আরব জাতির ইতিহাস

[প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত]

ফিলিপ কে. হিট্টি

মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩






স্যাবিয়ান ধরনের মুখাকৃতি

মূলগ্রন্থ : হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবস
ফিলিপ কে. হিট্টি
দশম সংস্করণ ; ম্যাকমিলান

অনুমতিপ্রাপ্ত প্রকাশক : মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

অনূদিত গ্রন্থস্বত্ব : মল্লিক ব্রাদার্স

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯

উপস্থাপনা : ক্যালকাটা ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
৬১, বি, পাম এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০ ০১৯

অনুবাদ : জয়ন্ত সিং ● সেঁজুতি ভট্টাচার্য ● সৌমিত্র সেনগুপ্ত

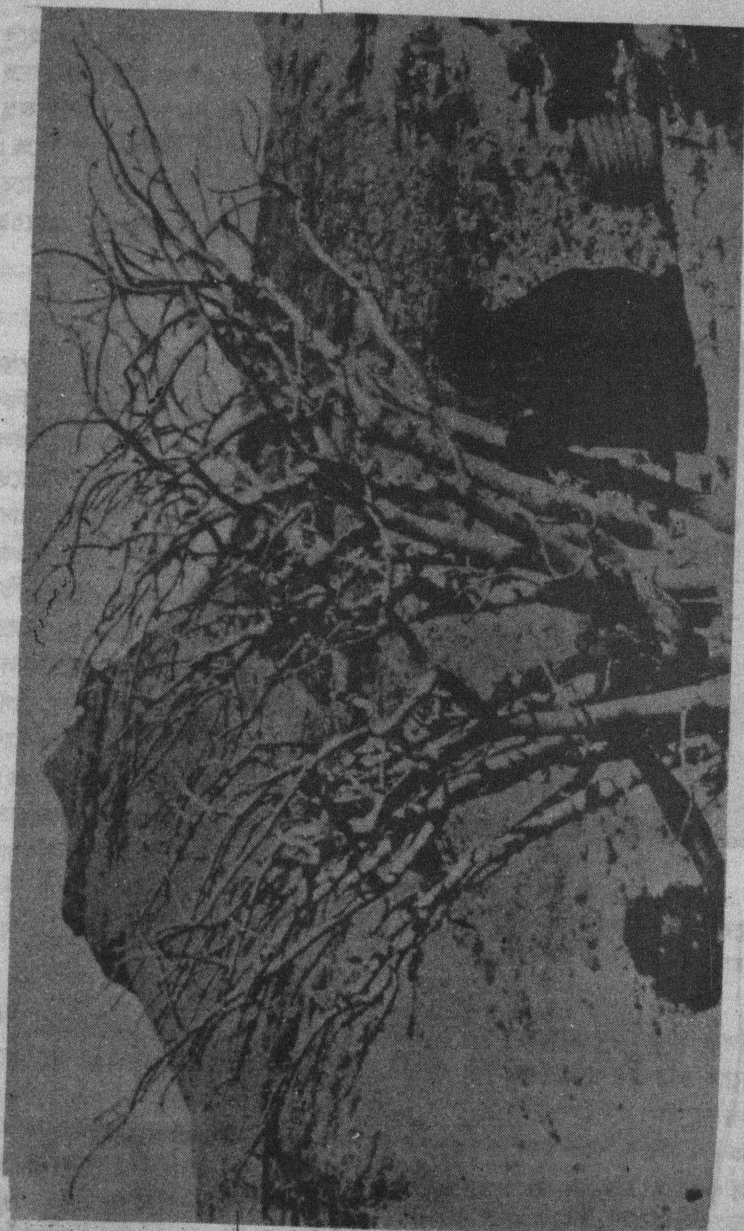
বানান সংযোজন : মুহা. আবদুল কাইউম

সম্পাদনা : তন্ময় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

অক্ষরবিন্যাস : ক্যালকাটা ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ

মুদ্রণ : অন্নপূর্ণা এজেন্সী
৬১, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯



ধুনা গাছ এবং একজন মাহ'রি সংগ্রাহক

প্রথম ভাগ

ইসলাম-পূর্ব যুগ

অধ্যায় ॥ ১ ॥

সেমেটিয় গোষ্ঠীভূত আরব জাতি :

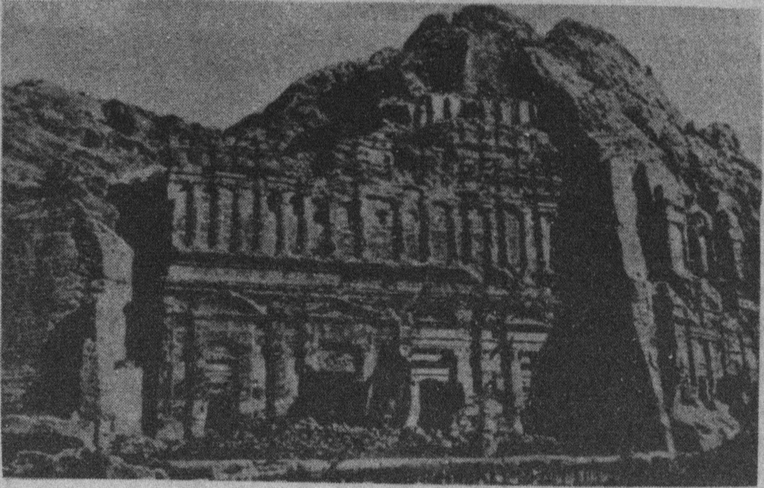
অধ্যায় ॥ ২ ॥

অধ্যায় ॥ ৩ ॥

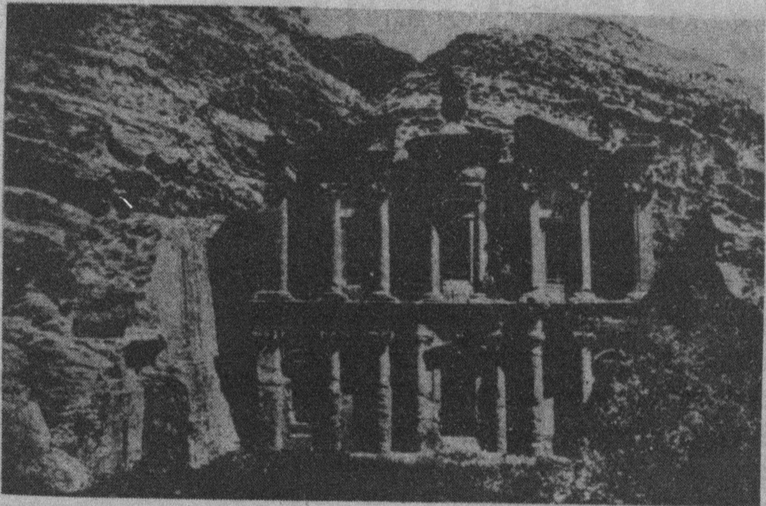
অধ্যায় ॥ ৪ ॥

অধ্যায় ॥ ৫ ॥

অধ্যায় ॥ ৬ ॥

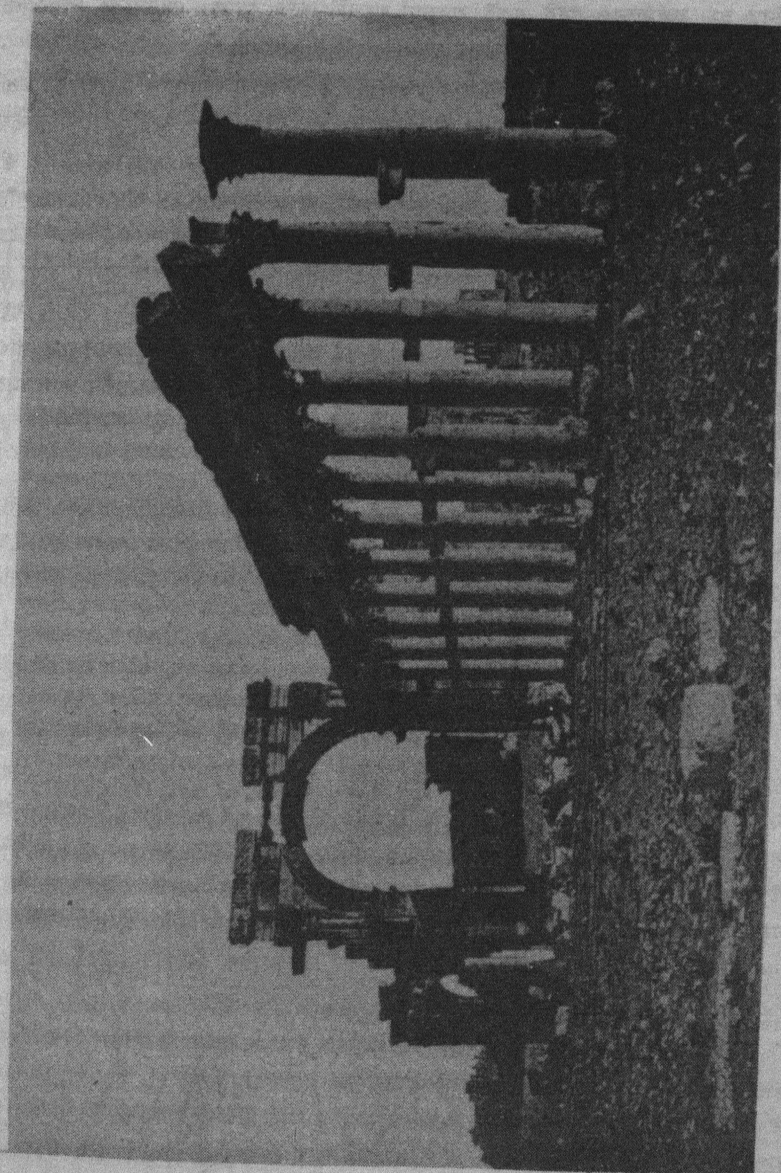


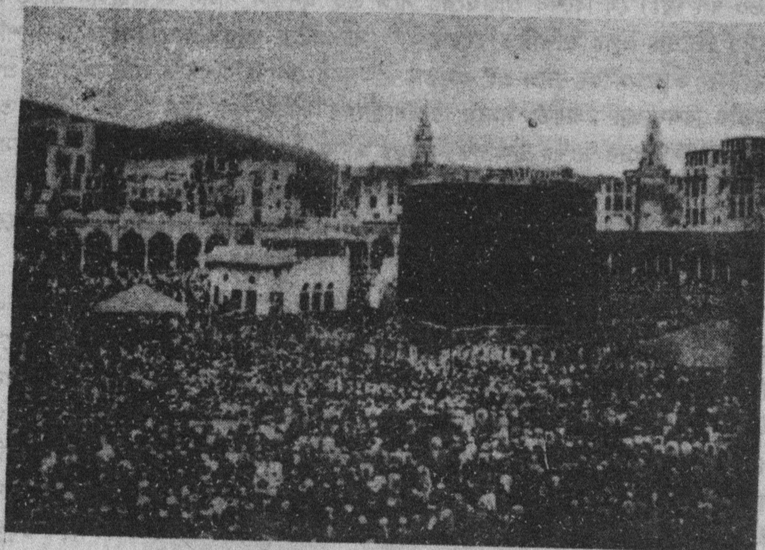
পেট্রার রাজপ্রাসাদ



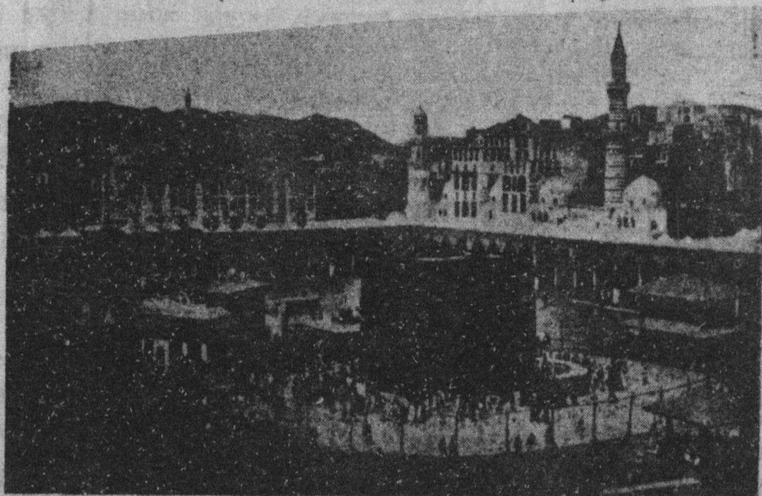
পেট্রার দার

হেরোডোটাস যাকে গণ্য করেছিলেন, সেই 'আল্লাত' ছিলেন প্রধান আরাধ্য দেবী। আঙুরের সঙ্গে পরবর্তীকালে 'দৃশারা' (যূ-শারা, অর্থাৎ শারার দেবতা) নামে যে দেবতা যুক্ত হয়েছিলেন,

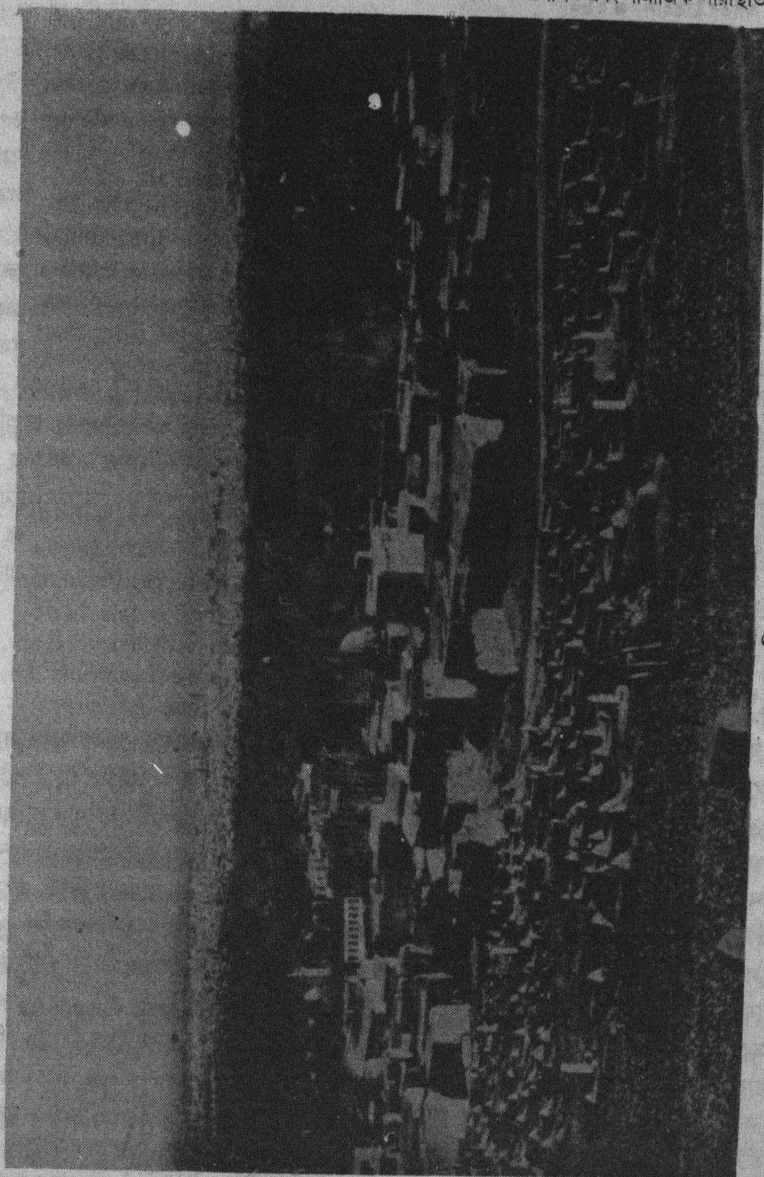




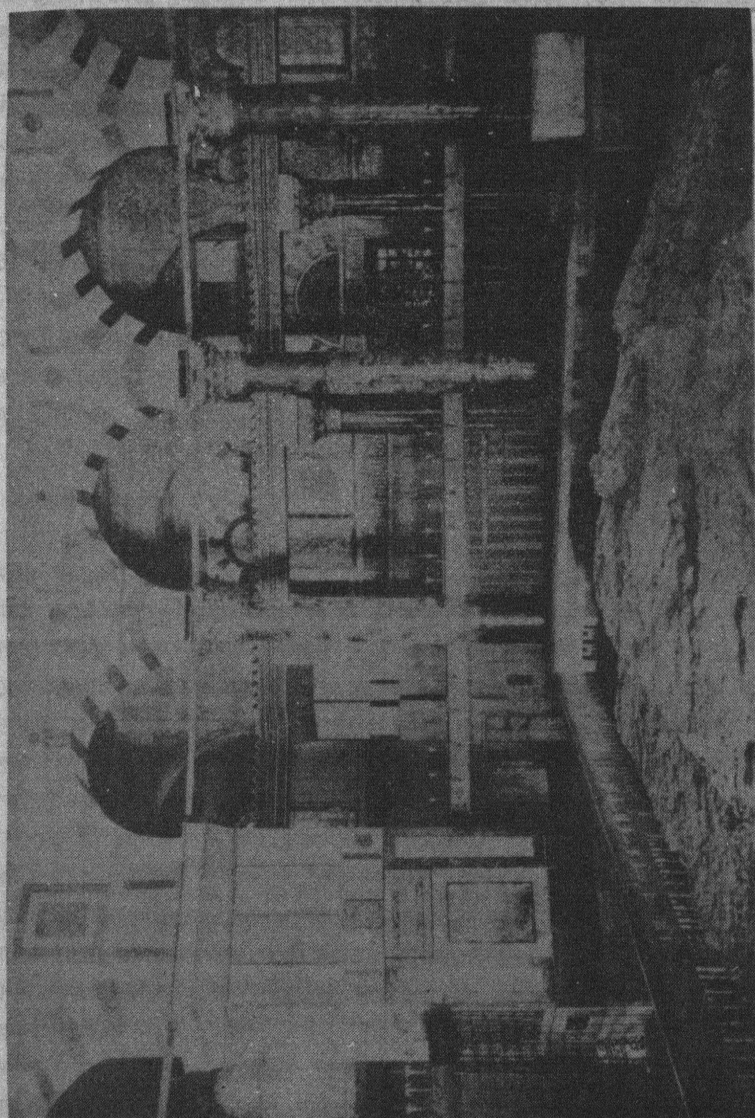
তীর্থযাত্রীরা কা'বাহ্‌র চারিদিকে তাদের শুক্রবারের নামাজ পড়ছে, ১৯০৮



কা'বাহ-র দক্ষিণ পূর্বাংশ, ১৯০৮



আল-সালহিয়াহ্ থেকে দেখা আজকের দামাস্কাস



ডোম অফ দ্য রক্-এর আভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশৈলী

অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

অধ্যায় ॥ ৩৩ ॥

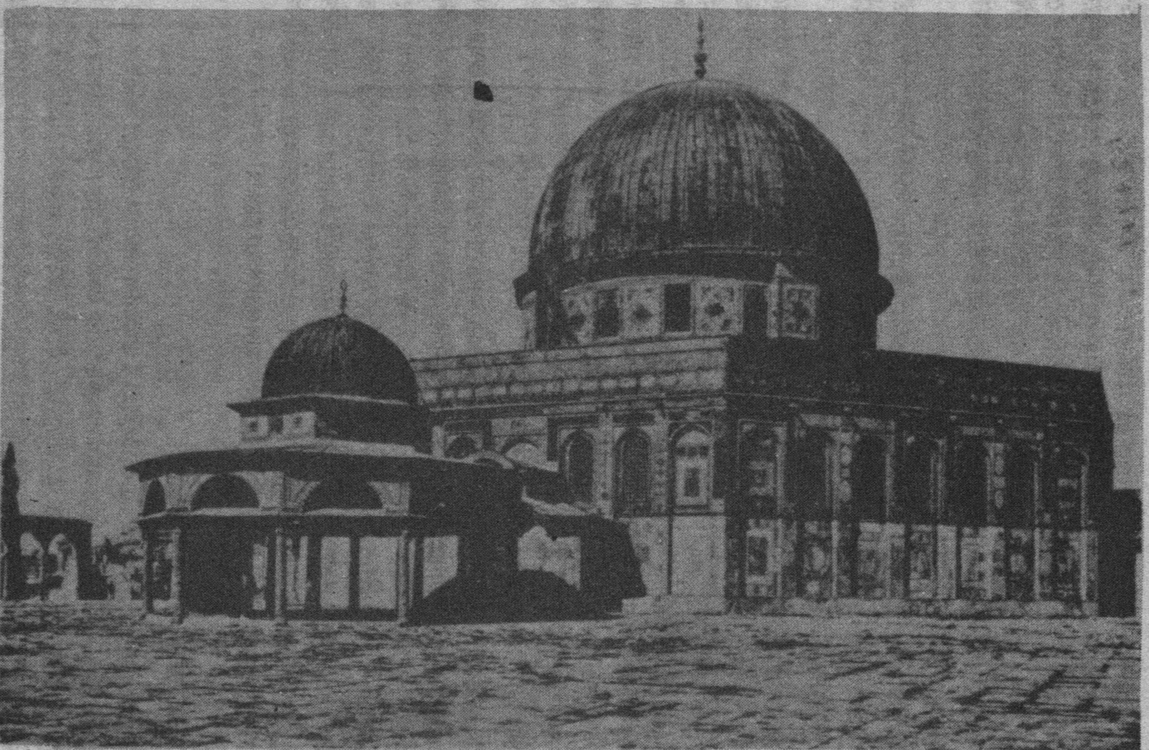
চতুর্থ ভাগ

ইউরোপে আরব অভিযান : স্পেন ও সিসিলি

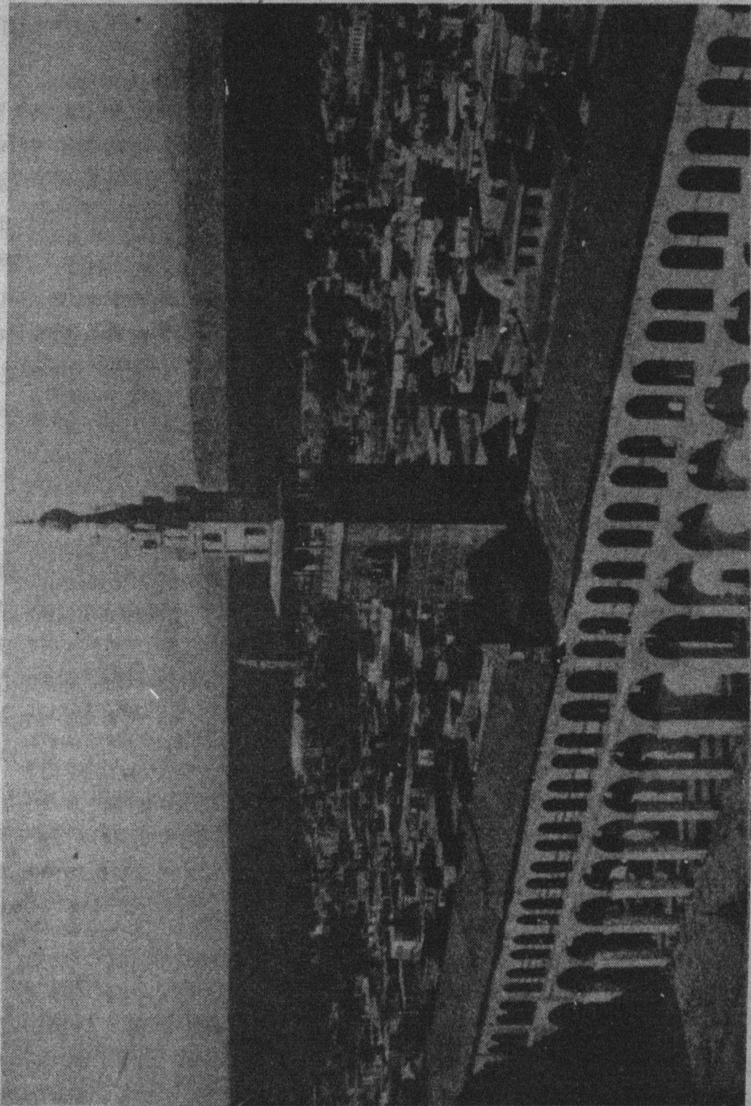
অধ্যায় - ৩৪

অধ্যায় ॥ ৩৫ ॥

অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥



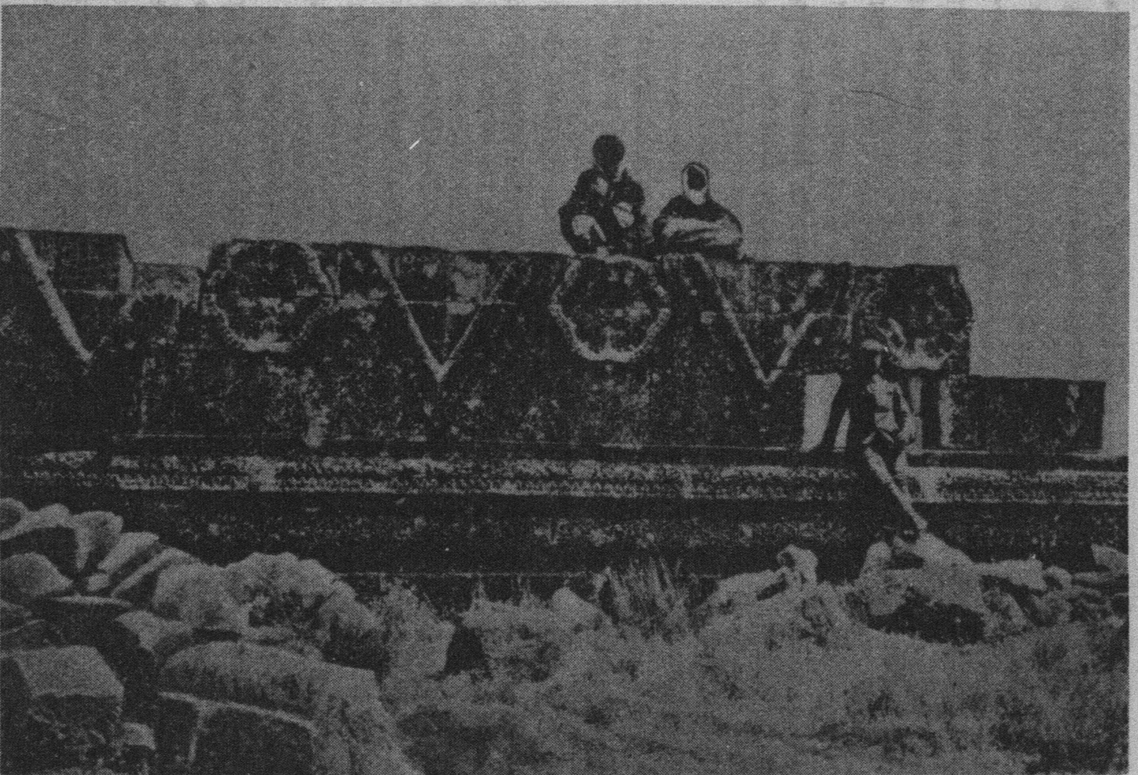
ডোম অফ্ দ্য রক্ এবং সারিবদ্ধ গম্বুজ



উমাইয়া মসজিদ : প্রার্থনাস্থল এবং উত্তরের মিনার

পঞ্চম ভাগ

সর্বশেষ মধ্যযুগীয় মুসলিম রাজ্যগুলি



আল-মাশতা-র প্রাসাদ-এর সম্মুখভাগ

অধ্যায় ॥ ৪৭ ॥

অধ্যায় ॥ ৪৮ ॥

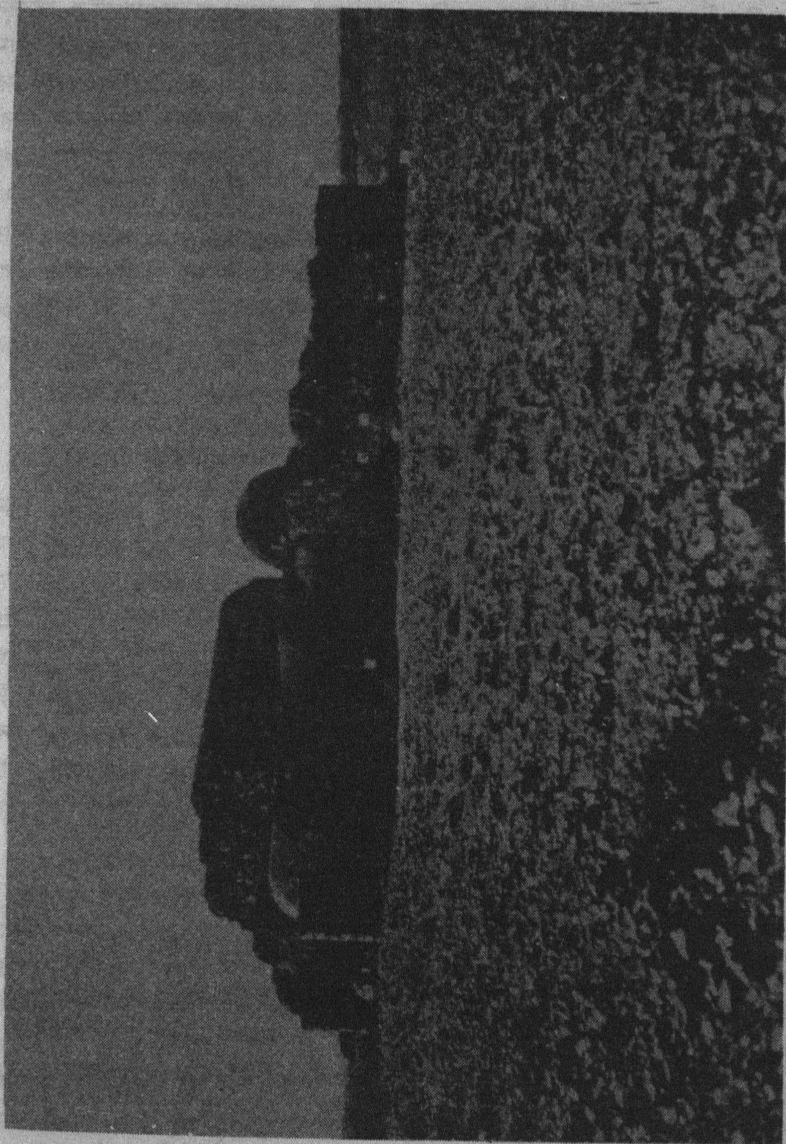
অধ্যায় ॥ ৪৯ ॥

ষষ্ঠ ভাগ

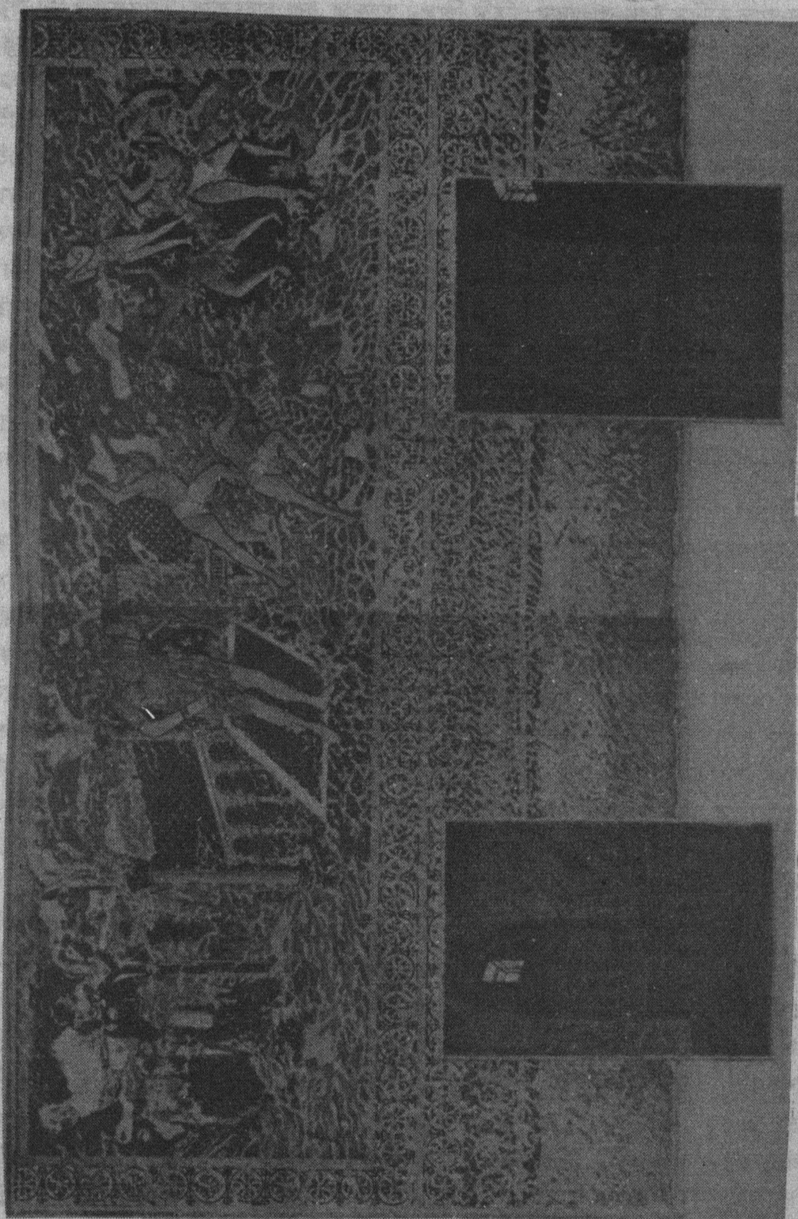
অটোমান শাসন এবং স্বাধীনতা

অধ্যায় ॥ ৫০ ॥

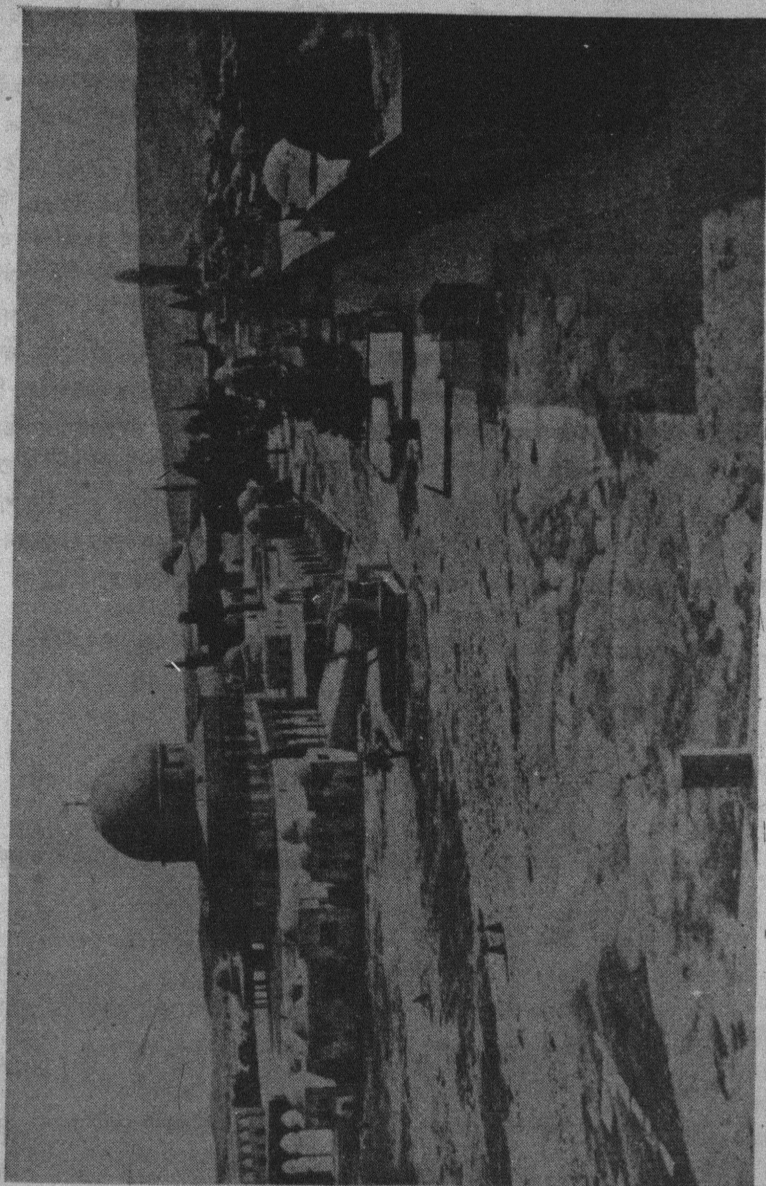
অধ্যায় ॥ ৫১ ॥

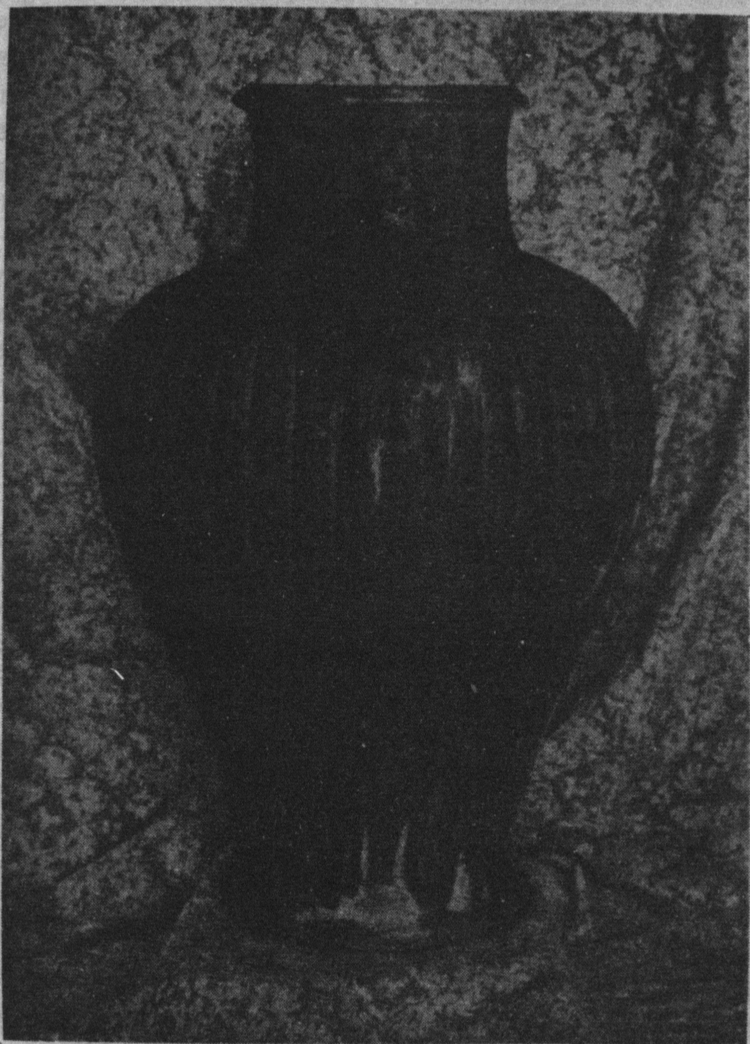


দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে কুসাইর উমরাহ

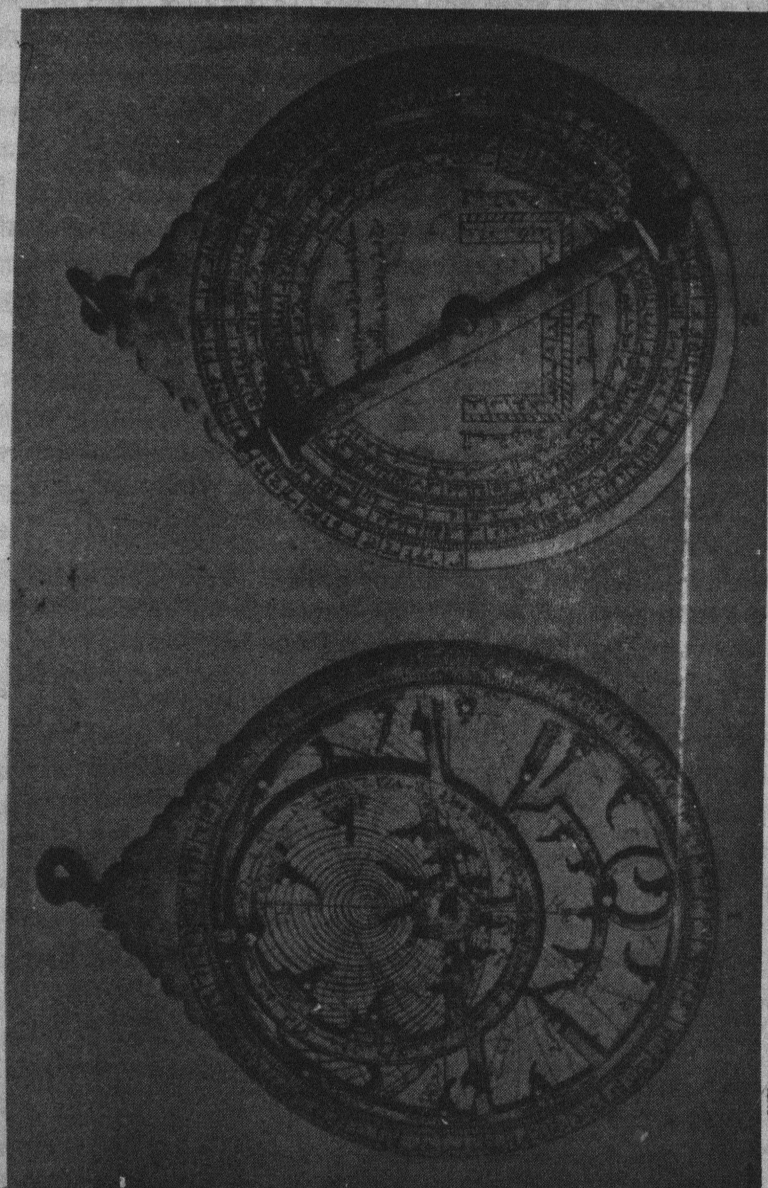


চিত্র তালিকা



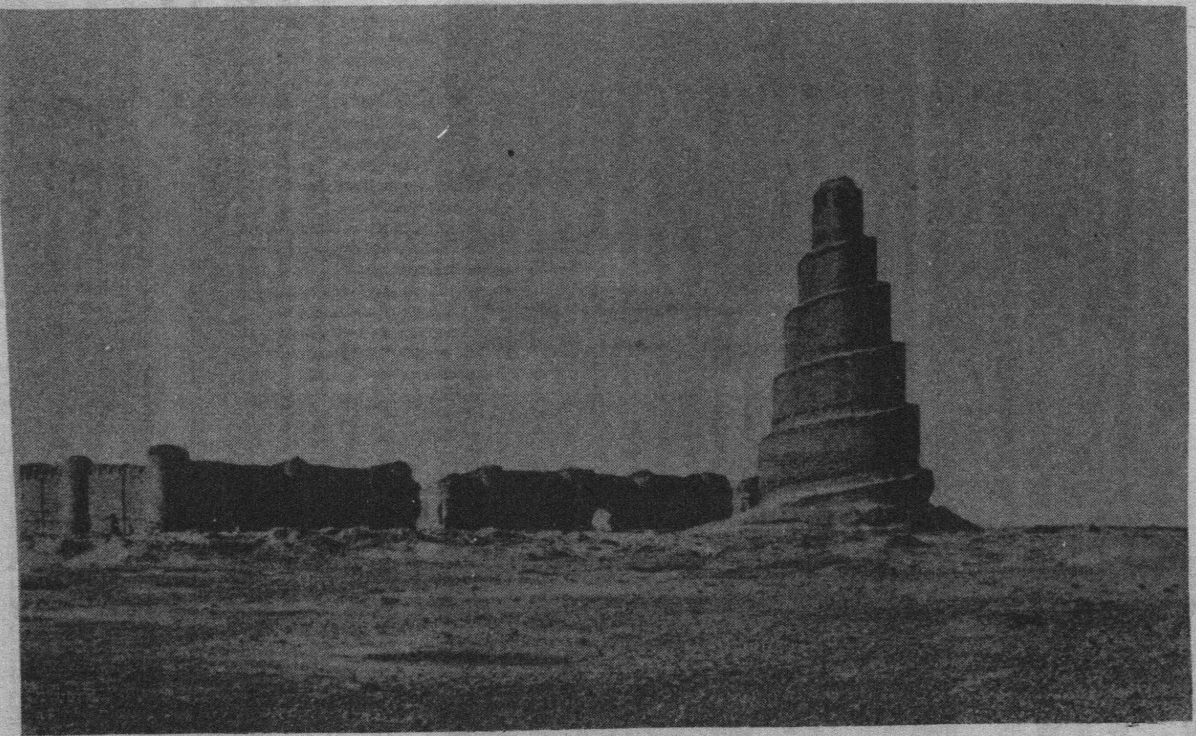


আল-রাক্কা, যেটি একসময়ে ছিল হারূণ-আল-রশীদ-এর রাজধানী,
সেখান থেকে পাওয়া গেছে নবমশতাব্দীর এই ফুল রাখার পাত্রটি।



হিজরী সন ১০১০ (১৬০১-২ খ্রীস্টাব্দ)-এ তৈরি একটি জ্যোতির্যন্ত্র

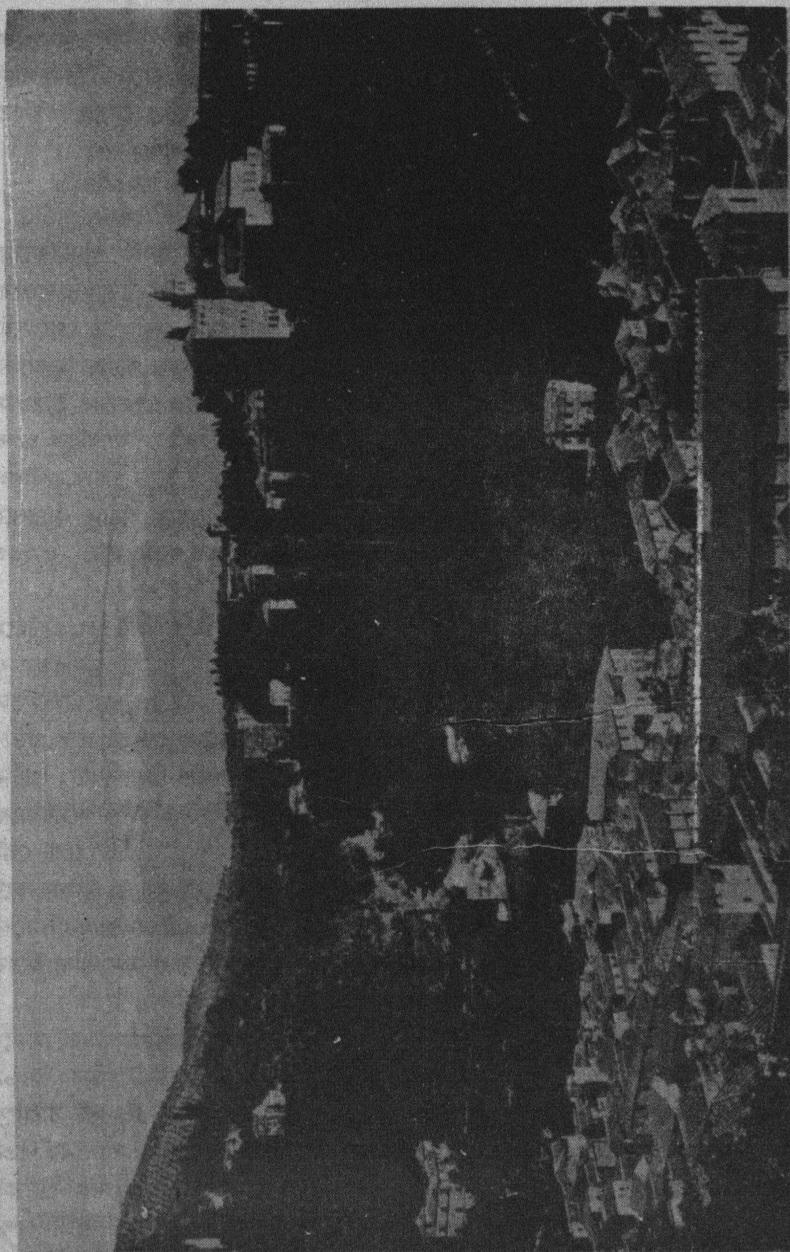
মানচিত্রের তালিকা



সামাররা-এর বিখ্যাত মসজিদের মালতওয়াহ্ প্রাসাদ (নবম খ্রিঃ)

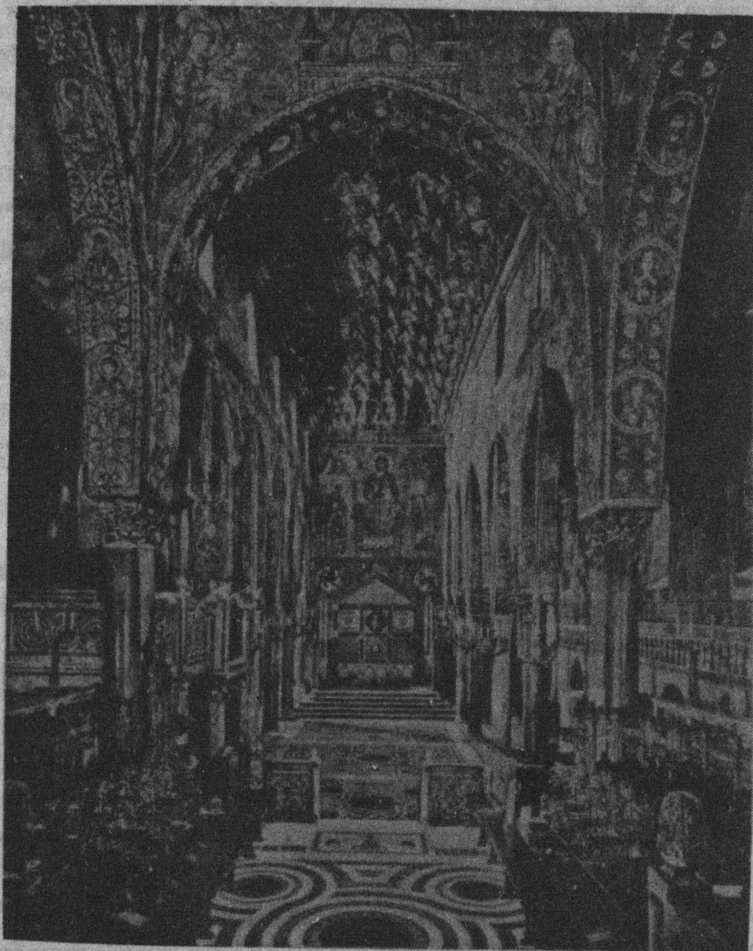
প্রথম ভাগ

ইসলাম-পূর্ব যুগ



— এখনকার আলহামব্রা এবং গ্রানাডা —

এবং তার নেতৃত্ব দিতেন আমিররা। এদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন অ্যান্টিয়োকের জর্জ (জুরজি)। এই গ্রিক সেনাপ্রধান এর আগে আফ্রিকার আল-মাহদিয়ায় এক মুসলিম যুবরাজের সেনাবাহিনীতে



দ্বিতীয় রজার নির্মিত পালেরমোর গির্জা

ছিলেন। সিসিলি অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদের নাম ছিল আমিরেটাস আমমিরাটোরাম (আমির আল-উমারা)।

।। অধ্যায় ১ ।।

সেমেটিয় গোষ্ঠীভূত আরব জাতি

সেমেটিয় গোষ্ঠীর ধাত্রী আরব ভূখণ্ড

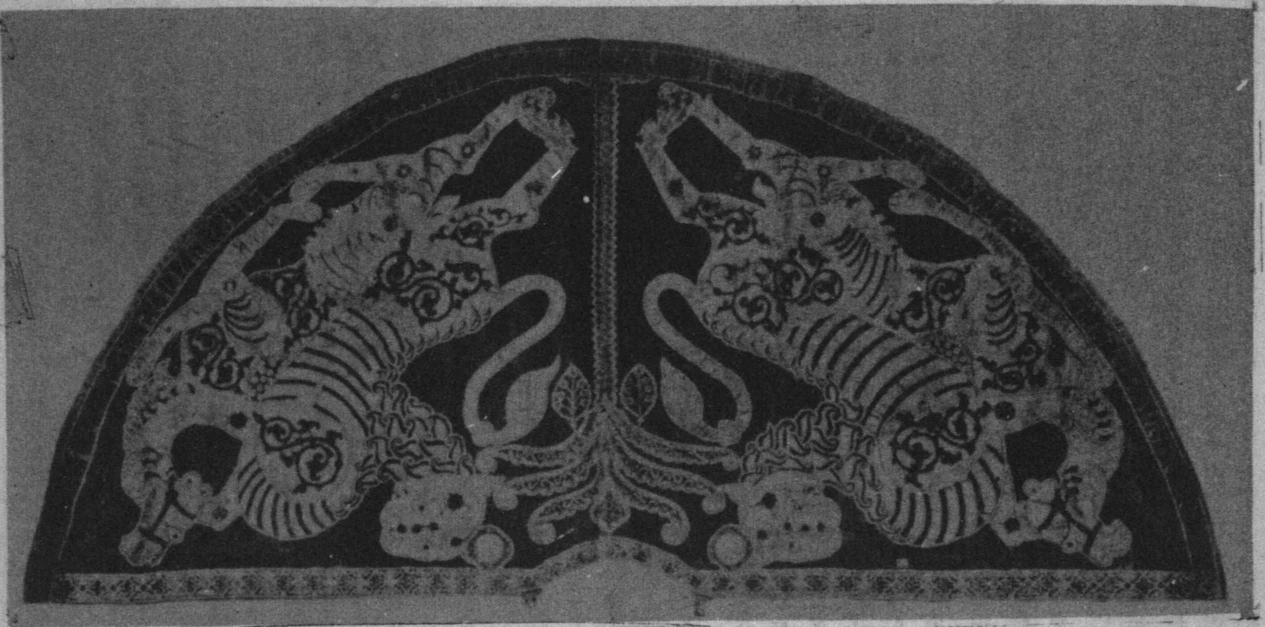
● অনুসন্ধানের কারণ

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অন্বেষণে আরব-ইতিহাসের উৎস-সন্ধান বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। ভাবতে অবাক লাগে, আরবের মত বিশাল এক রাষ্ট্র এবং তার জনগণ সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। শুধু ভৌগোলিক আয়তনের বিচারেই আরবের তুলনায় নেহাতই ক্ষুদ্র অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশি।

আরবের আয়তন ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ বা আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু আরব এবং আরবীয়দের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের তুলনায় অজানার অনুপাত বিস্ময়করভাবে বেশি। সুমেরু এবং কুমেরু সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই তুলনায় আরব সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

সেমেটিয় গোষ্ঠীর সম্ভাব্য ধাত্রী এই আরব ভূখণ্ড। এখান থেকেই সমৃদ্ধির পথে যাত্রা করা পথিকরা উত্তরকালের ইতিহাসে ব্যাবিলনিয়, অ্যাসিরিয়, ফিনিশিয় বা হিব্রু নামে পরিচিত হয়। বিশুদ্ধ সেমেটিয় চরিত্রের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে আরবের বালুরাশির মধ্যেই। কারণ, এখানেই রোপিত ও অঙ্কুরিত হয়েছিল ইহুদি ধর্ম এবং পরবর্তীকালের খ্রিস্টধর্মের বীজ। মধ্যযুগে এই আরবেই জন্ম হয় এমন এক মহামানবের, যিনি সেই সময়ের সভ্য বিশ্বের বৃহদংশই জয় করেছিলেন। প্রবর্তন হয় ইসলাম ধর্মের, যা বিশ্বের প্রায় সব জাতি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে পল্লবিত এবং এখনও যার ছত্রচ্ছায়ায় রয়েছেন ৪৫ কোটি অনুগামী। সমসাময়িক বিশ্বের প্রতি আট জনের এক জন হযরত মুহাম্মাদের অনুগামী এবং আযানের সুর প্রতি ২৪ ঘণ্টার অধিকাংশ সময়েই এই বিশ্বের গরিষ্ঠাংশে ধ্বনিত হচ্ছে।

আরবীয়দের নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে বিশ্বজয়ী শাসকদের নামের জ্যোতির্বলয়। আরব জাতির অভ্যুত্থানের একশ বছরের মধ্যেই অতলান্তিক সাগরের বিস্তীর্ণ বালুতট থেকে চীনের নিবিড়তম অঞ্চল পর্যন্ত এই বিশ্বজয়ীরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আয়তনে এই সাম্রাজ্য ছিল স্বর্ণযুগের রোম সাম্রাজ্যের থেকেও বিপুল ও বিশাল। ত্বরিৎ এবং ব্যাপক এই



অর্ধ বৃত্তাকার কুফিক লিপি শোভিত দ্বিতীয় রজারের অভিষেক প্রতীক

বিস্তার ইতিহাসে নজিরবিহীন। বর্ণ, ভাষা এবং আকৃতিতে বিভিন্ন যে অজস্র জনগোষ্ঠী সাম্রাজ্য বিস্তারের বিপুল এই উদ্যোগে আরবীয় রাজদণ্ডের আওতায় আসে তার তুলনায় হেলেনিয়, রোমান, অ্যাংলো-স্যাকসন বা রাশিয়ান সাম্রাজ্যও তুচ্ছ।[১]

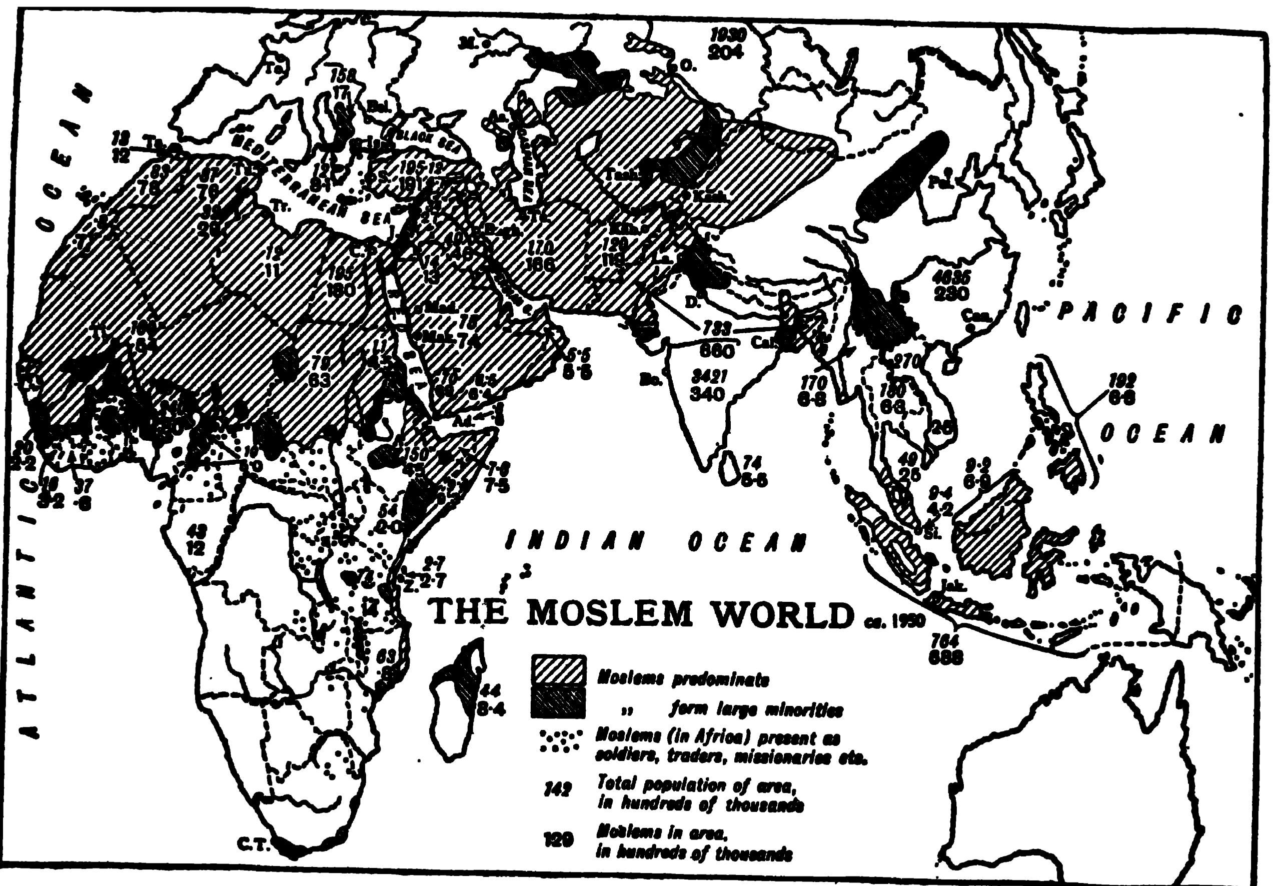
আরবীয়রা শুধু এক বিশাল সাম্রাজ্যই গড়েননি, সৃষ্টি করেছিলেন এক সংস্কৃতির। নীল নদের উপত্যকা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের তীরভূমি এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বতটে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল আরবীয়রা ছিলেন তারই উত্তরসূরি। গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির ধারায় পরিপুষ্ট আরবীয়রা এই সংস্কৃতির নির্যাস পৌঁছে দিয়েছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপের বিদগ্ধজনের কাছে। দীপ্তবুদ্ধির এই পরিক্রমাই উত্তরকালের প্রতীচ্যে এনেছিল নবজাগরণের আশ্বাস! আরবীয় এবং আরবী ভাষীদের অগ্রণী ভূমিকাতেই মধ্যযুগে মানবসভ্যতার বিকাশ ও বৃদ্ধি।[২] ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মতই তৃতীয় এবং সর্বশেষ একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আরবীয়রা। ঐতিহাসিকদের বিচারে, ইসলামধর্ম এই দুই ধর্ম সঞ্জাত। তাই অন্যান্য সব ধর্মের তুলনায় ইসলামের নৈকট্য এই দুই ধর্মের সঙ্গেই। কারণ, সেমেটিয় জীবনচর্যাই এই তিন ধর্মের উৎস। খ্রিস্টধর্মের অল্প কয়েকটি অনুশাসনে রদবদল ঘটালেই ধর্মপ্রাণ এক মুসলমানের কাছে তা গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলাম আজও এক চলিষ্ণু ও জীবন্ত বিশ্বাস, কোটি কোটি মানুষের জীবনচর্যার রূপরেখা।

মধ্যযুগের কয়েক শতাব্দী জুড়ে আরবী ভাষা ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল চিন্তার বাহক। কিন্তু আজ তা ব্যাপ্ত হয়েছে কয়েক কোটি মানুষের কথ্য ভাষায়। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অন্যান্য ভাষার তুলনায় আরবীতেই বেশি চর্চিত হয়েছে দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূবিদ্যা। পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় আরবীর প্রভাব আজও স্পষ্ট। বহু আরবী শব্দই এই সব ভাষার শব্দ-তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। লাতিনের পরেই আরবী বর্ণমালার ব্যবহার হত বিশ্বে সব থেকে বেশি। পারসি, আফগান, উর্দু এবং তুর্ক, বারবার ও মালয়ের অধিকাংশ ভাষাই লেখা হত আরবী বর্ণমালায়।

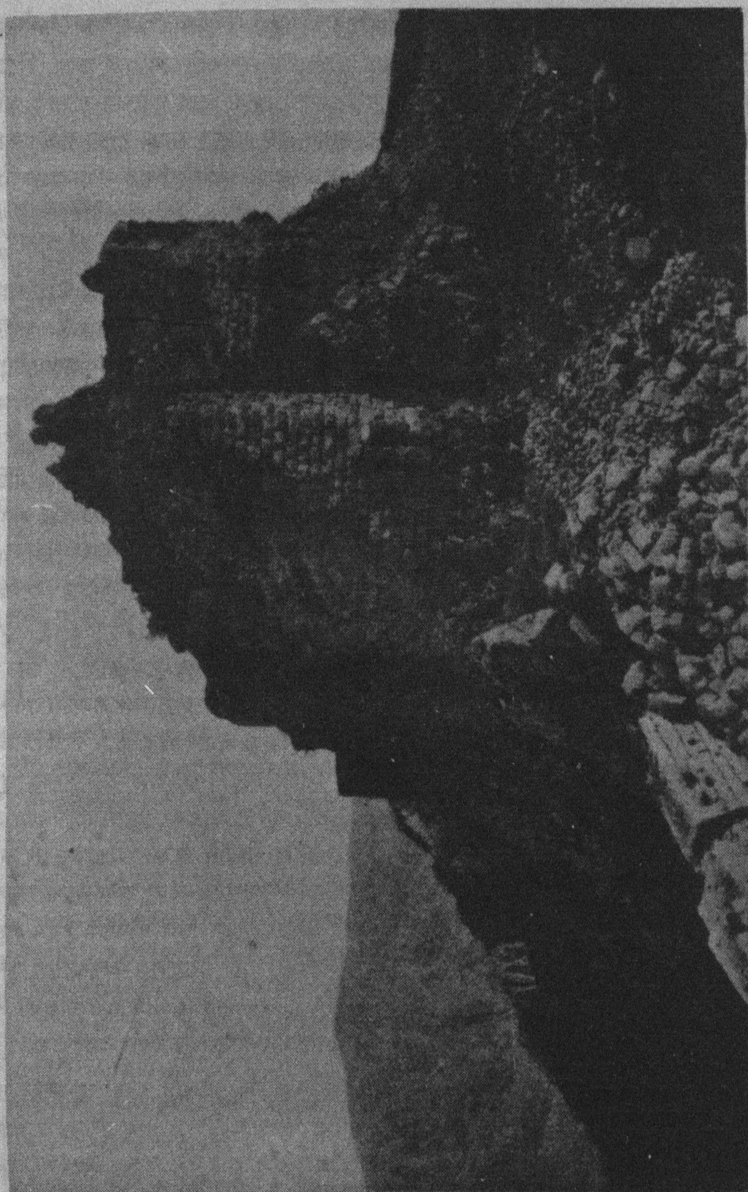
ব্যাবিলনিয়, ক্যালডিয়, হিট্টাইট এবং ফিনিশিয়রা আজ বিলুপ্ত। কিন্তু আরবীয় এবং আরবী-ভাষীদের অস্তিত্ব ইতিহাসের কাল থেকে আজও প্রখরভাবে বিদ্যমান। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্ববাণিজ্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশে। বর্তমানের রাজনীতিতে আরবের অবস্থান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্যভূমিতে। আরবের বালুরাশির মধ্যেই সঞ্চিত রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম তরল শক্তি—তেল। খনিজ এই তেলের প্রথম সন্ধান মেলে ১৯৩২ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবে সার্বভৌমত্বের চেতনা আসে এবং তার পর আসে স্বাধীনতা। ইসলামের অভ্যুত্থানের পর আরব ভূখণ্ড এই প্রথম সংহত এক শাসনের (সুয়ুদি) অধীনে আসে। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ১৯৫২ সালে মিশর সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করে। এর সাত বছর আগে, ফরাসি শাসনমুক্ত হয় সিরিয়া। এখানেও চালু হয় সাধারণতন্ত্র। মনে রাখতে হবে, সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস থেকেই গড়ে উঠেছিল



দশম শতকের ফাতিমিয় খলিফা আল-আযীযের নাম বহন করছে এই পাথরের পাত্রটি। এখন এটি ভেনিসের সেন্ট মার্কের ট্রেজারিতে রয়েছে।



THE MOSLEM WORLD ca. 1950
Moslems predominate
" form large minorities
Moslems (in Africa) present as soldiers, traders, missionaries etc.
142 Total population of area, in hundreds of thousands
120 Moslems in area, in hundreds of thousands
ATLANTIC OCEAN
MEDITERRANEAN SEA
BLACK SEA
INDIAN OCEAN
PACIFIC OCEAN
C.T.



কালআত আল-শাকীফ (বেলফোর্ট)

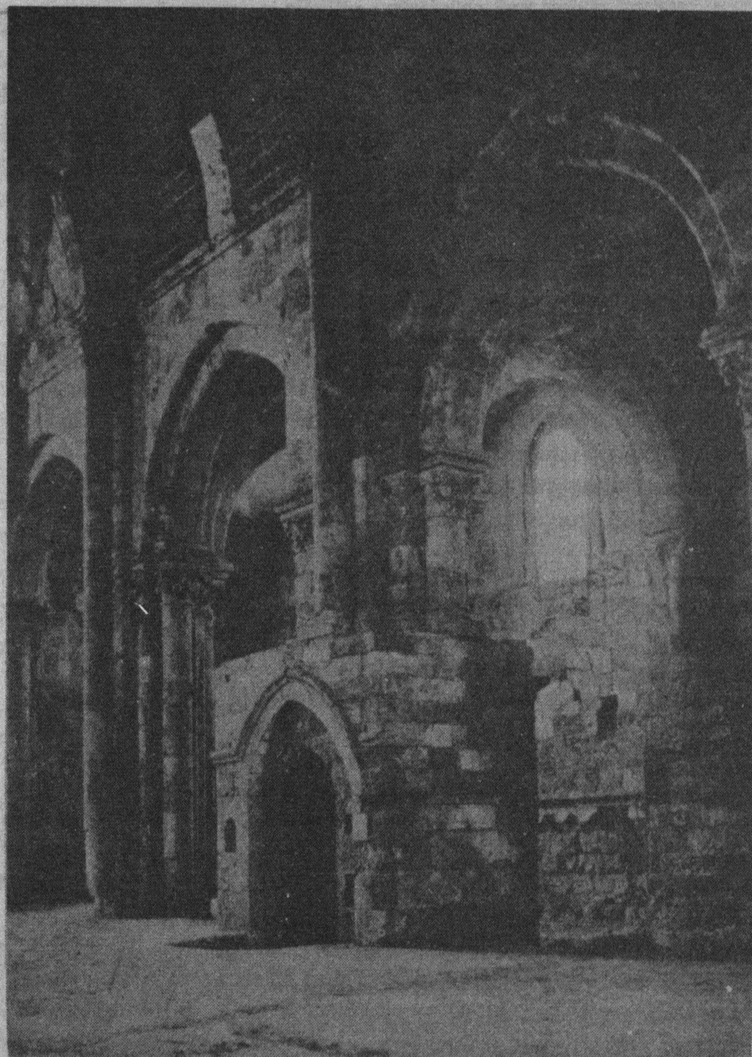
বর্ণময় উমাইয়াদ সাম্রাজ্য। আব্বাসীয় রাজবংশের অবলুপ্তির পর থেকেই আল-ইরাক বাস্তবিকভাবে নৃপতিবিহীন। তবে, বাগদাদে এক সুলতানকে একবার বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর রাজতন্ত্র আল-ইরাকেও বাতিল হয়ে যায়। জন্ম নেয় সাধারণতন্ত্র। তবে, এদের মধ্যে লেবাননেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় সাধারণতন্ত্রের। ট্রান্সজর্ডন এবং প্যালেস্তাইনের একাংশ মিলে ১৯৪৯ সালে গড়ে ওঠে জর্ডনের হাশিমি রাজ্য। ফরাসি শাসন থেকে ১৯৫০ সালে মুক্ত হয় উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, টিউনিশিয়া, মরিতানিয়া এবং আলজিরিয়া। ইতালির অধীনতা থেকে ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয় সিরিয়া। স্বাধীনতার প্রতীক—মুক্ত বিহঙ্গ ফিনিক্স আরবের আকাশে আবার ডানা মেলে।

● সাম্প্রতিক অভিযান

প্রাচীন ইউরোপের ধারণা ছিল শুধু দক্ষিণ আরব সম্পর্কে। হেরোডোটাস এবং অন্যান্যদের লেখায় এর পশ্চিম উপকূলের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ আরব সম্পর্কে গ্রিক ও রোমানদের উৎসাহের কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত, এখানে ধুনো-গুগগুল এবং রান্নার মশলা পাওয়া যায়; দ্বিতীয়ত, ভারত ও সোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্র হিসাবে দক্ষিণ আরবের গুরুত্ব। কিন্তু মধ্যযুগের শেষপাদ এবং আধুনিক যুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৃহত্তর আরব ইউরোপের কাছে অপরিচিতই ছিল। তবে, সম্প্রতি সূচনা হয়েছে নতুন করে আরবকে চেনার প্রয়াস। এই প্রয়াসের নান্দীপাঠ করেছেন ভূপর্যটক, খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক, বণিক এবং ১৮১১ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত মিশর অভিযানের ভারপ্রাপ্ত ফরাসি ও ইংরাজ সরকারের পদস্থ আমলারা। তা ছাড়া, কূটনৈতিক দূত এবং অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকরাও ত্বরান্বিত করেছেন এই প্রয়াস।

সম্প্রতিকালে আরব সম্পর্কে প্রথম অন্বেষণ শুরু করেন পণ্ডিত কার্সটেন নাইবুর। ১৭৬১ সালে ডেনমার্কের রাজার উদ্যোগে পাঠানো এক অভিযাত্রী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। প্রাচীন ইউরোপের সব চেয়ে চেনা জায়গা ছিল দক্ষিণ আরবের আল্-ইয়ামান। আরবকে নতুন করে চেনার প্রথম পাঠ শুরু হয় এখান থেকেই। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কেন্দ্র আল্-হিজাজ ভৌগোলিকভাবে ইউরোপের খুব কাছে হলেও এ জায়গা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত মাত্র জনা ১২ ইউরোপিয় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে এখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

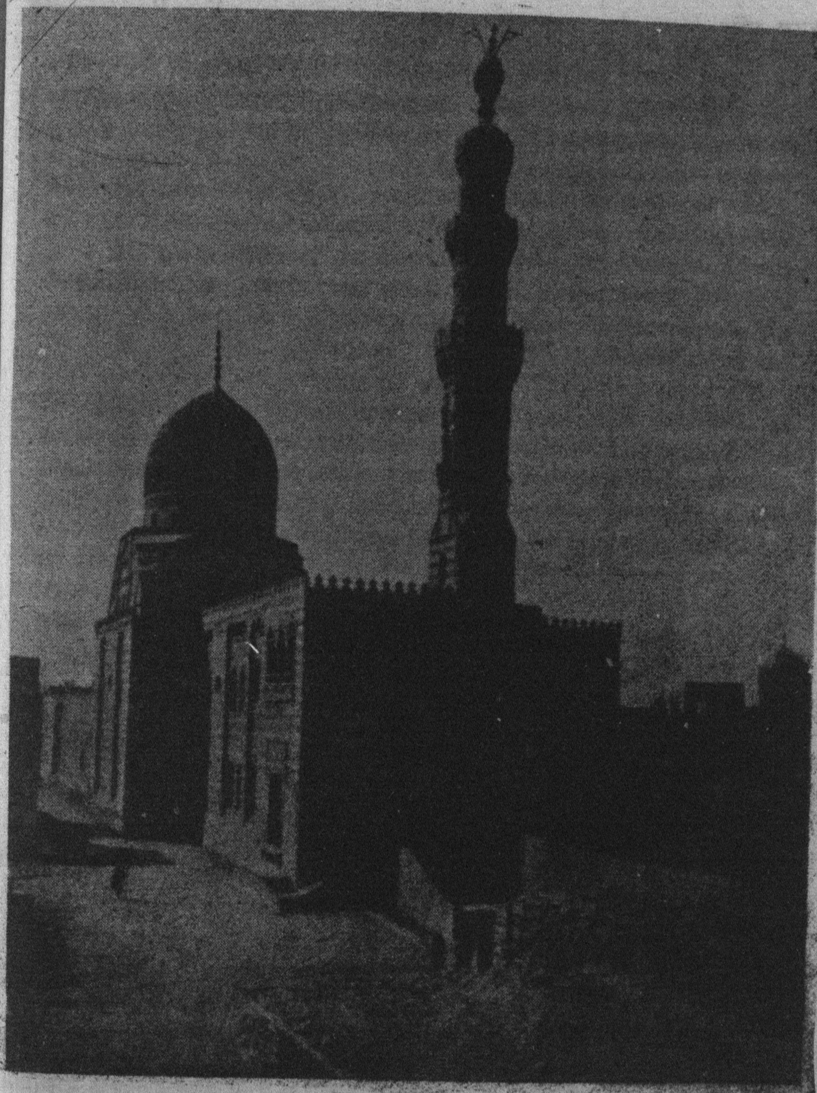
১৮১২ সালে জোহান লুডউইগ বার্কহার্ড নামে সুইডেনের এক অধিবাসী শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরেন পেত্রা-কে। ইবরাহীম ইব্ন-আবদুল্লাহ্ ছদ্মনামে তিনি মক্কা এবং মদীনায় যান। তাঁর বিবরণী সংস্কার করার মত তথ্য এ. পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বার্কহার্ডের মুসলিম সমাধি আজও কায়রোর সব থেকে বড় কবরস্থানে রক্ষিত। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আর একজন ইউরোপিয়ই মক্কার **দৈনন্দিন** জীবন পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি



আন্তারতুস (তরতোসা, আধুনিক তারতুস)-এর ক্রুশেড আমলের নোতরদাম গির্জার অভ্যন্তরভাগ (১৯২৯)।

হলেন লিডেনের অধ্যাপক স্নাউক হারগ্রোন্‌জে। তিনি মক্কায় যান ১৮৮৫-৮৬ সালে। ১৮৪৫ সালে সুইডেনের তরুণ পণ্ডিত জর্জ অগাস্টাস ওয়ালিন ভাষাতত্ত্বের গবেষণা চালাতে নাজদে পৌঁছান। ১৮৬১ সালে লেবানন থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার পর তৃতীয় নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন মধ্য-আরবে নতুন করে প্রভাব বিস্তার করতে। ১৮৬৩ সালে সেই উদ্দেশ্যে তিনি উইলিয়াম জিফোর্ড প্যালগ্রেভ নামে এক ইংরাজকে সেখানে পাঠান। প্যালগ্রেভ ছিলেন ইহুদি পরিবারের সন্তান এবং এক খ্রিস্টিয় সঙ্ঘের সভ্য। তিনি লেবাননের যাহ্‌লাহ্‌ অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। নাজদের প্রত্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলে গিয়েছেন বলে দাবি করলেও বাস্তবে প্যালগ্রেভ ও'সব জায়গায় যাননি। আরব্য রজনীর বিখ্যাত অনুবাদক সার রিচার্ড এফ বার্টন ১৮৫৩ সালে মক্কা ও মদীনায় যান তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে এবং আল-হাজ্জ-আবদুল্লাহ্‌ ছদ্মনামে। উত্তর আরবে যে দু'জন ইউরোপিয় মহিলা গিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন অ্যানি ব্লান্ট। ১৮৭৯ সালে তিনি নাজদে পৌঁছান বিচিত্র সব অভিযানের যাত্রী হয়ে। এই সব অভিযানের একটি ছিল আরবী ঘোড়ার খোঁজ করা। ১৮৭৫ সালে চার্লস এম ডাউটি নামে এক ইংরাজ 'নাসরানি' (খ্রিস্টান) এবং 'ইংলিসি' হিসাবে উত্তর আরবে অভিযান চালান। তাঁর এই অভিযানের রোজনামচা 'ট্রাভেলস ইন অ্যারাবিয়া ডেজার্টা' ইংরাজি সাহিত্যের এক ধ্রুপদী রচনা। ঠিক তেমনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক রচনা টি ই লরেন্সের সেভেন পিলারস অব উইজডম বিশেষভাবে প্রশংসিত। সাম্প্রতিক অভিযানগুলির অন্যতম উত্তর আরবে অ্যালোয়িস মুসিল নামে এক চেকোস্লোভাকিয়াবাসীর। এই এলাকা সম্পর্কে তাঁকে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য, আমিন রিহানি নামে আমেরিকায় থাকা এক লেবাননবাসী। আরব মুলুকের সব রাজাদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেছিলেন তিনি। এলডন রাটার ১৯২৫-২৬ সালে মক্কা ও আল-মদীনায় গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বারট্রাম টমাসের বিশেষ কৃতিত্বের কথাও বলতে হয়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাচ্যের ভাষা বিশেষজ্ঞ টমাসই প্রথম আরবের দক্ষিণে আল-রাব আল-খালি মরুভূমি অতিক্রম করেন। এর আগে পর্যন্ত কোন পর্যটক বা অনুসন্ধানীর দৃষ্টি পড়েনি এই মরুভূমির দিকে। ঠিক এক বছর পরে তাঁকে অনুসরণ করেন এইচ সেন্ট জে বি ফিলবি এবং আল-হাজ্জ আবদুল্লাহ্‌। ১৯৩২ সালের ৭ জানুয়ারি পারস্য উপসাগরের কাছে আল-হুফুফ থেকে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আল-রাব আল-খালি মরুভূমি অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লাগে ৯০ দিন।

দক্ষিণ আরবীয়দের ভাষায় তাদের নিজের কথা জানার সুযোগ এনে দেয় হিময়ারাইট লিপি। ১৮৬৯-৭০ সালে ফরাসি বিশেষজ্ঞ জোসেফ হেলভি এবং ১৮৮২ থেকে ১৮৯৪ সালে অস্ট্রিয়াবাসী ইহুদি এডওয়ার্ড গ্লেজার এই লিপি আবিষ্কার করেন। জোসেফ হেলভি এক ভিখারির ছদ্মবেশে এই লিপি উদ্ধারের কাজে জেরুসালেমে যান। তবে এই লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে সম্প্রতি। আরবী ভাষায় ইসলামি সাহিত্য রচিত হয়েছে অনেক পরে এবং এদের সংখ্যাও প্রচুর। এই সব লেখায় মৌলিকতার অভাব এবং অনুকরণের প্রবণতা থাকলেও



কায়েত-বে-র মাদ্রাসার বহির্ভাগ, কায়রো

প্রাচীন আরবের ইতিহাস জানার এটি এক উল্লেখযোগ্য সূত্র। বিক্ষিপ্তভাবে লাতিন ও গ্রিক সাহিত্যেও আরবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, ফারাও এবং অ্যাসিরিয়-ব্যাবিলনিয় রাজবংশের ইতিহাসের পুরাতাত্ত্বিক লিপিতে আরবের নিদর্শন মেলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি পাঠোদ্ধার হওয়া হিময়ারাইট লিপি এবং আধুনিক পর্যটনকারী ও অভিযাত্রীদের বিবরণী। প্রাচীন আরব সম্পর্কে জানার এগুলিই আমাদের মুখ্য উপকরণ।

● গোষ্ঠী সম্পর্ক

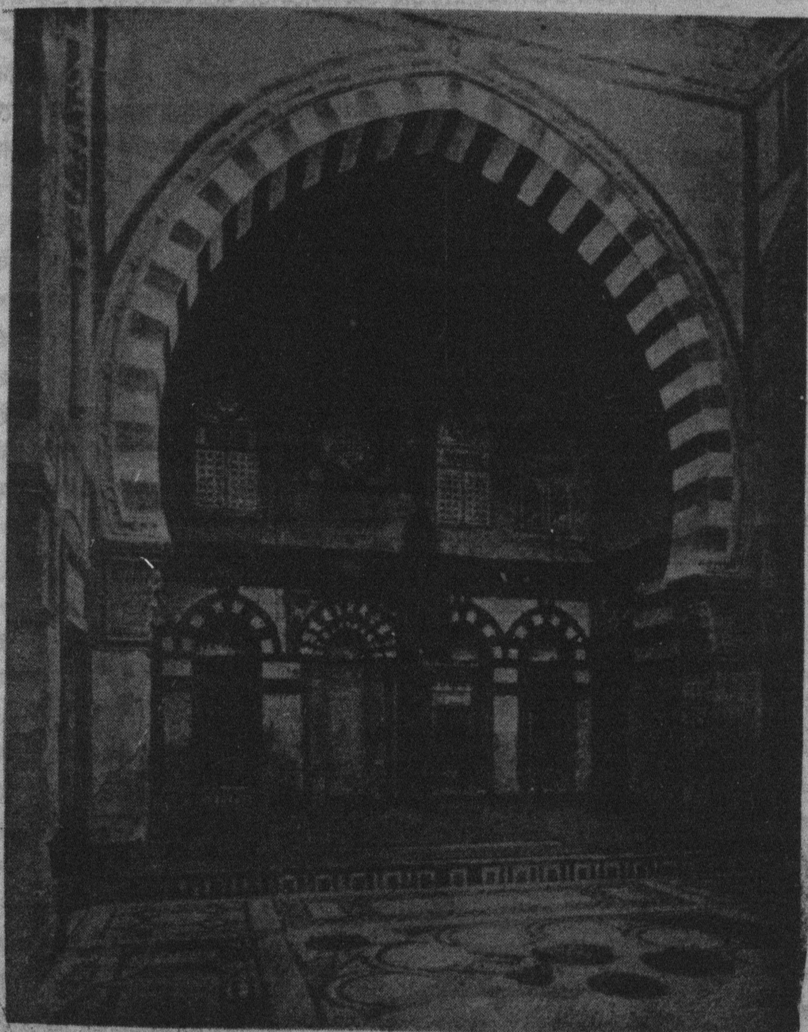
সেমেটিয় গোষ্ঠীর আজকের দুই প্রতিনিধি আরবীয় এবং ইহুদি। কিন্তু মূল সেমেটিয় গোষ্ঠীর শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষেত্রেও ইহুদিদের তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে আরবীয়রা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সেমেটিয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে আরবী অনেকটাই নবীন। কিন্তু ভাষার বাঁধুনি ও শৈলীতেও হিব্রু বা অন্য ভাষার তুলনায় সেমেটিয়র সঙ্গেই আরবীর মিল বেশি। তাই সেমেটিয় ভাষা চর্চার অন্যতম সূত্রই হল আরবী। সেমেটিয় ধর্মের যুক্তিপূর্ণ ও পরিমার্জিত রূপের সঙ্গে মূল ইসলাম ধর্মের অনেক সাদৃশ্য। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইহুদিরা। তাই এই দুই মহাদেশে সেমেটিয় বা সেমেটিয় বৈশিষ্ট্যধারী বলতে ইহুদিদেরই বোঝায়। কিন্তু আসলে তীক্ষ্ণ নাসা এবং অন্যান্য যেসব গড়নকে সেমেটিয় আখ্যা দেওয়া হয় আদপেই তা সেমেটিয় নয়। প্রকৃতপক্ষে তা 'সেমেটিয়দের' থেকে ইহুদিদের আলাদা করে। হিট্টাইট-হুররিয়ান ও হিব্রুদের[৩] মধ্যে প্রাচীন যুগে যে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি হয় এইসব বৈশিষ্ট্য তারই ফল।

আকার, প্রকৃতি, মানসিকতা, সামাজিক বিন্যাস এবং ভাষা-বৈশিষ্ট্যে সেমেটিয় গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ আরবীয়দের আরবীয় হয়ে ওঠার, বিশেষত যাযাবর জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণ আরবের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গ মরুজীবনের একঘেয়েমি। এই নির্মম বিচ্ছিন্নতা এবং প্রাকৃতিক কার্পণ্যের বিনিময়েই তারা রক্ষা করেছিল তাদের সেমেটিয় শুদ্ধতা।

আরবরা তাদের বাসভূমিকে বলে 'জাজিরাত আল-আরব' বা "আরবদের দ্বীপ"। সমস্ত দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপের তিনদিকে জল এবং একদিকে বালি। ভূমি এবং ভূমিপুত্রদের অবাধ এবং অসঙ্কুচিত সম্পর্কের এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

ভারত, গ্রিস, ইতালি, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার ইতিহাস যেমন বহিরাগতদের বারংবার প্রবেশ ও অনুপ্রবেশের সংঘাত এবং অভিঘাতে বিচলিত এবং বিচিত্রিত, অভিবাসনের সেরকম কোন ঐতিহাসিক তথ্য আরবের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি আরব-আক্রমণের বা বিজয়-প্রয়াসের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র। অন্তত ইতিহাসের সালতামামির তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, আরবের মানুষ তাদের বাসভূমিতে আদিলগ্ন থেকেই এক রকম জীবন কাটাচ্ছে।[৪]

ইংরাজি 'সেমাইট' শব্দটির উৎস ওল্ড টেস্টামেন্টের (জেনেসিস ১০ . ১) 'শেম' শব্দে



কায়েত-বে-র মাদ্রাসার অভ্যন্তরভাগ, কায়রো

নিহিত। লাতিনে অনূদিত বাইবেলে এই শব্দটির সন্ধান মেলে। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী তথাকথিত সেমেটিয়রা নোয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধর এবং জাতিগতভাবে সমগোত্রীয়। কিন্তু সেই মতবাদ আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। তা হলে সেমেটিয়দের প্রকৃত পরিচয় কী?

পশ্চিম এশিয়ার ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্র বিচার করলে দেখা যায় সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, মূল আরব-ভূখণ্ড এবং আল-ইরাকে বর্তমানে আরবীভাষী মানুষেরই বসবাস। কিন্তু ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, খ্রিস্টের জন্মের চারহাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয় (এখানকার রাজধানী আক্কাদু, আগাদের নামানুসারে এদের আদি নাম আক্কাদিয়ান) অ্যাসিরিয় এবং পরে ক্যালডিয়ানরাই টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী উপত্যকা দখল করেছিল। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর আমোরাইট এবং ক্যানানাইটদের (ফিনিশিয় সহ) নিয়েই গঠিত ছিল সিরিয়ার জনসংখ্যা। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ আরামিয়রা সিরিয়ায় এবং হিব্রুরা প্যালেস্তাইনে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে। ১৯ শতক পর্যন্ত আমরা একথা উপলব্ধি করতে পারিনি যে, এইসব জাতির মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ১৯ শতকেরই মধ্যভাগে পাঠোদ্ধার করা হয় প্রাচীন কীলকাকার লিপির। সেইসঙ্গে অ্যাসিরিয় ব্যাবিলনিয়, হিব্রু, আরামাইক, আরবী এবং ইথিওপিয় ভাষার তুলনামূলক বিচার করে দেখা যায় এইসব ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এরা সকলেই সমগোত্রীয়। এমনকী ক্রিয়ার গঠন, কাল বা সর্বনামের মত ব্যকরণগত দিক থেকেও এইসব ভাষার গঠনশৈলী একইরকম। এইসব ভাষায় যাঁরা কথা বলতেন তাদের চেহারায় যেমন সাদৃশ্য ছিল, বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ধর্মবিশ্বাসেও তেমনই আশ্চর্যরকমের মিল। ভাষার এই নিবিড় বন্ধন এইসব জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যেরই পরিচায়ক। এই ঐক্যের বৈশিষ্ট্য হল গভীর ধর্মীয় প্রেরণা, সুদূরপ্রসারী কল্পনা, সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নিষ্ঠুর মনোভাব। এর থেকে একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়— ব্যাবিলনিয়, অ্যাসিরিয়, আরামিয়, ফিনিশিয়, আমোরাইট, ক্যালডিয়ান, হিব্রু, আরবী এবং আবিসিনিয়রা পৃথক জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশের আগে নিশ্চয়ই কোন এক ভূখণ্ডে এক সময়ে এক জাতি হয়েই বাস করত।

● সেমেটিয় গোষ্ঠীর ধাত্রী আরব

তা হলে কোথায় ছিল এইসব মানুষের আদি নিবাস? এব্যাপারে জ্ঞানীজনেরা একাধিক অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। যাঁরা সেমেটিয় ও হ্যামাইটদের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক বিচার করেছেন, তাঁদের মতে পূর্ব-আফ্রিকাই ছিল সেমেটিয়দের বাসভূমি। অপরদিকে বাইবেলের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাসীরা মনে করেন, মেসোপটেমিয়াতেই সেমেটিয়দের মূল নিবাস। তবে এক্ষেত্রে, আরব উপদ্বীপের সপক্ষে পেশ করা যুক্তিকেই সার্বিকভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়। মেসোপটেমিয়া-সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী, সেমেটিয়রা নদীর উপকূলের কৃষিপ্রধান জাতি থেকে যাযাবরে পরিণত হয়। কিন্তু এই তত্ত্ব প্রাচীনযুগের সমাজতাত্ত্বিক নিয়মের সম্পূর্ণ

বিরুদ্ধে। আফ্রিকার সপক্ষ যুক্তির বিরুদ্ধেও রয়েছে একাধিক সংশয়।

আরবের ভূভাগের অধিকাংশই মরু। সীমানা জুড়ে সামান্য কিছু জমি বসবাসের যোগ্য। সীমানার প্রহরায় রয়েছে লবণাক্ত সমুদ্র। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বাড়তি জমির প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু কোথায় জমি? একদিকে তপ্ত মরু— অপরদিকে আরব সাগর। দু'দিকেই বাধা দুর্লঙ্ঘ্য। পথ একটাই। আরব সাগরের পশ্চিম তট ধরে উত্তরাভিমুখে গিয়ে নীলনদের উর্বর উপত্যকায় পৌঁছানো। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে, সেমেটিয়দের এক গোষ্ঠী এই পথেই অথবা পূর্ব-আফ্রিকা হয়ে নীলনদের উপত্যকায় পৌঁছেছিল। মিশে গিয়েছিল এখানে বসবাসকারী হ্যামিটিয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। আর এই মিশ্রণেই উত্তরকালের ইতিহাসে জন্ম নিয়েছিল মিশরিয়রা। এঁরাই হলেন সেই মিশরিয় যাঁরা মানবসভ্যতার প্রথম সোপানগুলি গড়ে দিয়েছিলেন। নির্মাণের কাজে পাথরের ব্যবহার কিংবা সৌর বর্ষপঞ্জি এঁদেরই দান। প্রায় একই সময়ে পূর্বতট ধরে আর একটি গোষ্ঠী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় এসে পৌঁছায়। এখানে তখন সুমেরিয়[1] সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ইউফ্রেটিস-তটের এই সভ্যতা সুমেরিয়রাই গড়েছিলেন। যাযাবর হিসাবে সেমেটিয়রা এখানে পৌঁছেই শিখেছিলেন গৃহবাসী হতে, বাড়ি তৈরির কলাকৌশল, চাষ-আবাদ এবং বর্ণমালা। সুমেরিয়রা কিন্তু সেমেটিয় ছিলেন না। এখানে এই দুই গোষ্ঠীর মিশ্রণেই জন্ম নিল পরবর্তীকালের ব্যাবিলনিয়রা। সংস্কৃতির যে উত্তরাধিকার আমরা ভোগ করছি তার প্রথম পুরুষ এঁরাই। এঁদের হাতেই জন্ম নিয়েছিল ধনুর্বাণ, চাকাওয়ালা গাড়ি এবং ওজন ও মাপ।

সেমেটিয় গোষ্ঠীর এই বর্ণময় উত্থানের আর এক সঙ্গী আমোরাইট গোষ্ঠী। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগে এই দুই গোষ্ঠীর মেলবন্ধন ঘটে। আমোরাইট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল ক্যানানাইট এবং ফিনিশিয়দের নিয়ে। এই ক্যানানাইটরাই ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরে পশ্চিম সিরিয়া ও প্যালেস্তাইন জয় করেন। সমুদ্রতটবাসী ফিনিশিয়দের নামকরণ করেন গ্রিকরা। সভ্যতার সেরা আবিষ্কার বর্ণলিপি প্রথম তৈরি করেছিলেন এঁরাই। ২২টি সাঙ্কেতিক চিহ্নের এই লিপি ফিনিশিয়দের হাতেই ব্যাপক প্রচার পায়।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০-র মধ্যে দক্ষিণ-সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনে পৌঁছান হিব্রুরা। (পরবর্তীকালের সিরিয়াবাসী) আরামিয়নরা পৌঁছান উত্তর সিরিয়ায় বিশেষত কোয়েলি সিরিয়ায়।[2] একেশ্বরবাদ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে প্রথম স্পষ্ট ধারণা দিয়েছিলেন এই হিব্রুরাই এবং এই ধারণাই উত্তরকালে খ্রিস্ট এবং ইসলামধর্মে পল্লবিত।

প্রায় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নাবাটিয়ানরা সিনাইট অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে তাঁদের সভ্যতা গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে রোমানদের প্রভাবে এই সভ্যতা উন্নতির যে শীর্ষে উঠেছিল তার প্রমাণ পার্বত্য-রাজধানী পেত্রার ধ্বংসাবশেষে আজও প্রতীয়মান।

এক ভূখণ্ড থেকে আর এক ভূখণ্ডে যাতায়াতের নতুন এবং চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় সাতের

শতকে ইসলামের ছত্রছায়ায়। এই জনজোয়ারে শুধু আরবের মূল ভূখণ্ড নয়, প্লাবিত হয়েছিল পারস্য উপসাগরের শীর্ষ থেকে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত যদি কোন বক্ররেখা আঁকা যায় তার অন্তর্গত সমগ্র জনাঞ্চল। এই ঢেউ পৌঁছেছিল মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার[১] কিছু অঞ্চলেও।

এই তরঙ্গের শেষ অভিঘাত ইতিহাসের পূর্ণ চেতনার মধ্যেই পড়ে। তাই যে সব ইতিহাসবিদ মনে করেন, সেমেটিয় গোষ্ঠীর ধাত্রীভূমি আরব, তাঁরা এই ঐতিহাসিক অভিঘাতকে সপক্ষ যুক্তির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। এঁদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে অন্যান্য এই ধরনের গোষ্ঠীর তুলনায় সেমেটিয়দের চারিত্র বৈশিষ্ট্য আরবীয়দের মধ্যেই শুদ্ধতমরূপে বিদ্যমান এবং জীবনচর্যায় প্রকাশিত। বিদ্বৎজনের মতে, এঁদের ভাষা এবং উচ্চারণও আদিম সেমেটিয় উচ্চারণের খুব কাছাকাছি। ক্রমিক এই গতায়াতের যে সালতামামি আগে দেওয়া হল তার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, পরবর্তী এক হাজার বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে হারে ঘটেছে তাতে অন্য ভূখণ্ডের সন্ধানে যাওয়া ছাড়া সেমেটিয় গোষ্ঠীর অন্য কোন উপায় ছিল না। যে সব পণ্ডিত এই ধারণার অনুসারী তাঁরাই এই গতায়াতকে 'তরঙ্গ' নামে অভিহিত করেছেন। ইউরোপিয়রা যে ভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল সেমেটিয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি : ছোট একটি দল প্রথমে অজানা বহির্বিশ্বের সন্ধানে যাত্রা করে, ক্রমে অনুসরণকারী দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে যতক্ষণ না পুরো জনগোষ্ঠীই উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ধূসর মরু থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের শস্য-সবুজ ক্ষেত্রে অবিরত মানুষের ঢল নামা বা বিক্ষিপ্ত অথচ ক্রমিক জনগোষ্ঠীর আগমণ ছিল প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। তাই এই স্থান ও কালের দীর্ঘ ও বন্ধুর ইতিহাস জানার ও বোঝার সূত্র এটিই। পরিযায়ী এই গোষ্ঠী নিকটতম শ্যামল-সভ্যতায় পৌঁছে কিছু পরিমাণে তাদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি গ্রহণ করত, পরিবর্তে দেওয়ার চেষ্টা করত নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু কোনক্ষেত্রেই ভূমিপুত্রদের সমূলে উৎপাটনের কোন চেষ্টা থাকত না। দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যের ইতিহাসে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। এই ইতিহাসের এক বৃহদংশই পরিযায়ী আরব এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যের ভূমিপুত্রদের সংগ্রামের ইতিহাস। আসলে, অভিবাসন বা ঔপনিবেশিকতা যে দখলেরই মার্জিত রূপ এখানকার ইতিহাসই তার প্রমাণ।

এই অভিবাসনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রায় সব ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত টিঁকে গিয়েছে সেমেটিয় ভাষাগোষ্ঠী। বহুক্ষেত্রে এই জন্যই পরবর্তীকালের ইতিহাসচর্চায় দিকনির্দেশকের কাজ করেছে। যেমন, মেসোপটেমিয়ায় যদি সুমেরিয় ভাষা শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকত তা হলে সেমেটিয়ভাষীরা যে আদৌ কখনও এখানে এসে পৌঁছেছিল তা খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে পড়ত। প্রাচীন মিশরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেমিটো-হ্যামিটিক এক ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এবং সে কারণেই মিশরিয়দের আমরা সেমেটিয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে

করি না। তাই, 'সেমেটিয়' শব্দটির ভাষাগত ব্যঞ্জনা জাতিগত ব্যঞ্জনার থেকে অনেক বেশি। অ্যাসিরিয়-ব্যাবিলনিয়, আরামাইক, হিব্রু, ফিনিশিয়, দক্ষিণ আরবীয়, ইথিওপিয় এবং আরবী ভাষাকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা 'উরসেমিটিস'[৮] হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমতুল একটি উদাহরণ হল, রোমানের সঙ্গে লাতিন ভাষার সম্পর্ক। সাহিত্যের অঙ্গনে অন্তত কিছু শব্দে লাতিন আজও চলিষ্ণু; কিন্তু সেমেটিয় ভাষা সম্পূর্ণই লুপ্ত। কারণ এই ভাষার মূল গঠনই ছিল বাচিক। তবে, সেমেটিয় ভাষার উত্তরসূরিদের জঙ্গমতা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে মাতার অমেয় ক্ষমতা।

সেমেটিয়দের জন্মভুমি হিসাবে আরবকে (নাজদ অথবা আল-ইয়ামান) চিহ্নিত করলেও একটি সম্ভাবনা কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না। সম্ভবত সেমেটিয়দের উদ্ভব আরও প্রাচীনকালে, পূর্ব-আফ্রিকায়। হ্যামাইট নামে এক শ্বেত গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজড়িত হয়ে। এই জনগোষ্ঠী থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি দল চলে আসে আরবের বাব্-আল্-মান্দবে। উত্তরকালে এরাই পরিচিত হয় সেমেটিয় নামে। তাই. আফ্রিকাকে আমরা সেমেটিয়-হ্যামিটিক গোষ্ঠীর সম্ভাব্য উদ্ভবভূমি বলে ধরে নিতে পারি। আববকে চিহ্নিত করতে পারি সেমেটিয় গোষ্ঠীর ধাত্রী হিসাবে এবং আরব সভ্যতার বিস্তার যে বিশাল ভূখণ্ডে তাই হল সেমেটিয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মানচিত্র। ❑

● টীকা ●

১ ডি জি হোগার্থ, দ্য পেনিট্রেশন অফ অ্যারাবিয়া (নিউ ইয়র্ক, ১৯০৪) পৃ ৭।

২ অ্যারবিয়ান ও অ্যারাবস (আরবীভাষী মানুষজন) যেভাবে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য মূল ইংরজি গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় ৩ নং টীকা দেখুন।

৩ জর্জ এ বার্টন, সেমিটিক অ্যাণ্ড হ্যামিটিক অরিজিনস (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৩৪) পৃ ৮৫-৭। ইগনেস জে গেলব, হুবরিয়ানস অ্যাণ্ড সুবারিয়ানস (শিকাগো, ১৯৪৪), পৃ ৬৯-৭০।

৪ বারট্রাম টমাস, দ্য নিয়ার ইস্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া (লণ্ডন, নভেম্বর ১, ১৯২৮), পৃ ৫১৬-১৯; সি রথজেনস, জার্নাল এশিয়াটিক, CCXV নং ১(১৯২৯) পৃ ১৪১-৫৫।

৫ সি. লিওনার্দ উলি, দ্য সুমেরিয়ানস (অক্সফোর্ড, ১৯২৯) পৃ ৫-৬

৬ হলো সিরিয়া, অধুনা আল বিকা, উত্তর ও দক্ষিণ লেবাননের মাঝে অবস্থিত।

৭ হুগো উইংকলার, দ্য হিস্ট্রি অফ ব্যাবিলনিয়া অ্যাণ্ড অ্যাসিরিয়া; অনু-জেমস এ ক্রেগ (নিউ ইয়র্ক ১৯০৭), পৃ. ১৮-২২।

৮ বার্টন, পৃ ২৭।

।। অধ্যায় ২ ।।

আরব উপদ্বীপ

● প্রস্তুতিপর্ব

বিশ্বের মানচিত্রে সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ আরবের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে। আয়তন ১,০২৭,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা মাত্র ১৪ মিলিয়ন বা ১,৪০,০০০০০। এর মধ্যে সুয়ূদি আরবের (আল-রাব আল-খালি বাদ দিয়ে) আয়তন ৫,৯৭,০০০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যার পরিমাণ ৭ মিলিয়ন বা ৭০ লক্ষ। আল-ইয়ামানের লোকসংখ্যা ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লক্ষ। বাকি ২০ লক্ষ মানুষ আল-কুওয়ায়েত ও কাতারের মতো দুটি শায়খ-শাসিত রাজ্য, উমান ও মাসকট, এডেন ও এডেনের আশ্রিত রাজ্যে বাস করে। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, সাহারার কিছু অংশ (বর্তমানে নীলনদের উপত্যকা এবং লোহিতসাগরের জন্য বিচ্ছিন্ন) এবং এশিয়ার যে মরুতট মধ্য পারস্য ও গোবি-মরুভূমির ভিতর দিয়ে গেছে তা আরবের অন্তর্গত ছিল। সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনের মালভূমিকে আটলান্টিকের যে জলরাশি এখন সিক্ত করে, বহু বছর আগে সম্ভবত আরবভূমিও স্নাত হত সেই জলেই এবং তুষার যুগের কোন এক সময়ে এই সমস্ত মরু প্রান্তরগুলি নিশ্চিত ভাবেই বাসযোগ্য তৃণভূমি ছিল। যেহেতু তুষারপাত কখনই এশিয়া মাইনরের বিরাট পর্বতমালাগুলির দক্ষিণে বিস্তৃত হয়নি, তাই আরব কখনও সম্পূর্ণ তুষার-আবৃত হয়ে বসবাসের অনুপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়নি। আরবের বালুরাশি যে কোন এক সময়ে বৃষ্টিস্নাত ছিল তার সাক্ষ্য আজও পাওয়া যাবে এখানকার গভীর ও শুকনো খাতগুলিতে। বৃষ্টির জল প্রবাহিত হয়েই জন্ম নিয়েছিল এই খাতগুলি। উত্তরের সীমানা সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়নি, তবে পূর্বদিকে সোজাসুজি লোহিত সাগরের অন্তর্গত আল-আকাবা উপসাগরের শীর্ষদেশ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখাকে সীমান্তরেখা বলে গণ্য করা যেতে পারে। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, গোটা সিরিয়-মেসোপটেমিয়া মরুভূমি আরবেরই অংশবিশেষ।

উপদ্বীপটি পশ্চিমদিক থেকে পারস্য উপসাগর ও মেসোপটেমিয় নিম্নভূমির দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান পর্বতশ্রেণী হল এর মেরুদণ্ড এবং তা উত্তরদিকে মিডিয়ানে ৯,০০০ ফুট ও দক্ষিণে আল-ইয়ামানে ১৪,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। আল-হিজাজের অন্তর্গত আল-সারাহ্ প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতা স্পর্শ করেছে। এই মেরুদণ্ডের কাছ থেকে পূর্বদিকের ঢালটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত। লোহিত সাগর অভিমুখী পশ্চিম ঢালটি ছোট ও খাড়াই। উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশগুলি, যেখানে সমুদ্র তার উপকূলভূমি থেকে প্রতি বছর

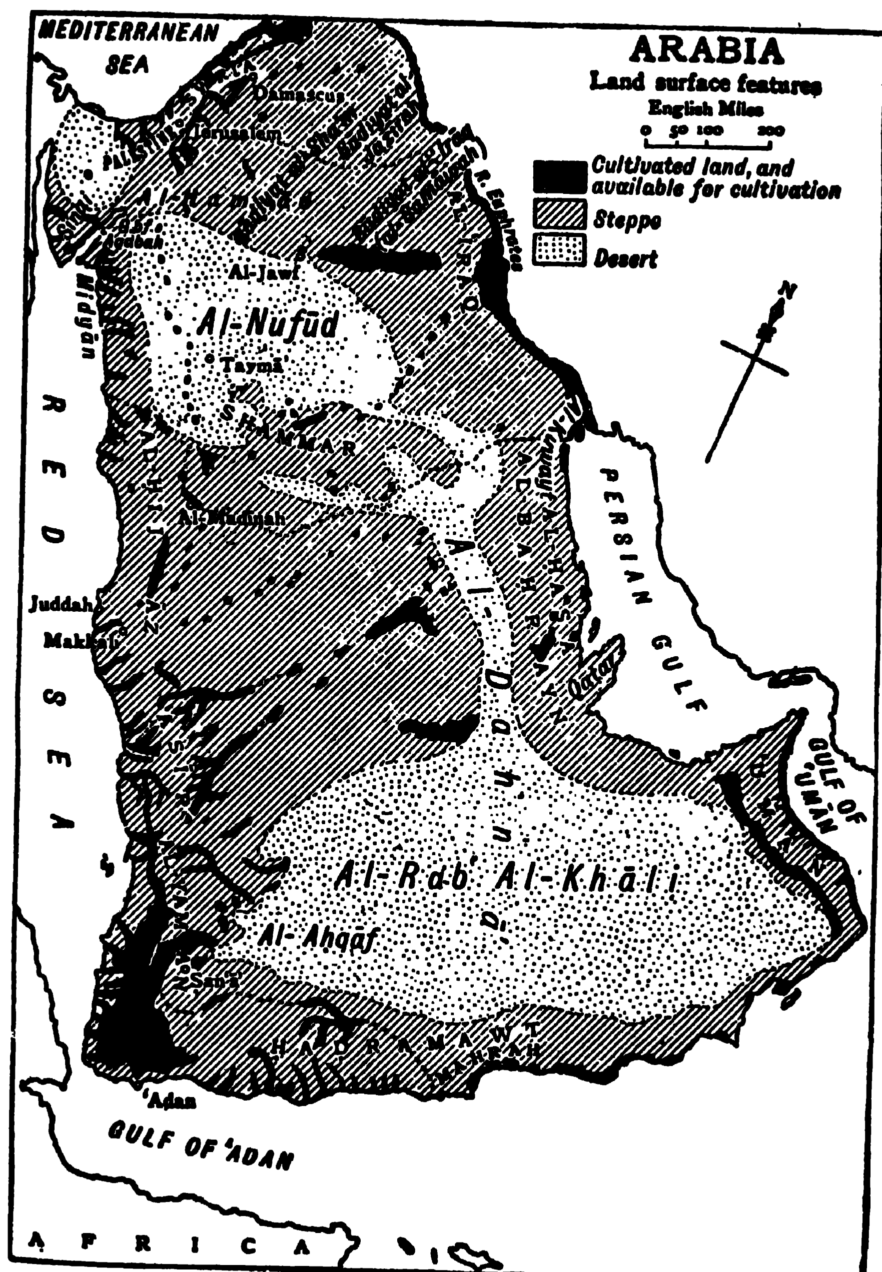
৭২ ফুট করে দূরে সরে যাচ্ছে, তিহামাহ্-র নিম্নভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর-মধ্য মালভূমি নাজদ-এর গড় উচ্চতা ২,৫০০ ফুট। এর পর্বতশ্রেণী শাম্মার-এর লাল গ্রানাইট পাথরে সমৃদ্ধ 'আজা' নামে একটি শৃঙ্গ আছে এবং তা সমুদ্রতল থেকে ৫,৫৫০ ফুট উঁচু। উপকূলভাগের নিম্নভূমির পিছনে তিনটি দিকেই বিভিন্ন উচ্চতার পর্বতশ্রেণী রয়েছে। ওমানে, পূর্ব উপকূলে অবস্থিত আল-জাবাল আল-আখদারের শীর্ষদেশটি ৯,৯০০ ফুট উঁচু এবং এটিই ওখানকার ভূমির পূর্বমুখী ঢালের সাধারণ প্রবণতার মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়।

এই পর্বতমালা, উচ্চভূমি ও তাদের ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া দেশটি মূলত মরুভূমি ও নিম্নভূমি নিয়ে গঠিত। নিম্নভূমি (একবচনে দারাহ) হিসাবে চিহ্নিত পর্বতমালার মধ্যবর্তী বৃত্তাকার সমভূমিগুলি বালুময় এবং অন্তঃসলিলা। সিরিয় মরুভূমি বাদিয়াত আল-শাম এবং মেসোপটেমিয় মরুভূমির অধিকাংশই নিম্নভূমি। সিরিয় মরুভূমির দক্ষিণ অংশটি স্থানীয় ভাষায় আল-হামাদ নামে পরিচিত। মেসোপটেমিয় নিম্নভূমির দক্ষিণাংশটি প্রায়ই বাদিয়াত আল ইরাক বা আল-সামাওয়াহ্ নামে অভিহিত হয়।

মরুভূমিগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(১) সুবিশাল নুফুদ। শাদা বা লালচে বালিযুক্ত অঞ্চল। কোথাও বা উঁচু ঢিবি আবার কোথাও বা বালিয়াড়িতে পরিণত হয়ে উত্তর আরবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবৃত করে রেখেছে। তার প্রাচীন নাম হল আল-বাদিয়া, মাঝে মাঝে আল-দাহনা। এক-আধটি মরূদ্যান ছাড়া সমস্ত অঞ্চল ঊষর। তবে কোন কোন শীতে আল-নুফুদে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এবং তার ফলে এই অঞ্চলটি যাযাবর বেদুইনদের চারণ-ভূমি হয়ে ওঠে। যে সমস্ত ইউরোপিয় প্রথমদিকে নুফুদ মরু অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন, তারা হলেন ফরাসি-অ্যালসেশিয় চার্লস হুবার (১৮৭৮), ইংরেজ কূটনীতিবিদ ও কবি উইলফ্রিড এস ব্লান্ট (১৮৭৯) এবং স্ট্রাসবার্গের প্রাচ্যবিশারদ জুলিয়াস ইউটিং (১৮৮৩)।

(২) উত্তরে বিরাট নুফুদ থেকে দক্ষিণে আল-রাব আল-খালি পর্যন্ত বিস্তৃত লাল বালিপূর্ণ আল-দাহ্না (লাল ভূমি) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এক বিরাট বক্ররেখা বরাবর ৬০০ মাইলের বেশি বিস্তীর্ণ। এর পশ্চিমাংশ মাঝে মাঝে আল-আহ্কাফ (বালিয়াড়ি) নামে পরিচিত। পুরানো মানচিত্রে আল-দাহ্না সাধারণত আল-রাব আল-খালি (ফাঁকা অঞ্চল) নামে অভিহিত। মরশুমি বৃষ্টির ফলে আল-দাহ্নায় প্রচুর তৃণক্ষেত্র আছে। বছরের মধ্যে বেশ কয়েকমাস এই তৃণক্ষেত্রগুলি বেদুইন ও তাদের গবাদি পশুর চারণ ভূমি হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই জায়গাগুলি প্রায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। বারট্রাম টমাসের আগে আর কোন ইউরোপিয় কখনও আরবের এই 'জনহীন প্রান্তর' আল-রাব আল-খালি অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখায়নি। অ্যারাবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানি এই অঞ্চলে ২,৫০,০০০ বর্গমাইল নিজেদের কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বারট্রাম টমাস ৫৮ দিনে আরবসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলটি অতিক্রম করেন। যাত্রাপথে তিনি আবিষ্কার করেন কোনো



Emery Walker Ltd. sc.

জলের একটি হ্রদ এবং মুখোমুখি হন ধ্বনিময় এক বালিয়াড়ির। আসলে তিনি দেখা পান কাতারের দক্ষিণে পারস্য উপসাগরের একটি খাঁড়ির। তার আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আরবের ওই ভয়ংকর রহস্যময় পরিত্যক্ত প্রান্তর সম্পর্কে আমাদের ধারণা দশম শতাব্দীর ভূগোলবিদদের তুলনায় বেশি কিছু ছিল না।

(৩) ঢেউতোলা ও বিদীর্ণ লাভায় ঢাকা বেলেপাথরযুক্ত অঞ্চল হল আল-হাররা। অগ্ন্যুৎপাতজনিত এই ধরনের ফাটল উপদ্বীপটির পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে প্রচুর আছে এবং তা উত্তর থেকে পূর্ব হাওরান পর্যন্ত বিস্তৃত। ইয়াকূত[৩] প্রায় ৩০টি এই ধরনের হার্‌রা তালিকাভুক্ত করেছেন। একজন আরব ঐতিহাসিকের লেখা থেকে জানা যায়, ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে শেষ অগ্ন্যুৎপাতটি ঘটেছিল।

মরুভূমি ও নিম্নভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বৃত্তাকার অঞ্চলের মধ্যে ওয়াহাবিদের দেশ বা নাজদ নামে পরিচিত একটি উঁচু এলাকা রয়েছে। এখানকার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে চুনাপাথর, দু-একটি বালুময় মরু ও লম্বা জমির টুকরো। শাম্‌মার শৃঙ্গটি গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট পাথর দিয়ে তৈরি।

● স্থানীয় আবহাওয়া

অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির মধ্যে আরব উপদ্বীপটি অন্যতম। পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত হলেও সেই জলরাশি এখানকার ভূমি সিক্ত করতে পারেনি। কারণ, আরবভূমির অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশিয়ার বৃষ্টিহীন বিপুল প্রান্তর। তাই তার আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির রুক্ষতার প্রাবল্যই বেশি। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে স্বাভাবিক কারণেই জলবাহী মেঘ ওঠে, কিন্তু মরুর বালুঝড় (সামুম) তা বাতাসেই শুষে নেয়। ফলে সেই মেঘ যখন আরবের প্রত্যন্তে পৌঁছায় তখন তাতে জলীয় বাষ্প আর অবশিষ্ট থাকে না। তবে, আরব কবিদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য অবশ্য রয়েছে পূবের বাতাস (আলসাবা), যার দোলা এবং স্নিগ্ধতায় আরব-কবিরা মুগ্ধ হয়েছেন বার বার।

ইসলামের জন্মস্থান আল-হিজাজে তিন বছর বা তারও বেশি সময় ধরে খরা চলার ঘটনা আদৌ অপরিচিত নয়। অল্প সময়ের জন্য ঝড়-বৃষ্টি বা তার মাত্রাতিরিক্ত প্রাবল্য মক্কা ও আল-মদীনায় কালেভদ্রে দেখা যেত এবং কখনও কখনও কা'বা-কে ভূপাতিত করার মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিও সৃষ্টি হত। আল-বালাযুরি[৪] তার বইয়ের একটি গোটা অধ্যায় জুড়ে মক্কার বন্যার (সুয়ূল) বর্ণনা দিয়েছেন। আর এই বৃষ্টির পরই মরুভূমিতে আবির্ভাব ঘটে তৃণক্ষেত্রের। উত্তর আল-হিজাজে প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বিচ্ছিন্ন মরূদ্যানগুলিই স্থায়ী জীবনযাত্রার একমাত্র আশ্রয়স্থল। আল-হিজাজের মোট জনসংখ্যার ছ' ভাগের পাঁচ ভাগই হল যাযাবর। ইসলাম সংক্রান্ত প্রাচীন বইতে বর্ণিত ফাদাক (এখন

আল-হাইত নামে পরিচিত)-এর মতো বেশ কিছু মরূদ্যান বর্তমানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। মুহাম্মাদের সময়ে এই সমস্ত উর্বর জমির অধিকাংশই চাষ করত ইহুদিরা। হিজাজের নিম্নভূমিতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৯০° ফারেনহাইটের কাছাকাছি। আল-মদীনার গড় তাপমাত্রা ৭০° ফারেনহাইটের থেকে কিছু বেশি এবং এখানকার আবহাওয়া তার দক্ষিণী সহোদরা মক্কার তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

কেবলমাত্র আল-ইয়ামান ও আসির-এ জমিতে প্রথাগত চাষ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। উপকূল থেকে প্রায় ২০০ মাইল এলাকা অনুকূল পরিবেশের জন্য উদ্ভিদযোগ্য থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,০০০ ফুট উঁচুতে আল-ইয়ামানের বর্তমান রাজধানী সানআ সেই কারণে অন্যতম স্বাস্থ্যকর ও মনোরম স্থান। অন্যান্য উর্বর ও বিক্ষিপ্ত জমিগুলি উপকূলভাগে অবস্থিত। হাযরামাওত অঞ্চলে গভীর উপত্যকা এবং ভূগর্ভে জল আছে। সুদূরতম পূর্ব-প্রান্তে ওমান প্রদেশে বেশ ভাল পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। জুড্ডা (জেদ্দা), আল-হুদাইদাহ্ (হোদেইদা) ও মাসকট (ম্যাসকট) হল বিশেষভাবে গরম ও আর্দ্র অঞ্চল।

আরবে এমন একটিও গুরুত্বপূর্ণ নদী নেই যেটি বারোমাস প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। আর এর কোন নদীই নৌ-চলাচলের উপযোগী নয়। নদীর পরিবর্তে এখানে বেশ কিছু স্রোতস্বিনী আছে যেগুলি বৃষ্টিপাত না হলে জলশূন্য থাকে কিন্তু বৃষ্টিপাত হলে সেগুলিই বন্যার সৃষ্টি করে। এই স্রোতস্বিনীগুলি আরও একটি উদ্দেশ্য সাধন করে। এরাই মরুযাত্রী ও তীর্থযাত্রীর পথ ঠিক করে দেয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে আরব ও বহির্বিশ্বের মধ্যে তীর্থযাত্রীরাই প্রধানত যোগাযোগ সৃষ্টি করেছিল। প্রধান স্থলপথ মেসোপটেমিয়া থেকে নাজদের অন্তর্গত বুরাইদা-র মধ্য দিয়ে ওয়াদি আল-রুম্মাহ্-কে এবং অন্যটি সিরিয়া থেকে ওয়াদি আল-সিরহানের মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলভাগকে স্পর্শ করেছে। অন্তর উপদ্বীপীয় গমনপথগুলি হয় উপকূলবর্তী এবং তা প্রায় গোটা উপদ্বীপকেই পরিবেষ্টন করে আছে অথবা আন্তঃ-উপদ্বীপীয় এবং তা মধ্য-অঞ্চলের মরূদ্যানগুলির ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে পরিব্যাপ্ত। বিশেষ করে আলরাব-আল-খালি বা ভ্যাকান্ট কোয়ার্টার-এর মধ্যবর্তী বিস্তৃত এলাকাকে এড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে।

দশম শতাব্দীর ভূগোলবিদ আল-ইস্তাখরি[৫] কেবলমাত্র আল-হিজাজের একটি জায়গার কথা বলেছেন, এবং সেটি **আল-তাঈফ**-এর কাছাকাছি অবস্থিত পর্বত, সেখানে জল বরফে পরিণত হয়। আল-হামদানি[৬] তার লেখায় সানআ-র বরফঠাণ্ডা জলের কথা উল্লেখ করেছেন। এই জায়গাগুলির সঙ্গে গ্লেসার[৭] আরও একটি জায়গায় নাম যুক্ত করেছেন। সেটি হল আল-ইয়ামানের অন্তর্গত হাদূর আল-শায়খ শৃঙ্গ এবং সেখানে প্রত্যেক শীতে ব্যাপক তুষারপাত হয়।

● উদ্ভিদসমূহ

শুষ্ক আবহাওয়া ও লবণাক্ত মাটির জন্য এখানে পত্র-পুষ্প বা ফলবতী বৃক্ষের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আল-হিজাজে প্রচুর পরিমাণে খেজুর জন্মায়, আল-ইয়ামান ও কয়েকটি মরূদ্যানে জন্মায় গম। ঘোড়াদের খাদ্য হিসেবে চাষ হয় বার্লির। কয়েকটি অঞ্চলে ভুট্টা (যুরাহ্) এবং উমান ও আল-হাসায় ধান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ উপকূলের সমান্তরাল উচ্চভূমিতে এবং বিশেষত মাহ্রাহ্-তে এখনও ধুনোগাছ জন্মায়। দক্ষিণ আরবের প্রথম দিককার ব্যবসা-বাণিজ্যে ধুনো গাছের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। আসির-এর একটি উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন হল আরবীয় গঁদের আঠাবিশেষ। যে কফি গাছের জন্য আল-ইয়ামান এখন বিখ্যাত, তা আবিসিনিয়া থেকে চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ আরবে আমদানি হয়েছিল। 'ইসলামধর্মাবলম্বী দেশের এই উত্তেজক পানীয়'-র কথা ষোড়শ শতাব্দীর[৮] জনৈক পাশ্চাত্যবাসীর লেখায় প্রথম উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল।

মরু-অঞ্চলের গাছগুলির মধ্যে আস্ল (চিরহরিৎ ঝাউগাছবিশেষ) ও গাদা-সহ বিভিন্ন প্রজাতির বাবলা গোত্রীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে ভাল জাতের কাঠকয়লা সংগৃহীত হয়। তালহ্ নামে আর এক প্রজাতির গাছ থেকে আরবীয় আঠা পাওয়া যায়। মরু-অঞ্চলে সামহ্ নামে আর এক ধরনের গাছ জন্মায় এবং এর দানা থেকে পরিজ বা যবের মণ্ড তৈরি করার ময়দা পাওয়া যায়। এছাড়া এই অঞ্চলে মশলারূপে ব্যবহৃত কন্দজাতীয় ছত্রাকবিশেষ ও সোনামুখী (আল-সানা) গাছ জন্মায়।

ঘরোয়া গাছগুলির মধ্যে দ্রাক্ষালতা অন্যতম। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে সিরিয়া থেকে আমদানি করা এই লতা আল-তাঈফে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় এবং এর থেকেই নাবীয আল-জাবিব নামে মদজাতীয় পানীয় তৈরি হয়। কিন্তু আরবী কবিদের সৃষ্টিতে যে মদের (খামর) জয়গান করা হয়েছে তা প্রধানত হাওরান ও লেবানন থেকে আমদানি করা। সিরিয়ার দেশি অলিভ গাছের সঙ্গে আল-হিজাজের মানুষদের পরিচিতি ছিল না। আরবীয় মরূদ্যানে উৎপন্ন অন্যান্য ফলের মধ্যে বেদানা, আপেল, খুবানি, বাদাম, কমলালেবু, কাগজি লেবু, আখ, তরমুজ ও কলা উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত নাবাতিয়ান ও ইহুদিরাই উত্তর থেকে এই ধরনের গাছ এনে এখানে চাষ করেছিল।

● খেজুর গাছ

আরবীয় উদ্ভিদকুলের মধ্যে খেজুরগাছকে বলা হয় রানী। এর ফল খুবই পরিচিত ও মূল্যবান : বলা হয় উৎকৃষ্টতম ফল (তামার)। খেজুর ও দুধ বেদুইনদের খাদ্য-তালিকার প্রধান অঙ্গ এবং উটের মাংস ছাড়া এটিই ছিল তাদের একমাত্র গুরুভার খাবার[৯]। গেঁজানো খেজুরের রস থেকেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত নাবীয নামের মদ তৈরি হয়। উটের দৈনন্দিন খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয় খেজুরের বীজ গুঁড়িয়ে তৈরি করা খোল। প্রত্যেক বেদুইনের স্বপ্ন হল দুটি

কৃষ্ণ দ্রব্য' (আল-আসওয়াদান) অর্থাৎ জল ও খেজুর খেতে পাওয়া। শোনা যায় মুহাম্মাদ আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমার চাচী, খেজুরকে সম্মান কর। কারণ আদমের মতো একই উপাদানে তারা তৈরি হয়েছে।"[১০] আরবীয় লেখকদের লেখা থেকে জানা যায়, আল-মদীনায় ও তার আশেপাশে ১০০ রকমের খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

এমনকী আরবীয় উদ্ভিদকুলের এই রানিটি সম্ভবত উত্তর দিকের মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানি হয়েছিল এবং ওই মেসোপটেমিয়ার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই খেজুর গাছ। নাজদ ও আল-হিজাজে কৃষি-সংক্রান্ত আরবী শব্দগুলি অর্থাৎ বা'ল (কেবলমাত্র বৃষ্টির জল দ্বারা সেচিত)[১১] আক্কার (কৃষক) ইত্যাদি উত্তর-সেমেটিয়, বিশেষত সিরিয় ভাষা থেকে ধার করে প্রচলিত হয়েছিল।

● প্রাণিকুল

আরবের জীবকুলের মধ্যে প্যান্থার (একবচন, নামির), চিতাবাঘ (একবচন, ফাহদ), হায়েনা, নেকড়ে বাঘ, শিয়াল ও গিরগিটি (বিশেষত আল-দাব) উল্লেখযোগ্য। উপদ্বীপের প্রাচীন কবিদের লেখায় প্রায়ই উল্লিখিত সিংহের অস্তিত্ব এখন আর নেই বললেই চলে। আল-ইয়ামানে বানর দেখা যায়। শিকারি পাখিদের মধ্যে ঈগল (ওকাব) বাসটার্ড (হুবারা, হৌবারা) বাজপাখি, শিক্ষিত বাজপাখি ও পেঁচা বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। এছাড়া, দেখা যায় প্রচুর সংখ্যায় কাক। অতি পরিচিত পাখিদের মধ্যে ঝুঁটিওয়ালা পাখি (হুদহুদ), ভরতপাখি, নাইটিঙ্গেল, পায়রা ও আরবী সাহিত্যে আল-কাতা[১২] নামে পরিচিত এক ধরনের তিতিরপাখি দেখতে পাওয়া যায়।

গৃহপালিত পশুদের মধ্যে উট, গাধা, সাধারণ কুকুর, শিকারি কুকুর (সালুকি) বিড়াল, ভেড়া ও ছাগল প্রধান। মুহাম্মাদ কর্তৃক হিজরতের পর মিশর থেকে আমদানি হয়ে খচ্চরও চালু হয়েছিল।.মরুভূমিতে পঙ্গপাল দেখা যেত এবং নুন দিয়ে ঝলসানো পঙ্গপাল বিশেষত বেদুইনরা বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেত। প্রায় সাত বছর অন্তর পঙ্গপালদের মধ্যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটত। সরীসৃপদের মধ্যে নুফুদরা শিংওলা ভাইপার বা বিষধর সাপের কথাই বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে থাকে। ওয়াদি আল-সিরহানের সাপেদের সঙ্গে লরেন্স[১৩] তার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

● আরবীয় ঘোড়া

মুসলিম সাহিত্যে ঘোড়া যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, প্রাচীন আরবে তা কিন্তু খুব একটা পরের দিকের আমদানি ছিল না। নাজদ নামের জায়গাটি ঘোড়ার জন্যই বিখ্যাত, কিন্তু

প্রথম দিককার সেমেটিয়রা ঘোড়ার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিকে কোন একটা জায়গায় প্রাচীন যুগের ইন্দো-ইউরোপিয় যাযাবর মেষপালকেরা ঘোড়া পালন করত। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ২,০০০ বছর আগে কাসাইট ও হিট্টাইটরা প্রচুর সংখ্যক ঘোড়া পশ্চিম এশিয়ায় আমদানি করেছিল। খ্রিস্টিয় যুগের সূচনার আগেই সিরিয়া থেকে ঘোড়া আরবে আসে এবং এখানেই ঘোড়াগুলি তাদের বংশশুচিতা অবিমিশ্র রেখেছিল। হিকসোরা সিরিয়া থেকে মিশরে এবং লিডিয়ানরা এশিয়া মাইনর থেকে গ্রিসে ঘোড়া চালান করেছিল এবং পার্থেননে তা স্মরণীয় করে রেখেছিল ফিদিয়াস। মিশরিয়, অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয় ও পারস্যের ইতিহাসে আরবদের পরিচয় অশ্বারোহী নয়, উষ্ট্রারোহী হিসেবে। উরবি[১৪]-র কাছ থেকে অ্যাসিরিয় বিজয়ী শাসকেরা যে শ্রদ্ধা পেয়েছিল, তাতে ঘোড়ার পরিবর্তে উটই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। গ্রিস জয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প জারজেস সেনাদলের আরবেরা উটে[১৫] চড়েই যুদ্ধ করেছিল। ২৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে যে-রোমান সেনাপতি আরব অভিযান করেছিলেন সেই এলিয়াস গ্যালাস ছিলেন স্ট্রাবোর বন্ধু এবং কোন বিচার-বিবেচনা না করে বন্ধুর সুপারিশের ভিত্তিতেই স্ট্রাবো[১৬] আরবে ঘোড়ার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছিলেন।

দৈহিকসৌন্দর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি ও মনিবের প্রতি মর্মস্পর্শী আনুগত্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ও উত্তমভাবে প্রতিপালিত আরবীয় ঘোড়া (কুহেলান) এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। এর থেকে ঘোড়াকে ভালভাবে প্রতিপালন করার সমস্ত পশ্চিমি ধ্যানধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়রা স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে এই ধ্যানধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেখানে এই চিন্তা বার্বারি ও আন্দালুসিয়ান বংশধরদের[১৭] মধ্যে তার প্রভাব রেখেছিল। ধর্মযুদ্ধের সময় ইংরেজদের ঘোড়াগুলি আরবী ঘোড়াদের সংস্পর্শে এসে আরও তেজী হয়ে উঠেছিল।

আরবের মাটিতে ঘোড়া ছিল এক ব্যয়বহুল পশু। তার লালন-পালন ও যত্ন-আত্তির ব্যবস্থা করা মরুভূমির মানুষদের কাছে ছিল বিশেষ অসুবিধার। সুতরাং কারোর ঘোড়া থাকার অর্থই ছিল, সে একজন বিত্তবান মানুষ। ঘোড়ার প্রধান গুরুত্ব ছিল, বেদুইনদের ঝটিকা আক্রমণে (গায্‌ওয়া) প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চার করা। এছাড়া খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা (জারিদ), ডালকুত্তা সঙ্গে নিয়ে শিকারের পিছনে তাড়া করা ও শিকার করার কাজেও ঘোড়া ব্যবহার করা হত। আজও কোন আরব শিবিরে শিশুরা যখন তৃষ্ণায় কাঁদে, তাতে বিচলিত না হয়ে শিবিরের প্রধান জলের শেষবিন্দুটি ঘোড়ার মুখের সামনেই তুলে ধরে।

● উট

মানুষের বিজয় অভিযানে ঘোড়া যদি হয় অগ্রগতির দূত, তা হলে যাযাবরদের চোখে উট নিশ্চিত ভাবেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। উটের সাহায্য ছাড়া মরুঅঞ্চল কখনই মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারত না। উট ছিল যাযাবরদের ধাত্রীসম, তার যাতায়াতের বাহন ও

আদান-প্রদানের মাধ্যম। মেয়ের বিয়ের যৌতুক, রক্তের দাম, মাইসির (জুয়া)-এর মুনাফা, একজন শায়খের সম্পদ — সব কিছুই উটের বিনিময়ে পরিমাপ করা হত। উট ছিল বেদুইনদের সর্বক্ষণের সঙ্গী, তার প্রাণের বন্ধু, তার পালিত অভিভাবক। জলের পরিবর্তে সে উটের দুধ পান করত (যে জল সে গবাদি পশুদের জন্য ব্যয় করত); তার মাংসে সে জীবন ধারণ করত, উটের চামড়া দিয়ে সে নিজের পোশাক তৈরি করত, তার লোম দিয়ে সে নিজের তাঁবু তৈরি করত। উটের মল সে জ্বালানি হিসেবে এবং মূত্র চুলের টনিক ও ওষুধ রূপে ব্যবহার করত। বেদুইনদের কাছে উট ছিল 'মরুভূমির জাহাজ'-এর চেয়ে আরও অনেক বেশি। এটা ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ উপহার (তুলনীয়, কোরান ১৬:৫-৮)। স্প্রেঙ্গার[১৮]-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলা যায়, বেদুইনরা ছিল 'উটের পরজীবী'। আমাদের সময়কার বেদুইনরা নিজেদের আহল আল-বাইর বা উটের আপনজন বলে উল্লেখ করতে আনন্দ বোধ করে। মুসিল[১৯] মন্তব্য করেছেন যে রুয়ালা উপজাতির মধ্যে এমন একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি কোন না কোন উপলক্ষে উটের কুঁজ থেকে জল পান করেছেন। জরুরি প্রয়োজনের সময়ে হয় কোন বুড়ো উটকে হত্যা করা হত অথবা গলার মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে উটকে বমি করিয়ে জল বার করতে বাধ্য করা হত। যদি বিগত দু-একদিনের মধ্যে উটটিকে জল খাওয়ানো হয়ে থাকে, তবে তার বমি করা জল মোটামুটি পানযোগ্য থাকত। আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে উট যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, আরবী ভাষায় বিভিন্ন প্রজাতির ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে নির্দেশ করার জন্য ১০০০ টি নামের তালিকা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। কেবলমাত্র তরবারির সমার্থক নামগুলিই তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। আরবের উটগুলি জল ছাড়া শীতকালে প্রায় ২৫ দিন ও গরমকালে প্রায় ৫ দিন এক নাগাড়ে চলতে পারে। এই উটই প্রথম দিককার বিজয় অভিযানে স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় মুসলিমদের অনেক বেগবান করে তুলেছিল। যুগিয়েছিল আনুষঙ্গিক সুবিধা। খলিফা উমার বলেছিলেন : "যেখানে উটদের উন্নতি হয়েছে কেবলমাত্র সেখানেই আরবদের অগ্রগতি ঘটেছে।" এই উপদ্বীপটিই গোটা দুনিয়ার মধ্যে প্রধান উটপালন কেন্দ্রের গৌরব লাভ করেছে। নাজদ-এর ঘোড়া, আল-হাসা-র গাধা এবং উমানের এক কুঁজযুক্ত উট জগদ্বিখ্যাত। অতীতে উমান এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মুক্তো উৎপাদন কেন্দ্র, কয়েকটি অঞ্চলের লবণের খনি ও উটশিল্প ছিল আয়ের প্রধান উৎস। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তেলক্ষেত্রগুলি থেকে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু হবার পর থেকে তেলশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজগুলিই আয়ের বৃহত্তম উৎসে পরিণত হয়েছে। আল-হাসার তেলের খনি বিশ্বের সমৃদ্ধতম তেলের খনিগুলির অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমেরিকার ঘোড়ার মতোই উটও খ্রিস্টপূর্ব ১১ শতকে মিডিয়ানাইটদের আগ্রাসনের

সময়ে উত্তর-পশ্চিম আরব থেকে প্যালেস্তাইন ও সিরিয়ায় প্রচলিত হয় (জাজস ৬:৫, তুলনীয়, জেনেসিস ২৪:৬৪)। সেই সময়েই এই প্রাণীটির ব্যাপক ব্যবহারের কথা জানা যায়[২০] খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে অ্যাসিরিয় যুদ্ধাভিযানের সময় মিশরেও উটের প্রচলন হয়। আবার যিশুখ্রিস্টের জন্মের পর সপ্তম শতকে মুসলিম আগ্রাসনের সময়ে উত্তর আফ্রিকায় এই পশুটির প্রচলন ও ব্যবহার শুরু হয়। ❑

● টীকা ●

১ সবচেয়ে শীর্ষবিন্দু : কার্ল রথজেন্স ও হারমান ভি উইসম্যান, সুদারাবিয়েনস রেইজ, ৩য় খণ্ড, ল্যাণ্ডেসকুণ্ডলিকে আরজেবনিসে (হামবুর্গ, ১৯৩৪), ২ পাতা।

২ অ্যারাবিয়া ফেলিক্স : অ্যাক্রস দি এম্পটি কোয়ার্টার অফ অ্যারাবিয়া (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩২)।

৩ মু'জাম আল-বুলদান, সম্পা : এফ উস্টেনফেল্ড (লিপজিগ; ১৮৬৬-৭০), বিষয়সূচি।

৪ ফুতুহ্ আল-বুলদান, সম্পা : ডি গোজে (লিডেন, ১৮৬৬), ৫৩-৫৫ পাতা, অনু : ফিলিপ কে হিট্টি, দি অরিজিন অফ দি ইসলামিক স্টেট (নিউইয়র্ক, ১৯১৬, পুনর্মুদ্রণ (বেইরুট, ১৯৬৬), ৮২-৮৪ পাতা।

৫ মাসালিক আল-মামালিক সম্পা : ডি গোজে (লিডেন, ১৮৭০), ১৯ পাতা। ২.১২-১৩।

৬ আল-ইকলিল, রিকে,-৮ম, সম্পা : নাবিহ্ এ ফ্যারিস (প্রিন্সটন, ১৯৪০), ৭ পাতা; নাজিহ্ এম আল-আযম, রিহলাহ ফী বিলাদ আল-আরাব আল-সাঈদাহ (কায়রো, ১৯৩৭?), ১ম ভাগ, ১১৮ পাতা।

৭ এ পিটারম্যান লিখিত মিটিলানজেন আস জাসটাস পার্থেস জিওগ্রাফিসার আনস্টালট্, ৩২শ খণ্ড (গোথা, ১৮৮৬), ৪৩ পাতা।

৮ ডি স্যাসি রচিত খ্রিস্টোম্যাথি আরেব, ২য় সংস্করণ (প্যারিস, ১৮২৬), ১ম খণ্ড, ১৩৮ ও পরের পাতায় আল-জাযীরি দ্রষ্টব্য, অনু : ৪১২ ও পরের পাতা।

৯ ইবন-কুতাইবাহ্ রচিত উয়ুন আল-আখবার (কায়রো, ১৯৩০), ৩য় খণ্ড, ২০৯-১৩ পাতা দ্রষ্টব্য।

১০ আল-সুয়ূতি-র হুসন আল-মুহাযারাহ (কায়রো, ১৩২১), ২য় খণ্ড, ২৫৫ পাতা দ্রষ্টব্য।

১১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নীচে দেখুন, ৯৭ পাতা।

১২ আর মিনারজাজেন, দি বার্ডস অফ অ্যারাবিয়া (এডিনবারা, ১৯৫৪)।

১৩ টি ই লরেন্স, সেভেন পিলারস অফ উইসডম (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৬), ২৬৯-৭০ পাতা।

১৪ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন, ৩৯ ও ৪১ পাতা।

১৫ হেরোডোটাস, হিস্টোরি, বি. কে, ৭ম, ৮৬ অধ্যায়, নতুন ভাগ ৮।

১৬ জিওগ্রাফি, বি. কে. ১৬, ৪ অধ্যায়, নতুন ভাগ ২ ও ২৬।

১৭ উইলিয়াম আর ব্রাউন, দি হর্স অফ দি ডেজার্ট (নিউইয়র্ক, ১৯২৯), ১২৩ ও পরের পাতা।

১৮ জাইটক্রিফট দার ডয়েসচেন মরগেনল্যানডিসেন জেসেলস্যাফট, ১৪(১৮৯১) ৩৬১ পাতা, ১.১৩।

১৯ দি ম্যানারস অ্যাণ্ড কাস্টমস অফ দি রোয়ালা বেদুইনস (নিউইয়র্ক, ১৯২৮), ৩৬৮ পাতা। তুলনীয়, দি নিয়ার ইস্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, ১ নভেম্বর ১৯২৮, ৫১৮ পাতায় বারট্রাম টমাসের লেখা।

২০ কার্লটন এস কুন, ক্যারাভান : দি স্টোরি অফ দি মিডল ইস্ট (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫১) ৬১ পাতা।

।। অধ্যায় ৩ ।।

বেদুইন জীবন

● যাযাবর

জমির দ্বিমুখী চরিত্রকে কেন্দ্র করে আরবের অধিবাসীরা দুটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— (১) যাযাবর বেদুইন ও (২) স্থায়ী বাসিন্দা। জনসংখ্যার কত অংশ ভ্রাম্যমাণ যাযাবর আর ঠিক কত অংশ স্থায়ী বাসিন্দা, সে ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে পার্থক্যের সীমারেখা টানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণ এদের মধ্যে অনেকে ছিল আবার আধা-যাযাবর ও আধা-শহুরে। এই শহুরে মানুযরা কিন্তু একসময় যাযাবরই ছিল। অন্যদিকে বেদুইনদের একটা অংশ ধীরে ধীরে শহুরে মানুষে পরিণত হচ্ছিল। ফলে ইতিমধ্যেই যারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠেছে, যাযাবরদের এই ক্রমিক রূপান্তর তাদের চরিত্রেও বারবার বদল ঘটাচ্ছিল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে কেবলমাত্র ঘুরে বেড়ানোর জন্যই ঘুরে বেড়াত—বেদুইনরা ঠিক এমন ধরনের জিপসি ছিল না। মরুর কঠিন জীবনকে এরাই সব থেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। সবুজের আভাস পেলেই, চারণভূমির সন্ধানে তারা যাত্রা করত। ডেট্রয়েট বা ম্যাঞ্চেস্টারে যে বিজ্ঞানে শিল্প-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই নুফূদ-এ গড়ে উঠেছিল যাযাবর জীবন।

শহুরে মানুষ ও মরুসন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব প্রধানত তাদের দুটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থ ও আত্মরক্ষার জরুরি প্রয়োজনেই নিয়ন্ত্রিত হত। যাযাবরদের যে সমস্ত জিনিসের অভাব ছিল, সে অভাব তারা পূরণ করত অনুকূল পরিবেশে বসবাসকারী সম্পন্ন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহ কখনও হত লুঠপাটে, কখনও বা বিনিময় মাধ্যমে। তারা ছিল স্থলদস্যু বা দালাল অথবা একই সঙ্গে দুই-ই। জলদস্যুদের সঙ্গে এদের মিল থাকার কারণ হল মরু ও সমুদ্রের জীবন প্রায় একই রকম রুক্ষ ও কঠিন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যাযাবর সম্প্রদায় অতীতে যা ছিল ও ভবিষ্যতে যা হবে এখনও ঠিক তাই রয়েছে। তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য একই রকম রয়ে গেছে। পরিবর্তন, অগ্রগতি ও বিবর্তনের নিয়ম সে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। বিদেশি ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে পূর্বপুরুষদের মতো তারা ছাগল বা উটের লোমের তৈরি তাঁবু বা বাড়িতে এখনও বাস করে একই রকমভাবে। একই তৃণভূমিতে ছাগল ও ভেড়া চরায়। মেষ, উট এবং ঘোড়া পালন,

শিকার ও লুঠপাটই ছিল তাদের প্রধান ও স্থায়ী পেশা এবং এগুলিকেই তারা মানুষের উপযুক্ত পেশা বলে মনে করত। কৃষি বা যে কোন ধরনের বাণিজ্য ও হস্তশিল্পকে তারা জীবিকা হিসেবে অমর্যাদাকর বলে মনে করত। যদি কখনও তারা এই ধারণা থেকে মুক্ত হত, তখন তারা আর যাযাবর থাকত না। তাই মুসলিম সাম্রাজ্যের উর্বর ভূমিতে একের পর এক সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও পতন হলেও, পশ্চিমের রুক্ষ মরুতে বেদুইনদের জীবনধারা একই রকম রয়ে গেছে।[১]

বেদুইন, উট ও খেজুর গাছই হল মরুজীবনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তিন শাসক। আর আছে মরুর বালি—চতুর্থ নায়ক। অস্তিত্ব রক্ষার নাটকীয় সংগ্রামে চার প্রধান ভূমিকাধারী।

এখানকার অধিবাসীদের কাছে মরু শুধু বাসভূমি নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। এই মরুভূমি তার অনাবিল ঐতিহ্য, ভাষা ও রক্তের রক্ষক এবং বহির্জগতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষার হাতিয়ার। এই মরুঅঞ্চলে জলের অভাব, প্রচণ্ড উত্তাপ, দিশাহীন পথ ও খাদ্যের অপ্রাচুর্য—সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক সময়ে শত্রুর ভূমিকা পালন করলেও বিপন্ন মুহূর্তে বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে ওঠে। তাই এতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবার কারণ নেই যে, আরবীয়রা বিদেশি শত্রুদের কাছে মাথা নত প্রায় করেনি বললেই চলে।

দিশাহীন মরুর একঘেয়েমি ও উর্বরতা যথার্থভাবেই বেদুইনদের দৈহিক ও মানসিক গঠন ও কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত। শারীরিক ভাবে বেদুইনরা স্নায়ু, হাড় ও পেশীতন্তুর সমষ্টি হলেও মরুর রুক্ষ শীর্ণতা তাদের আকৃতিতে বর্তমান। তার প্রতিদিনকার খাদ্য খেজুর ও আটার মিশ্রণ, অথবা জল বা দুধসমেত ঝলসানো শস্য। খাবারের মতো পোশাকও অতি অল্প। কোমরবন্ধনীসহ একটি লম্বা জামা (সাওব) এবং তার ওপর ঢিলেঢালা আলখাল্লা (আবা)। দড়ি (ইকাল) বাঁধা শাল (কূফীয়া), মাথা ঢাকা, শক্তপোক্ত পাজামা, কিন্তু পায়ে জুতো নেই। বেদুইন বললে এই ছবিই আমাদের চোখে ভাসে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের দৃঢ় মানসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা (সবর) ছিল তার প্রধান গুণ এবং এই গুণেই যেখানে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় সেখানে তারা বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। নিষ্ক্রিয় মানসিকতা এদের আর এক বৈশিষ্ট্য। অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন, যে পরিবেশে সে বাস করে তাকে পরিবর্তনের চেষ্টার চেয়ে নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা ছিল এদের কাছে বেশী পছন্দসই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাদের মনে এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, বেদুইনরা কখনই নিজেদের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক জীবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আর তাদের উপজাতির কল্যাণের বাইরে মানুষের মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ তো দূরের কথা, নিয়মানুবর্তিতা, বা গোষ্ঠীপতির প্রতি শ্রদ্ধা মরুজীবনে কোন আদর্শ হিসাবে গণ্য হত না। একজন বেদুইন এভাবে প্রার্থনা করেছিল : "হে প্রভু! আমার ওপর এবং মুহাম্মাদের ওপর তোমার করুণা বর্ষিত হোক, কিন্তু আর কারোর ওপর নয়!"[২] ইসমাঈলের সময় থেকে একজন আরবীয় প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে ও প্রতিটি মানুষ আরবীয়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল

● লুণ্ঠন

গযওয়া (রাজিয়া) বলে পরিগণিত এক ধরনের রাহাজানি মরুজীবনের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় একটি চালু প্রথা ছিল। নিহিত ছিল মেষপালক বেদুইন সমাজের আর্থিক কাঠামোর ভিত্তিতে। মরুভূমির জীবনে লড়াকু মেজাজ ছিল সাধারণ মানসিক অবস্থা। লুঠতরাজ ছিল অন্যতম মনুষ্যোচিত পেশা। বানু-তাগলিবের মতো খ্রিস্টান উপজাতিগুলিও এই ধরনের কাজে বিশেষ আপত্তি দেখাত না। উমাইয়া আমলের প্রথম দিককার কবি আল-কুতামি দুটি চরণে এই জীবনের মূল নীতিটিকে তুলে ধরেছেন—আমাদের কাজ হল শত্রুর ওপর আক্রমণ, প্রতিবেশীর ওপর আক্রমণ এবং আমাদের ভাইয়ের ওপর আক্রমণ, যদি আক্রমণ করার জন্য ভাই ছাড়া আর কেউ না থাকে![৩] সুয়ুদি আরবে আগ্রাসন এখন বেআইনি।

জাতীয় খেলা গযওয়ার নিয়ম অনুযায়ী—চরম প্রয়োজন ছাড়া রক্তপাত ঘটানো সাধারণ রীতি হিসাবে চালু ছিল না। গযওয়া নিশ্চিতভাবেই মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দিত, অবশ্য তাতে কোনভাবেই খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বাড়ত না। একটি দুর্বল উপজাতি বা সীমান্ত এলাকার অলস মানুষজনেরা শক্তিশালী উপজাতিকে খুওয়াহ্ দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারত। গযওয়া-র এই ধারণা এবং এই শব্দটি আরবেরা তাদের ইসলামধর্ম বিস্তারের অভিযানে ব্যবহার করেছিল।

যাই হোক, আতিথেয়তার নীতি কিছু পরিমাণে গযওয়া-র কুপ্রভাবকে উপশম করতে পেরেছিল। শত্রু হিসেবে যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, বেদুইনরা ছিল বন্ধু হিসাবে উদার ও বিশ্বস্ত। ইসলাম-পূর্ব যুগের কবি বা ঐতিহাসিকরা বেদুইনদের যিয়াফাহ্ (আতিথেয়তা)-র প্রশস্তিকীর্তনে কার্পণ্য দেখাননি। হামাসাহ্ (বীরোচিত সহিষ্ণুতা ও উদ্যম) এবং মুরুয়া (পুরুষত্ব)[৪]-সহ এই যিয়াফা (আতিথেয়তা) ছিল বেদুইন উপজাতির গুণাবলির শ্রেষ্ঠতম। জল এবং তৃণক্ষেত্রের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রবল সংঘর্ষ মরু অঞ্চলের মানুষকে যুযুধান এক গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু রুক্ষ ও ভয়াল প্রকৃতির সামনে মানুষ যে কত অসহায় সেই চেতনা তাদের মধ্যে জাগ্রত করেছিল আতিথেয়তার মহান বৃত্তি। একটি দেশে যেখানে কোন সরাইখানা বা মুসাফিরখানা নেই, সেখানে আতিথ্যদানে অস্বীকার বা অতিথির কোন ক্ষতি করলে তা শুধু প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার বিরুদ্ধই ছিল না, প্রকৃত রক্ষক আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেই তা অপরাধ বলে গণ্য হত।

● ধর্মপরায়ণতা

বালুময় অঞ্চলে নয় মরূদ্যানেই সেমিটিয় জীবনচর্যা ও ধর্মের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টে কথিত বেথেল এবং ইসলামের কালোপাথর বা হাজ্‌রে আসওয়াদ ও জামজামের পূর্বসূরি পাথর ও ঝরনাকে কেন্দ্র করেই এই ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। বেদুইনদের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তাদের হৃদয়ে ধর্মের প্রভাব তেমন গভীর

ছিল না। কোরানের (৯:৯৮) সিদ্ধান্ত হল : "মরুভূমির আরবরা নাস্তিক ও ভণ্ডামির মূর্ত প্রতীক"। বর্তমান সময় পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদের উদ্দেশ্যে মৌখিক শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া আর কিছুই করেনি।[৭]

● গোষ্ঠী

বেদুইন সমাজের ভিত্তি হল গোষ্ঠীবদ্ধতা। এক-একটি পরিবার বাস করে এক-একটি তাঁবুতে। কয়েকটি তাঁবু একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে একটি শিবির বা 'হাই'। একাধিক হাই-এর সদস্যরা মিলে গঠন করে একটি গোষ্ঠী (কাওম)। স্বজাতীয় কয়েকটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে একটি উপজাতি (কাবীলা)। সমগোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য নিজেদের চিহ্নিত করে একই বংশধারার উত্তরসূরি হিসাবে। গোষ্ঠীর সবচেয়ে প্রবীণ সদস্যের নির্দেশ সবাই মেনে চলে এবং লড়াইয়ের সময় একই শ্লোগান ব্যবহার করে। নামের প্রথমে তারা সকলে 'বানু' (....র সন্তান) উপাধি ব্যবহার করে। কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম থেকে বোঝা যায় কোন এক সময়ে গোষ্ঠীগুলি মাতৃতান্ত্রিক ছিল। উপজাতীয় সংগঠনের ঐক্য রক্ষার অন্যতম উপাদান হল এই বংশধারা, তা সে প্রত্যক্ষ বা প্রক্ষিপ্ত যাই হোক না কেন।

তাঁবু ও গৃহস্থালী জিনিসপত্র হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু জল, তৃণক্ষেত্র ও চাষযোগ্য জমি হল যে কোন উপজাতির যৌথ সম্পদ।

একই গোষ্ঠীর কোন সদস্য আর এক সদস্যকে খুন করলে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। সে যদি কোনক্রমে পালিয়েও যায়, তা-হলে সে গোষ্ঠী-বহিষ্কৃত ব্যক্তি বা দস্যু (তরীদ) বলে চিহ্নিত হয়। গোষ্ঠী বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে যদি কেউ খুন হয় তাহলে বদলা হিসেবে সেই খুনি ব্যক্তির গোষ্ঠীভুক্ত অপর কোন সদস্যকে হয়ত নিজের জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

রক্তের বদলে রক্ত—এটাই হল মরুভূমির আদিম আইন। বদলা ছাড়া আর কোন শাস্তিকেই এখানে যথোচিত বলে মনে করা হয় না। খুনির সবচেয়ে নিকটাত্মীয়কেই এর জন্য উদ্যোগী হতে হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বানু-বকর ও বানু-তাগলিব গোষ্ঠীর মধ্যে বাসূস যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ৪০ বছর ধরে। ইতিহাস রচয়িতাদের মতে, সমস্ত আইয়াম আল-আরবে অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে উপজাতিগুলির মধ্যে যে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াই চলেছিল, এই বদলার নীতি তার অন্যতম কারণ। তবে, এইসব লড়াইয়ের অনেকগুলিই ত্বরান্বিত হয়েছে আর্থিক কারণে। মাঝে মাঝে একটি রক্তপণ (দিয়াহ্) গৃহীত হয়।

স্বগোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত হওয়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা কোন বেদুইন কল্পনাই করতে পারে না। যে ভূমিতে আগন্তুক ও শত্রু সমার্থক, সেখানে গোষ্ঠীচ্যুত কোন মানুষ নিতান্তই অসহায়। কারণ, তাকে রক্ষার কোন দায় কোন গোষ্ঠী তো নেয়ই নি, উপরন্তু সে সবার কাছে দস্যু হিসাবেই চিহ্নিত। তার অবস্থা একমাত্র তুলনীয় সামন্ততান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের ভূমিহীনদের সঙ্গে।

বংশধারার মধ্যে না থেকেও গোষ্ঠীভূত হওয়ার বিকল্প প্রথা প্রাচীন আরবে চালু ছিল। গোষ্ঠীর কোন এক সদস্যের খাবার ভাগ করে খেয়ে অথবা তার কয়েক ফোঁটা রক্ত পান করে গোষ্ঠীবহির্ভূত কোন ব্যক্তি ওই গোষ্ঠীর সদস্য হতে পাবত। হেরোডোটাস[৬] কোন গোষ্ঠীতে দত্তক নেবার এই প্রাচীন রীতির বর্ণনা দিয়েছেন। কোন ক্রীতদাস দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আত্মরক্ষার তাগিদেই তার প্রাক্তন মনিবের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ক্রমে দত্তক পদ্ধতিতে তার গোষ্ঠীভূত এক অনুচরে (মাওলা) পরিণত হত। কোন আগন্তুক এই ধরনের সম্পর্ক তৈরি করতে চাইলে আশ্রিত ব্যক্তি (দাখিল) হিসেবে গণ্য হত। ঠিক একই ভাবে দুর্বল গোষ্ঠী কোন শক্তিশালী গোষ্ঠীর কাছ থেকে নিরাপত্তা চাইতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সেই শক্তিশালী গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হতে পারে। তায়ি, গাতাফান, তাগলিব ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি ছিল উত্তর আরবীয় উপজাতিগুলির মিত্রসঙ্গী। ইতিহাসে এদের কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে এবং তাদের বংশধরেরা এখনও আরবীভাষী দেশগুলিতে বেঁচে আছে।

ধর্মস্থানেও একই রকম প্রথা অনুযায়ী একজন আগন্তুক মসজিদের[৭] সেবায় নিযুক্ত হতে পারে এবং এভাবেই আল্লাহ্‌র অনুচরে পরিণত হতে পারে। এখন পর্যন্ত মক্কার তীর্থযাত্রীদের 'আল্লাহ্‌র অতিথি' হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং মক্কার বা অন্য কোন বড় মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের "[তাঁর] প্রতিবেশী" (একবচনে, মুজায়ির) বলা হয়।

● আসাবিয়া

আসাবিয়া হল গোষ্ঠীসমাজের মূল প্রেরণা। এই প্রেরণার মূলমন্ত্র হল গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য। এই আবেগপ্রবণতা সাধারণ অর্থে উগ্র স্বদেশপ্রেমের সমার্থক। এক চারণ কবি তাঁর গানে বলেছেন, "তোমার গোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বস্ত হও", "সদস্যদের ওপর গোষ্ঠীর দাবি এতই প্রবল যে, গোষ্ঠীর প্রয়োজনে কোন স্বামী তার স্ত্রীকেও ত্যাগ করতে পারে"।[৮] গোষ্ঠীভূত থাকার এই অনমনীয় বৈশিষ্ট্য জন্ম দিয়েছিল চূড়ান্ত এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের। ফল হয়েছিল, প্রতিটি গোষ্ঠীই যেমন একদিকে হয়ে উঠেছিল প্রবল স্বনির্ভর তেমনই নিষ্ঠুরভাবে স্বার্থপর। নিজের প্রয়োজনে অন্য গোষ্ঠীতে লুণ্ঠন বা হত্যা চালাতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হত না। ইসলাম ধর্ম তার সামরিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উপজাতীয় প্রথার পূর্ণ ব্যবহার করেছে। গোষ্ঠী অনুযায়ী তারা সেনাদলকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করেছিল। বিজিত অঞ্চলগুলিতে গোষ্ঠীভিত্তিক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল এবং পরাজিতদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্মান্তরিত তাদের অনুচর রূপে ব্যবহার করেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের। অসামাজিক বৈশিষ্ট্য বা আসাবিয়া কখনই আরব চরিত্রে উচ্ছ্বসিত হয়নি, কারণ ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের পরই তার রমরমা দেখা দিয়েছিল। আর বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্রগুলির বিভাজন ও অবলুপ্তির পিছনে যে উপাদানগুলি মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছিল, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বাড়াবাড়ি ছিল তার অন্যতম।

● শেইখ

যে কোন গোষ্ঠীর মূল কর্তা ছিল তার আনুষ্ঠানিক প্রধান 'শেইখ'। হলিউডের প্রচারিত শেইখদের সঙ্গে তাঁর অনেক তফাৎ। প্রবীণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শেইখ নির্বাচিত হতেন। এই শেইখ (শায়খ) ছিলেন গোষ্ঠীর প্রবীণ সদস্য। সহৃদয় পরামর্শ, ঔদার্য এবং সাহসী মনোভাব ছিল তাঁর নেতৃত্বের অঙ্গ। তবে, শাসন-বিচার বা লড়াই—যে কোন ব্যাপারেই এই শেইখ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সব বিষয়েই তিনি পরামর্শদাতাদের মতামত নিতে বাধ্য থাকতেন। গোষ্ঠীভূত বিভিন্ন পরিবারের প্রধানরাই ছিলেন এই পরামর্শদাতা। এই প্রধানরা যতদিন তার পক্ষে থাকতেন ততদিনই শেইখ তার পদে বহাল থাকতেন।

আরবীয়রা বিশেষত বেদুইনরা জন্ম থেকেই গণতান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী। এমন কী শেইখের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও সে সমমর্যাদা নিয়েই দেখা করত। তার সমাজের সব কিছুকে নিচে নামিয়ে এনে সে এক ধরনের সমতা তৈরি করেছিল। মালিক (রাজা) উপাধিটি আরবীয়রা বিদেশি শাসকদের এবং আংশিকভাবে গাসসানের রোমান ও আল-হিরার পারসি রাজবংশকে বোঝানো ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করে না। কেবলমাত্র বানু-কিনদার রাজারাই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্রের পাশাপাশি আভিজাততন্ত্রের মানসিকতাও আরবীয়দের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। আরবীয়দের বিশ্বাস, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূর্তরূপ তারাই এবং তারাই বিশ্বের মহত্তম জাতি (আফখার-আল-উমাম)। বেদুইনদের অহঙ্কারী চোখে, সব সভ্য মানুষই অসুখী এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তদের রক্তের শুচিতা, বাগ্মিতা, কাব্য, তরবারি, ঘোড়া এবং সর্বোপরি তার বংশধারার (নাসাব) মহত্ত্ব সম্পর্কে আরবীয়দের মনে ছিল প্রবল গর্ব। তার বিশাল বংশধারার ইতিহাস ছিল তার কাছে অতিমাত্রায় প্রিয় এবং প্রায়ই তারা নিজেদের আদমের বংশধর বলে দাবি করত। আরবীয় ছাড়া আর কোন জাতির মানুষই বংশকুলুজিকে একটি বিজ্ঞানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারেনি।

স্থায়ী বাসিন্দাদের কোন নারীর তুলনায় যে কোন বেদুইন নারীই অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। এ স্বাধীনতা সে ভোগ করছে শুধু ইসলাম যুগে নয়, ইসলাম-পূর্ব কাল থেকেই। পুরুষশাসিত বহুগামী পরিবারে বাস করলেও স্বয়ম্বরা হওয়ার কিংবা প্রয়োজনে স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার তার ছিল।

সুবিধামত অন্য জাতির সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেবার ক্ষমতা মরুসন্তানদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যুগ যুগ ধরে যে গুণাবলি তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে, অনুকূল পরিবেশে তা পল্লবিত হয়ে গতিশীল ক্ষমতায় পরিণত হয়। উর্বর তুরস্ক এই অনুকূল পরিবেশের স্রষ্টা। ফলে ব্যাবিলনে আবির্ভাব ঘটে এক হাম্মুরাবির, এক মোজেসের সৃষ্টি হয় সিনাইতে, পালমিরাতে এক জেনোবিয়ার, রোমে এক আরবীয় ফিলিপের অথবা বাগদাদে এক হারুন আল-রশীদের। গড়ে ওঠে পেট্রার মতো একাধিক [illegible] এগুলি [illegible] [illegible]

নজর কাড়ে। সাবেক ইসলামের বিস্ময়কর এবং প্রায় নজিরবিহীন বিকাশের পিছনে বেদুইনদের প্রচ্ছন্ন শক্তির দান নেহাৎ কম নয়। তাই খলিফা উমার বেদুইনদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "ওরা ইসলামকে কাঁচামাল' দিয়ে গড়তে সাহায্য করেছেন।" ❑

● টীকা ●

১ ইব্‌ন-সুয়ূদের আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু হল যাযাবরদের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করা।

২ আবু-দাউদ, সুনান (কায়রো, ১২৮০), ১ম খণ্ড, ৮৯ পাতা।

৩ আবু-তাম্মাম, আশআর আল-হামাসাহ্, সম্পা : ফ্রেটাগ (বন, ১৮২৮), ১৭১ পাতা।

৪ ইগনাজ গোল্ডজিহার, মুহমেডানিসে স্টাডিয়ে, ১ম ভাগ (হ্যালে, ১৮৮৯), ১৩ পাতা।

৫ আমীন রিহানি, তারীখ নাজদ (বেইরুট, ১৯২৮), ২৩৩ পাতা।

৬ বিকে, ৩, ৮ অধ্যায়।

৭ এজিকিয়েল ৪৪:৭ তুলনীয়।

৮ আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, সম্পা : ডবলিউ রাইট (লিপজিগ, ১৮৬৪), ২২৯ পাতা, ১.৩।

৯ ইব্‌ন-সা'দ, কিতাব আল-তাবাকাত, আল-কাবীর, সম্পা : এডুয়ার্ড স্যাচো, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ (লিডেন, ১৯০৪), ২৪৬ পাতা, ১.৩।

॥ অধ্যায় ৪ ॥

সাবেক যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

● দক্ষিণ আরবীয়

এখনও পর্যন্ত আমরা 'আরবীয়' শব্দটি বলতে আরব উপদ্বীপের তাবৎ বাসিন্দাকেই বুঝেছি। এক্ষেত্রে তারা কোন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করত, তা ধর্তব্যে আনিনি। কিন্তু এবার আমরা আরব ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমা অনুযায়ী বাসিন্দাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করব। পৃথকভাবে চিহ্নিত করব উত্তর ও দক্ষিণ আরবের জনগণকে। উত্তর আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে মধ্য আরবের 'নাজদিয়'-রাও ছিলেন। আরবের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভৌগোলিক বিভাজন ঘটিয়েছে পদচিহ্নহীন মরুভূমি।

উত্তর আরবের মানুষদের অধিকাংশই ছিলেন যাযাবর। তাঁরা আল-হিজাজ এবং নাজদ প্রদেশে পশুলোমের তৈরি বাড়িতে বসবাস করতেন। দক্ষিণ আরবের মানুষজন আবার ছিলেন অলস প্রকৃতির। তাঁরা বাস করতেন আল-ইয়ামান, হাযরামাওত এবং পার্শ্ববর্তী উপকূল অঞ্চলে। উত্তর আরবের লোকজন কথা বলতেন কোরানের ভাষায়, অতি উচ্চাঙ্গের আরবীতে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আরবের কথ্য ছিল ইয়ামানের প্রাচীন অধিবাসী 'সেবা' জনগোষ্ঠীর ভাষা। অনেকে আবার ইয়ামানেরই প্রাচীন রাজা হিময়ারের নামানুসারে রাখা 'হিময়ারি' ভাষায় কথা বলতেন। এই দুই ভাষার সঙ্গে আফ্রিকার ইথিওপিয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উভয় জনগোষ্ঠীই ছিলেন ভূমধ্যসাগরের লম্বা-মাথা-বিশিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর শ্রেণীভুক্ত। তবে দক্ষিণ আরবের লোকজনের সঙ্গে উপকূলের জনগোষ্ঠীর বেশ মিল ছিল। এরা ছিলেন সাধারণত গোল-মাথা-বিশিষ্ট। এদের চোয়াল প্রশস্ত, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক, চ্যাপটা গাল এবং চুল ছিল এক রাশ। এদের স্বভাবচরিত্র ছিল হিব্রু বা হিট্রিয়দের মতো। সম্ভবত উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে দক্ষিণ আরবে এসেছিল এই উদ্বেধী জনগোষ্ঠী।[১] দক্ষিণ আরবের লোকজনই প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন এবং নিজেদের চেষ্টায় সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। উত্তর আরবের মানুষজন ইসলামের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিধিতে পা রাখতে পারেননি।

জাতিগত এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্মৃতি ও সচেতনতা আরবীয়দের বংশধারার অন্যতম ঐতিহ্য। তাঁরা নিজেদের দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। (১) অবলুপ্ত জনগোষ্ঠী (বায়িদাহ্) এবং (২) বর্তমান জনগোষ্ঠী (বাকিয়াহ্)। অবলুপ্ত গোষ্ঠীতে পড়ে সামূদ, আদ (এই দুই গোষ্ঠীর

কথাই কোরানে রয়েছে), তসম এবং জদীস। সামূদ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। এঁদের কথা দ্বিতীয় সারগনের[১] প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে উল্লিখিত রয়েছে। তা সারগণ দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত আছে।[২] ধ্রুপদী লেখকদের কাছে এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় ছিল 'তামুদেই' নামে।[৩] আদ জনগোষ্ঠী সম্ভবত প্রাচীন হাযরামাওত অঞ্চলেই বিকাশলাভ করেছিলেন। এরপর বংশতাত্ত্বিকরা জীবিত আরব জনগোষ্ঠীকে আবার জাতিতে ভাগ করেছেন। (১) আরবীয় আরব বা আরবদেশীয় আরব (আরিবাহ) এবং (২) আরবে আসা আরবীয় (মুস্তারিবাহ্)। তাঁরা মনে করেন, আরিবাহ্রা প্রকৃতপক্ষে ইয়ামানিয়। তাঁরা কাহ্তান (বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে জোকতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে) বংশজাত। এরাই হচ্ছেন আদিম জনগোষ্ঠী। আর মুস্তারিবাহ্রা গড়ে উঠেছেন হিজাজি, নাজদি, নাবাটিনিয় এবং পালমিরিয় গোষ্ঠীর লোকজনদের নিয়ে। এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষরাই আবার 'আদনান' বংশজাত। 'আদনান' বংশের উৎপত্তি হয় ইসমাইলের হাত ধরে। ক্রমে এলাকার ভূমিপুত্র হয়ে ওঠেন। 'কাহ্তান' এবং 'আদনান'-এর মধ্যে যে পার্থক্য পরবর্তীকালে তা যথাক্রমে দক্ষিণ আরব এবং উত্তর আরবের জনগণের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মুহাম্মাদ মক্কা থেকে হিজরত করার সময় যে মদীনাবাসীরা তাঁর সমর্থনে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন ইয়ামান বংশজাত। অথচ মুহাম্মাদের নিজের পরিবারই ছিলেন কুরাইশ, যারা উত্তর-আরবের নিজারি জাতির লোক। পূর্ব সিরিয়ার গাস্সানিরা এবং আল-ইরাকের আল-হিরার লাখমিরাও ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আরবীয়। কিন্তু এঁরা পাকাপাকিভাবে উত্তর আরবের বাসিন্দা হয়ে যান।

আরবের দুই প্রান্তের জনগোষ্ঠীর এই পার্থক্য কখনও ঘোচেনি। দুই ভূখণ্ডের এই পার্থক্য আগাগোড়াই বিরাজমান ছিল। এমন কি ইসলামের আবির্ভাবের পরেও যখন সমগ্র আরব জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়, তারপরও তা ছিল প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান।

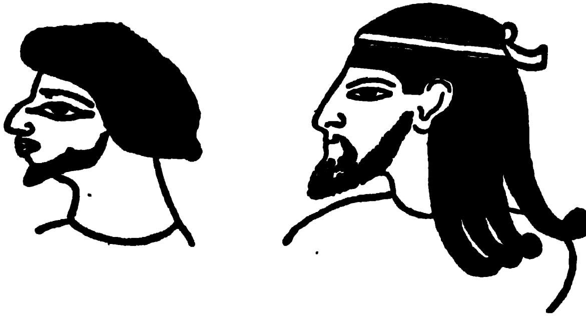
সংস্কৃতির দুই সাবেক প্রতিভূ 'মিশর' এবং 'ব্যাবিলন'। এর মধ্যে আরব উপদ্বীপের অবস্থান খুব মোটা কীলকের মতো। ভারতের পাঞ্জাব ছিল সম্ভবত তৃতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এক বা দুই নদীমাতৃক দেশের সংস্কৃতির পরিমণ্ডল আরব ভূখণ্ডে কখনও সম্ভব ছিল না, তবু নদীমাতৃক সংস্কৃতির প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে পারেনি এই ভূখণ্ড। এদের সংস্কৃতির শিকড় প্রোথিত ছিল দেশের মধ্যেই। সংস্কৃতি ছিল সামুদ্রিক। আরবের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের লোকজনই সম্ভবত মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং পাঞ্জাব—সাবেক বাণিজ্যের এই তিন মূল কেন্দ্রের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করে।

উত্তরে সিনাই উপদ্বীপে আরব ভূখণ্ডকে স্পর্শ করেছে আফ্রিকা, দক্ষিণে বাব-আল মানদাবের থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে মিশরভূখণ্ড। এছাড়া এক তৃতীয় যাত্রাপথে এই দেশ পশ্চিম আরবের মধ্যস্থলকে সংযুক্ত করেছে। পাশাপাশি থেবেস নগরীর কাছে নীলনদের বিপরীতে ছিল ওয়াদি আল-হাম্মামাত। তা আল কুসাইরে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এই শেষ পথটাই ছিল মূল যোগাযোগের ক্ষেত্র। দ্বাদশ মিশরিয় রাজবংশ বিদ্যমান থাকাকালীন (২০০০-১৭৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ) নীলনদের সঙ্গে লোহিত সাগরকে যুক্ত করা হয় একটি খাল দিয়ে। এটিই পরে খনন করে সুয়েজ খাল হিসেবে গড়ে তোলা হয় খলিফাদের আমলে। ভারতে যাবার জন্য উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আবিষ্কার হওয়ার (১৪৯৭ খ্রিঃ) আগে এই খালটিই ব্যবহৃত হত যাত্রাপথ হিসেবে।

● সিনাইয়ের তামা

সিনাইয়ের দক্ষিণাঞ্চলে ওয়াদি মাগারে ছিল তামা এবং **নীলকান্তমণির খনি**। এজন্যই সিনাইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল মিশরের। বর্তমান শহর আল-তূরের কাছে এই জায়গাটি অবস্থিত। রাজতন্ত্র কায়েম হবার আগেও সিনাইয়ের যাযাবররা মূল্যবান জিনিসপত্র সিনাই থেকে মিশরে রপ্তানি করতেন। সিনাইয়ের প্রথম রাজবংশের ফারাওরা (রাজা) এখানকার খনিগুলি চালাতেন। পরে শোষণের যুগ শুরু হয় তৃতীয় রাজবংশ স্নেফ্রুর (২৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ) আমল থেকে। মিশর এবং সিরিয়া-প্যালেস্তাইনের মধ্যে এবং এশিয়া মাইনর ও উর্বর তুরস্ক ভূমির মধ্যে সংযোগকারী যে-বিশাল সড়ক তৈরি করা হয়, তাই-ই ছিল মানুষের



প্রাচীন ইজিপ্সিয়ানের চোখে আরবী মানুষ

ব্যবহৃত প্রথম আন্তর্জাতিক জাতীয় সড়ক। এই সড়ক থেকেই একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিনাইয়ের সমৃদ্ধশালী তামা এবং **নীলকান্তমণির** খনির দিকে চলে গিয়েছিল। আবিডোসে তে প্রথম রাজবংশের রাজ-সৌধে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পেত্রি এক গজদন্তের টুকরোয় খোদাই করা অপূর্ব এক মানুষের ছবি দেখেছিলেন। মানুষটিকে দেখতে অনেকটা আর্মেনিয় সেমেটিয়দের

মতো। গালে দীর্ঘ ছুঁচলো দাড়ি। ঠোটের ওপরের দিকটা কামানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন দক্ষিণ আরবের কেউ। এই রাজবংশের আমলেই তৈরি সাবেক এক ভাস্কর্যে দেখা গেছে গায়ে কাপড় জড়ানো শীর্ণ এক বেদুইন নেতাকে তার মিশরিয় প্রভু গদার মত একটি অস্ত্র দিয়ে মারতে উদ্যত এবং বেদুইন নেতা হাঁটু মুড়ে বসে প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে। 'বেদুইন' শব্দটি (যার মিশরিয় অর্থ 'আমু' বা যাযাবর) প্রাচীন মিশরিয় ঐতিহাসিক বিবরণীতে ভালভাবেই পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মিশরের চারপাশের এবং মূল আরবের বাইরের যাযাবরদেরও 'বেদুইন' বলা হত।



সেমারখেট প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা, যাযাবর দলপতিকে বধ করেছে।

● ধুনা

মিশরের সঙ্গে নুবিয়া এবং পুন্তের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর দক্ষিণ আরব ওই দেশের ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সেসোস্ট্রিসের কথা বলে গেছেন হেরোডোটাস[৪]। সম্ভবত তিনিই দ্বাদশ রাজবংশের প্রথম সেনুসার্ট (১৯৮০-১৯৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। হেরোডোটাস বলেছেন, তিনি আরব উপসাগরের (সম্ভবত লোহিত সাগরের আফ্রিকার অংশের) দেশগুলি জয় করেছিলেন। অষ্টাদশ রাজবংশের আমলে লোহিত সাগরে তাদের নৌবহর ছিল, কিন্তু পঞ্চম রাজবংশের আমলে আমরা দেখি সাহুরে (২৫৫৩-২৫৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এই সমুদ্রপথে নৌবাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটান। শুরু করেন ধুনা-উৎপাদক ভূখণ্ডের সন্ধান। অবশ্যম্ভাবীভাবে তিনি গিয়েছিলেন আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে সোমালিল্যাণ্ডে।

দক্ষিণ আরবে মিশরিয়দের মূল আকর্ষণই ছিল ঐ ধুনা বা গুগগুল। মন্দির-মসজিদে ব্যবহারের জন্য এই গন্ধদ্রব্যকে তাঁরা যথেষ্ট মূল্যবান মনে করতেন। এছাড়া মমির বাক্সেও এই গন্ধদ্রব্য রাখা হত। আরবের একাংশে উৎপন্ন হত প্রচুর ধুনা। নুবিয়া জয় করার পর যখন পুন্তকে (আধুনিক সোমালিল্যাণ্ড) মিশর সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পরিধির মধ্যে আনা হল, তখন এইসব ধুনা উৎপাদক অঞ্চলে বহুবার বাণিজ্য অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধুনা, গুগগুল, চন্দনকাঠ, ইত্যাদি আঠাল দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। ইতিহাসের প্রথম বিখ্যাত মহিলা হাতশেপসুতের

নেতৃত্বে (১৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) পুন্তের উদ্দেশ্যে এরকম এক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। দূত মারফত তাঁর উত্তরসূরি এরূপ বৈভবের সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি হলেন 'প্রাচীন মিশরের নেপোলিয়ন' তৃতীয় থুটমোস। ১৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি একই জায়গা থেকে পণ্যবাহী জাহাজ ভরতি করে গজদন্ত, আবলুস কাঠ, চিতাবাঘের চামড়া এবং দাস সংগ্রহ করে আনেন। এসব জিনিস দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের আল-ইয়ামানেও পাওয়া যেত। তাই এটা অনুমান করা যায় যে, মিশরিয়রা বাব আল-মান্দাবের উভয়পাশের জমিকেই 'পুন্ত' বলে অভিহিত করতেন। আরব থেকে সোনাও হয়তো আসত। দক্ষিণ আরবের সঙ্গে ধুনা বাণিজ্য চলত ওয়াদি আল-হাম্মামাত মারফত।এভাবে দক্ষিণ আরবের সঙ্গে মিশরের যোগাযোগের এটাই মূল মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীনকালে যে-হাযরামাওতের[৫] মধ্যে মাহ্‌রাহ এবং আল-শিহ্‌র[৬] উপকূলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তা ছিল সেকালে ধুনা উৎপাদনের সমৃদ্ধশালী ভূখণ্ড। ওই অঞ্চলেরই এক সাবেক শহর 'জাফার' ছিল ধুনা উৎপাদনের মূল কেন্দ্র। 'জাফর' এর আধুনিক নাম 'যুফার'। এখন জায়গাটি উমান-এর মধ্যে অবস্থিত। দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত ধুনা উৎপাদনকারী দেশগুলির বাণিজ্যিক কেন্দ্র এই জাফারকে অবশ্য আল-ইয়ামানের 'জাফার' এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। এই জাফার ছিল হিময়ার রাজবংশের রাজধানী।[৭] আজও হাযরামাওত এবং দক্ষিণ আরবের অন্য অংশে ধুনা (লোবান) গাছের প্রচুর চাষ হয়। আগের মতোই এখনও জাফর এই গন্ধদ্রব্যের বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র। শুধু প্রাচীন মিশরিয়দেরই আরবে বাণিজ্যিক আগ্রহ ছিল একথা বললে ভুল হবে। রান্নার মশলা এবং খনিজপদার্থে বাণিজ্য করতে ব্যাবিলনের লোকেরও সমান আগ্রহ ছিল।

● ব্যাবিলন এবং সুমেরিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক

পূর্ব-আরবের সীমান্ত ছিল মেসোপটেমিয়ার দিকে। এই অঞ্চলের সাবেক অধিবাসী হলেন সুমেরিয় এবং আক্কাদিয়রা। বহু বছর আগেই এই দুই জাতির সঙ্গে আমুরুর প্রতিবেশীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জল এবং স্থলপথে দুই প্রদেশের মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

সুমের অঞ্চলে সেকালে যে-ধাতুর বহুল প্রচলন ছিল এবং যা শিল্পে ব্যবহৃত হত, সেই তামা সম্ভবত উমান থেকেই আসত।

সেমিটিক ইতিহাসের প্রথম বিখ্যাত পুরুষ সারগণের নাতি এবং উত্তরাধিকারী নারাম-সিনের (আনুমানিক ২১৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মূর্তিস্তম্ভে লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি 'মাগান' জয় করেছিলেন। সেখানকার প্রভু মানিয়ামকে[৮] তিনি পরাস্ত করেন। এছাড়া লাগাশের সুমেরিয় 'পাতেসি' গুডি মারফত (খ্রিঃ পূঃ ২০০০ নাগাদ) জানা যায়, মাগান এবং মেলুখ্‌খা থেকে তাঁর মন্দিরের জন্য কাঠ এবং মূল্যবান পাথরও জবরদখল করে আনা হয়েছিল। মাগান

ও মেলুখ্খা নামের দুটি সুমেরিয় স্থান-নাম যে পূর্ব ও মধ্য আরবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল সেকথা সুস্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তী কালে অ্যাসিরিয় আমলে তা স্থান পরিবর্তন করে দূরবর্তী সিনাই উপদ্বীপ ও পূর্ব-আফ্রিকায়। অবশ্য আরবী 'মাআন' শব্দের সঙ্গে 'মাগান' শব্দের কোন যোগ নেই। উত্তর আল-হিজাজে (এখন জর্ডনে) একটি মরূদ্যানের নাম 'মাআন'। সম্ভবত এটি মরুযাত্রীদের পথে মিনাইয়ানদের প্রাচীন এক উপনিবেশ ছিল। কীলকাকার বর্ণমালায় খোদিত লিপিতে প্রথম আরবের এক স্থান এবং আরব জনগণের কথা লেখা হয়। এটা ইতিহাসে প্রথম। গবেষণা করে সম্প্রতি জানা গেছে, এই কীলকাকার বর্ণমালাতেই খোদিত 'সিল্যাণ্ড' স্থানটি ছিল মূল আরব ভূখণ্ডে। এর মধ্যে ছিল পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীরভূমি থেকে আল-বাহরাইনের (প্রাচীন দিলমুন) দ্বীপ এবং হয়তো পশ্চিমে বিস্তৃত আল-আকাবাহ্ পর্যন্ত আল-নুফূদ অঞ্চল। আরও জানা গেছে, নবোপলাসর ব্যাবিলনের রাজা হওয়ার আগে এই 'সিল্যাণ্ড'-এর রাজা ছিলেন।

● অ্যাসিরিয় প্রভাব

আরবদের সম্পর্কে প্রথম সঠিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় অ্যাসিরিয় রাজা তৃতীয় সলমানেসারের সময়কার এক শিলালিপিতে। রাজা তৃতীয় সলমানেসার দামাস্কাসের আর্মেনীয় রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ছিলেন। অভিযান চলে দামাস্কাসরাজের সঙ্গে তাঁর মিত্র আহাব এবং জুন্দুবের বিরুদ্ধেও। শেষোক্তজন ছিলেন আরব শেখ। ৮৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হামাহ্‌র উত্তরে কারকারে এই যুদ্ধ হয়। সলমানেসারের নিজের কথা থেকে এসম্পর্কে জানা যায় : তিনি পরে বলেন, 'আমি কারকার নামে রাজকীয় নগর ধ্বংস করি। পুরো বিধ্বস্ত করি। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই। মোট ১২০০ রথ, ১২০০ অশ্বারোহী বাহিনী, দামাস্কাস রাজের ২০ হাজার সেনাবাহিনী এবং তাঁর আরবীয় মিত্র গিন্দিবু-র ১০০০ উটকে পুরো ধ্বংস করে দিই আমি।'[১]

ইতিহাসে এই প্রথম উট-সহ আরবদের যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ হয়।

বহুদূর বিস্তৃত অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্য বরাবর সড়কপথে বাণিজ্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে এবং ভূমধ্যসাগরের অভিমুখে যাত্রাপথ সুগম করতে দ্বিতীয় অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের স্থপতি রাজা তৃতীয় তিগলাথ-পাইলেসার (৭৪৫-৭২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) সিরিয়া এবং সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকবার অভিযান চালান। তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে তিনি 'আরিবি' ভূখণ্ডের রানি জাবিবির কাছ থেকে নজরানা নেওয়া শুরু করেন। তাঁর রাজত্বের নবম বছরে তিনি আরেক 'আরিবি রানিকে নিয়ে দেশে চলে আসেন। ওই রানির নাম ছিল সামসি (মতান্তরে শামস বা শামসিয়া)। ওই রাজার কালপঞ্জি থেকে জানা যায়, ৭২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাসাই উপজাতির পক্ষ থেকে তাঁকে নজরানা হিসেবে 'তেমাই' (মতান্তরে তায়মা) শহরটি এবং সাবাই উপজাতিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বহু সোনা, উট এবং মশলা দেওয়া হয়। এই দুই উপজাতি

গোষ্ঠী বাস করতেন সিনাই উপদ্বীপ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মরুভূমিতে।[১০] এভাবে তৃতীয় তিগলাথ-পাইলেসার প্রথম রাজা যিনি আরবদের কাঁধে জোয়াল চাপান।

কারকেমিশ এবং সামারিয়ার বিজয়ী রাজা দ্বিতীয় সারগণ (৭২২-৭০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) জানিয়েছেন, তাঁর রাজত্বের সপ্তম বর্ষে তিনি অন্য অনেককিছুর সঙ্গে তামুদ (কোরানে যে 'সামুদ' এর উল্লেখ আছে) উপজাতিগোষ্ঠীর লোকজনকে বন্দি করেন। একইসঙ্গে 'ইবাদিদ' উপজাতি গোষ্ঠীর যেসব লোক মরুভূমিতে বাস করতেন, যাঁরা কোন উঁচু বা নীচু পদমর্যাদার সরকারি কর্মচারীকে চিনতো না—তাঁদেরও বন্দি করেন তিনি। বন্দি করার পর তাদের একাংশকে হত্যা করে বাকিদের সামারিয়া পাঠিয়েছেন।[১১] একই সময়ে তিনি সামসির আরব-রানি, স্যাবিয়ান প্রধান ইতআমারা (ইয়াথা-আমার) এবং মিশর ও মরু অঞ্চলের অন্য রাজাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নজরানা গ্রহণ করেন। এই নজরানার মধ্যে ছিল সোনা, মূল্যবান পাথর, গজদন্ত, ইক্ষুবীজ, নানা রকমের জড়িবুটি, ঔষধি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি।[১২] এই ইতআমারা সম্ভবত তাদেরই কেউ হয়ে থাকবেন, যাঁরা দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপিতে উল্লিখিত রাজকীয় উপাধি 'মুকাররিব' ব্যবহার করতেন নামের আগে। তাঁর উত্তরাধিকারী সাবার কারিবা-ইল (যার থেকে সেনাচেরিব নজরানা আদায় করেছিলেন বলে দাবি করেন) ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের বাসিন্দা।[১৩] অন্তত শিলালিপিতে সেরকমই উল্লেখ আছে। তাই যদি হয়, তা হলে অ্যাসিরিয়দের দাবি করা 'নজরানা' সেই অর্থে 'নজরানা' না হয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহারই হবে। দক্ষিণ আরবীয় শাসকরা অ্যাসিরিয় রাজাদের এই উপহার দিতেন।

> রাজাদের সঙ্গে তাঁরা এই উপহার দিতেন উত্তর আরবের বন্য যাযাবরদের বিরুদ্ধে যারা তাদের সমর্থন করতেন, সেই মিত্রশক্তিকেও।

৬৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনাচেরিব আরবে দুর্গনগর 'আদুমু' দখল করে সেখানকার রানি, দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে নিনাভে চলে যান। আদুমু ছিল উত্তর আরবের মরূদ্যান। পরবর্তীকালে ইসলামি বিজয় অভিযানে এই আদুমুর নাম আবার আসে। তখন এর পরিচয় ছিল 'দুমাত আল-জান্দাল' নামে। এই নগরীর রানি ছিলেন তেলখুনু (তিয়িলখুনু)। রানি তেলখুনু অ্যাসিরিয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিদ্রোহী ব্যাবিলনিয়দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হন। তিনি কিদার (অ্যাসিরিয় কিদরি) উপজাতিগোষ্ঠীর প্রধান হাজাইল-এর সহযোগিতা পান। এই হাজাইল-এর সদরদপ্তর ছিল পালমিরেনায়।

প্রায় ৬৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এসারহাডন এই হাজাইলের পুত্র ওয়ায়েতের নেতৃত্বাধীন এক বিদ্রোহ দমন করেন। সেসময় হাজাইলপুত্র ওয়ায়েৎ জীবন বাঁচাতে শিবির ছেড়ে একা পালিয়ে যান।[১৪] দেখা যাচ্ছে, বেদুইনরা অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের পক্ষেই মদত করেন। বেদুইনদের বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে মিশর এবং ব্যাবিলন। হাজাইলপুত্র মিশর জয় করতে যে বিখ্যাত অভিযান (৬৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) চালান তাতে ভীত অ্যাসিরিয়রা এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে ওয়ায়েৎ দেখেন 'দুমাথাওয়ালা সাপ' এবং ভয়ার্ত সরীসৃপরা ও অন্য পতঙ্গরা ডানা

ঝাপটাচ্ছে।[১৭] ইসাইয়াও (৩০·৬) উল্লেখ করেছে, বিষধর এবং উড়ন্ত সাপের কথা। হেরোডোটাস[১৮] অবশ্য আমাদের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, "বিষধর সাপ সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, কিন্তু ডানাওয়ালা সাপ একমাত্র আরব ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। ওই দেশেই নাকি ডানাওয়ালা সব সাপ জড় হয়েছে।"

আরবীয় উপজাতিগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত তার নবম সামরিক অভিযানে ওয়ায়েৎ এবং তার সেনাবাহিনীকে তুমুল সংঘর্ষের পর বন্দি করেন আশুরবানিপাল (৬৬৮-৬২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।

অ্যাসিরিয় কালপঞ্জিতে আরব প্রধানদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। জানা যায়, আরব প্রধানরা রাজাদের পায়ে চুম্বন করে তাঁদের সোনা, মূল্যবান পাথর, ভ্রুতে মাখার কালি, ধুনা, উট এবং গাধা উপহার দিয়েছেন, বস্তুত আমরা অপরাজেয় বেদুইনদের শাস্তি দিতে দ্বিতীয় সারগণ, সেনাচেরিব, এসারহাডন এবং আশুরবানিপাল কর্তৃক মোট অন্তত ৯ বার অভিযানের কথা জানা যায়। এই বেদুইনদের শাস্তি দেবার কারণ হচ্ছে, তাঁরা সিরিয়ার অ্যাসিরিয় প্রদেশগুলিতে উৎপাত করতেন, মানুষজনের যাতায়াতের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। এসব করার জন্য তাঁরা অ্যাসিরিয়ার শত্রু মিশর এবং ব্যাবিলনের সাহায্য পেতেন। এইসব অভিযানে উল্লিখিত 'উরবি'-রা ছিলেন মূলত বেদুইন এবং তাঁদের ভূখন্ডকে বলা হত 'আরিবি'। এই আরিবি বিস্তৃত ছিল সিরিয়-মেসোপটেমিয়া মরুভূমি অঞ্চল, সিনাই উপদ্বীপ এবং উত্তর আরবে। সিনাই উপদ্বীপে নাবাতীয় নয়, ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত মিডিয়ানাইটসরা অ্যাসিরিয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের মাথাইরা কখনও নিনাভার দখলে যাননি। অ্যাসিরিয়দের সঠিকভাবেই প্রাচীন বিশ্বের 'রোমান' বলা হলেও তারা কখনও তাদের অধীনে কয়েকটি মরূদ্যান এবং উত্তর আরবের কিছু উপজাতিদের ছাড়া আর কাউকে আনতে পারেননি।

● নব্য ব্যালনিয় এবং পারসি সম্পর্ক তাইমা

ওই সময়ে উত্তর আরবে যেসব স্থানে মানুষজন বসবাস শুরু করে তাদের মধ্যে বিশেষ, পরিচিতি লাভ করে 'তাইমা' (তেমা বা অ্যাসিরিয়-ব্যাবিলনিয় নথিতে 'তে-মা-য়া' বলে যাদের কথা লিপিবদ্ধ আছে)। 'তেমা' ছিল ক্যালডিয় রাজত্বের শেষ রাজা নাবোনিদুসের (খ্রিঃ পূর্ব ৫৫৬-৫৩৯) প্রাদেশিক আস্তানা। তৃতীয় তিগলাথ পাইলেসারের আমল থেকে (৭৪৫-৭২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সিরিয়া এবং উত্তর আরবের একটি অংশ। নাবোনিদুসের রাজত্বের তৃতীয় বছরে তেমার যুবরাজকে হত্যা করা হয়। এরপর এই মরূদ্যানে নাবোনিদুস সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে এই তথ্য জানা যায়।[১৯]

এই আরব্য মরূদ্যানের সম্পর্কে সবচেয়ে তাৎপর্যময় তথ্য, যা কীলকাকার শিলালিপি মারফত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা হল, পারসিদের হাতে ব্যাবিলনের পতন (৫৩৯

খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। জানা যায়, তাঁর রাজত্বের সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ বছরে নাবোনিদুস 'আল তেমা'তেই থাকতেন। আর তাঁর পুত্র বেলশাজার এবং তার সৈন্যবাহিনী থাকতেন ব্যাবিলনে। পরে ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র ক্যামবিসাস উত্তর আরব সফর করে সেখানকার জনগণের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলেন। মিশর জয় করে ফেরার সময় তিনি এই মহৎ কাজটি করেন। দারিয়ুসের সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেরোডোটাস লিখেছেন, আরবরা কখনও পারস্য শাসনের অধীনে আসেননি।

হুবার (১৮৮৩) যে তাইমা প্রস্তরখণ্ড খরিদ করে এনেছিলেন তা এখনও ল্যুভে সুরক্ষিত রয়েছে। এই পাথরকে আজও সেমিটিক যুগের অন্যতম মূল্যবান শিলালিপি বলে অভিহিত করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তৈরি এই শিলালিপি লেখা হয়েছে 'আরাম' ভাষায়। কীভাবে তায়মা (তেমা)-তে এক পুরোহিত হাজামের সালম নামে এক নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কথা এতে লেখা আছে। ওই পুরোহিত একটি নতুন মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে পুরোহিততন্ত্রও কায়েম হয়। ওই নতুন বিগ্রহ ছিল অ্যাসিরিয় সভ্যতার আলোকে তৈরি। ওই বিগ্রহমূর্তির নীচে ছিল পুরোহিতের মূর্তি। ওই পুরোহিতমূর্তিই খাড়াভাবে এক প্রস্তরখণ্ড ধরে রেখেছিল, যার ওপরে বসানো ছিল বিগ্রহটি।

● হিব্রুদের সঙ্গে সম্পর্ক

ভৌগোলিকভাবে ইহুদিরা ছিলেন আরবদের প্রতিবেশী। আর জাতিগতভাবেও তারা ছিলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজনের ঘনিষ্ঠ। ওল্ড টেস্টামেন্টে হিব্রুদের উৎসের কথার প্রতিধ্বনি মেলে। আমরা আগে জেনেছি, হিব্রু এবং আরবী দুটি ভাষাতেই সেমিটিক সগোত্রতা পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত কিছু হিব্রু নাম আরবীর সঙ্গে মিলে যায়। যেমন, বলা হয়েছে **'তারা প্রায় সবাই ঈশাউয়ের পুত্র (জেনেসিস, ৩৬:১০-১৪ ; ১ম ক্রনিকল ১:৩৫-৭)। আবার** হিব্রুদের উদ্ভবের কথার ('জেনেসিস') প্রথম ছত্র বুঝতে যেকোন দক্ষিণ আরবীয়ের সামান্য অসুবিধাই হবে। আধুনিক গবেষণা দেখিয়েছে, হিব্রু ধর্মের সূত্রপাতই হয় মরুভূমিকে ঘিরে।

১২২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশর থেকে প্যালেস্টাইনে যাবার সময় হিব্রু উপজাতিগোষ্ঠীর লোকজন সিনাই এবং নুফুদে ৪০ বছরের মতো বসবাস করেন। সিনাইয়ের দক্ষিণে মিদিয়ানে এবং তার পূর্বদিকে ঐশ্বরীয় চুক্তিপত্র করা হয়। এই সময় মোজেস যে আরবী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন তিনি ছিলেন ওই মিদিয়ানের এক পুরোহিতের মেয়ে। ওই পুরোহিত ছিলেন জিহোবার পূজারি। তাই তিনিই মোজেসকে নতুন ধর্মমতে উদ্দীপ্ত করেন। যাহু (জাহওয়েহ, জিহোবা) ছিলেন সম্ভবত মিদিয়ান বা উত্তর আরবের কোন উপজাতি গোষ্ঠীর দেবতা। তিনি ছিলেন মরুভূমির দেবতা, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রবক্তা। তিনি থাকতেন এক তাঁবুতে। তাঁর ধর্মমত খুব বেশি জটিল ছিল না। তাঁর ধর্মকথা বলতে মরুভূমিতে আনন্দোৎসব, আত্মত্যাগ এবং পশুপালকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রণামী বা পূজাসামগ্রী সব

আগুনে পোড়ানো।[১৬] হিব্রুরা প্যালেস্টাইনে গিয়েছিল যাযাবর হিসেবে। মরুভূমির পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া তাঁদের উপজাতি জীবনযাপনের ঐতিহ্য বহুকাল টিকে ছিল। পরে অবশ্য হিব্রুরা অনেক সভ্য হয়ে ওঠেন।

হিব্রু রাজত্বের স্বর্ণযুগে সিনাই উপদ্বীপও ওই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল-আকাবাহ্ উপসাগরে সলোমনের রণতরী ছিল। ওফির থেকে সলোমন এবং হীরামের নৌবাহিনী যখন সোনা এবং মূল্যবান পাথর (১ম কিংস ৯:২৭-২৮, ১০:১১ ; ২ ক্রনিকল ৯:১০) আনে তখন সম্ভবত উমানের 'জাফার' ছিলেন 'ওফির। জব-এর (২২:২৪) সময়ে ওফির সোনা উৎপাদনকারী ভূখণ্ডের প্রতিশব্দে পরিণত হয়। সলোমনের পর জেহোশাফাতও (৮৭৩-৮৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এক শতক ধরে এলাথে (আধুনিক আল-আকাবা) শাসন করে চলেন। ওই অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে উঠছিল বাণিজ্যপথ। যেসব আরব দল বেঁধে (২ ক্রনিকল ১৭:১১) ওখানে আসতেন তাদের থেকে নজরানা পর্যন্ত আদায় করা হত। সেনাচেরিব তাঁর শাসনের তৃতীয় অভিযান চালিয়েছিলেন সিরিয়-প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ৭০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ওই অভিযানের কী হয় তা জানা যায় তারই জবানিতে আমার শাসন-মহিমাতেই পরাস্ত হয়ে যান হেজেকিয়া। আর আরবদের যে ভাড়াটেবাহিনী(?) এনে তিনি জেরুসালেমকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন তারা বিপদের মুহূর্তেই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যান।[১৭] হেজেকিয়া (১ম ক্রনিকল ৪:৪১) এবং তার পূর্বে উজ্জিয়া (২য় ক্রনিকল ২৬:৭) মিনাইনদের বিরুদ্ধে মরূদ্যানে ঘেরা 'মাইন' নামক স্থানে (আধুনিক মাআন) তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন। উজ্জিয়া (৭৯২-৭৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পরে ইলাথ পুনরুদ্ধার করে সেখানে এক নগরীর (দ্বিতীয় কিংস ১৪:২২) পত্তন করেন। জানা যায়, এক দক্ষিণ আরবীয় জুডার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে রাজা জেহোরামের (৮৪৮-৮৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পুত্র, স্ত্রী এবং কোষাগার ধ্বংস করেন। তবে এই তথ্য কতটা সঠিক তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ স্যাবিয়ানরা তো আরবীয়ই ছিলেন। তারা শুধু ইথিওপিয়দের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা এমন অভিযান চালাতে পারেন কিনা এনিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন। খ্রিস্টপূর্বাব্দ নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে নেহেমিয়ার[১৮] আমলে ইহুদিরা তাঁদের দক্ষিণ-পূর্বের প্রতিবেশীদের শত্রু হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন।

● ওল্ড টেস্টামেন্টের সূত্র

শব্দ বুৎপত্তি তত্ত্ব অনুযায়ী 'আরব' শব্দটি সেমিটিক। এর অর্থ 'পরিত্যক্ত' অথবা এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের জাতীয়তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। ওই অর্থে হিব্রু 'এরেব' শব্দটি একই অর্থ বোঝাতে ওল্ড টেস্টামেন্টের ইসাইয়া ২১:১৩, ১৩:২ এবং জেরেমিয়া ৩:২ অংশে ব্যবহৃত হয়েছে। কোরানে 'আরব' বলতে বেদুইনদেরও বোঝানো হয়েছে। কোরানের 'যাযাবর'দের জন্য 'আরাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাকাবিজ ১২:১০০-এ আরব ও যাযাবরদের সমার্থক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাইবেল-বিষয়ক ব্যবহারের প্রথম সুনিশ্চিত

উদাহরণ দেখা যায় জেরেমিয়াহ্ ২৫:২৪-এ। তাতে আরব শব্দটি মূল নাম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ 'আরবের রাজন্যবর্গ'। জেরেমিয়া-র ভবিষ্যদ্বক্তা জীবনে যবনিকাপাত ঘটে ৬২৬ এবং ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এখানে রাজা বলতে সম্ভবত উত্তর আরব এবং সিরিয়ার মরুভূমির শেখদেরই বোঝানো হত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে 'আরব' বলতে তাদেরই বোঝাত যারা ওই উপদ্বীপে বসবাস করতেন। দ্বিতীয় ক্রনিকল ২১:১৬ উল্লেখ করেছে যে, আরবীয়রা হলেন ইথিওপিয়দের কাছাকাছি। আর এ থেকে সুস্পষ্ট যে, লেখক এখানে আরবীয় বলতে দক্ষিণ-পশ্চিমের বাশিন্দা, অর্থাৎ—সাবাবাসীদের বুঝেছেন। প্রাচীন আরবের যে চার বহুলপরিচিত রাজ্যের কথা জানা যায়, সেগুলি হল সাবা, মাইন, হায়রামাওত এবং কাতাবান। এর মধ্যে প্রথম তিনটির কথা ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে। হিব্রু ধর্মগ্রন্থ 'ইজিকিয়েল'-এর (মৃত, ৫৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরে) বাণিজ্যিক অধ্যায়ে 'আরবীয়' এবং 'কেদার' শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওই অধ্যায়ে যেসব পণ্যদ্রব্যের তালিকা রয়েছে তার সঙ্গে আরবের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের প্রচণ্ড মিল রয়েছে। ২৭ অধ্যায়েরই একুশতম শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আরবরা এখনকার মতোই গবাদিপশু প্রতিপালন করতেন। ওইসব গবাদি পশু প্রতিবেশী দেশে কেনাবেচাও চলত। জেরেমিয়াহ্ ৩:২ থেকে এও জানা যায় যে, সড়কপথে ডাকাতিতে যথেষ্ট দুর্ধর্ষ হিসেবে কুখ্যাতি ছিল আরবদের। জেরেমিয়াহ্ ২৫:২৩ (আমেরিকা সংশোধনী) উল্লেখ করেছে যে, তারা চুল কাটার সময় মাথার মাঝে এক গোছা চুল রেখে পুরো মুণ্ডিতমস্তক হয়ে যেত, বর্তমান কালে বেদুইনরাও একই ভাবে চুল কাটেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টে (ইসাইয়া ২১:১৩; জেরেমিয়াহ্ ২৫:৩৩; ইজিকিয়েল ২৫:১৩) বারংবার উল্লেখ আছে যে 'ডেডান' (আরবী দাইদান)-এর তা আধুনিক আল-উলা ছাড়া কিছু নয়। জায়গাটি আল-হিজাজের উত্তরাঞ্চলে একটি মরূদ্যান। কিছুকাল এটাই ছিল এই উপদ্বীপের উত্তরাংশে স্যাবিয়ানদের সদরদপ্তর। স্যাবিয়ানদের যখন বেশ রমরমা অবস্থা তখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল পরিবহন ব্যবস্থা। আল-হিজাজ থেকে ভূমধ্যসাগর বন্দর অভিমুখে পরিবহন চালানো হত। এছাড়া এই পথে ওরা বেশ কিছু উপনিবেশের পত্তন করেন।

ইজিকিয়েলে[১৬] যে 'কেদার' (হিব্রুতে কিদার)-এর কথা বলা রয়েছে বা অ্যাসিরিয় কালপঞ্জিতে[১৭] যে 'কিদরি'দের কথা বলা হয়েছে বা ধ্রুপদী সাহিত্যে যে 'সেদরাই'[১৮] এর কথা বলা হয়েছে, তারা উত্তর আরব জুড়ে শাসন করতেন। দামাস্কাসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'পালমিরেনা'য় তাদের বসবাসকেন্দ্র ছিল।

সলোমনের (৬:১৩, ১:৫; প্রথম কিংস ১:৩ তুলনীয়) উদ্দেশে নিবেদিত গানে যে 'শানম' সুন্দরীর রূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনিও সম্ভবত 'কেদার' উপজাতিভুক্ত এক আরবীয় ছিলেন। ইতিহাসও বলে, যে শেবা-রানি (আরবী বিলকিস) ইজরায়েলরাজকে দক্ষিণ আরবীয় (প্রথম কিংস ১০:১০; দ্বিতীয় ক্রনিকল ৯:৯) প্রথায় মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সদরদপ্তর আল ইয়ামানে বা ইথিওপিয়াতেও ছিল না, ছিল স্যাবিয়ান অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে

অথবা উত্তরাঞ্চলে মরুযাত্রীপথের সেনা ছাউনিতে। সলোমনের যুগ শেষ হওয়ার ২০০ বছর পর থেকে ইয়েমেনীয় রাজাদের কথা শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়।

জব ৬:১৯ অংশে শেবা (আরবী সাবা) তেমা-র সহযোগী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। প্রাচীন সেমেটিক প্রভাবিত বিশ্বের বহু সেরা কবিতার স্রষ্টা জব ছিলেন একজন আরব, ইহুদি নন। কবির নাম (আয়য়োব, আরবী আয়্যুব) এবং তার কবিতা উত্তর আরবীয় পটভূমি বিচার করলেই তা বোঝা যায়।[১] প্রবাদ বাক্যের সংযোজনীতে যে নীতিবচন[২] থাকে তা জাকাহপুত্র অ্যাগুর (প্রোভার্বস ৩০:১) এবং লেমুয়েলের (প্রোভার্বস ৩১:১) বাণী থাকে। এরা দুজনেই ছিলেন মাসা-রাজা। এই মাসারা ছিলেন ইসমায়েলের এক উপজাতি। এই দুজনের নামই প্রাচীন দক্ষিণ আরবীয় এবং মিনা শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বারুক ৩:২৩ উদ্ধৃত হয়েছে অ্যাগারিনস (অ্যাগারতনয় = হ্যাগার, অর্থাৎ — ইসমায়েলিয় অথবা উত্তর আরবীয়) যে, 'এরা পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের সূত্রপাত করতে চেয়েছিলেন।'

ওল্ড টেস্টামেন্টের 'কেদেম' এবং 'বেনে কেদেম' এর ইংরাজি সংস্করণে (জেনেসিস ২৯:১; নাম্বারস ২৩:৭; ইসাইয়া ১১:১৪; জাজস ৬:৩৩; ইজিকিয়েল ২৫:৪; জব ১:৩) অর্থ করা হয়েছে 'পূর্ব' এবং 'পূর্বের শিশু' বা 'পূর্বের জনগণ' ইত্যাদি। আরবীতে একে বলা হয় 'শারক' এবং 'শারকিয়ূন' (পূর্ব এবং পূর্ব প্রান্তস্থিত)। বিশেষভাবে এই শব্দদুটির অর্থ 'প্যালেস্টাইনের পূর্বদিকের বেদুইন এবং ভূমি'। সাধারণভাবে এই শব্দদুটির অর্থ 'আরব' এবং 'আরবীয় জনগণ'। আরবী শব্দ (শারক) থেকেই 'স্যারাসেন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এমন অন্তত ৬টি আরবী শব্দ প্রাচীন ইংরাজি শব্দমালায় স্থান পেয়েছে। নবম শতকে এই সব শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের আগে এইসব শব্দ আদানপ্রদানেরও এক ইতিহাস রয়েছে। তখন থেকেই আরব এবং আরবীয় জনগণ ছাড়াও অন্য দেশের ইতিহাসে এর প্রয়োগ হতে থাকে।[৩] যে জব-এর কবিতা এবং ন্যায়কথার বই সেকালে সেরা বলে গণ্য করা হত, তিনি ছিলেন 'বেনে কেদেম'দের (জব ১:৩) প্রধান। সলোমন তাঁর লেখায় এই 'বেনে কেদেম' উপজাতিগোষ্ঠীর (প্রথম কিংস ৪:৩০) ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ম্যাথু ২:১-এ উল্লিখিত 'পুবের জ্ঞানী মানুষ' হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁরা সম্ভবত পারস্য থেকে আসা ম্যাজাই জনগোষ্ঠীর লোক নন, বরং উত্তর আরবের মরুভূমি থেকে আসা বেদুইন।

ব্যাবিলনে ইহুদিদের নির্বাসনের যুগ পার হওয়ার পর যে সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে তাতে 'আরব' শব্দটি বলতে সচরাচর নাবাতিয়দেরই (দ্বিতীয় ম্যাকাবিজ ৫:৮; প্রথম ম্যাকাবিজ ৫:৩৯) বোঝানো হত। প্রথম ম্যাকাবিজ ৯:৩৫-এ উল্লিখিত হয়েছে, নাবাতিয়রা এরূপ ছিল। পলের আমলে নাবাতি রাজ্য দামাস্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে 'আরবীয়' অঞ্চলে পল অবসর নেন (গ্যালাসিয়ান ১:১৭) সেটা ছিল নিঃসন্দেহে নাবাতি রাজ্যেরই কোন জেলার মরুঅঞ্চল। প্রেরিত পুরুষের নিয়মবিধি ২:১১ অনুযায়ী আরবীয় জনগণও সকলেই সম্ভবত নাবাতি গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

● ধ্রুপদী সাহিত্যে

'অ্যারাবিয়া' এবং 'অ্যারাবিয়ান' শব্দদুটি গ্রিক এবং রোমানদের কাছে বহুল পরিচিত ছিল। আরবের বণিকরা বাণিজ্য করতে ভারত এবং চীনে যেতেন। তাঁরা যেসব পণ্য উৎপাদন করতেন পশ্চিমি বাজারে তা বিপুল দামে বিক্রি হত। আরবের অধিবাসীরা অনেকেই দক্ষিণের সমুদ্রে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে মধ্যস্থতার কাজ করতেন। কারণ তাঁদের আত্মীয় ফিনিশিয়রা আগে ভূমধ্যসাগরেই ব্যবসা করতেন।

ধ্রুপদী লেখকেরা আরবদেশটিকে তিনভাগে ভাগ করেন। অ্যারাবিয়া ফেলিক্স, অ্যারাবিয়া পেট্রিয়া, অ্যারাবিয়া ডেজার্টা। আসলে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে আরবে যে রাজনৈতিক বিভাজন হয় তার সাপেক্ষেই এই তিনভাগে বিভাজন করেছিলেন ধ্রুপদী লেখকেরা। প্রথমভাগটি ছিল স্বাধীন, দ্বিতীয়ভাগটি ছিল রোমের অধীন, তৃতীয়ভাগটি আংশিক পার্থিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল। 'অ্যারাবিয়া ডেজার্ট-র মধ্যে সিরিয়া-মেসোপটেমিয়ার (বাদিয়াহ্) মরুভূমিকে ধরা হয়। 'অ্যারাবিয়া পেট্রিয়া' গড়ে উঠেছিল সিনাই এবং নাবাতিয় রাজ্যকে ঘিরে। এর রাজধানী ছিল পেট্রা। আর 'অ্যারাবিয়া ফেলিক্স' গড়ে ওঠে বাকি আরব উপদ্বীপ নিয়ে। যার অভ্যন্তরটা তখনও ভাল করে জানাই ছিল না। এর সীমানা ছিল ইয়ামান পর্যন্ত। অঞ্চলটি ইউরোপে সুপরিচিত ছিল। 'অ্যারাবিয়া ফেলিক্স'-এর অর্থ সুখী আরবভূমি'। আর 'আরাবিয়া ডের্জাটা'-র অর্থ 'আরব্য মরুভূমি'। 'সুখী আরবভূমি' কিন্তু ইয়ামানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। 'সুখী'-র আরবি অর্থ থেকেই 'ইয়ামান' নামটির উৎপত্তি হয়। 'ইউমন' মানে 'সুখ'। আবার আরাবী ভাষায় 'ইয়ামান' শব্দের অর্থ 'ডান হাত'। অনেকে বলেন, অঞ্চলটির নাম ইয়ামান হয়, কারণ তা ডান পাশেই অবস্থিত ছিল। আল-হিজাজের দক্ষিণ দিকে। ঠিক তার বিপরীতে অর্থাৎ বাম দিকে ছিল সিরিয়া।[২২] হেরাক্লিয়ার[২৩] মার্সিয়ান (৪০০ খ্রিস্টাব্দ) 'সারাসেনি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। মার্সিয়ানের আগে টলেমি[২৪] একই শব্দ ব্যবহার করেন। অ্যান্টিয়োকের বাসিন্দা অ্যামিয়ানাস মার্সেলিনাস[২৫] চতুর্থ খ্রিস্টীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক লেখায় 'স্যারাসেন' (বেদুইন) এবং 'সিনাইট আরব' (যাযাবর আরব) দের এক করেই দেখেছিলেন।

গ্রিক সাহিত্যে আরবদের সম্পর্কে প্রথম লেখা লেখেন অ্যাস্কাইলাস[২৬] (৫২৫-৪৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। এক লেখায় তিনি জার্জেসের সেনাবাহিনীর এক বিশিষ্ট আরব অফিসারের কথা চিত্রায়ন করেন। হেরোডোটাসও[২৭] (৪৮৪-৪২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) জার্জেসের সেনাবাহিনীর এক আরব জওয়ানের কথা লেখেন, যার বাড়ি ছিল পূর্ব মিশরে।

গ্রিসের এরাতোস্থিনিস মৃত ১৯৬ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ থেকে শুরু করে রোমের প্লিনির মতো ধ্রুপদী লেখকরা আরবকে এক সমৃদ্ধশালী এবং বিলাসী ভূখণ্ড হিসেবেই দেখে এসেছেন। তাঁরা জানতেন, এটা ধূনা-গুগ্‌গুলের মতো দুষ্প্রাপ্য (সেকালে) গন্ধদ্রব্য এবং অন্য মশলার দেশ। এখানকার মানুষজন স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ভালবাসে। বাস্তবিকই পশ্চিমি লেখকদের যা বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হল, আরব মানুষজনের স্বাধীন মনোভাব। আরব জনগণের স্বাধীন মনোভাব বহুবার ইউরোপিয় লেখকদের প্রশংসা পেয়েছে। সেই সুদূর

ধ্রুপদী লেখকদের চোখে আরব দেশ

অতীত থেকে গিবনের[৩৮] সময় পর্যন্ত ইউরোপিয় লেখকরা আরবদের এই গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

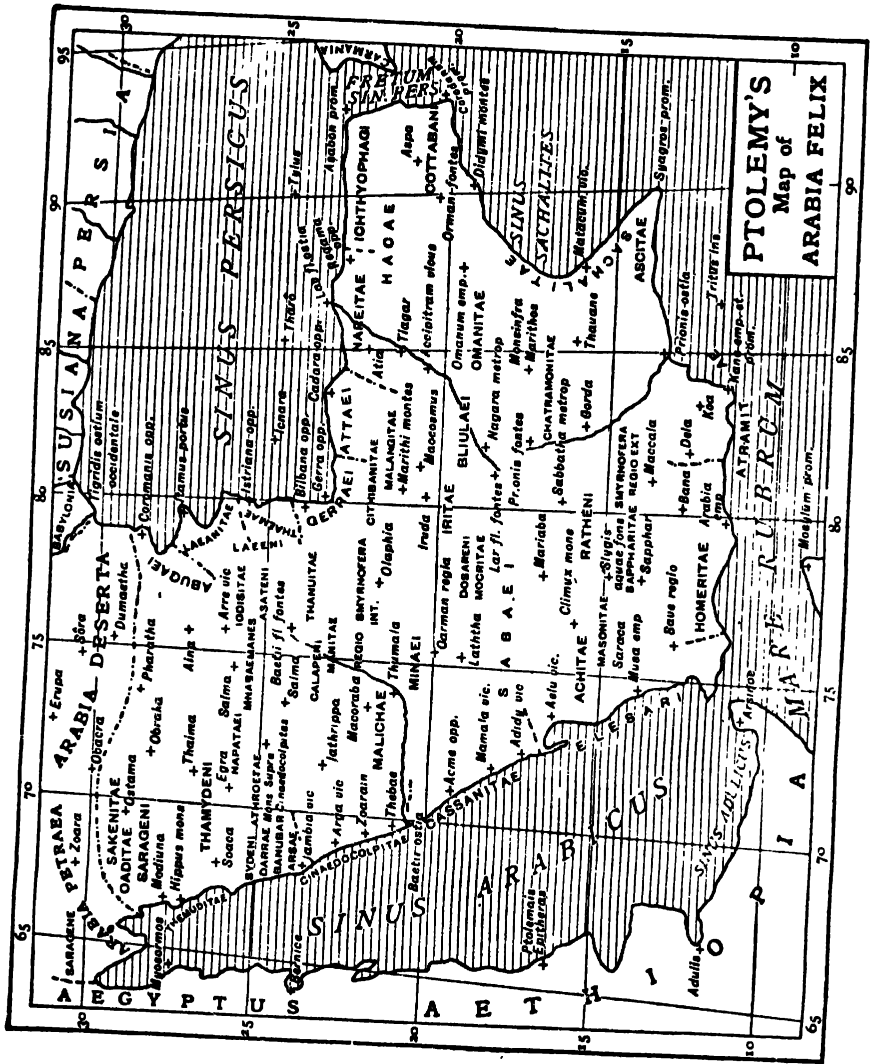
আরবরা যে তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই জাত এইসব গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তা বাইজানটাইন, ভারতীয় এবং চীনা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পারসি খসরুর সঙ্গে এক বিতর্কেই ধরা পড়ে। এই বিতর্কের অন্যভাগে ছিলেন আরবীয় বুদ্ধিজিবীরা। এই বিতর্কে আরবী প্রতিনিধিরা সবার প্রশংসা পেয়ে দেশের সুনাম বাড়িয়েছিলেন।[৩৯] ডিওডোরাস সিকুলাস[৪০] (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় অর্ধে বিকাশ লাভ করেছিলেন) বলেছিলেন 'আরবরা বেশ উঁচুদরের মানুষ এবং তাঁরা স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে জানেন।' স্ট্র্যাবো তাঁর 'জিওগ্রাফি'[৪১] বইতে লিখেছেন, 'আরবরাই একমাত্র জাতি যারা আলেকজাণ্ডারের কাছে তাঁদের দূত পাঠাননি। অথচ আলেকজাণ্ডার পরিকল্পনা করেছিলেন, আরব সাম্রাজ্য দখলের।[৪২]

● রোমান অভিযান

বিশ্বের সেরা বা 'প্রভু' বলে পরিচিত হলেও রোমানরা কিন্তু আরবদের স্কন্ধে দ্রুত জোয়াল চাপাতে ব্যর্থ হন। অগাস্ট সিজারের আমলে খ্রিস্টপূর্ব ২৪ অব্দে সেনাপ্রধান অ্যালিয়াস গ্যালাসের নেতৃত্বে ১০ হাজার রোমান সৈন্যবাহিনী মিশর থেকে আরবের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালায় তা ইতিহাসখ্যাত হয়ে রয়েছে। সেসময় রোমান সেন্যবাহিনীকে সমর্থন করে নাবাতি সেনারা। অথচ সেই অভিযানও ব্যর্থ হয়। ওই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণ আরবীয়দের একচেটিয়া আধিপত্যে থাকা পরিবহনপথ দখল করা এবং রোমের স্বার্থে আল ইয়ামানের সম্পদ দখল করা। দক্ষিণ আরবে প্রায় মাসখানেক ধরে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে রোমান সৈন্যবাহিনী "নেগরানা" (নাজরান) অঞ্চলে ফিরে আসে। এই জায়গাটি তারা আগেই দখল করেছিল। পরে নৌকা করে মিশরের সমুদ্রতীরে ফিরে যায়। ফিরতেই ৬০ দিন সময় লাগে। আরবের সর্বাধিক সীমা পৌঁছেছিল 'মারিয়াবা' পর্যন্ত। সম্ভবত তা সাবায়ী মহানগরী 'মা আরিব' নয়, বরং তা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের মারিয়ামা। গ্রিক ভূতাত্ত্বিক স্ট্র্যাবো রোমান সেনানায়ক গ্যালাসের বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন, আরবে প্রবেশের পথ চিনতেই দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী করে চলতে হয়। নাবাতি সরকারের মন্ত্রী সিলেয়াস ভুল পথে চালিত করেন সৈন্যদের।[৪৩] এভাবেই কোন ইউরোপিয় শক্তির প্রথম এবং শেষ গুরুত্বপূর্ণ ফৌজি অভিযান আরবের বিরুদ্ধে চালানো হয় ও তা ব্যর্থ হয়।

● সুরভি ভূখণ্ড

হেরোডোটাস[৪৪] মনে করতেন, 'সমগ্র আরব জুড়েই এক মধুর সুরভি বিরাজমান ছিল'। তিনি লিখেছেন, একমাত্র আরবদেশেরই উৎপাদন হত গুগ্‌গুল-ধুনা, মস্তকি, দারুচিনি, এলাচ এবং গোলাপ-নির্যাস। যেসব গাছে ধুনা-গুগ্‌গুল হত তা ডানাওয়ালা সাপেরা পাহারা দিত। গাছগুলি আকারে খুব ছোট ছিল। নানা রঙের গাছ। প্রায় প্রত্যেক গাছেই ঝুলত ধুনা-গুগ্‌গুল।[৪৫] তবে ভূতাত্ত্বিক স্ট্র্যাবো বলেছেন, হেরোডোটাস একটু বেশি আবেগময় হয়ে অনেক কথা অতিরঞ্জিত করে লিখেছেন। তিনিও মনে করতেন, দক্ষিণ আরব ছিল গন্ধদ্রব্যের খনি।[৪৬] কিন্তু সাপ উড়তে পারত একথা তিনি মানেননি। তিনি বলেছেন. খুব ছোট ছোট সাপ মানুষের কোমরের সমান উঁচু পর্যন্ত লাফাত।[৪৭] ডিওডোরাস সিকুলাস[৪৮] বলেছেন, রন্ধন-মশলার দ্রব্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে আরবের মাটি খুব উর্বর এবং যথোপযুক্ত ছিল। প্লিনি তার 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি'তে (BK. VI) লিখেছেন, আরবদেশের বৈশিষ্ট্যের কথা।[৪৯] তিনি প্রসঙ্গত লিখেছেন, ধুনো উৎপাদনে জড়িত থাকার কারণে আরবদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'সাবায়ী' জনগোষ্ঠী ছিল সবচেয়ে পরিচিত।[৫০] সমকালে হাযরামাওত ছিল উৎকৃষ্ট ধুনা উৎপাদনকারী দেশ। গ্রিক এবং রোমানরা মনে করতেন, আরবেরা যেসব পণ্যের বাণিজ্য করেন তা তাঁদের একান্ত নিজস্ব জিনিস। তাই বণিকরা অ্যাবিসিনিয়া এবং ভারতে তাঁদের পণ্য পাঠানোর সময় কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। ব্যবসাও ছিল পুরোদস্তুর একচেটিয়া।



ওই ধ্রুপদী লেখকরা দক্ষিণ আরবের ধনসম্পদ নিয়ে বেশ উল্লসিত ছিলেন। স্ট্র্যাবো[৫১] লিখেছেন, আরবের শহরগুলি ছিল সুন্দর সুন্দর মন্দির এবং প্রাসাদে ভর্তি। প্লিনিও[৫২] একই কথা লিখেছেন। তিনি আবার রোমান সেনানায়ক গ্যালাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন।

● সোনা

ধুনা এবং রন্ধন মশলার জন্য আরব যেমন বিখ্যাত ছিল তেমনই তার খনিজ পদার্থও কম ছিল না। বিশেষত সোনা ছিল আরবদের অহংকার। পশ্চিম উপকূল বরাবর মিদিয়ান থেকে আল-ইয়ামান পর্যন্ত এবং কিছু পরিমাণে মধ্য আরবেও প্রচুর সোনা পাওয়া যেত। ডিওডোরাস[৫৩] লিখেছেন, আরবদের খনিজ সোনা এত খাঁটি ছিল যে তা গলানোর দরকার হত না। আল-মাকদিসি[৫৪] এবং আল-হামদান[৫৫] (দশম শতকে) তাঁদের গ্রন্থদুটিতে আরবের সমৃদ্ধশালী খনিজপদার্থ নিয়ে একটি করে অধ্যায় লিখেছেন। বিশেষত সেখানে সোনার কথাই বলা হয়েছে।

গ্রিক ও লাতিন ইতিহাসেও এই নিয়ে অনেক কথা লেখা আছে। স্ট্র্যাবো[৫৬] লিখেছেন, দক্ষিণ আরবে এক-একজন মহিলার বহু পুরুষকে বিবাহের প্রচলন ছিল। সব ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। লোক শান্তিতেই জীবন কাটাতেন। পরিবারের কর্তা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। মদ্যপানের খুব প্রচলন ছিল। বেশিরভাগ মদ তৈরি হত খেজুর থেকে। জলপাই তেলের বদলে তিল তেলের খুব ব্যবহাব ছিল।[৫৭]

টলেমি ১৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত আঙ্গিকে তথ্য ও ব্যক্তিগত অনুভূতির আলোকে লিখেছেন আরবদের বণিক এবং পর্যটকের কথা। এশিয়া ও ইউরোপে তাঁর ভৌগোলিক ধ্যানধারণা দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত আছে। টলেমির তৈরি করা মানচিত্রই আরবের প্রথম মানচিত্র, যা থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

● টীকা ●

১ দেখুন কার্লটন এস. কুন এর 'দ্য রেসেস অব ইউরোপ' (নিউইয়র্ক, ১৯৩৯) ৪০৩-৪, ৪০৮ পৃষ্ঠা।

২ ডি ডি লাকেনবিল, অ্যানসিয়েন্ট রেকর্ডস অব অ্যাসিরিয়া অ্যাণ্ড ব্যাবিলনিয়া, ২য় খণ্ড (শিকাগো, ১৯২৭), নতুন ভাগ ১৭, ১১৮।

৩ প্লিনি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩২ অধ্যায়

৪ ওই দ্বিতীয় খণ্ড, ১০২ অধ্যায়।

৫ জেনেসিসে বর্ণিত হাসারমাওয়েথ ১০:২৬।

৬ আধুনিক কালে সমগ্র ধুনা উৎপাদক উপকূল বলতে আল-শিহ্রকে বোঝায়। এর সঙ্গে রয়েছে মাহরাহ্ এবং জাফার।

৭ দেখুন ইয়াকৃত, বুলদান, ৩য় খণ্ড, ৫৭৬-৫৭৭ পৃঃ।

৮ দেখুন F Thureau–Dangin, Les inscriptions de Sumer et d'Akkad (প্যারিস,

১৯০৫), ২৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

৯ লাকেনবিল, ১ম খণ্ড, নতুন ভাগ ৬১১।

১০ Ditlef Nielson, Handbuch der altarabischen Altertumskunie, Vol. I Die altarabische Kultur (Copenhagen. 1927) P. 65.

১১ লাকেনবিল, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ১৭।

১২ লাকেনবিল, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ১৮।

১৩ নাইলসন, Handbuch, প্রথম খণ্ড, ৭৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

১৪ লাকেনবিল, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ৯৪৬।

১৫ ওই, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ৫৫৮।

১৬ BK. III, ১০৯ অধ্যায়।

১৭ R P. Dougherty. Nabonidus and Belshazzar (New Haven. 1929) ১০৬-৭ পৃষ্ঠা।

১৮ BK. III. অধ্যায় ৮৮।

১৯ জি এ কুক : এ টেক্সটবুক অব নর্থ সেমিটিক ইনস্ক্রিপশন (অক্সফোর্ড, ১৯০৩), ১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা।

২০ Hos 9:10; Jer 2:2; Deut 32:10

২১ B. Moritz in Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft, n. ser. Vol III (1926) P 81 seq.; D. S. Margoliouth, The Relations between Arabs Israelites (London, 1924), P.P 8, 15, consult James A. Montgomery, Arabia and the Bible (Philadelphia, 1934), pp 149 seq

২২ Ex 3.1, 18:10-12

২৩ Ex 3:18, 5:1; Num 10:35-6

২৪ লাকেনবিল, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ২৪০ পৃঃ।

২৫ Neh 2:19, 4:7.

২৬ Is 21:16, Gen 25:13.

২৭ লাকেনবিল, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ৮২০, ৮৬৯ পৃঃ।

২৮ প্লিনি, ৫ খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়।

২৯ প্রাচীন হিব্রু কবিতায় এমন কিছু আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ছিল যা আরবী কবিতার অনুরূপ। উভয় কবিতাতেই পরস্পর অন্তমিলবিশিষ্ট দুটি চরণ থাকত। মধ্যযুগে হিব্রু ব্যাকরণ আরবী ব্যাকরণ রীতি মেনে বিন্যস্ত করা হয়।

৩০ সেগুলি লুকমানের নীতিকথার সঙ্গে তুলনীয়, কোরান ৩১:১১।

৩১ এই বইতে 'হিস্ট্রি অব দি সারাসেন', 'সারাসেনিক আর্ট', 'সারাসেনিক আর্কিটেকচার' ইত্যাদির

মতো কিছু শব্দ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই উপদ্বীপের অধিবাসীদের 'অ্যারাবিয়ান' নামে অভিহিত করার এক চেষ্টাও রয়েছে এই বইতে। আর যারা আরবী ভাষায় কথা বলতেন (বিশেষত মুসলিমরা) তাদের বলা হয়েছে 'আরব'। মুসলিম বোঝাতে 'মহামেডান' শব্দটি ব্যবহার করা এই লেখকের কাছে আপত্তিকর।

৩২ সাবাই (স্যাবিয়ান), মিনাই (মিনাইয়ান), হোমারিটাই (হিমিয়ারাইটস), সিনিটাই (তাঁবুর বাসিন্দা = বেদুইন), নাবাতি (ন্যাবাটিয়ান), ক্যাটাব্যানাই (কাতাবানাইটস), ক্যাট্রামটিটাই (হাযরামাওতের লোক), ওমানাইট (উমানাইটস), স্যাকালিটাই (দক্ষিণ উপকূল অঞ্চল, মধ্যযুগে যাকে বলত আল-শিহ্‌র—সেখানকার অধিবাসী)—গ্রিক ও রোমান ভূগোল এবং ইতিহাসে এইসব নামই পাওয়া যায়।

৩৩ পেরিপ্লাস অব দি আউটার সি, অনুবাদ : উইলফ্রেড এইচ. স্কফ (ফিলাডেলফিয়া, ১৯২৭), নতুন ভাগ ১৭ক।

৩৪ জিওগ্র্যাফিয়া, ক্যারোলাস এফ. এ. নব সম্পাদিত ২ খণ্ড (লিপজিগ, ১৮৮৭), পঞ্চম গ্রন্থ, অধ্যায় ১৭'নতুন ভাগ, ৩।

৩৫ Rerum gestarum, BK XXII, Ch 15, new sec. 2; BK. XXIII. Ch. 6, new sec. 13.

৩৬ পার্সিয়ান, ১.৩২০।

৩৭ BK. VII, new sec. 69

৩৮ এডওয়ার্ড গিবন; দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার, সম্পাদনা জে বি বারি (লন্ডন, ১৮৯৮) পঞ্চম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ।

৩৯ ইবন-আবদ-রাব্বিহি, আল-ইকদ আল-ফরীদ (কায়রো, ১৩০২), ১ম খণ্ড, ১২৫ পৃঃ।

৪০ Biblio-theca historica, BK II ch I. new sec. 5

৪১ BK XVI, ch 1, new sec. II

৪২ BK XVI, ch 4, new sec. 27

৪৩ BK XVI, ch 4, new sec. 23

৪৪ BK III, ch. 113

৪৫ BK III, ch 107

৪৬ BK XVI, ch 4, new section 25

৪৭ BK II, ch 4, new sec. 19

৪৮ BK II, ch 49, new sections 2-3

৪৯ BK XII, ch 30

৫০ BK VI, ch 32

৫১ BK. XVI. ch 4. new sec. 3

৫২ BK. VI. ch 32

৫৩ BK II, ch 50, new sec. 1

৫৪ আহ্সান আল-তাকাসীম, সম্পাদনা : দ্য গোজি (লিডেন, ১৮৭৭), ১০১-২ পৃষ্ঠা।

৫৫ সিফাত জাযিরাত আল-আরাব, সম্পাদনা : ডি. এইচ. ম্যুলার (লিডেন, ১৮৮৪), ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

৫৬ BK XVI, ch 4; new sec. 25

৫৭ ওই : new sec. ২৬; প্লিনি, ৬ খণ্ড, ৩২ অধ্যায়।

॥ অধ্যায় ৫ ॥

দক্ষিণ আরবের সাবায়ী ও অন্যান্য রাজ্যসমূহ

● ব্যবসায়ী হিসেবে দক্ষিণ আরবীয়দের ভূমিকা

আরবীয় হিসেবে স্যাবিয়ানরাই সর্বপ্রথম সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের কীলকাকার শিলালিপিতে তাদের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রিক সাহিত্যে থিওফ্রেসটাস (মৃ. খ্রিঃ পূঃ ২৮৮) রচিত হিস্টোরিয়া প্ল্যানটারাম[১]-এ তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে পুরানো প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তটিই ছিল স্যাবিয়ানদের প্রাচীন আশ্রয়স্থল।

বৃষ্টির আনুকূল্য প্রাপ্ত সেই মনোরম অঞ্চলটির উর্বরতা, সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থান এবং ভারতে যাবাব পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থলে অবস্থিতি এর উন্নতির ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল। এখানে মশলাপাতি, উদ্ভিজ্জ আঠা এবং মরশুমি খাদ্য অথবা রাজদরবারের অনুষ্ঠানে বা গির্জার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য সুগন্ধি দ্রব্য উৎপন্ন হত। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ধূপকাঠি এবং প্রাচীনকালে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটিই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান দ্রব্য। সেই সময়ে পারস্য উপসাগর থেকে মুক্তো, ভারত থেকে গুঁড়ো মশলা, আচার, চাটনি, কাসুন্দি, জামা-কাপড়, তরবারি, চীনদেশ থেকে রেশম, ইথিওপিয়া থেকে ক্রীতদাস, বানর, হাতির দাঁত, সোনা, উট পাখির পালকের মতো বিরল ও দুর্মূল্য বস্তু পশ্চিমি বাজারে সরবরাহ করা হত। দি পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী[২] নামক বইটির রচয়িতা (৫০-৬০ খ্রিঃ) আমাদের জন্য 'মুজা' অর্থাৎ বর্তমান 'মুখা' (মোছা)-র বাজারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন : "সেখানে যে সমস্ত পণ্য আমদানি করা হত তার মধ্যে সূক্ষ্ম ও মোটা ধরনের বেগনি কাপড়-জামা; সাদামাটা, সাধারণ, নকশা করা ও সোনায় মোড়া আস্তিনওয়ালা আরবীয় পোশাক, জাফরান, মিষ্টি, মসলিন, আলখাল্লা, কম্বল (অল্প)—খুব সাধারণ ও স্থানীয় নকশা অনুযায়ী প্রস্তুত বিভিন্ন রঙের পাগড়ি, মাঝারি পরিমাণে সুগন্ধি ক্রীম এবং স্বল্প পরিমাণে মদ ও গম ছিল প্রধান।"

স্যাবিয়ানরা ছিল দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলের ফিনিশিয়। তারা এই সমুদ্রের বিভিন্ন গমনপথ, চড়া ও বন্দর সম্পর্কে জানত এবং বিশ্বাসঘাতক মৌসুমি বায়ুর চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আর সেই কারণেই খ্রিস্টের জন্মের আগে প্রায় ১২৫০ বছর ধরে তারা এই সমুদ্রপথে একচেটিয়া ভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চালাত। জলপথে গোটা আরবকে প্রদক্ষিণ করার ঘটনাটি তাত্ত্বিক

দিক থেকে সম্ভব বলে বর্ণনা করেছিলেন নিয়ারকাস নামে আলেকজান্দারের সেনাবাহিনীর এক প্রধান। আর ফিনিশিয়রা তাকে বাস্তব দিক থেকে সম্ভব করে তুলেছিল। গ্রিক ও রোমান নাবিকদের কাছে ধুনো-উৎপাদনকারী অঞ্চলটি ছিল পর্বতসঙ্কুল ও নিষিদ্ধ[৩]। পেরিপ্লাস[৪]-এর মতানুযায়ী, "আরবের গোটা উপকূল বরাবর নৌ-চালনা ছিল খুবই বিপজ্জনক। কারণ সেখানে কোন বন্দর ছিল না, প্রবল ঢেউ ও বড় বড় পাহাড়ের জন্য নোঙর ফেলার জায়গাও ছিল খুবই খারাপ, নোংরা ও দুর্গম এবং সমস্ত দিক থেকেই ভয়ংকর।"

লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে মূল সমুদ্রপথটি বাব আল-মান্দাব থেকে মধ্য-মিশরের উপকূলে অবস্থিত ওয়াদি আল-হাম্মামাত পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এই সমুদ্রপথে, বিশেষত এর উত্তরাঞ্চলে নৌ-চালনার আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির ফলে স্যাবিয়ানরা উপদ্বীপটির পশ্চিম উপকূল বরাবর আল-ইয়ামান ও সিরিয়ার মধ্যে স্থলপথ গড়ে তুলেছিল, যেটি মক্কা ও পেত্রার মধ্য দিয়ে গিয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তরপ্রান্তে মিশর, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সিরিয় শাখাপথটি গাজ্জা (গাজা)-তে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে গিয়ে মিশেছিল। বিশেষ করে ধুনোয় সমৃদ্ধ হাযরামাওত থেকে একটি মরুপথ স্যাবিয়ান রাজধানী মাআরিব-এ গিয়ে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থলপথটিতে বেশ কয়েকটি স্যাবিয়ান উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। অ্যাসিরিয় ও হিব্রু তথ্যাবলিতে যে স্যাবিয়ানদের কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত এই স্যাবিয়ান উপনিবেশগুলি থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছিল। জিলিড থেকে আগত ইসমাইলী মরুযাত্রী এবং মশলাপাতি, বেদনা-উপশমকারী সুগন্ধি মলম ও ধুনো বহনকারী উটদলের একটি ঐতিহাসিক দলিল আমাদের জন্য জেনেসিস ৩৭:২৫-এ সংরক্ষিত আছে।

● দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপি

দক্ষিণ আরবীয়রা ব্যবসা ও বাণিজ্যে খ্যাতি লাভ করেছিল। যে রাজত্ব তারা গড়ে তুলেছিল সেগুলি সামরিক রাজ্য ছিল না। প্রাচীন সেমেটিয় ও গ্রিক-রোমান সাহিত্যে উল্লিখিত প্রসঙ্গ, প্রথম দিককার মুসলিম সাহিত্য, বিশেষত ওয়াহাব ইবন-মুনাব্বিহ্ (মৃ. সানা-তে, আনুমানিক ৭২৮ খ্রিঃ), আল-হামদানি[১] (মৃ. ৯৪৫ খ্রিঃ) এবং আল-হিময়ারি (মৃ ১১৭৭ খ্রিঃ)-র রচনাবলিতে সংরক্ষিত আধা-রূপকথা, সর্বোপরি হালেভি ও গ্লেসার-এর আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সহজবোধ্য স্থানীয় উপাদানগুলি থেকে তাদের ইতিহাসের একটি চিত্রময় রূপরেখা অঙ্কন করা যায়। এই সমস্ত দক্ষিণ আরবীয় সাহিত্য ধাতু অথবা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ। বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য উৎকীর্ণ করার জন্য যে-ধরনের উপাদানই ব্যবহার করা হয়ে থাক না কেন, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনের বয়স খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক। এই লিপিগুলি লেখা হত একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই সমস্ত শিলালিপিগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) শপথমূলক বা ব্রত

উদযাপনকল্পে স্থাপিত, মন্দিরে স্থাপিত, ব্রোঞ্জের ফলকে খোদাই করা এবং আলমাকাহ্ (ইলমুকাহ্), আসতার ও শামসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, (২) স্থাপত্যমূলক, মন্দিরের দেওয়ালে ও অন্যান্য সাধারণ স্মৃতিস্তম্ভে প্রস্তুতকারক বা প্রস্তুতের জন্য অর্থ দানকারীর নাম খোদাই করা, (৩) ঐতিহাসিক, একটি যুদ্ধের বর্ণনা বা বিজয় ঘোষণা, (৪) শহরের প্রবেশপথে স্তম্ভে খোদিত পুলিশি আইনবিধি, (৫) সমাধিস্থলের সঙ্গে যুক্ত অন্ত্যেষ্টিমূলক। অবশ্য অল্প কয়েকটি আইনমূলক শিলালিপি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলির মধ্য দিয়ে আইনগত ধ্যানধারণার বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটিত হয়েছে।



নাকাব আল-হাজার-এর ধ্বংসাবশেষ পাথরে উৎকীর্ণ লিপির দুটি পংক্তি, যার মাধ্যমে ইউরোপের মানুষ প্রথম দক্ষিণ আরবীয় লিপির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে।

কারস্টেন নিবুর সর্বপ্রথম দক্ষিণ আববীয় শিলালিপির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন (১৭৭২)। এলিয়াস গ্যালাস (খ্রিঃপূঃ ২৪)-এর পর জোসেফ হালেভি ছিলেন প্রথম ইউরোপিয় যিনি আল-ইয়ামানে অবস্থিত নাজরান দর্শন করেছিলেন (১৮৬৯-৭০ খ্রিঃ) এবং ৩৭টি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে ৬৮৫ টি লিপির অনুকৃতি নিয়ে এসেছিলেন। ১৮৮২ ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এডুয়ার্ড গ্লেসার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়ে চারবার আল-ইয়ামানে গিয়েছিলেন এবং ২০০০ লিপি নিয়ে এসেছিলেন। তার বেশ কিছু এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। বর্তমানে আমাদের হাতে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ৪০০০ লিপি রয়েছে। মাআরিব-এর ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কর্তা টমাস এস আরনাউদ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৬০টি শিলালিপির অনুকৃতি তৈরি করেছিলেন। জেমস আর. ওয়েলস্টেড নামে এক ইংরেজ নৌসেনাপতি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে নাকাব আল-হাজার-এর শিলালিপির একটি অংশ প্রকাশ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমেই ইউরোপ পেয়েছিল দক্ষিণ আরবীয় সাহিত্যকীর্তির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এই লিপিগুলির অর্থ উদ্ধার করেছিলেন হ্যালের অধিবাসী এমিল রডিজার (১৮৩৭) ও জেসেনিয়াস (১৮৪১)।

এই লিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনাও-স্যাবিয়ান ভাষা-র (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত)-র বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল। বর্ণগুলির আকার ছিল অনেকটা প্রথম দিকের কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো; এটা এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় বর্ণমালা ও তার মিশরিয় পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসমঞ্জস্য ও ঋজুরেখ অক্ষরগুলি (আল-মুসনাদ) একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে[৮] নির্দেশ করে। অন্যান্য সেমেটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপিয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আবার এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপিয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপিয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরানো সেমেটিয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়ামান সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার অবলুপ্তি ঘটে ও তার স্থান দখল করে উত্তর আরবীয় ভাষা। 'সুক উকাজ'-এর মতো উত্তরের সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক তীর্থযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।

● (১) সাবায়ী রাজ্য

দক্ষিণ আরবীয় প্রাচীনত্বের আবরণ ভেদ করে যে দুটি বড় রাজত্ব আবির্ভূত হয়েছিল তা হল সাবায়ী ও মিনায়ী রাজত্ব। তাদের গোটা রাজত্বকালের একটা বিরাট সময় ধরে দুটি রাজত্ব ছিল সমসাময়িক। দুটি রাজত্বই পুরোহিত তন্ত্রের অধীনে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার দিকেই এগিয়ে যায়।

সাবায়ীরা ছিল সমগ্র দক্ষিণ আরবীয় পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত শাখাবিশেষ। ইয়ামান জেলায় অবস্থিত নাজরান-এর দক্ষিণে সাবা বা বাইবেল কথিত শেবা ছিল তাদের মূল বাসভূমি। আরবীয় পণ্ডিতেরা নিম্নগামী (বা সংক্ষিপ্ত) কালনির্ঘণ্টে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের মতে সাবায়ী রাজত্ব প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। শুধুমাত্র খ্রিস্টপূর্ব ৬১০ নাগাদ রাজ-উপাধির কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। আর মিনায়ী রাজত্বের স্থায়িত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত।[৯] রাজ্যের প্রধান পুরোহিত-রাজার উপাধি ছিল মুকাররিব[১০]। দ্বিতীয় সারগন ও সেন্নাচেরিব[১১]-এর অ্যাসিরিয় বর্ষপঞ্জিতে প্রথম দুই সাবায়ী মুকাররিব ইয়াথা-আমর ও কারিবা-ইল-এর উল্লেখ আছে। এবং তারা যথাক্রমে খ্রিঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে ও খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করেছিলেন। তাদের চরম উন্নতির সময়ে সাবা-র রাজারা গোটা দক্ষিণ আরবে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং তাদের প্রতিবেশী মিনায়ী রাজ্যকে একটি সামন্ত রাজ্যে

Sinaitic	South Arabic	Phoenician	Ra's al-Shamrah	Later Greek	Latin	Arabic
					A	ا
					B	ب
					CG	ج
					D	د
					E	ه
					FV	و
					...	ز
					H	ح
...					...	ط
					I	ي
					...	ك
					L	ل
					M	م
					N	ن
					X	...
					O	ع
					P	ف
				...	...	ص
					Q	ق
					R	ر
					S	س ش
					T	ت

Constructed with the aid of G. Vinton Duffield

A TABLE OF ALPHABETS, INCLUDING RA'S AL-SHAMRAH CUNEIFORM

পরিণত করেছিলেন। মাআরিব-এর পশ্চিমে একদিনের যাত্রাপথের দূরত্বে অবস্থিত সারওয়া ছিল সাবা-র রাজধানী। চন্দ্র-দেবতা আলমাকাহ[১০]-এর মন্দিরটি ছিল সেখানকার প্রধান প্রাসাদ। বর্তমানে আল-খারিবাহ্ নামে পরিচিত এখানকার প্রধান ধ্বংসস্তূপটিতে ১০০ জন মানুষের একটি গ্রাম অবস্থিত ছিল। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এর চারপাশের প্রাচীরটি তৈরি করেছিলেন ইয়াদা-ইল নামে প্রথম দিককার এক মুকাররিব। আরেকটি শিলালিপি করিবা-ইল ওয়াতার (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৪৫০)-এর বিজয় অভিযানের উল্লেখ আছে। এই কারিবা-ইল প্রথম "এম এল কে (রাজা) সাবা" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

● মাআরিব বাঁধ

সাবায়ী রাজত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬১০-১১৫) শাসকেরা তাদের ধর্মীয় চরিত্র সম্পূর্ণ খুইয়ে ফেলেছিল। সানা-র ৬০ মাইল পূর্বে অবস্থিত মাআরিব তখন ওই রাজ্যের রাজধানী। শহরটি সমুদ্রতল থেকে ৩,৯০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ছিল। অল্প কয়েকজন ইউরোপিয় এই শহরটি দর্শন করেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন আরনাউড, হালেভি ও গ্লেসার। ভূমধ্যসাগরের বন্দর বিশেষত গাজ্জার সঙ্গে ধুনো-উৎপাদক রাজ্যগুলির যোগাযোগ স্থাপন করেছে যে সমস্ত বাণিজ্য-পথগুলি, এটি ছিল তাদের মিলনকেন্দ্র। আল-হামদানি তাঁর রচিত ইকলিল[১১]-এ উল্লেখ করেছেন, মাআরিব-এর তিনটি দুর্গের, কিন্তু এই শহরটি বিশেষ করে এখানকার সাদ মাআরিব[১২] নামে বিরাট বাঁধটির জন্য বিখ্যাত। এই উল্লেখযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকর্ম ও সাবায়ীদের অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম আমাদের এমন একটি শান্তিকামী সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় যেটি শুধু বাণিজ্যেই নয়, এমনকী কারিগরি কলাকৌশলেও চরম উন্নতি লাভ করেছিল। বাঁধটির পুরানো অংশগুলি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয়েছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সাম-হুয়ালে ইয়ানুফ ও তার পুত্র ইয়াথা-আমর বায়্যিন ছিলেন প্রধান নির্মাতা এবং দ্বিতীয় শারাহ্বি ইয়াফুর (৪৪৯-৪৫০ খ্রিঃ) এবং আবিসিনিয়ার অধিপতি আবরাহা (৫৪৩ খ্রিঃ)-এর আমলে বাঁধটির সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু আল-হামদানি এবং তারপর আল-মাসউদী[১৩], আল-ইসফাহানি[১৪] ও ইয়াকূত[১৫] প্রমুখ লুকমান ইব্ন-আদ নামে এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে এই বাঁধের নির্মাতা বলে গণ্য করেছেন।

● (২) মিনায়ী রাজ্য

আল-ইয়ামানে অবস্থিত জওফ নামক অঞ্চলটিতে মিনায়ীদের বিকাশ ঘটেছিল। এর সমৃদ্ধির যুগে দক্ষিণ আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূল আরবী শব্দ মাআন (একটি জায়গার নাম হিসেবে বাইবেল কথিত মাওন, মিউন, মিইন) পরবর্তীকালে 'মাইন' বলে প্রচলিত হয়। 'মাইন' শব্দের অর্থ ঝরনার জল। উত্তরের বাণিজ্যপথে অবস্থিত

বর্তমানে 'মাআন' (পেট্রার দক্ষিণ-পূর্বে) বলে পরিচিত এক গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ-এর নামের মধ্যেই ওই নামটি বেঁচে আছে। আল-উলা[১৮] ও তাবুক-এর কাছে অবস্থিত মিনায়ী শিলালিপি এই অঞ্চলে বহু উপনিবেশের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। এই উপনিবেশগুলি সেই সময়ে গুদামঘর ও বদলি ডাকঘর রূপে কাজ করত। মিনায়ী রাজ্যের রাজধানী ছিল কারনাও। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে হালেভি ওই রাজধানী দর্শন করেছিলেন। সেটিই বর্তমানে 'মাইন' (সানআ-র উত্তর-পূর্বে, আল-জওফের দক্ষিণে অবস্থিত) নামে পরিচিত। ধর্মচর্চার রাজধানী ইয়াসিলও দক্ষিণ আল-জওফে অবস্থিত এবং বর্তমানে সেটি বারাকিশ নামে পরিচিত। মাআরিব-এর উত্তর-পশ্চিমে বারাকিশ অবস্থিত। মিনায়ী রাজ্যের মানুষেরা পরবর্তীকালের সাবায়ীদের মতো একই ভাষায় কথা বলে; উভয়ের ভাষার মধ্যে কেবল স্থানীয় বাচনগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তথাকথিত মিনায়ী শিলালিপি আসলে কাতাবানিয়ান শিলালিপি এবং বেশ কিছু হাযরামাওতের মূল পাঠকে বোঝায়। আল-জওফের প্রাদেশিক রাজধানী আল-হার্জমের ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের গায়ে খোদিত ছবিতে ঝুলন্ত পাত্র, (সম্ভবত মদ উৎসর্গের) হরিণ ও বলিদানের জন্য অন্যান্য পশু, দিব্যশক্তির প্রতীকরূপী সাপ, মন্দিরের দেবদাসী রূপী নৃত্যরতা যুবতী ও পবিত্র পার্কে রক্ষিত উটপাখি দেখতে পাওয়া যায়।

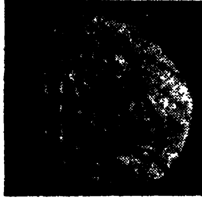
● (৩) কাতাবান ও হাযরামাওত

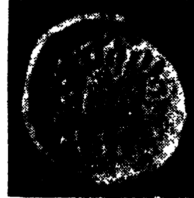
মিনায়ী ও সাবায়ী রাজ্য ছাড়াও এই অঞ্চলে কাতাবান ও হাযরামাওত নামে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। কাতাবান রাজ্যটি আদান-এর পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল, আর হাযরামাওত অবস্থিত ছিল সেখানেই এখন যেখানে সেটি রয়েছে। কাতাবান রাজ্য[১৯] প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০-৪৫০ পর্যন্ত টিঁকে ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তামনা (এখন কুহলান); হাযরামাওত-এর রাজধানী ছিল শাবওয়া (প্রাচীন সাবোতা) এবং ওই রাজত্ব খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রথম খ্রিস্টীয় শতকের শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। মাঝে মাঝে এই রাজ্যগুলি সাবায়ী ও মিনায়ী রাজাদের অধীনে ছিল। এই সমস্ত মানুষগুলি যাদের শিলালিপিগুলি উত্তর আরব থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল, যারা মশলার বাণিজ্যের ব্যবস্থা করেছিল এবং বিস্ময়কর জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিল, আরবীয় ঐতিহাসিকেরা তাদের সম্পর্কে কিছুই জানত না।

● (৪) হিময়ারীয় রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ থেকে পরবর্তী দিনগুলিতে গোটা অঞ্চলটি দক্ষিণ-পশ্চিমের উচ্চভূমি থেকে আগত হিময়ার উপজাতিভুক্ত নতুন শাসকদের অধীনে আসে। তখন থেকেই সভ্যতাটি 'হিময়ারাইট' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য রাজ-উপাধিটি তখনও 'সাবা-র রাজা ও যূ-রায়দান'-ই রয়ে যায়; রায়দান পরবর্তীকালে কাতাবান নামে পরিচিত হয়। এরমধ্য দিয়েই প্রথম

হিময়ারাইট রাজত্বের সূচনা হয় এবং প্রায় ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা টিঁকে ছিল। 'হোমেরিটে' শব্দটি দি পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী (৬০ খ্রিঃ নাগাদ) নামের বইতে প্রথম এবং পরে প্লিনির লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। হিময়ারাইটরা ছিল সাবায়ীদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি এবং ওই প্রজাতির সবচেয়ে তরুণ প্রজন্ম হিসেবে তারাই মিনায়ী সাবায়ী সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের উত্তরসূরি হয়ে ওঠে। তাদের ব্যবহৃত ভাষাও ছিল সাবায়ী ও মিনায়ীদের ভাষার মতো। প্লিনি-র লেখাতে কৃষিকাজের যে উল্লেখ আছে, শিলালিপিতে উল্লিখিত কুয়ো, বাঁধ ও জলধারা তার সত্যতা প্রমাণ করে। ধর্মীয় কাজ হিসেবে পরিগণিত ধুনো সংগ্রহ ছিল তখনও রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস।





হিময়ারাইট রুপোর মুদ্রা

হিময়ারাইট রাজবংশের রাজধানী ছিল জাফার (প্রাচীন স্যাপফার ও স্যাফার, জেনেসিস ১০:৩০-এ উল্লিখিত সেফার)। এটি ছিল মুখা-র ১০০ মাইল উত্তর-পূর্বে সানআ-তে যাবার পথে অবস্থিত। হিময়ারাইটরা সাবায়ীদের হাত থেকে মাআরিব ও মিনায়ীদের হাত থেকে কারনাও দখল করে নিয়েছিল। ইয়ারিম নামে আধুনিক শহরটির কাছে একটি বৃত্তাকার পাহাড়ের চূড়ায় এর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। দি পেরিপ্লাস নামে বইটি রচনার সময় এদের রাজা ছিল করিবা-ইল ওয়াতার (পেরিপ্লাসে বর্ণিত 'চ্যারিবায়েল')।

এই হিময়ারাইটদের শাসনকালেই এলিয়াস গ্যালাসের নেতৃত্বাধীন দুর্ভাগ্য-তাড়িত রোমান বাহিনী সুদূর মারিয়ামা পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করেছিল। সেই সময়কার শাসক স্ট্রাবো-র ইলাসেরাস-ই হলেন শিলালিপিতে উল্লিখিত ইলিশারিহা ইয়াহ্‌দুব।

● আবিসিনিয়দের সেমিটিক উৎস

এই অধ্যায়ের প্রথম দিককার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আল-ইয়ামান ও হাদরামাওত থেকে কুশ রাজ্যে আরব উপনিবেশ স্থাপন। এখানে তারা **আবিসিনিয় রাজত্ব ও**

সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং এমন একটি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল দেশীয় নিগ্রোরা যা কখনই সৃষ্টি করতে পারত না। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি (প্রচলিত লোককাহিনী অনুযায়ী মাআরিব-এর বিরাট বাঁধটির ভাঙনের সঙ্গে যুক্ত) দক্ষিণ আরবীয় উপজাতিগুলির স্থানচ্যুতির ফলে বেশ কিছু উপজাতি সিরিয়ায় এবং অন্যেরা আল-ইরাকে আশ্রয় নেয় এবং তার ফলে আবিসিনিয়ায় দক্ষিণ আরবীয়দের স্থায়ী আবাস-কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম আগ্রাসনের অনেক আগেই আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর আরব উপজাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। খ্রিস্টজন্মের পর প্রথম শতাব্দীতে, পরবর্তীকালের আবিসিনিয় সভ্যতার মুল কেন্দ্র আকসুম (অ্যক্সাম) রাজত্বের সূচনা হয়।

● গুমদান-এর দুর্গ

আল-ইয়ামানকে 'দুর্গের রাজ্য' বলা হত। এখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুর্গটি সানআ-র গুমদান-এ অবস্থিত ছিল। প্রথম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর ইলি-শরিহা (ইয়াকুত-এ কথিত লিশারহ্ ইব্‌ন-ইয়াহ্‌সুব)-কে এই দুর্গের নির্মাতা বলে গণ্য করা হয়। বেদুইনদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে শহরে হিময়ারাইটরা দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আল-হামদানিও তাকে অনুসরণ করে গুমদান সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যদিও তাঁদের সময়ে এটি একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই দুই ভূগোলবিদের বিবরণ অনুযায়ী, দুর্গটি ছিল ২০ তলা বিশিষ্ট, প্রতিটি তলার উচ্চতা ছিল ১০ হাত (১হাত = ১৮"—২২")— লিখিত ইতিহাসে এটিই হল প্রথম আকাশচুম্বী অট্টালিকা। গ্রানাইট, মার্বেল এবং এক ধরনের অত্যন্ত শক্ত ও বিভিন্ন রঙের শিলা দিয়ে অট্টালিকাটি তৈরি করা হয়েছিল। সবচেয়ে ওপরের তলাটিতে ছিল রাজদরবার এবং তার ছাদটি এমন স্বচ্ছ বিরাট এক পাথরের চাঙড় দিয়ে তৈরি হয়েছিল যে তার মধ্য দিয়ে একজন আকাশ দেখতে পারত এবং একটি কাক ও একটি ঘুড়ির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারত। অট্টালিকার সদরের চারটি বহির্ভাগ বিভিন্ন রঙের পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিটি কোণে পিতলের একটি করে সিংহ দাঁড় করানো ছিল, বাতাস বইবার সঙ্গে সঙ্গে তারা গর্জন করে উঠত। একটি কবিতায় আল-হামদানি মেঘকে গুমদানের পাগড়ি ও মার্বেল পাথরকে তার কোমরবন্ধনী রূপে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম ধর্মের উত্থানের আগে পর্যন্ত এই অট্টালিকাটি টিঁকে ছিল এবং আল-ইয়ামানে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় এটি ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রথম দিকের হিময়ারাইট শাসনকালে রাজা ছিলেন একজন সামন্তপ্রভু। তিনি দুর্গে বাস করতেন, জমির মালিক ছিলেন এবং একদিকে নিজের প্রতিমূর্তি ও অপর দিকে একটি পেঁচা (এথেনীয় প্রতীক) অথবা একটি ষাঁড়ের মাথার প্রতিমূর্তি-সহ সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা চালু করেছিলেন। কিছু কিছু পুরানো মুদ্রায় এথেনার মাথার ছবি আছে এবং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ

শতকের গোড়ার দিকে তা দেবী এথিনার ওপর দক্ষিণ আরবীয়দের নির্ভরশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। মুদ্রা ছাড়া আল-ইয়ামান খুঁড়ে মাঝে মাঝে হেলেনিস্টিক ও সাসানিদ কারিগরদের ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া গেছে। দেশীয় শিল্পে উন্নত স্তরের কোন প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথাও এমন কোন মাধ্যমে সেমিটিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়নি।

শিলালিপির মধ্যে সাবায়ী-হিময়ারী সম্প্রদায়ের সামাজিক সংগঠনের যে ছবি চিত্রিত হয়েছে তার থেকে জানা যায় সেখানে পুরানো উপজাতীয় প্রথা, জাতিভেদ প্রথা, সামন্ত অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই সংমিশ্রণের মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয়কে লক্ষ করা গেছে যেগুলিকে অন্যত্র নকল করা হলেও সামগ্রিক অর্থে এটি একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল।

● সামুদ্রিক বাণিজ্যে রোমানদের দ্বারা আরবীয়দের প্রাধান্য খর্ব

প্রথম দিককার এই হিময়ারাইট শাসনকালে দক্ষিণ আরবীয় শক্তির পরম গৌরবের দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়। যতদিন ইয়ামানীয়রা লোহিত সাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে একচ্ছত্র প্রাধান্যের অধিকারী ছিল, ততদিন তাদের অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু তাদের সেই প্রাধান্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেল। দি পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সী (৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দ)-তে প্রথম প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মূলে ছিল কোন পশ্চিমি শক্তি। বাণিজ্যিক গতি পরিবর্তনের এটাই ছিল সূচনা। উর্বর ক্রিসেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যে বিরাট





হিময়ারাইট রুপোর মুদ্রা

স্থলপথ ইউরোপের সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করেছিল তাকে কেন্দ্র করে পার্থিয়ান ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তহীন সংঘর্ষ ঘটেছিল এবং ইতিপূর্বে আলেকজান্দার সেই স্থলপথ দখল

করার মতো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর আগে ভারত পর্যন্ত দক্ষিণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথটি আরবীয়দের দখলেই ছিল। তাদের কাজ ছিল তাদের নিজেদের দেশ, পূর্ব আফ্রিকা ও ভারতে উৎপাদিত দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং উটের পিঠে করে উত্তর অভিমুখে মাআরিব থেকে মক্কার মধ্য দিয়ে সিরিয়া ও মিশরে বহন করে নিয়ে যাওয়া। এভাবেই তারা লোহিত সমুদ্রের নানা অসুবিধাগুলি এড়িয়ে যেত। কখনও যদি সমুদ্রপথই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হত, তা হলে তারা লোহিত সাগর দিয়ে নীল নদের পূর্বদিকের কোন শাখানদীর সঙ্গে যুক্ত খাল অথবা লোহিত সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে ওয়াদি আল-হামমামাত এবং তারপর মিশরিয় মরুভূমি পার হয়ে থিবস বা নীলনদ ধরে মেমফিসে পৌঁছে যেত। আল-হিজাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্থলপথের বিভিন্ন জায়গায় হিময়ারাইট কেন্দ্র[১১] ছিল। স্ট্রাবো[২০] লিখেছেন, 'মিনায়া থেকে অ্যালেনা' (আল-আকাবা) পর্যন্ত মরুযাত্রায় ৭০ দিন লাগত। প্রাচ্যের পোশাক, সুগন্ধি দ্রব্য ও মশলার প্রতি পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষের আকর্ষণ যত বাড়তে থাকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের পণ্যদ্রব্যের, বিশেষত ধুনো ও উদ্ভিজ্জ আঠার দাম ততই বাড়িয়ে দিতে থাকে এবং তাদের মারফত যে সমস্ত বিদেশি দ্রব্য আরবে প্রবেশ করত তাদের ওপর করের হার বাড়িয়ে দিতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও বেশি সন্দেহ পরায়ণ হয়ে তারা ওই বাণিজ্যপথের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করে তোলে। এর ফলে তারা প্রবাদতুল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। পেট্রা ও পরে পালমিরা এই বাণিজ্য প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়েছিল এবং তার ফলে তারাও এই সমৃদ্ধির ভাগ লাভ করেছিল। তারপরই গোটা অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়।

টলেমিদের শাসনে মিশর যখন আরও একবার বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল, তখন তারা সমুদ্রের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আরবীয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। ১৭ শতাব্দীর আগে সিজোস্ট্রিস-এর দ্বারা খোঁড়া নীলনদ-লোহিত সাগর সংযোগকারী খালটি দ্বিতীয় টলেমি (খ্রিঃ পূঃ ২৮৫-২৪৬) পুনরায় খুলে দেন। আরব থেকে মিশরকে বিচ্ছিন্ন করেছে যে বিপুল জলরাশি, টলেমীয় বাণিজ্য-বহর সেখানে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে হিময়ারাইট বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সমাপ্তির সূচনা হয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোম যখন টলেমিদের হাত থেকে মিশর দখল করে নেয় এবং তারাও টলেমিদের অনুসরণ করে সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে আরবীয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে ও মিশরকে আল-ইয়ামানের ওপর বাণিজ্যিক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রবল প্রচেষ্টা চালায়। প্লিনি-র সময়ে রোমের নাগরিকরা অভিযোগ তুলতে শুরু করেছিল, যেহেতু আরবীয়দের পছন্দসই দ্রব্য[২১] রোমের বিশেষ নেই তাই রোমকে নগদ টাকায় আরব থেকে সংগৃহীত দ্রব্যের দাম দিতে হয় এবং দক্ষিণ আরবীয় ব্যবসায়ীরা সেই সমস্ত দ্রব্যের জন্য চড়াদাম আদায় করে। তাদের পূর্বপ্রান্তের প্রতিবেশীরা লুঠের মালের যে অংশ আবিসিনীয়দের দিত, তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না এবং তাই তারা রোমানদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তুলল।

রোমান শাসনের প্রথম দিকে আবিসিনিয়ার সামুদ্রিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত একজন গ্রিক বা রোমান সমুদ্রপথের রহস্য, তার নানা বিপদ ও অসুবিধা, বর্ষার পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন জানবার জন্য পাড়ি দেন এবং বিজয়গর্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে আসেন। আসবার সময় তিনি ভারতে উৎপাদিত দারুচিনি ও গোলমরিচ-সহ চড়া দামের ও প্রচুর চাহিদা আছে এমন সমস্ত পণ্য নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষেরা তখন বিশ্বাস করত যে দারুচিনি ও গোলমরিচ আরবে উৎপন্ন হয়। প্রথম দিকের রোমান বাণিজ্যের কলম্বাস বলে পরিচিতি এই হিপ্পালাসকে অনুসরণ করে আরও অনেকে সমুদ্র অভিযানে পাড়ি দিল এবং এইভাবেই সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরবের একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব হল। কিন্তু বর্ষার পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ও ভারত অভিমুখী সরাসরি সমুদ্রপথের স্মরণীয় আবিষ্কারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার বেশ কিছুদিন পর্যন্ত করা যায়নি। ভারত মহাসাগরে রোমান জাহাজের অনুপ্রবেশ দক্ষিণ আরবীয় সমৃদ্ধির[২২] মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল। অর্থনীতির ভাঙন তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে রাজনৈতিক ধ্বংসকে ডেকে আনল। পেট্রা, পালমিরা ও উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়া একের পর এক রোমান নেকড়ের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হল।

● (৫) দ্বিতীয় হিময়ারাইট রাজ্য

৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দক্ষিণ আরবের রাজ-উপাধি হয়েছিল, "সাবা, যূ-রায়দান, হাযরামাওত ও ইয়ামানাত-এর রাজা।" অর্থাৎ সেই সময়ে হাযরামাওত তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। "এবং পর্বত ও তিহামা-র আরবদের"—এই অংশটি খুব শীঘ্রই ওই উপাধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তখন ইয়ামানাত (ইয়ামানাহ্) গোটা দক্ষিণ উপকূলভাগকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আর সানআ-র পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের উপকূলে ছিল তিহামা।

আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে অল্প দিনের জন্য (আনুমানিক ৩৪০—৭৮ খ্রিঃ) আবিসিনীয় শাসন চালু করার পর দেশীয় হিময়ারাইট রাজারা আবার শাসনক্ষমতা লাভ করেন এবং প্রায় ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের শাসন চালিয়ে যান। চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার অকসুমাইট শিলালিপিতে আবিসিনীয় রাজা নিজেকে 'আকসুম, হিময়ার, রায়দান, হাবাশা,[২৩] সালহ্ ও তিহামা-র রাজা' বলে দাবি করেছিলেন। আবিসিনীয়রা এই প্রথমবার বা কেবলমাত্র একবারই আরব আক্রমণ করেনি। এর আগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকে দক্ষিণ আরবের কিছু কিছু অংশে সাময়িক কর্তৃত্ব স্থাপনে তারা সফল হয়েছিল।

এই সময়কার হিময়ারাইট রাজাদের ন'জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে গেছে শিলালিপির মাধ্যমে। তুববা হল রাজকীয় উপাধি, ইসলামি সাহিত্যে যার অস্তিত্ব অক্ষয় হয়ে আছে। হিমিয়ারাইট রাজাদের মধ্যে জনৈক শাম্মার ইয়ারআশ ছিলেন পরবর্তীকালের আরবী রূপকথার সবচেয়ে পরিচিত নায়ক। এই রূপকথাগুলি থেকেই জানা যায় যে, তিনি নাকি সুদূর সমরকন্দ পর্যন্ত দখল করেছিলেন এবং তার নাম অনুসারে নাকি ওই অঞ্চলটির নাম

সমরকন্দ হয়েছিল। আর একজন ছিলেন আবু-কারিব আসআদ কামিল, বা আবি-করিবা আসআদ (আনুমানিক ৩৮৫-৪২০ খ্রিঃ)। শোনা যায়, তিনি পারস্য জয় করেছিলেন এবং পরে **ইহুদিধর্ম** গ্রহণ করেছিলেন। দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী সমন্বিত আরবী পল্লিগীতিতে আসআদ-এর নাম এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। আল-ইয়ামানে খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদিধর্ম চালু হবার মধ্য দিয়ে এই দ্বিতীয় হিময়ারাইট অধ্যায়টি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

● আল-ইয়ামানে খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদিধর্মের সূচনা

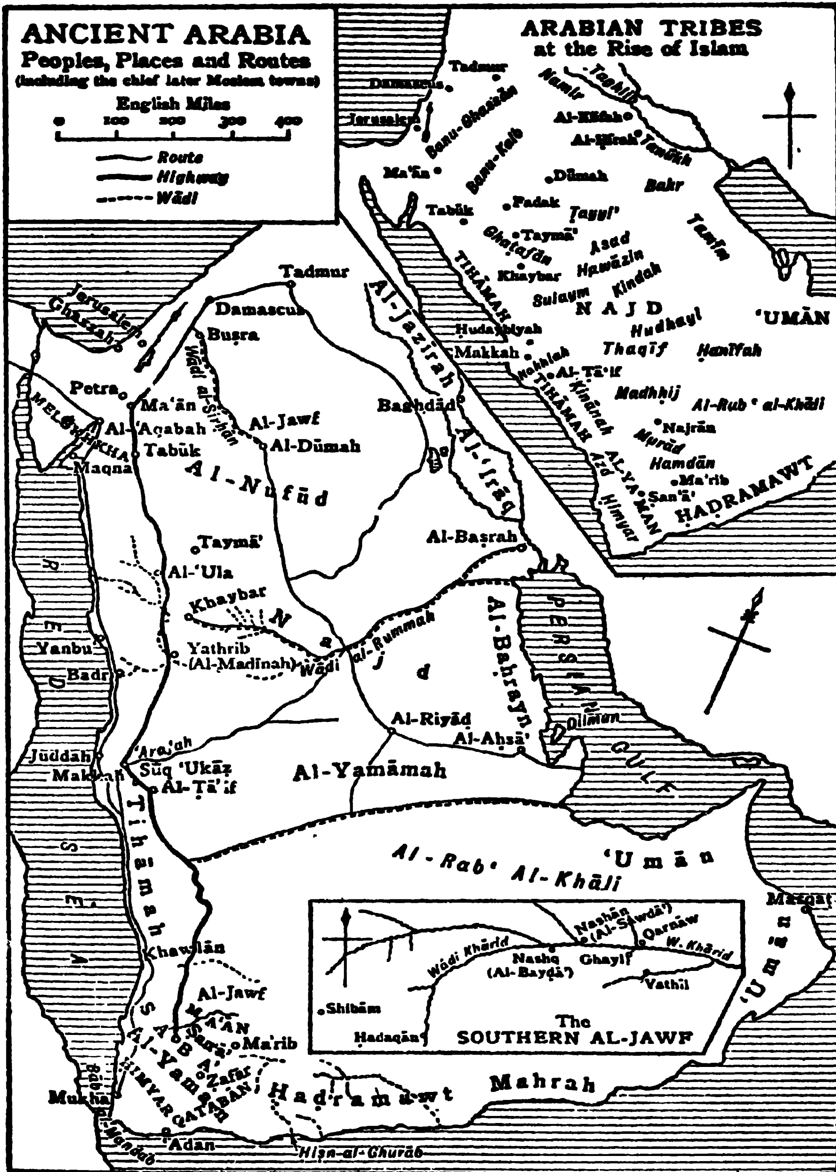
দক্ষিণ আরবের ধর্ম ছিল মূলগতভাবে আবর্তনশীল একটি নাক্ষত্রিক ব্যবস্থা এবং তাতে চন্দ্র-দেবতার আরাধনা বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রদেবতা হাযরামাওতের মানুষজনের কাছে সিন, মিনায়ীদের কাছে ওয়াদ (প্রেম বা প্রেমিক, পিতা), সাবায়ীদের কাছে আলমাকাহ্ (সুস্বাস্থ্যের দেবতা?) ও কাতাবানিয়ানদের কাছে আম্ (কাকা) রূপে পরিচিত ছিল ৎ সর্বদেবতার মন্দিরের মাথায় ছিল তার স্থান। তাঁকে পুরুষ দেবতা রূপে গণ্য করা হত এবং তাঁর স্ত্রী সূর্য বা শামস্-এর থেকে চন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। তাঁদের পুত্র আসতার (শুক্র, ব্যাবিলনিয় দেবী ইশতার ও ফিনিসীয় দেবী আশতার্ত-এর আরবীয় সংস্করণ) ছিল ওই ত্রয়ী পরিবারের তৃতীয় সদস্য। এই যুগ্ম দিব্যশক্তি থেকে অন্যান্য স্বর্গীয় সত্তার উদ্ভব ঘটেছিল। এবং তাদেরও দিব্যশক্তি রূপে গণ্য করা হত। উত্তর আরবের আল-লাত নামে যে দেবীর বর্ণনা কোবানে লিপিবদ্ধ আছে, সেটা সম্ভবত সূর্য-দেবীরই অন্য নাম বলে মনে হয়।

একদম শুরুতেই মোনোফাইসাইট ধরনের খ্রিস্টধর্ম উত্তরদিক, বিশেষত সিরিয়া থেকে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। নির্যাতন এড়ানোর জন্য সিরিয়ার খ্রিস্টান মিশনারীরা পালিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে আল-ইয়ামানে প্রবেশ করে থাকতে পারে, কিন্তু তা আমাদের অজানা। তবে এটা আমরা জানি যে, সম্রাট কনস্ট্যান্টিয়াস ৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে আরিয়ান মতাবলম্বী থিয়োফিলাস ইনদাস-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলকে দক্ষিণ আরবে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই সময়কার আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং দক্ষিণ আরবে নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই ছিল এই প্রতিনিধিদল পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য। আদান (এডেন)-এ একটি ও হিময়ারাইটদের দেশে আরও দুটি গির্জা তৈরি করার কাজে থিওফিলাস সফল হয়েছিলেন। ফাইমিয়ুন (ফেমিয়ন) নামে সিরিয়ার এক ধার্মিক ব্যক্তি নাজরান শহরে মোনোফাইসাইট সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান ধর্ম চালু করেছিলেন। এই নাজরান শহরটি ৫০০ খ্রিঃ নাগাদ নতুন ধর্মমত গ্রহণ করল। ইব্ন-হিশাম[১০] ও আল-তাবারী[১১] তাদের লেখায় এই কঠোর তপস্বী ও ধার্মিক ব্যক্তিটি সম্পর্কে নানা রূপকথার কাহিনী শুনিয়েছেন, একটি আরব মরুযাত্রীদল এই ধার্মিক ব্যক্তিটিকে ধরে নাজরানে নিয়ে যায়। সারুজ-এর অধিবাসী ইয়াকূব (মৃ. ৫২১ খ্রিঃ) সিরীয ভাষায় নাজরানের খ্রিস্টানদের স্বস্তিকর পত্র লিখেছিলেন। আর যারা **ইসলামধর্ম[১২] গ্রহণ করেনি, দ্বিতীয় খলিফা**

উমার (৬৩৫-৩৬ খ্রিঃ) তাদের আল-ইরাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় ৮৪০ খ্রিঃ নাগাদ আমরা আবার সানআ ও আল-ইয়ামানের বিশপ মার পেট্রাস-এর কথা শুনতে পাই।

দ্বিতীয় হিময়ারাইট রাজত্বে ইহুদি ধর্ম ব্যাপকভাবে আল-ইয়ামানে ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত ৭০ খ্রিঃ নাগাদ টিটাস কর্তৃক জেরুসালেম ধ্বংস ও প্যালেস্টাইন বিজয়ের পরেই ইহুদি ধর্ম উত্তর আরবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে সমস্ত নামকে তারা ধরে রেখেছিল, তার দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় আরবের অধিকাংশ ইহুদিই হল ধর্মান্তরিত সিরীয় ও আরবীয়, আব্রাহামের বংশধর নয। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে আল-ইয়ামানে হিব্রুধর্মের এমন প্রভাব ছিল যে, হিময়ারাইট বংশের শেষ রাজা যূ-নুওয়াস (সব্বা আসাদ কামিল-এর এক বংশধর) একজন ইহুদি ছিলেন। বস্তুত ১৯৪৮ সালের পর আল-ইয়ামানের হাজার হাজার ইহুদি ইজরায়েলে স্থানান্তরিত হয়।

দক্ষিণ আরবের দুটি নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসে ধর্মান্তরিত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত চরম বিরোধে পরিণত হল। জাতীয় চেতনার প্রতিনিধি যূ-নুওয়াস দেশীয় খ্রিস্টানদের যুক্ত করে দিলেন খ্রিস্টান আবিসিনীয়দের ঘৃণ্য শাসনের সঙ্গে। ৫২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নাজরান-এর খ্রিস্টানদের গণহত্যার কৃতিত্বও আরোপিত হল এই ইহুদি রাজার ওপর (সূরাহ্ ৮৫:৪)।[২৭] আরবের প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, দাওস যূ-সা'লাবান (বা সূ'লুবান) বেঁচে গিয়েছিলেন এবং সম্রাট প্রথম জাস্টিনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন। কারণ ওই সময়ে বাইজান্টাইনের ওই সম্রাটকে সর্বত্র খ্রিস্টানধর্মের ত্রাতা হিসেবে গণ্য করা হত। সম্রাট এ ব্যাপারে আবিসিনিয়ার রাজা নেগাস (নাজাশি)-কে (শিলালিপিতে কালেব এলা আসবেহা নামে উল্লিখিত) চিঠি লিখলেন, কারণ তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে নিকটতম খ্রিস্টান প্রতিনিধি। নেগাস লোহিত সাগর অতিক্রম করে জনৈক আরিয়াত-এর নেতৃত্বে ৭০,০০০ সেনা পাঠালেন। এই সামরিক অভিযানকে সেই সময়কার আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গ বলেই আখ্যা দেওয়া যায়। আবিসিনিয়ার মাধ্যমে বাইজান্টিয়াম চেষ্টা করছিল আরবীয় উপজাতিগুলিকে তাদের প্রভাবে এনে পারস্যের[২৮] বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করতে। ৫২৩, ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়রা জয়লাভ করেছিল। দ্বিতীয় অভিযানে তাদের নেতা ছিলেন আব্রাহা (আব্রাহামের পরিবর্তিত রূপ)। তিনি প্রথমে ছিলেন আরিয়াত-এর নেতৃত্বাধীন এক অফিসার, কিন্তু পরবর্তী কালে তার সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে নিজেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আল-তাবারী[২৯]-র লেখা থেকে জানা যায়, যূ-নুওয়াস তার ঘোড়ার পায়ে নাল লাগিয়ে সমুদ্রের জোয়ারে তাকে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং পরে আর কখনও তাকে দেখা যায়নি, এইভাবেই তার ও শেষ হিময়ারাইট রাজার পতন ঘটল এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে আল-ইয়ামানের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটল। প্রাচীন হিময়ারাইট রাজবংশের গৌরবময় স্মৃতির অবশিষ্টাংশ আদান-এর পূর্বদিকে হিময়ার বলে পরিচিত এক বর্বর জাতির নামের মধ্যে এখনও টিকে আছে।


ANCIENT ARABIA
Peoples, Places and Routes
English Miles
Route
Wādi
ARABIAN TRIBES
at the Rise of Islam
Tadmur
Damascus
Busra
Petra
Ma'ān
Al-'Aqabah
Tabūk
Al-Jawf
Al-Dūmah
Al-Nufūd
Baghdād
Al-Jazīrah
Al-'Irāq
Taymā'
Al-'Ula
Khaybar
Yathrib
(Al-Madīnah)
Yanbu
Badr
Al-Basrah
Al-Bahrayn
Al-Riyād
Al-Ahsā'
Juddah
Makkah
Sūq 'Ukāz
Al-Tā'if
Al-Yamāmah
Tihāmah
Al-Rab' Al-Khāli
'Umān
Khawlān
Al-Jawf
Ma'rib
Zafār
Hadramawt
Mahrah
Mukhā
'Adan
Hisn-al-Ghurāb
Masqat
The
SOUTHERN AL-JAWF
Shibām
Hadaqān
Nashq
(Al-Baydā')
Ghayl
Yathil
Qarnāw
Wādi Khārid
NAJD
'UMĀN
HADRAMAWT
Thaqīf
Hudhayl
Hanīfah
Madhhij
Al-Rub' al-Khāli
Najrān
Murād
Hamdān
San'ā'
Himyar
Kindah
Sulaym
Hawāzin
Asad
Tamīm
Bakr
Taghlib
Namir
Banu-Ghassān
Banu-Kalb
Fadak
Hudaybiyah
Al-Hīrah

● আবিসিনিয়দের শাসনকাল

আবিসিনিয়রা এসেছিল সাহায্য করতে, কিন্তু প্রায়ই যেমন ঘটে এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। তারাই বিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করল। তারা উপনিবেশিক শাসকে পরিণত হল এবং ৫২৫ খ্রিঃ থেকে ৫৭৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সেই দেশে শাসন চালাল এক সময় যেখান থেকে তার পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘদিন আগে আফ্রিকার উপকূলে চলে এসেছিল। আকসুমিয়দের স্বীকৃত রাজ-প্রতিনিধি আব্রাহা রাজধানী সানআ-তে ওই যুগের সুন্দরতম গির্জাগুলির একটি গড়ে তুলেছিলেন। আরবীয় লেখকেরা সেই গির্জাটিকে আল-কালীস (আল-কুলাইস, আল-কুললাইস, গ্রিক শব্দ একলেসিয়া, গির্জা) বলত। সেই গির্জার অল্প কিছুমাত্রই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু প্রাচীন মাআরিব-এর ধ্বংসাবশেষ থেকে গির্জার স্থানটি গড়ে তোলা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বী আবিসিনিয়রা গোটা রাজ্যকে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে এবং উত্তরের তীর্থকেন্দ্র নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মক্কার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। কারণ যে শহর দিয়ে তীর্থযাত্রীরা যেত অথবা যে রাস্তাগুলি সেই শহরে গিয়ে মিশেছিল সেখানকার অধিবাসীদের কাছে তীর্থযাত্রা ছিল রোজগারের একটি বিরাট উৎস। দক্ষিণে একটি পবিত্র ধর্মস্থান যেটি প্রচুর পরিমাণে ভক্তদের আকর্ষণ করবে, এমনকী হিজাজ মসজিদের ক্ষতি করেও সেটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আবিসিনিয় শাসকেরা সাফল্য লাভ করেছিল। অবশ্য এই অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বৈরীতার স্মৃতি স্থানীয় কাহিনীতে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই কাহিনী থেকেও জানা যায় যে কাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ফুকাইম উপজাতিভুক্ত দুই নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী আরবীয় একটি উৎসবের আগের দিন সানআ গির্জাটিকে কলুষিত করে এবং এর ফলে আব্রাহা ক্ষুব্ধ হয়ে মক্কার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেখানে সামরিক অভিযান চালান। মুহাম্মাদের জন্মের বছরেই (৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিঃ) এই ঘটনাটি ঘটেছিল এবং ওই বছরটি 'আম-আল-ফীল বা হাতির বছর' বলে গণ্য হয়। কারণ উত্তরমুখী অভিযানে হাতিটি আব্রাহার সঙ্গে ছিল এবং সেটি আল-হিজাজের আরবদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যেহেতু সেখানে এর আগে কখনও হাতি দেখা যায়নি। গুটি বসন্তের আক্রমণে আবিসিনিয় সেনাদল ধ্বংস হয়ে যায় যাকে কোরানে বলা হয়েছে 'ছোট নুড়িপাথর' (সিজ্জীল)।

● মাআরিব বাঁধের ভাঙন

প্রবল বন্যায় মাআরিব বাঁধের ভাঙন সংক্রান্ত ইসলামি সাহিত্যের স্মরণীয় ঘটনাটি এই সময়েই ঘটেছিল। তার ইতিহাসের অষ্টম খণ্ডটিতে (৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত) যিনি হিমইয়ারাইট রাজাদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, সেই আল-ইসফাহানি এই দুঃখজনক ঘটনাটিকে ইসলামের ৪০০ বছর আগের বলে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইয়াকুত-ই এ ব্যাপারে সত্যের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি ঘটনাটিকে **আবিসিনিয়**

শাসনকালের বলে বর্ণনা করেছিলেন। এখনও এই বাঁধটির ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। আব্রাহা কর্তৃক নির্মিত একটি দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপিতে (৫৪২-৪৩ খ্রিঃ সময়কালের) একটি ভাঙনের কথা বলা আছে এবং সেটি গ্লেসার[১১] কর্তৃক আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হয়েছিল।

আব্রাহার সময়ের এই ভাঙনের আগে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে জলের আঘাতে বাঁধে আরও একবার ভাঙন ধরেছিল, কিন্তু পরে সেটি সারানো হয়। কোরানের বর্ণনা (৩৪:১৫) থেকে জানা যায় যে, ৫৪২ খ্রিঃ-এর পরে ও ৫৭০ খ্রিঃ এর আগে এই বাঁধটিতে চূড়ান্ত ভাঙন ধরে। বাঁধের আর একবার ভাঙনের সঙ্গে সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হাওরান আঞ্চলে বানু-গাসসানের চলে যাওয়া ও সেখানে রোম সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠা এবং হিরা অঞ্চলে বানু-লাখমদের চলে যাওয়ার ঘটনাটি যুক্ত হয়ে আছে। এই হিরা অঞ্চলেই কয়েকটি দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপি সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁধের ভাঙন যে বছরে ঘটেছিল বানু-গাসসানেরা সেই বছরটিকেই তাদের নিজস্ব যুগের সূচনাবিন্দু[১২] বলে বেছে নিয়েছিল। সিরিয়া-র গাসসান এবং আল-ইরাকের তানুখ ছাড়াও উত্তর ও মধ্য-আরবের যথাক্রমে বানু-তায়ি, কিনদা এবং অন্যান্য বড় ও শক্তিশালী উপজাতিগুলিও নিজেদের দক্ষিণ আরব জাত বলে দাবি করেছিল। সিরিয়ায় আজও বহু পরিবার আছে একই কারণে তারাও এই দেশে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে মনে করে।

পরবর্তীকালের আরবীয় লেখকেরা প্রবল বন্যা ও মাআরিব বাঁধের ভাঙনের এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটির ভিত্তিতে দক্ষিণ আরবীয় বাণিজ্য, কৃষি[১৩], সমৃদ্ধি ও জাতীয় জীবনের অবক্ষয় ও ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করেছেন। লোহিত সাগরে রোমান জাহাজের অনুপ্রবেশ, নতুন ধর্মমতের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাব ও বিদেশি শক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণই ছিল এই অবক্ষয়ের কারণ। মাআরিব বাঁধ ধ্বংসের ঘটনাটি আসলে একটি রূপক মাত্র। দক্ষিণ আরবের সংহতি এবং আর্থ-সামাজিক পরিকাঠানো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দীর্ঘ ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রতীকের মাধ্যমে। আর সেই কারণেই এই কাহিনীর বর্ণনার সময় ঐতিহাসিকদের তীর্যক মন্তব্য ছিল—পঞ্চাশ জন মানুষ যা পারে না, একটি ইঁদুর সেই পাথর নাড়িয়ে দিল। লোককাহিনী থেকে জানা যায় যে, মুজালকিয়া (আমর ইব্‌ন-আমির মা-আল-সামার)-র আমলে ইঁদুর ওই বিরাট ও যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটিয়েছিল।

● পারস্য অধ্যায়

. আবিসিনিয় শাসনের হাত থেকে আল-ইয়ামানকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত জাতীয় আন্দোলন প্রাচীন হিমিয়ার রাজবংশের তরুণ বংশধর সাঈফ ইবন-যি-ইয়াজানের মধ্যে তাদের নায়ককে খুঁজে পেয়েছিল। রোমাঞ্চকর অভিযানে সাঈফের সাফল্য (সিরাহ) আরবীয় রূপক-কাহিনীতে স্থান করে নিয়েছে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে সংশোধিত ও রুচিপূর্ণভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। সেই কাহিনী আরবীয় গল্প কথকরা এখনও কায়রো, বেইরুট ও বাগদাদের

কাফেগুলিতে বলে থাকেন। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, সাঈফ আবিসিনিয়দের বিরুদ্ধে কনস্ট্যান্টিনোপলের সাহায্য চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল খ্রিস্টধর্মাবলম্বী এবং সেই কারণে বাইজান্টিয়ামের সঙ্গে তার ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আল-হিরার রাজা তখন তাকে পারসীয় শাসক কিসরা অনুসরওয়ানের শাসনাধীন আল-মাদাইন (সেলুসিয়া-টেসিফন)-এর সাসানিদ রাজদরবারে উপস্থিত করে। গোটা দুনিয়ার ভাগ্য তখন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী বাইজান্টাইন ও মাজদিয়ান পারসীয়দের হাতে। আকসূম ছিল বাইজান্টিয়ানের বেসরকারি প্রতিনিধি। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী আরবীয়রা ছিল বাইজান্টাইনপন্থি এবং নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার স্বার্থে কনস্ট্যান্টিনোপলের সাহায্যের প্রত্যাশায় ছিল। ইহুদি ও নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী আরবীয়রা ছিল পারসীয়পন্থি এবং টেসিফনের কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করছিল। সাঈফের আবেদনে সাড়া দিয়ে পারস্য সম্রাট ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহরাজ (ওয়াহরিজ)-এর নেতৃত্বে ৮০০ সেনা পাঠালেন। এই সেনারা আল-ইয়ামানে আবিসিনিয় সেনাদের উৎখাত করল এবং ঘৃণ্য আফ্রিকান শাসন থেকে দেশটিকে মুক্ত করল। প্রথমে সাঈফের নেতৃত্বে যৌথ প্রশাসন চালু হল। গুমদান-এর প্রাচীন দুর্গটি সাঈফ তার বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করলেন। অবশ্য আবিসিনিয় শাসনে এটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু আল-ইয়ামান শীঘ্রই একটি পারসীয় প্রদেশে রূপান্তরিত হল এবং দক্ষিণ আরবীয়রা উপলব্ধি করল যে, তারা এক প্রভুর বদলে আর এক প্রভুকে ক্ষমতাসীন করেছে।

এই সমস্ত লোককাহিনীতে আরবের উভয় দিকে ইহুদি ধর্মাবলম্বী পারস্য ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী আবিসিনিয় (বাইজান্টিয়াম সমর্থিত)---এই দুই শক্তির মধ্যে ভেঙে যাওয়া দক্ষিণ আরবীয় রাজ্যের দখল নিয়ে দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট বর্ণনা পেয়েছি। বাইজান্টিয়ামের প্রতি দেশীয় খ্রিস্টান আরবীয়দের সহানুভূতি আবিসিনিয় হস্তক্ষেপের অনুকূলে একটি গোষ্ঠ হিসেবে কাজ করেছিল। আবার পারসীয়দের প্রতি ইহুদি ও নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সহানুভূতি পারস্যকে বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন শক্তির অনুপ্রবেশের প্রশ্নটি বাদ দিলে উত্তরের সিরীয়-আরবীয় মরুভূমিসহ গোটা দক্ষিণ আরব এই সমস্ত শক্তির কাছে ওই উপদ্বীপের প্রবেশদ্বার রূপে কাজ করেছিল।

হিজরতের পর ষষ্ঠ বছরে অর্থাৎ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে আল-ইয়ামানে অবস্থিত 'বাদহান' নামে পারস্যের সপ্তম প্রদেশটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই নতুন ধর্মের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উপদ্বীপে মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু উত্তরদিকে সরে যায়। তখন থেকে আরব ইতিহাসের ধারাটি উত্তর অভিমুখে বইতে শুরু করে এবং জনসাধারণের কাছে আল-ইয়ামানের পরিবর্তে আল-হিজাজ সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ❑

● টীকা ●

১ বি কে. ৯ম ৪র্থ অধ্যায়, নতুন ভাগ ২।

২ অনু: ডবলিউ এইচ শফ (নিউইয়র্ক, ১৯১২), নতুন ভাগ ১৪।

৩ ইরিথ্রিয়ান সী, নতুন ভাগ ২৯।

৪ ওই বই, নতুন ভাগ ২০; ডি এইচ **মুলার, ডাই বারগেন অ্যাণ্ড স্কলোসার সুদারাবিয়েনস নাচ** ডেম ইকলিল ডাস হামদানি, ২য় ভাগ (ভিয়েনা, ১৮৭৯-৮১)।

৫ বি কে. ৮ম, সম্পা: নবিহ্ এ ফ্যারিস (প্রিন্সটন, ১৯৪০; দি অ্যান্টিকুইটিস অফ সাউথ অ্যারাবিয়া (প্রিন্সটন, ১৯৩৮); বি কে. ১০ম, সম্পা: মুহিব-আল-দীন আল-খাতীব (কায়রো, ১৩৬৮)।

৬ নমুনার জন্য কর্পাস ইনস্ক্রিপশনম সেমিটিকারাম, ৪র্থ (প্যারিস, ১৮৮৯, এক এক)।

৭ তুলনীয়, নিয়েলসেন, হ্যাণ্ডবুক, ১ম খণ্ড ৬৪ ও পরের পাতা; আমেরিকান স্কুলস অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ, বুলেটিন নং ৭৩ (১৯৩৯)-এ এফ ভি উইনেট, ৩-৯ পাতা; জি রাইকম্যানস-এর লেখা, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ১৪শ খণ্ড (১৯৫২) ১ ও পরের পাতা, জ্যাকুইস রাইকম্যানস-এর 'ইনস্টিটিউশন মনার্কি এন আরাবি মেরিডিওনেল আভান্ট এল ইসলাম (লুভেন, ১৯৫১) ২৫৭ ও পরের পাতা।

৮ এম কে আর বি, স্থানীয় ভাষান্তর অনিশ্চিত।

৯ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৩৭-৩৮ পাতা।

১০ আহমেদ ফাখরি, অ্যান আর্কিওলজিক্যাল জার্নি টু ইয়েমেন, ১ম খণ্ড (কায়রো, (১৯৫২) ২৯-৫৬ পাতা; ওয়েনডেল ফিলিপস, কাতাবান অ্যাণ্ড শেবা (নিউইয়র্ক, ১৯৫৫); রিচার্ড এল বাওয়েন ও ফ্রাঙ্ক পি অলব্রাইট, আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারিজ ইন সাউথ অ্যারাবিয়া (বাল্টিমোর, ১৯৫৮)।

১১ ফ্যারিস, ৪৫ পাতা।

১২ ধ্বংসের বর্ণনার জন্য আল-আজম, দ্বিতীয় ভাগ, ৫০ ও পরের পাতা দেখুন।

১৩ মুরূজ আল-যাহাব সম্পা: ও অনু: ডে মেনার্ড ও ডে কোর্টিলে, ৩য় খণ্ড (প্যারিস, ১৮৬৪) ৩৬৬ পাতা।

১৪ তারীখ সিনি মুলূক আল-আরদ অ আল-আনবিয়া, সম্পা. গটওয়াল্ড (লিপজিগ, ১৮৪৪) ১২৬ পাতা।

১৫ বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৩ পাতা।

১৬ লিহ্যানাইট রাজধানী, আনুমানিক ৫০০-৩০০ খ্রিঃ পূঃ। এজন্য হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৪২ পাতা।

১৭ তুলনীয় ফিলিপস, ২৯৭ পাতা। নাজরানের ইতিহাসের জন্য **মুলার দেখুন, ডাই বার্গেন, ২য় ভাগ, ৬০-৬৭ পাতা; জি রাইকম্যানস, লা নমস প্রপেস সুদ-সেমিটিক, ১ম খণ্ড (ল্যুভেন, ১৯৩৪)**, ৩৬ ও পরের পাতা; এইচ. সেন্ট জে বি ফিলবি, দি ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ ইসলাম (আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯৪৭), ১৯২ ৪৪ পাতা।

১৮ বুলদান, ৩য় খণ্ড, ৮১১ পাতা; ১.৮।
১৯ কোরান ৩৪:১৭.১৮ দেখুন।
২০ বি কে. ১৬, ৪ অধ্যায় নতুন ভাগ ৪।
২১ প্লিনি, বিকে. ১২, ৪১ অধ্যায়।
২২ জর্জ এফ হৌরানি-র জার্নাল অফ নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজ, ১১শ খণ্ড (১৯৫২) ২১১-১৫ পাতার লেখা দেখুন।
২৩ হাযবামাওত, নিয়েলসন, হ্যাণ্ডবুক, ১ম খণ্ড, ১০৪ পাতা।
২৪ সীরাহ, সম্পা: ওস্টেনফেল্ড (গটিনজেন, ১৮৫৮) ২০-২২ পাতা।
২৫ তারীখ আল রুসুল, সম্পা: ডি গোজে, ১ম খণ্ড, (লিডেন, ১৮৮১-৮২) ৯১৯-২৫ পাতা।
২৬ **বালাযুরি, ফুতুহ্, ৬৬ পাতা = হিট্টি, অরিজিনস, ১০১-১০২ পাতা, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন, ১৬৯ পাতা।**
২৭ আক্সেল মোবার্গ-এর দি বুক অফ দি হিময়ারাইটস (লাণ্ড, ১৯২৪)।
২৮ প্রোকোপিযাস, হিস্টোরি অফ দি ওয়ারস, সম্পা: ও অনু: এইচ বি ডেউইং (লণ্ডন, ১৯০৪), বিকে. ১. ২০ অধ্যায়, নতুন ভাগ ৯-১২।
২৯ ১ম খণ্ড, ৯২৭-২৮ পাতা।
৩০ প্রোকোপিয়াস, বি. কে. ১, অধ্যায় ২০, নতুন ভাগ ২, ৬।
৩১ ১০৫:১-৩, আল-তাবারী-র তফসীর আল-কুরআন (বুলাক, ১৩২৯) ৩০ খণ্ড, ১৯৩ পাতা; ইব্ন-হিশাম, সীরাহ, ৩৬ পাতা।
৩২ কোরান ৩৪:১৫।
৩৩ অপ সিট, ১২৬ পাতা।
৩৪ বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৩ পাতা।
৩৫ মিটেলুঙ্গেন দার ভরদারাসিয়াটিসেন গেসেলস্যাফ্ট (বার্লিন, ১৮৯৭)। ৩৬০-৪৮৮ পাতা।
৩৬ আল-মাসউদী, কিতাব আল-তানবিহ্, সম্পা: ডি গোজে (লিডেন, ১৮৯৩), ২০২ পাতা।
৩৭ আবহাওয়া বিশোধন তত্ত্বের ব্যাপারে ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অ্যালয়েস মুসিল, নর্দান নাজ্দ (নিউ ইয়র্ক, ১৯২৮) ৩০৪-১৯ পাতা।
৩৮ মাসউদী, মুরূজ, ৩য় খণ্ড, ৩৮৩ পাতা; ইয়াকুত, বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৪ পাতা; তুলনীয়, মাসউদী, ৩৭০-৭১ পাতা।

॥ অধ্যায় ৬ ॥

উত্তর ও মধ্য-আরবের নাবাতিয়ান ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্য

● নাবাতিয়ান রাজ্য

ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে উপদ্বীপের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে দক্ষিণ আরবের রাজ্যগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। দক্ষিণের ওই রাজ্যগুলির মতো উত্তর আরবের রাজ্যগুলিও মূলত বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই তাদের শক্তি সংগ্রহ করেছিল। উল্লেখ করা দরকার যে, সামরিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যেমন এই রাজ্যগুলির উদ্ভব হয়নি, তেমনি তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সামরিক কার্যকলাপের কোন ভূমিকা ছিল না। এই রাজ্যগুলির মধ্যে নাবাতিয়ান রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল সবার আগে।

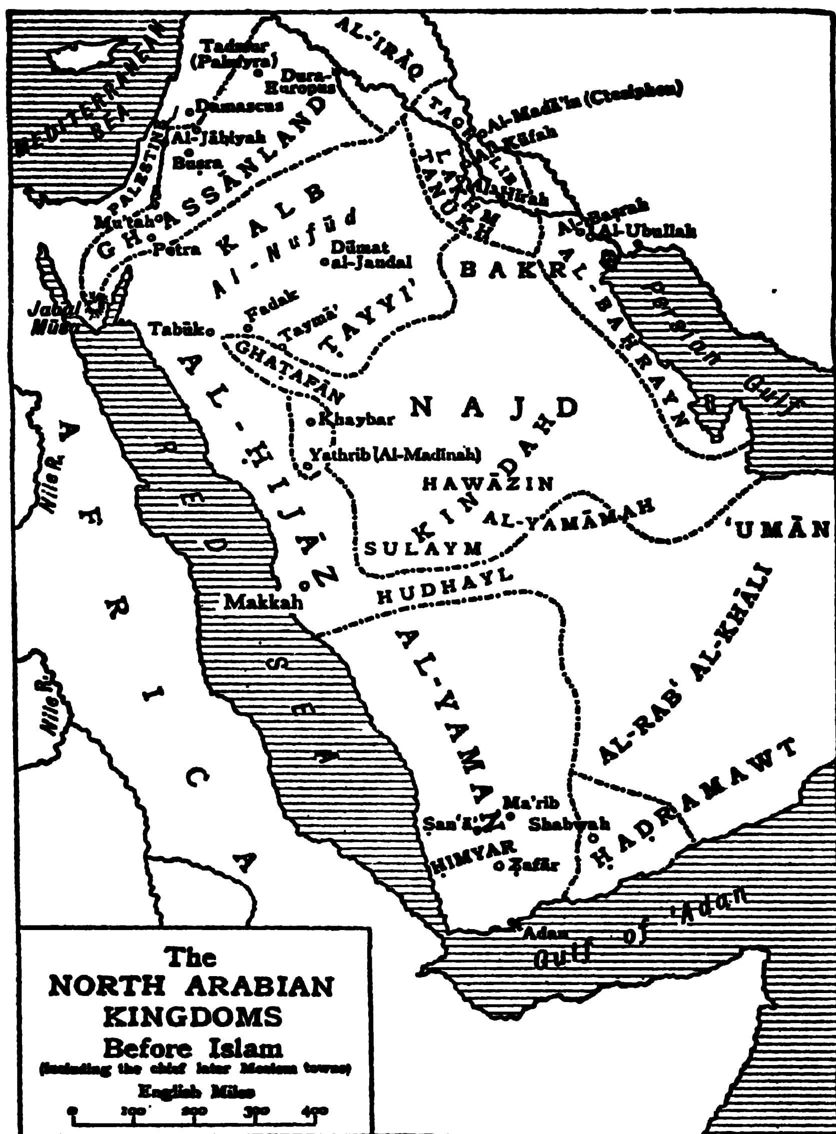
নাবাতিয়ান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে কোন অ্যাসিরিয় সামরিক অভিযানের কথা আমরা ইতিহাসে পাই না, কারণ তারা তখন পশ্চিম অভিমুখী মূল রাস্তার ওপরে অবস্থান করছিল না। বর্তমানে ট্রান্সজর্ডান বলে পরিচিত অঞ্চলটি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নাবাতিয়ানরা (আল-আনবাত, প্রাচীন নাবাটায়ি)[১] যাযাবর উপজাতি হিসেবে এখানে আসে এবং এডোমাইট (ইডুমিয়ান, এসাউ এর বংশধর)-দের রাজ্য দখল করে। নাবাতিয়ানরা পরে তাদের কাছ থেকে পেট্রা ছিনিয়ে নেয়। সিয়ার-এর এই রাজ্যে এডোমাইটদের পূর্বসূরি ছিল হোরাইটরা (হুরারিস)। তাদের রাজধানী পেট্রা থেকে অগ্রসর হয়ে নাবাতিয়ানরা আশপাশের অঞ্চলগুলি দখল করে। পেট্রা হল একটি গ্রিক শব্দ, এর অর্থ হল: পাহাড়। ইসাইয়া ১৬ : ১, ৪২ : ১১, ও ২য় কিংস ১৪ : ৭[২]-এ উল্লিখিত হিব্রু শব্দ 'সেলা'-র গ্রিক অনুবাদ হল পেট্রা। আরবী ভাষায় এর প্রতিশব্দ হল আল-রকীম[৩] এবং এর আধুনিক নাম হল ওয়াদি মূসা (মোজেস-এর উপত্যকা)। তিন হাজার ফুট উঁচু এক অনুর্বর মালভূমিতে অবস্থিত এই প্রাচীন নগরীটি বর্তমানে একটি পাহাড়ের (উম আল-বিয়ারা) গায়ে খোদাই করা ও সূর্যালোকে উজ্জ্বল একটি বিরাট গোরস্থানে পরিণত হয়েছে। এই পাহাড়টির বেলেপাথরের স্তরে স্তরে রামধনুর সাতটি রঙের বিকিরণ দেখতে পাওয়া যায়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিক থেকে শুরু করে প্রায় ৪০০ বছর ধরে পেট্রা ছিল সাবা ও ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্যে মরুযাত্রীদের যাওয়া-আসার পথে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর

নাবাতিয়ানদের রাজত্বকালের প্রথম দিককার বিস্তৃত বিবরণ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় দিওদোরাস সিকুলাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দেরপর)-এর বর্ণনা থেকে। খ্রিস্টপূর্ব ৩১২ নাগাদ নাবাতিয়ানরা এত শক্তিশালী ছিল যে, আলেকজান্দারের উত্তরসূরি হিসেবে সিরিয়ার রাজার পদে আসীন আন্টিগোনাসের দুটি সামরিক অভিযানের মোকাবিলা করে তারা বিজয়গর্বে সেই 'পাহাড়ে' ফিরে এসেছিল। তারা তখন টলেমীয় প্রভাবাধীন অঞ্চলের মধ্যেই ছিল। পরে তারা রোমের বন্ধুতে পরিণত হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ২৪-এ গ্যালাসের বিখ্যাত আরব অভিযানে তারা নামেমাত্র সহযোগিতা করে। হারিসা (আল-হারিস, তৃতীয় আরেটাস, আনু. খ্রিস্টপূর্ব ৮৭-৬২)-এর রাজত্বকালে নাবাতিয়ানরা প্রথম রোমানদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। এই সময়েই রাজকীয় মুদ্রা প্রথম চালু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭-এ জুলিয়াস সিজার দেখা করেন মালিকু (মালিক, প্রথম মালকাস)-র সঙ্গে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধের জন্য তার কাছে অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য চান। তার উত্তরসূরি ওবিদাস (উবাইদাহ, তৃতীয় ওবোদাস, আনু. খ্রিস্টপূর্ব ২৮-২৯)-এর আমলেই আরব দেশে রোমানরা সামরিক অভিযান চালায়। আরবীয় পেট্রিয়ার রাজধানী ছিল পেট্রা এবং চতুর্থ হারিসাত (খ্রিস্টপূর্ব ৯ থেকে ৪০)-এর আমলেই তা সাফল্যের শিখরে উন্নীত হয়েছিল। যীশুখ্রিস্টের আমলে নাবাতিয়ান রাজ্য উত্তরে দামাস্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আর তৃতীয় হারিসাত (৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ) দামাস্কাস ও সোলে-সিরিয়া সেলিউসিদদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। এ ছিল চতুর্থ হারিসাত-এর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি যে তিনি দামাস্কাসে[১] পলকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তর আল হিজাজ এর আল-হিজর (মাদাইন সালিহ্) আমাদের যুগের প্রথম শতাব্দীতে নাবাতিয়ান রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অন্তত সেখানে খোদাই করা বিভিন্ন প্রস্তুলিপি থেকে এমনই ধারণা হয়। প্রথম হারিসাত (খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯) থেকে শেষ স্বাধীন শাসক দ্বিতীয় রাব্বিল (৭০-১০৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সমস্ত নাবাতিয়ান রাজাদের নামই আমাদের অতি পরিচিত।[১] সম্রাট ট্রাজান ১০৫ খ্রিস্টাব্দে নাবাতিয়ান রাজত্বের অবসান ঘটান এবং পরের বছরে তাদের শাসিত অঞ্চলগুলি রোমান প্রদেশে পরিণত হয়।

দিওদোরাসের পর নাবাতিয়ানদের সম্পর্কে বিশ্বস্ত তথ্যসমূহের উৎস হিসেবে আমরা জোসেফাসকে (মৃ. আনুমানিক ৯৫ খ্রিস্টাব্দ) গণ্য করে থাকি। কিন্তু জোসেফাস তাদের সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন এই কারণে যে, তারা হিব্রুদের সঙ্গে ক্ষমতা লাভের জন্য পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারে হস্তক্ষেপ করেছিল। পূর্বদিকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত নাবাতিয়ান রাজ্যকেই তিনি আরব বলে মনে করতেন। জোসেফাস[১] তার লেখায় মালকাস বা মালিকাস (আরবী ভাষায় মালিক)-কে আরবের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, ... সঙ্গে হেরড ও তার বাবা বন্ধুত্ব করেছিলেন। আর মালকাস (দ্বিতীয় মালকাস ৪০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) ৬৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জেরুসালেম আক্রমণের নায়ক টাইটাসকে ১০০০ ঘোড়া ও

করেছিলে



The
NORTH ARABIAN
KINGDOMS
Before Islam
English Miles
0
100
200
300
400
Damascus
Al-Jābiyah
Buṣra
Petra
Tabūk
Fadak
Taymā'
Khaybar
Yathrib (Al-Madīnah)
Makkah
Dūmat al-Jandal
Al-Kūfah
Al-Ḥīrah
Al-Baṣrah
Al-Ubullah
Ma'rib
Ṣan'ā'
Shabwah
Ẓafār
'Adan
NAJD
HAWĀZIN
SULAYM
HUDHAYL
AL-YAMĀMAH
'UMĀN
AL-ḤIJĀZ
AL-YAMAN
ḤADRAMAWT
ḤIMYAR
AL-BAḤRAYN
BAKR
TAYYI'
GHAṬAFĀN
KALB
Al-Nufūd
TANŪKH
LAKHM
AL-'IRĀQ
PALESTINE
AFRICA
RED SEA
Persian Gulf
Gulf of 'Adan
Nile R.
Jabal Mūsa

ম্যাকাবিজ ৫ : ২৫ ও দ্বিতীয় ম্যাকাবিজ ৫ : ৮-এ নাবাতিয়ানরা আরবীয় হিসেবেই গণ্য হয়েছেন। আধুনিক হুওয়াইতাত বেদুইনরাও নাবাতিয়ানদের বংশধর রূপে পরিগণিত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে তারা যদিও আরবী ভাষায় কথা বলত, সেই সময়ে আরবী অক্ষরের অনুপস্থিতির ফলে নাবাতিয়ানরা তাদের উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশীদের ব্যবহৃত আরামাইক অক্ষরই ব্যবহার করত। অ্যান্টিগোনাসের উদ্দেশে সিরীয় অক্ষরে লেখা নাবাতিয়ানদের একটি চিঠির কথা দি ওদোরাস[১১] উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা ও ব্যবসার কাজে তারা আরামাইক ভাষা ব্যবহার করত। কিন্তু আরামাইক অক্ষরে খোদাই করা লিপিগুলির মধ্যে যে ভুলগুলি থেকে গিয়েছিল, তার জন্যই আরবী ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ নাম এবং গাইর (তা ছাড়া)-এর মতো আরবী অভিব্যক্তিগুলি তাদের লেখকদের ব্যবহৃত আরবী ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আরামাইক ভাষা থেকে গৃহীত ও নাবাতিয়ানদের টানা হাতে লেখা এই অক্ষরগুলি আমাদের যুগের তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর আরবীয় ভাষা, কোরানে ব্যবহৃত আরবী ভাষা ও বর্তমান যুগের আরবী ভাষার ব্যবহৃত অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। বিশেষত এটি মূলত গোলাকার নাসখি অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। আল-কুফাহ্ থেকে যে ভাষার নাম হয়েছিল কুফি (কুফিক), সেই ভাষায় ব্যবহৃত কোনাচে অক্ষরের সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোরান, রাজকীয় দলিল-দস্তাবেজ, স্তম্ভে খোদাই করা লিপি ও মুদ্রাতেই এই ভাষা ব্যবহৃত হত। প্রাচীনতম আরবী শিলালিপির অন্যতম একটি দেখতে পাওয়া যায় পূর্ব হাওরান-এ অবস্থিত আল-নামারাহ্তে। ৩২৮ খ্রিস্টাব্দে এই শিলালিপিটি ইমরু-আল-কায়িস নামে আল-হিরার এক লাখমিয় রাজার সমাধিস্তম্ভে খোদাই করা হয়েছিল। প্রস্তরাদির গায়ে খোদাই করা লিপি ছাড়া আর কোন নাবাতিয়ান সাহিত্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

● বর্ণের সিনীয় উৎস

নাবাতিয়ান রাজ্যের নিকটে অবস্থিত এবং 'দশটি নির্দেশাবলি' ঘোষণার জন্য খ্যাত সিনাই উপদ্বীপে বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম বর্ণের লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। সারাবীত আল-খাদিম নামে জায়গাটিতে এই শিলালিপিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেগুলি কায়রো যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাদের অর্থ উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। নীলা পাথরের খনিতে কর্মরত সিনাই উপদ্বীপের শ্রমিকরাই সম্ভবত এই বর্ণগুলি ব্যবহার করেছিল এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫০-অব্দে সম্ভবত এই লিপিগুলি খোদাই করা হয়েছিল। অর্থাৎ বলা চলে যে, মনট্যেট যে সময়ে জুবাইল (প্রাচীন জেবাল, গ্রিক ভাষায় বাইব্লস) নামে একটি জায়গায় আহীরাম বর্ণের খোদাই করা লিপি আবিষ্কার করে তাকে অন্যতম প্রাচীন ফিনিশিয় শিলালিপি বলে গণ্য করেছিলেন, তারও অন্তত ৮০০ বছর আগে সিনীয় শ্রমিকেরা এই বর্ণ ব্যবহার করেছিল

সিনীয় বর্ণমালার উদ্ভবের পর উত্তর সিরিয়াতে সেই অক্ষরের ব্যবহার চালু হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিককার রা'স আল-শামরাহ্ -এর উৎকীর্ণ ফলক[১১] থেকে জানা যায় যে, সেখানেই বর্ণমালাগুলি কীলকাকার ধারণ করে। নতুন আবিষ্কৃত এই অক্ষরগুলি ছিল সেমিটিক ও বর্ণানুক্রমিকভাবে বিনাস্ত। যদিও মাটির ফলকে ছুঁচলো মুখের কলম দিয়েই লেখা হত, তবুও বলা যায় যে প্রথম দিককার সুমেরো-আক্কাডিয়ান বর্ণমালা থেকে এগুলি গ্রহণ করা হয়নি। এর মাধ্যমেই সিনীয় বর্ণমালাগুলি প্রথাগতভাবে কীলকাকৃতি চিহ্নে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক গবেষকরা বহুদিন ধরেই এটা স্বীকার করে আসছেন যে, ফিনিশিয়রাই সর্বপ্রথম লেখার ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি চালু করে। এবার তারা মিশরের সাংকেতিক চিত্রলেখা উপাদান থেকেই তাদের এই পদ্ধতির ভিত্তিটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুটি পদ্ধতির পার্থক্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই ব্যবধানের মধ্যে সেতু বন্ধনের উদ্দেশ্য নিয়েই সিনীয় লেখার পদ্ধতি সৃষ্টি হয়। উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায় যে, সাংকেতিক চিত্রলেখা উপাদান থেকেই সিনীয় সেমাইটরা ষাঁড়ের মাথা চিহ্নটি গ্রহণ করে (মিশরিয় ভাষায় ষাঁড়ের মাথাকে কী বলা হয় তাকে গুরুত্ব না দিয়েই) এবং ষাঁড়ের মাথা চিহ্নটিকে নিজের ভাষায় 'আলেফ' বলে ডাকতে শুরু করে। তারপর ধনিতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী তারা 'এ' ধ্বনিকে বোঝাতে ওই চিহ্নটি ব্যবহার করতে শুরু করে। 'বাড়ি'-র জন্য ব্যবহৃত চিহ্নটিকে তারা নিজেদের ভাষায় 'বেথ' বলতে শুরু করে এবং 'বি' ধ্বনিকে বোঝাতে ওই চিহ্নটি ব্যবহার করতে থাকে। এইভাবেই অন্যান্য বর্ণের সৃষ্টি হয়।

বর্ণমালার সিনীয় উৎস থেকেই জানা যায় যে, কীভাবে একদিকে এই বর্ণমালা দক্ষিণ আরবে প্রচারিত হয় ও সেখানে তার এক স্বাধীন বিকাশ ঘটে এবং খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ নাগাদ মিনীয়রা এই বর্ণমালা ব্যবহার করতে শুরু করে। আবার অন্যদিকে এই বর্ণমালাই উত্তর দিকে ফিনিশিয় উপকূলে পৌঁছে যায়। আরবের ব্যবসায়ীরা ফিনিশিয়দের কাছে নীলা বিক্রি করত এবং সেই সুযোগেই ওই বর্ণমালাও ফিনিশিয়দের কাছে পৌঁছে যায়। পরবর্তীকালে ফিনিশিয়দের সঙ্গে গ্রিসদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলার সময়েই এই বর্ণমালা গ্রিকদের কাছে পৌঁছায় এবং সমস্ত ইউরোপিয় বর্ণমালার জন্মদাত্রীতে পরিণত হয়।

হাওরান-এর আগ্নেয়গিরিময় সাফা অঞ্চলে ১০০ খ্রিস্টাব্দে বা তারও পরে[১২] নাগাদ আবিষ্কৃত লিপিগুলি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে উত্তর আল-হিজাজ (তথাকথিত মূল আরবীয়) অঞ্চলের আল-উলায় আবিষ্কৃত ডেডানাইট ও লিহ্য়ানাইট লিপিগুলি এবং একই অঞ্চলের, বিশেষত আল-হিজর ও তাইমা (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) নামক স্থানে আবিষ্কৃত সামুদ জাতির লিপিগুলি পাথরে উৎকীর্ণ লিপিগুলির মাধ্যমে দক্ষিণ আরবীয় বর্ণমালার[১৩] সঙ্গে তাদের নিকট সাদৃশ্যের কথা প্রমাণ করেছে। কিন্তু এই সমস্ত শিলালিপিগুলির ভাষা মূলত উত্তর আরবীয় এবং অতি-পরিচিত প্রাচীন আরবি ভাষার থেকে

সেগুলির খুব অল্প পার্থক্যই লক্ষ করা যায়। সামূদ জাতির দেওয়ালচিত্র বা লিপি হল লিহ্‌য়ানাইট অক্ষরের উন্নত রূপ। সাফা দেওয়াল-চিত্রের মধ্যেও তার আর একটি উন্নত রূপ লক্ষ করা যায়। সুদূরতম উত্তরাঞ্চলে যে দক্ষিণ আরবীয় লেখাগুলি পাওয়া যায় তা হল, সাফা অঞ্চলের শিলালিপি। এমনকী ইথিওপিয় ভাষাতেও দক্ষিণ আরবীয় বর্ণমালার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

উত্তরাঞ্চলে এই তিনটি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাফাইটিক লিহ্‌য়ানাইট ও **সামূদিক** অক্ষরমালা ব্যবহার করত। কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ পুরোপুরি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। লিহ্‌য়ানাইটরা ছিল আদিম মানুষ। প্লিনি[১০] এদের লেচিয়েনি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তারা ছিল সামূদদের একটি অংশ। তাদের রাজধানী দায়দান ছিল একদা একটি মিনীয় উপনিবেশ। আর এই উপনিবেশটি অবস্থিত ছিল সেই রাস্তার ওপর, যে রাস্তা দিয়ে আল-ইয়ামান ও ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলিতে যেত। পেট্রার পতনের পর (১০৫ খ্রিস্টাব্দ) এক সময়ে সামূদ জাতির শহর বলে পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ নাবাতিয়ান কেন্দ্র আল-হিজর (আধুনিক মাদাইন সালিহ্‌) লিহ্‌য়ানাইটদের দখলে আসে। মিনায়ান ও নাবাতিয়ান সভ্যতা পরবর্তী সময়কার লিহ্‌য়ানাইট সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্প দ্বারা অলঙ্কৃত সমাধিস্তম্ভ-সহ আল-উলার ধ্বংসাবশেষ ইসলাম পূর্ব যুগের একটি উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে এবং তার সম্পর্কে মানুষ খুব অল্পই জানে।[১১]

● পেট্রা

আমাদের যুগের প্রথম শতাব্দীতে রোমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় পেট্রা সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির চূড়ায় পৌঁছেছিল। রোমানরা এই অঞ্চলটিকে পার্থিয়ার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মধ্যবর্তী রাজ্য বা বাফার স্টেট হিসেবে গণ্য করেছিল। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ— এই তিনদিকেই শহরটি ছিল অভেদ্য। নিরেট পাথর কেটে তৈরি এই শহরটি চারদিকে খাড়া গিরিচূড়ার মতো প্রায় অনতিক্রম্য চড়াই দ্বারা ঘেরা ছিল এবং কেবলমাত্র একটি সরু কুণ্ডলাকার গিরিসংকটের মধ্য দিয়েই এই শহরে প্রবেশ করা যেত। জর্ডান ও মধ্য আরবের মধ্যে এই শহরটিই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে অপর্যাপ্ত হলেও প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যেত। এখানেই দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের উত্তরমুখী মরুযাত্রায় নতুন নতুন উট ও উটচালক সংগ্রহ করত। এইভাবেই নাবাতিয়ানরা বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু গড়ে তুলেছিল এবং তার সাহায্যেই দক্ষিণ আরবের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পেট্রার বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষ এখনও বহু পর্যটককে আকর্ষণ করে এবং ট্রান্সজর্ডান নামে আধুনিক রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস রূপে কাজ করে আসছে।

পেট্রায় এক ধরনের কাবা ছিল যেখানে একটি কালো আয়তাকৃতি পাথরকে দুশারা [illegible]

হেলেনীয় আমলে নাবাতিয়ানদের রাজ্যে সেই দেবতার আরাধনার প্রচলন হয়েছিল এবং মদের দেবতা হিসাবে তার ওপর ডায়োনিসাস ব্যাক্কাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছিল।

খ্রিস্টের জন্মের পর প্রথম দু'শো বছরে যেহেতু ভারতে যাবার সমুদ্রপথ রোমের নাবিকদের কাছে ক্রমশ বেশি পরিচিত হয়ে গেল, পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী মরুযাত্রার পথটি ক্রমাগত পালমীরাসংলগ্ন উত্তরাঞ্চলের দিকে সরে যেতে লাগল, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার বাণিজ্যও পরবর্তীকালের তীর্থযাত্রার পথ থেকে আরও পূর্ব দিকে এবং বর্তমান হিজাজ রেলপথ ধরে সংঘটিত হতে লাগল, তার ফলে পেট্রা তার সুবিধাজনক অবস্থানটি হারাল এবং নাবাতিয়ান রাজ্যের সমৃদ্ধি কমতে লাগল। ট্রাজানদের অর্থলিপ্সা ও অদূরদর্শিতার ফলে ১০৫ খ্রিস্টাব্দে শহরটির গুরুত্ব কমে যাওয়ায় আরবীয় পেত্রিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল (১০৬ খ্রিঃ) এবং তার নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রভিন্সিয়া অ্যারাবিয়া হল। তারপর থেকে বহু শতাব্দী ধরে পেট্রার ইতিহাসে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে।[17]

● পালমীরেনা

পার্থিয়া কর্তৃক মেসোপটেমিয়া জয়ের পর পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি এবং আমাদের যুগের প্রথম শতাব্দীর পরে যে সমস্ত নতুন যাতায়াত-পথ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, তার পরিণতিতে সিরীয় মরুভূমির মধ্যস্থলে একটি মরূদ্যানে অবস্থিত একটি শহর খ্যাতি লাভ করল এবং গোটা বিশ্বে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এই শহরটিরই নাম হল পালমীরা (আরবীভাষায়, তাদমুর)। এর বর্তমান ধ্বংসাবশেষটি যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন নিয়ে কম গবেষণা করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এবং সবচেয়ে সুন্দর। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ পার্থিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের মাঝে অবস্থিত পালমীরা-কে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে হত।[18] এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিশুদ্ধ ও খনিজ জলের প্রাচুর্য এই শহরটিকে শুধু পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকী দক্ষিণ আরব থেকে শুরু করে দক্ষিণ ও উত্তরের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের একটি মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাদেরকে 'মরুযাত্রীদলের প্রধান' ও 'বাজারের প্রধান' হিসেবে শিলালিপিতে অগ্রগণ্য নাগরিক[19] রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। আমাদের যুগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে এই মরুনগরীটি নিকট প্রাচ্যের অন্যতম সম্পদশালী নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

তাদমোর (পালমীরা-র প্রথম দিককার সেমিটিক নাম) সম্ভবত একটি অতি প্রাচীন শহর, কারণ প্রথম তিগলাথ পাইলেসার (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১০০)-এর একটি শিলালিপিতে আমুররুর তাদমার[20] নামে এর উল্লেখ আছে। এর ধ্বংসাবশেষ দেখে আরবের গল্পকারেরা

এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে তারা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জিন্নেরা রাজা সলোমনের জন্য এটি তৈরি করেছিল।

আরবেরা ঠিক কোন্ সময়ে পালমীরা অধিকার করেছিল, স্থানীয় প্রচলিত কাহিনী থেকে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। এই শহরটি সম্পর্কে প্রথম যে-নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় তার থেকে জানা গেছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৪২-৪১ নাগাদ মার্ক অ্যান্টনি শহরটির সম্পদ দখল করার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। শহরটির সবচেয়ে পুরানো শিলালিপিটির সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৯। সেই সময়ে রোম ও পার্থিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে পালমীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

রাজার শাসন চলার সময়েই শহরটি রোমের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে আসে, কারণ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত রাজার যে আদেশ আমরা দেখতে পাই তার সময়কাল হল ১৭ খ্রিস্টাব্দ। হাদ্রিয়ান (১১৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর সময়ে পালমীরা ও তার ওপর নির্ভরশীল রাজ্যগুলি রোম সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৩০ খ্রিস্টাব্দে হাদ্রিয়ানের দর্শনের পরে শহরটির নাম হল হাদ্রিয়ানা পালমীরা। সেপ্টেমিয়াস সেভেরাস (১৯৩-২১১ খ্রিঃ) পালমীরা ও এর অন্যান্য শহরগুলিকে রোম সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক নগরে পরিণত করেন। তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে পালমীরা একটি উপনিবেশের মর্যাদা লাভ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রোম সার্বভৌমত্বকে নামেমাত্র স্বীকৃতি প্রদান করে এটি প্রশাসনিক স্বাধীনতা ভোগ করত। পালমীরার অধিবাসীরা তাদের নামের সঙ্গে রোমান নাম যুক্ত করতে শুরু করে। রোমানরা এই শহরটির সামরিক গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়, কারণ দামাস্কাস থেকে তাদের ইউফ্রেটিস যাবার রাস্তাটা পালমীরার মধ্য দিয়েই গেছে।

১৩০ থেকে ২৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পালমীরা তার সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছিল। এর অধিকাংশ খোদাই করা বাণীযুক্ত স্তম্ভগুলি এই সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্বদিকে সুদূর চীনদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং মরু-বাণিজ্যের দ্বারা সৃষ্ট এই শহরটি পরে পেট্রার উপযুক্ত উত্তরসূরিতে পরিণত হয়েছিল।

● ওডেনাথ এবং জিনোবিয়া

প্রথম শাপুর ২৬০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে বন্দি করেছিলেন এবং সিরিয়ার একটি বিরাট অংশ দখল করেছিলেন। তাদের সেনাপতি ওডেনাথ (ওডেনাথাস; আরবী ভাষায় উযাইনাহ্) যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রথম শাপুরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পালমীরার অধিবাসীরা যুদ্ধবাজ বলে পরিচিতি লাভ করেনি। তার রাজধানী টেসিফন (আল-মাদাইন)-এর প্রাচীর পর্যন্ত ওডেনাথ সেখানকার রাজা শাপুরকে ধাওয়া করেন। পার্থিয়ানদের উত্তরসূরি সাসানিদ (২২৬ খ্রিঃ) ও রোমানদের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে পালমীরার সেনাপতি রোমানদের পক্ষে যোগ দেন এবং ২৬২ ডাক্স ওরিয়েন্টিস অর্থাৎ প্রাচ্যে উপ-সম্রাট

নিযুক্ত হন। সম্রাট গ্যালিয়েনাস তাকে সাম্মানিক 'ইমপারেটর' উপাধি দান করেন এবং প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। অর্থাৎ এশিয়া মাইনর ও মিশরে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব নামেমাত্রই তার হাতে ছিল। সিরিয়া, উত্তর আরব ও সম্ভবত আর্মেনিয়াতেও অবস্থা ছিল একইরকম। এইভাবেই পালমীরা পশ্চিম এশিয়ার স্বত্বাধিকারীতে পরিণত হয়। চার বছর পরে (২৬৬-৬৭ খ্রিঃ) রোমের প্ররোচনাতেই ওডেনাথ ও তার বড় ছেলেকে হিমস্ (এমেসা)-এ গোপনে হত্যা করা হয়, কারণ রোমের শাসকদের চোখে তারা আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছিল।

ওডেনাথের সুন্দরী ও উচ্চাকাঙক্ষী স্ত্রী জিনোবিয়া (আরাম ভাষায়, বাথ জাবে, আরবীতে, আল-জাব্বা, জাইনাব) তার সুযোগ্য উত্তরসূরি হয়ে উঠেছিলেন। তার নাবালক পুত্র ওয়াহাব-আল্লাথ (আল-লাত-এর উপহার, গ্রিক অ্যাথেনোডোরাস)-এর পক্ষে শাসন চালাতে গিয়ে তিনি উদ্ধতভাবে 'প্রাচ্যের রানি' উপাধি গ্রহণ করেন এবং কিছু সময়ের জন্য রোম সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। পুরুষোচিত কর্মোদ্যোগের পরিচয় দিয়ে তিনি তার রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন এবং মিশর ও এশিয়া মাইনরের একটি বিরাট অংশ তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এশিয়া মাইনরেই তার সেনাদল ২৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমের সেনাদলকে পর্যুদস্ত করে সুদূর আঙ্কারা (আঙ্কিরা) পর্যন্ত তাদের পিছু হঠিয়ে দেন। বাইজান্টিয়ামের বিপরীত দিকে অবস্থিত চ্যালসিডনে সামরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও হয়েছিল। তার বিজয়ী সেনাদল ওই একই বছরে রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে এবং তখন মিশরের রাজা বলে ঘোষিত তার নাবালক পুত্র যে মুদ্রাগুলি চালু করেছিল তার থেকে অরেলিযান-এর মাথাটি বাদ দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাফল্যের পিছনে পালমীরা-র দুই জেনারেল জাববে এবং জাবদার ভূমিকাই ছিল প্রধান।

শেষ পর্যন্ত অরেলিয়ান কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। অ্যান্টিকের যুদ্ধে এবং তারপরেই হিমস্-এর কাছে আর একটি যুদ্ধে তিনি জাবদা-কে পরাজিত করলেন এবং ২৭২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পালমীরাতে প্রবেশ করলেন। গর্বিত আরব-রানি হতাশাগ্রস্ত হয়ে এক কুঁজওয়ালা উটের পিঠে চেপে দ্রুত মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বন্দি হলেন এবং বিজয়গর্বে রোমে প্রবেশের মুহূর্তটিকে মর্যাদামণ্ডিত করার জন্য বিজয়ী রাজার রথের সামনে সোনার শিকলে বদ্ধ অবস্থায় রানিকে নিয়ে যাওয়া হল। রাজধানীতে ফিরে আসার পথে পালমীরাতে অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে অরেলিয়ান দ্রুত সেখানে ফিরে যান, সেখানকার প্রাচীরগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন এবং সেখানকার কমনওয়েলথ ভেঙে দেন। গৌরবময় সূর্যমন্দিরের (বেল) সমস্ত অলঙ্কার তার উল্লেখযোগ্য বিজয়ের স্মরণে প্রাচ্যের সূর্য দেবতার উদ্দেশে রোমে নির্মিত নতুন মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। গোটা শহরটি ধ্বংসস্তূপে

পরিণত হয়, বর্তমানেও সেই একই অবস্থায় শহরটি পড়ে আছে। এইভাবেই পালমীরা-র দীপ্তিমান ও ক্ষণপ্রভ গৌরবের অবসান ঘটে।

পালমীরার সভ্যতা ছিল গ্রিক, সিরীয় ও পার্থিয় (ইরানীয়) উপাদানের উৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ। এই সভ্যতা কেবলমাত্র নিজের উৎকর্ষের দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়, বরং নাবাতিয়ান সভ্যতার মতো এটিও উপযুক্ত সহায়তা পেলে মরুবাসী আরবেরা যে সংস্কৃতির উন্নত স্তরে পৌঁছতে সক্ষম, তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পালমীরার অধিবাসীরা যে আরবীয় বংশোদ্ভূত তা তাদের বিশেষ নাম ও সিরীয় ভাষায় খোদাই করা বাণীতে আরবী শব্দের বহুল ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারা যায়। তারা সাধারণত পশ্চিম সিরীয়দের ভাষায় কথা বলত এবং তার সঙ্গে নাবাতিয়ান ও মিশরিয়-সিরীয় ভাষায় যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাদের ধর্মের মধ্যে সৌর সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল এবং উত্তর আরবীয়দের ধর্মেও তা দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের দেবতা বেল সর্বদেবতার মন্দিরের মাথায় স্থাপিত রয়েছেন, শপথমূলক বাণীযুক্ত শিলালিপিতে বাল শামিন (স্বর্গের প্রভু বা দেবতা)-এর মূর্তি চিত্রিত আছে এবং পালমীরা-তে কমপক্ষে ২০ জন দেবতার নামের উল্লেখ আছে।

পালমীরার ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের পতনের পর ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক ভাবেই অন্যপথ খুঁজতে লাগল ও তার সন্ধানও পেল। একসময় মরুশহর পালমীরা যেমন পেট্রার কাছ থেকে অনেক সুবিধা পেয়েছিল, তেমনি হাওরান-এ অবস্থিত বাসরা (বসট্রা) ও অন্যান্য গাস্‌সানীয় শহরও এক মরু শহরের সুবিধাপ্রাপকে পরিণত হল।

● গাস্‌সানী বংশ

এক অতি প্রাচীন দক্ষিণ আরবীয় উপজাতির বংশধর বলে গাস্‌সানী বংশ দাবি করে থাকে। এই উপজাতির প্রাক্তন প্রধান ছিল আমর জাইকিয়া ইব্‌ন-আমির মা-আল-সামা। তৃতীয় খ্রিস্টিয় শতাব্দীর শেষ দিকে মাআরিব বাঁধ ধ্বংসের পর এই উপজাতি প্রধান আল-ইয়ামান থেকে হাওরান [২১] ও আল-বালকাতে পালিয়ে যায়। আমর-এর এক পুত্র জাফনাকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। আবু-আল-ফিদার[২২] মতে, এই বংশে ছিল ৩১ জন সার্বভৌম রাজা, হামজা আল-ইসফাহানির[২৩] মতে ৩২ জন এবং আল-মাসউদী[২৪] ও ইব্‌ন-কুতাইবার[২৫] মতে ১১ জন। এই সংখ্যাগুলির অসামঞ্জস্য থেকেই বোঝা যায়, আরব ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে জাফনিদ ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট ছিল।

প্রথম আরবীয় হিসেবে সালীহ্‌ উপজাতি সিরিয়াতে রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই ইয়ামানী উপজাতি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং দামাস্কাসের সঙ্গে মাআরিব-এর সংযোগ সাধনকারী যে বিরাট বাণিজ্যপথ ছিল তার উত্তর প্রান্তে, দামাস্কাসের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। কালক্রমে বানু-গাস্‌সান উপজাতি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং সিরীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজেদের দেশীয় আরবী ভাষা বর্জন না-করেও তারা সিরীয় ভাষা গ্রহণ

করে। উর্বর তুরস্কের অন্যান্য আরবীয় উপজাতিগুলির মতো তারাও এইভাবে দ্বিভাষী উপজাতিতে পরিণত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ নাগাদ তারা বাইজানটাইনের রাজনৈতিক প্রভাবে আসে এবং বেদুইন উপজাতির অনুপ্রবেশ রোধ করার ক্ষেত্রে একটি 'বাফার' রাজ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজকের দিনে ব্রিটিশ শাসনে ট্রান্সজর্ডান যে ভূমিকা পালন করছে তার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রভাবকে কিছুটা দমন করার জন্য গাস্‌সানীরা এক ধরনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল যা স্থানীয় মোনোফাইসাইট চরিত্রের হলেও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপূরক ছিল। প্রথমে তাদের রাজধানীটি ছিল একটি ভ্রাম্যমাণ শিবির; পরবর্তী সময়ে জাওয়ালান (গাউলানাইটিস)-এ অবস্থিত আল-জাবিয়া ও কিছুদিনের জন্য জিললিক[২৬] নামে দুটি জায়গায় তাদের রাজধানী নির্দিষ্ট হয়েছিল।

● সিরীয়-আরব রাজত্বের চরম উন্নতি

আল-হিরাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও আত্মীয় লাখমিয় রাজ্যের মতো গাস্‌সানীয় রাজ্যও খ্রিস্টজন্মের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই শতাব্দীতে গাস্‌সান-এর শাসক দ্বিতীয় আল-হারিস ইবন-জাবালা (আনুমানিক ৫২৯-৬৯) ও আল-হিরার শাসক তৃতীয় আল-মুনযির ইবন-মা-আল-সামা (বাইজান্টাইন ইতিহাসে উল্লিখিত অ্যালামানডারাস, মৃ. ৫৫৪) আরবের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। জাফনিদ রাজবংশের ইতিহাসে এই আল-হারিস (ছদ্মনাম আল-আ'রাজ, খোঁড়া, আরব রচয়িতাদের দ্বারা এই নামে প্রচারিত)-ই প্রথম বিশ্বস্ত ও সবচেয়ে মহান শাসক। গ্রিক ঐতিহাসিকদের রচনা[২৭] থেকে তার সময়কার ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করা যায়। দুর্ধর্ষ লাখমিয় প্রতিদ্বন্দ্বী তৃতীয় আল-মুনযিরকে পরাস্ত করার পুরস্কার হিসেবে বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান তাকে সিরিয়ার সমস্ত আরব উপজাতিদের শাসক হিসেবে নিয়োগ করেন (৫২৯ খ্রিঃ) এবং তাকে অভিজাত ও নেতা মনোনীত করেন। এর অর্থ হল সম্রাটের ঠিক পরেই সর্বোচ্চ আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হন। আরবী ভাষায় এই উপাধির সহজ-সরল অর্থ হল মালিক বা রাজা।

বাইজানটাইন সম্রাটের স্বার্থরক্ষার্থে আল-হারিস শাসিত দীর্ঘ আমল জুড়ে যুদ্ধ শুরু হয়। ৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৃতীয় আল-মুনযিরের সঙ্গে এক যুদ্ধে আল-হারিসের এক পুত্র আল-মুনযিরের হাতে ধরা পড়েন এবং গ্রিকদের প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অ্যাফ্রোডাইটীর[২৮] আরবীয় সংস্করণ আল-উজ্জার কাছে তাকে বলি দেওয়া হয়। এর ঠিক দশ বছর পরে আল-হারিস এক যুদ্ধে তার প্রতিশোধ নেন এবং কিননাসরিনের জেলায় তার লাখমিদ শত্রুকে হত্যা করেন। আরবীয় বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধটিকে 'হালিমার দিন' বলে অভিহিত করা হয়। আল-হারিসের মেয়ে হালিমা ওই দিন যুদ্ধের আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ১০০ গাস্‌সানী বীরকে নিজের হাতে সুগন্ধি মাখিয়ে দেন এবং বর্ম ছাড়াও শাদা লিনেনের পোশাক পরিয়ে দেন।[২৯]

আল-হারিস ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলে[৩০] প্রথম জাস্টিনিয়ানের দরবারে দেখা করতে আসেন। এই বেদুইন প্রধানের আবির্ভাব সম্রাটের অনুগামীদের ওপর গভীর প্রভাব

ফেলে। কনস্ট্যান্টিনোপলে থাকার সময়ে সিরীয় আরবদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে আল-হারিস সেখানকার মোনোফাইসাইট বিশপ বলে পরিচিত এডেসার জ্যাকব বারাডিউস (ইয়াকুব আল-বারদায়ি)-এর নিয়োগকে সুনিশ্চিত করেন। নিজের মত প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি এত বেশি উদ্যমী ছিলেন যে, সিরীয় মোনোফাইসাইট গির্জা পরবর্তী কালে তার নাম অনুসারে জ্যাকোবাইট বলে পরিচিতি লাভ করে।

● আল-হারিস-এর পুত্র আল-মুনযির

আল-হারিস-এর উত্তরসূরি ছিলেন তার পুত্র আল-মুনযির। বাইজানটাইন রচনাকারদের কাহিনীতে তিনি অ্যালামানডারাস নামেও পরিচিত হয়েছেন। তার বাবার মতো আল-মুনযিরও ছিলেন মোনোফাইসাইটিজম[১১] এর অত্যুৎসাহী রক্ষক। সাময়িকভাবে এটি বাইজান্টিয়ামের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় এবং এর ফলে গাসসানিরা প্রকাশ্য বিদ্রোহে শামিল হয়। ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কনস্টান্টিনোপলে আসেন এবং দ্বিতীয় টিবেরিয়াস তাকে প্রভূত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান ও তার মাথার মূল্যবান মুকুটটি খুলে আরও দামী একটি মুকুট পরিয়ে দেন। ওই বছরেই তিনি আল-হিরাতে[১২] আক্রমণ চালান—এবং তার লাখমিয় শত্রুদের এই রাজধানী শহরটিকে পুড়িয়ে দেন। কিন্তু এই আক্রমণ তাঁর বাবার প্রতি রাজ আনুগত্যে বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিযোগ উঠেছিল তা নিরসন করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। দামাস্কাস ও পালমীরার মাঝামাঝি অবস্থিত হুয়ারিন নামে একটি জায়গায় স্থাপিত গির্জা থেকে তাকে উৎসর্গ করার সময় ধরা হয় এবং বন্দি করে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে যাওয়া হয় ও পরে সিসিলিতে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। একই ভাবে তার পুত্র ও উত্তরসূরি, যিনি বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ধ্বংস করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, সেই আল-নু'মানকেও গ্রেপ্তার করে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে যাওয়া হয়।

● বানু-গাস্সানের পতন

আল-মুনযির ও আল-নু'মানের পর গাস্সানরাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সিরীয় মরুভূমির বিভিন্ন উপজাতি নিজেদের গোষ্ঠীপতি ঠিক করে নিল। সামানিদ শাসক খুসর পারবিজ কর্তৃক জেরুসালেম ও দামাস্কাস দখলের (৬১৩-১৪ খ্রিঃ) ঘটনাটি জাফনিদ সাম্রাজ্যে শেষ আঘাত হানে। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার পুনর্বিজয়ের পর হেরাক্লিয়াস সিরীয়-আরব নেতৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে পেরেছিলেন কি না তা অনিশ্চিত। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, জাবালা ইবন-আল-আইহাম ছিলেন গাস্সান রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি। ইয়ারমুক-এর স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রে (৬৩৬ খ্রিঃ) এই রাজা বাইজান্টাইন শাসকের পক্ষ নিয়ে আরবীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রচলিত একটি কাহিনী থেকে জানা যায়, তার প্রথম তীর্থযাত্রার সময়ে যখন তিনি পায়ে হেঁটে কাবার চারদিকে ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক বেদুইন তার আলখাল্লা মাড়িয়ে দেয় এবং প্রাক্তন রাজা সঙ্গে সঙ্গে তার গালে চড় মারেন। পরে খলিফা উমার নির্দেশ দেন যে এর জন্য জাবালা-কে হয় ওই বেদুইনের কাছ থেকে একটি চড় খেতে হবে অথবা জরিমানা দিতে হবে। ফলে জাবালা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন এবং কনস্ট্যান্টিনোপলে ফিরে যান।

বাইজানটাইনের প্রতিবেশী গাস্সানিরা যে সাংস্কৃতিক মান অর্জন করেছিল পারসীয় সীমান্তে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী লাখমিয়দের অর্জিত সাংস্কৃতিক মানের তুলনায় তা নিঃসন্দেহে উন্নত মানের ছিল। তাদের রাজত্বে এবং রোমান আমলের প্রথম দিকে সিরিয়ার গোটা পূর্বাঞ্চল জুড়ে আরবী, সিরীয় ও গ্রিক উপাদানের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কালো রঙের আগ্নেয়শিলার বাড়ি, প্রাসাদ, জয়স্তম্ভ, সাধারণ স্নানাগার, কৃত্রিম জলপ্রণালী, নাট্যশালা ও গির্জাগুলি যেখানে দাঁড়িয়েছিল আজ সেখানে চূড়ান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। হাওরানের পূর্ব ও দক্ষিণ ঢালে তিনশো শহর ও গ্রামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এবং সেখানে এখনও অল্প কয়েকটির অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলাম-পূর্ব আরবের কয়েকজন কবি গাসসানি প্রধানদের মধ্যে অতিশয় দানশীল পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান পেয়েছিলেন। সাতজন কবির মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট এবং বিখ্যাত 'মুয়াল্লাকাত'-এর রচয়িতা লাবিদ, হালিমা-র যুদ্ধে গাসসানিদের পক্ষে লড়েছিলেন। আল-নাবিগাহ্ আল-যুব'ইয়ানি যখন লাখমিয় রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন, আল-হারিস-এর পুত্রদের রাজদরবারে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। বানু-গাসসানের সঙ্গে আত্মীয়তার দাবিদার মাদিনীয় কবি হাসসান ইবন-সাবিত (আনুমানিক ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে) তার যৌবনকালে তাদের রাজদরবারে এসেছিলেন। তখনও তিনি মুহাম্মাদের দরবারে রাজকবি হননি এবং তার রচিত 'দিওয়ান' (কাব্য সঞ্চয়ন) নামের বইটিতে তিনি একথা কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। তার নামে প্রচলিত অথচ অপ্রামাণিক একটি অনুচ্ছেদে জাবালা-র রাজদরবারের বিলাস ও প্রাচুর্য-সহ মক্কা, ব্যাবিলন ও গ্রিসের পুরুষ ও মহিলা কণ্ঠশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রী এবং মদের অবাধ ব্যবহার সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল বর্ণনা আছে।

● লাখমিয় রাজবংশ

স্মরণাতীত কাল থেকেই আরবীয় ভবঘুরে তাদের উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল ধরে ছোট ছোট দলে টাইগ্রো-ইউফ্রেটিস উপত্যকায় ভিড় জমিয়েছিল এবং সেখানে তারা স্থায়ী ভাবে বাস করতে শুরু করেছিল। আমাদের যুগের তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে তানূখ বলে পরিচিত এবং ইয়ামানীয় সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত এমন কয়েকটি উপজাতি ইউফ্রেটিসের পশ্চিম দিকের উর্বর অঞ্চলটিতে তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলেছিল। আরসাসিদ পার্থিয়ানদের পতন ও সাসানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠার (২২৬ খ্রিঃ) পর যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে মনে হয়

তানূখ উপজাতির মানুষেরা প্রথমে তাঁবুতে বাস করত। তাদের এই অস্থায়ী তাঁবুগুলিই কালক্রমে আল-হিরা (সিরীয় ভাষায় হারতা, ঘাঁটি) নামে একটি স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত হয়। প্রাচীন ব্যাবিলন নগরীর অনতিদূরে আল-কূফার দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল জায়গা জুড়ে এটি গড়ে উঠেছিল। এই আল-হীরা পরে পারসীয় আরবের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

দেশীয় মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিল খ্রিস্টান, এরা পূর্ব সিরীয় (পরে নেস্টোরিয়ান) চার্চের অনুগামী ছিল এবং আরব গ্রন্থকারেরা এদের 'ইবাদ' অর্থাৎ (খ্রিস্টের) আরাধনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তানূখ উপজাতির বেশ কিছু মানুষ পরবর্তী কালে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং উত্তর সিরিয়ায় বসবাস করতে শুরু করে। তানূখ উপজাতি পরে দক্ষিণ লেবাননে আসে এবং গোপনে দ্রুজ ধর্ম গ্রহণ করে আল-হিরা অঞ্চলের লাখমিয় রাজাদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হয়।

প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মালিক ইবন-ফাহ্‌ম আল-আজদি ছিলেন আল-ইরাকে বসবাসকারী আরবীয় উপজাতিটির প্রথম গোষ্ঠীপতি। তিনি তার পুত্র জাযিমাহ্ আল-আবরাশকে আরদাশির অঞ্চলে সামন্ত রাজা করেছিলেন। কিন্তু লাখমিয় রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমর ইবন-আদি ইবন-নস্‌র ইবন-রাবীয়া ইবন-লাখম। তিনি ছিলেন জাযিমা-র এক বোনের সন্তান। সেই বোনটি জাযিমা-র এক চাকরকে বিয়ে করেছিল। আল-হীরা অঞ্চলে আমর তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটিকে তাঁর রাজধানীতে পরিণত করেন।

আমাদের যুগের তৃতীয় শতাব্দীর পরের দিকে নাসরিয বা লাখমিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। আমাদের কাছে প্রায় ২০ জন লাখমিয় রাজার পরিচয়লিপির মধ্যে প্রাচীনতম হল প্রথম ইমরু-আল-কায়িসের (মৃ. ৩২৮ খ্রিঃ)। লিপিগুলিতে ব্যবহৃত হরফগুলি নাবাতিয়ান হরফের পরিবর্তিত রূপ এবং বিশেষ করে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের উত্তর আরবীয় হরফে রূপান্তরিত হবার অনেক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

ইমরু-আল-কায়িস-এর একজন বংশধর ছিলেন আল-নু'মান প্রথম আল-আওয়ার (এক-চক্ষু, আনুমানিক ৪০০-৪১৮), তিনি ছিলেন কাব্য ও রূপকথায় বিখ্যাত। আল-হিরার কাছে আল-খাওয়ারনাক নামে একটি বিখ্যাত দুর্গ তৈরির জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এটি প্রথম আজদাগির্দের (৩৯৯-৪২০)-এর পুত্র বাহ্‌রাম গর-এর বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আজদাগির্দ তার পুত্রকে মরুভূমির স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় মানুষ করে তুলতে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। আল-খাওয়ারনাক একটি বিস্ময়কর শৈল্পিক নিদর্শন বলে ঘোষিত হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকদের মত অনুসরণ করে বলা যায় যে, বাইজান্টাইনের এক স্থপতি এই দুর্গটি তৈরি করেছিলেন। অন্যান্য অনেক বিখ্যাত স্থপতির মতো তাকেও কাজের শেষে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কোনরকমেই যাতে ওই শৈল্পিক নিদর্শনটির দ্বিতীয় কোন হুবহু নিদর্শন তৈরি করা না যায় তার জন্যই তার স্রষ্টাদের মেরে ফেলা হত। জনপ্রিয় এই সমস্ত কাহিনীগুলির

এটিই ছিল সারবস্তু। আল-নু'মান প্রায় যারা জীবনই ছিলেন পৌত্তলিকতাবাদী। এক সময়ে তিনি তার খ্রিস্টধর্মাবলম্বী প্রজাদের ফাঁসি দিয়েছিলেন এবং সেন্ট সিমিয়নকে দেখার ক্ষেত্রে আরবীয়দের বাধা দিয়েছিলেন। অবশ্য জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সিমিয়ন নিজে ছিলেন একজন আরব এবং স্তম্ভের ওপর বসবাসকারী এই কঠোর তপস্বীকে দেখার জন্য মরুভূমির মানুষেরা ভিড় জমাত। আল-খাওয়ারনাক-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি কবিতায় উল্লিখিত এবং আল-হিরা ও সিরিয়া-র` মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি মরুভূমির মাঝে অবস্থিত আল-সাদির-এর নির্মাণকার্যটিও আল-নু'মানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-সাদির এবং অন্যান্য লাখমিয় হিরাহ আজ কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতায় উল্লিখিত কয়েকটি নামমাত্র। আল-খাওয়ারনাক ছাড়া আর কোনটির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

● ক্ষমতার শীর্ষে আল-হিরা

আল-নু'মানের পুত্র ও উত্তরসূরি প্রথম আল-মুনযির (আনুমানিক ৪১৮-৬২ খ্রিঃ)-এর আমলে আল-হিরা সেই সময়কার ঘটনাবলিতে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। আল-মুনযিরের প্রভাব এত বিরাট ছিল যে তিনি সিংহাসনের এক শক্তিশালী দাবিদারের পরিবর্তে এক সময়ে তার বাবার আশ্রিত ব্যক্তি বাহরামকে সিংহাসনে বসাতে পারসীয় যাজকদের বাধ্য করেন। সাসানিদ সার্বভৌম রাজ্যের পাশাপাশি অঞ্চলে ৪২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আল-হিরার শাসক ছিলেন তৃতীয় আল-মুনযির (আনুমানিক ৫০৫-৫৪ খ্রিঃ)। আরববাসীরা তাকে ইবন-মা-আল-সামা বলে ডাকত। মা-আল-সামা (স্বর্গীয় জলধারা) ছিল তার মা মারিয়া বা মাবীয়া-র ডাকনাম। লাখমিয় রাজবংশের ইতিহাসে তার শাসনকালকেই সবচেয়ে গৌরবময় যুগ বলা হত। রোম-শাসিত সিরিয়ার পথে তার রাজ্য ছিল যথার্থই একটি কাঁটাস্বরূপ। গাস্সানিদ আল-হারিসের[..] মধ্যে যতক্ষণ তিনি তার সমান শক্তিধর একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজ না পেয়েছিলেন, ততক্ষণ তিনি অ্যান্টিয়োক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই আল-মুনযির সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করেছেন আল-আগানি।[..] এই কাহিনী থেকে জানা যায় যে, আল-মুনযির ও তাঁর এক সমভাবাপন্ন বন্ধু যখন মদপান ও হৈ-হুল্লোড় করছিলেন, তখন তিনি সেই বন্ধুটিকে জীবন্ত কবরস্থ করেন।

তার পুত্র ও উত্তরসূরি আমর-এর পদবি ছিল ইবন-হিন্দ (৫৫৪-৬৯ খ্রিঃ)। যদিও তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন তবুও তিনি কবিদের এক দানশীল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারাফা ইব্ন-আল-আবদ, আল-হারিস ইব্ন-হিল্লিজা ও আমর ইব্ন-কুলসুম ('গোল্ডেন ওড্স্-এর সাতজন বিখ্যাত কবির তিনজন, মুয়াল্লাকাত)-এর মতো সেই সময়কার মহত্তম চারণকবি তার

রাজদরবারে যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য লাখমিদ ও জাফনিদ রাজাদের মতো আমর সমসাময়িক কবিদের জনমত সৃষ্টিকারী নেতা ও প্রচারবিদ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। বেদুইনদের মধ্যে তাদের প্রভাব বিস্তার হয়েছে দেখার আশা নিয়ে তিনি ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকেরা তাদের দরবারে প্রায়ই আসতেন এমন কবিদের জন্য বিপুল অর্থ দান করেছিলেন। আমর তার আশ্রিত ব্যক্তি ইবন-কুলসুমের হাতে খুন হয়েছিলেন। রাজা তার মাকে যেভাবে অপমান করেছিলেন তার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে এই খুন করেছিল।

● রাজ-পরিবারের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ

আমর-এর মা হিন্দ ছিলেন গাস্সানের এক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী রাজকন্যা। অনেকে আবার বলেন, তিনি ছিলেন কিনদা-র রাজকন্যা। রাজধানীতে তিনি সন্ন্যাসিনীদের একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি ইসলামি যুগের[১১] দ্বিতীয় শতাব্দীতেও টিকে ছিল। ইয়াকুত[১২] এর উৎসর্গমূলক শিলালিপিগুলি সংরক্ষণ করেছেন। এই লিপিগুলিতে হিন্দ নিজেকে 'খ্রিস্টের পরিচারিকা, তাঁর ক্রীতদাসের (আমর) মা ও তাঁর ক্রীতদাসের বোন' বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্ব-সিরীয় ধর্মমতে বিশ্বাসী জনসাধারণের মধ্যে যে খ্রিস্টানরাই ছিল আল-হিরার বিশপদের সম্পর্কে উল্লিখিত অনেক প্রসঙ্গ থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। তাদের একজন ৪১০ খ্রিস্টাব্দের শুরু নাগাদ বেঁচেছিলেন।

চতুর্থ আল-মুনযিরের পুত্র তৃতীয় আল-নু'মান আবু-কাবুস (আনুমানিক ৫৮০-৬২২)-এর সঙ্গে সঙ্গে লাখমিয় রাজবংশের পতন ঘটে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবি আল-নাবিঘা আল-যুব'ইয়ানির এক পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য পরবর্তীকালে এক মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে এই কবিকে আল-হিরা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি খ্রিস্টান পরিবারে লালিত পালিত হয়ে আল-নু'মান খ্রিস্টধর্মাবলম্বীতে রূপান্তরিত হন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম ও একমাত্র খ্রিস্টধর্মাবলম্বী লাখমিয় রাজা। লাখমিয় রাজবংশের আর কোন রাজাই যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেননি, তার কারণ হল হিরার রাজার চেয়ে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে পারসীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করাটাই দরকারি বলে মনে করেছিল। পূর্ব-সিরীয় (নেস্টোরিয়ান) এক প্রার্থনাসভায় আল-নু'মান ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এই ধর্মসভাটি পারসীয়দের কাছে খুব একটা আপত্তিকর ছিল না।

সিরীয়-বাইজানটাইন প্রভাবে পেট্রা, পালমীরা ও গাস্সানের আরবীয় সভ্যতা উন্নতির যে স্তরে পৌঁছেছিল, পারস্যের মুখোমুখি হওয়া আল-হিরার আরবীয় সভ্যতা সে জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। দৈনন্দিন জীবনে আল-হীরার আরবেরা আরবী ভাষাতেই কথা বলত, কিন্তু লেখালেখির ক্ষেত্রে সিরীয় ভাষাকেই কাজে লাগাত। ঠিক যেভাবে নাবাটিয়ান ও পালমীরার মানুষেরা আরবীতে কথা বলত ও সিরীয় ভাষায় লেখালিখি করত। ইউফ্রেটিস নদীর নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলে খ্রিস্টানরাই পড়া, লেখা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্বর আরবদের শিক্ষকের

ভূমিকা পালন করত। আল-হিরা থেকে কল্যাণকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে মূল আরব ভূখণ্ডে। সেখানে এমন মানুষও ছিল যারা বিশ্বাস করত যে, নাজরানে খ্রিস্টানধর্ম চালু হবার পিছনে আল-হিরার সিরীয় গির্জার ভূমিকাই ছিল প্রধান। ইব্‌ন-রুসতা[৪৫]-র লেখায় সংরক্ষিত প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে আল-হীরা থেকেই কুরাইশ গোষ্ঠী লেখার কৌশল ও মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস[৪৬] আয়ত্ত করেছিল। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই উপদ্বীপে লাখমিয় রাজত্বের মধ্য দিয়ে পারসীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তার প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আল-নু'মানের পর তায়ি-র আইয়াজ ইবন-কাবীসা শাসন চালান (৬০-২-১১ খ্রিঃ), কিন্তু সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করতেন এক পারসীয় অধিবাসী। পারসীয় রাজারা অসতর্কভাবে আরবীয় সামন্ত প্রথা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং পারসীয় গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। আরবীয় সেনাপতিরা তাদের অধীনেই ছিল। ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে অবস্থাটা ছিল এইরকম—ঠিক সেই সময়েই মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে খালিদ ইবন-আল-ওয়ালিদের কাছে আল-হিরা[৪৭] বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

● কিনদা

গাস্‌সানী ও বাইজান্টাইনের অধিবাসী এবং লাখমিয় ও পারস্যের অধিবাসীদের মধ্যে যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, তেমনি মধ্য আরবের কিনদা রাজবংশের সঙ্গে আল-ইয়ামানের শাসক তুব্বা-রও এক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উপদ্বীপের মধ্যে তারাই একমাত্র শাসক যারা মালিক (রাজা) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন— উল্লেখ্য যে আরবেরা এই উপাধিটি সাধারণত বিদেশি রাজাদের দিত।

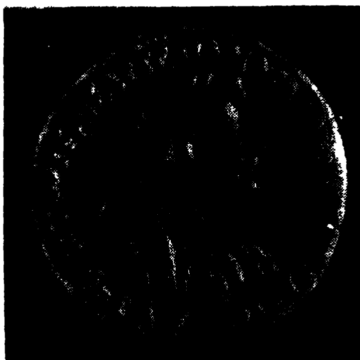
যদিও তারা ছিলেন দক্ষিণ আরব বংশোদ্ভূত এবং ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হাযরামাওত-এর পশ্চিমাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিল, তবুও প্রথম দিকের দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপিগুলিতে শক্তিশালী কিনদা উপজাতির উল্লেখ নেই। চতুর্থ খ্রিস্টিয় শতাব্দীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাদের কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, এই রাজবংশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা হুজ্‌র ছিলেন হিময়ারাইট হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বার সৎ ভাই এবং তার পদবিযুক্ত নাম ছিল আকিল আল-মুরার। ইব্‌ন-তুব্বা ৪৮০ খ্রিঃ নাগাদ তাকে মধ্য আরবের[৪৮] বিজিত কয়েকটি উপজাতির শাসক রূপে নিয়োগ করেছিলেন।

শাসক হিসেবে হুজ্‌রের পর ক্ষমতায় বসেন তার পুত্র আমর। আমর এর পুত্র আল-হারিস ছিলেন কিনদা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ বীর। পারসীয় সম্রাট কুবায-এর মৃত্যুর পর অল্প সময়ের জন্য আল-হারিস নিজেকে **আল-হিরার** শাসক বলে ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই (৫২৯ খ্রিঃ নাগাদ) লাখমিয় রাজা তৃতীয় আল-মুনযির সেটি দখল করে নেন। আল মুনযির কিনদা রাজপরিবারের ৫০ জন সদস্য সহ আল-হারিসকে ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করেন এবং তার ফলে কিনদা রাজবংশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। আল-হারিস সম্ভবত বাগদাদের ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে [illegible] বাস করে থাকতে পারেন।

আল-হারিসের প্রতিটি পুত্রই ছিল এক-একটি উপজাতির নেতা। তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিণতিতে মিত্রসঙ্ঘে ভাঙন ধরে এবং ক্ষণজীবী রাজত্বের পতন ঘটে। কিনদা রাজবংশের অবশিষ্ট লোকজনেরা হাযরামাওতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী গাস্সানি ও উত্তর আরবীয়দের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ত্রিমুখী লড়াইয়ে আল-হিরার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন এইভাবেই ধ্বংস হয়। গোল্ডেন **ওডস**[১১] **এর** শ্রেষ্ঠতম কাব্যগুলির একটির রচয়িতা বিখ্যাত কবি ইমরু-আল-কায়িস ছিলেন কিনদা রাজপরিবারের বংশধর এবং তার হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তার কবিতাগুলি লাখমিয়দের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষে ভরা। সাহায্যের আশায় তিনি এমন কী সদূর কনস্তান্তিনোপল পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে আল-হীরার শত্রু জাস্টিনিয়ানের সহায়তা পাবেন। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, ফিরে আসার পথে সম্রাটের[১৩] এক দূত আঙ্কারা নামে একটি জায়গায় বিষপ্রয়োগে তাকে হত্যা করে (৫৪০ খ্রিঃ নাগাদ)।

প্রথম দিককার ইসলামি দুনিয়ায় কিনদা বংশের কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আল-আশআস ইব্‌ন-কায়িস। তিনি ছিলেন হাযরামাওতের নেতা। সিরিয়া ও আল-ইরাক জয় করে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তার ফলে একটি পারসীয় প্রদেশের গভর্নর পদে তিনি আসীন হয়েছিলেন। আল-আশআস-এর বংশধরেরা সিরিয়ার উমাইয়া খলিফার আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছিলেন। খুরাসানের ছদ্মবেশী পয়গম্বর আল-মুকান্না[১১] নিজেকে খ্রিস্টের মূর্ত রূপ বলে দাবি করতেন এবং বন্ড বছর ধরে আব্বাসি খলিফা আল-মাহদীকে অস্বীকার করে এসেছেন। অবশ্য তিনি কিনদা গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন পারসীয়। ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিনদি[১২] ছিলেন প্রথম দিকের এক আরবীয় দার্শনিক। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তাঁর সহস্রতম জন্মবার্ষিক পালিত হয়েছে।

কিনদা রাজবংশের অভ্যুত্থান আকর্ষণীয় এই কারণে যে এই প্রথম আরবের অভ্যন্তরে একজন জননেতার অধীনে বেশ কয়েকটি উপজাতি ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিল। সেই দিক থেকে এই চেষ্টা আল-হিজাজ ও মুহাম্মাদের জন্য একটা নজির সৃষ্টি করেছিল। ❑





নাবাতিয়ানদের ব্রোঞ্জের মুদ্রা

● টীকা ●

১ হিব্রুভাষায় নেবায়োথ, অ্যাসিরীয় ভাষায় নাবাইতাই, নাবাইতু আপাত অর্থে নাবাতিয়ান নয়।

২ জেনেসিস ১৪ : ৬, ৩৬ : ২০।

৩ তুলনীয়, দ্বিতীয় ক্রনিকল ২৫ : ১২; জেরেমিয়াহ্ ৪৯ ১৬, অবাদিয়াহ্ ৩ : ৪।

৪ জোসে'ফাস-এর অ্যান্টিকুইটিস, বিকে ৪ ৪র্থ অধ্যায়, ৭, ৭ম অধ্যায় নতুন ভাগ ১ দ্রষ্টব্য।

৫ ডিওডোরাস, বি কে ১৯. নতুন ভাগ ৯৪ : ৭।

৬ দ্বিতীয় করিন্থীয় ১১ : ৩২।

৭ কুকের উত্তর সেমেটিক শিলালিপির ২১৬ পাতার তালিকাটি দেখুন।

৮ অ্যান্টিকুইটিস, বি কে ১৪, ১৪তম অধ্যায় নতুন ভাগ ১, দি জিউয়িশ ওয়ার, বি কে ১, ১৪ তম অধ্যায় নতুন ভাগ ১।

৯ জিউইশ ওয়ার, বি কে ৩, ৪র্থ অধ্যায়, নতুন ভাগ ২।

১০ বি কে ১৯, ৯৬ অধ্যায়।

১১ এফ এ স্ক্যাফার রচিত সিরিয়া, ১০ম খণ্ড (১৯২৯) ২৮৫-৯৭ পাতা। চার্লস বিরোলিউড, একই বই, ৩০৪-১০ পাতা।

১২ এফ ভি উইনেট রচিত এ স্টাডি অফ দি লিহয়ানাইট অ্যাণ্ড সামুডিক ইনস্ক্রিপশনস (টরেন্টো, ১৯৩৭) ৫৩ পাতা।

১৩ রেনে দুসাউদ, লা আরাবেস এন সিরিয়ে আবান্ট এল ইসলাম (প্যারিস, ১৯০৭), ৫৭-৭৩ পাতা; দুসাউদ ও এফ ম্যাকলার, ভয়েজ আর্কিওলজিকু আউ সাফা এট ডানস লে জেবেল এড ড্রুজ (প্যারিস, ১৯০১) ৩ ১৪ পাতা।

১৪ বি কে ষষ্ঠ, ৩২ অধ্যায়।

১৫ এডুয়ার্ড গ্লেসাব, স্কিজে দার জেসটিটে অ্যাণ্ড জিওগ্রাফি আরাবিয়েনস (বার্লিন ১৮৯০), ২য় খণ্ড, ৯৮-১২৭; জাউসেন ও সেভিগনাক, মিসন আর্কিওলজিকু এন আরাবি (প্যারিস, ১৯০৯), ২৫০-৯১ পাতা।

১৬ বি কে ৩য়, ৮ অধ্যায়।

১৭ সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি নাবাতিয়ান নিদর্শন 'আর এম' আল-আকাবা-র ২৫ মাইল পূর্বে; সেটিই হল কোরানে বর্ণিত ইরাম (সূরাহ্ ৮৯ : ৬)।

১৮ প্লিনি, বি কে ৫, ২১ অধ্যায়।

১৯ কুক, ২৭৪ ও ২৭৯ পাতা।

২০ লাকেনবিল, ১ম খণ্ড, নতুন ভাগ ২৮৭, ৩০৮ হিব্রু রচনাকার (দ্বিতীয় ক্রনিকল ৮ . ৪) এবং প্রথম কিংস ৯ : ১৮ এর গ্রিক অনুবাদকেরা সলোমন নির্মিত ইদুমায়েতে অবস্থিত তামার-এর সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলেন। তুলনীয়, ইজিকিয়েল ৪৭ · ১৯, ৪৮ : ২৮।

২১ অ্যাসিরীয় হাউরাণ (তুলনীয় লাকেনবিল, ১ম খণ্ড, নতুন ভাগ ৬৭২, ৮২১) বাইবেলে বর্ণিত বাশান, প্রাচীন অরানাইটিস।

২২ তারীখ (কনস্টান্টিনোপল, ১২৮৬) ১ম খণ্ড, ৭৬ ৭৭পাতা।

২৩ অপ. সিট. ১১৫-২২ পাতা।

২৪ মুরুজ, ৩য় খণ্ড, ২১৭-২১পাতা।

২৫ আল-মা'আরিফ, সম্পাদনা এফ উস্টেনফেল্ড (গটিনগেন, ১৮৫০), ২১৯-২৬ পাতা।

২৬ লিও সেটানি, আন্নালি দেল ইসলাম (মিলান ১৯১০), ৩য় খণ্ড, ৯২৮ পাতা।

২৭ প্রোকোপিয়াস, বি কে ১, ১৭ অধ্যায়, নতুন ভাগ ৪৭-৪৮ জোয়ানস্ মালালাস, ক্রোনোগ্রাফিয়া, সম্পাদনা এল, ডিনডর্ফ (বন, ১৮৩১), ৪৩৫, ৪৬১ ও পরের পাতা।

২৮ প্রোকোপিয়াস, বি কে ২, ২৮ অধ্যায় নতুন ভাগ ১৩।

২৯ ইব্‌ন কুতাইবাহ্, ৩১৪-৩১৫ পাতা; তুলনীয়, আবু-আল-ফিদা। ১ম খণ্ড, ৮৪ পাতা।

৩০ থিওফানিস, ক্রোনোগ্রাফিয়া, সম্পাদনা সি. দা বুর (লিপজিগ, ১৮৮৩), ২৪০ পাতা।

৩১ জন অফ এফিসাস, একলেসিয়াস্টিক্যাল হিস্টোরি, সম্পাদনা, উইলিয়াম কিওরটন (অক্সফোর্ড ১৮৫৩), ২৫১-৫২ পাতা, অনুবাদ, আর পেন স্মিথ (অক্সফোর্ড ১৮৬০) ২৮৪-৮৫ পাতা।

৩২ জন অফ এফিসাস, ৪১৫ পাতা (মূল পাঠ), ৩৮৫ অনুবাদ।

৩৩ ইব্‌ন-আবদ-রাব্বিহি, ইক্‌দ, ১ম খণ্ড ১৪০-১৪১ পাতা।

৩৪ আবু-আল-ফারাজ আল ইসবাহানি, আল আগানি (বুলাক, ১২৮৪-৮৫) ১৬শ খণ্ড, ১৫ পাতা।

৩৫ দক্ষিণ লেবাননে বর্তমানে বসবাসকারী খ্রিস্টান পরিবারগুলির মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ চিহ্নিত করে যে, তারা মূলত গাস্‌সানি রাজপরিবারের বংশধর।

৩৬ তুলনীয়, তাবারী, ১ম খণ্ড, ৭৭০ পাতা।

৩৭ তুলনীয়, হিট্টি রচিত দি অরিজিনস অফ দি ড্রুজ পিপল অ্যান্ড রিলিজিয়ন (নিউ ইয়র্ক, ১৯২৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬৬) ২১ পাতা।

৩৮ আজদ ও তানুখ মিলেমিশে আল ইরাকে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিল।

৩৯ দুসাউদ, লাস আরাবেস এন সিরিয়া, ৩৪-৩৫ পাতা।

৪০ ইয়াকুত, ২য় খণ্ড, ৩৭৫ পাতা।

৪১ প্রোকোপিয়াস, বিকে ১, ১৭শ অধ্যায়, নতুন ভাগ ৪৫-৪৮; মালালাস, ৪৩৪-৩৫, ৪৪৫, ৪৬০ ও পরের পাতা।

৪২ ১৯শ খণ্ড, ৮৬-৮৮ পাতা। তুলনীয় ইব্‌ন কুতাইবাহ্, ৩১৯ পাতা; ইসফাহানি, তারীখ, ১১১ পাতা।

৪৩ তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৮৮২ ও ১৯০৩ পাতা।

৪৪ ২য় খণ্ড, ৭০৯ পাতা।

৪৫ আল-আ'লাক আল-নাফিসা, সম্পা, ডে গোজে (লিডেন, ১৮৯২), ১৯২ পাতা, ২, ২-৩ ও ২১৭ পাতা, ২, ৯-১০। তুলনীয়, ইব্‌ন কুতাইবাহ্, ২৭৩-৭৪ পাতা।

৪৬ পারসি জানদিক থেকে আরবী শব্দ জানদাকাহ শব্দ উদ্ভূত। ম্যাজিয়ান, অগ্নিদেবের পূজারি; ম্যানিকিয়ান, প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মতে বিশ্বাসী।

৪৭ যেখানে আল-হিরা এক সময় ছিল এখন সেখানে অল্প কিছু টিলা রয়েছে।

৪৮ ইসফাহানি, তারীখ, ১৪০ পাতা; ইব্‌ন কুতাইবাহ্ ৩০৮ পাতা; গুনার অলিন্ডার, দি কিংস অফ কিনদা (লান্ড, ১৯২৭), ৩৮-৩৯ পাতা।

৪৯ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নীচে দেখুন, ৯৪ পাতা।

৫০ আল-ইয়াকুবী, তারীখ, সম্পাদক এম. থ. হাউটসমা (লিডেন, ১৮৮৩), ১ম খণ্ড, ২৫১ পাতা; অলিন্ডার, ১১৭ ১৮ পাতা।

৫১ টমাস মুর রচিত লাল্লা রুখ-এর এক বীর।

৫২ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নীচে দেখুন, ৩৭০ পাতা।

॥ অধ্যায় ৭ ॥

ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে আল-হিজাজের অবস্থা

বৃহত্তর অর্থে বলা যায় যে আরবের ইতিহাস তিনটি যুগ নিয়ে গঠিত :

(১) খ্রিস্টজন্মের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাপ্ত হওয়া সাবায়ী-হিময়ারী সময়কাল;

(২) জাহিলীয়া অধ্যায়, যেটি 'আদম সৃষ্টির সময়কাল' থেকে মুহাম্মাদের প্রচার অভিযান পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু বিশেষভাবে বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের ঠিক আগের শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত;

(৩) ইসলামি যুগ, বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

● জাহিলীয়া আমল

জাহিলীয়া শব্দটি সাধারণত 'অজ্ঞতার যুগ'কে বা 'বর্বরতা'কে বোঝায়, কিন্তু বাস্তবে এই শব্দটি এমন একটি সময়কালকে বোঝায়, যখন আরবে কোন বিধিবিধান ছিল না, কোন অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রচারক ছিল না, ছিল না প্রত্যাদিষ্ট কোন ধর্মগ্রন্থ। দক্ষিণ আরবীয়দের দ্বারা বিকশিত এমন একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও বর্বরতা শব্দ দুটি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়; শব্দটি কোরানে (৩:১৪৮, ৫:৫৫, ৩৩:৩৩, ৪৮:২৬) বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব ধর্মীয় আদর্শ, বিশেষত পৌত্তলিকতা থেকে তার মানুষজনদের মুক্ত করার জন্য একত্ববাদী মুহাম্মাদ ঘোষণা করেছিলেন যে, নতুন ধর্মটি তার পূর্বেকার সমস্ত ধর্মীয় প্রভাবকে বিলোপ করে দেবে। পরবর্তীকালে এই ঘোষণাটি ইসলাম-পূর্ব সমস্ত আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে নিষিদ্ধ করার ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করা হয়। কিন্তু ধ্যানধারণাকে হত্যা করা কঠিন এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের নিষেধাজ্ঞা অতীতের সমস্ত কিছুকে বাতিল করে দিতে পারে না।

আল-হিজাজ ও নাজদ-সহ উত্তর আরবের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশই ছিল যাযাবর। বেদুইনদের ইতিহাস হল মূলত গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস। এই কালপর্বকে বলা হত আইয়াম আল-আরব (আরবীয়দের দিন) এবং এই যুদ্ধে বিরাট আকারে আক্রমণ ও লুঠপাট হলেও রক্তপাত হত খুবই কম। আল-হিজাজ ও নাজদ-এর বসে থাকতে অভ্যস্ত মানুষজন নিজেদের কোন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেনি। এ ব্যাপারে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই যদিও নাবাতিয়ান, পালমিরীয়, গাসসানীয় ও লাখমিয়দের সঙ্গে তাদের একটা জ্ঞাতি-সম্পর্ক

ছিল। নাবাতিয়ান ও ব্যাপক অর্থে পালমীরার মানুষজন আংশিকভাবে আরামাইক সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। আর দক্ষিণ-আরবীয় উপনিবেশবাদী গাস্‌সানীয় ও লাখমিয়রা ছিলেন সিরীয়-বাইজানটাইন ও সিরীয়-পারসীয়। সুতরাং জাহিলীয় শাসনকাল সম্পর্কে আমাদের গবেষণা হিজরীসন শুরুর ঠিক আগের শতাব্দীতে উত্তরে বেদুইন উপজাতিদের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের বিবরণ ও ইসলাম-ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী আল-হিজাজের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে বাহ্যিক সাংস্কৃতিক প্রভাবের বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিশ্বস্ত তথ্যের আলোকে জাহিলীয়া যুগটি অস্পষ্টভাবে হলেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে সময়ে উত্তর আরবীয়দের মধ্যে লেখার প্রচলন ছিল না, সেই সময়ে এই যুগ সম্পর্কে মূলত প্রাচীন ঐতিহ্য, রূপকথা, প্রবাদ ও সর্বোপরি কবিতা থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যে যুগের কথা স্মরণ করা হয়েছে এই কবিতাগুলিতে, সেই কবিতাগুলির কোনটাই স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দুই থেকে চারশো বছর পরে অর্থাৎ হিজরী সনের সূচনার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর আগে লেখা হয়নি। এই তথ্যগুলি যদিও প্রচলিত কাহিনী ও রূপকথা থেকে সংগৃহীত, তবুও এই তথ্যগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ যা বিশ্বাস করে, সত্য হলেও তা যে প্রভাব ফেলত, অসত্য হলেও তা মানুষের জীবনের ওপর সেই একই প্রভাব ফেলে। মুহাম্মাদের আবির্ভাবের আগে উত্তর আরবীয়রা লেখার কৌশল বিকশিত করতে পারেনি। এতদিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ইসলাম-পূর্ব কেবলমাত্র তিনটি আরবীয় শিলালিপি (আল-নামারাতে ৩২৮ খ্রিস্টাব্দে ইমরু-আল-কায়িস-এর সময়কার প্রোটো-আরবীয় শিলালিপির পাশাপাশি) হল, আলেপ্পো-র দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত জাবাদ (৫১২ খ্রিঃ), আল-লাজাতে হাররান (৫৬৮ খ্রিঃ) ও উম-আল-জিমাল (একই শতাব্দী)-এর শিলালিপি।

ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে যে, আরবীয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে ওই উপদ্বীপের সমস্ত অধিবাসীকেই বোঝায়। আর সংকীর্ণ অর্থে, এটা উত্তর আরবীয়দের বোঝায়—অবশ্য ইসলামি শক্তির অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। একইভাবে আরবী শব্দটি হিময়ারাইট-সাবাইয়ান এবং আল-হিজাজের উত্তরাঞ্চলের কথ্যভাষাকেই বোঝায়। কিন্তু আল-হিজাজের কথ্যভাষা যেহেতু ইসলামের পবিত্র ভাষাতে পরিণত হয়েছিল এবং আল-ইয়ামানের দক্ষিণাঞ্চলের কথ্যভাষাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, তার ফলে এটি উৎকৃষ্ট আরবী ভাষাতে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং আমরা যখন আরবীয় ও আরবী সম্পর্কে বলি তখন আসলে আমরা উত্তর আরবের মানুষ ও কোরানের ভাষা বোঝাতেই বলি।

● আরবীয়দের দিনগুলি

আইয়াম আল-আরব বলতে আন্তঃ-উপজাতীয় বিরোধকে বোঝায়। সাধারণত গবাদি পশু, পশুচারণ ক্ষেত্র বা ঝরনাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের পরিণতিতেই এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষগুলি

বাধত। এই বিরোধগুলি লুঠপাট ও আক্রমণের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করে দিত। আর এই সব সুযোগে গড়ে উঠত এক ধরনের নায়কোচিত ভাবমূর্তি। এইসব নায়কেরা প্রমাণ করতে চাইতেন তাঁরা একাই এইসব লুঠতরাজ ও রাহাজানি চালাতে সক্ষম। এদের কথা এইসব লড়াইয়ে দুপক্ষের চারণকবিদের মুখে মুখে ফিরত। যদিও সর্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকত, বেদুইনরা মারা যাবার ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী ছিল না। সুতরাং যুদ্ধগুলির বিবরণ মানুষকে যে রক্তস্নাত কাহিনীর বর্ণনা শোনাত, সেই যুদ্ধগুলি আদৌ তেমন রক্তাক্ত ছিল না। অবশ্য এই যুদ্ধের ফলে বেদুইনদের রাজ্যে কখনই অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা দেখা দেয়নি। উল্লেখ করা দরকার যে, এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত অর্ধাহারেই থাকত এবং যুদ্ধের মেজাজটা ছিল তাদের মনের একটা দীর্ঘস্থায়ী ও স্বাভাবিক অবস্থা। তাদের মাধ্যমে বংশগত বিরোধ বেদুইন জীবনের একটি শক্তিশালী ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল।

এই সময়কালের প্রতিটি দিনে যে ঘটনাগুলি ঘটত, তার চরিত্র ছিল অনেকটা একই রকমের। সর্বপ্রথমে ব্যক্তিগত অপমান বা সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে অল্প কিছু মানুষ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হত। তারপর অল্প কয়েকজনের সংঘর্ষ সকলের সংঘর্ষে পরিণত হ'ত। শেষ পর্যন্ত কোন নিরপেক্ষ দলের হস্তক্ষেপে শান্তি ফিরে আসত। যে উপজাতির কম ক্ষতি হত, তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতিরিক্ত সংখ্যক মৃত্যুর জন্য রক্তপণ দিত। জনপ্রিয় শ্রুতিধরদের স্মৃতিতে এই সমস্ত বীরদের স্মৃতি কয়েক শতাব্দী ধরে জাগরূক থাকত।

মুহাম্মাদ ও তার অনুগামীরা আল-মদীনা শহরে আসার কয়েক বছর আগে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি উপজাতি আওস ও খাজরাজ-এর মধ্যে লড়াইয়ের দিনগুলি অর্থাৎ 'বুয়াস'[১]-এর দিন'-সম্পর্কে এমন কাহিনী বহু বছর ধরে প্রচলিত ছিল। যে পবিত্র মাসগুলিতে লড়াই নিষিদ্ধ ছিল সেই সময়েই একদিকে মুহাম্মাদের পরিবার কুরাইশ, তাদের মিত্রপক্ষ কিনানা এবং অন্যদিকে হাওয়াজিন-এর মধ্যে লড়াই হয়েছিল বলে সেই দিনগুলিকে 'আল-ফিজর (পাপকর্ম)-এর দিনগুলি' বলা হ'ত'। একজন যুবক হিসেবে মুহাম্মাদ সেই চারটি যুদ্ধের একটিতে[২] অংশ নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

● বাসুস যুদ্ধ

এই সমস্ত বেদুইন উপজাতির যুদ্ধগুলির একেবারের প্রথম দিকের এবং সবচেয়ে বিখ্যাত হল হারব আল-বাসুস-এর যুদ্ধ। পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে বানু-বকর[৩] এবং তাদের জ্ঞাতি উত্তর-পূর্ব আরবের বানু-তাগলিবের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। উভয় উপজাতিই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং উভয়েই নিজেদেব ওয়ায়েল-এর বংশধর বলে গণ্য করত। একটি মাদি-উটকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। মাদি-উটটি ছিল বকর উপজাতিভুক্ত বাসুস নামের এক

বৃদ্ধ মহিলার, তাগলিব উপজাতির এক প্রধান[৩] সেটিকে আহত করেছিল। আইয়াম-এর লোককাহিনী মূলক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই যুদ্ধটি চলেছিল ৪০ বছর ধরে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উভয় পক্ষই আক্রমণ ও লুঠপাটে লিপ্ত হয়েছিল এবং কাব্যিক প্রেরণা এই যুদ্ধের অগ্নিশিখাকে আরও উস্‌কে দিয়েছে। আল-হিরার শাসক তৃতীয় আল-মুনযিরের মধ্যস্থতায় ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ বন্ধ হয়েছিল, অবশ্য দুই পক্ষের শক্তি নিঃশেষিত হবার পর। তাগলিব পক্ষের নেতা কুলাইব-ইবন-রাবীয়া ও তার ভাই বীর-কবি মুহালহিল (মৃত আনুমানিক ৫৩১ খ্রিঃ) এবং বকর উপজাতির নেতা জাসসাস ইবন-মুররাহ্-র নাম এখন আরবী-ভাষী সমস্ত রাজ্যগুলির ঘরে ঘরে অতি পরিচিত। এই মুহালহিল পরে আরও জনপ্রিয় রোমান্টিক কাহিনী 'কিসসাত আল-জির'-এর জির-এ পরিণত হয়।

● দাহিস-এর দিনগুলি

ধর্মহীনতার যুগে সবচেয়ে পরিচিত ঘটনা দাহিস ও আল-গাবরার দিনগুলিও কম বিখ্যাত নয়। আবস্ ও যুবইয়ান উপজাতির মধ্যে এই লড়াই হয়েছিল মধ্য-আরবে। গাতাফান ছিল উভয় উপজাতিরই পূর্বপুরুষ। যুবইয়ান উপজাতির প্রধানের মালিকানাধীন আল-গাবরা নামে একটি ঘুড়ী এবং আবস্ উপজাতির প্রধানের দাহিস নামে একটি ঘোড়ার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা চলার সময়ে যুবইয়ান উপজাতির লোকদের অন্যায় আচরণকে কেন্দ্র করেই এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। বাসুস যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে শান্তির আবহাওয়া বিরাজ করছিল, তার অল্পদিনের মধ্যেই ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই লড়াই শুরু হয়েছিল এবং ইসলামি যুগের[৪] কয়েক দশক ধরে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এই সংঘর্ষ চলেছিল। এই যুদ্ধেই আরবের বীরত্বপূর্ণ যুগের 'অ্যাকিলিজ' বলে খ্যাত আনতারাহ্ (বা, আনতার) ইবন-শাদদাদ আল-আবসি (আনুমানিক ৫২৫-৬১৫ খ্রিঃ) নিজেকে একজন কবি ও যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

● ভাষা হিসেবে উত্তর আরবীয় ভাষার প্রভাব

আরবীয়দের মতো বিশ্বের আর কোন জাতির মানুষই বোধ হয় সাহিত্যশৈলীর জন্য এত উৎসাহ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটায়নি এবং লেখ্য ও কথ্য ভাষার দ্বারা এভাবে প্রভাবিত হয়নি। আরবী-র মতো আর কোন ভাষা সেই ভাষা-ব্যবহারকারীদের ওপর এমন অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। সেই যুগে প্রাচীন আরবী ভাষায় রচিত কবিতাগুলি অস্পষ্টভাবে বুঝলেও এবং বক্তব্যকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করলেও তা বাগদাদ, দামাস্কাস ও কায়রোর আধুনিক যুগের শ্রোতাদের মনকে আলোড়িত করে দেবে। ছন্দ, কবিতা, সঙ্গীত তাদের ওপর সেই প্রভাব সৃষ্টি করে যাকে তারা 'আইনি যাদু' (সিহর হালাল) বলে ডাকে।

আদর্শ সেমাইট বলে পরিচিত আরবীয়রা তাদের নিজেদের কোন বিরাট শিল্পকলা গড়ে তুলতে পারেনি বা তাদের উন্নতি ঘটাতে পারেনি। কিন্তু তাদের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য একটি মাধ্যম

অর্থাৎ বক্তৃতা দেবার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রিকরা যদি স্ট্যাচু নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে গৌরব অর্জন করে থাকে, আরবীয়রা তাদের গীতিকবিতায় (কাসীদাহ্) এবং হিব্রুরা আত্মপ্রকাশের আরও সূক্ষ্ম একটি মাধ্যম বা সাম-এ খ্যাতি লাভ করেছিল। একটি আরবী প্রবচনে বলা হয়েছে, 'মানুষের সৌন্দর্য নিহিত আছে তার বাগ্মিতার মধ্যে'। পরবর্তীকালে আর একটি প্রবচনে বলা হয়েছে যে, 'জ্ঞানের সাহায্যে তিনটি জিনিস আলোকিত হয়েছে : ফ্রাঙ্কদের চিন্তার ক্ষমতা, চীনাদের হাতের নৈপুণ্য ও আরবীয়দের বাগ্মিতা'।[*] বাগ্মিতা অর্থাৎ গদ্যে ও কাব্যে নিজেকে দৃঢ়তার সাথে রুচিশীল ভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা, ধনুর্বিদ্যা ও অশ্বারোহণ জাহিলীয়া যুগে একজন পরিপূর্ণ মানুষের (আল-কামিল) তিনটি প্রধান গুণ হিসেবে বিবেচিত হত। বিশেষ ধরনের গঠনশৈলীর গুণে আরবীভাষা কোন বিষয়ে বক্তব্য রাখার একটি সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ ও শ্লেষাত্মক বাচনভঙ্গি গড়ে তুলেছিল। ইসলাম ধর্ম আরবী ভাষার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং আরবীয়দের বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এই কারণেই মুসলিমরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধতার নজির হিসেবে জোরের সঙ্গে কোরানের গঠনশৈলী ও রচনারীতির বিস্ময়কর মাধুর্যের (ইজাজ) উল্লেখ করে থাকে। সেইদিক থেকে ইসলামের জয়কে একটি ভাষায় জয়, বিশেষত একটি বইয়ের জয় বলা যেতে পারে।

● বীরোচিত যুগ

জাহিলীয়া শাসনকাল থেকে শুরু হয়ে এবং ৫২৫ থেকে ৬২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত আরবীয় সাহিত্যের বীরোচিত যুগ থেকে আমরা বেশ কিছু প্রবাদ, কয়েকটি লোককাহিনী এবং বিশেষত প্রচুর কবিতা সংরক্ষিত করেছি। এর সবগুলিই ইসলামি যুগের পরের দিকে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছিল। সেযুগে যাদুবিদ্যা, আবহবিদ্যা ও ওষুধ সংক্রান্ত অল্প কয়েকটি সূত্র ছাড়া আর কোন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মানসিকতা ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটত। মহাজ্ঞানী লুকমান (আল-হাকীম)-এর মুখ দিয়ে প্রাচীন জ্ঞানভার অনেক বক্তব্য বলানো হয়েছিল। তিনি ছিলেন হয় একজন আবিসিনীয় অথবা একজন হিব্রু। প্রচলিত কাহিনী আখতাম ইবন-সাইফি, হাজিব ইবন-জুরারা এবং আল-খাসের কন্যা হিন্দ-এর মতো বেশ কয়েকজন জ্ঞানী নারী ও পুরুষের নাম আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আল-মায়দানি' রচিত মাজমা আল-আমসাল (মৃ. ১১২৪) এবং আল-মুফায্যাল আল-যাববি' রচিত আমসাল আল-আরাব (মৃ.৭৮৬)-এ ইসলাম-পূর্ব জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের বেশ কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

জাহিলীয়া আমলে যেহেতু লেখার কোন কৌশল চূড়ান্ত উন্নতি লাভ করেনি, সেহেতু তেমন কোন গদ্য সে যুগে রচিত হয়নি। তবুও ইসলামি যুগে রচিত বেশ কয়েকটি লোককাহিনী ও প্রচলিত কাহিনী আমাদের হাতে আছে যেগুলি আরও কয়েক দশক আগে

মানুষের মনে জন্ম নিয়েছিল। এই সমস্ত কাহিনীগুলোতে মূলত (আনসাব) এবং উপরে আলোচিত আরবীয়দের বিভিন্ন উপজাতির শাসনকালের আন্তঃউপজাতীয় দ্বন্দ্বগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জ্ঞাতিভাই আরবীয় ঐতিহাসিকদের মতো আরবীয় কুলুজিবিৎ সেই কাহিনীগুলোর বিভিন্ন ফাঁকফোকর ভরাট করা ও শূন্যস্থান পূরণ করার ক্ষেত্রে তাদের কল্পনাশক্তিকে বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এইভাবে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদম বা আরও পরিমিতভাবে বললে বলা যায় যে, ইশমায়েল ও আব্রাহামের সময় থেকে ধারাবাহিক ভাবে তথ্য সরবরাহ করতে পেরেছে। কুলজিশাস্ত্র-সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় দুটি বইতে। একটি হল ইব্ন জুরায়জ-এর কিতাব আল-ইশতিকাক।[৮] আর অপরটি হল একটি বিশ্বকোষ, কিতাব আল-আগানি (গানের বই)। এটির লেখক আবু-আল-ফারাজ আল-ইসবাহানি (অথবা ইসফাহানি, মৃত, ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। ইসলাম-পূর্ব দিনের দৈববাণীগুলি ছন্দমিলযুক্ত গদ্য হিসেবে একই ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে।

● কাব্য

কেবলমাত্র কাব্য রচনার ক্ষেত্রেই ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবীয়রা চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের সুন্দরতম প্রতিভা বিকাশ লাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিল। কবিতার প্রতি বেদুইনদের ভালবাসা ছিল তাদের অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ।

অন্যান্য সাহিত্যের মতো আরবীয় সাহিত্যের সূচনালগ্নে কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অন্যদের পথ অনুসরণ না করে আরবীয় সাহিত্য তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। সবচেয়ে পুরানো কবিতাগুলি হিজরী সন শুরুর প্রায় ১৩০ বছর আগে আল-বাসুস-এর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। অনড়-অচল প্রথাগত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এই সমস্ত গীতিকবিতাগুলি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবার ও ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের ধারক ছিল। আগের কবিদের প্রতিভাকে অতিক্রম করে আর বিশেষ কেউই ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এগিয়ে যেতে পারেনি। সূচনালগ্নের মুসলিম কবিদের মতো পরবর্তী কালের ও বর্তমান সময়ের কবিরাও প্রাচীন গীতিকবিতাগুলিকে উৎকর্ষের আদর্শ রূপে গণ্য করত এবং এখনও গণ্য করে। প্রথম যুগের এই সমস্ত কবিতাগুলি মুখস্থ রাখা হত। বছরের পর বছর ধরে এগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত হিজরী সনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এই কবিতাগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক যুগের বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, কবিতাগুলিকে ইসলামের আদর্শানুসারী[১০] করে তোলার জন্য এগুলির বহু সংশোধন, সংস্করণ ও সংযোজন করতে হয়েছে।

দৈবপুরুষ ও গণৎকারদের (কুহ্হান) দ্বারা ব্যবহৃত ছন্দমিলযুক্ত গদ্যগুলিকে, কাব্যরীতির উন্নয়নের প্রথম স্তর বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোরানের মধ্যে এমন রীতির প্রচলন

দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উট-চালকদের গানকে (হুদা) দ্বিতীয় বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আরবীয় কাহিনীগুলিতে কাব্যের উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উটের গতির ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উট-চালকদের গান গাইবার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই তার উদ্ভব বলে যে-কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সত্যের বীজ অঙ্কুরিত রয়েছে। 'হাদি' শব্দটির অর্থ হল গায়ক এবং এটি 'সাইক' (উটচালক) শব্দের সমার্থক।

চার অথবা ছ'চরণবিশিষ্ট 'রাজাজ' মিলছন্দের গদ্য থেকেই উদ্ভূত এবং এটিই প্রচীনতম ও সহজতম ছন্দ। আরবীয় সংজ্ঞানুযায়ী বলা যায়, "মিল-ছন্দের গদ্য (সাজ)-রূপ বাবা ও গানরূপ মায়ের এটিই প্রথম প্রসূত কাব্যসন্তান"।

● প্রাচীন যুগের গীতিকবিতা

সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগে কাব্যই ছিল সাহিত্য-চেতনা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। 'কাসীদা' (গীতিকবিতা) ছিল একমাত্র নিখুঁত কাব্যিক মুহালহিল, বাসুস যুদ্ধের তাঘলির নায়কই প্রথম এরকম দীর্ঘ কবিতা রচনার কৃতিত্ব লাভ করেন। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে, আরবীয় বিভিন্ন উপজাতির আমলে, বিশেষত তাগলিব অথবা কিনদা উপজাতির মানুষদের মধ্যেই গীতিকবিতার আবির্ভাব ঘটেছিল। ইমরু-আল-কায়িস (মৃ. আনুমানিক ৫৪০ খ্রিঃ) নামে দক্ষিণ আরবের অন্তর্ভুক্ত কাহ্তানি গোষ্ঠীর এক অধিবাসী ছিল কিনদা সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও তিনি ছিলেন প্রাচীনতম চারণকবিদের একজন, কিন্তু তাকেই কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবিদের আমীর (রাজপুত্র) বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানানো হয়। অন্যদিকে, আমর ইবন-কুলসূম (মৃত আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ) ছিলেন উত্তর আরবের রাবিয়া গোষ্ঠীর তাগলিব উপজাতিভুক্ত নাগরিক। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এই সমস্ত কবিরা কথা বললেও তারা মোটামুটি একই সাহিত্যরীতিতে কবিতা রচনা করতেন।

হোমারীয় আকস্মিকতা নিয়ে আবির্ভূত হলেও কাসীদা ছন্দের নিরিখে, জটিলতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে ইলিয়াড ও ওডিসি-কেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় যখন এর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে, কাসীদা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রথা অনুসরণ করে : গতানুগতিক সূচনা, প্রচলিত গুণবাচক পদ, বক্তব্যের মূল অংশের উপস্থাপনা ও একই ধরনের বিষয়বস্তু—এর সবগুলিই বিকাশের একটা দীর্ঘ পর্যায়ের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রাণবন্ত আবেগে সমৃদ্ধ, জোরালো ও বাহুল্যহীন ভাষায় রচিত গীতিকবিতাগুলিতে মৌলিক চিন্তা ও চিন্তা-উদ্রেককারী চিত্রকল্পের অভাব লক্ষ করা যায় এবং তার ফলে এর মধ্যে সর্বজনীন আবেদনের অনুপস্থিতিও চোখে পড়ে। কবিতার পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রেই কবিই শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হয়ে ওঠে। অন্য ভাষায় অনূদিত হলে গীতিকবিতার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ কবিতাতেই ব্যক্তিগত ও বিষয়মুখী উপাদানের উপস্থিতি প্রাধান্য লাভ করে। গীতিকবিতার বিষয় বাস্তবসম্মত, সীমানাটি সংকীর্ণ ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয়। কোন

জাতীয় মহাকাব্য অথবা প্রথম শ্রেণীর গুরুত্ব লাভ করতে পারে এমন কোন নাটক আরবীয়রা তখনও সৃষ্টি করতে পারেনি।

● মুয়াল্লাকাত

প্রাচীন গীতিকবিতাগুলির মধ্যে তথাকথিত 'সাত মুয়াল্লাকাত' প্রথম স্থান লাভ করে। আরবী-ভাষী মানুষজনের মধ্যে এগুলি এখনও কাব্য-রচনার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে গণ্য হয়। প্রচলিত লোককথা থেকে জানা যায় যে, এই গীতিকবিতাগুলির প্রত্যেকটিই 'উকাজ'-এর মেলায় বার্ষিক পুরস্কার লাভ করত এবং সেগুলি সোনার অক্ষরে খোদাই করে কাবার দেওয়ালে[১১] লটকানো থাকত। তাদের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা হত এইভাবে : আল-হিজাজে অবস্থিত আল-তাঈফ ও নাখলা-র মাঝে উকাজ-এ একটি বার্ষিক মেলা, অনেকটা এক ধরনের সাহিত্য সম্মেলন। সেখানে বীর-কবিরা তাদের কবিতা পাঠ করে এবং প্রথম পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এখানেই একজন কবি তার স্বীকৃতি লাভ করে, অন্যথায় আর কোথাও সে খ্যাতিলাভ করতে পারে না। ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে উকাজ-এর মেলাটি (সূক) আরবে এক ধরনের মত বিনিময়ের শিক্ষায়তন বলে গণ্য হত।

যে পবিত্র মাসগুলিতে যুদ্ধ ছিল নিষিদ্ধ, সেই সময়েই এই বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হত। ধর্মবিশ্বাসহীন আরবের দিনপঞ্জিকা ছিল অনেকটাই পরবর্তী সময়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বী আরবের চান্দ্র দিনপঞ্জিকার মতো। বসন্ত কালের প্রথম তিন মাস অর্থাৎ যু-আল-কাদা, যু-আল-হিজ্জা ও মুহাররাম ছিল শান্তিপূর্ণ সময়কাল। দেশীয় বাসনপত্রের প্রদর্শনী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যের আদান-প্রদান করার প্রচুর সুযোগ এই মেলায় থাকত। আমরা খুব সহজেই কল্পনা করতে পারি যে, এই বার্ষিক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মরুভূমির সন্তানেরা জমায়েত হত, দোকানে দোকানে ঘুরত, খেজুর থেকে তৈরি হওয়া মদ পান করত এবং নৃত্যরতা মেয়েদের গান ও নাচ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করত।

যদিও বলা হয় যে, ইমরু-আল-কায়িস (মৃত আনুমানিক ৫৪০ খ্রিঃ) রচিত গীতিকবিতাই সর্বপ্রথম 'উকাজ'-এর মেলায় বিচারকদের আনুকূল্য লাভ করেছিল, তথাপি এ কথাও সত্য যে উমাইয়া শাসনকালের শেষের দিকের আগে মুয়াল্লাকাত-এর কোন সংগ্রহ প্রকাশ করার চেষ্টা হয়নি। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে হাম্মাদ আল-রাবিয়াহ্ নামে যে বিখ্যাত মহাকাব্য-আবৃত্তিকারের আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনিই অন্যান্য অনেক গীতিকবিতার মধ্য থেকে সাতটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা বেছে নেন এবং তাদের একটি আলাদা বিভাগে সংকলিত করেন। গীতিকবিতার এই সংকলনটি অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[১২]

● ইসলাম-পূর্ব যুগের কবি

বিখ্যাত সাতটি গীতিকবিতা ছাড়াও ইসলাম-পূর্ব সময়কাল থেকে আমরা একটি কাব্য সংকলন খুঁজে পেয়েছি। সংকলক আল-মুফাযযাল আল-যাব্বি (মৃত আনুমানিক ৭৮৫ খ্রিঃ)-

এর নামানুসারে এই কাব্য সংকলনটির নাম হয়েছে, আল-মুফায্যালিয়াত[১৬]। এতে মোট অল্পখ্যাত কবিদের ১২০টি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে, এছাড়া আছে কয়েকটি দিওয়ান (কাব্য সঞ্চয়ন) এবং আবু-তাম্মাম (মৃত আনুমানিক ৮৪৫ খ্রিঃ) সম্পাদিত দিওয়ান আল-হামাসা ও আল-ইসবাহানি (মৃত আনুমানিক ৯৬৭ খ্রিঃ) রচিত কিতাব আল-আগানি থেকে সংগৃহীত এক বিরাট সংখ্যক অসম্পূর্ণ অংশ ও উদ্ধৃতি।

আরবীয় কবি (শায়ির) এমন জ্ঞানের অধিকারী যা সাধারণ মানুষের অজানা। এই জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন এক অপদেবতা, শয়তান (স্যাটান)-এর কাছ থেকে। কবির 'শায়ির' নামই সেই ইঙ্গিত দেয়। কবি হিসেবে অশরীরী শক্তির সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকত এবং তার অভিশাপের সাহায্য নিয়ে কবি তার শত্রুদের জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারতেন। ব্যঙ্গাত্মক কাব্য (হিজা) ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকেই আরবীয় কবিতার এক বিশেষ রচনা-রীতি।[১৪]

রাজদরবারে কবির বিশেষ স্থান নির্ধারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির ওপর বিভিন্ন ধরনের কাজের দায়িত্ব পড়ল। যুদ্ধক্ষেত্রে কবির কাব্য তার রাজ্যের মানুষের সাহসিকতার মতোই কার্যকরী হয়ে উঠল। আবার যখন শান্তি বিরাজ করে তখন তার বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে একজন কবি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগের রাজনৈতিক প্রচারে একজন জননেতার মিথ্যা বাগাড়ম্বর বা জ্বালাময়ী বক্তৃতার মতো সেই সময়ের একজন কবির কবিতাও কোন একটি উপজাতির মানুষজনকে উত্তেজিত করে কাজে নামিয়ে দিতে পারে। আল-হিরা ও গাস্সান রাজ্যের রাজসভার ঘটনাপঞ্জি থেকে জানা যায় যে, রাজকীয় উপহার দিয়ে সেই যুগের রাজারা তার আমলের সংবাদ প্রতিনিধি, সাংবাদিক হিসেবে সেই কবির আনুকূল্য দাবি করত। রাজকবির কবিতা মানুষ মনে রাখত এবং তা মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের ভূমিকা পালন করত। কবি ছিলেন একাধারে জনমতের স্রষ্টা ও জনমতের প্রতিনিধি। তার শ্লেষাত্মক কবিতা থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং রাজকোষ থেকে নিয়মিত বৃত্তি নেওয়া বন্ধ করার জন্য কাত্ আল-লিসান (জিভ কেটে নেওয়া)-ই ছিল একমাত্র প্রচলিত পদ্ধতি।

দৈববাণী প্রকাশের মাধ্যমে, তার সম্প্রদায়ের বক্তা ও মুখপাত্র হবার পাশাপাশি কবি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী, যদি ধরে নেওয়া যায় যে সেই যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন বিজ্ঞানী ছিল। বেদুইনরা কবিতার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবৃত্তি যাচাই করত। 'কে আছে এমন যে আমার গোষ্ঠীর অশ্বারোহী, কবি ও জনসংখ্যার উৎকর্ষকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখায়?'—আল-আগানিতে[১৫] উল্লিখিত এক চারণ কবি এই প্রশ্ন তুলেছেন। এই তিনটি বিষয়ে, অর্থাৎ—সামরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও জনসংখ্যার মাধ্যমেই একটি উপজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেত। একটি উপজাতির ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী হিসেবে একজন কবি সেই উপজাতির বংশবৃত্তান্ত, লোকাচারবিদ্যা, এর সদস্যদের অতীত ও বর্তমান

সাফল্য, তাদের সম্পত্তি, চারণক্ষেত্র ও সীমারেখা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকত। প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতিগুলির ঐতিহাসিক ব্যর্থতা ও মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার একজন অন্বেষী হিসেবে এই দুর্বলতাগুলিকে উন্মোচিত করা ও সেগুলিকে চরম অবজ্ঞা দেখানোই ছিল একজন কবির উদ্দেশ্য।

এর কাব্যিক উপাদান, রুচি ও সৌন্দর্য ছাড়াও প্রাচীন কবিতাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ যে সময়ে কবিতাগুলি রচিত হত সেই সময়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করার ক্ষেত্রে এই কবিতাগুলিই প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত এটাই হল আমাদের একমাত্র আপাত-সমকালীন তথ্যপঞ্জি। ইসলাম-পূর্ব সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এই কবিতাগুলি আলোকপাত করে। সেই অর্থেই একটি প্রবচনে বলা হয়েছে, 'কবিতা হল আরবীয়দের গণ নিবন্ধ' (দিওয়ান)[১৬]।

● কবিতায় প্রকাশিত বেদুইন চরিত্র

ধর্মবিশ্বাসহীন এই সমস্ত প্রাচীন কবিতাগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত আরবীয় গুণাবলির আদর্শ মুরুয়াহ্ বা মনুষ্যোচিত (পরবর্তীকালে, গুণাবলি) ও ইরদ (মর্যাদা)[১৭]-এর মতো শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সাহস, আনুগত্য উদারতা ছিল মুরুয়া-র বিভিন্ন উপাদান। প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতিগুলির ওপর আক্রমণের সংখ্যা (একবচনে, গ'জওয়া) দিয়ে কোন একটি উপজাতির সাহসিকতার পরিমাপ করা হত। কোন অতিথির আগমন উপলক্ষে অথবা গরিব ও অসহায় মানুষদের সাহায্যে কোন একজন তার উটকে বলি দিতে রাজী কিনা তার দ্বারাই সেই ব্যক্তির উদারতা বুঝতে পারা যেত।

বেদুইন উপজাতির আতিথ্যের ব্যক্তিকৃত মূর্তরূপ হাতিম আল-তাই (মৃত আনুমানিক ৬০৫ খ্রিঃ)-এর নাম বর্তমান যুগে সঞ্চারিত হয়েছে। বাল্যকালে তিনি যখন তার বাবার উটের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি তখন তিনটি উটকে জবাই করে অগ্রসরমান আগন্তুকদের খাওয়ান এবং বাকী মাংসটা তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এর ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন।[১৮]

আনতারা ইবন-শাদদাদ আল-আবসি (আনুমানিক ৫২৫-৬১৫ খ্রিঃ) ছিলেন একজন খ্রিস্টান। বেদুইন উপজাতির বীরত্ব ও ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ প্রতীক রূপে তার নাম যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হয়ে আছে। একাধারে নাইট, কবি, যোদ্ধা ও প্রেমিক আনতারা তার ব্যক্তিজীবনকে সেই সমস্ত গুণাবলির প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, মরুভূমির সন্তানেরা যে গুণাবলিকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তার বীরোচিত কার্যাবলি ও প্রিয়তমা আবলা-র সঙ্গে তার প্রেমের কাহিনীগুলি আরবী-ভাষী মানুষদের সাহিত্য-সংক্রান্ত ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। তার রচিত বিখ্যাত মুয়াল্লাকাহ্-তে তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী-র নামটি স্মরণ করে রেখেছেন। আনতারা জন্মসূত্রেই ছিলেন একজন ক্রীতদাস [illegible] খানসামার

পুত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী এক উপজাতির সঙ্গে লড়াইয়ে অংশ নিতে অস্বীকার করে এই ক্রীতদাস যুবকটি যখন বলেছিল "একজন ক্রীতদাস লড়াই করতে জানে না; উটের দুধ দোহ'নই তার একমাত্র কাজ", তখন তার বাবা দাসত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিল। তার বাবা চিৎকার করে বলল, "যাও! তুমি এখন মুক্ত।"[১৯]

● বেদুইন উপজাতির ধর্মহীনতা

তাদের কবিতা বিচার করে বলা যায় যে, জাহিলীয়া যুগের বেদুইন উপজাতির ধর্ম বলে প্রায় কিছুই ছিল না। ধর্মীয় প্রেরণার প্রতি তাদের কোন ঐকান্তিকতা ছিল না, বরং এ ব্যাপারে তারা ছিল উদাসীন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের বশ্যতা ছিল উপজাতীয় স্থিতিশীলতার বহিঃপ্রকাশ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাদের রক্ষণশীল মনের শ্রদ্ধাই তাদের ধর্মীয় বশ্যতাকে পরিচালিত করত। আমরা কোথাও একটি ম্লেচ্ছ দেবতার প্রতি তখনকার মানুষের প্রকৃত ভক্তিনম্রতার কোন প্রকাশ দেখতে পাই না। ইমরু-আল-কায়িস সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার বাবার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্য পথে বেরিয়ে তিনি তীর এঁকে[২০] দৈব ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করার জন্য যু-আল-খালাসার[২১] মন্দিরে থেমেছিলেন। বারতিনেক আঁকার চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি ভাঙা তীরগুলি দেবমূর্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন, "হতভাগা তোমার বাবাকে যদি হত্যা করা হত তা হলে তুমি আমাকে প্রতিশোধ নিতে বারণ করতে না।"[২২]

কাব্য ছাড়াও ইসলামি দুনিয়ায় ধর্মহীনতার অবশিষ্টাংশ, পরের দিককার ইসলামি সাহিত্যের অন্তর্গত অল্প কয়েকটি সত্য কাহিনী ও প্রচলিত কাহিনীতে এবং আল-কালবি (মৃত আনুমানিক ৮১৯-২০ খ্রিঃ) রচিত আল-আসনাম (উপাস্য দেবদেবী)-এ ইসলাম-পূর্ব যুগের ধর্মবিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের সন্ধান, পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় যে, ধর্মবিশ্বাসহীন আরবে কোন পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভব হয়নি।

বেদুইনদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সেমিটিক ধর্মমতের সবচেয়ে প্রাচীন ও আদিম রূপের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নাক্ষত্রিক বৈশিষ্ট্য, অতিমাত্রায় সজ্জিত মন্দির, ব্যাপক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলি-সমন্বিত দক্ষিণ আরবীয় সংস্কৃতি, এক অলস সমাজের পক্ষে ছিল যথেষ্ট প্রগতিশীল এবং উন্নত চিন্তাধারার সূচক। পেট্রা ও পালমীরার সংস্কৃতিমনস্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে সূর্য-পূজার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা একটি কৃষিজ রাজ্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কেননা সেখানে ইতিমধ্যে জীবনদায়ী সূর্যরশ্মি ও কৃষি উন্নয়নের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

অন্যান্য আদিম ধর্মবিশ্বাসের মতো বেদুইনদের ধর্মবিশ্বাসও ছিল মূলত সর্বপ্রাণবাদমূলক। মরুদ্যান ও মরুভূমির উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য বোধ হয় বেদুইনের বিশেষ বিশেষ দেবতা

সম্পর্কে প্রাচীন ও সুনির্দিষ্ট ধারণা যুগিয়েছিল। চাষযোগ্য জমির উর্বরতার জন্য যে দেবতার ভূমিকা ছিল, তাকে তারা উপকারী দেবতা মনে করে পূজা করত; পক্ষান্তরে অনুর্বর জমির জন্য দায়ী দৈব শক্তিকে তারা অপদেবতা বা শয়তান বলে গণ্য করত এবং তাকে তারা ভয় করত।[২৩]

দেবতা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে ওঠার পরেও গাছ, কূপ গুহা, পাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলি তাদের কাছে পবিত্র বস্তু হয়েই রইল। কারণ এই সমস্ত মাধ্যমের সাহায্যেই তারা দেবতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হত। মরুভূমিতে পরিষ্কার, তৃষ্ণা-নিবারণী ও জীবনদায়ী জলে পূর্ণ কূপগুলি খুব তাড়াতাড়িই তাদের কাছে পূজনীয় বস্তু হয়ে উঠল। আরবীয় গ্রন্থকারদের মতানুসারে, ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই জামজাম-এর পবিত্রতা মেনে চলা হচ্ছে এবং বহুকাল আগে যখন এটি হাজেরা ও ইসমাঈলকে[২৪] জল সরবরাহ করে আসছে তখন থেকেই একে পবিত্র বলে গণ্য করা শুরু হয়। ইয়াকুত[২৫] ও তার পরবর্তী কালের আল-কাজবীনি[২৬]-র লেখা থেকে জানা যায় যে, পথিকেরা 'উরওয়া'-র কূপ থেকে জল বয়ে নিয়ে যেত এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষ উপহার হিসেবে এই জল সরবরাহ করত। পাতালের দেবতা ও দৈবিক শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের জোরে গুহাগুলিও পবিত্র হয়ে উঠল। নাখলা-তে অবস্থিত গাবগাব-এর অবস্থা ছিল একই রকম, এখানেই আল-উজ্জার[২৭] কাছে আরবেরা বলি দিত। ঝরনা ও পাতালে অবস্থিত জলীয় উৎসের পিছনকার দৈবিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত বা'ল এবং ওই একই সময়ে আরবে তা খেজুর গাছ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। মুসলিম কর-ব্যবস্থায় এই শব্দটির একটি চিত্তাকর্ষক প্রভাব লক্ষ করা যায়, কারণ সেখানে যে জমিতে জল সরবরাহ করে (অর্থাৎ যে জমিতে কোন সেচের প্রয়োজন হয় না) এবং যে জমিতে চাষের জন্য আকাশের জল অর্থাৎ বৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

● সৌরজগৎ-সংক্রান্ত ধারণা

সৌরজগৎ সংক্রান্ত বেদুইন উপজাতির ধারণাটি ছিল চন্দ্রকেন্দ্রিক, কারণ চাঁদের আলোতেই তারা তাদের গবাদি পশুদের তৃণক্ষেত্রে চরিয়ে বেড়াত। চাঁদের পূজা পশুপালন-ভিত্তিক সমাজের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে, আর সূর্যের পূজা নির্দেশ করে পরবর্তীকালের কৃষিভিত্তিক সভ্যতার স্তর। আমাদের যুগে মুসলিম রুয়ালা বেদুইনেরা মনে করে যে, তাদের জীবন চাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই চাঁদই জলীয় বাষ্পকে আরও ঘন করে দেয়, চারণক্ষেত্রে উপকারী শিশির ঝরায় এবং চারাগাছের জন্ম সম্ভব করে তোলে। অন্যদিকে তারা এও বিশ্বাস করত যে, সূর্য বেদুইন-সহ সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে ধ্বংস করতে চায়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের সমস্ত উপাদানগুলির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যখন কোন উন্নত সভ্যতার স্তরে মানব পৌঁছাত তখন তাদের মধ্যে পুরানো ধর্মীয় বিশ্বাস কোন না কোন

আকারে বিরাজ করত। এই ঘটনা বাস্তবে দুটি স্তরের ধর্মীয় আদর্শের মধ্যে আপসেরই প্রতিফলন। এই কারণেই মিনাইয়ান সর্বদেবতার মন্দিরের মাথায় চন্দ্র-দেবতা 'ওয়াদ' (কোরান ৭১:৩২) বিরাজ করছে। ইব্‌ন-হিশাম[২৮] ও আল-তাবারী[২৯] তাদের লেখায় নাজরানের একটি পবিত্র খেজুরগাছের কথা বলেছেন। গাছের উদ্দেশে অর্ঘ্য হিসেবে অস্ত্র, পোশাক ও কম্বল দেওয়া হত এবং এই গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। মক্কার অধিবাসীরা প্রতি বছরেই যাত-আনওয়াত[৩০] (যার ওপর জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়)-এর কাছে যেত এবং সম্ভবত এর সঙ্গে নাখলা-তে[৩১] অবস্থিত আল-উজ্জার গাছটির যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। একটি বর্গাকার পাথর[৩২] আল-তাঈফ-এ অবস্থিত আল-লাত-এর প্রতিনিধিত্ব করত। আবার চার ফুট লম্বা ও দু'ফুট চওড়া একটি অখণ্ড ও চতুর্ভূজাকার কালো পাথর ছিল পেট্রাতে অবস্থিত যূ-আল-শারার প্রতিনিধি। এই সমস্ত দেবতাদের অধিকাংশেরই একটি করে সংরক্ষিত চারণ-ক্ষেত্র (হিমা) ছিল।

● জিন্ন

মরুভূমিতে জান্তব চরিত্রের যে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীরা ঘুরে বেড়াত, বেদুইনরা তাদের জিন্ন বা শয়তান বলে ডাকত। চরিত্রগত দিক থেকে এই সমস্ত জিন্নদের সঙ্গে দেবতাদের বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও মানুষের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। দেবতারা ছিলেন প্রধানত বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু জিন্নরা ছিল বিক্ষুব্ধ। অবশ্য জিন্নরা পরবর্তী আমলে পরিণত হয়েছিল মরুভূমির বিভিন্ন বিভীষিকা ও এখানকার বন্য জন্তু জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণার ব্যক্তিকৃত প্রকাশ। মানুষ যে সমস্ত জায়গায় প্রায়ই ঘোরাফেরা করত সেগুলি ছিল দেবতাদের জায়গা, আর বন্য মরুভূমির অজানিত ও অগম্য জায়গাগুলি ছিল জিন্নেদের। একজন উন্মাদ মানুষকে (মাজনূন) জিন্নগ্রস্ত বলে ভাবা হত। ইসলাম ধর্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নেদেয় সংখ্যা বাড়তে থাকে, কারণ নিম্নশ্রেণীর দেবতারা সেই সময়ে এই ধরনের সত্তায়[৩৩] অবনমিত হয়েছিল।

● আল্লাহ্‌র মেয়েরা

আল-হিজাজের শহুরে মানুষ ও মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৭ শতাংশের মধ্যে প্রথমদিকে ধর্মবিশ্বাসহীন আমলের নক্ষত্রকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা পৌঁছেছিল। আল্লাহ্‌র তিন মেয়ে আল-উজ্জা, আল-লাত ও মানাহ-র উপাসনার জায়গা ছিল এমন এমন অঞ্চল যেগুলি পরে ইসলামের জন্মভূমিতে পরিণত হয়। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে একত্ববাদী মুহাম্মাদ হঠাৎ মক্কা ও **আল-মদীনার** এই সমস্ত শক্তিশালী দেবতাগুলিকে স্বীকৃতি দিতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন[৩৪] এবং তাদের অনুকূলে আপস করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং তাঁর প্রত্যাদেশ যে আকার ধারণ করে তা সূরাহ্‌ ৫৩:১৯-২০[৩৫] তে দেখতে পাওয়া যায়।

৭৩। ...লে ধর্মতাত্ত্বিকগণ নাসিখ ও মানসূখ নীতি অনুযায়ী ঘটনাটির ব্যাখ্যা করেছেন.

অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বাতিল ও পরিবর্তন করেন। এর ফলে একটি আয়াতের পরিবর্তন হয় এবং আর একটি আয়াত বা স্তোত্র তার জায়গা দখল করে (কোরান ২:১০০)। আল-লাত (ইলাহাহ্ শব্দ হতে, দেবী)-এর নিজের পবিত্র এলাকা (হিমা ও হারাম) ছিল আল-তাঈফের কাছাকাছি এবং মক্কা ও অন্যান্য এলাকার অধিবাসীরা তীর্থযাত্রা ও বলিদানের জন্য সেই পবিত্র অঞ্চলে জমায়েত হত। এই ঘেরা জায়গার মধ্যে গাছ কাটা, শিকার করা ও মানুষের রক্তপাত ঘটানো ছিল নিষিদ্ধ। ওই এলাকায় যে দেবতা ছিল সম্মানিত, উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল সেই দেবতার অলঙঘনীয় মর্যাদার অংশবিশেষ। ইজরায়েলে উদ্বাস্তুদের শহরগুলিও ছিল একই উৎস থেকে উদ্ভূত। হেরোডোটাস[36] নাবাতিয়ান দেব-দেবীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আলিলাত নামে এই দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন।

মক্কার পূর্বদিকে অবস্থিত নাখলা ছিল আল-উজ্জা-র (সবচেয়ে শক্তিশালী, শুক্র, শুকতারা)-র আরাধনার কেন্দ্র। আল-কালবি[37]-র লেখা থেকে জানা যায় যে, কুরায়শদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দেবী এবং যুবক মুহাম্মাদ তাঁর উদ্দেশে একবার বলি দিয়েছিলেন। তাঁর উপাসনার জায়গাতে তিনটি গাছ ছিল। মানুষকে বলি দেওয়া ছিল তাঁর আরাধনার অঙ্গবিশেষ। তিনি ছিলেন দেবী উজ্জাই-আন যার উদ্দেশে এক দক্ষিণ আরবীয় তার অসুস্থ মেয়ে আমাত-উজ্জাই-আন (আল-উজ্জার কুমারী)[38]-এর পক্ষে একটি সোনার মূর্তি অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের মুহূর্তে আবদ-আল-উজ্জা ছিল জনপ্রিয় এক নাম বিশেষ।

মানাহ্ (মানিয়াহ্ থেকে, সুনির্দিষ্ট ভাগ্য) ছিলেন ভাগ্যের দেবী[39] এবং সেই অর্থে তিনি ছিলেন ধর্মীয় জীবনের[40] প্রথম দিকের প্রতিনিধি। তাঁর মূল উপাসনাস্থলে ছিল একটি কালো পাথর এবং মক্কা ও ইয়াসরিব (পরে আল-মদীনা নামে পরিচিত)-এর মধ্যকার রাস্তার মাঝামাঝি কুদাইদ নামে একটি জায়গায় তা অবস্থিত ছিল। আওস্ ও খাজরাজ উপজাতির মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে জনপ্রিয় এবং মক্কা থেকে মুহাম্মাদের বিপজ্জনক পলায়নের সময়ে এই দু'টি উপজাতি তাঁকে সমর্থন করেছিল। যূ-আল-শারা-র সঙ্গে একজন স্বাধীন দেবী হিসেবে তাঁর নাম আল-হিজর[41]-এ অবস্থিত নাবাতিয়ান শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত আরবীয় পদ্যকারেরা সমস্ত দুর্দশার জন্য আল-মানায়া বা আল-দাহর (মহাকাল)-কে দায়ী করে আসছে।

যেহেতু বাবার রক্তের তুলনায় মায়ের রক্তই সেমিটিক উপজাতিগুলির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলেছিল এবং যেহেতু আদিম পরিবারগুলি ছিল মাতৃকেন্দ্রিক, তাই আরাধনার পাত্র হিসেবে দেবতাদের তুলনায় আরবীয় দেবীরা অনেক বেশি গুরুত্ব পেত।

● মক্কায় অবস্থিত কা'বাহ

আল-কা'বার প্রধান দেবতা হুবাল (বাষ্প-র সিরীয় প্রতিশব্দ, স্পিরিট)-এর ছিল মানবিক রূপ। এর পাশে ছিল ভবিষ্যদ্বক্তাদের (কাহিন, সিরীয় ভাষা থেকে গৃহীত) ভবিষ্যৎ কথনের

প্রতীকরূপ ধর্মীয় তীরচিহ্ন এবং এই ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। ইব্‌ন-হিশামের[৪২] রচনায় উল্লিখিত প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মোয়াব বা মেসোপটেমিয়া থেকে আমর ইবন-লুহাই এই মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। এই কাহিনীর মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে, কারণ এই দেবতাটি[৪৩] যে সিরীয় উৎস-জাত সেই স্মৃতি এর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছিল। মুহাম্মাদ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পরে হুবাল অন্যান্য দেব-দেবীর পরিণতি ভাগ করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়।

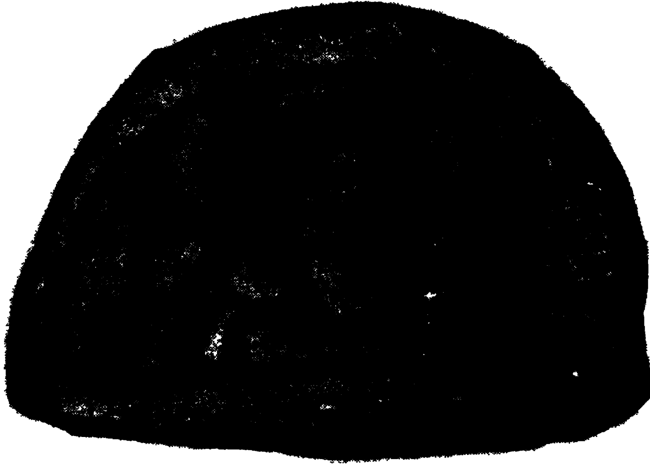
আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক কা'বাহ পরে ইসলামের রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছিল। এটি ছিল আদিম সারল্যে ভরপুর ঘনকাকৃতি (এইজন্যই ওই নাম) একটি বাড়ি। মূলত এই বাড়িটির মাথায় কোন ছাদ ছিল না এবং এটি একটি কালো উল্কাপিণ্ডের আশ্রয়স্থল বলে গণ্য হত। আর এই কালো উল্কাপিণ্ডকে ভক্তিযোগ্য বস্তুপিণ্ড রূপে শ্রদ্ধা করা হত। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর ৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ওই কাঠামোটির পুনর্গঠন করা হয়। লোহিত সাগরের[৪৪] উপকূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাইজান্টানীয় বা আবিসিনীয় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা সম্ভবত জনৈক আবিসিনীয় এটি পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন। এর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অঞ্চলকে পবিত্র অঞ্চল (হারাম) বলে গণ্য করা হত। সেখানে বার্ষিক তীর্থযাত্রা সংঘটিত হত এবং বিশেষ ভাবে কুরবানি দেওয়া হত।

মুসলিম প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, স্বর্গীয় আদিরূপের অনুকরণে আদম এই কা'বা তৈরি করেছিলেন। মহাপ্লাবনের পর আব্রাহাম ও ঈশমায়েল[৪৫] এটি পুনর্নির্মাণ করেন। এটির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল ঈশমায়েলের বংশধরদের হাতে যতক্ষণ না গর্বিত বানু-জুরহাম ও পরবর্তী সময়ে মূর্তিপূজার উদ্ভাবক বানু-খুজাআহ্-এর দখল নিয়েছিলেন। তারপর এল কুরাইশ উপজাতি, তারা প্রাচীন ঈসমাইলীয় আদর্শই অনুসরণ করত। পুনর্নির্মাণের কাজে যখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তখনই গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে ঈশমায়েল কালো পাথরটি পেয়েছিলেন, ওই কাঠামোর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি এখনও রক্ষিত আছে এবং তীর্থযাত্রার (হজ) অনুষ্ঠানের জন্য তিনি বিশেষ নির্দেশ পেয়েছিলেন।

● আল্লাহ্

মক্কার একমাত্র দেবতা না হলেও আল্লাহ্ (আল্লাহ্, আল-ইলাহ্, ঈশ্বর) ছিলেন প্রধান দেবতা। নামটি হল অতি প্রাচীন। দক্ষিণ আরবের দুটি শিলালিপিতে এই নামটির উল্লেখ আছে। একটি হল আল-উলা নামক স্থানে মিনাইয়ান ও অপরটি হল সাবায়ী শিলালিপি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর[৪৬] লিহ্য়ানাইট শিলালিপিতে 'এইচ এল এইচ'-এর আকারে বহুবার উল্লেখ আছে। সিরিয়া থেকেই লিহয়ান প্রথম আল্লাহ্র ধারণাটি পেয়েছিল এবং লিহয়ানই ছিল আরবে আল্লাহ্র আরাধনার প্রথম কেন্দ্র। ইসলামি যুগ[৪৭] শুরু হবার ৫০০ বছর আগে সাফা শিলালিপিতে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে[৪৮] সিরিয়ার অন্তর্গত উম-আল-জিমাল বলে পরিচিত

একটি জায়গায় ইসলাম-পূর্ব যুগের এক খ্রিস্টীয়-আরবীয় শিলালিপিতে এই নামটি হাল্লাহ্ রূপে উল্লিখিত হয়েছিল। মুহাম্মাদের বাবার নাম ছিল আবদ-আল্লাহ্ (আবদুল্লাহ্, আল্লাহ্র দাস বা পূজারি)। ইসলাম-পূর্ব যুগে মক্কার অধিবাসীরা দুনিয়ার স্রষ্টা ও পরমদাতা এবং বিশেষ বিশেষ বিপদের মুহূর্তে স্মরণযোগ্য বলে আল্লাহ্কে যে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখত, তা কোরানের অন্তর্ভুক্ত ৩১:২৪, ৩১; ৬:১৩৭, ১০৯; ১০:২৩ অনুচ্ছেদে দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন কুরায়শদের উপজাতীয় দেবতা। ঝোড়ো ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াযুক্ত এবং আতিথেয়তাহীন ও অনুর্বর উপত্যকা মক্কার এই উপাসনাস্থলটি আল-হিজাজকে উত্তর আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।



আল কা'বাহ-এর কালো পাথর

নাস্‌র[১১] (শকুন), আওফ (বড় পাখি)-এর মতো নিকৃষ্ট ধর্মের অন্যান্য দেবতাগুলিও প্রাণীর নাম বহন করে এবং তা স্বাভাবিকভাবেই টোটেম-জাতীয় উৎসের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থে আমরা বিশ্বস্ত প্রাচীন সাহিত্যের কোন জায়গাতেই এর সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ধারণার প্রকাশ দেখতে পাই না। অল্প কয়েকটি অস্পষ্ট প্রসঙ্গকে খ্রিস্টীয় কুসংস্কারের একটি প্রতিধ্বনি রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। আনন্দবাদী আরবীয়রা জীবনের আশু বিষয়গুলিতে এমনভাবে মগ্ন হয়েছিলে যে অন্য বিষয়ে তারা বিশেষ চিন্তা করতে পারেনি। এ ব্যাপারে এক চারণকবি গেয়েছেন ·

আমরা চরকা কাটি এবং জীবনের পথে পথে ঘুরে বেড়াই
তারপর, ধনী ও দরিদ্র সকলেই অবশেষে বিশ্রাম নিই
মাটির নীচে স্লেট-পাথরে ঢাকা ফাঁকা গহ্বরে
আমরা বাস করি।[২০]

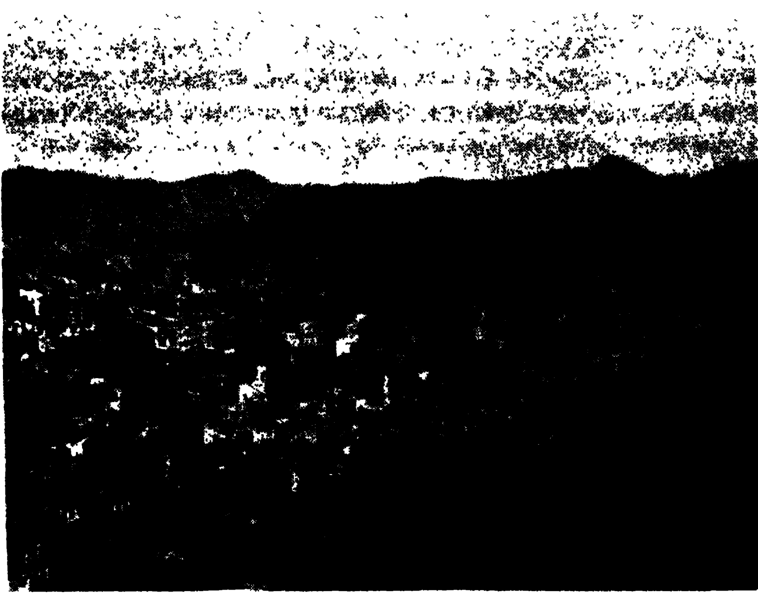
যেহেতু বেদুইনেরা তাদের পণ্যের আদান-প্রদানের জন্য স্থায়ী শহরগুলিতে প্রায়ই আনাগোনা করত, এবং বিশেষ করে 'পবিত্র যুদ্ধের সাময়িক বিরতি'-র চার মাসে তারা শহরের অগ্রণী চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হত এবং তার ফলে তারা কা'বার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এবং কুরবানি দিতে অভ্যস্ত হয়ে যেত। মক্কা ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন পাথরগুলি (আনসাব), বিশেষত যেগুলি মূর্তি বা যজ্ঞবেদী রূপে গণ্য হত, তাদের নিকট উট ও মেষ বলি দেওয়া হত। যাযাবর উপজাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুশীলন ছিল কোন বড় তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে শহরে আরবদের তীর্থযাত্রা। 'পবিত্র যুদ্ধের সাময়িক বিরতি'-র চারটি মাস মুসলিম পঞ্জীতে যথাক্রমে প্রতি বছরের একাদশ, দ্বাদশ ও প্রথম মাস (যূ-আল-কাদা, যূ-আল-হিজ্জা ও মুহাররাম) এবং মধ্যভাগে চতুর্থ মাস (রাজাব) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম তিন মাস ছিল বিশেষভাবে ধর্মীয় আচরণের জন্য সংরক্ষিত এবং চতুর্থ মাসটি ছিল বাণিজ্যের জন্য। মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান, সহজে প্রবেশ করার সুযোগ এবং উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মূল মরুযাত্রীদের পথে অবস্থিত হবার ফলে আল-হিজাজ ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অতুলনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করত। এভাবেই উকাজ মেলা ও তার পাশাপাশি কা'বার বিকাশ ঘটে।

● আল-হিজাজের তিনটি শহর আল-তাঈফ

নাজদ-এর উচ্চভূমি ও তিহামা (নিম্নভূমি) নামে পরিচিত নিম্নউপকূল অঞ্চলের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক (হিজাজ) রূপে দাঁড়িয়ে ছিল আল-হিজাজের অনুর্বর ভূমি। আল-তাঈফ এবং দুই সহোদরা শহর মক্কা ও আল-মদীনার জন্য আল-হিজাজ গর্ববোধ করতে পারত।

প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চতায় গাছের ছায়ায় অবস্থিত আল-তাঈফ ছিল মক্কার অভিজাত ব্যক্তিদের গ্রীষ্মাবকাশের আশ্রয়স্থল। একে 'সিরীয় ভূমির একটি ছোট অংশ' বলেও বর্ণনা করা হত। বার্কহার্ড ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই শহরে এসেছিলেন এবং শহরটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, লেবানন[২১] ত্যাগ করার পর তার দেখা শহরগুলির মধ্যে এখানকার দৃশ্যগুলিই সবচেয়ে মনোরম ও আনন্দদায়ক। এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে ছিল মধু, তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙুর, চীনাবাদাম, জাম, ও বেদানা।[২২] এখানকার গোলাপ ছিল আতরের জন্য বিখ্যাত এবং মক্কার প্রয়োজনীয় সুগন্ধিদ্রব্য এখান থেকেই সরবরাহ হত। আল-আগানি[২৩] উল্লিখিত একটি প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, এক ইহুদি মহিলা এখানে আঙুরের

চাষের প্রচলন করেছিল এবং তার প্রথম পাতাগুলি সে একজন স্থানীয় প্রধানকে উপহার দিয়েছিল। এখানকার মদের তুলনায় তা ছিল অনেক সস্তা। উপদ্বীপটির সমস্ত জায়গার মধ্যে আল-তাঈফ শহরটিই কোরানের ৪৭:১৬-১৭ সূরাহ্‌তে বর্ণিত স্বর্গের প্রায় কাছাকাছি চলে আসে।



আবু কুবায়স পাহাড়ের ওপর থেকে মক্কা, পিছনে দেখা যাচ্ছে হিরা পর্বত

● মক্কা

টলেমি[১৪] বর্ণিত মাকোরাবা অর্থাৎ মক্কা নামটি এসেছিল সাবায়ী শব্দ মাকুরাবা থেকে। মাকুরাবা শব্দটির অর্থ হল উপাসনাস্থল, অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় কোন ধর্মীয় সংগঠনই এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল এবং মুহাম্মাদের জন্মের বহু আগেই এটি একটি ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। লোহিত সাগর থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে, দক্ষিণ আল-হিজাজের অন্তর্গত তিহামা-তে একটি রুক্ষ ও পাথুরে উপত্যকায় এর অবস্থিতি। কোরানে (১৪:৪০) এটিকে 'চাষবাসের অযোগ্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কায় একটি থার্মোমিটারে প্রায় অসহনীয় উত্তাপ ধরা পড়বে। তাঞ্জিয়ার থেকে আগত বিখ্যাত আরব পর্যটক ইবন-বতুতা যখন খালি

পায়ে কা'বার চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে চেয়েছিলেন, পাথরের দ্বারা বিকিরিত তাপের ফলেই তিনি ব্যর্থ হন।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাবার 'ব্যাণিজ্য পথ'-যেটি এর মধ্যে দিয়ে গেছে, তার তুলনায় প্রাচীন এই শহরটি প্রথম দিকেই মাআরিব ও গাজ্জার মধ্যবর্তী একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক মানসিকতা ও প্রগতিশীল চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত মক্কার অধিবাসীরা শীঘ্রই তাদের শহরটিকে সম্পদের কেন্দ্রে পরিণত করল। বদরের খণ্ডযুদ্ধে (১৬ মার্চ, ৬২৪) লিপ্ত মক্কার একটি উষ্ট্রারোহী বাহিনী যখন গাজ্জা থেকে ফিরছিল, তখন তাদের কাছে ১০০০ উট ও ৫০,০০০ দিনার (প্রায় ২০,০০০ পাউন্ড) মূল্যের পণ্য ছিল। আল-ওয়াকিদির[৫৬] বর্ণনা থেকে উটের সংখ্যাটি জানা গেছে। কাবার তত্ত্বাবধায়ক কুরায়শদের দায়িত্ব ছিল ওই উপাসনাস্থলটিকে একটি জাতীয় ধর্মস্থানে এবং উকাজ-এর মেলাটিকে একটি বাণিজ্যিক ও বৌদ্ধিক মিলনকেন্দ্রে পরিণত করা। সেই কুরায়শদের নেতৃত্বেই মক্কার খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অক্ষত রইল।

● আল-মদীনা

মক্কার ৩০০ মাইল উত্তরে ইয়াসরিব (য়সরব বলে সাবায়ী শিলালিপিতে উল্লিখিত, টলেমি কর্তৃক জাথরিপ্পা বলে উল্লিখিত)[৫৭] অবস্থিত ছিল। দক্ষিণে অবস্থিত সহোদরা শহরের তুলনায় এই শহরটি প্রকৃতির অনেক বেশি আনুকূল্য লাভ করেছিল। আল-ইয়ামানের সঙ্গে সিরিয়াকে যুক্ত করেছে যে 'মশলা-পথ', তার ওপরে অবস্থিত এই শহরটি ছিল আসলে একটি প্রকৃত মরূদ্যান এবং এখানে বিশেষভাবে খেজুরের চাষ হত। এখানকার ইহুদি অধিবাসী বানু-নাযির ও প্রধানকে উপজাতিরা শহরটিকে একটি অগ্রণী কৃষিকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। তাদের জীবনে ব্যবহৃত তাদের বিশেষ নামগুলি ও সিরীয় শব্দকোষের ভিত্তিতে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ইহুদিরা মূলত আরব[৫৮] ও সিরীয় জাত ইহুদি বানু-কুরাইযাহ্ ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী। যদিও এদের মূল অংশটি ইস্রায়েলী হয়ে থাকতে পারে। খ্রিস্টজন্মের পর প্রথম শতাব্দীতে রোমানদের দ্বারা প্যালেস্টাইন বিজয়ের সময়ে তারা ওই শহর থেকে পালিয়ে এসেছিল। সম্ভবত এই সিরীয়ভাষী ইহুদিরা তাদের নাম ইয়াসরিব থেকে পরিবর্তন করে সিরীয় শব্দ মেডিন্টা ব্যবহার করতে শুরু করে। (মুহাম্মাদের 'শহর') আল-মদীনা নামটির ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে পরবর্তীকালে করা হয়। আওস ও খাজরাজ ছিল দুটি অগ্রণী অ-ইহুদি উপজাতি, যারা আল-ইয়ামান থেকে এসেছিল।

● আল-হিজাজে সাংস্কৃতিক প্রভাব : ১ সাবা

বিশ্ব-রাজনীতির মূল ঘটনাস্রোতে যুক্ত না থাকলেও ইসলাম-পূর্ব আল-হিজাজ সাম্প্রতিক ঘটনাবলির একেবারে প্রভাবমুক্ত ছিল না বললেই চলে। ইসলাম-পরবর্তী সময়েই আল-

হিজাজ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং অষ্টম হিজরী সন থেকে তা শুরু হয় যখন মক্কা দখল করা হয় এবং নবম সূরাহ্-র আটাশতম আয়াতটি অবতীর্ণ।[৫৯] মুহাম্মাদের জন্মের পর প্রথম শতাব্দীতে তাঁর জন্মস্থানেই বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান ও ইহুদি চিকিৎসক,সঙ্গীতজ্ঞ ও ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটে।

প্রথম দিকের দক্ষিণ আরবীয় সভ্যতা ধ্বংস হবার আগে তাদের উত্তরাঞ্চলীয় উত্তরসূরিদের ওপর বেশ কিছু ছাপ রেখে যায়। মাআরিব বাঁধের ভাঙনের ঘটনা নিয়ে উৎকীর্ণ আব্রাহা-র শিলালিপিটি (৫৪২-৪৩ খ্রিঃ) নিম্নলিখিত শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছিল : "করুণাশীল (রহমান-আন) এবং তার বার্তাবহ ও পবিত্র আত্মা[৬০]-র ক্ষমতা, মর্যাদা ও করুণা স্মরণে শুরু হচ্ছে।" রহমান-আন শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিশব্দ আল-রহমান পরবর্তীকালে আল্লার একটি বিশিষ্ট নামে পরিণত হয় এবং কোরান ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বে তাঁর অন্যতম নাম রূপে গণ্য হতে থাকে। ১৯ তম সূরাহ্টিতে আল-রহমান[৬১] শব্দের একচেটিয়া প্রাধান্য দেখা যায়। যদিও খ্রিস্টানদের ঈশ্বরকে বোঝাতেই শব্দটি শিলালিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও এই শব্দটি একটি প্রাচীন দক্ষিণ আরবীয় দেবতার নাম থেকেই ধার নেওয়া হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব ও সাবায়ী শিলালিপিতে[৬২] একটি দেবতার (রহীম) নাম হিসেবে আল-রহীম (করুণাময়) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অপর একটি দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপিতে 'শিরক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বহুদেবতার সমন্বয় বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—মুহাম্মাদ যার বিরুদ্ধে তীব্র ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। এই বহুদেবতার অর্থ হল একটি সর্বক্ষমতাময় দেবতার ধারণা, যাঁর সঙ্গে অন্যান্য ছোটখাট দেবতা যুক্ত হয়ে আছে। ওই একই শিলালিপিতে অনেকটা যেন উত্তর আরবীয় ভাষায়[৬৩] 'অবিশ্বাস'-কে বোঝাতে 'কফর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

● (২) আবিসিনিয়া

লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের সেমিটিক জনসাধারণ দক্ষিণ-পশ্চিম আরব থেকে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সেখানেই তাদের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের আবিসিনিয় বলা হত এবং তারাই বিরাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 'ট্রাস্ট'-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি করেছিল। এবং সাবায়ী-হিময়ারীদের নেতৃত্বে এই ট্রাস্ট প্রাচীন মশলার বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে কুক্ষিগত করেছিল এবং আল-হিজাজের মধ্য দিয়ে এই বাণিজ্যের মূলস্রোত প্রবাহিত ছিল। মুহাম্মাদের জন্মের আগে প্রায় ৫০ বছর ধরে আল-ইয়ামানে আবিসিনিয়দের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁর জন্মের বছরটিতে তারা মক্কার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে সেখানকার বহুমূল্য কা'বাকে ধ্বংস করার ভয় দেখাচ্ছিল। মক্কা ছিল এক আবিসিনিয়ের বাসস্থান, সাময়িক এক খ্রিস্টান উপনিবেশ। বিলাল[৬৪]-এর উচ্চকণ্ঠস্বর তাকে মুহাম্মাদের মোয়াজ্জিন হবার বিরল মর্যাদা এনে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন এক

আবিসিনীয় নিগ্রো। সমুদ্র ও সামুদ্রিক ঝড় সম্পর্কে কোরানে যে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ (সূরাহ্ ১৬:১৪, ১০:২৩-২৪, ২৪:৪০) আছে তা অসাধারণ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট এবং এগুলি আবিসিনিয়া ও আল-হিজাজের মধ্যে সামুদ্রিক সংসর্গের একটি প্রতিধ্বনিমাত্র। মুসলিম সম্প্রদায় তার শিশু অবস্থায় যখন ধর্মবিশ্বাসহীন কুরায়শদের প্রবল চাপের মধ্যে ছিল তখন তারা উদ্বাস্তু রূপে আবিসিনিয়াতেই আশ্রয় নিয়েছিল।[৬৪]

● (৩) পারস্য

ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হবার আগের শতাব্দীটিতে আল-ইয়ামানের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য জরথুস্টবাদী পারস্যের সঙ্গে আবিসিনিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পারস্যের জ্ঞান দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে পারসিয়ান আরব ও তার রাজধানী আল-হিরার মধ্য দিয়ে আবিসিনীয়দের আয়ত্তে চলে যাচ্ছিল। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে পারসিক বংশোদ্ভূত সালমান নাকি আল-মদীনা[৬৫] রক্ষার জন্য পরিখা কীভাবে কাটতে হবে, মুহাম্মাদকে শিখিয়ে ছিলেন।

পারস্যের আরবীয় উপনিবেশ আল-হিরা ছিল প্রধান মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র পারসীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবই নয়, পরবর্তী সময়ে অ্যারামিয়ান নেস্টোরিয়ান প্রভাব মুহাম্মাদ-পূর্ব আরবে অনুপ্রবেশ করেছিল। এই নেস্টোরিয়ানরা যেমন পরবর্তীকলে হেলেনীয় মতবাদ ও সদ্যোজাত ইসলামের মধ্যে মূল যোগসূত্র স্থাপন করেছিল, তেমনি তারা উত্তরের অর্থাৎ অ্যারামিক, পারসীয় ও হেলেনীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব ধর্মবিশ্বাসহীন আরবে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

● (৪) গাস্সান অঞ্চল

আল-হিরার নেস্টোরিয়ানরা যেমন পারসীয় সীমান্তের আরবদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, গাস্সান অঞ্চলের মোনোফাইসাইটরা আল-হিজাজের মানুষদের ওপর ঠিক তেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে চার শতাব্দী ধরে সিরীয় জীবনধারায় অভ্যস্ত এই সমস্ত আরবেরা গোটা আরব দুনিয়াকে শুধুমাত্র সিরিয়ারই নয়, এমনকি বাইজান্টিয়ামের সংস্পর্শে এনেছিল। দায়ুদ (ডেভিড), সুলাইমান (সলোমন), ঈসা (জেসাস)-র মতো এমন নাম ইসলাম-পূর্ব আরবীয়দের মধ্যে খুব একটা বিরল ছিল না।

উত্তরের এই প্রভাবকে কোনভাবেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া চলে না, কারণ মোনোফাইসাইট বা নেস্টোরিয়ান গির্জা কোনটারই এর ধর্মীয় প্রভাবকে সংক্রামিত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না। উত্তর আরবের কোন জায়গায় খ্রিস্টধর্ম গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল—পেরি শিকো[৬৬] সংগৃহীত তথ্যগুলি তা দেখানোর পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তবুও এই তথ্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম-পূর্ব যুগের অনেক কবিই খ্রিস্টান আদর্শ ও খ্রিস্টান পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিল। বেশ ভাল সংখ্যক সিরীয় শব্দ প্রাচীন আরবী শব্দকোষে[৬৭] যুক্ত হয়েছিল।

● (৫) ইহুদি সম্প্রদায়

আরবের ওপরে প্রভাব বিস্তারকারী একত্ববাদ সামগ্রিক অর্থে খ্রিস্টান চরিত্রের ছিল না। আল-মাদীনা ও উত্তর আল-হিজাজের বিভিন্ন মরূদ্যানে[৬৯] ইহুদি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। আল-জুমাহি (মৃ. ৮৪৫ খ্রিঃ) তার রচিত জীবনীমূলক[৭০] পুস্তকের একটি অংশ আল-মদীনা ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের ইহুদি কবিদের সম্পর্কে আলোচনায় উৎসর্গ করেছেন। আল-আগানি তার লেখায় আরবের কয়েকজন ইহুদি কবির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একমাত্র যে ইহুদি কবি আমাদের জন্য একটি দিওয়ান লিখে গেছেন তিনি হলেন তাইমা-র নিকটে অবস্থিত আল-আবলাক-এর অধিবাসী আল-সামাওয়াল (স্যামুয়েল)[৭১]। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইমরু-আল-কায়িস-এর সমসাময়িক। অবশ্য তার কবিতাগুলি বর্তমানের নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী কবিতা থেকে আলাদা কিছু ছিল না এবং এর ফলেই তার ইহুদি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সঠিকভাবেই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। আল-ইয়ামানে বিশেষত যু-নুওয়াসের শাসনে ইহুদিধর্ম একটি রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল।

পরিশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুহাম্মাদের প্রচার অভিযান শুরু হবার ঠিক আগের শতাব্দীতে বাইজানটাইন, সিরীয় ইয়ামানীয় (আরামিয়ান), পারসীয় ও আবিসিনিয় কেন্দ্রগুলি থেকে গাস্‌সানিদ, লাখমিয় ও ইয়ামানীয় চ্যানেলের মাধ্যমে বৌদ্ধিক, ধর্মীয় ও বস্তুবাদী প্রভাব আল-হিজাজে প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে নিজের দেশীয় সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটানোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আল-হিজাজ ও উত্তরের উন্নত সভ্যতার মধ্যে ছিল না। খ্রিস্টধর্ম যদিও নাজরানে এবং ইহুদি ধর্ম আল-ইয়ামান ও আল-হিজাজে পা রাখার মতো জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্মই উত্তর আরবীয়দের মনন জগতে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যাই হোক, উপদ্বীপের প্রাচীন নিকৃষ্ট ধর্মবিশ্বাস এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখান থেকে মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতে সে সফল হয়নি এবং তার ফলে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এই ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে একেশ্বরবাদের একটি অস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলেছিল এবং হানিফস[৭২] নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। তার মা ও মুহাম্মাদের দ্বিতীয় ভাইঝি-র মাধ্যমে উমাইয়া বংশের ইবন-আবি-আল-সলত (মৃ. ৬২৪ খ্রিঃ) এবং খাদিজার এক ভাইপো ওয়ারাকা ইব্‌ন-নাওফল ছিলেন এমন ধরনের হানিফস, যদিও বিভিন্ন কাহিনীতে ওয়ারাকা-কে একজন খ্রিস্টান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দিকে দক্ষিণ আরবে যে সংগঠিত জাতীয় জীবন গড়ে উঠেছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা এখন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ফলে একজন মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত এবং মানুষও মনের দিক থেকে তাঁকে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত ছিল। ❑

● টীকা ●

১ আগানি, ২য় খণ্ড ১৬২ পাতা।

২ ইব্‌ন-হিশাম, ১১৭-১১৯ পাতা; ইয়াকূত কর্তৃক উদ্ধৃত, ৩য় খণ্ড, ৫৭৯ পাতা।

৩ দিয়ার-বকর (দিয়ারবেকর) শহরটি এখনও এই উপজাতিটির নাম বহন করছে।

৪ আগানি, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০-৫২ পাতা; আবু-তাম্মাম, হামাসা, ৪২০-২৩ পাতা; ইক্‌দ, ৩য় খণ্ড, ৯৫ পাতা।

৫ আগানি, ৯ম খণ্ড, ১৫০ পাতা, ৭ম খণ্ড, ১৫০ পাতা।

৬ আল-জাহিজ, মাজমুয়াত রাসাইল (কায়রো, ১৩২৪), ৪১-৪৩ পাতা; ইক্‌দ, ১ম খণ্ড, ১২৫ পাতা তুলনীয়।

৭ ২য় খণ্ড (কায়রো, ১৩১০); জি ফ্রেটাগ, অ্যারাবাম প্রোভার্বিয়া (বন, ১৮৩৮-৪৩)।

৮ ২য় খণ্ড (কনস্ট্যান্টিনোপল, ১৩০০); আল-মুফায্‌যাল ইবন-সালামা (মৃত আনুমানিক ৯২০ খ্রিঃ), আল-ফাখীর, সম্পাদনা : সি. এ. স্টোরে (লিডেন, ১৯১৫)।

৯ এফ. উস্টেনফেল্ড সম্পাদিত (গটিনজেন, ১৮৫৪)।

১০ তাহা হুসাইন, আল-আদাব আল-জাহিলি (কায়রো, ১৯২৭)।

১১ আল-সুয়ূতি, আল-মুযহির (কায়রো, ১২৮২), ২য় খণ্ড, ২৪০ পাতা।

১২ উইলিয়াম জোন্স, রচনাবলি (লণ্ডন, ১৭৯৯), ৪র্থ খণ্ড, ২৪৫-৩৩৫ পাতা; অ্যানে ও উইলফ্রিড এস ব্লান্ট, দি সেভেন গোল্ডেন ওডস অফ প্যাগান অ্যারাবিয়া (লণ্ডন, ১৯০৩)।

১৩ সম্পাদনা : সি জে লায়াল, ৩ খণ্ড (অক্সফোর্ড ও লিডেন, ১৯২১-২৪)।

১৪ বালাম ছিল এক ধরনের আদিম আরবীয় শ্লেষাত্মক কবি (নাম্বারস : ২৩:৭)।

১৫ ৮ম খণ্ড, ৭৭ পাতা।

১৬ মুযহির, ২য় খণ্ড, ২৩৫ পাতা।

১৭ মুরুয়া ও ইরদ সম্পর্কে জানতে এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইস্‌লাম-এর ক্রোড়পত্রে বিশর ফোয়ারস রচিত প্রবন্ধাবলি দ্রষ্টব্য।

১৮ ইব্‌ন-কুতাইবা, আল-শির অ-আল-শুয়ারা। সম্পাদনা : ডে গেজে (লিডেন ১৯০৪) ১২৪ পাতা।

১৯ আগানি, ৭ম খণ্ড, ১৪৯-৫০ পাতা; ইব্‌ন-কুতাইবা, ১৩০ পাতা।

২০ মক্কার দক্ষিণে সাতদিনের যাত্রাপথ শেষে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে; এখানকার দেবতা হল একটি শাদা পাথর; আল-কালবি, আল-আসনাম, সম্পাদনা : আহমদ জাকি (কায়রো, ১৯১৪), ৩৪ পাতা।

২১ নীচে দেখুন, ১০০ পাতা। তীরচিহ্ন দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা কোরান ৫:৪,৯২-এ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২২ আগানি, ৮ম খণ্ড ৭০ পাতা।

২৩ আরবী শব্দ তাকওয়া-র অর্থ স্রষ্টার প্রতি ভক্তি, এটি এসেছে ‘নিজে সতর্ক থাকা, ভয় পাওয়া থেকে।’

২৪ ইব্‌ন-হিশাম, সীরাহ্, ৭১ পাতা।
২৫ ১ম খণ্ড, ৪৩৪ পাতা।
২৬ আজাইব আল-মাখলূকাত, সম্পাদনা : এফ. উস্টেনফেল্ড (গটিনজেন, ১৮৪৯), ২০০ পাতা।
২৭ কালবি, ১৮ ও ২০ পাতা; ইয়াকুত, ৩য় খণ্ড, ৭৭২-৭৩ পাতা।
২৮ সীরাহ্, ২২ পাতা।
২৯ ১ম খণ্ড, ৯২২ পাতা।
৩০ সীরাহ্, ৮৪৪ পাতা।
৩১ কালবি, ২৪-২৭ পাতা।
৩২ একই বই, ১৬ পাতা।
৩৩ কোরান ৩৭:১৫৮, ৬:১০০।
৩৪ কোরান ২২:৫১-৫২, ১৭:৭৪-৭৬ তুলনীয়।
৩৫ আল-বাইযাবী, আনওয়ার আল-তানজিল, সম্পাদনা : এইচ. ও. ফ্রেচার, ১ম খণ্ড, (লিপজিগ, ১৮৪৬), ৬৩৬-৩৭ পাতা; তাবারী, তাফসির আল-কুরআন, ২৭শ খণ্ড, ৩৪ ও পরের পাতা, ১৭শ খণ্ড ১৩১ পাতা।
৩৬ বি কে ৩, ৮ম অধ্যায়।
৩৭ পৃষ্ঠা ১৮-১৯।
৩৮ নিয়েলসেন, হ্যান্ডবুক, ১ম অধ্যায় ২৩৬ পাতা।
৩৯ হিব্রুশব্দ মেনি, ইসাইয়া ৬৫:১১ তুলনীয়।
৪০ কালবি, ১৩ পাতা।
৪১ কুক, ২১৭ ও ২১৯ পাতা; লিজরায়স্কি, এফিমেরিস, ৩য় খণ্ড, ১৯০৯-১৫ (গিসেন, ১৯১৫), ৮৫ পাতা তুলনীয়।
৪২ সীরাহ্, ৫০ ও পরবর্তী পাতা।
৪৩ দেবমূর্তি-র আরবী প্রতিশব্দ 'সানাম' সিরীয় 'সেলেম' শব্দ থেকে গৃহীত।
৪৪ আল-আজরাকি, আখবার মক্কা, সম্পাদনা উস্টেনফেল্ড (লিপজিগ, ১৮৫৮), ১০৪-০৭ পাতা তুলনীয়; ইয়াকুবী, তারীখ, ২য় খণ্ড, ১৭-১৮ পাতা।
৪৫ কোরান ২:১১৮-২১।
৪৬ উইনেট, ৩০ পাতা।
৪৭ দুসাউদ, লা আরাবে এন সিরিয়ে, ১৪১-৪২ পাতা।
৪৮ এনো লিটমান, জাইটক্রিফট্ ফর সেমিটিস্টিক অ্যান্ড ভারওয়াঁ গেবিতে, ৭ম খণ্ড (১৯২৯), ১৯৭-২০৪ পাতা।
৪৯ কোরান, ৭১:২৩।
৫০ আবু-তাম্মাম, ৫৬২ পাতা; লায়াল, ট্রানগ্রেসনস্, ২৭ পাতা।
৫১ জন এল বার্কহার্ড, ট্রাভেলস ইন অ্যারাবিয়া (লন্ডন, ১৮২৯), ১ম খণ্ড, ১২২ পাতা।
৫২ ইবন-বতুতা, তুহ্ফাত আল-নুয্যার, সম্পাদনা ও অনুবাদ : সি ডেফ্রেমেরি ও বি. আর স্যাঙ্গুইনেট্টি। ৩য় মুদ্রণ ১ম খণ্ড (প্যারিস, ১৮৯৩), ৩০৪-০৫ পাতা।

৫৩ ৪র্থ খণ্ড ৭৫ পাতা, ১১.৯-১০।

৫৪ জিওগ্রাফিয়া, সম্পাদনা : নোব্‌বে, বিকে. ৬ষ্ঠ, ৭ম অধ্যায়, নতুন ভাগ ৩২।

৫৫ ১ম খণ্ড, ২৮১ পাতা।

৫৬ আল-মাগাজি, সম্পাদনা : আলফ্রেড ভন ক্রেমার (কলকাতা, ১৮৫৫-৫৬), ১৯৮ পাতা।

৫৭ বি কে. ৬ষ্ঠ, ৭ম অধ্যায়, নতুন ভাগ ৩১; পারবর্তিত রূপ লাথরিপ্পা।

৫৮ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, ৪৯ পাতা, তারা যার বংশধর সেই আরবীয় উপজাতির নাম দেওয়া হয়েছে।

৫৯ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নীচে দেখুন, ১১৮ পাতা; বাইযাবী, ১ম খণ্ড, ৩৮৩ পাতা তুলনীয়; তাবারী, তাফসীর, ১০ম খণ্ড ৭৪ পাতা।

৬০ ই. গ্লেসার, মিটিলাঙ্গেন দার ভরদারাসিয়াটিসেন জেসেল স্যাফট (বার্লিন, ১৮৯৭), ৩৯০ ও ৪০১ পাতা; কর্পাস ইনস্ক্রিপশনাম সেমিটিকারাম, পারস্ ৪, টি ১, ১৫-১৯ পাতা।

৬১ পঞ্চম শতাব্দীর একটি দক্ষিণ আরবীয় শিলালিপিতে রাহমানা-ন খ্রিশ্চানদের ঈশ্বরের পদবিরূপে উল্লেখিত হয়েছে।

৬২ দুসাউদ ও ম্যাকলার, ভয়েজ আর্কিওলজিক, ৯৫ পাতা, ১.১০; দুসাউদ, অ্যারাবেস, ১৫২-৫৩ পাতা।

৬৩ জে এইচ মর্ডম্যান ও ডি এইচ মুলার রচিত উইনার জাইটক্রিফট ফর ডাই কুণ্ডে দাস মর্গেনল্যান্ডস, ১০ম খণ্ড (১৮৯৬), ২৮৫-৯২ পাতায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি।

৬৪ দামাস্কাসে এখনও তার সমাধিস্থল রয়েছে।

৬৫ বুরহান (প্রমাণ), হাওয়ারিয়্যান (যীশুর শিষ্য), জাহান্নাম (নরক, মূলত হিব্রু শব্দ), মায়িদা (টেবিল), মালাক (দেবদূত, মূলত হিব্রু শব্দ), মিহরাব (কুলুঙ্গি), মিনবার (প্রচারবেদী) মুসহাফ (পবিত্র বই), শায়তান (শয়তান) ইত্যাদি ইথিওপিক উৎসের আরবী শব্দগুলি মুসলিম হিজাজ-এর ওপর খ্রিস্টীয় আবিসিনীয় প্রভাবের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। তার রচিত আল-ইতকান (কায়রো, ১৯২৫) ১ম খণ্ড ১৩৫-৪১ পাতায় আল-সুয়ূতি উল্লেখ করেছেন যে, কোরানে ১১৮টি বিদেশি শব্দ আছে।

৬৬ হিট্টির মূল ইংরেজী গ্রন্থের নীচে দেখুন, ১১৭ পাতা। যরিন্দ (তরবারি), ফির'দাওস (স্বর্গ, সূরাহ্ ১৮:১০৭, ২৩:১১) সিজ্জিল (পাথর, সূরাহ্ ১০৫:৪), বারযখ (বাধা, সূরাহ্ ২৩:১০২; ৫৫:২০; ২৫:৫৫), জানজবিল (আদা, সূরাহ্ ৭৬:১৭, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নীচে দেখুন, ৬৬৭ পাতা) ইত্যাদি শব্দগুলি পারসীয় শব্দ থেকে গৃহীত।

৬৭ আল-নাস্‌রানীয়াহ্ অ-আদাবুহা, ২খণ্ড, (বেইরুট, ১৯১২, ১৯১৯, ১৯২৩); শুয়ারা আল-নাসরানিয়া; ২ খণ্ড (বেইরুট, ১৮৯০)।

৬৮ কানিসা ও বিয়া (গির্জা), দুমাইয়াহ ও সূরাহ্ (মূর্তি, ছবি), সুসিস (সাধু), সাদাকা (ভিক্ষা), নামূর (প্রহরী), নীর (দাসত্বচিহ্ন), কাসদান (একর), কিনদিল (প্রদীপ, ল্যাটিন ক্যান্ডেলা শব্দ থেকে) ইত্যাদি উদাহরণ। ল্যাটিন শব্দ 'ক্যাসট্রাম' থেকে সিরীয় ভাষায় 'কাস্ত্রা' শব্দটি উদ্‌ভূত। আর পশ্চিম আরামাইক 'কাসরা' শব্দ থেকে আরবী শব্দ 'কাস্‌র' (প্রাসাদ), এসেছিল এবং ইউরোপে ইতালি শব্দ ক্যাসেরো ও স্প্যানিশ শব্দ অ্যালকাজার চালু হয়েছিল।

৬৯ জিবরিল (গ্যাব্রিয়েল), সূরাহ্ (প্রত্যাদেশ, অধ্যায়), জাব্বার (সবচেয়ে শক্তিশালী) ইত্যাদি আরবী শব্দভাণ্ডারে হিব্রু শব্দের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

৭০ তাবাকাত আল-শুয়ারা, সম্পাদনা : জে হেল (লিডেন, ১৯১৬) ৭০-৭৪ পাতা।

৭১ দিওয়ান আল-সামাওয়াল, ২য় সংস্করণ, সম্পাদনা : শিখো (বেইরুট, ১৯২০)।

৭২ নাবাতিয়ানদের মাধ্যমে সিরীয় হতে সংগৃহীত বিদেশি শব্দ, এন এ ফ্যারিস ও এইচ ডব্লিউ গ্লিডেন, জার্নাল অফ দি প্যালেস্টাইন ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, ১৯শ খণ্ড (১৯৩৯), ১-১৩ পাতা; আর্থার জেফ্রি, দি ফরেন ভোকাবুলারি অফ দি কুরআন (বরোদা, ১৯৩৮), ১১২-১৫ পাতা। আরও প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাসংক্রান্ত গবেষণা কেবলমাত্র ইসলামের ওপরেই নয়, এমনকী প্রথম দিককার খ্রিস্টধর্মের ওপর নাবাতিয়ান সাংস্কৃতিক প্রভাবের গুরুত্বকে প্রমাণ করবে।

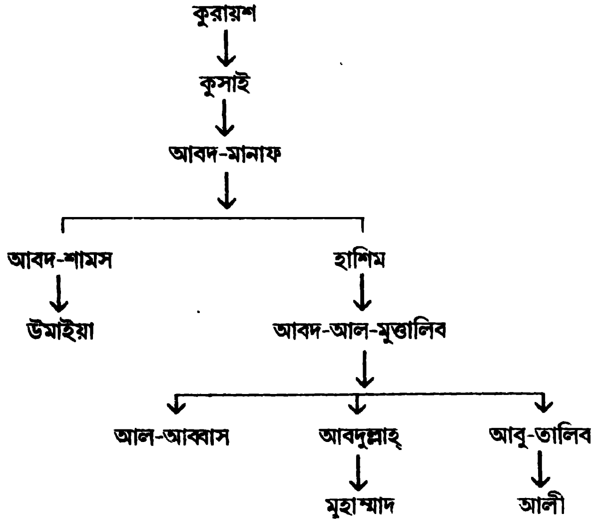
দ্বিতীয় ভাগ
ইসলামের আবির্ভাব ও খলিফা-রাজ্য

Print 12

।। অধ্যায় ৮ ।।

মুহাম্মাদ : আল্লাহ্‌র রাসূল

৫৭১ খ্রিস্টাব্দে বা ওই সময় নাগাদ মক্কায় কুরায়শ বংশে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। তার মা পুত্রের যে নাম দেন তা চিরকালের জন্যই ছিল অনিরূপিত। তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁকে আল-আমীন[১] (বিশ্বাসী) বলে ডাকত—এটি ছিল আপাতদৃষ্টিতে একটি সম্মানজনক উপাধি। কোরান (৩:১৩৮, ৩৩:৪০, ৪৮:২৯, ৪৭:২)-এ তাঁর নামটি মুহাম্মাদ[২] রূপে উল্লিখিত হয় এবং কেবলমাত্র একবার (৬১:৬) আহমাদ বলে উল্লিখিত হয়েছে। মানুষের মুখে মুখে মুহাম্মাদ (উচ্চপ্রশংসিত) নামটিই চালু ছিল—আর এই নামেই নামকরণ হতো অধিকাংশ পুত্রসন্তানের। মুহাম্মাদের বাবা আবদুল্লাহ্ তাঁর জন্মের আগেই মারা যান, আর মা আমিনা মারা যান যখন শিশুটির বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর। ফলে তাঁর দাদা আবদ-আল-মুত্তালিবের ওপরেই শিশুটিকে লালন-পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে। দাদার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব বর্তায় তাঁর চাচা আবু-তালিব-এর ওপর।



মুহাম্মাদের বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন তিনি তাঁর চাচা ও পৃষ্ঠপোষক আবু-তালিবের সঙ্গে সিরিয়া অভিমুখে ব্যবসা উপলক্ষে যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথেই তাঁর সঙ্গে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয় এবং প্রচলিত লোককাহিনী অনুযায়ী জানা যায় যে, তাঁর নাম ছিল বাহিরা।

যদিও বিশ্বের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে এই একজনই ইতিহাসের পরিপূর্ণ আলোকের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁর প্রথম জীবনে তিনি আমাদের কাছে খুব অল্পই পরিচিত ছিলেন। জীবিকার জন্য তাঁর সংগ্রাম, আত্মার পরিপূর্ণতা লাভের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর জন্য অপেক্ষমান মহান দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর ক্রমান্বয়িত ও কষ্টকর উপলব্ধি সম্পর্কে খুব অল্প বিশ্বাসযোগ্য বিবরণই আমাদের কাছে আছে। তার জীবন সম্পর্কে প্রথম বিবরণী রচনা করেন ইব্‌ন-ইসহাক। তিনি ১৫০ হিজরী (৭৬৭) নাগাদ বাগদাদে পরলোকগমন করেন। আর তার লিখিত রাসূল চরিতটি ইব ন-হিশামের সমালোচনামূলক বইটিতে সংরক্ষিত আছে। ইব ন-হিশাম ২১৮ হিজরী সনে (৮৩৩) মিশরে মারা যান। মুহাম্মাদের জীবনী ও ইসলাম ধর্মের শৈশবাবস্থার প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আরবীয় উৎস ছাড়া আর কোন বিবরণী পাওয়া যায় না। 'সারাসেন-এর শাসক ও মিথ্যা-ধর্মপ্রচারক' সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের হাতে তুলে দেবার ক্ষেত্রে প্রথম যে বাইজানটাইন কাহিনীকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার নাম ছিল থিওফ্যানিস[৩]; নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে সিরীয় ভাষায় একটি রচনায়[৪] মুহাম্মাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

পঁচিশ বছর বয়সে মুহাম্মাদের সঙ্গে তাঁর চেয়ে ১৫ বছরের বড় ধনবতী ও উদারমনা বিধবা মহিলা খাদিজার বিয়ে হয়। আর এরপরই মুহাম্মাদ ইতিহাসের আঙিনায় আবির্ভূত হন। খাদিজা ছিলেন কুরায়শ বংশজাত একজন ধনী ব্যবসায়ীর বিধবা স্ত্রী। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাতেন। তিনি যুবক মুহাম্মাদকে তার ব্যবসার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। যতদিন এই প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী ও মহান চরিত্রের অধিকারিণী মহিলা জীবিত ছিলেন, ততদিন মুহাম্মাদের আর অন্য কোন স্ত্রী-র প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

মুহাম্মাদের জীবনে যে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য দেখা দিল এবং কোরানে[৫] যার উল্লেখ আছে, তা মুহাম্মাদকে বেশ কিছুটা অবসরের সুযোগ এনে দিল। ফলে মুহাম্মাদ তাঁর নিজের ধর্মানুরাগের অনুশীলন করতে সক্ষম হলেন। তখন প্রায়ই তাঁকে নির্জনে বসে থাকতে দেখা যেত এবং মক্কার বাইরে অবস্থিত হিরা[৬] নামের একটি পাহাড়ের ওপর একটি ছোট গুহায় (গার) তিনি ধ্যানে বসতেন। সংশয়ের দ্বারা তাড়িত ও সত্যের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন এবং এই বিচ্ছিন্ন জীবনকালের অধ্যায়গুলির একটিতে মুহাম্মাদ 'গারে হিরা'-তে বসে একটি আদেশ[৭] শুনলেন : "যে আল্লাহ্ তোমার সৃষ্টিকর্তা তুমি তাঁর নামে পাঠ কর" [৮]।এটাই ছিল

তাঁর প্রথম প্রত্যাদেশ বা দৈববলে লব্ধ জ্ঞান। আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্মপ্রচারক তাঁর আহ্বান শুনেছেন। ওই দিনের রাতটির পরে নামকরণ হয়েছিল 'ক্ষমতার রাত' (লাইলাত আল-কাদর)[৯] ও রামাযান-এর (৬১০) শেষদিকে এটি নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই অকল্পনীয় ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই যখন আবার দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ এল, প্রবল আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে মুহাম্মাদ বিপদাশঙ্কায় বাড়ি চলে এলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে দেহটি কোন আবরণের দ্বারা ঢেকে দিতে বললেন, যার ফলে নিম্নোক্ত শব্দগুলি "নেমে এল" : "তুমি আঙরাখায় আবৃত হয়ে থেকো না! জাগো ও বিপদের আশঙ্কা সকলকে জানিয়ে দাও।"[১০] কণ্ঠের সেই আওয়াজগুলি কখনও জোরে, কখনও বা আস্তে ধ্বনিত হল, এবং সেই শব্দ কখনও 'ঘন্টাধ্বনির' (সালসালাত আল-জারাস)[১১] মতো প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু পরে মদিনীয় সূরাহ্-তে তা একটি আওয়াজে পরিণত হল এবং সেই আওয়াজ জিবরীল (গ্যাব্রিয়েল)-এর কণ্ঠস্বর বলে প্রতিভাত হল।

ওল্ড টেস্টামেন্টের হিব্রু ধর্মপ্রচারকদের মতো আরবীয় নাগরিক মুহাম্মাদও তাঁর আহ্বান ও বাণীর দিক থেকে প্রকৃত অর্থেই ছিলেন রাসূল। আল্লাহ্ এক। তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনিই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। বিচারের একটি নির্দিষ্ট দিন আছে। যারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করেন তাদের জন্য স্বর্গে রয়েছে জমকালো পুরস্কার। আর যারা তাঁর আদেশ অমান্য করেন তাদের জন্য নরকে অপেক্ষা করে আছে কঠোর শাস্তি। এটাই ছিল তার প্রথম দিককার বাণীর সারাংশ।

আল্লাহ্‌র বার্তাবহ (রাসূল) হিসেবে নতুন কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার পর মুহাম্মাদ তাঁর নিজের মানুষদের মধ্যে নতুন বাণীর প্রচার, প্রসার ও শিক্ষার কাজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারা তাঁর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপের বাণ হানতে লাগল। ফলে তিনি নিজেকে নাযীর (কোরান ৬৭:২৬; ৫১:৫০, ৫১), সতর্ককারী ও শেষ বিচারের তত্ত্ববাহক রূপে বেহেশতের মনোরম বর্ণনা এবং দোজখের ভীতিপ্রদ অবস্থা বর্ণনা করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এমনকী তাঁর শ্রোতাদের আসন্ন বিপদের ভয় দেখিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের প্রত্যাদেশগুলি বা মক্কার সূরাহ্‌গুলি ছিল সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, অভিব্যক্তিময় ও প্রভাবশালী।

আল্লাহ্‌র আরাধক, তাঁর বান্দাদের সতর্ককারী, আল্লাহ্‌র দূত ও বার্তাবাহক (নবী) হিসেবে মুহাম্মাদ বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তাঁর হানিফ[১২] চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব ন-নাউফালের প্রভাবে মুহাম্মাদের স্ত্রী খাদিজা আগেই তাঁর ধর্মে অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন এবং মুহাম্মাদের আহ্বানে প্রথমে যে ক'জন সাড়া দিয়েছিলেন, খাদিজা ছিলেন তার অন্যতম। মুহাম্মাদের চাচাতো ভাই আলী ও তার নিকটাত্মীয় আবু-বকর এঁর অনুসারী হলেন। কিন্তু কুরায়শ বংশের উমাইয়া শাখার অভিজাত ও প্রভাবশালী প্রতিনিধি আবু-সুফয়ান এই ধর্মান্তরকরণের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তারা যাকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা বলে গণ্য করত, তা আসলে একটি প্যান-অ্যারাবিয়ান তীর্থযাত্রার কেন্দ্র ও বহুসংখ্যক দেবতার মন্দির আল-কা'বার রক্ষক কুরায়শদের চরম আর্থিক স্বার্থের বিরুদ্ধেই ছিল।

প্রধানত ক্রীতদাস ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকেই ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা এই নতুন ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে লাগল। আর কুরায়শ গোষ্ঠীর তরফ থেকে তাঁর সম্পর্কে বিরামহীনভাবে যে উপহাস ও ব্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা আর অস্ত্র হিসেবে তেমন কার্যকরী ছিল না। ফলে প্রত্যক্ষ নির্যাতনই প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিল। এর ফলে মক্কার ১১টি পরিবার আবিসিনিয়াতে গমন করল এবং একই পথ অনুসরণ করে আরও ৮৩ টি পরিবার ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়াতে আশ্রয় নিল। উসমান ইব ন-আফফানের পরিবারটি ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী নেগাস-এর রাজত্বে তারা শরণার্থী রূপে আশ্রয় নিল। এই আশ্রয়প্রার্থীদের তাদের অত্যাচারীদের[১১] হাতে তুলে দেবার অনুরোধ নেগাস অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নির্যাতনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কালে সাময়িকভাবে তাঁর বহু অনুগামীকে হারালেও মুহাম্মাদ নির্ভীকভাবে তাঁর ধর্মপ্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং মেকী দেবতার পূজা থেকে সরিয়ে এনে আলোচনার মাধ্যমে অনেক মানুষকে এক ও প্রকৃত ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুরাগীতে পরিণত করলেন। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ নেমে আসা বন্ধ হল না। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মশাস্ত্র আছে জেনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অনুগামীদেরও ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে বলে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে উমার ইব-ন-আল-খাত্তাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, শীঘ্রই তিনি আল্লাহ্‌র সেবায় নিযুক্ত হলেন। হিজরতের তিন বছর আগে বিশ্বস্ত অনুগামিনী ও স্ত্রী খাদিজার মৃত্যু হল এবং তার অল্প কিছুদিন পরে আবু-তালিব মারা গেলেন। যদিও আবু-তালিব কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি, তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি তার ভাইপো মুহাম্মাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। হিজরত-পূর্ব এই সময়েই সেই নাটকীয় ইসরা[১৪] অর্থাৎ সেই নৈশ অভিযান ঘটেছিল। বলা হয়, সপ্তম স্বর্গে আরোহণের সময় মুহাম্মাদ নাকী চোখের পলকে আল-কা'বা থেকে জেরুসালেমে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এই স্মরণীয় যাত্রার ক্ষেত্রে যেহেতু একটি পার্থিব স্টেশনের ভূমিকা পালন করেছিল, তাই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে ইতিমধ্যেই পবিত্র শহর বলে পরিগণিত জেরুসালেম মুসলিম দুনিয়ায় মক্কা ও আল-মদীনার পরে তৃতীয় পবিত্র শহর বলে গণ্য হল এবং আজও তার সেই স্থান বজায় আছে। নানা সাজে অলংকৃত এই অত্যাশ্চর্য যাত্রা এখনও পারস্য ও তুর্কির অলৌকিক কাহিনীকারদের কাছে অতি প্রিয় বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয়। একজন স্পেনীয় গবেষক[১৫] মুহাম্মাদের এই যাত্রাকেই দান্তে রচিত ডিভাইন কমেডি-র মূল উৎস বলে

বর্ণনা করেছেন। আল-ইসরার স্মৃতি যে এখনও ইসলামি দুনিয়ায় একটি জীবন্ত ও গতিশীল শক্তি, তা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্যালেস্টাইনে সংঘটিত গুরুতর অশান্তির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। জেরুসালেমে ইহুদিদের 'ক্রন্দনের প্রাচীর' বলে পরিচিত স্থানটিকে মুসলিমরা মুহাম্মাদের স্বর্গযাত্রায় ব্যবহৃত নারীর মুখ ও ময়ূরের লেজবিশিষ্ট পাখনাযুক্ত ঘোড়া বুরাক[১৮]-এর থামার জায়গা বলে দাবি করায় এই অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল।

৬২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মূলত খাজরাজ উপজাতিভুক্ত বেশ কিছু ইয়াসরিবের অধিবাসী উকাজ মেলায় মুহাম্মাদের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং তিনি যা বলতে চান তা শোনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। দু'বছর পরে প্রায় ৭৫ জনের এক প্রতিনিধি দল তাকে ইয়াসরিব (আল-মদিনা)-এ বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তাদের আশা ছিল যে, এর মধ্য দিয়ে তারা পরস্পর বিরোধী আওস ও খাজরাজ উপজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পারবে। আল-মদিনার ইহুদিরা একজন মেসিয়া বা রক্ষাকর্তার আশায় দিন গুনছিল, তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসহীন স্বদেশবাসীর মধ্যে মুহাম্মাদের মতো আল্লাহ্‌র বার্তাবহ বলে দাবিকারী এক ধর্মপ্রচারকের ধর্মীয় বিশ্বাসে পূর্বেই অনুরক্ত হয়েছিল। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আল-তাইফে তাঁর সফর ব্যর্থ হবার পর, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর নিজের জন্মস্থানেই অসফল হয়েছে এই বিশ্বাসে মুহাম্মাদ তাঁর দু'শো অনুগামীকে কুরায়শদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে পালাতে দিলেন এবং তিনি নিজেও চুপিসারে আল-মদীনায় চলে গেলেন। আল-মদীনার সঙ্গে তাঁর মায়ের দিক থেকে ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল। তিনিও বেরিয়ে পড়লেন এবং ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছালেন। এই হল বিখ্যাত হেজিরা (হিজরত)—এটাকে ঠিক পলায়ন বলা চলে না, তবে দু'বছরের জন্য স্থানান্তরে গমনের উদ্দেশ্যে সতর্কতার সঙ্গে রচিত পরিকল্পনা বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ১৭ বছর পরে খলিফা উমার সেই চান্দ্র বছর (১৬ জুলাই তার শুরু) অর্থাৎ যে বছরে হিজরত ঘটেছিল, তাকেই মুসলিম যুগের[১৯] আনুষ্ঠানিক সূচনাবর্ষ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

হিজরতের সঙ্গে মক্কা অধ্যায়ের সমাপ্তি ও মদীনা অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল এবং তা মুহাম্মাদের জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ঘৃণিত ধর্মপ্রচারক হিসেবে তাঁর জন্মস্থান পরিত্যাগ করে তিনি এমন এক শহরে প্রবেশ করেছিলেন, যারা তাঁকে সম্মানিত অতিথি রূপে গ্রহণ করেছিল। তাঁর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যৎদ্রষ্টার সত্তা এখন পিছনে চলে গেল এবং সামনে এগিয়ে এল রাজনীতির জ্ঞানসম্পন্ন ও বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী এক মানবসত্তা। আল্লাহ্‌র বার্তাবহের ভূমিকাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল রাষ্ট্রনীতিকের কার্যকলাপ।

'পবিত্র যুদ্ধের সাময়িক বিরতির' সুযোগ গ্রহণ করে আশ্রয়প্রার্থীদের (মুহাজিরুন) অস্তিত্ব

রক্ষায় উদ্বিগ্ন মদীনার মুসলিমরা, তখন আনসার (সমর্থক) বলে পরিচিত, তাদের নতুন নায়কের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে গ্রীষ্মকালের এক মরুযাত্রীদলের গতিরোধ করেন। আর এইভাবেই তারা ওই বাণিজ্য-শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাত হানেন। মরুযাত্রীদলের নেতা আবু-সুফয়ান এই পরিকল্পনার গন্ধ পেয়েছিলেন এবং সাহায্যের জন্য মক্কার কাছে অতিরিক্ত সেনা চেয়েছিলেন। সেই অতিরিক্ত সেনাবাহিনী ও মদীনার মুসলিম ও আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে র'মাযান-এ আল-মদীনার ৮৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বদরে এই সংঘর্ষ ঘটেছিল। মুহাম্মাদের উদ্দীপ্ত নেতৃত্বে তিনশো মুসলিম এক হাজার মক্কাবাসীর সঙ্গে প্রবল বিক্রমে লড়াই করে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। সামরিক অভিযান[১৮] হিসেবে যত কম গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, এই গা'যওয়াত বদর-ই মুহাম্মাদের রাজকীয় শক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইসলাম তার প্রথম ও অমোঘ সামরিক বিজয় অর্জন করল। এই বিজয়কে নতুন ধর্মবিশ্বাসের[১৯] প্রতি আল্লাহ্‌র অনুমোদন বলে আখ্যা দেওয়া হল। ইসলামের এই প্রথম সশস্ত্র অভিযানের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলার শক্তি ও মৃত্যুর প্রতি যে ঘৃণার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তা ইসলামের সহজাত বৈশিষ্ট্য—পরবর্তীকালের আরও বড় বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। এটা সত্য যে, পরবর্তী বছরে (৬২৫ খ্রিঃ), মক্কার অধিবাসীরা আবু-সুফয়ানের নেতৃত্বে উহদ প্রান্তরে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলতে এবং এমনকী মুহাম্মাদকে আঘাত করারও চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে তাদের বিজয় স্থায়ী হয়নি। ইসলাম তার পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল এবং ক্রমশ রক্ষা থেকে আক্রমণের পথে অগ্রসর হয়েছিল। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ব্যতিরেকে ইসলাম শুধু ধর্মমাত্র ছিল। এখন থেকেই ইসলাম একটি রাষ্ট্রের ধর্মে পরিণত হয়েছিল; বদর-এর পরে আল-মদীনাতে এটা রাষ্ট্রীয় ধর্মের থেকেও বড় ভূমিকা পালন করেছিল; অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম নিজেই একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় এবং সেখান থেকেই ইসলাম পরিণত হয় উদ্দেশ্যসাধনে আক্রমণাত্মক মনোভাবসম্পন্ন একটি সংগঠিত রাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্ব তাকে সেভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মক্কার অধিবাসী, বেদুইন ও আববিসিনিয়ার ভাড়াটে সেনাদের মিত্রসংঘ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিল। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে শাসিত এই বর্বর আক্রমণকে আবার সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল। সালমান[২০] নামে এক পারসীয় অনুগামীর পরামর্শে আল-মদিনার চারদিকে মুহাম্মাদ একটি পরিখা[২১] খনন করালেন। যুদ্ধ চালনার ক্ষেত্রে এই নতুন আবিষ্কারটি বেদুইনদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী'র কাছে কোন দিক থেকেই যোদ্ধাসুলভ নয় বলে মনে হল এবং উভয় পক্ষের জনা কুড়ি মানুষ নিহত হবার পর[২২] শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে অবরোধকারীরা তাদের অবরোধ তুলে নিল। অবরোধ উঠে যাবার পর মিত্রসঙ্ঘে যোগ

দেবার জন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ সামরিক অভিযানে নামলেন। এর ফলে তাদের মধ্যকার অগ্রণী উপজাতি বানু-কুরাইজার ৬০০ শক্ত-সমর্থ মানুষ প্রাণ হারাল ও বাকিদের বহিষ্কার করা হল। এইভাবে যে খেজুর বাগানগুলি মালিকহীন্[২৩] হয়ে পড়ল, আশ্রয়প্রার্থীরা সেখানেই তাদের আবাস গড়ে তুলল। বানু-কুরাইজাহ্ ছিল ইসলামের শত্রুদের মধ্যে প্রথম উপজাতি যাদের স্বধর্ম ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল অথবা বিকল্প হিসেবে মৃত্যুকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। মুহাম্মাদ আগের বছরেই আল-মদীনার আর এক ইহুদি উপজাতি বানু-আল-নাজির[২৪]-কে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। আল-মদীনার উত্তরে অবস্থিত শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত মরূদ্যান খাইবার-এর ইহুদিরা ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং কর দিতে শুরু করেছিল।

মদীনাবাসীদের এই আধিপত্যের যুগে ইসলামের আরবীয়করণ ও জাতীয়করণ ঘটেছিল। এই নতুন ধর্মবেত্তা ইহুদিদের ধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের অবসান ঘটিয়ে ছিলেন। কর্মবিরতির জন্য নির্দিষ্ট দিনের (SABBATH) স্থান গ্রহণ করল শুক্রবার। ভেরী ও ঘন্টাধ্বনির বদলে আযান (মিনার থেকে আহ্বান) শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হল, র'মাযান-কে উপবাসের মাস হিসেবে নির্দিষ্ট করা হল, কিবলাহ্ (ধর্মীয় প্রার্থনার সময় কোন্ দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হবে)-র অভিমুখ জেরুসালেমের[২৫] পরিবর্তে মক্কার দিকে করা হল। আল-কা'বায় তীর্থযাত্রা স্বীকৃতি পেল এবং ইসলাম-পূর্ব যুগের অন্ধভক্তি থেকে উদ্ভূত কালো পাথরকে চুম্বন করার প্রথাটিও অনুমোদন পেল।

মুহাম্মাদ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর একদল অনুগামীকে নিয়ে মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত আল-হুদাইবিয়ায় এসে পৌঁছালেন এবং সেখানে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, যাতে মক্কার অধিবাসী ও মুসলমানদের সমান অধিকার[২৬] দেওয়া হল। এই চুক্তির ফলে তার অনুগামী ও কুরায়শদের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কুরায়শ উপজাতির অন্যান্য সদস্যরা যেমন খালিদ ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ এবং আমর ইব্‌ন আল-আস (আসি) প্রমুখ এই সময়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। খালিদ ও আমর ইসলামের সামরিক অভিযানে শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলেন। দু'বছর পরে, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ (অষ্টম হিজরী) মক্কা বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। তারপর হযরত মুহাম্মাদ প্রবেশ করলেন মক্কার পবিত্র কা'বাগৃহে। বলা হয় যে, কা'বাগৃহে তখন ৩৬০টি দেবমূর্তি ছিল। মুহাম্মাদ নিজের হাতে অনেকগুলি মূর্তিকে গুড়িয়ে দিলেন। আর তিনি পাঠ করছিলেন : 'সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে।'[২৭] যাই হোক, বিজিতদের সঙ্গে বিশেষ মহত্বপূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল।[২৮] বিজয়ী মুসলিম বাহিনী মক্কা প্রবেশের সময় যেরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাচীন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

সম্ভবত এই সময়[২৯] নাগাদ কা'বার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে হযরত মুহাম্মাদ 'হারাম' (নিষিদ্ধ, পবিত্র) ঘোষণা করেছিলেন। এ-ব্যাপারে কোরানের ৯ : ২৮ অংশে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরবর্তী কালে ব্যাখ্যা করা হয় যে, সেখানে অমুসলিমদের পক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোরানের এই পঙ্ক্তিতে শুধুমাত্র বহুত্ববাদীদের বার্ষিক তীর্থযাত্রার সময় কা'বা প্রদক্ষিণ করতে নিষেধ করা হয়। এই হুকুম এখনও বলবৎ আছে।[৩০] প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অনধিক ১৫ জন ইউরোপীয় খ্রিস্টান দুটি পবিত্র নগরী দেখতে সক্ষম হয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন বোলোন্যা-র[৩১] লুডোভিকো ডি ভারথেমা (১৫০৩ খ্রিঃ)। পরবর্তীকালে সেখানে এলডন রুটার[৩২] নামে এক ইংরেজ এবং জুলিয়াস জার্মানাস[৩৩] পৌঁছাতে সফল হয়েছিলেন। তবে সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকারী ছিলেন স্যার রিচার্ড বারটন (১৮৫৩)[৩৪]।

নবম হিজরীতে হযরত মুহাম্মাদ গাস্সান সীমান্তবর্তী অঞ্চল তাবুকে একদল সেনা মোতায়েন করেন। আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতিরেকেই আইলাহ্ (আল-আকাবাহ্)-র খ্রিস্টান প্রধান, মাকনার মরূদ্যানবাসী ইহুদি জাতি, এবং দক্ষিণে[৩৫] আযরুহ ও আল-জারবা-র সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। আর স্থানীয় ইহুদি-খ্রিস্টানরা কর প্রদানের (পরবর্তীতে জিয্য়া নামে অভিহিত) মাধ্যমে এই নতুন ইসলাম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করে। এরূপ কার্যাবলির ফলাফলের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল অতীতের সুদূরপ্রসারী উদাহরণ।

হিজরী সনের এই নবম বর্ষকেই (৬৩০-৩১ খ্রিঃ) বলা হয় 'দূতদের বছর' (সানাত আল-উফুদ)। এই সময়কালে হযরত মুহাম্মাদের কাছে চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে কাছাকাছি ও দূরবর্তী এলাকার দূতগণ এসেছিলেন। সুবিধার কথা চিন্তা না করে উপজাতিগুলি মৈত্রীচুক্তিতে শামিল হতে শুরু করেছিল, যদিও তারা দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল না। পক্ষান্তরে, ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের পূর্ণ মৌখিক স্বীকৃতি এবং যাকাহ (দরিদ্র কর) আদায় করে নিজেকে পরিতৃপ্ত করেছিল। এক বিশাল সংখ্যক বেদুইন জনগোষ্ঠী এই নতুন মতবাদকে আবাহন করেছিল। আর এটা উমারের একটি উক্তিতে অনুমান করা হয়েছে, 'বেদুইনরা হল ইসলামের উপাদান।' যে সমস্ত গোষ্ঠী এবং জেলাগুলি ইতিপূর্বে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে বিরত ছিল, তারাও এখন নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সুদূর উমান, হাযরামাওত ও আলইয়ামান থেকে তারা আসতে লাগল। তায়ি এবং হামদান ও কিনদা তাদের ডেপুটিদের পাঠাল। যে-আরব এর আগে কখনও একজন মানুষের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেনি, সে এবার মুহাম্মাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবার এবং তার পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হবার প্রবণতা প্রকাশ করল। মহান ধর্মবিশ্বাস ও উন্নত নৈতিকতা সেখানকার বর্বরতার স্থান দখল করল।

দশম মুসলিম বর্ষে মুহাম্মাদের নেতৃত্বে বার্ষিক তীর্থযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে তার নতুন ধর্মীয় রাজধানী মক্কাতে প্রবেশ করল। এটাই ছিল তাঁর শেষ সফর এবং তাই একে 'বিদায়ী তীর্থযাত্রা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। মদীনায় তাঁর ফিরে আসার তিন মাস বাদে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন প্রবল মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ হারান।

মুহাম্মাদের জীবনে মদীনার এই অধ্যায়টিতে কোরানে দীর্ঘ ও অধিক বাগবহুল সূরাহ্‌ অবতীর্ণ হয়েছিল। রোযা ভিক্ষাদান ও প্রার্থনার ধর্মীয় রীতিনীতি ছাড়াও বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দি ও শত্রুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্দেশ এই পর্বের সূরাহ্‌তে পাওয়া যায়। যিনি নিজে একসময় অনাথ ছিলেন, তিনি ক্রীতদাস, অনাথ, দুর্বল ও অত্যাচারিত মানুষজনের সম্পর্কে যে-আইন তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে পরোপকারের[৩৬] ইচ্ছাই প্রকাশ পায়।

তাঁর জীবনের অখ্যাত অধ্যায়ের মতো গৌরবময় অধ্যায়েও তিনি একটি মাটির বাড়িতে অতি সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। বর্তমান আরব ও সিরিয়ার পুরানো ধাঁচের বাড়ির মতো তাঁর বাড়িতেও ছিল কয়েকটি ঘর এবং তার সামনেই ছিল উঠোন, আর এই উঠোন দিয়ে প্রতিটি ঘরেই প্রবেশ করা যেত। প্রায়ই তাঁকে নিজের কাপড় সেলাই করতে দেখা যেত এবং সর্বদাই সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। যা কিছু তাঁর সঞ্চয় ছিল, তাকে তিনি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে গণ্য করতেন। করুণাজনিত ও রাজনৈতিক কারণে সব মিলিয়ে তাঁর ১২ জন স্ত্রী ছিল। কিন্তু তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিল আয়িশা—আবু-বকরের অল্পবয়স্ক কন্যা। মুহাম্মাদের স্ত্রী খাদিজার গর্ভে বেশ কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল। কিন্তু ফাতিমা ছাড়া আর কেউই বাঁচেনি। এই ফাতিমা ছিল আলীর বিখ্যাত স্ত্রী। তার মিশরদেশীয় খ্রিস্টান স্ত্রী মেরীর গর্ভজাত শিশুপুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে মুহাম্মাদ তীব্র শোকাহত হয়েছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অথবা মামুলি ধরনের আচরণগুলিও এক একটি অনুশাসনের সৃষ্টি করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেগুলি আজও সচেতনতার সঙ্গে অনুকরণ করে আসছে। মানবজাতির আর কোন অংশই তার মতো আর কাউকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গ্রহণ করে তার আচার-আচরণগুলিকে এত সূক্ষ্মভাবে[৩৭] অনুকরণ করেনি।"

আল-মদীনার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই পরে বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ধর্মের ভিত্তিতে আশ্রয়প্রার্থী ও সমর্থকদের এই নতুন সম্প্রদায়টি উম্মাত (সমাবেশ) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরবের ইতিহাসে এই হিসেবে রক্তের সম্পর্কের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যক্তিকরণ ঘটে আল্লাহ্‌র মধ্য দিয়ে। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মুহাম্মাদই ছিলেন

পৃথিবীর বুকে তার আইনসংগত প্রতিনিধি ও সর্বোচ্চ শাসক। সুতরাং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছাড়াও এক রাষ্ট্রপ্রধানের মতো মুহাম্মাদ রাজকীয় কর্তৃত্বও ভোগ করতেন। উপজাতীয় সম্পর্ক ও পুরানো আনুগত্য নির্বিশেষে এই সম্প্রদায়ের সকলেই অন্তত নীতিগত ভাবে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। "বিদায়ী তীর্থযাত্রায়" মুহাম্মাদ যে মহান উপদেশাবলি বিতরণ করেছিলেন তার মধ্যেই এই কথাগুলি ব্যক্ত হয়েছিল : সমবেত মানুষজন! তোমরা আমার কথাগুলি শোন ও অন্তর দিয়ে সেগুলি গ্রহণ করো! মনে রেখ, প্রত্যেক মুসলিমই অপর মুসলিমের ভাই এবং তোমরা সকলেই এই ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং তার ভাই[৩৮] যতক্ষণ না কোন সম্পত্তি স্বেচ্ছায় তাকে দিচ্ছে, ততক্ষণ তা ভোগদখল করা তোমাদের কারোর পক্ষেই আইনসংগত নয়।

এইভাবে এক খোঁচায় আরবীয় সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি অর্থাৎ উপজাতীয় আত্মীয়তা ধর্মবিশ্বাসের নতুন বন্ধন দ্বারা পরিবর্তিত হল। অর্থাৎ আরবের সমস্ত ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য একধরনের যুদ্ধবিরতির আদেশ বলবৎ হল। এই নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের কোন যাজকবর্গ, যাজকতন্ত্র, প্রধান বিশপের এলাকা কিছুই রইল না। এর মসজিদই ছিল জনতার সমাবেশস্থল, সামরিক ব্যায়ামের ক্ষেত্র ও সকল মানুষের আরাধনার স্থান। প্রার্থনার পরিচালক অর্থাৎ ইমাম ছিলেন ধর্মবিশ্বাসীদের সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং এই ধর্মবিশ্বাসীদেব প্রত্যেকেই গোটা বিশ্বের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একে অপরকে রক্ষা করার নির্দেশ পেয়েছিল। যে সমস্ত আরবীয়রা বর্বর ছিল, তারা সকলেই ছিল সমাজের সীমানার বাইরে। তারা প্রায় দস্যু বলেই গণ্য হত। ইসলাম অতীতের জীবন-আচরণকে বাতিল করে দিল। মহিলা ছাড়া আর যে দুটি জিনিস আরবীয়দের কাছে খুব প্রিয় ছিল— সেই মদ (খামর, আরামিয় থেকে গৃহীত) ও জুয়াকে একটি সূরায়[৩৯] নিষিদ্ধ করা হল। আরবীয়দের কাছে সমান আকর্ষণীয় সঙ্গীতের প্রতিও বিরাগ দেখানো হল। যে সমস্ত দেশত্যাগী মুসলিম আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মুখপাত্র জাফর ইব ন-আবি-তালিবের বক্তব্য বলে যে সন্দেহজনক কথাগুলি প্রচার করা হয় তার মধ্য দিয়ে পুরানো ও নতুন সমাজব্যবস্থার পার্থক্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নেগাসের উদ্দেশ্যে জাফর বলেছিলেন :

আমরা ছিলাম জাহিলীয়া যুগের মানুষ, মূর্তিপূজা করতাম ও মৃত প্রাণীর মাংস (মাইতাহ্)[৪০] খেয়ে জীবন ধারণ করতাম। অনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিলাম, পরিবারকে ত্যাগ করে আমরা তাদের রক্ষা করার মৌখিক চুক্তি লঙ্ঘন করতাম। আমাদের মধ্যে যে সবল সে দুর্বলকে গ্রাস করত। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্য থেকেই একজনকে তার দূত করে আমাদের কাছে পাঠালেন ততক্ষণ আমাদের অবস্থা ছিল এরকম। সেই দূতের

পূর্বপুরুষদের আমরা জানি এবং তার সত্যপরায়ণতা সততা ও পবিত্রতা আমরা স্বীকার করি। তিনিই আল্লাহ্‌কে মান্য করা এবং কেবলমাত্র তারই আরাধনা করার জন্য আমাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যে সমস্ত পাথর ও মূর্তির পূজা আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা করতাম তিনিই সেগুলি বাতিল করতে বলেছেন। তিনি আমাদের সত্যবাদী হতে, অন্যের যা পাওনা তা দিতে, পরিবারের ভরণপোষণ করতে, অন্যায় কাজ না-করতে ও রক্তপাত ঘটানো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের অবিবাহিত অবস্থায় যৌন সহবাস করতে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, অনাথ শিশুকে তার আইনসংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে ও সতী নারী সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনা করতেই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আর কাউকে যুক্ত না করতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের নামায পড়তে জাকাহ্ (ভিক্ষা) দিতে ও রোযা রাখতে[৪১] আদেশ দিয়েছেন।

আল-মদীনা থেকে ইসলামি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে তা পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিরাট অংশকে গ্রাস করে। আল-মদীনার ইসলামি ধর্ম সম্প্রদায় ছিল পরবর্তী কালের গোটা ইসলামি সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।

তার সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে মুহাম্মাদ সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যা আগে কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক সীমানাকেই বোঝাত কিন্তু তার জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। বিরাট একটি অঞ্চল জুড়ে খ্রিস্টানধর্ম ও ইহুদি ধর্মের অবসান ঘটিয়ে তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মানবজাতির একটি বেশ ভাল অংশ এখনও সেই ধর্ম অনুসরণ করে। মুহাম্মাদ এমন একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখনকার সভ্য দুনিয়ার সুন্দরতম প্রদেশগুলি শীঘ্রই সেই সাম্রাজ্যের সুদূর-প্রসারিত সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়। স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত[৪২] না হয়েও মুহাম্মাদ এমন একটি বইয়ের বিশ্বাসযোগ্য উপলক্ষ্য হয়েছেন, গোটা মানবজাতির এক-অষ্টমাংশ যে-বইটিকে সমস্ত বিজ্ঞান, জ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ বলে আজও গণ্য করে। ❑

● টীকা ●

১ ইবন-হিশাম, সীরাহ্, ১২৫ পাতা, ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৮ পাতা; মাসউদী, ৪র্থ খণ্ড, ১২৭ পাতা।

২ কর্পাস ইনস্ক্রিপশনাম সেমিটিকেরাম নামে দক্ষিণ আরবের একটি অন্তর্লেখে নামটির উল্লেখ আছে, ৪র্থ প্যারাগ্রাফ, টি ২, ১০৪ পাতা।

৩ ক্রোনোগ্রাফিয়া, সম্পাদনা : ক্যারোলাস ডি বুর (লিপজিগ, ১৮৮৫), ৩৩৩ পাতা।

৪ এ. মিঙ্গানা. সোর্সেস সিরিয়াকিউস, ১ম খণ্ড, বার-পেনকেয়ি (লিপজিগ, ১৯০৮), ১৪৬ পাতা (মূল পাঠ্য)=১৭৫ পাতা (অনূদিত অংশ)।

৫ সূরাহ্ ৯৩ : ৬-৯।

৬ ইবরাহীম রিফআত, মিরআত আল-হারামাইন (কায়রো. ১৯২৫). ১ম খণ্ড. ৫৬-৬০ পাতা।

৭ আল-বুখারী, সাহীহ্, (বূলাক, ১২৯৬), ১ম খণ্ড, ৩ পাতা।

৮ কোরান ৯৬:১-৫।

৯ কোরান ৯৭:১।

১০ কোরান ৭৪:১ ও পরবর্তী।

১১ বুখারী, ১ম খণ্ড, ২ পাতা, ১.২। ৬:১ ও পরবর্তী অংশে ইসাইয়া-র আহ্বান তুলনা করুন। টোর আন্দ্রেই, মোহাম্মেদ : সেন লেবেন আন্ড সেন গ্লোব (গোটিনজেন, ১৯৩২), ৩৯ ও পরের পাতা দেখুন।

১২ তুলনীয়, ইব ন-হিশাম, ১২১ ও ১৪৩ পাতা।

১৩ ইব ন-হিশাম, ২১৭-২০ পাতা; তুলনীয় ইব ন-সা'দ, ১ম খণ্ড, পয়েন্ট ১, ১৩৬-৩৯ পাতা।

১৪ কোরান ১৭:১; বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৬ ও ২৩০ পাতা। আল-বাগাবি, মাসাবীহ্ আল-সুন্নাহ (কাযরো, ১৩১৮) ২য় খণ্ড ১৬৯-৭২ পাতা; আল-খাতীব, মিশকাত আল-মাসাবীহ্ (সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১৮৯৮-৯৯), ২য় খণ্ড, ১২৪-২৯ পাতা।

১৫ মিগুয়েল এসিন, ইসলাম অ্যাণ্ড দি ডিভাইন কমেডি; অনুবাদ : এইচ স্যান্ডারল্যান্ড (লন্ডন, ১৯২৬)।

১৬ সম্ভবত আরবী শব্দ বার্ক থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এর অর্থ বজ্রপাত। আধুনিক প্যালেস্টিনীয়রা ওই স্থানটিকে বলে 'আল-বুরাক'।

১৭ তাবারী, ১ম খণ্ড ১২৫৬ ও ২৪৮০ পাতা; মাসউদী, ৯ম খণ্ড, ৫৩ পাতা।

১৮ আল-ওয়াকিদি (মৃ. ২০৭/৮২২-২৩) তার রচিত মাগাজি বইটির এক-তৃতীয়াংশে বদর ও তার বীবদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, ১১-৭৫ পাতা।

১৯ কোরান ৩:১১৯, ৮:৪২-৪৩।

২০ দার ইসলাম, ১২শ খণ্ড (১৯২২), ১৭৮-৮৩ পাতায় জোসেফ হোরোভিজ তুলনীয়।

২১ পারসী 'কানদান' শব্দ থেকে আরামিক ভাষার মাধ্যমে আরবী শব্দ 'খানদাক' (অর্থ, খনন করা)।

২২ কোরান ৩৩:৯-২৫ এই যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

২৩ কোরান ৩৩:২৬ ২৭।

২৪ বালাযুরি, ফুতুহ্, ১৭-১৮ পাতা=হিট্টি, ৩৪-৩৫ পাতা; ওয়াকিদি, ৩৫৩-৫৬ পাতা।

২৫ তুলনীয়, ১ম কিংস ৮:২৯-৩০; ড্যানিয়েল ৬:১০।

২৬ বালাযুরি, ৩৫-৩৬ পাতা-হিট্টি, ৬০-৬১ পাতা।

২৭ ওই বই, ৪০ পাতা=হিট্টি, ৬৬ পাতা; তুলনীয়, কোরান ১৭:৮৩।

২৮ ওয়াকিদি, ৪১৬ পাতা।

২৯ ইব ন-সা'দ, ২য় খণ্ড, প্রথম ভাগ১, ৯৯ পাতা; তুলনীয়, বাইযাবি, আনওয়ার, ১ম খণ্ড, ৩৮৩ পাতা, ১.১০।

৩০ মুহাম্মাদ লাবীব আল-বাতানূনি, আল-রিহলাহ আল হিজাজিয়াহ (কায়রো, ১৩২৯), ৪৭ পাতা।

৩১ মক্কার ওপরে কোন এক স্থানে মহাশূন্যে মুহাম্মাদের দেহ শায়িত আছে বলে যে ইউরোপীয় লোককাহিনী বহুল প্রচলিত, তিনি তাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছিলেন। ঈজিপ্ট, সিরিয়া, অ্যারাবিয়া ডেজার্টা অ্যান্ড অ্যারাবিয়া ফেলিক্স-এ দি ট্রাভেলস অফ লুডোভিকো ডাই ভারথেমা দ্রষ্টব্য, অনুবাদ : জে ডবলিউ জোন্স (হাকলুত সোসাইটি, ৩২শ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬৩), ২৫ ও পরের পাতা।

৩২ দি হোলি সিটিজ অফ অ্যারাবিয়া, ২ খণ্ড, (লণ্ডন, ১৯২৮)।

৩৩ আল্লাহ আকবর (বার্লিন, ১৯৩৮)।

৩৪ পারসোনাল ন্যারেটিভ অফ এ পিলগ্রিমেজ টু এল-মদিনা অ্যান্ড মক্কা, ৩ খণ্ড (লন্ডন, ১৮৫৫-৫৬)।

৩৫ বালাযুরি, ৫৯ ও পরের পাতা = হিট্টি, ৯২ ও পরেব পাতা।

৩৬ কোরান ২:১৭২, ২১৮-১৯; ৪:৪০; ৯:৬০; ২৪:৩৩; ৯৩:৯। রবার্ট রবার্টস, দি সোসাল ল'জ অফ দি কোরান (লন্ডন, ১৯২৫)।

৩৭ ডি জি হোগার্থ, অ্যারাবিয়া, (অক্সফোর্ড, ১৯২২) ৫২ পাতা।

৩৮ ইব ন-হিশাম, ৯৬৯ পাতা; তুলনীয়, ওয়াকিদি, ৪৩৩-৩৪ পাতা।

৩৯ কোরান ৫:৯২। নাবাতিয়দের একজন মদ্যপান বিরোধী ঈশ্বর ছিল।

৪০ তুলনীয়, কোরান ২:১৬৮।

৪১ আবিসিনিয়ায় দেশত্যাগের দীর্ঘদিন পরে মদিনীয় অধ্যায়ে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কোরান ২:১৭৯, ১৮৩; ইব ন-হিশাম, ২১৯ পাতা।

৪২ কোরানে বর্ণিত 'উম্মী' শব্দটি (৩:১৯), যাকে সুন্নি (নিষ্ঠাবান) মুসলিমরা 'নিরক্ষর' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাবারী তার ব্যাখ্যা করেছেন, তফসির, ৩য় খণ্ড, ১৪৩ পাতা, আরবীয় বহু-ঈশ্বরবাদীদের একজন বলে তার কোন প্রত্যাদেশ ছিল না। বিশ্লেষণাত্মক গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, কোরানে (৭:১৫৬; ৩:৬৮-৬৯, ৬২:২) শব্দটি যেন আহ্‌ল আল-কিতাব (ঐশী গ্রন্থধারী মানুষজন)-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এমন একজনকে বুঝিয়েছে, যে অতীতের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মশাস্ত্র পড়তে অক্ষম। মুহাম্মাদ যে আরবীভাষায় লিখতে পারতেন তা বোঝাতে সূরাহ ২৫:৬ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

।। অধ্যায় ৯ ।।

ঐশীগ্রন্থ কোরান

রক্ষণশীল মত অনুযায়ী জানা যায়, মুহাম্মাদের মৃত্যুর পরের বছর উমারের সুপারিশে আবু-বকর কোরানের বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে সংগ্রহ করার আদেশ দিয়েছিলেন। উমার লক্ষ করেছিলেন, যে সমস্ত মানুষ কোরানকে তাদের স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন (হুফ্‌ফাজ), তারা ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছেন। তাই তিনি আবু-বকরকে ওই রূপ সুপারিশ করেছিলেন। মুহাম্মাদের পূর্বতন সচিব ও আল-মদীনার অধিবাসী জাইদ ইবন-সাবিতকে ওই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। "খেজুর-পাতার শিরা, শাদা পাথরের টুক্‌রো ও মানুষের হৃদয়"[১] থেকে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করা হল এবং সেগুলির সাহায্যে একটি গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত হল। কুফিক হস্তাক্ষরের ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতির জন্যই এমনটা ঘটেছিল। ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণগুলির সংশোধনের জন্য উসমান ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করলেন এবং জাইদ-কেই তার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করলেন। মুহাম্মাদের অন্যতমা বিধবা স্ত্রী এবং উমারের মেয়ে হাফসা-র হেফাজতে থাকা আবু-বকরের বইটিই সংশোধনের কাজে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হল। সংশোধিত বইটির হাতে-লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটি আল-মদিনায়[২] রাখা হল। সংশোধিত বইটির তিনটি প্রতিলিপি তৈরি করে দামাস্কাস, আল-বসরাহ্‌ ও আল-কূফার সামরিক ঘাঁটিতে রাখা হল এবং বাকী সমস্ত প্রতিলিপি ধ্বংস করে দেওয়া হল।

আবু-বকর প্রথাগতভাবে কোন সংশোধন আদৌ করেছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে আধুনিক গবেষকদের সন্দেহ আছে। তাঁরা আরও মনে করতেন যে, উসমান বিভিন্ন পাঠযুক্ত অনেকগুলি হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি আরব, সিরিয়া ও আল-ইরাক শহর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মদিনায় প্রাপ্ত হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপিকে উসমান অধিক মাহাত্ম্য দান করেছিলেন এবং অন্য সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন। ৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুপণ্ডিত ইব ন-মুজাহিদের সাহায্যে ইব ন-মুকলাহ ও ইব ন-মূসা নামে দুই উজির শেষ পর্যন্ত মূল পাঠটি স্থির করেন। ইব ন-মুজাহিদ সাতটি বিভিন্ন পাঠের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। স্বরবর্ণের অভাব এবং মুদ্রণ চিহ্নগুলিকে আনুশাসনিক[৩] অর্থে ব্যবহার করার ফলে এতগুলি বিভিন্ন পাঠের সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলিমরা মনে করে, কোরান হল আল্লাহ্‌র বাণী এবং সপ্তম স্বর্গে (সূরা: ৪৩:৩, ৫৬:৭৬-৯, ৮৫:২১-২)[৪] সংরক্ষিত একটি আদি গ্রন্থ থেকে জিবরাঈলের মাধ্যমে মুহাম্মাদের উদ্দেশে পাঠ করা হয়েছে। তাই সেই বাণীর অন্তর্নিহিত ভাবই শুধু নয়, এমনকী প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরই অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে।

কোরানের সূরাহ্গুলি (অধ্যায়) দৈর্ঘ্যের নিরিখে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী বিন্যস্ত নয়। মক্কার দ্বন্দ্বপূর্ণ সময়ের প্রায় ৯০ টি সূরাহ্র অধিকাংশই ছোট, মর্মভেদী, অগ্নিবর্ষী, আবেগময় ও দিব্য প্রেরণায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ্র একত্ববাদ, তার ক্ষমতা, মানুষের নৈতিক কর্তব্য এবং আসন্ন শাস্তির সম্ভাবনা সেগুলির মূল বিষয়বস্তু। মদিনীয় সূরাহ্গুলি, বাকী ২৪টি (কোরানের সমগ্র বিষয়বস্তুর এক-তৃতীয়াংশ) বিজয়ের অধ্যায়ে আল্লাহ্র বাণীরূপে 'নেমে এসেছিল' (উনজিলাত)। এই সূরাহগুলি ছিল দীর্ঘ, বাগ্বহুল ও আইনি উপাদানে সমৃদ্ধ। যেগুলির মধ্যে প্রার্থনা, উপবাস, তীর্থযাত্রা ও পবিত্র মাসগুলি সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদ ও আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ আছে। মদ, শুয়োরের মাংস ও জুয়া নিষিদ্ধকারী আইন, ভিক্ষাদান (জাকাহ) ও পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) সংক্রান্ত আর্থিক ও সামরিক নির্দেশ, নরহত্যা, প্রতিহিংসা, চুরি, তেজারতি, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ব্যভিচার, উত্তরাধিকার ও ক্রীতদাসদের মুক্তিদান সংক্রান্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনসমূহ নিয়েই ওই সমস্ত নিয়মাবলি তৈরি হয়েছে। ২, ৪ ও ৫ সূরাহ্-তে এই সমস্ত আইনগত নির্দেশাবলির অধিকাংশ লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহ সংক্রান্ত যে নির্দেশটি (সূরাহ্ ৪:৩)[৭] প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়, তা বহুবিবাহ চালু করার পরিবর্তে তাকে সীমিত করেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারাগুলিকে (৪:২৪, ৩৩:৪৮, ২:২২৯) সবচেয়ে আপত্তিজনক এবং ক্রীতদাস, অনাথ ও আগন্তুক ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, সে সংক্রান্ত নির্দেশাবলিকে (৪:২, ৩, ৪০; ১৬:৭৩; ২৪:৩৩) সমালোচকেরা ইসলামি আইনের সবচেয়ে মানবিক উপাদান বলে গণ্য করেছেন। ক্রীতদাসদের মুক্তিদান আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশি সন্তোষজনক বলে প্রচার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তা অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে গণ্য করা হবে। সূরাহ্ ২৪-[৫] এর মতো অন্যান্য মদিনীয় সূরাহ্-র এখানে-সেখানে অতীতের বাগ্মিতার ও দিব্যচেতনার স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। সূরাহ্ ২:১৭২, ২৫৬ কোরানের মহত্তর আয়াতগুলির অন্যতম।

আদ ও সামূদ, লুকমান, "হাতির মালিকগণ" সংক্রান্ত কয়েকটি বিশুদ্ধ আরবীয় কাহিনী এবং আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট (ইস্কান্দার যূ-আল-কারনাইন)[৬] ও "সাতজন নিদ্রিত" সম্পর্কে পরোক্ষভাবে দুটি কাহিনী সংক্ষেপে কোরানে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া কোরানের প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলিই বাইবেলে উল্লিখিত একই ধরনের ঘটনাবলির মতো বারবারই উল্লিখিত হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের চরিত্রগুলির মধ্যে আদম, নোয়া, আব্রাহাম[৮] (২৫টি বিভিন্ন সূরাহ্তে প্রায় ৭০ বার উল্লিখিত হয়েছে এবং সূরাহ্ ১৪-তে তার নামটিই শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে), ইসমায়েল, লট, যোসেফ (সূরাহ্ ১২ যাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে), মোজেস (৩৪টি বিভিন্ন সূরাহ্ যাঁর নাম বহন করছে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সল, ডেভিড, সলোমন, এলিজা, জব এবং জোনাহ্ (দশ সংখ্যক সূরাহ্ যাদের নাম বহন করছে) তাঁরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উল্লিখিত। আদমের সৃষ্টি ও পতন সংক্রান্ত কাহিনীটি পাঁচবার, মহাপ্লাবনের কথা আটবার ও সমকামের কথা আটবার বলা হয়েছে। বস্তুত বাইবেলের অন্য যে কোন অংশের চেয়ে 'পুরাতন নিয়ম' নামক গ্রন্থটির প্রথম পাঁচটি পুস্তকের সঙ্গেই কোরানের বেশি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে নীতিশিক্ষার উপাদান রূপেই ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র গল্প বলার জন্যই নয়, একটি নীতিশিক্ষা প্রচারের জন্য, বিশেষত আল্লাহ্ অতীতে সমস্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষদের পুরস্কৃত করেছেন এবং শয়তানদের শাস্তি দিয়েছেন—এই শিক্ষাদানের জন্যই ওই ঘটনাগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। খুব আকর্ষক ও বাস্তবসম্মত ভাবেই যোসেফের গল্পটি বলা হয়েছে। এই গল্পটি ও এরূপ অন্যান্য ঘটনা যেমন প্রকৃত আল্লাহ্‌র (সূরাহ্ ২১:৫২ ও পরবর্তী) আহ্বানে আব্রাহামের সাড়া দেবার কাহিনীতে যে পরিবর্তন ঘটান হয়েছে, মিদরাশ, তালমুদ এবং আনুশাসনিক নয় এমন অন্যান্য ইহুদি রচনাবলিতেও[৯] তার অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

নিউ টেস্টামেন্টের চরিত্রগুলির মধ্যে জ্যাকারিয়া, জন দি ব্যাপটিস্ট, যীশু (ঈসা) ও মেরীর চরিত্রের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শেষের নাম দুটি সাধারণত পরস্পর সংযুক্ত। যীশুর মা মেরী হলেন ইমরান দুহিতা ও অ্যারনের[১০] এক বোন। অ্যাসিউরাসের[১১] প্রিয়পাত্র হামান (হামান) নিজে ছিলেন ফারাও-[১২]এর মন্ত্রী। মনে রাখা দরকার যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের চরিত্রগুলির আরবীয় নামগুলি সরাসরি হিব্রুভাষার পরিবর্তে প্রধানত সিরীয় (অর্থাৎ নূহ্, নোয়া) ও গ্রিক (অর্থাৎ ইলিয়াস, এলিয়াস; ইউনুস, জোনাহ্) ভাষার মাধ্যমেই এসেছে।

উপরে উল্লিখিত কোরান ও বাইবেলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং অন্যান্য একই রকম অনুচ্ছেদের তুলনা করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন নির্ভরতা নেই : সূরাহ্ ২:৪৪-৫৮ ও অ্যাক্টস ৭:৩৬-৫৩; সূরাহ্ ২:২৭৩ ও ম্যাথিউ ৬:৩,৪; সূরাহ ১০:৭২ ও ২য় পিটার ২:৫; সূরাহ্ : ১০:৭৩, ২৪:৫০ ও ডিউটারোনমি ২৬:১৪,১৭; সূরাহ্ ১৭:২৩-৪০ ও এক্সোডাস ২০:২-১৭ ডিটারোনমি ৫:৬-২১; সূরাহ্ ২১:২০ ও রেভিলেশন ৪:৮; সূরাহ্ ২৩:৩ ও ম্যাথিউ ৬:৭; সূরাহ্ ৩৬:৫৩ এবং প্রথম থেসালোনিয়ান ৪:১৬; সূরাহ্ ৩৯:৩০ এবং ম্যাথিউ ৬:২৪; সূরাহ্ ৪২:১৯; গ্যালাটিয়ান ৬:৭-৯; সূরাহ্ ৪৮:২৯ এবং মার্ক ৪:২৮ এবং সূরাহ্ ৯২:১৮ এবং লূক ১১:৪১। একমাত্র উদ্ধৃতি হল সূরাহ্ ২১:১০৫ (তুলনীয় সাম্ ৩৭:৯) যেখানে কোরান তার উৎস রূপে সাম্-এর কথা উল্লেখ করেছে। অন্য যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলি হল সূরাহ্ ২১:১০৪ এবং ইসাইয়া ৩৪:৪; সূরাহ্ ৫৩:৩৯-৪২ এবং ইজিকিয়েল১৮:২০; সূরাহ্ ৫৩.৪৫ এবং প্রথম স্যামুয়েল ২:৭। যে সমস্ত স্তোত্রে একটি 'চোখের বদলে একটি চোখ' (সূরাহ্ ৫:৪৯ এবং এক্সোডাস ২১:২৩-২৭), 'উট ও সূঁচ' (সূরাহ্ ৭:৩৮ এবং ম্যাথিউ ১৯:২৪), 'বালির ওপরে নির্মিত বাড়ি' (সূরাহ্ ৯:১১০ এবং ম্যাথিউ ৭:২৪-২৭) এবং 'প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যুর স্বাদ' (সূরাহ্ ২১:৩৬, ২৯:৫৭, ৩:১৮২ এবং হিব্রু ৯:২৭,২:৯, ম্যাথিউ ১৬:২৮) হিব্রু ও আরবী উভয় ভাষারই সর্বজনীন এবং পুরানো সেমিটিক প্রবাদ ও প্রবচনগুলিকেই তুলে ধরেছে। ম্যাথিউ ও মক্কার সূরাহ্‌গুলির মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিশু যীশুর ওপর আরোপিত কিছু বিস্ময়কর কার্যাবলি, যথা শৈশবাবস্থায় দোলনায় যীশুর কথা বলা (সূরাহ্ ৩:৪১) এবং মাটি দিয়ে পাখি তৈরির ঘটনা (সূরাহ্ ৩:৪৩) ইনজীল আল-তুফুলিয়া সহ গসপেলের বক্তব্য বলে প্রচারিত

সন্দেহজনক অংশটিতে একই ধরনের কার্যাবলির উল্লেখ আছে। এর স্বর্গ ও নরকের প্রাঞ্জল বর্ণবহুল ছবির সঙ্গে পারসিয়ার যে কোনোও পবিত্র বইয়ের তুলনা চলে। পার্সিদের পরবর্তীকালে লেখাপত্রেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যুবক ও যুবতীদের প্রতিমূর্তি রূপে সৃষ্ট দেবদূতদের মূর্তি-সহ স্বর্গীয় উদ্যানের যে ছোট ছোট রঙিন ছবি খ্রিস্টানদের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে, তার দ্বারাই উপরোক্ত ছবিগুলি অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।

যুগান্তকারী বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কোরানই পড়ে। কারণ আল্লাহ্‌র আরাধনায় ব্যবহার হবার পাশাপাশি প্রতিটি মুসলিম এই মূল পাঠ্যবই থেকেই আরবী ভাষা পড়তে শেখে। তুর্কি ভাষায় স্বীকৃত অনুবাদ ছাড়া অন্য কোন বিদেশি ভাষায় কোন মুসলিম-কৃত কোরানের কোন স্বীকৃত অনুবাদ নেই। অবশ্য অনেক মুসলিমই স্বেচ্ছায় পারসীয়, বাংলা, উর্দু, মারাঠি, জাভানীজ ও চীনা ভাষায় কোরানের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সেই অনুবাদগুলি স্বীকৃত নয়। সব মিলিয়ে ৪০টি ভাষায়[১৩] কোরানের অনুবাদ করা হয়েছে। শব্দগুলি (৭৭,৯৩৪), পঙ্‌ক্তিগুলি (৬২৩৬) এবং এমনকী অক্ষরগুলিও (৩২৩,৬২১)[১৪] খুব পরিশ্রম করেই গোনা হয়েছে। বইটির প্রতি মানুষের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা চরমে পৌঁছায় যখন মুসলিমদের মধ্যে এই মতবাদ গড়ে ওঠে যে, এটি হল আল্লাহ্‌র "অনাদি বাণী", "লোগোস" তত্ত্বের প্রতিধ্বনি।[১৫] "সুতরাং পবিত্র মানুষ ছাড়া আর কেউই বইটি স্পর্শ করবে না।[১৬] যদি 'আল্লাহ্‌' শব্দ লেখা কোন কাগজের টুকরো রাস্তার ওপর পড়ে থাকে, তা হলে একজন মুসলিম সযত্নে সেই টুকরোটা তুলে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেটি কোন দেয়ালের গর্তের মধ্যে রেখে দিচ্ছে আজও এ দৃশ্য মোটেই বিরল নয়।

কোরান শব্দটির অর্থ হল পাঠ, বক্তব্য রাখা ও আলোচনা করা। এই বইটি একটি শক্তিশালী ও তেজোদ্দীপ্ত বাণীর মূর্ত রূপ যা সাধারণত আবৃত্তি করা হয় এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবের উপলব্ধির জন্য মূল পাঠ্যাংশটি শোনা দরকার। কোরানের ছন্দ ও তার অলংকার, তার ধ্বনির উত্থানপতন ও দ্রুতগতি কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির কিছুটা ক্ষতি সাধন না করে কবিতাগুলির অনুবাদ সম্ভব নয়। কোরানের আয়তন হল আরবীয় নিউ টেস্টামেন্টের চার-পঞ্চমাংশ। ইসলামের ভিত্তি এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়সমূহের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব হিসেবে কোরান যে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তা একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। মুসলিমরা যেহেতু ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র বিজ্ঞানকে একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বলে মনে করে, তাই কোরান তাদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, উদার শিক্ষা অর্জনের একটি পাঠ্যবই রূপে গণ্য হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজহার নামক শিক্ষায়তনে কোরান এখনও গোটা পাঠক্রমের ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এর সাহিত্যগুণ আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, কেবলমাত্র এরই প্রভাবে আরবী-ভাষী জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন কথ্য ভাষা চালু থাকা সত্ত্বেও রোমান ভাষাগুলির মতো তা বহু ভাষায় বিভক্ত হয়ে পড়েনি। বর্তমানে একজন ইরাকির, মরক্কোর একজন মানুষের কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ আল-ইরাক, মরক্কো, সিরিয়া, আরব ও মিশরের সর্বত্র কোরানের

অনুকরণে সৃষ্ট ক্লাসিকাল ভাষাই ব্যবহৃত হয়। মুহাম্মাদের সময়ে আরবী গদ্যে কোন প্রথম শ্রেণীর রচনা ছিল না। সেদিক থেকে কোরানই প্রথম এবং সেদিন থেকে আদর্শ গদ্য রূপে গণ্য হয়ে আসছে। এর ভাষা ছন্দযুক্ত ও আলংকারিক, কিন্তু কাব্যিক নয়। বর্তমানের প্রায় সমস্ত রক্ষণশীল আরবীয় লেখকই সচেতনভাবে কোরানের ছন্দমিলযুক্ত গদ্যের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। ❑

● টীকা ●

১ খাতীব, মিশকাহ্, ১ম খণ্ড, ৩৪৩ পাতা।

২ বলা হয় তুর্কির শাসকেরা এই কপিটি সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামকে উপহার দিয়েছিলেন। ভার্সাই চুক্তি, পয়েন্ট ৮, বিভাগ ২, ধারা ২৪৬ দ্রষ্টব্য।

৩ আর্থার জেফ্রি, মেটিরিয়ালস ফর দি হিস্টোরি অফ দি টেক্সট অফ দ্য কোরান (লিডেন, ১৯৩৭), ১-১০ পাতা; হার্টউইগ হারসফিল্ড রচিত নিউ রিসার্চেস ইনটু দ্য কমপোজিসন অ্যাণ্ড এক্সিজেসিস অফ দ্য কোরান (লন্ডন, ১৯০২), ১৩৮ ও পরের পাতা তুলনীয়।

৪ বাইজাবি, ২খণ্ড, ২৩৫, ৩০৯-১০, ৩৯৬ পাতা।

৫ সূরাহ্ ৭০:২৯-৩০ তুলনীয়।

৬ এই সূরাহ্-র যে পঙ্ক্তি আলো নিয়ে আলোচনা করেছে তা জরথুস্টের প্রভাবমুক্ত।

৭ সূরাহ্ ১৮:৮২ ও পরেরগুলি, যেখানে তিনি আল্লাহ্‌র কার্য সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে দেখানো হয়েছে। ড্যানিয়েল ৮:৫, ২১-তে আলেকজান্দার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করে বলা আছে।

৮ মদিনীয় সূরাহ্‌তে আব্রাহাম হয়েছেন একজন হানিফ, এক মুসলিম (সূরাহ্ ৩:৬০)। তাকে মুহাম্মাদের আদর্শ পূর্বসূরি ও ইসলামের অধ্যাত্মবাদী চেতনার পূর্বপুরুষ (সূরাহ্ ৪:১২৪; ৩:৬১) এবং আল-কা'বা-র প্রতিষ্ঠাতা (২:১১৮ ও পরেরগুলি) রূপে গণ্য করা হয়। বন্ধু হিসেবে তার কথা ওল্ড টেস্টামেন্ট (ইসাইয়া ৪১:৮, দ্বিতীয় ক্রনিকলস ২০:৭), নিউটেস্টামেন্ট (জাস. ২:২৩) এবং কোরান (৪:১২৪)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ দি লিগ্যাসি অফ ইজরায়েল, সম্পাদনা: ই আর বিভান ও সি সিঙ্গার (অক্সফোর্ড, ১৯২৮), ১২৯-৭১ পাতা।

১০ সূরাহ্ ১৯:১৬-২৯; ৩:৩১-৪০।

১১ এসথার ৩:১।

১২ সূরাহ্ ২৮:৩৮; ৪০:৩৮।

১৩ ইসলামের ধর্মবিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্য ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ পিটার দ্য ভেনারেবল তিনজন খ্রিস্টান গবেষক ও একজন আরবের সাহায্যে বিদেশি ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষাতেই এর অনুবাদ করিয়েছিলেন (১১৪৩ খ্রিঃ)। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে (লণ্ডনে) প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সাযার দিউ রায়ার-এর দ্বারা "দি আলকোরান অফ মাহোমেট' নামে আরবী থেকে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। যে সমস্ত মানুষ এর মধ্যে মিথ্যা তুর্কি আভিজাত্যের সন্ধান

করতে চেয়েছিল তাদের জন্য নব্য ইংরেজিতে অনূদিত হয়। মূল আরবী থেকে সেল-এর অনুবাদটি (১৭৩৪ খ্রিঃ) আসলে বইটির শব্দান্তরে প্রকাশমাত্র এবং এটি ল্যাটিন ভাষায় মারাক্কি রচিত 'রেফ্যুটেশিও আলকোরানি' (১৬৯৮ খ্রিঃ) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। রডওয়েলের (১৮৬১) অনুবাদে সূরাহ্গুলিকে পরপর সাজানো হয়েছে; পামার (১৮৮০)-এর অনুবাদে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে; মারমাডিউক পিকথল-এর অনুবাদটি বিশেষভাবে সফল (১৯৩০)। রিচার্ড বেল (১৯৩৭-৩৯) স্তোত্রগুলির বিশ্লেষণধর্মী পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করেছেন। আরবী ভাষায় কোরানের প্রথম প্রকাশ ঘটে ভেনিসে, ১৪৮৫ থেকে ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন অ্যালেসান্দ্রো দা প্যাগানিনি।

১৪ অন্যান্য জিনিসেরও সেখানে পরপর উল্লেখ আছে।

১৫ প্রথম জন ১; প্রোভার্বস ২২-৩০ তুলনীয়।

১৬ সূরাহ্ ৫৬:৭৮.৮।

॥ অধ্যায় ১০ ॥

ইসলাম : আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের ধর্ম

সেমাইট জাতিগুলির দ্বারা সৃষ্ট তিনটি একত্ববাদী ধর্মের মধ্যে কোরান বর্ণিত ইসলাম ধর্মই সবচেয়ে বেশি বৈশিষ্টপূর্ণ এবং তা নিউ টেস্টামেন্টের খ্রিস্টধর্মের তুলনায় ওল্ড টেস্টামেন্টের ইহুদি ধর্মের অনেক কাছাকাছি। উভয় ধর্মের সঙ্গেই এর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, মধ্যযুগের অনেক ইউরোপীয় ও প্রাচ্য, খ্রিস্টানদের ধারণা যে-এটি কোন আলাদা ধর্ম নয়, বরং প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তার ডিভাইন কমেডি বইটিতে দান্তে 'কলঙ্ক ও ধর্মীয় বিভেদের বীজ বপনকারীদের' সঙ্গে মুহাম্মাদকে নিম্নতর নরকগুলির একটির হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে ইসলাম একটি স্বাধীন ও সুস্পষ্টভাবে আলাদা ধর্মমত রূপে গড়ে উঠল। কা'বা ও কুরায়শ হয়ে উঠল এই নতুন ধর্মমতের প্রতি অনুরক্ত হবার নির্ধারক উপাদান। তাদের ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকেরা ঈমান (ধর্মীয় বিশ্বাস), ইবাদাত (আরাধনা, ধর্মীয় কর্তব্য) ও ইহ্‌সান (সঠিক কাজ করা)-কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করল। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই দীন (ধর্ম)[১] শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। "ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।"[২]

● ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাস

আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতা, তাঁর গ্রন্থ ও রাসূল এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বাসই হল ঈমান-এর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রথম ও সবচেয়ে বড় ধর্মমত হল : লা ইলাহা ইল্লা-ল-লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। ঈমান-এ আল্লাহ্‌র ধারণাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।[৩] বস্তুতপক্ষে, মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ৯০ শতাংশেরও বেশি হল আল্লাহ্-সংক্রান্ত আলোচনা। তিনিই একমাত্র প্রকৃত স্রষ্টা। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ধারণাটি তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১১২ সূরাহ্-তে। আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ সত্য, অনাদি সৃষ্টিকর্তা (সূরাহ্ ১৬:৩-১৭; ২:২৭-২৮), সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান (১৩:৯-১৭; ৬:৫৯-৬২; ২:১০০-১০১; ৩:২৫-২৭), স্বাধিষ্ঠ (২:২৫৬; ৩:১)। তাঁর ৯৯টি সুন্দর সুন্দর নাম (আল-আসমা আল-হুসনা[৩], সূরাহ্ ৭:১৭৯) ও ততোধিক গুণাবলি আছে। মুসলিমদের তসবিদানা বা জপমালায় তাঁর নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ৯৯টি গুটি আছে। তাঁর প্রেমের গুণাবলি তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বে ঢাকা পড়ে গেছে (সূরাহ্ ৫৯:২৩-২৪)। ইসলাম (সূরাহ্ ৫:৫, ৬:১২৫, ৪৯:১৪) হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে

'আত্মসমর্পণ' 'আত্মনিবেদনের' ধর্ম। চরম পরীক্ষায় আব্রাহাম ও তার পুত্রের আত্মনিবেদন, পিতা আব্রাহামের মহত্তর কল্যাণের জন্য ত্যাগ করার প্রচেষ্টা 'আসলামা' (সূরাহ্ ৩৭:১০৩) ক্রিয়াপদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে এবং সেটিই মুহাম্মাদকে তার নতুন ধর্মমতের[৩] নাম যুগিয়ে দিয়েছে। এক অজ্ঞেয় সত্তার মহত্তম শাসনের প্রতি সহজ ও আগ্রহপূর্ণ বিশ্বাস-সহ এই আপসহীন একত্ববাদের মধ্যেই ইসলামের প্রধান শক্তি নিহিত আছে। অধিকাংশ ধর্মের অনুরাগীদের কাছে যা পরিত্যক্ত, অজানা। মুসলিম ধর্মের অনুরাগীরা সেই আত্মসন্তুষ্টি ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের সচেতন মানসিকতার অধিকারী। এজন্য মুসলিম দেশগুলিতে আত্মহত্যা প্রায় নেই বললেই চলে।

ঈমানের দ্বিতীয় মতবাদ হল মুহাম্মাদকে আল্লাহ্‌র বার্তাবহ (রাসূল) (সূরাহ্ ৭:১৫৭; ৪৮:২৯), তাঁর পয়গম্বর (৭:১৫৬, ১৫৮), তাঁর সৃষ্ট মানুষের পরামর্শদাতা (৩৫:২২), অসংখ্য নবীদের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মাদকে তাদের 'সীল' (৩৩:৪০) ও সেই অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা। কোরানভিত্তিক ধর্মতত্ত্বে মুহাম্মাদকে একজন মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে, যার একমাত্র ঐশী ক্ষমতা হল কোরান[৪]-এর ই'জাজ বা সৃষ্টি। তবে হাদীস, লোককথা ও বহুল প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি দিব্য শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব ধর্ম এবং এর মধ্য দিয়ে স্রষ্টার বাস্তব জ্ঞান ও সুচিন্তিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্মের মধ্যে এমন কোন আদর্শের কথা বলা হয়নি যা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তেমনি এই ধর্মের মধ্যে জটিলতা ও বিহ্বলতার পরিমাণ খুবই অল্প। এছাড়া এই ধর্মে কোন অতিপ্রাকৃত সংস্কার, যাজকতন্ত্র, যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি, বিশপের পদে উন্নয়ন ও ভগবদ-বাক্য প্রচারের উত্তরাধিকারলাভ কিছুই নেই।

কোরান হল আল্লাহ্‌র বাণী (কালাম, সূরাহ্ ৯:৬; ৪৮:১৫, তুলনীয় ৬:১১৪-১৫)। এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ (সূরাহ্ ১৭:১০৭-০৮; ৯৭:১; ৪৪:২; ২৮:৫১; ৪৬:১১) আছে এবং এটা অন্য কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কোরানের যে কোন উদ্ধৃতির সঙ্গে 'আল্লাহ্ বলেছেন' কথাটি বলা হয়। কোরানের ধ্বনিগত ও চিত্রানুগ প্রকাশ এবং ভাষাগত গঠনশৈলী স্বর্গীয় আদিরূপের সঙ্গে অভিন্ন ও সমভাবে চিরস্থায়ী (সূরাহ্ ৫৬:৭৬-৭৯; ৮৫:২১-২২)। তার সর্বপ্রকার অলৌকিকতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল : সমস্ত মানুষ ও জিন্ন সম্মিলিত চেষ্টাতেও এমন বাণী সৃষ্টি করতে পারবে না (১৭:৯০)।

এর ফিরিশতা-সংক্রান্ত তত্ত্বে ইসলাম সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে গ্যাব্রিয়েল (জিবরীল)-কে। তিনি হলেন প্রত্যাদেশের বাহক (২:৯১)[৫], 'পবিত্রতার আত্মা' (১৬:১০৪; ২:৮১) ও 'বিশ্বস্ত আত্মা' (২৬:১৯৩)। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর হার্মিস-এর মিল দেখতে পাওয়া যায়।

পাপ হয় নৈতিক বা আনুষ্ঠানিক হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হল শির্ক, অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাদের একমাত্র ও প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত করা (৪:৫১, ১১৬)। আল্লাহ্‌র ওপর বহুত্ব আরোপ করার কাজটি ছিল মুহাম্মাদের কাছে সবচেয়ে অরুচিকর এবং মদিনীয় সূরাহ্‌তে বহুত্ববাদীদের অবিরামভাবে চরম বা শেষ বিচারের পরিণতির কথা বলে ভয় দেখানো হয়েছে (২৮:৬২ ও পরবর্তী, ২১:৯৮ ও পরবর্তী)। মুহাম্মাদ সম্ভবত 'গ্রন্থভুক্ত মানুষজন, গ্রন্থধারীগণ' অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বহুত্ববাদী বলে গণ্য করেননি। অবশ্য সূরাহ্‌ ৯৮:৫ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন ভাষ্যকার ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

কোরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মৃত্যু পরবর্তী জীবনের আলোচনা। একটি গোটা সূরাহ্‌-র নাম দেওয়া হয়েছে পুনরুজ্জীবন (আল-কিয়ামা)। 'বিচারের দিন' (১৫:৩৫-৩৬; ৮২:১৭-১৮), 'পুনরুজ্জীবনের দিন' (২২:৫; ৩০:৫৬), 'বিশেষ দিন' (২৪:২৪-২৫; ৩১:৩২), 'বিশেষ মুহূর্ত' (১৫:৮৫; ১৮:২০) এবং সন্দেহাতীত দিন' (৬৯:১-২) সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ করে ভবিষ্যত জীবনের বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শারীরিক যন্ত্রণা ও দৈহিক আনন্দ-সহ ভবিষ্যত জীবনের যে ছবি কোরানে আঁকা হয়েছে, তা দেহের পুনরুজ্জীবনের কথাই নির্দেশ করে।

● পাঁচটি স্তম্ভ : (১) ধর্মবিশ্বাসকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা

মুসলিমদের ধর্মীয় কর্তব্য (ইবাদাত) ইসলামের তথাকথিত পাঁচটি স্তম্ভের (আরকান) ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

কোরানের দুটি সূত্র লা ইলাহা ইল্লা-ল-লাহ্‌ ও মুহাম্মাদুর রাসূলু-ল-লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহ্‌র বার্তাবহ)-এর মধ্যে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রথমটি অর্থাৎ বিশ্বাস (শাহাদাহ্‌)-এর সারসংকলন করা হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুকে সর্বপ্রথম এই কথাগুলিই শোনানো হয়। এমনকী সমাধিস্থ করার মূহূর্তেও এই শব্দগুলিই উচ্চারণ করা হয়। জন্ম ও মৃত্যুর মতো দুটি প্রধান ঘটনার মধ্যবর্তী স্তরে আর কোন শব্দ এতবার উচ্চারিত হয় না। মসজিদের মিনার থেকে প্রতিদিন একাধিক বার মোয়াযিযন আজানের জন্য যে আহ্বান জানান, তার মধ্যেও এই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। মৌখিকভাবে এই সূত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এবং তা গ্রহণ ও কার্যে রূপায়িত করলেই একজনকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

● (২) নামায

প্রতিদিন পাঁচবার[৮] একজন ধর্মানুরাগী মুসলিম মক্কার দিকে মুখ করে সুনির্দিষ্ট নামায পাঠ করবে। নামায হল মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় স্তম্ভ। নামাযের মুহূর্তে যদি ওপর থেকে

মুসলিম দুনিয়ার দৃশ্য দেখা হয় (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার ফলে সৃষ্ট পার্থক্য বাদ দিলে) তা হলে মক্কায় অবস্থিত কা'বা থেকে বিকীর্ণ এবং সিয়েরা লিওন থেকে মালয়েশিয়া ও টোবলস্ক থেকে কেপটাউন পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত আল্লাহ্র কাছে উপাসনাকারীদের দ্বারা গঠিত সমকেন্দ্রিক বৃত্তের একটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যাবে।

আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা বা নামায বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই সালাহ্ শব্দটি আরাম বা সিরীয় ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ। শব্দটির আরবী বিশুদ্ধ বানান (একটি ওয়া-সহ) থেকে তাই মনে হয়। ইসলাম ধর্ম সৃষ্টির পূর্বে যদি নামায চালু ছিল বলে মনে করা হয় তবে তা ছিল নিতান্তই অসংগঠিত ও অনিয়মিত। যদিও প্রথম দিকের একটি সূরাহ্-তে (৮৭:১৫) এই নামাযকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং মক্কার কয়েকটি প্রত্যাদেশে (১১:১১৬; ১৭:৮০-৮১; ৩০:১৬-১৭)-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও মদিনীয় অধ্যায়ের আগে পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচবার করে স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্টরূপে পৃথক উপাসনা এবং তার আইনি পবিত্রতা বা আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছন্নতার পূর্বশর্ত (২:২৩৯, ২৪:৫৭[৯], ৪:৪৬, ৫:৮-৯) চালু ছিল না। মধ্যবর্তী নামাযটি (২:২৩৯) একেবারে শেষে যুক্ত হয়েছে। আল-বুখারীর মতানুযায়ী[১০] বলা যায়, মিরাজ বা নৈশ ভ্রমণে (সূরাহ্ ১৭:১) মুহাম্মাদ যখন সপ্তম স্বর্গ দর্শনে গিয়েছিলেন তখন আল্লাহ্ ৫০ বার নামায পাঠের কথা বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আপসের মাধ্যমে এটি ৫ বারে পৌঁছেছিল। সূরাহ্ ৪:৪৬ থেকে জানা যায় যে, অযৌক্তিক বা অসঙ্গত গোলমালেব হাত থেকে আল্লাহ্র উপাসনাকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই প্রথমে মদের ব্যবহার সীমিত ও পরে নিষিদ্ধ করা হয়।

ধর্মীয় প্রার্থনা হল আইন নির্দেশিত একটি কাজ, যা সমস্ত মুসলিম একই ভাবে নতজানু হয়ে এবং সার্বিক অবস্থানে থেকে পালন করে। নামাযীকে অবশ্যই আইনত পবিত্র অবস্থায় (তাহারাহ্) থাকতে হবে। মাতৃভাষা যাই হোক না কেন, নামাযের মাধ্যম হিসেবে সমস্ত মুসলিমকে আরবী ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বাঁধাধরা আকারের এই প্রার্থনা সেই অর্থে ততটা আবেদন বা মিনতিপূর্ণ[১১] নয়, কারণ এতে শুধু আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা হয় (৬২:৯-১০; ৮:৪৭)। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনার মতো এক্ষেত্রেও ধর্মানুরাগী মুসলিমরা সরল ও অর্থপূর্ণ 'ফাতিহা' দিনে প্রায় ২০ বার আবৃত্তি করে। এর ফলে এটি প্রায়ই পুনরুচ্চারিত একটি স্তোত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিগুণ পুণ্যদায়ক হল রাতে স্বেচ্ছায় কৃত ধর্মীয় উপাসনা (তাহাজ্জুদ, ১৭:৮১; ৫০:৩৮-৩৯)। কারণ এটি হল প্রয়োজনের চেয়েও বেশি (নাফিলা)।

শুক্রবারের দুপুরের নামাযটি হল সকলের জন্য একত্রিত প্রার্থনা। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য এই নামাযটি বাধ্যতামুলক। কয়েকটি মসজিদে মেয়েদের নামাযের জন্য আলাদা জায়গা সংরক্ষিত আছে। শুক্রবারের নামাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল খুতবা (উদ্বোধনী বক্তৃতা)। যা নামাযের পরিচালক (ইমাম) নামাযীদের উদ্দেশ্যে বলেন। আর খুতবার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রধানের জন্য প্রার্থনা (দু'আ) করা হত। উপাসনার উদ্দেশ্যে

সংগঠিত এই ধর্মীয় সমাবেশ ইহুদিদের সায়নাগগে উপাসনার আদিরূপকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করত, কিন্তু পরবর্তীকালে তার উন্নতিসাধনে খ্রিস্টানদের রবিবারের প্রার্থনার দ্বারা তা প্রভাবিত হয়েছিল। গাম্ভীর্য, সারল্য ও শৃঙ্খলার দিক থেকে কোন উপাসনাই এই সম্মিলিত উপাসনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। মসজিদে সুবিন্যস্ত সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং শ্রদ্ধা ও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে ইমামের নির্দেশ অনুসরণ করে নামাজীরা এমন একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করে যা সর্বদাই অন্যের ওপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। মরুভূমির গর্বিত ও আত্মকেন্দ্রিক সন্তানদের কাছে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে এই ধর্মীয় উপাসনার বিরাট মূল্য ছিল। এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সামাজিক সাম্য ও সংহতি বোধ গড়ে ওঠে। মুহাম্মাদের ধর্ম তত্ত্বগতভাবে রক্তের সম্পর্কের পরিবর্তে যে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা গড়ে তুলেছে, এই ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবাদাতখানা এভাবেই "ইসলামের প্রথম ড্রিলের মাঠে" পরিণত হয়।

● (৩) ভিক্ষাদান বা জাকাহ

মানুষের প্রতি ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসেবে নির্দেশিত ও পুণ্যলাভের সমার্থক হিসেবে গণ্য জাকাহ্ (আইনি ভিক্ষা, সূরাহ্ ২:৪০, ৭৭, ১৯২, ২৬৩-৬৯, ২৭৩-৭৫, ২৮০) পরবর্তীকালে টাকা, গবাদি পশু, শস্য ফল ও ব্যবসা-সহ সম্পত্তির ওপর বাধ্যতামূলক করে পরিণত হয়। কোরানে (৯:৫; ২:৪০, ৭৭ ইত্যাদি) জাকাহ্ প্রায়ই সালাহ্-র সঙ্গে যুক্ত। নবীন ইসলামি রাষ্ট্র তাদের স্থায়ী কর্মচারীদের সাহায্যে জাকাহ্ সংগ্রহ করত এবং কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের গরিব মানুষদের সাহায্য করা, মসজিদ নির্মাণ করা ও সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা হত (সূরাহ্ ৯:৬০)। আরামীয় বা সিরীয় ভাষা থেকে জাকাহ্ শব্দটির উৎপত্তি এবং স্বেচ্ছাকৃত ও সাধারণভাবে ভিক্ষাদান সাদাকাহ থেকে এটি অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যদায়ক। জাকাহ্ সম্পূর্ণরূপে একটি সম্প্রদায়গত এবং ভিক্ষা তুলে কেবলমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই তা বন্টন করে। এর অন্তর্নিহিত নীতির সঙ্গে 'টাইদ' (যাজককে প্রদত্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ) প্রদান নীতির মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্লিনির[১১] মত অনুযায়ী, তাদের মশলা বিক্রি করার অনুমতি দেবার আগে দক্ষিণ আরবের ব্যবসায়ীরা তাদের দেবতাকে তা প্রদান করত। জাকাহ্-র সঠিক বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ফিকাহ্ (ধর্মীয় আইন) দ্বারা এর পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে এর পরিমাণ হল ২১/২ শতাংশ। এমনকী সেনাদের পেনসনও এ থেকে মুক্ত নয়। পরবর্তী কালে খাঁটি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জাকাহ্-র পরিমাণ নির্ধারণ মুসলিমদের বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। জাকাহ্ হল মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসের তৃতীয় স্তম্ভ।

● (৪) রোযা

প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যম হিসেবে রোযার কথা যদিও মদিনীয় সূরাহ্‌তে (৫৮:৫; ১৯:২৭; ৪:৯৪; ২:১৯২) একাধিকবার বলা হয়েছে, উপবাসের মাস হিসেবে রামাযানের কথা বলা হয়েছে মাত্র একবার (২:১৭৯-৮১)। ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে যে-মাসটি পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য হত, সেই বিশেষ মাসটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে রোযার মাস হিসাবে। কারণ এই মাসেই কোরান প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল (সূরাহ্ ২:১৮১) এবং বদরের জয় অর্জিত হয়েছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত (সূরাহ্ ২:১৮৩) পর্যন্ত সমস্ত খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার প্রথা চালু হয়েছিল। মুসলিম দেশগুলিতে আধুনিক যুগে উপবাসী থাকে না এমন মুসলমানের ওপর সরকার বা জনসাধারণ কর্তৃক হিংসাত্মক আক্রমণের ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে।

ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী আরবে উপবাসের প্রথা চালু থাকার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খ্রিস্টানও ইহুদিদের মধ্যে এই প্রথা ভালভাবেই প্রচলিত ছিল (ম্যাথিউ ৪:২; ডিউটারোনমি ৯:৯)। ইবন-হিশামের[১১] লেখা থেকে জানা যায় জাহিলীয়া শাসনে কুরায়শরা তাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মাউন্ট হিরার ওপরে বছরে একমাস উপবাস (তাহাননুথ) করে কাটাত। আল-মদীনায় এবং রামাযান মাস চালু হবার আগে মুহাররাম দশম দিনটি (আশুর) মুহাম্মাদ উপবাসের দিন হিসেবে পালন করতেন। এটা তিনি ইহুদিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।[১৪] মক্কার সূরাহ্‌গুলিতে উপবাসের (সাওম) কথা একবারই উল্লেখ আছে (১৯:২৭) এবং তাও আপাতঅর্থে 'নীরবতা' শব্দটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

● (৫) তীর্থযাত্রা

তীর্থযাত্রা (হজ, সূরাহ্ ৩:৯১; ২:১৯২-৯৬; ৫:১-২, ৯৬) হল ইসলামের পঞ্চম ও শেষ স্তম্ভ। যাত্রার খরচ জোগাতে পারে এমন প্রতিটি নারী ও পুরুষ সমগ্র জীবনে অন্তত একবার বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মক্কায় পবিত্র তীর্থযাত্রা করে থাকে। উমরাহ হল মক্কায় গৌণ তীর্থযাত্রা এবং তা ব্যক্তিগতভাবে বছরের যে কোন সময়ে করা যায়।

এই পবিত্র প্রাঙ্গণে একজন তীর্থযাত্রী (হজ) একজন মুহ্‌রিম (সেলাই-বিহীন অখণ্ড বস্ত্র পরে) হিসেবে প্রবেশ করে এবং কা'বার (তাওয়াফ) চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং সংলগ্ন আল-সাফা টিলা ও তার বিপরীত দিকে অবস্থিত মারওয়া উচ্চভূমির[১৫] মধ্যে অবস্থিত সাতপাক পথ (সা'ঈ) পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আসল হজ শুরু হয় আরাফা[১৬]-র দিকে যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে এবং এই যাত্রা যু-আল-হিজ্জা-র সপ্তম থেকে অষ্টম দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আরাফা-র বাইরে অবস্থিত আল-মুজদালিফা ও মিনার পবিত্র স্থানে এই যাত্রা সাময়িকভাবে থামে (উকুফ)। মিনা উপত্যকার দিকে যাবার পথে জামরাত আল-আকাবায়

অবস্থিত পাথর-ছোঁড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মিনা-তে একটি উট বা ভেড়া বা অন্য কোন শিংওলা গৃহপালিত পশুর কুরবানির (কোরান ২২:৩৪-৩৭) সঙ্গে সঙ্গে গোটা উৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। যূ-আল-হিজ্জার দশম দিনে এই কুরবানি দেওয়া হয় এবং গোটা মুসলিম দুনিয়ায় এই উৎসবটি ঈদ আল-আযহা (ত্যাগের উৎসব) রূপে পালিত হয়। মাথা ন্যাড়া করার পর ওই বিশেষ পোশাকটি (ইহ্‌রাম) বাতিল করা হয় এবং ইহ্‌লাল (পার্থিব অবস্থা) পুনরায় চালু হয়। যতক্ষণ কেউ মুহ্‌রিম অর্থাৎ পবিত্র অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ তাকে রামাযান মাসের উপবাসের সঙ্গে আরোপিত বিধিনিষেধ ছাড়াও যৌন সহবাস, রক্তপাত ঘটানো, শিকার ও গাছ উপড়ে ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্য তখন উপবাস করতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই।

পবিত্র স্থানগুলিতে তীর্থযাত্রা ছিল একটি প্রাচীন সেমিটিক প্রথা।[১৭] ওল্ড টেস্টামেন্টের সময়েও এই প্রথা চালু ছিল (এক্সোডাস ২৩:১৪, ১৭; ৩৪:২২-২৩; প্রথম স্যামুয়েল ১:৩)। সম্ভবত এটা ছিল সৌর উপাসনার একটি বৈশিষ্ট্য—যে সংস্কৃতির উৎসবগুলি বলবিষুবের সঙ্গে একই সময়ে পালিত হয় এবং যে উৎসবগুলির মধ্য দিয়ে প্রখর সূর্যদগ্ধ দিনগুলিকে শুভবিদায় জানিয়ে বৃষ্টির দেবতা কুজাহ্‌-কে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে উত্তর আরবের বার্ষিক মেলা যূ-আল-হিজ্জায় কা'বা ও আরাফা-তে অনুষ্ঠিত হত। কা'বা ও আরাফা-কে কেন্দ্র করে প্রাচীন তীর্থযাত্রা-সংক্রান্ত এই আচারকে হিজরীর সপ্তম বর্ষে মুহাম্মাদ গ্রহণ করেন এবং তার ইসলামিকরণ ঘটান। এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইসলাম-পূর্ব আরব থেকে ইসলাম ধর্ম এক বিরাট ঐতিহ্যের ভাণ্ডার গ্রহণ করেছিল। রিফআত[১৮]-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একজন বেদুইন যখন কা'বার চারদিকে পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করে তখন সে কথ্য আরবী ভাষায় বারবার বলতে থাকে : "এই পবিত্র উপাসনালয়ের মালিক! আমি ঘোষণা করছি যে, আমি এসেছি। আমি আসিনি, একথা বোলো না। যদি তুমি চাও, আমাকে ও আমার বাবাকে ক্ষমা কর। অন্যথায়, তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় ক্ষমা করো। কারণ তুমি দেখছ যে, আমি আমার তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেছি।"[১৯]

সেনেগাল, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া থেকে তীর্থযাত্রীদের অবিরাম স্রোত মধ্য-আফ্রিকার ওপর দিয়ে ক্রমাগত পূর্বদিকে এগিয়ে চলতে থাকে এবং যত এগোয় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। অনেকে পায়ে হেঁটে, আবার অনেকে উটের পিঠে চেপে তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তীর্থযাত্রীদের অধিকাংশই পুরুষ, তবে অল্প কিছু মহিলা ও শিশুও থাকে। তারা পথে মজুরি করে, ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে, এবং প্রভূত সম্মানিত মক্কা (আল-মুকাররামা) ও আলোকোজ্জ্বল শহরে (আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা) প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে। অনেকেই রাস্তার ধারে শহীদের মৃত্যু বরণ করে। আর যারা বেঁচে থাকে তারাই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমের রেড সী বন্দরে পৌঁছোয় এবং সেখান থেকে সমুদ্রগামী আরবীয়-জাহাজে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আল-ইয়ামান, আল-ইরাক, সিরিয়া ও মিশর থেকে

চারটি বড় মরুযাত্রীদল আসে। এই চারটি দেশের প্রত্যেকেই তাদের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রতি বছরেই তাদের মরুযাত্রীদলের সামনে একটি করে মাহ্‌মিল পাঠায়। মাহ্‌মিল হল জমকালোভাবে সজ্জিত বহনযোগ্য শয্যাবিশেষ, যেটি কারোর দ্বারা নিপীড়িত নয় ও মরুযাত্রীদলের সামনে অগ্রসরমান একটি উটের পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। নিজেদের স্বাধীনতা প্রদর্শন ও পবিত্র তীর্থস্থানের রক্ষক হিসেবে নিজেদের দাবি প্রমাণের উদ্দেশ্যে মুসলিম রাজারা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ওই ধরনের মাহ্‌মিল পাঠাতে শুরু করে। বর্তমানে



ঈজিপ্ট এবং সিরিয়ার তীর্থযাত্রীরা আল-মুজদালিফা থেকে মিনা-র দিকে যাত্রা শুরু করেছে, ১৯০৪

প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী বলা যায়, শেষ দিককার আয়্যুবিয় সুলতানদের অন্যতম এক প্রতিনিধির স্ত্রী শাজার-আল-দুর্‌র ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মাহ্‌মিল-এর প্রথাটি চালু করেন। কিন্তু আগেকার দিনের অনেক রচনায়[২৩] এই দাবি করা হয় যে, আল-ইরাকে উমাইয়া রাজের প্রতিনিধি বিখ্যাত আল-হাজ্জাজ (মৃ. ৭১৪ খ্রিঃ) এই প্রথা চালু করেছিলেন। দুটি কাহিনীর যেটাই সত্য হোক না কেন, এটা একান্তভাবেই সত্য যে মামলুক বেবার্স

(১২৬০-৭৭ খ্রিঃ) যে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান পালন করেছিলেন তাতে এই প্রথা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২১] সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সিরীয় ও মিশরিয় তীর্থযাত্রীরা জাঁকজমকের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তীর্থযাত্রীদের বার্ষিক গড় ছিল ১,৭২,০০০। তখন থেকেই তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তা ১০ লক্ষে পৌঁছে যায়। সেই সময় মিশর ও পাকিস্তান সবচেয়ে বেশি তীর্থযাত্রীদের পাঠাত। আচারনিষ্ঠ ইব ন-সুয়ূদ বর্বরতার নিদর্শন হিসেবে মাহ মিল প্রথা বিলুপ্ত করেন। তেলের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তীর্থযাত্রাই ছিল হিজাজ-এর আয়ের প্রধান উৎস।

যুগ যুগ ধরে এই হজ সমাবেশ ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে বড় ঐক্য সৃষ্টিকারী উপাদান এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী মিত্রতার বন্ধন হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সমাবেশ আর্থিক দিক থেকে সক্ষম প্রতিটি মুসলিমকে গোটা জীবনে একবার তীর্থযাত্রীর ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। পৃথিবীর চারটি প্রান্ত থেকে আগত ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ ধর্মবিশ্বাসীদের এমন একটি সমাবেশের সামাজিক প্রভাবের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই সমাবেশ নিগ্রো, বার্বার, চীনা, পারসি, সিরীয়, তুর্কি ও আরবী—ধনী ও গরিব, উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের একই ধর্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ করে দেয়। বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্মই জাতি, বর্ণ ও জাতীয়তাবোধের বৈষম্য—অন্তত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে—ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ও মানবজাতির বাকী অংশের মধ্যে পার্থক্য বজায় রয়েছে। এই হজ সমাবেশই উপরোক্ত সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। যে সমস্ত দেশগুলি এখনও যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমের দ্বারা যুক্ত নয় এবং যেখানে গণমাধ্যমের কণ্ঠস্বর তেমন জীবন্ত নয়, সেই সমস্ত দেশগুলি থেকে আগত মানুষজনের মধ্যে তাদের সাম্প্রদায়িক মত প্রচারের ক্ষেত্রে এই হজ সমাবেশ বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। মক্কায় তীর্থযাত্রা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ভাব বিনিময় করার যে সুযোগ দেখা দেয়, তার প্রভাবেই উত্তর আফ্রিকায় 'সানুসি' নামে পরিচিত এমন একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং সমধর্মী লোকেদের মধ্যে ধর্মীয় প্রচার চালাচ্ছে।

● পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদ

অন্ততপক্ষে খারিজী নামে একটি মুসলিম সম্প্রদায় পবিত্র যুদ্ধ[২২] (সূরাহ্ : ২:১৮৬-৯০) বা জিহাদ-এর কর্তব্যকে ষষ্ঠ স্তম্ভের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। একটি জাগতিক শক্তি হিসেবে তার অতুলনীয় বিস্তারের জন্য ইসলাম জিহাদের কাছেই ঋণী। দার আল-হারব (যুদ্ধের অঞ্চল) থেকে দার-আল-ইসলাম (ইসলামের সীমানা)—কে আলাদা করে রেখেছে যে ভৌগোলিক সীমা, তাকে বজায় রাখাই খলিফার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। শান্তির স্বর্গ ও

যুদ্ধের অঞ্চল—গোটা বিশ্বকে এই দুটি ভাগে বিভক্ত করার অনুরূপ নীতি সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী তত্ত্বে দেখতে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে মুসলিম দুনিয়ায় জিহাদের প্রতি সমর্থন অনেক কমে গেছে। তার মূল কারণ হল মুসলিম দুনিয়ার বহু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সে সমস্ত বিদেশি শক্তি এতই শক্তিশালী বা পরোপকারী যে, তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে অটোমান সুলতান-খলিফা মুহাম্মাদ রাশাদ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব জুড়ে সামরিক অভিযান চালানোর যে ডাক দিয়েছিল তা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল ভাল ও মন্দ-সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ (সূরাহ্ ৯:৫১; ৩:১৩৯; ৩৫:২)। এটি মুসলিমদের ধর্মচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং যুগ যুগ ধরে তা তাদের ধর্মচিন্তাকে প্রভাবিত করে আসছে।

উপরে আলোচিত ধর্মীয় কর্তব্যগুলিই (ইবাদাত) হল ইসলাম ধর্মের মূল উপাদান। কোরানের নির্দেশাবলির দ্বারা কেবলমাত্র এগুলিই প্রবর্তিত হয়নি। ন্যায় কাজের (ইহ্‌সান) চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সেই একই ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম দুনিয়ায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতা উভয়ই ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত। মুহাম্মাদের মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই মূলত কোনটা ঠিক (হালাল=সম্মতিপ্রাপ্ত, আইনসম্মত) এবং কোন্‌টা (হারাম=নিষিদ্ধ) তা নির্ধারণ করে। আরব দেশে ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মই প্রথম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ব্যক্তির নৈতিকতার (সূরাহ্ ৫৩:৩৯-৪২, ৩১:৩২) দাবি করেছিল। নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে এই ধর্ম রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে উপজাতীয় আত্মীয়তার পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার মৈত্রীবন্ধন গড়ে তুলেছিল। মানবিক গুণাবলির মধ্যে ইসলাম ধর্ম পরোপকারের মানসিকতার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে এবং জাকাহ্-র মধ্যে দিয়ে এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটে থাকে। ওল্ড টেস্টামেন্টের শ্রেষ্ঠ নিয়মগুলির সঙ্গে (অর্থাৎ আমোস ৫:২৩-২৪; হোসিয়া ৬:৬; মিকাহ্ ৬:৬-৮) ভালভাবে তুলনীয় ২:১৭২; ৩:১০০, ১০৬, ১০৯:১১; ৪:৪০; ৭:৩১-এর মতো কোরানের আয়াতগুলি। ইসলামে ধর্মের নৈতিক আদর্শগুলির কথা ওগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা আছে। ❑

• টীকা •

১ আল-শাহরাসতানি, আল-মিলাল অ-আল-নিহাল, সম্পাদনা : কিওরটন (লণ্ডন, ১৮৪২-৪৬), ২৭ পাতা তুলনীয়

২ কোরান ৩:১৭।

৩ আল-গাজ্জালী, আল-মাকসাদ আল-আসনা, ২য় সংস্করণ (কায়রো, ১৩২৪), ১২ ও পরের পাতা; বাগাবি, মাসাবীহ্, ১ম খণ্ড, ৯৬-৯৭ পাতা।

৪ সি সি টোরে, দি জিউইস ফাউন্ডেশন অফ ইসলাম (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৩), ৯০, ১০২ ও পরের পাতা।

৫ কোরানের গঠনশৈলীর সৌষ্ঠব তার বিস্ময়কর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য; কোরান ১৩:২৭-৩০; ১৭:৮৭-৯৬। ইবন-হাজম রচিত আল-ফাসল ফী আল-মিলাল ওয়াল-আহওয়া অ-আল-নিহাল, ৩য় খণ্ড (কায়রো, ১৩৪৭), ১০-১৪ পাতা দ্রষ্টব্য; আল-সুয়ূতি রচিত আল-ইতকান ফী উলুম আল-কুরআন (কায়রো, ১৯২৫), ২য় খণ্ড ১১৬-২৫ পাতা দ্রষ্টব্য।

৬ গ্যাব্রিয়েলই যে প্রত্যাদেশের মাধ্যম, তা এই সূরাহ্-তে স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছে, ৮১:১৯-২০; ৫৩:৫-৭ সূরাহ্ তুলনীয়।

৭ এইচ ল্যামেনস, এল 'ইসলাম : ক্রয়ান্সেস এট ইনস্টিটিউশনস, (বেইরুট, ১৯২৬) ৬২, পাতা, ১.১৭ এবং ২১৯ পাতা, ১.৭।

৮ ঊষা, মধ্যাহ্ন, দ্বিপ্রহর; সূর্যাস্ত, রাত্রি।

৯ সালম ৫৫:১৭ তুলনীয়।

১০ সাহীহ্, ১ম খণ্ড, ৮৫ ও পরের পাতা; জেনেসিস ১৮:২৩-৩৩ তুলনীয়।

১১ এটি হল দু'আ, অনিয়ন্ত্রিত ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা, একে আনুষ্ঠানিক সালাহ্-এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়।

১২ বি. কে. ১২, ৩২ অধ্যায়।

১৩ সীরাহ্, ১৫১-১৫২ পাতা।

১৪ বুখারী, ২য় খণ্ড, ২০৮ পাতা; লেভিটিসাস ১৬:২৯।

১৫ তার তৃষ্ণার্ত পুত্রের জন্য একটি ঝরনার খোঁজ করতে হ্যাগার (হাজেরা) এই দুটি উচ্চভূমির মধ্যে সাতবার ছোটাছুটি করেছিলেন—এই ঘটনার স্মরণে মুসলিমরা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'সাঈ' অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকে।

১৬ আরাফাহ্ হল উপত্যকা ও আরাফাত হল পর্বত; রিফআত, মিরআত ১ম খণ্ড, ৪৪ পাতা অনুযায়ী, কিন্তু এই দুটি শব্দ প্রায়ই নিজেদের জায়গা বদল করে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৭ ডব্লিউ রবার্টসন স্মিথ, লেকচারস অন দি রিলিজিয়ন অফ দি সেমাইটস, ৩য় সংস্করণ। এস. এ. কুক সম্পাদিত (লণ্ডন, ১৯২৭), ৮০ ও ২৭৬ পাতা।

১৮ ১ম খণ্ড, ৩৫ পাতা।

১৯ একই কর্তৃপক্ষ (১ম খণ্ড ৩৫ পাতা), হঠাৎ শুনে ফেলেছিল আল-কা'বাতে এক বেদুইন মহিলা বলছে, "হে কুমারী লায়লা! তুমি যদি বৃষ্টি এনে আমাদের অঞ্চলকে শস্যপূর্ণ (খাইর) করে দাও তা হলে তোমার চুলে মাখানোর জন্য আমি এক বোতল ঘি এনে দেব।" একথা শুনে আর এক বেদুইন মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি সত্যই তা এনে দেবে?" তখন আগের মহিলাটি উত্তর দিল, "আমি তাকে বোকা বানাচ্ছি, একবার সে বৃষ্টি এনে দিলে আমি তাকে কিছুই দেব না।"

২০ ইব ন-কুতাইবা, মাআরিফ, ২৭৪ পাতা; ইয়াকুত, বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৮৮৬ পাতা, ১.৬; ইব ন-রুসতাহ্, ১৯২ পাতা; আল-সুয়ুতি, আল-কানজ আল-মাদফুন (বুলাক, ১২৮৮), ৬৮ পাতা।

২১ সুয়ুতি, হুসন, ২য় খণ্ড, ৭৪ পাতা; আল-মাকরিজি, আল-মাওয়ায়িজ অ-আল-ই'তিবার, সম্পাদনা : গ্যাস্টন উইয়েট (কায়রো, ১৯২২), ৩য় খণ্ড, ৩০০ পাতা; আল-সুলুক ফী মারিফাত দুয়াল আল-মুলুক, অনুবাদ : এম কুয়াট্রেমেয়ার, হিস্টায়ার দাস সুলতানস মামলুকস দা এল' ইজিপ্টি (প্যারিস, ১৮৪৫), ১ম খণ্ড, (প্রথম ভাগ) ১৪৯-৫০ পাতা; মাহ্‌মিল, রুয়ালার মারকাব (বহনযোগ্য শয্যা) ও চুক্তিপত্রের পেটি সেই প্রাচীন সেমিটিক উৎস থেকে উদ্ভূত।

২২ তাত্ত্বিক দিক থেকে ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষ কোন যুদ্ধের কথা নেই।

॥ অধ্যায় ১১ ॥

বিজয়, সম্প্রসারণ ও উপনিবেশীকরণ

খ্রিস্টাব্দ ৬৩২-৬১

খিলাফতে রাশেদা

১.	আবু-বকর	৬৩২-৩৪
২.	উমার	৬৩৪-৪৪
৩.	উসমান	৬৪৪-৫৬
৪.	আলী	৬৫৬-৬১

মুহাম্মাদ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন ধর্মবেত্তা, আইন-নির্দেশক, ধর্মীয় নেতা, প্রধান বিচারক, সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও রাষ্ট্রের প্রধান। অর্থাৎ এই একজনের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। এখন তিনি মারা গেছেন। তার উত্তরাধিকারী কে হবেন, অর্থাৎ ধর্মীয় কার্যকলাপ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে কে খলিফা হবেন? সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর হিসেবে মুহাম্মাদ মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত বিধানের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাই তাঁর কোন উত্তরসূরি থাকা সম্ভব নয়।

সেই মহান পয়গম্বরের কোন পুত্রসন্তান বেঁচে নেই। তাঁর এক মেয়ে ফাতিমাকে রেখে তিনি মারা গেছেন। ফাতিমা ছিল আলীর স্ত্রী। কিন্তু আরবদেব প্রধান পদটি ঠিক বংশানুক্রমিক ছিল না। ববং উপজাতীয় মানুষদেব মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ কোন একজনকে ওই পদে নির্বাচিত করা হত। সুতরাং তাঁর পুত্ররা যদি তাঁর আগে মারা না যেত, তা হলেও এই সমস্যার সমাধান হত না। মুহাম্মাদ নিজেও স্পষ্টভাবে কাউকে উত্তরসূরি পদে মনোনীত করে যাননি। ফলে খলিফা কে হবে, সেটাই তখন ইসলাম ধর্মের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এটা এখনও একটি জীবন্ত সমস্যা। সুলতানি সাম্রাজ্য বাতিল হবার ১৬ মাস পর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কামালপন্থি তুর্কিরা দ্বিতীয় আবদ-আল-মাজীদের শাসনাধীন কনস্ট্যান্টিনোপলের অটোমান খলিফা সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয় এবং তারপর থেকে মুহাম্মাদের সঠিক উত্তরসূরি নির্বাচন করার জন্য কায়রো ও মক্কাতে বেশ কয়েকবার প্যান-ইসলামিক কংগ্রেসের বৈঠক বসেছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ধর্ম-সংক্রান্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল-শাহরাসতানির (মৃ. ১১৫৩ খ্রিঃ) ভাষায় বলা যায়, "খলিফার (ইমামাহ্) পদে কে বসবে তা নিয়ে যত রক্তপাত হয়েছে তার আগে আর কোন ইসলামিক ইস্যু বা বিষয় নিয়ে এত রক্তপাত হয়নি।"

যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিষয়টিকে জনসাধারণের আদালতে দাঁড় করানো হয়, তখন সর্বদা যা ঘটে এক্ষেত্রেও তাই ঘটল, অর্থাৎ—মুহাম্মাদের মৃত্যুর পরে পরস্পর-বিরোধী কয়েকটি দলের আবির্ভাব ঘটল। তাদের মধ্যে একটি পক্ষ হল দেশান্তরী বা বাস্তুত্যাগীরা (মুহাজিরুন)। তারা যেহেতু মুহাম্মাদের উপজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং তারাই প্রথম তার ধর্মকে গ্রহণ করেছিল, তাই তারা খলিফা পদের দাবিদার হয়ে বসল। মদীনার সমর্থকেরা (আনসার) হল এই পদের আর এক দাবিদার। নিজেদের দাবির সমর্থনে তারা জোর দিয়ে বলল যে, তারা যদি মুহাম্মাদ ও তার সদ্যোজাত ইসলামকে আশ্রয় না দিত তা হলে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। পরবর্তীকালে এই দুটি পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগী (সাহাবা) হয়ে উঠল। এরপর এল বৈধ উত্তরাধিকারীরা (আসহাব আল-নাস অ-আল-তায়িন)। তাদের যুক্তি ছিল. আল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ কখনই সুযোগ ও নির্বাচকদের ইচ্ছার ওপর ধর্মবিশ্বাসীদের ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দিতে পারেন না। সুতরাং মুহাম্মাদের উত্তরসূরি রূপে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করে তারা নিশ্চয়ই খলিফা-পদ পূরণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। মুহাম্মাদের খুড়তুতো ভাই এবং তার একমাত্র জীবিত কন্যা ফাতিমার স্বামী ও ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দু-তিনজনের অন্যতম আলী-ই হলেন সেই মনোনীত ব্যক্তি ও তার একমাত্র আইনসম্মত উত্তরসূরি। খলিফা নির্বাচনের নীতি বাতিল করে শেষ দলটি খলিফা পদে বসার আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকারের নীতিকেই কায়েম করল। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে কুরায়শ বা উমাইয়াদের আভিজাত্যের অধ্যায় শুরু হল। ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সম্পদের বৈভব উমাইয়া কর্তৃত্বকে মহিমান্বিত করেছিল (কিন্তু এরাই সকলের শেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল)। আবার এই উমাইয়ারাই জোরের সঙ্গে খলিফাপদে তাদের দাবির কথা ঘোষণা করেছিল। মক্কার পতনের আগে পর্যন্ত এই উমাইয়া বংশের প্রধান আবু-সুফয়ানই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

● রক্ষণশীল খলিফা : একটি পিতৃশাসিত যুগ

শেষ পর্যন্ত প্রথম পক্ষই জয়লাভ করল। মুহাম্মাদের এক শ্বশুর এবং তার প্রথম তিন-চারজন ধর্মানুরাগীর অন্যতম প্রবীণ ও ধার্মিক আবু-বকর সমবেত গোত্র প্রধানদের কাছে আনুগত্যের শপথ (বাইআহ) গ্রহণ করলেন। ইসলামের শৈশবাবস্থায় যারা তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই আবু-বকর, উমার ইব্ন-আল-খাত্তাব ও আবু-উবাইদাহ্ ইব্ন-আল-জাররাহের মধ্যে সম্ভবত পূর্বনির্ধারিত কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শপথ-গ্রহণ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

উমার, উসমান ও আলী-সহ চার রক্ষণশীল (রশীদুন) খলিফার মধ্যে আবু-বকরের নামটিই ছিল তালিকার শীর্ষে। এটা ছিল এমন একটা অধ্যায় যখন পয়গম্বর মুহাম্মাদের জীবনের দীপ্তি খলিফাদের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপকে আলোকিত ও প্রভাবিত করে যাচ্ছিল। ওরা চারজনই ছিলেন মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ সহচর ও আত্মীয়, এদের মধ্যে একমাত্র

আলী তার রাজধানী হিসেবে আল-ইরাকের অন্তর্গত আল-কূফাকে বেছে নিয়েছিলেন, বাকী তিন খলিফা মুহাম্মাদের কার্যকালের শেষ কেন্দ্র আল-মাদীনাতেই বাস করতেন।

● আরব বিজয়

খলিফা আবু-বকরের সংক্ষিপ্ত শাসনকালের (৬৩২-৩৪ খ্রিঃ) অধিকাংশ সময়টাই তথাকথিত রিদদাহ্ (বিচ্ছিন্নতা, স্বধর্মত্যাগ) যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। আরব ইতিহাস রচয়িতাদের মতে, আল-হিজাজের বাইরে সমস্ত আরবটাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং মুহাম্মাদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আরব এই নতুন সংগঠিত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বেশ কয়েকজন স্থানীয় ও মেকী নবীকে অনুসরণ করতে শুরু করে। আসল ঘটনা হল, যোগাযোগের অভাবের দরুণ সংগঠিতভাবে প্রচারকার্য চালানো সম্ভব হয় নি। তিনি সময়ও পেয়েছিলেন খুব কম। তাই মুহাম্মাদের জীবদ্দশায় উপদ্বীপের এক-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ তাঁর শাসন বা ধর্ম মেনে নেয় নি। এমনকী তার কার্যকলাপের আশু প্রাণকেন্দ্র আল-হিজাজও তার মৃত্যুর এক বা দু'বছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যে সমস্ত প্রতিনিধি (উফূদ) তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসত তারা গোটা আরবের প্রতিনিধিত্ব করত না এবং সেযুগে কোন উপজাতীয় প্রধান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে গোটা উপজাতিটাই সেই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হ'ত।

আল-ইয়ামান, আল-ইয়ামামা ও উমানের এমন অনেক উপজাতিই আল-মদীনাকে জাকাহ্ দিতে অনিচ্ছুক ছিল। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তারা জাকাহ্ দিতে অস্বীকার করল। রাজধানী হিজাজের ক্রমবর্ধমান একাধিপত্যের প্রতি হিংসা ছিল এর অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ। আরবীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যরূপ প্রাচীন বহির্মুখী শক্তিগুলি আবার পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে উঠল।

বিচ্ছিন্নতাকামীদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস না-হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে[২] যাওয়ার ব্যাপারে আবু-বকর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই যুদ্ধগুলির নায়ক ছিলেন খালিদ ইব ন-আল-ওয়ালিদ। ছয় মাসের মধ্যেই সেনাপতি হিসেবে তার যুদ্ধকৌশলের কাছে মধ্য-আরবের উপজাতিগুলি আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। প্রথমে তিনি 'তায়ি' কুক্ষিগত করলেন, তারপর তিনি দখল করলেন আসাদ ও গাতফান উপজাতিগুলি। এই গাতফান-এর ধর্মপ্রচারক ছিলেন তালহা, মুসলিমরা ব্যঙ্গ করে তাকে 'তুলাইহা' নামে ডাকত। আল-ইয়ামামার বানু-হানিফা গোষ্ঠী মুসাইলামা নামের এক নবুওত দাবিকারীর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আরবের ইতিহাসে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল ব্যঙ্গপূর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি বস্তু হিসাবে। এই মুসাইলামা অত্যন্ত শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সম্ভবত বানু-তামিমের এক খ্রিস্টান মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তা ও দাবিকারিনী সাজাহ্-র সঙ্গে তিনি তার ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন এবং এই মহিলাকে তিনি পরে বিয়ে করেছিলেন। খালিদ তার তৃতীয় সেনাদল নিয়ে পৌঁছানোর

আগেই তিনি ৪০,০০০ সেনা নিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন ও দুটি মুসলিম সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এমনকী বিজয়ী তৃতীয় সেনাদলটির মধ্য থেকে খালিদ বেশ ভাল সংখ্যক কোরান মুখস্থকারীদের হারিয়েছিলেন এবং তার ফলে এই পবিত্র বইটির অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে চিরস্থায়ী করে রাখার কাজটি বিপন্ন হতে চলেছিল। এছাড়া আল-বাহরাইন, উমান, হাযরামাওত ও আল-ইয়ামানে বিভিন্ন মুসলিম সেনাপতিরা অভিযান চালিয়েছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সাফল্য[৩] অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে আল-ইয়ামানে ধর্মপ্রচারক হিসেবে আল-আসওয়াদ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। আরব ঐতিহাসিকদের মতে অধিকাংশ রিদদাহ্ যুদ্ধ যত না শক্তির সাহায্যে বিচ্ছিন্নতাকামীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে, যে সমস্ত মানুষ তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি তাদের ইসলামের পক্ষে টেনে আনার জন্যই তার চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে।

খালিদের তরবারির সহায়তায় আবু-বকরের নেতৃত্বে উপদ্বীপটি এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠল। বিশ্বজয়ের আগে আরবকে নিজের দেশটাকেই জয় করতে হবে। মুহাম্মাদের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে অভ্যন্তরীণ সামরিক অভিযানের ফলে যে-আরব একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল এবং তার ফলে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যে গতিবেগ দেখা গিয়েছিল তা তখন আত্মপ্রকাশের জন্য নতুন জায়গা খুঁজছিল এবং সংগঠিত যুদ্ধের নতুন কৌশল অন্য কোথাও প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে যে প্রেরণার সৃষ্টি হয় উপজাতিগুলির মধ্যকার তেমন প্রেরণা এখন একটা সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধে পরিণত হল এবং নিজেদের শক্তি প্রয়োগের জন্য নতুন জায়গা খুঁজতে লাগল।

প্রাচীন যুগের শেষের দিকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল টিউটনিকদের দেশত্যাগের ফলে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং আরবের বিজয়াভিযান যা পারস্য সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল ও বাইজানটাইন শাসনের ভিত্তি ধরে নাড়া দিয়েছিল। এই দুটি ঘটনার মধ্যে আরব বিজয় ও তার পরিণতিতে স্পেন দখলের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সূচনা হয়।[৪] একদা বর্বর ও অখ্যাত আরব দেশ থেকে অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটবে, ওই যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুই ক্ষমতাধর শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে, সাসানিয় দখল ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সুন্দরতম নগরীটি দখল করবে—খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের প্রথম তিনটি দশকে কেউ যদি এমন কথা বলার দুঃসাহস দেখাত তবে তাকে নিঃসন্দেহে একটি বদ্ধ পাগল বলে আখ্যা দেওয়া হত। কিন্তু বাস্তবে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটেছিল। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পরে অনুর্বর আরবের মাটি যেন যাদুস্পর্শে এমন সমস্ত বীর নায়কদের পরিপোষণ কেন্দ্রে পরিণত হল, সংখ্যা ও গুণের বিচারে যাদের সমতুল্য আর কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। আল-ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও মিশরে যে সমস্ত সামরিক অভিযান খালিদ ইব ন-আল-ওয়ালিদ ও আমর ইব ন-আল-আস সংগঠিত করেছিলেন, যেগুলিকে যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিপুণতার সঙ্গে সংগঠিত যুদ্ধগুলির অন্যতম বলে আখ্যা দেওয়া যায় এবং নেপোলিয়ন, হানিবল বা আলেকজান্দারের যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়।

পরস্পরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বহু বছর ধরে পরিচালিত বাইজানটাইন ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাসানিয়-এর মধ্যকার মারাত্মক যুদ্ধের পরিণতিতে উদ্ভূত তাদের দুর্বল অবস্থা, যুদ্ধজনিত আর্থিক ক্ষতির পরে উভয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের ওপর চড়া হারে আরোপিত কর এবং তার পরিণতিতে রাজপ্রশাসনের প্রতি প্রজাদের আনুগত্যে চিড় ধরা, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া বিশেষত তাদের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে আরবীয় উপজাতিগুলির বসবাস, খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে সিরিয়া ও মিশরে মনোফাইসাইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং আল-ইরাক ও পারস্যে নেস্টোরিয়ানদের সমাবেশ ও সর্বোপরি রক্ষণশীল গির্জার পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে সংগঠিত ব্যাপক নির্যাতন ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে আরবীয় সেনাবাহিনীর বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল। বাইজানটাইনের শাসকেরা সীমান্তের দুর্গগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। প্রাচীন মোয়াব-এর অন্তর্গত মুতাহ্ নামক স্থানে মুহাম্মাদের পাঠানো সেনাদের পরাজিত করার পর (সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিঃ) হেরাক্লিয়াস অনুদান দেওয়া বন্ধ করে ছিলেন। ডেড সী-র দক্ষিণ প্রান্তের এবং মদীনা-গাজ্জা রুটের সিরীয়-আরব উপজাতিরা অবশ্য নিয়মিত এই অনুদান পেত।[৫] সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দেশিয় সেমাইটরা এবং মিশরের হেমাইটরা আরবীয় আগন্তুকদের ঘৃণিত ও অত্যাচারী বিদেশি যুদ্ধবাজদের তুলনায় আত্মীয়ের আত্মীয় বলে গণ্য করত। বাস্তবে মুসলিম বিজয়কে প্রাচ্যের নিকটবর্তী পুরানো দেশগুলির দ্বারা তাদের আগের রাজত্ব ফিরে পাওয়া বলে গণ্য করা যেতে পারে। ইসলামের প্রভাবে প্রাচ্য আবার জেগে উঠল এবং হাজার বছর ধরে পশ্চিমি দুনিয়ার কর্তৃত্বের পর প্রাচ্য আবার নিজেদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। পুরানো শাসকদের তুলনায় এই নতুন শাসকেরা জোর করে যে কর আদায় করত, তার পরিমাণ ছিল অনেক কম। আর বিজিত প্রজারা তাদের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আরবীয়রা নিজেরাই উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ এক সতেজ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করত; নতুন ধর্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে জয় করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যু সম্পর্কে এক ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য পশ্চিম-এশিয়া ও উত্তর-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ সমভূমিতে নতুন সামরিক কৌশল, অর্থাৎ অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী বাহিনীর ব্যবহার আপাত অর্থে তাদের বিস্ময়কর সাফল্যের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। রোমানরা অবশ্য এ ব্যাপারে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করতে পারেনি।

● সম্প্রসারণের অর্থনৈতিক কারণ

আরবীয় রচনাগুলিতে ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে যাজক সম্প্রদায়ের যে ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, তা এই আন্দোলনকে মূলত একটি ধর্মীয় আন্দোলন বলে গণ্য করেছে এবং এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক কারণকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। আরবীয় মুসলিমরা একহাতে কোরান ও অন্যহাতে তরবারি নিয়ে উৎসর্গীকৃত ছিল বলে ওই সময়কার

বহু খ্রিস্টান যে-ধারণা পোষণ করত, তা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। আরব উপদ্বীপের বাইরে এবং বিশেষত-আহ্ল আল-কিতাব (খ্রিস্টান ও ইহুদি)-এর উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, কোরান ও তরবারির সঙ্গে সঙ্গে বিজিত এলাকা থেকে কর সংগ্রহেও বিজয়ীদের দৃষ্টি থাকত সমান সজাগ।

"যুদ্ধ করো— যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জি'য়্য়া দেয়।"[৬] বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তৃতীয় পছন্দসই বিষয় অর্থাৎ কর প্রদানের সুযোগটি জরথুস্ত্রীয় এবং ধর্মবিশ্বাসহীন বার্বার ও তুর্কিদের দেওয়া হয়েছিল। এদের সকলের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আদর্শের পরিবর্তে আশু প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইসলাম একটি নতুন সিংহনাদ, সুবিধাজনক ঐক্যবিন্দু ও সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্যের সৃষ্টি করেছিল। আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি এমন সমস্ত বিভিন্ন ধরনের শক্তির সংহতি ও ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এরাই এর চালিকা-শক্তির একটি বিরাট অংশ সরবরাহ করেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র এর দ্বারাই মুসলিম বিজয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মোন্মত্ততার পরিবর্তে অর্থনৈতিক প্রয়োজনবোধের দ্বারাই বেদুইনরা পরিচালিত হত। আর মুসলিমদের বিজয়ী সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেনাই নিযুক্ত হয়েছিল এই বেদুইনদের মধ্য থেকে। এর ফলে তারা তাদের শুষ্ক বা অনুর্বর আশ্রয়স্থল থেকে উত্তরের সুন্দর দেশগুলোতে পাড়ি দিয়েছিল। এক্ষেত্রে কারো কারো মনে পরবর্তী জীবনে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা কাজ করলেও অনেকের মনে আবার উর্বর তুরস্কের সভ্য অঞ্চলগুলির উন্নত জীবনের আরাম ও বিলাস ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সেটানি[৭] বেকার[৮] ও অন্যান্য আধুনিক বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষকরা মুসলিম বিজয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিকে এভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। পুরানো দিনের আরবীয় ইতিহাস-রচয়িতারা সম্পূর্ণরূপে সেই চিন্তাকে অবহেলা করেননি। মুসলিম বিজয়ের ইতিহাসকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণ আল-বালাযুরি ঘোষণা করেছিলেন, সিরিয়ায় সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে সেনাদলে নিয়োগের জন্য আবু-বকর "মক্কা, আল-তাঈফ, আল-ইয়ামান এবং নাজদ ও আল-হিজাজের সমস্ত আরবদের উদ্দেশে চিঠি লিখে তাদের এই 'পবিত্র যুদ্ধে' অংশ নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই যুদ্ধের জন্য এবং গ্রিকদের[৯] কাছ থেকে লুঠের মালের ভাগ পাবার জন্য তাদের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন।" আরব আগ্রাসনের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে রুস্তম নামে যে-পারসীয় জেনারেল প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি মুসলিম দূতের কাছে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন : "আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা যে কাজটি করছ তা আর অন্য কিছুর জন্য নয়, কেবলমাত্র দারিদ্র্য ও জীবন ধারণের জন্যই তা করতে বাধ্য হয়েছ।"[১০] আবু-তাম্মাম[১১] তার রচিত হামাসা-র একটি কবিতায় চাঁছাছোলা ভাষায় গোটা ঘটনাটিকে তুলে ধরেছেন :

না, স্বর্গলাভের আকাঙক্ষায় তোমরা যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করনি
বরং, আমি বিশ্বাস করি, তোমরা তা করেছ রুটি ও খেজুরের জন্য।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বুঝতে পারা যায়, ইসলামি সম্প্রসারণ আসলে অনুর্বর মরুভূমি থেকে দেশান্তরী সেমিটিকদের শেষ আশ্রয়স্থল সংলগ্ন উর্বর তুরস্কে মুসলিম অনুপ্রবেশের যুগব্যাপী প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপ মাত্র।

যে সমস্ত ইতিহাস-রচয়িতা মুসলিম বিজয়কে তার পরবর্তী ঘটনাগুলির নিরিখে বিচার করেছেন, তাদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম দিককার খলিফাদের বিচক্ষণতার ফলে, বিশেষত আবু-বকর ও উমারের পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সামরিক অভিযানগুলি সংগঠিত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে এমন বড় ঘটনার কথা খুব অল্পই জানা যায়, যেখানে এই ঘটনা সৃষ্টির নায়কেরা আগে থেকেই ঘটনাগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশ ও পরিণতির প্রক্রিয়া দেখতে পান। এই সমস্ত সামরিক অভিযানগুলি আদৌ ঠাণ্ডা মাথায় রচিত কোন ইচ্ছাধীন পরিকল্পনার ফল ছিল না। নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ নিষিদ্ধ হবার পর উপজাতিগুলির যুদ্ধাকাঙক্ষাকে তৃপ্ত করার নতুন কৌশল হিসেবেই এই সামরিক অভিযানগুলি সংগঠিত হয়েছিল। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল লুঠপাট, স্থায়ী আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার কোন লক্ষ্য এর ছিল না। যুদ্ধবাজরা একটার পর একটা যুদ্ধ জেতার ফলে সামরিক অভিযানের গতি বৃদ্ধি পেল। তারপরই সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু হল এবং তার পরিণতিতে আরব সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। সুতরাং বলা যায়, সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন পূর্ব-পরিকল্পনার তুলনায় সহসা উদ্ভূত পরিস্থিতিকেই আরব সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে বেশি দায়ী করা যায়।

হিব্রুদের ইতিহাস সংক্রান্ত ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাখ্যা, খ্রিস্টানদের ইতিহাস সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় দর্শনের অনুরূপ ইসলামের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত যাজকীয় বা ধর্মীয় তত্ত্বগত ব্যাখ্যায় একে ঈশ্বরের করুণা বলে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার দার্শনিক ভিত্তিটিকে ভুল বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ইসলাম শব্দটিকে তিনভাবে ব্যবহার করা যায় : প্রথমে ধর্ম, পরে রাষ্ট্র ও সর্বশেষে সংস্কৃতি রূপে। ইহুদি ধর্ম ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ইসলামধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের মতো জঙ্গী ও সেবামূলক আদর্শে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এই ধর্মের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। যে ইসলাম উত্তরাঞ্চলগুলিকে দখল করেছিল তা ইসলাম ধর্ম ছিল না। তা ছিল ইসলামি রাষ্ট্র। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আরবীয়রা ধর্মভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইসলাম ধর্ম নয়, বরং প্রথমে জয়লাভ করেছিল আরবীয়ত্ববোধ। মুসলিম যুগের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকের আগে সিরিয়া মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের অধিকাংশ লোকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। এই অঞ্চলগুলিতে সামরিক বিজয় এবং এখানকার মানুষদের ধর্মান্তরকরণের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময়ের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রথমে তারা মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্থাৎ করের হাত থেকে

অব্যাহতি ও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করার লক্ষ্যেই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সামরিক বিজয়ের পরে পূর্বেকার সিরীয়-আরামিয়, পারসীয় ও হেলেনিস্টিক সভ্যতার ঐতিহ্য ও নির্যাসের সমন্বয়ে গঠিত সমাজের স্তরে স্তরে ইসলাম একটি সংস্কৃতি হিসেবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ইসলামের অগ্রগতির মাধ্যমে প্রাচ্যের নিকটস্থ দেশগুলি শুধু তাদের পূর্বেকার রাজনৈতিক আধিপত্যকেই পুনরায় দখল করেনি, তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগতের প্রাচীন বৌদ্ধিক খ্যাতিও পুনরায় অর্জন করতে পেরেছিল। ❑

● টীকা ●

১ ১২ পাতা।
২ বালাযুরি, ৯৪ পাতা, ১.১৪=হিট্টি, ১৪৩ পাতা, ১.২৩।
৩ বালাযুরি, ৯৪-১০৭ পাতা = হিট্টি, ১৪৩-৬২ পাতা দ্রষ্টব্য।
৪ হেনরি পিরেন, মাহমেট এট শার্লিমান, ৭ম সংস্করণ (ব্রাসেলস, ১৯৩৫)।
৫ থিওফানিস, ৩৩৫-৩৬ পাতা।
৬ সূরাহ্ ৯:২৯।
৭ আন্নালি, ২য় খণ্ড, ৮৩১-৬১ পাতা।
৮ কেমব্রিজ মিডাইভাল হিস্টোরি (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৩), ২য় খণ্ড, ১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৯ ফুতূহ্, ১০৭ পাতা = হিট্টি, ১৬৫ পাতা।
১০ বালাযুরি, ২৫৬-৫৭ পাতা = হিট্টি, ৪১১-১২ পাতা।
১১ ৭৯৫ পাতা।

॥ অধ্যায় ১২ ॥

সিরিয়া বিজয়

খ্রিস্টিয় দুনিয়ার নতুন প্রবক্তা ও প্রাচ্যের খ্রিস্টান সামাজ্যের একতার পুনরুদ্ধারকারী হেরাক্লিয়াস যে সময়ে পারসিয়দের কাছ থেকে পুনরায় দখল করে নেওয়া জেরুসালেমে প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের[১] পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিলেন, জর্ডনের অপর পারে একদল আরব তার সেনাদলকে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু বিন্দুমাত্র কষ্ট না করেই তাদের উপযুক্ত ভাবেই মোকাবিলা করা হয়। ডেড সী-র সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের পূর্বদিকে অবস্থিত মুতাহ্‌তে এই সংঘর্ষ ঘটেছিল। মুহাম্মাদের দত্তকপুত্র জাইদ ইব্‌ন-হারিসা ছিলেন এই আরবদের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে ৩০০০ আরব[২] এই ঠিক সেই সময়েই আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। জাইদ এই সংঘর্ষে প্রাণ হারান এবং নতুন ধর্মান্তরিত খালিদ ইব ন-আল-ওয়ালিদের নেতৃত্বে বিপর্যস্ত সেনাদলের অবশিষ্টাংশ আল-মদীনাতে ফিরে যায়। বাসরা-র ক্ষমতাসীন গাসসানীয় রাজার কাছে প্রেরিত মুহাম্মাদের দূত শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার আপাত উদ্দেশ্যেই তারা হঠাৎ এই আক্রমণ চালিয়েছিল। আর এই আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুতাহ্ ও সংলগ্ন শহরগুলিতে প্রস্তুত মাশরাফিয়া[৩] তরবারি সংগ্রহ করা, যাতে আসন্ন মক্কা আক্রমণের সময় সেগুলিকে ব্যবহার করা যায়। এই সংঘর্ষটিকে আরও পাঁচটি সাধারণ আক্রমণের অন্যতম বলে স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল, কারণ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরেই এই সব ঘটনার সঙ্গে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিল সেই যুদ্ধের শুরু। উদ্ধত বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ইসলামের পরবর্তী বীরদের করায়ত্ত (১৪৫৩) হওয়া এবং খ্রিস্টিয় দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর গির্জা সেন্ট সোফিয়া-র দেয়ালে যীশুখ্রিস্টের পরিবর্তে মুহাম্মাদের নাম খোদাই না হওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনি।

মুতাহ্-র সংঘর্ষের ঘটনাটি ছিল মুহাম্মাদের জীবৎকালে সিরিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র সামরিক অভিযানের ঘটনা। পরের বছরে তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তাবুক[৪] অভিযান (হিজরী সন ৯/৬৩০) ছিল রক্তপাতহীন। যদিও এই অভিযানে তাঁরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বেশ কয়েকটি মরূদ্যান দখল করে নিয়েছিলেন।

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে রিদ্দাহ[৫] যুদ্ধগুলির শেষে যথাক্রমে আমর ইব-ন-আল-আস, ইয়াজিদ ইব ন-আবি-সুফয়ান ও শুরাহবিল ইব ন-হাসানা'র নেতৃত্বে প্রতিটি ৩০০০ সেনার মোট তিনটি সেনাবাহিনী উত্তর দিকে এগিয়ে চলল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সিরিয়ায় আক্রমণ শুরু

করল। তার ভাই ও ভাবীকালে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া ছিলেন ইয়াজিদের সুযোগ্য উত্তরসূরি। ইয়াজিদ ও শুরাহবিল দুজনে সরাসরি তাবুক-মা'ন সড়কপথে এগিয়ে চললেন এবং সম্মিলিত সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে যিনি সেনাপতি হতেন সেই আমর এগিয়ে চললেন আইলা হয়ে উপকূলবর্তী পথ ধরে। পরবর্তীকালে প্রতিটি সেনাদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৭,৫০০। শীঘ্রই যার সর্বাধিনায়ক হবার কথা ছিল, সেই আবু-উবাইদাহ্ ইব ন-আল-জাররাহ্ সম্ভবত বাড়তি সেনাদের শক্তিতে বলীয়ান একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আল-মদীনা থেকে দামাস্কাস পর্যন্ত যান চলাচলের উপযোগী পুরানো পথটি, অর্থাৎ—যে পথ তীর্থযাত্রীরা অনুসরণ করত, সেই বিখ্যাত পথটি ধরেই তিনি এগিয়ে চললেন।

ডেড সী-র দক্ষিণে অবস্থিত ওয়াদি আল-আরাবা নামে এক বিরাট নিম্নভূমিতে সংঘটিত প্রথম সংঘর্ষে প্যালেস্টাইনের সার্জিয়াস দি প্যাট্রিসিয়ানকে পরাজিত করে ইয়াজিদ জয়লাভ করেন। তার মূল কেন্দ্র ছিল সিজারিয়া (কাইসারিয়া)-তে। গাজ্জায় তাঁদের ফেরার পথে সার্জিয়াসের নেতৃত্বাধীন অবশিষ্ট আরও কয়েক হাজার বাইজানটাইন সেনার ওপর তাঁরা অতর্কিতে চড়াও হল এবং প্রায় সকলকেই হত্যা করেন (৪ ফেব্রুয়ারি, ৬৩৪)। অন্যান্য জায়গায় বাইজানটাইন সেনারা অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল এবং মুসলিম আক্রমণকারীরা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হল। হেরাক্লিয়াসের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি ছিল এডেসা (আল-রুহা)। তিনি ছ'বছর ধরে সামরিক অভিযান চালিয়ে সিরিয়া ও মিশর থেকে পারসিয়দের বিতাড়িত করেছিলেন এবং এমেসা (হিমস্) থেকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে একটি নতুন সেনাদল গঠন করলেন ও তার ভাই থিওডোরাস-এর নেতৃত্বে সেই নতুন সেনাদলটিকে দক্ষিণ অভিমুখে পাঠালেন।

'আল্লাহ্‌র তরবারি' বলে খ্যাত খালিদ ইব-ন-আল-ওয়ালিদ[৬] তখন ৫০০ প্রবীণ রিদ্‌দাহ যোদ্ধা নিয়ে পারস্য সীমান্তে বসবাসকারী বাকর ইবন-ওয়ায়িল-এর উপজাতীয় গোষ্ঠী বানূ-শাইবানের সহযোগিতায় আল-ইরাকে সামরিক অভিযান চালাচ্ছিলেন। আবু-বকর তাকে দ্রুত সিরিয়ায় গিয়ে তার সহ-জেনারেলদের সাহায্য করতে বললেন। যদিও এটি একটি তুচ্ছ ঘটনা এবং সম্ভবত খলিফাকে না-জানিয়েই এটা করা হয়েছিল, ক্রমানুক্রমিকতার দিক থেকে মুসলিম সামরিক অভিযানের শুরুতেই আল-ইরাকের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। কিন্তু আল-মদীনা ও আল-হিজাজের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, প্রতিবেশী সিরিয়াই ছিল তাদের উদ্বেগের মূল কেন্দ্রবিন্দু। আবু-বকর তার আদেশ জারি করার আগে আল-ইরাকে আল-হিরা ৬০,০০০ দিরহামের বিনিময়ে খালিদ এবং তার বন্ধু শাইবান বেদুইন উপজাতির প্রধান আল-মুসান্না ইব ন-হারিসার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। উপদ্বীপের বাইরে আল-ইরাক সহ আরব অধ্যুষিত ছোট ছোট খ্রিস্টান রাজ্যগুলি সর্বপ্রথম ইসলাম অনুরাগীদের করায়ত্ত হয়েছিল এবং প্রথম পারসিকদের হস্তচ্যুত হয়েছিল। সিরিয়া অভিমুখে বিখ্যাত অভিযানটি শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আল-কুফার উত্তর-পশ্চিম দিকে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত আইন আল-তামর নামে দুর্গবেষ্টিত একটি জায়গাও তাদের করায়ত্ত হয়েছিল।

AL-JAZIRAH PROVINCE
ADHARBAYJĀN PROVINCE
AL-JIBĀL PROVINCE
AL-'IRĀQ PROVINCE
KHŪZISTĀN PROVINCE
PROVINCE OF FĀRIS
THE GREAT
Tigris River (Dijlah)
Euphrates River (Al-Furāt)
Baghdād
THE SYRO-MESOPOTAMIAN DESERT
PERSIA
SIND
EGYPT

AL-JAZĪRAH PROVINCE
ĀDHARBAYJĀN PROVINCE
Al-Mawṣil (Mosul)
Tigris River (Dijlah)
Euphrates River (Al-Furāt)
Sāmarrā
Al-Qādisīyah
Ḥulwān
Nahrawān
Baghdād
Ctesiphon
Al-Anbār
Hīt
AL-'IRĀQ PROVINCE
Karbalā'
'Ayn al-Tamr
Al-Ḥīrah
Al-Kūfah
Al-Najaf
Wāsiṭ
Al-Baṣrah
Al-Sūs
Tustar
Al-Ahwāz
KHŪZISTĀN PROVINCE
PROVINCE OF FĀRIS
THE GREAT SWAMP
AL-JIBĀL PROVINCE
CASPIAN SEA
BLACK SEA
ARMENIA
CILICIA
KHURĀSĀN
PERSIA
AL-JIBĀL
FĀRIS
KARMĀN
MUKRĀN
SIND
EGYPT
NAJD
ARABIA
AL-ḤIJĀZ
Al-Madīnah
Makkah
'UMĀN
THE SYRO-MESOPOTAMIAN DESERT
Showing Khālid's conjectured route
AL-NUFŪD
Dūmat al-Jandal
Scale of English Miles

● খালিদের বিপজ্জনক অভিযান

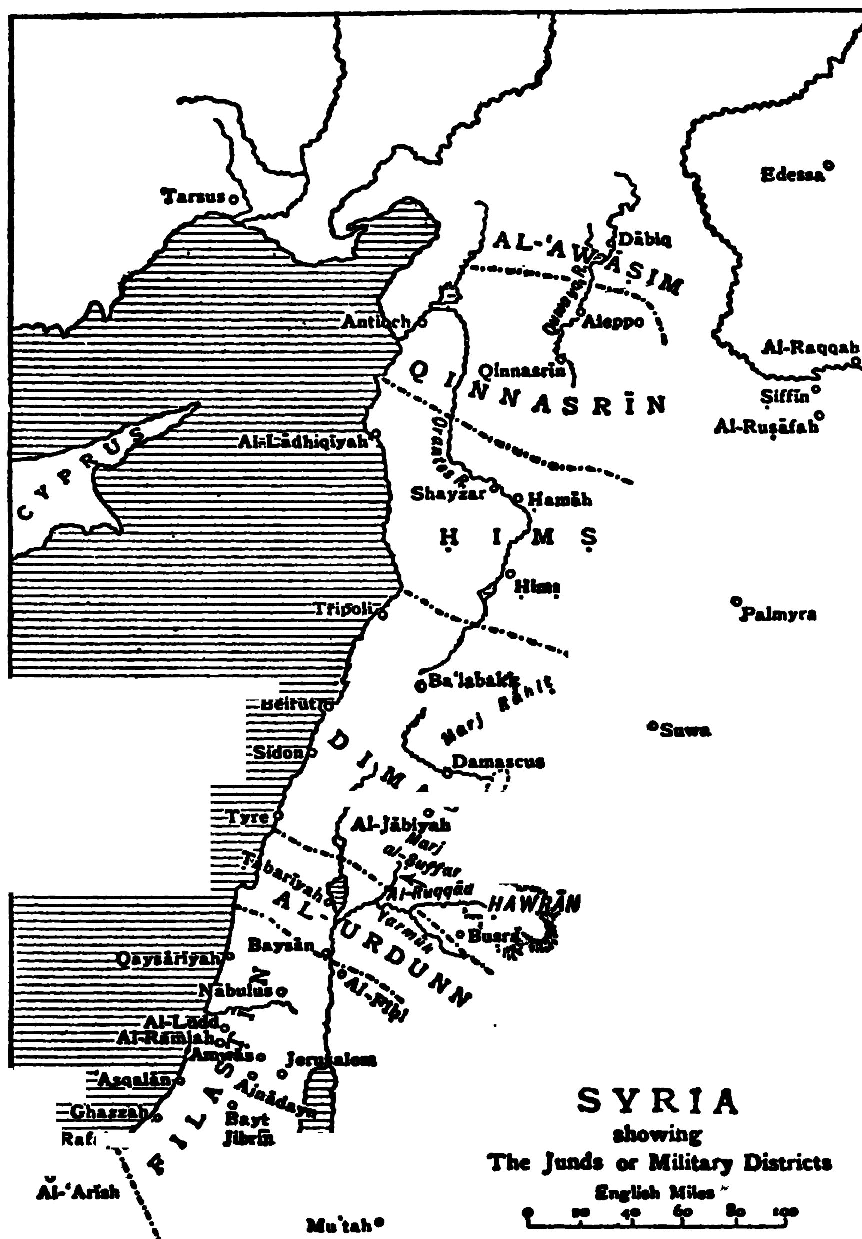
মরুভূমির মধ্য দিয়ে খালিদের অভিযানের ফলে অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। কারণ বিভিন্ন লেখক এই অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভিন্ন পথ ও পরস্পর বিরোধী দিনের[৭] উল্লেখ করেছেন। এই অভিযান সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণগুলি[৮] ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে-তথ্য পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় যে, তার অভিযান সম্ভবত আল-হিরা (মার্চ ৬৩৪) থেকে শুরু হয়েছিল এবং মরুভূমির মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে দুমাত[৯] আল-জান্দাল (বর্তমান আল-জাওফ)-এর মরূদ্যানে পৌঁছেছিল। আল-ইরাক থেকে সিরিয়া যাবার সহজতম রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় মরূদ্যানটি অবস্থিত। এক সময় দুমাহ্ থেকে তিনি ওয়াদি আল-সিরহান (প্রাচীন বাত্‌ন আল-সির)-এর মধ্য দিয়ে সিরিয়ায় ঢোকার প্রথম প্রবেশদ্বার ব্‌ুসরা-র দিকে এগিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু পথিমধ্যে ছিল একটি দুর্গ। সেই কারণে ওয়াদি সিরহান-এর পূর্ব সীমানায় অবস্থিত কুরাকির[১০]-এ যাবার জন্য দুমাহ্ থেকে উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উত্তরের রাস্তা ধরে সিরিয়ার দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার সুয়া[১১]-তে পৌঁছালেন। সুয়া-তে যাবার জন্য প্রায় জলশূন্য মরুপথে তাদের পাঁচ দিন ধরে চলতে হয়েছিল। তা'ঈ উপজাতির জনৈক রাফী ইব্‌ন-উমাইর ছিলেন তাদের পথপ্রদর্শক। সেনাদের জন্য চামড়ার থলেতে করে জল বহন করা হয়েছিল; খাবার জন্য যে সমস্ত বুড়ো উটকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের কুঁজগুলোকে ঘোড়াদের জলাধার[১২] হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে পাঁচশো থেকে আটশো সেনা উটের পিঠে চড়ে চলেছিল, আর মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় ব্যবহার করার জন্য অল্প কিছু ঘোড়াকে পাশাপাশি হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একটি জায়গায় বালিতে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের আলো এমনভাবে রাফীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি জলের উৎসের প্রত্যাশিত চিহ্ন দেখতে পাননি। তাই তিনি তার সহগামীদের কাছে ছোট গাছবিশেষ (আওসাজ) খুঁজে দেখার জন্য কাতর মিনতি জানিয়েছিলেন। তার কাছাকাছি জায়গাটি যে মুহূর্তে তারা খুঁড়ল, ভিজে বালির ওপর আঘাত করল তখনই সেখান থেকে জলের ধারা বেরিয়ে এল ও তৃষ্ণার্ত সেনাবাহিনীর পিপাসা মিটিয়ে দিল।

নাটকীয় আকস্মিকতার সঙ্গে খালিদ আবির্ভূত হলেন দামাস্কাস (দিমাশ্‌ক)-এর সংলগ্ন অঞ্চলে এবং মাত্র ১৮ দিন ধরে এগিয়ে চলার পর বাইজানটাইন সেনাদলের মুখোমুখি হলেন। এরপর লুঠপাট চালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সামরিক অভিযান শুরু করলেন। এমনই এক অভিযানের সময়ে মারজ রাহিত[১৩]-এ তিনি ইস্টার সানডেতে গাস্‌সানের খ্রিস্টান বাহিনীর মুখোমুখি হলেন এবং তাদের পরাজিত করলেন। তারপর বাসরার (এস্কি-শাম অথবা প্রাচীন দামাস্কাস) উদ্দেশ্যে খালিদ তার বিজয় অভিযান চালনা করলেন। এখানে

তিনি অন্যান্য আরবীয় শক্তির সঙ্গে মিত্রতা করতে সফল হলেন এবং এর ফলে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই আজানাদাইন[১৪] প্রান্তরের তুমুল যুদ্ধে বিজয়ী হন। সমগ্র প্যালেস্টাইনের দরজা তাদের সামনে খুলে গেল। আরবীয় বাহিনীকে সম্মিলিত করার পর খালিদ হন তার সর্বাধিনায়ক। তখন থেকে শুরু হল সুসংগঠিত অভিযান। সামান্য প্রতিরোধের পরই অন্যতম গাস্‌সানী রাজ্য বাসরার পতন ঘটে। ফিহ্‌ল (অথবা ফাহ্‌ল, গ্রিক, পেল্লা), জর্ডনের পূর্ব প্রান্ত এবং তার পারাপারের জায়গা ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তাদের অধীনে চলে আসে। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি মারজ আল-সফর[১৫] নামে একটি জায়গায় শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার পর সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে যাবার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে গেল। দু'সপ্তাহ পরে খালিদ লোককথায় পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর বলে পরিগণিত দামাস্কাসের প্রবেশদ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কথিত আছে যে, পলায়নের ওই স্মরণীয় রাতে জন পলকে একটি ঝুড়ির মধ্যে করে ওই নগরীর প্রাচীরের ওপর থেকে নামানো হয়েছিল। ছ'মাস অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর অসামরিক ও যাজকীয় কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দামাস্কাস নগরী যেটি খুব দ্রুতই ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আত্মসমর্পণ করল। বিখ্যাত সেন্ট জনের পিতাও ছিলেন এই বিশ্বাসঘাতকদের দলে। উমাইয়া আমল সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারব। বাইজানটাইন সেনাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবার পর দামাস্কাসের অসামরিক মানুষজন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। দামাস্কাসের আত্মসমর্পণের শর্তগুলিই পরবর্তীকালে অবশিষ্ট সিরীয়-প্যালেস্টিনীয় শহরগুলির সঙ্গে ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হয়েছিল। শর্তগুলি হল এইরকম—

'পরম দয়ালু করুণাময়, আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। এগুলি হল সেই অধিকার খালিদ ইব-ন-আল-ওয়ালিদ যেগুলি দামাস্কাসের মানুষদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যদি তিনি সেই শহরে প্রবেশ করেন : তিনি তাদের জীবন, সম্পত্তি ও চার্চের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তাদের নগরীর প্রাচীর ধ্বংস করা হবে না, অথবা তাদের বাড়িতে কোন মুসলিমকে জোর করে বাস করতে দেওয়া হবে না। আল্লাহ্‌র চুক্তি ও তাঁর প্রেরিত বার্তাবহ, খলিফা ও ধর্মবিশ্বাসীদের নিরাপত্তার সুযোগ তাদের দেওয়া হবে। সুতরাং যতদিন তারা মাথাপিছু ধার্য কর দিয়ে যাবে, ততদিন ভাল ছাড়া তাদের মন্দ হবে না।'[১৬]

মাথাপিছু করের পরিমাণ ছিল ১ দিনার ও ১ জারিব (গমের পরিমাপ) উমার ইব-ন-আল-খাত্তাব পরে এই মাথাপিছু করের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বায়ালাবাক, হিমস্‌, হামাহ্‌ (এপিফ্যানিয়া) ও অন্যান্য শহরগুলির একের পর এক পতন হল। বিজয়ার্থে অগ্রসরমান বাহিনীর সামনে কোন বাধাই আর রইল না। "খঞ্জনীবাদক ও গায়কদের সঙ্গে নিয়ে শেজার (লারিসা)-এর জনসাধারণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তার বশ্যতা মেনে নিল।"[১৭]


Tarsus
Edessa
Dābiq
AL-'AWĀSIM
Antioch
Aleppo
Al-Raqqah
Qinnasrīn
QINNASRĪN
Ṣiffīn
Al-Ruṣāfah
CYPRUS
Al-Lādhiqīyah
Shayzar
Hamāh
ḤIMṢ
Ḥimṣ
Tripoli
Palmyra
Ba'labakk
Marj Rāhiṭ
Beirut
Suwa
Sidon
Damascus
Tyre
Al-Jābiyah
Marj al-Ṣuffar
Ṭabarīyah
Al-Ruqqād
HAWRĀN
AL-URDUNN
Yarmūk
Buṣra
Baysān
Qaysārīyah
Fiḥl
Nābulus
Al-Ludd
Al-Ramlah
Amwās
Jerusalem
'Asqalān
Ajnādayn
Ghazzah
Bayt Jibrīn
Al-'Arīsh
Mu'tah
SYRIA
showing
The Junds or Military Districts
English Miles
0 20 40 60 80 100

● ইয়ারমুক-এর চূড়ান্ত লড়াই

হেরাক্লিয়াস ইতিমধ্যে তার ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে ৫০.০০০ সেনার একটি বাহিনী আবার গড়ে তুলেছিলেন এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খালিদ সাময়িকভাবে হিমস্, এমনকী দামাস্কাস ও রণকৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শহর পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন এবং জর্ডনের পূর্ব দিকের করদ রাজ্য ইয়ারমুক[১৮] উপত্যকায় ২৫,০০০ সেনাকে[১৯] জড় করেছিলেন। মাসাধিককাল ধরে ছোটখাটো লড়াই চলার পর পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং আরব সেনাপতির দ্বারা সুচতুরভাবে নির্ধারিত এই জায়গাটিতে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট বাতাসে ওড়া ধুলোয়[২০] আচ্ছন্ন একটি গরমের দিনে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হল। মরুসন্তানদের প্রবল আক্রমণের সামনে যাজকদের প্রার্থনা ও মন্ত্রোচ্চারণ এবং ক্রসচিহ্নের[২১] উপস্থিতি সত্ত্বেও বাইজানটাইন সেনাদের প্রচেষ্টা কোন কাজেই এল না। বাইজানটাইন সেনা এবং তাদের সহযোগী আর্মেনিয়ান ও আরবীয় ভাড়াটে সেনাদলের যে সমস্ত সেনাদের ঘটনাস্থলে হত্যা করা হয়নি তাদের ক্রমাগত তাড়া করে নদীর গভীর খাতে ও রুককাদ উপত্যকায় ঠেলে দেওয়া হল। আর যারা নদী পেরিয়ে পালাতে সফল হয়েছিল তাদের অপর পারে হত্যা করা হল। থিওডোরাস যুদ্ধে মারা গেলেন এবং তার নেতৃত্বাধীন রাজকীয় বাহিনী এক পলায়নপর সন্ত্রস্ত জনতায় পরিণত হল। সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। সুন্দরতম নগরীগুলির অন্যতম সিরিয়া চিরকালের জন্য প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। "শুভবিদায় সিরিয়া এবং শত্রুপক্ষের জন্য কি সুন্দর দেশ!"[২২]—এটাই ছিল হেরাক্লিয়াসের বিদায় সম্ভাষণ।

এবার এল প্রশাসক বা শান্তিস্থাপকের পালা। মনে হয়, খালিদের বিরুদ্ধে উমারের কিছু ব্যক্তিগত অসন্তোষ ছিল। তাই তার পরিবর্তে উমার অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবা, মদীনার ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠীর সদস্য ও সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বাহিনীর নেতা আবু-উবাইদাকে গভর্নর-জেনারেল ও খলিফার প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করেছিলেন। খালিদ যখন উত্তর অভিমুখে যাত্রা করলেন, আবু-উবাইদাহ তার সঙ্গী হলেন। সিরিয়ার প্রাকৃতিক সীমানা তরাস পর্বতমালার কাছে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত আরবীয় সেনাবাহিনীকে আর কোন বাধার মুখে পড়তে হল না এবং পূর্বে অধিকৃত শহরগুলি ফিরে পেতেও কোন অসুবিধা হল না। "যে অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যে আমরা বাস করছি তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচার আমরা অনেক বেশি পছন্দ করি"[২৩]—হিম্স্-এর মানুষের এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে নতুন বিজয়ী শাসকদের প্রতি দেশীয় সিরিয়াবাসীদের মানসিকতার একটা স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। অ্যান্টিয়োক, আলেপ্পো ও উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শহরগুলি শীঘ্রই তাদের জয়ের তালিকায় যুক্ত হল। কেবলমাত্র কিননাসরিন (কার্লসিস) শহরটিকে সহজে বশ্যতা স্বীকার করানো যায়নি। দক্ষিণে গ্রিক সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট কেবলমাত্র জেরুসালেম ও সিজারিয়া আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল—৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেরুসালেম

এবং ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত সিজারিয়া তাদের নগরীর দরজা বন্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সমুদ্রপথে সিজারিয়া সাহায্য পেয়েছিল, সেটা আটকানোর উপায় আরবদের ছিল না। কিন্তু সাত বছর ধরে মাঝে মাঝেই আক্রমণ ও অবরোধ চলার পর তাদের নগরীর অধিবাসী এক ইহুদির বিশ্বাসঘাতকতায় ও সাহায্যপুষ্ট মু'আবিয়ার আক্রমণের ফলে এই শহরটির পতন হয়। ৬৩৩ থেকে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত গোটা সিরিয়ার পতন ঘটে।

সিরিয়ায় এই 'সহজ জয়ের'[২৬] পিছনে বিশেষ কারণ আছে। আলেকজান্ডারের সিরিয়া জয়ের পর থেকে (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২) এখানে গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল ভাসা ভাসা এবং তাও কেবলমাত্র শহুরে মানুষদের স্পর্শ করেছিল। কিন্তু গ্রামীণ মানুষ সর্বদাই তাদের ও শাসকদের মধ্যকার সংস্কৃতিগত ও জাতিগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। সিরিয়ার সেমিটিক জনসাধারণ ও গ্রিক শাসকদের মধ্যকার জাতিগত বৈপরীত্য তাদের সম্প্রদায়গত বৈষম্যের দ্বারা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিরিয়ার মোনোফাইসাইট গির্জার মতে, যীশুখ্রিস্টের মধ্যে দুটির (ঐশ্বরিক ও মানবিক) পরিবর্তে একটিমাত্র সত্তাই বিরাজ করত। চালসেডন-এর সাইনড (৪৫১ খ্রিঃ) ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা এবং বাইজানটিয়ামের গ্রিক গির্জাও এই মত মেনে নিয়েছিল। কনস্টান্টিনোপল-এর বিশিষ্ট বিশপ সার্জিয়াস[২৭] প্রণীত সূত্রের ভিত্তিতে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যীশুখ্রিস্টর প্রকৃতি ও আকৃতি সংক্রান্ত ধর্মীয় দর্শনশাস্ত্রে হেরাক্লিয়াস যে সমঝোতা তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন, তা যীশুখ্রিস্টর মধ্যকার এক বা একাধিক সত্তাজনিত প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে এবং তার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছার (থেলেমা) ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই নতুন তত্ত্ব যারা গ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত খ্রিস্টানদের নাম দেওয়া হয় মোনোথিলাইট। অন্যান্য ধর্মীয় সমঝোতা সূত্রের মতো এটাও রক্ষণশীল বা পরিবর্তনপন্থি কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বরঞ্চ এর পরিণতিতে একটি তৃতীয় সমস্যা ও একটি তৃতীয় পক্ষের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু সিরিয়ার বেশির ভাগ মানুষই মোনোফাইসাইট থেকে যায়। তাদের অগ্রগতি ও আলাদা একটি সিরীয় গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের পিছনে একটি চাপা ও অর্ধস্ফুট জাতীয়তাবাদী অনুভূতির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

● নতুন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা

জেরুসালেমের পতনের ঠিক আগেই ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তরে অবস্থিত আল-জাবিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে খলিফা উমার উপস্থিত হলেন। দামাস্কাস নগরীর পশ্চিম দরজায় তার নাম এখনও খোদাই করা আছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই জয়কে বিধিমতো সম্পন্ন করা। বিজিত মানুষদের অবস্থান নির্ধারণ করা, ইয়ারমুক যুদ্ধের পর খালিদের স্থলাভিষিক্ত জেনারেলেসিমো আবু-উবাইদার সঙ্গে আলোচনা করা এবং নতুন অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে

শাসন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন রচনা করা। যখন জেরুসালেমের পতন হল তখনও উমার সেখানে গিয়েছিলেন। 'গির্জার মিষ্টভাষী রক্ষক' বলে খ্যাত জেরুসালেমের বিশপ সোফ্রোনিয়াস সেই বৃদ্ধ খলিফাকে তাঁদেব পবিত্র গির্জাগুলি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। সেই আরবীয় দর্শনার্থীর শিক্ষাসভ্যতাহীন হাবভাব ও জীর্ণ পোশাক দেখে তিনি এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি খলিফার অনুগামীতে পরিণত হলেন এবং উপস্থিত একজনের দিকে ফিরে গ্রিক ভাষায় মন্তব্য করলেন, "পবিত্র এই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে নিঃসঙ্গতার বেদনাবোধ আছে বলে ধর্মপ্রচারক ড্যানিয়েল যে-মন্তব্য করেছেন তা যথার্থই সত্য।"[২৬] আবু-উবাইদাহ খুব শীঘ্রই আমওয়াস (বা আমাওয়াস) নামক স্থানে মহামারীর শিকার হলেন। শোনা যায়, এই মহামারীতেই তার ২০,০০০ সেনা মারা গিয়েছিল। ইয়াজিদ-ইব ন-আবি সুফয়ানের মৃত্যুর পর বিচক্ষণ মু'আবিয়া সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

সিরিয়া জয়ের মুহূর্তে এটি রোমান ও বাইজানটাইন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এখন সিরিয়াকে চারটি সামরিক জেলায় (একবচনে, জুন্দ) ভাগ করা হল। এই জেলাগুলি হল দিমাশ্‌ক, হিমস্, গ্যালিলি থেকে সিরীয় মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত আল-উরদুন (জর্ডন) এবং এসড্রেলনের (মারজ ইব ন-আমির) বিস্তীর্ণ সমভূমির দক্ষিণে অবস্থিত ফিলাস্তিন (প্যালেস্টাইন)। উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদের রাজত্বকালে উত্তরপ্রান্তের জেলা কিননাসরিন যুক্ত হল।

সমকালীন যুগের প্রথম শ্রেণীর সম্রাটের কাছ থেকে রণনীতিগত দিক দিয়ে অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল অত দ্রুত ও অত সহজে দখল করার ফলে গোটা পৃথিবীর কাছে উদীয়মান ইসলাম ধর্ম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, এই শক্তি তার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কেও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। সিরিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে ইসলামি শক্তি প্রথমে মিশর জয় করল ও তারপর উত্তর-আফ্রিকার বাকী অংশের মধ্য দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল। সিরিয়াকে ঘাঁটি করে তারা আর্মেনিয়া, উত্তর-মেসোপটেমিয়া, জর্জিয়া ও আযারবাইজান দখল করল। এশিয়া মাইনরেও সে ধরনের আক্রমণ দীর্ঘদিন যাবত বজায় ছিল। সিরীয় সেনাদের সাহায্যে তারা মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর একশো বছরেরও কম সময়ে দূরবর্তী ইউরোপে অবস্থিত স্পেনকেও ইসলামি দুনিয়ার ক্রমপ্রসারিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করল। ❑

● টীকা ●

১ ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর এখনও লেবাননে বহ্ন্যুৎসব সহকারে দিনটি পালিত হয়।

২ তাবারী, ১ম খণ্ড, ১৬১০ পাতা; থিওফানিস, ৩৩৬ পাতা তুলনীয়।

৩ মাশারিফ আল-শাম থেকে, অর্থাৎ সিরিয়া সংলগ্ন উচ্চভূমি। এম জে দা গোজি, মেমোয়ার সার লা কনকুয়েট ডে লা সিরিয়া (লিডেন, ১৯০০), ৫ পাতা।

৪ ওয়াকিদি, ৪২৫ ও পরের পাতা; বালাযুরি, ৫৯ পাতা=হিট্টি, ৯২ পাতা।

৫ আল-বাসরি, ফুতুহ্ আল-শাম, সম্পাদনা : ডবলিউ এন লীস (কলকাতা, ১৮৫৩-৫৪), ৮-১১ ও ৪০-৪২ পাতা তুলনীয়।

৬ ওয়াকিদি, ৪০২ পাতা; ইব ন-আসাকির, আল-তারীখ আল-কবীর, সম্পাদনা : আবদ-আল কাদির বদরান, ৫ম খণ্ড (দামাস্কাস, ১৩৩২) ৯২ ও ১০২ পাতা।

৭ তুলনীয় : বালাযুরি, ১১০-১২ পাতা; ইয়াকুবি, তারিখ, ২য় খণ্ড ১৫০-৫১ পাতা; তাবারী, ১ম খণ্ড, ২১১১-১৩ ও ২১২১-২৪ পাতা; ইব-ন-আসাকির, ১ম খণ্ড, ১৩০ পাতা; ইব ন-আল-আসীর, আল-কামিল ফী আল-তারীখ, সম্পাদনা : সি জে টর্নবার্গ, ২য় খণ্ড, (লিডেন, ১৮৬৭) ৩১২-১৩ পাতা।

৮ অ্যালয়েস মুসিল, অ্যারাবিয়া ডেসার্টা (নিউইয়র্ক, ১৯২৭), ৫৫৩-৭৩ পাতা।

৯ জেনেসিস ২৫ : ১৪, ইসাইয়া, ২১ : ১১ তে উদ্ধৃত।

১০ মডার্ন কুলবান কারাকির।

১১ দামাস্কাসের উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান সাব বিয়ার (সপ্ত কুয়া)-এর কাছে।

১২ আশুরবানিপাল এখানে আরবদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা তাদের পিপাসা মেটানোর জন্য তাদের উটগুলির পেট চিরে ফেলত; লাকেনবিল, ২য় খণ্ড, নতুন ভাগ ৮২৭; মুসিল, অ্যারাবিয়া ডেসার্টা, ৫৭০ পাতা।

১৩ দামাস্কাস থেকে ১৫ মাইল দূরে, আযরা-র কাছে অবস্থিত গাস্সানিদদের একটি ঘাঁটি।

১৪ জান্নাবাতাইন নয়, এস. ডি. গইটিন দেখুন, আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি-র জার্নাল ৭০ খণ্ড (১৯৫০), ১০৬ পাতা।

১৫ দামাস্কাসের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি সমভূমি।

১৬ বালাযুরি, ১২১ পাতা=হিট্টি, ১৮৭ পাতা।

১৭ বালাযুরি, ১৩১ পাতা=হিট্টি, ২০১-০২ পাতা।

১৮ আরবদের হিসাব অনুসারী, বাইজানটাইন সেনার সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ থেকে ২,৪০,০০০ এবং মুসলিম সেনার সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। এই হিসাব গ্রিকদের হিসাবের মতোই নির্ভরযোগ্য নয়। তুলনীয়; মাইকেল লী সিরিয়েন, ক্রোনিক, সম্পাদনা : জে বি চ্যাবট, ৪র্থ খণ্ড, (প্যারিস, ১৯১০), ৪১৬ পাতা, অনুবাদ চ্যাবট, ২য় খণ্ড (প্যারিস, ১৯০১) ৪২১ পাতা।

১৯ ইয়ারমুক ও আল-রুককাদের সংযোগস্থলে। যোশ-এর যারমুথ (১০:৩)-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। বর্তমান খিরবাত ইয়ারমুক, আজনাদাইন-এর কাছে।

২০ এইচ আর পি ডিকসন রচিত দি আরব অফ দি ডেজার্ট (লন্ডন, ১৯৪৯), ২৫৮-৬২ পাতা দ্রষ্টব্য।

২১ বাসরি, ১৯৭ পাতা; ইব ন-আসাকির, ১ম খণ্ড, ১৬৩ পাতা।

২২ বালাযুরি, ১৩৭ পাতা=হিট্টি, ২১০ পাতা।

২৩ বালাযুরি, ১৩৭ পাতা, ১.১৩ = হিট্টি ২১১ পাতা।

২৪ বালাযুরি, ১১৬ পাতা, ১.১৮, ১২৬ পাতা, ১১.১৩, ১৯=হিট্টি, ১৭৯ পাতা, ১.১৭ পাতা, ১.২২, ১৯৪ পাতা, ১.৭।

২৫ জ্যাকোবাইট কুলের এক সিরীয় ব্যক্তি।

২৬ থিওফ্যানিস, ৩৩৯ পাতা; জে. পি. মিগনে, প্যাট্রোলোজিয়া গ্রেকা, সি ১১৩ খণ্ড (প্যারিস, ১৮৬৪), কল. ১০৯-এ কনস্ট্যানটাইন প্রোফিরোজেনিটাস, "ডি অ্যাডমিনিস্ট্রাণ্ডো ইমপেরিও"; ড্যানিয়েল ১১ : ৩১। সম্ভবত সোফ্রোনিয়াস ছিলেন একজন ম্যারোনাইট।

॥ অধ্যায় ১৩ ॥

আল-ইরাক এবং পারস্য জয়

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে খালিদ আল-হিরা থেকে পশ্চিমমুখে স্মরণীয় অভিযান চালালেন। অভিযান চালানোর আগে তিনি ইরাক সীমান্তের দায়িত্ব তাঁর বেদুইন মিত্র আল-মুসান্না ইবন হারিসা-র হাতে দিয়ে যান। আল-মুসান্না ছিলেন বানু শায়বান-এর শেইখ। ইতিমধ্যে পারসিকরা পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিল। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর আল-হিরার কাছে এক সেতুর[১] লড়াইয়ে পুরো আরবীয় বাহিনীকে পারসিকরা খতম করতে সক্ষম হয়। তখন নির্ভীক আল-মুসান্না নতুন করে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। পরের বছরের অক্টোবর অথবা নভেম্বরে তিনি লড়াই চালিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে আল-বুওয়াইব নামক জায়গায় পারসি সেনাপতি মিহ্রানকে পরাজিত করেন। তবে আল মুসান্না ছিলেন বেদুইন প্রধান। মক্কা বা মদীনার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। তিনি মুহাম্মাদের মৃত্যুর আগে ইসলামের নামই শোনেননি। তাই খলিফা উমার সেনানায়ক হিসেবে সাআদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে বাছাই করেন। বদর যুদ্ধে জয়ের পর মুহাম্মাদ যাঁদের স্বর্গ উপহার দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সাআদ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। খলিফা উমার তাকে নিয়োগকরে ইরাক সীমান্তে পাঠিয়ে ছিলেন। সেসময় ইয়ারমুক যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয় এবং সিরিয়ার ভাগ্য প্রতিবন্ধকতার মুখে গিয়ে পড়ে। সাআদ ১০ হাজার সেনা নিয়ে পারসি রুস্তমের সঙ্গে আল-কাদিসিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল আল-হিরার কাছেই, সেদিন (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষদিন বা জুনের প্রথম দিন) ছিল খুব গরম। ধূলিঝড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছিল। যেদিন ইয়ারমুক যুদ্ধে জয় এসেছিল আজও তেমন দিনই ছিল। তাই একই কৌশল প্রয়োগ করা হয় এবং ফলও মেলে হাতেনাতে। যুদ্ধে রুস্তম নিহত হন। আতঙ্কে বিশাল সাসানীয় সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আল-ইরাকের[২] সমস্ত উর্বর নীচু জমি (টাইগ্রিস নদীর পশ্চিমে) আক্রমণকারীরা দারুণভাবে কাজে লাগান। যুদ্ধ জয়ের পর 'আরামীয়' কৃষকদের তরফে তাঁরা যে অভিনন্দন পান, তা সিরিয়ার কৃষকদের অভিনন্দনের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সেমিটিক ইরাকিরা সাবেক ইরানি প্রভুদের বিদেশি হিসেবে দেখতে লাগল। উল্টে যুদ্ধজয়ী নবাগতরাই তাদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠলেন। খ্রিস্টান হিসেবে তারা জরথুস্ট্রর অনুগামীদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাননি। ইসলামি শাসন কায়েম হবার শত বছর আগে ছোটখাটো আরবীয় গোষ্ঠীপতি এবং রাজা-রাজড়ারা ইরাক-আরব সীমান্তে বংশবৃদ্ধি করে বেড়ে উঠেছিল। টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসের উপত্যকা যে আরবদের হাতেই যাবে তা বোঝা গিয়েছিল সেই সাবেক ব্যাবিলনীয় যুগ থেকেই। তখন থেকেই আরবীয়রা এই দুই উপত্যকার মানুষজনের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং ওই দুই উপত্যকার মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে শুরু করে।

সিরিয়ার মতো ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরেও নতুন করে আরবীয় উপজাতিরা অনুপ্রবেশ করতে থাকে। নতুন আর্থিক সুযোগ ছিল তাদের আকর্ষণের কারণ।

পারস্যের রাজধানী টেসিফন[৩] হল সাআদের পরবর্তী লক্ষ্য। সাহস এবং উদ্দীপনা নিয়ে তিনি অভিযান শুরু করলেন। টাইগ্রিস নদীর এক অগভীর অংশ সাআদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী হেঁটে পার হল। অথচ তখন টাইগ্রিস প্লাবনে ফুঁসছে। সেই অবস্থায় পুরো নদী সৈন্যবাহিনী হেঁটে পার হয়। কোন ক্ষতি হয়নি তাদের। মুসলিম ইতিহাসে এই ঘটনা অত্যাশ্চর্য হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুনে তিনি পারস্যের রাজধানীতে ঢুকে পড়েন। তখন সেনাবাহিনী নিয়ে পারস্যরাজ পলাতক। সাআদের নেতৃত্বাধীন সেই সৈন্যবাহিনী পারস্য-রাজধানী জয় করে এত কিছু লুঠ করেছিল যা আরব ইতিহাসে বেনজির। সব মিলিয়ে এই লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ দিরহাম।[৪]

পারস্যের রাজধানী দখল করার মধ্য দিয়ে আরবের পিছিয়ে পড়া মানুষজন এক আধুনিক উন্নত জীবনের বিলাসবহুলতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। রাজপ্রাসাদের নাম ছিল ইওয়ান কিসরা। তাতে ছিল প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহ। দারুণ কারুকাজ করা এই কক্ষের দেওয়ালে লিপিবদ্ধ ছিল তদানীন্তন বিশিষ্ট কবিদের কবিতা। সবকিছু সাআদ বাহিনীর দখলে চলে এল। বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে আরবীয় সূত্রগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা থেকেই উভয় সংস্কৃতির লোকজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। পারস্য রাজধানীতে লবণ হিসেবে কর্পূর ব্যবহৃত হত এবং অনেকেই তা রান্নায় ব্যবহার করতেন। যা আগে কখনও দেখা যায়নি।[৫] এছাড়া সোনা এবং রূপা বিনিময় হত।[৬] এক আরব যোদ্ধার বিরুদ্ধে এক অভিজাত বংশের মেয়েকে বিক্রির অভিযোগ ওঠে থাকে সে মাত্র ১০০০ দিরহামের বিনিময়ে পেয়েছিল। অভিযুক্ত হয়ে ওই যোদ্ধা জবাব দিয়েছিল : ১০ শতের ওপরে কোন অঙ্ক আছে—তার ধারণা ছিল না।[৭]

আল-কাদিসিয়া এবং আল-মাদাইন জয়ের পর আরব সাম্রাজ্যের বিজয়রথ যাত্রা শুরু করল আল-বসরার প্রতিষ্ঠিত নতুন এক ফৌজি ঘাঁটি থেকে। আল-কুফার ফৌজি ছাউনি ছিল আল-হিরার মতোই পুরানো। সেই আল-কুফাতেই টেসিফনের পরিবর্তে রাজধানী করার কথা হল। সাআদ আল-ইরাকে স্থাপন করলেন প্রথম মুসলিম মসজিদ।

এদিকে সাসানীয় রাজা তৃতীয় ইয়াজদাগির্দ এবং তাঁর রাজ-আদালত উত্তরমুখে সরে গেল। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষে জালুলায় পারস্য পার্বত্যাঞ্চলের লাগোয়া অঞ্চলে এবং পুরো আল-ইরাক আরবীয় বিজয়ীদের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন নিনেভের কাছে আল-মাওসিল (মসুল) দখলে এল। এর ফলে উত্তর সিরিয়া থেকে আয়ায ইবন-গানম যে অভিযান শুরু করেছিলেন তা সার্থক হল। একই বছরে নিহাওয়ান্দের (প্রাচীন একবাতানার কাছে) মহাযুদ্ধ হল। এই যুদ্ধ হল সাআদেরই এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে। তৃতীয় ইয়াজদাগির্দের সৈন্যবাহিনীর শেষ যে কজন ছিল, তারা সবাই যুদ্ধে মারা গেল। খুজিস্তান (প্রাচীন ইলম, পরে নাম হয় সুসিয়ানা, আধুনিক নাম আরবিস্তান) দখল করা হয় ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আল-বসরা এবং আল-কুফা থেকে যুদ্ধ চালিয়ে। ইতিমধ্যে পারস (ফারিস, মূল পারস্য)-এর সংলগ্ন প্রদেশ দখলের এক চেষ্টা হয়। পারস্য উপসাগরের পূর্ব উপকূলে অভিযান

চালানো হয় আল-বাহ্‌রাইন থেকে। ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় আল-বসরা ও আল-কূফার সঙ্গে এই বাহ্‌রাইনেও এক ফৌজি ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। সেখানে সেমেটিক বহির্ভূত জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। আল-বসরার রাজ্যপাল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন-আমির ৬৪৯-৫০[৯] খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফারিসের প্রধান শহর ইসতাখর (পার্সিপোলিস) দখল করে এই প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। ফারিস জয়ের পর খুরাসান প্রদেশ জয়ের পালা এল। এরপর ওকসাসে অভিযানের পথ খুলে গেল। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দের কিছু পরে মুকরান এবং বালুচিস্তানের উপকূল অঞ্চল দখলের পর আরবরা ভারত সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসে।

৬৪০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার বাইজানটাইন-আর্মেনিয়ায় আয়ায এক অভিযান চালানোর প্রয়াস নেন। তার চার বছর পর সিরিয়া থেকে হাবিব ইব্‌ন-মাসলামাহ্-র নেতৃত্বে এক অভিযান চালানো হয়। কিন্তু ৬৫২ খ্রিস্টাব্দের আগে তা সম্পূর্ণ দখল করা সম্ভব হয়নি।[১০]

আল-কূফার সামরিক শিবির হয়ে উঠল নতুন দখল করা ভূখণ্ডের রাজধানী। উমার চেয়েছিলেন, আল-হিজাজের সেকেলে বৈশিষ্ট্যই বজায় থাকুক। কিন্তু সাআদ এখানে টেসিফনের রাজকীয় প্রাসাদের আদলে একটি প্রাসাদ গড়ে তোলেন। পুরানো রাজধানীর ফটকগুলি খুলে নিয়ে এসে নতুন রাজধানীতে লাগানো হয়। প্রথমে সেনাবাহিনীর লোকজন এবং তাদের পরিবারের থাকার জন্য ব্যারাক তৈরি হয়। আগে ছিল কুটির। তার জায়গায় হল কাঁচা ইটের তৈরি বাড়ি। এভাবে দ্রুত গড়ে উঠল নতুন শহর। আল-বসরায় সহযোগী ফৌজি শিবির নিয়ে আল-কূফার শিবির আরব-মেসোপটেমিয়ার রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হয়ে উঠল। আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসূর বাগদাদ গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত এই আল-কূফাই ছিল রাজধানী।

৬৫১ খ্রিস্টাব্দে তরুণ ইয়াজদাগির্দ কিছু অনুগামী-সহ সাম্রাজ্যের ধনসম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে পালানোর সময় নিজের দলেরই এক লোভী লোকের শিকার হয়ে খুন হলেন। তিনি মারোয়ার[১১] (পারসিক মার্ভ) কাছে একজনের কুটিরে আশ্রিত থাকা অবস্থাতেই খুন হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এমন এক সাম্রাজ্যের পতন হয়, যে সাম্রাজ্য প্রায় দ্বাদশ শতক জুড়ে দাপটে শাসন করে এসেছে। এই সাম্রাজ্য পরবর্তীকালে আরও ৮০০ বছরের বেশিকাল মাথা তুলতে পারেনি।

পারস্য দখল সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক দশক লাগে। মুসলিম সৈন্যবাহিনী এই পারস্যতেই সিরিয়ার চেয়েও বেশি প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। অভিযানে ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ হাজার আরবীয় সৈন্য অংশ নেয়। সৈন্যদলে মহিলা, শিশু, দাসরাও ছিল। পারসিকরা ছিলেন আর্য, সিমাইট নন। তাঁরা কয়েক শতক ধরে স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব ভোগ করে এসেছে। তাঁদের ছিল সুসংগঠিত ফৌজি বাহিনী, যে বাহিনী চারশত বছর ধরে রোমানদের সঙ্গে লড়াই করে গেছে। পরবর্তী তিনশতকের আরবীয় শাসনে আরবী হয়ে উঠল সরকারি ভাষা এবং সংস্কৃতিবান সমাজের ভাষাও। সীমিতভাবে সাধারণ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু প্রজাদের পুরানো ঐতিহ্য ফের জাগ্রত হল এবং তাদের অবহেলিত মাতৃভাষা আবার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পারস্য কারমাতি (কারমাতিয়ান) আন্দোলনে বড়সড় ভূমিকা নেয়। এই আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে খলিফার ভিত্তিভূমি নড়িয়ে দিয়েছিল।

শী 'আহ্ সম্প্রদায়ের বিকাশেও পারস্যের বড় অবদান ছিল। অবদান ছিল ফাতিমিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতেও, যে-ফাতিমি বংশ দুশতক ধরে মিশর শাসন করে। এর শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র আরব দুনিয়ার সাধারণ সম্পত্তি হয়ে ওঠে এবং বিজয়ীদের হৃদয় জয় করেছিল। ইসলামের পত্তনের প্রথম তিন শতকের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী ইরানিগণ।

আরবীয় বাহিনীর বিশাল সৈন্যদল যখন সাআদের নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল ঘিরে অভিযান চালাচ্ছিল আমর ইব্‌ন আল-আসের নেতৃত্বে তখন পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। শেষোক্ত সেনাপতি নীলনদের উপত্যকার জনগণ এবং উত্তর-আফ্রিকার বর্বর জাতিকে সাম্রাজ্যের অধীনে আনলেন। এই তুলনাহীন আরবীয় সম্প্রসারণ অভিযান বাইরে থেকে ধর্মীয় মনে হলেও আসলে কিন্তু ছিল রাজনৈতিক এবং আর্থিক। অবশেষে আরবীয় সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের মতোই বৃহত্তর হয়ে উঠল। আল-মদীনা থেকে খলিফা এই বৃহত্তর সাম্রাজ্যের প্রবল স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন যে স্রোত উপস্রোতের সংখ্যা বহরে এবং সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলছিল। ❑

● টীকা ●

১ ইউফ্রেটিসের ওপারে। বালাযুরি, ২৫১-২৫২ পৃঃ তাবারী, ১ খণ্ড, ২১৯৪-২২০১ পৃঃ।

২ ইরাক, সম্ভবত পাহ্‌লভি ভাষারই একটি শব্দ, যার অর্থ 'নিম্নভূমি'। আরবী ভাষায় 'সাওয়াদ' শব্দের কাছাকাছি। 'সাওয়াদ' এর অর্থ কালো জমি। সাধারণত আরবের মরুভূমির সঙ্গে বৈপরীত্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইয়াকুত, ৩ খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ। তু. এ. টি ওমস্টেড, হিস্ট্রি অব অ্যাসিরিয়া (নিউইয়র্ক, ১৯২৭) ৬০ পৃঃ।

৩ আরবী আল মাদাইন, আক্ষরিক অর্থে সেই শহরগুলি, যার অন্তর্ভুক্ত সেলিউসিয়া এবং টেসিফন-টাইগ্রিসের দুপারে বাগদাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড।

৪ তাবারী, ১ খণ্ড, ২৪৩৬ পৃঃ। তু. ইব্‌ন-আল-আসীর, ২ খণ্ড, ৪০০ পৃঃ সেটানি, আন্নালি, ৩য় খণ্ড ৭৪২-৪৬ পৃষ্ঠা।

৫ ইবন আল-তিকতাকা, আল-ফাখরী, সম্পাদনা, এইচ ডেরেনবুর্গ (প্যারিস, ১৮৯৫) ১১৪ পৃঃ।

৬ ফাখরী, ১১৫ পৃঃ। অনুবাদ সি ই জে হুইটিং (লন্ডন, ১৯৪৭) ৭৯ পৃঃ। তু. আল-দিনাওয়ারি, আল আখ্‌বার আল-তিওয়াল, সম্পাদনা, ভি গিয়ারগ্যাস (লিডেন, ১৮৮৮) ১৩৪ পৃঃ।

৭ বালাযুরি, ২৪৪ পৃঃ হিট্টি, ৩৯২ পৃঃ। ফাখরী, ১১৪ পৃঃ।

৮ পারসিকরা তাদের দেশকে বলত ইরান, যার মধ্যে পারস (সাসানী এবং আখেমেনি বংশের পীঠস্থান ছিল দক্ষিণ প্রদেশে। গ্রিকরা এই 'পারস' কেই পারস্য ভাবত ভুল করে এবং সমগ্র রাজধানীর ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করত।

৯ তাবারী, ১ খণ্ড, ২৫৪৫-৫১ পৃঃ। সেটানি, ৪র্থ খণ্ড, ১৫১-৫৩ ; ৭ খণ্ড, ২১৯-২০, ২৪৮-৫৬ ; পঞ্চম খণ্ড, ১৯-২৭ পৃষ্ঠা।

১০ বালাযুরি, ১৯৩-২১২ পৃঃ সেটানি, চতুর্থ খণ্ড, ৫০-৫৩ পৃঃ, সপ্তম খণ্ড ৪৫৩-৫৪ পৃঃ দেখুন।

১১ মিশেল লা সিরিয়েন পড়ুন, চতুর্থ খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪২৪ পৃঃ।

।। অধ্যায় ১৪ ।।

মিশর, ত্রিপোলি এবং বারকা দখল

মিশরের কৌশলগত অবস্থান ছিল বিপজ্জনকভাবে সিরিয়া এবং আল-হিজাজের কাছাকাছি। মিশরের শস্যসুফলা মাটি এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, গোটা ভূখণ্ডকে কনস্ট্যানন্টিনোপলের শস্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেছিল। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল বাইজানটাইন নৌবাহিনীর ঘাঁটি। দেশটি এভাবে উত্তর আফ্রিকার বাকি অংশের প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহৃত হত। এইসব ভৌগোলিক সুবিধাগুলি দেখেই আরবরা সাম্রাজ্য বাড়ানোর সময় নীলনদের উপত্যকা কবজা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আরবরা আচমকা হানা দিয়ে মিশর জয় করেননি বরং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য নিয়মমাফিক প্রচার চালানোর সময়ই এই দেশ দখল করা হয়। সেনাপতি আমর ইবন-আল-আস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খালিদকে বীরত্বে ছাপিয়ে যেতে মিশরে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। সেই সময়ে জেরুসালেমে উমারের উপস্থিতিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। আমর জাহিলীয়াহ্ আমলে একাধিকবার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মিশরে এসেছিলেন। এর ফলে তিনি সেখানকার নগর ও রাস্তাঘাটের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[১] এভাবেই একবার ফ্যারাওদের প্রাচীন ভূখণ্ড মিশরে অভিযান চালাতে তিনি জেরুসালেমে উমারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু উমার আল-মদীনায় ফিরে উসমান ও অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর উল্টে এক বার্তা পাঠিয়ে আরব সেনাবাহিনীকে মিশরের দিকে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। কারণ উসমান এবং অন্যরা উমারকে বুঝিয়েছিলেন যে, এখন মিশর আক্রমণ করার বিপদ অনেক। খলিফা উমারের ওই বার্তা সেনাপতি আমরের কাছে যখন পৌঁছল, তখন তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিশর-প্যালেস্টাইন সীমান্ত অতিক্রম করার মুখে। খলিফার বার্তাটি পেয়েও সেনাপতি আমরের কেমন সন্দেহ হল। তা ছাড়া খলিফাই একসময় সেনাপতি আমরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : কখনও যদি আমি বার্তা পাঠিয়ে তোমার মিশর অভিযান বন্ধ করতে বলি এবং তুমি আমার চিঠি পাওয়ার আগেই মিশরে ঢুকে পড় তা হলে পিছু হটবে না। যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করবে।[২] তাই তিনি ওই বার্তা (চিঠি) খুললেন না। ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আল আরিশ গিয়ে তবে ওই চিঠি খোলেন। এই আমর ছিলেন কোরাইশপন্থি। ৪৫ বছরের এক যুবক। যুদ্ধে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। ছিলেন নির্ভীক এবং বুদ্ধিমানও। তাঁরই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জর্ডনের পশ্চিমে প্যালেস্টাইন জয় করতে পেরেছিল

আরববাহিনী। এই আমরের প্রিয় বন্ধু ছিলেন মু'আবিয়া। তার জন্য এক খিলাফতকে করায়ত্ত করতে যে ভূমিকা পালন করেন সেই সুবাদে তিনি 'ইসলামের চার সেরা আরবীয় রাজনৈতিক প্রতিভার (যুহাত) অন্যতম' খ্যাতি পেয়েছিলেন।[৫] যে পথে তিনি ৪০০০ অশ্বারোহী সেনাকে নিয়ে মিশর দখল করেন, সেই পথে আব্রাহাম, আলেকজাণ্ডার, আন্তিওকাস, নেপোলিয়ন, জেমাল পাশা প্রমুখ অভিযান চালিয়েছিলেন। এটাই ছিল প্রাচীন বিশ্বের আন্তর্জাতিক সড়কপথ, যা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার পীঠস্থানের সঙ্গে যোগাযোগের পথও ছিল।[৬]

৬৪০ খ্রিস্টাব্দের[৭] জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আরবীয় বাহিনী প্রথম যে দুর্গে আক্রমণ হানে তা হল আল-ফারামা (পেলুসিয়াম)। এই জায়গাটি ছিল পূর্ব-মিশরের স্নায়ুকেন্দ্র। প্রায় একমাস প্রতিরোধ করার পর এই শহর দখল হয়ে গেল। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে পারস্য আক্রমণের আগে ফারামার প্রতিরক্ষাশক্তি আর পুনর্গঠিত করে উঠতে পারেনি। এরপর দখল হয় কায়রোর উত্তর-পূর্ব অংশে বিলবেজ (মতান্তরে বিলবিস, বালবিস) শহর এবং পরে একের পর এক শহর। শেষে দখল হয় ব্যাবিলন[৮] (বাবালয়ুন)। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে হারকিউলিস তার দেশ পুনর্দখল করার পর থেকেই সাইরাস (মুকাওকিস) আলেকজান্দ্রিয়ার কুলপতি হিসেবে কাজ করতেন। তিনি প্রশাসনের স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন। আমর-এর অগ্রগতির খবর পেয়ে পাল্টা আঘাত হানতে সাইরাস তার কমাণ্ডার ইন চিফ অগাস্টালিস থিওডোরাসকে নিয়ে ব্যাবিলন চলে যান। সঙ্গে যায় তাদের সেনাবাহিনী। এদিকে আমর ব্যাবিলনের বাইরে শিবির করে পাল্টা আঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে আমরকে সাহায্য করতে আসেন আল যুবাইর ইবন আল আওয়ামের নেতৃত্বাধীন এক বাহিনী। সব মিলিয়ে আরবদের মোট ১০ হাজার সৈন্যের বাহিনী ছিল। বিপক্ষে বাইজানটাইন সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। এছাড়াও দুর্গে ৫০০০ বাইজানটাইন সেনা মজুত ছিল। আমর এসত্ত্বেও ব্যাবিলন অবরোধ করে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'আইন শাম'[৯] আক্রমণ করলেন। বাইজানটাইন সেনাবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। থিওডোরাস পালিয়ে গেলেন—আলেকজান্দ্রিয়ায়। সাইরাস ব্যাবিলনে বন্দি হয়ে পড়লেন। আরব সেনাবাহিনী এই অভিযানে সফল হলেও দুর্গ ধ্বংস করার মতো যান্ত্রিক ক্ষমতা তাদের ছিল না। বিশ্বাসঘাতক সাইরাস গোপনে অবরোধকারী সৈন্যদের অর্থ দিয়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত তিনটি বিকল্প ছিল সামনে। হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। না হয় বার্ষিক নজরানা দাও অথবা পাল্টা আঘাত হানো।

আরবীয়রা যে ব্যাবিলন অভিযান চালিয়ে কী ছাপ ফেলেছিলেন সেখানকার মানুষজনের মনে তা সাইরাসের দূতের মুখের এইসব কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় :

"আমরা এমন এক জনতাকে দেখছি যাদের প্রত্যেকে জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি পছন্দ করেন। এদের নম্রতার কাছাকাছি বিশ্বের কোন প্রান্তের মানুষ রয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এরা মাটিতে ছাড়া বসেন না, হাঁটুতে থালা নিয়ে খেতে অবজ্ঞা করেন না। এদের

LOWER EGYPT
Illustrating the Conquest
and showing the
Moslem Towns
Canals (sing. khalij)
English Miles

নেতা (আমীর) যেন এদেরই একজন। এদের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদ নেই। প্রভু-ক্রীতদাস ভেদ নেই। নামাযের সময় কেউ ফাঁকি দেন না। সবাই মুখ-হাত-পা ধুয়ে বিনীতভাবে নামাযে মনোযোগ দেয়।[৮]

সাইরাসের সঙ্গে সন্ধির জন্য আল রাওযায় তার কাছে প্রতিনিধি পাঠানোর কথা হয়। প্রতিনিধি হিসেবে সাইরাসের কাছে যান উবাদা ইবন আল সামিত নামে এক নিগ্রো। সাইরাস খুব দুঃখ পান। তিনটি বিকল্পই বারবার পাঠ করেন। সাইরাস বার্ষিক নজরানা দিয়ে সন্ধি করতে রাজি হন। তিনি সাততাড়াতাড়ি আলেকজান্দ্রিয়ায় ছোটেন রাজাকে সন্ধির শর্ত জানাতে। কিন্তু হেরাক্লিয়াস এইসব শর্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি সাইরাসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। ইতিমধ্যে বিনা প্রতিরোধে ব্যাবিলন অবরোধ সম্পন্ন হয়। এর সাতমাস পরে আল জুবের এবং তাঁর সহযোদ্ধারা একটি পরিখার একাংশ বুজিয়ে দুর্গকে ঘিরে ছিল এই পরিখা। তা বোজানোর পর তারা মই লাগিয়ে প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়েন দুর্গে, আচমকা রক্ষীদের আক্রমণ করে সৈন্য সরবরাহ করার জায়গাটিই দখল করে নিলেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল ওই দুর্গের কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি শোনা গেল 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্ মহান)-এর।[৯]

এভাবে বদ্বীপের পূর্ব সীমান্ত দখল করে আমর দ্রুত সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলে তাঁর ইস্পাতকঠিন নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সচেষ্ট হলেন। ১৩ মে পতন হল 'নিকিউ' আধুনিককালে, যাকে শাবশীর বলা হয়)। এক রক্তাক্ত হত্যাপর্ব আসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপলের পর বিশ্বে সুন্দরতম এবং শক্তিশালী শহর হিসেবে যার খ্যাতি ছিল, সেই আলেকজান্দ্রিয়া (আল-ইসকানদারিয়া) তখন সামনেই শান্তভাবে ছিল।

আমির আরবদেশ থেকে নতুন লোক নিয়োগ তার সৈন্যদলের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় ২০ হাজার করে ফেললেন। একদিন সকালে আমর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, মিশরের রাজধানী এবং সংলগ্ন বন্দরকে ঘিরে রয়েছে—অভেদ্য লম্বা প্রাচীর। আর মাঝে মাঝে রয়েছে রক্ষী-মিনার। একপাশে রয়েছে সুউচ্চ সেই সেরাপিয়াম,[১০] একদা যেখানে ছিল সেরাপিসের মন্দির এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার। অন্যদিকে রয়েছে সেন্ট মার্কের সেই বিখ্যাত গির্জা, যেখানে একসময় জুলিয়াস সিজারের স্মরণে ক্লিওপেট্রা সিজার-মন্দির[১১] নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন এবং তা শেষ করেন অগাস্টাস। আরও পশ্চিমে ছিল ক্লিওপেট্রা নির্মিত বলে প্রচলিত দুটি লাল উসোয়ান (আসওয়ান) গ্রানাইট নির্মিত চূড়া। তবে বাস্তবে এই স্থাপত্যকীর্তিটির স্রষ্টা ছিলেন তৃতীয় থুটমোজ (আনু. ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব)। এই দুটি চূড়ার একটি এখন লণ্ডনের টেমস নদীর ধারে শোভা পায়। অন্যটি রয়েছে নিউইয়র্কের সেন্টাল পার্কে। আর এই চূড়ার পিছনে রয়েছে প্রাচীন মিশরের রাজাদের স্মৃতি-মিনার। যেখানে দিনে সূর্যরশ্মি পড়ে ঝিকমিক করে। আর রাতে আলোকিত হয় নিজস্ব আগুনে। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই বস্তু।[১২] এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আধুনিক নিউইয়র্কের

দিগন্তছোঁয়া সুউচ্চ অট্টালিকার পাশাপাশি এই অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তুর যে চমক থাকবে আরব মরূদ্যানে ততটা থাকবে না।

আলেকজান্দ্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতে ৫০ হাজার সৈন্য মজুত ছিল। এছাড়া বাইজানটাইন নৌবাহিনীও সর্বশক্তি নিয়ে ছিল তার সমর্থনে। আক্রমণকারীরা ছিল সংখ্যায় নগণ্য, অস্ত্রশস্ত্রেও দুর্বল। তাদের না ছিল একটি যুদ্ধজাহাজ, না ছিল শহর অবরোধ করার আধুনিক যন্ত্রপাতি। হঠাৎ সামরিক লোকবল ধ্বংস হলে তা পূরণ করার মতো কোন উৎসই তাদের ছিল না।

সমকালীন সমাজের এক কর্তৃত্ব বলে যাকে ধরা হত জন নামে, সেই নিকিউয়ের অধিবাসী অসহায় আরবদের বাধার মুখোমুখি কী অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা করেছিলেন। উঁচু দেওয়াল থেকে যুদ্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাঁদের জেরবার করে দেওয়া হয়।[১৫] এক বাহিনী সৈন্যদল পিছনে ফেলে রেখে আমর পিছু হটে ব্যাবিলনে চলে যান। আবার পরে মিশরের উজান অঞ্চলে অভিযান চালান। হেরাক্লিয়াসের (ফেব্রুয়ারি ৬৪১) মৃত্যুর পর তার নাতি দ্বিতীয় কনস্ট্যান্স (কুসতানতীন ৬৪১-৬৮) উত্তরাধিকারী হন। আনুকূল্য লাভ করতে আলেকজান্দ্রিয়া ফিরে যান সাইরাস। যাতে নির্বিঘ্নে চুক্তি সম্পন্ন হয়। স্বাধীনভাবে আরবীয়দের জন্য দেশ চালানোর আশায় ৬৪১ খ্রিঃ এর ৮ নভেম্বর ব্যাবিলনে আমরের সঙ্গে বিশপ এক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিকে বলা হয় আলেকজান্দ্রিয়ার চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়, সাবালক পিছু দুই দিনার হারে বার্ষিক নজরানা দেওয়া হবে কনস্ট্যান্টিনোপলকে। এছাড়া দেওয়া হবে জমিকর বাবদ আদায়ও। বিনিময়ে একজনও বাইজানটাইন সৈন্যকে এই ভূখণ্ডে ফিরতে দেওয়া হবে না বা কোন ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে দেওয়া হবে না। ৬৪২ খ্রিঃ এর সেপ্টেম্বরে ওই শহর পুরো খালি হয়ে যায়। অর্থাৎ বাইজানটাইন সেনারা চলে যায়। সম্রাট কনস্ট্যান্স ছিলেন খুব দুর্বল এবং তরুন। তিনি এই চুক্তি অনুমোদন করেন। এই চুক্তি অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে কনস্ট্যান্টিনোপল সাম্রাজ্যের সুন্দরতম প্রদেশগুলির একটিকে আরবদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

এই আনন্দ সংবাদ আল-মদীনায় উমারের কাছে পৌঁছল এভাবে : আমি একটি নগর দখল করেছি। তবে এই নগরটি সম্পর্কে বিশদে কিছু বলছি না। শুধু এটা বলাই যথেষ্ট যে, ওই নগরের ৪০০০ অট্টালিকা, ৪০০০ স্নানাগার, ৪০ হাজার করদাতা ইহুদি এবং ৪০০ বিনোদন-স্থান এখন আমার হাতের মুঠোয়"।[১৬] খলিফা উমার এই বার্তা পেয়ে খুশিতে বার্তাবাহককে রুটি এবং খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করেন। এছাড়া পয়গম্বরের মসজিদে এই বিজয় উপলক্ষে এক ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান করেন।

মিশরের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আমরা ইবন-আবদ-আল-হাকাম[১৭] (২৫৭-৮৭১) মারফৎ অনেক কিছু জেনেছি। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, কীভাবে মিশর বিজয় হয়েছিল, কীভাবে সেদিনের আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপরা বিজয়ী দলকে কোনরকম বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন, তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। সেসময় ধর্মীয় গোষ্ঠীবিভাজন যা ছিল, তাতে এটা কোন বিস্ময়ের

ব্যাপার ছিল না। কারন তদানীন্তন রাজকীয় গির্জার অধীনস্থ ছিলেন খ্রিস্টধর্মের যৌগিকবাদে বিশ্বাসীরা (মোনোফিসাইট)। বহু বছর ধরে হেরাক্লিয়াস তাঁর প্রতিনিধি সাইরাসের মাধ্যমে মিশরীয় খ্রিস্টানদের নিজস্ব পন্থায় ধর্মচর্চা করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তাঁদের নতুন তত্ত্ব (খ্রিস্ট এক এবং অবিনশ্বর) বোঝানোর চেষ্টা করেন। হেরাক্লিয়াসের হয়ে এইসব প্রচার করে উল্টে সাইরাস খ্রিস্টবিরোধী হিসেবে পরিচিত হয়ে যান। উমারের নীতি মেনে আমর ব্যাবিলনের থেকে দূরে যেখানে শিবির করেছিলেন সেটাই নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এর নাম হয় আল-ফুসতাত।[১৬] পাশাপাশি ছিল সিরিয়ার আল-জাবিয়াহ্, আল ইরাকের আল-বাসরা এবং আল-কুফার সেনা-শিবির। নতুন রাজধানীতে আমর একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মিশরে এটাই ছিল প্রথম মসজিদ (৬৪১-৬৪২)। যা আজও একই নামে বিদ্যমান। শুধু যা ভবনটা কয়েকবার পুনর্নির্মিত ও সংযোজিত হয়েছে। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতিমিরা কায়রোয়তী নতুন রাজধানী গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত আল ফসতাত (পুরানো কায়রো, মিশর আল-আতিকা) এর রাজধানীটিকে ছিল। ওই আল ফসতাত থেকে আরবের পবিত্র নগরে যাবার জন্য সরাসরি এক জলপথ সূচনা করতে আমীর প্রাচীন ফ্যারাও খালটি পরিকার করেন। এই খালটি 'খলীফা আমীর আল-মুমিনিন' নামে হেলিওপোলিসের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ব্যাবিলনের উত্তরে নীলনদ এবং আল-কুলযুমের[১৭] সঙ্গে লোহিত সাগর[১৮] অভিমুখে যুক্ত হয়েছে। ট্রাজন এই খালটির সংস্কার করেন। কিন্তু অবহেলার এতে পলি পড়ে ফের বুজে যায়। প্রচুর পরিশ্রম করে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে উমারের মৃত্যুর আগে এই খাল দিয়ে ২০টি জাহাজ ইউরোপীয় পণ্য নিয়ে গিয়ে আরব বন্দরে তা নামায়।[১৯] এই খালটিই পরে—'আল-খালীজ আল-হাকিমি' নামে পরিচিত হয়। ফাতিমিয় খলিফা আল-হাকিমের (মৃ. ১০২১) আমলের পরে নানা নামে এই খালটির কিছু অংশ উনবিংশ শতকের শেষেও বিদ্যমান ছিল।

বাইজানটাইন প্রশাসনের পুরাতন কাঠামোটি নতুন শাসকরা প্রায় অবিকৃতই রাখলেন। সংবিধানে সংশোধন হল শাসনকাঠামোয় কেন্দ্রের হাতে বেশি ক্ষমতা রাখার লক্ষ্যে। তবে পুরাতন আর্থিক নীতি, হুবহু মেনে চলা হল। এছাড়া নীলনদের অববাহিকা উর্বর ভূখণ্ড কাজে লাগানোর সময় নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও অবিকৃত রাখা হল। এই ভূখণ্ডকে নতুন শাসকরাও 'দুধেল গাই' হিসেবেই দেখতে লাগলেন। সম্প্রতি আবিষ্কৃত মিশরীয় লিপি থেকে এই তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুর কিছু আগে খলিফা উমার মনে করলেন, আমীর, ঠিকঠাক রাজস্ব আদায় করতে পারছে না। তাই তিনি উজান মিশরের দায়িত্ব দিলেন আবদুল্লাহ্ ইবন্ স'দ ইবন্-আবি-সারহ্কে। নতুন খলিফা উসমান আবার আমরকে ডেকে পাঠিয়ে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওই আবদুল্লাহ্কেই সমগ্র মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে উসমানের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা নতুন শাসনের ভারে বিধ্বস্ত হয়ে সম্রাট কনস্ট্যান্সের কাছে ফের এই শহর ফেরৎ নেওয়ার অনুরোধ জানালেন।[২০] সম্রাট কনস্ট্যান্স এক আর্মেনীয় ম্যানুয়েলের নেতৃত্বে ৩০০ জাহাজ পাঠিয়ে আবার আলেকজান্দ্রিয়া দখলে উদ্যত হলেন। তারা প্রায় ১০০০ আরব সেনাকে হত্যা করে আলেকজান্দ্রিয়াকে আবার বাইজানটাইন -এর দখলে আনল। শুধু দখল আনাই নয় এরপর থেকে আলেকজান্দ্রিয়াকে আরব অধিকৃত মিশর আক্রমণের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হল। এসব কাণ্ড দেখে আমরকে আরবশাসকরা আবার মিশরের দায়িত্ব দিলেন। তিনি কিন্তু বাইজানটাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নিকিউ নামে স্থানে জোর সংঘর্ষ হয়। বাইজানটাইন বাহিনীর বহু সৈন্য এই সংঘর্ষে মারা যায়। ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় আলেকজান্দ্রিয়া আবার আরব দখলে এল। দুর্ভেদ্য প্রাচীর গুঁড়িয়ে ভেঙে ফেলা হল। সেই থেকেই প্রাচীন মিশরের এই রাজধানী মুসলিম শাসকদের হাতে রয়েছে।

● আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার

এমন এক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে, খলিফার নির্দেশ মেনে আমর নাকি ৬ মাস ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার অসংখ্য স্নানাগারের অগ্নিকুন্ডে গ্রন্থাগারের মূল্যবান সব বই ফেলে দিয়েছিলেন। এই কাহিনী নিয়ে উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তা ভুল। জুলিয়াস সিজার খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ আব্দে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত এক গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেন। পরে ৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওদোসিয়াসের ইন্ধনে অন্য একটি সহযোগী গ্রন্থাগার ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এরপর আরবরা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করার পর সেখানে সেই অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার ছিলই না। সমকালীন কোন লেখক কিন্তু আমর কিংবা উমারের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার নষ্টের কোন অভিযোগ তোলেননি। আবদ-আল-লতিফ আল বাগদাদি[২১] হিজিরা সন ৬২৯ অব্দে (১২৩১ খ্রিঃ) মারা যান। সম্ভবত তিনিই এই আজগুবি কাহিনী রটান। অবশ্য কেন তিনি এমন প্রচার করেন, জানা যায়নি। তবে তার বক্তব্য পরবর্তীকালে লেখকরা আরও অতিরঞ্জিত করেছেন।[২২]

আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের পর উসমান চেয়েছিলেন, আমরই সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বে থাকুন। আর আবদুল্লাহ্ হোক আর্থিক দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই প্রস্তাবের উত্তরে আমর বলেন : এমন হলে আমার অবস্থা হবে সেই লোকের মতো যে গরুর দুধ দোয়ার সময় তার শিঙদুটিকে ধরে রাখে। আর অন্যরা দুধ দুয়ে নেয়।[২৩] এরপর আবদুল্লাহ্কে খলিফার সহযোগী হিসেবে নেওয়া হয়।

যোদ্ধার চেয়ে আর্থিক-পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই আবদুল্লাহ্ পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্তে হানা দিয়ে যুদ্ধ করে লুণ্ঠিত দ্রব্য এনে সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি দুদিকেই সীমান্ত বাড়াতে সফল হলেন। তবে তার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রথম মুসলিম

নৌবহর গঠন। একই সঙ্গে সিরিয়ার রাজ্যপাল মু'আবিয়াও এই নৌবহর গঠনের ব্যাপারে সমান কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠল মিশরিয় নৌবহরের প্রধান বন্দর। কখনও আবদুল্লাহ্র নেতৃত্বে মিশর থেকে বা কখনও মু'আবিয়ার নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে বাইজান্টাইন বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালানো হত। ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া সাইপ্রাস দখল করলেন। সাইপ্রাসের তখন নাম ছিল কাবরাস। অপর বাইজান্টাইন নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল সিরিয়া উপকূলের গা ঘেঁষা। ফলে বিপদও ছিল। মুসলিম বাহিনীর নৌযুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য এটাই এবং এর মধ্য দিয়ে এই দ্বীপ মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। পরের বছর সিরিয়া উপকূলের নিকটবর্তী আরেওয়াদ (আরাদুস) দখল করা হল। ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লাহ্ শক্তিমান গ্রিক নৌবহরকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে উৎখাত করলেন। দু'বছর পর মু'আবিয়ার এক ক্যাপ্টেন রৌডস দেশে লুঠতরাজ চালান।[২৪] ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে[২৫] মু'আবিয়ার নেতৃত্বে সিরিয়া এবং মিশরের যৌথ নৌবহর আর আবদুল্লাহ্ মিলে বাইজান্টাইন নৌবহিনীর ৫০০ জাহাজকে ধ্বংস করে। ফিনিক্সের কাছে—লিসিয়ান উপকূলে এই ধ্বংসকাণ্ড চলে। সম্রাট দ্বিতীয় কনস্ট্যান্স এই যুদ্ধে নিজে হাজির ছিলেন। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এই যুদ্ধ আরব ইতিহাসে যু-আল-সাওয়ারি[২৬] (অর্থাৎ মাস্তুল-যুদ্ধ) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ বাইজান্টাইন নৌবাহিনীকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করালেও তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে ধ্বংস করতে পারেনি।[২৭] অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি বিজয়লাভে সমর্থ হল না। তাদের মুল লক্ষ্য ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল জয়। সেই অভীষ্ট সাধনেও ব্যর্থ হল মুসলিম বাহিনী। ৬৬৮ বা ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২০০ রণতরীর এক নৌসেনাদল আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিসিলি (সিকিল্লিয়াহ্) পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং সেখানে লুঠতরাজ চালিয়ে আসে। এর আগে মু'আবিয়ার[২৮] নেতৃত্বে এই দ্বীপ আরও একবার আক্রান্ত হয়। সেটা ছিল ৬৫২ খ্রিঃ। মু'আবিয়া এবং আবদুল্লার আমলে।[২৯]

এইসব নৌ অভিযান যে মদীনার খলিফার সহযোগিতা নিয়েই চালানো হত তা তদানীন্তনকালের তাৎপর্যপূর্ণ লেখা থেকেই প্রমাণিত। ওই লেখা উমার লেখেন মিশরের আমরকে। তিনি লেখেন, 'আমার এবং তোমার মধ্যে পানিতে যেন কোন হস্তক্ষেপ না ঘটে। শুধু এমন কোন জায়গায় ঘাঁটি করোও না যেখানে আমি ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারব না।''[৩০] উসমান মু'আবিয়ার সাইপ্রাস অভিযান অনুমোদন করেন। এর আগে মু'আবিয়া বারবার উসমানকে জানান যে, এই দ্বীপটিতে অভিযান চালানো উচিত। আর অভিযান চালানোর শর্তও ছিল একটি। অভিযান চালানোর সময় মু'আবিয়া তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমোদন আদায় করলেন।[৩১]

মিশরের পতনের ফলে বাইজান্টাইন-এর পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশগুলির প্রতিরক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। একইসঙ্গে উপর্যুপরি আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রমণ ওইসব প্রদেশগুলির জয়ই ত্বরান্বিত করে তুলল। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রথম পতনের পর এবং তার পশ্চাৎভাগকে

সুরক্ষিত রাখতে আমর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অশ্বারোহী বাহিনীকে পশ্চিমমুখে নিকটবর্তী পেন্টাপোলিসে পাঠালেন। তাঁর সেনাদল বিনা প্রতিরোধে দখল করে নিল বারকা। পাশাপাশি তিনি লাওয়াতাহ্-সহ ত্রিপোলির বার্বার উপজাতিদের সহযোগিতা পেলেন।[illegible] আমরের উত্তরাধিকারী আবদুল্লাহ্ ত্রিপোলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি ইফরিকিয়ার একটি অংশ দখল করলেন। ইফরিকিয়ার রাজধানী ছিল কার্থেজ (কার্তাজান)। এই কার্থেজকে নজরানা হিসেবে পেলেন তিনি।[illegible] উসমান পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী বর্বরদেরও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাদের শাস্ত্রসম্মত পূর্ণ সম্মান না দিতে পারলেও তিনি যিম্মীর সম্মান দিয়েছিলেন। এছাড়া দক্ষিণে নুবিয়াকে দখল করতেও চেষ্টা চালানো হয়। এখানকার অধিবাসীরা সবদিক দিকে আরবীয়দের মতো ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের আগে কয়েক শতক ধরে মিশরে কমবেশি পরিমাণে আরবীয় অনুপ্রবেশ চলতই। এমন কী সুদানেও বিস্তৃত ছিল তাঁদের উপদ্রব। ৬৫২ খ্রিঃ আবদুল্লাহ্ নুবিয়াবাসীদের[illegible] সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তাঁরা কিন্তু সেসময় নতিস্বীকার করার অবস্থান থেকে অনেক দূরে ছিলেন। এরপর কয়েকশতক নুবিয়া খ্রিস্টান রাজত্ব চালায়। এর রাজধানী ছিল ডোঙলা। লিবিয় এবং নিগ্রো জনগোষ্ঠীর মানুষই ছিলেন নুবিয়ার অধিবাসী। কিন্তু এঁরাই মুসলিম বাহিনীর বিজয়কে দক্ষিণে আরও সম্প্রসারিত করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ❑

● টীকা ●

১ ইবন, 'আবদ্-আল-হাকাম্। ফুতুহু মিসর, সংস্করণ সি. সি. টোরি (নিউ হেভেন, ১৯২২) ৫৩ পৃঃ।

২ ইয়াকুবি, খণ্ড-২, পৃঃ ১৬৮-৬৯, নেওয়া হয়েছে ইবন 'আবদ্-আল-হাকাম, পৃঃ ৫৬-৫৭; জে, ওয়েলহসেন, 'স্কিজেন উণ্ড ভোরারবিতেন, খণ্ড-৬, 'প্রোলেগোমেনা, যুর আলতেসতেন জেসাইট দেস ইসলামস্' (বার্লিন, ১৮৯৯), ৯৩ পৃঃ।

৩ ইবন-হাযার, আল ইসাবাহ ফি তামঈয আল সাহাবা, খণ্ড ৫ (কায়রো, ১৯০৭) ৩ পৃঃ।

৪ ওলমস্টিভের 'হিস্ট্রি অফ্ প্যালেস্টাইন', ৪৪-৪৮ পৃঃ।

৫ ঈজিপ্ট জয়ের অন্যান্য তারিখের মত এটির বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাবরি খণ্ড-১, পৃঃ ২৫৯২, ১, ১৬, বাছতে পারেন রাবি ১, ১৬ (সম্ভবত ৬৩৭)—কে ঈজিপ্ট জয়ের তারিখ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। নেওয়া হয়েছে ইবন-আবদ্ আল-হাকাম ৫৩-৫৮ পৃঃ।

৬ এ. জে. বাটলার. "দ্য আরব কনকয়েস্ট অফ্ ঈজিপ্ট (অক্সফোর্ড ১৯০২) ২৪৫-৪৭ পৃঃ।

৭ 'দ্য স্প্রিং অফ্ দ্য সান'—পঙ্‌ক্তিটির অর্থ. প্রাচীন হেলিওপোলিস ভাষায় লেখা, ওল্ড টেস্টামেন্টের ওপর এবং হায়রোগ্লিফিক অক্ষর খোদাই করা।

৮ ইবন-আবদ-আল হাকাম, ৬৫ পৃঃ।

৯ বালাযুরি, ২১৩ পৃঃ = হিট্টি ৩৩৬ পৃঃ, ইবন-আবদ-আল হাকাম, ৬১ ও পরবর্তী পৃঃ।

১০ আরবীয়রা পরবর্তীকালে এদের 'আমুদ-আল সওয়ারি' বলে ডাকতেন। সেখানে আজও

একটি স্তম্ভ স্মৃতি হিসেবে রয়েছে। মাকরিজি. মাওয়াইজ, সম্পাদনা ওয়েট. ৩ খণ্ড. ১২৮ ও পরবর্তী পৃঃ।

১১ আরবদের কায়সারিয়া। ইবন-আবদ-আল হাকাম। ৪১-৪২ পৃঃ।

১২ মাকরিজি দেখুন, ৩ খণ্ড, ১১৩-৪৩ পৃঃ। সুয়ুতি, হুসন, ১ম খণ্ড, ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা।

১৩ এইচ জোটেনবার্গ, Chronique de Jean. Ivique de Nikioe Texte ethuopien. অনুবাদ সহ ৪৫০ পৃঃ।

১৪ ইবন আবদ-আল হাকাম. ৮২ পৃঃ : তুলনীয় ঃ জোটেনবার্গ ৪৬৩ পৃঃ।

১৫ ৫৮-৫৯ পৃঃ।

১৬ লাতিন ফস্যাটাম এর অর্থ শিবির। বাইজান্টাইন হতে গ্রিক শব্দ 'ফস্যাতুন'।

১৭ প্রাচীন ক্লিজমা আধুনিক কালের সুয়েজ।

১৮ তুলনীয় : মাসউদি, চতুর্থ খণ্ড, ৯৯ পৃঃ।

১৯ ইয়াকুবি. দ্বিতীয় খণ্ড. ১৭৭ পৃঃ।

২০ বালাযুরি. ২২১ পৃঃ = হিট্টি ৩৪৭-৪৮ পৃঃ।

২১ আল ইফাদা ওয়াল ইতিবার সম্পাদনা ও অনুবাদ (লাতিন) জে হোয়াইট (অক্সফোর্ড, ১৮০০) ১১৪ পৃঃ।

২২ আল-কিফতি, 'তারিখ আল হুকামা' সম্পাদনা : জে লিপার্ট (লিপজিগ, ১৯০৩), ৩৫৫-৩৫৬ পৃঃ। আবু আল ফারাজ ইবন আল ইবরি, তারিখ মুখতাসার আল দুওয়াল, সম্পাদনা এ সালিহানি (বেইরুট, ১৮৯০), ১৭৫-১৭৬ পৃঃ। মাকরিজি, ৩ খণ্ড, ১২৯-৩০ পৃঃ। দেখুন বাটলার, ৪০১-৪২৬ পৃঃ। গিবন, 'ডিক্লাইন' সম্পাদনা : বিউরি, পঞ্চম খণ্ড, ৪৫২-৪৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩ ইবন আবদ-আল হাকাম, ১৭৮ পৃঃ। তুলনীয় : বালাযুরি, ২২৩ পৃষ্ঠা = হিট্টি, ৩৫১ পৃষ্ঠা।

২৪ আল হিজরা সন ৫২ অব্দে এক অভিযান চালানোর কথা বালাযুরিতে উল্লেখ রয়েছে। ২৩৫-২৩৬ পৃষ্ঠা।

২৫ দেখুন সি এইচ বেকার-এর প্রবন্ধ 'আবদ আল্লাহ ইবন সাআদ' এনসাইকোপেডিয়া অব ইসলাম।

২৬ ইবন আবদ-আল হাকাম, ১৮৯-৯১ পৃঃ।

২৭ তুলনীয় : ৬০২ পৃঃ।

২৮ বালাযুরি পৃঃ ২৩৫ = হিট্টি, ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

২৯ এই সময়কার নৌ অভিযান নিয়ে বিশদ যা কিছু পাওয়া যায় তা কিন্তু আরবসূত্র থেকেই।

৩০ ইয়াকুবি, ২ খণ্ড, ১৮০ পৃঃ, ফাখরি, ১১৪ পৃঃ থেকে জানা যাচ্ছে, উমার সাআদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাকে লিখেছিলেন যে খলিফা এবং মুসলিমদের মধ্যে সামুদ্রিক কোন দখলদারি কায়েম যেন না হয়।

৩১ বালাযুরি ১৫২-৫৩ পৃষ্ঠা - হিট্টি. ২৩৫-৩৬ পৃঃ।

৩২ ইয়াকুবি, ২ খণ্ড ১৭৯ পৃঃ।

৩৩ ইবন আবদ-আল হাকিম. ১৮৩ পৃঃ।

৩৪ বালাযুরি. ২৩৭ ২৩৮ পৃঃ।

।। অধ্যায় ১৫ ।।

নতুন সাম্রাজ্যের প্রশাসন

নতুনভাবে দখল করা এই বিশাল ভূখন্ড কীভাবে শাসন করা হবে তা ছিল তখনকার মুসলিম খলিফার সামনে বড় চিন্তা। এক বিশাল বিশ্বজনীন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ এমন সব অসংখ্য শর্ত মেনে বাস করছিলেন, যা ওইসব শর্তের স্রষ্টারাই ভেবেচিন্তে রচনা করেননি। এই জনগোষ্ঠীর চাহিদার মুখোমুখি সেকেলে, প্রাচীন আরব্য সমাজের অসংকলিত আদেশ এবং উপদেশ কীভাবে পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী করা যায়, তা ছিল মুসলিম শাসকদের কাছে মস্ত সমস্যা। খলিফা উমারই কিন্তু প্রথম এই সব সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। বরাবরই এমন সব সমস্যার সহজ সমাধান করাটাই তাঁর স্বভাব ছিল। এভাবেই তিনি ইসলামি ধর্মশাসনের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে ওঠেন। এটা ছিল কতকটা কাল্পনিক ইসলামি সাম্রাজ্যগোছের, যা অবশ্য বেশিকাল টেকেনি।

● উমারের সংবিধান

উমারের তত্ত্বের শুরুর কথা এই ছিল যে, এই উপদ্বীপে মুসলিম ধর্মমতকে কখনও গ্রাহ্য করা হয়নি। তাই প্রচন্ড ক্ষোভে এবং পুরানো সব চুক্তির[১] প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তিনি ওই ভূখন্ড থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে খাইবার[২] এর ইহুদিদেরও বিতাড়িত করেন। এটা ১৪-১৫ হিজরী সন (৬৩৫-৬৩৬ খ্রিঃ)-এর ঘটনা। বিতাড়িত হয়ে ওইসব ইহুদিরা জেরিকো এবং তার আশপাশে আস্তানা গড়লেন। এছাড়া নাজরানের খ্রিস্টানদেরও দেশ থেকে তাড়ালেন উমার। তাঁরা পালিয়ে সিরিয়া এবং আল-ইরাকে[৩] চলে গেলেন। উমারের তত্ত্বকথার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, আরব্য জনগণকে সংগঠিত করা। অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানকে এক পূর্ণ ধর্মীয়-সামরিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শরিক করে তুলে তাঁদের পবিত্র এবং নিখাদ রাখতে সাহায্য করতে চাইলেন তিনি। এজন্য তিনি আরব্য নন, এমন মানুষজনকে সমান অধিকার বা নাগরিকত্ব দিতেও নারাজ হলেন। ঠিক হল, আরব্য মুসলমানরা এই উপদ্বীপের বাইরে কোন জমির মালিক হতে পারবেন না বা চাষবাসও করতে পারবেন না। আর উপদ্বীপের যেসব অধিবাসী জমির মালিক তাদের এক ধরনের কর (উশর) দিতে হবে। পাশাপাশি, সিরিয়ার আরব বিজয়ীরা বিভিন্ন শিবিরে বসবাস শুরু করল। আল-জাবিয়া, হিমস, আমাওয়াস, তাবারিয়্যা[৪] (জর্ডনের জেলা), আল-লুদ (মতান্তরে লিড্ডা) এবং ফিলাস্তিন (ফিলিস্তিন) জেলায় এইসব

শিবির ছিল। মিশরে তাঁরা আল-ফুসতাত এবং আলেকজান্দ্রিয়া শিবিরে রয়ে গেল। আল-ইরাকে নতুনভাবে নির্মিত আল-কুফা এবং আল-বসরাই তাদের প্রধান দপ্তর[৫] হিসেবে কাজ করতে লাগল। দখল করা ভূখন্ডের অধীনস্থ মানুষজন নিজ নিজ পেশা এবং চাষবাস নিয়েই রইলেন। তাঁদের নতুন শাসকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দিতেন। মুসলমানদের কল্যাণে (মাদ্দাত আল-মুসলিমীন)[২] এই সব প্রজাদের কাজে লাগানোর জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হত। এমন কী আরব নন, এমন কেউ ইসলামধর্ম নিলেও তিনি আরবীয় মুসলিমের সমান অধিকার বা সুযোগ সুবিধা পেতেন না।

যিম্মীদের[১] মতো অধীনস্থ প্রজারা মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করতেন। এদের কোনরকম ফৌজি কাজ করতে হত না। কারণ ধর্মের নির্দেশে এদের মুসলিম সেনাবাহিনীতে কাজ করানোয় নিষেধাজ্ঞা ছিল।। কিন্তু তাঁদের বছরে মোটা অর্থ রাজস্ব দিতে হত। মুসলিম আইনের চৌহদ্দির বাইরে থেকেও তাদের নিজস্ব ধর্মগুরুদের অধীনে ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে চলতে পারতেন তাঁরা। এই আংশিক স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তুরস্কের সুলতানরাও মেনে নিয়েছিলেন। আরবের সমস্ত প্রদেশে এই স্বাধীনতা দেওয়া হত।

কোন প্রজা ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে তিনি মুক্ত মানুষে পরিণত হয়েছেন বলে ধরা হত। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী উমার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মাথাপিছু কর-সহ নানারকম কর আরোপ করতেন এঁদের ওপর। কোন জমি 'ফাই' বা 'ওয়াকফ' (অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম সমাজের) সম্পত্তি হলেই সেই জমির জন্য ভূমিকর দিতে হত। মুসলমানরা সর্বদা এই কর দিতেন। শুধু ব্যতিক্রম ছিল সেইসব 'ফাই' ভূমির ক্ষেত্রে যেসব জেলার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় আরব শাসকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আর তাঁদের আত্মসমর্পণের শর্ত ছিল এই যে, তাঁদের নিজস্ব জমির প্রতি অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে না। এইসব জেলাকে বলা হত দার আল-সুল্‌হ্ (অর্থাৎ শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ভূখণ্ড)। ইসলামে নবদীক্ষিতদের মাথাপিছু কর দিতে হত না। তবে এক নতুন বাধ্যবাধকতা ছিল। তা হল যাকাহ্ (গরিব কর)। আবার অন্যদিকে মুসলমানরা যে পেনসন এবং অন্য সুবিধা পেতেন তারাও তা পেতেন।

পরবর্তীকালে যে অগ্রগতি এই ব্যাপারে হয় তা বহু বছর ধরে উমারের অনুসৃত নীতি প্রয়োগের ধারাবাহিকতাতেই বিকশিত হয়। প্রথমদিককার খলিফারা এবং গোড়ার দিকের মুসলিম শাসকরা কর আরোপ এবং অর্থ-প্রশাসন চালানোর প্রশ্নে যে ভূমিকা নেন তা খুব একটা মৌলিক ছিল না। কারণ বাইজানটাইন শাসকরা সিরিয়া এবং মিশরে যে কর কাঠামো এবং আর্থিক প্রশাসনের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন তাই-ই আল্লাহ্‌র নামে নবীকরণ করা হয়। পূর্বের পারসি ভূসম্পত্তির স্থানীয় প্রশাসনে কোন বড়সড় পরিবর্তন করা হয়নি। গোড়া থেকেই জমির প্রকৃতি অনুযায়ী কর হারের তারতম্য ছিল। আর সাবেক শাসনে (বাইজানটাইন বা পারসি) যে-অঞ্চলে যে-নিয়ম প্রচলিত ছিল তাই-ই বহাল রাখা হয়। কোথায় কীভাবে জমি করায়ত্ত হয়েছে—তা বলপূর্বক দখল করে (আনওয়াতন) বা শর্তাধীনে সমর্পণ করে

(সুলহান) বা উমারের[৮] আইনি নির্দেশে, তা সবক্ষেত্রে ধর্তব্যে আনা হত না। বলপূর্বক দখল এবং স্বেচ্ছাসমর্পণের প্রশ্নটি কখনও হয়তো জমির কর স্থির করার ক্ষেত্রে মূল কারণ না হয়ে আইনি অজুহাত হিসেবে দেখা দিত। একইভাবে দ্বিতীয় খলিফার (৬৩৪-৪৪) আমলেও 'জিয্‌য়া'কর এবং 'খারাজ' (গ্রিক 'কোরেজিয়া' বা আরামীয় ভাষায় 'কেরাগ্গা' থেকে)-এর মধ্যে কোন ফারাক ছিল না। সেসময় দুটি শব্দই একই অর্থে ব্যবহৃত হত। দুটির অর্থই ছিল কর। কোরানের সূরাহ্ ৯ : ২৯ অংশে একবার 'জিয্‌য়া' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে কিন্তু এর কোন আইনি অর্থ দেওয়া হয়নি। একবার কোরানে (২৩ : ৭৪) 'খারাজ' শব্দটিরও উল্লেখ রয়েছে। সেখানে তা 'জমির কর' অর্থে উল্লেখ না করে বরং 'পারিশ্রমিক' হিসেবে দেখানো হয়েছে। মনে হয়, ওইসব ক্ষেত্রে মুসলিমরা যে পরিভাষা ব্যবহার করতেন তা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা নথিবদ্ধ করায় সময় ভুল করেছেন। ফলে পরবর্তীকালে স্থান-কাল দেখে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

উমাইয়া আমলের আগে 'জিয্‌য়া' এবং 'খারাজ' এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। জমির কর কিস্তিতে দেওয়া যেত। আবার অর্থে না-দিয়ে জমিতে উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশুজাত দ্রব্যাদি দিয়েও তা পুষিয়ে দেওয়া যেত। তবে মদ, শুকর বা মৃত পশুর বিনিময়ে কোনরকম রফা সম্ভব ছিল না। মাথাপিছু ধার্য কর (বা মাথট) এক দফায় দিলেই চলত। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী এর হার নানারকম ছিল। সচ্ছল পরিবারের জন্য এই করহার ছিল জনপ্রতি চার দীনার,[৯] মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের জন্য ছিল জনপ্রতি দুই দীনার, গরিবদের জন্য ছিল জনপ্রতি এক দীনার। এছাড়া মুসলিম সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হত। এই কর শুধুমাত্র সক্ষম মানুষকেই দিতে হত। মহিলা, শিশু, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, উন্মাদ এবং যারা দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন—তাঁদের এই কর দিতে হত না। তবে এইসব শ্রেণীর মধ্যে পড়েও যদি তাদের স্বাধীন উপার্জনের ব্যবস্থা থাকত তা হলে তাকে কর দিতে হত।

উমার তাঁর পারিষদদের[১০] পরামর্শে আর যে ঘোষণা করেছিলেন, তা হল—একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি ও যেসব বন্দিকে যুদ্ধে জিতে পাওয়া গেছে তা নিয়েই গানিমা[১১] গঠিত হবে। যোদ্ধাদের বা সৈন্যদের সম্পত্তি বলতে এটাই ছিল। কিন্তু জমি তারা ভোগ করতে পারত না। জমি এবং প্রজাদের থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত অর্থ নিয়ে গঠিত হত 'ফাই'[১২] এবং তা ছিল সমগ্র মুসলমান সমাজের জন্য। 'ফাই'-এর অর্ন্তভুক্ত যেকোন জমি চাষ করলেই জমি কর দিতে হত। এমন কী সেই কৃষক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও রেহাই পেতেন না। এই সব রাজস্ব রাজকোষাগারে জমা হত। এই অর্থ থেকে প্রশাসন খরচ এবং যুদ্ধের খরচ চালানোর পর যা বাঁচত তা মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। ওই ভাগ করার কাজটা যথাযথভাবে করতে আদমশুমারি জরুরি হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এভাবে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব সমবন্টনের উদ্দেশ্যেই প্রথম আদমশুমারি শুরু হয়। এই পেনসন প্রাপকদের তালিকায় শীর্ষে

নাম থাকত 'আয়িশা-র'। তিনি বছরে ১২ হাজার দিরহাম[১৩] করে পেতেন। মুহাম্মাদের পরিবারের (আহ্‌ল আল-বাইত) পরেই নাম থাকত মুহাজির বা দেশান্তরী এবং তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের। তাঁদের পূর্বসূরিরা যে যেরকম পেশায় ছিলেন সেই মতো এঁরা প্রত্যেকে বছরে ৪০০০ থেকে ৫০০০ দিরহাম পেনসন পেতেন।[১৪] তালিকার সর্বনিম্নে ছিলেন আরব্য জনগণ। কে কতকাল সামরিক বাহিনীতে চাকরি করেছেন এবং 'কোরানে' কার জ্ঞান কত বেশি—এই নিরিখে এদের পেনসন হার নির্দিষ্ট হত। তবে যেকোন সাধারণ যোদ্ধা বছরে ৫০০-৬০০ দিরহাম পেতেন। এমন কী মহিলা, শিশু এবং অনুচরদের[১৫] নামও এই তালিকায় ছিল। এরা ২০০ থেকে ৬০০ দিরহাম পর্যন্ত পেত। এই 'দিওয়ান' (শুল্কভবন বোঝাতে ফরাসি ভাষায় দউয়ানে ব্যবহৃত হয়) বা আয়-ব্যয়ের সরকারি হিসাব ব্যবস্থা, উমার পারস্য ব্যবস্থা থেকে নিয়েছিলেন। পারস্যেও ছিল এই ব্যবস্থা এবং পারসি 'দিওয়ান' শব্দটাই তা নির্দেশ করে। ইবন-আল-ত্তিকতাকা এরূপ বলেছেন।[১৬]

উমারের সামরিক সংবিধান আরব্য প্রভাবেই গঠিত হয়। এই সংবিধানে অ-আরব্য মুসলিমকে অ-আরব্য অমুসলিমের থেকে উঁচু স্থান দেওয়া হয়। তবে সময়ের নিরিখে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা খুব কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উমারের পরবর্তী উত্তরাধিকারী উসমানের আমলেই আরব্য জনগণকে নতুন-দখল-করা ভূখন্ডে জমির মালিকানার অনুমতি দেওয়া হয়। আরও পরে 'মাওয়ালি' সম্প্রদায়ের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরব্য জনগণের আভিজাত্য ধুয়ে মুছে যায়।

● সেনাবাহিনী

যুদ্ধে সেনাবাহিনী ছিল 'উম্‌মাহ' বা সমগ্র দেশবাসী। সেনাবাহিনীর আমীর বা কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন আল-মদীনার খলিফা। তিনিই আবার তার লেফটেন্যান্ট বা জেনারেলদের দায়িত্ব বন্টন করে দিতেন। গোড়ার দিকে জেনারেলরা কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ড জয় করতে পারলে তাঁরা সেখানে নামাযের ইমামতি করার এবং বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন। আল-বালাযুরিতে[১৭] বলা রয়েছে, উমার জর্ডন ও দামাস্কাসের জন্য একজন কাযী নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া হিমস এবং কিন্নাসরিনের জন্যও একজন কাযী নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ খলিফা হিসেবে তিনি বিচারালয় প্রতিষ্ঠারও অধিকারী ছিলেন।[১৮]

মুহাম্মাদের সময় থেকেই মুসলিম সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় ভাগ ছাড়া দুটি প্রান্তভাগ ছিল। অগ্রবর্তী এবং পশ্চাৎবর্তী আর তা অজ্ঞাতে বাইজানটাইন ও সাসানীয় অনুপ্রেরণাকে প্রকাশ করেছে। তখন থেকেই সামরিক ইউনিটগুলিকে 'খামিস' (পাঁচ) বলা হত। অশ্বারোহী বাহিনী এই ইউনিটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া ছিল উপজাতি ডিভিশন। প্রতিটি উপজাতি নিজের বল্লমের ডগায় একটুকরো কাপড় বেঁধে রাখত। আর তাদেরই কোন একজন সাহসী ব্যক্তি তা বহন করত। মুহাম্মাদের সেনাবাহিনীর পতাকার নাম ছিল ঈগল (উকাব)। পদাতিক

বাহিনী তীর, ধনুক, ঢাল, তরোয়াল—এসব ব্যবহার করত। তরবারি ডান কাঁধে ঝোলানো এক খাপে থাকত। পরে আবিসিনিয়ার অনুকরণে হারবা (বরশা) চালু করা হয়। অশ্বারোহী বাহিনীর মূল অস্ত্র ছিল বল্লম (রুমা)। আরবী সাহিত্যে যাদের 'খাট্টি' বলা হত। পরে আল-বাহ্‌রাইনে তা 'আল-খাট' নামে পরিচিত হয়। বাহ্‌রাইনেই প্রথম বাঁশগাছ হয়। পরে ভারত থেকে নিয়ে এসে ওখানে প্রচুর বাঁশগাছ বসানো হয়। এইসব বল্লম বাঁশগাছ থেকেই তৈরি হত। তীর, ধনুক এবং বল্লমই ছিল তখনকার জাতীয় অস্ত্র। সেকালে সেরা তরবারিও কিন্তু নির্মিত হত ভারতেই। তার নাম ছিল হিন্দি। ফৌজি বাহিনীর সৈন্যরা আত্মরক্ষা করতে বর্ম এবং ঢাল ব্যবহার করত। আরব অস্ত্র বাইজানটাইনের অস্ত্র থেকে হালকা ছিল।[১৯]

সেকালে যুদ্ধের কলাকৌশলও ছিল প্রাচীন। প্রথমে লড়াকু হিসেবে নামকরা কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে লড়াই শুরু হত। তারা পদমর্যাদা অনুযায়ী এগিয়ে এসে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাত। তারপর তা সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ত। আরব্য যোদ্ধারা পারসি বা বাইজানটাইন সেনাদের থেকে বেশি বেতন পেত। এছাড়া আবশ্যিকভাবে যুদ্ধে দখল করা মালেরও ভাগ পেত। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যুদ্ধবৃত্তি শুধু মহান এবং অত্যন্ত আনন্দকর পেশা বলে নয়, বরং তা খুব লাভজনকও ছিল। মুসলিম আরব্য সেনাবাহিনীর শক্তি, উন্নত অস্ত্র বা সংগঠন দক্ষতা—কোনটির মধ্যেই নিহিত ছিল না। বরং সেনাবাহিনীর বড় গুণ ছিল উচ্চ মূল্যবোধ। এর পিছনে অবশ্যই অবদান ছিল ধর্মের। এছাড়া আরব্য সেনাদের সহিষ্ণুতা ছিল উল্লেখযোগ্য। মরুভূমিতে জন্মানোর ফলে এই গুণ ছিল তাদের সহজাত। আরব্য সেনারা আর যে গুণের অধিকারী ছিলেন, তা হল গতিশীলতা। মূলত যাতায়াতের কাজে উট ব্যবহার আকছার ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়।[২০]

● তথাকথিত আরব সভ্যতা

অর্ধচন্দ্রাকার উর্বরভূমি সমন্বিত তুরস্ক, পারস্য এবং মিশর দখল করে আরব্য শাসকরা শুধু যে কিছু ভূখণ্ডের মালিক হলেন তা নয়—পাশাপাশি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাবেক সভ্যতার সংস্পর্শে এলেন। এভাবে মরুসন্তানরা এক উন্নত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় শরিক হয়ে উঠলেন। যে সংস্কৃতি গ্রিক-রোমান, ইরানি, ফেরাউনি অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয় সংস্কৃতির পথ থেকেই এগিয়েছে। শিল্প ও স্থাপত্যে, দর্শনে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে, সরকার পরিচালনায়, প্রকৃত আরব্য লোকজন কিছুই জানতেন না। সবই শিখতে হয় তাঁদের। তবে নতুন এক সভ্যতার সংস্রবে এসে আরব্য মানুষজনের মধ্যে যে আগ্রহ, উদ্দীপনা দেখা দেয় তা ছিল অভূতপূর্ব। আরবীয় মুসলিমরা প্রজাদের সাহায্য সহযোগিতায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নন্দনতত্ত্বকে পূর্ণ উপলব্ধি, উপযোগী এবং পুনরাবিষ্কার করতে শুরু করে। দামাস্কাস, জেরুসালেম, আলেকজান্দ্রিয়া, টেসিফন, এদেসা, নিসিবিস-এ তারা নতুন সভ্যতার স্থপতি, কারিগর, গহনা নির্মাতা এবং উৎপাদকদের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন, অনুসরণ করলেন

এবং কাজ শিখতে উদ্যোগী হলেন। এইসব প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে এসে তাঁরা ঘুরে দেখে সব জয় করে নিলেন। সেখানে বিজয়ীদেরকে দেখা গেল, তারা বিজিতদের নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ।

'আরব সভ্যতা' বলে আমরা যা বুঝি তা মৌলিকত্ব এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আদৌ আরবীয় নয়। এর মধ্যে আরবের যেটুকু অবদান ছিল তা ভাষাগত এবং নিশ্চিত পরিমাণে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমিত। খলিফাদের আমলে সিরীয়, পারসি, মিশরি এবং অন্যরা (অর্থাৎ মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিতরা বা খ্রিস্টানরা ও ইহুদিরা) ছিল সমাজে আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রতীকস্বরূপ। যেমনভাবে বিজয়ী রোমানদের সঙ্গে গ্রিকরা সম্পর্কযুক্ত ছিল।

আরব ইসলামি সভ্যতা তৃণমূলে গ্রিক ও সিরীয় এবং ইরানি সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। আর খলিফাদের আমলে তাদের ছত্রছায়ায় প্রকাশের মাধ্যম ছিল কিন্তু আরবী ভাষা। ঘুরিয়ে বলতে গেলে, যে সাবেক সেমেটিক সভ্যতা অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়, আরামিয়, ফিনিশিয় এবং হিব্রু ধারার মারফত বিকশিত হয়, তারই যুক্তিযুক্ত পরিণতি ছিল আরব ইসলামি সভ্যতা। এই সভ্যতার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার ঐক্য পরিণতি লাভ করে।

● নিষ্ঠাবান খলিফাদের চরিত্র এবং কৃতিত্ব

আবু-বকরের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর বিজয়রথ যাত্রা শুরু করে উমারের আমলে এক অভাবনীয় সাফল্যের পর সাময়িক থমকে দাঁড়াল। কারণ এক খলিফা আলী অভ্যন্তরীণ বিরোধে এতই জর্জরিত ছিলেন যে, আর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মুহাম্মাদের পর একটি প্রজন্মের যুগ শেষ হতে মুসলিম সাম্রাজ্য অকসাস থেকে উত্তর আফ্রিকায় সিরটিস মাইনর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। শূন্য থেকে শুরু করে মুসলমান আরব্য খিলাফত বিশ্বের সেরা শক্তিতে পরিণত হল।

আবু-বকর (৬৩২-৬৩৪) ছিলেন আরবের বিজয়ী ও শান্তিস্থাপক খলিফা। তিনি পিতৃতান্ত্রিক সরলতা নিয়েই জীবনযাপন করতেন। তাঁর আমলে প্রথম ৫ মাসে তিনি প্রতিদিন আল-সুনহ (যেখানে তিনি স্ত্রী হাবিবার সঙ্গে সাধারণ জীবনযাপন করতেন) থেকে মদীনা আসা-যাওয়া করতেন। অথচ এই সময় তিনি কোনও আনুতোষিকও পাননি। কারণ তখন রাষ্ট্রের প্রায় কোন আয় ছিল না।[১১] তিনি মুহাম্মাদের মসজিদের উঠানে বসে রাজকার্য সম্পাদন করতেন। তাঁর যোগ্যতা এবং জামাতা মুহাম্মাদের প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থাই (জামাতা তার চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন) তাঁকে ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত আকর্ষক চরিত্রে পরিণত করে। এই গুণের জন্যই তিনি আল-সিদ্দিক (বিশ্বাসী)[১২] উপাধি পান। চরিত্রগতভাবে তাঁকে যেভাবে ভাবা হত তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়তা এবং সাহস তাঁর ছিল। শারীরিকভাবে তার সুদর্শন চেহারা, নির্মেদ সুঠাম দেহ ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি তাঁর দাড়িতে কলপ করতেন আর হাঁটতেন নতমুখে।[১৩]

তাঁরই উৎসাহী, প্রতিভাবান উত্তরাধিকারী হচ্ছেন উমার (৬৩৪-৪৪)। তিনি ছিলেন সরল এবং মিতব্যয়ী। লম্বা চওড়া, সুঠামদেহী, টাক মাথার[২৪] উমার খলিফা হবার পরও বেশ কিছুকাল নিজস্ব ব্যবসা চালাতেন। তিনি সারা জীবন বেদুইন শেইখদের মতো অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন। কার্যত 'উমার' সাবেক ইসলামি ইতিহাসে মুহাম্মাদের পরই স্থান পেয়েছেন। তাঁর সরলতা, পবিত্রতা, ন্যায়বিচারের সুবাদে মুসলিম লেখকরা তাঁকে সেভাবেই চিত্রিত করে গেছেন। মুসলিম লেখকরা মনে করতেন, একজন যোগ্য খলিফার যা যা গুণ থাকা উচিত, তাই রয়েছে উমারের। তাঁর উত্তরাধিকারীরা সত্যই তার মহৎ চরিত্র মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। শুনেছি, তাঁর একটি মাত্র জামা ছিল। আর একটি মাত্র আঙরাখা ছিল। দুটিই ছিল বহুবার সেলাই করা।[২৫] তিনি ঘুমোতেন খেজুরপাতার তৈরি বিছানায়। ন্যায়বিচার, ইসলামের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ও আরবীয়দের প্রতিপত্তি এবং নিশ্চয়তা রক্ষা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আরবী সাহিত্যে উমারের কৃতিত্বের প্রশংসা করে বহু কাব্য লেখা হয়েছে। মদ্যপায়ী হওয়ায় এবং নৈতিক চরিত্রস্খলন হওয়ায় তিনি তাঁর পুত্রকে মৃত্যুদন্ড দেন।[২৬] একবার এক বেদুইন কারও কাছে অত্যাচারিত হয়ে উমারের কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সেই বেদুইনকে উমার বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। এরপরই নিজের ভুল বুঝতে পেরে উমার বিচলিত হয়ে ওই বেদুইনকে বলেন, 'যতবার তোমাকে বেত মারা হয়েছে, তত ঘা বেত তুমি আমায় মারো।' কিন্তু ওই বেদুইন তাতে রাজি হন না। তখন উমার এই স্বগতোক্তি করতে-করতে বিষণ্ন চিত্তে ঘরে ঢুকে যান :

"ওহে আল-খাত্তাব-এর পুত্র! তুমি যত বিনয়ী হবে আল্লাহ্ তোমাকে তত ভালবাসবেন। তুমি বিপথে গেলে আল্লাহ্ তোমাকে ঠিকপথে চালিত করবেন। তুমি দুর্বল হলে আল্লাহ্ তোমাকে শক্তি যোগাবেন। এভাবে তিনি জনগণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আর তাঁদেরই কেউ যখন এসে তোমার সাহায্য চাইবে তুমি তাকে আঘাত করবে? তা হলে প্রভুর কাছে তুমি মুখ দেখাবে কী করে? ছিঃ ছিঃ।"[২৭]

যে উমার হিজরী সন নির্দিষ্ট করে মুসলিম যুগের পত্তন করেছিলেন, যিনি এক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন, যাঁর আমলে রাষ্ট্রীয় নথিভুক্তিকরণ চালু হয়, যিনি প্রথম সুসংগঠিত মুসলিম প্রশাসন উপহার দেন—সেই উমারের মৃত্যু হয় কিন্তু আচমকাই। ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর এক খ্রিস্টান পারসি ক্রীতদাস[২৮] বিষমাখানো ছুরি দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। হত্যার সময় তিনি নামাযের জামাআতে উপস্থিত ছিলেন। সাম্রাজ্য অধিপতি হিসেবে উমার যখন সবে বিখ্যাত হয়ে উঠছিলেন তখনই তিনি খুন হন।

পরবর্তী খলিফা উসমান মনে করতেন আল্লাহ্‌র কথা মানেই অপরিবর্তনীয়। উসমানের আমলেই ইরান, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার কিছু অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যের দখলে

আসে। উসমান ছিলেন পবিত্র পুরুষ, তবে তাঁর লোভী আত্মীয়পরিজনকে বাধা দেওয়ার মতো দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ্ ছিলেন মুহাম্মাদের শ্রুতিলেখক। তিনি কোরাণের 'রহস্য উদঘাটন'[২৯] পর্বের পাণ্ডুলিপি বিকৃত করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মুহাম্মাদ মক্কা দখলের সময় যে ১০ জনের নাম আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন, তাব নামও ছিল সেই তালিকায়। উসমানের সৎভাই আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন-উকবাহ্ মুহাম্মাদের মুখে থুতু ছিটিয়েছিলেন এবং পরবর্তীরা তাঁকে দোষারোপ করেছেন। অথচ তাকেই উসমান আল-কূফার রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। উসমানের চাচাতো ভাই মারওয়ান ইব্‌ন-আল-হাকাম ছিলেন উমাইয়া খলিফার উত্তরাধিকারী। তাঁকে উসমান 'দিওয়ান' বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এছাড়া মাত্রাহীন স্বজনপোষণ করে উমাইয়া বংশের অনেককে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিযুক্ত করেন।[৩০] এছাড়া খলিফা নিজেও রাজ্যপালদের অথবা তাদের কর্মচারীদের উপহার গ্রহণ করতেন। একবার আল-বাসরার রাজ্যপাল তাঁকে এক সুন্দরী পরিচারিকা উপহার দেন। তিনি তা গ্রহণ করেন। স্বজনপোষণের অভিযোগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়ছিল দিন দিন। পাশাপাশি কুরায়শপন্থি তিনজন তাঁর উত্তরাধিকারের দাবিদার হয়ে ওঠেন। এরা হলেন আলী, তাল্‌হা এবং আল-জুবাইর। আলীর অনুগামীরা আল-কূফায় বিদ্রোহ করেন। মিশরে যে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বেশ ভালই ছিল তা বোঝা যায় ওই বিদ্রোহের বহর দেখে। মিশর থেকে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ৫০০ বিদ্রোহীকে আল-মদীনায় পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা শহরের বিশিষ্ট অশীতিপর বৃদ্ধ খলিফাকে একটি বাড়িতে আটক করে রাখে। এরপর যখন উসমান ওই বাড়িতে কোরান পাঠে রত ছিলেন,[৩১] তখনই বাড়িটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাঁর পূর্বসূরি ও বন্ধু আবুবকরের পুত্র মুহাম্মাদ বলপূর্বক তাঁর ঘরে ঢোকেন এবং প্রথম তাঁর ওপর হিংসাত্মক আচরণ করেন।[৩২] ফলে এই প্রথম মুসলমানদের হাতেই এক মুসলিম খলিফার মৃত্যু হয় (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন)। ইসলামের যুগান্ত সৃষ্টি হয়েছিল মুহাম্মাদের প্রেরণা পেয়ে এবং আল-মদীনার মতো পবিত্রস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত এই বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য শেষপর্যন্ত সিংহাসন দখলের দাবিদারদের অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে পড়ল। আলী এবং তালহা ও আল-জুবাইরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হল। মু'আবিয়াও শামিল হলেন এই লড়াইতে। ☐

● টীকা ●

১ দেখুন ওয়াকিদি, মাগাযি, ৩৯১-৩৯২ পৃষ্ঠা এবং আবু ইউসুফ এর 'কিতাব আল খারাজ' (কায়রো, ১৩৪৬), ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠ। মহম্মদ যে শর্ত দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত আছে।

২ সিরিয়া যাবার রাস্তায় পড়ে আল মদীনার উত্তরে ১০০ মাইল এক মরূদ্যান।

৩ বালাযুরি, ৬৬ পৃঃ হিট্টি, ১০১-১০২ পৃঃ

৪ আধুনিক = তাবারায়া তিবেরিয়া। 'আমোয়াস' বা প্রাচীন এমাউস।

৫ প্রথম মুসলিম শতকে এই ধরনের একাধিক ফৌজি ছাউনি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে ছিল খুজিস্তানের আস্কার মুকরাম, ফারিসের শিরাজ, উভয় আফ্রিকার বারক এবং আল কায়রাওয়ান।

৬ ইয়াহিয়া ইবন আদম, 'কিতাব আল খরাজ' সম্পাদনা জুয়েনবল (লেডেন, ১৮৯৬) ২৭ পৃ।

৭ বা আল আল যিম্মা (অনুগত লোকজন) প্রথমে এই শব্দটি আহ্ল আল কিতাবে প্রয়োগ করা হয় ইহুদি, খ্রিস্টান এবং স্যাবিয়ানদের প্রতি। পরে এদের মধ্যে জরাথুষ্টবাদীদের এবং অন্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮ দেখুন ড্যানিয়েল সি ডেলেট এর কনভারসন অ্যান্ড দি পোল ট্যাক্স ইন আর্লি ইসলাম (কেমব্রিজ, মাস, ১৯৫০) ১২ পৃঃ।

৯ গ্রিক-লাতিন 'ডিনোরিয়াস' থেকে শব্দটি এসেছে। খলিফা আমলে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ছিল প্রায় ৪ গ্রাম। ওমরের আমলে এক দিনার সমান ছিল ১০ দিরহাম। পরে তা ১২ দিরহাম হয়ে দাঁড়ায়।

১০ ইবন -সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছদ ২১ পৃষ্ঠা

১১ গানিমা এবং 'ফাই' নিয়ে আলোচনা হয়েছে 'আল মাওয়ারদি', 'আল আহ্কাম আল সুলতানিয়া'তে। সম্পাদনা এম এনজার (বন, ১৮৫৩), ২১৭-৪৫ পৃষ্ঠা। আবু ইউসুফ ২১-৩২ পৃষ্ঠা।

১২ সূরা অনুযায়ী (৮ : ১২) এই দখল করা মালের এক পঞ্চমাংশ ছিল আল্লা এবং মহম্মদের। অর্থাৎ রাষ্ট্রের। বাকি চার-পঞ্চমাংশ পেতেন যোদ্ধারা।

১৩ দিরহাম (পার্সি 'দিরহাম' থেকে)। আরবীয় আর্থিক ব্যবস্থায় 'দিরহাম' ছিল রৌপ্য মুদ্রা। যুদ্ধপূর্ব ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কের যা মূল্য ছিল 'দিরহাম' এরও তাই মূল্য ছিল। মার্কিন মুদ্রার ১৯ সেন্ট।

১৪ ইবন -সা'দ। ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছদ, ২১৩-১৪ পৃঃ।

১৫ মাওয়ালি বা মাওলা। এরা আরব জনগোষ্ঠীর কেউ ছিল না। ইসলামিদের কাছে এরা ছিল বিরক্তি উদ্দীপক। এরা এক আরব্য উপজাতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলেছিল।

১৬ ফাকরি, ১১৬ পৃঃ, মাওয়ারদি, ৩৪৩-৩৪৪ পৃঃ।

১৭ ১৪১ পৃষ্ঠা = হিট্টি ২১৭ পৃঃ।

১৮ ইবন -সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছদ, ২০২ পৃঃ।

১৯ আরবীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জানতে পড়ুন 'ইবন কুতাইবাহ', উয়ুন, ১ খণ্ড, ১২৮-৩২ পৃষ্ঠা।

২০ বাইজ্যানটাইন সেনাবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করতে পড়ুন চার্লস ওমান এর 'আ হিস্ট্রি অব দি আর্ট অব ওয়ার ইন দি মিডল এজেস' দ্বিতীয় সংস্করণ (লন্ডন, ১৯২৪) ৪ খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

২১ ইবন -সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছদ, ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা। ইবন আল আসীর, উসদ আল গাবাহ ফি মারিফত আল-সাহা'বা (কায়রো, ১২৮৬), ৩ খণ্ড, ২১৯ পৃঃ।

২২ সাধারণভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'সত্যবাদী'। আরও জানতে দেখুন ইবন-সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১২০-২১ পৃষ্ঠা।

২৩ ইয়াকুবি, ২ খণ্ড, ১৫৭ পৃঃ।

২৪ প্রাগুক্ত, ১৮৫ পৃঃ।

২৫ ইবন সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছদ, ২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা।

২৬ দিয়ারবকরি, তারিখ-আল-খামিস (কায়রো, ১৩০২) দ্বিতীয় খণ্ড, ২৮১ পৃঃ ॥ ৩-৪; আল নুওয়ায়রি, নিহায়েত আল-আরব, চতুর্থ খণ্ড (কায়রো, ১৯২৫), ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা।

২৭ ইবন আল আসীর, চতুর্থ খণ্ড, ৬১ পৃঃ।

২৮ তাবারী, ১ খণ্ড, ২৭২২-৩২ ; ইয়াকুবি, ২ খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ।

২৯ কোরান ৬ : ৯৩ ; বাইজাবি, ১ খণ্ড, ৩০০ পৃঃ।

৩০ ইবন-হাজার, চতুর্থ খণ্ড, ২২৩-২২৪ ; ইবন সা'দ; ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪৪ পৃষ্ঠা, মাসউদী, চতুর্থ খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৩১ ইবন বতুতা (১৩৭৭), ২ খণ্ড, ১০-১১ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন, তিনি যখন আল বসরার মসজিদ দেখতে গিয়েছিলেন তখনও ওখানে উসমানের কোরানটি সুরক্ষিত ছিল। সেই কোরানটির পাতায় ছিল উসমানের রক্তের দাগ। সেই পাতাতেই ছিল কোরানের সূরা ২:১৩১ ভাগ। ইবন-সা'দের (৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৫২ পৃঃ) ওই পাতাতেই আহত খলিফার দেহ থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ার পর তাঁর জীবনদীপ স্তব্ধ হয়ে যায়।

৩২ ইবন-সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৫১ পৃষ্ঠা।

॥ অধ্যায় ১৬ ॥

খিলাফত নিয়ে আলী এবং মু'আবিয়ার সংগ্রাম

● খিলাফতের মনোনয়ন-সংক্রান্ত

মুহাম্মাদের অন্যতম পুরানো সমর্থক এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আবু-বকর। মুহাম্মাদের অন্তিম জীবনের অসুস্থতার সময় নামাযের ইমামতি করেছিলেন মুহাম্মাদের এই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আল-মদীনায় বহু মুসলিম নেতার উপস্থিতিতে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আবু-বকরের নাম স্থির হয়। এরপর থেকে তিনি মুহাম্মাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। বিনিময়ে মুহাম্মাদ যেসব সুবিধা ভোগ করতেন, তিনিও তা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। তবে ব্যতিক্রম ছিল পয়গম্বরি-বিষয়ক ব্যাপারগুলি। সেগুলি মুহাম্মাদের মৃত্যুর সঙ্গে লোপ পায়।

'খলীফাত রাসূল আল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র দূতের উত্তরাধিকারী) যে 'পদ' আবু-বকরকে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি সম্ভবত 'উপাধি' হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন না। কোরানে 'খলিফা' শব্দটি মাত্র দুবারই উচ্চারিত হয়েছে (২ : ২৮, ৩৮ : ২৫)। অন্য কোন ক্ষেত্রেই এই পদটি তেমন কোন তাৎপর্য পায়নি বা এর অর্থ যে মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারী— তার কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

আবু-বকরের পর নিয়মমাফিকই মুহাম্মাদের উত্তরাধিকারী হবার কথা ছিল উমারের। আবু-বকরই তাঁকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে দেন। তিনি আবার প্রথম খলীফাত খলীফাত (অর্থাৎ খলিফার খলিফা) রসূল আল্লাহ্ উপাধি তাঁর নামের আগে ব্যবহার করতে থাকেন। এটা পরে অবশ্য খুব দীর্ঘ বলে মনে হয় উমারের। তাই নিজেই তা সংক্ষিপ্ত করে নেন।[১] দ্বিতীয় খলিফাই (৬৩৪-৪৪) প্রথম মুসলিম সেনাবাহিনীর 'কমান্ডার ইন চিফ' বা সেনাপ্রধান হিসেবে 'আমীর-আল মু'মিনিন' (অর্থাৎ মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীদের নায়ক) এবং মধ্যযুগের খ্রিষ্টান লেখকদের ভাষায় 'মিরামলিন' উপাধিতে ভূষিত হন। মৃত্যুর আগে উমার ৬ সদস্যের এক পর্ষদ মনোনীত করে যান। এদেরই ওপর ভার ছিল পরবর্তী খলিফা বাছাই করার। এই ৬ জন হলেন, আলী-ইব্‌ন আবি-তালিব, উসমান-ইব্‌ন-আফফান, আল-জুবাইর-ইব্‌ন-আল-আওওয়াম, তালহা ইব্‌ন-আবদুল্লাহ্, সা'দ ইব্‌ন-আবি-ওয়াক্কস, আবদ-আল-রহমান ইব্‌ন-আওফ। উমার এই ভেবে পর্ষদ মনোনীত

করেছিলেন যে, নয়তো নির্ঘাত তাঁর পুত্র জোর করে খলিফা হয়ে যাবেন। তিনি তাঁর বিরোধী ছিলেন। এই পর্ষদ গঠনকে বলা হয় 'আল-শূরা'। পর্ষদে প্রবীণ এবং বিশিষ্ট সাহাবাগণ নেতা হন। সাবেক আরবে এইভাবেই উপজাতি প্রধান বাছাই করা হত। মূলত তার অনুকরণেই এই পর্ষদ গঠন করা হয়।

তৃতীয় খলিফা উসমানের নির্বাচনের সময় আবার প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে নিবার্চন হয়। ফলে আলীর দাবিকে ছাপিয়ে উসমানই সুযোগ পান। উসমানের পূর্ববর্তী দুই খলিফাই ছিলেন মুহাজির বা দেশান্তরী। আর উসমান ছিলেন উমাইয়া আভিজাত্যের প্রতিনিধি। তবে তিনজন খলিফাই কোন রাজবংশের সৃষ্টি করে যেতে পারেননি।

উসমান খুন হওয়ার পর ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন আল-মদীনায় মুহাম্মাদের মসজিদে চতুর্থ খলিফা হিসেবে আলীর নাম ঘোষিত হয়। কার্যত সমগ্র মুসলিম দুনিয়া তাঁর উত্তরাধিকারত্বে স্বীকৃতি জানায়। আলী ছিলেন মুহাম্মাদের খুড়তুতো ভাই। আবার আলীই মুহাম্মাদের প্রিয় কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর বংশধারা বিস্তারকারী দুজন পুরুষ হাসান এবং হুসাইনের পিতা। আলী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অমায়িক এবং সাহসী। তিনি যে দলের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছিলেন সেই 'আহল আল-নাস অ-আল-তায়িন'[৩] (ঐশ্বরিক অধ্যাদেশ এবং উপাধির মানুষজন বা বৈধ উত্তরাধিকার দাবিকারী) দৃঢ়ভাবে এটা মনে করত যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের দিন থেকেই আল্লাহ্ এবং তাঁর পয়গম্বর আগাগোড়া আলীকেই তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে খলিফার আসনে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথম তিনজন খলিফা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে তাঁকে সিংহাসন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

● আলীর খিলাফত

আলীর প্রথম সমস্যা ছিল তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবির মীমাংসা করা। মক্কাভিত্তিক দলের তালহা এবং আল-জুবাইর ছিলেন তাঁর সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার। দু'জনেরই[৪] আল-হিজাজ এবং আল-ইরাকে প্রচুর অনুগামী ছিলেন, যারা আলীকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে নারাজ হন। মুহাম্মাদের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়িশা, যিনি মুসলিমদের কাছে মায়ের সম্মান পেতেন, তিনি উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপেক্ষা করেছিলেন। সেই আয়িশাও শেষ পর্যন্ত আল-বাসরায় আলী-বিরোধী বিদ্রোহে শামিল হন। যৌবনোচ্ছল আয়িশা এত অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন যে বিবাহের সময় পিতৃগৃহ (আবু বকর) থেকে প্রচুর পুতুল সঙ্গে করে এনেছিলেন। তিনি আলীকে অপছন্দ করতেন। একটি ঘটনায় তাঁর গর্ব গভীর ভাবে আহত হয়। একবার আয়িশা স্বামীর কাফেলায় যাওয়ার সময় পথমধ্যে আলস্যে কালক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ (সূরাহ্, ২৪ : ১১-২০) মারফত হস্তক্ষেপ করে আয়িশার পক্ষ

অবলম্বন করেন সেবার। আল-বসরার উপকণ্ঠে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর আলী তার বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হয়ে বিখ্যাত 'উটের যুদ্ধে' তাদের পরাস্ত করেন। ওই যুদ্ধের সময় আয়িশাও একটি উটের পিঠে বসে বিদ্রোহী বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা করছিলেন। যাই হোক, আলীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই পরাস্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। আলি কিন্তু তাঁদের জন্য যথার্থ শোকজ্ঞাপন করেই সম্মানের সঙ্গে তাঁদের দেহ সমাহিত করেন।[১] আয়িশাকে বন্দি করা হয়। বন্দি করা হলেও তাঁর সঙ্গে সুব্যবহার করা হয়। তাঁকে মুসলিম সমাজের 'প্রথম মহিলার' সম্মানই দেন আলী। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে আয়িশাকে মদীনায় ফেরত পাঠানো হয়। এভাবে মুসলিম বনাম মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধের অবসান হয়। যে রাজ্যে বংশগত লড়াই বারেবারে ইসলামের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে তার সূত্রপাত হয় এইভাবেই।

যুদ্ধে জয়ী হয়ে সিংহাসনে সুনিশ্চিতভাবে বসে আলী নতুন রাজধানী আল-কূফা থেকে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। প্রথমেই তিনি পূর্বসূরিদের নিযুক্ত অধিকাংশ প্রাদেশিক রাজ্যপালকেই সরিয়ে দেন। তাঁদের সরিয়ে শূন্যপদে বসান অনুগতদের। বাকিদের থেকে তিনি পূর্ণ আনুগত্য দাবি করেন। এমনই এক রাজ্যপাল ছিলেন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবি সুফয়ান। তিনি সিরিয়ার রাজ্যপাল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন খলিফা উসমানের আত্মীয়তা ছিল। আলী তাঁকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। তখন মু'আবিয়া বিদ্রোহী হয়ে নিহত খলিফার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। মু'আবিয়া দামাস্কাস মসজিদে সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন খুন হওয়া প্রাক্তন শাসকের রক্তমাখা জামা এবং বাধা দিতে আসা তাঁর স্ত্রী নাইলার কর্তিত আঙুল।[২] এই পদ্ধতি এবং বাগ্মিতা দ্বারা তিনি মুসলিম আবেগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন। এবার খলিফা আলীকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জ্ঞাপনে অসম্মত হন মু'আবিয়া। তিনি আলীকে কোণঠাসা করতে এক উভয়-সংকট প্রস্তাব তোলেন : পয়গম্বরের উত্তরসূরিদের যারা হত্যা করেছে সেই গুপ্তঘাতকদের হাজির করুন অথবা দুষকর্মে সহযোগিতার দায়ভাগ স্বীকার করে নিন—যার অর্থই হলো খিলাফতের অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া। আলীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ অনেকটাই ছিল ব্যক্তিগত, পারিবারিক। মূল প্রশ্নটি ছিল এই যে, ইসলামি সাম্রাজ্যে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে কোন প্রদেশ আল-কূফা, দামাস্কাস, আল-ইরাক না সিরিয়া? ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলী খলিফা হয়েই আল-মদীনা ছেড়ে চলে যান। তিনি কখনও আর মদীনা সফরেও আসেননি। স্বভাবতই আল-মদীনা ইতিমধ্যেই এই নিয়ামক ভূমিকায় আসার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে ছিটকে গিয়েছিল। পরে সুদূর-প্রসারিত বিজয় অভিযানের পরিণতিতে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের ভরকেন্দ্র হয়ে পড়ে উত্তরাঞ্চল।

ইউফ্রেটিসের পশ্চিম তীরে আল-রাক্কার দক্ষিণ দিকে সিফফীন সমভূমিতে শেষপর্যন্ত মু'আবিয়া এবং আলীর অনুগামী সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হল। আলীর সৈন্যদলে ৫০ হাজার ইরাকি ছিল। অন্যদিকে মু'আবিয়ার সৈন্যদলে সিরিয়ার লোকই বেশি ছিল। যুদ্ধ

আদৌ জমেনি। কারণ কোন পক্ষই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখাতে আগ্রহী ছিল না। স্রেফ কয়েক সপ্তাহের খণ্ডযুদ্ধ হল। পরে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মালিক আল-আশতার-এর নেতৃত্বে আলীর সৈন্যবাহিনী প্রায় জয় হাতের মুঠোয় এনেছিলেন। এমন সময় যুদ্ধ বন্ধ করতে মু'আবিয়ার সৈন্যবাহিনীর চতুর সেনানায়ক আমর-ইবন-আল-আস দুর্দান্ত কৌশলের পথ নিলেন। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, সৈন্যরা বল্লমের ফলায় কোরান ঝুলিয়ে উঁচুতে তা তুলে ধরে চলেছে। অর্থাৎ হাবেভাবে বোঝাতে চাওয়া হল যে কোরান-এর সিদ্ধান্তকেই তারা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এতেই দুপক্ষের বিদ্বেষ মুছে গেল আচমকা। সরল হৃদয়ের আলী মীমাংসায় রাজি হয়ে গেলেন মু'আবিয়ার সঙ্গে। দুই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত প্রতিহত হল। ঠিক হল, মীমাংসা হবে আল্লাহ্‌র কথা মেনে,[৮] তাতে যা ফল হয় হবে।

আপসসূত্র অনুযায়ী খলিফা তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি আবু-মূসা-আল-আশআরিকে নিযুক্ত করলেন। এই লোকটি ছিলেন সন্দেহাতীতভাবে ধার্মিক। কিন্তু আলীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল নাতিশীতোষ্ণ। মু'আবিয়াও এই কাজে নিযুক্ত করলেন আমর ইব্‌ন-আল আসকে। তাঁকে সমগ্র আরব দুনিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিভাবান বলে অভিহিত করা হয়।[৯] এরপর দুই পক্ষের দুই মীমাংসা-মধ্যস্থ (একবচনে, হাকাম) লিখিত তথ্য সহযোগে কাজে নেমে পড়লেন। দু'পক্ষেই ছিল অন্তত ৪০০ জন করে সাক্ষী। দুই 'হাকাম' ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে জনসমাবেশ ডাকলেন। আল-মদীনা এবং দামাস্কাসের মাঝে আযরুহ্ নামক জায়গায় এই জনসমাবেশ হয়।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে ঠিক কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা জানা যায়নি। নানা সূত্র থেকে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়।[১০] একটি সূত্র থেকে জানা যায়, দুই মীমাংসক (হাকাম) উভয়কেই পদচ্যুত করতে আপসে সম্মত হল। এভাবে তাঁরা এমন একজনের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন, যার গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁরাই অন্ধকারে ছিলেন। এরপর দুই হাকামের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ আবু-মূসা সম্মেলনে উঠে দাড়িয়ে হঠাৎ ঘোষণা করেন যে, তাঁর প্রভুর সিংহাসনে বসার অধিকারই নেই। মু'আবিয়ার প্রতিনিধি কিন্তু তা করেননি। তিনি প্রভুর সপক্ষে রায় দেন। এই নিয়ে পিয়ার ল্যামেনস[১১] এবং তাঁর আগে ওয়েলহাউসেন[১২] যে গবেষণা করেন তাতে দেখা গেছে, ওই সময়কার ইতিহাসের অধিকাংশ তথ্যই পাওয়া গেছে ইরাকি ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে। এই ঘরানা আব্বাসীয় রাজবংশের আমলে বিকশিত হয়। আর আব্বাসবংশীয়রা ছিলেন উমাইয়াদের আজীবন শত্রু। যাই হোক, সেই ঘটনায় আলীই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। পদচ্যুত হলেও মু'আবিয়া তো খলিফাই ছিলেন না। তিনি একটি অংশের রাজ্যপাল মাত্র ছিলেন। কিন্তু আলীর মতো খলিফার সঙ্গে তাঁর নিষ্পত্তি হওয়ায় তাঁর সম্মান বেড়ে আলীর সমান হয়ে উঠল। পাশাপাশি আলীর মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ন হল। শেষপর্যন্ত রফাকারী বা হাকামরা

যে রায় দিলেন তাতে আলী প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেন এবং মু'আবিয়া যে আকাশকুসুম দাবি করেছিলেন তাও নস্যাৎ হয়ে গেল। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে আলীর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই আপসের নামে প্রহসনলীলার দু'বছর পর। এরপরই মু'আবিয়ার সিংহাসন যথাযথ স্বীকৃতি পেল।

এই অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আপস প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আলীর সবদিক দিয়েই লোকসান হয়। এর ফলে তাঁর অনুগামীদের এক বৃহৎ অংশের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন তিনি। যাঁদের সহানুভূতি থেকে তিনি বঞ্চিত হন, তাদের বলা হত 'খারিজী'[১৩] অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাকামী। এরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের একেবারে গোড়ার দিককার এক সম্প্রদায়। ক্রমে এরা আলীর ঘৃণ্য শত্রুতে পরিণত হলেন। এঁরা শ্লোগান তুললেন, 'লা হুক্‌মা ইল্লা লি-ল্-লাহ্'[১৪] (অর্থাৎ আপস বা মীমাংসা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্।) প্রায় ৪০০০[১৫] খারিজী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন-ওহ্‌াব আল-রশিবি-র নেতৃত্বে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচুতে তুলে ধরে এই শ্লোগানে সমর্থন জানায়। ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে নাহ্‌রাওয়ান খালের তীরে আলী এদের শিবিরে আচমকা হানা দেন। সেই আচমকা হানায় এঁদের সবাই প্রায় নিহত হন। তবে শেষ হয়েও এঁরা মুছে যাননি। পরে অন্য নাম নিয়ে ফের মাথাচাড়া দেন। আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত এরা ছিলেন খিলাফতের কাঁটাস্বরূপ।

৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারির আল-কূফায় মসজিদে যাবার সময় বিষমাখানো তলোয়ার দিয়ে আলীর কপালে সজোরে আঘাত করা হয়। অস্ত্রের আঘাত মস্তিষ্কে পৌঁছয়। ওই তলোয়ারটি তৈরি করেছিলেন এক খারিজী। তাঁর নাম আবদ-আল-রহ্‌মান ইব্‌ন-মুলজাম। ওঁর এক বন্ধুর আত্মীয়স্বজন নাহরাওয়ান আক্রমনে খুন হয়েছিলেন। সেই খুনের প্রতিশোধ নিতেই উনি এরূপ করতে প্রণোদিত হন। এছাড়া ওই মুলজাম আরেক বড় চক্রান্তেরও অংশীদার ছিলেন। আলী, মু'আবিয়া এবং আমর ইবন-আল-আস[১৬]—এই তিন নেতার হাত থেকে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করতে যে তিনজন কা'বায় শপথ নিয়েছিলেন মুলজাম তাঁদের মধ্যেও ছিলেন। আল-কূফার যে নির্জন স্থানে আলীকে সমাহিত[১৭] করা হয়, বর্তমানে আল-নাজাফের মাশহাদ আলী নামে সুপরিচিত সেই জায়গাটি পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে উন্নীত হয়। এই চতুর্থ খলিফা দিনে দিনে শী'আহ্ জনগণের কাছে মুসলিম্ মহাপুরুষ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। শী'আহ্ জনগণের কাছে তিনি বিখ্যাত 'ওয়ালি' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্ধু এবং প্রতিনিধি), যেমন মুহাম্মাদ ছিলেন আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক এবং ইসলামের পয়গম্বর। জীবিত আলীর চেয়ে মৃত আলীই বেশি ক্ষমতাধর এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। জীবদ্দশায় যে সম্মান তিনি হারিয়েছিলেন মৃত্যুর পরে তার দ্বিগুণ সম্মান পান আলী। এটা সত্য যে, বড় নেতা বা রাজনীতিক হয়ে উঠতে যেসব গুণের দরকার সেইসব গুণ, অর্থাৎ দূরদৃষ্টি, দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা, সবসময় সতর্ক থাকা এবং তেজলদি সিদ্ধান্ত

নেওয়ার ক্ষমতা—তাঁর ছিল না। কিন্তু প্রকৃত আরবের সব গুণেরই অধিকারী ছিলেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক, উপদেষ্টা হিসেবে যোগ্য ও জ্ঞানী, ভাষণে পটু, বন্ধুবৎসল, শত্রুর প্রতি সদাশয় এই আলী মুসলিম আভিজাত্য এবং শৌর্যের পরম আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। কার্যত তিনি হয়ে ওঠেন আরবীয় ঐতিহ্যের সলোমন স্বরূপ। তাঁকে নিয়ে বহু কবিতা লেখা হয়। তৈরি হয় কত প্রবাদ, কত ধর্মোপদেশ, কত সত্য কাহিনী। তাঁর গায়ের রং ছিল কৃষ্ণকায়, চোখগুলি বড় এবং নিকষ কালো, মাথায় টাক, ঘন এবং দীর্ঘ শাদা দাড়ি। আলীর শরীর ছিল স্থূলকায় মাঝারি চেহারার।[৮] তাঁর প্রিয় তরবারি 'যূ-আল-ফাকার' বদর-এর যুদ্ধক্ষেত্রে মুহাম্মাদ নিজে ব্যবহার করেছিলেন। এই তরবারি সম্পর্কে যে বাক্য প্রচলিত রয়েছে তা মধ্যযুগের বহু আরবীয় তরবারিতে খোদাই করা থাকত। কথাটি এরকম : লা সাইফা ইল্লা যূ-আল-ফাকারি অ-লা ফাতা ইল্লা আলী—'কোন তরবারিই 'যূ-আল-ফকর'-এর সমকক্ষ নয়। কোন যোদ্ধাই আলীর সমকক্ষ নন।" মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিভালরি এবং আধুনিক স্কাউট আন্দোলন ফিতয়ান-পন্থিদের আদর্শপুরুষ এবং প্রথম ফাতা (তরুণ) হলেন আলী। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানী ও সাহসী ব্যক্তি হিসেবে আলী পরিচিত ছিলেন। একাধিক ফিতয়ান ও দরবেশদের সংগঠন তাঁকে মনে করতেন আদর্শবাদী ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর পক্ষভুক্ত লোকেরা তাঁকে মনে করতেন অপাপবিদ্ধ ও ভ্রান্তিহীন। এমনকী শী'আদের মধ্যে গুলাহ্ (চরমপন্থি) সম্প্রদায় আলীকে মনে করত, আল্লাহ্‌র অবতার। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বিশ্বজুড়ে যাঁর কৃতিত্ব শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেই আলী মৃত্যুর পর যে সম্মান ইসলামি দুনিয়া থেকে পান তা মুহাম্মাদের পর দ্বিতীয় কেউ পাননি। আজও আল-নাজাফে তাঁর স্মৃতিসৌধ দেখতে প্রতি বছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী যান। তাঁরই পুত্র হুসাইন, যিনি নিকটস্থ কারবালার কাছে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন, তাঁর স্মৃতিসৌধ দেখতেও সমান ভিড় হয়। আজও মহরমের দশম দিনে সমগ্র শী'আহ্ দুনিয়া হুসাইনের এই মৃত্যুবরণের ঘটনা পুনরাভিনয় করে তাঁকে স্মরণ করেন। এরূপ পুনরাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শী'আজগৎ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, জীবনের তুলনায় তাঁর মৃত্যু ত্রাণকর্তা হিসেবে কাজে লেগেছে বেশি।

● মহান খলিফাদের আমল

৬৬১ খ্রিস্টাব্দে আলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবু-বকর (৬৩২)-এর হাত ধরে খিলাফতের যে প্রজাতন্ত্রী যুগের সূচনা হয়েছিল তা শেষ হয়। এই যুগের চার খলিফাই আরবের ইতিহাসে নিষ্ঠাবান (আল-রাশিদুন) হিসেবে পরিচিত হয়ে রয়েছেন। এরপর দ্বিতীয় খলিফা যুগের প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া বংশের মু'আবিয়া তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে যান। এভাবে তিনি এক রাজবংশের পত্তন করেন। এই যে

বংশ পরম্পরা রক্ষার নীতি খলিফার উত্তরাধিকারী স্থির করার ক্ষেত্রে চালু হল তা কিন্তু কখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। উমাইয়া খিলাফত হচ্ছে ইসলামি দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাজবংশ (মুলূক)। খলিফা নির্বাচন এবং সেই উৎসব যে জনগণের নেতারা আক্ষরিক অর্থে এবং বাস্তবত এই নতুন খলিফাকে স্বীকৃতি দিলেন, তার বর্ণনা 'বায়আহ্-তে সংরক্ষিত আছে। উমাইয়া রাজবংশের (৬৬১-৭৫০) রাজধানী ছিল দামাস্কাস। এরপর আব্বাসীয় রাজবংশের (৭৫০-১২৫৮) রাজধানী হয় বাগদাদ। ফাতিমিয় রাজবংশের (৯০৯-১১৭১) মূলকেন্দ্র ছিল কায়রো। এই রাজবংশের অধীনে শী'আরাই প্রথম রাজত্ব পান। এছাড়া স্পেনের কুর্তুবাহ (কর্ডোভা) নামক স্থানে দ্বিতীয় উমাইয়া খলিফারাজ কায়েম হয়। এই রাজত্ব ৯২৯ থেকে ১০৩১ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। পরবর্তীকালে ইসলামি দুনিয়ায় শেষ বড় যে সাম্রাজ্য ছিল তা আরবীয় ছিল না। তা প্রতিষ্ঠিত হয় কনস্ট্যান্টিনোপলে (১৫১৭-১৯২৪) অটোমান তুর্কিদের নেতৃত্বে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে আংকারায় জাতীয় সংসদ ঘোষণা করে যে, তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক দেশ, সেই সংসদ সুলতান খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর চাচাতো ভাই আবদ-আল-মাজীদ-কে খলিফা বলে ঘোষণা করে। ১৯২৪ সালের মার্চে এই সাম্রাজ্যও লুপ্ত হয়।[২০]

● খলিফা—সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু

আমাদের একটি ব্যাপারে সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা থেকে সতর্ক হওয়া দরকার। 'খলিফা' পদটি কিন্তু কোন ধর্মীয় পদ নয়। এর পক্ষে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের এবং সমকালীন খ্রিস্টান শাসনের নজির টেনে—দুই সাম্রাজ্যের পার্থিব এবং ধর্মীয় ক্ষমতার পার্থক্য তুলনা করে যেসব কথা বলা হয় তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীদের নায়ক হিসেবে 'আমীর আল-মু'মিনীন' পদটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসলে এটা খলিফা সাম্রাজ্যের ফৌজি প্রধানের পদ। আবার 'ইমাম' (নামাযের নেতা) হিসেবেও খলিফা ধর্মীয় কাজকর্ম পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি শুক্রবারে 'খুতবা' (ধর্মীয় ভাষণ) দিতেন। কিন্তু এসব এমন কিছু কাজ, যা যে-কোন পবিত্র মুসলমানই করতে পারেন। ইসলামধর্মে মুহাম্মাদের (খিলাফাহ্) উত্তরাধিকারের অর্থ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উত্তরাধিকারত্ব। মুহাম্মাদ পয়গম্বর হিসেবে, অহী বা প্রত্যাদেশের উপলক্ষ হিসেবে, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক (রাসূল) হিসেবে কাউকে উত্তরাধিকারত্ব দিয়ে যেতে পারেন না। সেইজন্য ধর্মের সঙ্গে খলিফার সম্পর্ক স্রেফ অভিভাবকের। যে-কোন ইউরোপীয় সম্রাটের মতোই তিনি শুধু ইসলাম ধর্মের রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া তিনি আর যা করেন, তা হল প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতকে দমন করার সমস্ত দায়িত্ব নেন, অবিশ্বাসীদের শায়েস্তা করেন এবং দার-আল-ইসলাম (ইসলামি সাম্রাজ্য)-এর সীমানা বিস্তারে উদ্যোগ নেন। এই সমস্ত কাজ করতে তিনি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ প্রভূত ক্ষমতাকে কাজে লাগান।[২১]

পরবর্তীকালে মক্কা, আল-মদীনা এবং অন্য কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে যে-ধর্মীয় বিশারদরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন তাঁরা দামাস্কাস, বাগদাদ বা কায়রোয় ইসলামি সাম্রাজ্যের

রাজধানীগুলিতে রোজ কী ঘটছে, না-ঘটছে তার প্রতি নজর না রেখে খলিফা পদের যোগ্যতা নির্ণয়ে সুচারুভাবে নানারকম শর্ত তৈরি করেন। আল মাওয়ারদি[২১] (মৃ. ১০৫৮) তাঁর কাল্পনিক রাজনৈতিক প্রবন্ধে, আল-নাসাফি (মৃ. ১৩১০), ইব্‌ন খালদূন (মৃ. ১৪০৬) তাঁর বিখ্যাত সমালোচনামূলক গ্রন্থের ভূমিকায়[২৩] এবং সুন্নি তত্ত্বের সমর্থক পরবর্তী লেখকরা 'খলিফা' পদবির জন্য যোগ্যতার যেসব শর্ত তৈরি করেন, তা হল · (১) তাঁকে কুরায়শ পরিবারভুক্ত হতে হবে। (২) তাঁকে পুরুষ এবং সাবালক হতে হবে। (৩) তাঁর শরীর সুঠাম এবং দেহ সুস্থ হওয়া চাই। (৪) ইসলামি সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে তার মনের উদ্যম এবং জিদ দুর্বার হওয়া চাই। (৫) 'বায়আহ্'-এর মাধ্যমে তাঁকে সমগ্র জাতির সমর্থন যাচাই করতে হবে। অন্যদিকে 'খলিফা' পদটিকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না শিয়ারা। পরিবর্তে তাঁরা 'ইমাম' পদটিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। শী'আরা আলীর পরিবারকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা মনে করতেন, একমাত্র আলীকেই মুহাম্মাদ 'নাস' (ধর্মীয় অধ্যাদেশ)-এর ভিত্তিতে উত্তরসূরি মনোনীত করে গেছেন। আর একমাত্র আলীর বংশধররাই আল্লাহ্‌র অনুমোদন পেয়ে এই খলিফা পদে বসার উপযুক্ত।[২৪] সুন্নিরা মনে করতেন, খলিফার মূল কাজ হল : ইসলাম ধর্ম এবং তার অধীনস্থ ভূখণ্ড রক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। বিশেষ করে দুই পবিত্র স্থান—আল-হারামায়েন—মক্কা এবং আল-মদীনাকে রক্ষা করা হচ্ছে খলিফার প্রাথমিক কর্তব্য। এছাড়া প্রয়োজন হলে পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) ঘোষণা করাও খলিফারই কর্তব্য বলে মনে করতেন সুন্নিরা। খলিফার আরও কাজ হল, সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা, কর আদায় করা, সরকারি তহবিল ঠিক রাখা, সমাজের অপরাধীদের শাস্তির এবং ন্যায় বিচারের বন্দোবস্ত করা।[২৫] এছাড়া শুক্রবারের 'খুতবাহ'তে এবং মুদ্রায় খলিফার নামোল্লেখ থাকাটাও তাঁর কাজ বলে মনে করা হত। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বুরদাহ্ (মুহাম্মাদের আঙরাখা) পরাও ছিল খলিফার কাজ। মুহাম্মাদের[২৬] লাঠি, শিলমোহর, দাঁত এবং চুলের মতো পবিত্র বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল খলিফার কাজ।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধেও ইউরোপে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, মুসলিম খলিফা হলেন প্রায় পোপের মতো ক্ষমতাধর। বিশ্বজুড়ে মুহাম্মাদের অনুগামীরা হলেন তাঁর ধর্মীয় এক্তিয়ারের অধীন। ড'হ্‌শন নামে এক আর্মেনীয় (যিনি থাকতেন কনস্ট্যান্টিনোপলে) প্রথম এক লেখায় এই ভ্রান্ত ধারণাটির সূত্রপাত করেন। রচনাটির নাম ছিল 'ট্যাবলিউ জেনারেল দ্য লা এম্পায়ার ওসমান' (প্যারিস, ১৭৮৮)।[২৭] ধূর্ত খলিফা দ্বিতীয় আবদ-আল-হামিদ ইউরোপীয় শক্তির চোখে নিজের মর্যাদাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে এই ভ্রান্ত ধারণাটিকেই কাজে লাগান। কারণ সেসময় ইউরোপীয়রা এশিয়া এবং আফ্রিকায় মুসলমানদের প্রভু হয়ে দ্রুত উঠে আসছিলেন। গত শতকের শেষার্ধে অপরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা এবং আদর্শ নিয়ে এক আন্দোলন মুসলিম সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। প্যান ইসলামিজম বা বৃহত্তম মুসলিম সাম্রাজ্য (আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া) নামে এই আন্দোলন স্রেফ খ্রিস্টান শক্তির প্রসার রোধ করতে সমগ্র মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। তুরস্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন অসঙ্গতভাবে খলিফা শাসনের সর্বজনীন আকৃতি-প্রকৃতির ওপরই মূল গুরুত্ব দেয়। ❑

● টীকা ●

১ ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় ২০২ পৃষ্ঠা দেখুন।

২ ওই ৩য় খণ্ড, প্রথম অধ্যায় ২৪৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন।

৩ শাহরাস্তানি, ১৫ পৃষ্ঠা।

৪ আল-জুবাইরের মা ছিলেন মুহাম্মাদের বাবার এক বোন।

৫ ইব্‌ন হিশামের মতে, নয় বা দশ বছর বয়সে। ১০০১ পৃষ্ঠা।

৬ আল-জুবাইরের স্মৃতিসৌধের পাশে তাঁর নামে এক শহর গড়ে ওঠে।

৭ ফাখরি, ১২০-১৩৭ পৃষ্ঠা।

৮ আপস সূত্রের নথির জন্য দেখুন দিনাওয়ারি, ২০৬-৮ পৃষ্ঠা।

৯ মাসউদী, চতুর্থ খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠার নীচে, ১৬১ পৃষ্ঠার উপরে তুলনীয়।

১০ তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩৩৪০-৬০ পষ্ঠা। মাসউদী, চতুর্থ খণ্ড, ৩৯৯-৪০২ পৃষ্ঠা। ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২২০-২২ পৃষ্ঠা, ফাখরি, ১২৭-৩০ পৃষ্ঠা।

১১ Etudes sur le regne du calife omaiyade Moawia I (বেইরুট, ১৯০৭) সপ্তম অধ্যায়।

১২ Das arabische Reich und sein sturz (বার্লিন, ১৯০২) দ্বিতীয় অধ্যায় = দ্য আরব কিংডম অ্যাণ্ড ইটস ফল। অনুবাদ : মার্গারেট জি ওয়ার (কলকাতা ১৯২৭) দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৩ একে 'হারুরিয়া'ও বলা হয়। শব্দটি এসেছে হারুরা থেকে। (ইয়াকুত, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'হারাওরা')

১৪ ফাখরি, ১৩০ পৃষ্ঠা কোরান, ১২ : ৭০ তুলনীয়।

১৫ 'শাহরাস্তানি'তে ১২০০০ (৮৬ পৃষ্ঠা)

১৬ দেখুন দিনাওয়ারি, ২২৭ পৃষ্ঠা; তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩৪৫৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা। এইচ জোটেনবার্গ-এর ক্রনিক দ্য তাবারী, ৩য় খণ্ড (প্যারিস, ১৮৭১), ৭০৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

১৭ শী'আহ্ প্রথা অনুসারে এই জায়গাটি বাছা হয়েছিল আলীর মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুসারে। আলী বলেছিলেন, মৃত্যুর পর তার দেহ যেন একটি উটের পিঠে চাপিয়ে দেখা হয় যে উটটি কতদূর যায়। যেখানে উটটি থামবে সেখানেই যেন তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। তাই করা হয়েছিল। এই স্থানটি ৭৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। ওই সালেই হারুন আল রশীদ অকস্মাৎ তা জানতে পেরে যান। এই স্মৃতিসৌধ বিষয়ে আরও জানতে দেখুন ইব্‌ন হাওকাল লিখিত 'আল-মাসালিক অ-আল-মামালিক'। সম্পাদনা দ্য গোজে (লিডেন, ১৮৭২), ১৬৩ পৃষ্ঠা।

১৮ মাসউদী, তানবিহ্, ২৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৯ ইব্‌ন খালদুন-এর লেখা 'মুকাদ্দামাহ্' অর্থাৎ 'কিতাব আল-ইবার ওয়া-দিওয়ান আল-মুবতাদা অ-আল-খবর'-এর প্রথম খণ্ড (কায়রো, ১২৮৪), ১৭৪—১৭৫ পৃষ্ঠা। এছাড়া কোয়াত্রিমেয়র সম্পাদিত 'নোটিসেস এট এক্সট্রেটস' ইত্যাদির ৩৭৬-৩৭৭ পৃষ্ঠা ১৬ খণ্ড (প্যারিস, ১৮৫৮) এবং দ্য স্লেন-এর অনুবাদের ৪২৪-২৬ পৃষ্ঠা, ১৯ খণ্ড, (প্যারিস, ১৮৬২)।

২০ এই ছিল খলিফাদের বংশলতিকা।

কুরায়শ

আবদ-মানাফ

হাশিম

আবদ-শামস

আবদ-আল-মুত্তালিব

উমাইয়া

উমার
আবু-বকর
আবদুল্লা
আবু-তালিব
আল-আব্বাস
উমাইদা

খলিফারা ৬৬১-৭৫০
৯২৯-১০৩১
পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

হাফসাহ্ + মুহাম্মাদ
আয়িশা + মুহাম্মাদ

আব্বাসীয়
খলিফারা ৭৫০-১২৫৮
পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

উসমান + রুকাইয়া
ফাতিমা + আলী

আল-হাসান
আল-হুসাইন

ইমামগণ

ফাতিমিদ খলিফাগণ
৯০৯-১১৭১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

২১ দেখুন টমাস ডবলিউ আর্ণল্ড-এর দ্য ক্যালিফেট (অক্সফোর্ড, ১৯২৪), ৯-৪১ পৃষ্ঠা।

২২ ওই পৃষ্ঠা ৫-১০

২৩ মুকাদ্দামাহ্, ১৬১ পৃষ্ঠা

২৪ শাহরাস্তানি, ১০৮-৯ পৃষ্ঠা। ইব্‌ন খালদূন. ১৬৪-৫ পৃষ্ঠা।

২৫ মাওয়ারদি, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা। আল-নাসাফি লিখিত 'উমদাত আকিদাত আহ্‌ল আল-সুন্নাহ্' সম্পাদনা ডবলিউ কিউরটন (লণ্ডন, ১৮৪৩), ২৮-২৯ পৃষ্ঠা।

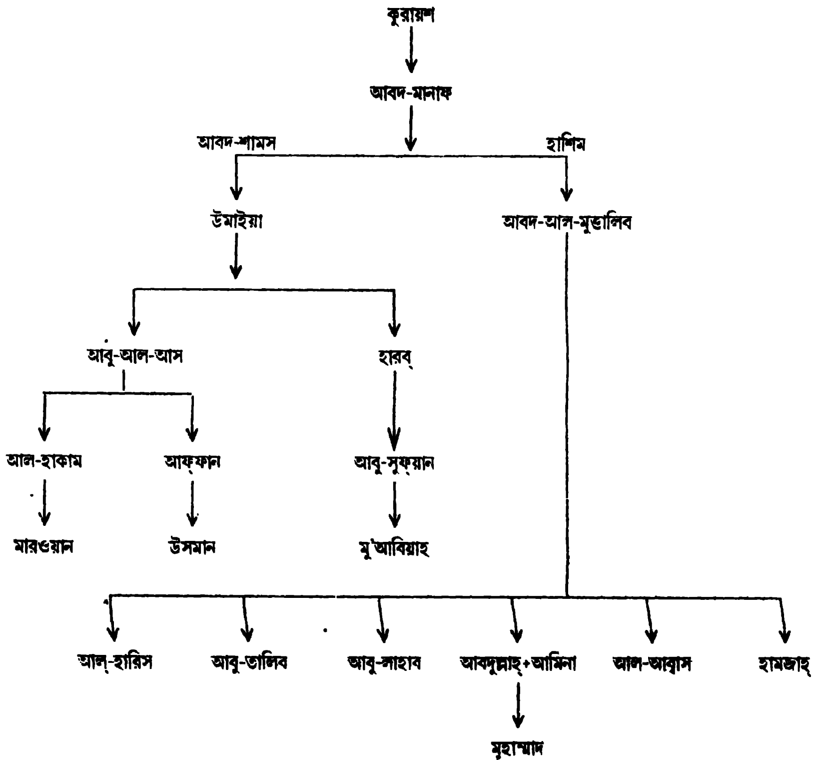
২৬ শেষ মুসলিম খলিফারা ছিলেন উসমান বংশীয় সুলতান। তাঁরাই মুহাম্মাদের এই দুর্লভ ব্যক্তিগত সম্পত্তির (যাখাইর নাবাবিয়্যাহ্) অধিকারী ছিলেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সেলিম এই সব সম্পত্তি কনস্ট্যান্টিনোপলে আনেন। তিনি মিশর জয় করে এসে এই সম্পত্তি স্থানান্তর করেন। সেই থেকেই এই দুর্লভ সম্পদ সেখানে সুলতানের প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদের বিশাল হারেমের এক বিশেষ চত্বরে রাখা আছে। তা আজও খলিফা শাসনের অমূল্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৭ প্রথম খণ্ড, ২১৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

তৃতীয় ভাগ
উমাইয়া এবং আব্বাসিদ সাম্রাজ্য

॥ অধ্যায় ১৭ ॥

উমাইয়া খিলাফত : মু'আবিয়া কর্তৃক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা



● খলিফা পদের দাবির নিষ্পত্তি

৪০ হিজরী সনে (৬৬০)[১] ইলিয়াতে (জেরুসালেম) মু'আবিয়া নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। প্রাদেশিক সরকারে তাঁর ক্ষমতাসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে

দামাস্কাস মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। অবশ্য সেই সাম্রাজ্যের সীমানা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সালিশী-আলোচনা চলার সময়ে মু'আবিয়ার 'ডান হাত' বলে পরিচিত আমর ইব্ন-আল-আস আলীপন্থিদের কাছ থেকে মিশর কেড়ে নিলেন। সেই সময়ে আল-ইরাক আলী ও ফাতিমার বড় ছেলে আল-হাসানকে আলীর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী ঘোষণা করল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, সুফয়ানীদের প্রতিনিধিত্বের প্রতি মক্কা ও আল-মদীনার আনুগত্যে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। কারণ মক্কার পতনের আগে এই প্রতিনিধিরা মুহাম্মাদকে স্বীকৃতি দেয়নি। আসলে ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি, তা ছিল নিছকই কিছু সুবিধা লাভের হাতিয়ার। সিংহাসন অপেক্ষা হারেমে গৃহমধ্যে আল-হাসানের আগ্রহ ছিল বেশি। রাজ্য পরিচালনায় তিনি তেমন উৎসাহী ছিলেন না। আল-মদীনায় নিরুদ্বেগ ও পরিতৃপ্ত জীবনযাপনের জন্য তিনি তার আগে বেশি দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে তার আগে মু'আবিয়ার অনুমোদনে নিজের জন্য বেশ মোটা পরিমাণ অনুদান ও পেনসনের[২] ব্যবস্থা করেছিলেন। এর মোট পরিমাণ ছিল কূফা রাজভাণ্ডার[৩] থেকে আজীবন ৫ মিলিয়ান বা ৫০ লক্ষ দিরহাম এবং পারস্যের একটি জেলা থেকে আদায় করা রাজস্বের সমষ্টি। হারেমের কোন এক ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে সম্ভবত বিষ প্রয়োগে[৪] মাত্র ৪৫ বছর বয়সে (৬৬৯) তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তার আগে আল-হাসানের বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ১০০-তে পৌঁছেছিল বলে শোনা যায়। এর জন্য তিনি 'মিতলাক'[৫] (মহান বিবাহ-বিচ্ছেদকারী) আখ্যা পেয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের জন্য শী'আরা মু'আবিয়াকেই দায়ী করেন। আর এই ভাবে মারা যাবার ফলে আল-হাসান হলেন একজন শাহীদ (শহীদ)। বাস্তবে সমস্ত শহীদের 'সায়্যিদ' (প্রভু) হিসাবে পরিগণিত হন।

তার ছোট ভাই আল-হুসাইন মু'আবিয়ার শাসনকালে আল-মদীনায় অবসর জীবন যাপন করছিলেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মু'আবিয়ার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইয়াজিদকে স্বীকৃতি দেননি। বরং যে ইরাকীরা আল-হাসান ও আলীর পরে তাঁকেই আইনসঙ্গত খলিফা রূপে ঘোষণা করেছিলেন তাদের জরুরি ও বারংবার আবেদনে তিনি সাড়া দেন এবং আত্মীয়-পরিজনদের (হারেমবাসিনী ও বিশ্বস্ত অনুগামী-সহ) এক দুর্বল প্রহরী স্বরূপ সশস্ত্র লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আল-কূফার উদ্দেশে যাত্রা করেন। মু'আবিয়া তাঁর সুবিধার্থে উবাইদুল্লাহর পিতা জিয়াদকে নিজের ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেই উবাইদুল্লাহ তখন আল-ইরাকের উমাইয়া গভর্নর। তিনি আল-ইরাক থেকে আল-হিজাজ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তার ওপর ফাঁড়ি তৈরি করেছিলেন। ৬১ হিজরী সনে (১০ অক্টোবর, ৬৮০) মুহাররামের দশম দিনে বিখ্যাত সেনাপতি সা'দ-ইব্ন-আবি ওয়াক্কাসের ছেলে উমার আল-কূফার ২৫

মাইল উত্তর-পশ্চিমে কারবালা প্রান্তরে ৪০০০ সৈন্য নিয়ে আল-হুসাইন ও তার ২০০ সৈন্যকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। আল-হুসাইন আত্মসমর্পণ করতে না-চাইলে তাদের হত্যা করা হয়। মহান পয়গম্বরের নাতি শরীরে বহু আঘাত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন। পরে তার মাথাটি দেহ থেকে কেটে নিয়ে ইয়াজিদের কাছে দামাস্কাসে পাঠানো হয়। আল-হুসাইনের বোন ও ছেলেকে সেই কাটা মুণ্ড ফিরিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা তা নিয়ে দামাস্কাসে[৮] গিয়েছিলেন। আল-হুসাইনের দেহ ও কাটা মুণ্ড কারবালা প্রান্তরেই কবরস্থ করা হয়। সেই থেকে আল-হুসাইনের শহীদের মৃত্যুবরণ-কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে শী'আপন্থি মুসলিমরা প্রতি বছর মুহাররামের প্রথম ১০টি দিন 'অনুতাপের দিন' হিসাবে পালন করার রীতি চালু করেছে। এছাড়া তার বীরোচিত সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর আবেগময় পুনরাভিনয় করা হয়। প্রতি বছর এই পুনরাভিনয় দুটি ভাগে দেখানো হয়। যুদ্ধের স্মরণে আল-কাজিমাইনে একটি অংশ দেখানো হয়—তার নাম 'আশুরা' (দশম দিবস)। মুহাররামের ১০ম দিন থেকে আরও ৪০ দিন পরে কারবালা প্রান্তরে দেখানো হয় আরেকটি অংশ-তার নাম 'মস্তকের প্রত্যাবর্তন'।

তাঁর পিতার চেয়ে আল-হুসাইনের রক্তদানই আলাদা মতবাদ গড়ার ব্যাপারে শী'আহ্ সম্প্রদায়কে অনেক বেশি প্রেরণা দিয়েছিল। মুহাররামের ১০ম দিবসে শী'আহ্ মতবাদের জন্ম হয়েছিল। তখন থেকেই ইসলাম ধর্মে মুহাম্মাদ যে শিক্ষা তুলে ধরেছিলেন, তাকে অবহেলা করা শুরু হয়। তার পরিবর্তে শী'আহ্ মতবাদে গোঁড়ামির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ফলে আলীর বংশধরদের মধ্যে বংশানুক্রমিক ভাবে ইমামের পদলাভের প্রথা চালু হয়ে যায়। ইয়াওম কারবালা (কারবালা যুদ্ধের দিনটি) শী'আদের মধ্যে 'আল-হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ' নেবার মানসিকতা গড়ে তোলে। এটিকে উমাইয়া বংশের পতনের অন্যতম কারণ রূপে গণ্য করা হয়। অপরদিকে, সুন্নি সম্প্রদায় ইয়াজিদকেই প্রকৃত শাসক বলে মনে করত। তাই তারা বিশ্বাস করত যে, তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ হল বিশ্বাসঘাতকতা, আর এই বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, শী'আদেরও এই ঘটনাকে অন্যভাবে দেখা উচিত নয়। কিন্তু কোন ঘটনাকে মানুষের কীভাবে দেখা উচিত—তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ইতিহাসের চলমান শক্তি হিসাবে মানুষ কোন একটি ঘটনাকে কীভাবে দেখে। এর পরিণতিতেই ইসলামধর্মে বিরাট বিভেদ সৃষ্টি হয়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত সেই বিভেদ দূর করে ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

আলীপন্থিদের ভূমিকা বিচার করে বলা যায় যে, উমাইয়াদের পক্ষে খিলাফত বেশ কিছুকালের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ ছিল। আসলে এই সংগ্রামটা ছিল ত্রিমুখী। কারণ তখনও তৃতীয় পক্ষকে যুদ্ধের আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যতদিন ক্ষমতাশালী মু'আবিয়া জীবিত ছিলেন, ততদিন আয়িশার ভাগ্যে ও খলিফার পদ নিয়ে আলীর সঙ্গে

নিষ্ফল বিতণ্ডায় লিপ্ত আল-জুবাইরের পুত্র আবদুল্লাহ্ আল-মদীনায় শান্তিতে বাস করছিলেন। চপলতা ও অসৎ আমোদ-প্রমোদে সব সময় ডুবে থাকার জন্য সুপরিচিত ইয়াজিদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, আবদুল্লাহ্ তখন প্রকাশ্যে নতুন খলিফার বিরোধিতা শুরু করলেন এবং আল-হুসাইনকে বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করলেন। আর তারই প্রেক্ষিতে তাঁকে প্রাণ দিতে হল। সুতরাং খলিফা পদের একমাত্র দাবিদার থাকলেন আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্ সমগ্র আল-হিজাজে সরকারি ভাবে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করলেন। আল-মদীনার বিরোধিতা নির্মূল করার জন্য ইয়াজিদ সেখানে দ্রুত এক সেনাবাহিনী পাঠালেন। এই সেনাবাহিনীতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী বহু সিরিয়াবাসী ছিল। এদের নেতৃত্বে ছিলেন মুসলিম ইব্‌ন-উকবাহ্ নামে জনৈক একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি। বার্ধক্য ও অশক্ত শরীরের জন্য তাঁকে সমস্ত পথ পালকিতে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আল-মদীনার পূর্বদিকে আল-হাররার আগ্নেয় সমভূমিতে এই সেনাদল ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬ আগস্ট যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং জয়লাভ করে। দামাস্কাসের সেনাবাহিনী যে তিনদিন মুহাম্মাদের নগরীতে অবাধ লুঠপাট চালাচ্ছিল, সে কাহিনী সন্দেহজনক। যাই হোক, সেই বিজয়ী সেনাবাহিনী তারপর মক্কার দিকে এগিয়ে চলে। যাত্রাপথে মুসলিম মারা যান। আল-হুসাইন ইবন-নুমাইর আল-সাকুনি[১] তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মক্কার হারাম (পবিত্র মসজিদ)-এর পবিত্র মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইব্‌ন-আল-জুবাইর। সেনাবাহিনীর নতুন জেনারেল সেখানেও আক্রমণ চালায়। অবরোধ করার সময় কা'বাতে আগুন ধরে যায় এবং সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়ে সেটি মাটিতে মিশে যায়। কালো পাথরটি তিনটি খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র উপাসনালয়টি এক 'শোকার্ত মহিলার ক্ষতবিক্ষত বক্ষের'[২] রূপ ধারণ করে। যখন এই আক্রমণ চলছিল তখন ইয়াজিদের মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় সিরিয়ায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করে ইব্‌ন-নুমাইর ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর এই অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার আদেশ দেন। আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে সংঘটিত প্রথম গৃহযুদ্ধের মতো ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধটিও ছিল দুটি রাজবংশের যুদ্ধ। ইব্‌ন-নুমাইরের আদেশের ফলে সেই যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

আল-হিজাজে ইব্‌ন-আল-জুবাইরের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। আর আল-ইরাকে তার ভাই মুসআবকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু ও আরব থেকে শত্রু সৈন্য প্রত্যাহারের পর ইবন-আল-জুবাইর ওই দুটি জায়গার সঙ্গে এমন কী দক্ষিণ আরব, মিশর ও সিরিয়ার অংশবিশেষের ওপর নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। ইব্‌ন-আল-জুবাইর কায়েসীয় (উত্তর আরবীয়) পার্টির নেতা আল-যাহ্‌হাক ইব্‌ন-কায়িস আল-ফিহ্‌রিকে স্বয়ং দামাস্কাসের প্রাদেশিক শাসক রূপে মনোনীত করেন। কালবাইটারা (তার মধ্যে ইয়ামান বা দক্ষিণ আরবের অধিবাসীরাও ছিল) প্রবীণ[৩] উমাইয়া মারওয়ান ইবন-আল-হাকামকে সমর্থন করেছিল। এই কালবাইট প্রতিপক্ষের হাতে মার্জ রাহিতে[৪] ৬৮৪

খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আল-যাহ্‌হাকের পরাজয় ঘটে। এটি ছিল উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় সিফফীন। এই সমস্ত সিরিয়া-জাত আরবদের হিজরতের আগে সিরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এদের অধিকাংশকেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে উসমানের জ্ঞাতিভাই ও তার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব মারওয়ান (৬৮৪-৮৫) উমাইয়া রাজবংশের মারওয়ানি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াজিদের দুর্বল ও রোগগ্রস্ত পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া (৬৮৩-৮৪) মাত্র তিন মাস শাসন চালানোর পর মারা যান। তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।[১১] ফলে মারওয়ান সেই আসনে বসেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফার নেতৃত্বে আল-হিজাজের বিদ্রোহ চলতেই থাকে। পরবর্তীকালে মারওয়ানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবদ-আল-মালিক এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আল-তাঈফের এক প্রাক্তন স্কুল-শিক্ষক ও বর্তমানে তাঁর পরাক্রমশালী জেনারেল আল-হাজ্জাজের নেতৃত্বে এক সিরীয় সেনাবাহিনী সেখানে পাঠান। ফলে বিদ্রোহের অবসান ঘটে। ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে ২৫ মার্চ আল-হাজ্জাজ মক্কা দখলের উদ্দেশ্যে এক অভিযান শুরু করেন। এই অভিযান সাড়ে ছ'মাস ধরে চলেছিল। আল-হাজ্জাজ এই অভিযানে তাঁর প্রস্তরনিক্ষেপক যন্ত্রকে সফলভাবে কাজে লাগান।[১২] ইব্‌ন-আল জুবাইরের মা আসমা-র[১৩] বীরোচিত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইব্‌ন-আল-জুবাইর তাঁর মুণ্ডু কেটে না-ফেলা পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর মুণ্ডুটি দামাস্কাসে[১৪] পাঠানো হয়। দেহটি বেশ কিছুক্ষণ ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখার পর তাঁর বৃদ্ধা মা'র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইব্‌ন-আল-জুবাইরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ধর্মবিশ্বাসের সর্বশেষ বীরের মৃত্যু ঘটে। মুসলিমের দ্বারা না হলেও উসমানের ওপর চরম প্রতিশোধ নেয় আল-হাজ্জাজ, এরপর আনসারদের (সমর্থক) ক্ষমতা চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যায়। এই বিপর্যয়ের পর বেশ কিছু আনসার উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধরত সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে মক্কা ও আল-মদীনা ত্যাগ করতে শুরু করে। তখন থেকেই বাইরের জগতের ওপর এই উপদ্বীপের প্রভাবের তুলনায় উপদ্বীপের ওপর বাইরের জগতের প্রভাবের কথাই আরবের ইতিহাসে সবিস্তারে আলোচিত হতে থাকে। এই ভাবেই মাতৃভূমির প্রাণশক্তি আপনা-আপনি নিঃশেষ হয়ে যায়।

● আরব নরপতির প্রতীক মু'আবিয়া

বিরোধী শক্তিগুলির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর মু'আবিয়া (৬৬১-৮০) উত্তর-পশ্চিম দিকে ইসলামের বড় শত্রু গ্রিসের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান শুরু করেন। সিরিয়া জয়ের পরে তিনি বাইজানটাইনের সুসজ্জিত জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র (একবচনে দার আল-সিনাআহ তা থেকে ইংরেজিতে 'আর্সেনাল' হয়েছে) আক্কায় (একর) তিনি শক্তিশালী মুসলিম নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। ইসলামি সমুদ্রযাত্রার ইতিহাসে এই পোতাঙ্গনগুলি ছিল মিশরের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম। আল-বালাযুরির[১] মতানুযায়ী, সিরিয়ার পোতাঙ্গনগুলি সুর

(টায়ার)[১৬]-এ স্থানান্তরিত করেন শেষদিকের উমাইয়ারা। আব্বাসীয় বংশের রাজত্বের আগে পর্যন্ত সেগুলি সেখানেই ছিল। সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত গ্রেকো-রোমানরাই এই যুদ্ধজাহাজগুলির দেখভাল করত। ইসলামের প্রধান অবলম্বন আল-হিজাজের আরবদের সমুদ্রপথের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। কারণ উমারের নীতি ছিল জলযাত্রায় দক্ষ কোন মানুষ যেন তাঁর ও তাঁর লেফটেন্যান্টদের সম্পর্কের মধ্যে মাথা গলাতে না-পারে। এই নীতিটি বুঝতে পারলেই পরিষ্কার হবে যে, মু'আবিয়ার প্রস্তাবিত সাইপ্রাস (কাবরাস) আক্রমণে কেন উমার সায় দেননি। উৎসাহ না-থাকা সত্ত্বেও উমারের উত্তরাধিকারী উসমান শেষ পর্যন্ত ওই দ্বীপ আক্রমণের অনুমতি দেন। খলিফার সম্মতি নিয়েই মু'আবিয়া তাঁর স্ত্রীকে এই অভিযানে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন (৬৪৯)[১৭]। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যাবার এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে সাইপ্রাস ছিল খুবই কাছে এবং এটা যে অতি সহজেই দখল করা যাবে তা আগে থেকেই জানা ছিল।

মু'আবিয়ার রাজত্বকালে খলিফা সাম্রাজ্য শুধু দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিতই হয়নি, তার সম্প্রসারণও ঘটেছিল। এই সময়েই উত্তর-আফ্রিকায় খলিফা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল এবং তার জন্য উকবা ইব্‌ন নাফির ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। এই সময়েই আল-বসরা[১৮] থেকে পূর্বদিকে খুরাসান বিজয়ের অভিযান (৬৬৩-৭১) চালানো হয়। তার সেনারা আমুদরিয়া অতিক্রম করে এবং দূরবর্তী তুর্কিস্থানে বুখারা আক্রান্ত হয় (৬৭৪)। এইভাবে মু'আবিয়া শুধু একটি রাজবংশের জনকই হননি, উমারের পরে খলিফা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সিংহাসন লাভ ও ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানোর জন্য মু'আবিয়া মূলত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সিরিয়াবাসীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। আর আল-হিজাজ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের জন্য তার ভরসা ছিল প্রধানত ইয়ামানের অধিবাসী সিরিয়া-জাত আরবদের ওপর। নতুন সেনাপতির[১৯] প্রতি সিরিয়ার অধিবাসীরা যতটা অনুগত ছিল, আরবের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সেই আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সৈনিক হিসাবে আলী অপেক্ষা নিচু মানের হলেও সামরিক সংগঠক হিসাবে মু'আবিয়া ছিলেন সমকালে শীর্ষস্থানীয়। সিরিয়ার সেনাদের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলি ছিল, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তিনি তাকে একটি প্রথম শ্রেণীর শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাবাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি সামরিক প্রশাসনকে পুরানো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সরকারের বহু প্রথাগত বৈশিষ্ট্য নির্মূল করে তিনি প্রাচীন গ্রিসের অনুকরণে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। আপাতত নৈরাজ্য থেকে মুক্ত করে তিনি এক সুশৃঙ্খল মুসলিম সমাজ গঠন করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, ইসলামদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যুরো অফ রেজিস্ট্রি ও ডাক পরিষেবা বা আল-বারিদ[২০] গড়ে তোলেন। এই ডাক পরিষেবাই আবদ-আল-মালিকের শাসনে সুদূর-বিস্তৃত মুসলিম

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গকে যুক্ত করে একটি সুসংগঠিত ডাকব্যবস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে। তাঁর অনেক স্ত্রীর মধ্যে মাইসুন নামে বানু-বাহদালের এক সিরিয়া-জাতের আরব কালবীয় রমণীকে তিনি প্রিয়তমা হিসাবে বেছে নেন। তিনি দামাস্কাসের রাজকীয় জীবন অবজ্ঞা করতেন এবং মরুভূমির স্বাধীন জীবনের আকাঙক্ষা পোষণ করতেন। তাঁর রচনা না হলেও তাঁর প্রতি আরোপিত কবিতাগুলিতে ঘরে ফেরার আকুল মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। যে সমস্ত বেদুইনরা এখন আধুনিক নগরে চলে যাচ্ছে তাদের অনেকেই এই মানসিকতা অনুভব করতে পেরেছে।[২১]

পূর্বসূরি উসমানের স্ত্রী নাইলা ছিল কালব উপজাতিভুক্ত। মাইসুনও ছিল তার মতো এক জ্যাকোবাইট খ্রিস্টান। পরবর্তীকালে মু'আবিয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছিল মাইসুনেরই পুত্র ইয়াজিদ। পুত্র ইয়াজিদকে সঙ্গে নিয়ে মাইসুন প্রায়ই বাদিয়া (সিরীয় মরুভূমি) বিশেষত পালমেরিনা সংলগ্ন অঞ্চলে যেতেন। সেখানে তার আপনজন বেদুইন উপজাতির লোকেরা ঘুরে বেড়াত এবং এখানেই যুবরাজ শিকারের পিছনে ধাওয়া করা, ঘোড়ায় চড়ার কষ্টকর কায়দা, অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খাওয়া ও কবিতা রচনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময় থেকেই আল-বাদিয়া পরিণত হয় উমাইয়া বংশের রাজপুত্রদের শিক্ষালয়ে। এখানে একদিকে তারা যেমন সিরিয়া বা আরামীয় ভাষার প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ আরবী ভাষা[২২] আয়ত্ত করত, অন্যদিকে এখানে থাকার ফলে তারা শহরাঞ্চলে প্লেগের বারবার আক্রমণ থেকেও রেহাই পেত। পরবর্তীকালে আবদ-আল-মালিক ও দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ সহ উমাইয়া খলিফারা এই ঐতিহ্য বজায় রাখেন এবং সিরিয়া সীমান্তে আল-বাদিয়া নামে পরিচিত এক বাসস্থান গড়ে তোলেন। আরব আগ্রাসনের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে দামাস্কাস যে আত্মসমর্পণ করেছিল, তার জন্য মনসুর ইব্‌ন-সরজুন (গ্রিক সার্জিয়াস)-কে[২৩] প্রধানত দায়ী করা হয়। তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট খ্রিস্টান পরিবারের তরুণ বংশধর। গ্রিক রাজত্বের শেষের দিকে এই পরিবারটিরই কয়েকজন সদস্য রাষ্ট্রের আর্থিক অধিকর্তার পদে বসেছিলেন। আরব প্রশাসনে সামরিক দপ্তরের পরে এই বিভাগটিই ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই মনসুরের পৌত্র ছিলেন সুপরিচিত সেন্ট জন (যুহান্ন) দ্য দামাসিন। তিনি তার যৌবনে ইয়াজিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। খলিফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইব্‌ন-উসাল ছিলেন একজন খ্রিস্টান। মু'আবিয়া তাকে হিমস্[২৪] প্রদেশের অর্থবিভাগের প্রশাসক পদে নিয়োগ করেছিলেন। মুসলিম রাজত্বে[২৫] এই পদে একজন খ্রিস্টানের নিয়োগ ছিল সত্যিই অভূতপূর্ব ঘটনা। উমাইয়া আমলের রাজকবি আল-আখতাল ছিলেন ইয়াজিদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজকবি ছিলেন আল-হিরার তাগলিব খ্রিস্টান-আরব সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সেন্ট জনের এক বিশিষ্ট বন্ধুও বটে। এই রাজকবি যখন খলিফার দরবারে প্রবেশ করতেন তখন তার গলা থেকে একটি ক্রস ঝুলত। মুসলিম খলিফা ও তাঁর অনুগামীদের আনন্দ দেবার জন্য

তিনি কবিতা পাঠ করতেন। আরও জানা গেছে যে, জ্যাকোবিয়ান ও ম্যারোনিয়ানরা তাঁদের ধর্মীয় বিবাদের মীমাংসার জন্য খলিফার[১৬] কাছে এসেছিল। থিয়োফ্যানিসের[১৭] বর্ণনা থেকে জানা যায় যে-এডেসার যে গির্জাটি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, খলিফা সেটি তৈরি করিয়ে দেন।

৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া যখন উত্তরাধিকারী[১৮] হিসাবে তার পুত্র ইয়াজিদকে মনোনীত করেন, তখন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিদের আনিয়ে তাদেরকে আনুগত্যের শপথ পাঠ করানো হয়। এর দ্বারা তিনি খলিফা পদে উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের বংশানুক্রমিক রীতিরই প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আব্বাসীয়-সহ অন্যান্য রাজবংশ এই নীতি অনুসরণ করেছিল। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পরবর্তী খলিফারা তাদের ছেলে বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে থেকেই যোগ্যতম ব্যক্তিকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। তার পর প্রথমে রাজধানী ও পরে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রধান-প্রধান শহরের মানুষজনের কাছ থেকে 'আনুগত্যের শপথ' আগাম আদায় করে নিতেন।

খলিফা হিসাবে মু'আবিয়ার সাফল্যের জন্য তার সহযোগীরা, বিশেষ করে শস্যশ্যামলা মিশরে খলিফার পরিবর্তে শাসনরত আমর ইব্‌ন-আল-আস, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আল-কূফার গভর্নর আল-মুগীরা ইব্‌ন-শুবা ও বিক্ষুব্ধ আল-বসরার শাসক জিয়াদ ইব্‌ন-আবিহের ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। এই তিন সহযোগীসহ খলিফা মু'আবিয়া ছিলেন আরব মুসলিমদের চার রাজনৈতিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব (যুহাত)। বাবার পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় ইব্‌ন-আবিহ্ রূপে নিজের পরিচয় দিতেন জিয়াদ। তাঁর মা ছিলেন আল-তাঈফ-এর এক ক্রীতদাসী ও পতিতা। মু'আবিয়ার পিতা আবু-সুফয়ান তাকে চিনতেন। জিয়াদ ছিলেন আলীপন্থি, চরম সংকটের মুহূর্তে মু'আবিয়া তাকে তার আইনসঙ্গত ভাই[১৯] হিসাবে স্বীকার করে নেন। পরে জিয়াদ তাঁর খলিফা ভাইয়ের একটি সম্পদে পরিণত হন। জিয়াদ দ্বিধাহীন চিত্তে শিয়া ভাবাদর্শের কেন্দ্র আল-বসরার ওপর প্রবল আক্রমণ চালান। আল-মুগীরার মৃত্যুর পর তিনি আল-কূফার গভর্নর হন। এর ফলে তিনি আরব ও পারস্য সহ গোটা সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন। তার ৪০০০ সুশিক্ষিত দেহরক্ষী, পুলিশ ও গুপ্তচরের কাজও করত। এদের সাহায্যে তিনি এক অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। আর যারাই আলীর কোন বংশধরের প্রতি আনুগত্য দেখানোর বা মু'আবিয়ার কুৎসা রটানোর সাহস দেখিয়েছে, তাদেরই তিনি নির্দয়ভাবে গ্রেপ্তার করেছেন।

একথা সত্য যে, অন্য যে-কোন খলিফার তুলনায় মু'আবিয়াই সুচতুর রাজনীতিক ছিলেন। আরব জীবনীকারদের কাছে মু'আবিয়ার মহৎ গুণ ছিল হিলম বা ধৈর্য।[২০] এক্ষেত্রে তাঁর ছিল এক ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং এজন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত উদারতার সাহায্যে তিনি শত্রুদের নিরস্ত্র ও

বিরোধীদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন। ধৈর্য এবং চূড়ান্ত আত্মসংযমের সাহায্যে প্রায় সমস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রক বা চালকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শোনা যায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমার চাবুকই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে আমি তরবারি ব্যবহার করি না। আমার কথাই যেখানে কাজ করে সেখানে আমি চাবুকও ব্যবহার করি না। আমার সহযোগীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদি একটা চুলের মতো পলকা বাঁধনেও বাঁধা থাকে, আমি তাকে ভাঙতে দিই না। তারা যখন টানে আমি বাঁধন আলগা করি; আবার তারা যদি আলগা করে আমি টেনে ধরি।" আল-হাসানের সিংহাসন ত্যাগের মুহূর্তে তিনি যে চিঠিটি তাকে পাঠিয়েছিলেন বলে জানা গেছে, তার থেকে নিচের বক্তব্যটি তুলে দেওয়া হয়েছে : "আমি স্বীকার করি যে, তোমাব রক্তের সম্পর্কজনিত কারণে আমার পরিবর্তে ওই উচ্চ আসনে বসার ক্ষেত্রে তুমিই অধিকতর যোগ্য। আর আমি যদি রাজকর্তব্য পালনে তোমার দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতাম তা হলে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে তোমার আনুগত্য স্বীকার করে নিতাম, এখন তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার কি করা উচিত।" চিঠিটির সঙ্গে যুক্ত ছিল মু'আবিয়ার সই করা একটি ফাঁকা কাগজ এবং তার শূন্যস্থানটি আল-হাসানকে পূরণ করতে হবে।

যে সমস্ত ঐতিহাসিকের রচনাবলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তার থেকে জানা যায় যে, নানা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও মু'আবিয়া, তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁরা মু'আবিয়াকে ইসলামের প্রথম মালিক (রাজা) বলে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এই উপাধিটা প্রকৃত আরবদের কাছে এতই বিতৃষ্ণার যে তাঁরা এটি শুধুমাত্র কোনোও অ-আরবীয় রাজার ক্ষমতা বোঝাতে ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিকদের লেখায় এই রক্ষণশীলদের মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়, যাঁরা মনে করতেন যে মু'আবিয়া ইসলামকে পার্থিব এবং খিলাফত আল-নুবুআহ্ (পয়গম্বর সুলভ, অর্থাৎ-ধর্মভিত্তিক, খিলাফত)-কে একটি মুলক্ বা পার্থিব সার্বভৌম সত্তায় পরিণত করেছেন। তাঁদের মতে, তাঁর অশাস্ত্রীয় সৃষ্টির অন্যতম হল মাকসুরা বা মসজিদের মধ্যে এক ধরনের বাসগৃহ যেটা শুধুমাত্র খলিফা ব্যবহার করতে পারতেন। শুক্রবারের দুপুরের বাণী (খুতবা) তিনি বসে বসেই পড়তেন। তিনিই প্রথম একটি রাজসিংহাসন (সারির আল-মুলক) তৈরি করেছিলেন। আব্বাসি আমলে বা শী'আদের প্রভাবে রচিত আরবীয় বর্ষপঞ্জিতে তাঁর ধর্মানুরাগের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য ইবন-আসাকিরে সংরক্ষিত সিরিয়ার ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁকে একজন ভাল মুসলিম বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উমাইয়া বংশধরদের মধ্যে তিনি ক্ষমাশীলতা, প্রাণপ্রাচুর্য, বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক চাতুর্য ইত্যাদি গুণাবলি সঞ্চারিত করে গেছেন।

এসব ব্যাপারে অনেকে তাকে ছাপিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও অল্প কয়েকজনই তাতে সফল হয়েছেন। রাজা হিসাবে তিনি শুধু প্রথমই নন, আরবীয় রাজাদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠও বটে। ❑

টীকা

১ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪; তুলনীয় মাসউদী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪।

২ ইব্‌ন-হাজার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩; দীনাওয়ারি, পৃঃ ২৩১ দেখুন।

৩ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩।

৪ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬।

৫ ইব্‌ন-আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৬, ১, ২১।

৬ ইব্‌ন-হাজার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭।

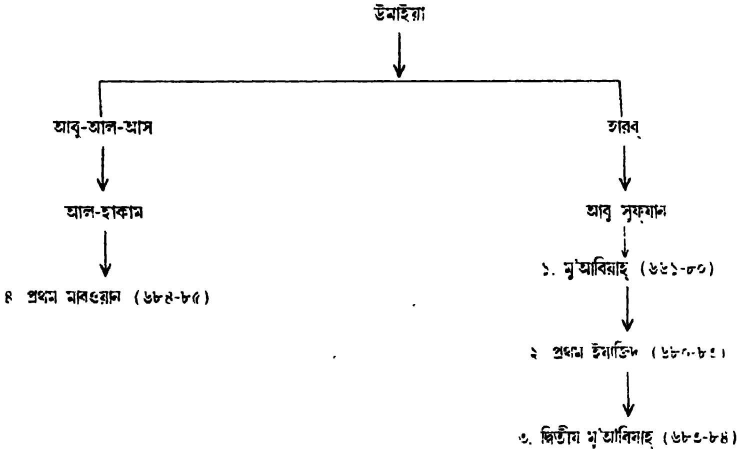
৭ তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২০; ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯।

৮ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৭; আল-ফাকিহি, আল-মুনতাকা ফি আখবার উম-আল-কুরা, সম্পাদনা এফ. ওস্টেনফেল্ড (লিপজিগ, ১৮৫৯), পৃঃ ১৮ ও পরবর্তীপৃষ্ঠায়; আজরাকি, আখবার মক্কা, পৃঃ ৩২। উমাইয়া সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের পর ইবন আল-জুবাইর কর্তৃক কা'বা পুনর্নির্মিত হয়।

৯ দামাস্কাসের অনতিদূরে মারজ আয্‌রা গ্রামের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি সমভূমি। ইক্‌দ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২০-২১ দেখুন; মাসউদী ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০১। উমাইয়া রাজবংশের বিশ্বস্ত সমর্থক কালব ও উত্তর আরব থেকে আগত নয়া উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি কায়েসদের মধ্যকার সুদীর্ঘ কালব্যাপী দ্বন্দ্ব উমাইয়া রাজবংশের পতনের কারণগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম। সিরিয়া লেবাননের বর্তমান রাজনীতিতেও কায়েসী ও ইয়ামানি পার্টির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিম্নে দেখুন, পৃঃ ২৮১।

১০ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৪, ১, ১৯।

১১ নিম্ন সংযোজিত বংশলতিকাটিতে উমাইয়া রাজবংশের সুফয়ানি শাখার সঙ্গে মারওয়ানি শাখার প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।



১২ দীনাওয়ারি, পৃঃ ৩০; ইব্‌ন-আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫০।
১৩ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪৫-৪৮।
১৪ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫২।
১৫ পৃষ্ঠা ১১৮=হিট্টি, পৃঃ ১৮১।
১৬ গাই লী স্ট্রেঞ্জের 'প্যালেস্টাইন আণ্ডার দি মোসলেমস' (বোস্টন, ১৮৯০), পৃঃ ৩৪২ দেখুন; তুলনীয় জুবাইর, রিহ্‌লাহ্ (লিডেন, ১৯০৭), পৃঃ ৩০৫।
১৭ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে, পৃঃ ১৬৮।
১৮ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮; বালাযুরি, পৃঃ ৪১০; তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।
১৯ তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০৯-১০, মাসউদী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮০, ১০৪; তুলনীয় ইক্‌দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, ১, ৩১।
২০ ফাখরি, পৃঃ ১৪৮। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিম্নে দেখুন, পৃঃ ৩২২।
২১ আবু-আল-ফিদা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩; নিকলসন, লিটারারি হিস্টোরি, পৃঃ ১৯৫।
২২ ইক্‌দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩, ১, ৩০।
২৩ আরবীয় বর্ষপঞ্জিতে এই ব্যক্তি ও তার পুত্র সারজুন ইব্‌ন-মনসূরের নাম নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে তা নিরসনে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৫, ২২৮ ও ২৩৯ দেখুন। মাসউদী, তানবিহ্, পৃঃ ৩০২, ৩০৬, ৩০৭, ৩১২; তুলনীয় থিওফেনিস, পৃঃ ৩৬৫।
২৪ ইব্‌ন-আসাকির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮০।
২৫ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড; পৃঃ ২৬৫, ওয়েলহাউসেন, রাইখ, পৃঃ ৮৫, এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিবরণটি কল্পিত বলে মনে করাই ভাল।
২৬ ওয়েলহাউসেন, রাইখ, পৃঃ ৮৪।
২৭-৩৫৬ পৃষ্ঠা।
২৮ মাসউদী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭৩; তুলনীয় তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪-৭৭।
২৯ দীনাওয়ারি, পৃঃ ২৩২-৩৩; তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০; ইব্‌ন-আসাকির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭।
৩০ ফাখরি, পৃঃ ১৪৫; ইক্‌দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৪; মাসউদী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০।
৩১ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩, ইক্‌দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০
৩২ তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫।
৩৩ ইব্‌ন-খালদুন, মুকাদ্দামা, পৃঃ ১৬৯ ও পরবর্তী। ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।
৩৪ ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬; দীনাওয়ারি, পৃঃ ২২৯; তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০, ১, ২০।
৩৫ ইব্‌ন-আল-ইবরি পৃঃ ১৮৮।
৩৬ ইব্‌ন-খালদুন, মুকাদ্দামা, পৃঃ ২১৭, আল-কালকাশান্দি, সুব্‌হ-আল-আশা, ৪র্থ খণ্ড, (কায়রো ১৯১৪), পৃঃ ৬।
৩৭ মাসউদী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮ দামাস্কাসের (আল-) বাব আল-সাগীর-এর সমাধিস্থানে মু'আবিয়ার কবরটি এখনও দেখা যায়।

।। অধ্যায় ১৮ ।।

বাইজানটানিয়দের বিরোধীরা

নতুন পদে অধিষ্ঠিত হয়েও কিন্তু মু'আবিয়া-র পায়ের তলায় জমি তত নিরাপদ ছিল না। ঘরোয়া সমস্যায় তিনি জর্জরিত ছিলেন। তাই তিনি অতিদ্রুত সম্রাট দ্বিতীয় কনস্ট্যানসের (৬৪১-৬৮) সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করলেন (৬৫৮ অথবা ৬৫৯) বার্ষিক এক নজরানা দিয়ে। এর উল্লেখ পাওয়া যায় থিওফ্যানিসের[১] বিবৃতিতে। পরে আল-বালাযুরিতেও[২] এর বর্ণনা মেলে। কিন্তু কিছুকাল যেতে-না-যেতেই এই সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। গোলমাল বাঁধল বাইজানটাইনের জমি ও সমুদ্র-এলাকার দখল নিয়ে। দু'দুবার মু'আবিয়া শত্রুদেশের রাজধানীতে হানা দিলেন। এশিয়া মাইনর ও রোমান ভূখণ্ডে (বিলাদ আল-রূম) এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল লুঠ করা, লুঠের মালের দখল নেওয়া। অবশ্য কনস্ট্যানটিনোপলের ক্ষীণ চাহনির ইশারাও যে নেপথ্যে ছিল না, তা বলা যায় না। ধীরে ধীরে এই লুণ্ঠন অভিযান বার্ষিক এক কাজ হয়ে দাঁড়াল। এতে সৈন্যদের শারীরিক ভাবে পটু রাখা এবং প্রশিক্ষণের কাজটা হয়ে যেত। তবু আরবের লোকজন কখনও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে স্থায়ী আস্তানা গড়ার প্রয়াসে সফল হতে পারেনি। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব এবং পশ্চিমমুখে অভিযান, যেখানে প্রতিরোধের আশঙ্কা কম। নয়তো এশিয়া মাইনর অঞ্চলে আরবী এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিবাসীদের সম্পর্কের কাহিনী অন্যভাবে লেখা হত। উত্তরখণ্ডে তুরস (Taurus) এবং বিরোধী শক্তির যে সুউচ্চ অবস্থানরেখা রয়েছে তা বোধহয় প্রকৃতিই চিরকালের জন্য সীমান্তরেখা হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। আরবী ভাষা যেন তাদের দক্ষিণ ঢালে জমাটবদ্ধ হয়ে রয়েছে। একটা সময়ে সালজুক এবং পরে তুরস্কের তুর্কিরা ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতায় এশিয়া মাইনরের কিছু এলাকাকে আরবীভাষী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া কখনও এশিয়া মাইনরের কোন অংশ আরবীভাষী হয়ে ওঠেনি। এই অঞ্চলের যে মূল জনসংখ্যা একেবারে আদিমকাল থেকে ছিল তাদের মধ্যে আরবী, ফিনিশিয়, হিব্রু, অ্যাসিরিয় বা অ্যারামিনিয়ানভাষী কেউ ছিল না। তার ওপর এই অঞ্চলের আবহাওয়াও ছিল আরব সভ্যতা প্রবেশের প্রতিকূল।

ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের কাছে মুসলিম দুর্ভেদ্য দুর্গ দিয়ে ঘেরা ছিল দীর্ঘ এক অঞ্চল এবং আযানাহ্, আলমাসীসা, মারআশ-এর ইউনিটগুলি কৌশলী যোদ্ধার মতো ফৌজি রাস্তার মোড়ে বা সঙ্কীর্ণ গিরিপথের ঢোকার মুখে অবস্থান করত। মালাতাইহ্ (মতান্তরে মালাতিয়াহ)

মেলিটিন থেকে তরসাস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই এলাকা। এই ঘাঁটিগুলিকে বলা হত 'আওয়াসিম'। তবে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'আওয়াসিম' বলতে কোন ফৌজি দুর্গের অভ্যন্তর বোঝায়। পাশাপাশি দুর্গের বাইরেকে বলা হয় 'তুগুর'[৩]। এই 'তুগুর' আব্বাসীয়দের অধীনে সঙ্কুচিত হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তরসাস এর আওলাস থেকে ইউফ্রেটিস[৪] এর সুমাইসাত (মতান্তরে সামোসাতা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মেসোপটেমিয়া থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত রেখা ধরে সুরক্ষার ভার ছিল যাদের হাতে তাদের বলা হত আল-তুগুর আল-জাযারিয়া। আর সিরিয়াকে যারা আগলে রাখত বিদেশি আক্রমণ থেকে তাদের বলা হত আল-তুগুর আল শামিয়া।[৫] সিলিসিয়ান ফটকের দক্ষিণ প্রবেশ মুখের সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখত তরসাস। এটি ছিল গ্রিকদের ভূখণ্ডে আরব আক্রমণ প্রতিরোধের ফৌজি ছাউনিগোছের। অঞ্চলটি বিস্তৃত ছিল ৪৫০ মাইলের মত। অন্য যে পথটি দিয়ে তরাসের পর্বতমালায় যাওয়া যেত সেটাকে বলা হত দার্ব-আল-হাদাস। উত্তর মারাশ থেকে আবুলাস্তাইন[৬] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই পথ। এই আরব সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল দাবিদারহীন এক এলাকা। এই আরবীয় ঘাঁটিগুলি মাঝেমধ্যেই হাতবদল হত। যুদ্ধের জোয়ার-ভাঁটার ওপর তা নির্ভর করত। উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের অধীনে প্রতি পদক্ষেপে লড়াই চলত, সে লড়াই ছিল রক্তাক্ত। এশিয়ার আর কোন স্থানে বোধহয় এভাবে রক্তপাত হয়নি।

হিজরী ৩৪ অব্দে (৬৫৫ খ্রিঃ) উসমানের অধীনে সিরিয়ার শাসক ছিলেন মু'আবিয়া। মিশরিয় বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বুসর-ইব্ন-আবি-আতা[৭] লিসিয়ান উপকূলে ফিনিক্স নামে এলাকায় গ্রিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। গ্রিকবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হেরাক্লিয়াসের পুত্র সম্রাট দ্বিতীয় কনস্ট্যানস। সেই নৌযুদ্ধে ইসলামের প্রথম বড়সড় জয় হয়। এই জয়ের কাহিনী আরবী ইতিহাসপঞ্জিতে 'যু-আল-সওয়ারি'[৮] হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আরবরা সমুদ্রযুদ্ধকে হাতাহাতি যুদ্ধে পরিণত করে। প্রতিটি আরবীয় জাহাজকে পাশাপাশি বেঁধে গ্রিক নৌযানের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়।[৯] এই যুদ্ধে গ্রিক বাহিনী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়।[১০] আল-তাবারীতে[১১] এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, সমুদ্রের জল লাল হয়ে গিয়েছিল। আরবরা কিন্তু এই যুদ্ধ জয়ের সুবিধা বিশেষ কিছুই পায়নি, কনস্ট্যানটিনোপলের দিকে এগিয়েছিল মাত্র। এর কারণ সম্ভবত ওই সময়ই উসমান খুন হন এবং নানারকম গোলমাল শুরু হয় দেশে।

তিন তিনবার কনস্ট্যান্টিনোপলকে ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছিল উমাইয়া বাহিনী। এই সময়ই সিরিয়া-আরব মিলিত বাহিনী গ্রিস রাজধানীর দুর্ভেদ্য প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। প্রথমবার হিজরী ৪৯ অব্দে (৬৬৯ খ্রিঃ) যুবরাজ ইয়াজিদের নেতৃত্বে অভিযান হল। তাঁর যোদ্ধারাই প্রথমবার বাইজানটিয়ামের[১২] ওপর নজর দেয়। ইয়াজিদকে যুদ্ধ করতে

পাঠিয়েছিলেন তাঁর পিতা। সে সময় বাইজানটিয়ামের এশিয় উপকণ্ঠে জমির জন্য লড়াই চালাচ্ছিলেন ফাযালাহ্-ইবন-উবায়দ-আল-আনসারি। তাঁকে মদত দিতেই পাঠানো হয়েছিল ইয়াজিদকে। এছাড়া যেসব গোঁড়াপন্থিরা ইয়াজিদের ভাবী খলিফা হওয়ার প্রতি তির্যক দৃষ্টি হেনে বিরোধিতা করছিল তাদের জব্দ করতেও ইয়াজিদ এই অভিযান চালান। ইয়াজিদের নেতৃত্বে প্রথম অবরোধ হয়। ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে ফাযালাহ্ অবরোধ শুরু করে ওই বছরের গ্রীষ্মকালে অবরোধ আরও জোরদার করেন। ৬৬৮-৮৫ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে বাইজানটিয়ামের একজনই উৎসাহী সম্রাট ছিলেন— সম্রাট চতুর্থ কনস্ট্যানটাইন।

ইয়াজিদ সাহসী যুবরাজ হিসেবে বেশ নাম কিনে 'ফাতা-আল-আরব' উপাধি লাভ করেন। আগানির[১৩] বর্ণনায় আছে, আরব ও বাইজানটাইন যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে দুটি পৃথক তাঁবু থেকে জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ইয়াজিদ খবর পেলেন যে, একটি তাঁবু রোমের রাজার-কন্যা দখল করে রয়েছে। অন্যটি দখল করে রয়েছে জাবালাহ ইব্‌ন-আল-আইহাম-এর কন্যা। খবর শুনেই ইয়াজিদ অসামান্য তৎপরতায় অবরুদ্ধ করতে অভিযান চালান এবং গাস্‌সানীয় রাজকন্যাকে তুলে আনেন। অবশ্য ইয়াজিদের অভিযানে প্রকৃত রূপকথার বীর ছিলেন বর্ষীয়ান আবু আয়্যুব-আল-আনসারি। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদের বিশিষ্ট আদর্শবাহী অনুগামী। হিজরাহ[১৪] পরবর্তীকালে তিনিই মুহাম্মাদকে মদীনায় নিজের আবাসে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যাঁর উপস্থিতি ছিল ইয়াজিদ শিবিরের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। অথচ যুদ্ধ জয়ের মুখে আবু আয়্যুবের আমাশয় রোগে মৃত্যু হয়। তাঁকে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীরের সামনে কবর দেওয়া হয়। সেই কবরস্থান এরপরেই খ্রিস্টান গ্রিকদের কাছে পবিত্রস্থানে পরিণত হয়। তাঁরা খরার সময় এই কবরস্থানে এসে প্রার্থনা করতেন বৃষ্টির জন্য।[১৫] ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করলে ওই কবরস্থানের স্মারকটি পুনরুদ্ধার করা হয়। অ্যান্টিয়োকে ধর্মযোদ্ধাদের পবিত্র বল্লম আবিষ্কারের ঘটনাটি-এ প্রসঙ্গে তুলনীয়। যাই হোক, পরে ওইখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এভাবে তিনটি দেশের কাছে এক সাধক রূপে সম্মান পান এই মহান মদীনাবাসী।

কনস্ট্যান্টিনোপলের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ হয় তথাকথিত 'সাত বছরের যুদ্ধের'[১৬] সময়। হিজরী সন ৫৪-৬০ অব্দে (৬৭৪-৮০ খ্রিস্টাব্দে)। সেইবার মূলত লড়াই হয় কনস্ট্যান্টিনোপলের কাছে দু'দল সৈন্যের মধ্যে। আরবরা সিজিকাসের[১৭] উপদ্বীপে মারমারা সমুদ্রে এক নৌঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই সিজিকাস উপদ্বীপকে আরব ইতিহাসের কালপঞ্জিতে ভুল করে 'আরওয়াদ দ্বীপ'[১৮] হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এই নৌঘাঁটিই আরবদের শীতকালীন নৌঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং এখান থেকে আক্রমণ চালানো সহজ ছিল। আরবের দিক থেকে এই অভিযানের প্রচার ছিল বিভ্রান্তিকর। জানা যায়, এক ধরনের অতিদাহ্য 'গ্রিক-মাটি' এই যুদ্ধে কনস্ট্যান্টিনোপলকে বাঁচিয়ে দেয়। এই দাহ্য পদার্থটি জলেও দাউ দাউ করে জ্বলত। দামাস্কাসের এক সিরীয় উদ্বাস্তু এই পদার্থ আবিষ্কার করে। ওই

উদ্বাস্তুর নাম ছিল ক্যালিনিকাস। গ্রিক বাহিনী নাকি এই পদার্থ ব্যবহার করেই সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যায়। গ্রিক কাহিনীতে এই নিয়ে সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। মনবিজ[১৯] এর অ্যাগাপিয়াস যিনি ছিলেন থিওফ্যানিস মতের সমর্থক জানিয়েছেন বাইজেনটাইনরা গ্রিকদের এই দাহ্য পদার্থকে, কীভাবে প্রথম যুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন।

এই সময়ই অস্থায়ীভাবে দখল করা হয় রোড্‌স (মতান্তরে রুডিস[২০]) এবং ক্রিট। প্রথমবার রোড্‌স দখল হয় ৬৭২ খ্রিস্টাব্দ। পরে আবার ৭১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে। আগে ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই রোডস আরবরা লুণ্ঠন করেছিল। দু'বছর পরে রোডসের বিশাল ধাতব সূর্যদেবতার মূর্তি এক ব্যবসায়ী কিনে নেন। ওই ব্যবসায়ী ধাতব মূর্তিটি আনতে ৯০০ উট ব্যবহার করেছিলেন। পরে রোডস ফের দখল করে স্পেন থেকে আসা আরবের দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীরা।

৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া-র মৃত্যুর পর আরব সৈন্যবাহিনীকে বসপোরাস ও ইজিয়ান সমুদ্রবক্ষ থেকে প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু রোমান ভূখণ্ডে হানা কখনও প্রত্যাহৃত হয়নি। আমরা প্রায় সমস্ত বহিরাক্রমণের ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখেছি, কোনটিই তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ৭১৫-১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলাইমান-এর অভিযানকেই ইতিহাস গুরুত্ব দেয়। সুলাইমান নিজেকে হাদীসে-বর্ণিত সেই খলিফা হিসেবেই মনে করতেন, তাঁর ধারণা ছিল তিনি পয়গম্বরের নাম ধারণ করে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আমলেই দ্বিতীয় এবং শেষবার সবচেয়ে ব্যাপক আকারে অবরুদ্ধ হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। ৭১৬-৭১৭ খ্রিস্টাব্দের[২১] আগস্ট-সেপ্টেম্বর এই অবরোধ হয়েছিল সুলাইমান-ভ্রাতা মাসলামাহ্-এর নেতৃত্বে। আরবদের অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর এবং উল্লেখযোগ্য এই অবরোধ ইতিহাসে স্বর্ণখচিত হয়ে রয়েছে নানা কারণে। অবরোধকারীরা সমুদ্র, ভূমি—দু'দিক দিয়েই ভয়ংকর অভিযান চালিয়েছিল। তাদের সঙ্গে ছিল প্রচুর ন্যাপথা এবং বিশেষ গোলন্দাজ বাহিনী।[২২] তাঁরা মিশরিয় নৌবাহিনীর মদত পেয়েছিল।। মাসলামাহ-এর রক্ষীবাহিনীর প্রধান আবদুল্লাহ্ আল-বাত্তাল এই যুদ্ধে[২৩] দুর্দান্ত সাহসিকতা দেখিয়ে 'সেরা ইসলামি' উপাধি পান। অবশ্য পরবর্তী কোন যুদ্ধে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারাও যান। ইসলামি প্রথা অনুযায়ী এই সায়্যিদ গাজী আল-বাত্তাল তুরস্কের জাতীয় বীরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তাঁর কবরস্থানে নির্মিত হয় মসজিদ, যা আজও এসকি শহরে (মধ্যযুগের ডোরিলিয়াম) আছে। এই বীরদের স্মরণে খ্রিস্টানরা তাঁদের গির্জায়[২৪] এক মূর্তি স্থাপন করেন। এই ঘটনা অভিনব।

শেষ পর্যন্ত সম্রাট লিও দ্য আইস্যাউরিয়ান কৌশলে মাসলামাহকে পরাস্ত করে রাজধানীকে টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। এই সম্রাট ছিলেন সিরিয়া জাত মারআশ সম্প্রদায়ভুক্ত। আরবী এবং গ্রিক ভাষায়[২৫] তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। এর আগে কনস্ট্যান্টিনোপলে যে অবরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সময়ই বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সন্ধান পাই। মাসলামাহ-এর সৈন্যবাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলের স্বর্ণসিংহাসন কেন স্পর্শ করতে পারেনি, তা জানা যায়। কারণ গ্রিকরা তাদের বিখ্যাত দাহ্য পদার্থের

সাহায্য নিয়েছিল। পাশাপাশি বুলগাররা গ্রিকদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে মাসলামাহ বাহিনীকে আক্রমণ করে। এছাড়া খাদ্যাভাব, অসহ্য শীত এবং মহামারী মাসলামাহ বাহিনীকে জর্জরিত করে তোলে। তবু মাসলামাহ পরাস্ত না হয়ে টিকেছিলেন। এমন কী সিরিয়ায় খলিফার মৃত্যুও মাসলামাহকে অবরোধ তুলতে প্ররোচিত করেনি। বরং নতুন খলিফা উমার-ইব্‌ন-আবদ-আল-আযিয (৭১৭-২০)-এর ফতোয়া মেনে তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। পিছু হঠার সময় সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। থিওফ্যানিসকে[২৬] বিশ্বাস করলে একথা মানতেই হবে যে, সিরিয়ার ১৮০০ নৌজাহাজের মধ্যে মাত্র ৫টি সিরিয়ার নৌঘাঁটিতে ফিরতে পেরেছিল। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই ইস্যাউরিয়ান বংশের সিরীয় প্রতিষ্ঠাতাকে আরবের মুসলমানরা ইউরোপের ত্রাতা হিসেবে সম্বোধিত করলেন। অন্যদিকে হেরাক্লিয়ান বংশের আর্মেনীয় প্রতিষ্ঠাতা হেরাক্লিয়াস অ-খ্রিস্টান পারস্য দেশ থেকে নিজেকে খ্রিস্টান ধর্মের মুক্তিদাতা হিসেবে ঘোষণা করলেন। এরপর মাত্র একবার এক আরব নেতাকে কনস্ট্যান্টিনোপলের ত্রিসীমানায় দেখা গেছে। খলিফা আল-মাহ্‌দী-র পুত্র হারুণ ৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের স্কুটারিতে (খ্রিসোপোলিস) ঘাঁটি গেড়েছিলেন। রানি ঈরিনা তাঁকে বার্ষিক নজরানা দিয়ে তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে বিলম্ব করেননি। এছাড়া কনস্ট্যান্টিনাইনের সাম্রাজ্যকে তার প্রাচীরের অভ্যন্তরে আর কোন মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে দেখতে হয়নি। প্রায় সাত শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর মঙ্গোলীয় তুর্কি নামে এক নতুন জাতির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ অবস্থা ছিল। এরাই পরে মুহাম্মাদের ধর্মের ধ্বজাধারী হন।

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা শিরোধার্য হলেও মাসলামাহ-এর জবরদস্ত অভিযান ইসলামি ইতিহাসে বহু কিংবদন্তির সূচনা করেছে। কনস্ট্যান্টিনোপলের[২৭] বুকে ওই মাসলামাহ-এর ভ্রাতা[২৮] কীভাবে মসজিদ, ঝরনা নির্মাণ করেছিলেন এবং আবিদোসে (মতান্তরে আবদুস) কিভাবে তিনি আরেকটি মসজিদ[২৯] নির্মাণ করেছিলেন বা কীভাবে ঘোড়ার পিঠে চেপে কনস্ট্যান্টিনোপলের সেন্ট সোফিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন — তা সত্যিই কিংবদন্তি। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল-মাকদিসি-[৩০] তে লেখা হয়েছে, "যখন মাসলামাহ্ ইব্‌ন-আবদ-আল-মালিক রোমানদের দেশ আক্রমণ করে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন তিনি তখনই ঠিক করে ফেলেন যে, হিপ্পোড্রোমে (ময়দান) বন্দি বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিদের নজরবন্দি করার জন্য তাঁরা যে গৃহে বাস করেন তার সামনে প্রহরী হিসেবে তিনি বাইজানটাইন কুত্তাদের দাঁড় করিয়ে রাখবেন।[৩১]

আরবদের উত্তরমুখী সম্প্রসারণ অভিযান ব্যাহত হওয়ার একটি বড় কারণ ছিল বাইজানটাইনের স্বার্থে বিদ্রোহী খ্রিস্টানদের সক্রিয়তা। এর মাঝে অনির্দিষ্ট বংশোদ্ভূত একদল লোক প্রায় স্বাধীন জাতীয় জীবনযাপন করে দ্রুতবেগে ঠিক আল-লুক্কাম (আমানুস) এর মতোই উঠে এলেন। আরবরা তাঁদের জারাজিমাহ (আরও ঠিকভাবে উচ্চারণ করলে বলতে

হয় জুরাজিমাহ) বলে অভিহিত করতেন। এই জুরাজিমাহরা অনিয়মিত সৈন্যবাহিনীও গড়ে ফেললেন। অবশেষে তাঁরা সিরিয়ার আরব শাসকের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। আরব-বাইজানটাইন সীমান্তে ওঁরা এশিয় মাইনরের সুরক্ষায় এক 'পিতলের প্রাচীর'[২২] (ইস্পাতদৃঢ় অর্থে) তৈরি করলেন। আনুমানিক ৬৬৬ খ্রিঃ তাঁদের বাহিনী লেবাননের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। সেই বাহিনীকে ঘিরেই বহু পলাতক এবং সমাজবিরোধী লোকজন জোটবদ্ধ হল। এদের মধ্যে ছিল মারোনাইটস্‌রাও। ঘরের এই শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করে মু'আবিয়াকে বার্ষিক নজরানা পর্যন্ত দিতে হল। পরে বাইজানটাইন সম্রাটকে প্রচুর পরিমাণে বার্ষিক নজরানা দেওয়ার বিনিময়ে এই ঘরের শত্রুদের জন্যে সন্ধিচুক্তি করতেও সম্মত হলেন মু'আবিয়া। ৬৮৯ খ্রিঃ নাগাদ দ্বিতীয় জ্যাস্টিনিয়ান আরও একবার খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের পরাস্ত করলেন সিরিয়ার বুকে। পরে মু'আবিয়াহ[৩৩]-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আবদ-আল-মালিক সম্রাটের নতুন শর্ত মেনে নিলেন। তিনি জুরাজিমাহদের প্রতি সপ্তাহে এক হাজার দিনার মুদ্রা দিতে সম্মত হলেন। শেষপর্যন্ত বাইরের আক্রমণকারীদের অধিকাংশই সিরিয়া ছেড়ে চলে গেল। তারা আরও দূরের প্রদেশে বা এশিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলে স্থায়ীভাবে আস্তানা তৈরি করল। এশিয়া মাইনরে গিয়ে তারা সমুদ্রের নাবিকের পেশা বেছে নিলেন। বাকিরা রয়ে গেলেন এবং তারা মারোনাইট সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করলেন। উত্তর লেবাননে এখনও এরা বাস করছেন। ❑

● টীকা ●

১ ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

২ ১৫৯ পৃষ্ঠা, ১.১ = হিট্টি পৃষ্ঠা ২৪৫

৩ দেখুন গাই লে স্ট্রেঞ্জ এর 'দ্য ল্যান্ড অব ইস্টার্ন ক্যালিফেট' (কেম্ব্রিজ, ১৯০৫) পৃষ্ঠা ১২৮

৪ ইস্‌তাখরি, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮

৫ বালাযুরি ১৮৩ পৃষ্ঠা। ১৬৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

৬ ইয়াকূত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪ দেখুন, লে স্ট্রেঞ্জ, ইস্টার্ন ক্যালিফেট পৃ ১৩৩ দেখুন। বাইজানটাইন নাম আবলাসতা, গ্রিক নাম আরাবিসাস। পরে আরবীতে হয় আল-বুস্তান।

৭ ইব্‌ন-আবদ-আল হাকাম, পৃষ্ঠা ১৯৮-৯০ পৃষ্ঠা; ইব্‌ন-হাজার, প্রথম খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা

৮ হয়তো জায়গার নাম, যা নাকি সাইপ্রেস গাছে ঘেরা ছিল, যা দিয়ে মাস্তুল লাগানো হত। অথবা বহু জাহাজের মাস্তুলের সংখ্যার জন্য এই নাম হয়েছে।

৯ ইব্‌ন-আবদ-আল হাকাম, পৃষ্ঠা ১৯০, ২, ১৮-১৯

১০ থিওফ্যানিস, পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৪৫-৪৬

১১ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬৮

১২ তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬, তুলনীয় ২৭ পৃষ্ঠা।

১৩ ষোড়শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩

১৪ বালাযুরি পৃ ৫ = হিট্টি পৃষ্ঠা ১৯

১৫ ইব্‌ন সাআদ, তৃতীয় খণ্ড, পার্ট, ২; পৃঃ ৫০, তাবারী তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২৪। দু'জনেই বলেন, তাঁর মৃত্যুকাল ৫২ হিজরীসন।

১৬ দেখুন (জে. বি. বিউরি, আ হিসট্রি অব দি লেটার রোমান এম্পায়ার (লন্ডন ১৮৯৯), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১০ নোট-৪।

১৭ দেখুন থিওফ্যানিস, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৫৪

১৮ তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৬৩ পাতা; বালাযুরি, ২৩৬ পৃষ্ঠা = হিট্টি ৩৭৬ পৃষ্ঠা।

১৯ দেখুন 'কিতাব আল-উনওয়ান' (এ ভাসিলিয়ে সম্পাদিত) এবং প্যাট্রোলোজিয়া ওরিয়েন্টালিস (প্যারিস, ১৯১২), তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯২।

২০ বালাযুরি পৃঃ ২৩৬ = হিট্টি পৃ ৩৭৫

২১ তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪৬, তুলনীয়, বিউরি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০১, নোট- ২।

২২ কিতাব আল-উয়ূন আল-হাদায়িক (দি গোয়জি সম্পাদিত) (লিডেন, ১৮৭১) পার্ট, ৩, পৃঃ ২৪

২৩ তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭১৬

২৪ মাসউদী, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭৪

২৫ কিতাব আল উয়ূন, পৃঃ ২৫, পার্ট- ৩।

২৬ পৃঃ ৩৯৫-৩৯৯

২৭ ইব্‌ন-তাগরি-বিরদি, আল-নুজূম আল-যাহিরা ফি মুলূক মিসর অ-আল কাহিরা ডাবলিউ পপার সম্পাদিত বার্কিলি ১৯০৯-১২ (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ৪০ পৃঃ ২.১২-১৩)। এতে মসজিদের এক ফাতিমিয় খুতবাহ-এর উল্লেখ আছে। দেখুন ইব্‌ন-আল-কালানিসি. যাইল-তারীখ দিমাশ্‌ক (এইচ এফ আমেদ্রোজ সম্পাদিত (বেইরুট, ১৯০৮) পৃঃ ৬৮, দ্বিতীয় খণ্ড ২৭--২৮ পৃঃ। এই মসজিদটি মামলুক যুগে ঠিক ছিল।

২৮ ইব্‌ন্ খুরদায্‌বিহ্‌, আল-মাসালিক-অ-আল-মামালিক (দি গোয়জি সম্পাদিত) লিডেন, ১৮৮৯, পৃঃ ১০৪, ১.১। মাসউদী দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা। এই স্থানটির নাম আন্দালুস)।

২৯ ইব্‌ন আল্‌ ফকীহ, কিতাব-আল-বুলদান (দি গোয়জি সম্পাদিত) (লিডেন ১৬৮৫) পৃঃ ১৪৫ ১.১৫ ; ইয়াকুত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪ এখানে এক আন্দুস নামে এক শহরের নাম রয়েছে। যা ভুলবশত আবদুস স্থলে ব্যবহৃত।

৩০ পৃষ্ঠা ১৪৭।

৩১ এই গৃহটি (আল-বালাত) এর ইয়াকুত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০৯ -তে উল্লেখ আছে। সঈফ-আল-দাউলাহ আল-হামদানির সময়ে এর ব্যবহার হয়েছিল (৯৪৪-৬৭) 'বালাত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের জন্য দেখুন হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৫০১ পৃষ্ঠার নীচে ১ নং নোট।

৩২ থিওফ্যানিস, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

৩৩ বালাযুরি পৃষ্ঠা ১৬০, ১.৮ = হিট্টি পৃষ্ঠা ২৪৭ ১.২৮।

।। অধ্যায় ১৯ ।।

উমাইয়া শক্তির সুবর্ণযুগ

উমাইয়া বংশের মারওয়ানি শাখার প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান (৬৮৩-৮৫ খ্রিঃ)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর পুত্র আবদ-আল-মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রিঃ) ক্ষমতাসীন হন। তাঁকে 'রাজাদের পিতা' হিসেবে অভিহিত করা হত। আবদ-আল-মালিক এবং তাঁর চার পুত্রের[১] শাসনে দামাস্কাসে এই রাজবংশ ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের শিখরে পৌঁছায়। আল ওয়ালীদ এবং হিশাম-এর আমলে ইসলামি সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়েছিল। অতলান্তিক সাগরের তীরভূমি থেকে পিরেনিজ পর্বত ও সিন্ধুনদের পাশ বরাবর চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্য। প্রাচীনকালে এবং আধুনিক যুগেও একমাত্র ব্রিটিশ এবং রুশ সাম্রাজ্য ছাড়া আর কোন সাম্রাজ্য এত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেনি। এই সুবর্ণযুগেই ট্রান্সঅক্সিয়ানাকে শাসনাধীনে আনা, উত্তর আফ্রিকাকে পুনর্জয় ও শান্ত করা এবং স্পেনের মতো বৃহৎ ইউরোপীয় দেশকে দখল করা সম্ভব হয়, যা আগে কোন আরব শক্তি পারেনি।

এই যুগেই প্রশাসনের জাতীয়করণ বা আরও স্পষ্ট করে বললে আরবীকরণ হয়। প্রথম খাঁটি আরবী মুদ্রার প্রচলন হয়। ডাক ব্যবস্থার উন্নতি হয়। আজ মুসলিমদের পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে বিশ্বে যাকে তৃতীয় হিসেবে গণ্য করা হয় জেরুসালেমের সেই ডোম অফ দি রক বা পাথরের গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এই যুগেই নির্মিত হয়।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই এবং তাঁর শাসনকালের প্রথম দশকে খলিফা আবদ-আল মালিকের শত্রুর অভাব ছিল না। এই ব্যাপারে পূর্বসূরি মু'আবিয়া-এর সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। তাঁর মতোই মালিককে নানা ক্ষেত্রে বহু শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়। তবু তাঁর শাসনের দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আল-ওয়ালীদ যে সাম্রাজ্য হাতে পান তা দস্তুরমতো সুসংহত এবং শান্ত ছিল। শুধু যে সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে এই সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে এনেছিল তাই নয়, অনেক নতুন রাষ্ট্রকেও জয় করেছিল। আল-ওয়ালীদ ছিলেন যোগ্য পিতার সুসন্তান।

উমার এবং উসমানের আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মিশর দখলই ছিল ইসলামি বিজয়রথের প্রথম পর্ব। এরপর নতুন পর্ব শুরু হয় আবদ-আল-মালিক এবং আল-ওয়ালীদের আমলে। এই দুই সাম্রাজ্যের দুর্মর সামরিক কৃতিত্বের মূলে ছিল দুই কেন্দ্র। পূর্বে আল-হাজ্জাজ-ইব্ন-ইউসুফ-আল-সাকাফি এবং পশ্চিমে মুসা ইব্ন-নুসাইর।

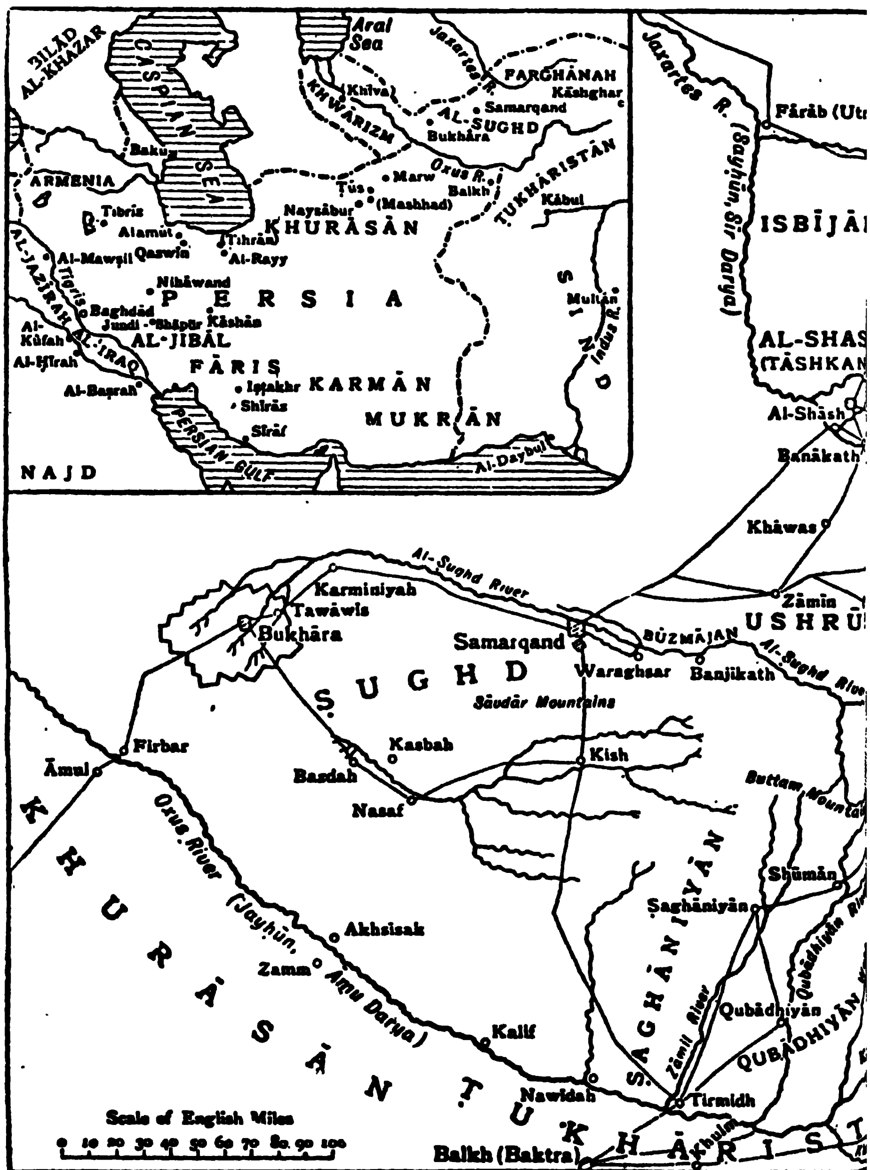
● উৎসাহী রাজ্যপাল : আল-হাজ্জাজ

আল-হিজাজে আল-তাঈফের[২] তরুণ শিক্ষক আল-হাজ্জাজ মসি ছেড়ে অসিকেই বরণ করে নিয়েছিলেন উমাইয়া সাম্রাজ্যের সমর্থনে লড়ার জন্য। তিনি ৩১ বছর বয়সে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল প্রতাপান্বিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন-আল-জুবাইরকে নিশ্চিহ্ন করে (৬৯২ খ্রিঃ) আরবের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। জুবাইর ৯ বছর ধরে ওই পদে বৃত ছিলেন এবং তাঁর উপাধি ও ক্ষমতা ছিল খলিফার সমান। দু'বছর ক্ষমতাসীন হয়েই আল-হাজ্জাজ আল-হিজাজকে শান্ত করে তোলেন। পাশাপাশি আল-ইয়ামান এবং পূর্বাঞ্চলের আল-ইয়ামামাহ প্রদেশকেও শান্ত করে তোলেন তিনি। ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তাকে আবদ-আল-মালিক ডেকে পাঠিয়ে গোলমেলে এবং অশান্ত আল-ইরাকেও শান্তি ফিরিয়ে আনার ভার দেন। আল-ইরাকের লোকজনের অধিকাংশই ছিল চতুর এবং কপট।[৩] সেখানে আলীপন্থিরা এবং খারিজীরা আগাগোড়া উমাইয়া সাম্রাজ্যের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরবী সাহিত্যের জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে ছদ্মবেশে আল-হাজ্জাজের আল-কূফাহ-এর বিখ্যাত মসজিদে অপ্রত্যাশিত আগমনের কথা। মাত্র ১২ জন উষ্ট্রারোহী নিয়ে তিনি আসেন ওই মসজিদে। এসে সটান উঠে যান প্রচারবেদীতে। তারপর মাথায় যে বিশালাকার পাগড়ি পরে তাঁর মুখ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছিলেন, তা সরিয়ে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর অগ্নিগর্ভ ভাষণ দেন। দ্ব্যর্থহীন শর্তে প্রতিটি নীতি ঘোষণা করে তিনি গোড়া থেকেই ইরাকিদের বুঝিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহী জনতার সঙ্গে তিনি নরম পথে চলবেন না। তিনি যেভাবে প্রাচীন কবির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ভাষণ শুরু করেছিলেন ওই মসজিদে তা ছিল এরকম :

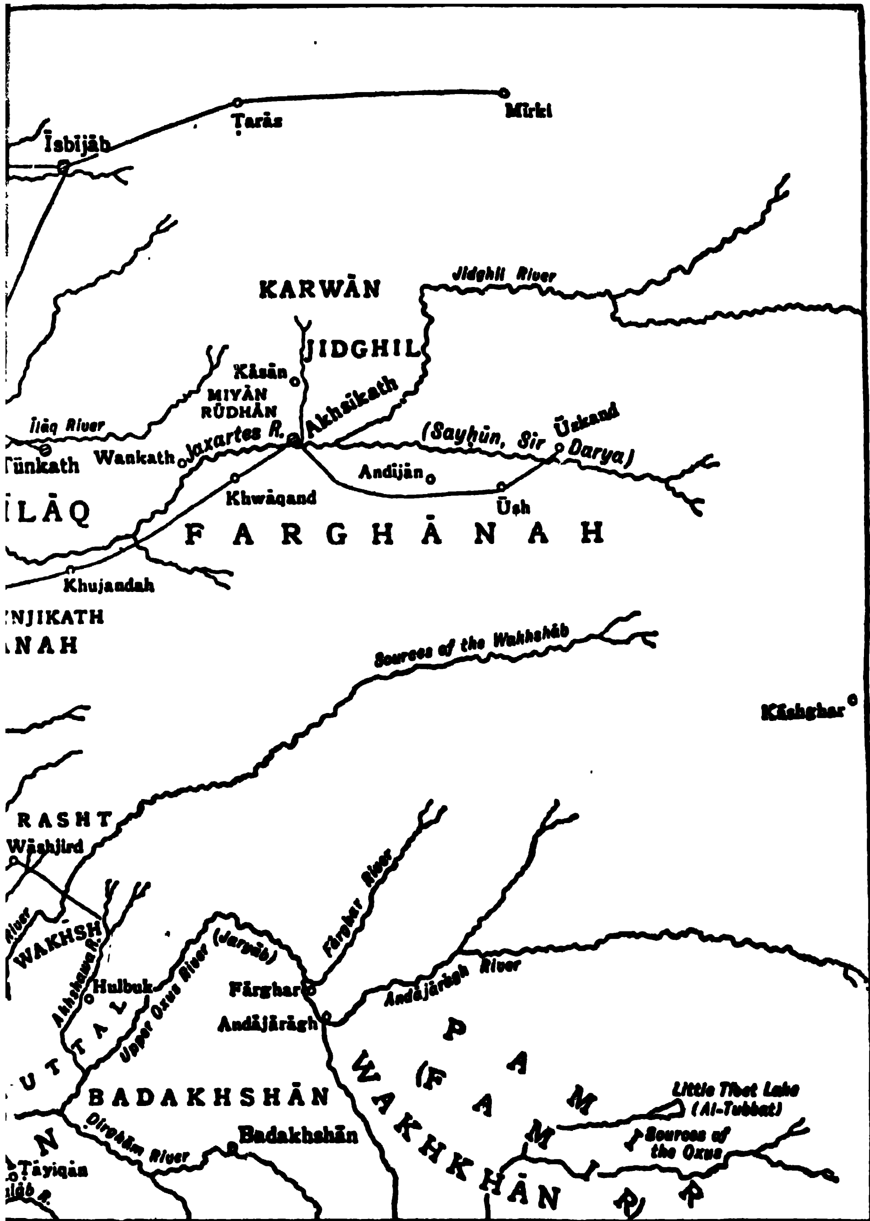
'আঁধার সরিয়ে আমিই
উঠে যাই সুউচ্চ প্রচারবেদীতে
মাথার শিরোপা সরালেই
আমায় চিনবেন সবাই।'

এরপরই তিনি বলেন, "আল-কূফাহ-এর জনগণ! নিশ্চিতভাবে দেখুন আমিই সেই ব্যক্তি, যে দেখতে পাচ্ছে কতগুলি মাথা কোতলের উপযুক্ত হয়েছে। আর সত্যি কথা হল, আমাকেই তা করতে হবে। বিশ্বাস করুন, আমি শিরোপা আর দাড়ির মাঝে রক্ত দেখতে পাচ্ছি।........"[৪]

কার্যত শত্রুপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার মতো এত সাহসী আর কোন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না উমাইয়া রাজবংশে। তাঁর কাছে মাথা উঁচু করে পৌঁছানোর মত সাহস কারো ছিল না। এমন-কী হযরত মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় সহচর এবং বিশিষ্ট হাদীসবর্ণনাকারী আনাস-ইব্‌ন-মালিক পর্যন্ত তার কোপদৃষ্টিতে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী শক্তিকে



অক্সাস (আমুদরিয়া) এবং জ্যাক্সার্টেস (সির-দরিয়া)-এর বিভিন্ন অঞ্চল



Taraz
Mirki
Isbijab
KARWAN
Jidghil River
JIDGHIL
Kasan
MIYAN
RUDHAN
Akhsikath
Ilaq River
Jaxartes R.
(Sayhun, Sir
Uzkand
Darya)
Tunkath
Wankath
Andijan
Khwaqand
Ush
ILAQ
F A R G H A N A H
Khujandah
NJIKATH
NAH
Sources of the Wakhshab
Kashghar
RASHT
Washjird
WAKHSH
Hulbuk
Akhshawa R.
Upper Oxus River (Jaryab)
Fargher River
Fargher
Andajaragh River
Andajaragh
KHUTTAL
BADAKHSHAN
Badakhshan
WAKHKHAN
PAMIR
(FAMIR)
Little Tibet Lake
(Al-Tubbat)
Sources of the Oxus
Dirgham River
Tayiqan

সহানুভূতি দেখানোর অভিযোগ ওঠে। এই সাহসী রাজপ্রতিনিধির শিলমোহর মারা গলাবন্ধ তিনি পরতে বাধ্য হন।[৫] আল-ইরাকের এই জবরদস্ত রাজ্যপাল, শোনা যায়, ১,২০,০০০[৬] মানুষকে কোতল করেছিলেন। আরব ঐতিহাসিকরাই লিখে গেছেন, মৃতদের অধিকাংশই ছিলেন শী'আহ এবং সুন্নি। তাঁরা আব্বাসী রাজত্বকে "রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী এবং যথার্থই নীরোর আমল"[৭] বলে বর্ণনা দিয়ে গেছেন। রক্তপিপাসার পাশাপাশি তাঁর অতিভোজনপ্রিয়তা এবং অধার্মিকতা ঐতিহাসিকদের কাছে বেশ আকর্ষক ছিল।[৮]

ন্যায়সঙ্গত হোক বা না হোক, আল-হাজ্জাজ যে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা কিন্তু বিদ্রোহী বসরাবাসী এবং কূফাহবাসীদের দমন করতে এবং আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা নেয়। শুধু এই দুই বিদ্রোহী শক্তিই নয়, আল-ইরাক এবং পারস্যেও তার গৃহীত ব্যবস্থা সফল হয়। আল-মুহাল্লাব-ইব্‌ন-আবি-সুফরাহ-এর নেতৃত্বাধীন তাঁর সৈন্যবাহিনী কার্যত আজরাকিদের[৯] নিশ্চিহ্ন (৬৯৮ কিংবা ৬৯৯) করেছিল। এই আজরাকিবাহিনী ছিল খারিজীদের। সমস্ত মুসলিম গোষ্ঠীরই ঐক্যের পক্ষে তা ছিল বিপজ্জনক শক্তি। এই খারিজীরা কাতারি-ইব্‌ন-আল ফুজাআহ্‌-এর নেতৃত্বে— কারমান[১০], ফারিস এবং অন্য পূর্বাঞ্চলের প্রদেশের দখল নেয়। পারস্য উপসাগরের বিপরীত উপকূলে উমানকে হযরতের আমলে এবং আমর-ইব্‌ন-আল-আসের আমলে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। সেই উমানও শেষপর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে নবনির্মিত রাজধানী 'বাসিত' থেকে আল-হাজ্জাজের সিরীয়বাহিনী এইসব ভূখণ্ড শাসন করত। এই নতুন রাজধানী নির্মিত হয়েছিল আল-ইরাকের দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর আল-বসরা এবং আল কুফাহ[১১]-এর মাঝামাঝি স্থানে। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর প্রতি তাঁর অন্ধবিশ্বাস ঠিক উমাইয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার মতই ছিল সীমাহীন।

তাঁর শাসন বাধাহীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আগ্রহদীপ্ত আল-হাজ্জাজ বিভিন্ন সেনাপতিদের আরও পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের নির্দেশ দিলেন। এই সেনাপতিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবদ-আল-রহমান ইবন-মুহাম্মাদ ইবন-আল-আশআস। তিনি ছিলেন প্রাচীন কিন্দাহ রাজবংশের তরুণ বংশধর এবং একসময় সিজিস্তানের রাজ্যপালও ছিলেন। এই তরুণটিই পরে আল-হাজ্জাজের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে ভয়ংকর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আশআসকে (৬৯৯-৭০০ খ্রিঃ) কাবুলের (আধুনিক আফগানিস্থানের) তুর্কি রাজা জুনবিলের (সঠিক উচ্চারণ করলে বলতে হয় রুতবীল)[১২] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়। কারণ তুর্কি রাজা তাঁর বার্ষিক নজরানা[১৩] দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওই যুদ্ধে আবদ-আল-রহমান এক বিশাল সুসজ্জিত বাহিনীর প্রধান হিসেবে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী 'ময়ূর-বাহিনী'[১৪] নামে অভিহিত হয়েছিল। এই অভিযান পুরোপুরি সফল হয়েছিল। কিন্তু এত সত্ত্বেও কুতাইবাহ্‌ ইব্‌ন-মুসলিম এবং মুহাম্মাদ-ইব্‌ন-আল-কাসিম আল সাকাফি-র তুলনায় তাঁর ভাবমূর্তি ছিল নিষ্প্রভ। তা ছাড়া শেষোক্ত জন ছিলেন আল্-

হাজ্জাজের জামাতা। আল-হাজ্জাজের সুপারিশে কুতাইবাহ্ ৭০৪ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানের রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন। তার রাজধানী ছিল মার্ভ। আল্-বালাযুরি[১৪] এবং আল-তাবারী[১৫]-এর বর্ণনা অনুযায়ী, আল-হাজ্জাজের অধঃস্তন হিসেবে খুরাসানের ওপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিল আল-বসরা-র ৪০ হাজার আরব-বাহিনী, আল-কূফাহ্-এর ৭০০০ বাহিনী এবং ৭০০০ অনুচর।

● নদী অতিক্রম করে বিজয় অভিযান

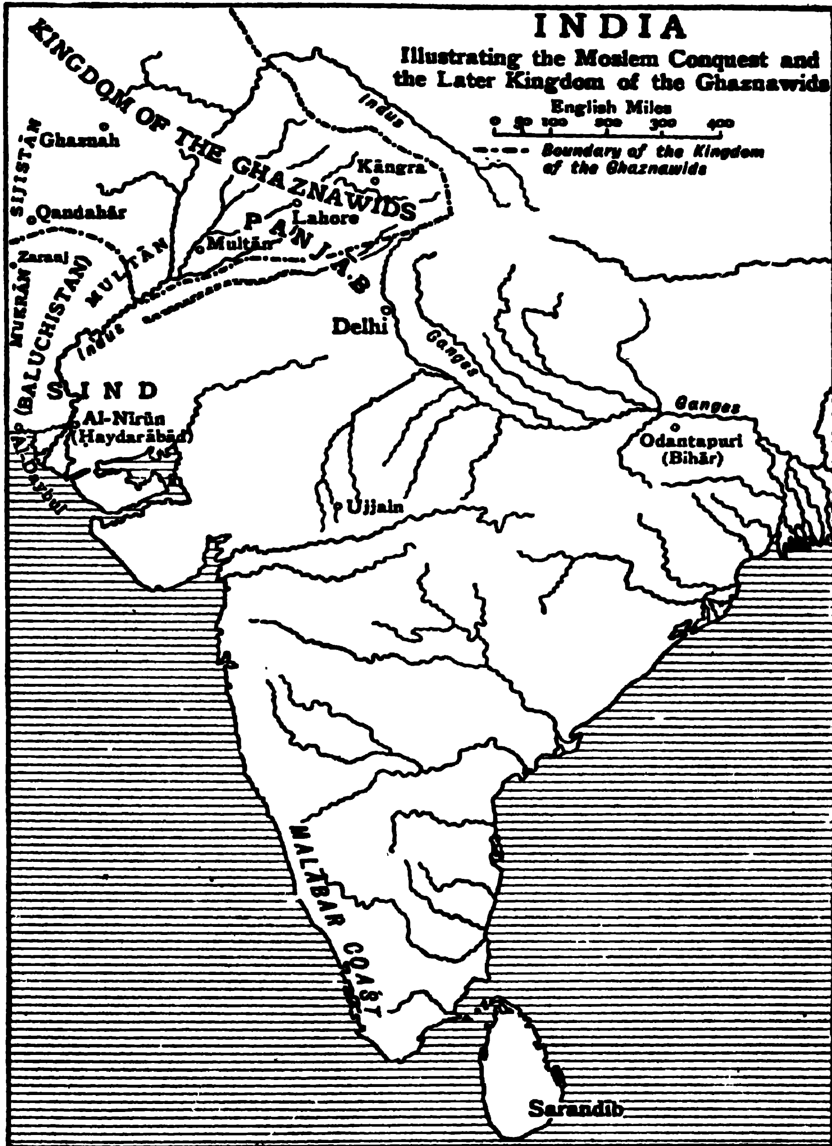
তখনও পর্যন্ত আমুদরিয়া (OXUS)[১৬] ঐতিহাসিকভাবে না-হলেও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে ইরান এবং তুরানের মধ্যে সীমান্তরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অর্থাৎ পারসিভাষী মানুষ এবং তুর্কিভাষী মানুষদের মধ্যে এক সীমান্তরেখা হিসেবে বিরাজমান ছিল এই নদী। এই নদীও আল-ওয়ালীদের অধীনে চলে এল এবং এই নদী বরাবর মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। একাধিকবার বুদ্ধিদীপ্ত অভিযান চালিয়ে কুতাইবাহ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে তুখারিস্তানের অববাহিকা অঞ্চল এবং তার রাজধানী, বল্খ (গ্রিকেরা যাকে বকত্রা বলতেন) পুনরুদ্ধার করলেন। এছাড়া ৭০৬-৯ খ্রিস্টাব্দে জয় করলেন বুখারা, যা ছিল আল-সুগাহের (মতান্তরে সোগদিয়ানা) অভ্যন্তরে। এর চারপাশে ভূখণ্ডও জয় করলেন তিনি এবং ৭১০-৭১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সমরকন্দ (আল-সুগদ-সহ) এবং পশ্চিমে খোয়ারিজম (আধুনিক খিওয়া) অঞ্চল দখল করলেন। ৭১৩-১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জ্যাকসার প্রদেশে, বিশেষত ফরগনায় অভিযান চালালেন। এভাবে সাম্প্রতিক কালেও যে অঞ্চলটি মধ্য-এশিয় খান-অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। অক্সাসের চেয়ে জ্যাকসার্টিস নদী অনেক বেশি স্বাভাবিক রাজনৈতিক এবং জাতিগোষ্ঠী-সংক্রান্ত সীমান্ত ছিল ইরানি এবং তুর্কিদের কাছে। আর নদী পার হয়ে এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই মুসলিমরা প্রথমবার মঙ্গোলীয় এবং বৌদ্ধদের সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। বুখারা, বল্খ এবং সমরকন্দে বৌদ্ধ মঠ ছিল। সমরকন্দে কুতাইবাহ বেশ কিছু উপাস্য মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। ধর্মীয় লোকজন তখন সরাসরি কুতাইবাহকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হলেন। তাতেও বিন্দুমাত্র না-দমে কুতাইবাহ নিজের হাতে বহু উপাস্য মূর্তিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন, যা দেখে কেউ কেউ ভয়ে ইসলামধর্মে[১৭] ধর্মান্তরিত হলেন। তবে বেশি মানুষ ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হলেন না। ধর্মভীরু খলিফা দ্বিতীয় উমারের আমলে (৭১৭-৭২০ খ্রিঃ) যখন নবদীক্ষিত মুসলিমদের খাজনা দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল তখন অনেকেই সুবিধা নিতে মুসলিমধর্ম গ্রহণ করলেন। সমকালীন সময়ে বুখারা-র অগ্নিমন্দির ধ্বংস করা হয়। এভাবে বুখারা, সমরকন্দ এবং খোয়ারিজম প্রদেশ দ্রুত মধ্য এশিয়ায় ইসলামি সংস্কৃতি এবং প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই সঙ্গে খুরাসানের মার্ভ-এ এবং নায়সাবুরেও (পারস্যে যাকে বলা হত নিশাপুর) বিস্তৃত হয়ে পড়ে ইসলামি সংস্কৃতি। আল-তাবারী-তে উল্লেখ

আছে কুতাইবাহ এবং অন্যরা ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক তুর্কীস্তানের কাশগর জয় করেন এবং এমন কী মূল চীনা ভূখণ্ডেও ঢুকে পড়েন। পরবর্তীকালে নাস্‌র ইব্‌ন-সায়্যার এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা[১১] এই ভূখণ্ড জয় করেছিল। প্রথমবারের আক্রমণের কথা সেই অনুমানের ভিত্তিতেই রটেছিল বলে মনে হয়। নাস্‌র, খলিফা-হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রিঃ) কর্তৃক ট্রান্সঅক্সিয়ানার প্রথম রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। ৭৩৮ থেকে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁকে কুতাইবাহ-এর হাতছাড়া-হওয়া-ভূখণ্ডগুলি পুনরুদ্ধার করতে হয়। কুতাইবাহ যেসব আরব প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা ছিলেন নিছকই ফৌজি তত্ত্বাবধায়ক এবং করসংগ্রাহক মাত্র। দেশীয় শাসকদের পাশাপাশি তাঁরা কাজ করতেন। দেশীয় শাসকরা স্থানীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে হুনরা ককেশাস অতিক্রম করে আল খাজারে আক্রমণের চেষ্টা করেন। পরে তারা ইহুদিধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৭৫১ খ্রিঃ আরবরা আল-শাস (তাসখন্দ) দখল করে। এভাবে তাঁরা মধ্য-এশিয়ায় ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। আর তা এত দৃঢ়ভাবে করতে সক্ষম হয় যে, চীনারা[১২] পর্যন্ত কোন বিরোধে যেতে সাহস পাননি।

এভাবে ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মাওয়ারা-আল-নাহর, যা নদীর অন্য প্রান্তে অবস্থিত) অবশেষে খলিফাদের উদীয়মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। ইসলামি বিশ্ব এক নতুন জাতি এবং নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়ল। সেই নতুন জাতি হল মঙ্গোলীয়। পরে আমরা এই নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব। ইসলামের সঙ্গে তাঁদের সংস্পর্শ কী তাৎপর্য এনে দিয়েছিল তা সেই আলোচনায় থাকবে।

● ভারতে জয়যাত্রা

ইতিমধ্যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন-আল কাসিমের নেতৃত্বে আরেক বাহিনী দক্ষিণমুখী অভিযান চালায়। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে এক অসামান্য সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে আল-হাজ্জাজের এই জামাতা মুকরানকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে ৬০০০ সিরিয়াবাসী ছিলেন। তিনি এরপর অধুনা বালুচিস্তানে অভিযান চালান। ৭১১-৭১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিন্ধুপ্রদেশ, তার অববাহিকা উপত্যকা এবং সিন্ধুনদের বদ্বীপ অঞ্চলকে দখলে আনেন। এখানে যেসব শহর তিনি দখল করেন তার মধ্যে ছিল আল-দায়বুল সমুদ্রবন্দর, যেখানে একটি বুদ্ধমূর্তি (আরবীতে, বুদ্দ) ছিল, যার উচ্চতা ছিল প্রায় ৪০ হাত[১১] এবং আল-নিরূন (আধুনিক হায়দরাবাদ)। সুদূর উত্তরপ্রান্তেও বিজয় অভিযান সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি দক্ষিণ পাঞ্জাবের মুলতানেও, যা (৭১৩) বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থস্থান ছিল তখন, অভিযান চলে। মুলতানে আক্রমণ চালানোর সময় সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী ছিলেন। তাদের সবাইকে বন্দি করা হয়। এভাবে সিন্ধুপ্রদেশ এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব পাকাপাকিভাবে দখলে এল। তবে দশম শতক পর্যন্ত বাকি ভারতে ইসলাম বিজয়পতাকা স্পর্শ করতে পারেনি। দশম শতকে



মুসলিম অধিকৃত এবং পরবর্তীকালে গজনাহ এর রাজধানী

গজনাহ্-এর মাহমূদের নেতৃত্বে নতুন করে আবার অভিযান শুরু হয়। এভাবে ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশগুলি চিরকালের জন্য ইসলামি হয়ে উঠল। পরে ১৯৪৭ সালে নতুন ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। সেমেটিক ইসলামের সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধদের স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হয়। একইভাবে তুর্কি সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি হয়। আল-হাজ্জাজ তাঁর দুই সেনাধ্যক্ষকে বললেন, তাদের মধ্যে যে প্রথম চীনের মাটিতে বিজয়পতাকা নিয়ে যেতে পারবে তাকেই চীনের রাজ্যপাল করা হবে। কিন্তু দুই সেনাধ্যক্ষ আল-সাকাফি বা কুতাইবাহ —কেউই চীন সীমান্ত পার হতে পারেননি। তুর্কিস্থান বাদে মূল চীন, যেখানে আজ দেড় কোটি বা তার বেশি মুসলমানের বাস, কখনও ইসলামের চৌহদ্দিতে আসেনি। দক্ষিণে সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তরে কাশগর এবং তাসখন্দের মতো প্রদেশ খলিফা শাসনের আওতাধীন হয়ে গেল।

● বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে

পূর্বদিকে যখন এমন বড়সড় অভিযান চলছে তখনও কিন্তু বাইজানটাইন সীমান্ত পুরোপুরি অবহেলিত ছিল না। তাঁর শাসনের একেবারে গোড়ার দিকে আবদ-আল-মালিক যখন ইব্‌ন-আল-জুবাইর-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি, তখন তিনি মু'আবিয়া-র[২২] দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 'রোমান সাম্রাজ্যের অত্যাচারীদের' নজরানা দেন। (হিজরী সন ৭০ অব্দ/৬৮৯-৯০ খ্রিঃ)। তখন রোমানদের প্রতিনিধি আল-লুক্কামের খ্রিস্টান সম্প্রদায় জারাজিমাহ-রা লেবাননে আক্রমণ চালাচ্ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট হতেই চির শত্রুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হল। ৬৯২ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান সিসিলির সেবাস্তোপোলিসে পরাস্ত হন। প্রায় ৭০৭ খ্রিস্টাব্দে কাপ্পাডোসিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তায়ানা (আল-তুওয়ানাহ্) দখল হয়ে গেল। সারদিস, পারগামাম দখল করে মাসলামাহ তার উল্লেখযোগ্য কনস্টান্টিনোপল অভিযান (৭১৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট থেকে ৭১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) চালান। এই বিষয়ে আমরা আগে জেনেছি। মুসলিম বাহিনী আবিডোজে দারদানেলিস অতিক্রম করে বিশাল গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে। কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপলের যাওয়ার সমুদ্রপথ এক বড় শৃঙ্খলে বন্ধ ছিল। তাই মুসলিম বাহিনীর নৌবহরকে বসপোরাসে সমুদ্রবক্ষে কনস্ট্যান্টিনোপলের কাছেই নোঙ্গর ফেলতে হয়। এই দ্বিতীয়বার আরববাহিনী বাইজানটাইন রাজধানী অবরুদ্ধ করে (আগে এর উল্লেখ আছে)। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যের অভাব এবং বুলগারদের আক্রমণে পুরো এক বছর ধরে লড়াইয়ের[২৩] পর আরববাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মু'আবিয়া-এর নির্দেশে হাবীব ইব্‌ন-মাসলামাহ আল-ফিহরি ৬৪৪-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। পরে সেই আর্মেনিয়াই ইবন-আল-জুবাইর-এর বিপর্যয়ের সুযোগে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেই বিদ্রোহও দমন করল আরববাহিনী।[২৪]

● উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ বিজয়

পশ্চিম সীমান্তে মূসা ইব্ন-নুসাইর-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী পূর্বদিকের আল-হাজ্জাজ এবং তার বাহিনীর চেয়ে কম বুদ্ধিদীপ্ত এবং ক্ষমতাশালী ছিল না। ৬৪০-৪৩ খ্রিস্টাব্দে মিশর দখল করার পর ইফরিকিয়া[২৫] তে অভিযান চালানো হয়। তবে ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মু'আবিয়া-এর প্রতিনিধি উক্বা ইব্ন-নাফি সেখানে 'আল-কায়রাওয়ান'[২৬] প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত এই ভূখণ্ড পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। মু'আবিয়া এই ভূখণ্ডকে ভিত্তি করে বর্বর উপজাতিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। উকবাহ সম্পর্কে লোককাহিনীতে বলা হয়েছে যে, অতলান্তিকের ঢেউ তাঁর ঘোড়ার গতি রুদ্ধ না করা পর্যন্ত তিনি থামেননি। পরে অবশ্য ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক আলজেরিয়ার কাছে বিস্করায় তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে আজও তার স্মৃতিবেদী জাতীয় পবিত্রস্থান হিসেবেই বিবেচিত। এমন কী তখনও ইফরিকিয়াতে আরবদের নিয়ন্ত্রণ এত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল যে, উকবাহ-এর মৃত্যুর পরই তাঁর উত্তরাধিকারীকে ওই ভূখণ্ড ছেড়ে চলে আসতে হয়।

হাস্সান ইব্ন-আল-নু'মান-আল-গাসসানি (আনুঃ ৬৯৩-৭০০ খ্রিঃ) রাজ্যপাল না হওয়া পর্যন্ত বাইজান্টাইনের শাসন এবং বার্বারিদের প্রতিরোধ নির্মূল করা যায়নি। এক মুসলিম নৌ-বাহিনীর সাহায্য নিয়ে হাস্সান কার্থেজ (৬৯৮ খ্রিঃ) এবং অন্য উপকূলীয় শহর থেকে বাইজানটাইনদের বিতাড়িত করেন। এরপরই হাস্সান বার্বারিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফাঁকা জমিন পান। এই বার্বাররা তখন এক গুরুমাতার (কাহিনা)[২৭] নেতৃত্বে পরিচালিত হত। ওই গুরুমাতার তাঁর অনুগামীদের প্রতি এক মায়াবী প্রভাব ছিল। অবশেষে ওই গুরুমাতা বিশ্বাসঘাতকদের কাছে পরাস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে এক কুয়োর কাছে খুন করা হয়। এই কুয়োটি এখনও 'বি'র-আল-কাহিনা' নামে পরিচিত।

হাস্সান ছিলেন ইফ্রিকিয়া-র পুনর্বিজেতা এবং শান্তিস্রষ্টা। তাঁর উত্তরাধিকারী হন বিখ্যাত মূসা-ইব্ন-নুসাইর, যার আমলে সেখানকার প্রশাসন পরিচালিত হত আল-কায়রাওয়ান থেকে। ওই অঞ্চলের সরকারকে মিশর থেকে স্বাধীন হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং সরাসরি দামাস্কাস থেকে খলিফা দ্বারা ওই সরকার পরিচালিত হত। মূসার পিতা (ইব্ন-ইসহাকের প্রপিতামহের সঙ্গে, যিনি মুহাম্মাদ-এর জীবনকাহিনীর লেখক) ছিলেন খালিদ-ইব্ন-আল-ওয়ালীদের হাতে বন্দি খ্রিস্টানদের অন্যতম। এরা 'আইন আল- তাম্র'[২৮] গির্জায় বাইবেল পড়ার সময় বন্দি হন। যাই হোক, তিনি তাঁর প্রদেশের সীমান্ত তানজিয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। এর ফলেই স্থায়ীভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে ইসলামিদের সঙ্গে আরেক বার্বার জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্ক তৈরি হয়। বার্বাররা ছিলেন শ্বেতাঙ্গ পরিবারের এবং হ্যাম-এর বংশোদ্ভূত। প্রাগঐতিহাসিক আমলে সম্ভবত সিমাইটদের[২৯] পাশাপাশিই এরা গড়ে ওঠেন। মুসলিমরা যখন তাদের দেশ জয় করেন তখন অধিকাংশ বার্বারই ভোল বদলে

রাতারাতি খ্রিস্টান হয়ে যান। সমুদ্র দিয়ে তৈরি সীমান্তবেষ্টিত তাদের দেশে অধিকাংশ লোকই উর্বর জমিতে চাষ কাজ করতেন। ওই অঞ্চলে টারটুলিয়া, সেন্ট সাইপ্রিয়ান এবং সর্বোপরি সেন্ট অগাস্টিন ছিলেন খ্রিস্টান। এছাড়া এই অঞ্চলের লোকজন রোমান সভ্যতার সঙ্গে গভীরভাবে সংস্রব রাখতেন না। রোমান এবং বাইজানটনাইরা মূলত উপকূলের শহরগুলিতে বাস করতেন। আর তাঁরা যে সংস্কৃতির প্রতিনিধি ছিলেন তা এই উত্তর আফ্রিকার যাযাবর এবং প্রায় যাযাবার উপজাতিগোষ্ঠীর কাছে ছিল মানসিকভাবে পুরোপুরি বিদেশি। অন্যদিকে ইসলামের প্রতি মানুষের বিশেষ আকর্ষণ ছিল; বার্বারিদেরও ছিল। এছাড়া সেমেটিক আরবরা ছিলেন আদিম ফিনিশিয়দের ঘনিষ্ঠ। আদিম ফিনিশিয়রা উত্তর-আফ্রিকার কিছু অংশকে উপনিবেশ করে তুলেছিলেন। এরাই কার্থেজ অঞ্চলে রোমের ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বেড়ে ওঠেন। এরা হ্যাম বংশোদ্ভূতদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কার্থেজের লোকজন মুসলিম বিপর্যয়ের কিছুকাল আগে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে টিকে ছিলেন। এই আধা-অসভ্য যাযাবর জাতির ধর্মকে ইসলামিকরণের এবং ভাষাকে আরবীকরণের দুর্দান্ত, অনির্বচনীয় ইসলামি অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যা এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। কীভাবে এই উপজাতি গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে মুসলিম বিজয়রথ নতুন করে অব্যাহত রাখা হয়েছিল তাও ভাবার মতো। এভাবে বিজেতাদের রক্ত সমৃদ্ধির নতুন টাটকা বাতাস পেল। আরবী ভাষাও বিজয়ের বড়সড় ক্ষেত্র উন্মুক্ত পেল এবং উদীয়মান ইসলাম বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠার নতুন ভিত্তিভূমি পেল।

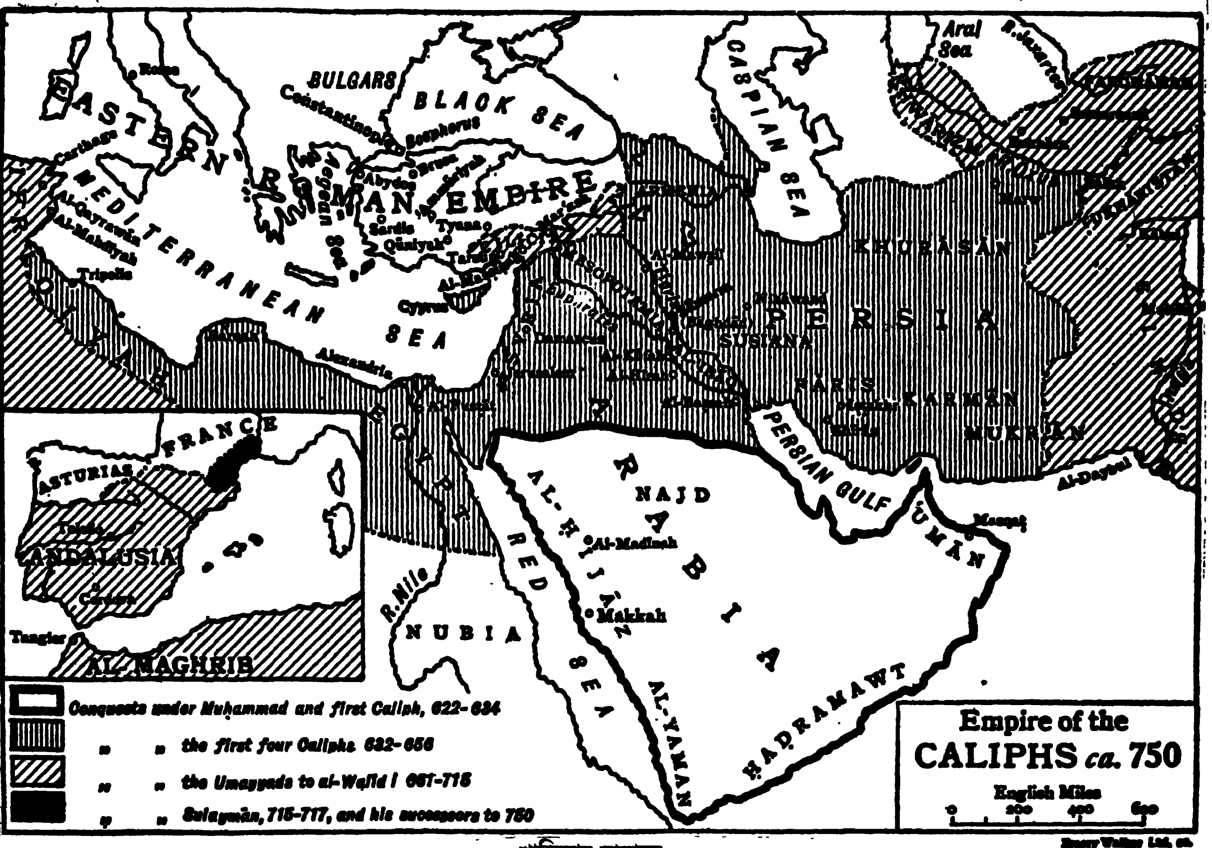
মূসা[৩০] উত্তর আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল এবং অতলান্তিক দখল করার পর সংলগ্ন ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ জয়ের আগলও খুলে গেল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে বার্বারিদের এক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং মূসার অন্যতম লেফটেন্যান্ট তারিক, এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে নাটকীয়ভাবে স্পেন সীমানা অতিক্রম করেন। এই অভিযানের পরিণতিতেই আইবেরিয়া উপদ্বীপ (আল-আন্দালুস) জয় সম্ভব হয় (হিট্টির মূল ইংরেজির ৪৯৩ ও পরবর্তী পাতায়)। আরবদের শেষ এবং অত্যন্ত সাড়া জাগানো বড়সড় অভিযান হল এটা। এর ফলে ইউরোপের বৃহত্তম ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন কায়েম হল, যা এর আগে কখনও ছিল না। দক্ষিণ গ্যালের (প্রাচীন ফ্রান্সের নাম) কয়েকটি শহর দখলের পর — আরব এবং বার্বারিদের যৌথ বাহিনীর অগ্রগতি প্রথম ব্যাহত হয় ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে। চার্লস মর্টেল, তুর এবং পয়তিয়ের-এর মাঝামাঝি স্থানে তাদের গতিরোধ করেন। এখানেই উত্তর-পশ্চিম মুখে আরব জমানার সম্প্রসারণ সীমিত হয়ে পড়ে।

৭৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদের মৃত্যুর প্রথম শতবর্ষ পূর্ণ হয়। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এবং সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক দিকগুলি চিন্তা করে এবার সমকালীন পরিস্থিতিকে বিচার করে দেখতে হবে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর ১০০ বছর পরে তাঁর অনুগামীরা তখন এমন এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব করছেন যা রোমের সুবর্ণযুগের চেয়েও বহরে

বৃহত্তম ছিল। কারণ তখন মুসলিমদের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্‌কে উপসাগর থেকে সিন্ধু এবং চীনের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আরাল সমুদ্র থেকে নীলনদের অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার কয়েক হাজার মসজিদ থেকে তখন দিনে পাঁচবার করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সঙ্গে আরব-সন্তান মুহাম্মাদের নাম উচ্চারিত হয়। তরুণ মুহাম্মাদ ঐতিহ্যের কথা ভেবে যে দামাস্কাসে যেতে দ্বিধান্বিত ছিলেন (কারণ মুহাম্মাদ 'স্বর্গে' একবারই যেতে চেয়েছিলেন) সেই দামাস্কাস হয়ে উঠল বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী।[৫১] পান্নাবেষ্টিত মুক্তার কোমরবন্ধের মত দামাস্কাস শহরের কেন্দ্রস্থলে উমাইয়াদের উদ্যানবেষ্টিত উজ্জ্বল রাজপ্রাসাদ অবস্থান করত, যা দেখে পশ্চিমাঞ্চল থেকে চিরতুষারের শিরোপা বিশিষ্ট মাউন্ট হারমন[৫২] অবধি প্রসারিত এক সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্যের অধিপতিদের শৌর্যের কথাই অনুমিত হয়। এই প্রাসাদের নাম ছিল আল-খায্‌রা[৫৩] (সবুজ)। এই প্রাসাদের নির্মাতা ছিলেন অবশ্যই উমাইয়া রাজবংশের স্থপতি মু'আবিয়া এবং ঠিক উমাইয়া মসজিদেব গা ঘেঁযে ছিল এই প্রাসাদ। উমাইয়া মসজিদকে আল-ওয়ালীদ নতুন করে সাজিয়ে তোলেন এবং তা ছিল স্থাপত্য শিল্পের অহংকার বিশেষ, যা এখনও সৌন্দর্যপিয়াসীদের আকর্ষণীয় বস্তু। ওই মসজিদের প্রেক্ষাগৃহে একটি বর্গাকার আসন ছিল, যা দামী কারুকার্য করা কুশনে মোড়া। ওখানেই বসতেন খলিফা। শ্রোতাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় ওই আসনেই জাঁকালো জোব্বা পরে আড়াআড়ি পা দুটি রেখে বসতেন তিনি। পাশে দক্ষিণ দিকে খলিফার আত্মীয়স্বজন বয়স অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতেন। বাম দিকে দাঁড়াতেন তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয়রা।[৫৪] পিছনের দিকে দাঁড়াতেন কবি, দরবারকারীরা এবং রাজ্যসভার পারিষদরা। বিশ্বখ্যাত এই মসজিদে প্রায়শই আনুষ্ঠানিক ভাষণ পেশ হত। আজও এই মসজিদ বিশ্বের এক আকর্ষণীয় ধর্মস্থান। এই পরিবেশেই আল-ওয়ালীদ (কেউ কেউ বলেন সুলাইমান, যিনি পরবর্তীকালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন) স্পেন জয়ের নায়ক তারিক এবং মূসা ইব্‌ন-নুসাইরকে বরণ করেন। তাদের সঙ্গে বহু বন্দি[৫৫] জার্মানির গথ রাজবংশের সুন্দর কেশওয়ালা' অনেক লোকজন এবং স্বপ্নাতীত পরিমাণের রাজকোষের দখল পান তাঁরা। স্রেফ এই একটি কাহিনীই উমাইয়া বংশের সুবর্ণযুগ বর্ণনা করার পক্ষে যথেষ্ট।

● রাষ্ট্রীয়করণ

আবদ-আল-মালিক এবং আল-ওয়ালীদের নেতৃত্বে ইসলামি রাষ্ট্রে আরবীকরণ শুরু হওয়ায় দামাস্কাসে সরকারি মহাফেজখানার (দিওয়ান) ভাষা গ্রিক থেকে আরবী করা হয়। ইরাকেও পাহলবি ভাষা থেকে আরবী ভাষা চালু হয়। পাশাপাশি আরবী মুদ্রাও চালু হয়। ভাষা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীস্তরেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়। আগে যাঁরা রাজা ছিলেন ইঁারা হিসাব বা আর্থিক সমস্যার কথা বুঝতেন না বলে সিরিয়ায় গ্রিক জানা কর্মচারীরাও


Empire of the
CALIPHS ca. 750
English Miles
0 200 400 600
Conquests under Muhammad and first Caliph, 622-634
" " the first four Caliphs 632-656
" " the Umayyads to al-Walid I 661-715
" " Sulayman, 715-717, and his successors to 750
EASTERN ROMAN EMPIRE
MEDITERRANEAN SEA
BLACK SEA
CASPIAN SEA
PERSIAN GULF
RED SEA
Aral Sea
R. Jaxartes
BULGARS
Constantinople
Bosphorus
Abydos
Sardis
Tyana
Qūniyah
Rome
Carthage
Al-Qayrawan
Al-Mahdiyah
Tripolis
Cyprus
Alexandria
PERSIA
KHURĀSĀN
SUSIANA
FĀRIS
KARMĀN
MUKRĀN
Al-Daybul
ARABIA
NAJD
AL-ḤIJĀZ
Al-Madinah
Makkah
AL-YAMAN
ḤAḌRAMAWT
ʿUMĀN
Masqat
EGYPT
NUBIA
R. Nile
FRANCE
ASTURIAS
ANDALUSIA
Toledo
Cordova
Tangier
AL-MAGHRIB

খালিফার সাম্রাজ্য

দাপিয়ে কাজ করতেন। পারস্য ও ইরাকে পারসি কর্মচারীদের আধিপত্য ছিল। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে নিঃসন্দেহে কিছু কর্মচারী রয়ে গেলেন। এঁরা আরবের লোক না হয়েও ইতিমধ্যে আরবী ভাষার অসামান্য দখল অর্জন করেছিলেন। বাকিদের সরে যেতে হল। অবশ্য বেশ শ্লথগতিতে এই রূপান্তর হল। আবদ-আল-মালিকের আমলে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে তাঁর উত্তরাধিকারীর আমলেও তা চলে। এই কারণেই অনেক ইতিহাসবেত্তা এই রূপান্তরের স্থপতি হিসেবে আবদ আল-মালিককে ভূষিত করে গেছেন। আবার অনেকে তাঁর পুত্রকেও একই বিশেষণে ভূষিত করে গেছেন।[৩৬] এই ব্যবস্থা ছিল এক সুপরিকল্পিত নীতির অঙ্গবিশেষ এবং আল-বালাযুরিতে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তেমন কোন মামুলি কারণে নয়। আল-বালাযুরিতে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে 'কালির দোয়াতে গ্রিক কেরানির প্রস্রাব করা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৭]

প্রাক ইসলামি যুগে আল-হিজাজে রোমান এবং পারস্য মুদ্রাই চালু ছিল। পাশাপাশি এথেন্স-এর প্যাঁচার ছাপ মারা কিছু দক্ষিণ আরবীয় রৌপ্যমুদ্রাও চালু ছিল। উমার, মু'আবিয়া এবং পূর্ববর্তী অন্য খলিফারা এই সব চালু মুদ্রা বদলানোর ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাননি।[৩৮] কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত মুদ্রাতেই কোরানের কিছু শ্লোক খোদাই করে দেওয়া হত। আবদ-আল-মালিকের শাসনের আগেও কয়েকবার কিছু স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা পরিবর্তন করা হয়। তবে তার কারণ ছিল অন্য। তা বাইজানটাইন বা পারস্য মুদ্রার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ায় সেই পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে আবদ-আল-মালিক দামাস্কাসে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা 'দীনার' এবং রৌপ্যমুদ্রা 'দিরহাম' চালু করেন, যা ছিল খাঁটি আরবী।[৩৯] ইরাকে রাজ্যপাল আল-হাজ্জাজ রৌপ্যমুদ্রা চালু করেন, পরবর্তী বছরে তা চালু হয় আল-কূফায়।[৪০]

খাঁটি ইসলামি মুদ্রার প্রচলন এবং প্রশাসনকে আরবীকরণের পাশাপাশি আবদ-আল-মালিক নিয়মিত ডাকব্যবস্থা চালু করেন।[৪১] এই ডাক পরিষেবা চালু রাখতে তিনি পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত ঘোড়াদের কাজে লাগান। গোড়ায় দামাস্কাস এবং বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীর মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান হত। প্রাথমিকভাবে সরকারি কাজের জন্যই এই পরিষেবা চালু হয়। পোস্টমাস্টারদের অন্যসব কাজের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে কী কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণও খলিফাকে জানাতে হত।

● আর্থিক সংস্কার

আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সে সময় সরকারি অর্থনীতি এবং প্রশাসনে প্রচুর সংস্কার সাধিত হয়। নীতিগতভাবে কোন মুসলমানই, তার দেশ যেখানেই হোক, জাকাত বা দরিদ্রকর ছাড়া কোন কর দিতে বাধ্য ছিলেন না। তবে কার্যত এই সুবিধা আরবীয়রা ভোগ করত। আর এই সুযোগ নিতে এইসময় অনেকে মুসলমান হয়ে যান। বিশেষ করে ইরাক

এবং খুরাসানে বহু চাষী গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে শুরু করলেন। সবাই 'মাওয়ালি' (অনুচর)[৪২] হিসেবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে চাইলেন। তা করলেনও। এতে রাজকোষের দ্বিগুণ ক্ষতি হল। কারণ সবাই ধর্ম পাল্টে মুসলমান হয়ে যেতে কর বাবদ আয় ভীষণভাবে কমে গেল। এছাড়া সরকারি সৈন্য হিসেবে সবাই অনেক ভরতুকি পাওয়ার অধিকারী হলেন। আল-হাজ্জাজ এসব দেখে এই লোকজনদের ফের চাষের কাজে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নেন[৪৩] এবং কাজ হাসিল করতে যাঁরা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন এবং যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদের আগের জীবনে যে কর দিতে হত তার চেয়ে দ্বিগুণ হারে কর ধার্য করলেন। এই করের সঙ্গে ছিল 'খারাজ' (জমির কর) এবং 'জিয্য়া' (মাথাপিছু কর)। এমন কী আরবের যেসব লোকজন জমি কিনে জমির মালিক তাঁদের জমি 'খারাজ' এলাকায় হলে তাঁদের প্রচলিত জমির কর দিতে হত।




বাইজানটাইন মুদ্রায় সোনা দিয়ে আবরী অক্ষর খোদাই করা হয়েছে—অবশ্যই ইঙ্গিতবাহী

খলিফা দ্বিতীয় উমার (৭১৭-৭২০ খ্রিঃ) অবশ্য পরে ধর্মান্তরিত হওয়া মুসলিমদের অসন্তোষ দূর করতে কিছু ব্যবস্থা নেন। তিনি পুনরায় প্রথম উমারের নীতি চালু করলেন। নিয়ম হল, আরবের লোকই হোক বা মাওলা-ই হোক কোনরকম কর দিতে হবে না। তবে তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, 'খারাজ' জমি মুসলমানদেরই যৌথ সম্পত্তি।[৪৪] এভাবে তিনি হিজরী সন ১০০ (৭১৮-৭১৯ খ্রিঃ)-এর পর 'খারাজ' জমি আরবদের এবং মুসলমানদের বিক্রি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এও ঘোষণা করা হল যে, এইরকম জমির কোন মালিক ধর্মান্তরিত হলে তার সম্পত্তি গ্রামের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। আর তিনি ওই জমিতে চাষ করতে চাইলে তাঁকে ইজারা নিয়ে চাষ করতে হবে।




আবদ্-আল-মালিকের তাম্রমুদ্রা

মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও উমারের নীতি সফল হয়নি। এর ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব অনেক

কমে যায় এবং শহরে অনুচর সংখ্যা বেড়ে সেনাদলের বহর বাড়তেই থাকে।[৪৭] বার্বার জাতির এবং পারসিদের অনেকেই এভাবে জমি ভোগ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত কিছু অদলবদল করে আল-হাজ্জাজের সময়কার গৃহীত নীতিই ফের চালু হল। তার আগে পর্যন্ত 'জিয্য়া' এবং 'খারাজ'-এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত না হলে 'জিয্য়া' কর দিতে হত। আর ধর্মান্তরিত হলে কেবল 'খারাজ' দিতে হত। কিন্তু যেহেতু 'জিয্য়া' ছিল তুলনামূলকভাবে কম লোকের জন্য তাই রাজকোষে বেশি কর আদায় হত 'খারাজ' বাবদই।

আল-হাজ্জাজের উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় আরও কিছু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার হয়। তিনি একাধিক নতুন খাল খনন করেন। টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যেকার একটি বন্ধ খাল ফের খনন করেন। জলে ডোবা এবং অকর্ষিত জমিকে তিনি চাষযোগ্য করে তোলেন। এছাড়া তিনি আরবী বানানে কিছু বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেন। যেমন. আরবী বানানে 'বা', 'তা', 'সা', 'দাল', 'যাল' ইত্যাদি একইরকমভাবে লেখা হরফের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে সিরীয় ভাষার স্বরবর্ণের কিছু অংশ আরবী বানানে সংযোজিত করার ব্যবস্থা হয়।[৪৮] যেমন, যাম্মাহ্, ফাতাহ্, কাসরা যতিচিহ্নের বিভিন্ন উচ্চারণ। আরবী বানানের এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি পবিত্র কোরান পাঠের বানান-ভুল সংশোধনে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। এরজন্য তিনি একটি সংশোধনীও তৈরি করেন। তিনি স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেন। সাহিত্য এবং ভাষণদানে তিনি কখনও আগ্রহ হারাননি। কবি এবং বিজ্ঞানীদের তিনি বরাবর পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। বেদুইন জাতির ব্যঙ্গ সাহিত্যিক 'জারীর' তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আল-ফারাজদাক এবং আল আখতালের সঙ্গে মিলে উমাইয়া আমলের কাব্যময় বিজয়গাথা লিখেছিলেন। এই 'জারির' ছিলেন রাজ-সাহিত্যিক এবং তিনি আল-হাজ্জাজের প্রশংসা করে সাহিত্য রচনা করেন। আল-হাজ্জাজের চিকিৎসক ছিলেন তায়াযুক[৪৯] নামে এক খ্রিস্টান। ইরানি শত্রুরা তাকে 'সাকিফ-এর ক্রীতদাস' বলে অভিহিত করত। এই হাজ্জাজ ৭১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ওয়াসিতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে খচিত থাকবে।

● স্থাপত্য স্তম্ভ

ওই সময়ের স্থাপত্য শিল্পকীর্তির মধ্যে ছিল বহু স্মারকস্তম্ভ, যার কিছু আজও টিকে রয়েছে।

প্যালেস্টাইনে খলিফা সুলাইমান প্রাচীন এক ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের বুকে নির্মাণ করেছিলেন আল-রামলাহ্[৫০] শহর। এই শহরেই তিনি বাসভবন গড়ে তোলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও তাঁর নির্মিত রাজপ্রাসাদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। আর তাঁর নির্মিত শাদা মসজিদের মিনার (যে মসজিদ দামাস্কাসের উমাইয়া মসজিদ এবং জেরুসালেমের মসজিদের পরই সিরিয়ার

তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ বলে বিবেচিত হত) চতুর্দশ শতকের গোড়ায় মামলূকদের আমলে পুনর্নির্মিত হয়। আজও তা বিদ্যমান। সুলাইমান-এর আমলে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানীতে খলিফাদের থাকা বন্ধ হয়। হিশাম বাস করতেন আল রাক্কার কাছে আল- রুসাফা নামে রোমের এক উপনিবেশে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আবদ-আল-মালিক জেরুসালেমে চোখ ধাঁধানো পাথরের মসজিদ নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল কুব্বাত-আল-সাখরা। ইউরোপীয়রা ভুল করে এই মসজিদকে উমারের মসজিদ বলে ভাবত। আবদ-আল-মালিক এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন-আল-জুবাইর-এর মক্কার মসজিদে তীর্থযাত্রীদের যাওয়া আটকাতে। এই মসজিদ যে আবদ আল-মালিকই নির্মাণ করেছিলেন তা এই মসজিদের গম্বুজে খোদিত কুফি-লিপি থেকেই প্রতীয়মান। একশত বছর পরে ওই মসজিদের সংস্কার করেন আব্বাসীয় আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রিঃ)। তিনি আবার ফন্দি করে ওই মসজিদগাত্র থেকে আবদ-আল-মালিকের নাম তুলে দিয়ে নিজের নাম খোদাই করে দেন। কিন্তু তিনি মসজিদ স্থাপনের সাল-তারিখ পরিবর্তন করতে ভুলে যান। আব্বাসীয় নামের অক্ষরগুলি ঘেঁষাঘেঁষিভাবে খোদিত হয়েছিল। কারণ মসজিদের মূল স্রষ্টা আবদ-আল-মালিকের নাম যেখানে খোদিত ছিল ঠিক সেই অল্প জায়গাতেই তা লেখা হয়। মসজিদের মিনারের গায়েই এবং পবিত্র স্থানের দক্ষিণ অংশে আবদ-আল-মালিক অন্য একটি মসজিদ স্থাপন করেন। সম্ভবত এখানে একটি গির্জা ছিল আগে। স্থানীয় লোকজন এই মসজিদকে 'আল-মসজিদ আল-আক্‌সা (দূরবর্তী মসজিদ) বলে অভিহিত করতেন। তবে ওই অঞ্চলের সমস্ত ধর্মস্থানগুলিকেই এই নামে অভিহিত করা হত বলেও অনুমান করা হয়। 'আল-হারাম আল-শরীফ' (পবিত্র ধর্মস্থান) হল এই দলের অপর নাম। অর্থাৎ মক্কা এবং মদীনার মসজিদ থেকে ঈষৎ কম পবিত্রস্থান।

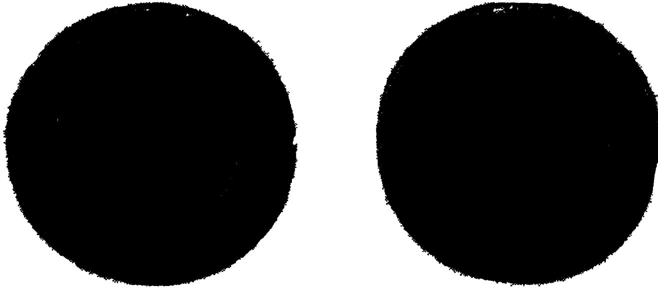
উমাইয়া বংশের সবচেয়ে কীর্তিমান রাজা ছিলেন আবদ আল-মালিকের পুত্র আল-ওয়ালীদ, যার শাসনে তুলনামূলকভাবে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। এই খলিফার ভবন নির্মাণের প্রতি আগ্রহ এত বেশি ছিল যে, তাঁর আমলে যখনই দামাস্কাসের কয়েকজন লোক কোন সুদৃশ্য ভবনের সামনে জড় হতেন তখন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু হত ওই ভবনের কারুকার্য। আর সুলাইমানের আমলে রন্ধনবিদ্যা এবং সুন্দরী নারী ছিল আলোচ্যবিষয়। উমার-ইব্‌ন-আবদ আল-আযীযের আমলে ধর্ম এবং কোরান-এর ব্যাপক চর্চা ছিল আলোচ্যবিষয়। আল-ওয়ালীদ মাত্র ৪০ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই মক্কার বিখ্যাত পবিত্র মসজিদ আরও বিস্তৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। মদীনার মসজিদ পুনর্নির্মিত হয়। সিরিয়ায় তাঁর আমলে প্রচুর বিদ্যালয় এবং ধর্মস্থান এবং কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসালয়, খঞ্জ এবং অন্ধদের সংস্থা স্থাপিত হয়। মধ্যযুগে হয়তো তিনিই প্রথম শাসক যিনি পুরানো রোগে অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এই মুসলিম শাসকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে পশ্চিমের দেশগুলিতে এমন বহু সংক্রামক রোগের হাসপাতাল নির্মিত হয়। বাআলাবাক্কে একটি গির্জার উঁচু গম্বুজে স্থাপিত চকচকে

তামার কারুকার্য তুলে নিয়ে আল-ওয়ালীদ তাঁর পিতার তৈরি জেরুসালেমের মসজিদের গম্বুজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর বড় কীর্তি হল, দামাস্কাসে সেন্ট জনের গির্জাকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিশ্বের সেরা ধর্মস্থান পরিণত করা। আজও উমাইয়া মসজিদকে বিশ্বের মুসলমানরা তাদের চতুর্থ সেরা ধর্মস্থানে হিসেবে মনে করেন। প্রথম স্থানে রয়েছে মক্কা, দ্বিতীয় স্থানে মদীনা, তৃতীয় স্থানে জেরুসালেমের মসজিদ। আল-ওয়ালীদের আগে মুসলমানরা এই মসজিদে খ্রিস্টানদের পাশাপাশি ধর্মচর্চা করতেন। মালিকানা খ্রিস্টানদেরই হাতে ছিল। পরে এই গির্জার দখলদারির পক্ষে এমন যুক্তি দেওয়া হয় যে, শহরের পূর্বাঞ্চলটা বলপূর্বক দখল করা হয়েছিল। পশ্চিম অংশটা দখল করেছিল শর্তাধীন আত্মসমপর্ণের মাধ্যমে। এছাড়া দুই বড়সড় মুসলিম সেনাবাহিনী শহরের অন্যপ্রান্তে কী হচ্ছে, তা না জেনে ওই গির্জার দখল নেয়। প্রাচীন এক রোমান মন্দিরের জমিতেই নির্মিত হয়েছিল ওই গির্জাটি। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ছিল তার অবস্থান। গির্জার দক্ষিণ দরজার চৌকাঠের ওপর গ্রিক ভাষায় লেখা যে প্রাচীন লিপি পড়া যেত, তা ছিল এরকম : ওগো মহান যীশু! তোমার শাসন চিরন্তন এবং তোমার শাসনে আমরা উপর্যুপরি প্রজন্ম শাসিত হয়ে যাব।[৫১]

উমাইয়া বংশের অন্য খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় উমার (৭১৭-৭২০ খ্রিঃ) এবং হিশাম ছাড়া অন্য কারও বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দ্বিতীয় উমার পুরোপুরি ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জীবনভর ধর্মানুরাগ এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সাধনার প্রতি আসক্ত থাকার সুনাম অর্জন করেন, যা উমাইয়া বংশের অধার্মিকতার ধারার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করত। কার্যত তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন সাধু। হাদীস-অনুসারে ইসলাম ধর্মকে নবীকরণ করাতে প্রতি একশত বছর অন্তর একজন সাধুর আবির্ভূত হওয়ার ধারণা মুসলিম সমাজে সুপ্রচলিত। এই সাধুকে বলা হয় 'মাব্‌উস' (সাধু, মুজাদ্দিদ)। হিজরী সন ১০০ অব্দে দ্বিতীয় শতকের তিনিই হলেন সেই 'মাব্‌উস'। যেমন তৃতীয় শতকের 'মাব্‌উস' হিসেবে আবির্ভূত হন আল-শাফিঈ। দ্বিতীয় উমারের জীবনীকারের[৫২] বর্ণনায় জানা যায়, তিনি এমন ছেঁড়া তাপ্পিমারা পোশাক পরে থাকতেন এবং প্রজাদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতেন যে, কোন প্রজা তাঁর কাছে দরবার করতে এসে তাঁকে আলাদা করে চিনতে বেশ অসুবিধায় পড়তেন। যখন তাঁর এক অনুচর তাঁকে লিখেছিলেন যে, সরকারি অর্থনীতিতে সংস্কার করে তিনি অন্য ধর্ম ছেড়ে মুসলমান-হওয়া-মানুষজনের জন্য যে সুবিধা দিচ্ছেন তাতে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তখন জবাবে উমার লিখেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র নামে বলছি, আমি খুশি হতাম যদি দেখতে পেতাম যে সবাই মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কেননা আপনাকে এবং আমাকে জীবন ধারণের জন্য নিজের হাতেই জমি চাষ করে খেতে হবে।'[৫৩] মু'আবিয়ার সময় প্রচলিত শুক্রবারের নামায পাঠের সময়ে মিম্বর থেকে 'আলীর' প্রতি কটূক্তির প্রথা তিনি বন্ধ করে দেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন

উমার। তাঁর ধর্মানুরাগই উমারের কবরকে অপবিত্র হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসীয়রা পূর্বতন রাজবংশের অন্য সমস্ত খলিফাদের কবরকে অপবিত্র করেছিলেন।

আবদ-আল-মালিকের চতুর্থ পুত্র ছিলেন হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রিঃ)। হিশাম-এর আমল শেষ হওয়ার পরই উমাইয়া বংশের সুবর্ণযুগ অস্তমিত হল। আরবীয় ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবেই হিশামকে উমাইয়া বংশের[১১] তৃতীয় এবং শেষ দেশনায়ক হিসেবে অভিহিত করেন। স্পেনের উমাইয়া বংশের উত্তরাধিকারী হিশাম-পুত্র মু'আবিয়া তখন যুবক। তিনি একবার শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। তখন হিশাম মন্তব্য করেন, 'আমি ওকে খলিফা বানাবার জন্য মানুষ করছিলাম। কিন্তু সে হয়ে গেল শিয়াল।'[১২] আল ইরাকে হিশামের রাজ্যপাল ছিলেন খালিদ ইব্‌ন-আবদুল্লা-আল-কাসরি। তাঁর নেতৃত্বে আল ইরাকে সমৃদ্ধির দ্বার খুলে যায়। বিশেষ করে হাস্‌সান আল-নাবাতির কারিগরি এবং নিষ্কাশন সংক্রান্ত কাজকর্ম বিস্তৃত হচ্ছিল ইরাক জুড়ে। এই খালিদ রাজস্ব তছরুপ করে ১ কোটি ৩০ লক্ষ দিরহাম আত্মসাৎ করেন। রাজস্ব থেকে এর তিনগুণ অর্থ[১৩] নয়ছয় করেন তিনি। শেষপর্যন্ত খালিদ তাঁর পূর্বসূরি অপরাধীদের পরিণতি লাভ করেন। ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে নির্যাতনের পর তাঁকে সরকারি তহবিলের হিসাব দিয়ে তছরুপের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়। উমাইয়া সাম্রাজ্যে অপশাসন এবং দুর্নীতি কীভাবে সমাজ কাঠামোটিতেই ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। এসব কারণেই উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসীয় বংশের প্রভাব বেড়ে ওঠে। □



(ই টি নিওয়েলের সৌজন্যে ২ পৃঃ) সূত্র : নুমিসম্যাটিক নোটস অ্যান্ড মনোগ্রাফস, ৮৭ (নিউইয়র্ক, ১৯৩৯)
আল-ওয়ালীদ (৭১৫ খ্রিঃ) কর্তৃক বলবৎ

বাইজানটাইন বাটখারা

বাটখারার বিপরীত দিকে কিছু লেখার সঙ্গে একটি ক্রুশচিহ্ন লেখা রয়েছে (B অর্থাৎ ২ আউন্স। অন্যদিকে কুফি হরফে লেখা রয়েছে যে, খলিফা এই বাটখারাকে দু' 'উকিয়া'-র সমান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সম্ভবত এপর্যন্ত যে-সব মুসলিম আমলের বাটখারা উদ্ধার হয়েছে এটি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন

● টীকা ●

১. আল-ওয়ালীদ (৭০৫-১৫ খৃঃ), সুলাইমান (৭১৫-১৭), দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-২৪) এবং হিশাম (৭২৪-৭৪৩)। ওমর (৭১৭-২০) এর মাঝে সন্তানভিত্তিক উত্তরাধিকারীর সারিতে ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন আবদ-আল-মালিক-এর ভাই আবদ-আল আযিযের পুত্র।

২. ইব্‌ন-রুসতা, ২১৬ পৃষ্ঠা, ইবন-জুরাইজ, ইর্সাতকোক, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৩. ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ, মাসউদী, পঞ্চম খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

৪. মুবাররাদ, কামিল, ২১৫-১৬ পৃষ্ঠা; ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬৬ পৃঃ; মাসউদী, চতুর্থ খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

৫. তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

৬. ইব্‌ন-আল-ইবরি, ১৯৫ পৃষ্ঠা; মাসউদী, পঞ্চম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা; তান্‌বীহ, ৩১৮ পৃষ্ঠা; তাবারী-২য় খণ্ড, ১১২৩ পৃঃ।

৭. দীনাওয়ারি, আখবার, ৩২০-২২ পৃষ্ঠা; মাসউদী, সপ্তম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা; তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১১২২-২৩ পৃষ্ঠা; ইব্‌ন-আসাকির, চতুর্থ খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

৮. এদের প্রথম নেতা ছিলেন নাফি ইব্‌ন-আল-আজরাক, তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে খারিজী ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুগামীরা ব্যতিক্রমহীনভাবেই নাস্তিক এবং তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা উচিত। দেখুন শাহরাস্তানি, ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা।

৯. অথবা কিরমান, ইয়াকুত, চতুর্থ খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

১০. ইয়াকুত, চতুর্থ খণ্ড, ৮৮১-৮৮২ পৃঃ; তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১১২৫-২৬ পৃষ্ঠা। এখন শহরটির ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নেই।

১১. ওয়েলহাউসেন, রাইখ, ১৪৪ পৃষ্ঠা; ৩ নং নোট। জুনবিল একটি উপাধি, এইসব রাজারা সম্ভবত ছিলেন পারসি।

১২. এই রাজা এবং মধ্য এশিয়ার অন্য রাজাদেরও প্রায় সব প্রজাই ছিলেন ইরানি। তাঁদের সেনাবাহিনীতে অধিকাংশই ছিলেন তুর্কি।

১৩. মাসউদী, তানবীহ, ৩১৪ পৃষ্ঠা।

১৪. পৃষ্ঠা ৪২৩

১৫. দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯০-৯১ পৃষ্ঠা।

১৬. আধুনিক আমু দরিয়াকে। আরবী ও পারসিতে যইহূন বলা হয়। অক্সাসকে যইহূন, আর জ্যাক্সার্টেস (সির দরিয়া)-কে বলা হয় সইহূন। এগুলি বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ের ২:১৩, ১১-তে 'জিহন' এবং 'পিজন' নামে উল্লিখিত হয়েছে।

১৭. বালাযুরি, ৪২১ পৃষ্ঠা।

১৮. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৭৫

১৯. 'বুলেটিন অব দা স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, লন্ডন ইনস্টিটিউশন, এইচ এ আর গিব দ্বিতীয় খণ্ড, (১৯২১) ৪৬৭-৭৪ পৃষ্ঠা।

২০. সমরকন্দ, খোমিয়ারিজম এবং শাস-এর প্রাদেশিক শাসকরা হয়তো খান, খাকান বা পশ্চিমি তুর্কিদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। অবশ্য আরব ইতিহাসে খুদা, শাহ এবং দিহ্‌কান পদবি পাওয়া যায়। সমরকন্দে বসবাসকারী সোগদিয়ানার শাসক 'ইক্‌শিদ' পার্সি পদবি নিতেন। ফরগনার শাসকও তাই করেছেন। ইব্‌ন-খুরদায্‌বিহ্‌ দেখুন, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০। ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা। আরবরা অক্সাসের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের যেকোন অ-পার্সি লোককেই তুর্কি বলতেন।

২১. ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬।

২২. বালাযুরি, ১৬০ পৃষ্ঠা দেখুন। ইয়াকুবী, ২০৫ পৃষ্ঠা।

২৩. থিওফ্যানিস, ৩৮৬-৯৯ পৃষ্ঠা দেখুন। তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩১৪-১৭ পৃষ্ঠা; ইব্‌ন-আল-আসির পঞ্চম খণ্ড, ১৭-১৯ পৃষ্ঠা।

২৪. বালাযুরি ২০৫ পৃষ্ঠা। হিট্টি, ৩২২ পৃষ্ঠা।

২৫. ইফরিকিয়া-র থেকে এই নামটি আরও সঠিক। এই নামটি রোমানদের থেকে আরবরা ধার করে এবং উত্তর আফ্রিকার প্রাচীন সংস্করণ বার্বারির পূর্বাঞ্চলকে এই নামে ভূষিত করা হয়। আর পশ্চিমাঞ্চলকে 'মাগ্রিব' নামে ভূষিত করা হয়। এখন সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশই 'ইফরিকিয়া' শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

২৬. পারসি কারওয়ান থেকে, ইংরাজিতে বলা হয় ক্যারাভান। বা মরুযাত্রীদের দল।

২৭. বালাযুর ২২৯ পৃষ্ঠা; ইব্‌ন খালদুন, ৭ খণ্ড, ৮-৯ পৃষ্ঠা। ইব্‌ন-ইযহারি, 'আল-বায়ান আল-মুগারিব ফি আখবার আল-মাগ্রিব'— আর ডোজি সম্পাদিত (লিডেন ১৮৪৮) প্রথম খণ্ড, ২০-২৪ পৃষ্ঠা। তিনি যে ইহুদি উপজাতিগোষ্ঠীর কেউ এটা বলা সন্দেহপূর্ণ।

২৮. অন্যরা দাবি করেন, তিনি ছিলেন একজন লখমি বা ইয়মানীয়। বালাযুরী, ২৩০ পৃষ্ঠা; ইব্‌ন, ইযহারি, প্রথম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

২৯. ইংরাজিতে 'বার্বার' শব্দটি সাধারণভাবে আরবী শব্দ 'বার্বার' থেকে এসেছে বলেই মনে করা হয়। লাতিনে বলা হয় 'বারবারি' (মূল শব্দটি আসে গ্রিক থেকে)। অর্থাৎ 'বারবারিয়াস্‌'। রোমান আফ্রিকার লাতিনীয় শহরগুলির লাতিন-না-জানা ভাষাভাষীদেরই এই বলে অভিহিত করা হয়।

৩০. ইব্‌ন-আব্‌দ-আল-হাকাম, ২০৩-২০৫ পৃষ্ঠা।

৩১. দামাস্কাসের প্রশংসাসূচক অন্য হাদীসের জন্য দেখুন ইব্‌ন-আসাকির, প্রথম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৩২. আল-জাবাল-আল-শায়খ, ধূসর চূড়াবিশিষ্ট পাহাড়।

৩৩. ইব্‌ন-জুবাইর, ২৬৯ পৃষ্ঠা ১.৩ : 'আল-কুব্‌বা আল-খায্‌রা' সুবজ গম্বুজ, দেখুন আগানি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩।

৩৪. আগানি, চতুর্থ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৩৫. আল-মাক্কারি-র মতে, ৩০ হাজার। নাফহ্-আল-তীব মিন গুস্ন আল-আন্দালুস আল-রতীব (ডোজি এবং রাইট সম্পাদিত) (লিডেন, ১৮৫৫), প্রথম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা; ইব্ন-আল-আসীর, চতুর্থ খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

৩৬. বালাযুরি, ১৯৩ পৃষ্ঠা, ৩০০-৩০১; মাওয়ারদি, ৩৪৯-৫০ পৃষ্ঠা; ইকদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা।

৩৭. পৃষ্ঠা ১৯৩ = হিট্টি, পৃষ্ঠা ৩০১।

৩৮. বালাযুরি, ৪৬৫-৪৬৬ পৃষ্ঠা।

৩৯. তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৩৯ পৃষ্ঠা; বালাযুরি, ২৪০ পৃষ্ঠা।

৪০. ইয়াকুত, বুলদান, চতুর্থ খণ্ড, ৮৮৬ পৃষ্ঠা।

৪১. আল-উমারি, আল-তারীফ-বি-আল-মুস্তালাহ আল-শরীফ (কায়রো, ১৩১২), ১৮৫ পৃষ্ঠা।

৪২. এই শব্দটি 'ক্রীতদাস্' হিসেবেই পরে ব্যবহৃত হয়। তবে এই সময়ে এই শব্দ কোন হীনমন্যতার পরিচয় বহন করত না।

৪৩. মুবাররাদ, ২৮৬ পৃষ্ঠা

৪৪. ইব্ন সা'দ, পঞ্চম খণ্ড, ২৬২, ২৭৭ পৃষ্ঠা; ইব্ন-আসাকির, চতুর্থ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা; ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা; ইব্ন-আল-জাওযী, সীরাত উমার ইব্ন-আবদ-আল-আযিয (কায়রো ১৩৩১); ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা।

৪৫. ইব্ন-আল-জাওযী, ৯৯-১০০ পৃষ্ঠা।

৪৬. ইব্ন-খাল্লিকান, অফায়াত আল-আ'য়ান (কায়রো, ১২৯৯), প্রথম খণ্ড, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা, = ডি স্লেন, ইব্ন-খাল্লিকান-এর জীবনী অভিধান (১৮৪৩, প্যারিস), প্রথম খণ্ড, ৩৫৯-৬০ পৃষ্ঠা। সুয়ুতি, ইতকানের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১ ; থিওডোর নোলডেক, গেসশিতে দা কোরানস (গটিনজেন, ১৮৬০), ৩০৫-৩০৯ পৃষ্ঠা। জি সি মাইলস, জার্নাল, নিয়ার ইস্ট স্টাডিজ, ৮ খণ্ড (১৯৪৮), পৃষ্ঠা ২৩৬-৪২।

৪৭. অথবা তিয়াযুক, গ্রিক ভাষায় থিওডোকাস, ইব্ন-আল-ইবরি, ১৯৪ পৃষ্ঠা।

৪৮. বালাযুরি, পৃষ্ঠা ১৪৩ = হিট্টি ২২০ পৃষ্ঠা।

৪৯. অন্যরা এই স্থানকে আল্-হাইর আল-শারকি বলেও চিহ্নিত করেছেন। পালমিরার পূর্বে ছিল তার অবস্থান।

৫০. বর্তমানে লিপিটা এভাবে লেখা আছে : এই গম্বুজটি নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্র সেবক আবদ [উল্লাহ্ আল-ইমাম আল-মামুন; ক]মান্ডার, হিজরী সন ২৭০ অব্দে যেসব ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের। আল্লাহ্ তাঁকে কবুল করুন এবং তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। আমিন

৫১. দা ভগ, ল্যা টেম্পল দা জেরুসালেম (প্যারিস, ১৮৬৪); ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা এই গ্রন্থই প্রথম ভ্রান্তুতা আবিষ্কার করে।

৫২. কোরান ১৭:১-এর সূত্রানুযায়ী আল-বুরাক এখানে অবস্থান করেছিল। ফাখরি, ১৭৩ পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে, আল-ওয়ালীদই আল-আকসা-র নির্মাতা।

৫৩. ফাখরি ১৭৩ পৃষ্ঠা, তাবারী, দ্বিতীয়খণ্ড, ১২৭-৭৩ পৃষ্ঠা।

৫৪. বালাযুরি, ৪৭ পৃষ্ঠা — হিট্টি ৭৬ পৃষ্ঠা।

৫৫. তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৭১ পৃষ্ঠা। ইব্‌ন-আল ফকীহ্, ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা।

৫৬. হিট্টি দেখুন 'শিভালরি : অ্যারাবিক; এনসাইক্লোপেডিয়া অব দি সোস্যাল সায়েন্সেস।

৫৭. তুলনামূলক বিচার করুন, বাইবেলের প্রার্থনাসঙ্গীত ১৪৫ : ১৩ : হিব্রু ১:৮।

৫৮. ইব্‌ন-আল-জাওযী, ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা, ১৪৫ ও পরের পাতা।

৫৯. প্রাগুক্ত, ৯৯-১০০ পৃষ্ঠা; কিতাব আল-উয়ূন-অ-আল হাদায়িক ফি আখবর আল-হাকায়িক দেখুন। গোজি সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৬৫) ৪ পৃষ্ঠা।

৬০. ফাখরি, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৬১. মাসউদী, ৫ খণ্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা; তুলনামূলক বিচার করলে করুন ইয়াকূবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা; ইব্‌ন কুতাইবাহ্, মা'আরিফ, ১৮৫ পৃষ্ঠা, আবু-আল-ফিদা, প্রথম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা; কিতাব আল উয়ূন, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৬২. তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড,১৭৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

৬৩. তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড,১৬৪২ পৃষ্ঠা, ইয়াকূবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

॥ অধ্যায় ২০ ॥

উমাইয়া শাসনে রাজনৈতিক প্রশাসন এবং সামাজিক পরিস্থিতি

উমাইয়া সাম্রাজ্য এবং পরবর্তীকালের আব্বাসি শাসনেও প্রশাসনিক কাজ চালাতে দেশকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করার যে রীতি প্রচলিত ছিল তা মূলত পূর্ববর্তী বাইজানটাইন এবং পারস্য সাম্রাজ্যের নিয়মেই রচিত হয়েছিল। ভাগটি ছিল এরকম (১) সিরিয়া-প্যালেস্টাইন (২) আল-কূফা, আল-ইরাককে নিয়ে (৩) আল-বসরার সঙ্গে পারস্য, সিজিস্তান, খুরাসান, আল-বাহরাইন, উমান এবং সম্ভবত নাজদ এবং আল- ইয়ামামা ধরে। (৪) আর্মেনিয়া (৫) আল-হিজাজ (৬) কারমান এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চল (৭) মিশর (৮) ইফরিকিয়া (৯) আল-ইয়ামান এবং দক্ষিণ আরবের বাকি অংশ। ক্রমান্বয়ে এই ভাগগুলি সংযুক্ত হয় এবং অবশেষে পাঁচজন ভাইসরয় এই বিপুল সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মু'আবিয়া আল-বসরাকে আল-কূফা-র সঙ্গে মিলিয়ে একজন ভাইসরয়ের অধীনে আনলেন। আল-ইরাকের সঙ্গে পারস্যের অধিকাংশ অংশ, আরবের পূর্বাঞ্চল জুড়ে দিয়ে তার রাজধানী করা হল আল-কূফাকে। পরে আল-ইরাকের ভাইসরয়ের অধীনে একজন উপরাজ্যপাল নিযুক্ত হল। তিনি খুরাসান এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানা অঞ্চল দেখাশোনা করতেন। তিনি সাধারণত মার্ভ-এ থাকতেন। আরেকজন উপরাজ্যপাল নিযুক্ত হল সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের জন্য। একইভাবে আল-হিজাজ, আল-ইয়ামান এবং মধ্য আরবকে একসঙ্গে করে একজন ভাইসরয়ের অধীনে আনা হল। আল-জাজীরা (টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী উত্তর ভূখণ্ড), আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং পূর্ব এশিয়া মাইনরকে নিয়ে আরেকটি প্রদেশ গঠিত হল আরেক ভাইসরয়ের অধীনে। মিশরের অববাহিকা এবং উজান অঞ্চলকে নিয়ে আরেকটি প্রদেশ গড়া হল। ইফরিকিয়ার সঙ্গে স্বেচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল উত্তর আফ্রিকা, মিশরের পশ্চিমাঞ্চল, স্পেন, সিসিলি এবং অন্য সংলগ্ন কিছু দ্বীপ। এইসব নিয়ে অন্য এক ভাইসরয়ের অধীনে পঞ্চম প্রদেশটি গঠিত হল। শেষোক্ত প্রদেশটির রাজধানী আল-কায়রাওয়ান থেকে পরিচালিত হত সরকার।

সরকারি কাজ ত্রিমুখী ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হত। রাজনৈতিক প্রশাসন, কর আদায় এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব। এক একজন জাঁদরেল অফিসার এক একটি বিষয় দেখতেন। ভাইসরয় (আমীর, সাহিব) কোন বিশেষ জেলায় তাঁর আমিল (অনুচর, কর্মচারী) নিযুক্ত করার অধিকার পেলেন। তিনি নাম সুপারিশ করে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। হিশাম-এর

(৭২৪-৭৪৩ খ্রিঃ) আমলে আমরা আর্মেনিয়ার নতুন রাজ্যপাল দেখতে পাই। এছাড়া আজারবাইজান এবং দামাস্কাসের অবশিষ্ট অঞ্চলে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা না করে একজন নায়িব (উপকর্তা) নিয়োগ করেন। নিজস্ব প্রদেশে রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রশাসনের পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকত ভাইসরয়ের হাতে। কিন্তু সচরাচর রাজস্ব আদায়ের ভার থাকত 'সাহিব আল-খারাজ' নামে এক বিশেষ অফিসারের ওপর, যিনি তাঁর কাজের জন্য সরাসরি সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। মু'আবিয়াই সম্ভবত প্রথমবার এমন অফিসার নিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি তাঁকে আল-কূফায়[৩] নিয়োগ করেন। তার আগে কোন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক সরকারের মূল কাজই ছিল আর্থিক প্রশাসন সামলানো।

প্রাচীন খলিফারা যেভাবে রাজস্ব আদায় করতেন সেই সূত্র থেকেই রাজস্ব আদায় হত। রাজস্বের সিংহভাগ আসত প্রজাদের বার্ষিক খাজনা থেকে। প্রদেশগুলিতে স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি আনুতোষিক, সৈন্যদের বৃত্তি এবং অন্যসব পরিষেবার খরচ নির্বাহ হত স্থানীয় আয়ের ভিত্তিতে। উদ্বৃত্ত অংশ যেত খলিফার তহবিলে। মুসলিমদের প্রদেয় আনুতোষিক হ্রাস করে মু'আবিয়া ২১/২ শতাংশ যাকাহ্ নির্দিষ্ট করেছিলেন। মু'আবিয়ার এই জাকাহ্ কর নেওয়া অর্থাৎ মুসলিমদের[৪] বার্ষিক আয়ের ২১/২ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আধুনিক আয়কর ব্যবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

বিচার যা হত, শুধু মুসলমানদের জন্যই। অমুসলিমরা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রধানের নিয়ন্ত্রণে স্বশাসন ভোগ করতেন। এজন্যই শুধু বড় শহরগুলিতে বিচারপতি নিয়োগ করা হত। মুহাম্মাদ এবং পূর্ববর্তী খলিফারা জনে জনে ন্যায়বিচারের কথা বলে গেছেন, তা তাঁদের উত্তরসূরি, তাদের অফিসারেরাও মেনে চলতেন। প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম পূর্বানুরূপ ছিল। প্রদেশে প্রথম বিচারবিভাগীয় কর্মী নিযুক্ত করেন রাজ্যপালরা। আব্বাসীয় আমলে খলিফারাই এই নিয়োগ করতেন। অবশ্য উমার-এর আমলে হিজরী সন ২৩ অব্দে (৬৪৩ খ্রিঃ)[৫] মিশরে প্রথম কাযী (জজ) নিযুক্ত হন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের পর আমরা দেখতে পাই, ওই দেশে কোন বিচারপতি অবসর নিলেই আবার নতুন বিচারপতি নিয়োগ হতেন। তাঁদের সবসময় নিয়োগ করা হত ফকীহ্ শ্রেণী থেকে। এই ফকীহ-রা কোরান এবং মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা মামলার বিচার ছাড়া ধর্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সংক্রান্ত (ওয়াক্ফ) কাজও পরিচালনা করতেন। বিকলাঙ্গ এবং অনাথদের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন।

তাঁর সই করা কিছু চিঠিপত্র জাল হয়েছে আবিষ্কার করে মু'আবিয়া প্রথম রাজ্যের মহাফেজখানা[৬] স্থাপন করেন। এখানে সমস্ত সরকারি দলিল শিলমোহর মারার আগে এবং কাউকে পাঠানোর আগে প্রত্যয়িত নকল করে রেখে দেওয়া হত। উমাইয়া খলিফা আব্দ আল-মালিকের আমলে দামাস্কাসে একটি কেন্দ্রীয় নথি সংরক্ষণাগার স্থাপিত হয়।

● ফৌজি সংগঠন

বাইজানটাইন-এর সেনাবাহিনীর অনুকরণেই উমাইয়া সেনাবাহিনী সাজিয়ে তোলা হয়। পাঁচটি বিভাগে সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী, দুটি শাখা বাহিনী, অগ্রবর্তী বাহিনী ও পশ্চাৎপদ বাহিনী। মোটামুটি প্রাচীন ফৌজি-সংগঠনের নিয়ম মেনেই এই সৈন্য-সংগঠন গঠিত হয়েছিল। শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান-এর (৭৪৪-৫০ খ্রিঃ) আগে পর্যন্ত এভাবেই চলে। দ্বিতীয় মারওয়ান প্রথম এই সংগঠন ভেঙে ছোট ছোট সুসংহত বাহিনী গড়ে তুললেন। যার নাম দেওয়া হল 'কুর্দুস' (সেনাদল)।[৮] সাজসজ্জা এবং অস্ত্রশস্ত্রে আরব যোদ্ধাদের গ্রিক সেনাদের থেকে আলাদা করা কঠিন ছিল। অস্ত্রশস্ত্রও প্রায় একই ছিল। তবে আরবীয় অশ্বারোহী সেনারা সরল এবং গোলাকার জিন ব্যবহার করতেন। তা গ্রিকদের মতো ছিল না। বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে যেমন অশ্বারোহী বাহিনী রয়েছে, তা ছিল অনেকটা সেইরকমই। জবরদস্ত পদাতিক বাহিনীর কাছে ছিল পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র (আর্‌রাদা) এবং 'মানজানীক' নামে এক ধরনের অস্ত্র এবং প্রাচীর চূর্ণ করার যুদ্ধাস্ত্র (দাব্বাবাহ্, কাব্‌শ)। এইসব যন্ত্রপাতি এবং সেনাবাহিনীর তল্পিতল্পা থাকত উটের পিটে। উটেরা থাকত সেনাবাহিনীর পিছনে।

দামাস্কাসেই ছিল সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। অধিকাংশ সৈন্যই ছিলেন সিরীয়, এবং আরব থেকে সিরীয়বাসী হওয়া মানুষ। পূর্বের সমস্ত প্রদেশের জন্য আল-বসরা এবং আল-কূফা থেকে সৈন্য নিয়োগ করা হত। সুফ্‌য়ানি আমলের হিসাব অনুসারে মজুত সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার। এর জন্য বার্ষিক খরচ হত ৬ কোটি দিরহাম মুদ্রা। এই অর্থ থেকেই সৈন্যদের পরিবারের 'স্টাইপেণ্ড' দেওয়া হত।[৯] তৃতীয় ইয়াজিদ (৭৪৪ খ্রিঃ) অবশ্য সৈন্যদের সমস্ত আনুতোষিক ১০ শতাংশ হারে কমিয়ে দেন এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে তিনি নাকিস' (যিনি আনুতোষিক কমিয়েছেন) নামে পরিচিত হন।[১০] উমাইয়া বংশের শেষ রাজার আমলে সৈন্যসংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার হয়েছিল।[১১] মনে হয়, সংখ্যাটি ভুলই। হয়তো ১২ হাজার সংখ্যাটিই ভুলবশত ১ লক্ষ ২০ হাজার লেখা হয়ে গেছে।

আরব নৌবাহিনী বাইজানটাইন-ছকের এক অলঙ্কৃত রূপ ছিল। নৌ-বাহিনীর এক একটি রণতরীতে ২৫ জন সৈন্য থাকত। নীচের দুটি ডেকে তারা বসত। প্রতি আসনে দুজন করে সৈন্য বসত। প্রতি রণতরীতে ১০০ বা তার বেশি বাইচ থাকত। তবে যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শীরা ওপরের ডেকেই থাকত।

● রাজ-জীবন

খলিফাদের সন্ধ্যা কাটত বিনোদন এবং সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে। মু'আবিয়া এই সময় ইতিহাস এবং গল্প শুনে কাটাতেন। মূলত দক্ষিণ আরবের ইতিহাসে আগ্রহী ছিলেন তিনি। এছাড়া কবিতা পাঠের শ্রোতা ছিলেন তিনি। তার মনোরঞ্জনের জন্য আল-ইয়ামান

থেকে একজন গল্প কথককে নিয়ে আসা হয়। তাঁর নাম ছিল আবীদ ইব্ন-শারইয়া, যিনি রাতের পর রাত মু'আবিয়াকে গল্প এবং অতীতের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়ে যেতেন। মু'আবিয়া গোলাপজলের সুরভি মেশানো শরবত তখন পান করতে ভালবাসতেন। শুনতেন আরবি গান।[১২] এখনও দামাস্কাস এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে এর প্রচলন রয়েছে। বিশেষত মহিলারা এসব উপভোগ করে।

মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ খলিফাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে প্রথম মদ্যপ ছিলেন। 'ইয়াজিদ-আল-খুমুর'[১৩] (মদের ইয়াজিদ) নাম হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর আগে নেশা ছিল, পোষ্য বানরকে নিয়ে মদ্যপানে বসা।[১৪] আবু-কায়িস নামে ওই বানরটিও প্রচুর মদ গিলত। রোজ প্রচুর মদ্যপান করতেন ইয়াজিদ। অন্যদিকে আল-ওয়ালীদ একদিন অন্তর মদ্যপান করতেন। হিশাম প্রতি শুক্রবার নামায পড়ার পর মদ্যপান করতেন। আর আবদ-আল- মালিক মাসে একবার মদ্যপান করতেন। তিনি আবার এত বেশি মদ্যপান করতেন যে পরে নিজেই বমি হবার ওষুধ খেয়ে বমি করতেন।[১৫] দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাঁর রাজসভার দুই গায়িকা সাল্লামা এবং হাবাবা-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। একরাতে হাবাবার মুখে তিনি খেলার ছলে আঙ্গুর ফেলে দেন। ওই আঙ্গুর গিলতে গিয়ে হাবাবার গলায় আটকে গেলে দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাঁকে উত্ত্যক্ত করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন।[১৬] তাঁর পানাসক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পান দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রিঃ)। তিনি এত লম্পট ছিলেন যে মদের নদীতে সাঁতার কাটাটা অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। স্নান করার সময় অবিরাম মদ্যপান করে যেতেন তিনি।[১৭] আল-ওয়ালীদ একদিনই নাকি কোরান খুলে বসেছিলেন। তাঁর দুচোখ কোরানের লেখার ওপর পড়তেই তিনি যে লেখা দেখতে পান তা ছিল এরকম 'এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী রাজারই ধ্বংস অনিবার্য।'[১৮] ওই লেখা দেখেই তিনি পবিত্র কোরান গ্রন্থটি তীরধনুক দিয়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেন। আর ওই ছেঁড়ার সময় প্রতিবাদে তিনি নিজের রচিত কবিতার দুটি চরণ আওড়াতে থাকেন।[১৯]

এই খলিফা বেশিরভাগ সময় কাটাতেন মরুভূমির দুর্গে। একটি দুর্গ ছিল আল-কারইয়াতাইনে। জায়গাটি ছিল দামাস্কাস এবং পালমিরার মধ্যে। আগানি[২০]-র দেওয়া বর্ণনায় এই ওয়ালীদের দেওয়া এক মদ্যপানের আসরের কথা জানা যায়। মদ্যপানের সঙ্গে সবসময়ই চলত নাচ-গান। যে সব খলিফার মান-মর্যাদা ছিল তাঁরা এই ধরনের অনুষ্ঠানে পর্দার পিছনেই অবস্থান করতেন। আর আল-ওয়ালিদের মতো খলিফা হলে তিনি মর্যাদার তোয়াক্কা না করে সবার সঙ্গে আসরে হুল্লোড়ে মেতে যেতেন।[২১]

এইসব আসরের যে একেবারেই সাংস্কৃতিক মূল্য ছিল না, তা কিন্তু নয়। এতেও নিঃসন্দেহে কবিতা, গান, এবং সাধারণভাবে জীবনের নান্দনিক দিককে উৎসাহিত করা হত। সবসময়ই তা নিছক মাতলামি এবং হুল্লোড় ছিল না।

খলিফা এবং তাঁর পারিষদরা আবার নির্ঝঞ্ঝাট এবং কেতাদুরস্ত কিছু অবসর বিনোদনেও জড়িত থাকতেন। এগুলি ছিল ঘোড়ায় চড়া, শিকার এবং পাশা খেলা। আব্বাসি সাম্রাজ্যের আমলে পোলো ছিল রাজাদের প্রিয় খেলা। সম্ভবত পারস্য থেকে এই খেলা প্রচলিত হয় উমাইয়া রাজত্বের শেষার্ধে। এছাড়া মোরগ-লড়াইও হত। আরবে প্রাচীনকালে শিকারের প্রচলন ছিল। সেখানে সালূকি (আল-ইয়ামানে 'সালুক' বলা হত) কুকুরকে কাজে লাগানো হত। পরে কাজে লাগানো হয় চিতা (ফাহ্দ) কে। যিনি প্রথমবার শিকারের কাজে চিতাবাঘকে কাজে লাগান তার নাম কুলায়ব ইব্ন-রবীআহ্। বাসূস যুদ্ধের এই নায়ক কিংবদন্তি হয়ে গেছেন। ভারতীয় এবং পারসিকরা অবশ্য আরবের লোকদের চেয়ে আগে তালিম দেওয়া পশুদের শিকারের কাজে লাগাতেন। মু'আবিয়ার পুত্র প্রথম ইয়াজিদ ছিলেন প্রথম সেরা মুসলিম শিকারি এবং তিনিই চিতাকে প্রথমবার ঘোড়ার পিঠে চড়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি শিকারি কুকুরদের পায়ের থাবায় সোনার বালা পরিয়ে রাখতেন। প্রতিটি কুকুরকে বিশেষ ক্রীতদাস হিসেবে চিহ্নিত করতেন।[২২] উমাইয়াদের আমলে ঘোড়দৌড় প্রচণ্ড জনপ্রিয় ছিল। আবদ আল-মালিকের পুত্র আল ওয়ালীদই প্রথম সর্বসাধারণের জন্য ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেন।[২৩] তার ভাই এবং উত্তরাধিকারী সুলাইমান ঠিক মৃত্যুর আগেই জাতীয় পর্যায়ে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৪] এদের ভাই হিশামও ঘোড়দৌড় নিয়ে প্রশিক্ষণ চালু করে দৌড়বাজ ঘোড়ার সংখ্যা প্রায় ৪০০০-এ পৌঁছে দিয়েছিলেন যা প্রাক্-ইসলামি এবং ইসলামি ইতিহাসেও নজিরহীন।[২৫] এই খলিফার প্রিয় এক কন্যা দৌড়ের ঘোড়াদের দেখাশোনা করতেন।[২৬]

রাজপরিবারের মহিলারা ভালরকম স্বাধীনতা ভোগ করতেন বলেই মনে হয়। মক্কার এক কবি আবু-যাবল-আল-জুমাহি মু'আবিয়ার সুন্দরী কন্যা আতিকাকে প্রেম কবিতা নিবেদন করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। আতিকা তীর্থযাত্রায় তার মুখাবরণ ও পরদা উন্মোচন করলে আবু-যাবল তাকে ক্ষণিকের জন্য দেখতে পান। শেষপর্যন্ত প্রেমের টানে আতিকার পিছন-পিছন রাজধানীও চলে আসেন তিনি। মু'আবিয়া খবর পেয়ে 'কবির মুখ বন্ধ করতে' তাঁকে কিছু অর্থ দেন এবং যুতসই অন্য স্ত্রী খুঁজে দেন।[২৭] আরেক সুদর্শন কবি ওয়াদ্দা-আল-ইয়ামান দামাস্কাসে প্রথম-আল ওয়ালীদের এক স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করেন। খলিফার হুমকি সত্ত্বেও তিনি এই ব্যাপারে ছিলেন বেপরোয়া। শেষপর্যন্ত এই দুঃসাহসিকতার ফল হয় মৃত্যু।[২৮] মু'আবিয়ার নাতনি আতিকা (দ্বিতীয়) তার স্বামী আবদ-আল মালিকের ওপর স্রেফ বিচক্ষণতা ও সৌন্দর্যের দ্বারা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা নিয়েও কাহিনী রয়েছে। যখন আতিকার অভিমান হত, তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতেন। যতক্ষণ না আতিকার কোন প্রিয় পারিষদ এসে কাঁদতেন এবং মিছিমিছি বলতেন যে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে মারপিট হয়ে একজন মারা গেছে এবং খলিফা ভ্রাতৃহন্তাকে বধ করতে মনস্থ করেছেন, ততক্ষণ আতিকা দরজা খুলতেন না। তবে দ্বিতীয় আল ওয়ালীদের আমলের আগে

যতদূর মনে হয়, পুরোপুরিভাবে হারেম প্রথার চল হয়নি।[৩০] হারেম প্রথায় খোজা পুরুষকে রাখা হত প্রহরী। গোড়ায় যেসব খোজাকে নিয়োগ করা হয় তারা মূলত ছিলেন গ্রিক এবং সম্ভবত বাইজানটাইন প্রথা অনুসরণ করে এদের আরব দুনিয়ায় নিয়োগ করা হয়।[৩১]

● রাজধানী

এটা খুব সহজেই ভাবা যায় যে উমাইয়াদের রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠার পরেও দামাস্কাসে জনজীবন এবং মানুষজনের আচার-আচরণের মূল সুরটির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। আগে এখনকার মতোই সংকীর্ণ রাস্তায়, গলিঘুপচিতে দামাস্কাসবাসীরা ঢোলা পায়জামা পরে ঘুরে বেড়াতেন। পায়ে থাকত লাল ছুঁচালো জুতো। আর মাথায় পেল্লাই পাগড়ি। দেখা যেত রোদে পোড়া বেদুইনরা মাথায় কুফিয়া (শাল) চাপিয়ে এবং সঙ্গে ইকাল (মাথার বন্ধনী) পরে কাঁধে কাঁধ ঘষে হাঁটছে। ক্বচিৎ ইউরোপীয় পোশাকের (ইফ্‌রানজি)[৩২] দেখা মিলত। অভিজাত, সচ্ছল দামাস্কাসবাসীরা ঘোড়ায় চড়ে শ্বেতশুভ্র রেশমি কাপড় 'আবা' পরে কোমরে তরবারি অথবা বর্শা নিয়ে চলাচল করত। রাস্তায় খুব কমই মহিলাদের দেখা যেত। আর যারা বের হত তারাও পর্দাঢাকা। অধিকাংশ মহিলাই বন্ধ ঘরের জানালার গরাদে থুতনি লাগিয়ে বাজার এবং জনপথের জনারণ্য উপভোগ করতেন। পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া চিৎকার করা শরবতওয়ালা বা মিষ্টি বিক্রেতারা ছিল দামাস্কাসের শোভাবিশেষ। অসংখ্য পথচারী মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলত উট, গাধার দল। পশুদের পিঠে থাকত মরুভূমি ও কৃষিভূমিতে উৎপন্ন নানারকম জিনিস। নানারকম গন্ধের ঘ্রাণে ম ম করত শহর।

অন্য শহরের মতো আরবরাও উপজাতিভিত্তিক বিভিন্ন পাড়ায় একজোট হয়ে আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকতেন। দামাস্কাসে, হিম্‌সে, আলেপ্পোতে (হালাব) এবং অন্য শহরে এইসব বাড়িগুলি (হারা) এখনও আলাদাভাবে বিদ্যমান। প্রতিটি বাড়ির প্রবেশপথ ছিল রাস্তার দিকে। দরজা খুলেই ছিল বড় একটা উঠান। উঠানে থাকত বড় জলাধার। তার সঙ্গে যুক্ত এক ঝরনা থেকে মাঝে মাঝে জল ঝরে পড়ত। উঠানের ধারে সচরাচর লাগানো হত লেবু কিংবা জামির গাছ। উঠানের গায়েই পরপর থাকত ঘর। বড় বাড়িতে আবার থাকত একটা উপাসনাগৃহ। উমাইয়া আমলেই দামাস্কাস শহরে এক আধুনিক জলসরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, যা এখনও বিদ্যমান। এখনও একটি খাল রয়েছে ইয়াজিদের নামে। 'নাহরে ইয়াজিদ' নামে এই খালটি মু'আবিয়া-পুত্র ইয়াজিদ বারাদা থেকে খনন করে আনেন এবং সম্ভবত পরে তা আরও সম্প্রসারিত করা হয়।[৩৩] গূতাহ্ অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থার পূর্ণতা বিধানে তা বিস্তৃত করা হয়েছিল। দামাস্কাসের বাইরে এই স্নিগ্ধ ও শ্যামল মরূদ্যানটি বারাদার অস্তিত্বের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছিল। এই খালটি ছাড়াও ওই একই জায়গা থেকে আরও চারটি খাল খনন করা হয়, যার ফলে শহরে জলসমস্যা বলে কিছু ছিল না। জমিও অনেক উর্বর হয়।

● সমাজ

সাম্রাজ্যের অধীন জনসংখ্যা চারটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে ওপরে স্থান ছিল শাসক মুসলমানদের। এদের মধ্যে ছিল খলিফা পরিবার এবং অভিজাত আরব সম্প্রদায়। এরা সংখ্যায় কত ছিলেন জানা যায়নি। প্রথম আল-ওয়ালীদের আমলে দামাস্কাসের যেসব আরবীয় মুসলমানদের বার্ষিকভাতা দেওয়া হত তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার।[৬৪] প্রথম মারওয়ানের আমলে, হিম্‌স এবং তার জেলায় (জুন্দ) ২০ হাজার মুসলমান পেনসন পেতেন। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিতীয় উমারের নিষেধাজ্ঞা জারির আগে খুব বেশি ছিল না। অবশ্য উমাইয়া আমলের শেষার্ধে সিরিয়া ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী, যেখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এই সংখ্যাটা এমনই ছিল বহুকাল। ছোটশহর এবং গ্রামগুলি, বিশেষত পাহাড়ি এলাকায় সাধারণত নিপীড়িতরাই থাকত। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাচীন সাংস্কৃতিক গঠন অবিকল একইরকম ছিল। কার্যত লেবানন ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে খ্রিস্টান এবং ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে সিরীয় থেকে গিয়েছিল মুসলিম বিজয়ের বেশ কয়েক শতক পরেও। শুধু মুসলিম শাসকের হাতে আসার পর এই দুই শহরের খ্রিস্টান-মুসলিম সংঘাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ধর্মীয়, সামাজিক, জাতিগত এবং ভাষাগত বিভেদ সবে শুরু হয়েছিল।

● অনুচরবৃন্দ

আরবীয় মুসলিমদের পরেই স্থান ছিল নয়া ধর্মান্তরিত মুসলিমদের, যারা বলপ্রয়োগের সুবাদে বা অন্য ফাঁদে পড়ে ইসলামধর্ম নিয়েছিলেন এবং তার ফলে তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবিকভাবে এরা পূর্ণ ইসলামি নাগরিকত্ব পাননি। আরবীয় জাতীয়তাবাদীরা তাত্ত্বিক ব্যাখা এড়িয়ে নিজেদের বেশ বলীয়ান বলেই মনে করতেন। উমাইয়া সাম্রাজ্যের সময়কালে নিঃসন্দেহে জমিমালিকদের; মুসলিম হোন বা না হোন, খারাজ (জমিকর) দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় উমার এবং আব্বাসীয় আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১ খ্রিঃ)-এর আমলে গৃহীত কঠোর ব্যবস্থা ছাড়া কোন মুসলিম অধীন দেশেই ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটেছে বলে কোন প্রমাণ নেই। মিশরে নতুন ধর্মের প্রতি বিরোধ সর্বদা খুব কমই ছিল। ওই দেশের রাজস্ব আমর ইব্‌ন-আল-আসের সময়ে ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ দিনার। তা কমে মু'আবিয়ার আমলে দাঁড়ায় মাত্র ৫০ লক্ষ দিনারে এবং আব্বাসীয় হারুন আল-রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রিঃ) আমলে তা কমে ৪০ লক্ষ দিনার হয়ে দাঁড়ায়।[৬৫] আল-ইরাকে উমার ইব্‌ন-আল-খাত্তাবের সময় ১০ কোটি দিনার রাজস্ব সংগ্রহ হত। আব্‌দ আল-মালিকের আমলে তা ৪ কোটি হয়ে দাঁড়ায়।[৬৬] রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ইসলামে ধর্মান্তর। আব্বাসীয় শাসনের প্রথম দিকে, মিশরি, পারসি এবং অ্যারামিয়ানদের মধ্যে যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন তাদের সংখ্যা ক্রমে আরবীয় মুসলমানদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে।

এই নব্য মুসলমানরা অনুচরবৃন্দ (মাওয়ালি) হিসেবে মুসলিম সমাজের সবচেয়ে নীচু স্তরে স্থান পান। এদের মর্যাদা দিতে 'প্রকৃত' মুসলিমরা রাজি ছিলেন না। পরে আমরা দেখি, এই নব্য মুসলিমরা স্বেচ্ছায় আল-ইরাকে 'শিয়া' বা পারস্যে 'খারিজী' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতেন। এদের অনেকে আবার এমন কাজে সচেষ্ট হল যে, তারা ধর্মগতভাবে রাজার চেয়েও বেশি রাজকীয় প্রতিপন্ন হল। নতুন ধর্মমতের প্রতি তাদের উদ্যম এবং ধর্মোন্মত্ততার প্রতি নৈকট্য তাঁদের অমুসলিমদের প্রতি নির্যাতনে প্ররোচিত করল। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, প্রথমদিকের এই সব অসহিষ্ণু মুসলিমদের কেউ কেউ খ্রিস্টান এবং ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া মুসলমান।

মুসলিম সমাজে এই মাওয়ালিরাই স্বাভাবিক কারণে লেখাপড়া এবং কলাবিদ্যা শেখায় য়োগ করলেন। কারণ তাঁরা সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা ছিলেন। এই মাওয়ালি বা ধর্মান্তরিত মুসলমানরা যখন বুদ্ধিজীবীর জগতে আরবীয় মুসলমানদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন তখন রাজনৈতিক জগতেও দুই পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। প্রকৃত মুসলমানদের সঙ্গে আন্তর্বিবাহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে আরবীয় রক্তের প্রাধান্য শিথিল করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত নানা বর্ণের সংমিশ্রণের মধ্যে তাঁরা আরবদের অনাকর্ষণীয় এক শক্তিতে পরিণত করে দিলেন।

● যিম্মী

সমাজে তৃতীয় শ্রেণী হিসেবে স্থান ছিল বিভিন্ন ঐশী ধর্মের মান্যকারীদের, সহিষ্ণু সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং তথাকথিত আহ্‌ল আল-যিম্মাহ্‌দের (অর্থাৎ খ্রিস্টান, ইহুদি, স্যাবিয়ানরা) যাদের সঙ্গে মুসলমানদের সামাজিক চুক্তি ছিল। স্যাবিয়ানরা ম্যানডিনদের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম ছিলেন। সেন্ট জনের সেইসব তথাকথিত খ্রিস্টানরা যারা এখনও ইউফ্রেটিস নদীর সামনের জেলাগুলোয় টিকে রয়েছেন, তাঁদের কথা কোরানে তিন-তিনবার (২:৫৯, ৫:৭৩, ২২:১৭) উল্লেখ রয়েছে। এর থেকেই এটা বোঝা যায় যে, মুহাম্মাদ তাঁদের প্রকৃত আল্লাহ্‌-বিশ্বাসী বলেই মনে করতেন। মুহাম্মাদের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল, ওইসব সহিষ্ণু ধর্মমতের অনুসারীদের নিরস্ত্র করে মুসলিম সুরক্ষার বিনিময়ে খাজনা দিতে বাধ্য করা। আর প্রধানত এই শ্রদ্ধা থেকেই মুহাম্মাদ বাইবেলকে স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া বানু-গাস্‌সান, বাকর, তাগলিব এবং অন্য খ্রিস্টান উপজাতিদের অভিজাত সম্পর্কের প্রশ্ন তো ছিলই।

যিম্মীরা জমিকর ইত্যাদি দিয়ে যে মর্যাদা ভোগ করতেন তা উল্লেখযোগ্য। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি বিচারের ব্যাপারেও যেখানে কোন মুসলমান জড়িত নয়, সেসব ক্ষেত্রে এই যিম্মীরা কার্যত নিজেদের ধর্মীয় প্রধানের অধীনেই বিচার ব্যবস্থা পেতেন। মুসলিম আইন তাদের প্রতি প্রযুক্ত না করাটাই বেশি পবিত্র বলে মনে করা হত। এই প্রথার মূল

অংশটা তুর্কি আমলেও বলবৎ ছিল এবং ইরাক. সিরিয়া. প্যালেস্টাইনের তত্ত্বাবধানকালীন আমলেও বিদ্যমান ছিল।

প্রারম্ভিক কালে ইসলামি শাসনের অধীনে তাঁরাই ছিলেন, যাঁরা কোরানে[17] উল্লিখিত আহ্‌ল-আল-কিতাব (গ্রন্থধারীগণ)। পরে মুসলমানরা অগ্নিউপাসক জরথুস্ত্রিয় (মজুস), হাররান-এর অসভ্য ধর্মহীন গোষ্ঠী এবং উত্তর আফ্রিকার পৌত্তলিক বার্বারিগোষ্ঠীকেও যিম্মিদের অনুরূপ মর্যাদার আওতায় আনেন। কোন ঐশী ধর্মে বিশ্বাসী না হলেও এবং কার্যত রক্ষা পাবার অযোগ্য হলেও পারসিক জরথুস্ত্রিয় এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বার গোষ্ঠীকে মুসলিম আক্রমণকারীরা তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দেন : ইসলামধর্ম গ্রহণ, যুদ্ধ বা বার্ষিক নজরানা দান। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর গর্দান নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ভৌগোলিক পরিস্থিতির খাতিরে উপযুক্ত ব্যবস্থা স্থির করা হল। লেবানন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে উমাইয়া সাম্রাজ্যের চরম মুহূর্তেও খ্রিস্টানরা আধিপত্য ভোগ করেছেন এবং আব্‌দ আল-মালিকের মতো খলিফাকে মানেননি।[18] পুরো সিরিয়ায় খ্রিস্টানরা অন্তত দ্বিতীয় উমারের রাজত্ব পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করেছেন। আমরা আগেই জেনেছি, মু'আবিয়ার স্ত্রীই ছিলেন খ্রিস্টান। তাঁর রাজসভায় কবি, চিকিৎসক, অর্থসচিব—এঁরা সবাই খ্রিস্টান ছিলেন। একমাত্র প্রথম আল-ওয়ালীদের আমলেই খ্রিস্টান-আরব উপজাতির বানু-তাগলিব প্রধান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়।[19] মিশরে পর্যন্ত খ্রিস্টানরা অনেকবার মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। অবশ্য ৮১৩-৩৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় আল-মামুনের আমলে ওই খ্রিস্টানদের দিন শেষ হয়।[20]

● উমারের চুক্তিনামা

দ্বিতীয় উমারের সুনাম শুধু তাঁর পবিত্র ধর্মানুরাগ এবং নব্য ধর্মান্তরিত মুসলিমদের ওপর ধার্য কর প্রত্যাহারের কারণেই বাড়েনি। তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা এবং একমাত্র উমাইয়া রাজা যিনি খ্রিস্টান প্রজাদের ক্ষেত্রে অপমানজনক বিধিনিষেধ জারি করেন। এই ব্যবস্থা নেওয়ার দায় অনেকে ভুল করে তাঁরই নামের তাঁর মাতুল পক্ষের প্রপিতামহ 'প্রথম উমারের' ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আসলে তা করেছিলেন দ্বিতীয় উমারই। অথচ নানাভাবে প্রথম উমারের সঙ্গে দ্বিতীয় উমারকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে ইতিহাসে।[21] যতদূর মনে হয়, ঠেলায় পড়ে যাতে মুসলিমদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের মেলামেশাটা ঘনিষ্ঠ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই ব্যবস্থা নেন। কারণ তাঁর আগে কোনভাবেই তো খ্রিস্টানদের কেউ বাগে আনতে পারেননি। এই উমাইয়া রাজা যে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা হল, সমস্ত সরকারি অফিস থেকে খ্রিস্টানদের অপসারণ করা, খ্রিস্টানদের মাথায় পাগড়ি পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি। খ্রিস্টানদের কপালের ওপরে চুল ঝুললেই তা কাটার নির্দেশ জারি করা হয়। চামড়া দেওয়া পোশাক পরা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করা হয়; ঘোড়ায় চড়ার ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা শুধু

মালবাহী জিনওলা ঘোড়ায় উঠতে পারতেন। কোন ধর্মস্থান নির্মাণ করতে পারতেন না। আযানের সময় কোন শব্দ করতে পারতেন না। এই কঠোর নির্দেশ অনুযায়ী, কোন মুসলমান কোন খ্রিস্টানকে হত্যা করলে সেই ঘাতক মুসলমানের শাস্তি হত শুধু জরিমানা। আদালতে মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন খ্রিস্টানের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হত না। ইহুদিদের ক্ষেত্রেও এইসব বিধিনিষেধের কিছু কিছু কায়েম করা হয়। তাঁদেরও সরকারি চাকরি দেওয়া নিষিদ্ধ করেন তিনি।[৪৪] তবে এইসব আইনের অধিকাংশই বেশিদিন যে বলবৎ থাকেনি তা বোঝা যায় একটা ঘটনা থেকে। হিশামের অধীনে আল-ইরাকের রাজ্যপাল খালিদ ইব্ন-আবদুল্লাহ্ আল-কাসরি আল-কূফাতে তাঁর খ্রিস্টান মাকে[৪৫] সন্তুষ্ট করতে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। অর্থাৎ তাঁর আমলে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের ধর্মস্থান নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। এমন কী জরথুস্ত্রের অনুগামীদের সরকারি পদে নিয়োগ করা হয়।

● ক্রীতদাস

সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে স্থান ছিল ক্রীতদাসদের।[৪৬] ইসলামি আমলে সেমেটিক গোষ্ঠীর প্রাচীন ক্রীতদাস প্রথা বজায় রাখা হয়। এর বৈধতা ওল্ড টেস্টামেন্টেও স্বীকৃতি পেয়েছে। অনুশাসন অনুযায়ী মুসলমানরা সহধর্মীদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারতেন না। তবে অন্য জাতের কোন দাস ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতিও ইসলামি অনুশাসনে নেই। প্রাচীন ইসলামি দেশে যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে দাসদের নিয়োগ করা হত। মহিলা, শিশু নির্বিশেষে অর্থ দিয়ে কিনে বা জোর করে দাসের দখল নেওয়ার প্রচলন ছিল। এভাবে দাসব্যবসা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত মুসলিম দেশে তা লাভজনক ব্যবসা হয়ে ওঠে। পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার কিছু দাস ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, ফরগণা এবং চীনা তুর্কীস্থানের দাসেরা ছিল পীতবর্ণের। এছাড়া পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দাসেরা ছিল শ্বেতাঙ্গ। স্পেনের দাসেদের বলা হত সাকালিবা[৪৭] (স্পেনের 'এসক্লাভো' শব্দ থেকে নেওয়া)। এই সাকালিবা দাসরা প্রতিজনে এক হাজার দিনারে বিক্রি হত। তুর্কি দাস মাত্র ৬০০ দিনারে বিক্রি হত। ইসলামি আইনে কোন মহিলা দাসীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মও (অন্য দাসের ঔরসজাত হলে) দাস বলে গণ্য হত। কোন মহিলা দাসীর সঙ্গে তাঁর প্রভু ছাড়া অন্য কোন লোকের যৌন সম্পর্কে সন্তান হলে সেও দাস হত। আর যে ক্ষেত্রে মহিলা দাসের কোন স্বামী থাকত না এবং প্রভুর সঙ্গে সম্পর্কেই সন্তান হত, সেক্ষেত্রেও সন্তান 'দাস' হত। তবে কোন পুরুষ দাসের সঙ্গে কোন মুক্ত মহিলার সম্পর্কের ফলে কোন সন্তান জন্ম নিলে সেই সন্তান দাস হয়ে জন্মাত না। সে হত 'মুক্ত' সন্তান।

মুসলিম সাম্রাজ্যের বিজয়কেতন উড়তেই দাসের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়, এমন ধারণা আছে। যেমন, জানা যায়, মূসা ইব্ন-নুসাইর ইফরিকিয়া থেকে তিন লক্ষ বন্দিকে দাস হিসেবে গ্রহণ করেন। তার এক পঞ্চমাংশকে তিনি আল-ওয়ালীদকে[৪৮] দিয়ে দেন এবং

স্পেনের গথ বংশীয় সাম্রাজ্য থেকে তিনি ৩০ হাজার কুমারী দাসীকে দখল করেন।[১৭] কুতাইবাহ্-এর শুধু সগদিয়ানা জাত ১ লক্ষ দাস ছিল।[১৮] আল-জুবাইর ইব্ন-আল-আওয়াম ১০০০ পুরুষ এবং ১০০০ মহিলা দাসকে অস্থাবর সম্পত্তির মত দলিল করে দান করেন।[১৯] মক্কার বিখ্যাত রোমান্টিক কবি উমার ইবন-আবি রবীআহ্ (মৃ.৭১৯ খ্রিঃ) এরই—৭০ জনের বেশি দাস ছিল।[২০] উমাইয়া বংশের এক যুবরাজ যে ১০০০ দাস রেখেছিলেন তাও অবিশ্বাস্য নয়। এমন কী সিফফিনের যুদ্ধে সিরীয় সৈন্যবাহিনীর এক একজন সৈন্যের ১ থেকে ১০ জন করে দাস ছিল।[২১]

মহিলা দাসী তার প্রভুর উপপত্নী হিসেবে থাকতে পারত। কিন্তু আইনত কোন বিয়ে মঞ্জুর করা হত না। এমন সম্পর্কের জেরে সন্তান হলে তার মালিক হত প্রভু এবং পরে সে 'মুক্ত' হয়ে যেত। তখন ওই উপপত্নীর মর্যাদা একটু বেড়ে উম্মে অলাদ (সন্তানের মা) হত, তার প্রভু-স্বামীর অন্তত তাকে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার ছিল না বা কাউকে দিয়ে দেওয়ার অধিকারও ছিল না এবং ওই দাসী মৃত্যুর পর 'মুক্ত' বলে ঘোষিত হতেন। আরবের লোকজনের সঙ্গে বিদেশিদের সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে এই দাসব্যবসা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

দাসদের মুক্তি সবসময়ই ভাল কাজ হিসেবে দেখা হত। পরকালে আল্লাহ্‌র বিশেষ পুরস্কার লাভ করবে বলা হত। মুক্তির পর দাস তার প্রাক্তন প্রভুর অনুচরের মর্যাদা পেত। প্রভু তখন তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠতেন। ওই পৃষ্ঠপোষক মারা গেলে এবং তার উত্তরাধিকারী না থাকলে তার সম্পত্তি পেত ওই দাস থেকে অনুচর হওয়া ব্যক্তি।

● মক্কা-মদীনা

ইসলামের প্রত্যুষে আল-মদীনার শান্ত জনজীবন মুসলিম সংস্পর্শে এসে হয়ে উঠেছিল চিত্তাকর্ষক। পবিত্র ধর্ম নিয়ে পাঠ নিতে আসা ভবিষ্যৎ পণ্ডিতদের কাছে মদীনা ছিল আকর্ষণীয়। আইনি এবং ধর্মীয় রীতিনীতি সংগ্রহেরও স্থান ছিল হযরত মুহাম্মাদের কবরস্থান বিশিষ্ট এই শহর। এভাবে ইসলামের হাদীস চর্চার প্রথম কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে মদীনা। আনাস ইব্ন-মালিক (মৃ. ৭০৯ এবং ৭১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) এবং আবদুল্লা ইব্ন-উমার ইব্ন আল খাত্তাব[২২] (মৃ. ৬৯৩ খ্রিঃ)-এর অধীনে মদীনা ইলমে হাদীস প্রথম একটি পদ্ধতিতে উন্নীত হয়।

মক্কার স্কুলের যেটুকু সুখ্যাতি তার কৃতিত্ব পুরোপুরি আবদুল্লাহ্ ইব্ন-আল-আব্বাসের। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদের চাচাতো ভাই এবং আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের পূর্বপুরুষ। ইসলামি শরীআর বৈধ-অবৈধ বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্য, কোরান ব্যাখ্যায় দক্ষতা, আইনশাস্ত্র এবং হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বজনীন। এই সুবাদেই তিনি

'হিব্‌র আল-উম্মা' (সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম বিজ্ঞ) উপাধি লাভ করেন। আধুনিক সমালোচকরা অবশ্য তাঁকে একাধিক 'হাদীস'-এর বিকৃতকারী বলে সমালোচনা করেন।

উমাইয়া আমলে আল-হিজাজের দুটি শহরের হাল পুরোপুরি বদলে যায়। আরবের পরিত্যক্ত রাজধানী আল-মদীনা সেইসব মানুষজনেরই বসবাসকেন্দ্র হয়ে ওঠে যাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জোয়ার-ভাটা থেকে দূরে থেকে শান্তিতে জীবন কাটাতে চান বা যুদ্ধের বিপুল সুফল যাঁরা নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করতে আগ্রহী। এছাড়া আল-হাসান এবং আল-হুসাইনকে অনুসরণ করে হঠাৎ ধনী হওয়া কিছু মানুষও সেখানকার বাসিন্দা হয়ে ওঠেন। শহরের অভ্যন্তরে বড় বড় প্রাসাদ মাথা তুলে দাঁড়ায়। এইসব প্রাসাদের লাগোয়া ছিল চাকরচাকরানি, দাসদাসীদের থাকার বাড়ি। প্রাসাদবাসীরা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতেন বলে জানা গেছে।[৫৩] মক্কা ও মদীনা আনন্দের পূজারিদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। দুই শহরেরই জীবন যত বিলাসবহুল হয়ে উঠল বাড়াবাড়িটাও তত মারাত্মক হয়ে উঠল।[৫৪] সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম তীর্থযাত্রীরা প্রতিবছর এখানে আসার ফলে অর্থ আমদানি ভালই হত। ফলে প্রাচীন মক্কা-মদীনার সঙ্গে এর অনেক ফারাক হয়ে দাঁড়াল! একবার খলিফা উমারের প্রতিনিধি আসেন আল-বাহরাইন থেকে ৫ লক্ষ দিরহাম নজরানা নিয়ে। খোদ খলিফাই এত অর্থমূল্যের নজরানা শুনে বিস্মিত হয়ে যান। যখন তাঁকে নিশ্চিত করা হয় যে, হ্যাঁ ১০০ হাজারের পাঁচ গুণ দিরহাম নজরানা মিলেছে তখন তিনি মক্কা-মদীনার লোকজনকে ডেকে ঘোষণা করেন যে, "আমরা এইমাত্র প্রচুর অর্থ নজরানা পেয়েছি। আপনারা চাইলে আমরা আপনাদের এই অর্থের ভাগ দেব। ওজন করে বা গুণে—যেকোন ভাবে এই ভাগ নিতে পারেন।[৫৫]"

এভাবে সম্পদ আমদানির গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় দুই পবিত্র শহর ক্রমেই পবিত্রতা হারাতে শুরু করে। সেগুলি ক্রমশ স্থূল আনন্দ লাভের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দুটি শহরেই ধর্মনিরপেক্ষ আরবী গান ও বাদ্যের ভালরকম চর্চা হত। মক্কায় একধরনের ক্লাবহাউস গড়ে উঠতে থাকে। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেইসব অতিথিরা, যারা তাঁদের জোব্বা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে দাবা, পাশা. অনুরূপ আরেকরকম খেলা এবং পড়াশোনা করতেন।[৫৬] এসব আল- হিজাজের অধিবাসীদের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল বলেই মনে হয়। মদীনায় পারস্য এবং বাইজানটাইন থেকে মহিলা দাসী-গায়িকা, (কিয়ান) প্রচুর সংখ্যায় চলে এলেন। পাশাপাশি প্রেমের কবিতারও কদর বেড়ে গেল। মদীনায় বাঈজীখানার (বুয়ূত আল-কিয়ান) সংখ্যা বাড়তে থাকল। জাতীয় স্তরের কবি আল-ফারাজদাকের মতো লোকজন এর পিছনে পৃষ্ঠপোষকতা করে চললেন।[৫৭] মহিলা দাসীরা গান এবং ধনবান প্রভুদের উপভোগ্য নাচও পরিবেশন করত। আসরে থাকতেন অতিথিরাও। অতিথিরা রঙ্গিন, জমকালো পোশাক পরে গদিতে বসে নেশায় মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। প্রজ্জ্বলিত ধূপের সুরভি উপভোগ করতে-করতে তাঁরা রুপোর পানপাত্রে চুমুক দিতেন সিরিয়ার রক্তাভ মদে।

একসময় মারওয়ানি আমলে মদীনার মানুষ গর্ব করতেন হুসাইনের সুন্দরী কন্যা সায়্যিদাহ[৫৮] সুকাইনার (মৃ. ৭৩৫) জন্য। তিনি ছিলেন মুসলিম আমলের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জনকারী মহিলা, আলীর নাতনি।

সুকাইনার শিক্ষা-দীক্ষা এবং সঙ্গীত-কবিতায় আগ্রহ, তাঁর রুচি-সংস্কৃতি, তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। দ্রুত তিনি সৌন্দর্য, সাহিত্য এবং ফ্যাশনের একনম্বর স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। সুরুচি ও চকিত রসবোধেও তিনি সমান পারদর্শিনী ছিলেন।[৫৯] তাঁর কৌতুকবোধ ও মজা করার প্রবণতাও উল্লেখ্য। তাঁর মোটা দাগের ব্যঙ্গ সমকালীন অভিজাত মহলেও গ্রহণীয় ছিল। একবার তিনি এক বৃদ্ধ পারসিকে এক ঝুড়ি ডিমের ওপর বসিয়ে ঠিক মুরগির মতো ডাক পাড়তে বলেন। যাতে সমাগত অতিথিগণ আনন্দ উপভোগ করেন। আরেকবার তিনি পুলিশকর্তাকে খবর পাঠান যে, একজন সিরীয়বাসী তাঁর ঘর ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছে। পুলিশকর্তা নিজে এক সহকারীকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। এসে তিনি দেখেন, তাঁর বাড়ির চাকরাণি একটা মাছি ধরে দেখাচ্ছে।[৬০] অর্থাৎ সিরীয়বাসী ওই মাছিটা তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল! এর থেকে আরেকটি সত্যও উদঘাটিত হয়। এখনকার মতোই তখন সিরিয়ায় বেশ মাছির উপদ্রব ছিল। এই মহিলার বাড়িতে তখনকার দিনের সেরা কবি এবং বিচারকদের সম্মিলন হত। রীতিমতো বৈঠকখানা ছিল সেটি। যে-কোন প্রসঙ্গে তাঁর মুখের রসালো জবাবে সবাই আকর্ষিত হতেন। পাশাপাশি তাঁর বংশমর্যাদাও ছিল বিরাট। সেই বংশমর্যাদাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আর গুরুত্ব দিতেন এবং গর্ব করতেন নিজের মেয়েকে নিয়ে। মেয়েকে তিনি গহনা দিয়ে সাজাতে এবং নিজের কেশচর্চা করতে ভালবাসতেন। তাঁর সাজসজ্জার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। এ লা সুকাইনাহ্ (তুরা সুকাইনিয়া)[৬১] এই কেশবিন্যাস পুরুষদের মধ্যেও জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নিষ্ঠাবান খলিফা দ্বিতীয় উমারের[৬২] আমলে এই ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এই দ্বিতীয় উমারেরই এক ভাই সুকাইনাকে বিবাহ করেন। তবে তাঁরা কখনও যৌনসম্পর্কে আবদ্ধ হননি বলেই জানা যায়। পরে সুকাইনা দীর্ঘকাল বা কিছুকালের জন্য যেসব স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছেন তাঁদের সংখ্যা গুনতে গেলে দু হাতের আঙুলেও শেষ হবে না।[৬৩] একাধিক উদাহরণেই স্পষ্ট যে, তিনি বিবাহের আগেই পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা অপরিহার্য মনে করতেন।

সুকাইনার এক প্রতিদ্বন্দ্বী বাস করতেন মক্কা-মদীনার বিখ্যাত গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামাবাস আল-তাঈফে। এই মহিলার নাম ছিল আয়িশা বিন্ত-তালহা। এই মহিলার সম্ভ্রান্ত সব গুণগ্রাহী তাঁকে নিয়ে অনেক কাহিনী এবং ঘটনার সাক্ষী। আয়িশার বাবা ছিলেন হযরতের একজন বিখ্যাত সাথী। তাঁর মা ছিলেন আবু বকর-এর কন্যা মুহাম্মাদের প্রিয়তমা পত্নী এবং আয়িশার ভগিনী জনগণের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির সাহায্যেই সুকাইনা অপেক্ষা অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করত। তালহার এই কন্যাটির মধ্যে, একইসঙ্গে মহান বংশধারা,

অসাধারণ সৌন্দর্য এবং গর্ব ও অহঙ্কারের সমাবেশ ঘটেছিল। কোন নারীর মধ্যে এই তিনটি গুণ আরবীয়দের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল।[৬৪] একবার আয়িশা মক্কায় তীর্থে যান। যাবার সময় তিনি মক্কার ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজক এবং সেই প্রদেশের রাজ্যপালকে বলেন, তিনি কা'বার চতুর্দিকে ইসলাম-বর্ণিত নিয়ম মেনে সাতবার প্রদক্ষিণ করবেন। যতক্ষণ না তাঁর প্রদক্ষিণ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ যেন জনসাধারণের ধর্মীয় পরিষেবা পিছিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর কথা শুনে রাজ্যপাল সেই নির্দেশই দিয়েছিলেন। অবশ্য এই নির্দেশ দেওয়ার জন্য খলিফা আব্দ-আল-মালিক এই রাজ্যপালকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন।[৬৫] আয়িশা মাত্র তিনবার বিবাহ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬৬] তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল মুসয়াব-ইব্ন-আল-জুবাইর। এই স্বামীটির সঙ্গে আয়িশার প্রতিদ্বন্দ্বী সুকাইনারও একবার বিবাহ হয়। জানা যায়, এই জুবাইর আয়েশা এবং সুকাইনাকে দশ লক্ষ দিরহাম করে যৌতুক দিয়েছিলেন।[৬৭] বোরখায় মুখ না-ঢাকা দেওয়ায় জুবাইর আয়িশার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ায় স্বভাবসিদ্ধ জবাবে আয়িশা বলেছিলেন, "আল্লাহ্ আশীর্বাদ এবং প্রশংসার প্রতীক। সেই আল্লাহ্ আমার গায়ে সুন্দরীর ছাপ মেরে দিয়েছেন। তাই আমার ইচ্ছা, আমার সৌন্দর্যের ভাগীদার জনগণও। সেই জনগণের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বীকৃতি পাক। সেজন্যই কোনভাবেই আমি আমার মুখ আবৃত করব না"।[৬৮] ❑

● টীকা ●

১ তুলনা করুন, ইব্ন-খালদুন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪, ১০, ১৫, ১৭, ১৩৪-৪১। আলফ্রেড ফন ক্রেমের-এর *Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen*, প্রথম খণ্ড (ভিয়েনা, ১৮৭৫), ১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠা।

২ ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা।

৩ ইব্ন-খালদুন, তৃতীয় খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা। ১.২৪

৪ ইয়াকুবী ; দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা। ১.১০

৫ আল কিন্দি, কিতাব-আল-উলা, আর গেস্ট সম্পাদিত (বেইরুট, ১৯০৮) ৩০০-৩০১ পৃষ্ঠা। দেখুন ইব্ন কুতাইবা-এর উয়ুন আল আখবার, প্রথম খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

৬ দিওয়ান আল-খাতিম "শিলমোহর দপ্তর"—তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫-৬। ফাখ্রি, পৃষ্ঠা ১৪৯

৭ মাসউদী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯

৮ তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৪ পৃঃ। ইব্ন-খালদুন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫, ১.১৬ (তুলনা করুন ১৯৫, ১১, ২৫-২৭) ইব্ন-আল-আসীর, পঞ্চম খণ্ড, ২৬৭, ১১. ৭-৮

৯ মাসউদী ; পঞ্চম খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ।

১০ ইব্‌ন-আল-আসীর ; পঞ্চম খণ্ড, ২২০ পৃঃ, ইয়াকুবী দ্বিতীয় খণ্ড, ৪০১ পৃঃ।

১১ ফাখ্‌রি, ১৯৭ পৃঃ, আবু-আল-ফিদা, প্রথম খণ্ড, ২২২ পৃঃ, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নীচে দেখুন পৃঃ ২৮৫

১২ আগানি, পঞ্চদশ খণ্ড, ৪৮ পৃঃ, ১.১২

১৩ ইকদ্‌, তৃতীয় খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ, নুয়ায়রি, নিহায়া, চতুর্থ খণ্ড, ৯১ পৃঃ।

১৪ মাসউদী, পঞ্চম খণ্ড, ১৫৭ পৃঃ।

১৫ খলিফাদের জীবনের বিনোদনের দিক সংক্রান্ত আমাদের অধিকাংশ তথ্যই নেওয়া হয়েছে আগানি গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থটি প্রাথমিকভাবে একটি সাহিত্য কর্ম। অন্য কিছু গ্রন্থ থেকেও সাহায্য নেওয়া হলেও তা তত সাহিত্যধর্মী বলা যায় না। আগানি, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পৃষ্ঠায় তথ্য সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে এরকম ; সৌন্দর্যে তা দর্শকদের মোহিত করবে এবং শ্রোতাদের মজা জোগাবে।

১৬ কিতাব আল-উয়ূন (১৮৬৫) ৪০-৪১ পৃঃ, তুলনা করে দেখুন : আগানি, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ।

১৭ আল নওয়াজি, হলবাত আল কুমাইত (কায়রো, ১২৯৯), ৯৮ পৃঃ।

১৮ সূরাহ্‌ ১৪ : ১৮

১৯ আগানি ; ষষ্ঠ খণ্ড, ১২৫ পৃঃ।

২০ দ্বিতীয় খণ্ড, ৭২ পৃঃ।

২১ আল-জাহিয্‌, আল-তাজ ফি আখলাক, আল-মুলুক, সম্পাদনা : আহমাদ জাকি (কায়রো, ১৯১৪) ৩২ পৃঃ।

২২ ফাখ্‌রি, ৭৬ পৃঃ।

২৩ মাসউদী, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩-১৭ পৃঃ।

২৪ ইব্‌ন-আল-জাওযী : সীরাত উমার, ৫৬ পৃঃ।

২৫ মাসউদী, পঞ্চম খণ্ড, ৪৬৬ পৃঃ।

২৬ কিতাব আল-উয়ূন (১৮৬৫), ১.৬৯ পৃঃ, ১.১২

২৭ আগানি, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৫৮-৬১ পৃঃ।

২৮ ওই ৩৬ পৃঃ। তুলনীয় ১১ খণ্ড, ৪৯ পৃঃ।

২৯ মাসউদী, পঞ্চম খণ্ড, ২৭৩-২৭৫ পৃঃ।

৩০ আগানি, চতুর্থ খণ্ড, ৭৮-৭৯ পৃঃ।

৩১ জে বি বিউরি— 'দা ইম্পিরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম ইন দা নাইন্থ সেঞ্চুরি' (লণ্ডন ১৯১১), ১২০ ও পরের পৃঃ। চার্লস দিয়েল-এর বাইজ্যান্স : গ্র্যাণ্ডুর এট ডেকাডেন্স (প্যারিস ১৯১৯), ১৫৪ পৃঃ।

৩২ অর্থাৎ একজন ফ্রাঙ্ক (জর্মন জাতির শাখা)। একসময় ইউরোপীয় মাত্র এই শব্দে পরিচিত হত। বিশেষত ক্রুশেডের যুগে.

৩৩ ইস্তাখ্রি দেখুন, ৫৯ পৃঃ। তুলনা করুন : এইচ সৌভায়েরে লিখিত 'ডেসক্রিপসন দি দামাস। ওয়ুন ইট-তাওয়ারিখ ; পার মুহাম্মাদ ইব্ন শাকির, জার্নাল এসিয়াটিক, ২ খণ্ড (১৮৯৬) ৪০০ পৃঃ।

৩৪ এইচ লামেন্স-এর 'লা সিরিয়া—প্রেসিজ হিস্টরিক (বেইরুট, ১৯২১) প্রথম খণ্ড, ১১৯-২০ পৃঃ।

৩৫ আল-ইয়াকূবী-এর 'কিতাব আল-বুলদান' (সম্পাদনা : দা গোয়েজ (লিডেন, ১৮৯২), পৃঃ ৩৩৯

৩৬ তুলনা করুন — ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ। টি. ডবলিউ আর্নল্ড-এর 'দ্য প্রিচিং অব ইসলাম', দ্বিতীয় সংস্করণ (লণ্ডন ; ১৯১৩) ৮১ পৃঃ।

৩৭ কোরান ৯ : ২৯ ; ২ : ৯৯ , ১০৩ ; ৩ : ৬২-৬৫

৩৮ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ২০৫ পৃঃ।

৩৯ আগানি, দশম খণ্ড, ৯৯ পৃঃ। এইচ লামেন্স-এব জার্নাল এশিয়াটিক ক্রমিক নং ৯, চতুর্থ খণ্ড, (১৮৯৪), ৪৩৮-৩৯ পৃঃ।

৪০ কিন্দি, ৭৩, ৮১, ৯৬, ১১৬, ১১৭ পৃঃ। মাকরিজি, খিতাত (বুলাক, ১২৭০), দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৯৭ পৃঃ।

৪১ ইব্ন-আব্দ আল-হাকাম, ১৫১-১৫২ পৃঃ ; ইব্ন-আসাকির, প্রথম খণ্ড, ১৭৮-৮০ পৃঃ ; আল-ইবশীহি আল-মুস্তাতরাফ (কায়রো, ১৩১৪), প্রথম খণ্ড, ১০০-১০১ পৃঃ।

৪২ আবু-ইউসুফ 'খারাজ' ১৫২-১৫৩ পৃঃ। ইবন-আল-জাওযী ; সীরাত উমর, ১০০ পৃঃ, ইকদ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৯-৪০ পৃঃ, ইব্ন-আল-আসীর, ৫ খণ্ড, ৪৯ পৃঃ। এ এস ট্রিটন-এর 'দ্য ক্যালিফস এ্যান্ড দেয়ার নন মুসলিম সাবজেক্টস' (অক্সফোর্ড, ১৯৩০), ৫-৩৫ পৃঃ।

৪৩ ইব্ন-খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ৩০২ পৃঃ = দ্য স্লেন, প্রথম খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ।

৪৪ আরবী 'আবদ' (বহুবচনে আবীদ), মূলত কালো। নচেৎ মামলূক, বহুবচনে মামালিক ; অর্থ-অধিগত

৪৫ আরবরা দাসদের যা বলে ডাকত সেই একই শব্দ। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৫২৫ পাতা দেখুন।

৪৬ মাক্কারি, প্রথম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ।

৪৭ ইব্ন-আল-আসীর, ৪ খণ্ড, ৪৪৮ পৃঃ।

৪৮ একই পুস্তক, চতুর্থ খণ্ড, ৪৫৪ পৃঃ।

৪৯ মাসউদী, ৪ খণ্ড, ২৫৪ পৃঃ।

৫০ আগানি, ১ খণ্ড, ৩৭ পৃঃ।

৫১ মাসউদী, ৪ খণ্ড, ৩৮৭ পৃঃ। জুবজি জায়দান : তারীখ আল তামাদ্দুন-আল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ (কায়রো, ১৯২২), ৫ খণ্ড, ২২ পরবর্তী পৃঃ।

৫২ দ্বিতীয় খলিফার বড় পুত্র। হাদীসবিদ হিসেবে তিনি ইব্ন-মালিকের চেয়েও বিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হন। আবদুল্লাহ্ ইবন-উমারের সংগৃহীত হাদীস আহমাদ ইব্ন-হাম্বলের 'মুসনাদে' রক্ষিত আছে।

৫৩ মাসউদী, ৪ খণ্ড, ২৫৪-২৫৫ পৃঃ।

৫৪ আগানি, ২১ খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ।

৫৫ ইব্‌ন-সা'দ, ৩ খণ্ড, প্রথম ভাগ, ২১৬ পৃঃ।

৫৬ আগানি, ৪ খণ্ড, ৫২ পৃঃ। হিট্টির মল ইংরেজি গ্রন্থের ৩৩৯ পাতার নীচের অংশ তুলনীয়।

৫৭ একই পুস্তক, ২১ খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ।

৫৮ 'আলী' এবং 'ফাতিমা'-র বংশধরদের জন্য 'লেডি' উপাধি মূলত সংরক্ষিত।

৫৯ আগানি, ১৪ খণ্ড, ১৬৪-৬৫ পৃঃ। ১৭ খণ্ড, ৯৭, ১০১-২ পৃঃ।

৬০ আগানি, ১৪ খণ্ড, ১৬৬ পৃঃ। ১৭ খণ্ড, ৯৪ পৃঃ।

৬১ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ৩৭৭ পৃঃ।

৬২ আগানি, ১৪ খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ।

৬৩ ওদের তালিকার সঙ্গে ইব্‌ন-সা'দ-এর তালিকা মিলিয়ে দেখুন। ৮ খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ। ইব্‌ন কুতাইবাহ, মাআরিফ, ১০১ পৃঃ। ১০৯-১০১ পৃঃ। ১১৩, ১২২, ২৮৯-৯০ পৃঃ। ইব্‌ন-খাল্লিকান ১ খণ্ড, ৩৭৭ পৃঃ। আগানি, ১৪ খণ্ড, ১৬৮-৭২ পৃঃ।

৬৪ আগানি, ১০ খণ্ড, ৬০ পৃঃ।

৬৫ একই পুস্তক, ৩ খণ্ড, ১০৩ পৃঃ।

৬৬ ইব্‌ন-সা'দ, ৮ খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ।

৬৭ আগানি, ৩ খণ্ড, ১২২ পৃঃ।

৬৮ প্রাগুক্ত, ১০ খণ্ড, ৫৪ পৃঃ।

।। অধ্যায় ২১ ।।

উমাইয়া আমলের বৌদ্ধিক জীবন

মরুভূমির কোন শিক্ষা, সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা নিয়ে আক্রমণকারীরা আসেননি। যে-ভূখণ্ড তাঁরা জয় করলেন, সেখানে এসব দিক থেকে তাঁদের দেবার কিছু ছিল না। সিরিয়ায়, মিশরে, ইরাকে এবং পারস্যে বিজেতারা দখল করা দেশের জনগণের পদতলে বসে ছাত্রের মতো শিখতে লাগলেন। সত্যিই শিক্ষার্জনে কী আগ্রহী ছাত্র ছিলেন তাঁরা!

উমাইয়া আমলের সঙ্গে জাহিলীয়া আমলের ঘনিষ্ঠতা, পারস্পরিক যুদ্ধ, মুসলিম বিশ্বের অস্থির সামাজিক, আর্থিক অবস্থা—এই সবকিছুই সেই আদিম যুগান্তে বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির বা বিকাশের সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই কাজ করেছিল। কিন্তু একইসঙ্গে তখনই জ্ঞানবৃত্তির বীজ বপন হয়, যা পরে বাগদাদের আব্বাসীয় আমলে ফুলেফলে ভরে ওঠে। পূর্ববর্তী গ্রিক, সিরীয় এবং পারসি সংস্কৃতির মধ্যেই তার মূল নিহিত ছিল সুনিশ্চিত। উমাইয়া যুগ ছিল সাধারণভাবে এমন-এক যুগ, যে সময়ে সংস্কৃতির ভ্রূণ সযত্নে, সকলের অলক্ষ্যে লালিত হচ্ছিল।

পারসি, সিরীয়, বার্বার, মিশরিয় খ্রিস্টান এবং অন্যরা যখন ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায এলেন এবং আরবদের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলেন তখনই আরববাসী এবং অন্যদের মধ্যে আগের গড়ে তোলা প্রাচীরে ফাটল ধরল। মুসলিম জাতির প্রশ্নটি পিছনে পড়ে রইল। জাত কী, সে প্রশ্ন পিছনে গিয়ে মুহাম্মাদের অনুগামীদের পরিচয় হয়ে উঠল আরববাসী হিসেবে। এরপর থেকে একজন আরববাসী মানেই এই বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হল যে তিনি ইসলামধর্ম চর্চা করেন এবং আরবী ভাষা লিখতে ও বলতে জানেন। তাঁর জাত বা বর্ণ যাই হোক না কেন। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল বিরাট। তাই আমরা যখন 'আরবীয় ওষুধ'-এর কথা বলি বা 'আরবীয় দর্শন'-এর কথা বলি বা 'আরবীয় গণিতের' কথা বলি, তার মানে কিন্তু আমরা এই অর্থ বোঝাই না যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন বা গণিত আরবী চিন্তাধারার ফসল বা এইসব বিজ্ঞানগুলি আরবের লোকেরাই বিকশিত করেছেন। বরং আরবী ভাষায় লেখা যেসব বই-এ জ্ঞানতত্ত্বের কথা রয়েছে, তা লিখেছেন তাঁরাই যাঁরা খলিফাদের আমলেই মূলত বিকশিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পারসি, সিরীয়, মিশরিয়, আরবীয়, খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান এবং তাঁরা যাঁরা গ্রিক, আরামিয়ান, ভারত পারসি কিংবা অন্যান্য সূত্র থেকে কিছু তথ্য পেয়েছেন।

● আল-বসরা ও আল-কূফা

আল-হিজাজের দুই শহর মক্কা এবং মদীনা উমাইয়া আমলে সঙ্গীত, সুর, প্রেম এবং কবিতা সৃষ্টির আবাসভূমি হয়ে দাঁড়ায়। আল-ইরাক এবং আল-বসরা[১] —এই দুই যমজ শহরও একইভাবে সমৃদ্ধ হয়। আর আল-কূফা শহর এই সময়ে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণবন্ত বুদ্ধিবৃত্তির কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

● আরবী ব্যাকরণ

আল-ইরাকের এই দুই রাজধানী সম্পর্কে আমরা আগে জেনেছিলাম যে, প্রকৃতপক্ষে শহরদুটি হিজরী সন ১৭ অব্দে (৬৩৮)[২] উমারের নির্দেশে সামরিক ছাউনি হিসেবেই গড়ে ওঠে। আলীর সাবেক রাজধানী আল-কূফা, প্রাচীন ব্যাবিলনের কাছেই মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে প্রতিবেশী লাখমিয়দের রাজধানী আল-হিরার উত্তরাধিকার হিসেবে গড়ে ওঠে কূফা। অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্য এবং অভিবাসনের সুবাদে যমজ শহরদুটি দ্রুত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং এক লক্ষ নাগরিক নিয়ে জনবহুল শহর হিসেবেই গড়ে ওঠে। আল-বসরা থেকে উমাইয়া আমলে খুরাসান শাসন করা হত। হিজরী সন ৫০ অব্দে এই শহরের জনসংখ্যা ৩ লক্ষে পৌঁছে যায়। এই শহরে ১ লক্ষ ২০ হাজার (?) খাল কাটা হয় বলে জানা যায়।[৩] পারস্যের সীমান্ত অঞ্চলে আরবীভাষা এবং ব্যাকরণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা শুরু হয়। নব্য-মুসলিমরা কোরান পড়তে চাইলে প্রথম ভাষাগত চাহিদা প্রেরণা পায়। তা ছাড়া অন্য ভাষাভাষীরা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেও আরবী ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। যেসব নব্য-মুসলিম সরকারি পদে ছিলেন এবং বিজেতাদের সঙ্গে কথোপকথন করতে চান তাদের প্রয়োজনেও এই ভাষা এবং ব্যাকরণ উন্নত করার প্রয়োজন দেখা দিল। তা ছাড়া মানুষের মুখের ভাষায় ক্রমশ সিরীয়, পারসি কিংবা অন্যান্য ভাষার শব্দ মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় তার সঙ্গে কোরানের ধ্রুপদী ভাষার পার্থক্য হয়ে যাচ্ছিল। ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহের এটাও ছিল অন্যতম কারণ।

তাই আরবী ব্যাকরণের কিংবদন্তি স্রষ্টা আবু-আল-আসওয়াদ আল-দুয়ালি (মৃ. ৬৮৮ খ্রিঃ)-এর আবির্ভাব আকস্মিক হয়নি আল-বসরায়। বিখ্যাত জীবনীকার ইব্‌ন-খাল্লিকান[৪] বলেছেন, "আলীই আল-দুয়ালিকে কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরি করে দেন। এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম অঙ্গ ছিল তিনরকম পদ : কর্তা, ক্রিয়া এবং অব্যয়। তিনিই প্রথম দুয়ালিকে এক পূর্ণাঙ্গ সূত্র রচনার কথা বলেন।" দুয়ালি তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। আরবী ব্যাকরণ এরপর থেকেই শ্লথগতিতে দীর্ঘ বিকাশের পথ ধরে এবং গ্রিক তর্কবিদ্যার প্রভাব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। আল-দুয়ালির পর এই বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন আল-খলীল ইব্‌ন-আহমাদ। তিনি ছিলেন বসরার আরেক বৈয়াকরণ। তাঁর মৃত্যু হয় ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। আল-

খলীলই প্রথম আরবী অভিধান 'কিতাব আল-আইন' লেখেন। আল-খলীল মনে করতেন, আরবী ছন্দশাস্ত্র এবং তার নিয়মকানুন তৈরিতে জীবনীকারদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁদের তৈরি ছন্দশাস্ত্রই আজও বহাল। তাঁর ছাত্র পারস্যের সিবাওয়াইহ্ (মৃ. ৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ) প্রথম আরবী ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম ছিল 'আল-কিতাব।' আরবী ভাষা নিয়ে যাবতীয় গবেষণার সূচনা কিন্তু এই গ্রন্থটি থেকেই হয়।

● ধর্মীয় বাণী এবং আইন

কোরান চর্চা এবং তার প্রসারের চিন্তা থেকেই আরবী ভাষাবিজ্ঞান এবং অভিধান রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। একইসঙ্গে মুসলিম সাহিত্যকর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ইলমে হাদীস বা হাদীসবিজ্ঞান (হাদীস আক্ষরিক অর্থে, বর্ণনা) বিকশিত হয়। শব্দার্থের দিক দিয়ে দেখলে হাদীস এমন এক ব্যাপার যা মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুগামী সাহাবাগণের কার্য ও বাণী নিয়েই গঠিত। কোরান এবং এই হাদীসই ভিত্তিস্থাপন করে ধর্মতত্ত্ব এবং ফিকাহ্ (আইন)-এর। ইসলামে আইন আইনশাস্ত্রের চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ধর্মের সঙ্গে—এই ব্যাখ্যা আধুনিক আইনজীবীরাও করেন। রোমান আইন প্রত্যক্ষভাবে অথবা তালমুদ এবং অন্য মাধ্যমের সুবাদে সন্দেহাতীতভাবে উমাইয়া আইনকে প্রভাবিত করেছিল। তবে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা এখনও নিরূপণ করা যায়নি। কার্যত সেই সময়ে, যখন তেমন কোন সাহিত্যই সৃষ্টি হয়নি আমরা কয়েকজন পুরানো আমলের মানুষ এবং বিচারকের কথাই জানতাম। এঁদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন আল-হাসান আল-বসরি এবং ইব্ন-শিহাব আল-জুহ্‌রি (মৃ. ৭৪২ খ্রিঃ)। দ্বিতীয়জন মুহাম্মাদের বংশধর ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে তার দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল না রেখে দিনরাত পড়াশোনা করে যেতেন। এরূপ দেখে তার স্ত্রী একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'হায় আল্লাহ্! আমার তিনজন সতীন থাকলেও যতটা না বিরক্ত বোধ করতাম তার চেয়েও বিরক্ত বোধ করি ওঁর বইগুলি দেখে'।[৫] হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আল-বসরির অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ তিনি এমন ৭০ জন সাহাবাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন যারা বদর-এর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইসলামের ধর্মীয় আন্দোলনের অধিকাংশই আল-বসরিকে তাদের মূল উৎস রূপে চিহ্নিত করেছেন। সুফিরা জীবনভর তাঁকে কঠোর ধর্মানুরাগের প্রভাবে প্রভাবিত বলেই মনে করতেন। আর নিষ্ঠাবান সুন্নিরা[৬] তাঁর ধর্মীয় বাণী উদ্ধৃত করতে কখনও বিরক্ত বোধ করতেন না। এমন কী মুতাজিলারাও তাঁকে তাঁদেরই একজন বলে ভাবতেন। তাই ৭২৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর শুক্রবার এই মানুষটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আল-বসরার মানুষ একযোগে যখন যোগদান করেন তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। কেউ সেদিন মসজিদে আসরের নামায পালন করতে যাননি। ইসলামি ইতিহাসে এমন ঘটনা সত্যিই বিরল।[৭]

পরিবর্তনশীল এবং সেকেলে চিন্তাভাবনার বিরোধী কূফাবাসীর আরবী ভাষাতত্ত্ব ও

মুসলিম শিক্ষাপদ্ধতিতে অবদান রয়েছে অসামান্য। তবে তা বসরাবাসীদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত ছিল না। কূফাবাসীদের মধ্যে 'শী'আহ্' এবং 'আলীপন্থি' ছিলেন অনেকে। যাইহোক বসরা এবং কূফার পণ্ডিতদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরবী ব্যাকরণ এবং সাহিত্যে দুটি স্বীকৃত ধারার সৃষ্টি করল। কূফাতে উমার ও উসমানের আমলে এক প্রখ্যাত সাহাবা ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ বাস করতেন। লালচে চুল ও রোগাটে পা-বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (মৃত আনু. ৬৫৩ খ্রিঃ)। তিনি ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮] ইব্ন-মাসউদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন কাঁপতেন, তাঁর কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরত, কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে বলে যেতেন। যাতে না কোন ভুল বলা হয়ে যায় সে সম্পর্কে সাবধান থাকতেন।[৯] কূফার হাদীসবিদদের মধ্যে আমির ইবন-শারাহীল আল-শাবি (মৃ. ৭২৮ খ্রিঃ) ছিলেন দক্ষিণ আরবের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ১৫০ জন সাহাবার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা শুনেছেন।[১০] তিনি একলাইনও লেখা না দেখে সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে এগুলি গড়গড় করে বলে যেতে পারতেন। এতৎসত্ত্বেও আধুনিক সমালোচকরা তাঁর বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। আল-শাবির ছাত্রদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন মহান আবু-হানিফা। আল-শাবি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, খলিফা আবদ-আল-মালিক এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে কনস্ট্যান্টিনোপলের বাইজানটাইন সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

আব্বাসীয় আমলে, আল-ইরাকের দুই যমজ শহরেই বুদ্ধিজীবীদের কৃতিত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে। পরে আরও বিকাশের ক্ষেত্রে ইরাকের হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র এবং আইনশাস্ত্রের ধারা রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। আল-হিজাজের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা ছিল।

● ইতিহাস রচনা

আরবী ইতিহাস রচনাও এই সময়েই শুরু হয়। তা গোড়ায় হাদীস-এর আঙ্গিকে লেখা হয়। আরব মুসলমানদের দ্বারা চর্চিত এটা হচ্ছে অন্যতম এক প্রাচীনধারা। প্রাথমিক পর্বের খলিফারা আগের ক্ষমতাসীন রাজা এবং শাসকদের আচরণ সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করেছিলেন। মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গীদের পুরানো কাহিনীও সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিলেন। এইসব কাহিনীর ভিত্তিতেই পরে জীবনীগ্রন্থ (সীরাহ) এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বিজয়কাহিনী (মাগাজি) লেখা হয়। সরকারি কোষাগার থেকে কত করে আনুতোষিক পেতেন তা জানতে প্রতিটি আরব মুসলমানের বংশসংক্রান্ত সম্পর্ক নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা, আরবী কবিতার ব্যাখ্যায় উত্তরণ এবং ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা স্থান ও মানুষজনের অনুসন্ধান করে তাদের চিহ্নিতকরণ, আরব জাত্যাভিমানের মোকাবিলা করতে আরবের জনগণের পুরানো জাতপাতের কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ—এসবই

ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রেরণা দিয়েছে। প্রাচীন আমলের বিখ্যাত গল্পকথকদের মধ্যে ছিলেন প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে উন্নীত দক্ষিণ আরবের আবিদ (উবাইদ) ইব্‌ন-শরিয়া। তিনি মু'আবিয়ার আমন্ত্রণে দামাস্কাসে গিয়ে তদানীন্তন আরব্য বংশের প্রাচীন সব রাজাদের বংশবৃত্তান্ত[১১] শুনিয়েছিলেন। এইসব রাজ পৃষ্ঠপোষকদের জন্য তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এমন এক গ্রন্থের নাম 'কিতাব আল-মুলূক ওয়া-আখবার আল-মাদ্‌ইন' (রাজাদের গ্রন্থ এবং প্রাচীন কালের ইতিহাস)। ঐতিহাসিক আল মাসউদীর[১২] (মৃ. ৯৫৬ খ্রিঃ) আমল পর্যন্ত এই গ্রন্থের বিরাট প্রচার ছিল। 'সায়েন্স অব অরিজিন্‌স' (ইলম্‌-আল-আওয়াইল)-গ্রন্থের লেখক ওয়াহব-ইবন-মুনাব্বিহ্‌ (৭২৮ খ্রিঃ নাগাদ সানআতে মৃত্যু হয়)। তিনি ছিলেন পারসি বংশজাত ইয়ামানের এক ইহুদি। তিনি সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থ হালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৩] ওয়াহ্‌ব-এর কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা গুরুতর প্রশ্নের সামনেও অমীমাংসিত। এই ওয়াহবের লেখাপত্রই প্রাক্‌-ইসলামি দক্ষিণ আরব এবং বিদেশি রাষ্ট্রের[১৪] সম্পর্কে তথ্য, বলা ভাল ভুল তথ্যের অন্যতম মূল উপাদান হয়ে ওঠে। অনুরূপ আর একজন ছিলেন কা'ব আল-আহবার (ইহুদি আইনজ্ঞদের 'কা'ব', ৬৫২ বা ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হিমসে মৃত্যু হয়)। তিনি ছিলেন ইয়ামানের এক ইহুদি। প্রথম দুই খলিফার কোন একজনের আমলে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। মু'আবিয়ার রাজসভায় তাঁর ভূমিকা ছিল শিক্ষক এবং উপদেষ্টার। তখন মু'আবিয়া সিরিয়ার রাজ্যপাল।[১৫] এভাবে কা'ব ইহুদি-মুসলিম ঐতিহ্যের প্রাচীন কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিভাত হন। কা'ব, ইব্‌ন-মুনাব্বিহ্‌ এবং অন্য ইহুদিরা কাহিনীকে ইসলামি ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর আরবী ঐতিহাসিক লোককাহিনীর সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেন।

উমাইয়া আমলে আমরা এমন বহু ধর্মীয়-দার্শনিক আন্দোলনকে চিহ্নিত করতে পারি, যা পরে ইসলামের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে আল-বসরায় ওয়াসিল ইবন-আতা (মৃ. ৭৪৮) নামে একজন বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদের এক বিখ্যাত ধারার প্রতিষ্ঠাতা, যে ধারাকে বলা হত 'মুতাজিলা'। তাদেরকে 'মুতাজিলা' বলার কারণ হল, এই মতবাদের প্রধান কথা ছিল, যিনি কোন সাংঘাতিক পাপ (কবীরা) করেন তিনি আর মুমিন (বিশ্বাসী) থাকেন না। কিন্তু তিনি ধর্মবিরোধীও হন না। বরং তিনি ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মবিরোধীর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করেন।[১৬] ওয়াসিল ছিলেন আল-হাসান আল-বসরি-র ছাত্র। একসময় এই ওয়াসিল 'মুক্তমন'-এর তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই তত্ত্বই 'মুতাজিলা' মতবাদের মৌলিক উৎস। এক সময়ে 'কাদারিয়া' নামে সংঘবদ্ধ একদল লোক এই 'মুক্তমন' নিয়ে মাথাচাড়া দেয়। 'কাদার'-এর অর্থ ক্ষমতা। সেই থেকেই 'কাদার'। 'জাবরিয়া'-দের সঙ্গে এদের ছিল সাপে-নেউলে সম্পর্ক। জাবর অর্থাৎ বাধ্যবাধকতা।[১৭] তাঁরা মুক্তমন বা স্বাধীন ইচ্ছার ঠিক বিপক্ষে ছিলেন। কাদারিয়ারা ইসলামের কঠোর নিয়তিবাদের বিপক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ ইসলামে যা আগেই ঠিক করা রয়েছে সেই অনুযায়ীই চলতে হবে—এ কথা ওঁরা

মানতেন না। কোরানে যে আল্লাহ্র সর্বশক্তিমান্যতার ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর বিপক্ষ মতপোষণ করতেন তাঁরা।[১৮] তাঁরা খ্রিস্টান-গ্রিক প্রভাবকেও পরিত্যাগ করতে চান। কাদারিয়ারাই ছিলেন ইসলামি দর্শনের আদিম প্রতিষ্ঠান এবং তাঁদের মতবাদ যে কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, উমাইয়া সাম্রাজ্যের দুই খলিফা দ্বিতীয় মু'আবিয়া এবং তৃতীয় ইয়াজিদ ছিলেন কাদারিয়া।[১৯]

'মুক্তমন' তত্ত্বের সঙ্গে 'মুতাজিলা' মতবাদে বলা হত, স্বর্গীয় গুণ এর সঙ্গে আল্লাহ্র সহাবস্থান মানা যায় না। যেমন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, জীবন ইত্যাদি স্বর্গীয় গুণ। তাঁরা বলেছেন, এসবের সঙ্গে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ আল্লাহ্র একত্বকে ধ্বংস করা। 'মুতাজিলা' মতবাদীদের প্রিয় সংজ্ঞা ছিল : 'ন্যায় এবং ঐক্যের জন্য পৃথক ব্যক্তি'। যুক্তিবাদী আন্দোলন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিশেষত আব্বাসীয় আমলের আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩)-এর আমলে প্রচণ্ড গুরুত্ব পায়। এই নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। বুদ্ধিগতভাবে বাগদাদের উত্থান ঘটল যখন আল-বসরা এবং আল-কূফার জমানা ফুরিয়ে এল।

● দামাস্কাসের সেন্ট জন

যে মুখ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে সমকালীন সময়ে খ্রিস্টান লোককাহিনী এবং গ্রিক চিন্তাভাবনা ইসলামের সংস্পর্শে আসে তিনি হলেন দামাস্কাসের সেন্ট জন (জোয়ানেস দ মাস্কেনাস)। তাঁর পদবি ছিল ক্রাইসোরোয়াস (সোনালিভাষী)। আগে যিনি সেন্ট জন নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর পদবি ছিল ক্রাইসোসটোম। তিনি ছিলেন অ্যান্টিয়োকবাসী। যদিও সেন্ট জন গ্রিক ভাষায় লেখালিখি করতেন তথাপি তিনি গ্রিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সিরীয়। কথা বলতেন সিরীয় বা 'আরাম' ভাষায়। এছাড়া আরবী ভাষাও জানতেন। তাঁর পিতামহ মনসূর ইব্ন-সরজূন ছিলেন একজন অর্থদপ্তরের প্রশাসক। আরবরা যখন দামাস্কাস জয় করে তখন তিনি দামাস্কাসে এই পদে বৃত ছিলেন। তিনিও তখন শহর সমর্পণের ব্যাপারে বিশপের মতো নিস্পৃহ থাকেন। তাই মুসলিমরা ক্ষমতাসীন হয়েও তাঁকে সরাননি! তাঁর অবসরের পরই জনের পিতা ওই পদে বসেন। তখন জন একজন যুবক। তিনি আল-আখতালের মদের আসরে সময় কাটাতেন। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের মদের আসরেও জন যেতেন। পরবর্তীকালে জন পিতার মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে চাকরি করেন বহুকাল। তাঁর যখন ৩০ বছর বয়স তখন জন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে জেরুসালেমের কাছে এক মঠে (সেন্ট সাবা) ধর্মচর্চা করে জীবন কাটানোর সংকল্প নেন। সেখানেই ৭৪৮ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়। সেন্ট জনের রচনার মধ্যে অন্যতম হল একজন স্যারাসেনের সঙ্গে সংলাপ। খ্রিস্টিয় মতবাদ অনুযায়ী যীশুর ঈশ্বরত্ব ও মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কথোপকথন এতে বিধৃত। এটি খ্রিস্টানদের পক্ষে মুসলিম বিরোধিতার পথপ্রদর্শক সারগ্রন্থ। জন সম্ভবত মুসলিম খলিফাদের উপস্থিতিতে এমন বহু বিতর্কে অংশগ্রহণ

করেন। কাদরিয়া ধারার সূচনার পিছনে তাঁর প্রভাব অনুসন্ধান করা খুব কঠিন নয়। সেন্ট জনের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত কঠোর সাধক বারলাম এবং হিন্দু যুবরাজ যোসাফতের কাহিনী। সম্ভবত মধ্যযুগের অতিবিখ্যাত ধর্মীয় রোমান্স জড়িত এই কাহিনীকে ঘিরে। আধুনিক সমালোচকরা মনে করেন, বুদ্ধর জীবনকাহিনীর খ্রিস্টান সংস্করণ হল এই কাহিনী। অর্থাৎ ওই যোসাফতই হলেন বুদ্ধ। কেউবা 'আয়োসাফ' নামেও ডাকেন। যতই অদ্ভুত হোক না কেন, লাতিন এবং গ্রিক গির্জায় এই মাহাত্ম্য দান করা হয়েছে। এভাবে বুদ্ধ দু'দুবার খ্রিস্টান মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। বারলাম এবং যোসাফতের মধ্যযুগীয় কাহিনী লাতিন, গ্রিক এবং জর্জিয়ান ভাষার হাত ধরে আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। অবশ্য বারলাম এবং যোসাফতের কাহিনীও পাহলবী ভাষা থেকে অনূদিত হয়ে আসে। তা করা হয় সেন্ট জনের জীবদ্দশায়।[২০] ফিহ্‌রিস্ত-এ[২১] 'কিতাব আল-বুদ্‌দ' (বুদ্ধের বই) এবং 'কিতাব বূদাসফ'-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। দামাস্কাসের জনকে প্রাচ্যের গ্রিক গির্জার মহান ও শেষ ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে গণ্য করা হয়। পাদ্রী সাহিত্যে সেসব স্তোত্র তিনি রচনা করেছেন (এর কিছু এখনও প্রোটেস্ট্যান্টরা ব্যবহার করেন) তা খ্রিস্টান গির্জার কবিরা সেরা সৌন্দর্যের প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। একজন স্তোত্র-রচয়িতা হিসেবে, একজন ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে, একজন সুবক্তা হিসেবে, একজন যুক্তিবাদী লেখক হিসেবে, বাইজানটাইন সঙ্গীতের জনক হিসেবে এবং বাইজানটাইন শিল্পের লিপিবদ্ধকারী হিসেবে তিনি খলিফা আমলের গির্জাগুলির রত্নস্বরূপ ছিলেন।

● খারিজী

ইসলামের একেবারে গোড়ার দিকে দর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন কাদারিয়ারাই। কিন্তু খারিজীরা ছিলেন একেবারে গোড়ার ধর্মীয় রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়। আলীর এই দুই ঘোর বিরোধী গোষ্ঠীই একসময় তাঁর সমর্থক ছিলেন। কুরায়শদের এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছিল যে, খলিফা তাঁদেরই কেউ হবেন। এই মর্যাদা দানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেন কাদারিয়া এবং খারিজীরা।[২২] ইসলামের প্রাচীন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় গোঁড়াপন্থি খারিজীরা মুসলিম শাসনের প্রথম তিন শতকে ব্যাপক খুনোখুনির কারণ হয়। পরে তাঁরাই সাধু পুরুষদের মতবাদ সহ্য করতে পারলেন না। আর সুফি ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ নিষিদ্ধ করলেন সমাজে। এখন তাঁরা ইবাদি (কেউ বলেন, আবাদীয়) গোষ্ঠী নামে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে টিকে রয়েছেন। প্রথম মুসলিম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খারিজী সম্প্রদায়ের প্রশাখার প্রতিষ্ঠাতা অতীব সহ্যশীল ইবন-ইবাদ[২২] এর নাম অনুসারেই এই নাম হয়েছে। পরে তাঁরা আলজিরিয়া, ত্রিপোলিতানিয়া এবং উমানে ছড়িয়ে পড়েন। পরে ওখান থেকে সীমান্ত পার হয়ে জানজিবার চলে যান।

● মুরজিয়া

উমাইয়া যুগে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও আরেক যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়েছিল তার নাম 'মুরজিয়া'। এদের মৌলিক বিশ্বাস নিহিত ছিল সেইসব ধর্মপ্রাণদের বিরুদ্ধে যাঁরা

পাপ করেছেন এবং নিজেদের অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেননি।[২৪] আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, মুরজিয়ারা উমাইয়া খলিফাদের হাতে ধর্মীয় আইন দমিত হওয়া দেখতে চাইতেন না। তা ছাড়া ইসলামের প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁদের যোগ্য সম্মান যে খলিফারা দেননি, তাও তাঁরা মনে করতেন। মুরজিয়া মতবাদের সমর্থকদের কাছে উমাইয়ারা যে নামমাত্র মুসলমান ছিল, এই সত্যটিই যথেষ্ট ছিল। উসমান এবং আলী এবং মু'আবিয়া— সবাইকেই তাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দা বলে মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই তাঁদের বিচার করতে পারেন।

সাধারণভাবে মুরজিয়ারা সহনশীলতার পক্ষেই ছিলেন। এই মধ্যপন্থি ধারার আধুনিক শাখার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন আবু-হানিফা (মৃ ৭৬৭), যিনি ইসলামের চার রক্ষণশীল মাযহাবের মধ্যে ফিকাহ্ বা আইন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

● শী'আহ্

খিলাফতের প্রশ্নে গোড়ায় ইসলামে যে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার অন্যতম ছিল শী'আহ্‌গোষ্ঠী। উমাইয়া আমলেই এরা দৃঢ়ভিত্তি পায়। তখন থেকেই নেতৃত্ব ইমাম পদ নিয়ে শী'আহ্ এবং সুন্নি গোষ্ঠীতে বিরোধের সূত্রপাত হয়, যা আজও বিদ্যমান। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আলী এবং তাঁর পুত্ররাই প্রকৃত ইমাম এবং তা রোম্যান ক্যাথলিক গির্জার যাজক হিসেবে পিটার এবং তাঁর উত্তরসূরিদের ধারাবাহিকতার মতোই। এই বিষয়টাই আজও উভয় গোষ্ঠীর বিরোধের অন্যতম হেতু। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে প্রতিনিধি-স্থানীয় করেছেন প্রত্যাদিষ্ট কোরানকে। শী'আহ্ গোষ্ঠী এই মধ্যস্থতা করতে একজন ব্যক্তিকে বেছেছেন। তিনি হলেন ইমাম।[২৫] 'আমি আল্লাহ্‌কে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করি' এবং 'আমি সেই কোরানের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করি যা শাশ্বত সত্তার শাশ্বত বাণী'— এই দুই আপ্তবাক্যের সঙ্গে তারা এখন এক নতুন বিশ্বাসের কথা যোগ করেছেন। তা হল : "আমি বিশ্বাস করি যে, ইমামই আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বর্গীয় সত্তার এক অংশ হিসেবে আমাদের মুক্তির পথে চালিত করতে পারেন।"

তাঁরা মনে করেন, অপবিত্র বলপ্রয়োগের ধ্যানধারণার ধর্মীয় বিরোধী হিসেবেই ইমাম পদটির সৃষ্টি হয়। সুন্নি মতের[২৬] বিরোধিতা করে শী'আহ্‌তত্ত্বে বলা হয়, মুসলিম সমাজের একমাত্র বৈধ প্রধান হলেন ইমাম, যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক এই পদে অধিষ্ঠিত। ফাতিমা এবং আলীর মাধ্যমে তিনিই হচ্ছেন মুহাম্মাদের বংশগত উত্তরাধিকারী। তিনি ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব-বিষয়ক নেতা। পূর্বসূরিদের থেকে এক রহস্যময় ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়ে থাকেন।[২৭] এককথায় তিনি যেকোন মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্পাপ (ইসমাহ)।[২৮] শী'আদের মধ্যকার উগ্ররা আবার এককাঠি এগিয়ে স্বর্গীয় সত্তা এবং দীপ্তিমান অন্তর্বস্তুর নিরিখে ইমামকে সাক্ষাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি হিসেবেই মনে করেন। [illegible]দের মতে, আলী

এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ইমামরা ধারাবাহিকভাবে মানুষরূপে জন্ম নিয়ে এক স্বর্গীয় প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। আরেক উগ্র শী'আগোষ্ঠী আবার মনে করেন যে, গ্যাব্রিয়েল ভুল করে আলীর জায়গায় মুহাম্মাদকে বেছে নিয়েছেন।[৩০] অর্থাৎ আলীই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এইসব মনোভাবের জন্যই শী'আহ্ গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনার ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান সুন্নি গোষ্ঠীর।

শী'আহ্ সম্প্রদায় জন্মগতভাবে এবং বিবর্তনের দিক দিয়ে কতটা পারসি ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কতটা তাঁরা ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্যের অনুসারী, তা নিরূপণ করা কঠিন। পরবর্তীকালে যে মাহ্‌দী চিন্তাভাবনা মাথাচাড়া দেয়, যার মধ্যে তাঁরা এক ত্রাতা-নেতার আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন, যে-নেতা স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির এক নতুন দিগন্ত স্থাপন করবেন—তা নিঃসন্দেহে খ্রিস্টানদের যীশুর আগমন প্রতীক্ষা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মতের প্রতিফলন। আবদুল্লাহ্ ইবন-সাবা নামে এক রহস্যজনক ব্যক্তি উসমানের আমলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আসলে তিনি ছিলেন ইয়ামানবাসী ইহুদি। তিনি আলীকে অত্যাধিক শ্রদ্ধা দেখিয়ে বিব্রত করে তোলার পর অবশেষে একদা উগ্র শী'আহ্ মতবাদের জনক হয়ে ওঠেন।[৩১] ইমাম সংক্রান্ত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার নেপথ্যে নিঃসন্দেহে খ্রিস্টান-রহস্যবাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ইসলাম অধ্যুষিত সমগ্র দেশের মধ্যে ইরাকেই আলীর মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার উর্বর জমি পেল। আর ছড়ালো আজকের পারস্যে দেড়কোটি শী'আহ্ সমর্থক সম্প্রদায়।[৩২] এই গোষ্ঠীর মধ্যেই অগুনতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী মাথাচাড়া দিল। 'মুহাম্মাদের বংশের' (আহল আল-বাইত অর্থাৎ আলী এবং তাঁর বংশধররা) বিভিন্ন সদস্যরা নানারকম আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সমস্যা ও গির্জা বিরোধিতা, রাজনৈতিক অসন্তোষের স্বাভাবিক কেন্দ্র হয়ে উঠলেন। ইসলামের জন্মের প্রথম শতকে যে প্রচলিত ধর্মবিরোধিতা মাথাচাড়া দেয়, তার বেশিরভাগই ছিল আরবদেশের বিজেতাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ক্রমান্বয়ে এই ধর্ম বিরোধিতাই শী'আহ্ মতবাদের জন্ম দেয়। প্রচলিত সময় ধর্মমতের বিরোধিতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ধর্মমত। ইসমাইলপন্থিরা, কারমাতিয়া, দ্রুজপন্থিরা, নুসাইরিপন্থিরা এবং সমমতাবলম্বীরা (যাদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা কবব) সবাই কিন্তু শী'আহ্ গোষ্ঠীরই শাখাপ্রশাখা।

● ভাষণ

উমাইয়া আমলে যেভাবে বিভিন্ন ধরনের ভাষণদানের ব্যবস্থা চালু করা হয় তা আগে কখনও ছিল না। ওই সময় এই ভাষণ-প্রদান-ব্যবস্থার যে অগ্রগতি হয়, আর কখনও তাকে পরিধিকে পরবর্তীকালে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। শুক্রবারের নামাযে 'খতিব' একপ্রকার ধর্মীয় যন্ত্র হিসেবে ভাষণকে ব্যবহার করতেন। সামরিক প্রধান এটাকে সৈন্যদের মধ্যে জঙ্গি মনোবল বাড়ানোর মাধ্যম বলে মনে করতেন। আর প্রাদেশিক রাজ্যপাল প্রজাদের মধ্যে দেশপ্রেম

জাগ্রত করার মাধ্যম মনে করতেন একে। সেসময় প্রচারের অন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করার সুযোগই ছিল না। সেইযুগে ভাষণদানই কোন মতামত প্রসার এবং আবেগ ছড়ানোর দুর্দান্ত মাধ্যম হয়ে ওঠে। আলী তাঁর ছন্দোমিল স্তোত্র এবং জ্ঞানগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে সকলকে মোহিত করে দিতেন। আল-হাসান আল-বসরি (মৃ. ৭২৮) নৈতিক ভাষণ দিতেন খলিফা উমার ইবন-আবদ-আল-আযীযের উপস্থিতিতে। তা আযীযের জীবনীকার[৫১] লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এছাড়া জিয়াদ ইবন-আবিহ্ এবং আল-হাজ্জাজের অগ্নিগর্ভ দেশপ্রেমের ভাষণও ছিল মনে রাখার মতো। এইসব ভাষণই সেই প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম সাহিত্যের অমূল্য উপাদান হিসেবে আমাদের কাছে বিদ্যমান।[৫২]

● চিঠিপত্র

নিষ্ঠাবান খলিফাদের আমলে রাজনৈতিক চিঠিপত্র যেসব আদানপ্রদান হত তা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। ফলে কয়েক লাইনের বেশি কোন সরকারি নোটই হত না।[৫৩] আবদ-আল-হামীদ আল-কাতিব (অর্থাৎ লেখক, মৃ. ৭৫০) ছিলেন উমাইয়া আমলের শেষের দিককার খলিফাদের সচিব। ইব্ন-খাল্লিকানে[৫৪] তাঁর যে গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, তিনিই প্রথম সুসজ্জিত এবং সুপরিকল্পিত আঙ্গিকে চিঠিপত্র লেখা চালু করেন। তাতে পারসি প্রভাব একেবারেই ছিল না। সহজবোধ্য শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে তিনি চিঠি লেখা চালু করেন। এই আঙ্গিকই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সচিবদের কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়াল। আরবী ভাষায় এক বহুল প্রচলিত জনশ্রুতিতে বলা হয়, 'আবদ-আল-হামীদের সময় চিঠিপত্র লেখায় যে-শৈলীর (ইন্শা) সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় ইবন আল-আমিদের আমলে।'[৫৫] বহু গুণীর বচন এবং প্রবাদে পারসি সাহিত্যের প্রভাব চিহ্নিত করা যায়। আলী তাঁর লেফটেন্যান্ট আল-আহনাফ (বক্রপদ বিশিষ্ট)[৫৬], ইবন-কায়েস (৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের পর মৃ.) এবং প্রাক-ইসলামি যুগের খ্যাতিমান পুরুষ আক্তাম ইব্ন-সঈফিকে উদ্দেশ্য করে এইসব প্রবাদ বাক্য বলেছিলেন। এঁদের একজনের উপাধি ছিল 'আরবদের জ্ঞানীপুরুষ' (হাকীম)।[৫৭]

● কবিতা

উমাইয়াদের আমলে যে মহত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি অর্জিত হয় তা অবশ্যই হয়েছিল কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে। ইসলামের জন্ম যে অন্তত গ্রিক কাব্যদেবীদের প্রধানের পছন্দসই ছিল না তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকেই যে, ইসলামের বিজয় এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে অনুপ্রেরণা পেয়ে 'কবির জাতি' একটিও কবিতা লেখেননি। উমাইয়া সাম্রাজ্যের পত্তন হতে আবার মদ্যদেবী, সঙ্গীতদেবী এবং কাব্যদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। সেইসময়ই প্রথম আরবী ভাষার রোমান্টিক কবিরা প্রবলরূপে আবির্ভূত হয়। প্রাক-ইসলামি যুগের বহু চারণকবি তাদের সুদীর্ঘ কবিতার (কাসিদাহ্) মুখবন্ধ হিসেবে প্রেমমূলক কিছু পঙ্ক্তি লেখেন। তাঁদের

কেউই প্রেমের কবিতায় (গজল) বিশেষত্ব অর্জন করতে পারেননি। এইসব প্রাচীন কাসীদা-র প্রণয়ঘটিত সুর (নাসিব) থেকে আরবী গীতিকবিতা জন্ম নেয়। এর পিছনে পারসি গায়কদের প্রভাব ছিল অসামান্য।

এর মধ্যে উপদ্বীপের ধারাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উমার ইবন-আবি-রবীআহ্[৪০] (মৃ. ৭১৯)। প্রেমের কবিতার এই যুবরাজকে বিখ্যাত লাতিন কবির নামে 'আরবের ওভিদ' বলে অভিহিত করা হত। তিনি ছিলেন একজন কুরায়শপন্থি, যাদের অধার্মিক ও স্বেচ্ছাচারী বলে মনে করা হত।[৪১] এই কবির কাজই ছিল মক্কা এবং মদীনায় তীর্থ করতে আসা সুন্দরীদের সঙ্গে প্রেম করা। পাশাপাশি বিখ্যাত সুকাইনা-র[৪২] মতো সেখানকার সুন্দরী অধিবাসীদেরও প্রেম নিবেদন করতেন তিনি। প্রচণ্ড ভাবাবেগ এবং স্বর্গসুখের ভাষায় তিনি তাঁর অনুভূতিকে শুদ্ধ যৌনতার প্রতি অবিস্মরণীয় করে তুলতেন। প্রাচীন কবি ইমরু-আল-কায়িসের নিছক ভাবাবেগপূর্ণ প্রেমের কবিতার ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান ছিল তাঁর। তা ছাড়া পরবর্তী যুগে একঘেয়ে আবেগের কবিতার থেকেও তাঁর কবিতা ছিল স্বতন্ত্র।[৪৩]

উমার যদি কবিতায় মুক্ত প্রেমের কথা বলে থাকেন, তাঁর সমসাময়িক জামীল (মৃ. ৭০১) বলে গেছেন নিষ্কাম, নিরীহ প্রেমের কথা। জামিল থাকতেন আল-হিজাজে। সেখানকার ইয়ামান বংশোদ্ভুত এক খ্রিস্টান উপজাতি 'বানু উয্‌রা'-র একজন ছিলেন তিনি। জামীলের বেশিরভাগ কবিতাই একই উপজাতি গোষ্ঠীর বুতাইনাকে নিবেদন করে লেখা।[৪৪] তাঁর কবিতায় যে সূক্ষ্ম অনুভূতি পাওয়া যায় তা সমকালে ছিল বিরল। কবিতাগুলির নান্দনিক মূল্য এবং সহজ ভাষার জন্য বহু আরবী গায়ক তা গানে ব্যবহার করতে লাগলেন। জামীল আল উয্‌রির মতো মজনূন লায়লা[৪৫] ছিলেন তখনকার নামকরা কবি। তাঁর আসল নাম ছিল কায়েস ইবন-আল-মুলাওঅহ্।[৪৬] তিনি গীতিকবিতা বেশি লিখেছেন। প্রায় কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া এই কবি একটা সময়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে যান, তখন তার নামের সঙ্গে 'মজনূন' শব্দটি যুক্ত হয়। তাদের উপজাতি জনগোষ্ঠীরই লায়লা নামে এক যুবতীর প্রেমে পড়েন তিনি। দুজনেই পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু বাবার কথা রাখতে লায়লা অন্য এক যুবককে বিয়ে করেন। এরপর কায়েস হতাশার প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে নজদ-এর পাহাড়ে, বনে-বনে ঘুরে বেড়াতেন। আর লায়লার প্রতি প্রেম নিবেদন করে গান গাইতেন। তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিয়ে করে পরবাসে চলে যাওয়া লায়লাকে একবার চোখের দেখা। তখন 'লায়লা' নামটি শুনলেই সে সম্বিত ফিরে পেত। নয়তো সারাক্ষণ থাকত ঘোরে।[৪৭] এভাবে 'মজনূন লায়লা' আরব, পারস্যও তুরস্কের রোমান্সের প্রতীক হয়ে যান। অবশ্য জামীল এবং মজনূনের নামে যেসব কবিতা এখনও প্রচলিত রয়েছে তার অনেকগুলিই ওদের লেখা নয়। সেগুলি প্রচলিত লোককবিতা।

প্রেমের কবিতা ছাড়াও রাজনৈতিক কবিতাও লেখা হয় উমাইয়া রাজত্বে। কার্যত রাজ অনুগ্রহেই এসব লেখা হত। প্রথমবার ইয়াজিদ যখন খলিফার আসনে বসলেন তখন তার

গুণকীর্তন করে কবিতা লিখতে বলা মিসকীন আল-দারিমিকে। তা প্রকাশ্যে পাঠ করতে হয়।[৬৮] এই সময়েই প্রাচীন প্রাক-ইসলামি কবিতাগুলিকে একত্রে গ্রথিত করার প্রথম প্রচেষ্টা হয়। এই দায়িত্ব নেন হাম্মাদ আলী-রাবিয়া (অর্থাৎ—বর্ণনাকারী, ৭১৩-৭২)।[৬৯] হাম্মাদের জন্ম হয় কূফায়। এক পারসি যুদ্ধবন্দির (দাইলামি)[৭০] সন্তান ছিলেন তিনি। তিনি কথা বলতেন আরবীতে। আরবের ইতিহাসে যেসব ব্যক্তি পুরানো ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি মনে রাখায় বিখ্যাত, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। দ্বিতীয় ওয়ালীদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একা জাহিলীয়া কবিতা মুখস্থ শোনান তাঁকে। সেই কবিতাগুলি বর্ণানুক্রমিক ছন্দবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক অক্ষরে একশত পৃথক গীতিকবিতা শুনিয়েছিলেন নিজে এবং অন্যের মাধ্যমে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালীদকে শুনিয়েছিলেন। প্রায় ২৯০০ 'কাসীদা' শোনাবার পর রাজা খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি হাম্মাদকে ১ লক্ষ দিরহাম দান করার নির্দেশ দেন।[৭১] নিঃসন্দেহে হাম্মাদের বড় কৃতিত্ব ছিল, বিখ্যাত 'সোনালি গীতিকবিতা' সংকলিত করা, যার অন্য নাম ছিল মুয়াল্লাকাত।

উমাইয়া আমলে প্রাদেশিক কবিতা ধারার নেতৃত্ব দেন আল-ফারাজদক (৬৪০-৭২৮) এবং জারীর (মৃ. প্রায় ৭২৯)। আর রাজধানীতে শীর্ষস্থানে ছিলেন আল-আখতাল (প্রায় ৬৪০-৭১০)। এই তিন কবিই ইরাকে জন্মান এবং বড় হন। এরা যেমন ছিলেন বিদ্রূপাত্মক কবিতায় পারদর্শী, তেমনই প্রশংসাকারী কবিতায় পারঙ্গম। কবি হিসেবে তিনজনই ছিলেন প্রথম সারির। আরবীয় সমালোচকরা সমকালীন যুগে তাঁদের সমান নামী কোন কবিকে খুঁজে পাননি। আল-আখতাল জাতে ছিলেন খ্রিস্টান। অথচ ধর্মীয় দলের বিরুদ্ধে উমাইয়াদের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।[৭২] আল-ফারাজদক ছিলেন অসৎচরিত্রের। তিনি ছিলেন আবদ-আল-মালিক এবং তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদ, সুলাইমান[৭৩] এবং ইয়াজিদের রাজকবি। জারীর ছিলেন সেযুগের সেরা বিদ্রূপাত্মক কবি ও আল-হাজ্জাজের সভাকবি।[৭৪] এখন যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তাঁবেদার লেখকশিল্পীরা তাদের সাধ্যমতো গল্প কবিতা লেখেন, ওঁরাও তখন রাজা-আমলাদের নির্দেশে গল্প-কবিতা রচনা করতেন। আল-ফারাজদক[৭৫] এবং জারীর প্রায়ই কুৎসিত এবং উগ্র ভাষায় নিজেদের পরস্পর আক্রমণ করতেন। আল-আখতাল নিয়মমাফিক ফারাজদকের পক্ষ নিতেন। অর্থাৎ তখনও কবিশিল্পীদের গোষ্ঠী ছিল। মদ্যপ এবং অসৎচরিত্রের আখতালের হৃদয়ে খ্রিস্টধর্মের স্থান কোনস্থানে, তা তিনি এক লেখায় লিখেছিলেন। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিবেদিত সান্ত্বনাবাক্যে আখতাল লিখেছিলেন, একবার আমি রাস্তা দিয়ে গাধার পিঠে বসে যাওয়া এক বিশপের পোশাকটুকু শুধু স্পর্শ করতে দৌড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিশপের পোশাক না ছুঁয়ে শেষমেশ তার গাধার লেজটা ছুঁতে পেরেছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল, বিশপ এবং তাঁর গাধার লেজে কোন পার্থক্য নেই।[৭৬]

● শিক্ষা

সেসময় সাবেক আমলের শিক্ষাপদ্ধতি সচরাচর প্রচলিত ছিল না। উমাইয়া সাম্রাজ্যের সাবেক যুবরাজদের সিরিয়ার মরুঅঞ্চল 'বাদিয়া'-তে এক ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

সেখানে রাজপুত্রদের শুদ্ধ আরবীভাষা শেখানো হত এবং আরবী কবিতায় পারঙ্গম করে তোলা হত। এই স্কুলে মু'আবিয়া তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে পাঠিয়েছিলেন। এই ইয়াজিদ পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে যে মাতৃভাষা পড়তে-লিখতে জানত তাকেই লোকে শিক্ষিত বলে গণ্য করত। অবশ্য ওর সঙ্গে আর দুটি গুণ থাকার দরকার ছিল। তীর-ধনুক চালাতে জানতে হত এবং সাঁতার কাটাও জানা দরকার ছিল। এসব গুণ থাকলে তাকে আল-কামিল বা 'যোগ্য' বলে বিবেচনা করা হত।[৭৭] সাঁতারের মূল্য আরও বাড়িয়ে দেয় ভূমধ্যসাগর উপকূলে বাস করার সমস্যাটি। সেকালে শিক্ষার নৈতিক আদর্শ ছিল সাহস, সমস্যাসংকুল সময়ে ধৈর্য (সবর), অধিকার সচেতনতা এবং প্রতিবেশীর প্রতি দায়বদ্ধতা, মনুষ্যত্ব (মুরুআ), সহৃদয়তা, সহানুভূতি, মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিশ্রুতি পালনে ক্ষমতা। এই গুণগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বেদুইন জীবনে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে গণ্য করা হত।

আবদ-আল-মালিকের আমল শেষ হবার পর, গৃহশিক্ষক এবং গুরুরা (মুয়াদ্দিব) (সাধারণত মাওয়ালি এবং খ্রিস্টানরাই এসব হতেন) দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই খলিফাজাদাদের পিতার তরফ থেকে গৃহশিক্ষক এরূপ নির্দেশ পেয়েছিলেন : ছেলেদের সাঁতার শেখান এবং কম সময়ের জন্য ঘুমে অভ্যস্ত করে তুলুন।[৭৮] দ্বিতীয় উমার নিজের ছেলেমেয়েকে বলে দিয়েছিলেন, আরবী ব্যাকরণের নিয়মকানুন না শিখলে তিনি তাঁদের কোতল করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না।[৭৯] তিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষককে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার তাৎপর্য বোঝা যায় তা পড়লেই। তাতে তিনি লেখেন : 'প্রথমে বিনোদনের মাধ্যমের প্রতি ঘৃণা করতে নৈতিক শিক্ষা দিন ওদের। কারণ বিনোদনের শুরু হয় শয়তানের পক্ষ থেকে এবং শেষ হয় আল্লাহ্‌র ক্রোধে।[৮০]

তখনকার প্রচলিত নিয়মমতো কেউ শিক্ষা নিতে চাইলে প্রথমেই মসজিদে যেতে হত। মসজিদে কোরান এবং হাদীসের ওপর ক্লাশ হত। ইসলামের সাবেক শিক্ষকরাই ছিলেন কোরান পাঠক (কুর্‌রা)। হিজরী সন ১৭ অব্দে (৬৩৮) উমার দেশের সব প্রান্তে এমন শিক্ষক পাঠান এবং জনগণকে নির্দেশ দেন প্রতি শুক্রবার মসজিদে এই শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। দ্বিতীয় উমার মিশরে মুখ্যবিচারপতি করে পাঠিয়েছিলেন ইয়াজিদ ইবন-আবি-হাবীব (মৃ. ৭৪৬)-কে, যিনি ছিলেন সেখানকার প্রথম শিক্ষক।[৮১] আল-কুফাতে আমরা আল-যাহ্‌হাক ইবন-মুজাহিমের[৮২] (মৃ. ৭২৩) কথা শুনি, যিনি প্রাথমিক স্কুল (কুত্তাব) চালনা করতেন, তবে শিক্ষার জন্য কোনরকম বেতন নেওয়া হত না।[৮৩] মুসলিম আমলের দ্বিতীয় শতকে আমরা এক বেদুইনের কথা শুনি, যিনি আল-বসরায় এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চালাতেন। সেখানে অবশ্য বেতন নেওয়া হত।[৮৪]

● বিজ্ঞান

আরবরা বলেন, মুহাম্মাদের ব্যাখ্যানুসারে বিজ্ঞানের কাজ দুরকমের। এক, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং দুই, দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (অর্থাৎ ওষুধ)।

উপদ্বীপের ওষুধ বাস্তবিকই খুব সেকেলে ছিল। সাধারণত অধিকাংশ চিকিৎসার সঙ্গেই জাদু এবং কুদৃষ্টির বিরোধী তুকতাকের মহিমা জড়িত ছিল। কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ খাওয়ানোর কথা বলা হত। ওষুধ বলতে মধু, রক্তমোক্ষক ব্যক্তি দ্বারা রক্তমোক্ষণ —এসবই ছিল। হাদীসে এসবেরই নাম ছিল 'মুহাম্মাদের ওষুধ'। এর ঘোর সমালোচক ছিলেন ইবন-খালদূন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দামা'তে[৬৪] এইসব ওষুধকে অবহেলা করে ঘোষণা করেন, মুহাম্মাদ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন ধর্মনীতি ও মূলতত্ত্ব শেখাতে, ওষুধ দিতে নয়।

মূলত গ্রিক এবং কিছুটা পারস্য থেকেই আরবরা বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ পান। পারস্যের ওষুধও অনেকটাই গ্রিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ইসলামি আমলের প্রথম শতকে বেশ কিছু আরব চিকিৎসক পারস্যে পড়াশোনা করতে যান। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন আল-হারিস ইবন-কালাদাহ্ (মৃ. ৬৩৪ খ্রিঃ নাগাদ)। তিনি থাকতেন আল-তাঈফে।[৬৫] আল-হারিসই ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া চিকিৎসক। তিনি 'আরবদের চিকিৎসক' সম্মানে ভূষিত হন।[৬৬] রোগ উপশমের ওষুধ আবিষ্কারের দক্ষতায় তারপরেই তাঁর পুত্র আল নায্‌র সফল হন। নায্‌রের মা ছিলেন মুহাম্মাদের মাসিমা।[৬৭]

আরবরা যখন পশ্চিম এশিয়া জয় করেন, তখন গ্রিক বিজ্ঞানচর্চা শক্তিশালী ছিল না, বরং তখন গ্রিক বিজ্ঞান ছিল গ্রিক এবং সিরীয়-জানা কিছু সমালোচকের এবং বিজ্ঞানচর্চাকারী লোকজনের মধ্যে আবদ্ধ এক বিষয়। উমাইয়া আমলের রাজসভার চিকিৎসকরাও ছিলেন এই দলে। এঁদের মধ্যে নামকরা বলতে ছিলেন মু'আবিয়ার খ্রিস্টান চিকিৎসক ইবন-৬সাল[৬৮] এবং আল-হাজ্জাজের গ্রিক চিকিৎসক তায়াযুক।[৬৯] তায়াযুকের কিছু সূত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখা তিন-চারটে গ্রন্থের কোনটিই আর সংরক্ষণ করা যায়নি। পারসি বংশোদ্ভূত এক ইহুদি চিকিৎসক মাসারজাওয়াইহ্ ছিলেন আল-বসরার বাসিন্দা। তিনি মারওয়ান ইবন আল-হাকামের আমলেই বেশ নাম করেন। এই মাসারজাওয়াইহ্ কিছু ওষুধের সিরীয় সূত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ (৬৮৩) করেন। আসলে এই সূত্রগুলি তৈরি করেছিলেন এক গ্রিক। তাঁর নাম ছিল আহরুন।[৭০] তিনি থাকতেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। খিস্টান পুরোহিত ছিলেন তিনি। যাই হোক, মাসারজাওয়াইহ্ এইভাবে ইসলামি ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যেসব মানুষ সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তাদের জন্য পৃথক চিকিৎসালয় স্থাপন করার কৃতিত্ব কিন্তু খলিফা আল-ওয়ালীদের।[৭১] দ্বিতীয় উমার গ্রিক ঐতিহ্যবাহী আলেকজান্দ্রিয়ার চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে এনেছিলেন অ্যান্টিয়োক এবং হাররানে।[৭২]

● অপরসায়ন

চিকিৎসাশাস্ত্রের মতোই অপরসায়ন বা কিমিয়া শাস্ত্রে আরবরা পরবর্তীকালে প্রভূত অবদান রাখেন। উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলিফার পুত্র এবং মারওয়ানিদের দার্শনিক (হাকিম) খালিদ

(মৃ ৭০৪ অথবা ৭০৮) ছিলেন প্রথম মুসলমান যিনি অপরসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রিক এবং খ্রিস্টান লেখাপত্রের অনুবাদ করেন। এটা জানা গেছে প্রাচীন তথ্য-আকর 'ফিহ্‌রিস্ত'[৭৪] থেকে। খালিদ যদিও কিংবদন্তিতে পরিণত হন[৭৫], তবু তাঁর এধরনের কাজকর্ম বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আরবরা বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করেন প্রাচীন গ্রিক লেখাপত্র থেকে এবং তাদের এই ব্যাপারে অনুপ্রেরণার উৎসও ছিলেন গ্রিকরাই। উমাইয়া সাম্রাজ্যের এই কিংবদন্তি যুবরাজের সঙ্গে আরেক বিদ্যান লোকের নাম জড়িয়ে রয়েছে। তিনি হলেন জাবির ইবন-হায়্যান (লাতিন ভাষায় জেবার)। তবে জাবিরের পসার হয় পরে, ৭৭৬ খ্রি নাগাদ। তাকে আব্বাসীয় আমলের লোক বলাটাই সমীচীন হবে। এমনই জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অপরসায়নের বেশ কিছু সূত্র আবিষ্কার করেন জাফর আল-সাদিক (৭০০-৭৬৫)।[৭৬] তিনি ছিলেন আলীর বংশধর এবং শী'আহ্‌ গোষ্ঠীর ১২ জন ইমামের একজন। তবে আধুনিক সমালোচক মহলের অনুমোদন পাননি তিনি।[৭৭] উমাইয়া সাম্রাজ্যের যুগে বুদ্ধিজীবীদের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল, তাঁরা এমন কোন নথি রেখে যাননি যে, আমরা যথাযথভাবে তাঁদের কর্মকীর্তির পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি।

● স্থাপত্যশিল্প

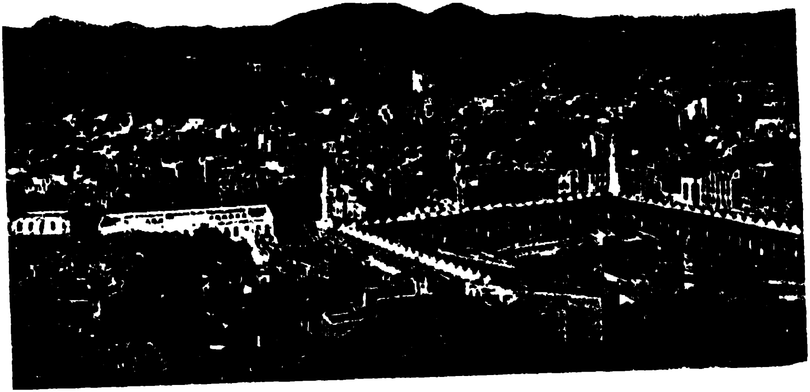
কোনকালে যদি আরবের নিজস্ব কোন স্থাপত্য শিল্পধারা থেকে থাকে তা ছিল একমাত্র আল-ইয়ামানেই। তা নিয়েও উপযুক্ত নথিপত্র না থাকায় খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। এমনকী দক্ষিণ আরবীয় শিল্পও উপদ্বীপের উত্তর অংশের জীবনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এইসব জায়গায় সাধারণ মানুষ থাকতেন তাঁবুতে। মসজিদ ছিল খোলা আকাশের নীচে। আর কবরস্থান ছিল মরুভূমির বালিতে। দুর্লভ মরূদ্যানের অধিবাসীরা আজকের মতোই তখনও এক গ্রাম্য স্থাপত্যশিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন। পরে এই স্থাপত্য প্রতিফলিত হত রোদে পোড়া ইঁটে বানানো বাড়ি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। বাড়ির ছাদ তৈরি হত খেজুরকাঠ এবং কাদামাটি দিয়ে। এসব বাড়ি ছিল কোনরকম সাজসজ্জাবর্জিত এবং স্রেফ কাজ চালানোর জন্য নির্মিত হত। এমন কী হিজাজের জাতীয় তীর্থক্ষেত্র কা'বাতেও কিছুই নেই। রয়েছে শুধু আদিম আমলের চারচৌকো এক কাঠামো, যার ছাদ পর্যন্ত নেই। মুহাম্মাদের সময় এই কাঠামো নির্মাণ করেন এক খ্রিস্টান ছুতোর মিস্ত্রী। জেদ্দার সমুদ্রতীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইজানটাইন জাহাজের কাঠ দিয়ে এই মসজিদের কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া পাথর কেটে নির্মিত মাদাইন সালিহ্‌ (প্রাচীন আল-হিজর) এর স্মৃতিসৌধ, পেত্রার বহুরঙা বালুকাময় উঁচু পাহাড়ে খোদিত ছবির মতো কক্ষ, পালমিরার পবিত্র মসজিদগুলি, সমান ব্যবধানে স্থাপিত পরপর স্তম্ভের পাশে ধনুকের মতো বাঁকা প্রাসাদ—এসবই বাস্তবিকই বেশ উঁচুমানের শিল্পপ্রযুক্তির প্রকাশ। অবশ্য এই শিল্পপ্রযুক্তিকে আরবীয় বললে ভুল বলা হবে। কার্যত সিরিয়া এবং গ্রিক নিয়ম মেনে সৃষ্ট মিশরিয় প্রযুক্তি থেকেই এসব ধার করা হয়। আল

রুসাফায় শহীদ সেন্ট সার্জিয়াসের সমাধিতে গাসসানির আল-মুনযির ইবন-আল-হারিস যে চমৎকার গির্জা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তা ছিল এই ধারার শিল্পসুষমার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ।

প্রাচীন এবং সবচেয়ে টেকসই শিল্পকলা হিসেবে স্থাপত্যশিল্প ধর্মীয় বিভিন্নতার নিরিখে সর্বদাই গৃহনির্মাণ শিল্পের মূল ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। ধর্মস্থান, আক্ষরিক অর্থে 'আল্লাহ্‌র আলয়' হিসেবে পরিচিত। এটা হচ্ছে সেই প্রথম কাঠামো, মানুষের বাসস্থানের বস্তুগত চাহিদা পূরণের থেকেও অনেক বেশি, অনেক উন্নত চরিত্র দাবি করে। মুসলিম আরবীয় শিল্প ধর্মস্থানের স্থাপত্যশিল্পের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুসলিম স্থপতিরা অথবা যেসব লোক গৃহনির্মাণে জড়িত থাকতেন, তাঁরা সাবেক স্থাপত্যরীতিকে ভিত্তি করে নির্মাণের এক সরল এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্প তৈরি করে নিয়েছিলেন। তবে এই প্রকল্পে নতুন ধর্মের তেজস্বিতা প্রকাশ পেত। এভাবে মসজিদগুলিতে (আরবী ভাষায়, মাসজিদ; একজনের জন্য সবিনয়ে আনত করার স্থান) আন্তঃবর্ণভিত্তিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিরিখে ইসলামি সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্তরূপ প্রতিফলিত। ইসলাম এবং প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের প্রকাশ দেখানোর মতো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মসজিদ ছাড়া আর কোথাও হয়তো মিলবে না।

● মদীনার মসজিদ

ইসলামি সভ্যতা বিকাশের প্রথম শতকে মক্কার মসজিদের থেকে আল-মদীনায় মুহাম্মাদের সাদামাটা মসজিদই দৈবক্রমে বহুলোকের সমাবেশ হওয়ার মতো মসজিদ তৈরির আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। মদীনার মসজিদটিতে ছিল খোলা আকাশের নীচে বড়সড় নামাযস্থল। চারধার রোদে পোড়ানো মাটির দেওয়ালে ঘেরা।[৭৮] পরে রোদ আসা বন্ধ করতে মুহাম্মাদ নামাযস্থলের ওপর চওড়া-ছাদ নির্মাণ করেন। ওই ছাদের কড়িকাঠ তৈরি হয়েছে খেজুরগাছের কাণ্ড দিয়ে। এছাড়া মাটি এবং খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি হয়েছে ছাদ।[৭৯] মাটিতে পোঁতা একটি খেজুর গাছের কাণ্ড প্রচারবেদী (মিন্‌বার)[৮০] হিসেবে ব্যবহৃত হত। ওই প্রচারবেদীতে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদ সমাবেশে ভাষণ দিতেন।[৮১] পরে ওই জায়গায় ঝাউকাঠের একটি ছোট মঞ্চ তৈরি করা হয়। এর তিনটি ধাপ ছিল। সিরিয়ায় খ্রিস্টান গির্জার আদলে এটা গড়া হয়। তবে মদীনার মসজিদে কোন দিকে মুখ করে নামায (কিবলাহ্) পড়া হবে তা ঠিক করতে কোন নির্দেশক (মিহ্‌রাব) বসানোর প্রয়োজনীয়তা মুহাম্মাদ অনুভব করেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। মসজিদে নামাযের সময় মুসলিম ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে মূলত জেরুসালেমের উদ্দেশ্যে দেওয়ালের দিকে মুখ করে, পরে মক্কার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।[৮২] মসজিদেব ছাদ থেকে আবিসিনিয়ার বিলাল তাঁর বাজখাঁই গলায় মু'মিনদেরকে নামায পড়ার ডাক দিতেন।[৮৩] অর্থাৎ একটি নামাযস্থল বিশিষ্ট বড় মসজিদের যা যা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তাই-ই ছিল মদীনায়। নামায পড়ার জায়গা, ছাদ ঢাকা আশ্রয়স্থল এবং প্রচারবেদী।



পূর্বদিক থেকে মক্কার মসজিদ

আরবরা পরবর্তীকালে আরও উন্নত হওয়ায় এবং পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা জয়ের পর বহু উচ্চশিল্পকলা সমন্বিত সামগ্রী তাঁদের দখলে আসায় সমকালীনতার নিরিখে আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। দখল করা দেশগুলির মানুষজনের উন্নত কারিগরি প্রযুক্তিও তাঁরা শিখেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চাহিদার প্রয়োজনে সে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মদীনার মসজিদ স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী উন্নত হয়ে উঠে। ক্রমান্বয়ে এরই পরিণতিতে, বহুবিধ স্যারাসিনী আরবীয়, মুসলিম এবং মোহামেডান বা মুহাম্মাদীয়[৮৪] শিল্প বিকশিত হয়। কাঠামো নির্মাণের উপাদান হিসেবে পাথর, ইট বা মাটির মধ্যে কোনটি ব্যবহৃত হবে, তা নির্দিষ্ট স্থানের ভিত্তিতে বিবেচিত হত। সিরিয়ার মুসলিম স্থাপত্য কিছুটা প্রাক-বিদ্যমান খ্রিস্টান সিরীয়-বাইজানটাইন ধারা এবং কিছুটা দেশীয় ও রোমান ধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যে এই স্থাপত্যই প্রধান দেশীয় ঐতিহ্য ভিত্তিক নেস্টোরীয় এবং সাসানিয় ধারার শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মিশরের স্থানীয় খ্রিস্টানরা বহু কারুকার্য করা অলংকার সরবরাহ করতেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে আরবীয় শিল্পকলার একাধিক ধারা সেখানে গড়ে ওঠে।

(১) সিরীয়-মিশরিয় ধারা, যা ছিল গ্রিস এবং রোমান ও দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। (২) ইরাকি-পারসি ধারা। এর ভিত্তি ছিল সাসানিয় এবং প্রধান ক্যালডিয় এবং অ্যাসিরিয় শিল্প-



আল-মদীনার মন্দিরের আভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশৈলী

ঐতিহ্য। (৩) স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার ধারা। এই ধারার মধ্যে দেশীয় খ্রিস্টান এবং গথিক প্রভাব ছিল। প্রায়শই এই শিল্পধারাকে বলা হত মুরিশ বা মাগ্রিবি। (৪) ভারতীয় শিল্পধারা, যাতে হিন্দু আঙ্গিক পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। চীনে যে মসজিদ নির্মিত হয় তা ছিল প্রায় এক বুদ্ধ মন্দিরের নকল।

● প্রদেশগুলির সাবেক মসজিদ

আল-বসরায় উতবাহ ইবন-গজওয়ান (৬৩৭ বা ৬৩৮ খ্রিঃ) প্রথম যে-মসজিদটি নির্মাণ করেন তা ছিল জয় করা কোন দেশে প্রথম মসজিদ। আল-বসরা নামে এক শহরও গড়ে তোলেন তিনি। তা গড়া হয় সেনাবাহিনীর শীতকালীন শিবির হিসেবে। আল-বসরার এই মসজিদটির নামাযস্থল গোড়ায় ছিল উন্মুক্ত জায়গায়। তাঁর চারধারে খাগড়া কাঠি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এই মসজিদের অট্টালিকাটি পরে মাটি এবং রোদে শুকানো ইট (লিবন) দিয়ে তৈরি করেন আবু মূসা আল-আশআরী। তিনি ছিলেন উমারের রাজ্যপাল। তিনি মসজিদের ছাদটি ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন।[৮৫] ৬৩৮ বা ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিজেতা আরব সৈন্যবাহিনীর জেনারেল সা'দ ইবন-আবি-ওয়াক্কাস আল-কূফায় আরেকটি সৈন্যশিবির স্থাপন করেন। তারও কেন্দ্রস্থলে মসজিদ স্থাপন করা হয়। মসজিদের গায়েই ছিল রাজ্যপালের বাসভবন (দার আল-ইমারাহ্)। আল-বসরার মতো এই মসজিদও গোড়ায় ছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। শুধু চারপাশে খাগড়াকাঠির বেড়া ছিল। পরে মাটি এবং রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে প্রাচীর নির্মিত হয়।[৮৬] মু'আবিয়ার ভাইসরয় জিয়াদ এই মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি সাসানিয় কায়দায় প্রস্তরস্তম্ভ দিয়ে মসজিদটি নির্মাণ করান। এছাড়া আল-মদীনার মসজিদ নির্মাণে মুহাম্মাদ যে

ছক অনুসরণ করেন তাকেও অনুকরণ করা হয়। আশ্চর্য হচ্ছে, বসরা মসজিদের কোন চিহ্নই এখন নেই। আল-কূফায় আলী যে-মসজিদ নির্মাণ করেন তা ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৈরি হয় এবং ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসিয় প্রদেশের পর্যটক ইবন-জুবাইর[৮৭] ওই মসজিদ দেখতে আসেন। অথচ এই মসজিদের কথা অল্প লোকেই জানেন।

ইসলামের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য মসজিদটি ছিল আমর ইবন-আল-আসের। তা সাবেক কায়রোয় (আল-ফুসতাত) স্থাপিত হয়। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আফ্রিকায় প্রথম মসজিদটি নির্মাণ করেন। আমরের তৈরি মসজিদের আসল রূপের কোন চিহ্নই নেই।[৮৮] তবে জানা গেছে, মসজিদটি অন্য মসজিদের মতোই সাদামাটা চারচৌকা ছিল। আর কোন দিকে মুখ করে নামায পড়া হবে তার কোন যথাযথ নির্দেশক কুলঙ্গি (মিহরাব) ছিল না। ছিল না কোন আযান-মিনার (মিযানা)। আমর তার পরে প্রচারবেদী নির্মাণ করেন এবং তা নুবিয়ার খ্রিস্টান রাজার আনুকূল্যে নির্মিত হয়।[৮৯] এরপর আল-কায়রাওয়ানে উকবাহ্-ইবন-নাফির আমলে (৬৭০-৭৫) উল্লেখযোগ্য মসজিদটি নির্মিত হয়। এই মসজিদও কায়রোর মসজিদের মতো ছিল সামরিক ছাউনি। মসজিদ এবং তার পাশে সরকারি বাড়ি তৈরি করেন উকবাহ্। পরে তার লাগোয়া সাধারণ লোকের বাড়ি তৈরি হয়।[৯০] এই মসজিদটি বিভিন্ন সময়ে তাঁর উত্তরাধিকারীরা পুনর্নির্মাণ করেন। চূড়ান্তভাবে আগলাবি সুলতান প্রথম জিয়াদাত-আল্লাহ্ (৮১৭-৩৮) এটি মেরামত করেন। তাঁর সময় থেকেই এই মসজিদ ইসলাম ধর্মের এক অন্যতম ধর্মস্থান বলে বিবেচিত হয়।

যেখানে মুসলিমরা নিজেরাই শহর গড়ে তুলেছেন সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে সাবেক কাঠামোয়। মাদাইনে সা'দ-ইবন-আবি-ওয়াক্কাস পারস্য সম্রাটের ধনুকের মতো বাঁকা কক্ষ (ইওয়ান)-কে নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার করেন।[৯১] দামাস্কাসে সেন্ট জনের ক্যাথিড্রাল প্রথম আল-ওয়ালীদ পুনর্নির্মাণ করে মসজিদে পরিণত করেন।[৯২] কিন্তু হিম্স শহরে একই ভবন মসজিদ এবং গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।[৯৩]

কিবলাহ্-নির্দেশক মসজিদের দেওয়াল-সংলগ্ন মিহরাব, গৃহকোণ বা কুলঙ্গি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়। আর এক্ষেত্রে অনুকরণ করা হয়েছিল গির্জাকে। আল-ওয়ালীদ এবং তাঁর রাজ্যপাল 'উমার ইবন-আবদ-আল-আযীয'-কেই সাধারণত এই নতুন ধরন চালু করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়।[৯৪] অবশ্য এর কিছুটা প্রাপ্য মু'আবিয়ারও।[৯৫] মদীনার মসজিদেই প্রথম মিহরাব ব্যবহৃত হয়। পরে অবশ্য খুব দ্রুত সব মসজিদেই এই মিহরাব স্থাপিত হয়। আর খ্রিস্টানবেদীর মতো মিহরাব স্থাপন মসজিদের পবিত্রতার বড় নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সেগুলি আরও নতুনভাবে সজ্জিত হয়। সত্যি বলতে কী, ইসলামি শিল্পকলার বিকাশ ও পরিবর্তনের মান বিচারের নির্ধারক ওই মিহরাবগুলি।

মসজিদ সংস্কারের নামে ধর্মীয় রীতিনীতি নয় এরূপ নতুন কিছু প্রবর্তনের চেষ্টাও শুরু হয়। এই ব্যাপারে সাধারণভাবে বেশি দোষী সাব্যস্ত হন মু'আবিয়া।[৯৬] তিনি মসজিদে

'মাকসূরা' নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদেরই প্রাচীরবেষ্টিত একটা অংশ, যেখানে শুধু খলিফাদের প্রবেশাধিকার থাকবে। তাকেই বলে 'মাকসূরা।' এই মাকসূরা প্রবর্তনের পিছনে নানা কারণ দেখানো হয়। মূল কারণ দেখানো হয় খলিফাদের সুরক্ষার বিষয়টা। বিশেষ করে খারিজীরা একবার খলিফার প্রাণনাশের চেষ্টা করার পর এর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়।[৯৭] খলিফাগণ নির্জনে বিশ্রাম অথবা একাকী চিন্তাভাবনার জন্য মাকসূরা ব্যবহার করেছিলেন সুস্পষ্ট।[৯৮]

মিহরাবের মতো মসজিদে মিনারেরও সূচনা করেন উমাইয়া খলিফাগণ। সিরিয়াতেই প্রথম মসজিদ-মিনার স্থাপিত হয়। সেখানে দেশীয় নজরদারি মিনারের ধাঁচে অথবা তার অনুকরণে নির্মিত গির্জার মিনারের ধাঁচে গোড়ায় তা নির্মিত হত, যা ছিল বর্গাকার।[৯৯]

দামাস্কাসে উমাইয়াদের মসজিদে একটি মিনারের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করার ব্যাপারে যাঁদের মত পাওয়া গেছে[১০০] তাঁদের মধ্যে একজন খোলাখুলিই বলেছেন, ওই মিনাবটি ছিল সেন্ট জনের গির্জার নজরদারি-মিনার (নাতুর)। মিশরে মু'আবিয়ার এক রাজ্যপাল মিনার তৈরি করেন। তিনি আল-ফুসতাতে আমর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের চারটি কোণের প্রত্যেকটির ওপর একটি করে মিনার বসান।[১০১] আল-ইরাকের বসরা মসজিদে মু'আবিয়ার রাজ্যপাল জিয়াদ পাথরের মিনার বসান।[১০২] এছাড়া উমাইয়া আমলের বিখ্যাত নির্মাতা আল-ওয়ালীদ সিরিয়া এবং আল-হিজাজে বহু মসজিদে মিনার বসান। মদীনা মসজিদে উমার নতুন রীতির সূচনা করেন।[১০৩] তাঁর পরবর্তীকালে একাধিক মিনার বসে ওই মসজিদে।

সিরিয়ার পাথরের চারচৌকা মিনার ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন। একই কায়দায় উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে মিনার নির্মিত হয়। পবে মুসলিম জমানায় মিনারের শিল্পকলা দেশীয় সাবেক রীতি মেনে উন্নত হয়। মিশরে বহু শতক ধরে স্রেফ ইঁট দিয়ে তৈরি মিনার দেখা গেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত বাতিঘর ফ্যারস দ্বীপপুঞ্জের বাতিঘরের স্থাপত্যশৈলীর কিছু প্রভাব পেয়েছিল। আল-ইরাকের সামাররায় নবম শতকের এক নজরদারি-মিনারে প্রাচীন অ্যাসিরিয়ার 'জিগুরাত' (উচ্চস্থান)-এ হিংস্র প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এ মিনার ছিল সাততলা—একটি সূর্য, একটি চাঁদ এবং অন্য পাঁচটি গ্রহের নামে সেগুলির নামকরণ করা হয়।[১০৪]

● ডোম অফ দ্য রক্

বাইবেলের সঙ্গে যোগ থাকার এবং ইসলামের প্রথম কিবলাহ্[১০৫] হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এবং মুহাম্মাদের শাবি মি'রাজের সময় যেহেতু এই অঞ্চলটি ছিল তাঁর বিশ্রামস্থল তাই জেরুসালেম গোড়া থেকেই সমস্ত মুসলমানের চোখেই আলাদা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়।[১০৬] ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন খলিফা উমার জেরুসালেম সফরে গিয়েছিলেন সম্ভবত তখনই তিনি মোরিয়া পাহাড়ের ওপর ইট বা কাঠেব তৈরি একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। একসময় এখানে ছিল সুলাইমানের মসজিদ এবং পবে একটি বার্বারদের ধর্মস্থান এবং একটি

খ্রিস্টান গির্জা স্থাপিত হয়। যখন আবদ-আল-মালিক এমন এক ধর্মস্থান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন যা পবিত্র সমাধির গির্জার[১০৭] মহিমাকে অনুজ্জ্বল করে দেবে, তখন তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন মক্কার মসজিদটি ছিল খলিফা-বিরোধী আবদুল্লাহ্ ইবন-আল-জুবাইরের দখলে। তাই আবদ-আল-মালিক তীর্থযাত্রীদের[১০৮] টানতে জেরুসালেমে ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে ডোম অফ্ দ্য রক্ নির্মাণ করেন। ভুল করে এই মসজিদকে অনেকে উমারের তৈরি মসজিদ ভাবেন। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ধর্মস্থানে এটি নির্মিত হয়। কারণ এখানে ইহুদি, বার্বার, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের সম্মিলন ঘটত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে আব্রাহাম এখানে তাঁর নিজের পত্র ইসহাককে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন। এই গম্বুজের চারপাশে কুফার লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে, পরে যার কিছু অংশ খলিফা আল-মামুন বিকৃত করার চেষ্টা করেন।[১০৯] এটা ইসলামি ঘরানার সাবেক লিপিগুলির অন্যতম।[১১০] আবদ-আল-মালিক খ্রিস্টান অট্টালিকা থেকে উপকরণ নিয়ে মসজিদে লাগানোর ব্যবস্থা করেন। ওই খ্রিস্টান সৌধটি মসজিদের সামনেই ছিল। দ্বিতীয় খসরু ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে ওই বাড়ি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করেন। আবদ-আল-মালিক পাথরের গম্বুজ দিয়ে মসজিদ সাজাতে যে মিস্ত্রী লাগান তাদের কয়েকজন ছিল বাইজানটাইনের অধিবাসী। মসজিদের মেঝেতে মোজাইক করে তারা সাবেক কাঠামোর চাল বদলেছেন। এছাড়া নানা অলংকার সজ্জিত গম্বুজটি যাতে যীশুর পবিত্র সমাধিস্থলে নির্মিত গির্জার সুন্দর গম্বুজটির থেকেও বেশ আকর্ষণীয় হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়।[১১১] ফলস্বরূপ এতসুন্দর এই মসজিদ নির্মিত হয় যে, স্থাপত্যশিল্পের এই গর্বকে ছাপিয়ে যেতে পারার কোন উপায় ছিল না। মুসলমানদের কাছে ডোম অফ্ দ্য রক্ স্থাপত্য-গর্ব এবং শিল্প সুষমাশক্তি পুরাকীর্তির চেয়ে বেশিকিছু। এটা তাদের বিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক। পরে অবশ্য অনেকবার এর পরিবর্তন হয়, মেরামত হয়। বিশেষত ১০১৬ খ্রিস্টাব্দে[১১২] মারাত্মক ভূমিকম্পের পর অনেক কিছু বদলাতে হয়। তবু এখনও এই গম্বুজের বেশিরভাগটাই সাবেক আকৃতির। তাই প্রাচীনকালের যেসব মুসলিম মসজিদ আজও রয়েছে এটা তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো। এ বর্ণনা ৯০৩ সালে ইবন-আল-ফকীহ[১১৩] দিয়ে গেছেন। পরে ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আল-মাকদিসিও[১১৪] বর্ণনা দিয়েছেন।

● আকসা মসজিদ

এই পাথরের গম্বুজ ছিল এক ধর্মস্থান, যার পবিত্র মসজিদ ছিল আকসা মসজিদ। আমরা আগে বলেছি, 'আল-মসজিদ আল-আকসা' শব্দটি সাধারণভাবে সমগ্র পবিত্র মসজিদ ভবন বলতেই বোঝানো হয়েছে আরবী সাহিত্যে। এর মধ্যে গম্বুজ, কবরস্থানের সৌধ, দরবেশদের খানকাহ্ (তাকিয়া বা জাবিয়া) এবং আবদ-আল-মালিক থেকে শুরু করে ওটোমন সুলতান মহানুভব সুলাইমানের আমল পর্যন্ত একাধিক খলিফার জনসাধারণের জন্য নির্মিত ঝরনা— এসবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৪ একর জমির ওপর এই মসজিদ বিস্তৃত

ছিল। নিখুঁতভাবে দেখলে 'আকসা' শব্দটি আবদ-আল-মালিকের তৈরি যে মসজিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তা গম্বুজ থেকে খুব দূরে নয়। এই মসজিদ তৈরির সময়ে জাস্টিনিয়ানের সেন্ট মেরি গির্জার ধ্বংসাবশেষ কাজে লাগানো হয়, যা এই মসজিদ তৈরির আগে এই স্থানেই ছিল এবং খসরু তা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ভূমিকম্পের পর আবার ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ পুনর্নির্মিত হয় আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসূরের আমলে। পরে ক্রুশেডারগণ এই মসজিদ সংস্কার করেন। ফের ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে সালাহ্-আল্-দীন (সালাদিন) মসজিদটি মুসলিমদের দখলে আনেন। গম্বুজের মতোই আমাদের সাবেক বর্ণনা অনুযায়ী ইবন আল-ফকীহ[১১৫] এবং আল-মাকদিসির[১১৬] সময় থেকেই এই মসজিদ চালু ছিল।

● উমাইয়া মসজিদ

৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আবদ-আল-মালিকের পুত্র আল-ওয়ালীদ দামাস্কাসের বাসিলিয়ায় সেন্ট জনের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক স্থান দখল করে নেন। এখানে আগে রোমানদের দেবতা জুপিটারের মন্দির ছিল। ওয়ালীদ উমাইয়াদের নামে এখানে এক বিশাল মসজিদ তৈরি করেন।[১১৭] আল-ওয়ালীদের তৈরি মসজিদে রোমানদের আগের মন্দিরের কতটা অংশ অক্ষত ছিল, তা বলা কঠিন। জানা গেছে, মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার দুটি পুরানো গির্জাতেই ছিল।[১১৮] তবে উত্তরদিকের মিনারটি, যা বাতিঘর-মিনার হিসেবে ব্যবহৃত হত, প্রকৃতপক্ষে আল-ওয়ালীদই নির্মাণ করান। সমকালীন যুগে সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে তা আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। এখনও টিকে থাকা সাবেক মুসলিম মিনারগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রাচীন। যে তিনটি স্তম্ভ এবং প্রশস্ত চত্বরের ওপর মোজাইক করা গম্বুজটি রয়েছে সবই ওই ওয়ালীদ নির্মাণ করান। আমরা জেনেছি, এই নির্মাণকাজে পারসি, ভারতীয় এবং গ্রিক কারিগরদের কাজে লাগানো হয়। গ্রিক কারিগরদের দিয়ে সাহায্য করেছিলেন কনস্ট্যান্টিনোপল-এর সম্রাট।[১১৯] সম্প্রতি পাপিরি অবশ্য তথ্য খুঁজে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, মিশর থেকেও দক্ষ কর্মীদের আনা হয়েছিল।[১২০] মসজিদের দেওয়াল মার্বেল পাথর এবং মোজাইক দিয়ে মিনা করা ছিল। আল-মাকদিসি[১২১] নামে যে-ভূতত্ত্ববিশেষজ্ঞ দশম শতকের শেষার্ধে ওই মসজিদ দেখতে যান, তিনি লিখেছিলেন যে-মূল্যবান পাথর ছাড়াও সোনা লাগানো ছিল দেওয়ালে। পাথরের ওপর নানারকম কথা খোদাই করে লেখা ছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে[১২২] ফের একথা জানা যায় যে, পরবর্তী ধর্মপরায়ণ খলিফা এইসব জিনিস ঢেকে দিয়েছিলেন। এই মসজিদে আমরা নামায (মিহ্‌রাব) পড়ার অর্দ্ধবৃত্ত আকারের কুলঙ্গি প্রথম দেখি। এখানে ঘোড়ার খুরের মতো ধনুকাকৃতি খিলানও ছিল বলে শোনা যায়। এখানে মসজিদের গায়ে আঙুর পাতা এবং গাছের যে নকশা ছিল, পরে তা কায়রাওয়ান মসজিদ তৈরির সময়ও কাজে লাগানো হয়। নবম শতকে আগলাবিয়রা তা আবার নতুন করে নির্মাণ করেন। ১০৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ পুড়ে যায়. ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে তাইমুর ফের তা পুড়িয়ে দেন এবং

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শেষবার তাতে আগুন ধরে। অথচ আজও এই উমাইয়া মসজিদকে বিশ্বের সমস্ত মসজিদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে মর্যাদার আসনে রেখেছেন মুসলিমরা। মুসলিমদের কাছে এই মসজিদ বিশ্বে চতুর্থ আশ্চর্য বিশেষ।[১২৩]

আল-মদীনার সাবেক মসজিদ নির্মাণের সময় থেকে জেরুসালেম এবং দামাস্কাসের দুই মহার্ঘ মসজিদ নির্মাণের সময়ের মধ্যবর্তীকালে মুসলিমদের দলবদ্ধ নামাযস্থল সমন্বিত (জামাআহ) মসজিদের বিবর্তন পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্মিলিত নামাযস্থল সমন্বিত মসজিদ সবসময়ই ধর্মস্থানের থেকে বেশি কিছু। এই ধরনের মসজিদ সম্মিলন কক্ষ, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত মঞ্চ হিসেবে কাজ করে।[১২৪] নামাযের আনুষ্ঠানিক চাহিদা পূরণে এখন মসজিদে আশ্রয়স্থল এবং অনাবৃত নামাযস্থল থাকে। ধর্মীয় আচারের চাহিদা পূরণে থাকে মিনার, কুলঙ্গি. প্রচারবেদী এবং অযূর জন্য বাইরে ঝরনা। আর রাজনৈতিক চাহিদা পূরণে নানারকম পরিকল্পনা করা হয়, আলংকারিক জাঁকজমক করা হয় যাতে সারা বিশ্বে ধর্মীয় অনুগামীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে যায় যে, যারা খ্রিস্টধর্মের গির্জায় উপাসনা করে তাদের পিছনে নতুন মতবাদের সমর্থকরা আর থাকবেন না।

● প্রাসাদ : কুসায়ির আমরাহ

স্থাপত্য ক্ষেত্রে মসজিদ ছাড়া উমাইয়ারা আর যা কিছু করেছিলেন তা হল, কয়েকটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ। এর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজ পরিবারের যুবরাজদের তৈরি মরু-প্রাসাদ। অধিকাংশ খলিফারই আগেকার গাসসানি শাসকদের মতো দেশের বাড়ি ছিল। মু'আবিয়া এবং আবদ-আল-মালিক ছাড়া কেউই দামাস্কাসে থাকতেন না। রাজধানীতে খায্‌রা[১২৫] প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। খায্‌রা ছিল রাজপ্রাসাদ, পাশেই ছিল বড় মসজিদ। একই নামের নির্মিত আল-হাজ্জাজের বাসভবনের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ওয়াসিতে নির্মিত সেই প্রাসাদের নাম আল-কুব্বা আল-খায্‌রা।[১২৬] তবে সিরীয় মরুভূমির প্রান্তে বহু রোমান দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছিল। উমাইয়া স্থপতিরা তা সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন; অথবা ওই স্থপতিরাই বাইজানটাইন ও পারসি আদর্শে তৈরি করেন। এমন একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখন আল-উখাইদির নামে পরিচিত। সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'আইন আল-তাম্‌র'-এর অদূরেই এই প্রাসাদ অবস্থিত। তবে উমাইয়া আমলের শেষার্ধে না আব্বাসীয় আমলের প্রারম্ভে ওই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত নয়।[১২৭] মরুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এমন অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এখানে আবদ-আল-মালিকের পুত্র ইয়াজিদ 'মুয়াক্কার'[১২৮] নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কিংবা উদ্ধার করেছিলেন। এই প্রাসাদের অল্প কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ ছিলেন শিকার ও আমোদপ্রমোদে আসক্ত। দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ বৃহত্তর জর্ডনের দুই প্রতিবেশী রোমান সেনা অবস্থানস্থল 'কাসতাল'[১২৯] এবং 'আল-আজরাক'[১৩০] দখল করেন।

আধুনিককালে আল-মুশাত্তা (আল-মাশতা)[১১১] নামে পরিচিত এই অঞ্চলের আরেকটি প্রাসাদও দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই প্রদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম আল-মুশাত্তা প্রাসাদেই পুরাতাত্ত্বিকরা সফরে এসেছিলেন। এই প্রাসাদটির নির্মাণকাজ পুরো শেষ করা সম্ভব হয়নি দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়। এই দুর্গের অত্যাশ্চর্য খোদাই করা বাইরের অংশটি এখন বার্লিনের কাইজার ফেড্রারিক মিউজিয়ামে রাখা আছে।[১১২] এই শ্রেণীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যে প্রাসাদের কথা জানা যায় তা হল, আমরাহ-এর ক্ষুদ্র প্রাসাদ (কুসায়রি)। এটির অবস্থান ছিল জর্ডনের পূর্বাঞ্চলে ডেড-সীর উত্তর কিনারা বরাবর প্রত্যক্ষ রেখায়। এই দুর্গটি ৭১২ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। সম্ভবত প্রথম আল-ওয়ালীদের আমলে। পরে তা হারিয়ে যায়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে আলয়িস মুসিল[১১৩] পুনরাবিষ্কার করেন। এই দুর্গের নামও আধুনিককালেই দেওয়া। কারণ আরবী সাহিত্যে এমন নাম আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ভবনটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তার দেওয়ালে আঁকা রঙিন চিত্র। তা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

● চিত্রাঙ্কন

ইসলামের বেশিরভাগ ধর্মতাত্ত্বিকই মনে করেন যে, মানুষ এবং প্রাণীকুলের পৃথিবীতে আবির্ভাব পুরোপুরি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল এবং যিনি আল্লাহ্‌র অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন তাকেই অধার্মিক মনে করা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ, কোরানের আপসহীন একেশ্বরবাদের অনুসিদ্ধান্ত এবং প্রতিমা-পূজায় নিষেধাজ্ঞা, 'হাদীস' থেকে সরাসরি অনুমোদন পায়। 'হাদীসে' মুহাম্মাদ ঘোষণা করেন, শেষ বিচারের সময় চিত্রশিল্পীদেরই সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে।[১১৪] 'মুসাব্বিরুন (প্রতিকৃতি আঁকিয়েরা) তক্‌মাটি ভাস্করদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হত। মসজিদের কোথাও মানুষের কোন প্রতিমূর্তি আঁকা হয়নি। কিছুক্ষেত্রে প্রাসাদ এবং বইতে তা আঁকা হয়েছে। মুসলিম চিত্রকলার সব জাঁকালো শিল্প উপকরণই নেওয়া হয়েছে উদ্ভিদজগৎ বা জ্যামিতিক আকৃতি থেকে। পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে যে সাফল্য পাওয়া যায় তা স্পষ্টই বোঝা যায় 'অ্যারাবেস্ক' (arabesque) শব্দটির মাধ্যমে, যা অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় সাজসজ্জার স্টাইলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত। কিন্তু আরবের লোকেরা নিজেরা মূর্তি গড়া বা চিত্রশিল্পে কোন উন্নত চিন্তার জন্ম দিতে পারেনি। আরবদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলির যে সাহিত্যিক বর্ণনা রয়েছে তা থেকেও এটা স্পষ্ট প্রমাণিত। আমরা মুসলিম শিল্প বলতে যা বুঝি, তা মূলগতভাবে ছিল মানসিক ঔদার্যপূর্ণ যেকোন শিল্পসার সৃষ্টি এবং তার ব্যবহার অধিকাংশই হচ্ছে মুসলিম দখলে আসা দেশের জনগণের প্রতিভার ফসল। তবে তা মুসলিম আমলে উন্নত হয়েছে বা অদ্ভুতভাবে মুসলিম ধর্মের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম চিত্রকলার সাবেক দৃষ্টান্ত কুসায়ির আমরাহের ফ্রেসকো বা দেওয়ালচিত্র, খ্রিস্টান চিত্রশিল্পীর সাহায্যে অঙ্কিত হয়। বৃহত্তর জর্ডনের এক বিনোদন ঘরের দেওয়ালে এবং প্রথম আল-ওয়ালীদের স্নানাগারে ৬ জন রাজকীয় চরিত্রের ছবি ছিল। এই ছয়জনের মধ্যে স্পেনের সর্বশেষ ভিসিগথ বংশধর রাজা রডারিকের ছবিও আছে। আর দুটি ছবির ওপর 'কাইসার' (সিজার) এবং নাজাশি (নেগাস) নামদুটি খোদিত আছে। আর তৃতীয় ছবির ওপরে লেখা রয়েছে খসরু (গ্রিকে)। এই চিত্রগুলিতে সাসান ধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া জয়, দর্শন, ইতিহাস ও কবিতার প্রতীকী আকৃতিও অঙ্কন করা হয়েছিল। এক শিকারের দৃশ্যের ছবিতে দেখা যায়, একটি সিংহ একটি বন্য গাধাকে আক্রমণ করছে। নৃত্যশিল্পী, গায়িকা এবং আনন্দোৎসবকারীদের নগ্ন চিত্রও পাওয়া যায়। ঝালর, পাত্র থেকে বেড়ে ওঠা পর্ণরাজি, আঙুরগাছ, কাঁদি সমেত খেজুর গাছ জলপাই পাতা এবং মরুভূমির পাখিদের প্রতিমূর্তিও নির্মিত হয়েছে। অধিকাংশ লিপিই আরবী, কিছু গ্রিক নামও রয়েছে।

● সঙ্গীত

প্রাক-ইসলামি আমলে আরবদেশীয়রা নানা ধরনের গান গাইতেন। মরুযাত্রীদের গান, ফৌজি গান, ধর্মীয় গান এবং প্রণয়ের গান। আজও সেই সাবেক যুগের ধর্মীয় গানের স্তোত্র রক্ষিত রয়েছে হজের তালবিয়াতে।[১৫৭] কবিতার সুর অথবা ইনশাদ রক্ষা করা হয় শুদ্ধভাবে (তাজবীদ) কোরান পাঠের সময়। জানা গেছে, মরুযাত্রীদের গান 'হুদা' ছিল আরবদের প্রিয় এবং যতদূর মনে হয় ওটাই প্রথম আরবসঙ্গীত। আল-মাসউদীতে[১৫৮]-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাস বলে, আরবীয় গোষ্ঠীগুলির এক অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুযার-ইবন-মাআদ[১৫৯] উট থেকে পড়ে গেলে তাঁর হাত ভেঙে যায়। তখন তিনি তাঁর সুরেলা কণ্ঠে কাঁদতে থাকেন : ইয়া ইয়াদা! ইয়া ইয়াদা! (অর্থাৎ ও আমার হাত! ও আমার হাত!) উটের চলার ছন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি ওই কথা বলে যান। এই কান্না থেকেই সৃষ্টি হয় 'রাজাজ' ছন্দের। সর্বপ্রকার কাব্যছন্দে ও মরুযাত্রীদের গানে তা ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণ আরবীয়দের নিঃসন্দেহে নিজস্ব গানের রীতি এবং গানের যন্ত্রও[১৬০] ছিল, যা সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। তবে সেই ঘরানা উত্তরাঞ্চল ও ক্রমান্বয়ে মুসলিম ও আরব্য ঐতিহ্যেরই অংশ গড়ে ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল-হিজাজের প্রাক-ইসলামি যুগের অধিবাসীরা গান গাওয়ার সময় মূল যন্ত্র হিসেবে চারচৌকো খঞ্জনি (দাফ), বাঁশি (কাসাবাহ, কাস্‌সাবাহ) এবং নল কাঠির রাজনা বা সানাই (জাম্‌র, মিজমার)[১৬১] ব্যবহার করতেন। তাঁরা চামড়ার তৈরি বীণা (মিজহার)[১৬২] ব্যবহার করতেন। মুহাম্মাদের সময়ে বিদেশি সঙ্গীত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। গাস্‌সানি-যুবরাজরা গ্রিক কিশোরী গায়িকাদের সমবেত সঙ্গীত ভালবাসতেন। আল-হিরার লাখমিয়রা কাঠের তৈরি পারসীয় বীণা (উদ, ইংরাজিতে লিউট) ছিল, যা হিজাজিরা অনুসরণ করেছিলেন। আরেক ঘরানা ছিল আন নাযর

ইবন-আল-হারিস ইবন-কালাদার। তিনি ছিলেন ডাক্তার এবং চারণকবি। লোকেদের মন জয় করার জন্য তার বার্বার যুগীয় আবৃত্তি দ্বারা কোরানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।[১৪১] তিনি মক্কা থেকে আল-হিরা—সর্বত্র এই ধরনের গানের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির নেপথ্যে ছিলেন।[১৪২] ইবন সুরায়জ (মৃ. ৭২৬ খ্রিঃ) পারসি বীণা চালু করেন। তিনিই প্রথম পারসি কর্মীদের হাতে এই যন্ত্রটি দেখেন। ৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লাহ্ ইবন-আল-জুবাইর কা'বা[১৪৩] পুনর্নির্মাণ করতে এই পারসি কর্মীদের আরবে আনেন। পরে একরকম কাঠের যন্ত্রও পারস্যের অনুকরণে চালু হয় আরবে। পারসি ভাষায় 'নে' (লম্বা বাঁশি) নামে এই কাঠের বাঁশি একই নামে আরবে প্রচলিত হয়। একথা বলেছেন হেনরি জি. ফারমার।[১৪৪] তিনিই গবেষণা করে বিষয়টি জানতে পারেন। জাহিলীয়া-র অধিকাংশ পেশাদার গায়কই ছিলেন মহিলা। আগানি[১৪৫], যা কার্যত গানেরই বই, কিছু মহিলা গায়িকার নাম সরবরাহ করেছে। সমকালীন বীর সাখরের প্রতি শোক জানিয়ে অনেক শোকসঙ্গীত গেয়েছিলেন তাঁর বোন আল-খানসা। কিছু শোকসঙ্গীত গান হিসেবে লেখা হয়েছিল সুস্পষ্ট।[১৪৬] আল-খানসা ছিলেন মুহাম্মাদের সমসাময়িক এবং আরবের মহান মহিলা কবি। প্রাক-ইসলামি যুগের বেশির ভাগ কবিই স্পষ্টত তাদের রচনাগুলি বাজনাসহ গেয়েছিলেন।

মুহাম্মাদ যে কবিদের[১৪৭] একবার তুলোধোনা করেছিলেন তা কিন্তু সব কবিদের নয়, শুধুমাত্র যেসব কবি উগ্র বর্বর ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাঁদেরই তিনি সমালোচনা করেন। মুহাম্মাদ বাজনার প্রতিও বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। এর কারণ তা ছিল বর্বর যুগের ধর্মীয় আচার। 'হাদীস'-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, মুহাম্মাদ গানের বাজনাকে শয়তানের মুয়াজ্জিন বলে ঘোষণা করেন। কারণ মুয়াজ্জিনের মতো ওই যন্ত্রও মানুষকে শয়তানের উপাসনা করতে আহ্বান করে।[১৪৮] অধিকাংশ মুসলিম আইনজ্ঞ এবং ধর্মতাত্ত্বিক বাজনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কেউ কেউ বাজনা শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন। আবার কেউ বা বাজনাকে অধর্মীয় আপত্তিকর (মাকরূহ) কিছু বলে মনে করতেন। অবশ্য বাজনা পাপকাজ (হারাম) না হলেও সাধারণ মানুষের ধারণা কী ছিল তা এই প্রবাদবাক্যেই স্পষ্ট : মদ হল দেহ, গান হল আত্মা এবং আনন্দ হল তাদের বাচ্চাকাচ্চা।[১৪৯]

ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় বা বিস্ময় কাটার পর আল-হিজাজে সামাজিক পরিবর্তন সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট মনোভাবের মধ্যে দিয়ে অনেকটাই আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। বিশেষত খলিফা উসমানের আমলে সর্বপ্রথম সম্পদ এবং আড়ম্বর প্রকাশের প্রবণতা দেখা যায়। তখন স্বর এবং বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারটা আরবদেশীয়দের আয়ত্তে। পাশাপাশি আরবীয় লেখকরা, শিল্পীদের এবং গাইয়েদের 'আল-গিনা', 'আল-মুতকান' বা 'আল-রাকিক' নামে অভিহিত করে। তাদের মাধ্যমে বিকশিত হয় ছন্দ (ইকা) ও সুরের উচ্চস্তরের সমন্বয়সাধন। এই ঘরানাগুলিই আল-হিজাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। ওই সময়ই পেশাদার পুরুষ গায়কদের প্রথমবার 'মুখন্নাসূন' নামে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। 'মুখন্নাসূন'

অর্থাৎ 'মেয়েলি'। অর্থাৎ যেসব পুরুষ নিজেদের হাতে রং মেখে নারীসুলভ আচরণের ভান করেন। এমনই 'মেয়েলি গায়ক' হিসেবে নাম কিনেছিলেন তুয়াইস (অর্থাৎ ছোট ময়ূর, ৬৩২-৭১০ খ্রিঃ)। তাঁর বাড়ি ছিল মদীনায়। তাঁকে ইসলামি জগতে সঙ্গীতের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। তুয়াইস আরবী সঙ্গীতে মিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতার ব্যবহারের সূচনা করেন এবং তিনিই প্রথম খঞ্জনি নিয়ে আরবীয় গান গেয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১৫০]

মুসলিম গায়কদের প্রথম প্রজন্মের নেতা ছিলেন ওই তুয়াইস। এঁদের মধ্যে কিছু বিদেশি লম্পটও ছিলেন। তুয়াইসের বহু ছাত্র তাঁর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হল ইবন-সুরাইজ (৬৩৪-৭২৬ খ্রিঃ)। তাঁকে বিশ্বের সেরা চার মুসলিম গায়কের একজন বলে গণ্য করা হয়।[১৫১] পারসি বীণা প্রচলনের কৃতিত্ব তাঁরই। এছাড়া তিনিই প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠানে নির্দেশকের ভূমিকা পালনের জন্য ছোট লাঠি হাতে নির্দেশনার সূত্রপাত করেন। ইবন-সুরাইজ আদতে ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তাঁর পিতা ছিলেন এক তুর্কি। আল-হুসাইনের কন্যা সেকালের অতীব সুন্দরী সুকাইনার পৃষ্ঠপোষকতা পান তিনি। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মক্কার এক অভিজাতের অনুচর নিগ্রো গায়ক সাঈদ ইবন-মিসজাহ (মুসাজ্জাহ, ৭১৪ খ্রিঃ)। সাঈদই হচ্ছেন মক্কার প্রথম এবং সম্ভবত উমাইয়া যুগের সেরা গায়ক, যিনি সিরিয়া ও পারস্যে গান গাইতে যান। তিনিই প্রথম বাইজানটাইন এবং পারসি গান অনুবাদ করে আরবী গানে রূপান্তরিত করেন।[১৫২] তিনিই আরবী সঙ্গীতকে নিয়মে বাঁধার চেষ্টা করেন। তিনিই ধ্রুপদী আরবী সঙ্গীতের প্রচলন করেন। তুয়াইসের আরেক ছাত্র ছিলেন আল-গারীদ।[১৫৩] তিনিও ছিলেন সুকাইনার ক্রীতদাস। বর্বর গোষ্ঠীর বর্ণসংকর এক লোক। তাঁর অন্যতম প্রশিক্ষক ছিলেন ইবন-সুরাইজও।[১৫৪] তিনি তাঁর দ্বিতীয় গুরুর পর ইসলামি জগতের সেরা চার সঙ্গীতকারের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। আর যে দু'জন গায়ক ছিলেন তাঁরা হলেন ইবন-মুহরিজ (৭১৫ খ্রিঃ) এবং মা'বাদ (৭৪৩ খ্রিঃ)। ইবন-মুহরিজ ছিলেন পারসি বংশজাত। তাঁকে 'আরবদেশীয় করতালবাদক (সান্নাজ)' হিসেবে গণ্য করা হত।[১৫৫] মদীনার এক নিগ্রো দম্পতির শ্বেতকায় সন্তান মা'বাদ, খলিফা প্রথম আল-ওয়ালীদ, দ্বিতীয় ইয়াজিদ এবং দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদের[১৫৬] দরবারে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন। রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে মা'বাদ পেশাদার চারণকবি হিসেবে সারা আরবে গান গেয়ে বেড়াতেন। তা ছাড়া তখনকার দিনের নামী গায়িকাদের (কিয়ান) মধ্যে ছিলেন জামিলা (৭২০ খ্রিঃ)। তিনি মদীনার এক ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁকে প্রথম যুগের সংগীত সম্রাজ্ঞী বলে গণ্য করা হত।[১৫৭] তাঁর বাড়িতে মক্কা এবং মদীনার শীর্ষস্থানীয় সুরকার ও সংগীতজ্ঞদের আসর বসত। অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে যে-বিখ্যাত ব্যক্তিটি তাঁর বাড়িতে প্রায়শই আসতেন তিনি হলেন 'প্রেমের কবি' উমর ইবন-আবি-রবীআহ্'। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন হাবাবাহ্ এবং সাল্লামাহ্। এরা দুজনেই দ্বিতীয় ইয়াজিদের খুব প্রিয় ছিলেন। জামিলার খ্যাতির চূড়ায় ওঠা চূড়ান্ত হয় মক্কাগামী এক তীর্থযাত্রীর দলের নেত্রী হওয়ার পর। এই দলে কবি, গায়ক-

গায়িকা, সুরকার, বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধরা ছিলেন। ব্যাপক জাঁকজমক করে সুসজ্জিত এই দিলের প্রত্যেকেই ছিলেন সুন্দর পোশাক পরিহিত। ঘোড়াগুলিকে পর্যন্ত সুসজ্জিত করা হয়।[১৫৮]

তখনকার দিনে অভিজাত মহিলারা বাড়িতে মাঝেমধ্যে গানবাজনার আসর বসাতেন। সেখানে নামীদামী গায়ক-গায়িকারা উপস্থিত থাকতেন। পারস্য থেকে আমদানি করা কাঠের খোলের বীণা আল-হিরার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছিল। তা এই সময় আরবদেশীয় চামড়ার খোলের বীণাকে অনেকাংশেই বাতিল করে দেয়। ওই সময়কার আরেক প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল 'মিজাফা'। খ্রিস্টানদের প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়ার বাদ্যযন্ত্রের মতো ছিল এই বাজনা। ঐক্যতান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল বাঁশি (কাসাবা), নলকাঠি (মিজমার), শিঙ্গা (বুক)। পিটিয়ে বাজানোর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল চারচৌকা খঞ্জনি, মহিলারা এই বাদ্যযন্ত্র খুবই পছন্দ করতেন। আর ছিল ড্রাম (তবল), করতাল অথবা শক্ত কাঠ কিংবা গজদন্ত নির্মিত ছোট করতাল বিশেষ (সুনূজ)। সঙ্গীতের সুর মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম শিখে নিত। শেষে তা হারিয়ে গেছে। 'আগানি' থেকে জানা যায়, উমাইয়া আমলে কবিতা গানে রূপান্তরিত করা হত। কিন্তু কোন চিহ্ন নেই উল্লেখ করার মতো। আল-হিরাতে একবার ইরাকি সঙ্গীতের প্রথম সারির খ্রিস্টান গায়ক হুনাইন আল-হীরি গান গাইতে এসেছিল সুকাইনার বাড়িতে। সেখানে এত শ্রোতা সমাগম হয়েছিল যে, যে-বারান্দায় ওই অনুষ্ঠান হয়েছিল তা ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। তাতে বহু নামীদামী শিল্পীর মৃত্যু হয়।[১৫৯] মক্কায় হজের সময় সারা বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা একত্রিত হতেন। সেখানে আল-হিজাজের গায়ক এবং বাজিয়েরা নিজেদের প্রতিভা জাহির করার সুযোগ পেতেন। এছাড়া তাঁরা মরুযাত্রীদের মক্কা অভিমুখে যাত্রার সময়ও সঙ্গীত পরিবেশন করে আনন্দ দিতেন। 'আগানি' এই সঙ্গীতমুখর তীর্থযাত্রী-মিছিলের বিবরণ দিয়েছে। এমন এক মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন কবি-গায়ক, উমার-ইবন-আবি-রবীআহ্। সুন্দর পোশাক পরে মহিলা পথচারী পরিবেষ্টিত হয়ে এগোতেন রবীআহ্। তার সঙ্গে ছিলেন ইবন-সুরাইজ, যার গান শুনে তীর্থযাত্রীরা নাকি এত মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় আচরণ পালন করতেই ভুলে গিয়েছিলেন।[১৬০]

এভাবে মক্কা এবং বিশেষত মদীনা, উমাইয়া সাম্রাজ্যের গানের আঁতুড়ঘর এবং বাদ্যের শিক্ষালয়[১৬১] হয়ে ওঠে। এই মক্কা-মদীনাই দামাস্কাসের রাজসভায় জ্ঞানী-গুণীজনদের যোগান দিত। এসব দেখে রক্ষণশীলরা এবং উলামারা আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন, মদ ও জুয়াখেলার মত বাদ্য ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ প্রমোদ (মালাহী)। তাঁরা মুহাম্মাদের 'হাদীস'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই শক্তিশালী চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমটিকে এমনভাবে কালিমালিপ্ত করেন যেন মনে হয়, শয়তানই মানুষকে প্রলুব্ধ করে ফেলল। কিন্তু সঙ্গীত সৃষ্টির যে জোয়ার এসেছিল তাকে রোধ করা সম্ভব হল না। কাব্যদেবীর পক্ষেই সাধারণ মানুষের সমর্থন বেশি ছিল। তাই সঙ্গীতানুরাগীরাও মুহাম্মাদের উদ্ধৃতি[১৬২] দিয়েই উলামাদের আক্রমণ করলেন। তাঁরা বললেন,

কবিতা, গান, এবং সুর সবসময় হীনচরিত্রের নয়। বরং সামাজিক আদানপ্রদানে এবং পুরুষ-মহিলার সম্পর্কের সচেতনতায় সঙ্গীতের মূল্য অপরিসীম।[১৬৩] উমাইয়া সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলিফা প্রথম ইয়াজিদ নিজেও একজন সুরস্রষ্টা ছিলেন। তিনি দামাস্কাসের রাজসভায় গান গাওয়া এবং বাদ্যযন্ত্রের আসর বসানোর প্রচলন করেন।[১৬৪] তিনি রাজপ্রাসাদেও সঙ্গীত উৎসবের সূচনা করেন, যেখানে মদ্যপান এবং গানের ফোয়ারা ছুটত। এরপর থেকে তা রাজপরিবারের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যায়। আবদ-আল-মালিক হিজাজি ঘরানার গায়ক ইবন-মিসজাহ্কে মদত করতেন। তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দামাস্কাসে ইবন-সুরাইজ এবং মা'বাদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ এবং মিতব্যায়ী উমারের উত্তরাধিকার, দ্বিতীয় ইয়াজিদ হাবাবাহ্ এবং সাল্লামাকে মদত দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, তিনিও কত বড় পৃষ্ঠপোষক সঙ্গীতের।[১৬৫] আল-হিরার গায়ক হুনাইন খলিফা হিশামের মদত পান। সৌন্দর্যপিয়াসী দ্বিতীয় ওয়ালীদ নিজে বীণাবাদক ছিলেন। তিনি অনেক গানেও সুর দিয়েছেন। তাঁর রাজসভায় তিনি বহু বিখ্যাত সঙ্গীতকার এবং সুরকারকে আমন্ত্রণ জানান, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মা'বাদ।[১৬৬] তাঁর আমলেই আল-হিজাজের যমজ শহরে সঙ্গীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রসার হয়। উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিককার রাজাদের আমলে সঙ্গীতশিল্পের এত বিকাশ হয় যে তাঁদের চিরশত্রু আব্বাসীয় গোষ্ঠী এই সুযোগ নিয়ে এই বলে বিরুদ্ধপ্রচার করেন যে, উমাইয়া রাজারা হচ্ছেন 'অধার্মিক দখলদার'। আর সেই প্রচারে কাজও হয়। ❑

• টীকা •

১ ইংরাজিতে বাসোরা। বর্তমানে আল-বাসরা প্রাচীন শহরের ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

২ আল-কূফা সম্ভবত আল-বাসরার পত্তনের দু-এক বছর পরে গড়ে ওঠে। ইয়াকূত, চতুর্থ খণ্ড, ৩২২-৩৩ পৃঃ।

৩ ইস্তাখরি ; ৮০ পৃঃ। ইবন-হাওকাল ১৫৯ পৃঃ।

৪ প্রথম খণ্ড, ৪২৯-৩০ পৃঃ = দ্য স্লেন, প্রথম খণ্ড, ৬৬৩ পৃঃ।

৫ ইবন-খাল্লিকান, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২৩ পৃঃ। আবু-আল-ফিদা, প্রথম খণ্ড, ২১৫-১৬ পৃষ্ঠা।

৬ হিট্টির মূল ইংরেজির নীচে দেখুন, ৩৯৩ পৃ ২ নং নোট।

৭ ইবন-খাল্লিকান, প্রথম খণ্ড, ২২৮ পৃঃ।

৮ আল-নাবাবি, তাহযিব আল-আসমা, সম্পাদনা : এফ ওয়েস্টেনফিল্ড (গটিনজেন ; ১৮৪২-৪৭) ৩৭০ পৃঃ।

৯ ইবন-সা'দ, ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, ১১০-১১ পৃঃ।

১০ আল-সামআনি, আল আনসাব, সম্পাদনা : মারগোলিয়থ (লিডেন,১৯১২), খোলা গ্রন্থের ডান পাতা ৩৩৪; তুলনীয়: ইবন-খাল্লিকান, প্রথম খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ।

১১ আল-নাদিম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, সম্পাদনা : জি ফ্লুজেল (লিপজিগ, ১৮৭২), ৮৯ পৃঃ, ১.২৬ ; তুলনাকরণ ইবন-খালিক্কান; দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ।

১২ চতুর্থ খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

১৩ আল-তিজান ফি মুলুক হিমিয়ার (হায়দরাবাদ, ১৩৪৭) ওই সংযোজিত সংখ্যা (৩১১-৪৮৯ পৃঃ) আবিদ-এর লেখা 'আখবার আবিদ।'

১৪ ইবন-খাল্লিকান. তৃতীয় খণ্ড, ১০৬-৭ পৃঃ; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ২৪৯৩-৯৪ পৃঃ। নাবাবি. ৬১৯ পৃঃ।

১৫ নাবাবি দেখুন ৫২৩ পৃঃ; ইবন-সা'দ, ৭ খণ্ড. ২ ভাগ, ১৫৬ পৃঃ; ইবন-কুতাইবাহ, মাআরিফ, ২১৯ পৃঃ।

১৬ মাসউদী, ৬ খণ্ড, ২২ পৃঃ, ৭ খণ্ড, ২৩৪ পৃঃ। তুলনা করুন, শাহরাস্তানি, ৩৩ পৃঃ; আল বাগদাদী, উসুল আল-দিন (ইস্তাম্বুল, ১৯২৮), প্রথম খণ্ড, ৩৩৫ পৃঃ। ওর 'মুখতাসার আল-ফার্ক বাইন আল-ফিরাক, সম্পাদনা : হিট্টি (কায়রো, ১৯২৪), ৯৮ পৃঃ। আল-নওবাখতি, ফিরাক-আল-শী'য়াহ, সম্পাদনা : এইচ রিটার (ইস্তাম্বুল, ১৯৩১), ৫ পৃঃ।

১৭ তুলনীয় : আল-ইজি, কিতাব আল-মাওয়াকিফ, সম্পাদনা : থিওডর সোয়েরেনসেন (লিপজিগ, ১৮৪৮), ৩৩৪, ৩৬২ পৃঃ।

১৮ সুরাহ্ : ৩ : ২৫-২৬, ১৫ : ২১, ৪২ : ২৬, ১০, ৫৪ : ৪৯ ইত্যাদি। ইবন-হাজম, ৩য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ।

১৯ ইবন-আল-ইবরি, ১৯০ পৃঃ, ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৪০২ পৃঃ।

২০ পলস পিট্রাস : অ্যানালেকতা বোল্যানডিয়ানা, ৪৯ খণ্ড, (ব্রাসেলস, ১৯৩১), ২৭৬-৩১২ পৃঃ।

২১ পৃষ্ঠা ৩০৫।

২২ ইবন-আল-জাওযী, 'নাকদ-আল-ইলম-অ-আল-উলামা' (কায়রো, ১৩৪০), ১০২ পৃঃ।

২৩ শাহরাস্তানি, ১০০ পৃঃ ; বাগদাদী, হিট্টি সম্পাদিত, ৮৭-৮৮ পৃঃ ; ইজি ৩৫৬ পৃঃ।

২৪ তুলনীয় : বাগদাদী, অপ. সিট. ১২২-২৩ পৃঃ ; ইবন-হাজম, ২ খণ্ড, ৮৮ পৃঃ।

২৫ আরবী শব্দ থেকে এটা এসেছে। যার অর্থ অগ্রগামী বা নেতৃত্বদায়ী। অবশ্য কোরানে (২ : ১১৮, ১৫ : ৭৯, ২৫ : ৭৪, ৩৬ : ১১) কোনরকম টেকনিক্যাল অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়নি। কোরানে 'ইমাম' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি আনুশাসনিক কাজের সঙ্গে জড়িত। আনুশাসনিক অর্থাৎ ধর্মীয় আচার-আচরণের ওপর নজরদারির কাজ। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ এবং তারপর অন্য খলিফারা বা তাঁদের প্রতিনিধিরাই এই কাজ সম্পাদন করতেন। ইবন-খালদূন, মুকাদ্দামা, ১৫৯-৬০ পৃঃ।

২৬ সুন্নিদের সম্পর্কে জানতে পড়ুন : ইজি, ২৯৬ ও পরবর্তী পৃঃ।

২৭ শাহরাস্তানি, ১০৮-৯ পৃঃ, মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ।

২৮ সুন্নিরা ভুল এবং পাপকাজ থেকে নানাভাবে রেহাই দিয়েছেন শুধু ধর্মপ্রবক্তাদের, বিশেষত মুহাম্মাদকে। ইবন-হাজম, ৪র্থ খণ্ড, ২-২৫ পৃঃ। গোল্ডযিহার লিখিত দার ইসলাম, ৩য় খণ্ড (১৯১২), ২৩৮-৪৫ পৃঃ ; ইজি, ২১৮ ও পরবর্তী পৃঃ।

২৯ নীচে দেখুন, ৪৪০ ও পরবর্তী পৃঃ।

৩০ বাগদাদী, হিট্টি সম্পাদিত, ১৫৭ পৃঃ, ইবন-আল-জাওযী, নাক্‌দ, ১০৩-৪ পৃঃ।

৩১ ইজি, ৩৪৩ পৃঃ।

৩২ সব মিলিয়ে এখন প্রায় ৫ কোটি শী'আপন্থি রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ থাকেন ইরানে, ৭০ লক্ষ থাকেন ভারতে, ৩০ লক্ষ থাকেন ইরাকে, ৪০ লক্ষ থাকেন ইয়ামানে, এখানে তারা জাইদী নামে পরিচিত। আর লেবাননে ও সিরিয়ায় থাকেন সাড়ে ৩ লক্ষ শী'আপন্থি, এখানে তাঁরা মাতাবিলাহ্ (অর্থাৎ আলীর 'গোঁড়া অনুগামী') নামে পরিচিত। উগ্র মতবাদীদের মধ্যে রয়েছেন ইসমাইলী, দ্রুজী, নুসাইরী ইয়াজিদী এবং আলী-ইলাহি। এরা মিলিত হয়ে সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সারা বিশ্বে প্রায় ৬ কোটি। অর্থাৎ বিশ্বের সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার ১৪ শতাংশের মতো। তুলনীয় : হিট্টিব মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে, ৩য় পৃষ্ঠা; নীচে, ৪৪৯ পৃষ্ঠা।

৩৩ ইবন-আল-জাওযী, সীরাহ, ১২১-১২৬ পৃঃ।

৩৪ ইবন-কুতাইবাহ্, উয়ূন-আল-আখবার', ২য় খণ্ড, ২৩১-৫২ পৃঃ। আল-জাহিজ, আল-বায়ান, প্রথম খণ্ড (কায়রো, ১৯২৬), ১৭৭ ও পরবর্তী পৃঃ, ইকদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭২ ও পরবর্তী পৃঃ।

৩৫ আরও জানতে পড়ুন কালকাশান্দি, সুবহ ৬ খণ্ড, ৩৮৮-৩৯১ পৃঃ।

৩৬ ১ম খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ; তুলনীয় : মাসউদী, ৬ খণ্ড, ৮১ পৃঃ।

৩৭ বুওয়াইহী খলিফা রুকন-আল-দাওলাহ-এর উজির।

৩৮ জাহিয, বায়ান, ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃঃ। ইবন-কুতাইবাহ, মাআরিফ, ২১৬ পৃঃ, তাবারী, ২য় খণ্ড, ৪৩৮-৩৯ পৃঃ।

৩৯ ইবন কুতাইবাহ, মাআরিফ ; ১৫৩ পৃঃ। তুলনীয় : আগানী, ১৫ খণ্ড, ৭৩ পৃঃ; ১.২৮। দেখুন. জাহিয, বায়ান, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ।

৪০ দিওয়ান, পল শোয়ার্জ সম্পাদিত. ২ খণ্ড, (লিপজিগ, ১৯০১-১৯০৯)।

৪১ আগানী, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃঃ। তাঁর জীবন ও কাজের জন্য দেখুন জিব্রায়েল জাব্বুর-এর 'উমার-ইবন-আবি-রবীআহ্, ২ খণ্ড, (বেইরুট ; ১৯৩৫)।

৪২ ইবন-কুতাইবাহ, শি'র ৩৪৯ পৃঃ।

৪৩ ডবলিউ জে প্যালগ্রেভের 'এসেজ অন ইস্টার্ণ কোশ্চেনস' (লণ্ডন, ১৮৭২), ২৭৯ পৃঃ।

৪৪ ইবন-কুতাইবাহ, শি'র ২৬০-৬৮ পৃঃ, আগানী, ৩য় খণ্ড, ৭৭-১১০ পৃঃ।

৪৫ আগানী, ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা; ইব্ন-খল্লিকান কর্তৃক উদ্ধৃত' ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৪৬ আল-কুতুবি, ফওয়াত-আল-ওয়াফায়াত (বুলাক, ১২৮৩), ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃঃ। এতে তাঁর মৃত্যুকাল হিজরী সন ৮০ বলা হচ্ছে অর্থাৎ ৬৯৯ খ্রিঃ।

৪৭ ইবন-কুতাইবাহ, শি'র ৩৫৮-৬২ পৃঃ।

৪৮ আগানী, ১৮ খণ্ড, ৭১-৭২ পৃঃ। ইবন-কুতাইবাহ, শি'র ৩৪৭ পৃঃ তুলনীয়।

৪৯ দেখুন ফিহ্‌রিস্ত, ৯১ পৃঃ। ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৯৪ পৃঃ।

৫০ ইবন-কুতাইবাহ, মাআরিফ ২৬৮ পৃঃ।

৫১ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৯২পৃঃ; আগানী, ৫ম খণ্ড, ১৬৪-১৬৫পৃঃ। দেখুন ইকদ, ৩য় খণ্ড, ১৩৭-১৩৮ পৃঃ।

৫২ ইবন-কুতাইবাহ, শি'র, ৩০১-৩০৪পৃঃ।

৫৩ ওই দেখুন ২৯৭-২৯৮ পৃঃ, ফারাজদকের প্রশংসাসূচক লেখার জন্য দেখুন তাঁর রচনা 'দিওয়ান' (সম্পাদনা আর বুশার (প্যারিস, ১৮৭৫), দিওয়ানে প্রায় সর্বত্র উল্লিখিত।

৫৪ ইবন-কুতাইবাহ, ২৮৭পৃঃ। তাঁর স্তুতিগাথার নমুনার জন্য দেখুন দিওয়ান (কায়রো, ১৩১৩), ১ম খণ্ড।

৫৫ তাঁকে নিয়ে লেখা দেখুন আগানী, ৮ম খণ্ড, ১৮৬-৯৭পৃঃ; ১৯ খণ্ড ২-৫২পৃঃ। ইবন - খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ১৩৬-৪৬ পৃঃ = দ্য স্লেন, ৩য় খণ্ড, ৬১২-২৮পৃঃ, জোসেফ হেল, দাস লেবেন দস ফারাজদক (লিপজিগ, ১৯০৩)।

৫৬ আগানী, ৭ম খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ, যেখানে তাঁর ধর্মানুরাগের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৫৭ ইবন-সা'দ, ৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ৯১পৃঃ ২, ১০-১১, দেখুন ওই বইতেই ৫ম খণ্ড ৩০৯ পৃঃ, ২, ৭ ও পরের পাতা। আগানী ৬খণ্ড, ১৬৫পৃঃ, ১.৯।

৫৮ মুবাররাদ, ৭৭পৃঃ, ২. ৬-৭।

৫৯ ইয়াকুত, মুজাম-আল-উদাবা, সম্পাদনা : মারগোলিয়থ, ১ম খণ্ড (লিডেন, ১৯০৭), ২৫-২৬ পৃঃ।

৬০ ইবন-আল-জাওযী, সীরাহ, ২৫৭-২৫৮ পৃঃ। দেখুন জাহিয. ২য় খণ্ড, ১৩৮-৪৩ পৃঃ।

৬১ সুয়ুতি, হুসন, ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠায়। দেখুন কিন্দি; উলাহ, ৮৯পৃঃ

৬২ জাহিয-এর বায়ান, ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠায় আবদ-আল-মালিকের পুত্রদের শিক্ষক হিসেবে তাঁকে দেখানো হয়েছে।

৬৩ ইবন সা'দ, ৬খণ্ড, ২১০পৃঃ।

৬৪ ইয়াকুত, উদাবা, ২য় খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ।

৬৫ ওই ৪১২ পৃঃ।

৬৬ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, উয়ূন-আল-আনবা' ফি তাবাকাত আল-আতিব্বা, সম্পাদনা : এ ম্যুলার (কায়রো, ১৮৮২), ১ম খণ্ড, ১০৯পৃঃ , ইবন-আল-ইবরি,১৫৬পৃঃ।

৬৭ ইবন-আল-ইবরি, ১৫৬-১৫৭পৃঃ; কিফ্‌তি, হুকামা, ১৬১পৃঃ।

৬৮ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃঃ। দেখুন নাবাবি, তাহযিব, ৫৯৩ পৃঃ।

৬৯ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃঃ।

৭০ ওই দেখুন, ১২১ পৃঃ; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে দেখুন ২২০ পৃঃ।

৭১ ইবন-আল-ইবরি, ১৯২ পৃঃ।

৭২ ওই দেখুন, ১৯৫ পৃঃ। তাবারী, ২খণ্ড, ১১৯৬ পৃঃ।

৭৩ ইবন-আল-উসাইবিয়া, ১ম খণ্ড, ১১৬পৃঃ.২.২৫-৬।

৭৪ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ২৪২, ৩৫৪পৃঃ।

৭৫ জুলিয়াস রুসকা, 'আরাবিশে অ্যালকেমিস্টেন', ১. চালিদ ইবন জাজিদ ইবন মু'আবিযা (হাইডেলবার্গ, ১৯২৪), ৮ ও পরবর্তী পৃঃ।

৭৬ ফিহ্‌রিস্ত, ৩১৭পৃঃ, ১.২৫; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ১৮৫পৃঃ = অ-আল-দ্য স্লেন, ১ম খণ্ড, ৩০০পৃঃ; হাজি খালফা, কাশফ আল-জুনূন আন আসামি আল-কুতুব ওয়াল ফুনুন। সম্পাদনা : ফ্লুজেল, ২য় খণ্ড (লিপজিগ ১৮৩৭), ৫৮১, ৬০৪পৃঃ ৩য় খণ্ড (লন্ডন, ১৮৪২) ৫৩পৃঃ, ১২৮পৃঃ।

৭৭ জে রুসকা, আরাবিশে অ্যালকেমিস্টেন, ২ জাফর আলসাদিক, দার শেক্তে ইমাম (হাইডেলবার্গ, ১৯২৪), ৪১-৫৯পৃঃ।

৭৮ ইবন-হিশাম, ৩৩৬-৩৩৭পৃঃ।

৭৯ বালাযুরি,৬পৃঃ; বুখারী, ১ম খণ্ড, ১০৫-১০৭পৃঃ।

৮০ ওরিয়েন্টালিস স্টাডিয়েন, থিওডোর নোলডেক, সম্পাদনা : সি বেজোল্ড (গিয়েসেন, ১৯০৬) ১ম খণ্ড, ৩৩১ ও পরের পাতা। সি এইচ বেকার বলেছেন যে 'মিনবার' ছিল প্রকৃতপক্ষে শাসকদের ব্যবহৃত সিংহাসন বা উচুঁ আসন। এর সঙ্গে ধর্মচর্চার কোন সম্পর্ক ছিল না।

৮১ ইবন-সা'দ, ১ম খণ্ড, ২ভাগ, ৯পৃঃ; এফ ওস্টেনফেল্ড, গেশিশতে দার স্ট্যাড মেদিনা (গটিনজেন, ১৮৬০), ৬৩পৃঃ। দেখুন বুখারী, ১ম খণ্ড, ১০৭পৃঃ।

৮২ ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ২ভাগ, ৩-৫পৃঃ।

৮৩ মদীনায় আসার এক কি দু'বছর বাদে হযরত মুহাম্মাদ নামাযের জন্য আযান বা 'আহ্বান' শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে তিনি একই উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান গির্জায় ব্যবহৃত কাঠের ঘন্টা (নাকুস) মসজিদগুলিতেও চালু করার কথা ভেবেছিলেন। ইবন-সা'দ, ১ম খণ্ড, ২ভাগ, ৭পৃঃ।

৮৪ 'মোহামেডান' শব্দটি ব্যবহারের বিরোধী আধুনিক মুসলমান সমাজ। কারণ খ্রিস্টের উপাসকদের 'খ্রিস্টান বলা হয়। কিন্তু মুসলিমদের বক্তব্য হল, তাঁরা যে মুহাম্মাদের উপাসক নন, তা হলে তাঁদের 'মোহামেডান' বলা হবে কেন?

৮৫ বালাযুরি, ৩৪৬-৩৪৭পৃঃ, ৩৫০পৃঃ। ইয়াকুত, বুলদান, ১ম খণ্ড, ৬৪২পৃঃ।

৮৬ তাবারী, ১ম খণ্ড, ২৪৮৯পৃঃ। ইয়াকুত, ৪র্থ খণ্ড, ৩২৩-২৪ পৃঃ।

৮৭ ২১১-২১২পৃঃ।

৮৮ পুরানো বহু বাড়িতে এই জিনিস ছিল। তা জানতে দেখুন ইয়াকুত, ৩য় খণ্ড, ৮৯৯-৯০০ পৃঃ।
৮৯ মাকরিজি, (বুলাক), ২য় খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ ১.৩০।
৯০ ইয়াকুত, ৪র্থ খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।
৯১ তাবারী, ১ম খণ্ড, ২৪৪৩, ২৪৫১পৃঃ।
৯২ বালাযুরি, ১২৫পৃঃ। ইয়াকুত, ২য় খণ্ড, ৫৯১পৃঃ। ইবন-জুবাইর ২৬২পৃঃ।
৯৩ ইসতাখরি, ৬১পৃঃ; ইবন-হাওকাল, ১১৭পৃঃ। মাকদিসি, ১৫৬পৃঃ।
৯৪ মাকরিজি, ২খণ্ড, ২৪৭পৃঃ ২. ১৬-১৭; মাকদিসি, ৮০ পৃঃ, ১. ১৭; ইবন-বতুতা, ১ম খণ্ড, ২৭১-২৭২পৃঃ, ইবন দুকমাক, আল-ইন্তিসার লি-ওয়াসিতাত ইকদ-আল-আমসার, সম্পাদনা : ভলার্স (বুলাক, ১৮৯৩), চতুর্থ ভাগ, ৬২ পৃঃ, ১.১২; সুয়ুতি, হুসন, ২য় খণ্ড, ১৪৯পৃঃ।
৯৫ ইবন-আল-ফাকীহ, ১০৯পৃঃ ১.২.।
৯৬ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৫৭১ পৃঃ। অনেকে আবার এর জন্য মারওয়ান ইবন-আল হাকামকে দায়ী করেন। (বালাযুরি, ৬পৃঃ, ১.১৬ = হিট্টি, ২০পৃঃ)। অথবা দায়ী করা হয় উসমানকে (মাকরিজি, ২য় খণ্ড, ২৪৭পৃঃ ১. ৩২)।
৯৭ দিনাওয়ারি, ২২৯ পৃঃ; ইবন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ২২৪-২২৬ পৃঃ। দেখুন তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩৪৬৫ পৃঃ, ২, ৮-৯।
৯৮ তুলনীয় আগানী, ১৭খণ্ড,১১৬পৃঃ, ১.৬ ।
৯৯ মাকদিসি ১৮২ পৃঃ ২.৮-৯।
১০০ ইবন-আল-ফাকীহ, ১০৮পৃঃ। তুলনীয় : ইবন-বতুতা, ১ম খণ্ড, ২০৩পৃঃ।
১০১ মাকরিজি, ২য় খণ্ড, ২৮৪পৃঃ।
১০২ বালাযুরি, ৩৪৮ পৃঃ।
১০৩ ওস্টেনফেল্ড, স্ট্যাড, ৭৫পৃঃ। ইবন-বতুতা, ১ম খণ্ড, ২৭২পৃঃ।
১০৪ মরিস জ্যাসট্রো, দা সিভিলাইজেশন অব ব্যাবিলনিয়া অ্যাণ্ড অ্যাসিরিয়া (ফিলাডেলফিয়া, ১৯১৫), ৩৭৬-৩৭৭পৃঃ, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের দেখুন নীচে ৪১৮-১৯পৃঃ।
১০৫ ইবন-সা'দ, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ৩পৃঃ; দেখুন কোরান ২.১৩৬, ১৩৮।
১০৬ জেরুসালেমে 'রোজ কেয়ামত'-এর দৃশ্যের জন্য দেখুন নুওয়াইরী, ১ম খণ্ড, ৩৩৪ ও পরবর্তী পৃঃ।
১০৭ মাকদিসি, ১৫৯পৃঃ।
১০৮ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৩১১পৃঃ।
১০৯ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে দেখুন ২২০পৃঃ।
১১০ কায়রোর আরব জাদুঘরে একটি স্মৃতিস্তম্ভের পাথর রয়েছে, যা পুরানো কায়রোর কবরখানা থেকে পাওয়া গেছে। এই পাথর কুফী ভাষায় লেখা রয়েছে । তারিখ রয়েছে হিজরী সন ৩১(৬৫১-৬৫২খ্রিঃ)। আল-হিলালে 'হাসান মুহাম্মাদ আল-হাওয়ারী' দেখুন। ৩৮ খণ্ড (১৯৩০), ১১৭৯-৯১ পৃঃ।

১১১ মাকদিসি, ১৫৯পৃঃ। গম্বুজটি বাসরার ক্যাথিড্র্যালের আদলে তৈরি। দেখুন এম এস ব্রিগস, মুহাম্মাদান আর্কিটেক্চার ইন ইজিপ্ট অ্যান্ড প্যালেস্টাইন (অক্সফোর্ড, ১৯২৪), ৩৭পৃঃ।

১১২ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ২০৯পৃঃ।

১১৩ পৃঃ ১০০-১০১।

১১৪ পৃঃ ১৬৯-৭১ পৃঃ।

১১৫ পৃঃ ১০০।

১১৬ পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

১১৭ আলেপ্পো, হিমস এবং বেইরুটে এখনও যেসব নামকরা মসজিদ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি অতীতে গির্জা ছিল।

১১৮ ইয়াকুত, ২য় খণ্ড, ৫৯৩ পৃঃ।

১১৯ মাকদিসি, ১৫৮ পৃঃ। ইবন-আসাকির, ১ম খণ্ড, ২০২পৃঃ; ইবন-জুবাইর, ২৬১পৃঃ। তাবারী, ২য় খণ্ড, ১১৯৪পৃঃ।

১২০ এইচ আই বেল-এর দার ইসলাম, ২য় খণ্ড (১৯১১), ২৭৪ ও ৩৭৪পৃঃ।

১২১ ১৫৭পৃঃ। দেখুন ইসতাখরি, ৫৭পৃঃ। ইবন-রুসতাহ, ৩২৬পৃঃ।

১২২ ই ডি লোরে এবং এম ভান বারশেম, লা মোজাইক দ্য লা মস্ক দাস উমাইয়াদ আ দামাস (প্যারিস, ১৯৩০)। কে এ সি ক্রেসওয়েল, আর্লি মুসলিম আর্কিটেকচার, ১ম ভাগ (অক্সফোর্ড ১৯৩২) ১১৯-২০পৃঃ।

১২৩ ইবন-আল-ফাকীহ, ১০৬পৃঃ; ইবন-আসাকির, ১ম খণ্ড, ১৯৮পৃঃ; ইয়াকুত, ২য় খণ্ড, ৫৯১পৃঃ।

১২৪ সাম্প্রতিককালে সিরিয়া এবং মিশরে ইউরোপীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মূল কিন্তু প্রোথিত ছিল শুক্রবারের মসজিদের সমাবেশে।

১২৫ দেখুন ওপরে, ২১৫ পৃঃ ইবন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ২২৪পৃঃ।

১২৬ বালাযুরি, ২৯০পৃঃ; মাসউদী, তানবীহ্, ৩৫০পৃঃ ইয়াকুবী, ৩২২পৃঃ।

১২৭ জি এল বেল, প্যালেস অ্যাণ্ড মস্ক অ্যাট উখাইদির (অক্সফোর্ড, ১৯১৪), ১৮৭পৃঃ।

১২৮ ইয়াকুত, ৪র্থ খণ্ড, ৬৮৭পৃঃ। আল-বলকায় অবস্থিত ছিল এই প্রাসাদ। জায়গাটা ছিল পূর্ব-জর্ডনের দক্ষিণ প্রান্তে।

১২৯ লাতিন ভাষায় শব্দ 'কাস্টেলাম' থেকে 'ক্যাসল' শব্দটি এসেছে. এর অর্থ দুর্গ। দেখুন ইয়াকুত, ৪র্থ খণ্ড, ৯৫পৃঃ।

১৩০ তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৭৪৩ পৃঃ।

১৩১ বেদুইন উচ্চারণে মাসাট্টা। এর অর্থ শীতকালীন বিশ্রামকেন্দ্র।

১৩২ আর ই ব্রুনো এবং এ ভি দোমাসজিউ, 'ডাই প্রভিন্সিয়া আরাবিয়া, ২য় খণ্ড (স্ট্র্যাসবুর্গ, ১৯০৫), ১০৫-৭০পৃঃ; বি শুলজ এবং জে স্ট্রেজিগোস্কি, 'মাশট্টা' যাহ্বাখ দর কোনিগ্লিখ-প্রিউজিশেন কান্সটসামলুনগেন, ২৫ খণ্ড, (১৯০৪), ২০৫---৩৭৩ পৃঃ।

১৩৩ কুসায়ির আমরা অ্যাণ্ড অ্যাড্রে স্কলসার অর্স্টলিক ফন মোয়াব, ১ম ভাগ (ভিয়েনা, ১৯০২) ৫ম ও পরবর্তী পৃঃ। মুসিল, কুসেজর আমরাহ্, আই-টেক্সটব্যাণ্ড (ভিয়েনা, ১৯০৭)। ঐতিহাসিক মুসিল দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদকেই কুসায়ির আমরাহ্ প্রাসাদের নির্মাতা হিসেবে মনে করতেন।

১৩৪ বুখারী, ৭ম খণ্ড, ৬১ পৃঃ।

১৩৫ স্তবগান শুরু হত 'লাব্বায়কা' শব্দের উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে। 'লাব্বায়কা' অর্থাৎ 'এই যে আমি'। সূত্র : বুখারী ২য় খণ্ড, ১৩৫পৃঃ।

১৩৬ ৮ম খণ্ড; ৯২পৃঃ।

১৩৭ আলমদাদ ১ : ১:২০।

১৩৮ মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ৯৩পৃঃ।

১৩৯ আগানী, ২য় খণ্ড. ১৭৫পৃঃ।

১৪০ ইকদ, ৩য় খণ্ড, ২৩৭। মাসউদী, ৮ম খণ্ড. ৯৩পৃঃ।

১৪১ সম্ভবত তাঁর কথাই কোরানের একটি সূরাহ্র মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। ৩১ : ৫-৬

১৪২ মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ৯৩-৯৪পৃঃ।

১৪৩ আগানী, ১ম খণ্ড, ৯৮পৃঃ।

১৪৪ জার্নাল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯২৯), ১১৯ও পরবর্তী পৃঃ। ৪৮৯ও পরবর্তী পৃঃ। এ হিস্ট্রি অব অ্যারাবিয়ান মিউজিক টু দ্য থার্টিনথ সেঞ্চুরি (লণ্ডন, ১৯২৯), ৭পৃঃ।

১৪৫ অষ্টম খণ্ড, ৩য় পৃঃ। দশম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।

১৪৬ আগানী, ১৩খণ্ড, ১৪০পৃঃ।

১৪৭ সূরাহ্ ২৬ : ২২৪-২২৬পৃঃ।

১৪৮ নুওয়াইরি, নিহায়াহ্, ৪র্থ খণ্ড, ১৩২-১৩৫পৃঃ। ফার্মারি এর লেখা অ্যারাবিয়ান মিউজিক, ২৪-২৫পৃঃ, এ. জে. ওয়েনসিন্ক, আ হ্যাণ্ডবুক অব আর্লি মহামেডান ট্রাডিশন (লিডেন, ১৯২৭), ১৭৩পৃঃ।

১৪৯ নাওয়াজী, ১৭৮ পৃঃ। দেখুন নুওয়াইরি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬ ও পরের পাতা।

১৫০ আগানী, ২য় খণ্ড, ১৭০, ১৭১, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

১৫১ আগানী, ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

১৫২ ওই ৩য় খণ্ড, ৮৪পৃঃ।

১৫৩ তাঁর প্রথম নাম ছিল আবদ-আল-মালিক। 'গারীদ' মানে সুগায়ক।

১৫৪ আগানী. ১ম খণ্ড. ৯৯-১০০পৃঃ।

১৫৫ ওই ১ম খণ্ড. ১৫১ পৃঃ।

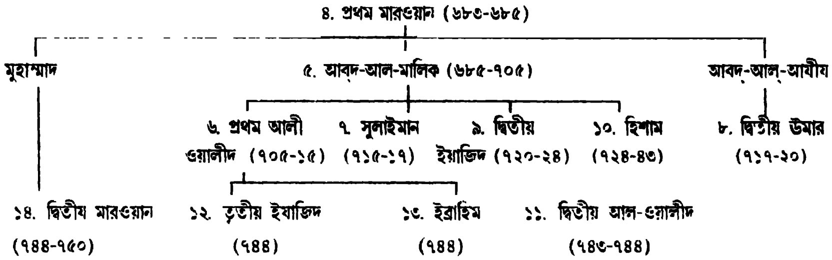
১৫৬ ওই ১৯ ও পরবর্তী পৃঃ।

১৫৭ ওই, ৫ম খণ্ড, ১২৪ ও পরবর্তী পৃঃ।

১৫৮ ওই ৩য় খণ্ড, ১৩৫পৃঃ।
১৫৯ আগানী, ২খণ্ড, ১২৭পৃঃ।
১৬০ ওই ১ম খণ্ড, ১০২পৃঃ।
১৬১ ইকদ, ৩য় খণ্ড, ২৩৭পৃঃ।
১৬২ গাজ্জালী, ইহ্ইয়া উলূম আল-দীন (কায়রো, ১৩৩৪), ২য় খণ্ড, ২৩৮ ও পরবর্তী পৃঃ।
১৬৩ ইকদ, ৩য খণ্ড, ২২৫-২২৬পৃঃ; নাওয়াজী, ১৭৭-১৭৯পৃঃ।
১৬৪ আগানী, ১৬খণ্ড, ৭০ পৃঃ। মাসউদী, ৫ম খণ্ড পৃঃ, ১৫৬-১৫৭পৃঃ।
১৬৫ মাসউদী, ৫ম খণ্ড, ৪৪৬পৃঃ।
১৬৬ ওই, ৬খণ্ড, ৪পৃঃ।

।। অধ্যায় ২২ ।।

উমাইয়া রাজবংশের অবনতি এবং পতন



উমাইয়া রাজবংশের মারওয়ানি শাখার খলিফাদের বংশলতিকা

আরব ঐতিহাসিকরা হিশামকে বরাবরই সম্মানের আসনে বসিয়ে এসেছেন। আমরা আগেও দেখেছি, হিশামকে সঠিকভাবেই মু'আবিয়া এবং আবদ-আল-মালিকের পরে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। এই হিসেবে তাঁকে তৃতীয় সেরা খলিফার মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বানু উমাইয়ার শেষ রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর চারজন উত্তরাধিকারী যে অযোগ্য ছিলেন তা প্রমাণিত। অবশ্য তাঁরা অসৎ বা অধঃপতিত চরিত্রের ছিলেন এমন প্রমাণ মেলেনি। তাঁদের আমলেই এই রাজবংশের পতন হয়। ব্যতিক্রম ছিলেন দ্বিতীয় মারওয়ান, হিশামের রাজত্বের আগে থেকেও খলিফাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কোরান পাঠ ও দেশ শাসনের চেয়ে দাবা খেলে, মদ্যপান করে সঙ্গীত এবং কবিতা চর্চায় বেশি সময় কাটানো। দ্বিতীয় ইয়াজিদ তো নিজেই ছিলেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সময়েই হারেমের প্রহরী হিসেবে খোজা পুরুষ নিয়োগ পদ্ধতি শুরু হয়। এতে হারেম চালু রাখা সম্ভব হয় এবং তা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য বিলাসে মন দেওয়া এবং ক্রীতদাসের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ানোর প্রবণতা এই সময়ই দেখা যায়। এমন কী শাসক রাজপরিবারের লোকজনরা খাঁটি আরবী রক্ত তাঁদের ধমনীতে বহমান থাকার গর্ব আর করতে পারতেন না। তৃতীয় ইয়াজিদই (৭৪৪) ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা যিনি এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর দুই উত্তরাধিকারীও দাসীর গর্ভে জন্ম নেন।[২] শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অধঃপতন থেকেই বোঝা যায়, তখন সাধারণভাবে দেশের নৈতিক চরিত্রের অবনমন

হয়েছিল। সভ্যতার এই অন্ধকার দিকগুলি, বিশেষত মদ্যপান, মহিলাদের নিয়ে বেলেল্লাপনা এবং নাচ-গান, মরুভূমির সন্তানদের জমানার আয়ু ক্ষীণ করে তুলেছিল। আরব যুব সমাজের প্রাণবন্ততাকেই নষ্ট করতে শুরু করল এই দিকগুলি।

● কায়িস বনাম ইয়ামান

আরবীয় সমাজ জীবনের আগাগোড়া যে দুর্বলতা ছিল তা হল উপজাতি সুলভ উদ্দীপনা (আসাবিয়া) এবং তাদের মধ্যেকার বিরোধ। এছাড়া ব্যক্তিত্ববাদকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রবণতা তো ছিলই। এই সমস্ত বিষয়গুলি এই সময়ে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইসলামি বন্ধনে আরব সমাজের যেসব কেন্দ্রাতিগ শক্তি এতকাল নিয়ন্ত্রিত এবং দমিত ছিল তারা এতকাল প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করার পর আবার সংগঠিত হতে শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই ক্রমশই সমাজজীবনে শিথিল হয়ে পড়ল ইসলামিবন্ধন। উসমানের আমল থেকেই এতকাল নিয়ন্ত্রিত থাকা পারিবারিক তেজস্বিতা মাথা তুলতে শুরু করল।

ইরাকে ইসলামি সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ করার আগে উত্তর-আরবের উপজাতিরা বসবাস করতেন। সেখানে টাইগ্রিস নদীর কিনারা বরাবর তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন 'দিয়ার রবীআহ্'। অর্থাৎ 'রবীআহ্' উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাসকেন্দ্র; আর ইউফ্রেটিস নদীর কিনারা বরাবর গড়ে ওঠে 'দিয়ার মুযার'। অর্থাৎ মুযার উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাসকেন্দ্র। বানু-মুযারে প্রথম স্থান ছিল কায়িস উপজাতি গোষ্ঠীর। এছাড়া সিরিয়ায় যেসব উপজাতি গোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে এসেছিল দক্ষিণ আরব থেকে। তাই তাঁদের বলা হত ইয়ামানীয়। সিরিয়ার এই ইয়ামানীয় উপজাতি গোষ্ঠীর আবার উপধারা ছিল বানু-কাল্‌ব। 'খুরাসান' নামক পারস্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বসবাসকারী আরবরা ছিলেন মূলত আল-বসরা থেকে আসা বাস্তুহীন। এরা ছিল উত্তর-আরব থেকে আসা লোকজন। 'খুরাসান' প্রদেশে বসবাসকারী মূল উপজাতি গোষ্ঠীর নাম ছিল 'তামীম'। ইউফ্রেটিস-এর অববাহিকা অঞ্চলে যে 'কায়িস' উপজাতি গোষ্ঠী বাস করত তাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল। খুরাসানে যেসব ইয়ামানীয় লোকজন ছিলেন তাঁরা পরিচিত ছিলেন আজদীয় হিসেবে। আজদ ছিলেন ওদের মধ্যকার নেতৃত্বদায়ী এক পরিবার। তার নামেই উপজাতি গোষ্ঠীর নাম ছিল। অন্য সব প্রদেশে কায়িসপন্থিরা কখনও নিজারীয় বা কখনও মাওয়াদীয়' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য গোষ্ঠীর নাম তত গুরুত্ব পেত না। কোন দেশ থেকে উপজাতিরা এসেছেন, সেটাই বেশি গুরুত্ব পেত। তাই উপজাতি গোষ্ঠীগুলি মূলত উত্তর আরবীয় এবং দক্ষিণ আরবীয় — এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। এছাড়া জাতীয় স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উত্তর আরবীয়রা কখনও দক্ষিণ আরবীয়দের সঙ্গে মিশতে পারেনি। উত্তর আরবীয়রা ছিলেন ইসমাঈল-এর বংশধর। তাঁরা নিজেদের 'আদনানি' বলে পরিচয় দিতেন। আর দক্ষিণ আরবীয়রা ছিলেন 'কাহতান' বংশজাত বাইবেলের 'জেনেসিস' পরিচ্ছেদের ১০:২৫তে

এদের পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ান্তরে কায়িসপন্থিরা একটি রাজনৈতিক দলের ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়, আর ইয়ামানীয়রাও অন্য একটি রাজনৈতিক দলের ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া ইয়ামানীয় কাঁধে ভর করেই সিরিয়ায় রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মু'আবিয়ার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ইয়াজিদের মা মাইসুন ছিলেন ইয়ামানীয় বংশোদ্ভূত 'কাল্‌ব' উপজাতি গোষ্ঠীর মহিলা। ইয়াজিদও 'কাল্‌ব' উপজাতির এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে কায়িসপন্থিরা ইয়াজিদের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মু'আবিয়াকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা ইবন আল-জুবাইরকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। পরে মার্‌জ রাহিত-এর চূড়ান্ত যুদ্ধে (৬৮৪ খ্রি) কায়িসপন্থিদের পরাজিত করে কাল্‌বপন্থিরা জয়ী হলে মারওয়ান রাজসিংহাসনে বসেন। মারওয়ান ছিলেন উমাইয়া রাজবংশের মারওয়ান শাখার প্রধান স্থপতি। প্রথম আল-ওয়ালীদের আমলে আল-হিজাজে কায়িসপন্থিরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথম আল-ওয়ালীদের চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ ভারত বিজয় করেছিলেন। আর কুতাইবাহ মধ্য এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। আল-ওয়ালীদের ভাই সুলাইমান ইয়ামানীয়দের পছন্দ করতেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদের মা ছিলেন মুযার উপজাতি গোষ্ঠীর মহিলা। মায়ের প্রভাবে তিনি কায়িসপন্থিদের সমর্থন করতে বাধ্য হতেন। দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদও তাই করেছেন। তৃতীয় ইয়াজিদ তাঁর পূর্বসূরি দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে ইয়ামানীয়দের ওপর নির্ভর করেছিলেন। উমাইয়া রাজবংশের শাসনকালের শেষার্ধে যেসব খলিফা ক্ষমতাসীন ছিলেন তাঁরা সবাই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার থেকে নির্দিষ্ট এক গোষ্ঠীর মাথা হয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন।

আরবের এই কায়িসপন্থি এবং ইয়ামানীয় শিবিরের মেরুকরণও একসময় মুসলিম দুনিয়ায় ব্যাপ্ত হল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যকার উপজাতিরা নানা নামে পরিচিত থাকলেও সবাই এই মেরুকরণের অংশীদার হয়ে উঠলেন। এই মেরুকরণই উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন করে তুলল। বেশ কিছুকাল ধরেই সাম্রাজের সর্বস্তরে নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল এই পতনের সম্ভাবনা। সামান্য কারণে গোষ্ঠী সংঘর্ষ লেগে যেত যেকোন মুহূর্তে। মা'আদ উপজাতি গোষ্ঠীর একজন লোক দামাস্কাসের এক ইয়ামানীর বাগান থেকে একটি তরমুজ চুরি করেছিল। স্রেফ এই কারণে[৪] দামাস্কাসে দু'বছর ধরে লাগাতার গোষ্ঠী সংঘর্ষ চলেছিল। স্পেনের মার্সিয়ায় এক ইয়ামানীর বাগানের আঙুর গাছের পাতা ছিঁড়েছিল একজন মুযার। সেই নিয়ে বিরোধের জেরে মার্সিয়ায় বছরকয়েক ধরে গৃহযুদ্ধ চলে এবং প্রচুর রক্তপাত হয়।[৫] রাজধানী এবং প্রদেশগুলির সর্বত্র, সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে, সিসিলির তীরে এবং সাহারা সীমান্তে মামুলি পারিবারিক বিরোধ রাজনৈতিক বিরোধে পরিণত হয়ে শেষমেশ দুই গোষ্ঠীর সংঘাতে পরিণত হত। এসব দেখেশুনে ফ্রান্সের যে মুসলমানরা সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত দমে যান এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। আন্দালুসে খিলাফতের পতনও ঘনিয়ে এল। লেবানন এবং

প্যালেস্টাইনে তো সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিষয়টি জিইয়ে ছিল। আমরা জানি, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও ওই দুই দেশে দুই গোষ্ঠীই মারাত্মক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

● উত্তরাধিকারের সমস্যা

রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের কোন সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী নিয়ম না থাকায় তা নিয়ে জাতীয় স্তরে বিরোধের মাত্রা খুব ছোটখাট ছিল না। মু'আবিয়াই প্রথম উত্তরাধিকার হিসেবে নিজের পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসানোর বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পথ দেখান। কিন্তু আরবীয় উপজাতিগোষ্ঠী চলত নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী। এই নিয়মের মূল কথা ছিল বরিষ্ঠতা অর্থাৎ যিনি প্রাচীন এবং বয়োঃজেষ্ঠ্য হতেন, তিনিই সিংহাসনে বসার যোগ্য হতেন। মু'আবিয়ার দেখানো পথ অনুযায়ী পিতা থেকে পুত্রের হাতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল এই উপজাতি রীতি। মু'আবিয়ার নির্দিষ্ট নীতির সঙ্গে প্রাচীন উপজাতি রীতির অবিরাম বিরোধ চলতে লাগল। শেষপর্যন্ত জনগণের দ্বারা স্বীকৃতিই সিংহাসনে আরোহণের একমাত্র নিশ্চিন্ত পন্থা হয়ে দাঁড়াল। উমাইয়া রাজবংশের মোট ১৪ জন খলিফার মধ্যে মাত্র ৪ জন — প্রথম মু'আবিয়া, প্রথম ইয়াজিদ, প্রথম মারওয়ান, আবদ-আল-মালিক—তাঁদের পুত্রদের সিংহাসনে বসাতে পেরেছিলেন। এই জটিল সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায় মারওয়ানি শাখার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টান্ত তাঁর উত্তরাধিকারী অনুসরণ করতে চাওয়ায়।

প্রথম মারওয়ান তার পুত্র আব্‌দ-আল-মালিককে উত্তরাধিকার হিসেবে নির্বাচিত করে যান। তিনি ঠিক করে যান যে, তার পর অপর পুত্র আব্‌দ-আল-আযীযও[৬] একই দৃষ্টান্ত মেনে পরবর্তী খলিফা হবেন। ক্ষমতাসীন হয়ে আব্‌দ-আল-মালিক স্বাভাবিক মনোবৃত্তি অনুযায়ীই কাজ করেন। তিনি তাঁর ভাই আব্‌দ-আল-আযীযকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে নিজের পুত্র আল-ওয়ালীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। ইতিমধ্যে আব্‌দ-আল-মালিক তাঁর আরেক পুত্র সুলাইমানকেও দ্বিতীয় উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান।[৭] আল-ওয়ালীদ রাজা হয়ে বাবার নির্দেশ না মেনে নিজের পুত্রকে রাজা করতে প্রয়াসী হন। সে চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। এই সব ঘটনা উমাইয়া রাজ্যকে স্থায়ী এবং স্থিতিশীল করার পরিবর্তে উল্টোটাই করে।

● আলী-র অন্ধ অনুগামী

ক্ষুব্ধ শী'আপন্থিরা 'উমাইয়া দখলদারদের' খিলাফত দখল ও বশ্যতা মেনে নেননি। আলী এবং আলী-হুসাইন-এর প্রতি যে 'অবিচার' হয়েছিল তা কখনও তারা ভুলতে পারেনি। শী'আদের এই মনোভাব আরও তীব্র হয়ে উঠল। এদিকে পয়গম্বরের বংশধরের প্রতি আনুগত্যের সুবাদে তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়তে লাগল। বানু উমাইয়া শাসনের প্রতি সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং আর্থিকভাবে অসন্তুষ্ট মানুষও ক্রমে শী'আহ্-শিবিরে

যোগদান করেন। আল-ইরাকের জনগণের অধিকাংশই হয়ে যান শী'আহ্। এরা সিরীয় শাসনের বিরোধিতা করেন। সিরীয় শাসন ইরাকের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছে, এই বোধ মাথাচাড়া দেয়। শেষমেশ এই ক্ষোভ ধর্মীয় আকার নেয়। সুন্নিদের মধ্যে আবার যাঁরা গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন, তাঁরা খলিফাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, তাঁরা কোরান এবং প্রচলিত বিধিনিষেধ না মেনে বড় বেশি পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রয়োজনে যে কোন বিরোধিতা নস্যাৎ করে দিয়ে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন।

● আব্বাসীয় দাবিদাররা

পাশাপাশি আরেক ধ্বংসাত্মক শক্তিও সক্রিয় ছিল সমাজে। মুহাম্মাদের এক চাচার বংশধর আব্বাসীয়রা সিংহাসনের দাবিদার হয়ে ওঠেন। মুহাম্মাদের ওই চাচার নাম ছিল আল-আব্বাস ইবন-আবদ-আল-মুত্তালিব ইবন-হাশিম। আব্বাসীয়রা হাশিমের বংশের প্রতি তাঁদের অধিকারের দাবি করে আলীপন্থিদের বন্ধু হয়ে ওঠেন। শী'আহ্ প্রাথমিকভাবে এই পরিবারকে আলীর বংশধর বলেই মনে করতেন। কিন্তু আব্বাসীয়রা কুরায়শ-এর হাশিম বংশধরের সদস্য হিসেবেই নিজেদের মনে করতেন। তাই তাঁরা বানু উমাইয়ার চেয়ে হযরত মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।[৮]

দেশজোড়া অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে এবং প্রকৃত আল্লাহ্ বিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের জাহির করে আল-আব্বাসের বংশধররা দ্রুত শীর্ষ নেতা হয়ে উঠলেন এবং উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে চলে এলেন। তাঁদের আন্দোলনের সদর দপ্তর এবং প্রচারের ঘাঁটি হিসেবে তাঁরা আল-হুমাইমা[৯] নামে ডেড-সীর তীরে একটি ছোট গ্রামকে বেছে নিলেন। গ্রামটির কেউ তাদের শত্রু ছিলেন না এবং বিশ্ব থেকে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল সেই গ্রামটি। তবে কৌশলগতভাবে গ্রামটির অবস্থান ছিল ভাল জায়গাতেই। মরুযাত্রীদের যাত্রাপথের গা ঘেঁষে এবং মক্কা-মদীনা যাবার পথের পাশেই ছিল এই গ্রামটি। এই গ্রাম থেকেই ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক পর্বের এবং সবচেয়ে কৌশলী প্রচার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

● খুরাসানের লোকজন

সাধারণভাবে অ-আরবীয় মুসলমান এবং বিশেষভাবে পারসি মুসলমানদের অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ ছিল। আরবীয় মুসলমানদের সমান আর্থিক ও সামাজিক অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের কার্যত অনুচরদের মতোই তাচ্ছিল্য করা হত। অমুসলিমদের যে মাথাপিছু কর দিতে হত, তা থেকেও সবসময় ছাড় পেতেন না তাঁরা। অথচ আরবীয়রাও জানত যে এইসব পারসি এবং অ-আরবীয় মুসলমানরা এক উন্নত এবং সাবেক সংস্কৃতির ধারার অনুসারী। এটা জেনেও আরবরা যে তাঁদের প্রতি অসদাচরণ করত, এটাই সবচেয়ে বেশি অসন্তোষের কারণ ছিল। এইসব অসন্তোষের মধ্য দিয়েই শী'আহ্ মতাবলম্বী এবং আব্বাসপন্থিদের বেড়ে

ওঠার জমি তৈরি হয়। যে আল-ইরাক আগাগোড়াই আলীর স্বার্থে নিবেদিত ছিল সেই দেশ থেকে শী'আহ্ মতবাদ পারস্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষভাবে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ খুরাসানে তা দৃঢ় ভিত্তি পায়। সেকালে খুরাসানে শী'আহ্ মতাবলম্বীদের রমরমা ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। পারস্যে আজদ-মুযার বিরোধ শী'আহ্পন্থিদের জাঁকিয়ে বসার জমি তৈরি করেই রেখেছিল। সেখানে শী'আহ্-ইসলামের ছদ্মবেশে নতুন করে ইরানপন্থিরাই মাথাচাড়া দেয়।

শী'আহ্পন্থি, খুরাসানবাসী এবং আব্বাসপন্থিরা জোটবদ্ধ হলে উমাইয়া রাজবংশের ওপর আক্রমণের লগ্ন ঘনিয়ে আসে। এই মিলিত জোটকে শেষ পর্যন্ত আব্বাসপন্থিরাই নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে কাজে লাগান। এই জোটের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মুহাম্মাদের চাচা আল আব্বাসের নাতির নাতি আবু-আল-আব্বাস। তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবী ইসলামধর্ম ধর্মতত্ত্বের চলতি ধারণার বিরোধিতা করে গোঁড়া মতবাদ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। ৭৪৭ খ্রিঃ ৯ জুন খুরাসানে আব্বাসপন্থিদের এক অনুচর আবু-মুসলিম[১০], আদতে যিনি ছিলেন এক পারসি ক্রীতদাস, কালো পতাকা তোলায় ইসলামিদের মধ্যে বিদ্রোহ লেগে যায়। এই কালো পতাকা একসময় ছিল হযরতের প্রতীক, পরে তা আব্বাসপন্থিদের নিশানে পরিণত হয়। আজদ উপজাতির (ইয়ামানীয়) নেতা হিসেবে সে রাজধানী মারোয়ায় প্রবেশ করে। তার অধিকাংশ অনুগামীই ছিল ইরানি কৃষক এবং অনুচর। তারা আরবীয় ছিল না।[১১] অবস্থা দেখে উদ্দেশ্যহীনভাবে খুরাসানের উমাইয়া রাজ্যপাল নাসর ইবন-সাইয়ার দ্বিতীয় মারওয়ানকে সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। তিনি এক করুণ চিঠি কবিতার ঢঙে লিখে পাঠান দ্বিতীয় মারওয়ানের কাছে।[১২] কিন্তু মারওয়ান তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে উদ্যম এবং ক্ষমতায় বলবান হওয়া সত্ত্বেও কোন জবাব দিলেন না। কারণ তাঁর রাজ্যেরই প্যালেস্টাইন থেকে হিমস পর্যন্ত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল সেসময়। এটা ছিল কায়িস এবং ইয়ামানের লোকজনের মধ্যকার পুরানো বিবাদ। এই বিবাদকে একসময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী খলিফারা কাজে লাগাতেন। এভাবে তা তৃতীয় ইয়াজিদ এবং ইব্রাহিমের আমলে গৃহযুদ্ধের আকার নেয়। ইয়াজিদ স্বেচ্ছায় কাদরিয়া মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিক্ততা আরো বাড়ান। ইব্রাহিম আবার ইয়ামানীয় দলের নেতা ছিলেন। আর দ্বিতীয় মারওয়ান কায়িসের লোকজনদের সমর্থন পেয়ে তাঁর বাসভবন বদলে চরম ভুল করলেন। শুধু বাসভবন পরিবর্তন নয়, পাশাপাশি রাজ্য সচিবালয়ও মেসোপটেমিয়ার হাররানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি সিরিয়াবাসীদের সহানুভূতি হারান। সিরিয়াবাসীরাই ছিল উমাইয়া রাজশক্তির মূল ভরসা। এরা ছাড়া আল-ইরাকের খারিজীরা বরাবর উমাইয়া রাজশক্তির ঘোর বিরোধী থাকার পর শেষপর্যন্ত প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।[১৩] স্পেনের একেবারে পূর্বদিককার মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে পারিবারিক বিরোধ প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এইসময় তিন বছর ধরে সিরিয়া এবং খারিজী বিদ্রোহীদের সামাল দেন এই ষাটবছরের খলিফা। তিনি অবশ্য বিদ্রোহ দমন করে যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। খলিফা হওয়ার আগে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে[১৪] কখনও ব্যর্থ না-হওয়ার অধ্যবসায়ের

সুবাদে 'মারওয়ান আল-হিমার' নামে পরিচিত হন। অন্য দেশে অভিযান চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই বিশ্বাসে দৃঢ়মত হন যে, মুহাম্মাদের যুদ্ধপদ্ধতির নিয়ম মেনে সরাসরি সম্মুখ সমরের (সুফুফ) চেয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে লড়াই চালানো অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। ছোট এই গোষ্ঠী (কারাদি)গুলি একই সঙ্গে অনেক বেশি সংহত ও চলমান বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু সামগ্রিক যুদ্ধপদ্ধতি নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা সংহত করতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই বানু উমাইয়ার সূর্য দ্রুত অস্তমিত হবার উপক্রম হয়েছিল।

● চূড়ান্ত আঘাত

খুরাসানের রাজধানী মার্ভ-এর পতনের পরই ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে আল-ইরাক, আল-কূফার মতো বড় বড় নগরীর পতন হতে থাকে। এই দুই শহরেই আবু-আল-আব্বাসের অনুগামীরা লুকিয়ে ছিল। তাঁরা খুব বেশি বিরোধিতার ধারেকাছে না গিয়ে গণ আত্মসমর্পণের পথ নিল। এখানেই ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আবু-আল-আব্বাসকে খলিফা[১৫] হিসেবে প্রধান মসজিদে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। এভাবে আব্বাসপন্থিদের প্রথম খলিফা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সর্বত্র উমাইয়াদের শাদা পতাকা নামিয়ে দেওয়া হয়। মারওয়ানও শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত লড়াই চালিয়ে ধ্বংস হন। ১২ হাজার সৈন্য[১৬] নিয়ে তিনি হাররান থেকে অগ্রসর হন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে টাইগ্রিস নদীর অববাহিকা অঞ্চল জাব-এর উত্তর তীরে আবদুল্লাহ্ ইবন-আলীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর মুখোমুখি হন তিনি। এই আবদুল্লাহ্ ইবন-আলী ছিলেন নতুন খলিফার চাচা। কিন্তু সিরিয়া বাহিনীর পক্ষে জয়ের ইচ্ছা কার্যকর করার মতো কিছুই ছিল না। ফলে পরাজয় অবধারিত হয়ে ওঠে। জাব-এর যুদ্ধের পর সিরিয়া আব্বাসপন্থিদের করায়ত্ত হয়। সিরিয়ার বড় বড় শহরগুলি একের পর এক আবদুল্লা এবং তাঁর খুরাসানী বাহিনীর কাছে ফটক খুলে দেয়। একমাত্র দামাস্কাসে অবরোধের মুখে পড়েন আবদুল্লা বাহিনী। তবে দিনকয়েক বাদেই ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল এই শহরও আবদুল্লা বাহিনীর হাতের মুঠোয় চলে আসে। প্যালেস্টাইন থেকে আবদুল্লাহ্ দামাস্কাসের পলাতক খলিফাকে ধরতে এক বাহিনী পাঠান। খলিফা আশ্রয় নিয়েছিলেন মিশরের বুসিরের[১৭] (মতান্তরে বুসিরিস) এক গির্জায়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট খলিফাকে পাকড়াও করে এই গির্জার বাইরে হত্যা করা হয়। ওখানে আজও তাঁর সমাধি রয়েছে। আল-মাসউদী[১৮]-র লেখা থেকে জানা যাবে, ওই খলিফার কাটা মাথাটি এবং 'খলিফা' লেখা তক্‌মাটি আবু-আল-আব্বাসের কাছে পাঠানো হয়।

আব্বাসপন্থিরা এভাবে উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার নীতি নেন। আব্বাসপন্থি সেনানায়ক আবদুল্লাহ্ শত্রুকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন উমাইয়া পরিবারের ৮০ জনকে এক ভোজসভায় তিনি আমন্ত্রণ জানান। জাফার কাছে 'আওজা' নদীর ওপর আবু ফিউট্রাসে এই ভোজসভার আয়োজন করা হয়।

খাওয়াদাওয়ার পর আশিজনকেই কোতল করা হয়। মৃত এবং মরণাপন্নদের দেহের ওপর চামড়া ঢাকা দিয়ে আবদুল্লা এবং সহকর্মীরা যখন খাওয়াদাওয়া সারছিলেন তখন মরণাপন্নদের স্তূপের মধ্য থেকে ভেসে আসছিল আর্তনাদ।[১৯] উমাইয়া পরিবারের পলাতক লোকজনের সন্ধানে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে দ্রুত সন্ধানকারী চর পাঠানো হয়। পলাতকদের কেউ কেউ আতঙ্কে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।[২০] এত নজর এবং অন্বেষণের মাঝেও নাটকীয়ভাবে যুবরাজ আবদ-আল-রহমান ইবন-মু'আবিয়া ইবন হিশাম স্পেনে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি নতুন করে আবার উমাইয়া সাম্রাজ্য পত্তনে সফল হন। শুরু হয় উমাইয়া রাজশক্তির নতুন এক অধ্যায়। এছাড়া আব্বাসপন্থিরা উমাইয়া রাজবংশের মৃত কারও খোঁজ পেলেও ছেড়ে দিতেন না। দামাস্কাসে কিননাসরিন এবং অন্য কিছু স্থানে খলিফাদের দেহ কবর থেকে তুলে আবদুল্লা বাহিনী তাদের অপবিত্র করতে দ্বিধা করেননি। খলিফা সুলাইমানের দেহ দাবিক থেকে মাটি খুঁড়ে তোলা হয়। হিশামের দেহ আল-রুসাফাহ্ থেকে কবর খুঁড়ে তোলা হয়। তুলে মৃতদেহকে আশিবার চাবুক মেরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[২১] একমাত্র ধার্মিক খলিফা দ্বিতীয় উমারের কবরকে কেউ স্পর্শ করেননি।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর সিরিয়ার স্বর্ণযুগ কেটে গেল। তার আধিপত্যের জমানা শেষ হল। সিরীয়রা অনেক বিলম্বে বুঝতে পারলেন যে, ইসলামের ভরকেন্দ্র তাঁদের হাতছাড়া হয়ে পূর্বমুখী হয়ে পড়েছে। তাঁরা যখন বুঝলেন তখন সশস্ত্র উদ্যোগ নিয়ে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে একাধিকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। শেষমেশ তাঁরা এই আশাতেই ভরসা করলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সুফয়ানি[২২] (অর্থাৎ কোন দেবদূত) আসবেন। তিনিই সিরিয়াবাসীকে ইরাকি নির্যাতনকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। উত্তরকালে সিরিয়ার মুসলমানদের কথায় সুফয়ানি বলতে মু'আবিয়ার বংশধরকেই গণ্য করা হয়। অবশ্য উমাইয়া রাজশক্তির পতন এর চেয়েও বেশি অর্থবহ। ইসলামি ইতিহাসে প্রকৃত আরব যুগ তখন অতিক্রম করে গেছে। আর ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রথম খাঁটি আরব যুগও দ্রুত শেষ হতে চলেছে। আব্বাসপন্থি সংস্কারকরা নতুন যুগে নিজেদেরকে 'দাওলা'[২৩] বলে অভিহিত করতেন। সত্যিই শুরু হল এক নতুন জমানা। ইরাকিরা এতদিনে সিরীয় অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হল। শী'আপন্থিরা নিজেদের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছেন ভেবে তুষ্ট হলেন। অনুচররাও মুক্ত হল। পারস্য সীমান্তের আল-কূফা হল নতুন রাজধানী। খুরাসানবাসীরা হলেন নতুন খলিফাদের দেহরক্ষী এবং পারস্যের লোকজনই সরকারের উঁচু গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করে রইল। প্রকৃত আরবী অভিজাতবাদ চলে গিয়ে এল এক আমলাতন্ত্র, যাদের খলিফাদের অধীনে নানা জাত থেকে নেওয়া হত। আরবের সাবেক মুসলমানরা এবং বিদেশি থেকে নতুন ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একাঙ্গীভূত হতে শুরু করলেন। আরবীয়বাদের পতন হল। কিন্তু ইসলামের বিজয়রথ অব্যাহত রইল। আন্তর্জাতিক ইসলামের বকলমে এবার ইরানিবাদের জয়যাত্রা শুরু হল। ❑

● টীকা ●

১ তাবারী ২ খণ্ড ১৮৭৪ পৃঃ। ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪০১ পৃঃ। মাসউদী, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩১-৩২ পৃঃ।

২ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪০৩-৪০৪ পৃঃ।

৩ আরব উপজাতি সম্পর্কে জানতে দেখুন ইব্ন-জুরায়জ্-এর 'ইশ্তিকাক'। এফ ওসটেনফেল্ড, *Genealogische Tabellen der arabischen Stämme (Gottingen, 1852), and Register szu den genia logischen Tabellen der arabischen Stämme (Göttingen, 1853)*

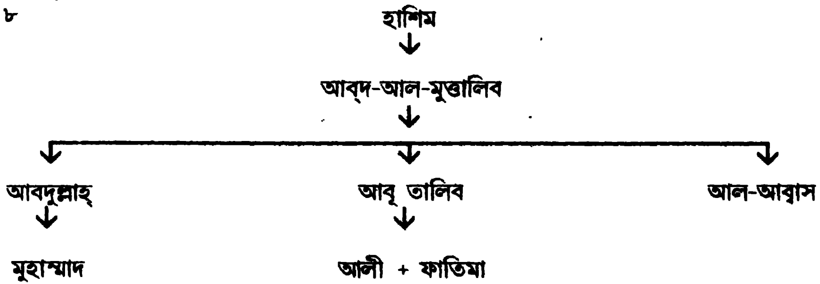
৪ আবু-আল-ফিদা, ২ খণ্ড, ১৪ পৃঃ।

৫ ইবন-ইয্হারী, বায়ান, ২ খণ্ড, ৮৪ পৃঃ।

৬ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৩০৬ পৃঃ।

৭ ওই দেখুন ৩৩৪-৩৩৫ পৃঃ।

৮



৯ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৩৫৬-৩৫৭ পৃঃ। ফাখরি ১৯২-১৯৩ পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৩৪ পৃঃ। ইয়াকুত, ২ খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ। মুসিল 'নর্দান হেগাজ (নিউ ইয়র্ক, ১৯২৬), ৫৬-৬১ পৃঃ।

১০ ফাখরি, ১৮৬ পৃঃ।

১১ তাবারী, ২ খণ্ড, ১৯৫৩ ও পরবর্তী পৃঃ। দিনাওয়ারি, ৩৫৯ ও পরবর্তী পৃঃ।

১২ ফাখরি, ১৯৪ পৃঃ। নিকলসন 'লিটারারি হিসট্রি', ২৫১ পৃঃ।

১৩ তাবারী, ২ খণ্ড, ১৯৪৩-১৯৪৯ পৃঃ।

১৪ ফাখরি, ১৮৪ পৃঃ।

১৫ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪১৭-৪১৮ পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ২৭-৩৩ পৃঃ। মাসউদী, ৬ খণ্ড, ৮৭, ৯৮ পৃঃ।

১৬ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৪৭ পৃঃ।

১৭ আবুসির। সম্ভবত ফাইউস-এর বুসির আল-মালাক। দেখুন সাবীরুস ইবন-আল-মুকাফ্ফা, সিয়ার আল-বাতারিকা আল-ইসকান্দারানিয়ীন (সম্পাদনা সি এফ সেবোল্ড (হামবুর্গ, ১৯১২), ১৮১ ও পরবর্তী পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃঃ।

১৮ ওই, ষষ্ঠ খণ্ড, ৭৭ পৃঃ।

১৯ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪২৫-৪২৬ পৃঃ। মাসউদী, ৬ খণ্ড, ৭৬ পৃঃ, ইবন-আল-আসীর, ৫ খণ্ড, ৩২৯-৩০ পৃঃ। মুবাররাদ ৭০৭ পৃঃ। আগানী, ৪ খণ্ড, ১৬১ পৃঃ। ওই দেখুন ৯২-৯৬ পৃঃ। ফাখ্‌রি, ২০৩-২০৪ পৃঃ। থিওফ্যানিস, ৪২৭ পৃঃ। আহাবের ঘরে জেহুর ধ্বংসের কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয়। (দ্বিতীয় কিংস, ৯:১৪-৩৪)। এছাড়া মুহাম্মাদ আলী কর্তৃক মিশরের মামলূক বংশকে ধ্বংসের সঙ্গেও তুলনীয় (জুরজি জায়দান, 'তারিখ মিশর আল-হাদীস', ৩য় সংস্করণ, কায়রো, ১৯২৫, ২ খণ্ড, ১৬০-৬২ পৃঃ)।

২০ ইবন-খালদূন, ৪ খণ্ড, ১২০ পৃঃ।

২১ মাসউদী, ৫ খণ্ড, ৪৭১ পৃঃ। ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪২৭-৪২৮ পৃঃ, ফাখরি, ২০৪ পৃঃ।

২২ তাবরী, ৩ খণ্ড, ১৩২০ পৃঃ। ইবন মিসকাওয়াইহ্‌, তাজারিব আল-উমাম ওয়া তায়াকুব আল হিমাম, সম্পাদনা : দ্য গোজি এবং দ্য জং, ২ খণ্ড (লিডেন, ১৮৭১) ৫২৬ পৃঃ। ইয়াকুত, ৪ খণ্ড, ১০০০ পৃঃ। আগানী, ১৬ খণ্ড, ৮৮ পৃঃ। এইচ ল্যামেন্স, *Études sur le siècle des Omayyades (Beirūt, 1930), pp. 391-408*

(বেইরুট, ১৯৩০) ৩৯১-৪০৮ পৃঃ।

২৩ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৮৫ পৃঃ, ২.১৬, ১৭, ১১৫ পৃঃ ১.৯।

॥ অধ্যায় ২৩ ॥

আব্বাসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

ইসলামের রাজনৈতিক নাটকের তৃতীয় পর্বের সূচনায় প্রধান ভূমিকা নিলেন খলিফা আবু-আল-আব্বাস (৭৫০-৫৪ খ্রিঃ)। এই নাটকের রঙ্গমঞ্চ ছিল আল-ইরাক। আল-কূফা-র মসজিদে প্রতি বছর প্রথম আব্বাসীয় খলিফা যে-উদ্বোধনী খুতবাহ (ভাষণ) দিতেন তাতে নিজেকে তিনি 'আল-সাফ্‌ফাহ্'[১] (অর্থাৎ রক্তপিপাসু) বলে অভিহিত করতেন। শেষপর্যন্ত এটাই তার উপনাম হয়ে যায়। অবশ্য এর বিকল্পও কিছু ছিল না। কারণ নীতি প্রয়োগ করার ব্যাপারে নতুন রাজশক্তি বিদায়ী রাজশক্তির চেয়ে অনেক বেশি বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইসলামধর্মের ইতিহাসে প্রথমবার খলিফার আসনের পাশ থেকেই বিস্তৃত হল চামড়ার চাদর। এই চাদর জল্লাদরা কার্পেটের মতোই ব্যবহার করতেন। ব্যাপারটি আব্বাসীয় রাজশক্তির এক অবিচ্ছিন্ন ধারা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই 'আল সাফ্‌ফাহ্'-ই ইসলামধর্মের আরবীয় বংশধরদের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা। উমাইয়া এবং ধর্মনিষ্ঠ (রশিদুন) রাজত্বের পর ধারাবাহিকতার বিচারে এদের স্থান ছিল তৃতীয়। ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবু-আল-আব্বাসের উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনে আসীন ছিলেন। অবশ্য এই সময়কালের মধ্যে সবসময় যে তাঁরাই শাসনকর্তা ছিলেন, তা নয়।

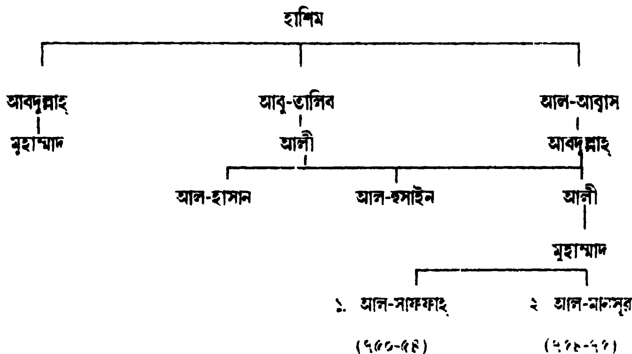
আব্বাসীয় বংশের জয়ের সাফল্যকে সাধারণভাবে প্রকৃত খিলাফত অর্থাৎ ধর্মীয় রাষ্ট্রের ধারণারই বাস্তব রূপ বলে স্বাগত জানান হয়। এই রূপটি উমাইয়া আমলের নিছক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্ত বলে প্রশংসিত হয়। তাই তাঁর মহিমময় সিংহাসনের ধর্মীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে খলিফা আল-সাফ্‌ফাহ্ কোন অনুষ্ঠানকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করতেন। তা ছাড়া তাঁর দূরসম্পর্কের ভাই হযরত মুহাম্মাদ[২] একসময় যে আঙরাখা (বুরদা) পরতেন, শুক্রবারের নামাযের সময় তিনিও তাই পরতেন। তাঁকে ঘিরে থাকত ধর্মীয় আইনজ্ঞরা। তিনি ছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। প্রশাসন চালাতে তিনি তাঁদের পরামর্শ নিতেন। উমাইয়া আমলে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করতে যে সুশৃঙ্খল প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগানো হত তাকেই এবার জনসমর্থন পেতে কাজে লাগানো হল। গোড়া থেকেই এমন একটা ধারণা প্রোথিত করার চেষ্টা হত যে, কর্তৃত্ব সর্বদাই আব্বাসীয়দের হাতেই থাকবে এবং তা শেষপর্যন্ত দেবদূত যীশুর (ঈসা) হাতে হস্তান্তরিত হবে।[৩] পরে এই তত্ত্ব ঘোষিত হয় যে, এই খিলাফত ধ্বংস হয়ে গেলে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪] আসলে এই ধর্মীয় পরিবর্তন আপাত বাস্তবে প্রকৃত নয়। উমাইয়া রাজত্বের

পূর্বসূরিদের মতো তিনি কখনও ধর্মানুরাগ বা কল্পিত ধার্মিকতা দেখাননি। বরং বাগদাদের খলিফা প্রমাণ করেন যে, তিনি দামাস্কাসের অপসৃত খলিফার মতোই বিশ্বজনীন। তবে একদিক থেকে দুজনের মৌলিক ফারাক ছিল। উমাইয়া সাম্রাজ্য ছিল আরবীয়। আব্বাসীয়রা ছিলেন অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। তা ছিল নয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের, যে সাম্রাজ্যে আরবীয়রা বহু জাতির মধ্যে অন্যতম এক জাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এছাড়া আরও পার্থক্য ছিল। ইতিহাসে এই প্রথম খলিফারা ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিলেন না। স্পেন, উত্তর-আফ্রিকা, উমান, সিন্ধু এবং এমন কী খুরাসান পর্যন্ত[৩] নতুন খলিফাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। মিশর স্বীকৃতি দিলেও তা ছিল নামকাওয়াস্তে। আল-ইরাকে উমাইয়াদের রাজধানী ছিল ওয়াসিত। তা ১১ মাস ওদের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল।[৪] সিরিয়ার গোলমাল লেগেই ছিল। আসলে রাজপরিবারের ওপর আক্রমণই এদের ক্ষোভের কারণ। আব্বাসীয় এবং আলীপন্থিরা যে আঁতাত করেছিলেন তার মূল লক্ষ ছিল, উভয়পক্ষেরই এক ঘৃণিত শত্রুকে হঠানো। কিন্তু সেই শত্রুকে উৎখাত করা পর্যন্ত তাঁরা ক্ষমতাসীন থাকতে পারেননি। যেসব আলীপন্থি বোকার মতো ভাবত যে, আব্বাসপন্থিরা তাঁদের স্বার্থেই লড়াই করছে, তাদের দ্রুত মোহভঙ্গ হয়।

আলীপন্থিদের প্রভাবিত কূফায় নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করে আল-সাফ্‌ফাহ্ আল-আনবারে এক দুর্গ-গৃহ নির্মাণ করলেন।[৫] তারই পূর্বপুরুষের নামে তার নাম দেওয়া হয় আল-হাশিমিয়া।[৬] তবে শত্রুকে উৎখাত করার পর এই আঁতাত বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

● আব্বাসীয়দের সঙ্গে এবং মুহাম্মাদের সম্পর্ক-লতিকা



আল-কূফার যমজ নগরী আল-বসরাকেও একই কারণে উপেক্ষা করা হয়। তা ছাড়া আল-বসরার দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থা শান্ত ছিল না। তাই সেখানে রাজপাট কায়েম করা উপযুক্ত

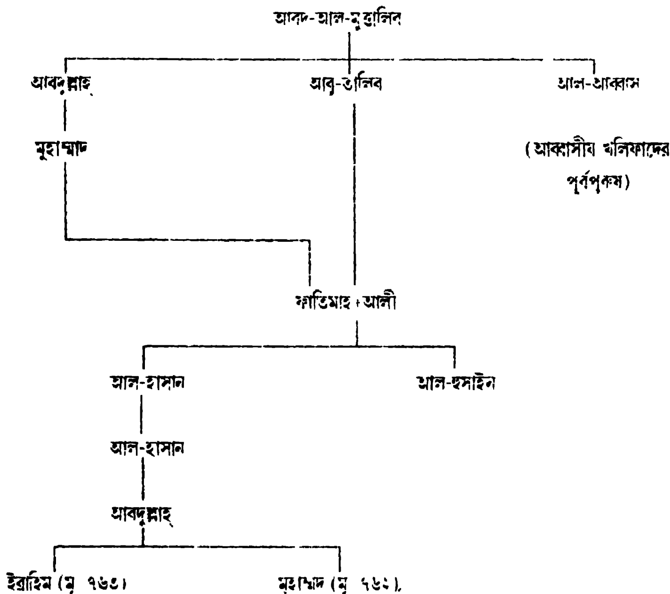
মনে করেননি খলিফা। আল-সাফ্ফাহ্ তাঁর নতুন রাজধানীতে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান মাত্র বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সে (৭৫৪ খ্রিঃ)।[৯]

● আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আল-মানসুর

আল-সাফ্ফার ভাই এবং উত্তরাধিকারী আবু-জাফর (৭৫৮-৭৭৫) সম্মানিত আল-মানসূর (অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক জয়ী বলে ঘোষিত) উপাধি নেন। তিনিই আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম ছিলেন। তবে তিনি ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারতেন না। আল-সাফ্ফার চেয়ে অনেক দৃঢ়ভাবে তিনি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর যে ৩৫ জন খলিফা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর সরাসরি বংশধর। চাচা আবদুল্লাহ্ ছিলেন বীর। জাব-এর বীর আল-সাফ্ফার আমলে তিনি সিরিয়ার রাজ্যপালও হন। আল-মানসূরের আমলে আবদুল্লার সঙ্গে খলিফার বিরোধ দেখা দিল। ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে নাসিবিন (মতান্তরে নিসিবিস) নামক স্থানে আবু-মুসলিম পরাস্ত করেন আবদুল্লাকে। পরাজিত হয়ে তাঁর স্থান হয় কারাগারে। সাত বছর বন্দিজীবন যাপনের পর তাঁকে ঘটা করে এক নতুন বাড়িতে স্থান দেওয়া হয়। এই বাড়িটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল লবণের ওপর। তার চারধারে ছিল জল। স্বাভাবিকভাবেই জলে লবণ গলে বাড়িশুদ্ধ আবদুল্লার সলিল সমাধি হল।[১০] এদিকে নাসিবিনের জয়ের পর আবু-মুসলিমের পালা এল। তিনি খুরাসান প্রদেশের প্রায় স্বাধীন শাসক ছিলেন। নিজের প্রদেশে ফিরে যাওয়ার সময় আবু-মুসলিমকে যাত্রাভঙ্গ করে খলিফার রাজসভায় আসতে বলা হল। রাজসভায় খলিফার সঙ্গে কথা বলার সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে নৃশংসভাবে খুন করা হয় আবু-মুসলিমকে।[১১] অথচ এই খুরাসানি নেতাই আবদুল্লার পর আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হয়েছিলেন। এইসময় পারসি উগ্রপন্থিদের এক নতুন উৎসাহী গোষ্ঠী 'রাওয়ানদিয়া' খলিফাকে আল্লাহ্‌র সমগোত্রীয় বলে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। তাদেরও নৃশংসভাবে দমন করা হয় (৭৫৮)।[১২] হতাশ শী'আপন্থিরা ইব্রাহিম এবং তার ভাই মুহাম্মাদের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ করেন তাও কঠোরভাবে নির্মূল করা হয়। এই মুহাম্মাদের পদবি ছিল আল-নাফস আল-যাকীয়া (পবিত্র আত্মা)। তিনি ছিলেন আল-হাসানের[১৩] নাতির ছেলে। মুহাম্মাদকে খতম করে মদীনায় ফাঁসি দেওয়া হয় (৭৬২ খ্রিঃ ৬ ডিসেম্বর)। আর ইব্রাহিমকে কূফার কাছে কোতল করে তার কাটা মাথা খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১৪] ইব্রাহিম কোতল হন ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি। আলীপন্থিদের কাছে আব্বাসীয় খলিফারা ছিলেন নেহাৎই দখলদার। তাঁরা মনে করতেন, প্রকৃত খলিফা হচ্ছেন ইমাম। তাঁরাই আলী এবং ফাতিমার বংশধর। আলীপন্থীরা কখনও ইসলাম ধর্মের স্বচ্ছ বাতাবরণকে বিশৃঙ্খলভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াসে ভঙ্গ দেননি। তাঁরা আগাগোড়া এই দাবি করে এসেছেন যে, মুহাম্মাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ইমামরাই। তাঁদেরই কাছে রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞা এবং স্বর্গীয়

আলোকবর্তিকা। খুরাসানে সানবাদের (সিনবাধের) বিদ্রোহ দমন করা হল। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই সানবাদ তেড়েফুড়ে উঠেছিলেন আবু-মুসলিমের খুনের প্রতিশোধ নিতে। একইভাবে উস্তাধসীস (৭৬৭-৭৬৮) দের খতম করা হয়।[১১] পারস্যে প্রাচীন জরথুস্ত্র এবং মাজদাকিয়ান মতাবলম্বীদের ধর্মীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গে প্রচণ্ড সম্পৃক্ত হয়েছিল জাতীয় ভাবাবেগ। তাও সাময়িকভাবে শান্ত করা হয়। এভাবে ইসলামি সাম্রাজ্যের বড় অংশ আবার সুসংহত হল। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল উত্তর-আফ্রিকা। উত্তর আফ্রিকায় খলিফার কর্তৃত্ব-আল কায়রাওয়ানের পর বেশিদূর সম্প্রসারিত করা যায়নি। আর স্পেনের উমাইয়া খলিফা আবদ-আল-রহমান (যাঁর মা আল-মানসুরের[১২] মায়ের মতই বার্বার ক্রীতদাসী ছিলেন) যে তাঁর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী আব্বাসীয় খলিফা মানসুর একথা বুঝতে পারেন।

আলী-র বংশধরগণ



ঘরোয়া সমস্যার সুচারুভাবে মোকাবিলা করে আব্বাসীয়রা সীমান্তরক্ষায় যুদ্ধে নামলেন। পশ্চিমে বাইজানটাইনদের সঙ্গে শুরু হয় যুদ্ধ ; যা অবিরামভাবে এক শতক ধরে চলেছিল। আবার প্রতিবেশী ঘাঁটিতে আচমকা অভিযান চালানোর মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত সীমান্ত-দুর্গগুলি (তুগুর) আর্মেনিয়ার 'মালাতিয়াহ্' (মেলিটিন) এবং সিলিসিয়ার আল-মাসিসাহ আবার মেরামত করে পুনর্নির্মিত হয়।[১৩] এমন কী [illegible] উৎসস্থল

পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই সব ন্যাপথা উৎপাদন কেন্দ্রের উপর কর ধার্য হয়। ক্যাসপিয়ান (বাহর আল-খাজার) এর দক্ষিণে যে পাহাড়ঘেরা তাবারীস্তান ছিল সেখানে অবলুপ্ত সাসানি সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলা এক পরিবার কার্যত স্বাধীন রাজত্ব চালাচ্ছিল। সাময়িকভাবে এই তাবারীস্তানকে দখল করা হল।[১৯] ভারত সীমান্তের দিকে অন্য কিছু জায়গার সঙ্গে কান্দাহার (আল-কান্দাহার)-কেও দখল করে সেখানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করা হল।[২০] কার্যত আল-মানসূরের সেনানায়করা উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সমৃদ্ধ উপত্যকা কাশ্মীর (আরবী কাশ্মীর) পর্যন্ত অভিযান চালান। ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুনদের ব-দ্বীপ অঞ্চলে আল-বসরা থেকে এক নৌবাহিনী পাঠানো হয়। যারা জুড্ডায় দস্যুবৃত্তি করার ছক কষছিল তাদের শাস্তি দিতেই এই নৌসেনাদলকে পাঠানো হয়।

● মাদীনাৎ-আল-সালাম

৭৬২ খ্রিস্টাব্দে আল-মানসূর বাগদাদে নতুন রাজধানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার আগে পর্যন্ত আল-মানসূর থাকতেন আল-কূফা এবং আল-হিরার[২১] মাঝামাঝি আল-হাশিমীয়া নামক স্থানে। আল-বাগদাদ ছিল কিংবদন্তি অ্যাডভেঞ্চারের জায়গা, যা দারুণভাবে বর্ণনা করেছিলেন শাহরাজাদ তাঁর 'সহস্র এক আরব্য রজনী' কাহিনীতে। বাগদাদের যে জায়গায় রাজধানী উঠে আসে. সেখানে প্রাচীন সাসানীয় আমলে ছিল 'বাগদাদ' নামেই এক গ্রাম।[২২] এর অর্থ 'আল্লাহ্‌র দান'। আল-মানসূর এর আগে অনেক জায়গা দেখে বাতিল করে দেন। কারণ তিনি বলতেন, 'ফৌজি ছাউনির পক্ষে বাগদাদ জায়গাটি দুর্দান্ত। তা ছাড়া চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যে নজরদারি রাখার জন্য এখানে রয়েছে টাইগ্রিস নদী। এরূপ সুবিধা ছাড়াও সংযোগ ছিল পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্নকারী দেশ মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া এবং পারিপার্শ্বিক প্রদেশের সঙ্গে। তা ছাড়া সিরিয়া, আল-রাক্‌কাহ্[২৩] এবং সংলগ্ন প্রদেশের উৎপন্ন সামগ্রী ইউফ্রেটিস নদীপথে আনা যাবে। এই নগরের নির্মাণকাজ শেষ হয় চার বছরে। আল-মানসূর এর জন্য খরচ করেন ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার দিরহাম।[২৪] প্রায় এক লক্ষ স্থপতি, দক্ষ শিল্পী এবং শ্রমিককে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং অন্য সব প্রদেশ থেকে এনে তিনি নির্মাণকাজে লাগান।[২৫]

বাগদাদের সরকারি পোশাকি নাম হয় মাদীনাৎ-আল-সালাম (শান্তির শহর)। আল-মানসূরই এই নাম দেন। টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই শহরে প্রাচীন পৃথিবীর কয়েকটি জবরদস্ত রাজধানীর দৃশ্যাবলি প্রদর্শিত হত। শহরটা গড়া হয় বৃত্তের আকারে। তাই কেউ কেউ একে বলত, গোলাকার শহর (আল-মুদাওয়ারা)। পুরো শহরটা ঘিরে ছিল ইটের জোড়া প্রাচীর, গভীর পরিখা এবং ৯০ফুট উঁচু আরেকটি তৃতীয় প্রাচীর, যা নগরীর অন্তস্তলকে বেষ্টন করেছিল। প্রাচীরগুলিতে ছিল চারটি করে সমান মাপের ফটক। ওই সমদূরত্বের চার ফটক থেকে শুরু হয়েছিল চারটি জাতীয় সড়ক পথ: গোলাকার শহরের

মাঝখানে খলিফার প্রাসাদ থেকে শুরু করে গোটা নগরটা ঘুরলে চাকার দণ্ডের মতো মনে হয় চারটি কোণকে। প্রবেশপথে সোনার ফটক (বাব-আল-যাহাব) আর সবুজ গম্বুজ (আল-কুব্বাহ আল-খাযরা) ছিল শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রাসাদের পাশেই ছিল সুবিশাল মসজিদ। প্রেক্ষাগৃহের গম্বুজটি ছিল ১৩০ ফুট উঁচু। পরে ওই গম্বুজের মাথায় বসানো হয় এক বল্লমধারী অশ্বারোহীর মূর্তি। এই মূর্তিটিকে ঘোরানো যেত। বিপদের সময় যেদিক থেকে আক্রমণ হতে পারে বলে অনুমান করা হত সেদিকে ওই মূর্তির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হত,[২৬] যাতে সবাই সতর্ক হতে পারে। কিন্তু ইয়াকূত বললেন, 'এটা ভুল।' তিনি পরামর্শ দিলেন, বরং সবসময়ই মূর্তিটার মুখ কোন না কোন দিকে এমন ভাবে ঘুরিয়ে রাখা উচিত যাতে সবাই বুঝতে পারেন যে, তাঁদের শহরে আক্রমণের ভয় রয়েছে সবসময়ই। তিনি বলেন, মুসলমানরা রীতিমতো বুদ্ধিমান। তাঁরা এই ধরনের বিচারে বিশ্বাস করবেন না।[২৭] নতুন শহরের নির্মাণকাজে মাল সরবরাহের কাজ করেছিল সংলগ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত সাসানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী টেসিফন।' বাসভবন তৈরির সব মালই ওখান থেকে আনা হয়। শুধু ইঁট নির্মাণ করা হয় নতুন শহরেই। মৃত্যুর আগে আল-মানসূর টাইগ্রিস নদীর তীরে নগর প্রাচীরের বাইরে আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর নাম দেওয়া হয় কাসর্ আল-খুল্দ (চিরন্তনতার প্রাসাদ)। এই প্রাসাদের বাগান সম্ভবত স্বর্গের (কোরআন ২৫,১৬-১৭) বর্ণিত বাগানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গড়ে তোলা হয়। তাই এমন নাম দেওয়া হয়। এছাড়া আল-রুসাফা (জলাভূমির মধ্যে উঁচু পথ) নামে তৃতীয় এক প্রাসাদও তিনি নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল মানসূরের পুত্র যুবরাজ আল-মাহদীর জন্য।

রাজসভার জ্যোতিষীর পরামর্শে, যে লগ্নে আল-মানসূর তাঁর বাসভবনের নির্মাণকাজ শুরু করছেন, তাঁর পরিবারের এবং খুরাসানি দেহরক্ষীদের জন্য যে সামরিক ছাউনি নির্মিত হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবেই শুভ কাজ।[২৮] অচিরেই তা সত্য বলে প্রমাণিত হল। কয়েক বছরের মধ্যে শহরটি শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠল। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেল রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবেও। যেন অচিরেই প্রাচীন কালের প্রাচ্যের রাজধানীগুলির সমান মর্যাদা লাভে সমর্থ হল। টেসিফন, ব্যাবিলন, নিনেভ, উর এবং প্রাচীন প্রাচ্যের অন্যান্য রাজধানীর মর্যাদার ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে পড়ে এই নতুন রাজধানীও। মধ্যযুগে সম্ভবত কনস্ট্যান্টিনোপল ছাড়া কোন শহরই এর সমকক্ষ হতে পারেনি। অনেক উত্থান-পতনের পর আবার প্রকৃত আরবীয় রাজা ফয়সালের নেতৃত্বে এই শহরটিই ইরাকের নতুন রাজধানী হিসেবে পুনর্নির্মিত হয়।

নতুন জায়গায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হল। এভাবে খলিফারা সাসানীয় শাসনের আদর্শ গ্রহণ করে সরকার গঠন করেন। পারসি প্রভাবে আরবীয় ইসলাম ধর্মের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। খলিফারা আরবীয় শেখতন্ত্রের চেয়ে ইরানি স্বৈরতন্ত্রের পুনর্জাগরণেই বেশি উৎসাহী

ছিলেন। ধীরে ধীরে পারসি পদবি, পারসি মদ, পারসি বিবি, পারসি প্রেমিকা, পারসি গান, পারসি ভাবনাচিন্তাই গ্রাস করে ফেলতে লাগল সবকিছু। আমরা বলি, আল-মানসূরই প্রথম খলিফা যিনি পারসি টুপি (কালানিস) ধারণ করেন, যা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রজারা অনুসরণ করেন।[৫৯] এটা বলা উচিত, সাবেক আরবীয় জীবনের কঠোর দিকগুলি পারসি প্রভাবে কোমল হয়ে ওঠে। এর ফলে বিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব দিয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায় এবং বহু পণ্ডিতের জন্ম হয়। মাত্র দুটি ক্ষেত্রে আরবীয়রা নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছিলেন। ইসলামধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম হিসেবে এবং আরবী ভাষাই সরকারি ভাষা হিসাবে রয়ে গেল।

● পারসি উজির পরিবার

আল-মানসূরের আমলেই উজিরতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই প্রথম ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় পারসিক পদ সৃজন করা হল। খালিদ ইবন-বারমাক ছিলেন এই পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত প্রথম ব্যক্তি।[৬০] খালিদের মা ছিলেন এক বন্দি, তাঁকে কুতাইবাহ ইবন-মুসলিম ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে বল্‌খ থেকে বন্দি করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বারমাক অর্থাৎ স্থানীয় বৌদ্ধ মঠের প্রধান পুরোহিত।[৬১] খালিদের সঙ্গে আল-সাফ্‌ফার এত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল যে, তার কন্যাকে লালনপালন করতেন খলিফা আল-সাফ্‌ফার বিবি। আবার সাফ্‌ফার কন্যাকে লালনপালন করতেন খালিদের বিবি।[৬২] আব্বাসীয় রাজশক্তির আমলে খালিদ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে অর্থমন্ত্রকের (দিওয়ান আল-খারাজ) ভারপ্রাপ্ত হন। ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাবারীস্তানের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। তাবারীস্তানের রাজ্যপাল হিসেবে তিনি বেশ বিপজ্জনক অভ্যুত্থান দমন করেছিলেন।[৬৩] বৃদ্ধ বয়সে খালিদ এক বাইজান্টাইন দুর্গ দখল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[৬৪] পদের দিক থেকে বিচার করলে খালিদ ঠিক উজির[৬৫] ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন মন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তি। কিন্তু এই পারসিক রাজকর্মচারীটি জীবদ্দশায় প্রায় সময়ই খলিফার উপদেষ্টার কাজ করে যান। এভাবেই প্রভাব বিস্তার করে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন।

৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর আল-মানসূর তীর্থযাত্রায় গিয়ে মক্কার নিকট মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। পবিত্র নগরী মক্কার কাছে ১০০টি কবর খনন করা হয়। পাছে কোন শত্রু কবর থেকে তাঁর দেহ তুলে অপবিত্র করতে পারে, সেই আশঙ্কায় মানসূরের দেহ গোপনে সাবধানে অন্য এক কবরে রাখা হয়। ফলে কেউ ঘুণাক্ষরেও মৃতদেহের হদিশ পায়নি।[৬৬] আল-মানসূর ছিলেন রোগা পাতলা চেহারার, লক্ষণীয় মানুষ। গায়ের রং ছিল কালো. চাপদাড়ি রাখতেন তিনি।[৬৭] স্বভাবে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী এবং আচরণে কঠোর। পূর্বসূরি খলিফাদের অনুসৃত পথ থেকে একেবারেই ভিন্নধর্মী ছিলেন তিনি। তার গৃহীত নীতিসমূহ বহু যুগ ধরে উত্তরসূরিরা মান্য করেছেন। উমাইয়া রাজবংশে যেমন

মু'আবিয়ার স্থান ছিল তেমনই আব্বাসীয় বংশে ছিল তাঁর স্থান।

আল-মানসূরের উত্তরাধিকারী আল-মাহদী (৭৭৫-৮৫) তাঁর পুত্র হারূনের লেখাপড়ার দায়িত্ব দেন খালিদ-পুত্র ইয়াহিয়াকে। আল-মাহদীর পর খলিফা হন তাঁর আরেক পুত্র আল হাদী (৭৮৫-৭৮৬)। তার পর হারূন খলিফার আসনে বসেন। তিনি খলিফা হয়েই বারমাকিদেরকে উজির নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়াকে হারূন পিতার সমান শ্রদ্ধা করে 'আব্বা' বলেই ডাকতেন। তাই তাঁকে অসীম ক্ষমতা দিলেন। ইয়াহিয়ার ৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়। তারপর তার দুই পুত্র আল-ফযল এবং জাফর ৭৮৬ থেকে ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কার্যত ওই সাম্রাজ্য শাসন করেন।[১৭]

এই সব উজিররা থাকতেন পূর্ব বাগদাদে, বেশ রাজকীয়ভাবেই তাঁরা জীবনযাপন করতেন। জাফরের বাসস্থান আল-জাফারিকে ঘিরে অভিজাত বাসিন্দারা আবাস নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। পরে আল-মামুন এই আল-জাফারি দখল করে তা খলিফা-প্রাসাদে (দার আল-খিলাফা) পরিণত করেন। টাইগ্রিস নদীর ধারে অবস্থিত ছিল এই পেল্লায় রাজপ্রাসাদ। সঙ্গে ছিল প্রশস্ত উদ্যান। পাশাপাশি প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল অনেক ছোট বড় বাড়ি। বারমাকি পরিবার রীতিমতো ভাগ্য নিয়ে না এলে এত বিশাল রাজপ্রাসাদের অধিকারী হতে পারতেন না। রাজপরিবারের অনুচরবৃন্দ, প্রশংসাকারী লেখকবৃন্দ এবং অন্য অমাত্যরা[১৮] যা না পেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি ধনসম্পদের মালিক হন এই আশ্রিত উজিররা। তবে তাঁদের সহৃদয়তা ছিল প্রবাদপ্রতিম। আজও আরবীভাষী অঞ্চলে 'বারমাকি' শব্দটি 'সহৃদয়'-এর পরিবর্ত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর দানশীলতায় উজিরেরা ছিলেন জাফরের[১৯] সমতুল্য।

বারমাকিদের পরোপকারী স্বভাবের জন্য সেকালের মানুষ কত যে খাল[২০] মসজিদ এবং সড়ক ইত্যাদি গড়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আল-ফযলই প্রথম মুসলমান যিনি রমাযান মাসে মসজিদে আলো দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করেন। জাফর তো সাহিত্যকর্ম এবং পাণ্ডিত্যে প্রগাঢ় সুখ্যাতি অর্জন করেন।[২১] মূলত তার জন্য আরবীয় ঐতিহাসিকরা বারমাকিদের 'কলমচি শ্রেণীর' (আহ্ল আল-কলম) অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাবৎ পণ্ডিতের চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন। ফ্যাসান সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার তাঁর অসামান্য সুখ্যাতি ছিল। তিনিই সেযুগে উঁচু কলারের জামা পরা প্রচলন করেন।[২২] এর কারণ ছিল তাঁর নিজের গলাটি ছিল লম্বা। তবে খলিফা হারূনের সঙ্গে জাফরের অন্তরঙ্গতা তাঁর পিতা ইয়াহিয়া পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, এটি একেবারেই অনৈতিক কাজ।[২৩]

অবশেষে এমন সময় এল যখন খলিফারা এই পারসিক অভিভাবকদের হাত থেকে মুক্ত হতে মনস্থ করলেন। শী'আপন্থি বারমাকিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন দৃঢ়চেতা খলিফা হারূনের আমলে (৭৮৬-৮০৯ খ্রিঃ)। হারূনের সাম্রাজ্যে নিয়মকানুন এত কঠোর ছিল যে, বলা হত, এক আকাশে দুটি সূর্য থাকতে পারে না। এই হারূনই ৮০৩

খ্রিস্টাব্দে ৩৭বছরের উজির জাফরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তাঁর মুণ্ডুচ্ছেদ করে কাটা মুণ্ডুটি বাগদাদের এক সেতুর কাছে শূলবিদ্ধ করে রাখা হয়। আর দেহটিকে দুটুকরো করে অন্য দুটি সেতুতে রেখে দেওয়া হয়।[১৪] ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন, খলিফা হারুন জাফরের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন জাফরের যৌনজীবনের কারণে। হারুন তাঁর প্রিয় বোন আল আব্বাসাকে স্রেফ নামকাওয়াস্তে বিবাহ করার অনুমতি দেন জাফরকে। কিন্তু শর্ত ছিল, কোনরকম যৌন সম্পর্ক বজায় রাখা চলবে না। পরে মক্কায় আল-আব্বাসা তীর্থে গিয়ে সন্তান প্রসব করেন। আব্বাসা তাকে সেখানেই লুকিয়ে রাখেন।[১৫] এই ঘটনার পরেই বৃদ্ধ উজির ইয়াহিয়া এবং আল-ফজল সহ তাঁর অন্য তিন পুত্রকে বন্দি করা হয়। জেলে বন্দি থাকাকালীনই আল-ফজল এবং ইয়াহিয়া মারা যান। উজির পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[১৬] উজিরদের শুধু নগদ মুদ্রাই (দীনার) ছিল ৩০ কোটি ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার। তা ছাড়া খামারবাড়ি, প্রাসাদ, মূল্যবান আসবাবপত্র। এভাবে খালিদ ইবন-বারমাকি স্থাপিত উজির পরিবারকে সমূলে বিনাশ করা হয়। ❑

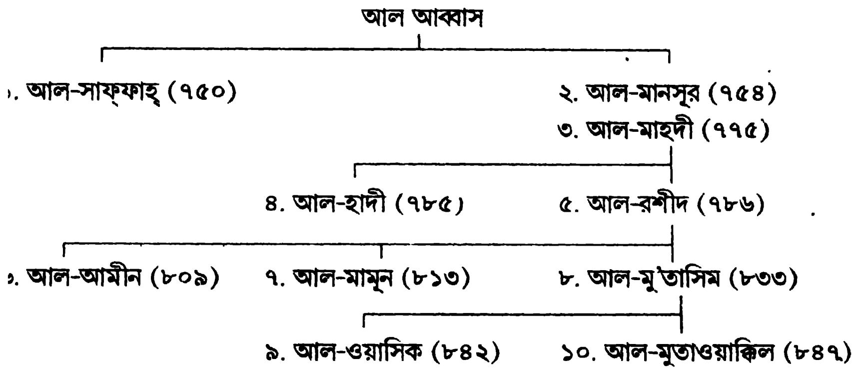
• টীকা •

১ তাবারী, ৩খণ্ড, পৃঃ ৩০.১.২০; ইবন-আল-আসীর, ৫খণ্ড, পৃঃ ৩১৬
২ পরে যে বংশ তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট হবে আব্বাসীয়দের সঙ্গে মুহাম্মাদের সম্পর্ক।
৩ তাবারী, ৩খণ্ড, ৩৩ পৃঃ। ইবন-আল-আসীর, ৫খণ্ড, পৃঃ ৩১৮
৪ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৪৮৭ পৃঃ।
৫ দিনাওয়ারি, ৩৭৩ পৃঃ।
৬ দিনাওয়ারি, ৩৬৭-৭২পৃঃ। তাবারী, ৩খণ্ড, ৬১-৬৬পৃঃ।
৭ ইয়াকুবী, ২খণ্ড, ৪২৯পৃঃ। দিনাওয়ারি, ৩৭২-৩৭৩পৃঃ।
৮ ইউফ্রেটিস নদীর বাম তীরে। আল-ইরাকের উত্তর দিকের এই স্থানটির এখন চিহ্ন মাত্র নেই।
৯ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪৩৪। তাবারী, ৩খণ্ড, ৮৭-৮৮ পৃঃ।
১০ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৩৩০পৃঃ।
১১ ওই দেখুন, ১০৫-১১৭ পৃঃ; দিনাওয়ারি ৩৭৬-৩৭৮পৃঃ
১২ তাবারী, ৩ খণ্ড, ১২৯-১৩৩; মাসউদী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৬ পৃঃ। বাগদাদি (সম্পাদনা : হিট্টি) পৃঃ ৩৭। ইসবাহানের কাছে একটি শহরের নাম রাওয়ান্দ।
১৩ বংশতালিকা দেখুন।
১৪ তাবারী, ৩খণ্ড, ২৪৫-৬৫ পৃঃ, ৩১৫-১৬। মাসউদী, ৬ খণ্ড, ১৮৯-২০৩পৃঃ, দিনাওয়ারি, ৩৮১পৃ।
১৫ তাবারী, ৩খণ্ড, ১১৯-২০পৃঃ, ৩৫৪-৩৫৮পৃঃ। ইয়াকুবী, ২খণ্ড, ৪৪১-৪৪২পৃ। ইবন-আল আসীর, ৫ খণ্ড, ৩৬৮-৩৬৯ পৃ।
১৬ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ। ইবন-কুতাইবাহ, মা'আরিফ, ১৯১পৃ।

১৭ ইয়াকুবী, বুলদান, ২৩৮পৃ, ১.৫.
১৮ মাসউদী, ২ খণ্ড, ২৫ পৃ। ইয়াকুত, ১ খণ্ড, ৪৭৭পৃ।
১৯ ইয়াকুবী, ২খণ্ড, ৪৪৫-৪৪৭ পৃ।
২০ বালাযূরী ৪৪৫পৃ ; ইয়াকুত, ৪খণ্ড, ১৮৩-১৮৪পৃ., ইয়াকুবী, ২খণ্ড, ৪৪৯পৃ।
২১ ইয়াকুবী, বুলদান, ২৩৭পৃ।
২২ ওই দেখুন, ২৩৫পৃ, বালাযুরি, ২৯৪পৃ, হিট্টি, ৪৫৭পৃ।
২৩ তাবারী, ৩ খণ্ড, ২৭২ পৃ।
২৪ আল-খাতিব (আল বাগদাদী) তারীখ বাগদাদ, ১খণ্ড (কায়রো, ১৯৩১) ৬৯-৭০পৃ। তাবারী, ৩খণ্ড, ৩২৬পৃ। ইয়াকুত, ১খণ্ড, ৬৮৩পৃ।
২৫ তাবারী, ৩খণ্ড, ২৭৬পৃ। ইয়াকুবী, বুলদান ২৩৮; খাতীব, ১খণ্ড, ৬৬-৬৭ পৃ।
২৬ খাতীব, ১খণ্ড, ৭৩পৃ।
২৭ ওই প্রথম খণ্ড, ৬৮৩পৃ।
২৮ ইয়াকুত, ১খণ্ড, ৬৮৪-৬৬৫পৃ; খাতীব, ১খণ্ড, ৬৭-৬৮পৃ;।
২৯ তাবারী, ৩খণ্ড, ৩৭১পৃ।
৩০ ইবন-খাল্লিকান, ১খণ্ড, ২৯০পৃঃ; (যেখানে কোরানে সূরা ২০:৩০অনুরূপ অর্থেই আল হামদানিকে উজির বলা হয়েছে)
৩১ ইবন-আল-ফাকীহ্, ৩২২-৩২৪পৃ। তাবারী, ২খণ্ড ১১৮-১। ইয়াকুত, চতুর্থ খণ্ড, ৮১৮ পৃষ্ঠা।
৩২ তাবারী, ২খণ্ড, ৮৪০পৃ।
৩৩ ইবন-আল-ফাকীহ্, ৩১৪ পৃ।
৩৪ তাবারী, ৩খণ্ড, ৪৯৭পৃ।
৩৫ দেখুন ফাখ্‌রি, ২০৬পৃ,। মাসউদী, তানবীহ্, ৩৪০পৃ।
৩৬ ইবন-আল-আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৩পৃঃ।
৩৭ তাবারী, ৩খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ। ইবন-আল-আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪পৃঃ। মাসউদী, তানবীহ্, ৩৪১ পৃঃ।
৩৮ ইয়াকুবী, ২খণ্ড, ৫২০ পৃঃ।
৩৯ ইবন-খাল্লিকান, ১খণ্ড, ১৮৫ ও পরবর্তী পৃঃ।
৪০ তাবারী, ৩খণ্ড, ৬৪৫ পৃঃ ২, ১৮-১৯। বালাযুরি ৩৬৩ পৃষ্ঠা।
৪১ তাবারী, ২খণ্ড, ৮৪৩পৃঃ। মাসউদী, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৬১পৃঃ।
৪২ জাহিয, বায়ান, ৩ খণ্ড, ২০১পৃঃ।
৪৩ তাবারী, ৩খণ্ড, ৬৭৪-৬৭৬পৃঃ।
৪৪ তাবারী, ৩খণ্ড ৬৮০পৃঃ; ইক্‌দ, ৩খণ্ড, ২৮পৃ;।
৪৫ তাবারী, ৩খণ্ড, ৬৭৬-৬৭৭পৃঃ; মাসউদী, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৮৭-৩৯৪পৃঃ। ফাখ্‌রি, ২৮৮ পৃঃ। ইবন-খালদুন, ৩খণ্ড, ২২৩-২২৪ পৃঃ। কিতাব আল-উয়ুন ৩খণ্ড, ৩০৬-৩০৮ পৃষ্ঠা।
৪৬ ইক্‌দ, ৩খণ্ড ২৮পৃঃ।

॥ অধ্যায় ২৪ ॥

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ



মুসলিম ইতিহাসের অন্য রাজবংশের মতোই আব্বাসীয় রাজবংশেও প্রতিষ্ঠার পরই রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের সবচেয়ে সেরা সময় আসে। আল-সাফ্ফাহ্ এবং আল-মানসূরের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদি খলিফারাজ্যের সুবর্ণযুগ ছিল তৃতীয় খলিফা আল-মাহ্দীর আমল থেকে শুরু করে নবম খলিফা আল-ওয়াসিকের সময় পর্যন্ত। বিশেষত হারুন আল-রশীদ এবং তাঁর পুত্র আল মামূনের আমলে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে। মূলত এই দুই কৃতী খলিফার জন্যই আব্বাসীয় রাজবংশ সাধারণ মানুষের কল্পনায় বিশেষভাবে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে এবং ইসলামের ইতিহাসে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ আল-সাআলিবি' (মৃ. ১০৩৮) মন্তব্য আব্বাসীয় রাজবংশের 'প্রতিষ্ঠাতা' আল-মানসূর, 'মধ্যবর্তী অগ্রবর্তী শক্তি' আল-মামূন এবং 'পতনকারী' আল-মুতাযিদ (৮৯২-৯০২)—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে মিথ্যা নয়। আল-ওয়াসিকের পর থেকেই আব্বাসীয় রাজবংশের পতন ঘটতে থাকে। বংশ পরম্পরায় ৩৭ তম খলিফা আল-মুতাসিমের আমলে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলীয়দের হাতে এই সাম্রাজ্যের যবনিকা পতন হয়। আব্বাসীয় খলিফা-রাজ কোন গুণবলে এত ক্ষমতা, গরিমা এবং অগ্রগতির ধারক-বাহক হয়ে উঠেছিলেন সেকথা সহজেই বোঝা যায় সেই সময় বিদেশিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যথার্থভাবে মূল্যায়ন করলে, বাগদাদের রাজসভা এবং অভিজাতদের জীবন যথাযথভাবে সমীক্ষা করলে এবং সেকালের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত জাগরণের উৎস অনুসন্ধান করলেই যা আল-মামূনের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বোচ্চ আকার নেয়।

● ফ্র্যাঙ্কদের সঙ্গে সম্পর্ক

উনবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি নামই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যে শার্লমান এবং প্রাচ্যে হারুন আল-রশীদ। দু'জনের মধ্যে আবার হারুনই ছিলেন নিঃসন্দেহে বেশি শক্তিশালী এবং উচ্চতর সংস্কৃতির প্রতিনিধি। এই দুই সাম্রাজ্য-অধিপতি নিজ নিজ স্বার্থের কথা ভেবেই পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। শার্লমান জানতেন যে তাঁর চিরশত্রু বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে হারুনই হতে পারেন তাঁর সেরা মিত্র। অন্যদিকে হারুনও শার্লমানকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কথা ভাবেন। হারুনের বড় শত্রু ছিল প্রতিবেশী স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্য যারা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থেকেও শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ এক সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পশ্চিমি ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হারুন এবং শার্লমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল একাধিকবার—দূত বিনিময় এবং উপহার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। শার্লমানকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, এমন এক ফ্র্যাঙ্ক লেখক (যিনি কিছুকাল তাঁর সচিব হিসেবেও কাজ করেছিলেন বলে জানা যায়) লিখেছেন, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ফেরার সময় শার্লমানের দূতরা অ্যারন-এর পারস্যরাজার কাছ থেকে হাতি, সুগন্ধিদ্রব্য এবং নানাধরনের আসবাবপত্র দান হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন।[২] 'অ্যানালস রয়্যালস'[৩] থেকে জানা যায়, বাগদাদ থেকে দান হিসেবে একটি সূক্ষ্ম ঘড়িও নিয়ে এসেছিলেন শার্লমানের দূতরা। কিন্তু শার্লমানের জন্য তামাক খাওয়ার পাইপ উপহার হিসেবে হারুন পাঠিয়েছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা কল্পিত বলেই মনে হয়। মনে হয়, 'ক্লেপসাইড্রা' শব্দটির ভুল অনুবাদ থেকেই এই বিভ্রান্তি চালু হয়ে গেছে। 'ক্লেপসাইড্রা'-র অর্থ জলের সাহায্যে সময় জানার এক যন্ত্র, যাকে সহজকথায় ঘড়ি বলা যায়। একই ভাবে পবিত্র সেপালকার গির্জার চাবি হারুনের অনুমতি নিয়েই শার্লমানকে দেওয়া হয়েছিল বলে এক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে।[৪]

দূত এবং উপহার আদানপ্রদানের এত সব ঘটনা ৭৯৭ এবং ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ঘটেছে। অথচ মুসলিম ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে বিস্ময়করভাবে নীরব। অন্য অনেক কূটনৈতিক আদানপ্রদানের কথা উল্লেখ থাকলেও এসব ব্যাপারে একটি শব্দও ব্যয় করেননি মুসলিম ইতিহাস লেখকরা। 'ইকদ'[৫] বর্ণনা করেছে, বাইজানটাইন সম্রাট এবং উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে চিঠিপত্র লেনদেন হয়েছিল। এছাড়া ভারতের রাজার এক প্রতিনিধিদল হারুনের জন্য যে, মূল্যবান দানসামগ্রী এনেছিলেন এবং তাঁদের জাঁকজমক করে অভ্যর্থনা জানানো হয়—তাও জানা যায় ওই গ্রন্থ থেকে। অন্য এক সূত্রে জানা[৬] যাচ্ছে, হারুনের পুত্র আল-মামুন সমকালীন রোমের রাজা, সম্ভবত দ্বিতীয় মাইকেলের কাছ থেকে প্রচুর উপহার পেয়েছিলেন।

● বাইজানটাইনদের সঙ্গে সম্পর্ক

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলিফা আল-মাহদীর (৭৭৫-৭৮৫) আমলে শতাব্দী-প্রাচীন বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও খিলাফতের বিরোধ আবার শুরু হয়। তবে যুদ্ধ হত খুবই অনিয়মিত

ভাবে এবং কেউই সাফল্য পেত না অধিকাংশ যুদ্ধে। বরং অভ্যন্তরীণ বিরোধই আরব রাষ্ট্রকে উত্তাল করে তোলে। এর ফলেই সুদূর বাগদাদে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন খলিফারা। এই কারণেই পঞ্চম কনস্ট্যান্টাইন (৭৪১-৭৫) আন্তর্জাতিক সীমানা আরও পূর্বে সরিয়ে নেন। একই সঙ্গে এশিয়া মাইনর এবং আর্মেনিয়ার পুরো সীমানাও সরিয়ে নেন তিনি।[৭] বাইজানটাইন সীমান্ত যখন এগিয়ে আসে, তখন সিরিয়া থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী দুর্গগুলি (তুগুর) পিছিয়ে নেওয়া হয়।

আব্বাসীয় বংশের আল-মাহদীই প্রথম খলিফা যিনি বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তিনি শত্রু দেশের রাজধানীতে বুদ্ধিমানের মতো হানা দিয়ে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর তরুণ পুত্র এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হারুন এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ৭৮২ খ্রিঃ[৮] আরব বাহিনী বসপোরাস[৯] পৌঁছে যায়। অবশ্য কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি তাদের। তখন তার পুত্র ষষ্ঠ কনস্ট্যানটাইনের নামে রাজত্ব দেখাশোনা করতেন আইরিন। তিনি আরব বাহিনীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হন। চুক্তি অনুযায়ী ৩ মাস অন্তর ৭০ থেকে ৯০ হাজার দীনার অর্ধবার্ষিক নজরানা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।[১০] এই অভিযান চালিয়েই হারুন এত স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন যে তাঁর পিতা তাঁকে 'আল-রশীদ' (সঠিক পথের অনুসারী) উপাধি দেন এবং হারুনকে সিংহাসনের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেন। হারুনের বড় ভাই মূসা আল হাদী ছিলেন প্রথম উত্তরাধিকারী।

এই শেষবার প্রমাণিত হয় যে দুরন্ত আরববাহিনী যে কোনোও গর্বিত রাজধানীর মোকাবিলায় রুখে দাঁড়াতে পারে। সব মিলিয়ে বাইজানটাইন বিরোধী মোট চারটি অভিযান হয় মুসলিম আমলে। প্রথম তিনবার অভিযান হয় মু'আবিয়া এবং সুলাইমানের[১১] নেতৃত্বে উমাইয়া আমলে। চারবার অভিযানের মধ্যে মাত্র দু'বারই প্রকৃতপক্ষে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করা সম্ভব হয়। একবার তা করেছিলেন ইয়াজিদ (৪৯/৬৬৯) অন্যবার মাসলামাহ (৯৮/৭১৬)। অবশ্য তুরস্কের ইতিহাসে উল্লিখিত রয়েছে অন্তত ৭ থেকে ৯ বার কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের কথা। এর মধ্যে দু'বার হারুনের নেতৃত্বে অবরোধ হয়েছিল বলে বলা হয়। 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' এবং অন্য আরবী বীরগাথার কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানকে আরও অনেক বেশি রঙিনভাবে চিত্রিত করে বর্ণনা করা হয়েছে ক্রুশেডের সময়।

যে বাইজানটাইন সম্রাজ্ঞী সিংহাসন দখল করেন তিনি হলেন আইরিন (৭৯৭-৮০২)। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১২] আইরিনের পর বাইজানটাইন-অধিপতি হন প্রথম নাইসিফোরাস।[১৩] ৮০২ খ্রিঃ থেকে ৮১১ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি আরবদের সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর কৃত চুক্তি প্রত্যাখান করেন। এমন কী তিনি তৎকালীন খলিফা আল-রশীদের কাছে চিঠি লিখে ইতিমধ্যে দেওয়া সমস্ত অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত কর ফেরত চান। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে রশীদ তাড়াতাড়ি রাজকর্মচারীদের কাছে কালি-কলম চান এবং ওই চিঠিরই পিছনে ঘৃণা ভরে যা লেখেন তা এরকম—

'করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অধিনায়ক হারূনের হয়ে রোমান কুকুর নাইসিফোরাসকে লিখছি। এই চিঠিটির আদ্যোপান্ত আমি পড়েছি। হে অবিশ্বস্ত মায়ের সন্তান, চিঠির জবাব চাও তো মুখোমুখি হও, কানে শোনার মতো কোন জবাব নেই। সালাম।'[১৪]

এই কথানুসারেই হারূন তৎক্ষণাৎ আল-রাক্কা থেকে অভিযান শুরু করে দেন। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সিরীয় সীমান্তের এই প্রিয় শহর থেকে অভিযান চালিয়ে হারূন এশিয় মাইনর এলাকা তছনছ করেছিলেন এবং হেরাক্লিয়া (হিরাক্লাহ) ও তিয়ানা (আল-তুয়ানা) দখল করেন। পাশাপাশি তিনি খোদ সম্রাটকে এক বিপুল পরিমাণ বার্ষিক কর দিতে বাধ্য করেন। শুধু সাম্রাজ্য দিয়েই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে করভারে জর্জরিত করেছিলেন হারূন।[১৫] হারূন আল-রশীদের আমলে এই ঘটনা আব্বাসীয় রাজশক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হিসেবেই স্বীকৃত হয়ে রয়েছে।

৮০৬ খ্রিস্টাব্দের পর তরাসের ওপারে দখলদারি কায়েমে মাত্র একবারেই জবরদস্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়। আর ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে আল-মুতাসিম একবার অভিযান চালান। আল-মুতাসিমের প্রচুর সৈন্য ছিল। কোন খলিফার সেনাবাহিনীতেই এত সৈন্য ছিল না।[১৬] আল-মুতাসিম রোমান ভূমির অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে সামরিকভাবে অ্যামোরিয়াম (অ্যামোরিয়ান আরবী, আমমূরিয়াহ্‌) পর্যন্ত দখল করেন। কিন্তু তা টিকিয়ে রাখা যায়নি। ওই আমোরিয়াম ছিল তৎকালীন শাসক রাজবংশের জন্মভূমি।[১৭] আরব বাহিনীর ইচ্ছে ছিল কনস্ট্যান্টিনোপলেও অভিযান চালানোর। কিন্তু দেশে বিপজ্জনক ফৌজি অন্তর্ঘাতের খবর পেয়ে তাঁরা পিছু হটেন। তখনকার কনস্ট্যান্টিনোপল-অধিপতি থিওফিলাস (৮২৯-৮৪২) রাজধানী হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভেনিসে, ফ্র্যাঙ্ক-রাজার কাছে এবং স্পেনের উমাইয়া রাজসভায় দূত পাঠিয়ে সাহায্যের আর্জি জানান। থিওফিলাস আরও একবার এভাবে পূর্ব সীমান্ত থেকে হুমকির মুখোমুখি হয়েছিলেন। হারূন-পুত্র আল-মামুন নিজে থিওফিলাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তরাসের কাছে তাঁর মৃত্যু হয়। আল-মুতাসিমের পর আরবের পক্ষ থেকে তেমন বড়সড় কোন অভিযান চালানো হয়নি। এছাড়া তাঁর উত্তরাধিকারী যেসব খলিফা কনস্ট্যান্টিনোপল বিরোধী অভিযান চালানোর স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন, দেশ জয় করা নয়। কোন অভিযানই তেমন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেনি। অথচ নবম শতাব্দী জুড়ে আরবদের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে এমন বিক্ষিপ্ত সংঘাত লেগেই থাকত। এক আরব ভূতাত্ত্বিক[১৮] জানিয়েছেন, তখন বছরে তিনবার যুদ্ধ অভিযান চালানো রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার অভিযান চালানো হত শীতকালে ফেব্রুয়ারির শেষ এবং মার্চের শুরুর মধ্যে। আরেকবার অভিযান চালানো হত বসন্তকালে। ১০ মে থেকে অভিযান শুরু হয়ে দিন তিরিশেক ধরে তা চলত। তৃতীয় অভিযান চালানো হত গ্রীষ্মকালে। ১০ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ৬০ দিন ধরে চলত এই অভিযান। কার্যত এই অভিযান চালানো হত ফৌজি বাহিনীকে সবসময় যুদ্ধোপযোগী রাখার জন্য। এছাড়া যাতে যুদ্ধে কম লোকসানের মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া

যায় তাও লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আরবদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ইসলামি ইতিহাসে সাবেক অভিযানগুলিতে যে ধর্মীয় উন্মাদনা বেশি গুরুত্ব পেত ক্রমশ তার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করতে শুরু করল। এভাবেই আলেপ্পোতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে উদীয়মান হামদানী রাজবংশ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এদের পরিণতির কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

● বাগদাদের গৌরব

খলিফা হারুন আল রশীদের (৭৮৬-৮০৯) আমলে ইতিহাস এবং কিংবদন্তী একাকার হয়ে বাগদাদকে খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করায়। যদিও বাগদাদের উত্থানকাহিনী অর্ধশতকের চেয়ে কম প্রাচীন, কিন্তু ওই সময়ে বাগদাদ ধনসম্পদ এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিশ্বসেরা হয়ে উঠেছিল। বাইজানটাইন রাজধানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একাকী মাথা উঁচু করে রাখার ক্ষমতা ছিল বাগদাদের। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বাগদাদ অত্যুৎকর্ষ হয়ে ওঠে। তখন বাগদাদ এমন এক শহরে পরিণত হয়, সারা পৃথিবীতে যার জুড়ি ছিল না।[১৯]

গোলাকার নগরীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল রাজকীয় প্রাসাদ। প্রাসাদে হারেম, হারেমের খোজা পুরুষ প্রহরী এবং রাজকর্মচারীদের জন্য আলাদা নিবাস ছিল। প্রাসাদের প্রেক্ষাগৃহটি ছিল দর্শনীয়। পর্দা, গদি কার্পেট দিয়ে রাজকীয়ভাবে সজ্জিত ছিল এই প্রেক্ষাগৃহটি। খলিফার বিবি যুবাইদাহ্ (যিনি সম্পর্কে তাঁর চাচাতো বোন ছিলেন) স্বামীর সঙ্গে যাবতীয় সম্মানকর কাজ-কর্মে অংশীদার ছিলেন। খলিফা এবং তাঁর বিবি খাবার টেবিলে সোনা বা রূপা ছাড়া অন্য ধাতুর তৈরি কোন বাসন রাখা পছন্দ করতেন না। শুধু সোনা-রূপার তৈরি নয়, তাতে দামী পান্নার কারুকার্য থাকত। বিবি যুবাইদাহ্ অত্যন্ত ফ্যাশন প্রেমিক ছিলেন। তিনিই প্রথম আরবী মহিলা যিনি জুতোয় দামি মণিমুক্তো লাগান।[২০] একবার পবিত্র তীর্থে গিয়ে যুবাইদাহ্ ৩০ লক্ষ দীনার খরচ করেছিলেন। ২৫ মাইল দূরের এক ঝরনা থেকে মক্কায় জল সরবরাহের প্রকল্পটি এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

যুবাইদার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আল-মাহদীর সুন্দরী কন্যা উলাইয়া। সে হারুনের পালিত বোন। তিনি অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। তিনি কপালে এবং মাথার চুলে এক ধরনের ওড়না পরতেন, যে ওড়নায় থাকত নানা-রকম মণিমানিক্য। এই জাঁকাল ওড়না পরা শেষপর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়।[২২]

খলিফার অভিষেক অনুষ্ঠান, বিবাহ, তীর্থযাত্রা এবং বিদেশি দূতের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাগদাদের রাজসভার ধনসম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। ৮২৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মামুনের বিবাহ হয়। পাত্রী ছিলেন তাঁর উজির আল-হাসান ইবন-সহল-এর ১৮ বছরের কন্যা বূরান।[২৩] এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সমারোহে এত অর্থব্যয় হয় যে, আজও আরবী সাহিত্যে এই বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা ব্যতিক্রমী হিসেবে লিখিত হয়ে রয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বর-কনে বসেছিলেন একটি

সোনার বিছানায়। একটি সোনার রেকাবি থেকে তাদের মাথায় ঢালা হয় নানা আয়তনের কয়েক হাজার মুক্তা। বিয়ের রাতে স্পার্ম-তিমির উদর থেকে পাওয়া যায় যে মোম জাতীয় পদার্থ, যাকে বলা হয় অ্যাম্বর, তার তৈরি অত্যুজ্জ্বল বাতি জ্বালানো হয় রাতভর। আর নিমন্ত্রিত যুবরাজ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয় কস্তুরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল, যার প্রত্যেকটিতে ছিল একটি করে টিকিট। ওই টিকিট পাওয়ার সুবাদে কেউ পেয়ে যান একটি অঞ্চল, কেউ বা একজন ক্রীতদাস এবং হরেকরকমের দানসামগ্রী।[২৪] ৯১৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মুক্তাদির বিশাল সমারোহ করে সপ্তম কনস্ট্যান্টিন যুবরাজকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে দু'দেশের বন্দি বিনিময় এবং মুক্তির চুক্তি হয়।[২৫] এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ১ লক্ষ ৬০ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, ৭০০০ কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ খোজা এবং ৭০০ অমাত্য। অভ্যর্থনার দিন যে মিছিল বেরোয় তাতে যোগ দেয় ১০০ সিংহ। খলিফার প্রসাদে ৩৮ হাজার পর্দা টাঙ্গানো হয়, যার মধ্যে ১২,৫০০ টি ছিল মণিমুক্তা বসানো। এছাড়া পাতা হয় ২২,০০০ কার্পেট। বিদেশি দূতবৃন্দ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ভুল করে প্রথমে অমাত্যদের কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। পরে ঢুকে পড়েন উজিরদের কার্যালয়ে। শেষে ঢোকেন রাজদরবারে। এঁরা সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, বৃক্ষ-গৃহ (দার আল-শাজারা) দেখে। ওই গৃহে ছিল সোনা এবং রূপার তৈরির ৫ লক্ষ ড্রাম ওজনের কৃত্রিম গাছ। গাছের ডালে ডালে ছিল মূল্যবান ধাতুর তৈরি পাখি। সেযুগে তা এমনভাবে তৈরি করা হয় যে মাঝে মাঝেই যন্ত্রের সাহায্যে পাখিগুলি ডেকে উঠত। বাগানে কৃত্রিম ছোটমাপের খেজুর গাছ গড়া হয়েছিল পাথরের সাহায্যে। এইসব শিল্পকর্ম চর্চার মাধ্যমে অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্ম হয়েছিল।[২৬]

চুম্বকের মতোই ইসলামি সাম্রাজ্যের আদর্শ রাজা হারুন এবং তাঁর উপাধিকারী খলিফাদের রাজধানীর কবি, সঙ্গীতকার, গায়ক-গায়িকা, নর্তকী, লড়াকু মোরগ ও কুকুরের প্রশিক্ষক এবং অন্য বিনোদনকারীদের প্রতি আকর্ষণ ছিল।[২৭] বাগদাদের বিখ্যাত গায়ক এবং সুরকার ছিলেন ইবরাহীম আল-মাওসিলি, সিয়াত এবং ইবন-জামি। বিখ্যাত লম্পট কবি ছিলেন আবু-নুওয়াস। আল-রশীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল প্রচণ্ড। আবু-নুওয়াস এবং সমকালীন কবিরা তাঁদের রচনায় তৎকালীন রাজসভার গৌরবময় জীবনের কথা লিখে রেখে গেছেন। 'আল-আগানি'-র পাতায় পাতায় রয়েছে এমন সব তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের ছবি, যার সত্যতা অনুসন্ধান করা খুব কঠিন নয়। এমনই এক কাহিনীতে লেখা হয়েছে, খলিফা আল-আমীন (৮০৯-৮১৩) এক সন্ধ্যায় স্রেফ আবু-নুওয়াসের লেখা কয়েকটি কবিতা শোনানোর জন্য তাঁর নিজের চাচা ইবরাহীম ইবন-আল-মাহদীকে ৩ লক্ষ দীনার দান করেন। ইবরাহীম ছিলেন সেকালের বিখ্যাত গায়ক। তিনি এভাবে রাজ পরিবারের কাছ থেকে আনুতোষিক বাবদ মোট ২ কোটি দিরহাম পেয়েছিলেন।[২৮] ইবন-আল-আসীর[২৯] যাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন গুণের দেখা পাননি, সেই, আল-আমীন টাইগ্রিস নদীর বুকে যে ভোজ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাতে বিভিন্ন জীবজন্তুর আকারে অসংখ্য বজরা বানানো হয়। যার মধ্যে এই ভোজসভা হয়। এইসব বজরার একটি ছিল ডলফিনের মতো,

একটি সিংহের মতো, একটি ঈগলপাখির মতো। এক একটি বজরা নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল ৩০ লক্ষ দিরহাম।[৩০] আগানিতে[৩১] আমরা এক বর্ণময় ব্যালে নৃত্যের বর্ণনা পাই। এই ব্যালে নৃত্য হয়েছিল খলিফা আল-আমীনের সৌজন্যে সারারাত ধরে। এই অনুষ্ঠানে বহু সুন্দরী নর্তকী সঙ্গীতের ছন্দে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই এই নাচ-গানে অংশগ্রহণ করেন। আল-মাসউদী লিখেছেন, ভাই আল রশীদের সম্মানে ইব্রাহীম বজারায় এক নৈশভোজ সভার আয়োজন করেন। এই ভোজসভায় নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে মাছ পরিবেশন করা হয়। নিমন্ত্রিতরা ওই মাছের টুকরোগুলি খুব ছোট বলে মন্তব্য করলে জবাবে বলা হয়, প্রতিটি টুকরোই হচ্ছে মাছের জিভ। মোট ১৫০ টি মাছের জিভের ডিশের জন্য ১০০০ দিরহামেরও বেশি দাম পড়েছে। বাগদাদের খলিফাদের বর্ণময় জীবন নিয়ে অত্যাশ্চর্য এমন বহু কাহিনীই প্রচলিত রয়েছে।

আব্বাসীয় রাজবংশের খলিফা পরিবারের রাজকীয় জীবনযাপনের পাশাপাশি উজির রাজকর্মচারী এবং রাজবংশের কাছাকাছি থাকা অমাত্যরাও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। আব্বাসীয়রা যে হাশিমি উপজাতি গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, সেই উপজাতি গোষ্ঠীর লোকজন সরকারি কোষাগার থেকে নিয়মিত প্রচুর অর্থ আনুতোষিক হিসেবে পেতেন। আল-মুতাসিমের (৮৩৩-৪২)[৩৩] আমলে এই প্রথা রদ করা হয়। আল-রশীদের মা আল-খায়জুরানের আয় ছিল ১৬ কোটি দিরহাম।[৩৪] মুহাম্মাদ ইবন-সুলাইমানের মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আল-রশীদ বাজেয়াপ্ত করেন। জানা গেছে, সুলাইমানের নগদ ৫ কোটি দিরহাম ছিল। তাঁর মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে ১ লক্ষ দিরহাম দৈনিক আয় হত।[৩৫] এসবের মালিক হন আল-রশীদ। খলিফাদের পরিবারবর্গ যেভাবে জীবনযাপন করতেন, বারমাকিরা তার চেয়ে খুব একটা নিম্নস্তরের জীবনযাপন করতেন না। তবে বাগদাদের সাধারণ মানুষের একঘেয়ে গতানুগতিক জীবন বা তাঁদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা কিছুই লিখে যাননি। একমাত্র আবু-আল-আতাহিয়ার কবিতায় এর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আল-মামূন সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বড় ভাই আল-আমীনের (বাবা তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন) সঙ্গে কয়েকবছর ধরে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন। সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন তাঁর চাচা ইবরাহীম ইবন-আল-মাহদী। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ হয় আল-মামূনের। ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধে জয় হয় আল-মামূনের। তারপর তিনি যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন বাগদাদের বেশ কিছু অংশ প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাগদাদ সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে পারি না। খলিফা হিসেবে আল-মামূন বসবাস করতেন জাফারি প্রাসাদে। নদীর পূর্ব দিকে জাফর আল-বারমিকীর জন্য ঐ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আবার বিশ্ব পর্যায়ের বাণিজ্যিক এবং বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠতে বাগদাদের বেশি সময় লাগেনি। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস উপত্যকা জুড়ে উর, ব্যাবিলন থেকে শুরু করে টেসিফোন পর্যন্ত বিস্তৃত যে বৃহত্তর শহর গড়ে উঠেছিল তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীকে কিন্তু সহজে কেউ দমন করতে পারেনি।

কারণ এই শহরেই জাহাজ ভেড়ার কেন্দ্র গড়ে ওঠার যে সুবিধা ছিল তার সুবাদে তৎকালীন সামুদ্রিক ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় বাগদাদ। বাগদাদের মাইলের পর মাইল প্রশস্ত জাহাজঘাটে সবসময়ই নোঙর করত কয়েকশ জলযান—যুদ্ধজাহাজ থেকে শুরু করে বিনোদন-যান পর্যন্ত। চীনা তরণী, ভেড়ার চামড়ায় তৈরি ছোট নৌকা দেখতে প্রায় এখনকার নৌকার মতোই ছিল। আল-মাওসিল থেকে ছাড়ত এইসব নৌকা। বাগদাদ শহরের বাজারে মিলত চীনা পোর্সিলিন, রেশম এবং কস্তুরী। ভারত এবং মালয়দ্বীপ থেকে আসত রান্নার মশলা, ধাতুদ্রব্য এবং রঙ। মধ্য এশিয়ার তুরস্ক থেকে আসত ক্রীতদাস, পোশাক, চুনি পাথর, নীলকান্ত মণি। রাশিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আসত মধু, মোম, পশুর লোম এবং শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস। মধ্য আফ্রিকা থেকে আসত হাতির দাঁত, সোনার ধুলো এবং কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস। চীনা জিনিসপত্রের পৃথক বাজার ছিল। আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সমুদ্রপথে বা ঘোড়ার পিঠে সড়কপথে বিভিন্ন পণ্য আসত। মিশর পাঠাত চাল, শস্যদানা এবং সুতিবস্ত্র। সিরিয়া পাঠাত কাঁচ, ধাতুর তৈরি জিনিস এবং ফলমূল। অ্যারাবিয়া থেকে আসত মণিমুক্তা, অস্ত্রশস্ত্র এবং বুটিদার রেশমি কাপড়। পারস্য থেকে আসত রেশম সুতো, সুগন্ধি, কাঁচা শাকসবজি।[৩৬] শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে যোগাযোগের জন্য সরাসরি নৌকার ওপর নির্মিত কাঠের 'পনটুন সেতু' ছিল তিনটি। আজও বাগদাদে এমন সেতু রয়েছে। আল-খাতীবে[৩৭] বাগদাদের এইসব সেতু এবং খাল (আনহার) নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বর্ণনা রয়েছে। বাগদাদ এবং অন্য রপ্তানিকেন্দ্র থেকে আরব বণিকরা যেতেন দূরপ্রাচ্যে, ইউরোপে এবং আফ্রিকায়। তাঁরা জাহাজে করে সোনার গহনা, ধাতুর আয়না, রান্নার মশলা, পোশাক, কাঁচের তসবিদানা নিয়ে যেতেন।[৩৮] সম্প্রতি রাশিয়া, ফিনল্যান্ডের কিছু স্থানে আরবী মুদ্রার গুপ্ত ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৯] সুইডেন ও জার্মানি সাক্ষ্য দেয় যে, সমকালে ও পরবর্তীতে মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ছিল। 'হাজার এক আরব্য রজনীতে' সিন্দবাদের যে দুঃসাহসিক কাহিনী লিখিত রয়েছে তা এই বাগদাদের মুসলিম বণিকদের কাহিনীর ভিত্তিতেই লেখা।

বাগদাদের জনজীবনে বণিকদের স্থান ছিল শীর্ষে। এখনকার মতই একই বাজারের মধ্যে প্রত্যেক বণিকদের শিল্প ও ব্যবসায়ের দোকানগুলি (সুক)[৪০] ছিল। রাজপথের চলমান জীবনের একঘেয়ে দশা ঘুচিয়ে মাঝেমধ্যে বিবাহ বা সুন্নৎ অনুষ্ঠানের মিছিল দেখা যেত। আল-মামুনের আমল থেকেই রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, লেখক এবং সমধর্মী পেশাদাররা শহরের গুণীজন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন। এই সময়ই আল-নাদীম (৯৮৮) তাঁর সেরা কীর্তি 'আল-ফিহ্‌রিস্ত' রচনা করেন। তাতে রয়েছে তৎকালীন আরবী পুস্তকের তালিকা। এমন কী সম্মোহনবিদ্যা, ভোজবাজি, তরবারি গিলে ফেলা, কাচ চেবানোর মতো বিষয়ের পাণ্ডুলিপিরও উল্লেখ রয়েছে।[৪১] ইবন-খাল্লিকন[৪২] সৌভাগ্যবশত সমকালীন বিদ্বজ্জন হুনায়ন ইবন-ইসহাকের দৈনন্দিন কাজের প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু নমুনা দিয়ে গেছেন, যা থেকে আমরা অনেককিছু জানতে পারি। এর থেকে জানা যায়, ওই সময়ে সরকারি বৃত্তির অসামান্য কদর ছিল। হুনায়ন রোজ প্রকাশ্যে জলাশয়ে স্নান করার সময় জলে ভেসে থাকতেন। সেখানে উপস্থিত লোকজন তাঁর গায়ে জল ঢেলে

দিতেন। জল থেকে উঠে তিনি ঢিলেঢালা পোশাক পরে নিতেন। তারপরই ঈষৎ মদ্যপান করতেন। তারপর বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়তেন বিছানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতেন। ঘুম থেকে উঠে সুগন্ধি পুড়িয়ে নিজেকে উজ্জীবিত করে নিতেন তিনি। এরপরই রাতের খাবারের নির্দেশ দিতেন। রাতে তিনি সাধারণত খেতেন ঝোল, রুটি এবং মাংসল মুরগি। আবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তেন। ফের ভোরে ঘুম থেকে উঠে চার রতল পরিমাণ পুরানো মদ পান করতেন। মদ্যপানের সময় তাজা ফল খাওয়ার ইচ্ছা হলে সিরিয়ার আপেল এবং নাশপাতি খেতেন।

● বুদ্ধিজীবী জাগরণ

আল-মাহদী এবং আল-রশীদের আমলে মুসলমান সেনাবাহিনীর বাইজান্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করার ঘটনা নিঃসন্দেহে সে যুগে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে যে বিলাসবহুল জীবনযাপন ইতিহাসে এবং বিভিন্ন কাহিনীতে দীপ্ত হয়ে রয়েছে, তার জুড়ি নেই। কিন্তু এই সময়েই ইসলামি ইতিহাসের সেরা বুদ্ধিজীবী জাগরণও হয়। এই জাগরণ বিশ্ব সংস্কৃতি এবং চিন্তাভাবনার ইতিহাসে প্রচন্ড তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত বিদেশি প্রভাবে, কিছুটা ভারত-পারস্য এবং সিরীয় প্রভাবে এই জাগরণ ঘটে। বিদেশী প্রভাব বলতে গ্রিক প্রভাবই ছিল বেশি। পাশাপাশি পারসি, সংস্কৃত, সিরীয় এবং গ্রিক থেকে আরবী অনুবাদ কর্মও এই সময়ে প্রচুর হয়েছে। আরবীয় মুসলমানদের বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যচর্চার এই সামান্য ঐতিহ্য ছিলই। এছাড়া মরুদেশ থেকে তারা নিয়ে এসেছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহ, শেখার অদম্য ইচ্ছা, এর ফলে আরবরা যে দেশ জয় করেছিল বা যে দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, সেই সব দেশের সংস্কৃতিবান জনগণের থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন তাঁরা। যেমন সিরিয়ার আরাম-সভ্যতার উন্নত দিকগুলি তাঁরা গ্রহণ করেন। আল-ইরাকে পারস্য সভ্যতার অনুপ্রেরণায় যে সভ্যতা উন্নত হয় তা গ্রহণ করতে তাঁরা ইতস্তত করেননি। বাগদাদ প্রতিষ্ঠার পরের শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ আরবীভাষী লোকেরা অ্যারিস্টটলের মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাদের আয়ত্তেই রেখেছিল। এছাড়া নয়া-প্লেটোপন্থি মতবাদের এই চিন্তাবিদদের লেখা পত্র, গ্যালেন-এর সুবিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক লেখা; পারসি এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রও আরবীয়রা সংগ্রহ করে আত্মস্থ করতে মনোনিবেশ করেন।[৪৩] মাত্র কয়েক দশকেই আরব পন্ডিতরা গ্রিক সভ্যতা থেকে আহরিত জ্ঞানতত্ত্বগুলির বিকাশে মন দেন। এভাবে গ্রিক এবং পারসি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করে ইসলামধর্ম নিশ্চিতভাবে নিজস্ব চরিত্রের অনেকাংশই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে মরুদেশে নতুন হাওয়ার জন্ম হয়, যার নাম আরবীয় জাতীয়তাবাদ। এভাবে মধ্যযুগীয় এক সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দক্ষিণ-ইউরোপীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় সভ্যতার মিলন ঘটে। এটা মনে রাখা দরকার, এই সংস্কৃতি একটি ধারাতেই বজায় ছিল, যে ধারার উৎস ছিল প্রাচীন মিশরে, ব্যাবিলনে, ফিনিশিয় এবং ইহুদি সংস্কৃতিতে। এই সব সংস্কৃতিই গ্রিক সংস্কৃতির দিকে ধাবমান হয়ে আবার ইউরোপে হেলেনিজমের আকারে ফিরে আসে। পরে আমরা দেখব

কীভাবে এই প্রবাহ স্পেন এবং সিসিলির আরবদের মারফত পুনরায় ইউরোপে ঘুরে আসে। তখন তা ইউরোপে রেনেসাঁর উন্মেষে সাহায্য করে।

● ভারত

ভারতও সাহিত্য এবং গণিতচর্চায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। হিজরী সন ১৫৪ অব্দে (৭৭১ খ্রিস্টাব্দে) এক ভারতীয় পর্যটক বাগদাদে জ্যোতির্বিদ্যার এক তত্ত্ব 'সিদ্ধান্ত' (সিন্দহিন্দ) চালু করেন। খলিফা আল-মানসূরের নির্দেশে ওই তত্ত্ব আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-ফাজারি (৭৯৬ থেকে ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন)। এই ফাজারিই ইসলামি দুনিয়ার প্রথম জ্যোতির্বিদ।[১৪] সাবেক যুগে ও আরবের পণ্ডিতদের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে আগ্রহ কম ছিল না। কিন্তু তখন পর্যন্ত তা নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। এভাবে ইসলামি দুনিয়া জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় মন দিল। কোন দিকে মুখ করে নামায পড়া শাস্ত্রসম্মত—এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ওঁরা জ্যোতির্বিদ্যাকে কাজে লাগালেন। বিখ্যাত আল-খওয়ারিজমি (মৃ. ৮৫০ খ্রিঃ) আল-ফাজারির লেখার ভিত্তিতেই তাঁর সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণি (জিজ) তৈরি করেন। এভাবে তিনি গ্রিক ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার সমন্বয় সাধন করে নিজস্ব অবদানও তাতে সংযোজিত করেন। এই সময়কার জ্যোতির্বিদ্যায় অন্যান্য যেসব বইপত্র পারসি থেকে আরবী ভাষায় অনূদিত হয় তা করেন আল-ফযল ইবন নওবখত।[১৫] (মৃ. ৮১৫ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন আল-রশীদের গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক।[১৬]

এই ভারতীয় পর্যটকই গণিতেরও এক গবেষণা-সন্দর্ভ বাগদাদে এনেছিলেন। এই সন্দর্ভের সংখ্যাতত্ত্বকে ইউরোপীয়রা বলত আরবীয় সংখ্যাতত্ত্ব এবং আরবীয়রা বলত ভারতীয় (হিন্দি)। এই সংখ্যাতত্ত্ব এইসময় গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[১৭] পরে নবম শতকে ভারতীয়রা আরবী গণিত শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোজিত করেন, তা হল দশমিক প্রথা।

● পারস্য

শিল্পকলা এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাস-রসসাহিত্যে ছাড়া পারস্যের দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। পারস্যের ইরানি জনগণের নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সেমেটিক আরবীয় জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রয়োজনীয় ছিল। শিল্পকলার পরেই বিজ্ঞান এবং দর্শনের চেয়েও সাহিত্যিক কাজকর্মের ব্যাপারে পারসি প্রভাব যে আরবের জনগণকে প্রভাবিত করেছিল তা বলা বাহুল্য। আরবের সাবেক সাহিত্যকর্ম 'কালিলাহ ওয়া-দিমনাহ' (খেঁকশিয়ালের কাহিনী) ছিল পাহলবী থেকে অনূদিত। পারসিরা আবার এই কাহিনী সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন। অনুশারওয়াঁর (৫৩১-৭৮) আমলে দাবা খেলার সঙ্গে এই কাহিনীও ভারতীয় ভাষা থেকে পারসিকরা অনুবাদ করেন। আজও এই কাহিনী 'পঞ্চতন্ত্রে' রয়েছে। অথচ আরবী অনুবাদ এতই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, পারসি অনুবাদটি

মূল সংস্কৃতের মতো হারিয়ে গিয়েছিল। তাই এই বইটির আরবী সংস্করণ থেকেই ৪০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে—ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায়, হিব্রুতে, তুর্কিভাষায়, ইথিওপিয়ার ভাষায় এবং মালয় ভাষাতেও। এমন কী আইসল্যান্ডের ভাষাতেও এই কাহিনীর অনুবাদ রয়েছে। এই বইতে পশুর কাহিনীর নীতিগল্পের মাধ্যমে যুবরাজদের রাজকার্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় বইটি অনুবাদ করেন ইবন আল-মুকাফফা।[১০] তিনি আদপে ছিলেন এক জরাথুস্ট্রপন্থি। পরে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু ধর্মান্তর সত্ত্বেও তাঁর প্রতি গোঁড়োদের সন্দেহের জন্য শেষপর্যন্ত ৭৫৭ খ্রিঃ নাগাদ তাঁকে আগুনে পুড়ে মরতে হয়।

ইবন-আল-মুকাফফার অনুবাদ কর্মটি ছিল বেশ সুচারু এক সাহিত্যকর্ম। এর আগে পর্যন্ত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে আরবী গদ্য পারসি সাহিত্যের যথাযথ সুরভিত, রঙিন রূপকল্প এবং সাবলীল বিবরণের স্বাদ পায়নি। সাবেক আরবী সাহিত্যধারায় প্রকাশের আঙ্গিক ছিল যুক্তিযুক্ত, চাঁচাছোলা। কিন্তু অভাব ছিল কাব্যময়তার এবং রূপকল্পের। সাসানীয় আমলের রচনাশৈলী এই রীতিকে বদলে দিল। 'আল-আগানি', 'আল ইকদ-আল-ফরীদ' এবং আল-তুরতুশির 'সিরাজ আল-মুলূক'[১১] হল এমনই আরবী সাহিত্যকর্ম, যাতে সাবেক ভারতীয়-পারসি প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। বিশেষত যখন আদবকায়দা, আচার-আচরণ, জ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাসের প্রসঙ্গ আসে তখনই বোঝা যায় এই প্রভাবের কথা। আমরা দেখব যে, আরবী ইতিহাসতত্ত্বও পারসি ধাঁচেই গড়া।

৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মানসুর পেটের জটিল রোগে আক্রান্ত হন। রোগ সারাতে গিয়ে চিকিৎসকরা ধাঁধায় পড়ে যান। জুন্দি-শাপুর[১২] থেকে সেখানকার হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান জুর্জিস[১৩] (জর্জ) ইবন-বখতিসুকে (৭৭১) তখন ডেকে পাঠানো হয়। জুন্দি-শাপুর ছিল চিকিৎসা এবং দর্শনের শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত। রাজা অনুশারওয়াঁ ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই দুই অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গ্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী এই সংস্থায় গবেষণা হত। গবেষণাকাজে 'আরাম' ভাষা ব্যবহৃত হত। ডাক্তার জুর্জিস এসে দ্রুত খলিফার আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। পরে তিনিই রাজসভায় চিকিৎসক নির্বাচিত হন। তবে তারপরও তাঁর খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে খলিফার আমন্ত্রণ লাভের পরও তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর পিতা ও পূর্বপুরুষের সান্নিধ্যই বেশি পছন্দ করেন—তাঁরা স্বর্গ বা নরক, যেখানেই থাকুন না কেন।[১৪] ইবন-বখতিসু বাগদাদে এক বিশিষ্ট পরিবারের জনক ছিলেন। এই পরিবার ৬/৭ প্রজন্ম ধরে রাজসভার মূল চিকিৎসকের দায়িত্ব সামলান। ৬/৭ প্রজন্ম অর্থাৎ প্রায় আড়াই শতক ধরে। সেখানে গহনা নির্মাণ বা অন্য ধরনের কারিগরি শিল্পের মতো বিজ্ঞান-কাহিনীও পুরোপুরি পারিবারিক পরম্পরা হিসেবে বিবেচিত হত। পুরুষানুক্রমে তা পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হত। জুর্জিসের পুত্র বখতিসুও আল-রশীদের আমলে বাগদাদের হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বখতিসুর পুত্র জিব্রিল (খ্রিস্টান নাম গ্যাব্রিয়েল) আল-রশীদের এক প্রিয় ক্রীতদাসের চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলেন। ওই ক্রীতদাস মানসিক রোগ এবং পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন। শেষপর্যন্ত ৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি খলিফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন।[১৫]

● (হেলিনিজম) গ্রিক-ইহুদি সংস্কৃতি

আরবরা উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার ভূখণ্ড জয় করার পর গ্রিসের বুদ্ধিজীবী উত্তরাধিকার প্রশ্নাতীতভাবে সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে। আরব জীবনে সমস্তরকম বিদেশি প্রভাবের মধ্যে হেলিনিজম-এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। সিরীয় খ্রিস্টানদের মুখ্যকেন্দ্র এডেসা (আল-রুহা) এবং যেসব ধর্মচ্যুত সিরীয় হাররানকে কেন্দ্র করে বসবাস করেছিলেন, তাঁরা নবম শতক এবং তারপর 'স্যাবিয়ান' (আরবী সাবিয়া বা সাবিয়ুন)[৫৪] হিসেবে দাবি করতেন নিজেদের। অ্যান্টিয়োক ছিল প্রাচীন গ্রিক উপনিবেশগুলির অন্যতম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের মিলনস্থল ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। অসংখ্য সিরীয় এবং মেসোপটেমীয় মঠ ছিল সেকালের এই গ্রিসে। এইসব মঠে বিজ্ঞান সংক্রান্ত, দার্শনিক এবং খ্রিস্টানধর্ম সংক্রান্ত পড়াশোনা হত। মঠগুলি হেলিনিয় সংস্কৃতিকেন্দ্রকে বৃত্ত করেই গড়ে উঠেছিল। এছাড়া 'রোমানদের দেশে' বিশেষত হারুনের নেতৃত্বে বারবার যে অভিযান চালায় আরবরা, তার ফলে যুদ্ধে লুণ্ঠিত নানা দ্রব্যের সঙ্গে তাঁরা বেশ কিছু গ্রিক পাণ্ডুলিপিও পেল। মূলত অ্যামোরিয়াম এবং আংকিরা (আঙ্কারা)[৫৫] থেকে এসব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। আল-মামুন গ্রিক লেখাপত্র অনুসন্ধানের জন্য 'কনস্ট্যানটিনোপল'-এর সম্রাট লিও-র কাছে দূত পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট লিও ছিলেন আর্মেনীয়। আবার আল-মানসূরও বাইজানটাইন সম্রাটের কাছে ইউক্লিড[৫৬] সহ কয়েকটি বই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। বাইজানটাইন সম্রাট তা দিয়েও ছিলেন। কিন্তু আরবরা গ্রিক ভাষা জানতেন না। তাই তাঁদের নির্ভর করতে হত অনুবাদের ওপর। আর এই অনুবাদ করতেন মূলত নেস্টোরীয় খ্রিস্টানরা। সিরীয় খ্রিস্টানরা প্রথমে তা সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করতেন। তারপর সিরীয় থেকে ফের আরবীতে অনুবাদ করে নিতেন। এভাবেই হেলিনীয় সভ্যতার সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার মিলন হয়। গ্রিক সংস্কৃতি আরও বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। হেলিনীয় সভ্যতা নিয়ে আরবরা আগ্রহী হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত তাদের সিরীয় অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হত।

আল-মামূনের আমলেই গ্রিক প্রভাব দারুণভাবে প্রভাবিত করে আরব সভ্যতাকে। মামূনের মতো খলিফার উদার এবং ন্যায়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে গ্রিক দর্শনকর্ম অনুসন্ধানে প্ররোচিত করে। এছাড়া মুতাজিলা মতবাদকে তিনি সমর্থন করতেন। মুতাজিলা মতবাদে বলা হত, ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্তিকে মেলানো প্রয়োজন। এর ফলেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। ফিহ্‌রিস্ত[৫৭] ব্যাখ্যা করেছে, অ্যারিস্টটল নাকি স্বপ্নে আল-মামূনের সঙ্গে দেখা করেন। দেখা করে আল-মামূনকে তিনি বলেন যে, ধর্মীয় আইন এবং যুক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিজের গৃহীত নীতি অনুসারে আল-মামূন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বিখ্যাত বায়ত আল-হিকমাহ (জ্ঞানকক্ষ) স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি একটি গ্রন্থাগার এবং অনুবাদ অ্যাকাডেমিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই তিনের শতকের প্রথমার্ধে আলেকজান্দ্রিয়ায় মিউজিয়াম স্থাপনের পর এসবই ছিল শিক্ষা প্রসারের পথে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এর পরবর্তীকালে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং সদ্য মুসলিম হওয়া বিদেশিরা প্রচুর অনুবাদ কর্ম করেন। আল-মামূন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলেও এই অ্যাকাডেমিকে কেন্দ্র করেই সমস্ত গবেষণা ও অনুবাদ কাজ হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে এই যে অনুবাদকর্মের ঢেউ নামে তা ৭৫০

খ্রিস্টাব্দের পর এক শতক স্থায়ী হয়েছিল। যেহেতু অধিকাংশ অনুবাদকই ছিলেন আরামভাষী তাই বহু গ্রিক গ্রন্থ প্রথমে আরাম ভাষায় (সিরীয়) অনূদিত হয়। পরে তা আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। কঠিন বিষয়ের অনুবাদ হুবহু শব্দভিত্তিক করা হত। আর যেখানে সিরীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করার সময় যুৎসই আরবী প্রতিশব্দ মিলত না সেখানে গ্রিক শব্দটি অবিকল রেখে দেওয়া হত।[৫৮]

আরবী ভাষায় অনুবাদকরা অনুবাদের সময় মূল গ্রিক গ্রন্থের সাহিত্যিক ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখার কথা ভাবতেন না। এর ফলে আরবী চিন্তাভাবনার সঙ্গে গ্রিক নাটক, গ্রিক কাব্য এবং গ্রিক ইতিহাসের তেমন মিলন ঘটেনি। বরং এক্ষেত্রে আরবীররা পারসি প্রভাবে প্রচন্ড প্রভাবিত হয়েছিলেন। হোমারের ইলিয়াড তাওফীল (থিওফিলাস) ইবন-তুমা অনুবাদ করেছিলেন। তা সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। আল-রূহার থিওফিলাস[৫৯] ছিলেন খলিফা আল-মাহদীর মারোনাইট গোষ্ঠীভুক্ত জ্যোতিষী। কিন্তু এই গ্রন্থটি অন্য গ্রন্থের মতো আরবী ভাষায় পুনরায় অনুবাদের পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। গ্যালেন (মৃ. আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টাব্দে) এবং এজিনা-র পল (৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিকাশ লাভ করেন)[৬০] মারফত গ্রিক ওষুধপত্র, ইউক্লিড (বিকাশ লাভ করেন আনু. ৩০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) এবং টলেমি (খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে) প্রবর্তিত গ্রিক গণিত এবং অন্য বিজ্ঞান এবং অ্যারিস্টটল-প্লেটোর গ্রিক দর্শনই ছিল বুদ্ধিচর্চার আবিষ্কারের সূচক। পরে গ্রিক দর্শন নব্য প্লেটোবাদীরা কিছুটা বিকশিত করেন।

● অনুবাদকবৃন্দ

গ্রিক থেকে অন্য ভাষায় যাঁরা অনুবাদ করতেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছে আবু-ইয়াহিয়া ইবন-আল-বাতরীক (মৃ. ৭৯৬ থেকে ৮০৬ এর মধ্যভাগে)। তিনি আল মানসূরের নির্দেশে গ্যালেন এবং হিপোক্রেটিসের (৪৩৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দ নাগাদ বিকাশ লাভ করেন) গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন। পাশাপাশি টলেমি'র 'কোয়াড্রিপারটিটাম'ও[৬১] তিনি অনুবাদ করেন। ইউক্লিড এর 'এলিমেন্টস' এবং টলেমি-র[৬২] জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থ 'অ্যালমাজেস্ট' বা আরবী ভাষায় আল-ম্যাজিস্তি বা আল-মিজিস্তি (মূল গ্রিক শব্দ 'মেজিস্ত', মহান) সম্ভবত ওই সময়ই অনূদিত হয়। 'আল-মাসঊদী'তে[৬৩] তেমনই বর্ণনা রয়েছে। তবে গোড়ায় এইসব অনুবাদে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। পরে তা আল-রশীদ এবং আল-মামূনের আমলেই সংশোধিত হয়। আরেক বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন সিরীয় খ্রিস্টান ইউহান্না (ইয়াহিয়া) ইবন মাসাওয়াইহ্[৬৪] (মৃ. ৮৫৭)। তিনি ছিলেন জিব্রিল ইবন-বখতিসুর ছাত্র এবং আরেক অনুবাদক হুনায়ন ইবন-ইসহাকের শিক্ষক। আল-রশীদ যেসব গ্রন্থ আঙ্কারা এবং অ্যামোরিয়াম[৬৫] থেকে অনিয়েছিলেন সেইসব গ্রন্থই (মূলত চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত) তিনি অনুবাদ করেন। ইউহান্না আল-রশীদের উত্তরাধিকারীর আমলেও কাজ করেন। একবার আদালতে তিনি অভিযুক্ত হন, তখন তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা বিখ্যাত উক্তি হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, "শিল্পকে যদি কেউ মুর্খের মত যন্ত্রণা দিয়ে বুদ্ধিমত্তায় রূপান্তরিত করে এবং তারপর তা একশটি গুবরে পোকার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা প্রত্যেকে অ্যারিস্টটলের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে!"[৬৬]

● হুনায়ন ইবন-ইসহাক

আরবরা হুনায়ন ইবন-ইসহাককে বলেন, 'অনুবাদকদের শেখ'। হুনায়ন (৮০৯-৮৭৩) ছিলেন সেযুগের অন্যতম সেরা পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন ইবাদি অর্থাৎ নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। থাকতেন আল-হিরায়। যুবক অবস্থায় তিনি ডাক্তার ইবন-মাসাওয়াইহ্-এর কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজ করতেন। একদিন ডাক্তার মাসাওয়াইহ্ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বলেন, 'আসলে হিরার লোকজন চিকিৎসার বিন্দুবিসর্গ বোঝেন না। কম্পাউন্ডারি না করে তুমি বরং বাজারে টাকা লেনদেনের ব্যবসা কর।'[১০] এতে অত্যন্ত অপমানিত হন হুনায়ন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে তৎক্ষণাৎ ওই চাকরি ছেড়ে দেন। তখন তিনি গ্রিক শিখতে মনস্থ করেন। মূসা ইবন-শাকিরের তিনজন পন্ডিত পুত্র নিজেদের গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য একজন যুবকের খোঁজ করছিলেন। হুনায়ন তাঁদের কাজে যোগ দেন। কাজ ছিল, গ্রিক ভাষী দেশে দেশে গিয়ে মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসা। এরপর ইসহাক আল-মামুনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিব্রিল ইবন বখতিসুর-এর সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আল-মামুন হুনায়নকে তাঁর গ্রন্থাগার-অ্যাকাডেমির অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব নিয়ে তিনি সমস্ত রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণাকাজের অনুবাদের ভার নেন। একাজে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর পুত্র ইসহাক[১১] এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়শ ইবন আল-হাসান।[১২] যেসব অসামান্য কাজ হুনায়ন করেছেন তার পিছনে এই দুজন সহকারীর দান কম ছিল না। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের অন্য ছাত্র এবং সদস্যরাও সাহায্য করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ইসা ইবন ইয়াহ্য়া[১৩] এবং মূসা ইবন-খালিদ।[১৪] হুনায়ন নিজে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রিক থেকে প্রথমে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং পরে তা আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন সহযোগীরা।[১৫] যেমন, অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হারমেনুটিকা' প্রথমে গ্রিক থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন পিতা। পরে সিরীয় থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন পুত্র ইসহাক। পুত্রই আরবী ভাষায়[১৬] বেশি দক্ষ ছিলেন। ওই পুত্রই অ্যারিস্টটলের বহু লেখার অনুবাদ করেন। হুনায়ন এছাড়া গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, ডায়োসকরিডিসের (৫০ খ্রিঃ নাগাদ বিকাশ লাভ করেন) বহু লেখার অনুবাদ করেন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' (সিয়াসাহ্)[১৭] এবং অ্যারিস্টটলের 'ক্যাটাগরিস' (মাকুলাত)[১৮], ফিজিক্স (তাবিয়াত) এবং ম্যাগনা মোরালিয়া (খুলকিয়াত)[১৯] অনুবাদ করেন তিনি। গ্যালেনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই তিনি গ্রিক থেকে সিরীয় এবং সিরীয় থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[২০] গ্যালেনের অ্যানাটমি সংক্রান্ত সাতটি গ্রন্থের মূল গ্রিক পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশত তা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে রয়েছে।[২১] এছাড়া গ্রিকভাষা থেকে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' হুনায়ন আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তা অবশ্য এখন আর অবশিষ্ট নেই।[২২]

হুনায়ন যে অনুবাদক হিসেবে কত দক্ষ ছিলেন তা এক প্রতিবেদন থেকেই প্রমাণ হয়। ইবন-শাকিরের পুত্রদের কাছে চাকরি করার সময় তিনি এবং অন্য অনুবাদকরা মাসে ৫০০ দীনার (প্রায় ২৫০ পাউন্ড) বেতন পেতেন। আল-মামুন তাঁকে পারিশ্রমিক হিসেবে দিতেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটির ওজনের সোনা। কিন্তু তিনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন শুধু অনুবাদক হিসেবে নয়, পাশাপাশি চিকিৎসক

হিসেবেও। আল-মুতাওয়াক্কিলের চিকিৎসক নিযুক্ত হয়ে (৮৪৭-৬১) তিনি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। অবশ্য একবার এক শত্রুকে বিষ দেওয়ার জন্য তাঁকে বিষ তৈরির লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হলে তা তিনি প্রত্যাখান করায় আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁকে এক বছরের জন্য কারাবাসে পাঠিয়েছিলেন। এরপর কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁকে খলিফার সম্মুখে এনে খুনের ভয় দেখানো হয়। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "যা মানুষের উপকারে লাগে, তাই আমি শিখেছি। অন্য কিছু আমি শিখিনি।"[৮০] তখন খলিফা বলেন, "আমি স্রেফ তোমার সততা যাচাই করছি। কেন তুমি আমার নির্দেশ সত্ত্বেও বিষ বানাতে রাজি নও, তা জানতে চাই তোমার কাছ থেকে।"

জবাবে হুনায়ন বলেন, "দুটি জিনিস রয়েছে আমার সামনে। ধর্ম এবং আমার পেশা। আমার ধর্ম বলছে, শত্রুর সঙ্গেও সদাচরণ করতে। ঠিক যেমন বন্ধুর সঙ্গে আচরণ করি। আর আমার পেশা মানবসমাজের উপকারের জন্যই উৎসর্গীকৃত। শুধু রোগ উপশম এবং মুক্তিই আমার কাম্য। তা ছাড়া প্রত্যেক চিকিৎসককেই শপথ নিতে হয় সে কাউকে কখনও বিষাক্ত ওষুধ দেবে না।"[৮১]

হুনায়ন ইবন-ইসহাক আল-ইবাদিকে পর্যালোচনা করে ইবন-আল-ইবরি এবং আল-কিফতি বলেছেন, "তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের উৎস এবং জ্ঞানের আকর।" আর লেকলার্ক বলেছেন : "Ia plus grande figure du IX^{e} siecle". তিনি এমনও বলেছেন : une des plus belles intelligences et un des plus beaux caracteres que l'on rencontredans I' histoire".[৮২]

● সাবিত ইবন-কুর্রাহ্

হুনায়ন যেমন নেস্টোরিয়ান গোষ্ঠীর খ্রিস্টান অনুবাদকদের সেরা ছিলেন তেমন হাররান (প্রাচীন) এর তথাকথিত স্যাবিয়ানদের[৮৪] মধ্যে সেরা অনুবাদক ছিলেন সাবিত ইবন-কুররাহ[৮৩] (৮৩৬-৯০০ খ্রিঃ)। এই স্যাবিয়ানরা ছিলেন গ্রহনক্ষত্রের পূজারি। স্বভাবতই জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতে এদের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে এদের শহরটি ঘিরেই দর্শন চর্চার বিদ্যালয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তারও আগে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আলেকজান্দ্রিয়া থেকে অ্যান্টিয়োকে স্থানান্তরিত হয়। এসবের প্রভাবেই সাবিত ইবন-কুররাহ্ এবং তাঁর শিষ্যরা বিকাশের সুযোগ পান। গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রচুর গ্রন্থ তাঁরা গ্রিকভাষা থেকে নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। আর্কিমিডিস (মৃ. ২১২ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) এবং পার্গা-র অ্যাপোলোনিয়াসের (২৬২ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)[৮৫] বহু গ্রন্থ তাঁরা অনুবাদ করেন। পাশাপাশি আগে অনুবাদ করা বহু গ্রন্থের ভুলও সংশোধন করেন তাঁরা। যেমন, হুনায়নের দ্বারা ইউক্লিডের অনুবাদে ভুলভ্রান্তি সাবিত সংশোধন করেছিলেন।[৮৬] খলিফা আল-মুতাযিদের (৮৯২-৯০২) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন সাবিত। দ্রুত তিনি ওই খলিফার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন।[৮৭]

সাবিতের পুত্র সিনান (মৃ. ৯৪৩ খ্রিঃ), তাঁর দুই পৌত্র সাবিত (মৃ. ৯৭৩)[৮৮] এবং ইব্রাহিম (মৃ. ৯৪৬)[৮৯] ও এক প্রপৌত্র আবু আল-ফারাজ[৯০] অনুবাদক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সাবিতের পর যে স্যাবিয়ান বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর নাম আল-বাত্তানি

(মৃ ৯২৯ খ্রিঃ)। তিনি লাতিনভাষী লেখকদের কাছে 'আলবাতেগনিয়াস' অথবা 'আলবাতেনিয়াস' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবু-আবদুল্লা মুহাম্মাদ (ইবন জাবির ইবন সিনান) থেকেই বোঝা যায়, তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান। আল-বাত্তানির খ্যাতির মূল কারণ তাঁর অনুবাদকর্ম নয়, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা।

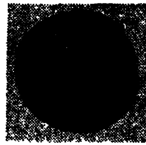
গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার অনুবাদক হিসেবে হাররান-এর যাঁরা বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল-হাজ্জাজ ইবন-ইউসুফ ইবন-মাতার (বিকাশ লাভ করেন ৭৮৬ থেকে ৮৩৩ খ্রিঃ এর মধ্যে)। তিনিই প্রথম ইউক্লিডের 'এলিমেন্ট' এবং টলেমির 'অ্যালমাজেস্ট' অনুবাদ করেন। 'এলিমেন্ট' গ্রন্থটি তিনি দু'বার অনুবাদ করেন। একবার আল-রশীদের নির্দেশে আরেকবার আল-মামুনের নির্দেশে।[৩১] হুনায়ন অনুবাদ করার আগেই এই অনুবাদ করেন তিনি। জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যালমাজেস্ট'-এর আল হাজ্জাজ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৮২৭ থেকে ৮২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সিরীয় ভাষা থেকে এই গ্রন্থ অনূদিত হয়। আল-রশীদের উজির ইয়াহিয়া ইবন-খালিদ ইবন বারমাকের আগ্রহে 'অ্যালমাজেস্ট' অনুবাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়।[৩২] কিন্তু অনুবাদ সন্তোষজনক হয়ে ওঠেনি। পরে আবু-আল-ওয়াফা মুহাম্মাদ আল-বুজজানি আল হাসিবের[৩৩] (৯৪০-৪৭ বা ৯৯৮) উদ্যোগে এর অনুবাদ করার চেষ্টা হয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদ। আরেক বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন কোস্তা ইবন -লুকা (মৃ. ৯২২ খ্রিঃ)। বা'লাবাক-এর এক খ্রিস্টান ছিলেন তিনি। 'ফিহ্‌রিস্ত'[৩৪] গ্রন্থে তাঁর লেখা ৩৪টি গ্রন্থের বর্ণনা রয়েছে।

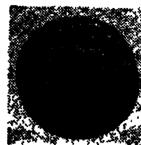
দশম শতকের শেষার্ধে উত্থান হয় জ্যাকোবাইট বা মোনোফাইসাইটদের। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের সমর্থকদের বলা হত জ্যাকোবাইট। আর যাঁরা একথা বিশ্বাস করতেন যে, যীশুখ্রিস্ট ছাড়া আর কারও যৌগিক চরিত্র নেই, তাঁরা পরিচিত ছিলেন মোনোফাইসাইট নামে। ইয়াহিয়া ইবন আদির নেতৃত্বে এই দুই গোষ্ঠীর বেশ কিছু অনুবাদক বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এইসময়। ইয়াহিয়া ইবন আদি ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাকরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়। এছাড়া ছিলেন আবু-আলি ইসা ইবন-জুরআহ্। তিনি থাকতেন বাগদাদে (মৃ. ১০০৮ খ্রিঃ)।[৩৫] ইয়াহিয়া গির্জার বিশপ ছিলেন। তিনি একবার 'ফিহ্‌রিস্ত'[৩৬]-এর লেখককে বলেন যে, তিনি দিনে-রাতে চব্বিশ ঘন্টায় একশ পৃষ্ঠা অনুবাদ করতে পারেন। অ্যারিস্টটলের লেখাপত্রের বিদ্যমান সংস্করণের ভুল সংশোধনের কাজেই এরা বেশি মন দেন। পাশাপাশি নতুন অনুবাদও করেন। অধিকন্তু এঁরাই আরবী সাহিত্য জগতে নব্য প্লেটোবাদী চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করেন।

অনুবাদের যুগ শেষ হবার পর অ্যারিস্টটলের সমস্ত লেখাপত্রই আরব জনগণ পড়তে সফল হলেন। অবশ্য অনুবাদকর্মে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি ছিল। ইবন-আবি-উসাইবিয়া[৩৭] এবং আল-কিফতি[৩৮] অন্তত ১০০টি অ্যারিস্টটল রচিত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। ইউরোপ যখন গ্রিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রায় অন্ধকারে তখনই কিন্তু এসব ঘটে গেছে। আল-রশীদ এবং আল-মামুন যখন গ্রিক এবং পার্সি দর্শনের জগৎ আরব জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন ইউরোপে

তাঁদের সমমর্যাদার শার্লেমান এবং অন্য অভিজাতরা নিছক নিজেদের নাম লেখার কলা আত্মস্থ করতেই মগ্ন ছিলেন। অ্যারিস্টটলের 'অরগানন' এবং 'রেটরিক' ও 'পোয়েটিক্স' এর মতো গ্রন্থ অনূদিত হয়ে ইসলামি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবস্তু হয়ে উঠল। পাশাপাশি ছিল আরবী ব্যাকরণ এবং পোরফিরি-র 'আইসাগোগা' নামক অমূল্য গ্রন্থ। এখনকার মতোই সেকালের মুসলমানরা নব্য প্লেটোবাদীদের এই মতে বিশ্বাসী হয়ে উঠল যে, অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর শিক্ষা একই। বিশেষত সুফি মতবাদে মুসলিম মায়াবাদ নব্য প্লোটোবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। পরে আমরা দেখব, অ্যাভিসেন্না (ইবন সিনা) এবং অ্যাভেরুশ (ইবন রুশদ) এর মাধ্যমে প্লেটোবাদ এবং অ্যারিস্টটলবাদ লাতিন দর্শনেও প্রবেশ করে। এরপর তা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

আব্বাসীয় আমলে এই দীর্ঘ এবং সফল অনুবাদ যুগ অতিবাহিত করার পর সৃষ্টি হয় নিজস্ব সৃষ্টির। এই নিয়ে পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। দশম শতক নাগাদ, আরবীভাষা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা প্রকাশের এক উল্লেখযোগ্য এবং অভূতপূর্ব মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি দার্শনিক চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ারও মাধ্যম ছিল এই আরবীভাষা। আরবীভাষা প্রাক-ইসলামি যুগে ছিল নিছক কবিতার ভাষা। মুহাম্মাদের পরবর্তী যুগে আরবীভাষা হয়ে ওঠে ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাস প্রকাশের ভাষা। আর শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনা প্রকাশের এক অভূতপূর্ব মাধ্যম। ইতোমধ্যে আরবীভাষা উত্তর আফ্রিকা, স্পেন এবং মধ্য এশিয়ার ব্যাপক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে কূটনীতির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকে আল-ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাই, মিশর, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কোর মানুষ আরবী ভাষাতেই তাঁদের উন্নত ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ❑





সূত্র : এইচ ডবলিউ সি ডেভিস, 'মিডাইভ্যাল ইংল্যাণ্ড' (ক্ল্যারেণ্ডন প্রেস)

অ্যাংলো-স্যাক্সন স্বর্ণমুদ্রা ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের আরব দিনার এর অনুকরণে)

এই মুদ্রার সামনের পিঠে কালিমা 'শাহাদাহ' লেখা রয়েছে এবং উল্টো পিঠে লেখা রয়েছে OFFA REX :

● টীকা ●

১ লাতাইফ আল-মাআরিফ (সম্পাদনা পি দি জঙ) (লিডেন ১৮৬৭), পৃঃ ৭১।

২ এগিনহার্ড, ভাই দ্য শার্লম্যান, সম্পাদনা এবং অনুবাদ এল হ্যালফেন (প্যারিস, ১৯২৩) ৪৭ পৃঃ।

৩ "অ্যানালেস রেগনি ফ্র্যানকোরাম, সম্পাদনা : জি এইচ পারজি এবং এফ কুরজের 'স্ক্রিপটরস রেরাম জার্মানিকারাম; ৪৩ খণ্ড (হ্যানোভার, ১৮৯৫) ১১৪ পৃঃ, ১২৩-১২৪ পৃঃ।

৪ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন ৫০৭ পৃঃ, ৬৩৫-৬৩৬ পৃঃ, লুই ব্রেয়ার এর 'চেম্বার দ্য কমার্স দ্য মার্সেই, কংগ্রেস ফ্রাঙ্কেস দ্য সিরি' স্যাঁস এট ট্রাভক্স, ফাস ২ (১৯১৯) পৃঃ ১৫-৩৯।

৫ ১ম খণ্ড, ১৯৭-১৯৮ পৃঃ।

৬ কুতুবি, ফাওয়াত, ১ খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ, ২.১২-১৩।

৭ এ এ ভাসিলিয়েভ : হিস্ট্রি অব দি বাইজানটাইন এম্পায়ার অনুবাদ : এস. রাগোজিন, ১ম খণ্ড, (ম্যাডিসন, ১৯২৮), ২৯১ পৃষ্ঠা; চার্লস দিয়েল, হিস্ট্রি অব দি বাইজানটাইন এম্পায়ার, অনুবাদ : জি বি ইভস (প্রিন্সটন : ১৯২৫) ৫৫ পৃঃ।

৮ কিতাব আল-উয়ুন, ৩য় ভাগ, ২৭৮ পৃঃ তে বলা হয়েছে অভিযান চালানো হয় (১৬৩-৭৮০ খ্রিস্টাব্দে), ইয়াকুবী (২ খণ্ড, ৪৭৮, ৪৮৬ পৃঃ) তে বলা হয়েছে ১৬৪ হিজরী সন। তাবারীতে (৩ খণ্ড, ৫০৩-৪ পৃঃ) বলা হয়েছে ১৬৫ হিজরী সনে।

৯ ৮১৩ খ্রিঃ থিওফ্যানিস লিখেছিলেন। তাতে বলা হয়েছে (৪৫৬ পৃঃ) হারুন আধুনিক স্কুটারির কাছাকাছি ক্রিসোপোলিস ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন।

১০ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৫০৪ পৃঃ।

১১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ২০০ ও পরবর্তী পৃঃ।

১২ ভাসিলিয়েভ, ১ খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ।

১৩ আরবীতে বলা হয় নিকফূর, আসলে তিনি আরবেরই বংশোদ্ভূত। সম্ভবত গাসসানি গোষ্ঠীর জাবালার উত্তরপুরুষ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৬৯৫ পৃঃ। মাইকেল লে সিরিয়েন; ক্রনিকল, সম্পাদনা : জে বি চ্যাবট, ৩ খণ্ড (প্যারিস ১৯০৫), ১৫ পৃঃ। আইরিন যাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন তিনি হচ্ছেন তৃতীয় লিও প্রতিষ্ঠিত সিরীয় রাজবংশের শেষ পুরুষ ৭১৭-৮০২। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরে বিক্ষোভের ধ্বজা তোলেন। যাতে মুসলিম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, থিওফ্যানিস বলেন, লিও 'আরব মনস্ক' পৃঃ ৪০৫।

১৪ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৬৯৬ পৃঃ।

১৫ ওই দেখুন, ৬৯৬ পৃষ্ঠা, ৭০৯-১০ পৃষ্ঠা। ইয়াকুবী, ২খণ্ড, ৫১৯ পৃঃ, ১ ১৪, ৫২৩ পৃঃ ১.২ দিনাওয়ারি, ৩৮৬-৩৮৭ পৃষ্ঠা; মাসউদী, ২ খণ্ড, ৩৩৭-৫২ পৃঃ।

১৬ তাবারী, ৩ খণ্ড, ১২৩৬ পৃঃ।
১৭ মাইকেল লে সিরিয়েন, ৩ খণ্ড, ৭২ পৃঃ।
১৮ কুদামাহ, কিতাব আল-খারাজ, সম্পাদনা : দি গোয়িজ (লিডেন, ১৮৮৯) ২৫৯ পৃঃ।
১৯ খাতীব, ১ খণ্ড, ১১৯ পৃঃ।
২০ মাসউদী, ৮ খণ্ড, ২৯৮-২৯৯ পৃঃ।
২১ ইবন খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ৩৩৭ পৃঃ, বার্কহার্ড : ট্রাভেলস, ১ খণ্ড, ১৯৬ পৃঃ।
২২ আগানি, ৯ খণ্ড, ৮৩ পৃঃ।
২৩ ১০ বছর বয়সেই তিনি আল-মামূনের বাগদত্তা হন। এই তথ্য দিচ্ছে ইবন খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ১৬৬ পৃঃ।
২৪ তাবারী, ৩ খণ্ড, ১০৮১-৮৪ পৃঃ। মাসউদী : ৭ খণ্ড, ৬৫-৬৬ পৃঃ; ইবন-আল আসীর, ৬ খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ। সাআলিবি, লাতায়িফ, ৭৩-৭৪ পৃঃ। ইবন-খালদূন, মুকাদ্দমাহ, ১৪৪-১৪৫ পৃঃ।
২৫ মাসউদী, তানবীহ, ১৯৩ পৃঃ।
২৬ খাতীব, ১ খণ্ড, ১০০-১০৫ পৃঃ। আবু-আল-ফিদা, ২ খণ্ড, ৭৩ পৃঃ। ইয়াকুত, ২ খণ্ড, ৫২০-২১ পৃঃ।
২৭ বালাযুরি, আনসাব আল-আশরাফ (সম্পাদনা : ম্যাক্স অ্যাকলোসিংগার, ৪ খণ্ড, বি (জেরুসালেম, ১৯৩৮), ১ পৃষ্ঠা।
২৮ আগানি, ৯ খণ্ড, ৭১ পৃঃ। হিট্টির মূল ইংরেজির নিম্নে দেখুন পৃঃ ৩২১।
২৯ ওই ৬ খণ্ড, ২০৭ পৃঃ।
৩০ ওই ২০৬ পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৯৫১-৯৫৩ পৃঃ।
৩১ ওই ১৬ খণ্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ।
৩২ ওই ৬ খণ্ড, ৩৪৯-৫০ পৃঃ।
৩৩ সাআলিবি, লাতায়িফ, ১৬ পৃঃ।
৩৪ মাসউদী, ৬ খণ্ড, ২৮৯ পৃঃ।
৩৫ ওই
৩৬ লি স্ট্রেনজ, ইস্টার্ণ ক্যালিফেট, প্যাসিম, ৩৪৩-৩৫১ পৃঃ।
৩৭ ওই ১ খণ্ড, ১১১-১১৭ পৃঃ।
৩৮ নীচে দেখুন ৩৪৫ পৃঃ।
৩৯ হেলসিঙ্কি জাদুঘরে এমন অনেক মুদ্রা আছে।
৪০ ইয়াকুবী, বুলদান, ২৪৬ পৃঃ।

৪১ ৩১২ পৃঃ।

৪২ ওই ১ খণ্ড, ২৯৮ পৃঃ।

৪৩ উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক আরব সাহিত্যে একই ধরনের অনুবাদের জোয়ার বয়ে যায়। মূলত ফরাসি এবং ইংরাজি থেকেই এইসব অনুবাদকর্ম হয়।

৪৪ সাঈদ ইবন আহমাদ (আল-কাযী আল-আন্দালুসি) তাবাকাত আল-উমাম, সম্পাদনা এল শিখো (বেইরুট, ১৯১২), ৪৯-৫০ পৃঃ। ইয়াকুত, উদাবা, ৬ খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ। মাসউদী, ৮ খণ্ড, ২৯০-২৯১ পৃঃ।

৪৫ পারসিতে 'নওবাখত' মানে সৌভাগ্য। এই পরিবারের বহু সদস্যই জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৩১৭, ৩১৮ পৃঃ (এখানে অবশ্য নাম দেওয়া রয়েছে 'নিবাখ্‌ত' বা নয়বখ্‌ত) ১৩৬৪।

৪৬ ফিহ্‌রিস্ত, ২৭৪ পৃঃ।

৪৭ দেখুন, ৫৭৩ ও পরবর্তী পৃঃ।

৪৮ 'কালিলা ওয়া দিমনাহ' এর ছাপা সংস্করণ দেখুন সিলভেস্টার দ্য স্যাসি-র (প্যারিস/১৮১৬) সংস্করণ, যা ১২৪৯ খ্রিঃ বুলাকে পুনর্মুদ্রিত। বা খলিল আল-ইয়াজিজির দ্বিতীয় সংস্করণ (বেইরুট, ১৮৮৮)। এল শিকো-র (বেইরুট, ১৯০৫) সংস্করণ। ইবন-আল-মুকাফফা সম্পর্কে জানতে ফিহ্‌রিস্ত, ১১৮ পৃঃ। ইবন-খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ২৬৬-২৬৯ পৃঃ।

৪৯ কায়রোয় প্রকাশিত ১২৮৯, ১৩০৬ ইত্যাদি।

৫০ আরবীতে জুন্দেসাবুর। এই শহরটি সাসানিদ ১ম শাপুর স্থাপন করেন। পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খুজিস্তানের শাহাবাদ গ্রামে এখনও এই নামের ফলক রয়েছে। এর অর্থ হল শাপুরের শিবির'।

৫১ ফিহ্‌রিস্ত, ২৯৬ পৃঃ। ইবন-আল-ইবরি, ২১৩-১৫ পৃঃ। ইবন-আবি-উসাইবিয়া 'বখত' (১খণ্ড ১২৫ পৃঃ) সিরীয় শব্দটি নেন। এর অর্থ 'সেবক'। আবার পাহলবী ভাষায় 'বখ্‌ত' এর অর্থ হল 'আশীর্বাদপ্রাপ্ত। কোন পরিবারের নামের সঙ্গে 'বখ্‌ত' শব্দটি যোগ করার অর্থ হয়, তাঁরা সবাই "যীশুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং যীশুপ্রেরিত"।

৫২ ইবন-আল-ইবরি, ২১৫ পৃঃ, ইবন-আবি-উসাইবিয়াব দ্বারা পুনর্লিখিত, ১ খণ্ড, ১২৫ পৃঃ।

৫৩ ইবন-আল-ইবরি, ২২৬-২২৭ পৃঃ। কিফতি, ১৩৪-১৩৫ পৃঃ।

৫৪ হিট্টির মূল গ্রন্থের নীচে দেখুন, ৩৫৭ পৃঃ।

৫৫ আরবী-আনকিরা, ইয়াকুবী, ১ খণ্ড, ৪৮৬ পৃঃ।

৫৬ ইবন-খালদুন, মুকাদ্দমাহ, ৪০১ পৃঃ।

৫৭ ২৪৩ পৃঃ।

৫৮ এমনই আরবী শব্দ এরিথম্যাটিকি (এরিথমেটিক), জুমাত্রিয়া (জিওম্যাট্রি) জিগ্রাফিয়া (জিওগ্রাফি), মুসিকি (মিউজিক), ফালসাফাহ (ফিলোসফি), অ্যাস্তরল্যাব (অ্যাস্ট্রোল্যাব),

আসীর (ইথার), ইকসির (ইলিক্সির), ইবরিজ (খাঁটি সোনা), ম্যাগনাতিস (ম্যাগনেট), উরগুন (অরগ্যান), দেখুন আবু-আবদুল্লা আল-খওয়ারিজমি-র মাফাতিহ আল-উলুম'। সম্পাদনা : জিভান ভ্োলটেন (লিডেন/১৮৯৫) সূচী: ফিহরিস্ত, প্যাসিম; রাসাইল ইখওয়ান আল-সাফা। সম্পাদনা : খায়ির আল-দীন আল-জিরিকলি (কায়রো, ১৯২৮), প্যাসিম।

৫৯ ইবন আল-ইবরি ৪১ পৃঃ, ২২০।

৬০ ওই দেখুন, ১৭৬ পৃঃ।

৬১ ফিহ্‌রিস্ত, ২৭৩ পৃঃ।

৬২ ইয়াকুবী, ১ খণ্ড, ১৫০-১৫১ পৃঃ।

৬৩ ৭ম খণ্ড পৃঃ ২৯১; তুলনীয় : মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে পৃঃ ৩১৪-১৫।

৬৪ লাতিন ভাষায় মেসু (মেসুয়া) বা মেসু মেজর (বড়)। ছোট-র থেকে পৃথক করতে এভাবে পৃথক শব্দ। 'ছোট' অর্থাৎ মেসু দি ইয়ংগার (মাসাওয়াইহ্ আল-মারিদিনি)। এই জ্যাকোবাইট চিকিৎসক ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের কায়রোর রাজসভায় বিখ্যাত হন। মারা যান ১০১৫ খ্রিঃ।

৬৫ ইবন-আল-ইবরি, ২২৭ পৃঃ। ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ। কিফতি, ৩৮০ পৃঃ।

৬৬ ফিহ্‌রিস্ত, ২৯৫ পৃঃ।

৬৭ ইবন-আল-ইবরি, ২৫০ পৃঃ। ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ।

৬৮ ইবন-খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ১১৬ পৃঃ, ডি. স্লেন, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৮৭-৮।

৬৯ ছদ্মনাম আল-আসাম। এমন নাম রাখার কারণ তাঁর একটি হাত ছিল ভাঙা। ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ১৮৭, ২০৩ পৃঃ। ফিহ্‌রিস্ত, ২৯৭ পৃঃ। ইবন-আল-ইবরি, ২৫২ পৃঃ।

৭০ ফিহ্‌রিস্ত, ২৯৭ পৃঃ।

৭১ তিনি পারসি থেকে আরবীতে অনুবাদও করেন। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৪। ১.২৮

৭২ ফিহ্‌রিস্ত, ২৪৯ পৃঃ।

৭৩ ফিহ্‌রিস্ত, ২৯৮ পৃঃ, পুনর্লিখন : কিফতি, ৮০ পৃঃ।

৭৪ ওই দেখুন, ২৪৬, ১.৫।

৭৫ ঐ দেখুন, পৃঃ ২৪৮।

৭৬ কিফতি, ৩৮, ৪২ পৃঃ।

৭৭ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ১৮৮-১৮৯ পৃঃ। কিফতি ৯৪-৯৫ পৃঃ।

৭৮ চিকিৎসাবিদদেরই অন্য লেখাপত্রর জন্য দেখুন 'আল-সিনাআহ আল-সাগীরাহ'। গ্যালেনের ১৬ খণ্ড গ্রন্থের অনুবাদ করা হয় ১০ টি আরবী খণ্ডে। এছাড়া দেখুন হিট্টি, ফারিস এবং আবদ-আল-মালিক, 'ক্যাটালগ অফ দি গ্যারেট কালেকশন অব অ্যারাবিক ম্যানাসক্রিপ্ট (প্রিন্সটন নং ১০৭৫, ১৯৩৮)।

৭৯ কিফতি, ৯৯ পৃঃ।

৮০ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ১৮৭-১৮৮ পৃঃ। ইবন-আল-ইবরি, ২৫১ পৃঃ।

৮১ ইবন-আল-ইবরি, ২৫১-২৫২ পৃঃ।

৮২ এল. লেকলার্ক হিস্টোয়ার ডিয় লা. মেডিসিন অ্যারাবি (প্যারিস, ১৮৭৬) প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।

৮৩ তাঁর 'আল-যখীরা ফি ইলম আল-তিব্ব' সম্পাদনা করেছেন জি সবি (কায়রো, ১৯২৮)।

৮৪ বাস্তবিক অর্থে মেকী স্যাবিয়ান। হিট্টির মূল ইংরেজির নিচে দেখুন পৃঃ ৩৫৮।

৮৫ ফিহ্‌রিস্ত, ২৬৭ পৃঃ।

৮৬ ইবন-খাল্লিকান, ১ খণ্ড, ১৭৭, ২৯৮ পৃঃ।

৮৭ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ২১৬ পৃঃ।

৮৮ ওই দেখুন, ২২৪-২২৬ পৃঃ।

৮৯ ওই দেখুন, ২২৬ পৃঃ। কিফতি, ৫৭-৯ পৃঃ। ফিহ্‌রিস্ত ২৭২ পৃঃ।

৯০ কিফতি, ৪২৮ পৃঃ।

৯১ ফিহ্‌রিস্ত, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

৯২ ফিহ্‌রিস্ত ২৬৭-২৬৮ সি. এফ. ও পরে পৃঃ ৩১১ পৃঃ।

৯৩ তাঁর জন্মস্থান ছিল কুহিস্তানের বুজজানে। 'হাসিব' এর অর্থ গণিতজ্ঞ।

৯৪ ২৯৫ পৃঃ। কিফতি, ২৬২-২৬৩ পৃঃ।

৯৫ ফিহ্‌রিস্ত, ২৬৪ পৃঃ। ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ২৩৫-২৩৬ পৃঃ। কিফতি, ২৪৫-৬ পৃঃ।

৯৬ ওই ২৬৪ পৃঃ।

৯৭ ওই ১ খণ্ড, ৫৭ ও পরবর্তী পৃঃ।

৯৮ ওই ৩৪ ও পরবর্তী পৃঃ।

।। অধ্যায় ২৫ ।।

আব্বাসীয় রাষ্ট্র

● আব্বাসীয় খলিফারা

রাষ্ট্রের শীর্ষে স্থান ছিল খলিফাদের। তত্ত্বগতভাবে তাঁরা ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তিনি প্রশাসনিক কর্তৃত্ব উজিরদের বণ্টন করে দিতে পারতেন। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা তিনি বণ্টন করে দিতেন কাযীদের (বিচারক)। আর সামরিক ক্ষমতা বণ্টন করে দিতেন আমীর (জেনারেল)-কে। খলিফা নিজে সমস্ত সরকারি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী ছিলেন। সাম্রাজ্য চালানোর ক্ষেত্রে বাগদাদের সাবেক খলিফারা পারস্যের প্রাচীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করতেন। উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষার্ধে যে ধর্মবিরোধী কাজকর্ম হয়েছিল তার বিরুদ্ধে জনমত রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আব্বাসীয় খলিফারা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে গোড়া থেকেই ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের সরকারি রক্ষাকর্তা হিসেবে সর্বদাই তাঁদের ভূমিকা পালনে সতর্ক ছিলেন তাঁরা। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শেষের দিকে ধর্মকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাঁরা এমন কিছু কাজও করেন যা তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার মতো ছিল না। অষ্টম খলিফা আল মুতাসিম বি-আল্লাহ্ (৮৩৩-৮৪২)-এর আমল থেকেই খলিফারা 'আল্লাহ্' শব্দটি সংযুক্ত করে সম্মানীয় উপাধি গ্রহণ শুরু করেন। পতনের যুগেও প্রজারা বিভিন্নরকম সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করতেন খলিফাদের। যেমন, 'খলীফাত আল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র খলিফা), জিল আল্লাহ্ আলা আল আর্দ (পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া)। সর্বপ্রথম খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকেই এমন সম্মানে ভূষিত করা হয়।[১] ৮৪৭ থেকে ৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তা অটোমান খিলাফতের শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল।

উমাইয়া খলিফারা যেমন উত্তরাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেননি তেমনই আব্বাসীয় খলিফারাও যথেচ্ছাচার করে গেছেন। তবে ফলও হয়েছিল বিষময়। ক্ষমতাসীন খলিফা উত্তরাধিকার হিসেবে নিজের পছন্দসই উপযুক্ত পুত্র বা গুণসম্পন্ন আত্মীয়কে বাছাই করে যেতেন। আল-সাফ্‌ফাহ্ তাঁর ভাই আল-মানসূরকে উত্তরাধিকার নির্বাচিত করে যান। তারপর খলিফা হন তাঁর বড় পুত্র আল-মাহদী[২]। তারপর খলিফা হন তাঁর বড় পুত্র আল-হাদী। হাদীর মৃত্যুর পর খলিফা হন তাঁর ভাই হারূন আল-রশীদ।[৩] হারূন আবার বড় পুত্র আল-আমীনকে প্রথম উত্তরাধিকার এবং বুদ্ধিমান কনিষ্ঠপুত্র আল-মামূনকে

দ্বিতীয় উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। হারূন দু'জনকে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। আল-মামূন পেয়েছিলেন খুরাসানের ভার। তার রাজধানী ছিল মারও (মার্ভ)।[৪] এর ফলে দুই ভাইয়ে তীব্র যুদ্ধ বাধে! যা আল-আমীন-এর গুপ্তহত্যায় সমাপ্ত হয়েছিল (সেপ্টেম্বর, ৮১৩)। আল-মামূনই পুরো সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। চার বছর বাদে তিনি আব্বাসীয়দের কালো রঙের পরিবর্তে শী'আহ্দের সবুজ রঙ ধারণ করে নিজেকে পরিচয় দেন আলীপন্থি হিসেবে এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে আলী আল-রিযাকে মনোনীত করলে বাগদাদবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে আল-মামূনের চাচা ইব্রাহিম ইবন-আল-মাহদীকে পাল্টা খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। ৮১৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে এই ঘটনা ঘটে। পূর্বসূরির মৃত্যুর পরবর্তী ৬ বছর আল-মামূন রাজধানীতে ঢুকতেই পারেননি। ৬ বছর পর তিনি বাগদাদে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে আল-মামূন নিজের পুত্র আল-আব্বাসকে উপেক্ষা করে তাঁর ভাই আল-মুতাসিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। এতে সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কারণ সৈন্যবাহিনীতে আল-আব্বাসের অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। আল-মুতাসিমের পর তাঁর পুত্র আল-ওয়াসিক (মৃ. ৮৪৭) খলিফার পদে বসেন। তিনিই ছিলেন আব্বাসি সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগের শেষ রক্ষক। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের গরিমা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রথম ২৪ জন খলিফা মোট ২৫০ বছর ধরে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (৭৫০-৯৯১)। এদের মধ্যে মাত্র ৬ জনের পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে খলিফা হয়েছিলেন।

খলিফাদের একজন করে সহকারী থাকতেন। তাদের বলা হত 'হাজিব'। এদের দায়িত্ব ছিল খলিফার উপস্থিতিতে দূত এবং সম্মানীয় অতিথিদের রাজসভায় পরিচয় করে দেওয়া। খলিফাদের ওপর এঁদের অসামান্য প্রভাব ছিল। এছাড়া ছিল কোতলকারী। বাগদাদ আদালতের কোতলকারীর বেশ নামডাক ছিল। বাগদাদে ছিল ভূগর্ভে নির্যাতনের জন্য আলাদা ঘর। আরব ইতিহাসে প্রথম তা বাগদাদেই নির্মিত হয় এই আব্বাসীয় আমলে। আদালতের কোতলকারীর পাশাপাশি থাকতেন দরবারী জ্যোতিষী। এঁদের পারস্য থেকে আনা হত। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনের পাশেই এদের বসার জায়গা ছিল।

● উজির

খলিফার পরেই স্থান ছিল উজিরের। পারস্য ঐতিহ্য মেনেই আব্বাসীয় উজিররা চলতেন।[৫] উজিররা অনেক সময়ই বিকল্প খলিফা হিসেবেও কাজ করতেন। ক্রমশই তাঁরা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন এবং খলিফাদের প্রশ্রয়ে হারেমের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। খলিফা আল-নাসির (১১৮০—১২২৫) তাঁর উজিরকে কূটনীতিকের কাজে নিয়োগ করে রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকারতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দেন। তিনি উজির সম্পর্কে ঘোষণা করেন :

'মুহাম্মাদ ইবন-বার্জ আল-কুম্মি আমাদের দখলে থাকা সমস্ত ভূখণ্ড এবং বসবাসকারী

প্রজাদের প্রতিনিধি। তাই তাঁকে মান্য করার অর্থই আমাদের মান্য করা। তাঁকে মান্য করার অর্থ আল্লাহ্‌কে মান্য করা। যাঁরা আল্লাহ্‌কে মান্য করে বেহেস্তে যেতে আগ্রহী তাঁদের ভালমন্দ দেখবেন আল্লাহ্-ই। আর যে আমাদের উজিরকে অমান্য করবে, সে আমাদেরও অমান্য করবে। আর যে আমাদের অমান্য করবে। প্রকারান্তরে সে আল্লাহ্‌কেও অমান্য করবে। আল্লাহ্‌কে অমান্য করবে যারা তাদের নরকের আগুনে পুড়ে মরতে হবে।[৫]

বারমাকিদের মতো উজিররা প্রায়ক্ষেত্রেই হতেন শক্তিমান। তাঁরাই প্রাদেশিক রাজ্যপাল নিয়োগ করতেন। আবার সরিয়ে দিতেন। কাযীদের নিয়োগের ক্ষমতাও ছিল তাঁদের। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে খলিফার নির্দেশেই এরা সব কাজ করতেন। এমন কী উজিররা উত্তরাধিকার পর্যন্ত মনোনীত করে যেতেন খলিফাদের মতো। উজিরদেরই ক্ষমতা ছিল, বিপথগামী রাজ্যপালদের ক্ষমতাচ্যুত করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার। আর রাজ্যপাল অধস্তন অসৎ কর্মচারী এবং দোষী সাধারণ নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আর দোষী উজিরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন খলিফা।[৬] বাস্তবে এই সম্পত্তির দখলদারি নিতে গিয়ে বেশ কিছু জীবনহানি হত। তাই স্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্তকরণ দপ্তর খোলা হয়।[৭] খলিফা মুতাযিদের সময় উজিরেরা মাসিক একহাজার দীনার বেতন পেতেন। আল মাওয়ার্দি[৮] এবং অন্য কিছু তত্ত্ববিদ উজিরদের মধ্যে আবার রকমভেদ আনেন। সেই থেকে দু'প্রকার উজিরের সৃষ্টি হয়। (১) তাফ্‌বীয (২) তানফিয। প্রথমজনের ক্ষমতা ছিল অসীম। দ্বিতীয়জনের ক্ষমতা ছিল সীমিত। তিনি শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'তাফ্‌বীয' উজির সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করতেন। এমন কী তাঁর উত্তরাধিকার নিয়োগেরও ক্ষমতা ছিল। আর 'তানফিয' উজিররা শুধু খলিফার নির্দেশ পালন করতেন। আল-মুকতাদিরের পর (৯০৮-৯৩২) উজিরের পরিবর্তে "আমীর আল-উমারা" নিয়োগ করা হত। তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক। বুয়াহিদরা পুরুষানুক্রমে এই পদে অধিষ্ঠান করেন।

● করমন্ত্রক

উজিররা বাস্তবে ছিলেন 'মহা উজির'। তারাই করমন্ত্রকের সভাপতি হতেন। এর সদস্য ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানরা। আলোচনায় এই সময় বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রধানের পদেও থাকতেন মনোনীত উজিররা। অবশ্য তাঁরা আসল উজিরদের সমান মর্যাদা কখনও পেতেন না। বরং তাদের স্থান ছিল উজিরদের অধীনে। আব্বাসীয় রাজশক্তির আমলের সরকারি প্রশাসন আগের থেকে অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার ফাঁস আগের চেয়ে বেশিই ছিল। বিশেষ করে কর এবং বিচারব্যবস্থায়— এই দুই ক্ষেত্রে বেশ কড়াকড়ি করা হয়। সরকারের মূল নজর থাকত রাজকোষে। তাই করমন্ত্রক (দিওয়ান আল খারাজ) বা অর্থমন্ত্রক (বাইত আল-মাল) সেই উমাইয়া আমলের ধরনেই রেখে দেওয়া হয়। এর মাথায় ছিলেন 'করকর্তা'। খলিফা প্রশাসনে তিনি রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হতেন।

রাষ্ট্রের আয়ের উৎসের মধ্যে অন্যতম ছিল 'যাকাত'। একমাত্র এই করটিই প্রতিটি মুসলমানকেই দিতে হত। চাষযোগ্য জমি, পশুপালন কেন্দ্র, সোনা, রূপা, বাণিজ্যিক গুদাম এবং অন্য যেসব সম্পত্তি স্বাভাবিকভাবে বা বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধির সম্ভাবনাযুক্ত ছিল— তাতেই কর আরোপ করা হত। আমরা আগে জেনেছি, মুসলমানদের কোন 'মাথাপিছু-কর' দিতে হত না। জমি, পশুপালনকেন্দ্র, বা এই ধরনের সব কিছুর কর নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল সরকারি কর সংগ্রাহকদের। আর সোনা, রূপা ইত্যাদির কর কত হবে, তা নাগরিকদের বিচারবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়া হত। ধর্মবিশ্বাসীদের থেকে যে অর্থ আদায় করা হত তা আবার তাঁদের জন্যই খরচ করা হত। দরিদ্র, অনাথ, ভবঘুরে, পবিত্রযুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবী, ক্রীতদাস এবং বন্দিদের খেসারত দেওয়া হত। সরকারি আয়ের বড় উৎস ছিল বিদেশি শত্রুর থেকে আদায় করা 'নজরানা', লুঠ করা অর্থ, অ-মুসলিম প্রজার 'নাগরিক কর' (জিয্য়া), ভূমিকর (খারাজ)। এছাড়া অ-মুসলিমদের মালিকানাধীন বাণিজ্য সংস্থার ওপর বাড়তি কর আরোপ করা হত। মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে পাঠানো পণ্যের ওপরও কর আরোপ করা হত। এসবের মধ্যে ভূমি করই ছিল সবচেয়ে বেশি। সরকারি আয়ের মূল উৎস অবিশ্বাসীদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল। সেখানে সরকারি রাজস্বকে 'ফাই' (কোরান ৫৯ : ৭) হিসেবে বর্ণনা করা হত এবং তা খরচ করা হত সৈন্যদের বেতন দিতে, মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা, সড়ক নির্মাণে এবং মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে।

আব্বাসীয় আমলের যে বিভিন্নরকম বিবরণ আমরা পেয়েছি তা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এই সাম্রাজ্যের অন্তত প্রথম একশ বছর রাজকোষ বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল। এর সুবাদেই খলিফারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে সক্ষম হন। আর পরবর্তী প্রত্যেক শতকে যে ধারাবাহিকভাবে কর ব্যবস্থায় অবনতি ঘটেছিল। তার তিনটি দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। 'ইবন খালদূন-' এর মতো প্রাচীন ঐতিহাসিকের লেখায় আল-মামূনের সময়কার সাম্রাজ্যের রাজস্বের বর্ণনা রয়েছে। কুদামাহ্-এর লেখায় রয়েছে আরও কয়েক বছর পরের রাজস্বের বিবরণ। সম্ভবত আল মুতাসিমের আমলের। আর তৃতীয় মুসলিম শতকের প্রথমার্ধের বর্ণনা রয়েছে খুরদাদবিহ্-এর লেখায় ইবন-খালদূন-এর' বর্ণনা অনুযায়ী, আল সাওয়াদ (নিম্ন ইরাক, প্রাচীন ব্যাবিলন) থেকে আল-মামূন শুধু জমি-কর পেতেন বছরে ২,৭৮,০০০০০ দিরহাম। খুরাসন থেকে জমি-কর পেতেন ২,৮০,০০০০০ দিরহাম। মিশর থেকে জমি কর পেতেন ২,৩০,৪০০০০ দিরহাম। সিরিয়া প্যালেস্টাইন থেকে জমি-কর পেতেন ১৪,৭২৪,০০০ দিরহাম। বাকি সমস্ত প্রদেশ থেকে জমি কর পেতেন ৩৩,১৯,২৯,০০৮ দিরহাম। এছাড়া অন্য অনেক করের অর্থ তো ছিলই। কুদামাহ্' এর বর্ণনায় পাওয়া যায় আল-সাওয়াদ থেকে নগদ এবং অন্য সামগ্রী মিলিয়ে বার্ষিক প্রায় ১,৩০,২০০,০০০ দিরহাম আয় হত। খুরাসন থেকে আয় হত ৩৭,০০০,০০০ দিরহাম। মিশর এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ৩৭,৫০০,০০০ দিরহাম। সিরিয়া প্যালেস্টাইন এবং হিমস থেকে ১৫,৮৬০,০০০

দিরহাম। বাকি সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে ৩,৮৮২,৯১৩,৫০ দিরহাম। ইবন খুরদাদবিহ্[১৬] যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে হিসাব করলে জানা যায় যে আল শাবর থেকে নগদ এবং সামগ্রী মিলিয়ে বার্ষিক আয় ছিল ৭৮,৩১৯,৩৪০ দিরহাম।[১৭] খুরাসন এবং সংলগ্ন পদানত প্রদেশ থেকে ৪৪,৮৪৬,০০০। সিরিয়া প্যালেস্টাইন[১৮] থেকে ২৯,৮৫০,০০০। বাকি সাম্রাজ্য থেকে ২,৯৯,২৬৫,৩৪০[১৯] দিরহাম। কীভাবে এই উপার্জন ব্যয় করা হত, তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে আল-মানসূরের মৃত্যুর সময় কেন্দ্রীয় কোষাগারে ৬০০,০০০,০০০ দিরহাম এবং ১৪,০০০,০০০ দিনার ছিল।[২০] আল-রশীদের মৃত্যুর পর কোষাগারে ছিল ৯,০০,০০০,০০০ দিরহাম।[২১] আল মুকতাফির (৯০৮) মৃত্যুর সময় রাজকোষে সোনাদানা, আসবাবপত্র এবং ভূসম্পত্তির মূল্য ধরে ১০০,০০০,০০০ দিনারের মতো অবশিষ্ট ছিল।[২২]

● অন্য সরকারি দপ্তর

করমন্ত্রকের পাশাপাশি আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধীনে একটি নিরীক্ষা বা হিসাব কার্যালয় (দিওয়ান আল-জিমাম) ছিল। এটির সূচনা হয় আল-মাহদীর আমলে। আর ছিল চিঠিপত্র লেনদেনের কার্যালয় (দিওয়ান আল-তাওকি)। এই দপ্তরের কাজ ছিল সমস্ত সরকারি চিঠিপত্র, রাজনৈতিক দলিল, সরকারি নির্দেশ এবং উপাধি তৈরি করা। এছাড়া একটি অভিযোগ দপ্তর, পুলিশ বিভাগ এবং স্বতন্ত্র ডাকবিভাগও ছিল।

অভিযোগ দপ্তর (দিওয়ান আল-নাজার ফি আল-মাজালিম) ছিল এক ধরনের আপিল-আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দপ্তরের কাজে কোন ভুলত্রুটি হলে এখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যেত। উমাইয়া আমলেও এমন দপ্তরের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল-মাওয়ারদিতে[২৩] বলা হয়েছে, আবদ-আল-মালিকই প্রথম খলিফা যিনি নিজে এই ধরনের সমস্ত আপিল এবং প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন এবং বিচার করতেন। এরপর দ্বিতীয় উমার প্রবল আগ্রহে আবদ-আল-মালিককে অনুসরণ করে এমন দপ্তর চালু করেন।[২৪] পরে আল মাহদী আব্বাসীয় আমলে এই রীতির প্রচলন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী আলা-হাদী, হারুন, আল-মামুন এবং অন্য অনেকেই এই দপ্তর বজায় রাখেন। তাঁরা প্রকাশ্য স্থানে মানুষের অভাব শুনতেন। আল-মুহতাদিই (৮৬৯-৭০) শেষ খলিফা-যিনি এই প্রথা চালু রেখেছিলেন। পরে নরম্যান রাজ দ্বিতীয় রজার (১১৩০-৫৪) সিসিলিতে এই দপ্তর চালু করেন, যা পরে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।[২৫]

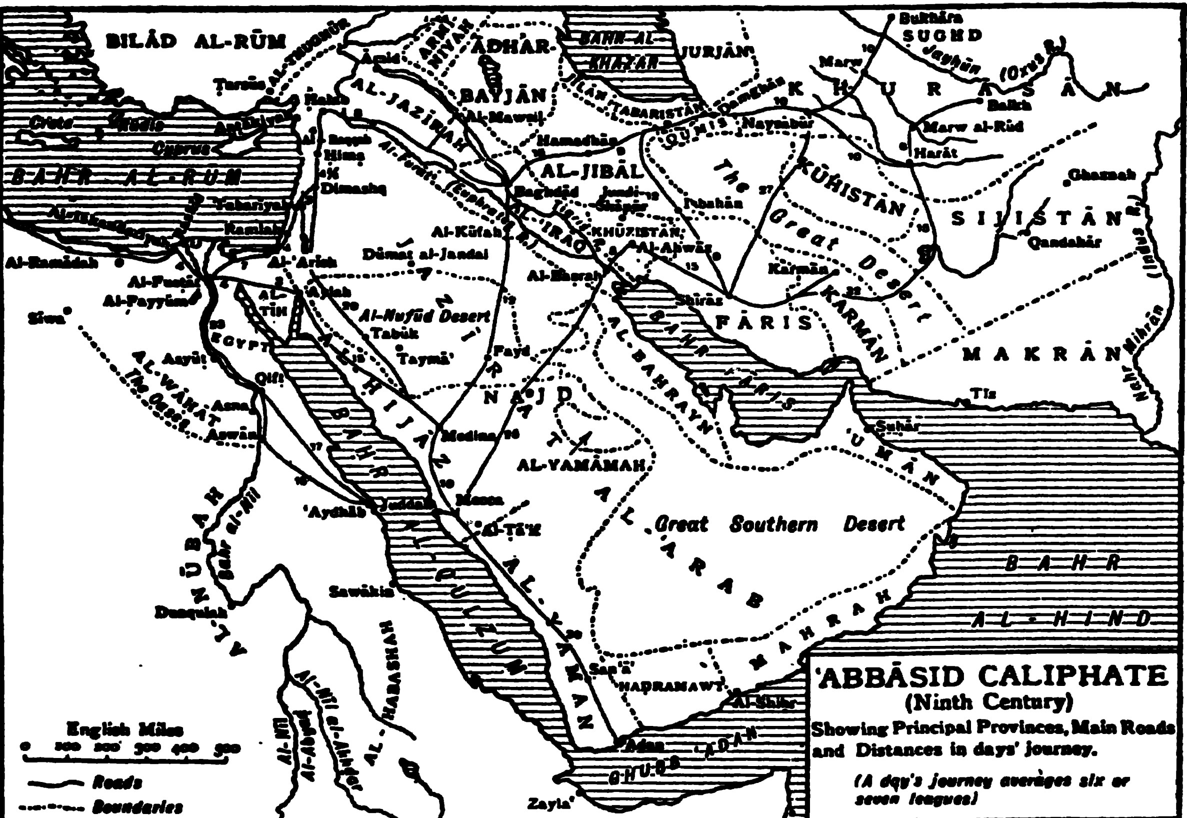
পুলিশ বিভাগের (দিওয়ান আল-শুরতাহ্) শীর্ষে ছিলেন সাহিব আল-শুরতাহ্। তিনিই ছিলেন পুলিশকর্তা এবং রাজকীয় দেহরক্ষী। পরবর্তীকালে এই পুলিশকর্তার পদাধিকারীরা উজিরও হয়ে যান। প্রত্যেক বড় শহরে নিজস্ব পুলিশ দপ্তর ছিল। পুলিশকর্মীরা ফৌজির সমান মর্যাদা পেত এবং তাদের বেতনও ছিল ভাল। নগর পুলিশ বাহিনীর কর্তাকে বলা হত

'মুহতাসিব'। তিনি নৈতিকতা ও নগরের বাজারগুলির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল ব্যবসায়ীরা ঠিকঠাক ওজন দিচ্ছে কি না তা দেখা। বৈধভাবে ঋণ শোধ হচ্ছে কিনা, তাও দেখতেন তিনি। তিনি লক্ষ্য রাখতেন, যথাযথ নৈতিকতা মেনে ব্যবসা চালানো হচ্ছে কিনা। কোথাও বেআইনিভাবে জুয়াখেলা হচ্ছে কিনা, প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে কিনা তাও তাঁকে দেখতে হত। আল-মাওয়ারদিতে[১৪] বর্ণনা রয়েছে, অন্য দায়িত্ব ছাড়া পুলিশের কাজ ছিল নারী পুরুষ যথাযথ নৈতিকতা মেনে পথে চলছে কিনা তা দেখা। আর যেসব পুরুষ কলপ করে ধূসর দাড়িগোঁফ কালো করে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন তাঁদের রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা করাও ছিল পুলিশের কাজ।

আব্বাসীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল ডাকবিভাগ।[১৫] ডাক বিভাগের প্রধানকে বলা হত সাহিব আল-বারীদ। উমাইয়া আমলে মু'আবিয়াই প্রথম ডাকবিভাগ চালু করতে আগ্রহী হন বলে আমরা আগেই জেনেছি। আবদ-আল-মালিকও তা বহাল রাখেন এবং খলিফা আল ওয়ালীদ তাঁর রাজপ্রাসাদ নির্মাণের সময় এই ডাকবিভাগের বিস্তর সাহায্য নেন। ঐতিহাসিকরা ডাক বিভাগকে উন্নত করে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করার জন্য খলিফা হারূনকে কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন। হারূন তার বারমাকি উপদেষ্টা ইয়াহিয়ার মাধ্যমে ডাকবিভাগকে সাজিয়ে তোলেন। অবশ্য প্রাথমিকভাবে এই ডাকবিভাগ রাষ্ট্রের স্বার্থই বেশি দেখভাল করত। পাশাপাশি কিছু বেসরকারি চিঠিপত্রও লেনদেনের দায়িত্ব নিত ডাকবিভাগ।[১৬] প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে একটি করে ডাকঘর ছিল। দেশের[১৭] গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ সাধন করে একটি পথ নির্মাণ করা হয়। রিলে প্রথার এই পথে ডাক যোগাযোগ রক্ষা করা হত। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০টি এমন 'রিলে-রুট' ছিল। পারস্যে ঘোড়া এবং গাধাকে দিয়ে ডাক বহন করানো হত। সিরিয়া এবং আরবে উটকে কাজে লাগানো হত।[১৮] নবনিযুক্ত রাজ্যপালদের নিজ নিজ প্রদেশে যাতায়াতের জন্য 'বাবিদ'দের কাজে লাগানো হত। এছাড়া সৈন্যবাহিনী যখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে যেত তখনও এই 'বারিদ'কে কাজে লাগানো হত।[১৯] সাধারণ মানুষও প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে এর পরিষেবা গ্রহণ করতে পারতেন।

পায়রাকে তালিম দিয়ে ডাকবাহক হিসেবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও ছিল সেকালে। এইভাবেই পায়রার মাধ্যমে খুররামি[২০] সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী নেতা বাবিককে (বাবক) গ্রেপ্তারের সংবাদ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন খলিফা আল-মুতাসিমের কাছে। ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ এই ঘটনা ঘটে।[২১]

বাগদাদে ডাকবিভাগের সদর দপ্তরগুলিতে সারা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং দূরত্বের তথ্য সংক্রান্ত তালিকা থাকত। এই তালিকার সাহায্য নিতেন বণিক, পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীরা। পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতেই ভূতাত্ত্বিক গবেষণা সম্ভব হয়। ভূগোলের সাবেক আরবের ছাত্ররা এই ডাক বিভাগের তালিকা দেখেই পড়াশোনা করত। ইবন-খুরদাযবিহ্ (মৃ ৯১২) ছিলেন



আব্বাসীয় খিলাফত (নবম শতাব্দী)

তাদের পুরোধা। তিনি 'আল-মাসালিক অ-আল-মামালিক' গ্রন্থ রচনা করেন। সরকারি লেখ্যাগারে রক্ষিত তথ্যকে ভিত্তি করেই তিনি এই ঐতিহাসিক কালপঞ্জি রচনা করেন। ইবন খুরদাযবিহ্ ছিলেন খলিফা আল-মুতামিদের আমলের 'সাহিব আল-বারিদ'। আল-জিবালে (সাবেক মেডিয়া) ছিল তাঁর দপ্তর। দেশের রাজধানীকে ঘিরে বৃত্তের মতো তৈরি সড়কপথ অনেকটাই পারস্য সাম্রাজ্যের আদলে নির্মিত হয়। বিখ্যাত জাতীয় সড়কের মধ্যে ছিল খুরাসন জাতীয় সড়ক, যা উত্তর থেকে পূর্বে বিস্তৃত ছিল। হামদান, আল-রায়ি, নায়সাবুর, তূস, মার্ভ, বুখারা, সমরকন্দ জুড়ে এই সড়কপথ বাগদাদের সঙ্গে জ্যাকসারটের সীমান্ত শহর এবং চীন সীমান্তের সংযোগ সাধন করে। এই সড়কপথের মাঝে ছিল উপপথ, যার সাহায্যে বড় বড় নগরগুলি থেকে উত্তর-দক্ষিণে যোগাযোগ সহজ হয়েছিল। আধুনিক পারস্যে তিহরানকে (তেহেরান) ঘিরে আল-রায়ির কাছে যে জাতীয় সড়ক রয়েছে তাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেই নির্মিত। এছাড়া বাগদাদ থেকে ট্রাইগ্রিস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আরেকটি রাস্তা ছিল। এই সড়কটি ওয়াসিত এবং আল-বসরা থেকে খুজিস্তানের আল-আহ্ওয়াজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখান থেকে যুক্ত ছিল ফারিসের শীরাজ পর্যন্ত। এমনই পথের শাখা পূর্ব এবং পশ্চিমকে যুক্ত করে দিল। শেষ পর্যন্ত তা খুরাসনে গিয়ে শেষ হয়। তীর্থযাত্রীরা বাগদাদ থেকে আল-কূফা বা আল-বসরা হয়ে মক্কা যেতে প্রায়শই এই পথটি ব্যবহার করতেন। তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ধর্মশালা এবং জলাধার নির্মাণ করা হয়। খুরাসন সড়ক বরাবরও এমন ধর্মশালা এবং জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল দ্বিতীয় উমারের[৩৪] আমলে। এছাড়া বাগদাদ এবং আল-মাওসিলের মধ্যে যোগাযোগকারী একটি তৃতীয় জাতীয় সড়কও নির্মিত হয়। এই সড়ক নির্মিত হতে বাগদাদের সঙ্গে আমিদ (দিয়ার বাকর) এবং অন্য সীমান্তবর্তী দুর্গগুলিতে যোগাযোগও সহজ হয়। উত্তর-পশ্চিমে বাগদাদের সঙ্গে আল-আনবার এবং আল-রাক্কার মাধ্যমে দামাস্কাস এবং অন্য সিরীয় শহরে যোগাযোগ সহজ হয়।

ডাকব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ডাকঘর পরিচালনা করা ছাড়া ডাকবিভাগের কর্তা আরও এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। তিনি ছিলেন এক সুচারু গুপ্তচর ব্যবস্থারও প্রধান। কার্যত এই গুপ্তচর বিভাগের অধীনেই ডাকবিভাগ চলত। তাই ডাকবিভাগের প্রধানকে বলা হত 'সাহিব আল-বারীদ অ-আল-আখবর'[৩৫]। অর্থাৎ ডাক এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে গোয়েন্দা বিভাগের তদারকি করার সঙ্গে ডাক-কর্তারও দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাদেশিক ডাকপ্রধানরা তাঁর কাছে অথবা সরাসরি খলিফার কাছে কাজের হিসাব দিতেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের সমস্ত সরকারি কর্মী কেমন কাজ করছেন তার বর্ণনাও দিতেন তিনি। রাজ্যপালের পর্যন্ত কাজের গতিবিধি নজরে রাখতেন তিনি। একবার আল-মুতাওয়াক্কিলের কাছে বাগদাদের এক রাজ্যপালের নামে এমন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, এই রাজ্যপাল মক্কার তীর্থে গিয়ে এক সুন্দরী

ক্রীতদাসীকে নিয়ে এসেছেন। শুধু নিয়ে আসাই নয়, তাঁর সঙ্গে ওই রাজ্যপাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত কাটান এবং সরকারি কাজকর্ম কিছুই দেখেন না— এমন অভিযোগ ওঠে।[৩৬] খলিফা আল-মানসুর বণিক, হকার, পর্যটকদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করতেন। আল রশীদ এবং অন্য খলিফারাও এই নিয়োগনীতি অনুসরণ করেন।[৩৭] আল-মামূনের গোয়েন্দাবাহিনীতে শুধু বাগদাদেরই ১৭০০ বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। বিশেষত যেসব রোমান সাম্রাজ্য আব্বাসীয়-রাজ্যের দখলে এসেছিল সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং চিকিৎসকদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হত।

● বিচার-প্রশাসন

ন্যায়বিচার সবসময়ই মুসলিম সমাজে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। এই ন্যায়বিচারের দায়িত্ব আব্বাসীয় খলিফারা বা তাদের উজিররা অর্পণ করেছিলেন ফকীহ (ধর্মতাত্ত্বিক) সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর। এরাই হয়ে ওঠেন কাযী।[৩৮] বাগদাদের প্রধান বিচারপতি বা 'কাযী আল কুজাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। বাগদাদের প্রথম 'কাযী আল-কুযাহ্' খ্যাতনামা ইউসুফ (মৃ. ৭৯৮)। তিনি আল-মাহ্দী এবং তাঁর দুই পুত্র আল-হাদী এবং আল-হারূনের[৩৯] সময়ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন। মুসলিম আইন অনুসারে বিচারককে সবসময় পুরুষ হতে হবে। তা ছাড়া বিচারককে হতে হবে সাবালক, সুস্থ মানসিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, সৎ চরিত্রের এক মুক্ত নাগরিক। তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হতে হবে এবং ইসলামি আইনে পণ্ডিত হতে হবে তাঁকে।[৪০] অ-মুসলিমরা নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে নিজস্ব ধর্মীয় প্রধান বা ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারধীন ছিলেন। আল-মাওয়ারদি[৪১] দু'ধরনের বিচারপ্রথার পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দেন। তিনি ঠিক করেন, এক ধরনের বিচার ব্যবস্থার কর্তৃত্বে থাকবেন সাধারণ বিচারপতি। তাঁর ক্ষমতা হবে অসীম (আম্মাহ মুতলাকাহ)। আর অন্য ধরনের বিচারব্যবস্থার কর্তৃত্বে থাকবেন বিশেষ বিচারপতি। তার ক্ষমতা হবে সীমিত (খাস্সাহ)। প্রথম শ্রেণীর কাযীর প্রধান কর্তব্য ছিল মামলার নিষ্পত্তি করা। তিনি অনাথ, উন্মাদ এবং নাবালকদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করতেন। বিভিন্ন ধরনের পবিত্র বিধি চালাতেন তিনি। ধর্মীয় আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। বিচারবিভাগীয় সহকারী (নায়েব) নিযুক্ত করার ক্ষমতা ছিল তাঁরই। বিভিন্ন প্রদেশে এদের নিযুক্ত করা হয়। শুক্রবারের নামাযের জমায়েতে কিছু শর্তে প্রথম শ্রেণীর কাযী নেতৃত্ব করতেও পারতেন। একেবারে গোড়ায় প্রাদেশিক রাজ্যপালরাই বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন। কিন্তু মুসলিম শাসনের চতুর্থ শতকে এই বিচারপতিরাই সাধারণভাবে হলেন বাগদাদের প্রধান কাযীর সহকারী। আল-মামূনের আমলে মিশরের বিচারপতির মাসিক বেতন ৪০০০ দিরহাম পর্যন্ত হয়েছিল বলে এক সূত্র[৪২] মারফৎ জানা গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারপতির ছিল সীমিত ক্ষমতা। খলিফা বা উজির বা রাজ্যপাল[৪৩] নিয়োগের সময়ই তাঁর ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিতেন।

● ফৌজি সংগঠন

আরব খলিফাদের অধীনে কখনও আক্ষরিক অর্থে বিশাল, সুশৃঙ্খল, নিয়মানুগ স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। খলিফার দেহরক্ষী (হারাস) বাহিনীই ছিল কার্যত একমাত্র নিয়মিত এক ফৌজিগোষ্ঠী। এদেরকে ঘিরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী তাদের প্রধানের নেতৃত্বে গড়ে উঠত। তার পাশাপাশি ভাড়াটে সৈন্য এবং দুঃসাহসী বাহিনী তো ছিলই। নিয়মিত জুন্দ বাহিনীতে যারা ছিলেন তাদের বলা হত মুর্তাজিকা (নিয়মিত বেতনপ্রাপ্ত)। কারণ তাঁরা সরকারি বেতন পেতেন। অন্যদের বলা হত মুতাতাওবিয়া[৪৪] (স্বেচ্ছাসেবী)। ওরা কর্মরত অবস্থায় শুধু র‍্যাশন (বিভিন্ন খাদ্যশস্য) পেতেন। এই স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হত মূলত বেদুইন, কৃষক এবং শহুরে লোকদের থেকে। তবে দেহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা প্রচুর বেতন পেতেন। তাদের পোশাক এবং অস্ত্রও ছিল আধুনিক। প্রথম আব্বাসীয় খলিফার আমলে পদাতিক বাহিনীর একজন জওয়ানের গড় বার্ষিক বেতন ছিল ৯৬০ দিরহাম।[৪৫] এছাড়া অন্য অনেকরকম ভাতা এবং র‍্যাশন পেতেন তিনি। আর অশ্বারোহী বাহিনীর জওয়ানরা পেতেন ঠিক এর দ্বিগুণ অর্থ। আল-মামুনের আমলে যখন সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগ সেসময় ১,২৫,০০০ জন জওয়ান ছিল ইরাকি সৈন্যবাহিনীতে। তার মধ্যে পদাতিক বাহিনীর জওয়ানরা বছরে মাত্র ২৪০ দিরহাম[৪৬] করে বেতন পেতেন। আর অশ্বারোহী বাহিনীর জওয়ানরা পেতেন দ্বিগুণ বেতন। আল-মানসূর বাগদাদ শহর গড়ে তোলার সময় মুখ্য স্থপতিকে দৈনিক এক দিরহাম করে বেতন দিতেন এবং সাধারণ নির্মাণ-শ্রমিকরা পেতেন এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ।[৪৭] এর থেকেই বোঝা যায় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা কত সুখে ছিলেন।

সাবেক আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে সেনাবাহিনী বলতে ছিল পদাতিক বাহিনী (হারবিয়া)[৪৮]। এই বাহিনীর জওয়ানদের কাছে থাকত তরবারি, ঢাল এবং বল্লম। তীরন্দাজ বাহিনী (রামিয়া) এবং অশ্বারোহী বাহিনীর (ফুরসান) জওয়ানরা পরতেন হেলমেট, বুক-বর্ম। তাদের কাছে থাকত বল্লম এবং যুদ্ধের কুঠার। আরবীয় রীতি অনুসারে জওয়ানরা কাঁধে তরবারি রাখত। আল মুতাওয়াক্কিল এই রীতি বাতিল করে পারসি প্রথা মেনে কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে রাখার নতুন নিয়ম চালু করেন।[৪৯] তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতিটি ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে থাকত এক দাহ্য তেল-নিক্ষেপ বাহিনী (ন্যাফাতুন)। এই বাহিনীর জওয়ানরা আগুন-নিরোধক পোশাক পরে থাকত। আর শত্রুশিবিরে দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ত।[৫০] কোথাও কোন অভিযান চালানো হলে অবরোধের জন্য যেসব জিনিস লাগত তা তদারকি করার প্রযুক্তিবিদরাও বাহিনীর সঙ্গে থাকত। এছাড়া থাকত পাথর ছোড়ার যন্ত্র, প্রাচীর চূর্ণ করার এক ধরনের যন্ত্র। এই সব যন্ত্রের প্রযুক্তিবিদদের বেশ কদর ছিল সেকালে। এমনই একজন প্রযুক্তিবিদ ছিলেন ইবন-সাবির আল-মানজানিকি। তিনি খলিফা আল-নাসিরের (১১৮০-১২২৫) আমলে বিখ্যাত হন। তিনি একটি অসম্পূর্ণ পুস্তিকাও লিখে গেছেন যাতে যুদ্ধকলা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে।[৫১] এছাড়া যুদ্ধাভিযানে থাকত ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুলেন্স। উট-চালিত যানে এসব

থাকত। খলিফা হারুনের আমলেই যুদ্ধের নানারকম আদবকায়দা সংযোজিত হয়। তিনি সৈন্যবাহিনীকে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক করে তোলেন।

আব্বাসীয় আমলে আরবীয় অস্ত্রের থেকে পারসি অস্ত্রই বেশি প্রাধান্য পায়। ফলে আরবী অস্ত্রের আধিপত্য চূর্ণ হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের প্রথম যুগে দেহরক্ষী বাহিনীর বেশিরভাগ জওয়ানই ছিলেন খুরাসনের লোক। আরবী সৈন্য নিয়ে দুটি ডিভিশন গঠন করা হয়েছিল। একটিতে ছিল উত্তর আরবের মুযারীয়রা আরেকটিতে ছিল দক্ষিণ আরবের ইয়ামানীয়রা। ইসলামে নতুন ধর্মান্তরিতরা কিছু আরব উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে 'অনুচর' হিসেবে নিজেদের যুক্ত করে রাখত। এভাবে তারাও এক আলাদা ডিভিশন গড়ে তোলে। আল-মুতাসিম মধ্য এশিয়ার[৫২] তুর্কিদের নিয়ে এক নতুন ফৌজি ডিভিশন গড়ে তোলেন। এরা ছিল মূলত তাঁর দাস। এই নতুন রাজকীয় দেহরক্ষীরা দ্রুত সমগ্র রাজধানীর ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা এদের জন্য এক নতুন শহর গড়তে বাধ্য হন। সামাররায় গড়ে ওঠে নতুন শহর। ওই শহরেই তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আল-মুনতাসিরের (৮৬১-৮৬২) মৃত্যুর পর এই তুর্কি বাহিনী সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করেন। সরকার পরিচালনায় তাদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

আল-মামুন, আল-মুস্তাইন এবং অন্য আব্বাসীয় খলিফারা রোমান-বাইজানটাইন আদলে প্রতি সৈন্যবাহিনীর দশজন জওয়ানের নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন একজন 'আরিফ'কে। প্রতি পঞ্চাশজন সেনার নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন এক 'খলিফা'কে। প্রতি ১০০ জন সৈন্যের নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন এক 'কায়িদ'কে।[৫৩] ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে গড়া হত একটি ব্যাটেলিয়ন। সেই ব্যাটেলিয়নের মাথায় ছিলেন একজন আমীর (জেনারেল)। আর ১০০ সৈন্যকে নিয়ে গড়া হত একটি কোম্পানি বা স্কোয়াড্রন। অনেকগুলি কোম্পানি নিয়ে গঠিত হত একটি কুরদুস। ভন ক্রেমার[৫৪] তৎকালীন সেনাবাহিনীর গঠন, আকৃতি ইত্যাদি নিয়ে বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি গ্রন্থ লিখেছেন।

আব্বাসীয় খলিফারা তাদের শাসনকালের প্রথম শতকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নির্ভর করেন এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর ওপর। এই বাহিনী শুধু সিরিয়া, পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার বিদ্রোহ দমন করেই ক্ষান্ত হয়নি পাশাপাশি বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। এক আধুনিক পণ্ডিতের[৫৫] মতে তৎকালীন আরব সেনাবাহিনীর দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল দশম শতকের অন্য সাম্রাজ্যের কাছে ত্রাসস্বরূপ। এক, আরব সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা; দুই, আরবীয় সেনাদের দীর্ঘপথ ভ্রমণের আশ্চর্য ক্ষমতা। অবশ্য এই দুই বৈশিষ্ট্যই একমাত্র ছিল না। ফৌজিকৌশল নিয়ে সম্রাট ষষ্ঠ লুইয়ের প্রবন্ধে[৫৬] আমরা জেনেছি পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে আরবীয় বেদুইন সৈন্যবাহিনী ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী এবং ফৌজি অভিযানে সবচেয়ে সাহসী। শত্রু বাইজানটাইনদের ওপর আক্রমণ করে এবং অভিযান চালিয়ে আরব সেনাবাহিনী যে কীরকম প্রশংসা অর্জন করেছিল তা সম্রাট কনস্ট্যানটাইন পরফিরোজেনিটাস-এর[৫৭]

(৯১৩-৫৯) লেখা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, তাঁরা শক্তিশালী এবং যুদ্ধবাজ। এমনই শক্তিশালী যে আরবীয় বাহিনীর মাত্র ১০০০ জওয়ান কোন শিবির দখল করলেই তা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। তারা ঘোড়ায় চড়ে না, উটের পিঠে চড়ে। এইসব বিবৃতি থেকে এবং সম্রাট নাইসফোরাস ফোকাস (৯৬৩-৯৬৯)-এর মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, আরব যোদ্ধাদের সবচেয়ে অপছন্দ ছিল ঠাণ্ডা এবং ভিজে আবহাওয়া। এছাড়া একবার তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে তারা আর পুনর্গঠিত হতে পারত না। এর থেকে বোঝা যায় যে এই বিশাল শক্তিশালী বাহিনীতে শৃঙ্খলাবোধ তেমনভাবে ছিল না। তবু এটা ঘটনা যে বাইজানটাইনরা আরবকে যেমন বর্বর এবং অসভ্য বলেও মনে করত তেমনই তাদের ভয়ংকর শত্রু বলেও স্বীকার করত। অথচ দশম শতকেই এই 'ভয়ংকর শত্রু' ক্রমে ক্রমে 'নিরীহ শত্রু'তে পরিণত হয়। তখন বাইজানটাইনরা যখন তখন আক্রমণ করত আরবদের। এমন কী দামাস্কাস এবং বাগদাদ পর্যন্ত বাইজানটাইনদের হুমকিতে কাঁপত।

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ফৌজি শক্তি দুর্বল হতে শুরু করে আল-মুতাওয়াক্কিলের আমল থেকেই। তিনি সৈন্যবাহিনীতে বিদেশিদের নিয়ে পৃথক ইউনিট গড়ার পর থেকেই বাহিনীর শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ধূলিসাৎ হতে থাকে। পরবর্তীকালে আল-মুকতাদির (৯০৮-৯৩২) রাজ্যপাল বা ফৌজি সেনানায়কদের হেফাজতে বিভিন্ন প্রদেশকে ইজারা দেওয়ার নিয়ম চালু করেন। ইজারা নেওয়ার বিনিময়ে রাজ্যপাল বা সেনানায়কদের প্রাদেশিক তহবিল থেকে সেনাবাহিনীর খরচ বহন করতে হত। বুওয়াহিদ সাম্রাজ্যের আমলে সৈন্যরা বেতনের পরিবর্তে জমি পেত। এর থেকেই বোঝা যায়, গোড়া থেকেই এক সামন্ততান্ত্রিক সামরিক ব্যবস্থার বীজ বপন হয়েছিল। তা সালজুক সাম্রাজ্যের আমলে আরও বিকশিত হয়। এরপর থেকেই প্রাদেশিক রাজ্যপাল এবং সেনাধ্যক্ষরা অনুদান হিসেবে কোন শহর বা জেলা উপহার পেতেন। সেই উপহার পাওয়া জেলা বা শহরে তাঁরা পুরোদস্তুর ক্ষমতা নিয়ে শাসন করতেন। বিনিময়ে তাঁরা সালজুক সুলতানকে বার্ষিক নজরানা দিতেন। এছাড়া যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হত।

● রাজ্যপাল

উমাইয়া আমলে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে রাজ্যপালের (আমীর বা আমিল) অধীনে আনা হয়। সাবেক বাইজানটাইন এবং পারসি আদলে গঠিত হয়েছিল এই বিভাগ। এই বিভাগ আব্বাসীয় আমলেও বজায় ছিল। তেমন আমূল কিছু পরিবর্তন হয়নি। তবে আব্বাসীয় প্রদেশের তালিকা এক এক খলিফার আমলে এক এক রকম ছিল। 'আল-ইসতাখরি', 'ইবন হাওকাল', ইবন-আল-ফকীহ অনুরূপ আরও অনেকের গ্রন্থ থেকে যেরূপ ভৌগোলিক বিভাজন জানা যায়, আব্বাসীয় আমলে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক বিভাজন সর্বদা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বাগদাদের প্রথম দিককার খলিফাদের নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত

প্রদেশগুলিই মুখ্য ছিল বলে মনে হয়—(১) লিবিয়ান মরুভূমিসহ পশ্চিম আফ্রিকা এবং সিসিলি, (২) মিশর, (৩) সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন—এই দুটি প্রদেশ কিছুকাল বিচ্ছিন্নও ছিল—(৪) আল-হিজাজ এবং আল-ইয়ামামা (মধ্য আরব), (৫) আল-ইয়ামান বা দক্ষিণ আরব[৫৮], (৬) আল-বাহরাইন এবং ওমান—এর রাজধানী ছিল যথাক্রমে আল-বসরা এবং আল-ইরাক—(৭) আল-সাওয়াদ বা আল-ইরাক (নিম্ন মেসোপটেমিয়া)—এর বড় শহর ছিল বাগদাদ ছাড়া আল-কুফা এবং ওয়াসিত, (৮) আল-জাজিরা (এটা ছিল দ্বীপ, বদ্বীপ নয়, প্রাচীন অ্যাসেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত) এর রাজধানী ছিল আল-মাওসিল (মসুল), (৯) আজারবাইজান, এর বড় শহর ছিল আরজাবিল, তিবরিজ এবং মারাঘা, (১০) আল-জিবাল-(পাহাড় প্রাচীন মেডিয়া) পরে এই প্রদেশকেই বলা হত আল-ইরাক আল-আজামি (ইরাকের পারস্য)[৫৯]। এই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি ছিল হামাদান (প্রাচীন একবাতানা), আল-রাজি, ইসবাহান (ইসফাহান, ইসপাহান)। (১১) খুজিস্তান, এর মুখ্য শহর ছিল আল-আহ্ওয়াজ এবং তুসতার[৬০]। (১২) ফারিস, এর রাজধানী ছিল শিরাজ। (১৩) কারমান, এর রাজধানীর এখনও এই নাম। (১৪) মুকরান, যা আধুনিক বালুচিস্তানের মধ্যে পড়েছে। আজ তা সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। (১৫) সিজিস্তান বা সিস্তান। এর রাজধানী ছিল জারান্‌জ, (১৬-২০) কুহিস্তান, কুমিস, তাবারিস্তান, জুরজান এবং আর্মেনিয়া, (২১) খুরাসন। এখন এই অংশ উত্তর পশ্চিম আফগানিস্তান। এর বড় বড় শহর ছিল নয়সাবুর, মার্ভ, হিরাত এবং বলখ, (২২) খওয়ারিজম। এর সাবেক রাজধানী ছিল কথ, (২৩) আল-সুগদ (প্রাচীন সগদিয়ানা) এর দুটি প্রধান শহর ছিল বুখারা এবং সমরকন্দ। (২৪, বিবিধ) ফরগনা, আল-শাশ (আধুনিক তাসখন্দ) এবং অন্য তুর্কি ভূখণ্ড।[৬১] এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কি গ্রামগুলি ভৌগোলিকভাবে সাবেক আরব প্রদেশরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আব্বাসীয় খলিফারা প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনেই রাখতে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ধরনের যোগাযোগের অসাধ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। অনিবার্যভাবে তাই-ই হয়। স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে রাজ্যপালই হলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তত্ত্বগতভাবে উজিরের খেয়ালখুশির ওপরই রাজ্যপালের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। উজির খলিফার কাছে রাজ্যপালের নাম সুপারিশ করতেন। তাঁর দয়াতেই রাজ্যপাল নিয়োগ করা হত। যে উজির-রাজ্যপালকে নিয়োগ করতেন, সেই উজির ক্ষমতাচ্যুত হলে রাজ্যপালেরও গদি যেত। আল-মাওয়ারদি[৬২] দু'ধরনের রাজ্যপালের কথা বলে গেছেন। এক, ইমারাহ্ আম্মাহ্ (সাধারণ আমীর)। এই ধরনের রাজ্যপাল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সামরিক ব্যাপারে, বিচারপতি নিয়োগ এবং তাঁদের কাজকর্মের নজরদারি, কর আরোপ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেখা, রাষ্ট্রীয় ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা, পুলিশ প্রশাসনের কাজ দেখা, শুক্রবারের নামাযে পৌরোহিত্য করতেন এই ধরনের রাজ্যপাল। আরেক ধরনের রাজ্যপাল ছিলেন

যাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত (খাস্‌সাহ্‌)। এরা ছিলেন বিশেষ ধরনের রাজ্যপাল। এই রাজ্যপালরা বিচার এবং করের ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তবে এই সব শ্রেণীবিভাগ ছিল নিতান্তই তত্ত্বগত। কার্যত প্রাদেশিক রাজ্যপালদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত নিজের দক্ষতায়, খলিফার দুর্বলতায় এবং রাজধানী থেকে প্রদেশের দূরত্ব বেশি হলে যোগাযোগের অভাবে। প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব আয় থেকেই সেই প্রদেশের ব্যয় নির্বাহ হত। প্রদেশের ব্যয় নিজস্ব আয়ের চেয়ে বেশি হলে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে সীমিত অনুদান পাওয়া যেত। প্রদেশের বিচারব্যবস্থা সামলাতেন প্রাদেশিক কাযীরা। তাঁদের সাহায্যে থাকতেন একাধিক সহকারী। এঁদের অফিস ছিল প্রদেশের বিভিন্ন মহকুমায়। ❑

• টীকা •

১ মাসউদী, ৭ম খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ

২ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৪৩৭ এবং পরবর্তী পৃঃ, ৪৭২ ও পরবর্তী পাতা ফাখরী, ২৩৬ পৃঃ

৩ ফাখরী, ২৬১-২৬২ পৃঃ, তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৫২৩ পৃঃ

৪ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৫০০ ও পরবর্তী পৃঃ, ফাখরী ২৯২ পৃঃ, মাসউদী, তানবিহ ৩৪৫ পৃঃ

৫ ইবন আল আব্বাস, 'আসার আল-উওয়াল ফি তারতিব আল-দুওয়াল' (কায়রো, ১২৯৫) ৬২ পৃঃ; এস ডি গয়তে 'ইসলামিক কালচার' ১৬ খণ্ড, (১৯৪২) ২৫৫-৬৩, ৩৮০-৯২ পৃঃ

৬ ফাখরী, ২০৫ পৃঃ

৭ ইব্‌ন আল-আসীর, ৬ খণ্ড, ১৯-২০ পৃঃ

৮ হিলাল আল-সাবি, 'তুহ্‌ফাত আল-উমারা ফি তারিখ আল-উজারা'— সম্পাদনা : এইচ এফ আমেড্রজ (বেইরুট, ১৯০৪), ৩০৬ পৃঃ

৯ ওই ৩৭-৪৭ পৃঃ

১০ এই সময়ে 'জিয্‌য়া' এবং 'খারাজ'-এর পার্থক্য পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। পরে 'জিয্‌য়া' করকে 'আল-বদল আল-আসকারী' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা অমুসলিম প্রজাদের থেকে সামরিক খরচ তোলার জন্য আদায় করা হত তুর্কি সাম্রাজ্যে।

১১ মাওয়ারদি, ৩৬৬ ও পরবর্তী পাতা।

১২ মুকাদ্দামা, ১৫০-১৫১ পৃঃ; হুয়ার্ট : হিস্টোয়ার দেস আরাবেস, ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃঃ। আলফ্রেড ভন ক্রেমার-এর গ্রন্থ Culturgeschichte des orients unter den Chalifen, ১ম খণ্ড, (ভিয়েনা, ১৮৭৫) ৩৫৬ ও তার পরবর্তী পৃঃ। এটা স্পষ্ট যে অন্য দুই জনের মতো ইবন-খালদূনের তালিকা অতটা স্পষ্টও নয়, প্রামাণ্যও নয়।

১৩ কিন্নাসরীন, দামাস্কাস, জর্ডন এবং প্যালেস্টাইনের কর ছিল ১,২২৭,০৩০ দিনার।

১৪ খারাজ, ২৩৭-৫২ পৃঃ

১৫ শুধু নগদেই ৮,০৯৫,৮০০ দিরহাম। কুদামাহ্‌, ২৪৯, ২৩৯ পৃঃ। বাস্তব ঘটনা এই যে, তিনি বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন সংখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর তালিকা অনুযায়ী মোট অঙ্কের সঙ্গে সারণির বিবৃতির মিল নেই।

১৬ প্যাসিম।

১৭ নগদেই তার ৮৪৫৬৮৪০ দিরহাম। ইবন-খুরদাদবিহ্, ৫ ও তার পরবর্তী পৃঃ

১৮ কিন্নাসরীন এবং অন্য সীমান্তবর্তী শহর হল হিমস, দামাস্কাস, জর্ডন এবং প্যালেস্টাইন।

১৯ জায়দান, তামাদ্দুন, ২ খণ্ড, ৬১ পৃঃ। স্থয়ার্টের গ্রন্থ, ১ ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃঃ।

২০ মাসউদী. ৬ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ

২১ তাবারী, ৩ম খণ্ড. ৭৬৪ পৃঃ

২২ সাআলিবি, লাতায়িফ, ৭২ পৃঃ

২৩ ১৩১ পাতা। তুলনীয় : ইব্‌ন-আল-আসীর পৃঃ, ১ খণ্ড, ৪৬ পৃঃ

২৪ মাওয়ারদি, ১৩১ পৃঃ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৩৬৭ পৃঃ। আল-বাইহাকী আল-মাহাসিন অ- আল মাসাবি, সম্পাদনা : এফ স্কেওয়ালি (গিসেন, ১১০২) ৫২৫ ও পরবর্তী পাতা।

২৫ এম আমারি, Storia dei Masalmani di Sicilia, সম্পাদনা-ন্যালিনো, ৩ খণ্ড (ক্যাটানিয়া, ১৯৩৭-৩৯) ৪৫২ পৃঃ। ফন (ক্রেমার) Culturgeschichte, ১ খণ্ড, ৪২০ পৃঃ

২৬ ৪১৭-১৮ পৃঃ, ৪৩১ পৃঃ

২৭ দিওয়ান আল-বারীদ, ডাক বিভাগ। 'বারীদ' শব্দটি সম্ভবত সেমেটিক শব্দ। লাতিন শব্দ 'ভেরেদাস' পারসিশব্দ 'বীরদান' (দ্রুতগামী ঘোড়া) বা আরবী শব্দ 'বিরদাওয়ান' (বেতো ঘোড়া)-এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তুলনীয় : ESTH. ৮ : ১০; ইসফাহানি, তারিখ, ৩৯ পৃঃ।

২৮ মাসউদী, ৬ খণ্ড, ৯৩ পৃঃ, ২.৫-৬ পৃঃ

২৯ ইবন-খুরদাযবিহ্, প্যাসিম

৩০ ইবন-আল-আসীর, ৬ খণ্ড, ৪৯ পৃঃ; ২.১১-১২

৩১ ওই, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ

৩২ পারস্যের একটি জেলার লোকজনকে এই নামেই ডাকা হত। বিখ্যাত আবু-মুসলিম আল খুরাসানীকে হত্যার পর এই গোষ্ঠী মাথাচাড়া দেয়। এদের অনেকে একথা বিশ্বাস করতে চান না যে আবু মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, পৃথিবীতে ন্যায়ের কথা প্রচার করতে তিনি ফিরে আসবেনই। মাসউদী, ৬ খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ। বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ১৬২ ও পরবর্তী পাতা পৃঃ। ফিহ্‌রিস্ত, ৩৪২ পৃঃ

৩৩ মাসউদী, ৭ম খণ্ড, ১২৬-১২৭ পৃঃ

৩৪ ইবন-আল-আসীর, ৫ ম খণ্ড, ৪৪ পৃঃ; নাবাবি, তাহজিব ৪৬৮ পৃঃ ১ :১৬

৩৫ কুদামা, ১৮৪ পৃঃ

৩৬ আতলিদি, ই'লাম আল-নাস' (কায়রো, ১২৯৭) ১৬১ পৃঃ

৩৭ আগানি, ১৫ খণ্ড, ৩৬ পৃঃ, ১ : ১৪ মিসকাওয়াইহ্, সম্পাদনা ডি গোজি এবং ডি. জং, ২৩৪, ৪৬৬, ৪৯৮, ৫১২, ৫১৪, ৫৬৭ পৃঃ

৩৮ তেরোটি ভিন্ন ভঙ্গিতে অনুবাদ করা হয়েছে। সরকারি ব্রিটিশ নথিতে ৬টি ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে: Qadi, Qazi, Kazi, Cadi, Al-kali, Kathi,

৩৯ ইবন-খাল্লিকান, ৩ য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ = ডি. স্লেন, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ

৪০) মাওয়ারদি, ১০৭-১১ পৃঃ

৪১ ওই ১১৭-১২৫ পৃঃ

৪২ সুয়ূতি, হুসন, ২ খণ্ড, ১০০ পৃঃ, ১:৪

৪৩ রিচার্ড গথেল এবং Revue des etudes ethnographiques (১৯০৮) ৩৮৫-৩৯৩ পৃঃ

৪৪ মুত্তাওবিয়া, তাবারী, ৩ খণ্ড, ১০০৮ পৃঃ। ইবন্-খালদূন, ৩ খণ্ড, ২৬০ পৃঃ

৪৫ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৪১ পৃঃ/২ ১৭-১৮/ইবন-আল-আসীর দ্বারা পুনর্লিখিত, ৫ খণ্ড, ৩২২ পৃঃ, ২.১৪-১৪।

৪৬ আল-মামুন যখন তাঁর নিজের ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত তখন তাঁকে ৯৬০ দিরহাম উদ্ধার করতে হয়। সমপরিমাণ অর্থ তাঁর ভাই তাকে দিত। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৮৩০ পৃঃ। ২.৭-৮, পৃঃ ৮৬৭, ১.১৪

৪৭ খাতীব, ১ খণ্ড, ৭০ পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ।

৪৮ তাবারী কর্তৃক উল্লিখিত। ৩ খণ্ড, ৯৯৮ পৃঃ । ইবন-খালদূন, ৩ খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ ১.১৭, ২৪৫ পৃঃ ২.২৩-২৬

৪৯ ইবন-খালদূন, ৩ খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ

৫০ আগানি, ১৭ খণ্ড, ৪৫ পৃঃ । ইবন-খালদূন, ৩ খণ্ড, ২৬০ এবং ১.২০ পৃঃ

৫১ ইবন-খালিক্কান, ৩ খণ্ড, ৩৯৭ পৃঃ

৫২ মাসউদী, ৭ খণ্ড ১১৮ পৃঃ

৫৩ ইবন-খালদূন, ৩ খণ্ড, ২৯৯-১.৭। মাসউদী, ৬ খণ্ড, ৪৫২ পৃঃ.। তাবারী, ৩ খণ্ড, ১৭৯৯ পৃঃ

৫৪ Culturgeschichte, ১ খণ্ড, ২২৭-২২৯ পৃঃ এস খুদাবক্স=দি ওরিয়েন্ট আন্ডার দি কালিফস (কলকাতা, ১৩২০), ৩৩৫-৩৫ পাতা।

৫৫ ওমান, 'আর্ট অব ওয়ার' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ খণ্ড, ২০৯ পৃঃ

৫৬ 'ট্যাকটিকা' কনস্টিটিউশ ১৮, নতুন ভাগ ১২৩, প্যাট্রলজিকা গ্রেকা, ৮ খণ্ড।

৫৭ 'De administrando imperio' caput XV in Migne, Patrologia, Graeca, সি-১৩ খণ্ড

৫৮ এই পাঁচটি প্রদেশকে প্রায়শই 'আকালিম আল-মাগ্রিব' নামে অভিহিত করা হত। অর্থাৎ প্রাচ্যের প্রদেশ। আর 'আকালিম আল-মাশরিক' বলা হত প্রতীচ্যের প্রদেশগুলিকে।

৫৯ আল ইরাক আল-আরাবি (অর্থাৎ আরবি ইরাক) (অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ার অববাহিকা অঞ্চলের বিপরীতে এই শব্দ ব্যবহৃত হত।

৬০ পারসিরা বলত 'সুসতার' বা 'শুশতার'।

৬১ এই তালিকার সঙ্গে লি স্ট্রেঞ্জ 'ইস্টার্ন ক্যালিফেট' এর দেওয়া তালিকা মিলিয়ে দেখুন! জায়দান : তামাদ্দুন, ২ খণ্ড, ৩৪-৪৪ পৃঃ। ভান্ ক্রেমার : Culturgeschichte' ১ খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ

৬২ ৪৭-৫৪ পাতা।

॥ অধ্যায় ২৬ ॥

আব্বাসীয় আমলের সমাজব্যবস্থা

আব্বাসীয় আমলে প্রাচীন কালের আরবী সামাজিক সংগঠনের উপজাতি প্রথা পুরোপরি ভেঙে পড়ে। আব্বাসীয়রা তাদের সিংহাসনে বসানোর উপযোগী উত্তরাধিকারীর জন্য বিদেশি উপাদানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমন কী খলিফারা বিবি এবং সন্তানের মা বাছাই করার সময়ও আরব রক্তকে কোন মর্যাদাই দেননি। আব্বাসীয়দের মধ্যে মাত্র তিনজন খলিফাই ছিলেন মুক্ত মায়ের সন্তান। এরা হলেন আবু-আল-আব্বাস, আল-মাহদী এবং আল-আমীন।[১] এদের মধ্যে আবার শেষের জনের বাবা ও মা দুজনেই ছিলেন মুহাম্মাদের পরিবারের লোক।[২] উমাইয়া বংশের খলিফাদের মধ্যে দ্বাদশ খলিফা তৃতীয় ইয়াজিদই ছিলেন প্রথম, যাঁর মা আরবীয় ছিলেন না। তবু তিনি অন্তত পূর্বতন পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ইয়াজদ্‌দাগির্দের বংশধর ছিলেন। তাকে সোগদিয়ানায় কুতাইবাহ্ গ্রেপ্তার করেন। আল-হাজ্জাজ তাকে খলিফা আল-ওয়ালীদের হাতে তুলে দেন। আব্বাসীয়দের মধ্যে আল-মানসূরের মা ছিলেন বার্বার, উপজাতির ক্রীতদাসী। আল-মামূনের মা ছিলেন পারসি ক্রীতদাসী। আল-ওয়াসিক এবং আল-মুহ্‌তাদির মা ছিলেন গ্রিক। আল মুন্তাসিরের মা ছিলেন গ্রিক্-অ্যাবিসিনিয়া পিতামাতার সন্তান। আল-মুস্তাইনের মা ছিলেন স্লাভজাতীয়। আল-মুক্তাফির মা ছিলেন তুর্কি ক্রীতদাসী। আল-মুকতাদিরের মা ছিলেন তাই। আল মুসতাযির মা ছিলেন আর্মেনীয়।[৩] হারূনের মা ছিলেন আরেক বিদেশি ক্রীতদাসী। তার নাম ছিল আল খায়জুরান। তিনিই হলেন প্রথম মহিলা যিনি আব্বাসীয় সাম্রাজ্য চালানোর ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৪]

আরবীয় শাসকদের সঙ্গে প্রজাদের সংমিশ্রণ ঘটানোর পিছনে বহুগামীতা, উপপত্নী-প্রথা এবং ক্রীতদাসত্ব সক্রিয় ভূমিকা নেয়। খাঁটি আরবীয় শক্তি এর ফলে পিছিয়ে পড়ে। পরিবর্তে সামনে চলে আসে অ-আরবীয়, বর্ণশংকর এবং মুক্ত ক্রীতদাসীর সন্তানরা। আরবীয় আধিপত্যের স্থান নেয় বিভিন্ন দেশের লোকজনকে দিয়ে তৈরি সরকারি আমলাগোষ্ঠী। এদের মধ্যে পারসি এবং তুর্কিই ছিলেন বেশি

এক চারণকবি তাঁর গানে প্রকৃত আরবীয় ভাবাবেগকে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন এভাবে :

'উপপত্নীদের সন্তানরাই
বেড়ে উঠছে সংখ্যায়
সবাই আমাদের বিপক্ষে।
ঈশ্বর, এমন এক দেশে যেতে চাই
যেখানে কোন জারজের
মুখ দেখতে পাবো না।'[৭]

দুর্ভাগ্যবশত আরব ঐতিহাসিকরা খলিফাদের জীবনযাপন এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে অত্যুৎসাহী ছিলেন। ফলে তখনকার সাধারণ প্রথা, সমাজ এবং আর্থিক জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে তাঁদের লেখাতেই টুকরো টুকরো মন্তব্য থেকে এই সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এর মূল উৎস কিন্তু তৎকালীন সাহিত্য। সেইসব তথ্যের সঙ্গে বর্তমান কালের রক্ষণশীল মুসলমানদের সার্বিক জীবনযাপনের কথা তুলনা করলে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়।

● গার্হস্থ্য জীবন

সাবেক আব্বাসীয় মহিলারা উমাইয়া মহিলাদের মতোই স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতেন। তবে দশম শতকের শেষার্ধে বুওয়াহিদদের আমলে নারী-পুরুষের মধ্যে কঠোর বিভাজন রাখার নিয়ম তৈরি হয়। আমরা তৎকালীন উচ্চ মহলের মহিলাদের উঁচু পদে থেকে প্রভূত ক্ষমতা করায়ত্ত করার কথা জেনেছি। প্রশাসনে তাঁদের দাপট ছিল সর্বজনবিদিত। আল-খায়জুরান, আল-মাহদীর স্ত্রী এবং আল-রশীদের মা এমনই মহিলা ছিলেন। আল-মাহদীর কন্যা উলাইয়া, আল-রশীদের স্ত্রী এবং আল-আমীনের মা যুবাইদাহ্ এবং আল-মামূনের স্ত্রী বূরান--এরা সবাই যুদ্ধে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা থেকে শুরু করে কবিতা লেখা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ায় এদের জুড়ি ছিল না। সঙ্গীত প্রতিভা এবং বাগ্মিতায় এরা এগিয়ে গিয়েছিলেন। এমনই একজন ছিলেন উবাইদা আল-তুনবুরিয়া (অত্যাশ্চর্য মহিলা)। তিনি আল-মুতাসিমের আমলে সুন্দরী, গায়িকা এবং সঙ্গীতজ্ঞা হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।[৮]

পতনের যুগে প্রচণ্ড অবৈধ সম্পর্ক এবং অসম্ভব বিলাস-ব্যসনের পরিণতিতে এই মহিলাদেরই কতটা যে অধঃপতন হয় তা 'আরব্য রজনী' -র কাহিনীতেই জানা যায়। ওই কাহিনীতেই আমরা দেখেছি, শেষমেশ কত ধূর্ততা এবং জটিলতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় মহিলারা। স্রেফ ভাবাবেগ এবং অপদার্থ ভাবনাচিন্তার শিরোমণি হয়ে দাঁড়ান তাঁরা। সাহিত্য গুণসম্পন্ন চিঠিপত্রের প্রথম লেখক আবু বকর আল-খওয়ারিজমি (মৃ. ৯৯৩ বা ১০০২ খ্রি)-এর এক বন্ধুর কন্যার অকালমৃত্যু হয়। এরপর খওয়ারিজমি ওই বন্ধুকে যে অসাধারণ

শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লেখেন, 'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে আমাদের সবারই ......কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত কোন কবরের সঙ্গে। তা হলেই আমরা সেরা জামাতা পাবো।'"[৭]

ইসলাম ধর্মে বিবাহকে প্রায় সর্বসম্মত ভাবেই এক ইতিবাচক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। বরং বিবাহ না করাটাই গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। আর সন্তানের জন্ম হওয়া, বিশেষত পুত্রসন্তান, আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য হয়। একজন স্ত্রীর প্রাথমিক কর্তব্য স্বামীর সেবা করা, সন্তানদের মানুষ করা এবং সংসার সামলানো। এসব করে সময় থাকলে সেলাই বা তাঁত বোনার কাজ করা যেত। আল-রশীদের সৎবোন উলাইয়া সেকালে মেয়েদের মাথায় পরার এক জিনিস চালু করেছিলেন। সেটা ছিল কতকটা গম্বুজের মতো দেখতে টুপির মতো। তার নীচের দিকে থাকত একটি টিকলি, যাতে সোনাদানা লাগানো যেত। এছাড়া তখনকার মেয়েরা পরতেন নূপুর (খালখাল) এবং ব্রেসলেট (আসাবির)।

পুরুষেরা নানারকম পোশাক পরতেন। বেশির ভাগ পুরুষই কালো চূড়াওলা টুপি পরতেন। একে বলা হত 'কালানসুওয়া'। এটা সাধারণত উল বা পশমে তৈরি করা হত। আল-মানসূর[৮] এই টুপি চালু করেন। সুভদ্র, পুরুষমাত্রই[১২] পরতেন পারসি আদলের[৯] ঢোলা ট্রাউজার (সারাবিল), শার্ট, গেঞ্জি, জ্যাকেট (কাফতান)[১০], জোব্বা[১১]। আল-রশীদের বিশিষ্ট বিখ্যাত বিচারক আবু ইউসুফের নির্দেশের পর থেকে ধর্মপ্রচারকরা মাথায় কালো পাগড়ি এবং লম্বা ঢিলা আঙরাখা (তায়লাসান) পরতেন।[১২]

সেযুগের কবিদের প্রেমের কবিতার ব্যাখ্যাকে বিচার করে দেখলে বলতে হয় নারীর সৌন্দর্য নিয়ে সাবেক আরবীয় আদর্শ খুব একটি পরিবর্তন হয়নি। বিশিষ্ট কবি আল-নুওয়াইরি তাঁর রচনাবলির[১৪] বৃহৎ অংশেই মহিলাদের দেহের সুন্দর বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর কথায়, গাছপালার জগতে বাঁশ গাছ (খাইজুরান) যেমন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনই শরীর হওয়া উচিত মেয়েদের। মেয়েদের মুখ হওয়া উচিত পূর্ণচন্দ্রের মতো গোল। চুল হওয়া উচিত রাতের অন্ধকারের চেয়েও মিশকালো। চিবুক হওয়া উচিত শাদা এবং গোলাপি। তাতে থাকা উচিত একটি ছোট্ট আঁচিল। স্ফটিকের পেয়ালায় এক ফোঁটা অম্বরের মতো। তার চোখ হওয়া উচিত ঘনকালো, কিন্তু তাতে যেন সুর্মা (কুহ্‌ল) দিতে না হয়। চোখ হওয়া উচিত বণ্য হরিণীর মতো নিটোল। চোখের পাতা যেন হয় নিদ্রালু অথবা অবসন্ন (সাকীম)। মুখ হবে ছোট। আর তাতে প্রবালে বসানো মুক্তার মতো দাঁত যেন হয়। বক্ষযুগল হওয়া উচিত ডালিমের মতো। পাছা হওয়া উচিত প্রশস্ত এবং আঙুলগুলি মোমবাতির দীপশিখার মতো। আঙুলে সিন্দুরবর্ণ মেহেদি (হিন্না) থাকা উচিত।

সেকালে যে-আসবাবের প্রচলন খুব বেশি ছিল তা হল সোফা (দিওয়ান)। যেকোন ঘরের তিন দিকে তিনটা সোফা থাকত। পূর্বতন রাজবংশের আমলে একধরনের আরামকেদারা

ব্যবহার করা হত যার বসার আসনগুলি ছিল উঁচু। এছাড়া মেঝেতে ছোট্ট চারচৌকো মাদুরের (আরবী, মাত্‌রাহ থেকে ইংরেজি ম্যাট্রেস) ওপর কুশন চাপিয়ে বসার ব্যবস্থাও ছিল। এসব প্রচলিত ছিল খুবই। মেঝে জুড়ে হাতে বোনা কার্পেট লাগানো হত। মেঝেতে ওরকম কুশন-আসনে বা দিওয়ানের সামনে নীচু টেবিলে বড় গোলাকার তামার তৈরি ট্রেতে করে খাবারদাবার দেওয়া হত অতিথিদের। সচ্ছল লোকজনের বাড়িতে এই ট্রে থাকত রুপোর। আর ওই টেবিল সাজানো হত আবলুস কাঠ, কচ্ছপের খোল বা শুক্তি-মুক্তো দিয়ে। এখনও দামাস্কাসে এমন টেবিল তৈরির প্রচলন আছে। এইসব লোকজনই বিলাসিত করতে বিছা, গুবরে পোকা, বেজি পুষতেন[15]। এরা ভাতকে বিষাক্ত খাবার[16] মনে করতেন। বড় চেটালো রুটির ওপর লিখতেন।[17] এইসময় ভাল এবং দামি খাবারের খোঁজে এরা বিশ্বের সবচেয়ে সেরা খাদ্যরীতির আমদানি করতে লাগলেন। পারসি খাবার স্টু, 'সিকবাজ' এবং মিষ্টান্ন 'ফালুযাজ'-এর প্রচলন হল। বাদাম, দুধ এবং খোলাওলা বাদাম খাওয়ানো হত তাঁদের হাস-মুরগিকে। গ্রীষ্মকালে ঘর ঠাণ্ডা করা হত বরফের সাহায্যে।[18] শরবত হিসেবে[19] অ-সুরা পানীয় দ্রব্য পান করতেন। স্বাদের জন্য জলের সঙ্গে চিনি মেশানো হত। আর তাকে সুগন্ধিত করা হত কলা, গোলাপফুল, ভায়োলেট ফুল বা তুঁতফুলের নির্যাস দিয়ে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কফি পানের তেমন প্রচলন ছিল না। নতুন পৃথিবী[20] আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তামাকের ব্যবহার কেউ জানত না। নবম এবং দশম শতকের একজন সাহিত্যিক[21] সেই সময়কার মানুষ, সংস্কৃতি (জরিফ) এবং প্রকৃত 'ভদ্রলোকের' ভাবাবেগ ও আচরণের বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ভদ্রলোক' বলতে তাঁদেরই বোঝাত, যিনি আচরণে (আদাব) ছিলেন নম্র প্রকৃতির। যিনি ছিলেন পুরুষালি সংস্কৃতির (মুরুয়াহ্‌) বাহক, যিনি সৎ ব্যবহার করবেন মানুষের সঙ্গে। যিনি অযথা কৌতুক করবেন না। যার বন্ধুত্বের পরিমণ্ডলী ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু বাছাই করা। যার নজর ছিল উঁচু। যিনি কথা দিলে কথা রাখতেন। গোপনীয়তা রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভুল করবেন না যিনি। যিনি পরিষ্কার, না-ছেঁড়া পোশাক পরবেন। যিনি অতি-ভোজনপ্রিয় হবেন না। খাবার টেবিলে কথা বলবেন বা হাসবেন কদাচিৎ। যিনি খাবার সময় আস্তে-আস্তে চিবিয়ে খাবেন। খেতে-খেতে কখনও আঙুল চাটবেন না। রসুন, পিয়াঁজ এসব তিনি খাবেন না। মুখ ধোওয়ার পর কাঠি দিয়ে দাঁত খোচানোয় অভ্যস্ত হবেন না যিনি। শুধু মুখ ধোওয়ার পরই নয়, স্নানঘরে, জনসভায় বা রাস্তায় কখনও যিনি দাঁত খুঁটিবেন না।

প্রায়শই মজলিশে এবং একান্ত নিভৃতে মদ্যপান চলত। 'আগানি' এবং 'আরব্য রজনী'তে মদ্যপানের আসরের অসংখ্য কাহিনী পড়েই এটা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া মদ্যপানের (খামরিয়াত) প্রশংসা করে আবু নুওয়াসের (মৃ. ৮১০ খ্রিঃ) লেখা প্রচুর গান এবং কবিতাও এর প্রমাণ দেয়। খলিফা ইবন্‌-আল-মুতাজ (মৃ. ৯০৮ খ্রিঃ) এবং সমকালীন অনেক চারণকবি এই নিয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, গান গেয়েছেন। এসব থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তা হল, মুসলিম ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা সেসময় আদৌ মানা হত না।

বরং মার্কিন সংবিধানের অষ্টাদশতম সংশোধনীতে এই নিষেধাজ্ঞা অনেকটা কার্যকর করা সম্ভব হয়েছিল। এমন কী খলিফা, উজির, রাজকুমার, এবং বিচারপতিরা পর্যন্ত এই ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাকে আদৌ সম্মান করতেন না।[২২] পণ্ডিত, কবি, গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞদের বিশেষভাবে মদ্যপানের আসরে আশীর্বাদ হিসেবে মনে করা হত। আদতে মদ্যপানের এই প্রচলনটা ছিল পারস্য ঘরানার।[২৩] তা শেষপর্যন্ত আব্বাসীয় আমলের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কারে পরিণত হয়। আর আল-রশীদেব আমলে আরও বিকশিত হয়। এই খলিফা ছাড়াও আল-হাদী, আল-আমীন, আল-মামূন, আল-মুতাসিম, আল-ওয়াসিক এবং আল-মুতাওয়াক্কিল ছিলেন মদ্যপায়ী। আল-মানসূর এবং আল-মুহ্‌তাদি ছিলেন মদ্যপানের বিরোধী। আল নওয়াজি[২৪] তাঁর বইতে লিখে গেছেন যে খলিফা, উজির এবং সচিবদের মদ্যপানের আসক্তি দেখে তিনি দিশেহারা। খেজুর থেকে এক ধরনের মদ তৈরি হত। তার নাম খামর। এর ছিল সবচেয়ে চাহিদা। ইব্‌ন-খালদূন লিখেছেন, আল-রশীদ এবং আল-মামূনের মতো ব্যক্তিত্ব শুধু নাবীয[২৫] পান করতেন। এই মদ তৈরি হত আঙ্গুর, কিসমিস এবং খেজুর জলে ভিজিয়ে সামান্য ঝাঁঝবিশিষ্ট করে। মুসলিম শাস্ত্রের একটি ধারা আবার এই পানীয়কে কিছু শর্তে 'আইনি' বলে মনে করে। মুহাম্মাদ নিজেও এটি পান করতেন। তবে তিনদিন ধরে পচার আগেই তা পান করতেন।[২৬]

পানোৎসব, যাকে বলা হত 'দ্রাক্ষা কন্যা' এবং গানের আসরের আয়োজন হত প্রায়ই। এই সব পানের আসরে (একবচনে, মাজলিস আল-শিরাব[২৭]) আপ্যায়নকারী ও অতিথি দাড়ি গোলাপ-জলে সুগন্ধ করে আসতেন এবং উজ্জ্বল রঙের (সিয়াব আল-মুনাদামা) দামি পোশাক পরে আসতেন। ঘর সুগন্ধিদ্রব্য পুড়িয়ে সুবাসিত করা হত। এইসব অনুষ্ঠানে যেসব গায়িকারা গান করতেন তাদের অধিকাংশই অসৎ চরিত্রের নারী। এই তথ্য বহু কাহিনীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[২৮] এরাই সমসাময়িক যুবকদের—নৈতিক চরিত্র নষ্ট করার মূলে থাকতেন।[২৯] আল-মানসূরের আমলে আল-কুফায় এমন এক আসরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এগুলি ছিল আধুনিক রেঁস্তোরার থেকেও বেশি কিছু। ওই আসরের প্রধান গায়িকা ছিলেন নীলচোখের সাল্লামাহ্ আল-জারকা।[৩০] খ্রিস্টান মঠে বাইরের লোকেরা গিয়েও মদ্যপান করতে পারতেন। ইহুদিরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এইসব জায়গায় মদ্যপানকেন্দ্র চালাতেন। সেসময় খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা ছিলেন মদের কারবারি।

● স্নানাগার

মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হল পবিত্রতা —এই কথাটি মুহাম্মাদের বাণী হিসেবে আজও মুসলিম দেশে দেশে সবার কণ্ঠস্থ। মুহাম্মাদের আবির্ভাবের আগে আরবের লোকজন হাম্মামখানায় স্নান করত বলে শোনা যায়নি। মুহাম্মাদ নিজেও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেবল পুরুষরাই হাম্মামে প্রবেশ করতে পারত। অবশ্য প্রত্যেককে পোশাক পরে যেতে হত। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেসময় গণ স্নানাগার (হাম্মাম)

শুধু আনুষ্ঠানিক ধোয়াধুয়ির জন্যই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, পাশাপাশি তা বিনোদন এবং বিলাসিতারও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মহিলাদের এইসব স্নানাগার 'বিশেষ দিনে' ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হত। আল-খাতীব[২১] এর বর্ণনা অনুযায়ী, আল-মুকতাদিরের আমলে (৯০৮-৯৩২) বাগদাদে ২৭ হাজার গণস্নানাগার ছিল। পরে তা বেড়ে ৬০ হাজারে[২২] দাঁড়ায়। তবে আরবীয় সূত্রগুলির অধিকাংশের মতো এসবের মধ্যেও যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। আল-ইয়াকূবী[২৩]-এর তথ্য অনুযায়ী, বাগদাদ প্রতিষ্ঠার পরে পরেই এরকম গণস্নানাগারের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। আফ্রিকার পর্যটক ইব্‌ন-বতুতা[২৪] ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ সফরে আসেন। তিনি বাগদাদে এমন ১৩টি বাড়ির প্রতিটির পশ্চিম দিকে দুটি বা তিনটি করে আধুনিক স্নানাগার দেখেছিলেন। প্রতিটি স্নানাগারে ছিল গরম এবং ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা।

এখনকার মতো এইসব স্নানাগারে একাধিক ঘর ছিল। মোজাইকের মেঝে এবং মার্বেল পাথরের দেওয়াল ছিল। স্নানাগারের মাঝে ছিল একটি বড় ঘর। স্নানাগারের অন্তস্তলের এই ঘরটির মাথায় ছিল গম্বুজ। গম্বুজের মাথায় ছিল চকচকে এমন কিছু দ্রব্য, যাতে বাইরের আলো আসার সুবিধা হয়। এছাড়া জলাধারের মাঝে বাষ্পশক্তির সাহায্যে জল গরম করার বন্দোবস্ত ছিল। স্নানাগারের বাইরের ঘরগুলি ব্যবহৃত হত মদ্যপান এবং ফুর্তির জন্য।

● বিনোদন

চারুকলার মতো ক্রীড়া-সংস্কৃতিরও ভারত-ইউরোপীয় ধারার একটা দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। ক্রীড়া বিষয়টি যত না সেমেটিক সভ্যতা-জাত তার চেয়ে ঢের বেশি ভারত-ইউরোপীয় সভ্যতা-জাত। ক্রীড়ার মূল কথাই হল মানুষের নিজের জন্যই শারীরিক ব্যায়ামে লিপ্ত থাকা। খেলাধূলা আরবের লোকজনের কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়ে ওঠেনি। এর কারণ হল, আরবের জলবায়ুর উষ্ণতা এবং সেখানকার মানুষজনের অতিরিক্ত কেজো মেজাজ।

খলিফা আমলে কিছু ঘরোয়া খেলা ছিল জনপ্রিয়। উমাইয়া আমলে মক্কায় একটি ক্লাব হাউস ছিল। সেখানে দাবা, পাশা খেলার ব্যবস্থা ছিল। আল-রশীদই প্রথম খলিফা, যিনি নিজে দাবা খেলতেন এবং দাবা খেলাকে প্রশ্রয় দিতেন।[২৫] দাবাকে আরবী ভাষায় 'শিতরঞ্জ' বলা হয়। চূড়ান্ত বিচারে 'দাবা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। দাবা আদতে ছিল ভারতীয় খেলা।[২৬] দ্রুত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে পাশার বদলে দাবার প্রচলন হয়। আল-রশীদ শার্লমানকে একটি দাবার বোর্ড উপহার দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যেরূপভাবে ধর্মযুদ্ধের সময়ে 'পর্বতের বৃদ্ধ মানুষ' সেন্ট লুইসকে একটি দাবার বোর্ড দেন। এছাড়া বোর্ডে 'ব্যাকগ্যামন' খেলতে হত। ব্যাকগ্যামন খেলা (নার্দ) ভারতেই প্রথম সৃষ্টি হয়।[২৭]

মাঠের খেলার মধ্যে নামকরা খেলা ছিল তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা, পোলো খেলা (জ্কান, পারস্য ভাষা থেকে নেওয়া 'চাওগান'[২৮] হকির মতো বাঁকা লাঠি নিয়ে যা খেলা হত) বল খেলা এবং সাওলাজান (হকির মতো খেলা), অসিক্রীড়া, বল্লম ছোঁড়ার খেলা (জারীদ),

ঘোড়ার দৌড়, এবং শিকার। আল-জাহিযের বর্ণনা থেকে জানা যায়, খলিফার আশীর্বাদধন্য হতে গেলে তীর-ছোঁড়া-শিকার, বল খেলা এবং দাবায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যিক ছিল। এইসব খেলা জানলে খলিফার সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পথ সহজ ছিল। খলিফাদের মধ্যে বিশেষভাবে পোলো খেলার প্রিয় ভক্ত ছিলেন আল-মুতাসিম। তাঁর তুর্কি সেনাধ্যক্ষ আল-আফশিন একবার তাঁর বিরুদ্ধে পোলো খেলতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, খেলাচ্ছলে হলেও আমীরুল মু'মিনীনের বিপক্ষে অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়। আরও একরকম খেলার কথা জানা যায়, যা একটি লম্বা কাঠের টুকরো এবং বল দিয়ে খেলা হত। ওই লম্বা কাঠের টুকরোটিকে বলা হত তবতব। সেটাই সম্ভবত আজকের টেনিস খেলার ভ্রূণ অবস্থা ছিল। আল-মাসউদীতে আমরা আল-রাক্কায় অনুষ্ঠিত সেই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার বর্ণনা পাই যেখানে আল-রশীদের একটি ঘোড়া প্রথম হয়েছিল। তাতে আল-রশীদ উল্লসিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় উপস্থিতও ছিলেন। 'ইকদ' থেকে পাওয়া যায় এমন কিছু কবিতা, যাতে পুরস্কারজয়ী ঘোড়ার কথা রয়েছে। এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে জুয়াও হত।

আগের মতো আব্বাসীয় আমলে খলিফা এবং যুবরাজদের বিনোদনের বড় প্রিয় মাধ্যম ছিল শিকার। খলিফা আল-আমীন সিংহ শিকার করতে ভালবাসতেন। তাঁর এক ভাই শিকারে গিয়ে বুনো শুয়োরের আক্রমণে মারা যান। আবু-মুসলিম আল-খুরাসানি এবং আল মুতাসিম---দুজনেই চিতা শিকার করতে ভালবাসতেন। সাবেক আরবী বইতে শিকার নিয়ে বিস্তর কাহিনী পাওয়া যায়। বাজপাখিকে তালিম দিয়ে অন্য পশুপাখিকে শিকার করার প্রচলনও ছিল। এটা পারস্য দেশ থেকে চালু হয়। পরে খলিফারা এই খেলার প্রিয় ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং ধর্মযুদ্ধেও এদের কাজে লাগানো হত। এখনও বাজপাখি অথবা বাজপাখির সমতুল্য 'বাশিক' পাখিকে তালিম দিয়ে শিকার করাব প্রচলন রয়েছে। পারস্য, আল-ইরাক, দাইর আল-জুর এবং সিরিয়ার আলাবাই অঞ্চলে এইভাবে শিকার করা প্রচলিত আছে বলে আরব্য রজনীতে লেখা রয়েছে। ছোট হরিণ, খরগোশ, তিতির পাখি, বুনো রাজহংসী, পাতিহাঁস, কাতা (মেঠো মোরগবিশেষ) পাখিকে শিকার করতে বাজপাখিকে কাজে লাগানো হয় বা কুকুরকে দিয়ে বড় ধরনের শিকার করাতে বাজপাখিকে সহযোগীর ভূমিকায় রাখা হয়। যে কোন মুসলিম শিকারি কোন কিছু শিকার করেই প্রথমে তার গলা কেটে ফেলেন। নয়তো শিকার করা প্রাণীর মাংস অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিকারি দল মিলে শিকার-স্থলকে ঘিরে একটি বৃত্ত (হলকা) গড়ত। ওই শিকার-স্থলেই হত শিকার। আল-মুতাসিম টাইগ্রিস নদীর পাশে একটি ঘোড়ার খুরের আকৃতির দেওয়াল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শিকারি-দলকে ওই দেওয়ালের অপরপ্রান্তে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শিকার-খেলা চালাতেন। আল-মুতাসিম 'বৃত্ত-পদ্ধতি'ও অনুসরণ করতেন। এমন পদ্ধতি অনুসরণ করতেন সালজুকরাও। অন্যদের মধ্যে খলিফা আল-মুস্তানজিদ (১১৬০-৭০) পরবর্তীকালে

একাধিক শিকারিদল সংগঠিত করেছিলেন। কিছু খলিফা এবং শাসক বাঘ, সিংহ-র মতো বন্য পশু পুষতেন প্রজা এবং দর্শনার্থীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য।[১১] আবার অনেকে পুষতেন কুকুর এবং বানর। আল-মুক্তাদিরের উজিরের এক পুত্র থাকতেন কায়রোয়। তিনি সরকারের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তাঁর শখ ছিল সাপ, বেজি এবং অন্য বিষধর পশু সংগ্রহ করা। এসব জন্তু তিনি তাঁর প্রাসাদের কাছে বিশেষ ঘরে যত্নের সঙ্গে রেখে দিতেন।[১২]

● ক্রীতদাস

সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে স্থান ছিল খলিফা ও তাঁর পরিবারবর্গ, সরকারি কর্মচারী, হাশিমি গোষ্ঠীর রাজপুত্র এবং তাঁদের ছত্রছায়ায় থাকা মানুষজন। এই শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিলেন সৈন্য ও খলিফার দেহরক্ষীরা। আর ছিলেন তাঁদের বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ সহযোগী, অনুচর ও চাকরবাকররা।

চাকরদের প্রায় সবাই ছিল ক্রীতদাস শ্রেণীভুক্ত। তাদের নেওয়া হত অমুসলিম লোকজনের মধ্য থেকে। যাদেরকে দখল করা হয়েছিল বলপূর্বক, কিংবা যুদ্ধকালে বন্দি হিসাবে, অথবা শান্তির সময়ে খরিদ করা মারফত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল নিগ্রো, কিছু তুর্কি, আর বাকী সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসরা (মামালিক) ছিল মূলত গ্রিক, শ্লাভ, আরমেনীয় এবং বার্বার জাতিভুক্ত। কিছু ক্রীতদাস ছিল খোজা বা নপুংসক (খিস্য়ান)। তারা হারেমের কাজে লিপ্ত থাকত। কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস ছিল 'গিলমান' শ্রেণীভুক্ত। তারা নপুংসকও হতো। তারা প্রভুদের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ করত। তারা মূল্যবান, নজরকাড়া পোশাক পরত। দেহে সুগন্ধি লাগিয়ে সবসময় ফ্যাশনদুরস্ত হয়ে থাকত। আমরা গিলমানদের কথা জেনেছি আল-রশীদের[১৪] আমলে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আরব জগতে অপ্রাকৃতিক যৌন সংসর্গের[১৫] মাধ্যম হিসেবে গিলমানদের ব্যবহার করেছিলেন আল-আমীন। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরি ছিলেন পারসিকরা। আল-মা'মূনের আমলে একজন বিচারপতি এরূপ ৪০০ যুবককে[১৬] ব্যবহার করেছিলেন। আবু-নুওয়াসের মতো কবি জনগণের এরূপ বিকৃত যৌন ভালবাসাকে প্রকাশ করতে কোনরূপ ঘৃণাবোধ করেননি। তিনি তাঁর প্রণয়মূলক কবিতায় গিলমানদেরকে 'শ্মশ্রুহীন তরুণ' বলে সম্বোধন করেছেন।

ক্রীতদাসীদের মধ্যে যারা কুমারী (জাওয়ারী) ছিল তারা গায়িকা, নর্তকী ও উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাদের মধ্যে অনেকে প্রভু-খলিফার ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের অন্যতম হল যাত-আল-খাল (তিলোত্তমা)। আল-রশীদ তাকে ৭০ হাজার দিরহাম দিয়ে কেনেন। তারই জন্য নিছক সন্দেহবশত এক ক্রীতদাসকে তিনি নির্বাসিত করেন। কোন একদিন যাত-আল-খাল তার আবেদন মঞ্জুর করার জন্য আল-রশীদের কাছ থেকে শপথ আদায় করেন। কিন্তু তার আবেদনের স্বরূপ পূর্বে খুলে বলেননি। শেষমেশ দেখা গেল, আল-রশীদ তার স্বামীকে সাত বছরের জন্য ফারিস-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন।[১]

অপর একজন গায়িকার সঙ্গেও আল-রশীদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার সংস্পর্শ থেকে বাঁচাতে খলিফা-পত্নী যুবাইদাহ স্বামীকে দশটি কুমারী উপহার দিয়েছিলেন। আর এই দশজনের মধ্যে অন্যতম দু'জন হয়েছিলেন আল-মা'মুন এবং আল-মু'তাসিমের গর্ভধারিণী।[৭৮] সহস্র এক আরব্য রজনীর (৪৩৭—৬২ রাত্রি) প্রতিভাময়ী, সুশ্রী ক্রীতদাসী তাওয়াদ্দুদ-এর কিংবদন্তি স্বরূপ কাহিনী অবিস্মরণীয়। এই ক্রীতদাসীটি চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, সঙ্গীত; এমন কী ছন্দ, ব্যাকরণ, কবিতা, ইতিহাস এবং কোরান বিষয়ক এক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার গুণপণায় অভিভূত আল-রশীদ তাকে খরিদ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। এর থেকেই বোঝা যায়, এই কুমারী কত উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। এমনই একদল মেয়েকে উন্নত করে তুলেছিলেন আল-আমীন। তারা ছোট করে চুল ছাঁটত। ছেলেদের মতো পোশাক পরত এবং মাথায় পরত সিল্কের উষ্ণীষ। এরূপ ফ্যাশন অতি শীঘ্রই সমাজের[৭৯] উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এক রবিবার তিনি আল-মা'মূনের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে তিনি কুড়িজন গ্রিক কুমারীকে দেখেছিলেন। তারা সবাই দারুণ সাজগোজ করে ছিল। তারা গলায় সোনার ক্রস ঝুলিয়ে, হাতে জলপাই শাখা ও খেজুর পাতা নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিল। নাচের শেষে[৮০] তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করা হয়েছিল।

খলিফাদের গৃহস্থালী কাজের জন্য ব্যবহৃত ক্রীতদাসদের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়, সেকালে দাসপ্রথার কত রমরমা ছিল। জানা গেছে, আল-মুকতাদিরের (৯০৮-৩২) প্রাসাদে এগারো হাজার গ্রিক ও সুদানি খোজা ছিল।[৮১] অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল-মুতাওয়াক্কিলের চার হাজার উপপত্নী ছিল। তারা প্রত্যেকেই ছিল তাঁর শয্যাসঙ্গিনী।[৮২] একবার তাঁর এক সেনাপ্রধানের[৮৩] কাছ থেকে তিনি উপহারস্বরূপ ২০০ জন ক্রীতদাস লাভ করেছিলেন। রাজ্যপাল ও সেনাপ্রধানরা নিয়মমাফিক খলিফা অথবা উজিরদের[৮৪] কাছে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে নারীও পাঠাতেন। সেই উপঢৌকন তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে লাভ করতেন অথবা জোর করে আদায় করতেন। আর এরূপ উপঢৌকন প্রেরণে ব্যর্থ হলে তাকে বিদ্রোহী বলে গণ্য করা হত। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত বিশ্বস্ত দাসদের নিয়ে আল-মা'মূন একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সন্দেহজনক ক্ষেত্রে গুপ্তচর হিসেবে অথবা প্রয়োজনমাফিক হইচই সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।[৮৫]

● অর্থনৈতিক জীবন : বাণিজ্য

তৎকালীন জনগণের মধ্যে ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছাকাছি থাকা এক উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। এছাড়া ছিলেন সাহিত্যিক, রসসাহিত্যিক, শিক্ষিত লোকজন, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং পেশাদাররা। এছাড়া দেশের জনগণের বড় অংশ ছিল নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়। এই

নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল কৃষক, রাখাল, গ্রামবাসীরা। এরা 'যিম্মীদের' মর্যাদা পেত। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করব। এখানে এটা বলা যথেষ্ট যে, আব্বাসীয় আমলে সংস্কৃতির সাধারণ মান খুব একটা নীচু ছিল না।

সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং উঁচু স্তরে পৌছানোর বড় কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। সাবেক আমলে খ্রিস্টান, ইহুদি[৬৬] এবং জরথুস্ট বণিকরাই ব্যবসা করতেন। কিন্তু পরে মুসলিম এবং আরবরা এদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়। এরা চাষবাসকে অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু বাণিজ্যকে অবজ্ঞা করতেন না। বাগদাদ, আল-বসরা, সিরাফ,[৬৭] কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া দ্রুত স্থল এবং নৌবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

পূর্বদিকে মুসলিম বণিকরা চীনে বাণিজ্য-পরিধি বিস্তার করেন। আরবীয় রীতি অনুযায়ী আল-বসরা থেকে এই বাণিজ্য সম্পন্ন হত। আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসুরের[৬৮] আমলে এই বাণিজ্য চলত। সুলাইমান আল-তাজির (বণিক) এবং অন্য মুসলিম ব্যবসায়ীরা, যাঁরা তৃতীয় মুসলিম শতকে বাণিজ্য করতেন তাঁদের ভ্রমণবিবরণীতে জানা যায় যে, আরব এবং পারস্যের সঙ্গে ভারত এবং চীনের কেমন সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল সেকালে।[৬৯] বাণিজ্য হত মূলত সিল্কবস্ত্র নিয়ে। এই 'সিল্ক' ছিল পাশ্চাত্যের কাছে চীনের অত্যাশ্চর্য উপহার স্বরূপ। আর সেই কারণেই সমরকন্দ এবং চীনা তুর্কিস্থান হয়ে এই সিল্কদ্রব্য পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যে পথে সরবরাহ হতো, তাকে অভিহিত করা হতো 'মহান রেশমী পথ' নামে। পণ্য সাধারণত রিলে প্রথায় সরবরাহ করা হত। কিছু মরুযাত্রীদল অবশ্য নিজেরাই সর্বত্র গিয়ে বাণিজ্য করতেন। তবে আরবীয় বণিকদের আবির্ভাবের আগেই নিশ্চিতভাবে দেশগুলির মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পারস্য বিজেতা সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস মুহাম্মাদের দূত হিসেবে চীনে গিয়েছিলেন। ক্যান্টন প্রদেশে সা'দের সমাধিস্থলকে সকলে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। চীনে কিছু সাবেক স্মৃতিস্তম্ভে ইসলামধর্ম নিয়ে লিপিও খোদিত রয়েছে।[৭১] অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীন এবং আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে দূতাবাস বিনিময় হয়। সমকালীন চীনা নথিপত্র থেকে জানা যায়, আমীর আল-মু'মিনীন-কে চীনে বলা হত 'হানমি-মো-মো-নি'। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা আবু- আল-আব্বাসকে বলা হত 'আ-বু-লু-বা'। হারূনকে বলা হত 'আ-লুন'। এইসব খলিফাদের আমলে চীনে বেশ কিছু মুসলমান স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। গোড়ায় এই মুসলমানরা 'তা-শি'[৭২] নামে পরিচিত ছিলেন। পরে চীনা মুসলমানরা 'হুই হুই' (মুসলমান)[৭৩] নামে পরিচিত হন। চীনে আরবদের (বেদুইন) অবস্থিতির প্রথম বিবরণ ইউরোপে মার্কোপোলোর লেখাতেই পাওয়া যায়।[৭৪] মুসলমান ব্যবসায়ীরাও ইসলামধর্ম প্রচার করেছিলেন বিভিন্ন দেশে। তার ফলেই ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়।

পশ্চিমমুখে মুসলিম বণিকরা মরক্কো এবং স্পেনে পৌঁছান। আরব সাম্রাজ্যের খলিফা হারূনই প্রথম সুয়েজের যোজক বরাবর খাল খননের পরিকল্পনা করেন। তবে ভূমধ্যসাগরে

আরবদের বাণিজ্য তখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি। বরং বলা যায় কখনই ভূমধ্যসাগর তাদের সমাদর করেনি। তাদের পক্ষে কৃষ্ণসাগরও ছিল অনুরূপ প্রতিকূল। দশম শতক জুড়ে উত্তরে ভল্‌গা উপত্যকার মানুষজনের সঙ্গে পুরোদস্তুর বাণিজ্য চলে। পারস্য দেশগুলির কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় এবং সমরকন্দ এবং বুখারার মতো সমৃদ্ধশালী শহরের সঙ্গে তার পশ্চাদ্‌ ভূমির ঘনিষ্ঠ অবস্থান থাকায় ক্যাসপিয়ান সাগরকে ঘিরে বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মুসলিম বণিকরা খেজুর, চিনি, সুতা, উলের পোশাক, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি এবং কাচের বাসন নিয়ে বাণিজ্য করত। তারা আমদানি করত এশিয়া থেকে মশলা, কর্পুর, সিল্কবস্ত্র এবং আফ্রিকা থেকে হাতির দাঁত, আবলুসকাঠ এবং নিগ্রো ক্রীতদাস।

সেযুগে রকফেলর বা রথচাইল্ডদের বিপুল সম্পত্তি দেখে বাগদাদের স্বর্ণকার ইব্‌ন-আল-জাস্‌সাসের সম্পত্তি অর্জনের ইচ্ছা হয়। তিনি বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন। খলিফা আল মুকতাদির তাঁর সম্পত্তির ১ কোটি ৬০ লক্ষ দিনার বাজেয়াপ্ত করেন। ইব্‌ন-আল জাস্‌সাস ছিলেন প্রথম বিখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী।[১৬] বাসরার কিছু বণিকের জাহাজ বিশ্বের অন্যত্র ব্যবসার কাজে যেত। তাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ছিল দশ লক্ষ দিরহাম। আল-বাসরা এবং বাগদাদের এক অশিক্ষিত শষ্যপেষাইকারী পর্যন্ত রোজ প্রায় ১০০ দিনার ভিখারিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। পরে খলিফা আল-মুতাসিম তাঁকে উজির নিযুক্ত করেন।[১৭] সিরাফে অধিকাংশ ব্যবসায়ীর বাড়ি নির্মাণ করতে কমপক্ষে ১০,০০০ দিনার খরচ করা হত। অনেকে আবার ৩০ হাজার দিনার খরচ করতেও কার্পণ্য করতেন না। আর নৌকা বা জাহাজ পথে বাণিজ্যকারী ব্যবসায়ীরা তো বাড়ি তৈরি করতে ৪০ লক্ষ দিনার খরচ করতেন।[১৮] সিরাফের অনেক ব্যবসায়ী জলের ওপরেই তাদের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। 'আল-ইসতাখরি'[১৯] থেকে জানা যায়, এমন এক ব্যবসায়ী ৪০ বছর জাহাজের ডেকে বাস করেছিলেন।

● শিল্প

সেকালে কুটির শিল্প এবং চাষবাসের মতো বিস্তৃতিলাভ করেনি অন্য কোন শিল্পই। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরোয়া এমন অগুনতি শিল্প। পশ্চিম এশিয়ায় কম্বল, সিল্ক, সুতো, উলবস্ত্র, সাটিন বস্ত্র, ব্রোকেড (দিবাজ), সোফা নির্মাণ শিল্প (আরবী 'সুফ্‌ফাহ্‌' থেকে এসেছে), কুশন আচ্ছাদন এবং পরদা তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। পাশাপাশি এই অঞ্চলেই আসবাবপত্র এবং রান্নার বাসনপত্রের কারখানা ছিল। পারস্য এবং আল-ইরাকের বহু তাঁতকল কার্পেট এবং কাপড় তৈরিতে শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। খলিফা আল-মুসতাইনের মা একবার নিজের ঘরে ব্যবহারের জন্য একটি কম্বল তৈরি করিয়েছিলেন, যার মূল্য পড়ে ১৩ কোটি দিরহাম। ওই কম্বলে প্রায় সমস্ত রকম পাখির ছবি সোনা দিয়ে নকশা করা হয়েছিল। এইসব পাখির চোখ তৈরি করা হয়েছিল চুনি এবং অন্য মূল্যবান পাথর দিয়ে। বাগদাদে একটি আবাসন গড়া হয়েছিল উমাইয়া যুবরাজ আন্তাব-এর

নামে। এই আবাসনে থাকতেন অতিবিশিষ্ট মানুষ ওই যুবরাজ। আবাসনটির গায়ে নানা রঙের রেখার সাহায্যে লেখা হয়েছিল 'আত্তাবি'[৮১]। স্পেনের আরবরা এই নকশা অনুসরণ করে 'তাবি' নামটি ব্যবসায়িক কাজে লাগিয়েছিলেন। তা ফ্রান্স, ইতালি এবং ইউরোপের অন্য দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে তা অপভ্রংশ হয়ে 'টাবি' তে রূপান্তরিত হয়। 'টাবি' বলতে ডোরাকাটা বিড়ালকে বোঝাত।

আল-কূফায় তৈরি হত সিল্ক বস্ত্র এবং মাথা ঢাকা দেওয়ার ওড়না। যা এখনও 'কুফিয়া' নামেই পরিচিত হয়ে রয়েছে। ফারিস-এর তাওয়াজ, ফাসা এবং অন্য শহরে উন্নতমানের কার্পেট, চিকনের কাজ, বুটিদার রেশমিকাপড় প্রাচ্যের কোন বিশিষ্ট পদের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত লম্বা, ঢিলা পোশাক তৈরির কারখানা ছিল। গোড়ায় এইসব জিনিস রাজপরিবারের জন্যই তৈরি হত।[৮২] এইসব জিনিসপত্রকে বলা হত 'তিরাজ' (পারসি শব্দ)। এখানে তৈরি কাপড় বা কার্পেটে সুলতান বা খলিফার নাম অথবা নামের প্রথম অক্ষর খোদাই করে দেওয়া হত। এছাড়া খুজিস্তানের[৮৩] তুস্তার এবং আল-সূসে (প্রাচীন সুসিয়ানা)-তে একাধিক কারখানা ছিল, যেখানে দামাস্ক[৮৪] কার্পেট এবং কাপড় তৈরি হত। এই বিশেষ কারুকার্যে ব্যবহৃত হত সোনার জরি। আর পর্দা নির্মিত হত স্পান সিল্ক (ফাজ) দিয়ে। খুজিস্তানের এইসব কারখানায় তৈরি উট এবং ছাগলের লোমের পোশাকের কদর ছিল দারুণ। শীরাজে তৈরি হত ডোরাকাটা উলের পোশাক। জরিদার ও বুটিদার পোশাক নির্মাণেও তারা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপীয় মহিলাদের প্রিয় ছিল 'তাকেটজা' নামে রেশমবস্ত্র; যা আসলে পারসি 'তাফতা' থেকেই অপভ্রংশ হয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল ওই নামে। খুরাসান এবং আর্মেনিয়া বিখ্যাত ছিল সোফা, কুশন-আচ্ছাদন, পর্দা ইত্যাদির জন্য। মধ্য এশিয়ায় মধ্যযুগের গোড়ায় বুখারা বিখ্যাত ছিল নামায পড়ার জন্য মুসাল্লা কম্বল তৈরিতে। আল-মাকদিসি[৮৫] প্রদত্ত রপ্তানি-তালিকা থেকে ট্রান্সঅক্সিয়ানায় শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। সিরিয়া এবং মিশরে তৈরি হত সাবান, কার্পেট, তামার তৈরি বাতি, ফার টুপি, মধু; কাঁচি, সুচ, ছুরি, তরবারি, তীর; টেবিল, সোফা, আলো, মাটির তৈরি জিনিস, রান্নার বাসন, পিকদানি, ঝাড়বাতি ইত্যাদি। মিশরে তৈরি কারুকার্যখচিত পোশাক দিমিয়াতি (দিমিয়াত থেকে), দাবিকি ('দাবিক' থেকে) এবং তিনিসি ('তিন্নীস'[৮৬] থেকে)-এর খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। প্রাচীন মিশরের শিল্পকলাও সেকালে ক্ষীণ ভাবে বিদ্যমান ছিল মিশরিয় খ্রিস্টানদের তৈরি জিনিসপত্রে।

সিডোন, টায়ার এবং সিরিয়ার অন্য শহরের কাচ শিল্প সাবেক ফিনিশিয় শিল্পের ঐতিহ্যের অনুসারী হিসেবে টিকে ছিল। পৃথিবীর প্রথম কাচ শিল্প গড়ে ওঠে কিন্তু ওই মিশরেই। মিশরের কাচ স্বচ্ছতায় এবং সূক্ষ্মতায় ছিল প্রবাদপ্রতিম।[৮৭] সিরিয়ার কাচ শিল্পও নানা ধরনের কাঁচ তৈরিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ফলে ইউরোপের গির্জাগুলিতে সাজসজ্জার জন্য সিরিয়া থেকে কাচ যেত। সিরিয়ার তৈরি কাচ এবং ধাতুর পিকদানির কদর ছিল প্রচণ্ড। বিভিন্ন

মসজিদ এবং প্রাসাদে নানা রঙের কাচে বিভিন্ন রকমের লেখা এবং কারুকার্য খোদিত সিরিয়ার এই কাচ দেখা যেত সেকালে। দামাস্কাস ছিল উন্নতমানের মোজাইক এবং কাশানি তৈরির কেন্দ্র। কাশানি[৮৮] (কথ্য 'কিশানি' কাশি) নামটি এসেছে কাশান[৮৯] থেকে। 'কাশানি' বলতে বোঝাত বর্গাকৃতি বা ছয়কোনা চকচকে টালি। এইসব টালিতে ফুলের নকশা কাটা থাকত। ঘরের ভিতরে এবং বাইরে মেঝে তৈরিতে কাজে লাগানো হত এই টালি। সচরাচর এইসব টালি হত ঘন নীল, সবুজ, নীলকান্তমণির রঙের। কখনও বা লাল এবং হলুদ রঙা মোজাইক টালিও বানানো হত। অ্যাসিরিয়া বা ইলম সভ্যতার মতো প্রাচীন এই শিল্প দামাস্কাসে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত টিকে ছিল।

এছাড়া লেখার কাগজ তৈরির প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় চীন থেকে সমরকন্দ হয়ে কাগজনির্মাণ শিল্প আরবদেশে প্রবেশ করে।[৯০] সমরকন্দে তৈরি কাগজ সেকালে অতুলনীয় বলে বিবেচিত হত।[৯১] ৭০৪ খ্রিস্টাব্দে আরবরা সমরকন্দ দখল করে। ফলে কাগজ নির্মাণ শিল্পও তাদের দখলে আসে। ওই শতকের বিদায় মুহূর্তে বাগদাদে প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়। পরে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বা তার আগে মিশরে কাগজকল তৈরি হয়। ১১০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মরক্কোয় কাগজকল স্থাপিত হয়। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্পেনে কাগজকল স্থাপিত হয়। এইসব কাগজকলে শাদা এবং রঙ্গিন নানারকম কাগজ তৈরি হত। আল-মুতাসিম-এর উৎসাহে বাগদাদে একটি সাবান এবং কাচের কারখানা স্থাপিত হয়। সামাররা এবং অন্য শহরেও কাগজ শিল্প বিস্তারলাভ করে। আমরা প্রাচীন কালের আরবীয় যে পাণ্ডুলিপি (কাগজে লেখা) পাই তা ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বরে (হিজরীসন ২৫২ যু-আল-কাদাহ) লেখা। লিখেছিলেন আবু-উবাইদ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (মৃ. ৮৩৭)। লেখাটির শিরোনাম 'গরীব আল-হাদীস'। কাগজের লেখা এই পাণ্ডুলিপিটি লিডেন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে সুরক্ষিত রয়েছে।[৯২] ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত রয়েছে খ্রিস্টান লেখকের লেখা এক ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ। আবু কুরবা[৯৩] (মৃ. ৮২০ খ্রিঃ) এটা লিখেছিলেন ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে (রবিয়ল আউওল, হিজরীসন ২৬৪)। মুসলমান অধ্যুষিত স্পেন এবং ইতালি থেকে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে কাগজ নির্মাণ শিল্প ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের হাতে চলে যায়। পরে ১৪৫০-৫৫ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তনশীল অক্ষর দিয়ে ছাপার আবিষ্কার হতে জনশিক্ষা প্রসার সহজ হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা যার সুফল এখন ভোগ করছে।

গহনা শিল্পও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল সেকালে। রাজপরিবারের লোকজনের প্রিয় ছিল মুক্তা, নীলকান্তমণি, হীরা, জহরত ইত্যাদি। আর সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রিয় ছিল আশমানি মণি, লালপাথর এবং আকীক জাতীয় মণিবিশেষ। আরব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পাথর ছিল একটি বড় চুনিপাথর। এই পাথরটি একসময় পারসি রাজাদের দখলে ছিল। পরে তা আল-হারুন ৪০ হাজার দিনার দিয়ে কিনে নিয়ে তাতে তাঁর নাম খোদাই করে দেন।[৯৪] এই

চুনিপাথরটি এত বড় এবং উজ্জ্বল ছিল যে, রাতে কোন ঘরে এটিকে রাখলে ঠিক আলোর মতো জ্বলত মণিটি। জানা গেছে, হারুনের বোন মাথার ওড়নাতেও মণিরত্ন পরতেন এবং তাঁর স্ত্রী জুতোতে রত্ন লাগাতেন। একবার ইয়াহিয়া ইব্‌ন খালিদ নামে এক বারমাক বাগদাদের এক বণিকের কাছে মূল্যবান পাথরে তৈরি একটি গহনার বাক্স ৭০ লক্ষ দিরহাম দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন। সেই বণিক অবশ্য তা বিক্রি করেননি।[৯৫] আল-মুক্তাফি ২ কোটি দিনার মূল্যের গহনা এবং সুগন্ধি রেখে গিয়েছিলেন।[৯৬] আল-মুতাওয়াক্কিল একবার যে ভোজসভা দিয়েছিলেন এবং আল-মামূনের বিয়েতে যে রাজকীয় খরচ হয়েছিল তা ইসলামের ইতিহাসে তৃতীয়বার আর ঘটেনি।[৯৭] ওই দুই ভোজসভায় যে টেবিল এবং ট্রে ব্যবহৃত হয়, তা ছিল স্বর্ণখচিত। এমনকী ইব্‌ন-খালদূনও (যিনি দাবি করতেন, যে আব্বাসীয়রা কখনও বিলাসবহুল জীবনযাপন করেননি), আল-মামূনের বিয়েতে প্রচুর সোনাদানা দান হিসেবে গ্রহণ করেন।[৯৮] 'আল-মাসউদী' বলেছেন, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ত্রয়োদশ খলিফা আল-মুতাজই (৮৬৬-৮৬৯) প্রথম সোনার পাদানি ব্যবহার করতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ার সময়। তাঁর আগের সমস্ত খলিফাই রূপার পাদানি ব্যবহার করতেন। খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গহনা ছিল আল-মুকতাদিরের (৯০৮-৯৩২)। তিনি বাগদাদের[৯৯] সবচেয়ে ধনী গহনার দোকানের মালিকের সমস্ত সোনাদানা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তিন হারুনের লাল চুনিপাথরটিও করায়ত্ত করেন। এছাড়া তি'ন মিসকাল (মিসকাল) ওজনের বিখ্যাত মুক্তাদানাটিও তিনি দখল করেন। এছাড়া বহু মূল্যবান পাথর তাঁর হেফাজতে ছিল। সবই দখল করা।[১০০]

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মূল্যবান ধাতুর খনি ছিল খুরাসানে। এই খুরাসানই সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, অভ্র[১০১] সরবরাহ করে পণ্যশিল্পের প্রসার ঘটিয়েছিল সেকালে। এছাড়া ট্রান্সঅক্সিয়ানা[১০২] অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল চুনিপাথর, নীলা, আশমানি পাথরে। কারমান থেকে প্রচুর সীসা এবং রূপা পাওয়া যেত।[১০৩] আল-বাহ্‌রাইন থেকে পাওয়া যেত মুক্তা।[১০৪] নায়সাবুর থেকে পাওয়া যেত নীলকান্তমণি। এই নায়সাবুরের খনিটি দশম শতাকের দ্বিতীয়ার্ধে বার্ষিক ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২০ দিরহাম মূল্যে ইজারা দেওয়া হয়।[১০৫] এছাড়া সানআ থেকে পাওয়া যেত গোলাপি লালপাথর।[১০৬] মাউন্ট লেবানন থেকে পাওয়া যেত লোহা।[১০৭] তিবরিজ থেকে পাওয়া যেত মার্বেল পাথর এবং চিনামাটি। ইসবাহান থেকে পাওয়া যেত নীলাভ শাদা রঙের এক প্রকার মূল্যবান পাথর।[১০৮] জর্জিয়া সমৃদ্ধ ছিল বিটুমিন এবং ন্যাপথার জন্য। সিরিয়া-প্যালেস্টাইনে[১০৯] মার্বেল পাথর এবং গন্ধকের প্রাচুর্য ছিল। ট্রান্সঅক্সিয়ানায়[১১০] অ্যাসবেসটস এবং ফরগনায়[১১১] পারদ, আলকাতরা এবং পিচ পাওয়া যেত।

● চাষবাস

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীই ছিল রীতিমতো কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ফলে এই আমলে দেশে চাষবাস যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত 'আল সাওয়াদ'

ছিল পলিসমৃদ্ধ সমভূমি অঞ্চল। এখানে প্রচুর চাষবাস হত। তা ছাড়া আব্বাসীয় খলিফারা বুঝেছিলেন যে, কৃষিকাজই রাষ্ট্রীয় আয়বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। সেকালে চাষবাস করতেন দেশীয় অধিকারীরাই। তাদেরই হাতে ছিল সমস্ত জমিজমা। আর এদের মর্যাদা আব্বাসীয় খলিফা শাসনে কিছুটা বেড়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মরু-অঞ্চল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। ওইসব এলাকায় মানুষজন পেয়েছিলেন পুনর্বাসন। ট্রাইগ্রিস—ইউফ্রেটিস উপত্যকার নিম্ন অঞ্চল ছিল মিশরের পরেই সবচেয়ে কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। এছাড়া 'ইডেনের বাগান' ছিল সাবেক কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। সরকারের নজরদারির ফলে এইসব অঞ্চল যথেষ্ট উন্নত হয়ে ওঠে। ইউফ্রেটিস থেকে পুরানো খালের সংস্কার অথবা নতুন খাল খনন করে উন্নত সেচব্যবস্থা[১১২] গড়ে তোলা হয়। প্রথম যে বড় খালটি কাটা হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয় 'নাহর ঈসা'। আল-মানসূরের এক আত্মীয় এই খালটি খনন করেছিলেন। খনন করে খালটির সাহায্যে বাগদাদের দিকে ট্রাইগ্রিসের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমদিকে আল-আনবারকে সংযুক্ত করা হয়। 'নাহর ঈসা'-র মূল শাখা ছিল সারা। এরপর দ্বিতীয় যে বৃহৎ খালটি কাটা হয় সেটির নাম ছিল 'নাহর সারসার'। এই খালটিকে আল-মাদাইন হয়ে টাইগ্রিসে প্রবেশ করানো হয়। তৃতীয় খালটির নাম ছিল 'নাহর আল-মালিক' (অর্থাৎ রাজার-নদী)। এটি আল মাদাইনের নিম্নমুখে টাইগ্রিস পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল।[১১৩] টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ছাড়া আরও যে দুটি নদী সেচকার্যে মুখ্য ভূমিকা নেয় সেদুটি হল নাহর কুথা এবং বৃহৎ সারা।[১১৪] এই দুটি নদী থেকেও একাধিক খাল কাটা হয়। 'দুজায়ল' (দিজলাহ্, টাইগ্রিসের ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ) নামে আরেকটি খাল গোড়ায় টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসের সংযোগকারী হলেও দশম শতকেই তা পলি জমা হয়ে বুজে যায়। পরে ওই নামে আরেকটি খাল কাটা হয়। এই খালটি আল-কাদিসিয়ার নিম্ন অঞ্চলে টাইগ্রিস থেকে প্রবাহিত হয়ে বেশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ফের টাইগ্রিসেই মিলিত হয়েছিল।[১১৫] 'নাহর-আল-সিলা' খালটির নামও উল্লেখ করা যায়। এটি-ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি আল মাহদীর[১১৬] -এর আমলে ওয়াসিতে খনন করা হয়। কোন খলিফা কোন কোন খাল খনন এবং পুনর্খনন করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন আরব ভূতাত্ত্বিকরা। দেখা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুনর্খনন করা হয়েছিল খালগুলি। এইসব খালের অস্তিত্ব ব্যাবিলনের যুগেও পাওয়া যায়। আল-ইরাক এবং মিশরে মূলত প্রাচীন ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করা হয়। এমন কী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যখন অটোমান সরকার 'আল-ইরাকের সেচ সমস্যা খতিয়ে দেখতে স্যার উইলিয়ম উইলককককে নিয়োগ করেন তখনও তিনি নতুন খাল খনন না করে পুরনো জলপ্রবাহগুলিকে পুনরুদ্ধারের সুপারিশ করেন।[১১৭] এবং উল্লেখ করা উচিত যে, আব্বাসীয় আমল থেকেই পলিসমৃদ্ধ 'সাওয়াদ' অঞ্চলের অবস্থায় বিশাল পরিবর্তন দেখা দেয়। টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস—এই দুই নদীই বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে তাদের গতিধারা বদলেছে।

আল-ইরাকে বার্লি, গম, চাল, খেজুর, তুলা, তিল এবং শন উৎপন্ন হত প্রচুর। পলিসমৃদ্ধ 'আল-সাওয়াদ' অঞ্চলে ফলমূল এবং শাকসবজি প্রচুর উৎপন্ন হত। গ্রীষ্ম এবং শীত—দুই

ঋতুর ফসলই হত। এখানে বাদাম, কমলালেবু, আখ, বেগুন, শিম এবং গোলাপ ও ভায়োলেট ফুল প্রচুর হত।

খুরাসান, আল-ইরাক এবং মিশরের মধ্যে কে কত কৃষিপ্রধান অঞ্চল তা নিয়ে রেষারেষি চলত। এক রাজস্ব প্রতিবেদনে জানা যায়, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সিংহভাগ কৃষিকর (খারাজ) এই তিন প্রদেশ থেকেই উঠত। পাশাপাশি ট্রান্সঅক্সিয়ানা এবং সিজিস্তান অঞ্চল ছিল বহু মানুষের যোগানদার। তাই আল-মামুন এই দুই অঞ্চলকে যখন 'পুরো সাম্রাজ্য' বলে অভিহিত করেন তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না।

আরব ভূতাত্ত্বিকদের মতে বুখারাকে ঘিরে যে অঞ্চল ছিল তাকে প্রকৃতই বাগান বলা যায়। বিশেষ করে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সামানি-আমলে এই অঞ্চল সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল। এখানে সমরকন্দ এবং বুখারার মাঝামাঝি অঞ্চলে ছিল ওয়াদি আল-সুগদ (সগদিয়ানা উপত্যকা) পৃথিবীর চারটি স্বর্গের মধ্যে এটি একটি—এমন প্রবাদ ছিল। বাকি তিনটি 'পৃথিবীর স্বর্গ' ছিল শিয়্যাব বাওয়ান (ফারিসের অন্তর্ভুক্ত বাডভান-এর উন্মুক্ত ভূমি), আল-বসরা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত উবাল্লা খালের নিকটস্থ বাগান এবং দামাস্কাসের ফলবাগান (গুতাহ্)। এইসব বাগানে নানাধরনের ফুল ফল, শাকসবজি, ফলত। গাছে গাছে ভরে থাকত খেজুর, আপেল, খুবানি, পিচফল, কিসমিস, পাতিলেবু, কমলালেবু, আঙুর, লবঙ্গ, আতা, বেগুন, শশা, মূলা, ডুমুর। ফুটে থাকত গোলাপ। আর ছিল প্রচুর পুদিনা (রাইহান) গাছ। আল-মামুন এবং আল-ওয়াসিকের রাজসভায় বরফে আচ্ছাদিত বাক্সে ভরে তরমুজ আসত খওয়ারিজম থেকে। এইসব ফল বাগদাদে প্রতিটি ৭০০ দিরহাম দামে বিক্রি হত। এখন মধ্যপ্রাচ্যে যেসব ফল এবং শাকসবজি পাওয়া যায় সেসময় সবই পাওয়া যেত। শুধু আম, আলু, টমাটো এবং এই ধরনের কিছু সবজি পরে আমেরিকা এবং দূরবর্তী ইউরোপীয় কলোনি থেকে আমদানি শুরু হয়। পাতিলেবু এবং কমলালেবু—দুই গাছই ভারত বা মালয় থেকে মধ্য এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরের অববাহিকা অঞ্চলে যায়। পরে তা স্পেনের আরবদের মারফৎ চলে যায় ইউরোপেও। ফারিস এবং আল আহওয়াজ থেকে আখ চাষ ছড়িয়ে পড়ে সিরীয় উপকূল অঞ্চলে। সেখান থেকে ইউরোপে যায় চিনি এবং আখ। এভাবেই সম্ভবত বাংলাদেশে জাত এই মিষ্টি পদার্থটি (চিনি) সভ্য মানুষের দৈনন্দিন খাবারের অপরিহার্য উপাদান হয়ে পশ্চিমাভিমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

সেকালে শুধু ফল এবং শাকসবজির মধ্যেই বাগানচর্চা সীমিত ছিল না। ফুলচাষও অনেক উন্নত করা হয়। শুধুমাত্র বাড়ির ছোট বাগানে ঝর্ণার চারপাশে সাজানো ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসায়িকভাবে বড়সড় পরিধিতে বাগানচাষ শুরু হয়। গোলাপ থেকে সুগন্ধি এবং নির্যাস তৈরি করা হয়। জলপদ্ম, কমলা, ভায়োলেট ফুল চাষ করা হয় দামাস্কাস, শীরাজ, জুর এবং অন্য শহরে। সমগ্র জুর অথবা ফারিসের ফিরোজাবাদে 'আতর' (আরবী 'ইত্‌র' থেকে এসেছে) তৈরি হত। জুরের গোলাপজল চীন এবং আল মাগ্রিবে রপ্তানি হত। ফারিস শহরে ৩০ হাজার বোতল গোলাপ নির্যাস [illegible] বাগদাদের খলিফাকে [illegible]

সাবুর (পারসি 'শাপুর' থেকে এসেছে) এবং তার সংলগ্ন উপত্যকায় অন্তত দশরকম বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধি তেল অথবা মালিশ তৈরি হত। ভায়োলেট, জলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, ড্যাফোডিল, পামফুল, মারজর‍্যাম, মেহেদিফুল, পাতিলেবু গাছের ফুল এবং কমলালেবু গাছের ফুল থেকে এইসব তেল তৈরি করা হত।[151] এর মধ্যে মুসলিম বিশ্বে ভায়োলেট ফুলের নির্যাসের দারুণ কদর ছিল। স্বয়ং মুহাম্মাদের মুখের কথা থেকেই এটা প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেছিলেন : ভায়োলেট ফুলের নির্যাস আমার কাছে দুনিয়ার অন্যান্য সব ফুলের নির্যাসের থেকে প্রিয়।[152]

ফুলের মধ্যে গোলাপফুল সবারই প্রিয় ছিল বলে মনে হয়। সংস্কৃতিবান ক্রীতদাসী তাওয়াদুদ মনে করতেন, গোলাপ এবং ভায়োলেট হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি। আর বেদানা এবং জামির লেবু (বাতাবি) হল সেরা ফল। সেরা সবজি হল স্যালাডে ব্যবহৃত এক ধরনের পাতা (ধনে পাতার মতো)।[153] তাওয়াদুদের মতকে জনমতের সূচক হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ দশম এবং দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর মতই জনমত বলে বিবেচিত হত। গোলাপফুল সম্পর্কে মুহাম্মাদ বলেছেন : আমার নৈশযাত্রার (মি'রাজ) ঘাম থেকে তৈরি হয়েছে শাদা গোলাপফুল। আর লাল গোলাপ তৈরি হয়েছে—গ্যাব্রিয়েলের ঘাম থেকে এবং আল-বুরাকের ঘাম থেকে হয়েছে হলুদ গোলাপ।[154] আল-মুতাওয়াক্কিল বলেছিলেন, আমি সুলতানদের রাজা। আর গোলাপ হচ্ছে মিষ্টগন্ধী ফুলের রাজা। খলিফা মুতাওয়াক্কিল গোলাপচাষে এত একাধিপত্য কায়েম করেছিলেন যে, তাঁর প্রাসাদ ছাড়া অন্য কোথাও গোলাপ দেখাই যেত না সেসময়ে।[155]

গোলাপ এবং ভায়োলেটের সঙ্গে আবার মেহেদি ফুলের রেষারেষি রয়েছে। মুহাম্মাদের বাণী হিসেবে বলা হয়, আদমকে তিনটি বস্তু সমেত স্বর্গ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তিনটি বস্তু হল : এক মেহেদি গাছ যার 'গন্ধরাজ' ফুল ছিল পৃথিবীর সব ফুলের সেরা। এক দানা গম, যা পৃথিবীর সেরা খাদ্যশস্য। একটি খেজুর, যা পৃথিবীর সর্বকালের সেরা ফল।[156] অন্যান্য পছন্দসই ফুলের মধ্যে ছিল নারসিসাস বা ড্যাফোডিল জাতীয় ফুল, লিলিফ্লাওয়ার বা লবঙ্গগন্ধী ফুলবিশেষ, যুঁই, আফিম এবং স্যাফ্লাওয়ার বা লোধ্র জাতীয় ফুল।

সেকালে কোন ফুলের কেমন কদর ছিল, কোন ফুলের চাষে কৃষকরা আগ্রহী ছিলেন তার নিদর্শন কিছু বইতেও পাওয়া যায়। গ্রিকদের অনুবাদ করা কিছু গ্রন্থ, 'ফিহ্‌রিস্ত'[157], আতর[158] এর ওপর লেখা কিছু বই এবং ইব্‌ন-ওয়াহ্‌শিয়ার লেখা 'আল-ফিলাহাহ্‌ আল-নাবাতিয়াহ্‌' তে এ সম্পর্কে অনেক লেখা রয়েছে।

● যিম্মী : খ্রিস্টান

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার সিংহভাগই ছিলেন কৃষক। মূল রাজস্বদাতা ছিলেন জমির মালিকরা; পরে এই নাম হয় যিম্মী। আরবরা চাষবাসকে পেশা হিসেবে বেছে

নেওয়াকে মর্যাদাহানিকর বলে মনে করত। মূলত খ্রিস্টান, ইহুদি এবং স্যাবিয়ানরা ছিলেন আহ্‌ল কিতাব বা গ্রন্থধারী শ্রেণীভুক্ত। পরে খ্রিস্টান বা যিম্মীদের পদমর্যাদা অনেক বিস্তৃত হয়েছিল। জরথুস্ত্র-পন্থি, মানিপন্থি, হাররান, স্যাবিয়ানরা এবং অন্যরা শেষপর্যন্ত খ্রিস্টান হয়ে যায়! তখন এদের সকলকে একই ধর্মমতাবলম্বী হিসেবে মনে করা হত। গ্রামাঞ্চলে এবং কৃষিখামারে এই যিম্মীরা প্রাচীন সাংস্কৃতিক কাঠামোকেই আঁকড়ে জীবনযাপন করতেন। কথাও বলতেন নিজেদের সাবেক ভাষায়। সিরিয়ায় যিম্মীদের কথ্য ভাষা ছিল আরাম এবং সিরীয় ভাষা। আল-ইরাকেও তাই। পারস্যে ইরানি ভাষা। মিশরে মিশরিয় খ্রিস্টানদের স্বতন্ত্র ভাষা। এদের অনেকেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে শহরে চলে আসে।

এমন কী শহরগুলিতেও খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ পেশা গ্রহণ করেন। কেউ করণিকের পদ গ্রহণ করেন, কেউ বা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানে বিরাজ করতেন। খ্রিস্টান—ইহুদিদের এই অগ্রগতি সাবেক মুসলমানদের সবাই ভাল চোখে দেখতেন না। অনেকে এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। এজন্য সরকারি কিছু বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁদের অধিকার চিহ্নিত করে দিতে হয়। তবে সেসব ছিল নিতান্তই 'কালি-কাগজে' সীমাবদ্ধ। তা কার্যকরী হত কমই।

আমরা জানি, প্রথম খলিফা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাদের কেমন পোশাক পরতে হবে তা-ও ফতোয়া জারি করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। উমাইয়া সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধার্মিক খলিফা বলে যার খ্যাতি ছিল সেই দ্বিতীয় উমারই খ্রিস্টান-ইহুদিদের ভদ্রোচিত পোশাক পরার পরোয়ানা জারি করেন। এছাড়া তাদের জন্য সরকারি চাকরির দুয়ার বন্ধ করে দেন। এই দ্বিতীয় উমারের অনেক সিদ্ধান্তই প্রথম উমারের সিদ্ধান্ত বলে গুলিয়ে ফেলেন ইতিহাসবিদরা। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের খলিফাদের মধ্যে হারূনই প্রথম এইসব নিয়ন্ত্রণ পুনরায় জারি করেন। ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সীমান্ত এলাকায় নির্মিত সমস্ত গির্জা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া মুসলিম দখলে আসার পর যেখানে যত গির্জা তৈরি হয়েছে তা-ও ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তিনিও যিম্মীদের কেমন পোশাক পরতে হবে তা ঠিক করে দেন।[১৮৭] আল-মুতাওয়াক্কিলের আমল পর্যন্ত যিম্মী বিরোধী এইসব আইন টিকে ছিল। তিনি ৮৫০ থেকে ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এমন নির্দেশ দেন যে, খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের ঘরে কাঠের শয়তান মূর্তি রাখতে হবে। তাদের কবরস্থান উঁচু করলে চলবে না। তা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হতে হবে। একমাত্র হলুদ রঙের পোশাকই পরা যাবে। যিম্মীরা তাদের দাসদের পোশাকে দুটি হলুদ রঙের চিহ্ন দিতে পারতেন। একটি পিঠে এবং অন্যটি সামনে। যিম্মীরা শুধু গাধা এবং খচ্চরের পিঠে চড়তে পারবেন। ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারবেন না। তা-ও গাধা বা খচ্চরের পিঠে ওঠার পাদানি কাঠের হতে হবে এবং তার দুদিকে বেদানার আয়তনের দুটি বল থাকতে হবে। এই স্বতন্ত্র পোশাকের জোরেই কিন্তু যিম্মীরা বিশেষভাবে চিহ্নিত হতে

সক্ষম হলেন। এর পাশাপাশি সেকালে মুসলিম বিচারকরা রায় দেন যে, কোন মামলায় মুসলমানের বিরুদ্ধে ইহুদি বা খ্রিস্টানদের সাক্ষ্যদান গ্রাহ্য হবে না। এই রায় যিম্মীদের হতাশ করে তোলে। এর কারণ হল, কোরানে অভিযোগ করা হয়েছে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থে রদবদল করেছে। সুতরাং তারা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ৯৯৬-১০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাতেমিয় শাসক ছিলেন যিনি সেই খলিফা আল-হাকিম পর্যন্ত এই নির্দেশ কঠোরভাবে জারি করেন।

এইসব বিধিনিষেধ সত্ত্বেও যিম্মীরা যে খলিফাদের আমলে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন তারও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মু'আবিয়া, আবদ-আল মালিকের সময় এবং আব্বাসীয় আমলেও যিম্মীদের অধিকার নিয়ে বহু ধর্মীয় বিতর্ক হয়। ৭৮১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল মাহদীর কাছে খ্রিস্টান সমাজের হয়ে নেস্টোরপন্থি ধর্মগুরু টিমোথি যে ক্ষমতাপত্র পেশ করেন তা আমরা দেখেছি। এছাড়া ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে আল-মামুনের আমলে খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মের তুলনামূলক যে বিতর্ক হয় তাও জানা গেছে। এর মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে আল-কিন্দি বিরচিত প্রখ্যাত গবেষণা-সন্দর্ভে। আলী আল-তাবারী (মৃ. ৮৫৪ খ্রিঃ) তার 'কিতাব আল দিন অ-আল দাওলা' পুস্তকে যে ধর্মীয় আলোচনা করেছেন তাতে প্রায় সরকারি বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সহযোগিতায় লেখা এই পুস্তকে খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট সংযত। কোথাও খ্রিস্টান বিদ্বেষ বা মুসলিম ভাবাবেগ প্রশ্রয় পায়নি। বহু ক্ষেত্রে সিরীয় অনুবাদ অথবা প্রাচীন আরবী অনুবাদের ভিত্তিতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। আল-নাদিম যখন তার 'ফিহ্‌রিস্ত' (৯৮৮) পুস্তকটি লেখেন তখন আরবী ভাষায় বাইবেলের ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, খলিফা হারুনের আমলে জনৈক আহমাদ ইব্‌ন-আবদুল্লা ইব্‌ন সালাম বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন আরবী ভাষায়। সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাইবেলের কিছু অংশ সিরীয় থেকে আরবী বা গ্রিক থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয় বলে জানা গেছে। আল-তাবারী জানাচ্ছেন, হিজরী সন ৬১ অব্দে মিশর বিজয়ীর পুত্র আবদুল্লা বাইবেলের ড্যানিয়েলের কাহিনী পড়েছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আরবী অনুবাদ করেছিলেন মিশরের সাঈদ আল-ফায়্যুমি (সাদিয়া গাঁও ৮৮২-৯৪২)। এখনও আরবীভাষী ইহুদিদের মধ্যে এই পুস্তক প্রচলিত। এই অনুবাদ ওল্ড টেস্টামেন্টের বিতর্কিত বিষয়ে মুসলমানদের আগ্রহ বাড়িয়েছিল। আমরা জানি, আরও অনেকের সঙ্গে আল-জাহিজও (মৃ. ৮০৯ খ্রিঃ) খ্রিস্টানদের তোলা বিতর্কের জবাব দিতে কলম ধরেন। নবম শতকের শেষদিকে খ্রিস্টান উজিরও নিয়োগ করা হয়। আবদূন ইব্‌ন সাঈদ ছিলেন খ্রিস্টান উজির। তার সম্মানে বাগদাদের এক বিচারক প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে ওঠেন। তাতে আদালতের অন্য লোকজন অত্যন্ত বিরক্ত হন। আল-মুত্তাকির (৯৪০-৪৪) এক খ্রিস্টান উজির ছিলেন। পূর্ব দিকের [illegible] মধ্যেও একজন খ্রিস্টান ছিলেন [illegible] আল-মুক্তাদিরের ([illegible]) [illegible]

দপ্তরের[১৫২] প্রধান ছিলেন একজন খ্রিস্টান। এইসব উচ্চ পদমর্যাদার খ্রিস্টানরা মুসলিম পদাধিকারীর মতোই সমান সম্মান পেতেন। তবে খ্রিস্টানরা অভ্যাসবশত পরিচয় হলেই যে হাতে চুম্বন করতেন, তা কিছু মুসলমান করতেন না। খলিফাদের অধিকাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসকই ছিলেন নেস্টোরপন্থি খ্রিস্টান। সম্প্রতি এক সুরক্ষা সনদে প্রকাশ পেয়েছে, আল-মুক্তাফির[১৫৩] আমলে (১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে) নেস্টোরপন্থিদের সুরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, সেকালে সরকারি মুসলিমদের সঙ্গে সরকারি খ্রিস্টানদের সম্পর্ক কত আন্তরিক ছিল।

● নেস্টোরপন্থিরা

আব্বাসীয় খলিফাদের খ্রিস্টান প্রজন্মের বেশিরভাগই সিরিয়ার দুটি গির্জার অনুগামী ছিলেন। এরা সাধারণভাবে জ্যাকোবপন্থি এবং নেস্টোরপন্থি হিসেবে বিভক্ত ছিলেন। আল ইরাকে আধিপত্য ছিল নেস্টোরপন্থিদেরই। নেস্টোরপন্থিদের ধর্মগুরু বা ক্যাথলিক নেতার (অপভ্রংশ হয়ে আরবী ভাষায় জাথিলীক বা জ্যাথালীক) বাগদাদে বাস করার অধিকার ছিল। এই অধিকারের জন্য জ্যাকোবপন্থিরা আগাগোড়া আর্জি করেও ব্যর্থ হন। এই নেস্টোরপন্থি ধর্মগুরুদের ঘিরে গড়ে ওঠে দায়র আল রূম'[১৫৪] (রোমানদের ধর্মীয় মঠ)। বাগদাদে এভাবে এক খ্রিস্টান আবাসই গড়ে ওঠে, যার নাম ছিল 'দার (বাসভবন) আল-রূম'। ক্যাথলিকদের এক্তিয়ারে সাতটি বড় শহর বিস্তৃতি লাভ করে। এই বড় শহরগুলি ছিল আল-বসরা, আল মাওসিল এবং নাসিবিন (নিসিবিস)। প্রতিটিতে দু বা তিনজন বিশপ থাকতেন। নেস্টোর ধর্মগুরু হিসেবে যিনি নির্বাচিত হতেন তিনি খলিফার স্বীকৃতি পেতেন। খলিফাই তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানদের প্রধান হিসেবে মেনে নিতেন। ৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিকরা খলিফাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে জ্যাকোবপন্থি ধর্মগুরুর-বাসস্থান অ্যান্টিয়োক থেকে বাগদাদে স্থানান্তর আটকান[১৫৫]। জ্যাকোবপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রধান রাজনৈতিক অভিযোগ ছিল এই যে তারা বাইজানটাইনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু জ্যাকোবপন্থিদের বাগদাদে একটি মঠ ছিল।[১৫৬] বাগদাদের অদূরেই তাকরীতে তাদের একটি আবাসন ছিল। সব মিলিয়ে ইয়াকুত,[১৫৭] শুধু 'পূর্ব বাগদাদেই ৬টি খ্রিস্টান মঠের তালিকা দিয়েছেন। এছাড়া পশ্চিম বাগদাদে তো আরও মঠ ছিলই।

মিশরি খ্রিস্টানরা ছিলেন জ্যাকোবপন্থি। এই জ্যাকোবপন্থিদের অনুসরণ করেই চলত ন্যুবিয়ান গির্জাগুলি। তারা আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মগুরুকে প্রধান আচার্য হিসেবে স্বীকার করত। মিশরের পশ্চিম উপকূল বরাবর বার্বার উপজাতিদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ছিল।

খলিফা শাসনে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, নিজেদের রীতিমতো আক্রমণাত্মক করে তুলতে তাদের [illegible]

পাঠাতে দ্বিধাবোধ করেননি। আল-নাদীম[১৫৮] লিখে গেছেন এক চমৎকার সাক্ষাৎকারের কথা। তিনি নিজেই চীনফেরত এমন এক মিশনারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাগদাদের খ্রিস্টান আবাসে[১৫৯] তিনি ওই মিশনারির সঙ্গে দেখা করেন। ৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ৬৭ জন নেস্টোরপন্থি[১৬০] মিশনারির স্মরণে চীনের সিয়ানফুতে বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। এই সঙ্গে ভারতে খ্রিস্টান গির্জা অনুমোদন-উপযাপনও করা হয। মালাবারের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সেন্ট টমাসের এক গির্জা স্থাপিত হয় একই সময়ে। এসব থেকেই বোঝা যায় মুসলিম শাসন হলেও পূর্ব সিরিয়ায় গির্জা তৈরির প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল তখন। এটাও জানা গেছে যে, বর্তমানে মঙ্গোলীয় এবং মাঞ্চু দেশীয় যে খ্রিস্টানরা রয়েছেন তাঁরা ইগুরি বংশজাত। 'ইগুরি' শব্দটি নিশ্চিত সিরীয় বর্ণমালা থেকেই জাত। নেস্টোরপন্থিদের হাতে অপভ্রংশ হয়ে শেষে এমন বদলে গেছে।

● ইহুদিরা

ইহুদিরা ছিলেন সেকালে সবচেয়ে সুরক্ষিত মানুষজন। সেদিক দিয়ে তারা খ্রিস্টানদের থেকেও স্বচ্ছন্দ্যে থাকতেন। অবশ্য ইহুদিদের সম্পর্কে কিছু বিদ্বেষমূলক কথা কোরানেই রয়েছে।[১৬১] আসলে তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন কম। তাই কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াননি। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আল-মাকদিসি-র[১৬২] বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে, ওইসময়ে সিরিয়ার অধিকাংশ লগ্নিকারী এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীই ছিলেন ইহুদি। বিপরীতে কেরানি এবং চিকিৎসকরা ছিলেন খ্রিস্টান। বহু খলিফার আমলেই, বিশেষত আল-মুতাযিদের সময় (৮৯২-৯০২) আমরা রাজধানীতে এবং প্রদেশগুলিতে একাধিক ইহুদির কথা জানতে পারি, যারা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে ছিলেন। শুধু বাগদাদেই ইহুদিদের একটি বড়সড় কলোনি[১৬৩] ছিল। বাগদাদের পতনের আগে পর্যন্ত এই কলোনি ক্রমেই ফুলেফেঁপে ওঠে। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুদেলার[১৬৪] বেঞ্জামিন ওই কলোনিতে সফরে আসেন। তিনি ওই কলোনি ১০ টি রব্বিদের শিক্ষা সংস্থা এবং ২৩টি[১৬৫] ইহুদি উপাসনালয় দেখেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপাসনালয়টি ছিল আগাপাশতলা মার্বেল পাথরে মোড়া। উপাসনালয়ের বিভিন্ন জায়গায় সোনা এবং রূপা দিয়ে কারুকার্য করাও ছিল। বেঞ্জামিনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই উপাসনালয়ের ব্যাবিলনীয় ইহুদিদের প্রধান ছিলেন ডেভিড-এর বংশধর। কার্যত সকল ইহুদিদের প্রধান হিসেবে ওই উপাসনালয়ের প্রধান বাগদাদের খলিফার আনুগত্য লাভ করতেন। আরাম ভাষায় ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধানকে বলা হয় রেশ গালুতা, বন্দিত্ব[১৬৬] অথবা নির্বাসিতের রাজপুত্র। ক্যাথলিকরা যেমন সমস্ত খ্রিস্টানদের প্রতিই কিছু ধরনের কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা করত তেমন ব্যাবিলনীয়রা এই নির্বাসিত ধর্মগুরুও তার সমধর্মীদের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করতেন। এই 'নির্বাসিত' যুবরাজ বেশ সচ্ছল জীবনযাপন করতেন। তাঁর বাগান, ঘরদোর এবং প্রচুর চাষবাস ছিল। খলিফার কাছে যাওয়ার সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরোতেন তখন তাঁর পরনে

থাকত কারুকার্যকরা রেশমি পোশাক। মাথায় থাকত শাদা উষ্ণীষ। তাতে ঝলমল করত মণিমাণিক্য। আর তাঁকে অনুসরণ করত এক অশ্বারোহী বাহিনী। তাঁর কনভয়ের আগে একজন ঘোষক এমন ঘোষণা করতে-করতে যেত : ডেভিড-পুত্র আমাদের প্রভু আসছেন। তাঁর যাত্রাপথ পরিষ্কার রাখুন।

● স্যাবিয়ান

আরবীয় লেখকদের কাছে মান্দাইনরা[১৬৭] প্রকৃত স্যাবিয়ান[১৬৮] হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এরা আদতে ছিল ইহুদি-খ্রিস্টান সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক সম্প্রদায়। এদের ন্যাসোরেইদ ইয়াহিয়া বা ন্যাসোরিয়ান্স [১৬৯] নামেও ডাকা হত। অর্থাৎ সেন্ট জনের অনুগত। এর ফলেই আধুনিক জগতে ভ্রান্তভাবে এরা সেন্ট জনের (ব্যাপটিস্ট) খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছেন। মান্দাইনরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয় জন্মগ্রহণের পরই, বিয়ের আগে এবং অন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এরা ব্যাবিলনের নিম্ন অঞ্চলে থাকতেন। খ্রিস্টের জন্মের একশত বছর পরে তারা পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। হয়তো অন্য ব্যাপটিস্ট এবং এদের প্রকৃত বাসভূমি ছিল প্যালেস্টাইনে। এদের ভাষা ছিল মান্দাইক। 'আরাম'-এর কথ্যভাষাই ছিল মান্দাইক। আর বর্ণমালা ছিল অনেকটা সাবেক আরবের নাবাতিয়ান এবং স্পেনের প্যালমিরিন ভাষার কাছাকাছি। কোরানে তিনবার উল্লেখ আছে এই স্যাবিয়ানদের কথা। এই ব্যাবিলনীয় স্যাবিয়ানরা যিম্মীর মর্যাদা ভোগ করতেন আব্বাসীয় আমলে। শুধু তাই নয়, তারা এক সুরক্ষিত সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের দ্বারা বিভাজিত হয়েছিল। ফিহ্‌রিস্ত[১৭০] বলছে, তখনকার যুগের মুগ্‌তাসিলাহ্ সম্প্রদায় (যারা নিজেদেরকে ধোয়াধুয়ি করত) পর্যন্ত এই স্যাবিয়ানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা আল-ইরাকের নিম্ন অঞ্চলে থাকত। এখনও এই মুগ্‌তাসিলা সম্প্রদায়ের প্রায় হাজার পাঁচেক লোক আল-বসরার কাছে বাস করে। নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে এরা বাস করে। কারণ কাচাকাচি করতে জল আবশ্যিক। আধুনিক বাগদাদে স্যাবিয়ান বলতে বোঝায় রূপার কারিগর এবং মিনা[১৭১] নির্মাতাদের।

আবার এই ব্যাবিলনীয় স্যাবিয়ানদের সঙ্গে হাররান[১৭২] এর মেকি স্যাবিয়ানদের ফারাক অনেক। আরবীয় লেখকরা দুই সম্প্রদায়কে অনেক সময়ই এক ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। হাররান-এর স্যাবিয়ানরা মূলত নক্ষত্রের পূজারি অর্থাৎ জ্যোতিষী। মুসলিম শাসনে এরা কোরানের অনুগ্রহ পেতে 'স্যাবিয়ান' তক্‌মা নেয়। আর সেই থেকেই এরা এই নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও এই স্যাবিয়ানরা খলিফার রাজপ্রাসাদের আশপাশেই বসতি গড়ে সংখ্যায় বেড়ে ওঠে। মঙ্গোলীয়রা এদের শেষ ধর্মস্থান ধ্বংস করে দেয়। নিঃসন্দেহে এদের অনেকের পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক গুণই এদের মুসলিম শাসনেও সুরক্ষা[১৭৩] পেতে সাহায্য করেছিল। সাবিত-এর পুত্র সিনানকে খলিফা আল-কাহিরই জোর করে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। এছাড়া স্যাবিয়ানদের অন্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের

মধ্যে ছিলেন আবু-ইসহাক ইব্ন হিলাল আল সাবি। আল-মুতি (১৪৬-৭৪) এবং আল-তাই (৯৭৪-৯১) এর সচিব ছিলেন উপরোক্ত ব্যক্তি। বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন আল-বাত্তানি। নাবাতিয়া চাষবাস নিয়ে বই লিখেছিলেন ইব্ন ওয়াহ্শিয়া। তিনিও স্যাবিয়ান। এছাড়া জাবির ইব্ন হায়্যানও সম্ভবত ছিলেন বিখ্যাত স্যাবিয়ান রসায়নবিদ। শেষোক্ত তিনজনই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

● প্রাচীন পারস্যের পুরোহিত সম্প্রদায় (ম্যাজিয়ান) এবং অন্য দ্বৈতবাদীরা

কোরানে মাত্র একবারই (২২:১৭) জরথুস্ট্রবাদীদের (মাজুস) কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মুহাম্মাদ তাঁদের আহ্ল্ কিতাব বা গ্রন্থধারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতে পারেননি। তবে হাদীসে এবং মুসলমান আইনবিচারকদের কাছে তাঁরা ওই হিসেবেই পরিচিত। 'স্যাবিয়ান' বলতে তাদেরই বোঝানো হত। আমরা আগে দেখেছি, বাস্তব রাজনীতি এবং যুক্তির খাতিরে সরকার সেকালের এক বিশাল জনতাকে 'যিম্মী' মর্যাদায় ভূষিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিশাল জনতা থাকতেন ইরানে। ইসলামিরা ইরান দখলে আনার পরও জরথুস্ট্রপন্থা সেদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বিরাজ করত। এদের অগ্নিমন্দির শুধু ইরানের সমস্ত প্রদেশেই নয়, আল-ইরাকে, ভারতে এবং পারস্যের পূর্বাঞ্চলেও সসম্মানে টিকে ছিল। ভারতে জরথুস্ট্রপন্থিদের যে শাখা দেখা যায়, তারা মূলত পারসি। এদের পূর্বপুরুষ পারস্য থেকে চলে যান অষ্টম শতকের গোড়ায়। জরথুস্ট্রবাদে অনুপ্রাণিত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ইব্ন-আল-মুকাফ্‌ফা। ইসলামি ধর্মতত্ত্বের গোড়ার পর্বে এই ধরনের কিছু স্তর উঠে আসে হয় দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে অথবা ওই দ্বৈতবাদেরই ধ্যানধারণা নকল করে।

মানিপন্থিদের (ম্যানিকিয়ান) প্রথমে খ্রিস্টান বা জরথুস্ট্রবাদী বলে গুলিয়ে ফেলতেন মুসলমানরা। পরে এই মানিপন্থিরা এক সহিষ্ণু সম্প্রদায়ের মর্যাদা পায়। পারস্যের মহাপুরুষ মানি (মৃ. ২৭৩ বা ২৭৪ খ্রিস্টাব্দে) এবং তার ধর্মমতের প্রতি মুহাম্মাদের শিষ্যদের এক অন্য আকর্ষণ ছিল। তাই আমরা দেখি খলিফা আল-মাহদী এবং আল-হাদী এই প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এমন কী 'উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ খলিফাও, যার শিক্ষাগুরু 'জিন্দিক' হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, মানির মতবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে সন্দেহ করা হত। ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আল-মাহ্দী আলেপ্পোতে একাধিক রহস্যময় মানিপন্থিকে হত্যা করেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দু'-বছরে বাগদাদে মানিপন্থিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। আল-হাদী তাঁর পূর্বসূরিদের শুরু করা জেহাদ চালিয়ে যান। আল-রশীদ আবার মানিপন্থিদের মতো দ্বৈতবাদীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে এক বিশেষ অফিসার নিয়োগ করেন। এত নির্যাতন সত্ত্বেও বহু মানিপন্থি এবং সাম্যবাদী মাজদাপন্থিরাও সেকালে টিকে ছিল। কোরানে যদিও পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে কোন

আপসের স্থান নেই, বাস্তবে ইসলামধর্ম কিন্তু এই ব্যাপারে চোখ বুজেই ছিল। উভয় আফ্রিকা এবং মধ্য এশিয়ার কিছু ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ইসলামের চৌহদ্দিতে থেকেও কিন্তু এই প্রশ্নে বিরুদ্ধাচরণ করত। জনপ্রিয়তা নষ্টের কথা ভেবে মুসলিম নেতারা তাদের বিরোধিতায় মাথা ঘামায়নি। তা ছাড়া ভারতেও পৌত্তলিকবাদীদের নির্মূল করতে সাহস দেখাননি তাঁরা।

● সাম্রাজ্যের ইসলামিকরণ

তথাকথিত 'মুসলিম বিজয়' বলতে গোঁড়া খলিফারা বুঝতেন আরব অস্ত্র এবং আরব জাতির বিজয়। এভাবেই পারস্যের ফৌজি এবং রাজনৈতিক অধীনতা করায়ত্ত হয়েছিল তাঁদের। পারস্যের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকাও এভাবে দখল করেছিলেন তাঁরা। আব্বাসীয় আমলের প্রথম শতকে অন্য দেশ বিজয় এক নতুন ধারনার সৃষ্টি করে। তখন আর শুধু দেশ দখল নয়, ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়ানোও মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যেই দেশ বিজয়ের পর সেই দখলীকৃত দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অথচ উমাইয়া শাসনকালে সিরিয়া রাজনৈতিকভাবে অধিকৃত হলেও খ্রিস্টানধর্ম এবং ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখেছিল। আল-রশীদ এবং আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে পক্ষপাতমূলক আইন থাকার ফলে নতুন করে ধর্মান্তরিত হওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে বলপূর্বক ধর্মান্তরের ঘটনা এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেছিল। বানু-তানুখের ৫,০০০ খ্রিস্টানের কাছে গিয়ে খলিফা আল-হাদী নির্দেশ দিয়েছিলেন ধর্মান্তরের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধর্মান্তরিত হন।[১৮৪] সাধারণভাবে ধর্মান্তবিত করার প্রক্রিয়া ছিল শান্তিপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী। তবে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন ছিল। সত্যি বলতে কী, নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই সবাই এতে ঝুঁকছিলেন। অন্য পথ ছিল, নিজেকে দুর্বল প্রতিপন্ন করা, বার্ষিক নজরানা দিতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি। সে পথে না গিয়ে সকলেই সামাজিক মর্যাদা পেতে, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেতে এবং বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে, সর্বোপরি নিরাপত্তার জন্য ধর্মান্তরিত হয়ে যেতেন।

পারস্য আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পর তৃতীয় শতক পর্যন্ত ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার হিড়িক পড়েনি। তখনও পারস্যের জনসংখ্যায় হাজার নয়েক জরথুস্ট্রপন্থি ছিলেন। দশম শতকের গোড়ার আল-ইরাকের উত্তরাঞ্চলের জনসংখ্যা নামেই ছিল মুসলিম, কিন্তু চরিত্রগত ভাবে ছিল খ্রিস্টান। এই কথাটি বলেছিলেন ইব্‌ন-আল-ফকীহ্।[১৮৫] লেবাননে আজও বেশ বড় অংশ খ্রিস্টান রয়ে গেছেন। মিশরের বহু লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই মিশরই বেশ সহজে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। মিশরি খ্রিস্টানরা আজও রয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে। ষষ্ঠশতকের মধ্যভাগে নুবিয়ানের মানুষরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। দ্বাদশ শতকেও[১৮৬] তাঁরা খ্রিস্টানই ছিলেন। এমন কী চতুর্দশ শতকের[১৮৭] শেষার্ধে তাঁরা তাই ছিলেন। ওই সময় বার্বার জাতি এবং বহু উত্তর আফ্রিকাবাসী ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আল-কায়রাওয়ান প্রতিষ্ঠার পর ওই প্রদেশকে মুসলিম ফৌজি বাহিনীর স্থায়ী

সামরিক ঘাঁটি এবং ইসলামি প্রভাব-বিস্তারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তী শতকে নতুন ভাবে পরিকল্পনা করে বার্বার জাতির লোকজনকে ইসলামি সেনাবাহিনীতে স্থান দেওয়া হয়। এভাবে যুদ্ধের দখল করা জিনিসপত্র ভাগ পাওয়ার মস্ত সুযোগ দিয়ে তাদের মন জয় করে ফেলেন মুসলিম শাসকরা। বার্বাররাই ইসলামি সেনাবাহিনীর মূল শক্তিতে পরিণত হয়। এদের জোরেই ইসলামি সেনা পশ্চিম আফ্রিকার বিজয় সম্পূর্ণ করে স্পেনে নিজেদের শাসন কায়েম করে। কিন্তু আরবদের জয়ের তিন শতক পরেও আমরা স্পেনে দেখেছি সেখানে গির্জায় ৪০ জন[১৮৮] বিশপ আছেন, যা একসময় ৫০০ জন ছিল। দেখা যাচ্ছে দ্বাদশ শতকের আগে পর্যন্ত ইসলামের পূর্ণ বিজয় সম্ভব হয়নি। অবশ্য আলজেরিয়ার কিছু কাবাইলস (আরবী শব্দ কাবায়িল থেকে জাত ; অর্থ, উপজাতি) ওই সময় আন্দালুস প্রদেশীয় মুর উপজাতির ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের পর তাদের বিতাড়িত করা হয়।

● আরবী ভাষার জয়

জয়ের তৃতীয় স্তরে মুসলিম শাসকরা আরবী ভাষার প্রসার এবং আধিপত্য বিস্তারে জোর দিয়েছিলেন। এই স্তর ছিল শেষ স্তর এবং তা চলে মন্থরগতিতে। আরবী ভাষার এই আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে কিন্তু দখলীকৃত দেশের মানুষজনের পক্ষ থেকে বিরাট প্রতিরোধ এসেছিল। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে, ভাষাগত অধীনতা অস্বীকার করতে তাঁরা রাজনৈতিক এমন কী ধর্মীয় আনুগত্য পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাই আমরা দেখি, আব্বাসীয় আমলের শেষদিকেও আরবী ভাষার পুনর্বিজয় সম্ভব হয়নি। পারস্যে সামরিক জয়ের পর কিছুকাল শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক কাজে আরবী ভাষাই মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানকার সাবেক ইরানি কথ্যভাষাকে পাকাপাকিভাবে হঠিয়ে আরবী ভাষার দখলও সেখানে দাঁড়াতে পারেনি, আল-ইরাক এবং সিরিয়ার 'আরাম' ভাষা থেকে 'আরবী' ভাষায় রূপান্তরের কাজটা সহজই ছিল। কারণ দুটি ভাষাই ছিল প্রায় সমগোত্রীয়। কিন্তু লেবাননের খ্রিস্টানরাও মেনে নেননি আরবী ভাষাকে। বরং তারা সিরীয় ভাষার মর্যাদাকে বিন্দুমাত্র খাটো না করতে প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন। আজও লেবাননে সেই সিরীয় ভাষারই আধিপত্য চলছে। বাস্তবিকই মালূলা এবং আর দুটি লেবানন-বিরোধী গ্রামে এখনও সিরীয় ভাষার রমরমা বিদ্যমান। 'আরাম' ভাষা বিদায় নিলেও আরবী ভাষার কথ্য ধরনে এখনও নির্ভুল 'আরাম' শব্দ, তার উচ্চারণরীতি এবং ব্যাকরণগত প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান।[১৮৯]

এটা বলা উচিত, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবী ভাষা কিন্তু 'মাতৃভাষা' হিসেবে আরবীর চেয়েও অনেক সফল। আগে আমরা দেখেছি কিভাবে বাইজানটাইন, পারস্য এবং ভারতীয় সভ্যতার নতুন চিন্তাভাবনা ৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ, আল-বসরা এবং আল-কুফাতে এক সাংস্কৃতিক' সংমিশ্রণের সৃষ্টি করেছিল। সমকালীন সময়ে যা একমাত্র আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয় ছিল।

এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে যে আরবী ভাষা আগে কখনও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার কাজে লাগেনি সেই আরবীই মুসলিম সভ্যতার বাহক হয়ে ওঠে। এবার আমরা সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুসন্ধান করব।

● টীকা ●

১ সাআলিবি, লাতায়িফ, ৭৫ পৃঃ।

২ তাবারী, '৩ খণ্ড, ৯৩৭' ২.১২-১৩ পৃঃ।

৩ সাআলিবি, ৭৫-৭৭ পৃঃ, মাসউদী, প্যাসিম।

৪ তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। তাঁর পুত্র ছিলেন খলিফা আল-হাদী। তাঁর বাড়িতে তাঁর প্রিয় আরেক পুত্র আল-রশীদকে সিংহাসনে বসান। দেখুন তাবারী, ৩খণ্ড, ৫৬৯ পৃঃ। ইব্‌ন-আল-আসীর পুনর্লিখিত, ৬খণ্ড, ৬৭পৃঃ। মাসউদী ৬খণ্ড, ২৮২-২৮৩ পৃঃ।

৫ মুবাররদ, ৩০২ পৃঃ।

৬ আগানি, ১৯ খণ্ড, ১৩৪-১৩৭ পৃঃ।

৭ রাসাইল (কনস্টান্টিনোপল, ১২৯৭) ২০ পৃঃ।

৮ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ২৯৪ পাতা। লাল টুপি 'তারবুশ' এখনও মুসলিম দেশে পরা হয়। এটি একটি আধুনিক জিনিস।

৯ জাহিজ, বায়ান, ৩ খণ্ড, ৯ পৃঃ। আর পি এ ডোজি : ডিক্সনারি ডিটেল দাস নমসম দাস ভেটিমেন্টস (আমস্টার্ডাম, ১৮৪৫) ২০৩-২০৪ পৃঃ।

১০ দোজি, ১৬২-১৬৩ পৃঃ।

১১ এই আরবী শব্দটি 'স্প্যানিশ' থেকে এসেছে। দশম শতকের অভিধানে আমরা এই শব্দটি রোমান ভাষার অন্তর্ভুক্ত হতে দেখি। পরে ইংরাজি, জর্মন এবং স্লাভ ভাষার অভিধানেও তা অন্তর্ভুক্ত হয়। ইংরাজিতে এই শব্দটি এখন 'gibbet'এর সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হল ফাঁসি-কাঠ।

১২ লেবানন এবং সিরিয়ার বয়স্ক প্রজন্ম এখনও এই পোশাকের স্টাইল অনুসরণ করে।

১৩ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ৩ খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ = দ্য স্লেন, ৪ খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ। আগানি, ৫ খণ্ড, ১০৯ পৃঃ। ২.২৩-২৪, ষষ্ঠ খণ্ড, ৬৯ পৃঃ, ১.২৩; ইব্‌ন-আবি-উসায়বিয়া, ২ খণ্ড, ৪ পৃঃ, ১:২৩।

১৪ নিহায়া, ২ খণ্ড ১৮ পৃঃ। আরবী ভাষা সম্পদের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিলাদের বর্ণনা পেতে দেখুন ইব্‌ন কায়্যিম-আল-জাওযীয়া, আখবর আল-নিসা। (কায়রো, ১৩১৯), ১১৯ পৃঃ।

১৫ ইব্‌ন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ১৭০ পৃঃ।

১৬ ইব্‌ন-আল ফকীহ; ১৮৭-১৮৮ পৃঃ।

১৭ ইব্‌ন-খালদুন, ১৪৪ পৃঃ।

১৮ ইব্‌ন-আবি-উসাইবিয়া, ১ খণ্ড, ১৩৯-৪০ পৃঃ।

১৯ আরবী 'শারবাহ্' থেকে আগত, পানীয়। ইংরাজিতে 'সিরাপ' শব্দটিও এসেছে সমোদ্ভাব শব্দ 'শরাব' থেকে।

২০ চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ আরবে চালু হয়ে কফি মক্কার ঘরে ঘরে চালু হয়ে যায় পঞ্চদশ শতকে। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে আল-ইয়ামানের সুফিদের মারফত তা কায়রোতে আসে। সুফিরা আজহার মসজিদে রাত জেগে নামায পাঠের সময় কফি পান করতেন। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ওষধি পুড়িয়ে তার গন্ধ শোঁকা চিকিৎসার প্রয়োজনে অথবা আনন্দ লাভের জন্য আমেরিকা আবিষ্কারের আগে থেকেই চালু রয়েছে।

২১ আল-ওয়াশশা, 'কিতাব-আল-মুওয়াশশা, সম্পাদনা আর ব্রুনো (লিডেন, ১৮৮৬) ১, ১২, ৩৩, ৩৭, ১২৪, ১২৫, ১২৯-১৩১, ১৪২ পৃঃ।

২২ দেখুন নুওয়াইরি, নিহায়া, ৪ খণ্ড, ৯২ পৃঃ।

২৩ জাহিজ, তাজ, ২৩, ৭২; নওয়াজি, হালবাহ, ২৬ পৃঃ।

২৪ ৯৯ পৃঃ, ২, ২৪-২৭

২৫ মুকাদ্দামা, ১৬ পৃঃ। নিষিদ্ধ মদ্যপানের জন্য কোরানে (৫:৯২-৯৩) 'খামর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকারীদের দিক থেকে অযথার্থ প্রয়োগের যা সুযোগ করে দিয়েছে তা হল প্রকৃত ঘটনা এই যে মুহাম্মাদের সময়ে আল-মদীনায় আঙ্গুরের তৈরি কোন 'খামর' পাওয়া যেত না। তখন মদীনায় এই পানীয় তৈরি হত খেজুর থেকে। দ্বিতীয়ত, এই রস বিশেষ পদ্ধতিতে বেশ কিছুক্ষণ না রাখলে ঝাঁঝালো হত না। দেখুন, ইকদ, ৩ খণ্ড, ৪০৫-৪১৪ পৃঃ।

২৬ মিশকাহ, ২ খণ্ড, ১৭২-১৭৩ পৃঃ। ইব্‌ন-হানবাল, মুসনাদ, (কায়রো, ১৩১৩), ১ খণ্ড, ২৪০, ২৮৭, ৩২০ পৃঃ। বুখারী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৩২ পৃঃ।

২৭ নওয়াজি, ৩৮ পৃঃ।

২৮ আগানি, ১১ খণ্ড, ৯৮-৯৯ পৃঃ ; ১৮ খণ্ড, ১৮২-১৮৯ পৃঃ।

২৯ ওয়াশশা ; ৯২ পৃঃ।

৩০ আগানি, ১৩ খণ্ড, ১২৮ পৃঃ। নুওয়াইরি, ৫ম খণ্ড, ৭২ ও পরবর্তী পাতা তুলনীয়।

৩১ তারিখ, ১ খণ্ড, ১১৮-১৯ পৃঃ।

৩২ ওই দেখুন, ১১৭ পৃঃ।

৩৩ বুলদান, পৃঃ ২৫০, ২, ৯-১০; তুলনীয় : ২৫৪, ২.৮-৯ পাতা।

৩৪ ওই খণ্ড, ২, ১০৫-১০৭ পৃঃ।

৩৫ মাসউদী, ৮ খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ।

৩৬ ওই খণ্ড, ১ খণ্ড, ১৫৯-৬১ পৃঃ।

৩৭ ওই খণ্ড, ১৫৭-১৫৮ পৃঃ।

৩৮ ল্যাঙ্গুডক এবং অন্য এ এক ধরনের পুরানো খেলাকে এই 'চিকেন' নাম দেওয়া হয়। এটা পায়ে করে খেলা হয় কাঠের ছোট হাতুড়ির মতো জিনিস দিয়ে এবং শক্ত কাঠের বল থাকে।

৩৯ তাজ, ৭২ পৃঃ। অন্যান্য গুণাবলির জন্য দেখুন নওয়াজি, ২৫ ও পরের পাতা।

৪০ ইব্‌ন-আল-আব্বাস, আসার আল-উওয়াল, ১৩০ পৃঃ।

৪১ মাসউদী, ৮ খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ। ১.২ পৃষ্ঠা। আসার, ১২৯, ২.৩-৪ পৃষ্ঠা তুলনীয়।

৪২ ফরাসি ক্রিয়াপদ 'টেনেজ' (যার অর্থ লুকানো) থেকে সম্ভবত 'টেনিস' শব্দটি এসেছে। এক মিশরিয় শহরের আরবী নাম 'তিন্নীস'। তা থেকেই সম্ভবত 'টেনিস' শব্দটির উৎপত্তি। মধ্যযুগে এই বদ্বীপটি লিনেন বস্ত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল, যা টেনিস বল তৈরিতে ব্যবহৃত হত। দেখুন ম্যালকম, ডি, হুইটম্যান, টেনিস : অরিজিনস অ্যাণ্ড মিসটেরিজ (নিউইয়র্ক, ১৯৩২) ২২৪-৩২ পৃঃ।

৪৩ ওই খণ্ড ৬, ৩৪৮-৩৪৯ পৃঃ।

৪৪ ওই খণ্ড ১, ৬৩-৬৫ পৃঃ।

৪৫ মাসউদী, ষষ্ঠ খণ্ড, ৪৩২-৪৩৩ পৃঃ।

৪৬ আগানি, ৯ খণ্ড, ৯৭, ২.২৭-২৯ পাতা।

৪৭ ফিহ্‌রিস্ত, ৩১৫ পৃঃ এবং ইব্‌ন-খাল্লিকান, ২ খণ্ড, ১৭২ পৃঃ ও ৩ খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠায় শিকার এবং বাজকে দিয়ে শিকারের বহু বইয়ের কথা লেখা হয়েছে।

৪৮ এই বিষয়ে আরবে সাবেক কালে কী করা হত, তা জানতে পড়ুন উসামা ইবন-মুনকিয-এর 'কিতাব আল-ইতিবার'। সম্পাদনায় হিট্টি (প্রিন্সটন, ১৯৩০) ১৯১-২২৬ পৃঃ। ইং অনুবাদ হিট্টির 'অ্যান আরাব-সিরিয়ান জেন্টলম্যান অ্যান্ড ওয়ারিয়র (নিউইয়র্ক, ১৯২৯, বেইরুটে ১৯৬৪ সালে পুনর্মুদ্রিত, ২২১-২৫৪ পৃঃ।

৪৯ কোরান ২ : ১৬৮, ৫ : ৪, ১৬ : ১১৬

৫০ ফাখরী, ৭৩-৭৪ পৃঃ।

৫১ আসার আল-উওয়াল, ১৩৫ পৃঃ।

৫২ ফাখরী, ৩০ পৃঃ। ইকদ, ১ খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ, ২.৪

৫৩ কুতুবি, ১ খণ্ড, ১৩৪-১৩৫ পৃঃ।

৫৪ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৬৬৯ পৃঃ। একই কথা আছে ইব্‌ন-আল-আসীর, ৬ খণ্ড, ১২০ পাতা।

৫৫ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৯৫০ পৃঃ, ইব্‌ন-আল-আসীর পুনর্লিখিত, ৬ খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৫৬ মাসউদী, ৭ খণ্ড, ৪৭ পৃঃ।

৫৭ আগানি, ১৫ খণ্ড, ৮০ পৃঃ, নুওয়াইরি, ৫ খণ্ড, ৮৮৯ পৃঃ।

৫৮ আগানি, ১৬ খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ।

৫৯ মাসউদী, ৮ খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ।

৬০ আগানি, ১৯ খণ্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ।

৬১ ফাখরী, ৩৫২ পৃঃ।

৬২ মাসউদী, ৭ খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ।

৬৩ ওই, ৭ খণ্ড, ২৮১ পৃঃ।

৬৪ ইব্‌ন-আল-আসীর, ৭ খণ্ড, ২১১-১২ পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৬২৭ পৃঃ। ইব্‌ন-আল-আসীর পুনর্লিখিত, ষষ্ঠ খণ্ড, ৮৬ পৃঃ।

৬৫ ইকদ, ১ খণ্ড, ১৯৬ পৃঃ।

৬৬ ইব্‌ন-খুরদাযবিহ্‌, ১৫৩-১৫৪ পৃঃ।

৬৭ পারস্য উপসাগরের ওপর এক পারসিক শহর। সিরাফ এবং উমান (মাসউদী, ১ খণ্ড, ২৮১-৮২ পৃঃ) ছিল আব্বাসীয় আমলের গোড়ায় সর্বজনবিদিত বন্দর।

৬৮ মার্শাল ব্রুমহল-এর 'ইসলাম ইন চায়না' (লণ্ডন, ১৯১০) ৫-৩৬ পৃঃ।

৬৯ 'সিলসিলাত-আল-তাওয়ারিখ'। সম্পাদনা ল্যাঙ্গেলস্ (প্যারিস, ১৮১১) জি ফারাণ্ড অনূদিত গ্রন্থ ভয়েজ দ্য মার্চেন্ড আরব সুলেমান অ্যান ইণ্ড অ্যাট এন চায়না (প্যারিস, ১৯২২)

৭০ টমাস এফ. কার্টার, 'দ্য ইনভেনশন অব প্রিন্টিং ইন চায়না অ্যান্ড ইটস স্প্রেড ওয়েস্টওয়ার্ড' (নিউইয়র্ক, ১৯২৫) ৮৫ পৃঃ।

৭১ পল পিলিয়ট-এর লেখা 'জার্নাল এশিয়াটিক' (১৯১৩) ২ খণ্ড, ১৭৭-১৯১ পৃঃ।

৭২ পাহলবী 'তাজিক' থেকে। আধুনিক শব্দ 'তাজি' (আরব)। সম্ভবত এক আরব উপজাতি 'তায়ি' থেকে এই শব্দটি পারসিতে অপভ্রংশ হয়ে এমন হয়েছে।

৭৩ আইজাক ম্যাসন-এর 'জার্নাল অব দি নর্থ-চায়না ব্রাঞ্চ অব দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি', নবম খণ্ড (১৯২৯), ৪২-৭৮ পৃঃ।

৭৪ কোরিয়ায় মুসলিম-উপনিবেশ সম্পর্কে জানতে দেখুন 'ইব্ন খুরদাযবিহ্' ৭০ পৃঃ, ১৭০ পৃঃ।

৭৫ মাসউদী, ৪ খণ্ড, ৯৮-৯৯ পৃঃ।

৭৬ কুতুবি, ১ খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ।

৭৭ ফাখরী, ৩২১-৩২২ পৃঃ।

৭৮ ইসতাখরি, ১২৭ পৃঃ ; ১৩৯ পৃঃ। ইব্ন হাওকাল, ১৯৮ পঃ। মাকদিসি, ৪২৬ পৃঃ।

৭৯ ১৩৮ পৃঃ।

৮০ ইবশিহি, ১ খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ।

৮১ মাকদিসিতে উল্লিখিত, ৩২৩ পৃষ্ঠা, ১.২০ ; ইব্ন-হাওকাল, ২৬১ পৃঃ, ১.১৩ ; ইয়াকুত, বুলদান, ১ খণ্ড, ৮২২ পৃঃ, ১.২২

৮২ ইসতাখরি, ১৫৩ পৃঃ। মাসউদী, ৪৪২-৪৪৩ পৃঃ।

৮৩ মাকদিসি, ৪০২, ৪০৭-৪০৯ পৃঃ।

৮৪ এই কারুকাজ গোড়ায় দামাস্কাসে করা হত। তখন থেকেই এরূপ নামকরণ হয়েছে।

৮৫ ৩২৩-৩২৬ পৃঃ।

৮৬ ইয়াকুত, ২ খণ্ড, ৬০৩ পৃঃ, ৫৪৮ পৃঃ ; প্রথম খণ্ড, ৮৮২ পৃঃ। মাকদিসি, ২০১, ৪৩৩ পৃঃ ; ২. ১৬-১৭, ৪৪৩, ১.৫ পাতা হিট্টির মূল ইংরাজি গ্রন্থের ৬৩১ পৃষ্ঠা দেখুন।

৮৭ সাআলিবি, লাতায়িফ, ৯৫ পৃঃ।

৮৮ ইব্ন বতুতার লেখা, ১ খণ্ড, ৪১৫ পৃঃ, ২ খণ্ড, ৪৬, ১৩০; ২২৫, ২৯৭, ৩ খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

৮৯ আরবী শব্দ 'কাশান'। বুলদান, চতুর্থ খণ্ড, ১৫ পৃঃ।

৯০ ফ্রেডারিক হার্ট-এর লেখা 'Chienesische Studien' (মিউনিখ এবং লিপজিগ, ১৮৯০) ১ খণ্ড, ২৫৯-৭১ পৃঃ দেখুন।

এছাড়া দেখুন হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৪১৪ পৃঃ। কাগজের টাকাও চীনেই প্রথম তৈরি হয়, যা ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। আরবী ভাষাতেও মুদ্রিত হয় তিবরিজে। তিবরিজ ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রথম স্থান যেখানে ব্লক করে কাগজের নোট ছাপা হয়।

৯১ সাআলিবি, ১২৬ পৃঃ, মাকদিসি, ৩২৬ পৃঃ, ২. ৩-৪

৯২ উইলিয়াম রাইট লিখিত 'দ্য প্যালিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, ওরিয়েন্টাল সিরিজ (লণ্ডন, ১৮৭৫-৮৩) ষষ্ঠ প্লেট।

৯৩ থিওদোরাস আবু কুররা লিখিত 'De Cultu Imaginum'. আই আরেন্ডজেন সম্পাদিত এবং অনূদিত (বন, ১৮৯৭)

৯৪ মাসউদী, ৭ খণ্ড, ৩৭৬ পৃঃ। ফাখরী, ৩৫২-৩৫৩ পৃঃ। তাবারী, ৩ খণ্ড, ৬০২ পৃঃ, ১.১২।

৯৫ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৭০৩ পৃঃ।

৯৬ সাআলিবি, ৭২ পৃঃ।

৯৭ ওই, ৭২-৭৩ পৃঃ।

৯৮ মুকাদ্দামা, ১৫ পৃঃ, ২.২০, ১৪৪-১৪৫ পৃঃ।

৯৯ ৭ খণ্ড, ৪০১-৪০২ পৃঃ, ইব্‌ন্-খালদুন উল্লিখিত মুকাদ্দামা, ১৫ পৃঃ।

১০০ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ, ৩৪৪ পৃঃ।

১০১ ফাখরী, ৩৫৩ পৃঃ। ইব্‌ন-হাওকাল এর গ্রন্থেও (৩৮, ১.৭) এই অসাধারণ মুক্তোর কথা বলা হয়েছে। মাকদিসি, ১০১, ১.১৬ পৃঃ।

১০২ ওই গ্রন্থ, ৩০৩ পৃঃ। 'লাজুলি' এবং 'অ্যাজিউর' শব্দ দুটি আরবী 'লাজাওয়ার্ড' এবং পারসি 'লাজুওয়ার্ড' শব্দ থেকে লাতিন মারফত ইংরাজিতে এসেছে।

১০৩ ইব্‌ন-আল-ফকীহ্, ২০৬ পৃঃ।

১০৪ মাকদিসি, ১০১ পৃঃ।

১০৫ ওই গ্রন্থ, ৩৪১ পৃঃ টীকা।

১০৬ ওই গ্রন্থ, ১০১ পৃঃ।

১০৭ ওই গ্রন্থ, ১৮৪ পৃঃ ১.৩।

১০৮ ইসতাখরি, ২০৩ পৃঃ। সাআলিবি, লাতায়িফ, ১১০ পৃঃ। আরবী কুহ্‌ল সম্ভবত 'গ্যালেনা'। এ-বিষয়ে আরও জানতে দেখুন স্ট্যাপলটন-এর মেমোয়ারস অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ৮ খণ্ড (১৯২৭), ৩৫২ পৃঃ।

১০৯ মাকদিসি, ১৮৪ পৃঃ।

১১০ ওই, ৩০৩ পৃঃ, ২.১৩-১৫

১১১ ইব্‌ন-হাওকাল, ৩৬২ পৃঃ।

১১২ ইসতাখরি, ৮৪ পৃঃ, ১.৩ ; ইব্‌ন-হাওকাল, ১৬৬ পৃঃ ; ১.২

১১৩ এই সব খাল সম্পর্কে জানতে পড়ুন ইসতাখরি, ৮৪-৮৫ পৃঃ, ইব্‌ন-হাওকাল, ১৬৬-১৬৬ পৃঃ। মাকদিসি, ১২৪. পৃঃ। খাতিব 'তারিখ' ১ খণ্ড, ৯১ পৃঃ, ১১১ পৃঃ। গাই লা স্ট্রেঞ্জ এর 'ডেসক্রিপশন অব মেসোপটেমিয়া অ্যাণ্ড বাগদাদ'। ৯০০ খ্রিঃ নাগাদ ইব্‌ন-সেরাপিয়ন (সুহরাব) লিখিত রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল (১৮৯৫) ২৫৫-৩১৫ পৃঃ।

১১৪ ইয়াকূত, ৩ খণ্ড, ৩৭৭-৩৭৮ পৃঃ।

১১৫ ইসতাখরি, ৭৭-৭৮ পৃঃ, ইয়াকূত, ২ খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ।

১১৬ বালাযুরি, ২১৯ পৃঃ = হিট্টি, ৪৫১ পৃঃ। কুদামাহ, ২৪১ পৃঃ।

১১৭ উইলিয়াম উইলককস ইরিগেশন অব মেসোপটেমিয়া (লণ্ডন, ১৯১৭) ১৭ ও পরবর্তী এবং ১১ ও পরবর্তী পাতা।

১১৮ ৩২১ পৃঃ।

১১৯ ইয়াকুবী, ২ খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ ১.৪।

১২০ ইসতাখরি, ৩০৫ পৃঃ। ইবন-হাওকাল পুনর্লিখিত, ৩৫৫ পৃঃ।

১২১ ইসতাখরি, ৮১ পৃঃ। ইবন-হাওকাল ; ১৬০ পৃঃ। মাকদিসি, ১১৭-১১৮ পৃঃ।

১২২ ইয়াকুত, ১ খণ্ড, ৭৫১ পৃঃ। ৩ খণ্ড, ৩৯৪ পৃঃ। ১ খণ্ড, ৯৭, ২.১৫-১৬।

১২৩ এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে, ৫২৮ পাতার ৬ নং টীকা দেখুন। এই গাছটি চীনেই প্রথম হয়।

১২৪ সাআলিবি, ১২৯ পৃঃ।

১২৫ এটি এক তিক্ত স্বাদের লেবু। আরবী শব্দে বলা হয় আবু সুফায়ের। পারসি শব্দ 'নারাঙ্গ' থেকে আরবী শব্দ 'নারাঞ্জ'। ইংরাজি শব্দ 'অরেঞ্জ শব্দটি স্প্যানিশ মারফত এসেছে'। ইংরাজিতে 'লেমন' শব্দ এসেছে পারসি 'লিমুন' এবং আরবী 'লাইমুন' থেকে।

১২৬ সাআলিবি, ১০৭ পৃঃ।

১২৭ আরবী 'সুক্কার'। ইংরাজি শব্দ 'ক্যাণ্ডি' এসেছে আরবী কান্দাহ্ বা কান্দি থেকে। পারসিতে এই শব্দ ছিল 'কান্দ'। কেন (আখ) শব্দটিও মূলত সেমিটিক শব্দ। আরবী কানাহ্ শব্দজাত। অর্থ, শর বা খাগড়া। তবে পাশ্চাত্য ভাষায় পৃথক ভাবে পরিচিত।

১২৮ সিরিয়ায় এখনও লাল গোলাপকে বলা হয় 'ওয়ার্দ জুরি'।

১২৯ ইবন-হাওকাল, ২১৩ পৃঃ ; ইসতাখরি, ১৫২-১৫৩ পৃঃ।

১৩০ সাআলিবি, ১০৯-১০ পৃঃ, মাকদিসি, ৪৪৩ পৃঃ।

১৩১ সুয়ুতি, হুসন, ২ খণ্ড, ২৪২ পৃঃ।

১৩২ আলফ লায়লা ওয়া-লায়লা (সহস্র এক আরব্য রজনী), ৪৫৩ সংখ্যক।

১৩৩ সুয়ুতি, হুসন, ২ খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ।

১৩৪ নওয়াজি, ২৩৫ পৃঃ। সুয়ুতি, ২ খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ।

১৩৫ সুয়ুতি, ২ খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ। দেখুন : এডওয়ার্ড ডবলিউ লেনের দ্য থাউজ্যান্ডস অ্যান্ড ওয়ান নাইটস, ভলিউম ওয়ান (লন্ডন, ১৮৩৯), ২১৯ পৃঃ।

১৩৬ ৭৮ পৃঃ, ২. ১২, ২৩, ৭৯ পৃঃ, ১.৩, ৮৩ পৃঃ, ১.১৬, ২.৫২ পৃঃ, ২.৯-১০

১৩৭ ফিহ্‌রিস্ত, ৩১৭ পৃঃ।

১৩৮ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৭১২-৭১৩ পৃঃ। ইব্‌ন-আল-আসীর, ৬ খণ্ড, ১৪১ পৃঃ।

১৩৯ তাবারী, ৩ খণ্ড, ১৩৮৯-৯৩ পৃঃ ১৪১৯ পৃঃ।

১৪০ জাহিজ, বায়ান, ১ খণ্ড, ৭৯ পৃঃ, ২. ২৭-৮

১৪১ সূরাহ্ ২:৭০, ৫:১৬-১৮

১৪২ এ মিনগানা-র লেখা পড়ুন 'বুলেটিন অব জন রাইল্যান্ডস লাইব্রেরি, ১২ খণ্ড (ম্যানচেস্টার, ১৯২৮) ১৩৭-২৯৮ পৃষ্ঠা।

১৪৩ রিসালাত আবদ-আল-সামীহ্ (লণ্ডন, ১৮৭০) দ্বিতীয় সংস্করণ (লণ্ডন, ১৮৮৫)

১৪৪ সম্পাদনা এ মিনগানা (কায়রো, ১৯২৩)। অনুবাদ গ্রন্থ মিনগানা : দি বুক অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এম্পায়ার (ম্যানচেস্টার, ১৯২২)

১৪৫ ফিহ্‌রিস্ত, ২৩ পৃঃ।

১৪৬ ওই, ২২ পৃঃ। এটা আংশিক অনুবাদও হ'তে পারে।

১৪৭ ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ।

১৪৮ ইয়াকুত, উদাবা, ২ খণ্ড, ২৫৯ পৃঃ।

১৪৯ আল-তানূখি, আল-ফারাজ বা'দ আল-শিদ্দাহ্ (কায়রো, ১৯০৪), ২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ।

১৫০ নাসর ইব্‌ন-হারুন ছিলেন বুয়াহিদ উজির। দেখুন মিসকাওয়াইহ্ : তাজারিব আল-উমাম, সম্পাদনা : মারগোলিউথ, দ্বিতীয় খণ্ড (কায়রো অ্যাণ্ড অক্সফোর্ড, ১৯১৫) ৪০৮, ৪১২ পৃঃ।

১৫১ সাবি, উজারা, ৯৫ পৃঃ।

১৫২ এ মিঙ্গানা : বুলেটিন জন রাইল্যাণ্ডস লাইব্রেরি। ১০ খণ্ড (১৯২৬) ১২৭-৩৩ পৃঃ।

১৫৩ ইয়াকুত, বুলদান, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৬২ পাতা।

১৫৪ মোনোফাইসাইট (যারা অভিন্ন চরিত্রের খ্রিস্টে বিশ্বাসী) এবং জ্যাকোবাইট (জ্যাকবপন্থি) পুরোহিতদের সম্পর্কে জানতে পড়ুন অ্যাসেমানী (আল-সামআনি) Bibliotheca orientalis, ২ খণ্ড, (রোম, ১৭২১)

১৫৫ ইয়াকুত, ২ খণ্ড, ৬৬২ পৃঃ, ১.১৮

১৫৬ 'দায়ের'এর অধীনে

১৫৭ ৩৪৯ পৃঃ।

১৫৮ 'দার আল-রুম' যা সম্পাদক ফ্লুগেল তাঁর টীকায় ভুলভাবে 'কনস্টান্টিনোপল' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৫৯ পি ভি সাকির 'দ্য নেস্টোরিয়ান ডকুমেন্টস অ্যান্ড রেলিক্স ইন চায়না' (টোকিও, ১৯৩৭), ১০ পৃঃ।

১৬০ সুরাহ্, ২:৭০-৭৩:৫:১৬, ৬৬-৬৯

১৬১ ওই ১৮৩ পৃঃ।

১৬২ ইয়াকুত, ৪ খণ্ড, ১০৪৫ পৃঃ।

১৬৩ দ্য ইটিনারারি অব রাব্বি বেঞ্জামিন অব টুডেলা, অনুবাদ ও সম্পাদনা, এ আশার, ১ খণ্ড (লণ্ডন ও বার্লিন, ১৮৪০) ১০০-১০৫ পৃঃ।

১৬৪ অন্য সমকালীন পর্যটকরা এই সংখ্যাটি তিন বলে অভিহিত করেছেন, যা বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

১৬৫ বাগদাদের কিছু ইহুদি ৫৯৭ এবং ৫৮৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে নেবুচাদনেজার কর্তৃক নির্বাসিতদের বংশধরও হতে পারেন।

১৬৬ 'আরাম' ভাষায় 'ইয়াদা' শব্দ থেকে এই শব্দটি এসেছে। এর অর্থ 'জানা'। এই ছিল রহস্যবাদী খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

১৬৭ আরবী শব্দ সাবিয়াহ্ বা সাবিয়ুন। একবচনে 'সাবি'। শব্দটি মান্দাইক (আরাম) ভাষাজাত 'স্যাবি' থেকে উৎপন্ন; অর্থাৎ — খ্রিস্ট ধর্মানুযায়ী সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে দীক্ষিতকারী। আবার দক্ষিণ-পূর্ব আরবের বিখ্যাত লোকদের বলা হত 'সাবা'। তার মধ্যে কিন্তু এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোন সংযোগ নেই।

১৬৮ প্রায়ই ভাবে 'নাসোরিনাস'। অর্থাৎ খ্রিস্টান। বলা হয়

১৬৯ মাসউদী, ২ খণ্ড, ১১২ পৃঃ। ৩৪০, ১.২৬

১৭০ পারসি শব্দ 'মিনো' (অর্থাৎ স্বর্গীয়) থেকে এসেছে।

১৭১ মাসউদী, ৪ খণ্ড, ৬১-৭১ পৃষ্ঠায় শুধু এই নিয়ে একটি পরিচ্ছেদেই আলোচনা রয়েছে।

১৭২ ফিহ্‌রিস্ত, ২৭২ পৃষ্ঠা, ১.১১

১৭৩ ওই ৩০২ পৃষ্ঠা, ইব্‌ন-আবি-উসাইবিয়া কর্তৃক উদ্ধৃত, ১ খণ্ড, ২২০-২১ পৃঃ।

১৭৪ সাবিয়ানদের সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন ডি শৌলসন এর Die SSabier und der ssabismus. ২ খণ্ড (সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৫৬)

১৭৫ মাসউদী, চতুর্থ খণ্ড, ৮৬ পৃঃ।

১৭৬ 'ফার্‌স' (আধুনিক ফারিস) থেকেই নামটি এসেছে। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ২নং টীকা দেখুন।

১৭৭ ফিহ্‌রিস্ত, ৩৩৭-৩৩৮ পৃঃ। সাবেক আরবে যে মুসলিমের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা সাধারণভাবে পারসিদের গোঁড়া ধ্যানধারণার সমধর্মী ছিল এবং বিশেষভাবে মানিপন্থার ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের সম্পর্কে আরবীয় লেখকেরা 'জিন্দিক' (পাহ্‌লবী জান্দিক থেকে) শব্দটি ব্যবহার করবেন। পরে অবশ্য 'জিন্দিক' বলতে বোঝানো হত মুক্তচিন্তার মানুষজনকে। তুলনীয় : ই. জি. ব্রাউনি, এ লিটারারি হিস্ট্রি অব পারসিয়া, ১ খণ্ড, (নিউইয়র্ক, ১৯০২), ১৫৯-৬০ পাতা। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৮৪ পাতার ২নং টীকা তুলনীয়।

১৭৮ তাবারী, ৩ খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ।

১৭৯ ওই, ৫১৯-২০, ৫৮৮ পৃঃ।

১৮০ ওই ৫৪৮-৫১ পৃঃ।

১৮১ ফিহ্‌রিস্ত, ৩২৭ পৃষ্ঠা। শাহারাস্তানি, ১৮৮ পৃষ্ঠা। ইয়াকুবী ১ খণ্ড, ১৮০-৮২ পৃষ্ঠা। এইসব আরবী বই থেকে মানিপন্থা সম্পর্কে জানা যায়। আধুনিক চিন্তাভাবনার জন্য পড়ুন, এ ভি উইলিয়াম জ্যাকসন-এর 'রিসার্চেস ইন ম্যানিকিয়িজম' (নিউইয়র্ক, ১৯৩২)

১৮২ পড়ুন তাবারী, ১ খণ্ড, ৮৮৫-৮৮৬, ৮৯৭ পৃষ্ঠা, শাহারাস্তনি ১৯২ পৃষ্ঠা। ব্রাউনি, ১ খণ্ড, ১৬৬-১৭২ পৃষ্ঠা।

১৮৩ সূরাহ্‌ ৪ : ১১৬-২০, ২১ : ৯৮-১০০, ৬৬ : ৯।

১৮৪ ইব্‌ন-আল-ইবরি, Chronicon Syriacum. সম্পাদনা এবং অনুবাদ : পি জি ব্রুনস এবং জি জি কিরশ (লিপজিগ, ১৭৮৯), ২ খণ্ড (মূল পাঠ), ১৩৩ পৃঃ = ১ খণ্ড, ১৩৪-৩৫ পাতা।

১৮৫ বুলদান, ৩১৫ পৃষ্ঠা ১.৯

১৮৬ আল-ইদ্রিসি, 'সিফাত আল-মাগ্রিব' সম্পাদনা ও অনুবাদ : আর দোজি এবং এম জে ডি গোজি (লিডেন, ১৮৬৪-৬৬), ২৭ পৃষ্ঠা (মূল পাঠ্য) – ৩২ পৃষ্ঠা (অনুবাদ)

১৮৭ ইব্‌ন-বতুতা, ৪ খণ্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

১৮৮ De Mas Latris : Relations et commerce de l' Afrique ser entrionale (Paris. 1886) ২৭-২৮ পৃঃ ; আর্নল্ড, প্রিচিং, ১২৬ পৃষ্ঠা।

১৮৯ হিট্টি, আল-লুগাত আল-সামিয়া (বেইরুত ১৯২২) ১০ ৪৬ পৃষ্ঠা।

॥ অধ্যায় ২৭ ॥

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতি

আগের অধ্যায়ে (২৪) অনুবাদের যুগ (৭৫০-৮৫০) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরের যুগেই সৃষ্টিশীল কাজের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। এই সৃষ্টিশীল কাজগুলি ভালো করে লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যায় যে আরবরা পারস্যের প্রাচীন জ্ঞান ও গ্রিসের প্রাচীন ঐতিহ্যকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। আবার অন্যদিকে তারা সেগুলিকে নিজেদের দেশের বিশেষ প্রয়োজন ও চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। মধ্যযুগের রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও ভূগোলে তাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে তাদের কাজের তুলনায় অনেক বেশি খ্যাতিলাভ করেছিল। আইনবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানেও আরব ও মুসলিমদের মৌলিক চিন্তাভাবনা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বহু শতাব্দী ধরে আরব ও অন্যান্যরা জ্ঞান জগতের বিভিন্ন শাখার মৌলিক চিন্তা-ভাবনার অনুবাদ করেছিল। এই অনুবাদগুলি ও উপরোক্ত বিভিন্ন শাখার নবতর অবদানগুলি সিরিয়া, স্পেন ও সিসিলির মধ্য দিয়ে ইউরোপ পৌঁছেছিল। আর এগুলিই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনাকে পথ প্রদর্শন করেছিল। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় যে আরব থেকে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই আগমন মৌলিক আবিষ্কারের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ অ্যারিস্টটল, গ্যালেন ও টলেমির গবেষণাগুলি যদি হারিয়ে যেত, তা হলে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা খুবই দুরবস্থার মধ্যে পড়ত।

● চিকিৎসাবিদ্যা

কোন্‌গুলি অনূদিত কাজ, আর কোন্ কাজগুলি মৌলিক গবেষণা সে ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা করে সীমারেখা টানা হয়নি। অনুবাদকদের মধ্যে অনেকেই কিছু নতুন অবদান রেখেছেন। এ ব্যাপারে যুহান্না ইবন-মাসাওয়াইহ্ (৭৭৭-৮৫৭)ও হুনায়ন ইবন-ইসহাক (৮০৯-৭৩)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জিবরিল ইবন-বখতিসুর ছাত্র যুহান্না ছিলেন একজন খ্রিস্টান চিকিৎসক। শব-ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য তিনি কোন মানুষের দেহ ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ ইসলাম ধর্ম এ ধরনের কাজকে কখনই সমর্থন করেনি। তাই গরিলা নিয়েই তিনি তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে ছিলেন। একটি গরিলা তিনি উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন আল-মুতাসিম-এর কাছ থেকে এবং সেটি ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে নুবিয়া থেকে এসেছিল। সুতরাং এই অবস্থায়

শব-ব্যবচ্ছেদ এবং শারীর বিজ্ঞানে খুব একটা অগ্রগতি ঘটেনি। শুধুমাত্র চোখের গঠন নিয়ে পড়াশোনার কাজটি কিছুটা এগিয়েছিল। সূর্যের প্রখর তাপের জন্য আল-ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে চোখের রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই কারণেই এই বিষয়টির ওপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টি পড়েছিল। তার ফলেই ইবন-মাসাওয়াইহ্-এর কলম থেকে চোখের চিকিৎসা সম্পর্কে প্রাচীনতম[১] ও বর্তমানে কালেও উপযোগী একটি পাঠ্যবই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম আল-আশ্‌র মাকালাত ফী আল-আইন (চোখের সম্পর্কে দশটি রচনা)। এই বইটি তার ছাত্র হুনায়ন ইবন-ইসহাকের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। বইটির একটি ইংরাজি অনুবাদও[২] প্রকাশিত হয়েছে।

দৈববার্তা ঘোষণার ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে মানুষের রোগ সারানোর বিদ্যার প্রতি আরবদের আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞান এর ফলে ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিদ্যার মতো দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা ছিলেন একই সঙ্গে অধিবিদ্যাবিদ্ দার্শনিক ও সন্ন্যাসী। কোনরকম বাছ-বিচার না করে এই ধরনের সমস্ত মানুষকেই হাকিম উপাধি দেওয়া হত। আল-রশীদ, আল-মামূন ও বার্মাকিদের দরবারে নেস্টোরিয়ান জিবরিল ইবন-বখতিসু ছিলেন রাজ-চিকিৎসক (মৃ. ৮৩০)। শোনা যায়, তিনি প্রায় ৮৮,৮০০,০০০ দিরহাম[৩] উপার্জন করেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, সে যুগে চিকিৎসাবিদ্যা থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা যেত। আল-রশীদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে জিবরিল বছরে দু'বার তাঁর রক্ত মোক্ষণ করে দেবার জন্য ১০০,০০০ দিরহাম ও তাঁর দেহে বছরে দু'বার কোষ্ঠ পরিষ্কারের ওষুধ প্রয়োগ করার জন্যও সমান অর্থ রোজগার করতেন। বখতিসু পরিবারের পরপর ছ' বা সাতটি প্রজন্মে কোন না কোন ব্যক্তি বিশিষ্ট চিকিৎসক রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে শেষের ব্যক্তি একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তাঁর চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

ওষুধের সাহায্যে মানুষের রোগ সারানোর ক্ষেত্রে আরবরা এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। তারাই প্রথম ওষুধের দোকান খুলেছিল, ওষুধ প্রস্তুত ও সংরক্ষণবিদ্যা শিক্ষা দেবার স্কুল চালু করেছিল এবং ওষুধ তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম বই লিখেছিল। ওষুধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের ওপর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই সময়ে লেখা হয়েছিল। আরবের মধ্যযুগীয় রসায়নের জনক জাবির ইবন-হাইয়ানের প্রবন্ধগুলি সত্যই জগদ্বিখ্যাত, সম্ভবত ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর কর্মজীবন উন্নতির চূড়ায় পৌঁছেছিল। আল-মামূন ও আল-মুতাসিমের সময়েই ওষুধ প্রস্তুতকারকদের বেশ কয়েকটি পরীক্ষা[১] পাশ করতে হয়েছিল। তাদের মতো চিকিৎসকদেরও একটি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। দুর্নীতির একটি ঘটনার পরে আল-মুকতাদির ৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সিনান ইবন-সাবিত ইবন-কুররাকে সমস্ত কর্মরত চিকিৎসকের পরীক্ষা নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে তিনি আরও বলেছিলেন যে, পরীক্ষা নিয়ে সন্তুষ্ট হলে তবেই যেন তাদের সার্টিফিকেট (একবচনে, ইযাজা) দেওয়া হয়। বাগদাদে ৮৬০ জনেরও বেশি চিকিৎসক এই পরীক্ষায় পাশ করেন। এর ফলে রাজধানীর মানুষের হাতুড়ে ডাক্তারদের হাত

থেকে মুক্তি পান।[৮] আল-মুকতাদিরের ধর্মপ্রাণ উজির আলি ইবন-ঈসার আদেশে চিকিৎসকদের একটি দল গড়ে তোলেন সিনান। তাঁরা ওষুধ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষের চিকিৎসা করতেন এবং রোগগ্রস্ত মানুষকে সুস্থ করে তুলতেন। অন্যান্য চিকিৎসকেরা প্রতিদিন জেলের[৯] কয়েদীদের দেখতে যেতেন। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তখনও তা চালু ছিল না। চিকিৎসাবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা ও বাগদাদের হাসপাতালটির সুদক্ষ পরিচালনার মধ্য দিয়েই মূলত সিনান খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইসলামের যুগে এটিই ছিল প্রথম হাসপাতাল। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে হারুন-আল-রশীদ এটি তৈরি করেছিলেন। হাসপাতালটি যে পারস্যের মডেলে তৈরি হয়েছিল, তা তার বিমারিস্তান[১০] নাম থেকেই বোঝা যায়। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম দেশগুলিতে প্রায় ৩৪ টি হাসপাতাল গড়ে ওঠে। ৮৭২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইবন-তুলুনের আমলে কায়রোর প্রথম হাসপাতালটি তৈরি হয়।[১১] পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই হাসপাতালটির অস্তিত্ব ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় গড়ে ওঠে। মুসলিম হাসপাতালগুলিতে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড ছিল ও প্রতিটি ওয়ার্ডেরই নিজস্ব ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র ছিল। মুসলিম হাসপাতালগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাগার ছিল। তা ছাড়া সেই হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষাও দেওয়া হত।

● আলী আল-তাবারী

মহান অনুবাদকদের যুগের পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার ওপর বই লিখে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছিলেন আলী আল-তাবারী, আল-রাজি, আলী ইবন-আল-আব্বাস আল-মাজুসি ও ইবন-সিনা। এরা জাতিতে পারসি হলেও আরবীভাষী ছিলেন। এদের মধ্যে আল-রাজি ও ইবন-সিনার ছবি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার স্কুলের বিশাল হলঘরে এখনও শোভা পাচ্ছে।

নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আলী ইবন-সাহ্ল রাব্বান আল-তাবারী বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তার লেখা কিতাব আল-দিন নামের বইটিতে তিনি তাবারিস্তানের খ্রিস্টান রূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাবার নামও সেই পরিচয়েরই ইঙ্গিত দেয়।[১২] আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং খলিফার চিকিৎসকে পরিণত হন। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সেই খলিফার শাসনকালেই তিনি ফিরদাউস আল-হিকমা (জ্ঞানের স্বর্গ) নামে আরবী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে পুরোনো একটি সংক্ষিপ্ত বই লেখেন। এই বইটির মধ্যে দর্শনশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কিছু পরিমাণে আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া গ্রিক ও হিন্দু শাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করা উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই এই বইটি লিখিত

হয়েছে। আলীর পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ধর্মবিদ ও দার্শনিক এবং চিকিৎসক রূপে আল-রাজির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

● আল-রাজি

আবু-বকর মুহাম্মাদ ইবন-জাকারিয়া আল-রাজি (রাজেস, ৮৬৫-৯২৫) ছিলেন সেই সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে বড় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মুসলিম চিকিৎসক। এছাড়াও তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বইয়ের এক সৃষ্টিশীল লেখক।[১১] আধুনিক পারস্যের রাজধানী তিহরান থেকে অল্প দূরে আল-রায়ি নামে একটি স্থানে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জন্মস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁর ওই রকম নাম রাখা হয়েছিল। বাগদাদের বিশাল হাসপাতালটির[১২] তিনিই ছিলেন প্রধান চিকিৎসক। শোনা যায়, হাসপাতালটির জন্য একটি নতুন জায়গা খোঁজার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে মাংসের টুকরো ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। যে জায়গায় মাংসের টুকরোতে সবচেয়ে কম পচন[১৩] ধরেছিল, সেই জায়গাটিই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাকেই শল্যচিকিৎসার জনক বলে গণ্য করা হয়। ফিহ্‌রিস্ত-এ[১৪] আল-রাজির ১১৩টি বড় ধরনের ও ২৮টি ছোট গবেষণা কাজের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ১২টিতে মধ্যযুগের রসায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের রসায়ন সম্পর্কে তাঁর প্রধান কাজগুলির অন্যতম হল কিতাব-আল-আসরার (গোপন সমস্যা সংক্রান্ত বই)। অনেকে বইটির সম্পাদনা করার পর শেষ পর্যন্ত ক্রিমোনার বিশিষ্ট অনুবাদক জেরার্ড (মৃ. ১১৮৭) ল্যাটিন ভাষায় এই বইটির অনুবাদ করেন। তখন থেকেই বইটি রসায়ন-সংক্রান্ত জ্ঞানের মূল উৎস হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে জাবির (জিবার)-এর রচনাবলিতে আরও উন্নত চিন্তার প্রকাশ ঘটে। ফলে কিতাব-আল-আসরার নামে বইটির কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যায়। রজার বেকনের দ্য স্পিরিটিবাস এট করপোরিবাস বইটিতে এটির উল্লেখ রয়েছে। আল-রাজি যখন পারস্যে ছিলেন তখন তিনি সিজিস্তানের মানসুর ইবন-ইসহাক আল-সামানির জন্য দশ খণ্ডের একটি বিশাল আয়তনের বই লেখেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নাম অনুসরণে তিনি বইটির নাম দেন কিতাব আল-তিব্‌ব আল-মানসুরি। পঞ্চদশ শতাব্দীর ৮০-র দশকে মিলানে সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'লিব্যর আলমানসোরিস' নামে। সাম্প্রতিককালে বইটির অংশবিশেষ ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলির মধ্যে হাম ও বসন্ত রোগের ওপর লেখা প্রবন্ধটি (আল-জুদারি ওয়াল-হাসবা) অন্যতম। এই বিষয়ের এটিই সবচেয়ে পুরোনো বই। এই বইটির সঠিকভাবেই আরবের চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। এর মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম গুটিবসন্তের রোগ-লক্ষণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব ও রোগমুক্তির উপায় সম্পর্কে ডাক্তারি ব্যাখ্যা দেখতে পাই।[১৫]

এই প্রবন্ধগুলি ভেনিসে (১৫৫৬ খ্রিঃ) ল্যাটিন ভাষায় ও পরবর্তী কালে অন্যান্য আধুনিক অনূদিত হয়েছে। এই [illegible] বইটি প্রমাণ করেছে [illegible] ইত্যাদি

আল-রাজি ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও চিকিৎসক। আল-হাবি (সর্বার্থসাধক বই) ছিল তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। আনজু বংশের প্রথম চার্লসের উদ্যোগে সিসিলির ইহুদি চিকিৎসক ফারাজ বেন-সালিম ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওই বইটি প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৪৮৬ সালে বইটি পুনরায় 'কন্টিনেনস্' নামে প্রকাশিত হয়। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে বইটির পঞ্চম সংস্করণ বের হয়। নামটি থেকেই বোঝা যায় যে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাবলিতে পরিপূর্ণ এই বইটি ছিল সত্যই এক জ্ঞানকোষ। গ্রিক, পারস্য ও হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যার পাশাপাশি সেই সময়ে আরবেরা চিকিৎসাবিদ্যায় যে জ্ঞান অর্জন করেছিল, বইটিতে তার মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বই ছাপার পদ্ধতি তখনও তার শৈশব পার হয়নি। তবুও বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত আল-রাজির এই বইটি ল্যাটিন ভাষাভাষী পাশ্চাত্যের মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

● আল-মাজুসি

বুয়াহিদ বংশের মহান সম্রাট আযুদ-আল-দাওলা ফান্না খুশর ৯৪৯-৮৩ খ্রিস্টাব্দ[16] পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তাঁর জন্যই আলী ইবন-আল-আব্বাস (হালি আব্বাস মৃ. ৯৯৪ খ্রিঃ) একটি বই লিখে লেখকরূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বইটির নাম 'আল-কিতাব আল-মালিকি' (রাজকীয় পুস্তক, লিবার রেগিয়াস)। বইটির লেখক আলী ইবন-আল-আব্বাস যে একজন জরথুস্ত্রীয় ছিলেন, তাঁর নামের শেষে আল-মাজুসি (প্রাচীন পারস্যের পুরোহিত) থেকেই তা বোঝা যায়। কামিল আল-সিনা আল-তিব্বিয়া নামেও বইটি পরিচিত। এই বইটির মধ্যে একই সঙ্গে দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার[17] সুমহান জ্ঞানভাণ্ডার সংযোজিত হয়েছে। বইটি আল-হাবির চেয়ে সংক্ষিপ্ত। ইবন-সিনার আল-কানুন-এ আরও উন্নত চিন্তার প্রকাশ ঘটার আগে পর্যন্ত ব্যাপকভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই বইটির চর্চা করা হয়েছে। আল-মালিকির সেরা অংশটিতে ওষুধের গুণাগুণ ও প্রয়োগ এবং খাদ্য নির্বাচনবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কৈশিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার আলোচনা এই বইটির অন্যতম মৌলিক অবদান। তা ছাড়া সন্তান প্রসবের সময়ে সে যে নিজে নিজেই বাইরে বেরিয়ে আসে না, বরং জঠরের পেশী সংকোচনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাই-ই গর্ভের সন্তানটিকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে—প্রমাণ সহকারে সেকথাও এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

● ইবন-সিনা

আরবের চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জিতে আল-রাজির পরেই সবচেয়ে বিখ্যাত নামটি হল ইবন-সিনা (ল্যাটিনে আভিসেনা, হিব্রুর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আভেন সিনা, ৯৮০-১০৩৭)। আরবেরা তাকে আল-শাইখ আল-রইস, প্রধান (পণ্ডিতদের মধ্যে) এবং যুবরাজ (পারিষদদের মধ্যে)[18] বলে ডাকত। আল রাজি চিকিৎসক হিসাবে ইবন-সিনার চেয়ে দক্ষ ছিলেন কিন্তু ইবন-সিনা

ছিলেন প্রধানত দার্শনিক। এই চিকিৎসক, দার্শনিক ও কবির মধ্যে দিয়েই আরবের বিজ্ঞান চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছিল বরং বলা ভাল, তার মধ্য দিয়েই যেন আরবের বিজ্ঞান মূর্ত রূপ গ্রহণ করেছিল।

আবু-আলী আল-হুসাইন ছিলেন আবদুল্লা নামে এক ইসমায়িলির (শী'আহ্) ছেলে। বুখারার কাছাকাছি একটি জায়গায় তাঁর জন্ম। কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে তিনি সারাজীবন কাটিয়েছিলেন। মারা যাবার পর হামাদানে তাকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর সেই কবর এখনও দেখা যায়। বুখারার সামানি বংশের সুলতান নুহ্ ইবন-মানসুরকে (শাসনকাল ৯৭৬-৯৭) তিনি রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন। তখন তিনি নিতান্তই এক যুবক। এই কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আবু-আলী আল-হুসাইনকে সুলতানের উন্নতমানের গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। অতি সহজেই বিষয়বস্তুটিকে বুঝতে পারা ও তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। ফলে পারস্যের এই মুসলিম পণ্ডিত রাজ-পরিবারের বিশাল গ্রন্থাগারটির জ্ঞানভাণ্ডার আত্মস্থ করেছিলেন। আল-কিফতির'' তালিকা থেকে ইবন-সিনার ৪৫টি পুস্তকের কথা জানা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের একজন পুস্তক-বিবরণীকারের লেখা থেকে জানা গেছে যে দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও শিল্প সম্পর্কে ইবন-সিনা দু'শোরও বেশি পুস্তক লিখে গেছেন। এর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যময় সৃষ্টি হল একটি দীর্ঘ গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যে 'মানবদেহে স্বর্গ থেকে আত্মার নেমে আসার' কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আরবের পূর্বপ্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও গীতিকাব্যটি মুখস্থ করে থাকে। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রধান দু'টি হল কিতাব আল-শিফা (রোগ নিবারণের উপায় সম্পর্কিত বই) ও আল-কানুন ফী আল-তিব্। এর মধ্যে প্রথম বইটি হল একটি দর্শন-সংক্রান্ত জ্ঞানকোষ। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও নিও-প্লেটোনিকদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত অ্যারিস্টটলের দার্শনিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এই বইটি রচিত। আর দ্বিতীয় বইটিতে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে গ্রিক ও আরবদের চিন্তা-ভাবনার সার-সংকলন করা হয়েছে। কানুনের আরবী সংস্করণ ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে রোমে প্রকাশিত হয়। আরবে যে সমস্ত বই শেষ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে'' বইটি তার অন্যতম। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রেমোনার জেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় বইটির অনুবাদ করেন। সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডার, সুশৃঙ্খল বিন্যাস ও দার্শনিক পরিকল্পনার সাহায্যে বইটি শীঘ্রই গ্যালেন, আল-রাজি ও আল-মাজুসির বইয়ের বদলে ওই যুগের চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বইগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে নেয়। এমন কী ওই বইটি ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার স্কুলে পাঠ্যবইয়ে পরিণত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ তিরিশ বছরে ল্যাটিন ভাষায় বইটির ১৫টি সংস্করণ ও হিব্রুতে ১টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিক কালে ইংরাজি ভাষায় বইটির আংশিক অনুবাদ হয়েছে।'' বইটির মধ্যে যক্ষ্মারোগের সংক্রামক চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, জল ও মাটির সংস্পর্শে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। রোগটির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে বইটিতে এটিও আলোচনা করা হয়েছে যে, অন্ত্রে এক ধরনের [illegible] থেকেই এই রোগের সৃষ্টি। ওষুধ সম্পর্কে বইটির মধ্যে যে অংশটি

আছে তাতে ৭৬০টি ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বইটিই পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যার মূল পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে এসেছে। মুসলিম প্রাচ্যে বইটি এখনও যথারীতি ব্যবহার করা হয়। ডঃ ওসলার[১১]-এর ভাষায় বলা যায়, "অন্য যে কোন বইয়ের তুলনায় এই বইটি অনেক বেশি দিন ধরে চিকিৎসাবিদ্যার বাইবেল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।"

এছাড়া আলী ইবন-ঈসা (জেসু হালি) ছিলেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ (কাহ্হাল)। আলী ছিলেন একজন খ্রিস্টান। আল-মুতামিদ-এর রাজ-চিকিৎসক ঈসা ইবন-আলীর[১২] সঙ্গে প্রায়ই তাঁর নাম গুলিয়ে ফেলা হয়। তার দেড় শতাব্দী পরে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগদাদে আলী ইবন-ঈসার-এর পরিচিতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। চক্ষু-চিকিৎসা সম্পর্কে মধ্যযুগে ৩২টি আরবী গ্রন্থের মধ্যে তাঁর লেখা তাজকিরাত আল-কাহ্হালিন[১৪] (চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি পরামর্শ) প্রাচীনতম ও উৎকৃষ্টতম বইগুলির অন্যতম। কেবলমাত্র ইবন-মাসাওয়াইহ্ ও হুনায়ন ইবন-ইসহাকের দুটি প্রবন্ধ এর আগে লেখা হয়েছিল। তাজকিরাতে প্রায় ১৩০ ধরনের চক্ষুরোগের কথা সবিস্তারে বলা আছে। বইটি একবার হিব্রু ও দু'বার ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচ্যে বইটি এখনও ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আরও একজন চিকিৎসক ছিলেন ইবন-জাজলা (বেনজেসলা, বিনজেজিয়া, মৃ. ১১০০ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান।[১৫] তাকবীম আল-আবদান ফী তাদবির আল-ইনসান নামে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে একটি সার-সংকলন মূলক বই লিখেছিলেন (মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তালিকা)। খ্রিস্টান চিকিৎসক ইবন-বুতলানের[১৬] লেখা তাকবিম আল-শিহ্হার অনুসরণে ওই বইটি লেখা হয়েছে। ইবন-বুতলান ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিয়োকে মারা যান। জ্যোতির্বিদ্যার সারণিতে যেমন করে নক্ষত্রদের অবস্থান আঁকা থাকে, তেমনিভাবে, তাকবিমে পরপর রোগের বর্ণনা দেওয়া আছে। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে স্ট্রাসবার্গে ইবন-জাজলার বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আল-মুতাযিদের (৮৯২-৯০২ খ্রিঃ) আস্তাবলের পরিচালক ইয়াকুব ইবন-আখি-হিজামের নাম দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বশেষ চিকিৎসক রূপে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি অশ্বারোহণ (আল-ফুরুসিয়া ওয়া-শিয়াত আল-খয়াল) সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। এটি আরবী ভাষায় লেখা এই ধরনের প্রথম রচনা। এই রচনায় পশু-চিকিৎসা সম্পর্কে প্রাথমিক কলা-কৌশলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে[১৭] এই রচনাটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

● দর্শনশাস্ত্র

মানুষের জ্ঞানলব্ধ চিন্তাশক্তি বস্তুর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যে সত্য জানতে পারে, সেই জ্ঞানই আরবদের কাছে দর্শনশাস্ত্র (ফালসাফা) নামে পরিচিত। তাদের দর্শন প্রধানত ছিল গ্রিক দর্শন। অবশ্যই প্রাচ্য এবং বিজিত দেশগুলির দ্বারা প্রভাবিত এবং মার্জিত। ইসলাম তার নিজস্ব ধ্যান-

ধারণার সাহায্যে একে আত্মস্থ করেছিল এবং তার প্রকাশ ঘটেছিল আরবী ভাষার মাধ্যমে। আরবের এই সমস্ত অধিবাসীরা বিশ্বাস করত যে গ্যালেনের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যেমন গ্রিসের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি অ্যারিস্টটলের ধ্যান-ধারণার মধ্যে দিয়ে গ্রিক দার্শনিক ঐতিহ্যের সার কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছে। তখনকার দিনে গ্রিক দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বলতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারকেই বোঝাত। মুসলিম হিসাবে আরবেরা বিশ্বাস করত যে কোরান ও ইসলামি ধর্মতত্ত্ব আসলে ধর্মীয় আইন ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি। একদিকে দর্শন ও ধর্মের আইন এবং অন্যদিকে দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যেকার সীমারেখার চৌহদ্দিতেই তাদের মৌলিক অবদান নিহিত ছিল। কালক্রমে আরব লেখকেরা তাদের লেখায় ফালাসিফা অথবা হুকামা (দার্শনিক) শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে। যে সমস্ত দার্শনিকদের অনুমান ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাদের সম্পর্কে তারা ওই শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে। আর যে সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনা ধর্মীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠত তাদের সম্পর্কে মুতাকাল্লিমুন বা আহ্‌ল-আল-কালাম (বক্তা, ন্যায়বাগীশ) শব্দটি ব্যবহার করা হত। মুতাকাল্লিমুনরা ছিল অনেকটা খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী ইউরোপের পণ্ডিত লেখকদের সমকক্ষ। তারা প্রস্তাবের আকারে তাদের তত্ত্বকে তুলে ধরত এবং সেই নামেই তাদের ডাকা হত। পরবর্তী কালে কালাম বলতে ধর্মতত্ত্বকেই বোঝানো হতে থাকে এবং মুতাকাল্লিম শব্দটি ধর্মবেত্তা বা ধর্মতত্ত্ববিদকে বোঝাতেই ব্যবহার করা শুরু হয়। আল-গাজ্জালী ছিলেন মূলত একজন ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। আল-কিন্দি, আল-ফারাবি ও ইবন-সিনা প্রাচীন যুগের আরবীয় দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

● আল-কিন্দি

আল-কিন্দি, আবু-ইউসুফ ইয়াকুব ইবন-ইসহাক সম্ভবত ৮০১ খ্রিস্টাব্দে আল-কুফাতে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদেই তাঁর কর্মজীবন বিকাশ লাভ করে। ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই তিনি মারা যান। খাঁটি আরবীয় বংশধর হওয়ার ফলে তিনি 'আরবদের দার্শনিক' উপাধি লাভ করেন। মধ্যপ্রাচ্যের খলিফা রাজত্বে তিনিই ছিলেন অ্যারিস্টলের চিন্তা-ভাবনার প্রথম ও শেষ অনুসারী। শুধু তাই নয়, জাতিতে তিনি ছিলেন আরবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যথেষ্ট উদার। নব্য-পিথাগোরিদের অঙ্কশাস্ত্রকে তিনি সমস্ত বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি বলে মনে করতেন। দার্শনিক আল-কিন্দি একাধারে ছিলেন জ্যোতিষী, রসায়নবিদ, চোখের ডাক্তার ও গানের তাত্ত্বিক। তিনি প্রায় ৩৬১ টি পুস্তক লিখেছিলেন, কিন্তু তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। জ্যামিতিক ও শারীরবৃত্তীয় এবং আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর প্রধান রচনাটি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে চর্চা করা হয়েছে, থিওনের সমালোচনামূলক সংশোধিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ইউক্লিডের আলোকবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটির বদলে আরও উন্নত চিন্তায় সমৃদ্ধ ইবন-আল-হাইসাম-এর প্রবন্ধটি ব্যবহৃত হতে থাকে। ল্যাটিন ভাষায় প্রবন্ধটি অনূদিত হয়। তার নাম দ্য অ্যাসপেক্টিবাস। এটি রোজার বেকনের চিন্তা-ভাবনাকে যথেষ্ট

প্রভাবিত করেছিল। গানের তত্ত্ব সম্পর্কে আল-কিন্দির তিন-চারটি পুস্তক ওই বিষয় সম্পর্কে আরবী ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরানো রচনা। গানের তত্ত্ব সম্পর্কে গ্রিক লেখকদের রচনার যথেষ্ট প্রভাব উপরোক্ত লেখাগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। একটি প্রবন্ধে আল-কিন্দি আরবদেশে গানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ছন্দের (ইকা) ভূমিকা আলোচনা করেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে[২৮] চালু হবার বহু শতাব্দী পূর্বেই মুসলিম দেশগুলিতে তালমাত্রা সম্বলিত গানের প্রচলন ছিল। আরবী ভাষায় লেখা আল-কিন্দির মূল রচনাগুলি পাওয়া না গেলেও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত তাঁর বেশির ভাগ রচনাই এখনও পাওয়া যায়। ক্রিমোনার জেরার্ডের অনুবাদগুলি তার মধ্যে অন্যতম।

● আল-ফারাবি

গ্রিক দর্শনের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সামঞ্জস্য সাধনের কাজটি শুরু করেছিলেন আল-কিন্দি, তিনি ছিলেন আরবের অধিবাসী। পরবর্তীকালে জাতিতে তুর্কি আল-ফারাবি সেই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যান। প্রাচ্যে এই সামঞ্জস্য সাধনের কাজটি সম্পন্ন করেন পারস্যের অধিবাসী ইবন-সিনা।

মুহাম্মাদ ইবন-মুহাম্মাদ ইবন-তরখান আবু-নসর আল-ফারাবির[২৯] (আলফারাবিয়াস) জন্ম হয়েছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানাতে। একজন খ্রিস্টান চিকিৎসক ও বাগদাদের এক খ্রিস্টান অনুবাদকের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরে আলেপ্পোতে সঈফ-আল-দাওলা আল-হামদানির দরবারে তিনি সুফি হিসাবে কাজ শুরু করে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ৮০ বছর বয়সে দামাস্কাসে মারা যান। প্লেটো, অ্যারিস্টটল সম্পর্কে তাঁর রচনাগুলি থেকে জানা যায় যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও সুফি মতবাদের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছিল। এই সমন্বয় সাধনের ফলে মহান স্টাগিরাইটের পরে তিনি সকলের আকাঙ্ক্ষিত 'দ্বিতীয় শিক্ষক' (আল-মুয়াল্লিম আল-সানি) উপাধি লাভ করেছিলেন। অ্যারিস্টটল ও অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকদের ওপর কিছু রচনা ছাড়াও তিনি মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি ও অধিবিদ্যা সম্পর্কে বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হল রিসালাত ফুসুস আল-হিকাম[৩০] (জ্ঞানের মণি-মাণিক্যে পরিপূর্ণ চিঠিপত্র) ও রিসালা ফী আরা আহ্‌ল আল-মদীনা আল-ফযিলাহ্ (উৎকৃষ্ট শহরের মানুষজনের মতামত সম্পর্কে লেখা চিঠিপত্র)।[৩১] প্লেটোর লেখা 'রিপাবলিক'ও অ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শেষের বইটি ও তাঁর আল-সিয়াসা (সিয়াসাত) আল-মাদানিয়া (রাজনৈতিক শাসনকাল) নামের বইটিতে আদর্শ-শহর সম্পর্কে তাঁর ভাবনাকে রূপ দেন। তাঁর ভাবনা অনুযায়ী একটি আধুনিক শহর হল মানবদেহের অনুরূপ একটি যাজকপ্রধান চলমান প্রতিষ্ঠান। মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের মত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করে নিচের কর্মকর্তারা, আবার তাদের আদেশ পালন করে আরও নিচের কর্মীরা। তাঁর আদর্শের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে আদর্শ শহরের লক্ষ্য হল তার অধিবাসীদের সব দিক থেকে সুখী করে

তোলা। আর সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে নৈতিক চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে নিখুঁত বা ত্রুটিহীন হতে হবে।

আল-ফারাবির অন্যান্য লেখা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যোতিষী ও অসাধারণ সঙ্গীতশিল্পী। আরবের সঙ্গীততত্ত্বের জগতে তাকেই সবচেয়ে সেরা বলে গণ্য করা হয়। বিজ্ঞানের দুটি ছোট রচনায় তিনি সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও শুধুমাত্র সঙ্গীতের ওপর তার তিনটি বড় বই আছে। তার মধ্যে কিতাব আল-মুসিকি আল-কবীর (সঙ্গীত সংক্রান্ত সুবিশাল বই)[৬২] সবচেয়ে বেশি পরিচিত। শোনা যায় তাঁর পৃষ্ঠপোষক সঈফ-আল-দৌলাহ্-র উপস্থিতিতেই তিনি বীণা বাজিয়ে তার শ্রোতাদের কখনও হাসাতেন, কখনও বা কাঁদাতেন, আবার কখনও প্রহরী-সহ সকলকেই ঘুম পাড়িয়ে দিতেন[৬৩]। তাঁর সম্পর্কে লেখা পুরানো গানগুলি এখনও মুসলিম ফকিরদের মুখে শোনা যায়।

আল-ফারাবির পরে আরবের সঙ্গীততত্ত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন ইবন-সিনা (১০৩৭ খ্রিঃ)। চিকিৎসকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার কথা এর আগেই বলা হয়েছে। তবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি আল-ফারাবির কাছে ঋণী। ইবন-খাল্লিকানের[৬৪] মতে, "দর্শনশাস্ত্রকে আল-ফারাবির মত আর কেউই এত উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। তাঁর লেখাগুলি পড়ে এবং তাঁর রীতির অনুকরণ করেই ইবন-সিনা খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁর লেখাগুলি এত উপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিল।" আর একথা তো সত্য যে ইবন-সিনাই তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে গ্রিক দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারকে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের বোঝার উপযোগী করে তুলে ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহায্যেই গ্রিক জ্ঞানভাণ্ডার, বিশেষত গ্রিক দর্শনের মৌলিক চিন্তাগুলি ইসলাম ধর্মে সংযোজিত হতে পেরেছিল।

● নিষ্ঠার সমধর্মী (ইখওয়ান আল-সাফা)

চতুর্থ মুসলিম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (হি: ৯৭০) আল-বসরাতে জনপ্রিয় দর্শনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অন্যান্য দর্শনের ভাল জিনিসগুলি সহজেই গ্রহণ করার মত মানসিক উদারতা এদের ছিল তবে পিথাগোরাসের চিন্তা-ভাবনার প্রতি এরা কিছুটা অনুরক্ত ছিল। এই দর্শনটি ইখওয়ান-আল-সাফা (নিষ্ঠার সমধর্মী) নামে পরিচিত ছিল। এই নামটি সম্ভবত কালিলাহ্ ওয়া দিমনায় উল্লিখিত ঘুঘুর গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই গল্পে বলা হয়েছে কীভাবে একদল পশু বিশ্বস্ত বন্ধুর (ইখওয়ান আল-সাফা)[৬৫] মত একে অপরকে সাহায্য করে শিকারির ফাঁদ[৬৬] কেটে পালিয়ে গিয়েছিল।

বাগদাদে ইখওয়ানদের একটি শাখা ছিল। ইখওয়ানরা দর্শন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। আবার তারই পাশাপাশি সম্ভবত গোঁড়া ঈসমাঈলী শী'আহ্‌দের নিয়ে তারা ধর্ম ও রাজনীতি চর্চার একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা ছিল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী। তারা ওই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই তারা দীর্ঘদিন ধরে চলে-আসা জ্ঞানচর্চার

পরিমণ্ডল ও ধর্মবিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। এর ফলে তাদের কাজ ও সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। জ্ঞানকোষের মত সুবিন্যস্ত তাদের একগুচ্ছ চিঠিতে বেশ কিছু অস্পষ্ট নামের উল্লেখ আছে। তাদের তারা ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়েছে। তাদের এই চিঠিগুলি রাসাইল[৩৭] নামেই পরিচিত। চিঠিগুলির মোট সংখ্যা ৫২। এর মধ্যে অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, সঙ্গীত, নীতিশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে অর্থাৎ সে যুগের একজন শিক্ষিত মানুষ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিল বলে মনে করা হয় তার সব কিছু নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ৫১ টি চিঠির আলোচিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করা হয়েছে ৫২তম চিঠিটিতে, এই চিঠিটিকে তাই সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের সমন্বয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আর চিঠিগুলির ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময়ে আরবী ভাষা এত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তার সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নত চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল। ইখওয়ানের[৩৮] রচনার দ্বারা আল-গাজ্জালী গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন'। আর সিরিয়ার গুপ্তঘাতকদের প্রধান রশিদ আল-দিন সিনান ইবন-সুলাইমান সেই লেখাগুলি দক্ষতার সঙ্গে[৩৯] নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। বাগদাদে যখন ছিলেন, তখন সিরিয়ার বিশিষ্ট কবি-দার্শনিক আবু-আল-আলা আল-মাআর্‌রী ওই প্রতিষ্ঠানের শুক্রবারের সভায়[৪০] যোগ দিতেন। বিখ্যাত মুতাজিলাপন্থি আবু-হায়্যান আল-তাওহিদি (মৃ. ১০২৩ খ্রিঃ[৪১]) আল-রওয়ানদি (মৃ. ৯১৫ খ্রিঃ) আল-মাআর্‌রী-র (মৃ. ১০৫৭ খ্রিঃ) সহায়তায় ইসলামের চরম বিদ্বেষী[৪২] তিনজনের একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এই আবু-হায়্যান ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ সংস্থাটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন না; কিন্তু তিনি ছিলেন ওই সভার এক ছাত্র।

● জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র

বহুদিন আগেই ইসলাম ধর্মে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল। এর পিছনে ছিল 'সিদ্ধান্ত' (আরবী ভাষায় সিন্দহিন্দ) নামে একটি ভারতীয় বইয়ের প্রভাব। ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে বইটি বাগদাদে পৌঁছায়, মুহাম্মাদ ইবন-ইব্রাহিম আল-ফাজারি এটির অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে আরবীয় পণ্ডিতেরা এই বইটিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সাসানি আমলে পহ্‌লবী সারণি (জিক) তৈরি হয়। শীঘ্রই এটির অনুবাদ (জিজ) করা হয়। সময়ের দিক থেকে গ্রিক দর্শনের শেষ দিককার চিন্তা-ভাবনাগুলি গুরুত্বের দিক থেকে ছিল প্রথম। টলেমির লেখা আলমাজেস্ট অনূদিত হওয়ার ঠিক পরেই ওই একই বিষয়ের ওপর দুটি উন্নতমানের বই লেখা হয়। তার একটি লেখেন আল-ইজ্জাজ ইবন মাতার। বইটি লেখা হয় ২১২ হিজরী সনে (৮২৭-২৮ খ্রিঃ)। অপর বইটি লেখেন হুনায়ন ইবন-ইসহাক এবং সেটি সংশোধন করেন সাবিত ইবন-কুররা (মৃ. ৯০১ খ্রিঃ)। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে উন্নতমানের যন্ত্রের সাহায্যে জুন্দেসাবুর-এ (দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে) নিয়মিত ভাবে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ (রাসদ) শুরু হয়েছিল। বাগদাদে শাম্মাসিয়া দরজার কাছে আল-মামুন একটি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। ধর্মান্তরিত ইহুদি সিন্দ

ইবন-আলি ও ইয়াহিয়া ইবন-আবি-মানসুর (মৃ. ৮৩০ বা ৮৩১ খ্রিঃ)[৪৩] ছিলেন এই কেন্দ্রের পরিচালক। এখান থেকে খলিফার জ্যোতির্বিদরা নিয়মিতভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। এছাড়াও তারা 'আলমাজেস্ট' বইটিতে আলোচিত, গ্রহণের তির্যক গতি, বিষুবরেখার সামনে এগিয়ে যাওয়া, সৌরবর্ষের মেয়াদ ইত্যাদি পরীক্ষা করতেন।[৪৪] দামাস্কাসের বাইরে মাউন্ট কাসিয়ুন[৪৫]-এ আল মামূন একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সে যুগে প্রধানত কোণ পরিমাপক যন্ত্র, জ্যোতির্যন্ত্র, ঘড়ি ও ভূ-গোলক ব্যবহার করা হত। ইব্রাহিম আল-ফাজারি (মৃ. ৭৭৭ খ্রিঃ) সর্বপ্রথম একটি জ্যোতির্যন্ত্র[৪৬] তৈরি করেছিলেন। আরবী ভাষায় সর্বপ্রথমে গবেষণামূলক পুস্তিকা লিখেছিলেন আলি ইবন-ইসা আল-আস্তুরলাবি (জ্যোতির্যন্ত্রের নির্মাতা)। ৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই বাগদাদ ও দামাস্কাসে তার কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল।

আল-মামূনের জ্যোতির্বিদেরা পৃথিবীর ওপর অঙ্কিত একটি কৌণিক রেখার দৈর্ঘ্য মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভৌগোলিক দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে এটি ছিল সত্যই একটি চমকপ্রদ সাফল্য। পৃথিবী গোলাকার-এই অনুমানের ভিত্তিতে তার পরিধি ও আয়তন নির্ণয় করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। পালমিরার কাছে ইউফ্রেটিসের উত্তরে সিনজার নামে একটি সমভূমিতে তাঁরা এই রৈখিক কোণের মাপ নিয়েছিলেন। মধ্যরেখা পর্যন্ত অঙ্কিত এই কৌণিক রেখার দৈর্ঘ্য ছিল ৫৬২/৩ আরবীয় মাইল। এটি ছিল নিঃসন্দেহে নির্ভুল পরিমাপ এবং ওই জায়গায় কৌণিক রেখার প্রকৃত দৈর্ঘ্যের চেয়েও তা ছিল ২৮৭৭ ফুট[৪৭] বেশি। এর ফলে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের পরিমাপ হবে যথাক্রমে ২০,৪০০ মাইল ও ৬,৫০০ মাইল। মুসা ইবন-শাকিরের পুত্ররা এবং সম্ভবত আল-খওয়ারিজমি এই কাজে অংশ নিয়েছিল। আল-খওয়ারিজমি যে সারণিটি (জিজ) তৈরি করেছিলেন, ১৫০ বছর পরে স্পেন দেশীয় জ্যোতির্বিদ মাসলামাহ্ আল-মাজরিতি (মৃ. ১০০৭ খ্রিঃ) সেটি সংশোধন করেন। বাথ-এর অ্যাডেলার্ড ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় সেই সারণিটির অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এই ধরনের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ওই সারণিটি মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। আরবের জ্যোতির্বিদদের দ্বারা প্রস্তুত এই ধরনের সারণি তাদের গ্রিক ও ভারতীয় পূর্বসূরিদের তৈরি সারণির পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে শুরু হল। এমন কী চীনদেশের জ্যোতির্বিদরাও আরবদের তৈরি করা সারণি ব্যবহার করা শুরু করল।

ওই সময়ের আর একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ ছিলেন আবু-আল-আব্বাস আহমদ[৪৮] আল-ফারগানি (আলফ্রাগানাস)। তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানার ফরগনার অধিবাসী ছিলেন। আল-মুতাওয়াক্কিল ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে আল-ফুস্তাতে[৪৯] যে নাইলোমিটার তৈরি করিয়েছিলেন, তিনি সেই কাজের দেখভাল করেছিলেন। আল-ফারগানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটির নাম আল-মুদখিল ইলা ইলম হায়াত আল-আফলাক।[৫০] ক্রিমোনার জেরার্ড ও সেভিলের জন ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় বইটির অনুবাদ করেন। বইটি আরবী ভাষাতেও বিভিন্ন নামে[৫১] অনূদিত হয়েছে।

মামুনি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি মুসা ইবন-শাকিরের (৮৫০-৭০ খ্রিঃ) তিন ছেলে বাগদাদে নিজেদের বাড়িতে আর একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। বুয়াহিদ বংশের সুলতান

শরাফ-আল-দাওলা (৯৮২-৮৯ খ্রিঃ) বাগদাদে তাঁর রাজপ্রাসাদে আরও একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে আবদ-আল-রহমান আল-সুফি (মৃ. ৯৮৬ খ্রিঃ), আহমাদ আল-সাগানি (মৃ. ৯৯০ খ্রিঃ) ও আবু আল-ওয়াফা (মৃ. ৯৯৭ খ্রিঃ)[৫২] কাজ করতেন। আবদ-আল-রহমান আল-সুফির লেখা 'আল-কাওয়াকিব আল-সাবিতা' (স্থির নক্ষত্র) মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উন্নতমানের বই। বুয়াহিদ বংশের আর এক সুলতান আল-রায়ির রুকন-আল-দাওলার (৯৩২-৯৬ খ্রিঃ) দরবারে আর একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি হলেন খুরাসানের আবু-জাফর আল-খাজিন।[৫৩] এই বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ গ্রহণের তির্যক গতি নির্ণয় করেছিলেন। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি একটি ঘন সমীকরণ রচনা করেছিলেন। অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরা শীরাজ, নাইসাবুর (নিশাপুর) ও সমরকন্দের আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন।

● আল-বাত্তানি

৮৭৭ থেকে ৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর এক জ্যোতির্বিদ আল-রাক্কায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ও সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে পড়াশোনা করতেন। তাঁর নাম আবু-আবদুল্লা মুহাম্মাদ ইবন-জাবির আল-বাত্তানি[৫৪] (আলবাতেগনিয়াস)। তিনি হাররান-এর একজন সাবিয়ান। নিঃসন্দেহে তাকে তাঁর জাতির ও সময়ের সবচেয়ে সেরা ও মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলে আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন মৌলিক গবেষক। টলেমির তত্ত্বে বেশ কয়েকটি সংশোধনী তিনি যুক্ত করেছিলেন। চাঁদ ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রহের কক্ষপথ নির্ণয়ের ভুলও সংশোধন করেছিলেন। তিনি সূর্যের বার্ষিক গ্রহণের সম্ভাবনা প্রমাণ করেছিলেন। গ্রহণের তির্যক গতির নির্ভুল হিসাব নির্ণয় করা ছাড়াও আর একটি নতুন চাঁদ[৫৫] দেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

● আল-বিরুনী

আবু-আল-রায়হান মুহাম্মাদ ইবন-আহমাদ আল-বিরুনী[৫৬] (৯৭৩-১০৫০ খ্রিঃ) আফগানিস্তানের গজনায় বাস করতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাকেই মুসলিমদের মধ্যে মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আখ্যা দেওয়া যায়। পারস্যের অধিবাসী এই আরবীয় গ্রন্থকার তুর্কি ভাষায় কথা বলতেন এবং পারসি ছাড়াও সংস্কৃত, হিব্রু ও প্রাচীন সিরিয়ার ভাষাও জানতেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত মাহমুদের পুত্র ও তার পৃষ্ঠপোষক মাস্‌উদের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আল-বিরুনী একটি বই লেখেন। বইটির নাম আল-কানূন আল-মাসউদী ফী আল-হায়াহ্ ওয়া-আল-নুজূম। ওই একই বছরে তিনি জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, পাটিগণিত ও জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের আকারে একটি ছোট বই রচনা করেন। তার নাম আল-তাফহিম লি-আওয়ায়েল সিনাআত আল-তানজিম। আল-বিরুনীর লেখা প্রথম বইটির নাম হল, আল-আসার আল-বাকিয়া

আল-কুরুন আল-খালিয়া[৫১]। এই বইটিতে প্রাচীন যুগের মানুষদের দিনপঞ্জি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত বইগুলির মধ্যে আল-বিরুনী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের কক্ষের ওপর পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নির্ভুল ভাবে নিরক্ষরেখা থেকে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব ও দ্রাঘিমার অবস্থান নির্ণয় করেছেন। তিনি ছিলেন শী'আহ্পন্থি ও অপার্থিব কোন সত্তায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। আল-বিরুনী কিছুদিন ভারতে ছিলেন।[৭১] হিন্দু দর্শন পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্থিতি শক্তির নীতির দ্বারা প্রাকৃতিক ঝরনার গতিময়তা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা এবং সিন্ধু উপত্যকাকে পলি পূর্ণ কোন এক প্রাচীন সমুদ্র অববাহিকা বলে আখ্যা দেওয়া তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলির অন্যতম। এছাড়া তিনি শ্যামদেশের একত্রে জোড়া যমজ শিশু[৭২] সহ বিভিন্ন বিরাটাকার প্রাণীর বর্ণনাও এই বইগুলির মধ্যে লিখে গেছেন।

● উমার আল-খইয়াম

সালজুক সুলতানদের মধ্যে জালাল-আল-দীন মালিকশাহ মহাকাশ পর্যবেক্ষণের কাজকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সঠিকভাবে জানা না গেলেও বলা যায় ৪৬৭ হিজরী সনে (১০৭৪-৭৫ খ্রিঃ) আল-রায়ি বা নাইসাবুর নামক স্থানে তিনি একটি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। ক্রান্তীয় বছরের দৈর্ঘ্যের নিখুঁত পরিমাপের ভিত্তিতে এই কেন্দ্রের জ্যোতির্বিদেরা সেই সময়ে প্রচলিত দিনপঞ্জির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছিলেন। পুরোনো পারসিক দিনপঞ্জির সংস্কার করার এই কাজটি করার জন্য সুলতান এই কেন্দ্রে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ উমার আল-খইয়ামকে[৭৩] ডেকে পাঠান। ১০৩৮ থেকে ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে নাইসাবুরে জন্মগ্রহণ করেন উমার, সেখানেই তিনি ১১২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মারা যান। গোটা পৃথিবীর কাছে উমার একজন পারসি কবি[৭৪] ও মুক্ত চিন্তার ধারক রূপেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদও ছিলেন, একথা খুব অল্প লোকই জানতেন। আল-খইয়াম ও তাঁর সহযোগীদের গবেষণার মধ্য দিয়ে এক নতুন দিনপঞ্জিকা তৈরি হয়। খইয়ামের পৃষ্ঠপোষকের নামের অনুকরণে পঞ্জিকাটির নামকরণ আল-তারিক আল-জালালি করা হয়। পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি প্রবর্তিত পঞ্জিকার চেয়ে এটি ছিল অনেক বেশি নিখুঁত। গ্রেগরির পঞ্জিকায় ৩,৩৩০ বছরে সময়ের দিক থেকে ১ দিনের গণ্ডগোল ধরা পড়ে। আর খইয়ামের পঞ্জিকায় ১ দিনের ভুল দেখা যায় ৫,০০০ বছরে।

বাগদাদ ধ্বংস করার এক বছর পরে হুলাগু (১২৫৯ খ্রিঃ) উর্মিয়া হ্রদের কাছে একটি বিরাট মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি শুরু করেন। এটির নাম মারাগা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ নাসির-আল-দীন আল-তুসি[৭৫] (মৃ. ১২৭৪ খ্রিঃ)। আব্বাসি আমলের তিনিই ছিলেন সর্বশেষ জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। মারাগা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতিগুলি ছিল খুবই উন্নত মানের। এগুলির মধ্যে ছিল আর্মিলারি গোলক। এই কেন্দ্রে বসেই নাসির আল-দীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন সারণি তৈরি করেন। প্রথম ইল-খান[৭৬] হুলাগুর সম্মানে এটির নাম

দেওয়া হয় আল-জিজ আল-ইল-খানি। গোটা এশিয়া, এমন কী চীনদেশেও এই সারণি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই কেন্দ্রটি খুব অল্প দিনই টিকে ছিল, কিন্তু এর ভিত্তিটি এখনও টিকে আছে। এর খুব কাছেই একটি গ্রন্থাগার আছে। সেটিও তৈরি করেন হুলাগু। এই গ্রন্থাগার ৪,০০,০০০-এর মত বই আছে। এর বেশির ভাগ বই-ই মোঙ্গল সেনারা সিরিয়া, আল-ইরাক ও পারস্য থেকে লুঠ করে এনেছিল।

● জ্যোতিষবিদ্যা

জ্যোতিষবিদ্যার জননী হল জোতির্বিজ্ঞান। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব[৬৪] হলেন আবু-মাশার (মৃ. ৮৮৬ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন খুরাসানের বলখ অঞ্চলের অধিবাসী। বাগদাদেই তাঁর কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল। খ্রিস্টিয় মধ্যযুগে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রায়ই তাঁর নাম উল্লেখ করা হত। আইকনোগ্রাফিতে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। সেক্ষেত্রে অবশ্য তিনি আলবুমাসার নামে পরিচিত ছিলেন। সেভিলের জন ও বাথের অ্যাডেলার্ড দ্বাদশ শতাব্দীতে আলবুমাসারের চারটি বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। মানুষের জন্ম, জীবনের ঘটনাবলি ও মৃত্যুর কারণ হিসাবে নক্ষত্রের প্রভাবের ওপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এছাড়া তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে তিনি জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে চাঁদের উদয় ও অস্ত যাবার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। জ্যোতিষবিদ্যার ওপর কয়েকটি মুসলিম গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, বিশেষত স্পেনে। আর খ্রিস্টান ইউরোপের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে তা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল।

● আরবীয় সংখ্যা

আল-মানসূরের দরবারে সিন্দহিন্দ নামে জ্যোতির্বিদ্যার একটি বই পৌঁছে দিয়েছিলেন এক হিন্দু পণ্ডিত। সেই হিন্দু পণ্ডিতই আবার বিভিন্ন সংখ্যা সহ হিন্দু পাটিগণিত (আরবী ভাষায় 'হিন্দী' নামে পরিচিত) ও শূন্যের[৬৫] প্রচলন করেছিলেন। আল-ফাজারি হিন্দু অঙ্কশাস্ত্রের যে অনুবাদ করেছিলেন, তার সাহায্যেই মুসলিমরা সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে শুরু করে। সম্ভবত আল-খওয়ারিজমি ও হাবাশ আল-হাসিব (মৃ. ৮৬৭ ও ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে)-এর সারণিগুলিই আরব দুনিয়ায় সংখ্যার ব্যবহার ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু অঙ্কশাস্ত্রে যে সমস্ত নতুন জিনিসের আবিষ্কার হয়েছিল, আরবের জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা অনেক দেরি করে সেগুলি গ্রহণ করেন। একাদশ শতাব্দী নাগাদ আবু-বকর মুহাম্মাদ আল কারাজি (ভুলক্রমে কারখি নামে পরিচিত, (মৃ. ১০১৯ ও ১০২৯ খ্রিঃ-এর মাঝামাঝি) তার 'আল-কাফি ফী আল-হিসাব' (পাটিগণিতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট) নামের বইটিতে সমস্ত সংখ্যাগুলিকে বানান করে লেখেন। আর পুরোনো সেমিওটিক ও গ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্যান্যরা হিসাব আল-জুম্মাল বা বর্ণমালার অক্ষরগুলিকেই ব্যবহার করতেন। আহমদ আল-নাসাবি[৬৬] (মৃ. ১০৪০) তাঁর আল-মুকনি ফী আল-হিসাব আল-হিন্দি (হিন্দু গণনা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্নকারী) নামের বইতে অনেকটা আধুনিক পদ্ধতিতেই

ভগ্নাংশের ভাগ এবং বর্গমূল নির্ণয় করেছেন। তা ছাড়া আল-খওয়ারিজমির মত তিনিও এই বইতে ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে ব্যবহার করেছেন।

● আল-খওয়ারিজমি

আল-খওয়ারিজমি[৬১] পরিচিত ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন-মুসা (৭৮০-৮৫০) নামেও। আরবীয় অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে তিনিই ছিলেন মুখ্য ব্যক্তি, মুসলিমদের মধ্যে যে সমস্ত মনীষী বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। মধ্যযুগের যে কোন লেখকের চেয়ে তিনি অনেক বেশি গভীর ভাবে অঙ্কশাস্ত্র সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার সারণিগুলির[৬৮] সংকলন করা ছাড়াও তিনি পাটিগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত পুরোনো প্রবন্ধ ও রচনাগুলিরও সংকলন করেছিলেন। তার শেষ বই 'হিসাব আল-জবর অ-আল-মুকাবালা' (সংযোজন ও সমীকরণের গণনা) হল তাঁর প্রধান কাজ। প্রায় ৮০০-র বেশি উদাহরণের সাহায্যে তিনি বইটিতে অঙ্কশাস্ত্রের উপরোক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন। বইটি আরবী ভাষায় এখনও পাওয়া যায়! অবশ্য তাঁর ব্যবহৃত উদাহরণগুলির কয়েকটি নব্য ব্যাবিলনিয়রাও অনুমান করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রেমোনার জেরার্ড ল্যাটিন ভাষায় ওই বইটির অনুবাদ করেন। তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বইটি অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান পাঠ্যবই রূপে ব্যবহার করা হত। আসলে, আল-খওয়ারিজমির লেখা এই বইটিই ইউরোপে বীজগণিতের প্রচলন করে। এমন কী 'বীজগণিত' নামটিও এই বইটির মাধ্যমেই চালু হয়। শুধু তাই নয়, আল-খওয়ারিজমির বইয়ের মাধ্যমে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংখ্যাতত্ত্ব 'অ্যালগোরিজম' নামেই পরিচিত। আল-খওয়ারিজমির[৬৯] নাম অনুসরণেই এই সংখ্যাগুলির ওই রকম নাম দেওয়া হয়েছে। উমার আল-খইয়াম, পিসার লিওনার্ডো ফাইবোনাক্কি (মৃ. ১২৪০ খ্রিঃ-পর) ও ফ্লোরেন্সের মাস্টার জ্যাকব প্রমুখ তিন অঙ্কশাস্ত্রবিদ আল-খওয়ারিজমির চিন্তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে মাস্টার জ্যাকব ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কশাস্ত্রের ওপর ইতালিয় ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি ছ'ধরনের দ্বিখাত সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই দ্বিখাত সমীকরণ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা অঙ্কশাস্ত্রে মুসলিমদের মৌলিক অবদান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, লিওনার্ডোর একটি বইতেও দ্বিখাত সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা আছে। বীজগণিত সংক্রান্ত আল-খওয়ারিজমির চিন্তা-ভাবনার উন্নতি ঘটিয়ে আল-খইয়াম আরও উন্নত ধরনের বীজগণিত[৭০] চালু করেন। এর মধ্যে তিনি দ্বিখাত সমীকরণের বীজগণিতীয় ও জ্যামিতিক সমাধান করেছেন এবং সমীকরণগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগও করেছেন।

● মধ্যযুগের রসায়ন

চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের পর আরবদের সবচেয়ে বড় অবদান হল রসায়নবিদ্যায়। রসায়ন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আরবেরা বস্তুগত পরীক্ষা শুরু

করেন। গ্রিকদের ভাসা-ভাসা অনুমানের পরিবর্তে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের অগ্রগতির ঘটনা। বস্তু সম্পর্কে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও সে সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করার ফলে উপযুক্ত প্রকল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে আরবেরা কখনই বিশেষ অসুবিধায় পড়েনি। যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চূড়ান্ত কোন পদ্ধতিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা ছিল তাদের মননশীলতার দুর্বলতম স্থান।

আরবীয় রসায়নশাস্ত্রের[১১] জনক ছিলেন জাবির ইবন-হাইয়ান[১২] (জেবার)। ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আল-কূফায় তার কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল। মধ্যযুগের রসায়নশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আল-রাজি (মৃ. ৯২৫ খ্রিঃ)-র পরেই তাঁর স্থান। লোককথায় বলা আছে, উমাইয়া বংশের রাজপুত্র খালিদ ইবন-ইয়াজিদ ইবন-মু'আবিয়া (মৃ. ৭০৪ খ্রিঃ) ও ষষ্ঠ ইমাম, আল-মদীনার জাফর আল-সাদিক ছিলেন তাঁর দুই শিক্ষক। মিশর ও গ্রিসের পূর্বসূরিদের মত জাবিরও বিশ্বাস করতেন যে কোন এক রহস্যময় পদার্থের সাহায্যে টিন, সীসা, লোহা ও তামার মত নিকৃষ্ট ধাতুগুলিকে সোনায় পরিণত করা যায়। সেই রহস্যময় পদার্থটির সন্ধানেই তিনি তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। আগের অন্যান্য রসায়নবিদদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি স্পষ্ট ভাষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলে গেছেন। রসায়নবিদ্যার তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। তার মৃত্যুর দু'শো বছর পরে আল-কূফার একটি ভেঙে যাওয়া রাস্তা পুনরায় তৈরি হচ্ছিল। সেই সময়ে তার রসায়নাগারটি আবিষ্কৃত হয় এবং সেখান থেকে একটি কামানের গোলা ও একটি সোনার তাল উদ্ধার করা হয়। পাশ্চাত্ত্যের ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে জাবির অনেক রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু আরবী ভাষায় তার নামে[১৩] যে ২২ টি বই বের হয়েছে, তার মধ্যে এগুলির উল্লেখ নেই। কিতাব আল-রাহমা (ক্ষমা সংক্রান্ত বই) কিতাব আল-তাজমি (একাগ্রতা সংক্রান্ত) ও আল-জিবাক আল-শারকি (প্রাচ্যে পারদ সংক্রান্ত)-সহ তার পাঁচটি বই ছাপা হয়েছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, ল্যাটিন ও আরবী ভাষায় রসায়নবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর নামে যে একশোটি বই চালু আছে, তার অধিকাংশই তাঁর লেখা নয়। তবুও বলা চলে, যে বইগুলির সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত আছে চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশেই রসায়নবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হিসাবে সেই বইগুলিই চালু ছিল। অবশ্য তার কয়েকটি মৌলিক অবদান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। রসায়নবিদ্যার দুইটি প্রধান প্রক্রিয়া লঘুকরণ ও তাপ প্রয়োগে কোন পদার্থকে চূর্ণ করার পদ্ধতিটি তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। বাষ্পায়ন, ঊর্ধ্বপাতন, গলন ও কেলাসনের প্রক্রিয়াকেও তিনি উন্নত করেছেন। কিন্তু স্থূল সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত এবং লবণের সঙ্গে এই দু'প্রকার অ্যাসিড মিশিয়ে অ্যাকোয়া রিজিয়া বা অম্লরাজ তৈরি করতে তিনি পারতেন বলে যে দাবি করা হয়, তার কোন ভিত্তি নেই। ধাতুর উপাদান সংক্রান্ত অ্যারিস্টটলের তত্ত্বে তিনি উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। আর এই কাজটি তিনি এমন সুন্দরভাবে করেছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক রসায়নের যুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত কিছুটা পরিবর্তিত আকারে জাবিরের উন্নত চিন্তাই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী কালের মুসলিম রসায়নবিদেরা ইবন-হাইয়ানকেই তাঁদের গুরু বলে মানতেন। কবি ও কূটনীতিক আল-তুগরাই[৭৪] (মৃ. ১১২১) ও আবু-আল-কাসিম আল-ইরাকী দুজনেই আরবী ভাষায় লেখালেখি করতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে[৭৫] তাঁদের কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু তাঁরাও জাবিরের প্রবর্তিত পদ্ধতির খুব একটা উন্নতি ঘটাতে পারেননি। মধ্যযুগের রসায়নশাস্ত্রের দুটি অধরা বস্তু 'দার্শনিকের পাথর'[৭৬] এবং অনন্ত পরমায়ু দানের অধিকারী অমোঘ ওষুধের[৭৭] সন্ধান তাঁরা চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আব্বাসি আমলের পর বিশুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন শাখাতেই কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। সুতরাং আজকের মুসলিমরা যদি কেবল মাত্র তাদের বইয়ে মুদ্রিত জ্ঞানের ওপরেই নির্ভর করে থাকে, তা হলে তারা জ্ঞানের দিক থেকে তাদের দূর অতীতের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের স্তর থেকেও অনেক পিছনে পড়ে থাকবে। চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিমদের চিন্তা-ভাবনা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তারপর আর কোন অগ্রগতি ঘটেনি। ঐতিহ্য এবং অতীতের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আরবদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবেমাত্র সেই বাধার প্রাচীর ভাঙতে শুরু হয়েছে। তবে মধ্যযুগের ইসলামের এটা একটা চিরকালীন গৌরব যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে তারাই প্রথম প্রাচীন সেমিওটিক সভ্যতার সঙ্গে গ্রিক দর্শনের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিল। আর এর ফলেই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপ আধুনিক চিন্তাধারার[৭৮] সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে পেরেছিল।

প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরবের মুসলিমদের অবদান খুবই কম, তা কেবলমাত্র জীববিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু স্পেনীয় মুসলিমরা উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। পশুজগৎ সম্পর্কে আরবীয় লেখকদের রচনাগুলিতে মূলত পশুদের নাম ও তাদের গুণাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়। তারই পাশাপাশি কবিদের উক্তি উদ্ধৃত করে তাদের বর্ণনাগুলিকে যুক্তিগ্রাহ্য করার একটা চেষ্টাও এই রচনাগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই। শুধুমাত্র ঘোড়া সম্পর্কে তাদের লেখাগুলি সত্যই ব্যতিক্রমী এবং তা প্রায় একটি বিজ্ঞানের স্তরে পৌঁছেছিল। এই পশুটির বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামকরণ, তাদের বিভিন্ন রঙের বর্ণনা এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলি[৭৯] সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রবন্ধ তখন প্রকাশ পেয়েছিল।

● আল-জাহিয

প্রাণীবিজ্ঞান ও নৃ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রথম দিককার এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন আবু-উসমান আমর ইবন-বাহ্‌র আল-জাহিয (বড় বড় চোখের অধিকারী, ৮৬৮-৬৯ খ্রিঃ)। আল-বসরাতে তার কর্মজীবনের বিকাশ ঘটেছিল। তার লেখা 'কিতাব আল-হায়াওয়ান' (পশুদের জীবন সংক্রান্ত বই) সেই অর্থে জীববিজ্ঞান মূলক নয়, বরং তুলনায় তা অনেক বেশি ধর্ম ও লোকাচারের ভিত্তিতেই রচিত। তবে পরবর্তী সময়ের বিবর্তনবাদ, অভিব্যক্তি তত্ত্ব ও প্রাণী মনস্তত্ত্বের অঙ্কুর বলে বইটিকে আখ্যা দেওয়া যায়। এই বইটিতে লেখক অ্যারিস্টটলের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আল-জাহিয

শুষ্ক পাতন পদ্ধতিতে মৃত জীবজন্তুর নাড়িভুঁড়ি থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে পারতেন। পরবর্তী সময়ের প্রাণীবিজ্ঞানী, বিশেষত, সৃষ্টির গঠনতত্ত্ববিদ আল-কাজবিনি (মৃ. ১২৮৩)[৮০] পারসি এবং আল-দামিরি (মৃ. ১৪০৫) মিশরিয় হলেও উভয়েই আরবী ভাষায় লিখতেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তারা দুজনেই প্রাণীবিজ্ঞানকে ভাষাতত্ত্ব সাহিত্যের একটি অংশ বলে মনে করতেন। আল-দামিরি ছিলেন সর্বশেষ্ঠ আরবীয় প্রাণীবিজ্ঞানী[৮১]। কিন্তু একজন প্রগতিশীল ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে আল-জাহিযের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। তিনি একটি মুতাজিলা সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন। তারা তাঁর নাম[৮২] বহন করত। আরবীয় পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম সৃজনশীল ব্যক্তি। আরবীয় সাহিত্যে[৮৩] প্রায়ই তাঁর নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। মৌলিকতা, কৌতুক, বিদ্রূপ ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল, কিন্তু তার ঘৃণ্য কদর্য চেহারার জন্যই মুতাওয়াক্কিল তাকে তাঁর ছেলেদের[৮৪] শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করেননি।

● মণি-মাণিক্য সংক্রান্ত বিদ্যা

মধ্যযুগের রসায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ রত্নবিদ্যায় আরবেরা খুব অল্পই উন্নতি করেছিল। মূল্যবান পাথর ও মানুষের জীবনে পাথরের প্রভাব সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ছিল প্রবল। এর ফলে আরবীয় লেখকেরা মূল্যবান পাথর সম্পর্কে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানোটি নবম শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল; এটি লিখেছিলেন উতারিদ ইবন-মুহাম্মাদ আল-হাসিব (সম্ভবত আল-কাতিব[৮৫])। কিন্তু শিহাব-আল-দীন আল-তিফাশি'-র লেখা[৮৬] আজহার আল-আফকার ফী জাওয়াহির আল-আহজার (মূল্যবান রত্নাদি সম্পর্কে চিন্তার মুকুল) সবচেয়ে মূল্যবানগ্রন্থ। এর লেখক ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে মারা যান। আল-তিফাশি ২৪ টি মূল্যবান পাথর, তাদের উৎস, প্রাপ্তিস্থান, বিশুদ্ধতা, দাম, চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব, যাদুকরী ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আর এই আলোচনা করার ক্ষেত্রে মূল্যবান রত্নাদি সম্পর্কে প্লিনি ও অ্যারিস্টটলের সন্দেহজনক রচনাগুলি ছাড়া তিনি কেবলমাত্র আরবীয় বিভিন্ন রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। খ্যাতনামা আল-বিরুনী ১৮ টি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেছিলেন।

● ভূগোল শাস্ত্র

পবিত্র তীর্থযাত্রা, মক্কার দিকে মুখ করে মসজিদগুলি তৈরি করা ও নামাযের সময় কা'বার অভিমুখ নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা মুসলিমদের ভূগোলচর্চায় একটা ধর্মীয় মাত্রা যোগ করেছিল। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর এর বৈজ্ঞানিক প্রভাব পড়েছিল ভূগোল চর্চার ওপর। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম ব্যবসায়ীরা জলপথে ও স্থলপথে পূর্ব দিক দিয়ে চীনদেশে পৌঁছেছিল। এছাড়াও তারা জাঞ্জিবার দ্বীপ ও দক্ষিণ প্রান্তে আফ্রিকার সুদূরতম উপকূল, এমন কী উত্তরে

রাশিয়াতেও পৌঁছে গিয়েছিল। কেবলমাত্র 'অন্ধকারের সমুদ্র' (আটলান্টিক)-এর বিপুল জলরাশি পশ্চিমদিকে তাদের অগ্রগতিকে রুখে দিয়েছিল। ঘরে ফেরা ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্বাভাবিকভাবেই দূরের দেশ ও সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে মানুষের মনে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত সিরাফ-এর সুলাইমান-আল-তাজির দূর প্রাচ্যে তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে এক বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এক অজ্ঞাতনামা লেখক সেই বর্ণনা লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। আর এটিই হল চীন ও ভারতের উপকূল সংলগ্ন দ্বীপগুলি সম্পর্কে আরবী ভাষায় লেখা প্রথম বই। সুলাইমানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, চীনারা তাদের আঙুলের ছাপকে তাদের সই হিসাবে ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে এই সমুদ্রযাত্রা ও একই ধরনের বর্ণনা থেকে নাবিক সিন্দবাদের গল্প তৈরি হয়। রাশিয়া সম্পর্কেও প্রথম বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় আহমাদ ইবন-ফযলান ইবন-হাম্মাদের লেখা থেকে। ৯২১ খ্রিস্টাব্দে আল-মুকতাদির বুলগা রাজার কাছে রাশিয়া সম্পর্কে তার বর্ণনাগুলি পাঠিয়ে দেন। বুলগারের রাজা তখন ভল্‌গা তীরবর্তী কোন এক জায়গায় বসবাস করেন। 'মুজাম আল-বুলদান' নামে ইয়াকুত এর বিশাল ভৌগোলিক অভিধানে এর বেশির ভাগ বর্ণনাই পাওয়া যাবে। আল-মাসউদী তার বর্ণনায় আল-দীর-এর মধ্যে সেই মুসলিম ব্যবসায়ীদের কথাই বলেছেন যারা ছিল মূলত স্লাভ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং নীপার নদীর শাখানদী প্রিপেট-এর কাছে বাস করত।

● ভূগোলচর্চায় গ্রিকদের পূর্ব-অবদান

টলেমি'র লেখা 'জিওগ্রাফি' বইটিতে বেশ কয়েকটি জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের দ্বারা এদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে পরে। বহুবার এই বইটি সরাসরি আরবীতে বা সিরীয় ভাষার মাধ্যমে আরবীতে অনূদিত হয়েছে। সাবিত ইবন-কুররা (মৃ. ৯০১ খ্রিঃ) এই অনুবাদগুলি করেছেন। এই বইটির অনুকরণেই খ্যাতনামা খওয়ারিজমি তাঁর সুরাত আল-আরদ (পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি) বইটি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভূগোল চর্চা ও ওই বিষয়ে মৌলিক নিবন্ধ রচনার কাজে এই বইটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করে গেছে। আল-খওয়ারিজমি এই বইটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে আল-মামুনের নির্দেশে ৬৯ জন পন্ডিতের সাহায্যে 'পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি' নামে একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। এটি ইসলামি ইতিহাসে সৌরজগৎ ও পৃথিবী সম্পর্কে অঙ্কিত প্রথম মানচিত্র। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আল-মাসউদীর কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল। তিনিও এই মানচিত্রের সাহায্য নিতেন। আল-খওয়ারিজমির লেখা ভূগোল বইটি চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবীয় লেখকদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবু-আল-ফিদার লেখাতেও এর প্রমাণ মেলে।

● পৃথিবীর ছাদ

ইতিমধ্যেই আরবের প্রথমদিকের ভূগোলবিদরা ভারত সম্বন্ধে টলেমির জিওগ্রাফি-তে 'ওরিন' বলে উল্লিখিত একটি ধারণা লাভ করেছিলেন। ধারণাটি হল এই যে, ভারতের উজ্জয়িনী শহরে

পৃথিবীর একটি কেন্দ্র আছে। এই শহরটির নামটি বিকৃত করে তারা এটিকে বলত 'এরিন'।[১১] শহরটিতে একটি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল এবং তার মধ্যরেখায় 'পৃথিবীর ছাদ'[১২] বা পৃথিবীর চূড়া অবস্থিত। আরব ভূগোলবিদদের মতে, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝামাঝি নিরক্ষরেখার ওপরে 'এরিন' শহরটি অবস্থিত। তারা আরও মনে করত যে, পশ্চিমের প্রধান মধ্যরেখাটি এই পৌরাণিক শহর থেকে ৯০ ডিগ্রি দূরত্বে অবস্থিত। মুসলিম ভূগোলবিদরা সাধারণত বর্তমানে কানারিজ নামে পরিচিত দ্বীপপুঞ্জের প্রধান মধ্যরেখা থেকে দ্রাঘিমার পরিমাপ করতেন। টলেমিও তার কাজে এই প্রধান মধ্যরেখাটি ব্যবহার করেছিলেন।

আরবী ভাষায় ভূগোলের ওপর প্রথম মৌলিক প্রবন্ধগুলি ছিল অনেকটা পথ বিবরণীর মতো। এর মধ্যে পর্যটকদের বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল। পারসি সম্প্রদায়ের মানুষ ইবন-খুরদাযবিহ্ (মৃ. ৯১২ খ্রিঃ) ছিলেন আল-জিবাল (মিডিয়া)-এ ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর। তার লেখা আল-মাসালিক অ-আল-মামালিক[১৩] ছিল এই সিরিজের প্রথম বই। ৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণের দিক থেকে বইটির মূল্য ছিল অসীম। ইবন-আল-ফাকীহ্, ইবন-হাওকাল, আল-মাকদিসি ও পরবর্তীকালের ভূগোল-সংক্রান্ত লেখকেরা এই বইটির সাহায্য নিয়েছেন। আর্মেনিয়া ও খুরাসানে শী'আহ্পন্থি ইবন-ওয়াজিহ্ আল-ইয়াকূবী[১৪] এর কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল। ৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা কিতাব আল-বুলদান[১৫] (বিভিন্ন দেশের বর্ণনা) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরার ওপর বইটিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ৯২৮ খ্রিস্টাব্দের পরেই কুদামা 'আল-খারাজ' নামে একটি বই লেখার কাজ শেষ করেন। কুদামা জন্মসূত্রে ছিলেন খ্রিস্টান, পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে রাজস্ব দপ্তরে অ্যাকাউন্ট্যান্টের পদে আসীন হয়েছিলেন। এই বইটিতে খলিফা-সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করা, ডাক-ব্যবস্থা ও প্রতিটি জেলার ওপর আরোপিত করের পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবন-রুসতা ছিলেন পারসি সম্প্রদায়জাত আর এক আরবীয় ভূগোলবিদ। ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তার 'আল-আলাক আল-নাফিশা[১৬] (ভ্রমণ সংক্রান্ত মূল্যবান বিবরণী) প্রকাশিত হয়। ওই একই বছরে ইবন-আল-ফাকীহ্ আল-হামাদানি তাঁর কিতাব আল-'বুলদান'[১৭] লেখার কাজ শেষ করেন। জন্মস্থানের নাম অনুসরণে আল-ফাকীহ্কে ওই নামে ডাকা হয়। তার লেখা বইটিকে ভূগোল সম্পর্কে একটি সামগ্রিক রচনা বলা যেতে পারে। আল-মাকদিসি ও ইয়াকূত তাঁদের লেখালেখির মধ্যে প্রায়ই এই বইটির উল্লেখ করেছেন।

● সাহিত্যের জ্ঞানসম্পন্ন ভূগোলবিদ

চতুর্থ মুসলিম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আল-ইস্তাখ্রি, ইবন-হাওকাল ও আল-মাকদিসির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত কোন বড় মুসলিম ভূগোলবিদের দেখা মেলেনি। আল-ইস্তাখ্রি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আল-ইস্তাখর (পারসিপোলিস)-এ। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর কর্মজীবন বিকাশ লাভ

করেছিল। তাঁর লেখা মাসালিক অ-আল-মামালিক[৯৯]-এ তিনি প্রতিটি দেশের জন্য রঙিন মানচিত্র সংযোজন করেছিলেন। এই বইটিকে আবু-জাইদ আল-বালখি (মৃ. ৯৩৪ খ্রিঃ) দ্বারা প্রবর্তিত ভৌগোলিক পদ্ধতির সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে। সামানি রাজদরবারে আবু-জাইদের কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল, কিন্তু তাঁর কোন কাজ সংরক্ষণ করা হয়নি। কিন্তু আল-বালখি ও আল-ইস্তাখ্‌রি যে পদ্ধতি চালু করেছিলেন, তা মুসলিম জগতের বাইরের কোন দেশকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তাঁরা তাঁদের ভাষাগত বর্ণনাকে মানচিত্রের সাহায্যে অনেক বেশি প্রাঞ্জল করে তুলেছিলেন। এর প্রতিনিধিরা ছিলেন মূলত পর্যটক। আল-মাসউদী[৯৯] তার লেখায় প্রথম বাতাস চালিত কল-এর উল্লেখ করেছিলেন। আল-ইস্তাখরি হলেন দ্বিতীয় লেখক যিনি এই বাতাসকল (সিজিস্তানে অবস্থিত) সম্পর্কে লিখে গেছেন। আল-ইস্তাখ্‌রির অনুরোধে ইবন-হাওকাল (কর্মজীবন ৯৪৩-৭৭ খ্রিঃ) তাঁর লেখা ভূগোলের বিষয়বস্তু ও মানচিত্রগুলির সংশোধন করেন। ইবন-হাওকাল সুদূর স্পেন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। পরে তিনি গোটা বইটি পুনরায় লিখেছিলেন। এবার তার নাম দিয়েছিলেন আল-মাসালিক অ-আল-মামালিক।[১০০] আল-মাকদিসি (অথবা আল-মুকাদ্দাসি)-র লেখা মৌলিক রচনাও এই শ্রেণীর লেখাগুলির মধ্যেই পড়ে। জেরুসালেম (বাইত আল-মাকদিস)-এ জন্মেছিলেন বলে তার ওই রকম নাম হয়েছিল।

এই বিশিষ্ট ভূগোলবিদ স্পেন, সিজিস্তান ও ভারত ছাড়া অন্য সমস্ত মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশে ঘুরেছিলেন। ৯৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'আহসান আল-তাকাসিম ফী মারিফাত আল-আকালিম[১০১] (বিভিন্ন স্থানের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের দিক থেকে সবচেয়ে সেরা) নামে একটি সুন্দর বই লেখেন। এই বইটিতে তাঁর ২০ বছরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা আছে। এতে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও নতুন তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

একই সময়ে ইয়ামান জাত ভূগোলবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক আল-হাসান ইবন-আহমাদ আল-হামদানির আবির্ভাব ঘটেছিল। সানার একটি কারাগারে তিনি মারা যান (৯৪৫ খ্রিঃ)। আল-ইকলিল[১০২] ও সিফাত জাজিরত আল-আরব[১০৩] নামে তাঁর লেখা দুটি বই থেকে আমরা ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামি আরব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। এই সময়ের বিশ্ব-পর্যটক আল-মাসউদীর কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল, আমরা তাকে ইতিহাসবিদ বলেও গণ্য করে থাকি। এই সময়েই ইখওয়ান-আল-সাফার কর্মজীবন বিকাশ লাভ করে। তিনি তাঁর চিঠিপত্রের[১০৪] যে অংশটিতে মণি-মাণিক্য বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানেই ইখওয়ান-আল-সাফা মহাজাগতিক চক্র সম্পর্কে একটি তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এই চক্রের প্রভাবেই শস্যশ্যামলা দেশ মরুভূমিতে ও মরুভূমি উর্বর দেশে এবং শুষ্ক, উদ্ভিদহীন ও তৃণাবৃত অঞ্চলকে সমুদ্রে এবং সমুদ্র পর্বতমালায় বা শুষ্ক তৃণাবৃত অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়।

● ইয়াকূত

আব্বাসি বংশের পতনের ঠিক পূর্বেই প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভূগোলবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর নাম ইয়াকূত[১০৫] ইবন-আব্দুল্লাহ আল হামাবি (১১৭৯-১২২৯ খ্রিঃ)। ভৌগোলিক অভিধান

মুজাম আল-বুলদান[১০৬] তিনিই রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি মুজাম আল-উদাবা নামে সাহিত্যের একটি অভিধানও তৈরি করেছিলেন। এশিয়া মাইনরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামাতা ছিলেন গ্রিক। হামাহ্ (এজন্য তার পদবি আল-হামাবি) থেকে একজন ব্যবসায়ী যুবক ইয়াকুতকে বাগদাদে নিয়ে আসেন। তিনিই তাঁকে ভালোভাবে লেখাপড়া শেখান। তারপর বহুবছর ধরে ইয়াকুত তাঁর কাছে এক পর্যটক-কেরানি হিসাবে কাজ করেন। এরপর সেই ব্যবসায়ী তাকে মুক্ত করে দেন। জীবন-জীবিকা চালানোর জন্য ইয়াকুত পাণ্ডুলিপি লিখে দেওয়া ও বিক্রি করার পেশা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। ১২১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে খওয়ারিজমে তাতার আগ্রাসনের ঠিক আগে তাঁকে পালিয়ে যেতে হয়। "পুনরুজ্জীবনের[১০৭] দিনে কবর থেকে তুলে আনার সময় মানুষের যে অবস্থা থাকবে, পালানোর সময় ইয়াকুতের অবস্থা ছিল অনেকটা সেইরকম।" যাই হোক, ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে আল-মাওসিলে তার ভৌগোলিক অভিধানের প্রথম খসড়া তৈরি হয়। আর ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোতে এই অভিধানের চূড়ান্ত খসড়া তিনি তৈরি করেন। পরে এই আলেপ্পোতেই তিনি মারা যান। তাঁর এই অভিধান 'মুজাম'-এ বিভিন্ন স্থানের নাম বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো আছে। এই অভিধানটি যথার্থই একটি বিশ্বকোষ। কারণ বইটিতে ওই যুগের ভূগোল সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ছাড়াও ইতিহাস, বিভিন্ন মানবজাতির বিবরণ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।

ভূগোল-সংক্রান্ত এই সমস্ত বইগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি। ফলে ইসলামি সাহিত্যের গুণ সমন্বিত এই ভূগোল বইগুলি ইউরোপের মধ্যযুগের চিন্তার ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। মহাকাশ ভূ-বিদ্যার কিছু কিছু বিষয়, আবু-মাশার দ্বারা উদ্ভাবিত জোয়ার-ভাঁটার কারণ সংক্রান্ত তত্ত্ব, ও পৃথিবীর ওপর অঙ্কিত কোণের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি পশ্চিমের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে বলা যায় যে, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত আল-ফরগানির রচনার অনুবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ওপর অঙ্কিত কোণের দৈর্ঘ সংক্রান্ত বিষয়টি পশ্চিমি জগতে প্রবেশ করেছিল। একইভাবে, গ্রিসের ভূগোল-সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চার যে প্রভাব অ্যারিস্টটল ও টলেমির লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল, তা আরবদের মধ্যেমেই পশ্চিমের দেশগুলিতে পুনরায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, আরবের ভূগোলবিদদের মৌলিক অবদানের বেশির ভাগ অংশই অনুবাদের অভাবে ইউরোপের জ্ঞানজগতে প্রবেশ করতে পারেনি। দূরপ্রাচ্য, প্রাচ্য, সুদানীয় আফ্রিকা, রাশিয়ার শুষ্ক তৃণক্ষেত্রের বর্ণনামূলক ভৌগোলিক বিবরণ, বিশ্বের মানচিত্রের আকারে নিখুঁত মানচিত্র অঙ্কন, একটি দেশকে একক ধরে প্রাদেশিক ভূগোল এবং মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সম্পর্কের বিশ্লেষণ ইত্যাদি এই অবদানের মধ্যে পড়ে। ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী পশ্চিমি দেশগুলি আরবীয় বইগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাদের এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল এই যে, বইগুলি থেকে তারা ক্যালেন্ডার তৈরি, নক্ষত্রের তালিকা ও ঠিকুজি-কুষ্ঠী প্রস্তুত, অ্যারিস্টটল-সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রের গোপন রহস্যের বিশ্লেষণ ইত্যাদি শিখতে চেয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা ও ভূগোল সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অধিকাংশ স্পেন ও সিসিলির মধ্য দিয়ে পশ্চিমি জগতে

প্রবেশ করেছিল। স্পেন ও সিসিলি সম্পর্কে আলোচনার সময়ে কর্ডোভার আল-বিত্রুজি, টলেডোর আল-জারকালি ও পালেরমোর আল-ইদ্রিসির অবদান আলোচনা করা হবে।

● ইতিহাস রচনা

আরবী ভাষায় লেখা প্রথম দিককার ইতিহাস-সংক্রান্ত রচনাগুলি আব্বাসি আমলেই লেখা শুরু হয়েছিল। উমাইয়া আমলে যেগুলি লেখা হয়েছিল তার বেশ কিছু সংরক্ষিত আছে। আমরা জানি যে, ইতিহাসের প্রথম দিককার বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছিল ইসলাম-পূর্ব দিনগুলির মুখে মুখে প্রচলিত রূপকথা ও ছোট ছোট সত্য কাহিনী এবং মহান ধর্মগুরু বা ভবিষ্যৎ বার্তা-বহনকারীর নাম ও জীবন সংক্রান্ত ধর্মীয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে। ইসলাম-পূর্ব দিনগুলিতে এই ধরনের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে আল-কূফা অঞ্চলের হিশাম আল-কালবি (মৃ. ৮১৯ খ্রিঃ) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আল-ফিহরিস্ত-এর[১০৮] তালিকাভুক্ত তাঁর ১২৯টি লেখার মধ্যে মাত্র ৩টির এখনও অস্তিত্ব রয়েছে[১০৯]। তবে আল-তাবারী, ইয়াকূত ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের লেখায় আল-কালবির অন্যান্য লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রথম যে বইটি লেখা হয়েছিল, তার নাম সিরাত রসূল আল্লাহ। মহান ধর্মগুরুর এই জীবনীটি লিখেছিলেন আল-মদীনার মুহাম্মাদ ইবন-ইসহাক। আল-ইরাকের[১১০] অন্তর্ভুক্ত আয়ন আল-তামরে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে খালিদ ইবন-আল-ওলীদ যে ৬৩৩ টি খ্রিস্টান শিশুকে বন্দি করেছিলেন, তাদেরই একজন ছিলেন ইবন-ইসহাকের দাদু ইয়াসার। ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইবন-ইসহাক বাগদাদে মারা যান। কিন্তু তার লেখা মুহাম্মাদের জীবনীটি ইবন-হিশামের[১১১] শেষ দিককার সমালোচনামূলক সংশোধনী গ্রন্থ হিসাবে আমাদের হাতে পৌঁছায়। ইবন-হিশাম ৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে[১১২] মারা যান। মুসা ইবন-উকবা[১১৩] (মৃ. ৭৫৮ খ্রিঃ), আল-ওয়াকিদি[১১৪] (মৃ. ৮২২-২৩ খ্রিঃ) ও অন্যান্যদের লেখা 'মাগাজি' তারপর আমাদের হাতে আসে। উপরোক্ত এই বইটিতে প্রথম দিকের যুদ্ধ ও ইসলামের জয়ের কাহিনী বলা হয়েছে। উপরোক্ত দুজন লেখকই আল-মদীনার লোক। তারও পরে ইবন-সা'দের কলম থেকে আমরা পাই মহান ধর্মগুরু, তার সঙ্গীসাথী ও লেখকের সময় পর্যন্ত সেই ধর্মগুরুর উত্তরসূরিদের (আল-তাবিয়ুন) জীবন-কাহিনী[১১৫] সংবলিত প্রথম বিশালাকার একটি বই। ইবন-সা'দ ছিলেন আল-ওয়াকিদির[১১৬] সচিব। তিনি বাগদাদে ৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। মুসলিম বিজয় সম্পর্কে যে সমস্ত ঐতিহাসিকেরা লেখালেখি করেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য দুই ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইবন-আবদ-আল-হাকাম (মৃ. ৮৭০-৭১ খ্রিঃ) ও আহমাদ ইবন-ইয়াহিয়া আল-বালাযূরি (মৃ. ৮৯২ খ্রিঃ)। ইবন-আবদ-আল-হাকাম ছিলেন একজন মিশরিয়। তার লেখা 'ফুতুহ্ মিশর ওয়া-আখবারুহা'[১১৭] বইটি মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের একটি প্রাচীনতম প্রধান দলিল। আল-বালাযূরি ছিলেন পারসি, তিনি আরবী ভাষায় লিখতেন। তাঁর প্রধান দুটি রচনা ছিল ফুতুহ্ আল-বুলদান[১১৮] এবং আনসাব আল-আশরাফ[১১৯]

(মহান ব্যক্তিদের বংশ-পরিচয় সংক্রান্ত বই)। আল-বালাযুরিই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন শহর ও দেশ জয়ের কাহিনীগুলিকে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর এর মধ্য দিয়েই ইতিহাস-রচনার বিশেষ ধরন হিসাবে প্রবন্ধ লেখার যে রীতি গড়ে উঠেছিল, তার অবসান ঘটল।

● প্রথম দিকের ঐতিহাসিকদের পরিচয়

রূপকথা, হাদীস, জীবনী, বংশবৃত্তান্ত ও সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনার পরিবেশ তখন যথেষ্ট অনুকূল হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে পারসি মডেলই ছিল অনুকরণযোগ্য। আর তার দৃষ্টান্ত হিসাবে পহলবী 'খুদাই-নামাহ' (রাজাদের সম্পর্কে বই)-র মতো বইয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। ইবন-আল-মুকাফ্ফা (৭৫৭) আরবীভাষায় বইটির অনুবাদ করেছিলেন। অনূদিত বইটির নাম ছিল 'সিয়ার মুলুক আল-আজম'। ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্যের সমন্বয়েই এমন একটি পৃথিবীর ইতিহাস রচনার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল যাতে প্রথম দিককার ঘটনাবলি মুসলিম-ইতিহাসের পটভূমি হিসাবে উল্লেখ করা হবে। তবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত ইসলামিক ঐতিহ্যকেই[১১০] অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী বা সমসাময়িক ব্যক্তিদের দেওয়া বর্ণনাগুলিই গ্রহণ করা হত। তারপর মধ্যবর্তী কিছু সাংবাদিকদের ভাষ্যের মাধ্যমে সেগুলিকে লেখক বা রচয়িতার কাছে উপস্থাপন করা হত। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া যেমন সম্ভব হত, তেমনি তার সঠিক দিন, মাস পর্যন্ত উল্লেখ করা যেত। কিন্তু বর্ণিত ঘটনার প্রামাণিকতা সাধারণত সাংবাদিকদের দেওয়া ভাষ্যের ধারাবাহিকতার (ইসনাদ) এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরিবর্তে প্রতিটি সাংবাদিকের পেশাগত সততার ওপরেই নির্ভর করত। তথ্যের বিন্যাস ও শাসকদের ধারাবাহিকতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতই প্রাধান্য পেত। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা বিশ্লেষণ, সমালোচনা, তুলনা বা অনুমিতির ওপর খুব কমই গুরুত্ব দিতেন।

প্রথম দিককার ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমেই ইবন-কুতাইবার নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন-মুসলিম আল-দিনাওয়ারি।[১২১] ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইবন-কুতাইবাহ্ বাগদাদে মারা যান। তার আগেই তিনি কিতাব আল-মাআরিফ[১২২] (জ্ঞানকোষ) বইটি সম্পূর্ণ করে যান। বইটিকে ইতিহাসের একটি ম্যানুয়াল হিসাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর সমসাময়িক আর এক ঐতিহাসিক ছিলেন আবু-হানিফা আহমাদ ইবন-দাউদ আল-দিনাওয়ারি.।[১২৩] ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইসবাহান (ইসফাহান) ও দিনাওয়ার (পার্সিয়ান ইরাকের অন্তর্গত)-এ তাঁর কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল। আল-আখবার আল-তিওয়াল[১২৪] (দীর্ঘ বর্ণনামূলক) তাঁর প্রধান রচনা। পারসি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিচার করলে এটিকে একটি সর্বজনীন ইতিহাস বলে আখ্যা দেওয়া যায়। দুজন ঐতিহাসিকই ছিলেন ইরানের মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইতিহাস ছাড়াও তাঁরা সাহিত্য ও দর্শনের ওপর অনেক বই লিখে গেছেন। ওই একই সময়ে আর একজন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদের কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল, তাঁর নাম ইবন-ওয়াজিহ্ আল-ইয়াকুবী। ২৫৮ হিজরী সনে (মৃ. ৮৭২

খ্রিঃ) তিনি সর্বজনীন ইতিহাস[১২৫]-এর একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। বইটিতে প্রাচীন শী'আহ্ ঐতিহ্যের নিখুঁত চিত্র লিপিবদ্ধ করা আছে। হামজা আল-ইসফাহানি এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইসবাহান ছিল তার কর্মক্ষেত্র, সেখানেই তিনি ৯৬১ খ্রিঃ মারা যান। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক বর্ষপঞ্জি[১২৬] বেশ তাড়াতাড়িই আধুনিক ইউরোপে পরিচিতি লাভ করে। মিসকাওয়াইহ্[১২৭] (১০৩০ খ্রিঃ) ছিলেন অপর মহান পারসি ঐতিহাসিক। বুয়াহিদ বংশের আজদ আল-দাওলার রাজদরবারে তিনি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ৩৬৯ হিজরী সন (৯৭৯-৮০ খ্রিঃ) পর্যন্ত তিনি একটি সর্বজনীন ইতিহাস[১২৮] রচনা করেছিলেন। মিসকাওয়াইহ্ ছিলেন একাধারে একজন দার্শনিক ও চিকিৎসক। শুধু তাই নয়, অগ্রগণ্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। আল-তাবারী ও আল-মাসউদীকে নিঃসন্দেহে অন্যতম দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের আখ্যা দেওয়া যায়।

● আল-তাবারী

কাস্পিয়ান সাগরে দক্ষিণ উপকূলে পারস্যের পর্বত-অধ্যুষিত তাবারিস্তান জেলায় আবু-জাফর মুহাম্মাদ ইবন-জারির আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোরান সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য এবং তারিখ-আল-রুসুল অ-আল-মুলুক[১২৯] (ধর্মপ্রচারক ও রাজাদের ইতিহাস) নামে তাঁর লেখা সুবিশাল ও নিখুঁত ইতিহাসের জন্যই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোরান সম্পর্কে তার ভাষ্যটি[১৩০] ছিল আকারে অনেক বড়। বইটি কোরান সম্পর্কে শুধু প্রাচীনতমই নয়, বরং টীকা-সম্বন্ধীয় ভাষ্যের বৃহত্তম সংগ্রহও বটে। পরবর্তী কালের কোরানের ব্যাখ্যাকারেরা এই বইটিকে ভিত্তি করেই তাদের ভাষ্য রচনা করেছেন। আরবী ভাষায় তিনি সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব ইতিহাস রচনা করেন। মিসকাওয়াইহ্, ইবন-আল-আসীর ও আবু-আল-ফিদার মতো পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা তাঁর এই সুবিশাল বইটিকে নিজেদের কাজের নির্ভরযোগ্য উপাদান রূপে ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতো আল-তাবারীও বিভিন্ন ঘটনাকে সময়ানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন এবং হিজরী সনের ধারাবাহিকতায় ঘটনাগুলিকে তালিকাবদ্ধ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে, তার ইতিহাস শুরু হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল থেকে এবং ৩০২ হিজরী সন (৯১৫খ্রিঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার কথা বইটির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। তার আগে আল-ওয়াকিদি ও অন্যান্যরা এবং তার পরে মিসকাওয়াইহ্, ইবন-আল-আসীর, আবু-আল-ফিদা[১৩১] (১২৭৩-১৩৩১ খ্রিঃ) ও আল্-যাহাবি[১৩২] (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রিঃ) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। শোনা যায় যে, আল-তাবারীর লেখা ইতিহাস বইটির প্রথম সংস্করণটি বর্তমানে বিদ্যমান সংস্করণের দশ গুণ। ধর্মীয় ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ইসনাদ বা বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা করাব পদ্ধতিটি পছন্দ করতেন। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি ইবন-ইসহাক, আল-কালবি, আল-ওয়াকিদি, ইবন-সা'দ ও ইবন-আল-মুকাফ্ফার মতো লেখকদের রচিত সাহিত্যের উপাদান এবং পারসিভাষা থেকে অনূদিত ঐতিহাসিক অনুবাদগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময়ে লোকগাথা এবং বাগদাদ ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে

বিভিন্ন পণ্ডিতদের বক্তৃতা থেকে ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে তিনি পারস্য, আল-ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে[১০৩] ঘুরে বেড়িয়েছেন এমনকী একবার তার খাদ্য জোগাড় করার জন্য জামার আস্তিন বা হাতা পর্যন্ত তাকে বেচে দিতে হয়েছিল। চল্লিশ বছরে আল-তাবারী প্রতিদিন[১০৪] চল্লিশ পাতা করে লিখেছিলেন—লোকমুখে প্রচলিত এই ঘটনা থেকেই জ্ঞান অর্জনের জন্য তার পরিশ্রম ও উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুমান করা যায়।

● আল-মাসউদী

আরবদের 'হেরোডোটাস' নামে খ্যাত আবু-আল-হাসান আলি আল-মাসউদী[১০৫] আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেছিলেন। বর্ষ-ক্রম অনুযায়ী ঘটনার বিন্যাস না করে তিনি বংশ, রাজা ও জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। ইবন-খালদুন ও অপেক্ষাকৃত কম খ্যাত ঐতিহাসিকেরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন। যুবক আল-মাসউদী ছিলেন মুতাজিলাবাদের যুক্তিবাদী আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। সেই সময়কার অধিকাংশ পন্ডিতের মতো আল-তাবারীও জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফলে জন্মস্থান বাগদাদ[১০৬] ত্যাগ করে তিনি এশিয়ার প্রতিটি দেশে ও এমনকী জাঞ্জিবারেও গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দশটি বছর তিনি সিরিয়া ও মিশরে কাটান। এই দুই দেশে থাকাকালীন সময়ে তিনি মুরুজ আল-জাহাব ওয়া-মাআদিন আল-জওহার[১০৭] (স্বর্ণক্ষেত্র ও মূল্যবান রত্নের খনি) নামে তিরিশ খন্ডের একটি বই লেখেন। বইটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এখনও পাওয়া যায়। ইতিহাস ও ভূগোলের এই বিশ্বকোষটিতে মুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রথাগত বিষয়বস্তুর গণ্ডী অতিক্রম করে আল-মাসউদী উদার মানসিকতা ও বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ইন্দো-পারসীয়, রোমান ও ইহুদি ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। বইটির শুরুতেই তিনি লিখেছেন যে, এখন যেগুলি শুষ্ক মরুভূমি সেইস্থানে আগে ছিল সমুদ্র এবং এখন যেখানে সমুদ্র রয়েছে সেগুলি আগে ছিল শুষ্ক মরুভূমি। প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই এই পরিবর্তন ঘটেছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আল-ফুস্তাত-এ মারা যাবার আগে তিনি আল-তানবিহ্ অ-আল-ইশরাফ[১০৯] বইটি শেষ করেন। এই বইটিতে ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্পর্কে তার দর্শনের সংক্ষিপ্তসার এবং ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্রেণী-বিভাজন সম্পর্কে তৎকালীন দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১০৮] আল-মাসউদীর এই বইটি প্লিনির বইয়ের সঙ্গে তুলনীয়।

আল-তাবারী ও আল-মাসউদীর সময়েই ইতিহাস রচনায় আরবেরা তাদের সাফল্যের চূড়োয় পৌঁছেছিল। বলা যায় যে, মিসকাওয়াইহ্-এর (মৃ. ১০৩০ খ্রিঃ) পর আবার দ্রুত অবনতি শুরু হয়। ইজ্জ আল-দিন ইবন-আল-আসীর[১৪০] (১১৬০-১২৩৪ খ্রিঃ) একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম আল-কামিল ফী আল-তারিখ[১৪১] (সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ

বই)। এর মধ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে আল-তাবারীর রচনাগুলিকে তুলে ধরেছেন। এতে ১২৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা আছে। বইয়ের মধ্যে যে অংশটিতে ধর্মযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাকে লেখকের একটি মৌলিক অবদান বলা চলে। এছাড়াও ইবন-আল-আসীর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। বইটির নাম উসদ আল-গাবা[142](ঘন ঝোপের সিংহ)। এতে ৭,৫০০ জন রসূল-সহচরের জীবনী লিপিবদ্ধ করা আছে। তার সমসাময়িক সিবত ইবন-আল-জাওযী[143] (১১৮৬-১২৫৭ খ্রিঃ) ছিলেন এক তুর্কি ক্রীতদাসের সন্তান। তিনি বাগদাদে জন্মেছিলেন। মিরআত আল-জামান ফী তারিখ আল-আইয়াম নামের বইটি তার অন্যতম সৃষ্টি। এতে পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে ১২৫৬ খ্রিঃ[144] পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আছে। আব্বাসি শাসনের শেষদিকে সিরিয়ার প্রধান বিচারক ইবন-খাল্লিকানের (মৃ. ১২৮২ খ্রিঃ) আবির্ভাব ঘটেছিল। মুসলিমদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাতীয় নায়কদের জীবনী-সংক্রান্ত একটি অভিধান রচনা করেছিলেন। তার আগে ইয়াকূত শিক্ষিত সমাজের অভিধান এবং ইবন-আসাকির (মৃ. ১১৭৭ খ্রিঃ) ৮০ খণ্ডে তার জন্মস্থান দামাস্কাসের[145] বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী রচনা করেছিলেন।

বিদেশি ভাষায় লেখা ইতিহাস ও ভূগোলের অন্যান্য সম্পদের মতো আল-তাবারী, আল-মাসউদী, ইবন-আল-আসীর ও তাদের সমবৃত্তিধারী ব্যক্তিদের রচনাবলি মধ্যযুগের পশ্চিমি পাঠকদের কাছে অপঠিত ছিল। আধুনিক যুগে অনেক রচনাই আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অনূদিত হয়েছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবের পন্ডিতদের কোন মৌলিক অবদান নেই। সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে সারটন[146] উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন : "মানবজাতির প্রধান প্রধান কাজগুলি মুসলিমরাই সম্পূর্ণ করেছেন। শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক আল-ফারাবি ছিলেন একজন মুসলিম; শ্রেষ্ঠতম অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবু-কামিল[147] ও ইবরাহীম ইবন-সিনান[148]-ও মুসলিম ছিলেন; শ্রেষ্ঠতম ভূগোলবিদ ও বিশ্বকোষ রচয়িতা আল-মাসউদী ছিলেন মুসলিম; এমনকী শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক আল-তাবারীও একজন মুসলিম ছিলেন।"

● ধর্মতত্ত্ব

আরব ও মুসলিম হিসাবে আরবেরা যে সমস্ত বিষয়ে তাদের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে, এখন আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব। জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখাগুলি এইভাবে বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, ঐতিহ্যবাদ, বিচারশাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব হল প্রধান। ইতিমধ্যেই আলোচিত চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, মধ্যযুগের রসায়ন ইত্যাদি শাখার পন্ডিতেরা ছিলেন ইহুদি, সিরিয়া বা পারস্যের অধিবাসী, কিন্তু বর্তমানে যে সমস্ত শাখাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে তার অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই ছিলেন মূলত আরবের অধিবাসী।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখাগুলি ধর্মীয় আবেগের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, সেগুলির প্রতিই মুসলিম ধর্মাবলম্বী আরবদের আগ্রহ ও মনোযোগ লক্ষ করা যায়। ফলে কোরানের শিক্ষাগুলিকে

বোঝা ও ব্যাখ্যা করার কাজটিই তাদের ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার মূল বিষয়ে পরিণত হয়। দামাস্কাসে প্রথম শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্মের সংস্পর্শে আসার মধ্য দিয়ে যে ধর্মসংস্কারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার পরিণতিতেই মরজিয়া ও কাদারিয়া আদর্শের[১৪৯] উদ্ভব হয়।

পবিত্র কোরানের পরেই সুন্নাহ[১৫০] অর্থাৎ সেই মহান ধর্মপ্রচারকের কাজ, বক্তব্য, নীরব সম্মতি (তাকরীর) ইত্যাদি গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমদিকে মুখে বলা হলেও, দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুহাম্মাদের এই সুন্নাহ লিখিত হাদীসের রূপ গ্রহণ করা হয়। সুতরাং হাদীস বলতে মুহাম্মাদের কোন কাজ বা উক্তির বিবরণীকেই বোঝায়। আরও সাধারণভাবে বললে হাদীস বলতে মুহাম্মাদের কোন সঙ্গী বা তাদের উত্তরসূরিদের[১৫১] কোন কাজ বা বক্তব্যের বিবরণীকে বোঝায়। কোরানের মতো আনুশাসনিক না হলেও ইসলামি আদর্শের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে হাদীস-ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হাদীস হল মুহাম্মাদের বাণী; আর কোরান হল আল্লাহ্‌র বাণী।

হাদীসের মধ্যে কেবল তার অর্থটুকু প্রত্যাদিষ্ট; আর কোরানের শব্দসহ অর্থও প্রত্যাদিষ্ট। ধর্মতত্ত্ব ও বিচারশাস্ত্রের (ফিকহ্) মূল ভিত্তিটি আমরা কোরানেই প্রথম পাই, তারপর হাদীসে পাই তার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। বিশ্বের সমস্ত জাতির মানুষের মধ্যে মুসলিমরাই তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের (হাদীস) ভাণ্ডার থেকে একটি বিজ্ঞান (ইলম) গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

● হাদীস-বিজ্ঞান

ধার্মিক মুসলিমদের কাছে হাদীস-এর বিশেষ জ্ঞানই অচিরেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান[১৫২] হয়ে উঠল। 'জ্ঞানের ভাণ্ডার যদি চীনদেশে থাকে, তবে সেখানে গিয়েই তা অর্জন করতে হবে'—হযরতের ধর্মশিক্ষার এই ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাবী পণ্ডিতেরা জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে খলিফা-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ ও কষ্টকর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হলেন। এই ধরনের ভ্রমণগুলি (আল-রিহলা ফী তলব আল-ইলম)[১৫৩] পরে পরিপূর্ণ ধার্মিক হওয়ার উপায় হিসাবে চিহ্নিত হয়। জ্ঞানের সন্ধানে এই সব অভিযাত্রী বিপদসঙ্কুল ভ্রমণে প্রাণ হারালে তাঁদের ধর্মযুদ্ধে (জিহাদে) নিহত শহীদের সমান মর্যাদা দেওয়া হত।

মুহাম্মাদের মৃত্যুর ২৫০ বছর পরে তার কাজ ও উপদেশাবলীর বিবরণীর সংখ্যা ও প্রতিলিপি অনেক বেড়ে যায়। যখনই ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক দেখা দিত, তখন বিতর্কে লিপ্ত প্রতিটি পক্ষই তাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য মুহাম্মাদের কোন বক্তব্য বা সিদ্ধান্তকে তা সে সত্য বা বানানো যাই হোক না কেন, তুলে ধরত। আলী ও আবু-বকরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, মু'আবিয়া ও আলীর লড়াই, আব্বাসি ও উমাইয়া বংশের পারস্পরিক শত্রুতা, আরবীয় ও অ-আরবীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক—এই ধরনের ও অন্যান্য একই ধরনের ঘটনাবলি হাদীসের বিকৃতি ঘটানোর এবং সেই বিকৃত ধারণা প্রচার করার যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কী, হাদীস-কে মনোমত করে

লেখবার একটা ব্যবসায়িক মূল্য ছিল এবং অনেক শিক্ষক এই কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে আল-কূফাতে তার ফাঁসির আগে ইবন-আবি-আল-আওজা স্বীকার করেন যে, তিনি ৪০০০ হাদীস নিজে উদ্ভাবন করেছেন।[১৫৪] সাধারণভাবে কূফা-পন্থিদের তুলনায় মদীনাপন্থিদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন পক্ষকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না। মুহাম্মাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী এবং হযরতের কাজ ও উপদেশাবলির এক উৎসাহী প্রচারক আবু-হুরাইরাহ্ ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৫৫] তার মৃত্যুর পরে বিনা প্রশ্নে এগুলির অধিকাংশই গোপনে বা অন্যায়ভাবে ঢোকান বলে অভিযোগ তোলা হয়। একই ভাবে আয়িশা ২২১০, আনাস ইবন-মালিক ২২৮৬ ও আবদুল্লা ইবন-উমার ইবন-আল-খাত্তাব ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৫৬]

প্রতিটি নির্ভুল হাদীসের দুইটি অংশ আছে; তার একটিতে রয়েছে বর্ণনাকারীদের সূত্র (ইসনাদ), এবং অপরটি হল মূল পাঠ্যবস্তু (মতন)। সূত্র শৃঙ্খলের পর রয়েছে মূল পাঠ্যাংশ এবং তাতে সরাসরি বলা হয়েছে : 'এ আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (হাদ্দাসা) এবং বি সংশ্লিষ্ট সি-এর ঊর্ধ্বতন ডি-এর সঙ্গে এবং ডি তার ঊর্ধ্বতন ই-এর সঙ্গে, তিনি বলেছেন ......। ইতিহাস রচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই সূত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রচয়িতাদের ক্ষমতা সম্পর্কে বাইরের লোকেরাই সমালোচনা করত। কারণ এরা নিজেদের হযরত মুহাম্মাদের উক্তি ও কাজ সংবলিত হাদীসের পবিত্রতা রক্ষার সদাসতর্ক প্রহরী হিসাবে জাহির করত। এমন সম্ভাবনার কথাও বলা হতো যে তাদের রচনা শেষ পর্যন্ত হযরত-এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এক ধারাবাহিক শৃঙ্খল গড়ে তুলবে। এই সমালোচনার ভিত্তিতেই হাদীসকে খাঁটি (সহীহ্), ভাল (হাসান) ও দুর্বল (জঈফ)[১৫৭]—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীস সম্পর্কে এই বাহ্যিক সমালোচনা যে চরম হাস্যকর পরিণতির উদ্রেক করতে পারে তা এক হাদীসবিদের গল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গল্পটিতে বলা হয়েছে, ওই হাদীসবিদ ব্যক্তিটি এক খ্রিস্টানের দেওয়া এক কাপ মদ পান করল। যখন তাকে বলা হল যে এটি একটি নিষিদ্ধ পানীয় এবং ওই খ্রিস্টানটির এক ক্রীতদাস এক ইহুদির কাছ থেকে ওই পানীয়টি কিনে এনেছে, তখন প্রত্যুত্তরে সে বলল, "আমরা হাদীসবিদরা সুফিয়ান ইবন-উয়াইনা ও ইয়াজিদ ইবন-হারুনের মতো ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য কর্তৃত্ব বলে মনে করি। সুতরাং একজন ক্রীতদাস, একজন ইহুদির কথার ভিত্তিতে কি একজন খ্রিস্টানকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আল্লাহ্র শপথ! দুর্বল বর্ণনাসূত্রের (ইসনাদ) জন্যই আমি এই পানীয় পান করেছিলাম।[১৫৮]

● ছটি পবিত্র গ্রন্থ

তৃতীয় মুসলিম শতাব্দীতে হাদীসের বিভিন্ন সংগ্রহকে ছ'টি বইয়ের মধ্যে সংকলিত করা হয়। তারপর থেকে এই বইগুলি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ছ'টি বইয়ের

মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারীর (৮১০-৭০ খ্রিঃ)[১৫৯] লেখা বইটিই প্রথম ও সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আল-বুখারী ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। পারস্য, আল-ইরাক, সিরিয়া, আল-হিজাজ ও মিশরে তিনি ১৬ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বহু কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই ভ্রমণের সময়ে ১০০০ জন শায়খের নিকট ৬,০০,০০০ হাদীস শুনে তিনি তার মধ্যে থেকে ৭৩৯৭ টি হাদীস[১৬০] বেছে নেন। তারপর বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা, জিহাদ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে হাদীসগুলিকে ভাগ করেন। প্রত্যেকটি হাদীস লেখা শুরুর আগে তিনি স্নান ও প্রার্থনা[১৬১] সেরে নিতেন। এর ফলে তার সংগৃহীত হাদীসগুলি পবিত্রতার মাহাত্ম্যে ভূষিত হয়েছে। কোরান ছুঁয়ে শপথ করার মতো এটি ছুঁয়ে শপথ করলেও সেটি সত্য বলে গৃহীত হয়। কোরানের পর এই বইটিই মুসলিম জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনাকে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সমরকন্দের বাইরে লেখক আল-বুখারীর সমাধি অবস্থিত। তীর্থযাত্রীরা সকলেই সমাধিতে গিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। কারণ, তাদের কাছে হযরত মুহাম্মাদের পরেই তার স্থান।

নায়সাবুর (নিশাপুর) অঞ্চলের মুসলিম ইবন-আল-হাজ্জাজ (মৃ. ৮৭৫ খ্রিঃ)-এর সংকলনটি আল-বুখারীর বইটির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। তার বইটিকেও মুসলিমরা আল-সহীহ্ বা খাঁটি বলে আখ্যা দিয়েছে। ইবন মুসলিমের লেখা সহী'র বিষয়বস্তু ও আল-বুখারীর বইয়ের বিষয়বস্তু প্রায় একই। শুধুমাত্র ইসনাদের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। এই দুটি খাঁটি বইয়ের পরে বাকি চারটির স্থান। অবশ্য মুসলিমদের কাছে বইগুলি পবিত্র বলেই গণ্য হয়। সেই চারটি বই হল যথাক্রমে, আল-বসরার পণ্ডিত আবু-দাউদের (মৃ. ৮৮৮ খ্রিঃ) লেখা সুনান, আল-তিরমিযীর লেখা জামি, কাজবিনের অধিবাসী ইবন-মাজার (মৃ. ৮৮৬ খ্রিঃ) লেখা সুনান এবং আল-নাসাঈ-এর লেখা সুনান। আল-নাসাঈ ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কাতে[১৬২] মারা যান।

কোরানের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় সংযোজনা করা ছাড়াও হাদীসগুলি প্রচারমূলক নীতি ও উদাহরণের সাহায্যে মানুষের সামগ্রিক কর্তব্যের ধারণাগুলিকে মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরেছে। তরমুজ খাওয়ার আগে খড়কে দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হযরত মুহাম্মাদ অভ্যস্ত ছিলেন কি না—এরূপ মামুলি প্রশ্নও হাদীসবিদগণের সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কোরানের একটি সূরায় (১৭ : ১) মুহাম্মাদের অলৌকিক ভ্রমণের (মিরাজ) যে অনিশ্চিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, হাদীসের মধ্যে তার বিস্তৃত ও মনোরম বিবরণ আছে। দান্তের রচনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমি দুনিয়া তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এছাড়া জ্ঞানগর্ভ উপদেশ. ছোট ছোট সত্য কাহিনী. নীতিমূলক রূপক কাহিনী ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা বর্ণনার মাধ্যম হিসাবে হাদীস ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমস্ত হাদীস বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় উপাদান, এমনকী নিউ টেস্টামেন্ট থেকে সংগৃহীত এবং প্রত্যেকটি মুহাম্মাদের উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়েছে। আবু-দাউদের[১৬৩] সংকলনে মুহাম্মাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনা বলানো হয়েছে। অসংখ্য

উপদেশমূলক হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা এটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ একবার মন্তব্য করেছিলেন, যিনি গোপনে ভিক্ষা দেন, তার বাঁ হাতও জানে না যে তার ডান হাত কি করে"। আল-বুখারী[১৬৪] ও মুসলিমের[১৬৫] সংকলনে এর উল্লেখ আছে। মুসলিম ধর্মে মানুষকে অভ্যর্থনা ও সেবা করার যে নীতি প্রচলিত আছে আর কোন উদাহরণই এর থেকে ভালোভাবে তা বোঝাতে পারবে না। তাই হাদীস মুসলিমদের ঘরে একান্ত প্রিয় সাহিত্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় আইন ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত বই হিসাবে স্থান করে নিয়েছে।

● বিচারশাস্ত্র

রোমানদের পর মধ্যযুগের মানুষ হিসাবে আরবরাই বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারশাস্ত্রের চর্চা করেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে সেখানে একটা স্বনির্ভর বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাদের এই বিচার ব্যবস্থাকে আরবেরা বলত ফিকহ্[১৬৬]। কোরান ও সুন্নার (হাদীস) উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং উসুল (মূল ভিত্তি, মৌলিক নীতিসমূহ) নামে খ্যাত ছিল। এর উপর গ্রিক-রোমান বিচার-ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইসলামের অনুশাসনিক নীতি(শারিয়া[১৬৭]) কোরানে উদ্ধৃত ও হাদীসে বিশদভাবে বিশ্লেষিত আল্লাহ্‌র উপদেশাবলি ফিকাহ্‌র মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উপাসনা (ইবাদত), সামাজিক ও আইনগত দায়দায়িত্ব (মুয়ামালাত) এবং শাস্তি সমূহ (উকুবাত) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেই নির্দেশাবলি ছিল ওই সমস্ত উপদেশগুলিতে।

কোরানে বর্ণিত ছয় হাজার আয়াত বা প্রায় সমসংখ্যক আয়াতের মধ্যে দু'শোটিতে, বিশেষত দুই ও চার সংখ্যক সূরাহ্‌তে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই দু'শোটি আয়াতের অধিকাংশই মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ মদীনার পরিবেশ এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সিরিয়া, আল-ইরাক ও অন্যান্য বিজিত দেশগুলির নতুন ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেওয়ানি, ফৌজদারি, রাজনৈতিক ও আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলাই ওই আইনগুলির দ্বারা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এর ফলে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সম্ভাবনা থেকেই দুটি নতুন মৌলিক নীতির সংযোজন ঘটে। তার একটি হল কিয়াস বা অনুরূপ যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ইজমা অর্থাৎ সর্বজনীন সম্মতি। এইভাবেই কোরান ও হাদীসে বর্ণিত আইনের পাশাপশি মুসলিম বিচারশাস্ত্রে আরও দুটি নতুন উৎস-পথ সংযোজিত হল। একটি হল তুলনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপরটি হল মতের ঐক্য। কখনও কখনও রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তাকে পঞ্চম মৌলিক নীতির পর্যায়ে উন্নীত করা হয়নি। হযরত মুহাম্মাদ ইয়ামানে তার নিযুক্ত 'কার্যী' মুয়াজ ইবন-জাবালের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে যে আলোচনা করেছিলেন, তাকে এক কথায় ইসলামি মৌলিক আইনের 'ম্যাগনাকার্টা (মহাসনদ) আখ্যা দেওয়া যায়।

মুহাম্মাদ : "কোন বিষয়ে বিচার করার ক্ষেত্রে তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে?"

মুয়াজ : "আল্লাহ্‌র কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী"।

মুহাম্মাদ : "সেখানে যদি কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?"

মুয়াজ : "আল্লাহ্‌র দূতের সুন্না অনুযায়ী"।

মুহাম্মাদ : "সেখানে যদি কোন নির্দেশ খুঁজে না পাও?"

মুয়াজ : "তা হলে আমি আমার নিজের বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগাব"।[১৬১]

● চারটি নিষ্ঠাবান গোষ্ঠী

ইরাকি গোষ্ঠীর নেতা (আবু হানিফা), বিচারক্ষেত্রে কিয়াস বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুমান প্রয়োগের অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে মদীনা গোষ্ঠী বিশেষভাবে হাদীসের[১৬২] ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। আবু হানিফার প্রকৃত নাম ছিল আল-নুমান ইবন সাবিত। আবু-হানিফা ছিলেন একজন পারসি ক্রীতদাসের[১৬৩] পৌত্র। আল-কূফা ও বাগদাদে তাঁর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল। ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু তিনিই ইসলামের প্রথম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী আইনজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তিনি মুখে মুখেই তার শিক্ষা প্রচার করতেন। তাদেরই একজন আবু-ইউসুফ (মৃ. ৭৯৮ খ্রিঃ) তাঁর লেখা কিতাব আল-খারাজ[১৬৪] নামের বইটিতে তার শিক্ষকের মূল চিন্তাভাবনা আমাদের জন্য সংকলিত করে রেখেছেন। নিজে চালু না করলেও আবু হানিফা বিশ্লেষণ ভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। সমানাধিকার-এর তুলনায় তিনি 'অগ্রাধিকার'-এর (ইস্তিহ্‌সান)[১৬৫] প্রশ্নকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, আল-মদীনার অধিবাসী মালিকের মতো আইন শিক্ষার বিদ্যালয় (মাজহাব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান) চালু করার কোন পরিকল্পনা আবু-হানিফার ছিল না। তবুও তিনিই ইসলামি আইন শিক্ষার সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উদার মতাবলম্বী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গোটা বিশ্বের সুন্নিপন্থি মুসলিমদের প্রায় অর্ধেকই তার শিক্ষাকে মেনে চলে। ভারত, মধ্য এশিয়া ও বর্তমানে অস্তিত্বহীন তুর্কি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম আইন সম্পর্কে আবু-হানিফার ব্যাখ্যাই শাসকগোষ্ঠীর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ধর্মীয়-আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে আবু-হানিফার চিন্তাকেই ভন ক্রেমার ইসলামের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম সাফল্য বলে মনে করেছেন।[১৬৬]

মদীনাপন্থিদের নেতা ছিলেন মালিক ইবন-আনাস (৭১৫-৯৫ খ্রিঃ[১৬৭])। মনে করা হয় যে মুহাম্মাদের জীবন ও মানসিকতার সঙ্গে তিনি অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। জাইদ ইবন-আলীর[১৬৮] (মৃ. ৭৪৩ খ্রিঃ) লেখা সংক্ষিপ্তসারের পর তাঁর লেখা আল-মুঅত্তা[১৬৯] বর্তমানে বিদ্যমান মুসলিম আইনের প্রাচীনতম সংকলন। ১৭০০ আইনি প্রথা সংবলিত এই বৃহৎ বইটি সুন্নাহর সংকলন করেছে, আল-মদীনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ইজমার (মতের ঐক্য)

প্রথম রূপরেখা রচনা করেছে এবং মালিকি মাজহাবের অনুশাসন হয়ে উঠেছিল। এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মাগ্‌রিব ও আন্দালুসিয়া থেকে আল-আওজাই (মৃ. ৭৭৪ খ্রিঃ) ও আল যাহিরি[১৭৭] (৮১৫-৮৩ খ্রিঃ) প্রবর্তিত দুটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় সংস্থাকে নির্বাসিত করেছে। আর এই আচার-অনুষ্ঠানই বর্তমান সময় পর্যন্ত নিম্ন মিশর বাদে পূর্ব আরবসহ গোটা উত্তর আফ্রিকাতেই টিকে ছিল। আবু-হানিফা ও মালিকের পর বিচারশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের চর্চা এত উন্নতি লাভ করেছিল যে, এই দুটি বিষয় আরবীয় মনীষার জগতে সবচেয়ে বেশি অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

ইরাকের উদারপন্থি ও মদীনার রক্ষণশীলরা ছাড়াও সেই সময়ে আর একটি মধ্যপন্থি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনগুলি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলিম আইনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুমান প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন-ইদ্রিস আল-শাফিঈ। তাঁর নাম অনুসরণে এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের 'শাফিঈপন্থি' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কুরায়শ পরিবারের সন্তান শাফিঈ (৭৬৭ খ্রিঃ) গাজ্জায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল-মদীনায় তিনি মালিকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাগদাদ ও কায়রো[১৭৮] ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। কায়রোতেই ৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। সেখানে আল-মুকাত্তামের পাদদেশে তার সমাধিটি তীর্থযাত্রীদের কাছে এখনও একটি পবিত্র ও দর্শনীয় স্থান হিসাবে গণ্য হয়। দক্ষিণ মিশর, পূর্ব আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব, ভারতের উপকূল অঞ্চল ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এখনও শাফিঈ প্রবর্তিত আচার-অনুষ্ঠানই প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। হানাফিপন্থি, মালিকিপন্থি ও হাম্বলীপন্থির সংখ্যা যথাক্রমে ১৮০,০০০,০০০, ৫০,০০০,০০০ ও ৫,০০০,০০০ হলেও শাফিঈপন্থিদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। প্রায় ১০৫,০০০,০০০ মুসলিম শাফিঈ অনুগামী।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চারটি শাখার মধ্যে শেষটি হল হাম্বলীপন্থি। আল-শাফিঈর ছাত্র ও হাদীসের নির্দেশাবলির প্রতি অবিচল আনুগত্যের ধারক ও বাহক আহমদ ইবন হাম্বলের নাম অনুসরণেই এই মতের অনুগামীদের নাম হয়েছে হাম্বলপন্থি। একমাত্র শী'আহ্‌দের বাদ দিলে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে এই চারটি শাখার বিভক্ত হয়ে রয়েছে। বাগদাদে মুতাজিলাদের উদার মতের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নৈষ্ঠিকতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে ইবন-হাম্বলের রক্ষণশীল মতাদর্শ। আল-মামূনের শাসনে তাঁকে জেরার সম্মুখীন ও শিকলে বাঁধা থাকতে হয়েছিল। আল-মুতাসিম তাকে চাবুক মেরেছিলেন ও জেলে পুরেছিলেন, কিন্তু তবুও ইবন-হাম্বল দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কী জেরার সময় অপরাধ স্বীকার[১৭৯] করে যে বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন তার বিন্দুমাত্র সংশোধনেও তিনি রাজি হননি। ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে[১৮০] তার শেষযাত্রায় ৮০০,০০০ পুরুষ ও ৬০,০০০ মহিলা যোগ দিয়েছিলেন. এর থেকেই বোঝা

যায় যে জনজীবনে এই নৈষ্ঠিকতা ও রক্ষণশীলতার প্রবক্তা হাম্বলের কী ব্যাপক প্রভাব ছিল। তার সমাধিটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক সাধুর সমাধি বলে গণ্য হয়। শুধু তাই নয়, আবু-হানিফা, মালিক ও আল-শাফিঈর মতো ইবন হাম্বলকেও তারা 'ইমাম' আখ্যা দিয়েছিল। তার নামে প্রচলিত মুসনাদ[১৮১]-এ ২৮০০০-এরও বেশি হাদীস সংকলিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সংকলনটি মানুষের কাছ থেকে বিশেষ শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। তবে বর্তমানে ওয়াহাবিরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ হাম্বলী আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে না।

ইজমার নীতিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আল-শাফিঈ। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায় লাভ করেছিল একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক ধর্মীয় কৌশল। আর মুসলিমরা তার সাহায্যেই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে কোন গির্জা, যাজকমণ্ডলী বা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি লাভ করেনি, জনমতকে মেনে নেবার ব্যাপারটি তাদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নীতির মাধ্যমেই অপর ভাষায় কোরানের মূল পাঠ মাহাত্ম্য লাভ করেছিল, হাদীসের ছটি আনুশাসনিক বই স্বীকৃতি পেয়েছিল, ধর্মপ্রবক্তার জীবনের আশ্চর্য ঘটনাগুলি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল, মুদ্রণশিল্প মারফত কোরানের অবিকল প্রতিলিপিগুলি অনুমোদন লাভ করেছিল এবং খলিফা হবার ক্ষেত্রে কুরায়শ বংশের সন্তান হতেই হবে, এমন প্রথা রদ করে তুর্কিদেরও খলিফা হবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শী'আহ্পন্থি মুসলিমদের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে এবং তারা 'ইজমা'-কে মেনে নেয়নি। এছাড়াও আলীর বংশধর ইমামরা ভুলের ঊর্ধ্বে এবং তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও বিচার-ক্ষমতা শী'আহপন্থিরা মেনে নিতে পারেনি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপরোক্ত চারটি ধারা প্রথাগত গোঁড়ামি এবং মতবাদ ও বিচারশাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়কে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিল। এরই পাশাপাশি ইজতিহাদ-এর দরজা, অর্থাৎ কোরান ও সুন্নাহ্-র নতুন ব্যাখ্যা অথবা অনুরূপ ঘটনার তুলনা টেনে এনে নতুন মতবাদ গড়ে তোলার সম্ভাবনা সুন্নি সম্প্রদায়ের কাছে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শী'আহ সম্প্রদায়ের মধ্যে মুজতাহিদ বা এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যারা মহিমান্বিত ও আত্মগোপনকারী ইমামদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতেন এবং তাদের আদর্শের ব্যাখ্যা করতেন।

সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরে বহু শতাব্দী ধরে রোম ও গ্রিসের আইন প্রচলিত ছিল। মুসলিম বিচারব্যবস্থাও এই আইনের কাছে যথেষ্ট ঋণী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সুদক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেননি। কোন কোন প্রাচ্যবাদী মনে করেন যে, মুসলিম আইনের বিশেষ কোন ধারাই শুধু নয়, এমন কী তার নীতি ও আইন প্রণয়নের প্রণালীও রোমের আইনের দ্বারা প্রভাবিত। অনুরূপ ঘটনায় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে বিচার করার পদ্ধতিটি জাস্টিনিয়ান আইন স্বীকার করে

নিয়েছে। কেনা, বেচা ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্পর্ক সংক্রান্ত ইসলামিক আইনের ধারাগুলি বাইজানটাইনের কিছু কিছু আইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উইল, ভাড়া দেওয়া ও ভাড়া নেওয়া সংক্রান্ত আইনের ধারাগুলি ইহুদি আইন বা ইহুদি আইনের ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। তবে সিরিয়ার অধিবাসী আল-আওজায়ি (মৃ. ৭৭৪ খ্রিঃ) প্রবর্তিত পদ্ধতিতে রোমান আইনের প্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বেইরুটে[১২] কঠোর পরিশ্রম করে তিনি রোমান আইনের ক্রমবিকাশমান শাখাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পঞ্চম শাখা প্রবর্তনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

● নীতিশাস্ত্র

উপরে আলোচিত আনুশাসনিক আইন (শরিয়াহ্) মুসলিমদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই আইন তাদের বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক এবং অ-মুসলিমদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারেও নির্দেশ দিত। এই পবিত্র আইনের ভিত্তিতে নৈতিক আচরণগুলি স্বীকৃতি পেত এবং কোন্ কোন্ আচরণ অনুচিত সেটাও এই আইনের দ্বারাই ঠিক হত। সমস্ত মানুষের কার্যাবলিই এই আইনের ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) অবশ্যপালনীয় কর্তব্য (ফর্‌জ)—এগুলি পালন করলে আইন অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে এবং পালন না করলে আইনের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; (২) প্রশংসনীয় বা পুরস্কারযোগ্য কর্তব্য (মুস্তাহাব)—এগুলি পালন করলে পুরস্কার দেওয়া হলেও পালন না করলে শাস্তি দেওয়া হবে না; (৩) অনুমতিদানের যোগ্য কার্যাবলি (জায়িয, মুবাহ) এ ব্যাপারে কোন আইনগত নির্দেশ ছিল না; (৪) নিন্দনীয় কাজকর্ম (মাকরুহ)—এই কাজগুলি সমাজের স্বীকৃতি পেত না, কিন্তু শাস্তিযোগ্যও ছিল না; (৫) নিষিদ্ধ কার্যাবলি (হারাম)—এই ধরনের কাজ করলে শাস্তি পেতে হত।

আরবীয় সাহিত্যে নৈতিক শিক্ষা (আখলাক) সংক্রান্ত যে সমস্ত উপাদান আছে, কোরান ও হাদীসের শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত নৈতিকতা সংক্রান্ত[১৩] অসংখ্য বইতে তার সবগুলি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সর্বমোট তিন প্রকার ভিন্ন প্রক্রিয়া ছিল। বেশ কিছু লেখাতে ভালো নৈতিক আচরণ এবং আত্মার উন্নতি ও আচার আচরণের পরিমার্জনা (আদব) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইন্দো-পারসীয় ছোট ছোট সত্য ঘটনা, প্রবাদবাক্য ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের ভিত্তিতেই এই আলোচনাগুলি করা হয়েছে। ইবন-আল-মুকাফ্‌ফা (৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয়) রচিত আল-দুর্‌রাহ আল-ইয়াতিমা[১৪] বইটি এই ধরনের আলোচনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বইটিতে ধৈর্য, সাহস, উদারতা এবং কথোপকথন ও আলাপ-আলোচনায় দক্ষতা ইত্যাদি গুণাবলির প্রশংসা করা হয়েছে। আরবদের ঈশপ বলে পরিচিত লুকমানের প্রবাদ ও নীতিমূলক গল্পে একই ধরনের জনপ্রিয় নৈতিক দর্শনের দেখা মেলে। বাগদাদের

বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ আল-মাওয়ারদি (মৃ. ১০৫৮ খ্রিঃ)[১১৫] পয়গম্বর ও তাঁর সহচরগণের জ্ঞানগর্ভ উক্তি-সমৃদ্ধ যে বইটি লিখেছিলেন, তা মিশর ও সিরিয়ার বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যবই হিসাবে এখনও জনপ্রিয়। আরও এক ধরনের বই আছে তাতে মূলত দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। সত্যি বলতে কী, এই বইগুলিতে নিও-প্লেটোনিক ও নিও-পিথাগোরিয়ান উপাদানের মাধ্যমে অ্যারিস্টটলের দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। অ্যারিস্টটলের লেখা 'নিকোম্যাকিয়ান এথিকস' এই গ্রিক বইগুলির মধ্যে প্রধান। হুনায়ন অথবা তার ছেলে ইসহাক[১১৬] কিতাব আল-আখলাক নামে এই বইটির অনুবাদ করেছেন। অনূদিত বইটি আরবদের নৈতিক দর্শনের (ইলম আল-আখলাক) ভিত্তি রচনা করেছে। অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর দর্শনের মতো আরবের নৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ্য হল পার্থিব সুখ-লাভের পথ প্রশস্ত করা। এই চিন্তার অনুগামীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন ঐতিহাসিক মিসকাওয়াইহ্। তার লেখা বইটির নাম 'তাহ্যীব আল-আখলাক।'[১১৭] একজন মুসলিমের রচিত প্রধানত দর্শন সংক্রান্ত বা নিও-প্লেটোনিক দর্শন জাতীয় বইয়ের এটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নিষ্ঠার সমধর্মী' ইখওয়ান আল-সাফা পত্রাবলির নবম রচনাটি আখলাকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। গ্রিক এথিকসের বৈশিষ্ট্যমূলক ভাণ্ডার পরিব্যাপ্ত হয়েছিল জ্যোতিষবিদ্যা ও ভাববাদী-মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায়। সমধর্মীরা যীশু ও সক্রেটিসকে নৈতিক দিক থেকে আদর্শ মানুষ বলে বিবেচনা করলেও সুন্নিদের কাছে মুহাম্মাদ এবং শী'আদের কাছে আলী হলেন পরিপূর্ণ মানুষ। তৃতীয় ধরনের নৈতিক আচরণকে অতীন্দ্রিয় মনস্তাত্ত্বিক নৈতিকতা বলে আখ্যা দেওয়া যায়। আল-গাজ্জালী ও অন্যান্য সুফি লেখকেরা ছিলেন এই ধরনের নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যাকার। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এই ধরনের সমস্ত মুসলিম নৈতিক দর্শনে, উদাসীনতা, সন্তোষ ও ধৈর্যের মতো গুণাবলির প্রশংসা করা হয়েছে; মানুষের দোষগুলিকে আত্মার ব্যাধি এবং নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন দার্শনিকদের সেই ব্যাধির চিকিৎসক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আত্মার বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষমতার বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই এই ধরনের শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। তবে এই কর্মক্ষমতা গুণ ও দোষের সমন্বয়ে গঠিত।

● সাহিত্য

আব্বাসি শাসনের প্রথম দিকে তাদের অধীন জাতিগুলি, বিশেষত পারসিকদের মধ্যে এক কৌতূহল উদ্দীপক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যে সমস্ত মুসলিমরা আরবীয় মুসলিমদের প্রকৃত বংশধর ছিল বা নিজেদের তাদের বংশধর বলে দাবি করত, দীর্ঘদিন ধরেই তাদের মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবার এক ধরনের মানসিকতা দেখা যাচ্ছিল। ওই মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। কোরানের একটি সূরাহ্ (৪৯ : ১৩) থেকে এই আন্দোলনের নাম হয়েছিল শু'উবিয়াহ্ (অ-আরবীয়, জনসাধারণের)। সমস্ত মুসলমানের

মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যই ছিল সূরাইটির মূল বক্তব্য। খারিজি ও শী'আহ্দের মধ্যে এই আন্দোলন বংশগত ও রাজনৈতিক চরিত্রের রূপ ধারণ করলেও পারস্যের কিছু কিছু অধিবাসীর মধ্যে এই আন্দোলন ধর্মীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এই ধর্মীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ছিল প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী বিশ্বাস ও জিন্দিকিয়। কিন্তু সাধারণভাবে আল-শু'উবিয়াহ্ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাহিত্য-সংক্রান্ত বিতর্ক। মননশীলতায় আরবীয়রা যে শ্রেষ্ঠত্বের ভান করত, এই আন্দোলন তার প্রতি উপহাস করেছিল এবং কবিতা ও সাহিত্যে অ-আরবীয়রাই শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেছিল। আল-বিরুনি ও হামজা আল-ইস্ফাহানির মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্য অ-আরবীয়দের দাবির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। পক্ষান্তরে বিভিন্ন আরবীয় পণ্ডিত এবং আল-জাহিয[১৮৮], ইবন-জুরায়জ[১৮৯], ইবন-কুতাইবাহ্ ও আল-বালাযুরিসহ পারস্য বংশীয় বিভিন্ন পণ্ডিত আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির প্রতি জোরালো সমর্থন যুগিয়েছিল। এই ধরনের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আরবী সাহিত্য রচনার প্রথম দিকে বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের ল্যাটিন সাহিত্য যতটা ইতালিয় ছিল, আরবী সাহিত্য চরিত্রের দিক থেকে তার চেয়ে বেশি আরবীয় ছিল না। যাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন জাতির মানুষ।[১৯০] সামগ্রিক অর্থে এই আরবী সাহিত্য শুধুমাত্র আরবদের সৃষ্টি ছিল না, বরং এটা ছিল একটি মহান সভ্যতার স্থায়ী ঐতিহাসিক দলিল। এমন কী ভাষাবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, অভিধান ও যে ব্যাকরণ রচনার মতো ক্ষেত্রগুলির কাজকর্ম আরব দেশেই প্রথম শুরু হয়েছিল সেজন্যও তাদের বেছে নিতে হয়েছিল কিছু অ-আরব দিকপাল পণ্ডিত ব্যক্তিকে। শব্দের সর্বশেষ মৌলিক বর্ণের ক্রম অনুসারে আল-জাওহারি (মৃ. ১০০৮ খ্রিঃ) অভিধান[১৯১] রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ফারাবের এক তুর্কি।[১৯২] তাঁর এই অভিধানটি পরবর্তীকালের অভিধান রচয়িতাদের কাছে একটি আদর্শ হিসাবে কাজ করে গেছে। তাঁরই সমসাময়িক ইবন-জিন্নি (মৃ. ১০০২ খ্রিঃ) ছিলেন এক গ্রিক ক্রীতদাসের[১৯৩] সন্তান। ইবন-জিন্নি আলেপ্পোতে হামদানি বংশের রাজদরবার অলংকৃত করেছিলেন। দর্শনগত দিক থেকে ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করাটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব।

● কাব্য-নাটক-উপন্যাস

বসরা কেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রধান আল-জাহিয (মৃ. ৮৬৮-৬৯ খ্রিঃ)-এর সময় থেকে আদাব (কাব্য-নাটক-উপন্যাস)-এর সংকীর্ণ অর্থে আরবীয় সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। আর চতুর্থ ও পঞ্চম মুসলিম শতাব্দীতে বাদি আল-জামান আল-হামাদানি ((৯৬৯-১০০৮ খ্রিঃ) নায়সাবুরের অধিবাসী আল-সাআলিবি[১৯৪] (৯৬১-১০৩৮ খ্রিঃ) ও আল-হারিরির (১০৫৪-১১২২ খ্রিঃ) সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আরবীয় সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই সময়ে প্রবন্ধ রচনার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পারসিক সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে প্রবন্ধগুলির মধ্যে অতিমাত্রায়

অলঙ্কার ব্যবহারের একটা প্রবণতা ছিল। অতীতের সহজ, বাহুল্যবর্জিত ও মর্মভেদী প্রকাশভঙ্গি চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছিল—তার পরিবর্তে এসেছিল মার্জিত ও রুচিশীল প্রকাশভঙ্গি এবং প্রবন্ধগুলি লেখার মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মানবতাবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রাধ্যন্য। অবশ্য মননশীলতার দিক থেকে এটিকে অবনতির যুগ বলা যেতে পারে। একদিক থেকে এই যুগটি সর্বহারা সাহিত্যিকদের সমর্থন যুগিয়েছিল। এদের জীবিকা নির্বাহের কোন স্বাধীন উপায় ছিল না। ফলে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত এবং সাহিত্য-সংক্রান্ত কোন বিষয়, ব্যাকরণগত প্রশ্ন বা মামুলি বিষয়কে কেন্দ্র করে কাব্যের সার্থকতা পরিমাপ ইত্যাদি ব্যাপারে জোরদার লড়াই চালিয়ে ধনী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার চেষ্টা করত। এই সময়েই সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের প্রকাশভঙ্গির সৃষ্টি হয়। তাকে 'মাকামা' বলা হয়।

মাকামা (নানা বিষয়ের সমাবেশ) সৃষ্টির কৃতিত্ব দেওয়া হয় বাদি আল-জামান (যুগের বিস্ময়) আল-হামাদানিকে। এটি এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি-এর সাহায্যে লেখক তাঁর কাহিনীর বিন্যাস ঘটান এবং তাঁর কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বাস্তবে মাকামা নামের এই ধরনের প্রকাশরীতি কোন একজন মানুষের একক সৃষ্টি ছিল না। ইবন-জুরায়জ ও তার আগেকার লেখকদের কাব্য সুষমামণ্ডিত গদ্য ও সুন্দর রচনাশৈলীর স্বাভাবিক বিকাশের পথেই এই ধরনের প্রকাশরীতি সৃষ্টি হয়েছিল। আল-হামাদানির রচনাবলি[১১৫] আল-বসরার[১১৬] অধিবাসী আল-হারিরির সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল। তার রচিত মাকামাত[১১৭] সাত শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কোরানের পরেই আরবীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হিসাবে গণ্য হত। আল-হারিরি ও অন্যান্য লেখকদের রচিত এই মাকামাতে সুন্দর রচনাশৈলী ও অলঙ্কারপূর্ণ ছোট ছোট সত্য ঘটনা ছাড়াও আরও কিছু ছিল। অধিকাংশ পাঠকরা সেগুলিকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করত। এই ছোট ছোট সত্য কাহিনীগুলি অনেকক্ষেত্রেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ সমালোচনা এবং তার থেকে উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের কাজেই ব্যবহার করা হত। আরবী ভাষায় কখনও প্রকৃত অর্থে কোন নাটক লেখা হয়নি। তবু বলা যায় যে, আল-হামাদানি ও আল-হারিরির সময় থেকেই মাকামা আরবীয় ভাষায় সাহিত্যশৈলী ও নাটকীয় প্রকাশভঙ্গির সবচেয়ে সুন্দর রীতি হয়ে উঠেছিল। সত্য বা প্রতারণামূলক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত প্রথম দিককার ইতালিয় ও স্পেনীয় গল্পগুলি আরবী ভাষায় রচিত মাকামার সঙ্গে নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ।

মাকামা সৃষ্টি হবার আগে আরবী সাহিত্যে আবু-আল-ফারাজ আল-ইসবাহানি বা আল-ইসফাহানি (৮৯৭-৯৬৭ খ্রিঃ) নামে সাহিত্যিক গুণের অধিকারী এক ঐতিহাসিকের দেখা মেলে। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা মারওয়ানের বংশধর। আবু-আল-ফারাজের কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল আলেপ্পোতে। সেখনে থাকার সময়েই তিনি কিতাব আল-আগানি[১১৮] (গানের বই) রচনা করেন। এই বইটি কাব্য ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ এবং মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কে জানবার এক অপরিহার্য উপাদান। ইবন-খালদূন তার

মুকাদ্দামা[১৯৯] গ্রন্থে এটিকে 'আরবদের দপ্তর' ও 'কাব্য-সাহিত্য-উপন্যাসের ছাত্রদের সবচেয়ে সেরা হাতিয়ার' বলে বর্ণনা করেছেন। আলেপ্পোতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সঈফ-আল-দাওলা আল-হামদানি এই কাজের জন্য[২০০] তাঁর স্রষ্টাকে পুরস্কার হিসাবে এক হাজার স্বর্ণখণ্ড দিয়েছিলেন। আন্দালুসিয়ার দ্বিতীয় আল-হাকাম তাঁকে সমপরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন। বুয়াহিদ আমলের এক উজির আল-সাহির ইবন-আব্বাদ (মৃ. ৯৯৫ খ্রিঃ) তাঁর ভ্রমণের সময় ৩০টি উট বোঝাই করা বইপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শোনা যায় 'আল-আগানি' নামের বইটির একটি কপি পেয়ে তিনি ওই সমস্ত বই ফেলে রেখে যান। পরে তিনি একাই[২০১] ওই বই বয়ে নিয়ে যান।

● দি অ্যারাবিয়ান নাইটস

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু আগে 'আলফ লায়লা ওয়া-লায়লা'[২০২] (এক হাজার এক রাত্রি) বইটির প্রথম খসড়াটি তৈরি হয়েছিল। আল-ইরাকেই এটি রচিত হয়। যে কাহিনীর ভিত্তিতে এই খসড়াটি তৈরি হয়েছিল, সেটা ছিল পুরানো এক পারসিক বই। হাজার আফসানা (হাজার গল্প) নামের এই বইটিতে ভারত ভূখণ্ডের অনেকগুলি গল্প ছিল। এটি লিখেছিলেন আল-জাহশিয়ারি[২০৩] (মৃ. ৯৪২ খ্রিঃ)। স্থানীয় গল্পকারদের[২০৪] অনেক গল্প-ও আল-জাহশিয়ারি বইটিতে যুক্ত করেছিলেন। শাহরাজাদ সহ প্রথম সারির বীর ও বীরাঙ্গনাদের নামের তালিকা, তাদেরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিভিন্ন কাহিনীর পটভূমি ও ঘটনা-তথ্য যুগিয়েছিল এই আফসানায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয়, গ্রিক, হিব্রু, মিশরিয় ও অন্যান্য বহু উৎস থেকে নানা কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বহু শতাব্দী ধরে রূপান্তরিত এই বইটির মধ্যে প্রাচ্যের বিভিন্ন ধরনের লোকগাথাও সংযুক্ত হয়। হারুন-আল-রশীদের রাজদরবারের পণ্ডিতেরাও নানা মজাদার সত্য কাহিনী ও প্রেমের গল্প বইটির সঙ্গে যুক্ত করেন। তা সত্ত্বেও মিশরে মামলুক শাসনের শেষ দিককার আগে দি অ্যারাবিয়ান নাইটস তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেনি। বইটির বহুমুখী চরিত্র এক আধুনিক সমালোচককে সরস মন্তব্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন, অ্যারাবিয়ান নাইটস হল পারসিক গল্প এবং খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রানি ইস্টার[২০৫] কায়রোতে বসে অনেকটা বুদ্ধদেবের অনুসৃত পদ্ধতিতে এই গল্পগুলি হারুন আল-রশীদকে শুনিয়েছেন। গ্যালান্ড[২০৬] সর্বপ্রথম ফরাসি ভাষায় বইটির অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে আধুনিক ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সমস্ত ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। শুধু তাই নয়, মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় আরবী সাহিত্য হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন[২০৭] সর্বপ্রথম ইংরাজি ভাষায় বইটির অনুবাদ করেন। অসম্পূর্ণ হলেও অনুবাদটিকে একদম নিখুঁত বলা যায়। বইটিতে মূল্যবান ও পূর্ণাঙ্গ টীকা আছে। এছাড়া বইটির অনেকগুলি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। তবে জন পেইন কৃত অনুবাদটি[২০৮] ইংরাজি ভাষায় বইটির সেরা অনুবাদ, কিন্তু এতে কোন টীকা নেই। স্যার রিচার্ড এফ বার্টন[২০৯] তার অনুবাদটিতে কবিতা-সংক্রান্ত অংশটি বাদে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে পেইনকে অনুসরণ

করেছেন এবং মূল আরবী বইটির প্রাচ্যদেশীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তার অনুবাদটিকে উন্নত রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

● কাব্য

ইসলাম পূর্ব যুগের জাহিলিয়ার বীরত্বপূর্ণ ঘটনা উমাইয়া আমলের চারণকবিদের সামনে কাব্যের আদর্শ তুলে ধরে। এই চারণকবিরা প্রাচীন গীতিকবিতার অনুকরণে কাব্য রচনা করতেন। আব্বাসি আমলের কবিরা তাদের কাব্যগুলিকে অনুপম সৃষ্টি বলে গণ্য করতেন।

খলিফারা সেই সময়ের কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং আশা করতেন যে, কবিরা তাঁদের কাব্যে খলিফাদের প্রশস্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবেন। তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতা, পারস্য থেকে আসা ধর্মীয় প্রভাব এবং বানু আল-আব্বাসের নতুন রাজত্বে যে ধর্মীয় আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাদের সম্মিলিত প্রভাবেই প্রাচীন গীতিকবিতার অনুকরণে কাব্য সৃষ্টির পথ থেকে বিচ্যুতি শুরু হয় এবং নতুন কাব্যরীতি জন্মলাভ করে। তবু আরবের বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের মধ্যে কাব্যই সবচেয়ে রক্ষণশীল বলে বিবেচিত হত। যুগ যুগ ধরে কাব্যই মরুভূমির মানুষদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে এসেছে। এমন কী কায়রো, দামাস্কাস ও বাগদাদের আধুনিক আরবীয় কবিরা তাদের গীতিকাব্যের শুরুতেই মরুভূমিতে প্রিয়তম বা প্রিয়তমার শিবির স্থাপনের (আতলাল) বর্ণনাকে বেখাপ্পা মনে করেননি। এই প্রেমিক বা প্রেমিকার চোখ দুটি তারা বুনো গরুর (মাহা) সঙ্গে তুলনা করত। কবিতাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র আইন—বিশেষত বিবাহ-সংক্রান্ত আইনের ধারাগুলিতে মরুভূমি-সংক্রান্ত উপাদানগুলি তাদের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

কাব্যের এই নতুন রীতির অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন পারস্যের অন্ধ কবি বাশ্‌শার ইবন-বারদ্। আল-মাহদীর শাসনে ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, মাহদীর উজিরকে ব্যঙ্গ করার জন্যই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশের মত হল ইবন-বার্দের জিন্দিকিজম, জরথুস্টের বা ম্যানিকিয়াপন্থিদের গোপন আদর্শ লালন-পালন করার জন্যই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁকে অন্ধ করার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে বাশ্‌শার এক সময় বলেছিলেন, "যা আমি ঘৃণা করি তা যেন আমায় দেখতে না হয়।"[২১০] প্রাচীন কবিতার[২১১] পুরানো রীতির তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই নতুন কাব্যরীতির আর এক প্রতিনিধি ছিলেন আধা-পারসীয় আবু-নুওয়াস[২১২] (মৃ ৮১০ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন হারুন ও আল-আমীনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী; তার গীতি কবিতাতে প্রেম ও মদের গুরুত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আরব জগতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আবু-নুওয়াসের নাম ছিল জোকারের সমার্থক। প্রণয়পূর্ণ আবেগের প্রকাশ, প্রেমের উচ্ছ্বাস বর্ণনা ও রুচিশীল রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বললেই চলে। মুসলিম দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন গীতিকাব্য ও পানোন্মত্ত প্রণয়োচ্ছ্বাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার। আব্বাসি রাজদরবারের এই

প্রিয় কবির রচিত পুরুষদের সৌন্দর্য সংক্রান্ত গান ও রঙিন পানীয়ের (খামরিয়াত) প্রশস্তি সূচক কবিতাগুলি পানাসক্ত পড়ুয়াদেরও পুলকিত করেছে। তা ছাড়া এই রচনাগুলি থেকে সে যুগের অভিজাত জীবন[২১৩] সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। আবু-নুওয়াসের গজল, প্রায় পঞ্চাশটি প্রেমের ছোট কবিতা পারসীয় চারণকবিদের কাব্য-রচনার অনুকরণেই লেখা হয়েছিল। তবে এটা সত্য যে, আরবদের বহু আগেই পারসীয় চারণকবিরা প্রেমের ছোট ছোট কবিতা রচনা করেছিল।

রসিক ও লম্পট আবু-নুওয়াস তাঁর লেখায় রাজদরবারের জীবনের লঘু দিকগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। তার সমসাময়িক কঠোর তপস্বী আবু-আল-আতাহিয়া[২১৪] (৭৪৮-৮২৮ খ্রিঃ) পেশায় ছিলেন একজন কুমোর। তাঁর লেখায় আদর্শ সংক্রান্ত হতাশাপূর্ণ নীতিগর্ভ কথাই স্থান পেয়েছে। অবশ্য ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ এই ধরনটিকে বেশ উপভোগ করত। আনাজার বেদুইন উপজাতির এই তরুণ বংশধরটি বাগদাদে বাস করত। কিন্তু সেখানকার অসার অভিজাত জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল। হারুন তাঁর জন্য বার্ষিক ৫০,০০০ দিরহাম অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দরবেশের পোশাক পরতেন এবং ধর্মীয় কাব্য (জুহদিয়াত) রচনা করেছিলেন। এই কাব্য রচনার মধ্য দিয়েই তিনি আরবীয় পবিত্র কবিতার[২১৫] জনকের মর্যাদা লাভ করেন।

বিভিন্ন প্রদেশ, বিশেষত সিরিয়াতে, আব্বাসি আমলে প্রথম শ্রেণীর কিছু কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতনামা ছিলেন আবু-তাম্মাম (মৃ. ৮৪৫ খ্রিঃ) ও আবু-আল-আলা। আবু-তাম্মামের বাবা ছিলেন একজন খ্রিস্টান। তাঁর নাম ছিল থাদুস (থাদ্দায়োস)। দামাস্কাসে তাঁর একটি মদের দোকান ছিল। পুত্র তাম্মাম যখন ইসলামধর্ম[২১৬] গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'আঁওস' করেন। আবু-তাম্মাম ছিলেন বাগদাদের এক সভাকবি। তাঁর রচিত দিওয়ান[২১৭] ও দিওয়ান আল-হামাসা[২১৮] নামের সংকলনটি কবিকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিয়েছিল। দিওয়ান আল-হামাসা সংকলনটি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করে লেখা হয়েছে। তাঁর দিওয়ান-এ আরবীয় কবিতার রত্নদের প্রশস্তি আছে। আবু-তাম্মামের অনুসরণে আর এক সভাকবি আল-বুহতুরি (৮২০-৯৭ খ্রিঃ) হামাসা[২১৯] কবিতার সংকলন করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি আল-তাম্মামের রচনার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ধরনের।

আব্বাসি বংশের খলিফা, উজির ও গভর্ণরেরা তাঁদের স্তাবক রূপে কবিদের নিয়োগ করেছিলেন ফলে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা স্তুতিপূর্ণ কবিতা (মাদীহ্) রচনার এক বিশেষ জনপ্রিয় রীতিতে পরিণত হয়েছিল। আর তারই পরিণতিতে কবিরা তাদের কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতাকে বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে, এই স্তুতিপূর্ণ কবিতার মিথ্যা জৌলুস ও শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে প্রায়ই আরবীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা হত। আব্বাসি আমলের কবিতাগুলি অন্যান্য সময়ের আরবের কবিতাগুলির মতো ছিল না। কবিতাগুলি ছিল

মূলত প্রাদেশিক, মনগড়া ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কিন্তু স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে সেগুলি কখনই চিরায়ত ও সর্বজনীন কাব্যসম্পদে পরিণত হতে পারেনি।



গর্ভাশয় ব্যবচ্ছেদের প্রাচীনতম পদ্ধতি

● টীকা ●

১ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্, ১ম খণ্ড, পাতা ১৭৮।

২ দাগাল আল-আইন (চোখের গোলমাল) পাণ্ডুলিপি: কায়রোতে তাইমুর পাশার গ্রন্থাগারে একটি কপি ও লেনিনগ্রাডে আর একটি কপি আছে।

৩ ম্যাক্স মেয়ারহফ কৃত (কায়রো, ১৯২৮)।

৪ কিফ্‌তি, পাতা ১৪৩।

৫ প্রাগুক্ত, পাতা ১৮৮-৮৯।

৬ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্, ১ম খণ্ড, পাতা ২২২; কিফ্‌তি পাতা ১৯১।

৭ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্ ১ম খণ্ড, পাতা ২২১; কিফ্‌তি, পাতা ১৯৩-৯৪।

৮ পার্সি, বিমার, (অসুস্থ) + স্তান।

৯ ইবন-দুকমাক, ৪র্থ ভাগ, পাতা ৯৯।

১০ পূর্বোক্ত ১২৪-২৫— বুক অফ রিলিজিয়ন, পাতা ১৪৭; ফিহ্‌রিস্ত দেখুন, পাতা ২৯৬; তুলনীয় ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পাতা ৫০৩, ১.২৫ তার বাবার নামের সঙ্গে 'রাব্বান' শব্দটি দেখে পণ্ডিতরা তাকে ইহুদি বলে মনে করলেও তিনি আসলে ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। কারণ আলী তার ফিরদৌস আল-হিকমা ফী আল-তিব্ব-এর ভূমিকায় সেভাবেই চিত্রিত করেছেন। মুহাম্মাদ জেড সিদ্দিকি কর্তৃক সম্পাদিত (বার্লিন, ১৯২৮)।

১১ এডওয়ার্ড জি ব্রাউনি, অ্যারাবিয়ান মেডিসিন (কেম্ব্রিজ, ১৯২১), পাতা ৪৪।

১২ বুয়াহিদ শাসক আজ্‌দ-আল-দাওলা নিজের জায়গায় হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী কালের লেখকেরা ভুল করে তাকে আল-আজুদি বলে উল্লেখ করেছেন।

১৩ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ১ম খণ্ড, পাতা ৩০৯-১০।

১৪ পূর্বোক্ত, পাতা ২৯৯-৩০২

১৫ কর্ণেলিয়াস ভান ডিক সম্পাদিত (লণ্ডন, ১৮৬৬ এবং বেইরুট, ১৮৭২); ভাষান্তরিত ডব্লিউ এ গ্রীনহিল, এ ট্রিটিজ অন দি স্মল পক্স অ্যাণ্ড মিজলস্‌ (লণ্ডন, ১৮৪৮)।

১৬ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ১ম খণ্ড, পাতা ২৩৬-৩৭; কিফ্‌তি, পাতা ২৩২।

১৭ কিফ্‌তি, পাতা ২৩২। একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির জন্য, ৫৮৬ খ্রিঃ (১১৯০ হিজরী সন)। হিট্টি দেখুন, ফ্যারিস এবং আবদ-আল-মালিক, ক্যাটালগ অফ অ্যারাবিক ম্যানাস্ক্রিপ্ট, সাপ্লিমেন্ট নং; ১ দেখুন।

১৮ আল-মুয়াল্লিম আল-সানি নামেও পরিচিত, দ্বিতীয় শিক্ষক (অ্যারিস্টটলের পরে)।

১৯ পাতা ৪১৮। ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ২য় খণ্ড, পাতা ১৮-২০; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, পাতা ২৭৩-৭৪; কার্ল ব্রোকেলমান, গেসচিচে দার আরাবিচেন লিটারেচার, ১ম খণ্ড (ভাইমার, ১৮৯৮), পাতা ৪৫৩-৫৮।

২০ আল-শিফার একটি সংক্ষিপ্তসারের প্রথম সংস্করণ, যেটি এর বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

২১ ও. ক্যামেরন গ্রুনার, এ ট্রিটিজ অন দি ক্যানন অফ মেডিসিন অফ আভিসেনা (লণ্ডন, ১৯৩০)।

২২ উইলিয়াম অসলার, দি ইভোল্যুশন অফ মডার্ন মেডিসিন (নিউ হেভেন, ১৯২২) পাতা ৯৮।

২৩ ফিহ্‌রিস্ত, পাতা ২৯৭; ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ১ম খণ্ড, পাতা ২০৩।

২৪ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ১ম খণ্ড, পাতা ২৪৭; আরবীয় ভাষা থেকে অনূদিত নয়, ক্যাসি এ উড কর্তৃক অনূদিত, দি তাজকিরাত অফ আলি ইবন ইসা (শিকাগো, ১৯৩৬)।

২৫ ঐ, ১ম খণ্ড, পাতা ২৫৫; কিফ্‌তি; পাতা, ৩৬৫; ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, পাতা ২৫৫।

২৬ হিট্টি, আরাব-সিরিয়ান জেন্টলম্যান, পাতা ২১৪-১৬; ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ, ১ম খণ্ড, পাতা ২৪১ ও পরবর্তী অংশ; কিফ্‌তি, পাতা ২৯৪ ও পরবর্তী অংশ।

২৭ ফিহ্‌রিস্ত, পাতা ৩১৫, সম্ভবত ইয়াকুবের এক পুত্র ইবন-আখি-হিজামের উল্লেখ আছে।

২৮ হিট্টির মূল ইংরেজি দেখুন, পাতা ৬০০,

২৯ তুর্কিস্তানের ফারাব-এর কাছে, ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ২য় খণ্ড, পাতা ১৩৪; কিফ্‌তি, পাতা ২৭৭।

৩০ ফ্রেডরিখ দিয়েতেরিসি কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত ডাই ফিলসফি দার আরবের ইম ৯ অ্যাণ্ড ১০। জাহরুনডার্ট এন. ক্রনিকল, ১৪ খণ্ড (লিডেন, ১৮৯০) পাতা ৬৬-৮৩

৩১ ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত এবং দিয়েতেরিসি রচিত ফিলসফি দার আরবের, ১৬ খণ্ড (লিডেন, ১৮৯৫), তিনি দার মুস্তারস্তাত ভন আলফারাবি নামে অনুবাদ করেছিলেন (লিডেন, ১৯০০)।

৩২ অ্যাক্তেস ডু সিক্সিমি কংগ্রেস ইনটারন্যাশনাল দ্য ওরিয়েন্টালিস্টস পত্রিকায় প্রকাশিত জে পি এন ল্যাণ্ডের নির্বাচিত রচনা, পার্ট ২, বিভাগ ১ (লিডেন ১৮৮৫), পাতা ১০০-১৬৮, রডলফ

ডি এরল্যাঙ্গার কর্তৃক ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনূদিত; লা মিউজিক আরাবে' ১ম ও ২য় খণ্ড, আল-ফারাবি (প্যারিস, ১৯৩০-৩৫)। হিট্টি, ফ্যারিস ও আবদ-আল-মালিক রচিত ক্যাটালগ অফ অ্যারাবিক ম্যানাস্ক্রিপ্ট, নং ১৯৮৪।

৩৩ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পাতা ৫০১।

৩৪ ২য় খণ্ড, পাতা ৪৯৯— ডি স্লেন, ৩য় খণ্ড, পাতা ৩০৭।

৩৫ এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে "দি ব্রেদরেন অফ পিউরিটি'-র স্বাভাবিক অনুবাদ হল" লেস ফ্রেরেস ডে লা পিউরিটি", "ডাই লটারেন ব্রুডার" সঠিক নয়।

৩৬ দার ইসলাম-এ আই গোল্ডজিহার, ১ম খণ্ড, (১৯১০), পাতা ২২-২৬।

৩৭ দিয়েতেরিসি তার ডাই ফিলসফি দার আরাবের গ্রন্থের ১৬টি খণ্ডে মূল পাঠ্যাংশের একটি বড় অংশ অনুবাদ করেছেন (লিপজিগ এবং লিডেন, ১৮৫৮-১৮৯৫) প্রাচ্যের সর্বশেষ সংস্করণটি হল ৪ খণ্ডে রচিত খয়র-আল-দীন আল-জিরিকলির বই, (কায়রো, ১৯২৮)।

৩৮ তুলনীয় : ইহ্ইয়া, ২য় খণ্ড, পাতা ২৫৪, ২. ৮-১২, পাতা ২৬২, ২.১৮-২০, রাসাইল, ১ম খণ্ড, পাতা ১৮০।

৩৯ জার্নাল এশিয়াটিক-এ এম. সি. ডেফ্রেমারি, ক্রমিক ৫, ৫ম খণ্ড (১৮৫৫) পাতা ৫-৬।

৪০ শাকির শুকাইর সম্পাদিত দিওয়ান; সিকত আল-জান্দ (বেইরুট, ১৮৮৪), পাতা ১১২, ১.১৫ পাতা ১০৪, ২.৪-৫।

৪১ ক্যালিফোরনিয়াম, ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পাতা ৪০৭, ইয়াকূত, উদাবা, ৫ম খণ্ড, পাতা ৩৮১।

৪২ আল-সুবকি, তাবাকাত আল-শাফিইয়া আল-কুবরা (কায়রো, ১৯০৬)। ৪র্থ খণ্ড, পাতা- ৩।

৪৩ ফিহ্রিস্ত, পাতা ২৭৫।

৪৪ সি. এ. নাললিনোর প্রবন্ধ "অ্যাস্ট্রোনমি", ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, ক্যালিফোরনিয়াম, সা'দ, তাবাকাত, পাতা ৫০-৫১।

৪৫ ইবন-আল-ইবরি, পাতা ২৩৭।

৪৬ ফিহ্রিস্ত, পাতা ২৭৩।

৪৭ নাললিনো রচিত "ইলম-আল-ফালাক (কায়রো, ১৯১১) পাতা ২৮১ ও পরবর্তী অংশ। 'ফালাক' নামের প্রবন্ধ (মহাকাশক্ষেত্র) ব্যাবিলনিয়া হতে পারে, পাতা- ১০৫-০৬।

৪৮ ফিহ্রিস্ত-এ "মুহাম্মাদ", পাতা ২৭৯; কিফ্তি, পাতা ২৮৬।

৪৯ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্, ১ম খণ্ড, পাতা-২০৭।

৫০ ইবন-আল-ইবরি, পাতা ২৩৬; কিফ্তি, পাতা ৭৮।

৫১ হিট্টি, ফ্যারিস ও আবদ-আল-মালিকের ক্যাটালগ অফ অ্যারাবিক ম্যানাস্ক্রিপ্ট ৯৬৭ নং দেখুন।

৫২ ফিহ্রিস্ত, পাতা ২৮৩; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, পাতা ৯৭; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পাতা ৫০৮-০৯।

৫৩ কিফ্তি, পাতা ৩৯৬; ফিহ্রিস্ত, পাতা ২৬৬, ২৮২।

৫৪ ফিহ্রিস্ত, পাতা ২৭৯।

৫৫ সি. এ. নাললিনো সম্পাদিত তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত রচনা আল-জিজ-আল-সাবি', (রোম, ১৮৯৯)।

৫৬ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পাতা ২০-২১: ইবন-আল-ইবরি, পাতা ৩২৪-২৫। খওয়ারিজম-এর রাজধানী কাথ-এর সংলগ্ন নগর বিরুন (পারসীয় ভাষায়, বাইরের) থেকে তাঁর পদবিটি এসেছে। যদিও ইসলামিক কালচার ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৩২)-এর প্রথম পাতায় "আল-বেরুনী" কথাটি তাঁর নিজের হাতে লেখা। আবার ৫৩৪ পাতাতে একই বানান দেখা যায়।

৫৭ ই সাচাউ সম্পাদিত (লিপজিগ, ১৮৭৮); ভাষান্তরিত সাচাউ (লণ্ডন, ১৮৭৯)।

৫৮ ই সাচাউ সম্পাদিত তাহকিক মা লিয়া-আল-হিন্দ-এ তার বর্ণনা দেখুন (লণ্ডন, ১৮৮৭); ভাষান্তরিত সাচাউ (লণ্ডন, ১৮৮৮), ২ খণ্ড, (লণ্ডনে ১৯১০ খ্রিঃ-এ পুনর্মুদ্রিত)।

৫৯ চীনের কোন বই ছাড়া তাঁর একটি অপ্রকাশিত রচনায় চায়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। মাজাল্লাত আল-মাজমা, ১৩ খণ্ড (১৯৩৫), ৬৮৮ পাতায় এফ. ক্রেনকাউ-এর লেখা দেখুন।

৬০ আরবী ভাষায় পুরো নাম আবু-আল-ফাত্হ উমার ইবন-ইব্রাহিম আল-খইয়ামি (তাঁবু-প্রস্তুতকারী)। তাঁর জীবন সম্পর্কে কিফ্তি, পাতা ২৪৩-৪৪; কাজবিনি, আসার, পাতা ৩১৮ দেখুন।

৬১ ফিটজেরাল্ড (লণ্ডন, ১৮৫৯) প্রথম ইংরাজিতে তার রুবাইয়াত অনুবাদ করেন। তারপর ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, ডেনিশ ও আরবীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়।

৬২ ইবন-আল-ইবরি, পাতা ৫০০; রশীদ-আল-দিন ফজল-আল্লাহ, জামি আল-তাওয়ারিখ, কোয়াট্রেমার দ্বারা সম্পাদিত ও অনূদিত হিস্টয়ার দাস মোঙ্গল দ্যা লা পার্স, ১ম খণ্ড (প্যারিস, ১৮৩৬) পাতা ৩২৪ ও পরবর্তী (এখানে নাসীর-আল-দীন লেখা আছে)।

৬৩ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৪৮৮ পাতা, ১নং টীকা।

৬৪ ফিহ্রিস্ত, ২৭৭ পাতা, ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, পাতা ১৯৮-৯৯।

৬৫ বুলেটিন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৩১) ৩২৩-২৮ পাতায় জি. কোয়েদেস লক্ষ্য করেন, ইন্দো-চীনে সপ্তম খ্রিস্টিয় শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবীয় সংখ্যা ও শূন্যের আবির্ভাব ঘটার বহু পূর্বে ভারতে তা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। জিরো বা শূন্য ইতালিয় আকৃতি থেকে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল। আর আরবী 'সিফ্র' শব্দ হতে ইংরেজিতে সাইফার ২০০ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিল। এটি একটি সংস্কৃত শব্দের অনুবাদ, এর অর্থ শূন্য। জার্নাল এশিয়াটিক, ১০ সিরিজ, ১৬ খণ্ড (১৯১০) ২২৫ ও পরবর্তী পাতাগুলিতে এফ নাউ সিরিয়ার একটি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। তার থেকে জানা যায়, ৬৬২ খ্রিস্টাব্দে কিন্নাসরিনের মধ্যে সিরিয়ার এক অধিবাসী এই সংখ্যাগুলি জানত।

৬৬ খুরাসানের নাসা থেকে।

৬৭ খওয়ারিজম, যে নাম সে বহন করেছিল, তা আসলে বর্তমান খিওয়া, আমু দরিয়ার (প্রাচীন অক্সাস নদী) নিম্ন প্রবাহের কাছে অবস্থিত একটি শহর। তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৪ পাতায় একে আল-মাজুসি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এক ম্যাজিয়ানের বংশধর ছিলেন।

৬৮ কিফ্তি কর্তৃক পুনর্লিখিত ফিহ্রিস্ত-এর ২৮৬ পাতা দেখুন. ফিহ্রিস্ত, ২৭৪ পাতা দেখুন। ক্যালিফোরনিয়া'ম ইবন-আল-ইবরি, ২৩৭ পাতা।

৬৯ চসার রচিত এ ট্রিটিজ অন অ্যাস্ট্রোলেব-এ পার্ট ১, নতুন ভাগ ৭ এবং নতুন ভাগ ৮-এ আগ্রিম, অ্যাগরিম।

৭০ দাউদ এস কাসিরের অনুবাদ 'দি অ্যালজেবরা অফ ওমার খৈয়াম' (নিউইয়র্ক, ১৯৩২)।

৭১ আরবী ভাষায় এই শব্দটি আল-কিসীয়া। জার্মান ভাষা থেকে প্রাচীন মিশরিয় ভাষায় সংযোজিত। এর অর্থ হল কালো।

৭২ শোনা যায় সাবিয়ান থেকে শী'আহ্‌তে ধর্মান্তরিত; অন্যদের মতে দক্ষিণ আরবের আল-আজদ উপজাতির মানুষ, ফিহ্‌রিস্ত, পাতা ৩৫৪-৫৫; কিফ্‌তি, পাতা ১৬০-৬১।

৭৩ হাজ্জি খালফা, পাসিম, ২৭টি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পল ক্রাউস, জাবির ইবন-হাইয়ান, ১ম খণ্ড (কায়রো, ১৯৪৩), পাতা ৩-১৭০ দেখুন।

৭৪ অ-আরবীয়দের জন্য লেখা 'এল'। গীতিকাব্যে লামিয়াত আল-আজম-এর জন্য বিখ্যাত। তুগরাই-এর অর্থ হল চ্যান্সেলর যিনি সরকারি দলিলের ওপরে শাসকের নাম ও উপাধি রুচিশীল ভাষায় লিখতেন। ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৮৪ ও পরবর্তী পাতা।

৭৫ হাজ্জি খালফা, ৩য় খণ্ড, ২১৮ পাতা; ৫ম খণ্ড, ৪৭ পাতা; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৪ পাতা দেখুন। তাঁর আল-ইলম আল-মুকতাসাব ফী জিরাআত আল-যাহাব (স্বর্ণ উত্তোলন সংক্রান্ত সংগৃহীত জ্ঞান) সম্পাদনা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ই জে হমইয়ার্ড (প্যারিস, ১৯২৩)।

৭৬ আল-কিবরিত আল-আহমার, আক্ষরিক অর্থে 'লাল সালফার'।

৭৭ মূলত গ্রিক শব্দ। আরবী আল-ইকসির হতে।

৭৮ হিট্টির মূল ইংরেজির ৫৮০ পাতা দেখুন।

৭৯ অগস্ট হফনার (ভিয়েনা, ১৮৯৫) সম্পাদিত আল-আসমাই, কিতাব আল-খাইল দেখুন। উইলিয়াম রাইটের অপাসকুলা অ্যারারিকা (লিডেন, ১৮৫৯)-এতে ইবন-জুরায়জ; আল-কালবি, নাসাব আল-খাইল ফী আল-জাহিলিয়া অ-আল-ইসলাম এবং আল-আরাবি, আসমা খাইল আল-আরব ওয়া-ফুরসানিহা। জি লেভি ডেলা ভিডা কর্তৃক সম্পাদিত (লিডেন, ১৯২৮)।

৮০ আজাইব আল-মাখলুকাত ওয়া-গারায়িব আল-মাওজুদাত (সৃষ্টির রহস্য ও অস্তিত্বের প্রতিবন্ধকতা) তাঁর প্রধান রচনা। ওস্টেনফেল্ড (গটিনজেন, ১৮৪৯) সম্পাদিত।

৮১ তাঁর হায়াত আল-হায়াওয়ান (পশুজীবন) কায়রোতে বহুবার ছাপা হয়েছিল। এ এস জি জয়াকর ইংরাজিতে অনুবাদ করেন (লণ্ডন, ১৯০৬, ১৯০৮), ১ম ও ২য় খণ্ড, পার্ট ১।

৮২ হিট্টি সম্পাদিত, বাগদাদি, পাতা ১১৭-১১৮।

৮৩ ইয়াকুত। ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৫-৭৮ পাতা; ১২০টি বই তিনি লিখেছিলেন।

৮৪ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১০৮-০৯ পাতা।

৮৫ ফিহ্‌রিস্ত, ২৭৮ পাতা। প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশনালে-তে তাঁর মানাফি আল-আহ্‌জার (মূল্যবান পাথরের ব্যবহার) পাণ্ডুলিপির আকারে সংরক্ষিত আছে। দ্য স্লেন ক্যাটালগ দাস ম্যানাসক্রিপ্টস আরাবেস (প্যারিস, ১৮৯৩-৯৫) ২৭৭৫[১] নং।

৮৬ ইতালিতে অনুবাদ ও সম্পাদনা, অ্যান্টনিও রাইনেরি (বিস্কিয়া) (ফ্লোরেন্স, ১৮১৮)।

৮৭ সিলসিলাত আল-তাওয়ারিখ, সম্পাদনা, ল্যাঙ্গলেস, ৪৪ পাতা, ই. রেনাডট কর্তৃক অনূদিত (লণ্ডন, ১৭৩৩), ২৬ পাতা; আহবার আস-সিন অ-আল-হিন্দ, জে সোভাগেট কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত (প্যারিস, ১৯৪৮) ১৯ পাতা।

৮৮ ৩য় খণ্ড, ৬৪ পাতা।

৮৯ হনস ভি মিজিক কর্তৃক অনুদিত (লিপজিগ, ১৯২৬)।

৯০ ২য় খণ্ড, ৩০৮ পাতা।

৯১ উজ্জায়িন, উজাইন, উযায়ন ইত্যাদি। ইবন-রুস্তা, ২২ পাতা, ১.১৭; মাসউদী, তানবীহ্, ২২৫ পাতা, ১.২; আবু-আল-ফিদা, রিনাউড ও দি স্লেন সম্পাদিত, ৩৭৬ পাতা, ২.৮, ১২।

৯২ কুব্বাত আল-আরদ, আবু-আল-ফিদা, ৩৭৫, ৩৭৬ পাতা; ইবন-রুস্তা; ২২ পাতা, ২, ১৭ ও পরবর্তী; বিরুনি, তাহ্কিক ১৫৮ পাতা।

৯৩ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৮৯)।

৯৪ আল-আব্বাসি, ইয়াকূত, ২য় খণ্ড, ১৫৬-৫৭ পাতা।

৯৫ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৯২)।

৯৬ দ্য গোজে স'পাদিত (লিডেন, ১৮৯১-৯২)।

৯৭ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৮৫)।

৯৮ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৭০)।

৯৯ ২য় খণ্ড, ৮০ পাতা। সংখ্যার জন্য দিমাসকি রচিত নুখবাত আল-দাহর ফী আজায়িব আল-বার্র অ-আল-বাহর (সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১৮৬৬), ১৮২ পাতা।

১০০ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৭৩); জে এইচ ক্রেমারস সম্পাদিত সুরাত আল-আরদ, ২য় খণ্ড, (লিডেন, ১৯৩৮-৩৯)।

১০১ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৭৭)।

১০২ হিষ্ট্রির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৫০ পাতা ২ নং নোট।

১০৩ ডি এইচ মুলার সম্পাদিত, ২খণ্ড, (লিডেন, ১৮৮৪-৯১)।

১০৪ জিরিকলি সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ৮০ ও পরবর্তী পাতা; ক্যালেফোরনিয়াম মাসউদী, তানবীহ্, ৩ পাতা।

১০৫ শব্দটির অর্থ রুবি, মূল্যবান বস্তুর নামে প্রায়ই ক্রীতদাসদের নাম দেওয়া হত, যেমন লুলু (পার্ল), জওহর (জেম)।

১০৬ এফ ওস্টেনফেল্ড সম্পাদিত ৬ খণ্ড (লিপজিগ, ১৮৬৬-৭৩)।

১০৭ ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ১৬২ পাতা; দ্য স্লেন, ৪র্থ খণ্ড, ১০ পাতা।

১০৮ পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮।

১০৯ এগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত ছিল আহমদ জাকি (কায়রো, ১৯১৪) সম্পাদিত কিতাব আল-আসনাম।

১১০ ইবন খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ২৮২ পাতা।

১১১ ওস্টেনফেল্ড সম্পাদিত ২টি খণ্ড (গটিনজেন, ১৮৫৮-৬০)।

১১২ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৫২০ পাতা।

১১৩ ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইবন-কাযী শুহ্বাহ কর্তৃক সংকলিত।

১১৪ ভন ক্রেমার (কলকাতা: ১৮৫৬) সম্পাদিত। ইবন-খাল্লিকান ২য় খণ্ড, ৩২৪-২৬ পাতা দেখুন।

১১৫ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩২৬ পাতা।

১১৬ সাচাউ সম্পাদিত ৯টি খণ্ড (লিডেন ও বার্লিন, ১৯০৪-২৮)।

১১৭ চার্লস সি টোরি সম্পাদিত (নিউ হ্যাভেন, ১৯২২)।

১১৮ দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৬৬); হিট্টি কর্তৃক রূপান্তরিত দি অরিজিনস অফ দি ইসলামিক স্টেটস (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৬), প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ; এফ সি মারগোটেন (নিউ ইয়র্ক, ১৯২৪)।

১১৯ ডব্লিউ আলওয়ার্ড সম্পাদিত ১১শ খণ্ড (গ্রিফসোয়াল্ড, ১৮৮৩); এস ডি এফ গোটেন; ৫ম খণ্ড (জেরুসালেম, ১৯৩৬); ম্যাক্স শ্লোলেসিংগার, ৪র্থ খণ্ড বি (জেরুসালেম, ১৯৩৮)।

১২০ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৩৯৪।

১২১ ফিহ্‌রিস্ত, ৭৭-৮ পাতা দেখুন; নবাবি, তাহযীব, ৭৭১ পাতা; সামআনি, আনসাব ৪৪৩-এ পাতা দেখুন।

১২২ ওস্টেনফেল্ড, (গটিনজেন, ১৮৫০)।

১২৩ ফিহ্‌রিস্ত, ৭৮ পাতা; ইয়াকুত, উদাবা, ১ম খণ্ড, ১২৩-২৭ পাতা দেখুন।

১২৪ সম্পাদনা ভ্লাদিমির গুইরগাস (লিডেন, ১৮৮৮)।

১২৫ টমাস হাউৎসমা সম্পাদিত তারিখ, ২টি খণ্ড (লিডেন, ১৮৮৩)

১২৬ তারিখ সিনি মুলুক আল-আরদ অ-আল-আম্বিয়া, আই. এম. ই গটওয়াল্ড সম্পাদনা (লিপজিগ, ১৮৪৪), গটওয়াল্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত (লিপজিগ, ১৮৪৮)।

১২৭ প্রায় সঠিক ভাবে 'ইবন-মিসকাওয়াইহ্'; ইয়াকুত, ২য় খণ্ড, ৮৮ পাতা; কিফ্‌তি, ৩৩১ পাতা।

১২৮ তাজারিব আল-উমাম, এ এফ অ্যামেড্রোজ সম্পাদনা, ২খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯১৪-২১)। ভাষান্তরিত, ডি এস মার্গোলিউথ, দি এক্সপেরিয়েন্সেস অফ দি নেশনস, ২খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯২১)।

১২৯ দ্য গোজে সম্পাদনা, ১৫খণ্ড (লিডেন, ১৮৭৯-১৯০১)।

১৩০ জামি আল-বায়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন, ৩০ খণ্ড (বুলাক, ১৩২৩-২৯)।

১৩১ তারিখ দেখুন, আল-মুখতাসার ফী আখবার আল-বাশার নামে পরিচিত, ৪খণ্ড (কনস্টান্টিনোপল, ১২৮৬)।

১৩২ দুওয়াল আল-ইসলাম। ২খণ্ড (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩৭) দেখুন।

১৩৩ ফিহ্‌রিস্ত, ২৩৪ পাতা।

১৩৪ ইয়াকুত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪২৪ পাতা।

১৩৫ আবদুল্লা ইবন-মাসউদের বংশধর।

১৩৬ ফিহ্‌রিস্ত, ১৫৪ পাতা। ভুলভাবে তাঁকে আল-মাগরিবের অধিবাসী বলা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়াম, ইয়াকুত, ৫ম খণ্ড, ১৪৮ পাতা।

১৩৭ সম্পাদনা ও অনুবাদ, ডি মেনার্ড ও ডি কোর্টেইল। ৯খণ্ড (প্যারিস, ১৮৬১-৭৭)।

১৩৮ ক্যালিফোরনিয়াম, ইখওয়ান, রাসাইল, ১ম খণ্ড, ২৪৭-৪৮ পাতা।

১৩৯ ডি গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৯৩-৯৪)।

১৪০ টাইগ্রিসের তীরে জাজিরাত ইবন-উমারে জন্ম, আল-মুসিল-এ কর্মজীবন। ইবন-খাল্লিকান ২য় খণ্ড, ৩৫-৩৬ পাতা।

১৪১ সম্পাদনা সি জে টর্নবার্গ, ১৩ খণ্ড, (লেডেন, ১৮৬৭-৭৪)।

১৪২ ৫খণ্ড (কায়রো, ১২৮০)।

১৪৩ তাঁর বিখ্যাত মাতামহ ইবন-আল-জাওযী (মৃ ১২০১)-র থেকে তিনি তাঁর পদবি পেয়েছিলেন।

১৪৪ নির্বাচিত অংশ, সম্পাদনা ও অনুবাদ, রিকুয়েল দাস হিস্টোরিয়েনস দায় ক্রোয়সাদেস : হিস্টোরিয়েনস ওরিয়েন্টাক্স। ৩য় খণ্ড (প্যারিস, ১৮৮৪)। জেমস আর জিউয়েট কর্তৃক পার্ট ৮-এর হুবহু প্রতিলিপি পুনরায় ছাপা হয়েছিল (শিকাগো, ১৯০৭)।

১৪৫ আল-তারিখ আল-কবীর, সম্পাদনা আবদ-আল-কাদির বাদরান ও আহমদ উবায়দ (দামাস্কাস, ১৩২৯ ৫১। প্রথম ৭ খণ্ড।

১৪৬ ইন্ট্রোডাকশন টু দি হিস্টোরি অফ সায়েন্স, ১ম খণ্ড (বাল্টিমোর, ১৯২৭) ৬২৪ পাতা।

১৪৭ মিশরের সুজা ইবন-আসলাম, দশম শতাব্দীর শুরুতে যিনি আল-খওয়ারিজমির বীজগণিত সংশোধন করেছিলেন।

১৪৮ সাবিত ইবন-কুররার পৌত্র, জীবনকাল ৯০৮-৪৬। ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের আবিষ্কারের আগে তাঁর নির্ণীত অধিবৃত্তের সমচতুষ্কোণতা ছিল সবচেয়ে সরল।

১৪৯ পরবর্তী অধ্যায়ে অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৫০ শব্দের প্রকরণগত দিক থেকে এর অর্থ 'প্রথা', 'ব্যবহার', তা ছাড়া শব্দটির অন্যান্য ব্যবহারিক অর্থ আছে। শী'আহ্ সম্প্রদায়ের বিপরীতে, এটি ক্যাথলিক মুসলিম সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

১৫১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ২৪২ পাতা।

১৫২ বুখারীর ইলম অধ্যায়, ১ম খণ্ড, ১৯ ও পরের পাতা দেখুন।

১৫৩ ইবন-খালদূনের 'মুকাদ্দামা' দেখুন, ৪৭৬ পাতা। আলফ্রেড গুইলাউম, দি ট্র্যাডিশনস অফ ইসলাম (অক্সফোর্ড, ১৯২৪), পাতা ৬৮-৬৯।

১৫৪ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭৬ পাতা; ইবন-আল-আসীর দ্বারা পুনর্লিখিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩ পাতা। ক্যালিফোর্নিয়াম, বাগদাদি, সম্পাদনা, হিট্টি, ১৬৪ পাতা।

১৫৫ ইবন-হাজার, ইসাবা, ৭ম খণ্ড, ২০১ পাতা। বিড়ালের প্রতি তাঁর অনুরাগ থেকেই তাঁর পদবি হয়েছিল 'আবু-হুরাইরাহ্', 'বিড়াল শাবকের জনক', ইবন কুতাইবাহ্ মা'আরিফ, ১৪১ পাতা; ইবন-সা'দ, ৪র্থ খণ্ড, পার্ট ২, ৫৫ পাতা।

১৫৬ নবাবি, পাতা ১৬৫, ৩৫৮।

১৫৭ ইবন-আসাকিরের 'তারিখ', ২য় খণ্ড, ১৮ ও পরের পাতা দেখুন; ইবন-খালদূন, মুকাদ্দামা, ৩৭০ ও পরের পাতা।

১৫৮ নওয়াজি, হালবা, ১৭ পাতা।

১৫৯ আল-জামি আল-সহীহ্, ৮খণ্ড, (বুলাক, ১২৯৬)।

১৬০ নবাবি; ৯৩, ৯৫-৯৬ পাতা।

১৬১ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ২৩১ পাতা।

১৬২ এই বইগুলির অনেক সংস্করণ মিশর ও ভারতে ছাপা বা খোদাই করা হয়েছে। অবশ্য কোনটিই বিশ্লেষণমূলক নয়।

১৬৩ (কায়রো, ১২৮০), ২য় খণ্ড, ১০১ পাতা।

১৬৪ ২য় খণ্ড, ১০৫ পাতা।

১৬৫ (দিল্লি, ১৩১৯), ১ম খণ্ড, ৩৩১ পাতা।

১৬৬ আক্ষরিক অর্থে 'জ্ঞান'।

১৬৭ আক্ষরিক অর্থে 'জলময় স্থান অভিমুখী রাস্তা'। 'পরিচ্ছন্ন রাস্তা অনুসরণ করা উচিত'।

১৬৮ শাহরাস্তানি, ১৫৫ পাতা।

১৬৯ ঐ, পাতা ১৬০-৬১; ইবন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ৩৭২ পাতা।

১৭০ ফিহ্‌রিস্ত, ২০১ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ৭৪ পাতা।

১৭১ (কায়রো, ১৩৪৬)।

১৭২ হানাফিদের 'ইস্তিহ্‌সান', মালিকিদের ইস্‌তিস্‌লাহ্ (জনস্বার্থ সংক্রান্ত নীতি)। আর 'রায়'-এর প্রতিশব্দ হল 'কিয়াস' (অনুমান)।

১৭৩ কালচারজেশ্চিচতে, ১ম খণ্ড, ৪৯৭ পাতা।

১৭৪ ক্যালিফোর্নিয়াম, ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ২০১ পাতা।

১৭৫ দিল্লি, ১৩০২, তার আল-মুদাওওয়ানা আল-কুবরা (কায়রো, ১৩২৩) ১৬ টি খণ্ড দেখুন।

১৭৬ মাজমু আল-ফিকহ্, সম্পাদনা ই. গ্রিফিনি (মিলান, ১৯১৯)।

১৭৭ দাউদ ইবন-খালাফ আল-ইসবাহানি (ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৩১২ পাতা)। তার পদবি ছিল আল-জাহিরি। কারণ তিনি কোরান ও হাদীসকে আক্ষরিক অর্থে (যাহির) সত্য বলে মনে করতেন যদিও কর্ডোভার ইবন-হাজমের (৯৯৪-১০৬৪) মধ্যে তার উপযুক্ত দেখা মিলেছিল, তবু সেগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৭৮ ইয়াকুত, উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৭ ও পরের পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ২১৫-১৬ পাতা।

১৭৯ ইবন-আসাকির, তারিখ, ২য় খণ্ড, ৪১ ও পরের পাতা।

১৮০ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

১৮১ ছ'খণ্ড (কায়রো, ১৩১৩)।

১৮২ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৪৯৩ পাতা।

১৮৩ হাজ্জি খালফা, ১ম খণ্ড, ২০০-২০৫ পাতা দেখুন।

১৮৪ সম্পাদনা, শাকিব আরিসলান (কায়রো)।

১৮৫ আদাব আল-দুনিয়া অ-আল-দীন, ১৬তম সংস্করণ (কায়রো, ১৯২৫)।

১৮৬ ক্যালিফোর্নিয়াম, ফিহ্‌রিস্ত, ২৫২ পাতা।

১৮৭ একাধিক কায়রো সংস্করণ। কোনটিই বিশ্লেষণ মূলক নয়।

১৮৮ বায়ান, ৩য় খণ্ড, ৯ ও পরের পাতা।

১৮৯ একজন অভিধান-রচয়িতা, ৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে মারা যান। শু'উবিয়াহ্‌দের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন 'কিতাব আল-ইশ্‌তিকাক। সম্পাদনা ওস্টেনফেল্ড (গটিনজেন, ১৮৫৪)।

১৯০ মুকাদ্দামা বইটির ৪৭৭-৭৯ পাতায় ইবন-খালদুন একটা অধ্যায় লিখেছেন যার নাম 'ইসলামের অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তিই অ-আরবীয় ছিলেন'।

১৯১ সিহাহ্‌, ২টি খণ্ড (বুলাক, ১২৯২)।

১৯২ ইয়াকুত, উদাবা, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পাতা।

১৯৩ ঐ, ৫ম খণ্ড, ১৫ পাতা।

১৯৪ নামের অর্থ, লোমজাত বস্ত্রের ব্যবসায়ী; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৫২২ পাতা। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বই হল য়াতীমাত আল-দাহ্‌র, ৪টি খণ্ড (দামাস্কাস, ১৩০২), বইটি সমকালীন কবিদের কাব্য-সংকলন।

১৯৫ মাকামাত, সম্পাদনা, মুহাম্মাদ আবদুহ্‌ (বেইরুট, ১৮৮৯)।

[illegible] ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৬৮ পাতা।

১৯৭ সম্পাদনা ডি সাসি, ২টি খণ্ড (প্যারিস, ১৮৪৭-৫৩)। টমাস চেনেরি ও এফ স্টেনগাস কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, ২টি খণ্ড (লণ্ডন, ১৮৬৭-৯৮)।

১৯৮ ২০ খণ্ড (বুলাক, ১২৮৫); ব্রুনো সম্পাদিত ২১ তম খণ্ড (লিডেন, ১৮৮৮) এবং গিডির সূচক (লিডেন, ১৯০১)।

১৯৯ ৪৮৭ পাতা।

২০০ ইয়াকুত, ৫ম খণ্ড, ১৫০ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১১ পাতা।

২০১ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১১ পাতা, সি এফ. ১ম খণ্ড, ১৩৩ পাতা।

২০২ বুলাক সংস্করণ, ১২৫১ হিজরী সন (১৮৩৫ খ্রিঃ) ও ১২৭৯ মূল আরবীয় পাঠের মুদ্রণ হয়েছিল।

২০৩ কিতাব আল-উজারা অ-আল-কুত্তাব-এর জন্য পরিচিত, হ্নস ভি মিজিক (লিপজিগ, ১৯২৬)।

২০৪ ফিহ্‌রিস্ত, ৩০৪ পাতা; সি. এফ. মাসউদী, ৪র্থ খণ্ড, ৯০ পাতা।

২০৫ সি এফ ফিহ্‌রিস্ত, ৩০৪ পাতা, ১.১৬, তাবারীর সঙ্গে, ১ম খণ্ড, ৬৮৮ পাতা, ২.১, ১২-১৩ এবং ৬৮৯ পাতা ১.১।

২০৬ ১২ খণ্ড (প্যারিস, ১৭০৪-১৭)।

২০৭ ৩ খণ্ড (লণ্ডন, ১৮৩৯-৪১)। অলঙ্করণ-সহ সম্পাদনা : ই. এস. পুল, ৩ খণ্ড (লণ্ডন, ১৮৫৯)। ই এস পুল কর্তৃক সংশোধিত, ৩ খণ্ড (লণ্ডন, ১৮৮৩)। পরে বহুবার মুদ্রিত।

২০৮ ৯ খণ্ড, (লণ্ডন, ১৮৮২-৮৪)।

২০৯ ১৬ খণ্ড, (লণ্ডন ও বেনারেস, ১৮৮৭-৮৮)।

২১০ আগানি, ৩য় খণ্ড, ২২ পাতা।

২১১ আহমদ এইচ. আল-কিরনি রূপে বাসসার ইবন-বার্‌দ সম্পাদিত সংকলনটি দেখুন : শি'রুহু ওয়া-আখবারুহু (কায়রো, ১৯২৫); আগানি, ৩য় খণ্ড, ১৯-৭৩ পাতা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৭-৫৩ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ১৫৭ পাতা। ইবন-কুতাইবাহ্‌, শি'র, ৪৭৬-৭৯ পাতা।

২১২ আল-হাসান ইবন-হানি; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৪০ পাতা।

২১৩ 'দিওয়ান' বইটি দেখুন। সম্পাদনা : মাহমুদ ওয়াসিফ (কায়রো, ১৮৯৮), আগানি, ১৮ খণ্ড, ২-৮ পাতা; ইবন-কুতাইবাহ্‌, শি'র, ৫০১-২৫ পাতা।

২১৪ ইসমাঈল ইবন-আল-কাসিম। তার জীবনী সম্পর্কে আগানির লেখা দেখুন, ৩য় খণ্ড ১২৬-৮৩ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ১২৫-৩০ পাতা। মাসউদী, ৬ খণ্ড, ২৪০-৫০, ৩৩৩-৪০ পাতা; ৭ম খণ্ড, ৮১-৮৭পাতা।

২১৫ 'দিওয়ান' বইটি দেখুন (বেইরুট, ১৮৮৭)।

২১৬ আগানি ১৫ খণ্ড ৯৯-১০৮ পাতা; মাসউদী ৭ম খণ্ড, ১৪৭-৬৭ পাতা; ইবন-খাল্লিকান ১ম খণ্ড ২১৪-১৮ পাতা দেখুন।

২১৭ শাহীন আত্তীয়া সম্পাদিত (বেইরুট, ১৮৮৯)।

২১৮ ফ্রেটাগ সম্পাদিত "আশআর আল-হামাসা (বন, ১৮২৮)। ২ খণ্ডের ব্যাখ্যা সহ (বন, ১৮৪৭-৫১)।

২১৯ গেয়ার ও মার্গোলিউথ কর্তৃক সূচিসংখ্যাসহ ছবিতে পুনর্মুদ্রণ (লিডেন, ১৯০৯)।

॥ অধ্যায় ২৮ ॥

শিক্ষা

শিশুদের শিক্ষা শুরু হত বাড়িতে। যে মুহূর্তে সে কথা বলতে শিখত, তাকে লা ইলাহা ইল্লা-ল-লা (আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নেই) 'শব্দটি' (আল-কালিমা) শেখানোই ছিল বাবার কর্তব্য। যখন তার ছ' বছর বয়স হত, তখনই তাকে নিয়মমাফিক নামায পড়া শুরু করতে হত। আর সেই সময়েই শুরু হত তার প্রথাগত শিক্ষা।[১]

● প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয় (কুত্তাব) নিজে মসজিদ না হলেও ছিল মসজিদেরই অংশবিশেষ। কোরান ছিল মূল পাঠ্যবই, আর তার ওপর ভিত্তি করেই তাদের পাঠক্রম তৈরি হত। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত লেখার কাজও। ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে দামাস্কাস ভ্রমণের সময় ইব্ন-জুবাইর[২] লক্ষ করেছিলেন যে, কোরানের পরিবর্তে ছাত্ররা সাধারণ কবিতা থেকে লেখার অনুশীলন করত। কারণ লেখার পর আল্লা শব্দটি মুছে দিলে তাতে আল্লাহ্‌র সম্মানহানি হতে পারে এই আশঙ্কায় লেখার অনুশীলনে কোরানের অনুলিপি করা হত না। পড়া ও লেখার পাশাপাশি ছাত্রদের আরবী ব্যাকরণ, ধর্মপ্রচারকদের জীবনকাহিনী, বিশেষত হযরত মুহাম্মাদের সম্পর্কে হাদীসের কাহিনী, পাটিগণিত ও কবিতা শেখানো হত। অবশ্যই বাদ দেওয়া হত প্রেমের কবিতাগুলি। গোটা পাঠক্রমেই মুখস্থবিদ্যার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব ছিল। বাগদাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যোগ্য ছাত্ররা প্রায়ই পুরস্কার পেত। পুরস্কার-স্বরূপ বাগদাদের রাস্তায় তাদের উটের পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হত এবং সেই সময় তাদের উদ্দেশে বাদাম ছোঁড়া হত। এমনই একটি অনুষ্ঠানে হঠাৎই একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল—ছোঁড়া বাদামের আঘাতে এক কিশোর পড়ুয়ার[৩] একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। যে সব কিশোর ছাত্রের কোরান কণ্ঠস্থ, তাদের সম্মানে এমন অনুষ্ঠান মুসলিম দেশগুলিতে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত। এই সব পড়ুয়াদের কোন একজন যদি কোরানের একটা অংশ আয়ত্ত করে ফেলত, তখন তাকে অনেক ক্ষেত্রে পুরো একদিন বা আংশিক ছুটি দেওয়া হত।

নারীদের মানসিকতা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার রেওয়াজ চালু থাকলেও উচ্চমার্গের জ্ঞান আহরণে তাদের উৎসাহ দেওয়া হত না। কারণ, মনে করা হত, সংসার ও গৃহকর্মেই মেয়েরা তাদের বেশিরভাগ সময় কাটাবে।[৪] ধনী পরিবারের সন্তানদের জন্য গৃহ শিক্ষকদের (একবচনে, মুয়াদদিব) নিয়োগ করা হত। তাঁরা ধনী পরিবারের

সন্তানদের ধর্ম, সাহিত্য ও কবিতা রচনার কৌশল শিক্ষা দিতেন। সাধারণত বিদেশি পণ্ডিতদেরই গৃহশিক্ষক রূপে নিয়োগ করা হত। অভিজাত পরিবারের সন্তানদের কী রকম শিক্ষা দেওয়া হত, আল-রশীদ তাঁর পুত্র আল-আমীনের গৃহ-শিক্ষককে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার থেকেই জানা যায়—"এত কড়া হবেন না যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হয় অথবা এমন নরম হবেন না যাতে সে আলস্য উপভোগ করতে পারে এবং কুঁড়েমিটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। স্নেহ ও দয়ার স্পর্শে তাকে সহজ-সরল করে গড়ে তুলুন; কিন্তু তাতে যদি সে সাড়া না দেয়[৫] তা হলে কঠোর হাতে ও প্রয়োজনে মারধর করতেও দ্বিধা করবেন না।"[৫] লাঠি ছিল শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার এবং উপরে উল্লিখিত নিদের্শ থেকে বোঝা যায় যে, ছেলেদের ওপর এই লাঠি ব্যবহার করার ব্যাপারে গৃহশিক্ষকরা খলিফাদের সম্মতি পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা রিসালাত আল-সিয়াসা[৬] বইটির 'সন্তান লালন-পালনে পিতামাতার ভূমিকা' অধ্যায়ে লেখক ইব্‌ন-সিনা শিক্ষকের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে হাতের ব্যবহার করতে বলেছেন।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মুয়াল্লিম বলা হত। আবার ধর্মীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে কখনও কখনও তাদের ফকীহ্ বলেও ডাকা হত। সামাজিক পদমর্যাদায় এঁরা ছিলেন কিছুটা নিচুতে। এ ব্যাপারে চালু এক প্রবাদ হল : "শিক্ষক, মেষপালক বা মেয়েদের সঙ্গে বেশি থাকে[৭] এমন পুরুষের কাছ থেকে কোন উপদেশ চেয়ো না।" আল-মামূনের রাজত্বকালে একজন বিচারক আদালতে একজন শিক্ষকের সাক্ষ্যকে সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। আরবীয় সাহিত্যে বেশ কিছু ছোট ছোট কাহিনী আছে যেখানে শিক্ষকদের মোটা মাথার লোক বলে তুলে ধরা হয়েছে।" প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের চেয়েও মূর্খ"[৮] —এটাই ছিল সেই সময়ের একটি জনপ্রিয় প্রবাদ। কিন্তু উচ্চস্তরের শিক্ষকেরা সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করতেন। তাঁরা নিজেরাই একটি সঙ্ঘ তৈরি করেছিলেন এবং যে সমস্ত ছাত্ররা সেখানকার নির্বাচিত পাঠক্রম অনুযায়ী পড়াশোনার পর পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করত, সঙ্ঘের শিক্ষকরা তাদের একটি বৈধ সার্টিফিকেট (ইযাজা) দিতেন। শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আল-জারনূজি[৯] ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সমাজে শিক্ষকদের সম্পর্কে যে প্রবল শ্রদ্ধা বিদ্যমান এবং যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন ছাত্র শিক্ষকতার মহান ব্রত গ্রহণ করবে, প্রবন্ধটির একটি অংশে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। "আমি তার ক্রীতদাস যে আমাকে অন্তত একটি বর্ণ শিখিয়েছে"—আলীর এই প্রবাদবাক্যটি ওই আলোচনায় আল-জারনূজি উদ্ধৃত করে ছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে আরবীয় ভাষায় যে দু'শো গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে, আল-জারনূজির প্রবন্ধটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত প্রবন্ধের অধিকাংশই এখনও পাণ্ডুলিপির আকারে বিদ্যমান।[১০]

● উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

মুসলিম দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল বাইত আল-হিকমাহ্ (জ্ঞানের আলয়)। আল-মামূন (৮৩০ খ্রিঃ) তাঁর রাজধানীতে এটি তৈরি করেছিলেন। একটি

অনুবাদকেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শিক্ষায়তন ও সর্বজনীন গ্রন্থাগারের ভূমিকা পালন করত। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও ছিল। মনে রাখা দরকার যে, এই সময়ে গড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণকেন্দ্রগুলি জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় হিসাবেও কাজ করত। তেমনি এই সময়েই সর্বপ্রথম হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল ও সেখানেই চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু ইসলামি দুনিয়ার[১১] প্রথম প্রকৃত শিক্ষায়তন ছিল নিজামীয়া। এখানে ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য মানুষের শরীরের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শব ব্যবচ্ছেদের সুযোগও দেওয়া হত। উমার আল-খইয়াম-এর পৃষ্ঠপোষক এবং মালিকশাহ্ ও সালজুক সুলতান আলপ আরসলানের পারসিয় উজির সুশিক্ষিত নিজাম-আল-মুলক ১০৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে নিজামীয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী কালের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি এটির অনুকরণেই গড়ে ওঠে। বুওয়াইহি ও অন্যান্য অ-আরবীয় সুলতান ইসলামের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করেছিল। ঠিক তাদের মতোই সালজাক সুলতানেরাও জনসাধারণের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে শিল্পকলা ও উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। শাফিঈ মাযহাবের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠাবান আশআরি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজামীয়াকে একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে (মাদ্রাসা) পরিণত করা হয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোরান ও প্রাচীন কবিতা, কলাশিক্ষার (ইলম-আল-আদাব) মূল বনিয়াদ গড়ে দিয়েছিল। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ঠিক যে ভূমিকা ছিল ধ্রুপদী সাহিত্যের। ছাত্ররা নিজামীয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই থাকত এবং তাদের অনেকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি পেত। দাবি করা হয় যে, ইউরোপের[১২] প্রথম দিককার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজামীয়া শিক্ষাকেন্দ্রের বেশ কিছু সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করেছিল। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে যে নিজেদের সম্বন্ধে একটি বিশেষ আত্মমর্যাদার মনোভাব ছিল, একটি ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্কুলের এক কিশোর পড়ুয়া ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যায়। কিন্তু তার ঘরের জন্য সে কোন উত্তরসূরি[১৩] রেখে যায়নি। আদালতের এক প্রতিনিধি যখন সেই ঘরটি তালাবন্ধ করতে এসেছিল, তখন তাকে ছাত্রদের কাছে যথেষ্ট অপদস্থ হতে হয়েছিল।

নিজামীয়া ছিল রাষ্ট্রের স্বীকৃত একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইব্‌ন-আল-আসীর[১৪] একজন অধ্যাপকের (মুদাররিস) নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেই অধ্যাপক নিয়োগপত্র পেলেও খলিফার সম্মতি না পাওয়ায় তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি। সাধারণত একবারে[১৫] একজন অধ্যাপককেই নিয়োগ করা হত। অধ্যাপকের নিচে দুই বা তার বেশি পুনরাবৃত্তিকারী (একবচনে, মুঈদ, পুনরাবৃত্তিকারী)[১৬]থাকতেন। এদের কাজ ছিল ক্লাস শেষ হবার পর অধ্যাপকের বক্তৃতা পুনরায় পাঠ করা এবং কম মেধাবী ছাত্রদের সেটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। দুপুরের নামাযের পর প্রথম শ্রেণীর এক অধ্যাপকের বক্তৃতা একবার শুনতে গিয়েছিলেন ইব্‌ন-জুবাইর।[১৭] অধ্যাপক একটি ছোট মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং

ছাত্ররা টুলের ওপর বসেছিল। সন্ধ্যার নামাযের আগে পর্যন্ত ছাত্ররা তার কাছে লিখিত ও মৌখিক প্রশ্ন পাঠিয়ে যাচ্ছিল। এই নিজামীয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আল-গাজ্জালী চার বছর (১০৯১-৯৫ খ্রিঃ)[১৮] অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর ইহ্য়া[১৯] বইটির প্রথম অধ্যায়টিই ছিল শিক্ষাসংক্রান্ত। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য যে জ্ঞানের সঞ্চার করা—এই ধারণার বিরোধিতা করে আল-গাজ্জালী ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক চেতনা গড়ে তোলার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আর এর মধ্যে দিয়েই ইসলামি দুনিয়ায় নৈতিক চেতনার সঙ্গে শিক্ষার একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম তাঁর লেখার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তী কালে নিজামীয়ার বিশিষ্ট শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন বাহা-আল-দীন। তিনি ছিলেন সালাহ-আল-দীন (সালাদিনের)-এর জীবনীকার। নিজের স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন, স্মৃতিশক্তিকে ক্ষুরধার করার জন্য কয়েকজন এক ছাত্র এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাজুবাদামের নির্যাস পান করেছিল যে তাদের একজন সমস্ত বোধবুদ্ধি হারিয়ে উলঙ্গ হয়ে তাঁর ক্লাসে এসেছিল। ইব্ন-খাল্লিকানে[২০]এ ঘটনার উল্লেখ আছে। ক্লাসের ছাত্রদের প্রবল হাসির মধ্যে যখন তার কাছে এই আচরণের জন্য কৈফিয়ত তলব করা হল, তখন সেই ছাত্রটি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল যে, সে এবং তার কয়েকজন সহপাঠী কাজুবাদামের [২১] শাঁস থেকে তৈরি নির্যাস পান করেছে এবং তার ফলে সে ছাড়া অন্য সকলেই তাদের বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হুলাগু রাজধানী দখল করা সত্ত্বেও এবং পরবর্তী কালে তাতার আগ্রাসনের পরেও আল-নিজামীয়া টিকে ছিল। কিন্তু ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাইমূর ল্যাং (টেমারলেন) বাগদাদ দখল করার দু'বছর পরে নিজামীয়া অপেক্ষাকৃত ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মুস্তানসিরীয়ার সঙ্গে মিলে যায়। সর্বশেষ খলিফার পূর্ববর্তী খলিফা আল-মুস্তানসির চারটি নিষ্ঠাবান মাযহাব বা[২২] ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই শিক্ষায়তন তৈরি করেছিলেন। তাই তাঁর নাম অনুকরণেই শিক্ষায়তনটির নাম হয়েছিল আল-মুস্তানসিরীয়া। শিক্ষাকেন্দ্রটির প্রবেশপথেই একটি ঘড়ি (নিঃসন্দেহে জলঘড়ির আদলে) ছিল ; এছাড়া এর মধ্যে স্নানঘর, রান্নাঘর, একটি হাসপাতাল ও গ্রন্থাগার ছিল। ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে ইব্ন-বতুতা বাগদাদ ভ্রমণ করেন। তিনিই ওই শিক্ষাকেন্দ্রটি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি পুনর্নির্মিত হয়। আব্বাসীয় শাসনের সময় থেকেই এটি এবং আল-কাস্র (রাজপ্রাসাদ) আল-আব্বাসী টিকে আছে। তবে আল-কাস্র এখন একটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।

বাগদাদের নিজামীয়া ছাড়াও সালজুকের উজির নাইসাবুর ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরে অনেকগুলি শিক্ষায়তন তৈরি করেছিলেন। সালাহ-আল-দীনের আগে ইসলামি দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। খুরাসান, আল-ইরাক এবং সিরিয়াতে নিজামীয়া ধরনের মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল। মাদ্রাসা তৈরি করা ইসলামে সর্বদাই প্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য হত। বহুসংখ্যক মাদ্রাসা গড়ে ওঠার এটাই ছিল মূল কারণ। পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনীতে আমরা তার বর্ণনা পড়েছি। ইব্ন-জুবাইরের[২৩] বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বাগদাদে এই ধরনের ৩০টি

ল ছিল। সালাহ্-আল-দীনের শাসনে দামাস্কাসের তখন স্বর্ণযুগ। সেখানে প্রায় ২০টি এরূপ স্কুল ছিল। াল-মাওসিলে ছিল ছয় বা তার বেশি এবং হিমসে মাত্র একটি এরূপ স্কুল ছিল।

ধর্মতত্ত্বের এইসব উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ইল্‌ম আল-হাদীস বা হাদীসতত্ত্বই ছিল পাঠক্রমের মূল ভিত্তি। ছাড়া মুখস্থবিদ্যার ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। সেই সময়ে কোন ডায়েরি বা লিখিত বয়ানের কান প্রচলন ছিল না। তাই খবরের উৎসগুলিকে যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে মানতেই হবে য স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষমতাটি বিস্ময়কর মাত্রায় পৌঁছেছিল। ৩০০,০০০ হাদীস মুখস্থ করে হুজ্জত াল-ইসলাম (ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ) উপাধি পেয়েছিলেন আল-গাজ্জালী। শোনা যায়, আহমাদ ব্‌ন-হানবালের ১,০০০, ০০০[২৫] হাদীস মুখস্থ ছিল। একবার আল-বুখারীর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। াকে এমন ১০০টি হাদীস বলতে বলা হয়েছিল, যার একটিতে উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের ক্রমিক শৃঙ্খল ইসনাদ) অপরটির মূল হাদীসের সঙ্গে (মাত্‌ন) জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর স্মৃতি[২৬] থেকে সব চয়টি নিখুঁত ভাবে মুখস্থ বলে দেন। স্মৃতিশক্তি নিয়ে কবিদের সঙ্গে হাদীসবিদগণের প্রতিযোগিতা চলত। এক বই বিক্রেতার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে একটি বই পড়ার পর আল-মুতানাব্বি আর বই কেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কারণ এর বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে তার স্মৃতিশক্তিতে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। আবূ-তাম্মাম ও আল-মাআররীর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ হিসাবে জন্য একই ধরনের ছোট ছোট সত্য ঘটনা প্রচলিত আছে।

● বয়স্ক শিক্ষা

মুসলিম দুনিয়ার কোন স্থানেই বয়স্ক শিক্ষার সুশৃঙ্খল পদ্ধতি চালু ছিল না। কিন্তু প্রায় সমস্ত মুসলিম শহরেই মসজিদগুলি শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করত। যখন একজন দর্শনার্থী কোন নতুন শহরে আসত, সে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মসজিদে যেত যে সেখানে গিয়ে সে হাদীসের ওপর ধর্মগুরুর বক্তব্য শুনতে পাবে। আল-সুসেত গিয়ে আল-মাকদিসি[২৭] এই কাজই করেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় তিনি সেকথা বলেছেন। দশম শতাব্দীর এই পর্যটক-ভূগোলবিদ, তাঁর জন্মস্থান প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া, মিশর ও ফারিসের মসজিদে[২৮] ফকীহ, কোরান পাঠক ও সাহিত্যিকদের বহু আলোচনা চক্র (একবচনে, হলকা) অথবা জন সমাবেশ (একবচনে, মাজলিস) দেখেছিলেন। আল-ফুস্তাত-এ আমরের মসজিদে অনুষ্ঠিত এমন একটি হলকা ইমাম আল-শাফিঈ পরিচালনা করতেন। ৮২০ খ্রিস্টাব্দে[২৯] তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে এখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। ইব্‌ন-হাওকাল[৩০] সিজিস্তানে এই রকম একাধিক সমাবেশ লক্ষ করেছেন। এই সমস্ত সমাবেশে[৩১] শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং কাব্য ও ভাষাগত বিষয়বস্তু নিয়েও আলোচনা হত। মসজিদে এই ধরনের বক্তৃতা শোনার জন্য যে কোন মুসলিম সেখানে প্রবেশ করতে পারত। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সমাবেশগুলি ইসলামি শিক্ষা- দানের সম্প্রসারিত স্কুল হিসাবে টিকে ছিল।

মসজিদের এই সমাবেশগুলি আর এক ধরনের, বিশেষত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির আসর বসত। এর নাম মজলিস আল-আদাব[৩২] বা সাহিতিক বৈঠক ।

আব্বাসি আমল থেকেই এই ধরনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। খলিফার উপস্থিতিতে কবিতা প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় বির্তক ও সাহিত্যিক সম্মেলন প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত। এই ধরনের বির্তক-সংক্রান্ত[৩৩] অল্প কিছু বই এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

● গ্রন্থাগার

মসজিদগুলি ছিল সংগৃহীত বইয়ের ভাণ্ডার। উপহার ও দানের মধ্য দিয়ে মসজিদের গ্রন্থাগারগুলি বিশেষত ধর্মীয় সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অন্যান্যদের মধ্যে ঐতিহাসিক আল-খাতীব আল-বাগদাদী (১০০২-৭১) তাঁর বইগুলিকে 'মুসলিমদের জন্য একটি ওয়াকফ (হস্তান্তরিত করা যায় না এমন সম্পত্তি)' হিসাবে উইল করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বইগুলি এক বন্ধুর[৩৪] বাড়িতে রাখা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ধনবান মানুষদের উদ্যোগে যে সমস্ত আধা-সরকারি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, সেখানে তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান-সংক্রান্ত[৩৫] বইয়ের বিরাট ভাণ্ডার। এমন কী ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলিতেও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রবেশে কোন বাধা ছিল না। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন নগরবাসীর উদ্যোগে আল- মাওসিলে একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। সেখানে ছাত্রদের বিনা পয়সায় লেখার কাগজ[৩৬] সরবরাহ করা হত। বুওয়াইহী শাসক আযুদ-আল-দাওলা (৯৭৭-৮২ খ্রিঃ) নিজের উদ্যোগে শীরাজে যে গ্রন্থাগার (খিজানাত আল-কুতুব) গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে বইগুলি সাজানো থাকত বাক্সের মধ্যে ; বইগুলির একটি তালিকাও ছিল এবং একজন স্থায়ী কর্মচারী[৩৭] সেই গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করত। ওই একই শতাব্দীতে আল-বাসরাতে একটি গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারে এসে যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাজ করতেন, এর প্রতিষ্ঠাতা তাদের নিয়মিত অনুদান[৩৮] দিতেন। আল-রায়িতেও একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। চারশোরও বেশি উট-বোঝাই করা যায় এমন বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সেখানে ছিল এবং সেগুলি দশটি খণ্ডে তালিকাভুক্ত[৩৯] করা হয়েছিল। সেকালে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বির্তক করার উদ্দেশ্যে সমবেত হবার স্থান ছিল গ্রন্থাগার মার্ভ ও খওয়ারিজমের গ্রন্থাগার থেকে তিন বছর ধরে ইয়াকূত তার ভূগোল-অভিধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। চিঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গল আক্রমণ শুরু হবার মুখে তিনি পালিয়ে যান মোঙ্গলেরা এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

● বইয়ের দোকান

আব্বাসি আমলেই ব্যবসায়িক ও শিক্ষাগত সংস্থা হিসাবে প্রথম বইয়ের দোকান চালু হয়। আল-ইয়াকুবী[৪০] জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর আমলেই (৮৯১ খ্রিঃ) রাজধানীর একটি রাস্তাতে একশোরও বেশি বইয়ের দোকান গড়ে উঠেছিল। কায়রো ও দামাস্কাসে এখন যেমন আছে, তেমনি সেই সময়েও অনেক বইয়ের দোকানই মসজিদ পরিচালিত ছোট ছোট বই-বিক্রির কেন্দ্র হিসাবে চালু হয়েছিল কিন্তু বেশ কয়েকটি বইয়ের দোকান ছিল নিঃসন্দেহে বড় এবং সেগুলি রসগ্রাহী ও বই-পড়ুয়া লোকদের

পড়াশোনার কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বই বিক্রেতারা ছিলেন হস্তাক্ষরবিদ, অনুলিপিকার ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁদের দোকানগুলি যে শুধু বই বিক্রির ও বই তৈরির কেন্দ্র ছিল তাই নয়, বরং সেগুলি ছিল সাহিত্য আলোচনার জীবন্ত কেন্দ্র। সমাজে এই বই -বিক্রেতারা যথেষ্ট মর্যাদা পেতেন। ইয়াকূত নিজে এক বই-বিক্রেতার কেরানি হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। আল-নাদীম (মৃ. ৯৯৫ খ্রিঃ) পরিচিত ছিলেন আল-ওয়াররাক (লেখার দ্রব্য বিক্রেতা) নামেও। তিনি নিজে একজন গ্রন্থাগারিক বা বই-বিক্রেতা ছিলেন। সম্ভবত এর ফলেই তালিকা-বিষয়ক তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পুস্তক আল-ফিহ্‌রিস্ত আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। এর মধ্যে[৪১] আমরা ইরাকের এক বিখ্যাত বই-পড়ুয়ার কথা জানতে পারি। তাঁর একটি বিরাট সিন্দুক পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি ছিল। আর এই পাণ্ডুলিপিগুলি পশুচর্ম, মিশরিয় নলখাগড়া, চীনা কাগজ ও চামড়ার পাকানো কাগজে লেখা ছিল। প্রতিটি পাণ্ডুলিপিতেই লেখকের নাম লেখা ছিল। এছাড়াও পাঁচ-ছয় প্রজন্মের পণ্ডিত ব্যক্তিরা পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে টীকাগুলির উল্লেখ করেছেন, সেখানে সেই টীকাগুলিরও উল্লেখ ছিল।

● কাগজ

তৃতীয় মুসলিম শতাব্দী পর্যন্ত লেখার সাধারণ উপাদান ছিল পশুর চামড়া ও মিশরের নলখাগড়া। পশুর চামড়ার ওপর লিখিত কয়েকটি সরকারি দলিল আল-আমিন ও আল-মামূনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময়ে লুঠ হয়ে যায়। পরে সেগুলি আবার ধুয়ে পরিষ্কার করে বিক্রি করা হয়।[৪২] তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে আল-ইরাকে চীনের কাগজ আমদানি শুরু হয়, কিন্তু শীঘ্রই ইরাকে কাগজ তৈরি শুরু হয়ে যায়। সমরকন্দে কিছু চীনদেশীয় বন্দি ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে শন, লিনেন ও শনের লেখা[৪৩] থেকে কাগজ তৈরি করতে শুরু করে। কাগজকে প্রাচীন আরবীয় ভাষায় 'কাগায' বলা হয়। সম্ভবত শব্দটি চীনা ভাষা থেকে পারসীয় ভাষার মাধ্যমে আরবীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সমরকন্দের পর আল-ইরাকেও কাগজ তৈরি হতে শুরু করে। ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানে অধিষ্ঠিত বার্মাকি গভর্নর আল-ফজল ইব্‌ন-ইয়াহিয়ার নির্দেশে বাগদাদে[৪৪] প্রথম কাগজের কল তৈরি হয়। তাঁর ভাই ও হারুনের উজির জাফর সরকারি অফিসগুলিতে[৪৫] পশুর চামড়ার বদলে কাগজ ব্যবহার করতে শুরু করেন। সমরকন্দের কাগজকলের অনুকরণে অন্যান্য মুসলিম শহরেও কাগজকল চালু হয়। তিহামা-তে একটি দেশি কারখানায় উদ্ভিদ তন্তু[৪৬] থেকে কাগজ প্রস্তুত করা শুরু হয়। আল-মাকদিসির[৪৭] সময়েও সমরকন্দের কাগজই ছিল সবার সেরা। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে ত্রিপোলির[৪৮] মতো সিরিয়ার শহরগুলিতে আরও উন্নত মানের কাগজ তৈরি হতে থাকে। নবম শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম- এশিয়া থেকে মিশরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে কাগজ শিল্প ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার অনেকগুলি শহর দীর্ঘদিন ধরে গ্রিকভাষী দেশগুলিতে কারাতীস[৪৯] নামের প্যাপিরাস জাতীয় কাগজ রপ্তানি করত। দশম শতাব্দীর শেষদিকে, গোটা মুসলিম দুনিয়াতেই প্যাপিবাস ও পার্চমেন্টের বদলে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়।

● সংস্কৃতির সাধারণ মান

আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফার আমলে অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, এ কথা সকলেরই জানা। কিন্তু সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির মান কতটা উঁচু ছিল, তা নির্ণয় করা খুব একটা সহজ ছিল না। ইয়াকূতের[৫০] বইতে বাগদাদের এক অনাহারী পণ্ডিতের কাহিনী লেখা আছে। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এমন কী ওই পণ্ডিতের মেয়ে যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তখনও তিনি তাঁর বই বিক্রি করতে ইতস্তত করেছিলেন। হারূনের পর দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃতিবান মানুষেরা কী পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, দি থাউজ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান নাইটস (৪৩৮-৬১নং)-এ উল্লিখিত সুশিক্ষিতা ক্রীতদাসী তাওয়াদ্দুদ প্রশ্নোত্তর-পর্বে যেভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন তার থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। তাওয়াদ্দুদ মানুষের বুদ্ধিকে সহজাত ও অর্জিত এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। জ্ঞানের আধার হল হৃদয় —আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার করেন এবং তার পর সেই জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্কে উদিত হয়। মানুষের শরীরে ৩৬০টি শিরা-উপশিরা, ২৮০টি হাড় ও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। জল, মাটি, আগুন ও বাতাস দিয়ে মানুষের দেহ গঠিত। হৃৎপিণ্ডের সামনে পাকস্থলী অবস্থিত এবং ফুসফুস এই হৃৎপিণ্ডের বায়ুরন্ধ্র হিসাবে কাজ করে। যকৃত দয়ার, প্লীহা হাসির ও দুটি কিডনি ধূর্তামির উৎস। ইন্দ্রিয়ানুভূতি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি—এগুলি হল মস্তিষ্কের পাঁচ প্রকার ক্ষমতা। পাকস্থলী সমস্ত রোগের উৎস এবং রোগ নিরাময়ের উপায় হল খাদ্যাভ্যাস। আর মোট সাতটি গ্রহ আছে—সেগুলি হল সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।[৫১]

● টীকা ●

১ তুলনীয় : গাজ্জালী, ইহ্য়া ১ম খণ্ড, ৮৩ পাতা।

২ ২৭২পাতা।

৩ আগানি, ১৮খণ্ড, ১০১ পাতা।

৪ মুবাররাদ, ১৫০ পাতা, ১.৩।

৫ মাসউদী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২১-২২ পাতা; ইব্‌ন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ৪৭৫-৭৬ পাতা।

৬. এডওআর্ড লুইস মালুফ আল-মাশরিক, ৯ম খণ্ড (১৯০৬), পয়েন্ট ১০৭৪।

৭ জাহিয, বায়ান, ১ম খণ্ড, ১৭৩ পাতা।

৮ লক উল্লিখিত।

৯ তালীম আল-মুতাআল্লিম তারিখ আল-তাআল্লুম, সি. কাসপারি সম্পাদিত, (লিপজিগ, ১৮৩৮), ১৪-১৯ পাতা। গাজ্জালী, ১ম খণ্ড, ৮-১১ পাতা দেখুন।

১০ তালিকার জন্য খলীল এ তোতাহ্ রচিত দি কনট্রিবিউশন অফ দি আরবস টু এডুকেশন (নিউইয়র্ক, ১৯২৬), ৬৭-৭৬ পাতা দেখুন।

১১ সুয়ুতি, হুস্‌ন ২য় খণ্ড, ১৫৬-৫৭পাতা। দেখুন সিএয় কাজবীনি আসার, ২৭৬ পাতা।

১২ রুবেন লেভি, এ বাগদাদ ক্রোনিকল (কেমব্রিজ, ১৯২৯), ১৯৩ পাতা

১৩ ইব্‌ন-আল-আসীর, ১১শ খণ্ড, ১১৫পাতা।

১৪ ১১শ খণ্ড, ১০০পাতা।

১৫ ইব্‌ন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ১২৩।

১৬ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ৪৩০ পাতা দেখুন।

১৭ পিপি ২১৯-২০।

১৮ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পাতা ; আল মুনকিয মিন-আল-যালাল (কায়রো, ১৩২৯), ২৯-৩০ পাতা।

১৯।১ম খণ্ড, ৪৩-৪৯ পাতা, আয়্যুহা আল-ওয়ালাদ, সম্পাদনা ও অনুবাদ : হ্যামার-পার্গস্টল (ভিয়েনা, ১৮৩৮); ইংরাজি অনুবাদঃ জি এইচ শিরার (বেইরুট, ১৯৩৩)।

২০ ৩য় খণ্ড, ৪৩৫ ও পরের পাতা।

২১ পারসি 'বালাদুর' শব্দ থেকে আরবী 'বালাযুর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বলা হয় যে, পারসীয় ঐতিহাসিক আল-বালাযুরি অ্যানাকার্ডিযার (কাজুবাদাম) রস পান করে মারা গিয়েছিলেন। সেই কারণেই তার এই পদবী।

২২ আবু-আল-ফিদা, ৩য় খণ্ড, ১৭৯ পাতা।

২৩ ২য় খণ্ড ১০৮-৯ পাতা।

২৪ পাতা ২২৯, ১.১০, ২৮৩ পাতা, ১ ৮, ২৩৬ পাতা, ১১.১-২, ২৫৮ পাতা, ১.২০।

২৫ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৮ পাতা।

২৬ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ২ য় খণ্ড, ২৩০-৩১ পাতা।

২৭ ৪১৫ পাতা।

২৮ মাকদিসি, ১৮২, ১৭৯ পাতা, ১.২০, ২০৫ ও ৪৩৯ পাতা, ১.১১।

২৯ ইয়াকুত, উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৮৩ পাতা; সুয়ুতি, হুসন, ১ম খণ্ড, ১৩৬ পাতা।

৩০ পৃষ্ঠা ৩১৭।

৩১ ইয়াকুত, ৪ র্থ খণ্ড, ১৩৫ পাতা, ২.১৪-১৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩২ পাতা, ১১. ১৪-১৬।

৩২ আগানি ১৮ খণ্ড, ১০১ পাতা।

৩৩ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৩৫৪ পাতা দেখুন।

৩৪ ইয়াকুত, ১ম খণ্ড, ২৫২ পাতা, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পাতা।

৩৫ ব্যাখ্যার জন্য ঐ বইয়ের ৫ম খণ্ড, ৪৬৭ পাতা দেখুন।

৩৬ ইয়াকুত, ২ য় খণ্ড, ৪২০ পাতা

৩৭ মাকদিসি, ৪৪৯ পাতা। ইয়াকুত, ৫ম খণ্ড, ৪৪৬ পাতাও দেখুন ।

৩৮ মাকদিসি, ৪১৩ পাতা।

৩৯ ইয়াকুত, ২ য় খণ্ড, ৩১৫ পাতা।

৪০ পাতা ২৪৫।

৪১ পাতা ৪০।

৪২ ফিহ্‌রিস্ত, ২১পাতা।

৪৩ ডব্লিউ বার্টহোল্ড, তুর্কীস্থান ডাউন টু দি মোঙ্গল ইন-ভেসন, ২ য় সংস্করণ (অক্সফোর্ড, ১৯২৮), ২৩৬-৩৭ পাতা। তুলনীয় ফিহ্‌রিস্ত, ২১ পাতা

৪৪ ইব্‌ন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ৩৫২ পাতা।

৪৫ মাকরিজি, খিতাত, সম্পাদনা : উইয়েট, ২ য় খণ্ড, ৩৪ পাতা। তুলনীয় কালকাশান্দি, ২য় খণ্ড, ৪৭৫-৭৬ পাতা।

৪৬ ফিহ্‌রিস্ত, ৪০ পাতা, ১.২৩।

৪৭ পাতা ৩২৬।

৪৮ নাসির-ই-খুসরু, সেফের নামেহ, সম্পাদনা ও অনুবাদ : চালর্স স্কিফার (প্যারিস, ১৮৮১), মূল পাঠাংশ, ১২ পাতা, অনুবাদ, ৪১ পাতা।

৪৯ গ্রিক ভাষা কার্তেস থেকে আগত আরবী একবচনে কিরতাস। ইয়াকুবী, ৩৩৮ পাতা, ১১.৮, ১৩ দেখুন ; কালকাশান্দি, ২য় খণ্ড, ৪৭৪ পাতা। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে ৩৪৭ পাতা দেখুন।

৫০ ১ম খণ্ড, ৩৮-৩৯ পাতা।

৫১ টলেমি উদ্ভাবিত সৌরজগতেরও নয়টি গ্রহ। শেষের পাঁচটি আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের অধিবাসীদের কাছে পরিচিত ছিল। জ্যাস্ট্রো, সিভিলাইজেশন অফ ব্যাবিলোনিয়া, ২৬১ পাতা।



LOW CAP OF THE SĀSĀNID TYPE
(Original in Kunsthistorisches Museum, Vienna)

আল মুতাওয়াক্কিল (৮৫৫ খ্রিঃ)-র ছবি আঁকা একটি রুপোর মুদ্রা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর দাড়ি দুভাগে বিভক্ত এবং তাঁর মাথায় আছে সাসানীয় .রনের নিচু টুপি।

॥ অধ্যায় ২৯ ॥

চারুকলার অগ্রগতি

আরবীয়রা ছিল সেমাইট। কাব্যের মতো শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের উপলব্ধি ছিল গভীর। তা ছাড়া শিল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কেও তাদের অনুভূতি ছিল প্রখর। কিন্তু শিল্পবস্তুর বিভিন্ন অংশের সুসমঞ্জস ঐক্য গড়ে তুলে তাকে একটি সামগ্রিক শিল্পবস্তুতে পরিণত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। বিশেষত স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রকলায় তারা প্রথম দিকে তেমন কোন অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। দশম শতাব্দীর পর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি যেমন থমকে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি উল্লিখিত ওই দুটি ক্ষেত্রেও আরবদের এগিয়ে চলার গতি যেন চিরকালের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

● স্থাপত্যশিল্প

স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন যে বিশাল সৌধগুলি এক সময় আল-মানসুর ও আল-রশীদের শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল, পরে তাদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মুসলিম দুনিয়ার পবিত্রতম দুটি স্থাপত্যসৌধ, অর্থাৎ দামাস্কাসের উমাইয়া মসজিদ ও জেরুসালেমের

পাথরের গোল গম্বুজ উমাইয়া আমলের প্রথম যুগ থেকে এখনও টিকে রয়েছে। বাগদাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতার দ্বারা নির্মিত এবং সোনার দরজা (বাব আল-যাহাব) বা সবুজ গোল গম্বুজ (আল-কুব্বা আল-খাদরা) নামে পরিচিত খলিফার প্রাসাদ, অমরত্বের প্রাসাদ (কাস্‌র আল-খুলদ), যুবরাজ আল-মাহদীর[১] জন্য নির্মিত রুসাফা প্রাসাদ, আল-শাম্মাসিয়াহ্‌তে[২] অবস্থিত বার্মাকিদের প্রাসাদগুলি, সামাররার পর বাগদাদে রাজধানীকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার কৃতিত্বের অধিকারী আল-মুতাযিদ (৮৯২-৯০২ খ্রিঃ) দ্বারা ৪০০,০০০ দিনার[৩] ব্যয়ে নির্মিত কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রাসাদ (আল-সুরাইয়া), তাঁর পুত্র আল-মুকতাফি (৯০২-৯০৮ খ্রিঃ) দ্বারা সমাপ্ত ও সিংহাসনের (আল-তাজ)[৪] আদলে নির্মিত প্রাসাদটি, পুকুরের ওপর নির্মিত সোনা ও রুপোর গাছের অলংকরণে সমৃদ্ধ 'বৃক্ষনিবাস' (দার আল-শাজারাহ) নামে পরিচিত আল-মুকতাদিরের (৯০৮-৩২ খ্রিঃ) অনুপম প্রাসাদ, ১,০০০ ০০০ দিনার[৫] ব্যয়ে নির্মিত ও মুইজ-আল-দাওলাহ্‌ (৯৩২-৬৭ খ্রিঃ)-র নামের অনুসরণে আল-মুইজ্‌জিয়া নামে খ্যাত বুওয়াইহিদ প্রাসাদ ও এগুলির মতো আরও কিছু সুন্দর প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে তাদের উৎকর্ষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতে পারেনি। আল-আমীন ও আল-মামূনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হুলাগুর দ্বারা রাজধানী লুণ্ঠন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সমস্ত প্রাসাদগুলিকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে যে কোন্‌ জায়গায় প্রাসাদগুলি ছিল এখন আর তা চিনতে পারাই যায় না।

রাজধানীর বাইরে আব্বাসীয় আমলের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি কোনমতেই সামাররা শহরের জনক আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র ও ওই শহরের বিরাট মসজিদটির[৬] নির্মাতা আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রিঃ)-এর শাসনকালের আগেকার সময়ের নয়। সেই পবিত্র মসজিদটি তৈরি করতে ৭০০,০০০ দিনার[৭] ব্যয় হয়েছিল। এই মসজিদটি ছিল আয়তাকার এবং এর জানালার বহুপাত বিশিষ্ট ধাতব খিলানগুলি স্থাপত্যশিল্পে ভারতীয় প্রভাবের পরিচয় দেয়। এখানে অথবা সামাররার নিকটবর্তী আবু-দুলাফ (নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের)-এর মসজিদটিতে কিবলাহ্‌ প্রাচীরের মধ্যে মিহ্‌রাব (প্রার্থনার স্থান)-এর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। সিরিয়ার কোন শিল্পী এই কিবলাহ্‌ প্রাচীর তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয় এবং খ্রিস্টান চার্চের[৮] আদলেই এটি তৈরি হয়েছিল। বাইরের দিকে সামাররার বিরাট মসজিদের বিপরীতে একটি সৌধ রয়েছে। প্রাচীন ব্যাবিলনের জিগারাত-এর[৯] সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এই সৌধটির অনুকরণেই ইব্‌ন-তূলুন তার মসজিদের (৮৭৬-৭৯ খ্রিঃ) মিনারটি তৈরি করেন। এর গম্বুজটি সূচালো। আমর (৮২৭ খ্রিঃ)-এর পুনর্নির্মিত মসজিদ ও নাইলোমিটারের (৮৬১ খ্রিঃ) পর এই মসজিদটিতেই তৃতীয় বার এমন ধরনের সূচালো গম্বুজ তৈরি করা হয়েছিল। সামাররা ও আল-রাক্কাতে বিদ্যমান অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরি আব্বাসীয় আমলের স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষগুলি এশিয়ার বিশেষত পারসীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে; বাইজানটাইন-সিরিয়ার স্থাপত্যরীতির

দ্বারা প্রভাবিত উমাইয়া আমলের স্থাপত্যকীর্তির সঙ্গে এর কোন মিল নেই বললেই চলে। সাসানি বংশের (২২৬-৬৪১ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকালে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক পারসীয় স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠেছিল। ডিম্বাকার গম্বুজ, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, শাঁখের মতো পেঁচানো



আশুর-এর আনু-আদাদ মন্দিরের মঞ্চ (জিগুরাট্)-এটি পুনর্নির্মিত হয়।

সৌধ, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অট্টালিকার ওপর নির্মিত ফোকরযুক্ত প্রাচীর, মসৃণ টালিযুক্ত প্রাচীর ও ধাতু দিয়ে ঢাকা ছাদ ইত্যাদি ছিল এই নতুন ধরনের স্থাপত্যরীতিটির বৈশিষ্ট্য। আব্বাসীয় আমলের শিল্পকীর্তিগুলি গড়ে ওঠার পিছনে এই নতুন ধরনের স্থাপত্যরীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

● চিত্রকলা

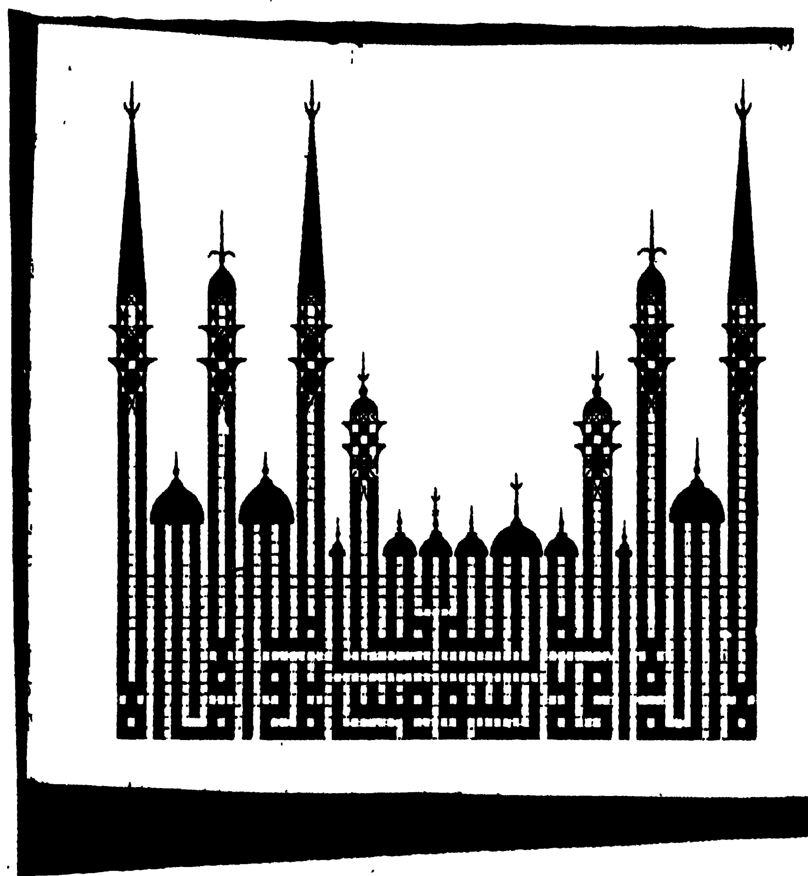
সুরাপান যাতে জোর করে নিষিদ্ধ করা না হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আছে কোরানে। কিন্তু তবু গোঁড়া তাত্ত্বিকরা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন জোর করেই। সৌভাগ্যের ব্যাপার শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের এই প্রতিকূল আচরণ তেমনভাবে কার্যকরী হতে পারেনি। আল-মানসুর তার প্রাসাদের গম্বুজের ওপর এক অশ্বারোহীর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। এটি হাওয়া-নিশান হিসাবে ব্যবহৃত হত। টাইগ্রিস নদীতে আল-আমীনের যে সমস্ত বিলাসবহুল

নৌকা ভেসে বেড়াত, সেগুলি সিংহ, ঈগল ও ডলফিনের আদলে তৈরি করা হয়েছিল। তেমনি আল-মুকতাদিরের প্রাসাদে একটি বিরাট জলাশয়ে ১৮ টি শাখাযুক্ত একটি সোনার ও একটি রুপোর গাছ নির্মাণ করা হয়েছিল। জলাশয়ের দুইদিকে কিংখাব পরা ও বর্শাধারী ১৫ জন অশ্বারোহীর এমন চলমান মূর্তি তৈরি করা হয়েছিলে যাদের দেখে মনে হত তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে।

সামাররা নগরের (৮৩৬ খ্রিঃ) জনক খলিফা আল-মুতাসিমের প্রাসাদের দেওয়ালগুলি কুসাইর আমরা-র দেওয়ালগুলির মতো বিশেষ পদ্ধতিতে অঙ্কিত নগ্ন নারীমূর্তি ও শিকার দৃশ্য দ্বারা সজ্জিত ছিল। সম্ভবত কোন একজন খ্রিস্টান শিল্পীই এই ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় উত্তরসূরি আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে এই অস্থায়ী রাজধানীটি উন্নতির শীর্ষে[১১] পৌছেছিল। তাঁর প্রাসাদের দেওয়ালগুলি রঙিন চিত্র দ্বারা সাজানোর জন্য তিনি এক গ্রিক চিত্রকরকে নিয়োগ করেছিলেন। তার আঁকা ছবিগুলির মধ্যে সন্ন্যাসীসহ গির্জার[১১] একটি ছবিও ছিল।

মুসলিম দুনিয়ায় অনেক দেরিতে চিত্রকলাকে ধর্মের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মতো এটি কখনই ইসলাম ধর্মের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আরবের একজন পর্যটক চীনদেশের রাজদরবারে[১৪] সর্বপ্রথম মহান ধর্মপ্রচারক মুহাম্মাদের ছবি দেখেন। কিন্তু এটা নেস্টোরিয় খ্রিস্টানরাও এঁকে থাকতে পারে। বুরাকের বহু ছবিতেই মানুষরূপী উর্ধ্বাঙ্গ ও অশ্বরূপী নিম্নাঙ্গযুক্ত গ্রিক দেবতা বা মানুষের মাথাওয়ালা বেগবান জন্তুরূপী প্রাচীন অ্যাসিরীয় দেবতার মূর্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত পারসীয় চিত্রকলা থেকেই তারা দেবতার এই আদিরূপ গ্রহণ করে থাকতে পারে। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে মুসলিম ধর্মীয় চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। আর্নল্ডের গবেষণা[১৫] থেকে জানা যায় যে, প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের গির্জা বিশেষত জ্যাকোবাইট ও নেস্টোরিয়ানদের শিল্পকলা থেকেই মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় চিত্রকলার বিষয়বস্তু আহরণ করেছিল। তাদের কাছ থেকেই মুসলিমরা বই অলংকরণের কাজও শিখেছিল। ছোট ছোট ছবি বা মিনিয়েচার আঁকার ক্ষেত্রে ম্যানিকিয়ানদের প্রভাব ভালভাবেই লক্ষ করা যায়।[১৭] তবে চিত্রকলার ব্যাপারে আরবদের আগ্রহ এতই কম ছিল যে, মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাস সম্পর্কে হাতে-গোনা যে কয়েকটি আরবী বই লেখা হয়েছিল, বর্তমানে তার কোনটিরই অস্তিত্ব নেই।

আরবী ভাষায় লেখা প্রাচীনতম যে পাণ্ডুলিপিটির এখনও অস্তিত্ব রয়েছে, সেটি হল ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা আল-সুফির জ্যোতির্বিদ্যা (এখন লেলিনগ্রাডে)। রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খ্রিস্টিয় শতাব্দীতে রচিত কালীলা ওয়া-দিমনা, আল-হারীরির লেখা মাকামাত ও আল-আগানির[১৮] আগে আর কোন বই লেখা হয়নি। তখনকার ছোট ছোট ছবিগুলিতে সেই সমস্ত শিল্পীদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা নিজেরা খ্রিস্টান ছিলেন অথবা কোন খ্রিস্টিয় উপাদান থেকে আহরিত ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাঁরা তাঁদের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাধীন মুসলিম চিত্রশিল্পীদের আবির্ভাবের আগে এই সমস্ত মুসলিমরা তাদের



ধর্মগুরুদের নির্দেশ উপেক্ষা করে জ্যাকোবাইট ও নেস্টোরিয়ন চিত্রশিল্পীদের নিয়োগ করেছিলেন। পুরানো ইন্দো-ইরানীয় শিল্পবৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যে উর্বর পারস্যেই সর্বপ্রথম এই



আল হারিরি-র একটি দৃশ্য (মাকামাহ্)

ধরনের স্বাধীন মুসলিম চিত্রশিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। শী'আহপন্থিদের বিদ্রোহী মানসিকতার ফসল হিসাবে এই সমস্ত চিত্রশিল্পীর জন্ম হয়েছিল বলে যে-ধারণা প্রচলিত আছে, তা সত্য নয়। কারণ ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সাফাবী বংশের রাজত্ব শুরুর আগে পারস্যে শী'আহ্ মতবাদের এমন প্রভাব ছিল না যাতে এটি রাষ্ট্রধর্ম হয়ে উঠতে পারে।

● বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত শিল্পকলা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পারস্যের মানুষেরা সুন্দর সুন্দর নকশা তৈরি ও রঙের ব্যবহারে তাদের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিল। তাদের প্রচেষ্টাতেই মুসলিম দুনিয়ায় বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার্য চিত্রকলা উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। মিশরে ফ্যারাওদের শাসনকাল থেকেই কার্পেট বোনার কাজ শুরু হয়েছিল। কম্বলের নকশাতে শিকারের ও বাগানের ছবিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে ফটকিরি মিশিয়ে সেগুলিকে পাকা করা হত, যাতে রঙ সহজে নষ্ট

হয়ে না যায়। মিশর ও সিরিয়ার হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত নকশাকাটা কাপড় ইউরোপের মানুষের কাছে এত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, ধর্মযোদ্ধা ও অন্যান্য পশ্চিমি দেশের মানুষেরাও সাধুসন্তদের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নের মোড়ক হিসাবে এই কাপড়ই ব্যবহার করত।

মিশর ও সুসার—জন্মলগ্ন থেকেই ওই দুটি দেশে সিরামিকের কাজ চালু আছে। সিরামিকের বিভিন্ন দ্রব্যে মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের ছবি এবং জ্যামিতিক ও লিপি ও নকশা আঁকার ক্ষেত্রে তারা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অন্য কোন মুসলিম শিল্পমাধ্যম[১১] এই উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারেনি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুসলিম শতাব্দীতে ছাঁচে ফেলা শিল্পকর্ম ও চিত্রকলার বিরুদ্ধে আইনবিশারদদের মধ্যে অনড়-অচল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা সত্ত্বেও মাটি ও ধাতুর কাজে যে বিশেষ পারদর্শিতা গড়ে উঠেছিল, মধ্যযুগে তার তুলনা মেলে না। ফুলের কারুকার্যে সজ্জিত কাশানি টালি প্রথমে পারস্যে তৈরি হয়েছিল, পরে এটি দামাস্কাসেও ব্যবহার হতে থাকে। মোজাইক টালির পাশাপাশি বাড়ির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অলংকরণের কাজেও এই ধরনের টালির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। আরবের অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সুন্দর সুন্দর নকশার প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে তুলেছিল এবং মুসলিম শিল্পকলার একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠেছিল। সেগুলি এমন কী ধর্মীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে অ্যান্টিয়োক, আলেপ্পো, দামাস্কাস ও টায়ার-এর মতো ফিনিশিয়ার প্রাচীন শহরে কাচ গিলটি ও কলাই করার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ল্যুভের, ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও কায়রোর আরব মিউজিয়ামের সম্পদগুলির মধ্যে সামাররা ও আল-ফুস্তাতে প্রস্তুত এবং বাড়ি ও মসজিদে ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবর্তিত রামধনু রঙের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর সুন্দর প্লেট, কাপ, ফুলদানি, হাতলযুক্ত বড় জগ ও বাতিগুলি ছিল অন্যতম।

● হস্তাক্ষরবিদ্যা

আল্লাহ্‌র বাণীকে চিরস্থায়ী লিখিত রূপ দেবার মাধ্যম হিসাবে হস্তাক্ষরবিদ্যা সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। এ ব্যাপারে কোরানের সম্মতিও (৬৮:১,৯৬:৪) ছিল। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মুসলিম শতাব্দীতে এই শিল্পকলার জন্ম হয়েছিল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি সবচেয়ে মূল্যবান শিল্পমাধ্যমের স্থান[১৮] দখল করেছিল। চরিত্রের দিক থেকে এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলামি ঘরানার এবং চিত্রকলার ওপরে এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সজীব বস্তুর প্রতিলিপি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে না পারায় মুসলিমরা এই হস্তাক্ষরবিদ্যার মধ্যেই তাদের নন্দনচর্চার উপযোগী মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল। চিত্রশিল্পীদের তুলনায় হস্তাক্ষরবিদরা সমাজে অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান উপভোগ করত। এমন কী মুসলিম শাসকেরাও কোরানের অনুলিপি তৈরি করে ধর্মীয় গুণাবলির অধিকারী বলে খ্যাতি লাভ করার চেষ্টা করতেন। আরবী ভাষায় লেখা ইতিহাস ও সাহিত্যের বইগুলিতে অনেক হস্তাক্ষরবিদের নাম যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করা হলেও স্থাপত্যবিদ, চিত্রকর ও

ধাতুশিল্পীদের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে। আরবের হস্তাক্ষরবিদ্যার জনকদের মধ্যে আল-রাইহানি[১৯] (রিহানি, মৃ. ৮৩৪ খ্রিঃ), ইব্‌ন-মুকলা (মৃ. ৮৮৬-৯৪০ খ্রিঃ) ও ইব্‌ন-আল-বাউয়াব[২০] (মৃ ১০২২ বা ১০৩২ খ্রিঃ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। আল-মামুনের শাসনকালে আল-রাইহানির কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল এবং তিনি তার নামের অনুকরণে অভিহিত হস্তাক্ষরবিদ্যার ওই বিশেষ পদ্ধতিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিলেন। ইব্‌ন-মুকলা ছিলেন আব্বাসীয় আমলের একজন উজির। খলিফা আল-রাজির নির্দেশে তার ডান হাতের আঙুলগুলি কেটে নেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি বাঁ-হাত দিয়ে এবং এমন কী ডান হাতের তালুর[২১] সঙ্গে কলম বেঁধে নিয়ে সুন্দরভাবে লিখতে পারতেন। বাগদাদের পাঠকক্ষের এক পিয়নের ছেলে ইবন-আল-বাউয়াব ছিলেন হস্তাক্ষর বিদ্যায় মুহাককাক রীতির প্রবর্তক। ইয়াকুত-আল-মুস্তাসিমি ছিলেন আব্বাসীয় আমলের সর্বশেষ প্রসিদ্ধ হস্তাক্ষরবিদ। আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের দরবারে হস্তাক্ষর রীতিটি তার নাম অনুযায়ী ইয়াকুতি রীতি বলে পরিচিত হয়। ইয়াকৃত[২২] ও প্রাচীন কালের অন্যান্য খ্যাতনামা হস্তাক্ষরবিদদের যে-সমস্ত লিখনশৈলী এখনও টিকে আছে, তার ভিত্তিতে বিচার করলে সেগুলিকে খুব উঁচু মানের শিল্পকলা বলা যাবে না। হস্তাক্ষরবিদ্যা হল একমাত্র আরবীয় শিল্পকলা, এখনও কনস্ট্যান্টিনোপল, কায়রো, বেইরুট ও দামাস্কাসে যার খ্রিস্টান ও মুসলিম প্রতিনিধিদের দেখা পাওয়া যায়। তাদের হস্ত-লিখিত শিল্পশৈলী রুচি ও সৌন্দর্যের দিক থেকে প্রাচীনকালের হস্তাক্ষরবিদদের শ্রেষ্ঠ লিখনশৈলীকেও ছাপিয়ে যাবে।

হস্তাক্ষরবিদ্যার পাশাপাশি রঙের ব্যবহার, পালিশ করার ও বই বাঁধাই করার কৌশলও পবিত্র কোরানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছিল ও তাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। আব্বাসীয় আমলের শেষদিকেই বই অলংকরণ ও কোরানের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য আনার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সালজুক ও মামলুক আমলে তা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এক্ষেত্রেও নেস্টোরিয়ান ও জ্যাকোবাইটদের চিত্রকলা সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। হস্তাক্ষরবিদদের পর মুসলিম পালিশ-শিল্পীদের (মুযাহ্‌হিব) আবির্ভাব ঘটেছিল এবং গুরুত্বের দিকে থেকে হস্তাক্ষরবিদদের পরেই ছিল তাদের স্থান। কোরানের পর সাধারণ পাণ্ডুলিপি রচনার কাজেও হস্তাক্ষরবিদ্যার ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

● সঙ্গীত

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আইনবিশারদদের অসম্মতি দামাস্কাসে কিছুটা প্রভাব ফেললেও পরবর্তীকালে বাগদাদে এর কোন কার্যকারিতা ছিল না বললেই চলে। উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন আব্বাসীয় বংশের আল-মাহদী। তিনি তাঁর দরবারে মক্কার সিয়াত[২৩] (৭৩৯-৮৫ খ্রিঃ) ও তাঁর ছাত্র ইব্‌রাহীম আল-মাওসিলি (৭৪২-৮০৮ খ্রিঃ)-কে আমন্ত্রণ জানান এবং নানাভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

শোনা যায়, সিয়াত-এর সঙ্গীত মানুষের ঠাণ্ডা হৃদয়কে গরম জলের স্নানের[২৪] চেয়েও বেশি গরম করে দিত। পরে তাঁর ছাত্র ইব্‌রাহীম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। একটি মহান পারসীয় পরিবারের সন্তান[২৫] ইব্‌রাহীমকে তাঁর যৌবনকালে চুরি করে আল-মাওসিলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বন্দি থাকার সময়ে তিনি ওই দস্যুদের কিছু গান শেখেন। তিনিই প্রথম লাঠির[২৬] সাহায্যে সঙ্গীতে তাল ও লয় সৃষ্টি করেন এবং ৩০ জন বীণাবাদকের মধ্যে একটি মেয়েকে চিহ্নিত করে বেসুরে বাঁধা তার বীণাযন্ত্রটির[২৭] দ্বিতীয় তারটিকে শক্ত করে বাঁধার নির্দেশ দিতে পারতেন। পরবর্তীকালে, আল-রশীদ তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী রূপে ইব্‌রাহীমকে নিয়ে আসেন, তাকে ১৫০,০০০ দিরহাম দান করেন এবং তাঁর জন্য ১০,০০০ দিরহাম মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে শিল্পী ইব্‌রাহীম মাঝে মাঝে উপহার পেতেন। একবার একটি গানের জন্য এরকম উপহারের পরিমাণ ছিল ১০০,০০০ দিরহাম। সিয়াত-র সৎছেলে ও কুরায়শ বংশজাত ইব্‌ন-জামি ছিলেন ইব্‌রাহীমের এক নিকৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী। ইকদ-এর বিচারের নিরিখে বলা যায় যে, ইব্‌রাহীম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু ইব্‌ন-জামির সৃষ্টি করা সুর ছিল সবচেয়ে মধুর![২৮] হারূন যখন তাঁর দরবারের এক সমাদৃত চারণকবিকে ইব্‌ন-জামি সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তার উত্তর ছিল, "আমি কীভাবে মধুর বর্ণনা দেব, কারণ যেভাবেই আপনি তার স্বাদ গ্রহণ করুন না কেন তা মিষ্টি লাগবে![২৯]

আল-রশীদের রাজদরবারে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মতো সঙ্গীত ও গীতিকাব্য উভয়েরই পৃষ্ঠপোষকতা হত। আর এর ফলেই সেই দরবারটি এক ঝাঁক সঙ্গীত তারকার[৩০] মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞদের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা ক্রীতদাসীরা রাজদরবারের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নিত এবং তারাই অগণিত বিস্ময়কর ছোট ছোট সত্য কাহিনী সরবরাহ করত। এগুলিই আগানি,[৩১] ইকদ, ফিহ্‌রিস্ত, নিহায়া ও সর্বোপরি অ্যারাবিয়ান নাইটস-এর পাতায় পাতায় অমর সৃষ্টিরূপে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। শোনা যায়, খলিফার উদ্যোগে সংগঠিত একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে দু'হাজার সঙ্গীতশিল্পী অংশগ্রহণ করেছিল। তার পুত্র আল-আমীনের উদ্যোগে সংগঠিত সারারাতব্যাপী একটি অনুষ্ঠানে রাজপ্রাসাদের সমস্ত পুরুষ ও মহিলারা ভোর না-হওয়া পর্যন্ত নেচেছিল।[৩২] যখন আল-মামুনের সৈন্যবাহিনী বাগদাদ অবরোধ করছিল, তখন আল-আমীন বিষণ্ণ মনে টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত তার রাজপ্রাসাদে বসে তার প্রিয় মহিলা সঙ্গীতশিল্পীদের গান শুনছিলেন।[৩৩]

আল-রশীদের আর এক আশ্রিত ব্যক্তি মুখারিক (মৃ. ৮৪৫ খ্রিঃ) ছিলেন ইব্‌রাহীমের ছাত্র। বাবার মাংসের দোকানে শিশুবয়সে তিনি যখন একদিন কাঁদছিলেন, তার ওই মিষ্টি ও জোরালো কণ্ঠস্বর শুনে এক মহিলা সঙ্গীতশিল্পী মুখারিককে কিনে নিয়ে যান। পরে তিনি হারূনের দখলে আসেন। হারূন তাকে মুক্ত করে দেন। ১০০,০০০ দিনার[৩৪] দান করেন এবং খলিফার পাশে আসনে বসার অধিকার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এক সন্ধ্যায় টাইগ্রিস

নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি গান শুরু করেন। তার কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, সেই অসাধারণ সঙ্গীতশিল্পীর[৩৫] গান শোনার জন্য বাগদাদের রাস্তায় মানুষের ভিড় জমে যায়।

আল-মামুন ও আল-মুতাওয়াক্কিলের আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ইসহাক ইব্‌ন-ইব্‌রাহীম আল-মাওসিলি (৭৬৭-৮৫০ খ্রিঃ)। তাঁকে ওই যুগের সঙ্গীতজ্ঞদের ডীন[৩৬] বলা হয়। বাবার পর ইসহাকের সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আরবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গীতের সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ইসহাক ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞ।[৩৭] তাঁর বাবা ও জিরয়াবের মতো তিনিও দাবি করতেন যে, জিন্নেরাই তাকে সঙ্গীতসৃষ্টির প্রেরণা যোগাত।

তৎকালীন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞরা খলিফাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে চিরকালীন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা নিছক সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না-এঁরা ছিলেন রসিক মানুষ। কবিতা ও ছোট ছোট অজস্র সত্য কাহিনীও তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা একাধারে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার, কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তি। সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাঁদের তত্ত্বাবধানে বাদ্যযন্ত্রীরা (একবচনে, যারিব) কাজ করতেন; এই বাদ্যযন্ত্রীদের কাছে বীণা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শিল্পীরা বড় বেহালা (রাবাব) নামে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত। তারপর মহিলা সঙ্গীত-শিল্পীদের (একবচনে, কায়েনা) আবির্ভাব ঘটল। সেই সময়কার নিয়ম অনুযায়ী তারা পর্দায় আড়াল থেকে গান শোনাত। এই ধরনের মেয়েরাই পরে হারেমের প্রয়োজনীয় ভূষণে পরিণত হল এবং এদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দেওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসাবে গড়ে উঠল। ইসহাকের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি মেয়ের জন্য মিশরের গভর্নরের এক দূত এবং বাইজানটাইন সম্রাটের দূত উভয়েই ৩০,০০০ দিনার দিতে চেয়েছিলেন। খুরাসানের শাসকের দূত এটা বাড়িয়ে ৪০,০০০ দিনার করেন। ঝামেলা এড়াতে ইসহাক শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন ও তাকে বিয়ে করেন।[৩৮]

দামাস্কাসের তুলনায় বাগদাদের খলিফার দরবারে অনেক বিশিষ্ট বীণাবাদক, সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকারদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আব্বাসীয় বংশের ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আল-মাহদী ছিলেন হারুনের ভাই। তিনি ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে আল-মামুনের প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী[৩৯] হিসাবে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বীণাবাদক ও এর ১০০ টি সঙ্গীতের[৪০] রচয়িতা আল-ওয়াসিক (৮৬১-৬২ খ্রিঃ) ছিলেন প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ খলিফা। তারপর আল-মুন্তাসির (৮৬১-৬২ খ্রিঃ) ও আল-মুতাজ (৮৬৬-৬৯ খ্রিঃ) উভয়েই কিছুটা কাব্যিক ও সাঙ্গীতিক প্রতিভার[৪১] পরিচয় দেন। কিন্তু আল-মুতামিদ (৮৭০-৯২ খ্রিঃ) ছিলেন একমাত্র প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ খলিফা। তাঁর উপস্থিতিতে ভূগোলবিদ ইব্‌ন-খুরদাযবিহ্ গান ও নাচের ওপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তব্যটিকে সেই সময়ে সঙ্গীত ও নৃত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান[৪২] বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

● সঙ্গীততত্ত্ববিদ

আব্বাসীয় আমলের স্বর্ণযুগে যে সমস্ত গ্রিক রচনাবলির অনুবাদ হয়েছিল, তার মধ্যে খুব অল্প কয়েকটিতেই সঙ্গীতের দূরকল্পী তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অ্যারিস্টটলের লেখা এই ধরনের দুটি রচনাবলি কিতাব আল-মাসাইল (প্রবলেমাটা) ও কিতাব ফী আল-নাফস (দ্য অ্যানিমা)[৪৩] নামে আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বিখ্যাত নেস্টোরিয়ান চিকিৎসক হুনায়ন ইব্ন-ইসহাক (৮০৯-৭৩ খ্রিঃ) এই অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কিতাব আল-সাওত (দ্য ভোস) নামে গ্যালেনের একটি বই অনুবাদ করেছিলেন। কিতাব আল-নাগাম (সঙ্গীতের বই) ও কিতাব আল-কানুন (অনুশাসন)[৪৪] নামে ইউক্লিডের দুটি বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এর মধ্যে কিতাব আল-নাগাম ছিল একটি মেকী-ইউক্লিডীয় ভাষান্তর। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যারিস্টোজেনাস তাঁর বই কিতাব আল-ইকা (ছন্দ)[৪৫] এবং অ্যারিস্টটলের ছেলে নিকোম্যাকাস তাঁর কিতাব আল-মূসীকি আল-কবীর (সঙ্গীত সম্পর্কে সঙ্গীতজ্ঞের রচনা)[৪৬] বইয়ের জন্যই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। 'ব্রেদরেন অফ সিনসিয়ারিটি' (দশম শতাব্দী) গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন ছিলেন সঙ্গীততত্ত্ববিদ। তাঁরা সঙ্গীতকে অঙ্কশাস্ত্রের একটি শাখা বলে মনে করতেন এবং পীথাগোরাসকে এই তত্ত্বের[৪৭] স্রষ্টার মর্যাদা দিতেন। এই বইগুলি ও অন্যান্য গ্রিক রচনাবলি থেকে আরবীয় গ্রন্থকারেরা সঙ্গীত সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করেন এবং শব্দতত্ত্বের শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় দিক সর্ম্পকে প্রশিক্ষিত হন। সুতরাং বলা যায় যে, গ্রিকদের কাছ থেকেই আরবীযরা সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ও আঙ্কিক বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করেছিল; কিন্তু ফার্মারের[৪৮] গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এর প্রয়োগগত দিকটি আরবীয় আদর্শের অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল। এই সময় নাগাদ মূসীকি ও পরে মূসীকা (সঙ্গীত) শব্দটি গ্রিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং গান ও বাজনা বোঝাতে এতদিন ধরে ব্যবহৃত আরবীয় শব্দ গিনা-র পরিবর্তে শিল্পকলা বোঝাতে মূসীকা শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। বাদ্যযন্ত্রের নাম হিসাবে কিতার (গিটার) ও আরগান (অর্গান) এবং গ্রিক সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্যান্য পরিভাষারও আরবীয় ভাষায় ব্যবহার শুরু হয়। অর্গান ছিল বাইজানটাইন থেকে আমদানি করা বাদ্যযন্ত্র। আবু-আল-মাজদ ইবন-আবি-আল-হাকাম (মৃ. ১১৮০ খ্রিঃ) ও আবু-জাকারিয়া ইয়াহিয়া আল-বায়াসি নামে দুজন অর্গান প্রস্তুতকারকেব কর্মজীবন দ্বাদশ শতাব্দীতেই বিকাশ লাভ করেছিল। এর মধ্যে প্রথমজন ছিলেন দামাস্কাসের লোক, আর দ্বিতীয়জন সালাহ-আল-দীনের[৪৯] কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সঙ্গীত-সংক্রান্ত বইয়ের যে সমস্ত রচয়িতারা গ্রিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, দার্শনিক আল-কিন্দি ছিলেন তাদের নেতৃস্থানীয়। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল। তার রচনার মধ্যেই গ্রিক প্রভাবের সবচেয়ে পুরোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। সঙ্গীত সম্পর্কে আল-কিন্দি ছ'টি বই লিখেছেন, তার মধ্যে একটিতে আমরা সর্বপ্রথম কোন আরবীয় রচনায় স্বরলিপির ব্যবহার দেখতে পাই। শুধু আল-কিন্দিই নয়, অনেক অগ্রগণ্য

মুসলিম দার্শনিক ও চিকিৎসকেরাও ছিলেন সঙ্গীততত্ত্ববিদ। ইব্‌ন-আবি-উসাইবিয়া[১০] উল্লেখ করেছেন যে, আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রিঃ) অন্তত একটি এই ধরনের একটি বই রচনা করেছেন। বিশিষ্ট বীণাবাদক আল-ফারাবি (মৃ. ৯৫০ খ্রিঃ) মধ্যযুগে সঙ্গীততত্ত্বের ওপর সবচেয়ে বড় লেখক। ইউক্লিডের হারিয়ে যাওয়া অনেক বইয়ের ওপর টীকাসহ ভাষ্য রচনার পাশাপাশি তিনি তিনটি বই লেখেন। এতে তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিতাব আল-মূসীকি আল-কবীর[১১] হল প্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রচলিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত ও তাঁরই রচিত ইহসা আল-উলূম[১২] (দ্য সাইন্টিস) সঙ্গীত সম্পর্কে সবচেয়ে পুরানো ও সবচেয়ে বেশি পরিচিত বই। বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সারমূলক তাঁর এই বইটি পশ্চিমি দুনিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। আল-ফারাবির বইগুলি ছাড়াও ইব্‌ন-সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রিঃ) ও ইব্‌ন-রুশদ (মৃ. ১১৯৮ খ্রিঃ)-এর বইগুলিও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং সেগুলি পশ্চিম ইউরোপের পাঠ্যবইতে পরিণত হয়েছিল। ইব্‌ন-সীনা তাঁর লেখা আল-শিফা-তে সঙ্গীত-সংক্রান্ত আগেকার লেখাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছিলেন। আল-সামা (গান ও বাজনা)[১৩]-র সমর্থনে আল-গাজ্জালী যে বই লিখেছিলেন তার ফলেই সুফি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে সঙ্গীত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।

কিন্তু খুবই দুঃখের কথা যে, সঙ্গীত সম্পর্কে মৌলিক রচনার সেই মূল পাণ্ডুলিপিগুলি হারিয়ে গেছে। স্বরলিপি এবং তার দুটি মৌলিক উপাদান নাগাম (সুরের রীতি) ও ইকা (ছন্দযুক্ত ধরন) সহ আরবীয় সঙ্গীত মুখে মুখেই প্রচারিত হয়েছে ও শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখনকার আরবীয় সঙ্গীত ছন্দের দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও সুরের বৈচিত্র্যের অভাব খুবই প্রকট। আরবের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে খুবই অল্প যে কয়েকটি লেখা এখনও টিকে আছে আরবের কোন আধুনিক মানুষই তার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারে না এবং তাদের সঙ্গীতের ছন্দের প্রাচীন তাৎপর্য ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারে না। তার কারণ এই ধরনের অনেক শব্দই আসলে পারসীয় ও ভারতীয় ভাষা থেকে আরবী ভাষায় যুক্ত হয়েছে।

● টীকা ●

১ আল-খাতীব (আল-বাগদাদী), ১ম খণ্ড, ৮২-৮৩ পাতা।
২ বাগদাদের পূর্বাংশের একটি অন্যতম এলাকা।
৩ মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ১১৬ পাতা। দুই শতাব্দী পরে এই প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে যায়।
৪ খাতীব, ১ম খণ্ড, ৯৯ ও পরের পাতা।
৫ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ২৫৬ পাতা।
৬ ইয়াকূবী, ২৬০ পাতা; মার্কর্দিস, ১২২ পাতা।

৭ ইয়াকুত, বুলদান, ৩য় খণ্ড, ১৭ পাতা।

৮ আর্নেস্ট টি রিচমন্ড, মোসলেম আর্কিটেকচার, ৬২৩ টু ১৫১৬ (লন্ডন, ১৯২৬), ৫৪ পাতা; সি.এফ. আর্নেস্ট হার্জফেল্ড, এরস্টার ভরলাফিজার বেরিক্ট উবের ডাই অসগ্রাবানজেন ভন সামাররা (বার্লিন, ১৯১২), ১০ পাতা, উপরে দেখুন, ২৬১ পাতা।

৯ উপরে, ২৬২ পাতা, বাইরে শাঁখের মতো পেঁচানো সিঁড়িযুক্ত এই প্রাচীন মিনারটি এখনও টিকে আছ। এর নাম মালবিয়া (বাঁকানো মিনার)।

১০ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ২৬৯-৭১ পাতা।

১১ তার প্রাসাদগুলি সম্পর্কে ইয়াকুবী ২৬৬-৬৭ পাতায় ও ইয়াকুত, ৩য় খণ্ড, ১৭-১৮ পাতায় আলোচনা করেছেন। এর জন্য আল-মুতাওয়াক্কিল ২৯৪,০০০,০০০ দিরহাম ব্যয় করেছিলেন।

১২ আর্নেস্ট হার্জফেল্ড, ডাই ম্যালেরিয়েন ভন সামাররা (বার্লিন, ১৯২৭) একাধিক সংখ্যা ৬১,৬৩।

১৩ মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৩১৫-১৮ পাতা।

১৪ পেন্টিং ইন ইসলাম, (অক্সফোর্ড, ১৯২৮) ৩য় অধ্যায়।

১৫ সি. এফ. টমাস ডব্লিউ আর্নল্ড ও অ্যাডলফ গ্রম্যান, দি ইসলামিক বুক (লন্ডন, ১৯২৯)। ২ পাতা।

১৬ মুহাম্মাদের ১২১৭/১৮ মাপের ছোট ছবির জন্য বুলেটিন দ্য ল ইনস্টিটিউট দ্য ইজিপ্ট, ২৮ খন্ড (কায়রো, ১৯৪৬), ১-৫ পাতা।

১৭ গ্যাস্টন মিজিয়ন, লা আর্টস মুসুলমানস (প্যারিস, ১৯২৬), ৩৬-৩৭ পাতা।

১৮ কালকাশানদি, ৩য় খন্ড, ৫ ও পরের পাতা, ২য় খন্ড, ৪৩০ ও পরের পাতা।

১৯ ফিহ্‌রিস্ত, ১১৯ পাতা; ইয়াকুত, উদাবা, ৫ম খন্ড, ২৬৮ ও পরের পাতা।

২০ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ২য় খন্ড, ৪৭২ পাতা; ফাখরি, ৩৬৮, ৩৭০-৭১ পাতা; ইয়াকুত, ৩য় খন্ড, ১৫০ পাতা, ২. ৮-১০।

২১ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ২য় খন্ড, ৩১ ও পরের পাতা; নুওয়াইরি, ৭ম খন্ড, ৩-৪ পাতা।

২২ বি. মরিজ-এর অ্যারাবিক প্যালিওগ্রাফি (কায়রো, ১৯০৫), ৮৯।

২৩ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন-ওয়াহাব, খুজাআর একজন মুক্ত ক্রীতদাস; আগানি, ৬ষ্ঠ খন্ড. ৭ পাতা।

২৪ আগানি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮ পাতা, ১১. ৪-৫, ৪র্থ খন্ডের ২৮৯ পাতায় নুওয়াইরি কর্তৃক উদ্ধৃত।

২৫ ফিহ্‌রিস্ত, ১৪০ পাতা; ইব্‌ন-খাল্লিকান, ১ম খন্ড, ১৪ পাতা; নুওয়াইরি, ৪র্থ খন্ড, ৩২০ পাতা।

২৬ ইকদ, ৩য় খন্ড, ২৪০ পাতা, ১. ৪. ২৭৫ পাতার উপরে তুলনীয়।

২৭ আগানি, ৫ম খন্ড, ৪১ পাতা।

২৮ ৩য় খন্ড, ২৩৯ পাতা।

২৯ লক. সিট. সি এফ. আগানি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২ পাতা।

৩০ ইকদ, ৩য় খন্ড, ২৩৯ ও পরের পাতা।

৩১ আরবের সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য-সম্পদে ভরপুর 'বুক অফ সংস' বইটি মুসলিম-পূর্ব সময় থেকে লেখকের সমসাময়িক আরবের সঙ্গীতের ইতিহাস। বইটি আল-ইসফাহানির (৮৯৭-৯৬৭ খ্রিঃ) লেখা। আরবীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের ইতিহাসবিদ.

৩২ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের, ৩০৩ পাতা।

৩৩ মাসউদী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৬-৩০ পাতা।

৩৪ আগানি, ২১ খন্ড, ২২৬ পাতা; ৮ম খন্ড ২০ পাতা।

৩৫ আগানি, ২১ খন্ড ২৩৭-৩৮ পাতা; সি. এফ. নুওয়াইরি, নিহায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩০৭ পাতা।

৩৬ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ১ম খন্ড, ১১৪ ও পরের পাতা দেখুন; ফিহ্‌রিস্ত, ১৪০-৪১ পাতা; আগানি, ৫ম খন্ড, ৫২ ও পরের পাতা; নুওয়াইরি ৫ম খন্ড, ১ ও পরের পাতা।

৩৭ ফারমার, অ্যারাবিয়ান মিউজিক, ১২৫ পাতা।

৩৮ ফাখরি, ২৭৬-৭৯ পাতা।

৩৯ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ১ম খন্ড, ১২ ও পরের পাতা; তাবারী, ৩য় খন্ড, ১০৩০ ও পরের পাতা দেখুন।

৪০ আগানি, ৮ম খন্ড ১৬৩ পাতা; ৪র্থ খন্ড ১৯৮ পাতায় নুওয়াইরি কর্তৃক উদ্ধৃত।

৪১ নুওয়াইরি, ৪র্থ খন্ড, ১৯৯ পাতা।

৪২ মাসউদী, ৮ম খন্ড, ৮৮-১০৩ পাতা।

৪৩ সম্ভবত হুনায়নের ছেলে ইসহাক কর্তৃক অনূদিত (মৃ. ৯১০ খ্রিঃ)।

৪৪ ফিহ্‌রিস্ত, ২৬৬ পাতা; কিফ্‌তি ৬৫ পাতা।

৪৫ ফিহ্‌রিস্ত, ২৭০ পাতা।

৪৬ ওই, ২৬৯ পাতা।

৪৭ রাসাইল, ১ম খন্ড, ১৫৩ পাতা।

৪৮ অ্যারাবিয়ান মিউজিক, ২০০-২০১ পাতা; টমাস আর্নল্ড ও আলফ্রেড গুইলাউম সম্পাদিত দি লিগ্যাসি অফ ইসলাম বইয়ের 'মিউজিক' অধ্যায় (অক্সফোর্ড, ১৯৩১), ৩৫৬ ও পরের পাতা।

৪৯ ইব্‌ন-আবি-উসাইবিয়াহ্‌, ২য় খন্ড, ১৫৫ ও ১৬৩ পাতা।

৫০ ১ম খন্ড, ৩২০ পাতা, ১. ২৬।

৫১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের, ৩৭২ পাতা। টীকা. ১।

৫২ সম্পাদনা, উসমান মুহাম্মাদ আমীন (কায়রো, ১৯৩১)।

৫৩ ইহ্‌য়া, ২য় খন্ড, ২৩৮ ও পরের পাতা দেখুন।

॥ অধ্যায় ৩০ ॥

বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়

ইতিমধ্যেই আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১০০০ খ্রিঃ) ২৫০ বছরের ইতিহাস নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সময়টি ছিল মুসলিম সভ্যতার গড়ে ওঠার যুগ এবং এই যুগে মুসলিম সভ্যতা যে বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করেছিল, তা আধুনিক কাল পর্যন্ত বজায় থেকেছে। ধর্মতত্ত্ব ও আইন, বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও কলা ন'শো বছর আগে মুসলিম সমাজে যে অবস্থায় ছিল, আজও তা সেই একই অবস্থায় আছে। সেই সময়ে মুসলিম দুনিয়ায় আদর্শের যে বিভিন্ন ধারাগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল, কোন-না-কোন আকারে তা আজও কিছু মাত্রায় বজায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়।

● যুক্তিবাদ বনাম গোঁড়ামি

সেই সময়ে অচল অনড় আচারনিষ্ঠ আন্দোলন হিসাবে মুতাজিলার সূচনা হয়। এই আন্দোলনের অনুগামীদের বক্তব্য ছিল যে, কোরান আল্লাহ্‌র অনাদি বাণী এবং এই অনাদি ও চিরন্তন বাণী তাঁর সঙ্গেই মিলিত হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একটি যুক্তিবাদী শাখা গড়ে ওঠে। তাদের মতে, মানুষের যুক্তিভিত্তিক চিন্তা-ভাবনার ফসলগুলি কোরানের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনের প্রতি আল-মামুনের আগ্রহ এই নতুন ধর্মীয় বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। তাঁর আমলের মুতাজিলীয় বিচারক ইবন-আবি-দুয়াদের[১] দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণাপত্রে কোরান সৃষ্টির ধর্মীয় মতবাদটির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। 'কোরান হল আরবীয় ভাষায় স্বর্গীয় উপদেশাবলির[২] হুবহু প্রতিফলন'—এই রক্ষণশীল মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই আল-মামুন ওই ঘোষণাটি করেছিলেন। কোরানের উদ্ভব সংক্রান্ত এই নতুন মতবাদটি শীঘ্রই মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসের কষ্টিপাথর হয়ে দাঁড়াল। এমন কী বিচারকদের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। এরপর ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে খলিফা তাঁর কুখ্যাত অনুশাসনটি ঘোষণা করলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, কোরানের উদ্ভব সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত না হতে পারলে কোন কাযী তার পদে থাকতে পারবেন না অথবা ওই পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, যাঁরা এই মতবাদ[৩] স্বীকার করতে চাইবেন না তাদের বিচার অথবা শাস্তিদানের জন্য তিনি মিহ্‌নাহ্ নামে তদন্তকারী বিচারসভা গঠন করেছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, মুক্তচিন্তার সমর্থনে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটাই পরে চিন্তার স্বাধীনতা দমনের এক মারাত্মক হাতিয়ার হয়ে উঠল।

● প্রকৃত মুসলিমের অনুসন্ধান

ইসলামি দুনিয়ায় বিরুদ্ধ মতকে দমন করার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। কোরানকে সৃষ্টি করা হয়েছে[৪]—এই মতবাদ প্রচারের জন্য আল-জাআদ ইবন-দিরহামকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন উমাইয়া শাসক হিশাম (৭২৪-৪৩ খ্রিঃ)। এছাড়াও 'মুক্তচিন্তা'-র[৫] মতবাদ পোষণ করতেন বলে গায়লান আল-দিমাশকি (দামাস্কাসের অধিবাসী)-কেও তাঁরই নির্দেশে হত্যা করা হয়। আল-মাহদী ও আল-হাদী উভয়েই বেশ কয়েকজন জিন্দিক[৬]-কে ক্রুশবিদ্ধ করেন। কিন্তু আল-মামূনের সৃষ্টি এই মিহ্‌নাহ্ বিরুদ্ধ মতকে দমন করার প্রথম সুসম্বদ্ধ বিচারব্যবস্থা এবং বিরুদ্ধ মতাদর্শকে খতম করার এটাই প্রথম বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা।

আহমাদ ইবন-হাম্বল[৭] ছিলেন এই মিহ্‌নাহ্-র প্রথম শিকার। রক্ষণশীল গোঁড়া মতাদর্শ রক্ষার স্বার্থে তাঁর দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ এই আদর্শগত সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আল-মামূনের পরবর্তী দুই উত্তরসূরির আমলেও রক্ষণশীল আদর্শের অনুগামীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চলতে থাকে। কিন্তু আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁর শাসনকালের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুতাজিলাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে শুরু করেন এবং পুরানো মতবাদকেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

আল-নাজ্জাম (মৃ. ৮৪৫ খ্রিঃ) ছিলেন এই সময়কার মুতাজিলাদের অন্যতম নেতা। মুতাজিলাদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, পারস্যের দ্বিমুখী প্রবণতা যেভাবে ইসলাম ধর্মের ওপর প্রভাব ফেলছিল, তাকে প্রতিহত করবার আন্তরিক চেষ্টা চালান এবং ঘোষণা করেন যে, সন্দেহপ্রবণতাই জ্ঞান অর্জনের[৮] এক অপরিহার্য উপাদান। তাঁর পদ্ধতি, মূলত অ্যানাক্সাগোরাস-এর পদ্ধতির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আল-বসরার অধিবাসী ও বিখ্যাত বিশ্বকোষ রচয়িতা আল-জাহিয (মৃ. ৮৬৮-৬৯)[৯] ছিলেন আল-নাজ্জামের অন্যতম ছাত্র। ওই সময়ের আর এক নেতা ছিলেন মুয়াম্মার ইবন-আব্বাদ আল-সুলামি[১০] (মৃ. ... ৮৩৫)। তিনি ছিলেন একজন কাদারীয় এবং তিনি ভারতীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

● আশারীয় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব

ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে মানুষটি মুতাজিলা ভাবাদর্শকে কোণঠাসা করে পুনরায় রক্ষণশীল মতাদর্শকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি হলেন বাগদাদের অধিবাসী আবু-আল-হাসান আলী আল-আশআরি (মৃ. ৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ)[১১]। তিনি আলীর সালিস আবু-মূসার বংশধর। আর সেই থেকেই রক্ষণশীল মতাদর্শ সুন্নিপন্থি মুসলিমদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এক ধার্মিক মুসলমানের ভাষায় বলা যায়, "আল-মুতাজিলা মাথা উঁচু করে চলত। কিন্তু আল্লাহ্ যখন আল-আশআরিকে পাঠালেন তখনই তাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটল। "মুতাজিলীয় ধর্মতত্ত্ববিদ আল-জুব্বায়ী[১২] (মৃ. ৯১৫-১৬ খ্রিঃ)-এর ছাত্র হিসাবে জীবন শুরু করে আল-আশআরি পরবর্তী জীবনে পক্ষ[১৩] বদল করেন এবং তার প্রাক্তন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মতবাদ-

সংক্রান্ত সংগ্রামে মুতাজিলাদের প্রবর্তিত যুক্তিভিত্তিক ও দর্শনগত বিতর্কের একই হাতিয়ারটিকে কাজে লাগান। অন্যান্য সাফল্যের পাশাপাশি তিনি এর মধ্য দিয়ে ইসলামের ...ত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের (কালাম) প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। এরপর থেকেই মধ্যযুগের খ্রস্টানদের মত, গ্রিকচিন্তার সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বিলা কাইফ (বাহ্য আকৃতি ব্যতিরেকে) সূত্রটি চালু করার কৃতিত্বও আল-আশআরির। এই সূত্র অনুযায়ী কোরানে উল্লিখিত (আল্লাহ্‌র প্রতি) নরত্বারোপমূলক বক্তব্যগুলি একজনকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু এর জন্য কোন ব্যাখ্যা চাওয়া বা দেওয়া যাবে না। এই নতুন নীতির প্রভাবে সকলেই মুক্তচিন্তা ও সেই সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণার কাজ উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আশআরি প্রবর্তিত ধর্মতত্ত্বের এই নতুন ভাবাদর্শ প্রচারের জন্যই সালজুক উজির বিখ্যাত নিজামীয়া শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

● আল-গাজ্জালী

আল-আশআরির পর আল-গাজ্জালীর[১] (ল্যাটিন ভাষায়—আলগাজেল) আবির্ভাব ঘটে। তাঁকে নিঃসন্দেহে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতম তাত্ত্বিক এবং অন্যতম মহান ও মৌলিক চিন্তাবিদ বলা যায়। আশআরিয়া মতবাদের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন আল-গাজ্জালী এবং এই অনুশাসনকেই তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বজনীন আদর্শে পরিণত করেন। 'ইসলামি গির্জার এই ...নকই' তখন থেকে সুন্নিপন্থি রক্ষণশীল মতাদর্শের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষে পরিণত হলেন। মুসলিমরা মনে করেন যে, মুহাম্মাদের পর আর যদি কোন দৈববার্তা-ঘোষণাকারী ধর্মপ্রচারক থাকত, তা হলে আল-গাজ্জালীই সেই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি হতেন।

খুরাসানের তুস-এ ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে আবু-হামিদ আল-গাজ্জালী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১১১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানেই মারা যান। ইসলামের ধর্মীয় আদর্শকে তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এখানে তার নিজস্ব ভাষায় বলা কিছু কথা তুলে দেওয়া হল :

"যখন আমার বয়স ২০ বছর (এখন আমার বয়স পঞ্চাশোর্ধ) ...... তখন থেকেই আমি অবিরাম প্রতিটি মতবাদ বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করেছি। অতীন্দ্রিয়বাদকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা ছাড়া আমি কোনোও বাতিনীর সঙ্গে মেলামেশা করিনি। যখনই কোনোও দার্শনিকের[২] সাহচর্যে এসেছি তাঁর দর্শনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে চেয়েছি। দ্বান্দিকতত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি ধর্মের দ্বান্দিকতত্ত্ব। সুফিদের কাছে ...নেছি সুফি ধর্মমত সম্বন্ধে। কঠোর তপস্যা করে বুঝতে চেয়েছি তপশ্চর্যার রহস্য। নাস্তিক এবং জিন্দিকিদের সঙ্গে মিশে জানতে চেয়েছি নাস্তিকতা এবং জিন্দিকিবাদ সম্বন্ধে। আমার ...বনের শুরু থেকে এমনই ছিল জ্ঞান অর্জনের জন্য আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারে

আমার কোন ভূমিকা[১১] ছিল না. আল্লাহ্ই আমার মধ্যে এই সহজাত প্রবৃত্তি ও মানসিক কাঠামো গড়ে দিয়েছিলেন।"

রক্ষণশীল মতাদর্শের অনুগামী হিসাবে জীবন শুরু করলেও আল-গাজ্জালী শীঘ্রই একজন সুফিতে রূপান্তরিত হন এবং কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই তিনি অতীত জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১০৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদের নিজামীয়া শিক্ষায়তনে একজন অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি একজন নাস্তিক্যবাদীতে পরিণত হন। কিন্তু তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চার বছর পরে তিনি আবার সুফি মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এই আদর্শগত সংগ্রামের ফলে তাঁর দেহ ও মন ভেঙে পড়ে। তাঁর প্রখর মেধাও তাকে সঠিক পথের দিশা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে দরবেশের বেশে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং আত্মা ও মনের শান্তি খুঁজে পান। সিরিয়ায় দু'বছর বসবাস ও একটি পবিত্র তীর্থযাত্রা-সহ মোট ১২ বছর অবসর জীবন যাপনের পর তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার ও সেই মতে মানুষকে দীক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বাগদাদে ফিরে আসেন। এখানেই তিনি তার বিখ্যাত বই ইহ্য়া উলূম-আল-দীন[১১] (ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানে পুনর্জীবন দান) রচনা করেন। এই বইয়ের অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয়বাদ, আইনকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে এবং এর রক্ষণশীল মতামত নবজীবন পায়। তাঁর এই বইটিতে এবং ফাতিহাত আল-উলূম[১] তাহাফুত আল-ফালাসিফা[১১] ও আল-ইকতিসাদ ফী আল-ইতিকাদ[১১১] সহ তাঁর অন্যান্য বইয়ে রক্ষণশীল মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। এই বইগুলি ফিকাহ্কে তাঁর উচ্চ আসন থেকে স্থানচ্যুত করে। বাস্তবোচিত একটি আদর্শ উদ্ভাবন করার জন্য গ্রিক দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে তিনি কাজে লাগান এবং রক্ষণশীলদের কাছে দর্শনশাস্ত্রকে রুচিকর করে তোলেন। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের আগে ল্যাটিন ভাষায় আংশিক অনূদিত এই সমস্ত বইগুলি ইহুদি ও খ্রিস্টান তাত্ত্বিকদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। খ্রিস্টধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক টমাস অ্যাকুইনাস ও পরে পাস্কাল পরোক্ষভাবে আল-গাজ্জালীর আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, সমস্ত মুসলিম চিন্তানায়কদের মধ্যে আল-গাজ্জালীর মতাদর্শই খ্রিস্টধর্মের সমর্থনে ইতিবাচক অবদান রাখার মতো জায়গায় পৌঁছেছিল। আল-আশআরি ও আল-গাজ্জালীর গড়ে তোলা পাণ্ডিত্যের সুদৃঢ় কাঠামো আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে; খ্রিস্টধর্ম, বিশেষত প্রোটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহের সময়ে, তার বিদ্যাভিমানের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। আর তখন থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। পশ্চিমি দুনিয়া এগিয়ে চললেও প্রাচ্য এখনও নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

● সুফি মতবাদ

ইসলাম ধর্মে অতীন্দ্রিয়বাদ যে বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল তাকেই সুফিবাদ[১১] বলা হয়। এটাকে ঠিক কিছু উপদেশাবলির সমষ্টি বলা যায় না। বরং সুফিবাদ হল ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা ও অনুভব করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। ইসলাম ও কোরানের তত্ত্ব এবং তার পরিণতিতে গড়ে-

ওঠা আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসাবেই মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদের জন্ম হয়েছিল। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, আল্লাহ্ ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে গভীর অনুভূতি এবং ওইগুলির ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের মানবিক আকাঙক্ষার মধ্যেই এর ভিত্তি নিহিত। অন্যান্য মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলনের মতো সুফি মতবাদের উৎসও হল কোরান ও হাদীস। ৪:৯৬, ৯:১১৩, ৩৩:৪৭-এর মতো যে সব সূরায় 'বর্তমান জীবনের ভাল জিনিসের প্রতি মানুষের লোভের' ও 'যারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে,' তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখ, কারণ তিনি একজন উপযুক্ত অভিভাবক'। কোরানে এমন সূরার অভাব নেই। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুহাম্মাদের নিজের সম্পর্ক, বিশেষত স্বর্গীয় সত্তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ চেতনার মধ্যে রহস্যময়তার ছোঁয়া আছে। আর সুফিরা নিজেদেরকে হাদীসে উল্লিখিত মুহাম্মাদের রহস্যমূলক শিক্ষার প্রকৃত ব্যাখ্যাকার বলে মনে করতেন।

খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মতো শুরুতেই কঠোর তপশ্চর্যা তথা ধ্যানাভিমুখী জীবনের চর্চা করলেও দ্বিতীয় মুসলিম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টধর্ম, নিও-প্লেটোনিক চিন্তা, খ্রিস্টানদের অতীন্দ্রিয়বাদ ও বৌদ্ধধর্মের অনেক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে সুফিবাদ এক পৃথক বিশ্বাসী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক ও সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার স্তর অতিক্রম করে। খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের অনুকরণে পোশাক হিসাবে পশমের (সুফ) কাপড় পরা শুরু হয়। খ্রিস্টানদের কাছ থেকে সুফিরা চিরকৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিমরা কখনই এই আদর্শকে উৎসাহ দেয়নি। তাদের নির্জন স্থানে যোগ ও দীর্ঘদিন ধরে রাতে জেগে থাকার অভ্যাসের মধ্যে সিরিয়ার সন্ন্যাসীদের ধর্মানুশীলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টান ধর্মে যাজক ও শিক্ষানবিশের যে সম্পর্ক, ১৩শ শতাব্দীতে যে সুফি ভ্রাতৃত্ববোধ (তারিকা, সঠিক পথ) গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেও তেমনি শিক্ষক (শায়খ) ও শিক্ষানবিশের (মুরিদ) সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। "ইসলামে সন্ন্যাসজীবনের (রাহ্‌বানিয়া) প্রয়োজন নেই"—হাদীসে একথা বলা থাকলেও সুফি ভ্রাতৃত্ববোধ সন্ন্যাসব্রতের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে যে ধর্মোপাসনার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল তাকে যিক্‌র বলা হত। এই যিক্‌রই ইসলাম ধর্মে একমাত্র আচারঅনুষ্ঠান এবং এটা যে খ্রিস্টধর্মের প্রার্থনা-সঙ্গীতের থেকেই উদ্ভূত তা ইসলাম অস্বীকার করেছে। খ্রিস্ট-বিরোধিতার পাশাপাশি সুফিদের খাদ্যাদি গ্রহণে বিরত থাকার যে ঐতিহ্য তা থেকে বোঝা যায় যে, নবদীক্ষিত মুসলিমদের পূর্বের একেশ্বরবাদ অপেক্ষা ভ্রাতৃত্ববোধ বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

● কঠোর তপশ্চর্যা

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবীয় সাহিত্যে সুফি শব্দটির প্রথম আবির্ভাব ঘটে। সুফি বলতে একজন কঠোর তপস্বীকেই বোঝাত। এই সংজ্ঞার নিরিখে প্রথম যে মানুষটিকে সুফি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তিনি হলেন বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির ইবন-হাইয়ান (কর্মকাল ৭৭৬

খ্রিঃ)। কঠোর সংযম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটা তত্ত্ব ছিল। তারই সমসাময়িক বলখ-এর অধিবাসী ইবরাহীম ইবন-আদহাম (মৃ. ৭৭৭ খ্রিঃ) ছিলেন প্রথম দিকের এরূপ এক প্রশান্ত তপশ্চর্যায় (যুহ্‌দ) ব্রতী পুরুষ। বুদ্ধের[১১] কাহিনীর অনুকরণে রচিত ইবরাহীমের সুফিতে রূপান্তর সম্পর্কে যে লোককথা প্রচলিত আছে তার থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন রাজার ছেলে। একদিন তিনি যখন শিকার করছিলেন, রহস্যময় কণ্ঠে কে যেন তাকে সতর্ক করে দিয়ে যায় যে, এর জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। তারপর সেই রাজপুত্র তাঁর বাহন থেকে নেমে আসেন এবং চিরকালের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে কঠোর তপশ্চর্যা ও ধর্মানুরাগের ব্রত গ্রহণ করেন। সুফিতে তাঁর রূপান্তর সম্পর্কে আর একটি উপকথা থেকে জানা যায় যে, একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে দেখেন যে, একজন ভিখারি জলে ভেজা বাসি রুটি নুন মাখিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। ভিখারিটিকে জিজ্ঞাসা করে তিনি যখন তার তৃপ্তির ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হন, তখন তিনি একটি লোমের পোশাক পরে যাযাবরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন[১২]। সুফিতে রূপান্তরের পরে ইবরাহীম সুফি মতবাদের প্রাচীনতম কেন্দ্র সিরিয়াতে চলে যান এবং নিজের শ্রমের বিনিময়ে সেখানে জীবনযাপন করেন।

● অতীন্দ্রিয়বাদ

খ্রিস্টধর্ম ও হেলেনীয় মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম তপশ্চর্যার ব্রত দ্বিতীয় মুসলিম শতাব্দীতে অতীন্দ্রিয়বাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ এই তপশ্চর্যা অনুগামীদের কাছে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার এক আধ্যাত্মিক উপায় হিসাবে গণ্য হতে থাকে। এই মতবাদের অনুগামীরা মনে করতেন যে, এর দ্বারা পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার লাভ না করলেও তারা আল্লাহ্‌কে জানতে ও ভালবাসতে শিখবে এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে সুফিদের এই পরিচয়-জ্ঞান (মারিফা) এক ধরনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা অর্জিত হয় বুদ্ধিবৃত্তি নয়, আভ্যন্তরীণ আলো অর্থাৎ অনুভবের দ্বারা। অতীন্দ্রিয়বাদের এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ ঘটান আবু-সুলাইমান আল-দারানি (মৃ. ৮৪৯-৫০ খ্রিঃ)। দামাস্কাসের কাছে দারাইয়াতে তার সমাধি ইয়াকূতের[১৩] আমলেও তীর্থযাত্রীদের কাছে একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। তপশ্চর্যার আদর্শের বিরোধী অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রথম সুফি ছিলেন মারুফ আল-কারখি। তিনি ছিলেন বাগদাদের ধর্মীয় আদর্শের অনুগামী। ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। প্রথম জীবনে তিনি সম্ভবত ছিলেন একজন খ্রিস্টান বা স্যাবিয়ান[১৪]। পরে তাঁকে ঈশ্বর-অন্তপ্রাণ, সাধুর মর্যাদা দেওয়া হয়। টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে বাগদাদে তাঁর সমাধিটি তীর্থযাত্রীদের এক বিরাট অবলম্বন, আল-কুশাইরি[১৫]-এর আমলে (মৃ. ১০৭৪ খ্রিঃ) এই সমাধিতে প্রার্থনা রোগীকে সুস্থ করে তোলার নিশ্চিত উপায় বলে গণ্য হত। অতীন্দ্রিয় আদর্শের মূল কথা হল—আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্‌ই চিরন্তন সৌন্দর্য এবং তাঁর কাছে যাবার একমাত্র মাধ্যম হল ভালবাসা। এইভাবে ভালবাসাই অতীন্দ্রিয়বাদের সারবস্তু হয়ে উঠল।

● অধ্যাত্মবাদ

অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে সুফিবাদ অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হয়। গ্রিক থেকে অনুবাদের পর্বে এই যে রূপান্তর ঘটেছিল, তার ওপর হেলেনীয় আদর্শের প্রভাব ছিল প্রবল। সুফি অং
মুখ্য ব্যাখ্যাকার ছিলেন যু-আল-নূন আল-মিশরি (মিশরিয়)। তাঁর পিতামাতা ছিলেন নুবিয়ান। যু-আল-নূন ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে আল-জিজায় (গিজে) মারা যান। সাধারণভাবে সুফিরা এই তপস্বীকে তাঁদের আদর্শের স্রষ্টা বলে গণ্য করে। তারা তাকে তাদের প্রথম কুতবদের (পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু) মধ্যে স্থান দেয় এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করার সময়ে প্রার্থনা করে, "আল্লাহ্ তার আত্মাকে পাপমুক্ত (সির) করুন!" যু-আল-নূনই সুফি মতবাদকে স্থায়ী রূপ দেন। পরমানন্দের (ওয়াজদ) মাধ্যমেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব—তিনি এই ধারণার জন্ম দেন। আল-মাসউদীর লেখা থেকে জানা যায় যে যু-আল-নূন মিশরের সৌধগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন এবং সেই রহস্যময় মূর্তিগুলির পাঠোদ্ধার করে প্রাচীন নিদর্শনের হারিয়ে যাওয়া শিল্পকৌশলকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন।

● সর্বেশ্বরবাদ

অধ্যাত্মবাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদে রূপান্তরটা খুব একটা শক্ত ছিল না, আর এটা ঘটেছিল ইন্দো-ইরানীয় প্রভাবের ফলে। আগানি-তে জীবন সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির একটা নির্ভুল ছবি আঁকা আছে। আর আল-জাহিয যে সমস্ত জিন্দিক সন্ন্যাসীর বর্ণনা দিয়েছেন তারা হয় ভারতীয় সাধু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অথবা তাদের অনুকরণকারী। একজন মেজিয়ানের পৌত্র ও একজন পারসীয় বায়াজিদ আল-বিস্তামি (মৃ. ৮৭৫ খ্রিঃ) সম্ভবত ফানা বা আত্মোৎসর্গের তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অনুগামীদের নির্বাণের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। "আমিই সত্য" (অর্থাৎ আল্লাহ্)—এই ঘোষণার অপরাধে আব্বাসীয় আমলের তদন্তকারী দল কর্তৃক পারসীয় আল-হাল্লাজকে (সবজান্তা লোক) ৯২২ খ্রিস্টাব্দে চাবুক মারা হয়, ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং তার শিরশ্ছেদ করে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তিনি এক মহান সুফি শহীদে পরিণত হন। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটিতে তার অতীন্দ্রিয়বাদের মূল ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে :

"আমিই সে যাকে আমি ভালবাসি এবং সে, যাকে আমি ভালবাসি হলাম আমি
আমরা দুটি আত্মা একই দেহে বাস করি
যখন তোমরা আমাকে দেখ, তোমরা তাঁকেই দেখ
এবং যখন তোমরা তাঁকে দেখ, তোমরা আমাদের দুজনাকে দেখ।"

পশ্চিম বাগদাদে আল-হাল্লাজের সমাধিটি এখনও একজন সাধুর সমাধি বলে গণ্য হয়। স্পেনের মুহঈ-আল-দীন ইবন-আরাবি (১১৬৫-১২৪০ খ্রিঃ) ছিলেন মহান অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী সুফি। দামাস্কাসে মাউন্ট কাসিয়ুন-এর পাদদেশে তাঁর সমাধিটি এখন তারই

নামাঙ্কিত একটি বড় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল-গাজ্জালী ও বাগদাদের জুনায়দের (মৃ. ৯১০ খ্রিঃ)[৪০] মতো রক্ষণশীল সুফিদের অনুরূপ না হলেও ইবন-আরাবি এই মতবাদকে বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টা করেন। আর এই মতাদর্শকে তিনি তার চিন্তায় যারা সবে দীক্ষিত হয়েছে তাদের জন্যই সংরক্ষণ করে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সকলের মধ্যেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আছে—এই সর্বেশ্বরবাদী চিন্তা তার দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছিল।

● অতীন্দ্রিয় কাব্য ও দর্শন

অতীন্দ্রিয় কাব্যের জগতে একমাত্র আরবীয় কবি হলেন ইবন-আল-ফরিদ। তিনি ছিলেন মিশরের অধিবাসী। ১১৮১ থেকে ১২৩৫ খ্রিঃ পর্যন্ত তাঁর কর্মকাল বিস্তৃত ছিল। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল একটি সুদীর্ঘ গীতিকবিতা (আল-তায়াত্তুল কুবরা)[৪১] এবং এর মধ্যে স্বর্গীয় প্রেমের সুন্দর স্তবগান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, সাদী হাফিজ এবং আল-রুমির মতো সমস্ত পারসীয় কবিরাই ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী। কিন্তু আরবীয় লেখককুল দাবি করতেই পারে যে, সুফি মতবাদের দর্শনগত ক্ষেত্রে ইসলামি দুনিয়ার দুই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তারা হলেন আল-ফারাবি ও আল-গাজ্জালী। এর মধ্যে গাজ্জালী সুফি মতবাদের সঙ্গে এর নানা প্রগতিশীল অনুশাসনও ইসলামের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এবং অতীন্দ্রিয়বাদকে দৃঢ় বৌদ্ধিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

● ভ্রাতৃত্ব সংগঠন

প্রথম পাঁচটি ইসলামিক শতাব্দীতে সুফিবাদ বলে পরিচিত ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত উপলব্ধির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। শিষ্য ও অনুগামীদের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি কোন প্রেরণাদায়ক শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে আল-হাল্লাজের নাম উল্লেখ করা যায়। এইভাবে সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি মূলত স্থানীয় ও অস্থায়ী চরিত্রের ছিল। দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতকের শেষ দিকে স্থায়ী সংস্থার আবির্ভাব ঘটে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর গড়ে ওঠা প্রথম ভ্রাতৃসঙ্ঘের (তারিকা) নাম ছিল কাদিরিয়া। পারস্যের অধিবাসী আবদ-আল-কাদির আল-জিলানি বা আল-জিলির (১০৭৭-১১৬৬ খ্রিঃ)[৪২] নাম অনুসরণেই সংস্থাটির এরূপ নাম হয়েছিল। বাগদাদেই তাঁর কর্মজীবনের বিকাশ ঘটেছিল। সবচেয়ে সহিষ্ণু ও উদার সংগঠনগুলির অন্যতম ছিল এটি। এরা দাবি করে, আলজেরিয়া, জাভা ও গায়না-সহ সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতেই তাদের অনুগামী আছে। প্রাচীনত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় সংগঠনটি হল রিফাঈ। ইরাকের অধিবাসী আহ্‌মদ আল-রিফাঈ (১১৮৩ খ্রিঃ) এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যান্য সংস্থাগুলির মতো এই সংগঠনের সভ্যরাও জ্বলন্ত কয়লা, জ্যান্ত সাপ ও কাচ খেয়ে ফেলা এবং তাদের শরীরের মধ্য দিয়ে সূচ ও ছুরি ঢুকিয়ে দেবার মতো আশ্চর্য রকমের খেলা দেখাতে পারে। মাওলাবী সংগঠন সাধারণভাবে ভ্রাম্যমাণ দরবেশদের গোষ্ঠী বলেই পরিচিত।

এদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিখ্যাত পারসিক কবি জালাল-আল-দীন আল-রূমি। ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কুনিয়-তে (কোনিয়েহ, প্রাচীন আইকোনিয়াম) মারা যান। মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ অনুশাসনের বিরোধিতা করে আল-রূমি তার সংগঠনের আচার-অনুষ্ঠানে সঙ্গীতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কুনিয়াহ্-তে বসবাসকারী তাঁর কোন-না-কোন বংশধর এই সংগঠনের প্রধানের পদে আসীন ছিলেন। আর এই প্রধানই তুর্কির নতুন সুলতান-খলিফাকে তার তরবারি দিয়ে অভিবাদন করার অধিকার ভোগ করতেন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আরও অন্যান্য কয়েকটি স্বাধীন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কঠোর তপশ্চর্যা ও নির্জন স্থানে ধ্যানে বিশ্বাসী থেকে সর্বেশ্বরবাদী পর্যন্ত সকলেই ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাই হয়ে উঠতেন বিশেষ একটি আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু। ধরে নেওয়া হত যে, তিনি স্বর্গীয় বা আধা স্বর্গীয় ক্ষমতার অধিকারী। আর সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরটি সাধকদের উপাসনার কেন্দ্রে পরিণত হত। আলী-আল-শাজিলি (মৃ. ১২৫৮ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত শাজিলিয়[৫২] ছিল আফ্রিকার সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠন। মরক্কো ও তিউনিসিয়াতে এরা বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল। এই সংগঠনের আবার উপ-সংগঠন ছিল ও বিশেষ বিশেষ নামে তারা পরিচিত ছিল। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় মরক্কোতেই ইসলাম ধর্ম সাধকদের আরাধনা অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল। আলজেরিয়ার অধিবাসী শায়খ আল-সানুসি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক সানুসি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কুফরার মরূদ্যানে ছাড়াও আগে জাঘবাবে এদের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল। পূর্বের অন্যান্য সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। এই সংগঠনের পিছনে রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। মিশরের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংগঠনের পুরোভাগে ছিল স্থানীয় আহ্‌মাদিয়াহ গোষ্ঠী। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমাদ-আল-বাদাবি (মৃ. ১২৭৬)। টান্টা ছিল তার মূলকেন্দ্র। তুর্কির অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন ছিল বকতাশি। জানিসারিদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল উল্লেখ করার মতো। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি চিরকৌমার্যের ব্রত গ্রহণে বেশ উৎসাহ দিত, আলীকে শ্রদ্ধা করত এবং এদের ধর্মীয় দর্শনে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যেত। সুফি সংগঠনের পরিবর্তে এদেরকে একটি সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করাই ভাল। এশিয়া মাইনরের পুরানো ধর্মীয় আদর্শকে আত্মস্থ করার পাশাপাশি ওই দেশের মুসলমান ফকিরদের মধ্যে শ্যামানিজমের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কিরা এই মতবাদ বহন করে এনেছিল।

সুফি সংগঠনই ইসলাম ধর্মে একমাত্র যাজকীয় সংগঠন। এদের সদস্যরা দরবেশ[৫৩] বলে পরিচিত। তাকিয়া, জাবিয়া বা রিবাত নামে খ্যাত বিশেষ সামাজিক কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মসজিদও এই ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি। শিক্ষক ও নবদীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়াও এই সংগঠনের অনুমোদিত তৃতীয় এক শ্রেণীর সাধারণ সদস্য ছিল এবং এরা সংগঠনের উচ্চপদাধিকারীদের নির্দেশ মেনে চলত।

● ধারাবাহিক প্রার্থনাবলি বা স্তবসমূহ

এক ধরনের সন্ন্যাস-জীবন ও আচার-অনুষ্ঠান[৪৫] চালু করার পাশাপাশি সুফিরা ইসলাম ধর্মে আরও কিছু অবদান রেখে গেছে। তারাই মুসলিমদের[৪৬] মধ্যে স্তবের (সাব্হাহ্) প্রচলন করেছে। এখন কেবলমাত্র আচারনিষ্ঠ ওয়াহাবিরাই স্তবগান বর্জন করে থাকে, কারণ তারা এটিকে নতুন আবিষ্কার (বিদআহ্) বলেই মনে করে। এগুলি হিন্দুদের সৃষ্টি হলেও সুফিরা সম্ভবত প্রাচ্যের খ্রিস্টান গির্জাগুলি থেকেই আল্লাহ্‌র আরাধনার এই হাতিয়ারটি ধার করেছিল। সরাসরি ভারত থেকে তারা তা নিয়ে যায়নি। ধর্মযুদ্ধের সময়েই রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত পশ্চিমি দুনিয়ায় স্তবগানের প্রচলন হয়। রাজকবি আবু-নুওয়াস (মৃ. ৮১০ খ্রিঃ)[৪৭] সর্বপ্রথম আরবীয় সাহিত্যে স্তবগানের উল্লেখ করেছিলেন। বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয়বাদী ও বাগদাদের অধিবাসী আল-জুনায়দ (মৃ. ৯১০ খ্রিঃ) স্তবগানকে পরমানন্দ লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ধর্মীয় বিধি পালনে তাঁর খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও এমন এক নতুন জিনিস ব্যবহারের জন্য যখন এক সমালোচক তাঁর প্রবল সমালোচনা করেছিলেন, তখন আল-জুনায়দ উত্তর দিয়েছিলেন, "যে পথ আমাকে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে দিয়েছে, আমি সে পথ ত্যাগ করব না।[৪৮]"

● সাধুদের ধর্মবিশ্বাস

সুফিবাদ সাধুসুলভ মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করল ও তাকে জনপ্রিয় করে তুলল। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপারে কোরানের কোন অনুমোদন নেই। খ্রিস্টধর্মের প্রচলিত প্রথাগুলির অনুসরণে এবং অতীন্দ্রিয়বাদেব হাতছানিতে সাড়া দিয়ে এটা গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও এই মতাদর্শের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামি ধর্মতত্ত্বে আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যেকার দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া। যদিও ইসলাম ধর্মে সাধুত্বের কোন আনুষ্ঠানিক মাহাত্ম্য ছিল না, তবুও বিস্ময়কর কাজকর্ম (কারামত) করার ফলে জনসাধারণের প্রশস্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি সাধুত্বের (ওয়ালি, আল্লাহ্‌র বন্ধু) মর্যাদায় অভিষিক্ত হত। দ্বাদশ শতাব্দীতে শী'আহ্-সুন্নি উভয় গোষ্ঠীই সাধারণভাবে অনুভব করে যে, সাধুদের মিনতিপূর্ণ আহ্বান প্রতিমা পূজার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। আর চরম মতবাদের সঙ্গে সাধুসুলভ দার্শনিকতার সমন্বয় দ্বারা তা অপচিত। প্রধানত সুফি মতবাদের মাধ্যমেই তা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু 'আল্লাহ্‌র বন্ধুদের মধ্যে' যখন পদাধিকারের প্রশ্ন উঠল, বীর ও বিনয়ী সুফিরা লিঙ্গের[৪৯] বিচারভেদে সম্পূর্ণ সমতার নীতি অনুসরণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সুন্দর চরিত্র ও অতীন্দ্রিয় আদর্শের অধিকারিণী আল-বসরার এক মহিলা রাবিয়া আল-আদাবিয়াকে তাঁরা সাধুদের সারণির শীর্ষে স্থান দিয়েছিলেন। তখন থেকেই রাবিয়া সুন্নিপন্থি সন্ত-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাধুতে পরিণত হন। যখন তিনি যুবতী ছিলেন, তখন ক্রীতদাসী হিসাবে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রার্থনার সময় তাঁর চারপাশে উজ্জ্বল জ্যোতির বিকিরণ দেখে তাঁর মালিক তাঁকে মুক্তি দেন। সেই মহিলা বিয়ে করতে অস্বীকার

করেন এবং কঠোর তপশ্চর্যা ও জাগতিক বিষয়মুক্ত জীবনযাপন করেন। শীঘ্রই তিনি অতীন্দ্রিয় ভাবাদর্শের এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকে পরিণত হন এবং কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কৃতজ্ঞতা, পবিত্র ভয়, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য এবং আল্লাহ্‌র ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার (তাওয়াক্কুল) বাণী প্রচার করেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি শয়তানকে ঘৃণা করেন কিনা, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহ্‌র প্রতি আমার ভালবাসা শয়তানকে ঘৃণা করার কোন সুযোগ রাখেনি।" আর একবার স্বপ্নে মুহাম্মাদ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি তাঁকে ভালবাসেন কিনা তখন তাঁর উত্তর ছিল : "আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা আমাকে এমন আচ্ছন্ন করেছে যে, কোন কিছুকে ঘৃণা করা বা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসার সময় আমার নেই।"[৫০] অন্য একটি ঘটনা উপলক্ষে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়বশত আমি তার উপাসনা করি না .... স্বর্গের মোহ থেকেও নয় .... শুধুমাত্র তাঁর প্রতি ভালবাসা ও তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমি তার উপাসনা করি।"[৫১]

আল্লাহ্‌র সেই সমস্ত ভক্তদের অন্যতম আল-সুহ্‌রাওয়ারদি-এর একটি আবেগময় প্রার্থনা থেকে নিও প্লেটোনিক মতবাদ ও খ্রিস্টধর্মের[৫২] প্রতি সুফি ভাবাদর্শ কতখানি ঋণী, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করার অপরাধে রাজপ্রতিনিধি আল-মালিক আল-জাহির ও তার বাবা সালাহ-আল-দীনের নির্দেশে আলেপ্পোতে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে (১১৯১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁকে হত্যা করা হয়।

● শী'আহ্

আব্বাসি বংশের শাসনকালে আর একটি ধর্মীয় আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল। সেটি হল শী'আহ্ ভাবাদর্শ। এই ভাবাদর্শের শাখা-প্রশাখাগুলি ইসলামধর্ম ও খিলাফতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আলীর বিশেষ একটি পক্ষ অবলম্বনের ফলে উমাইয়া শাসনের মতো আব্বাসীয় আমলেও বিশেষ কোন ফল হয়নি। এমন কী উমাইয়াদের পরিবর্তে আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় বসানোর ক্ষেত্রে পক্ষ-বদলের ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কার্যকারিতার দিক থেকে কোন লাভ হয়নি বললেই চলে। জয়ের পর আল-মামুন পোশাকের রং বদল করে সবুজ পোশাক পরলেও এবং ইমাম আলী-আল-রিযাকে[৫৩] উত্তরসূরি হিসাবে ঘোষণা করলেও আল-মামুনের জয়ের হাসি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। শীঘ্রই আল-মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতাসীন হলেন এবং ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি শী'আহ্‌দের ওপর নির্যাতন চালানোর পুরানো নীতি আবার চালু করলেন। আল-নাজাফে অবস্থিত আলীর সমাধি ও কারবালাতে[৫৪] আরও বেশি শ্রদ্ধেয় আল-হুসায়নের সমাধি তিনি ধ্বংস করলেন এবং এর ফলে তিনি শী'আহ্‌পন্থিদের কাছে চিরকালের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হলেন। ১০২৯

খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-কাদির বাগদাদের এক মসজিদ থেকে এক শী'আহ্‌পন্থি নেতাকে বহিষ্কার করলেন এবং তার জায়গায় একজন সুন্নিকে[৫৫] নিয়োগ করলেন। শাসকগোষ্ঠীর এই প্রত্যক্ষ বিরোধিতার পরিণতিতে শী'আহ্‌পন্থিরা তাদের প্রকৃত মনোভাব গোপন করে চলার নীতি" (তাকিয়া[৫৬]) গ্রহণ করল অর্থাৎ বাধ্য হয়ে বা আঘাতের ভয়ে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করা থেকে নিজেদের বিরত রাখল। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু খারিজী[৫৭] নৈতিক আদর্শ হিসাবে প্রকৃত মনোভাব গোপন করে চলার নীতির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু শী'আহ্‌রা একে অপরিহার্য নীতিতে পরিণত করল। এই নীতিটিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করে তারা বলল যে, কোন ধর্মাবলম্বী যদি এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে যখন তার বিরোধীরাই আসল ক্ষমতার অধিকারী, তখন সে প্রচলিত ধর্মমত মেনে চলার ভানই করবে না, বরং তার এবং তার সমধর্মীদের সুরক্ষার জন্য তাকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে।[৫৮]

একটি নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী ব্যর্থ কিন্তু বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের রূপকার এই বিদ্রোহী শী'আহ্‌রা প্রকাশ্যে ও 'তাকিয়া'-র আড়ালে তাদের প্রকৃত আরাধ্য ধর্মশিক্ষক, অর্থাৎ আলীর বংশধর এক ইমামের উদ্দেশে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। শী'আহ্‌পন্থি ইমামরা মুহাম্মাদের কাছ থেকে পার্থিব সার্বভৌম ক্ষমতার পাশাপশি আইনের ব্যাখ্যা দেবার অধিকারও লাভ করেছিলেন। ইমামকে ভুলহীন শিক্ষক বলে গণ্য করা হয় এবং তার এই নির্ভুলত্বের (ইসমা)[৫৯] সঙ্গে তিনি স্বর্গীয় গুণকে[৬০] যুক্ত করেছিলেন। সুন্নি ও সুফি মতবাদের বিপরীতে শী'আহ্‌রা মনে করতেন যে আল্লাহ্‌র সাহায্যে ভুল ও পাপ থেকে মুক্ত একজন ইমামের নির্দেশ অনুসরণ করলে ধর্মীয় ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। তাদের প্রথম ইমাম আলীর পর তার পুত্র আল-হাসান এবং তারপর তার আর এক পুত্র আল-হুসায়ন[৬১] ইমাম হন। আল-হুসায়ন অনুসৃত আদর্শটি ছিল অনেক বেশি সুপ্রসিদ্ধ। বারো জন ইমামের শেষ ন'জন ছিলেন আল-হুসায়নের বংশধর। শী'আহ্‌দের মূল দল টুয়েলভারস (ইসনা আশারিয়া) ওই ন'জন ইমামের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল। এই ন'জনের মধ্যে পরপর চারজন বিষপ্রয়োগে মারা গিয়েছিলেন : আল-মাদীনাতে জাফর (৭৬৫ খ্রিঃ), বাগদাদে মুসা[৬২] (৭৯৯ খ্রিঃ), তুস-এ'আলী আল-রিযা[৬৩] (৮১৮ খ্রিঃ) ও বাগদাদে মুহাম্মাদ আল-জাওয়াদ (৮৩৫ খ্রিঃ)। অন্যরা খলিফার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা গিয়েছেন অথবা ঘাতকের হাতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ যেহেতু কোন উত্তরসূরি না রেখে সামাররায় অবস্থিত বিরাট মসজিদটির গুহাতে "অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন" (২৬৪/৮৭৮), তাই তিনি "গুপ্ত (মুস্তাতির)" অথবা "প্রত্যাশিত (মুন্তাজার) ইমাম"[৬৪] হন। তাই তিনি মৃত নন ও সাময়িকভাবে গোপন অবস্থায় (গাইবাহ্‌) আছেন বলে মনে করা হয়। এও ভাবা যায় যে যথা সময়ে মাহদী (আল্লাহ্‌ দ্বারা চালিত ব্যক্তি) হিসাবে আবির্ভূত হয়ে তিনি প্রকৃত ইসলামকে পুনরায় তার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনবেন, সমস্ত পৃথিবীকে জয় করবেন এবং পৃথিবীর ধ্বংসের আগে স্বল্পমেয়াদী স্বর্ণযুগের সূচনা করবেন। যদিও গুপ্ত অবস্থায় ছিলেন, এই দ্বাদশ ইমাম-ই সর্বদাই

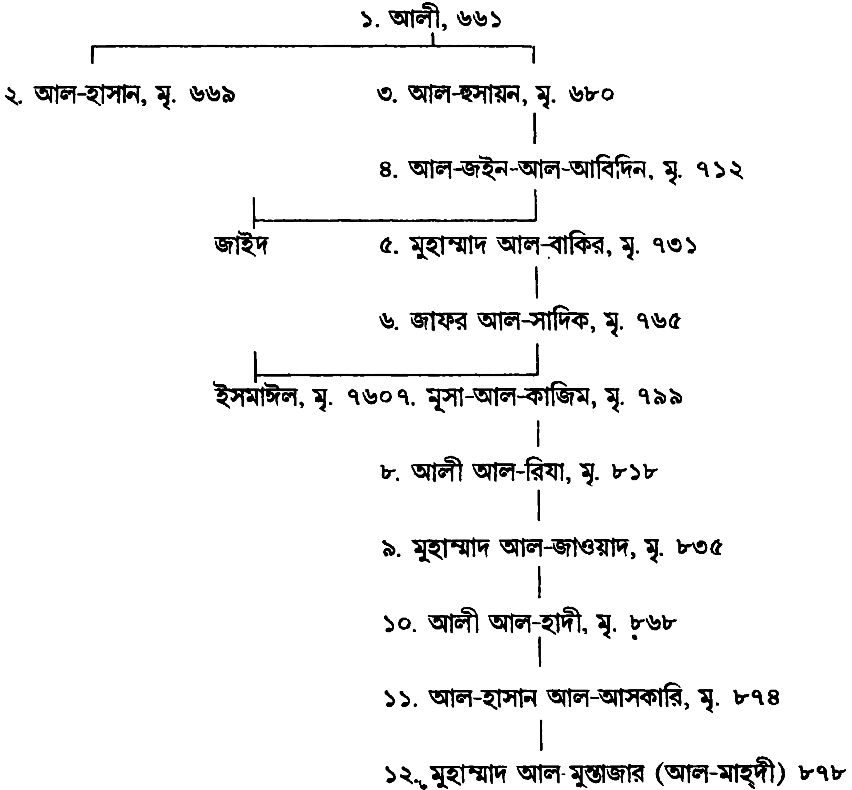
সময়ের নিয়ন্ত্রক (কায়িম আল-যামান) রূপে গণ্য হয়েছেন। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে সাফাবিরা পারস্যে টুয়েলভার শী'আহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। সাফাবিরা নিজেদের সপ্তম ইমাম মুসা আল-কাজিমের বংশধর বলে দাবি করেন। তখন থেকেই শাহ ওই গুপ্ত ইমামের প্রতিনিধি ও মুজতাহিদরা (উচ্চস্তরের ধর্মতত্ত্ববিদ) তার মুখপাত্র ও মানুষের সঙ্গে সংযোগকারী হিসাবে গণ্য হতে থাকেন।

এইভাবেই ইমাম-মাহ্‌দী মতবাদ শী'আহ্‌পন্থি মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। এমন কী আধুনিক যুগেও এটাই শী'আহ্ ও সুন্নিদের মধ্যে মূল পার্থক্য রূপে গণ্য হয়। যদিও সুন্নিরাও তাদের ধর্মবিশ্বাসকে পুনরায় তার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভবিষ্যতের কোন ধর্মগুরুর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় দিন গুনছেন, তবুও তারা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না অথবা তাকে মাহ্‌দী[৬৫] বলেও ডাকে না।

● ইসমাঈলি গোষ্ঠী

শী'আহ্-অধ্যুষিত এলাকাগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী চিন্তা গড়ে ওঠার উর্বর ভূমি হয়ে ওঠে। একটি হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদ একবার বলেছিলেন, "ইস্রায়েলীরা ৭১ বা ৭২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রিস্টানদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। আমার সম্প্রদায়টি ৭৩টি গোষ্ঠীতে ভাগ হবে।"[৬৬] এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই শী'আহ্‌পন্থি মুসলিমদের শাখা-প্রশাখা রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ইমামীয় শী'আহ্‌দের মধ্যে টুয়েলভাররাই (ইসনা আশারা) একমাত্র গোষ্ঠী ছিল না। ষষ্ঠ ইমাম জাফর আল-সাদিক পর্যন্ত উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে টুয়েলভারদের সঙ্গে আর একটি গোষ্ঠীও একমত ছিল। কিন্তু সপ্তম ও শেষ ইমাম হিসাবে ইসমাঈলের ভাই মূসার বদলে ওই পদে তারা ইসমাঈলকেই দেখতে চেয়েছিল। আর এই বিষয় নিয়েই টুয়েলভারদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। এই গোষ্ঠীটি দৃশ্যমান ইমামের সংখ্যা সাতে বেঁধে দিয়েছিল এবং তাদের সেভেনারস (সাবিয়াহ্) বলা হত। জাফর প্রথমে ইসমাঈলকেই তার উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু তার অধৈর্যের পরিচয় পেয়ে তিনি তার সিদ্ধান্ত বদল করে দ্বিতীয় পুত্র মূসাকে ওই পদে মনোনীত করেন। অধিকাংশ শী'আহ্ই এই পরিবর্তন মেনে নেন এবং মুসা আল-কাজিম ইমাম রূপে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এইভাবেই বারোজন দৃশ্যমান ইমামের মধ্যে তিনি সপ্তম ইমাম হয়েছিলেন। অন্যরা দাবি করেছিলেন যে, ইমাম যেহেতু কোন ভুল করতে পারেন না, তাই মদ খাওয়া, তার বাবার পাঁচ বছর আগে মারা যাওয়া ইসমাঈলের প্রতি অনুগত থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব করবেন না। ইসমাঈলি নামে পরিচিত এই সেভেনারদের (সাবিয়াহ্) কাছে ইসমাঈল ছিলেন গুপ্ত মাহ্‌দী।[৬৭]



তালিকাটি ১২ জন ইমামের সম্পর্ক নির্দেশ করছে

পুরানো দিনের পীথাগোরিয়ান পদ্ধতির মতো ইসমাঈলিয়া পদ্ধতিতে সাত (৭) সংখ্যাটি পবিত্র গুরুত্বের প্রতীক। সেভেনার গোষ্ঠী এই সংখ্যা দ্বারা সৃষ্টিসংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনাবলির পর্যাবৃত্তিকে নির্দেশ করছে। আংশিকভাবে নিও-প্লেটোনীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রহস্যময় সৃষ্টি উৎপত্তির তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রবাহের ধারা হল সাতটি (১) আল্লাহ্ ; (২) বিশ্বজনীন মন (আক্ল)। (৩) বিশ্বজনীন আত্মা (নাফস), (৪) বিশ্বের আদি বস্তু, (৫) মহাশূন্য ; (৬) মহাকাল ; (৭) পৃথিবী ও মানুষ। এই পৃথিবী ধন্য হয়েছে আইন প্রণয়নকারী সাতজন দৈববার্তা-ঘোষণাকারী ধর্মপ্রচারকের (একবচনে, নাতিক) পাদস্পর্শে : এরা হলেন আদম, নুহ, ইবরাহীম, মূসা, জেসাস (ঈসা), মুহাম্মাদ এবং ইসমাইলের পুত্র মুহাম্মাদ আল-তাম। এছাড়া প্রতি দুজন ধর্মপ্রচারকের মধ্যে তারা সাতজন নীরব ধর্মপ্রচারককে (একবচনে, সামিত) অন্তর্ভুক্ত করেছে। এদের মধ্যে প্রথমজন হল 'ভিত্তি' (আসাস)।

ইসমায়েল, অ্যারন, পিটার ও আলী এই নীরব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে পড়েন। তাদের সমান্তরাল অবস্থানে আর একটি নিচু স্তরের যাজকবর্গ রয়েছে। সাত বা বারো জনের এই যাজকবর্গ মুখ্যত প্রচারকার্যের নেতা (একবচনে, হুয্যাহ্) ও সাধারণ ধর্মপ্রচারক (একবচনে, দায়ী)।[৬৮]

● বাতিনি গোষ্ঠী

ইসমাঈলি গোষ্ঠী মুসলিম দুনিয়ায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রচারের সবচেয়ে কুশলী ও কার্যকর পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। তাদের পশ্চাদপসরণের জায়গা থেকে তারা মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের মুসলিম দুনিয়া পর্যটন ও বাতিন[৬৯] (অন্তরস্থিত, অভ্যন্তরীণ) নামে ধর্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য পাঠাল। আদর্শগত দিক থেকে অসংগঠিত এই ধারাটিকে রক্ষণশীলরা বাতিনীয় নাম দিয়েছিল। বাতিনীয়রা মনে করত, যে রূপক কাহিনীর মাধ্যমে কোরানের ব্যাখ্যা করতে হবে। তারা আরও মনে করত যে, অদীক্ষিত মানুষের কাছ থেকে ধর্মীয় সত্যকে আড়াল করে রাখার জন্য এই রূপকের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। কোরানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কারের মাধ্যমেই ধর্মীয় সত্যকে আয়ত্ত করা সম্ভব। গোপন রাখার শপথ নেবার পর নতুন শিক্ষানবিশদের ধীর-স্থিরভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে রহস্যময় তত্ত্বে দীক্ষা দেওয়া হত। স্বর্গীয় সুষমার ক্রমপ্রবাহের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পুনর্জন্ম, ইসমাঈলের মধ্যে স্বর্গীয় পবিত্রতার পরিব্যাপ্তি এবং মাহ্দী রূপে তার শীঘ্র ফিরে আসার (রাজআহ্) প্রত্যাশা ইত্যাদি দুর্বোধ্য বিষয়েও তাদের দীক্ষা দেওয়া হত। সাত থেকে নয়টি ক্রমবিভক্ত স্তরে[৭০] এই দীক্ষাদানের কাজটি সম্পূর্ণ করা হত এবং এটি আধুনিক যুগের সহযোগী গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘের (Freemasonry) সদস্যদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই রহস্যময় তত্ত্বের এক প্রবল উৎসাহী সমর্থক ছিলেন আবদুল্লা। তাঁর বাবা মায়মুন আল-কাদ্দাহ ছিলেন একজন চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ (কাদ্দাহ)। কিন্তু তাঁর সঠিক বংশপরিচয় জানা যায়নি। জেরুসালেমে চলে যাবার আগে তিনি আল-আহওয়াজে চিকিৎসা করতেন। নকশার সাহায্যে বর্ণিত ইসমাঈলিদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিখুঁত করে তোলেন আবদুল্লা। প্রথমে আল-বসরা ও পরে উত্তর সিরিয়ার সালামিয়াতে[৭১] অবস্থিত তাঁর কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে তিনি ও তাঁর উত্তরসূরিরা ছদ্মবেশী ধর্মপ্রচারকদের বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন। কাজের শুরুতেই তারা ভবিষ্যতের অনুগামীদের মনে সংশয়বাদ জাগিয়ে তুললেন। তারপর তারা মহান মাহ্দীর প্রতি ওই অনুগামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং জানাতেন যে মাহ্দী শীঘ্রই প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হবেন। আরব ও পারস্যের মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শত্রুতার সুযোগ নিয়ে নগণ্য এক পারসীয় চক্ষু চিকিৎসকের এই পুত্রটি দীক্ষার স্তর অনুযায়ী বিজিত ও বিজয়ীদের একটি গোপন সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুক্ত চিন্তার ধারক ও বাহক রূপে এই দীক্ষিত অনুগামীরা খলিফা সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার কাজে ধর্মকে ব্যবহার

করবে এবং আবদুল্লা বা তার বংশধরদের হাতে সিংহাসনের অধিকার তুলে দেবে— এই পরিকল্পনাটি একদিকে যেমন সকলকে স্তম্ভিত করে দেয় তেমনি তার দ্রুত রূপায়ণ ও আংশিক সাফল্যও মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কারণ এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই তিউনিসিয়া ও মিশরে ফাতিমিয় রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল।

● কারমাতিয়া

মৃত্যুর আগে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ[১১] নাগাদ আবদুল্লা এক অত্যন্ত আগ্রহী ছাত্র পেয়েছিলেন। সেই ছাত্রটির নাম হামদান কারমাত।[১২] সে এক ধর্মান্তরিত ইরাকী কৃষক। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে সেই ছাত্রটি জানতে পেরেছিল যে, ইরানীয়রা পুনরায় আরব সাম্রাজ্যের[১৩] অধিকারী হতে চলেছে। হামদান পরে বাতিনি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই সম্প্রদায়টিই কারমাতিয়া নামে পরিচিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই কৃষক সমাজ ও মরুভূমির সন্তানদের মধ্যেকার পুরানো শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছিল। ৮৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-কুফার কাছে নিজেই তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য একটি বাসস্থান তৈরি করেন। এর নাম দার আল-হিজরা[১৭] (দেশান্তরীদের আশ্রয়)। এটিই পরে এই নতুন সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় দপ্তর হয়ে ওঠে। দেশের মানুষ, বিশেষত নাবাতিয়ান কৃষক ও কারিগর এবং আরবদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রচারের ফলে এই নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায়। মূলগতভাবে এটি ছিল সাম্যবাদী নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি গুপ্ত সংগঠন। সংগঠনের সদস্য হতে গেলে তাদের মতবাদে অবশ্যই দীক্ষা নিতে হত। সভ্যদের চাঁদায় গড়ে ওঠা একটি সাধারণ তহবিল থেকে সদস্যদের ভরণপোষণ চালানো হত। বাইরের দিক থেকে এই চাঁদাটা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দেয় বলে মনে হলেও বাস্তবে বিভিন্ন ধরনের করের মাধ্যমে এই চাঁদা আদায় করা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রতিটি করের পরিমাণই ছিল তার আগের করটির তুলনায় অনেক বেশি। কারমাত, এমন কী সদস্যদের স্ত্রীদের সংগঠন ও তাদের সম্পত্তিগুলিকে মিলিয়ে দিয়ে একটি সম্পত্তি (উলফা)[১৫] গড়ে তোলার কথাও বলেছিলেন। বেশ কয়েকজন আধুনিক লেখকদের দ্বারা অভিহিত "ইসলামের এই বলশেভিকরা" তাদের ধর্মতত্ত্বে কোরানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নোত্তরমূলক শিক্ষাদানের বিধি ব্যবহার করেছিলেন। মনে করা হয়েছিল, সর্বপ্রকার আদর্শ, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা এটিকে গ্রহণ করবে। তারা সহিষ্ণুতা ও সমতার ওপর গুরুত্ব দিতেন। শ্রমিক ও কারিগরদের (একবচনে, সিনফ) গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের অনুষ্ঠানে গিল্ডের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। মুসলিম গিল্ডগুলির গোড়ার দিককার সাংগঠনিক কাঠামোর ছবি আঁকা আছে ইখওয়ান আল-সাফার অষ্টম চিঠিতে। এই গিল্ডগুলিকে চরিত্রের দিক থেকে সম্ভবত কারমাতিয়া বলা যায়। ম্যাসিগননের মতে, এই ব্যবসায়িক গিল্ড গড়ে তোলার আন্দোলনই পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ইউরোপের দেশগুলিতে গিল্ড ও রাজমিস্ত্রীদের সংঘ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করেছিল।

সাম্যবাদী ও বৈপ্লবিক ভাবধারার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা কারমাতিয়া আন্দোলন ইসলামি দুনিয়ার রাজনৈতিক জগতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। বিরোধীদের, এমন কী সে যদি মুসলিমও হয়, তবুও তাদের রক্তপাত ঘটানোটা কারমাতিয়াদের কাছে আইনসঙ্গতই ছিল। নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত করবার আগে আল-বসরাতে তারা জঙ্গীদের (নিগ্রো) ক্রীতদাস সংক্রান্ত একটা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। ৮৬৮ ও ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি খলিফা সাম্রাজ্যের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। কারমাতের[] এক ধর্মপ্রচারক আবু-সাইদ আল-হাসান আল-জান্নাবি-[]র নেতৃত্বে তারা পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়েছিল (৮৯৯ খ্রিঃ)। আল-আহ্সা[] ছিল এই রাষ্ট্রের রাজধানী। শীঘ্রই এই রাষ্ট্রটি তাদের ক্ষমতার দুর্গ হিসাবে গড়ে ওঠে এবং বাগদাদের খলিফাদের কাছে তা একটি আতঙ্কে পরিণত হয়। তাদের নতুন কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর বেশ কয়েকবার তারা জোরালো আক্রমণ হেনেছিল। আল-জান্নাবি ৯০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আল-ইয়ামামা দখল করেন এবং ওমানের ওপর আক্রমণ চালান। তার পুত্র ও উত্তরসূরি আবু-তাহির সুলাইমান নিম্ন আল-ইরাকের অধিকাংশ জায়গা ধ্বংস করেন ও তীর্থযাত্রার পথটি[] নষ্ট করে দেন। ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা ও সেখানকার কালো পাথর[] তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তার চরম অত্যাচারের প্রকাশ ঘটে। ২০ বছর পরে ফাতিমিয় বংশের খলিফা আল-মানসূরের[] নির্দেশে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এই নিদর্শনটি আবার আল-কাবাতে ফিরে আসে (৯৫১ খ্রিঃ)। দশম ও একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কারমাত ও আল-জান্নাবির অনুগামীরা সালামিয়ায় অবস্থিত তাদের মূল কেন্দ্র থেকে সিরিয়া ও আল-ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে এই দুটি দেশকে রক্তে ভিজিয়ে দেয়[]। কারমাতিয়াদের কাজকর্মের ফলে দূরবর্তী খুরাসান ও আল-ইয়ামানও বিরোধের স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

● অ্যাসাসিন

কারমাতিয়া রাষ্ট্র ধ্বংস হল, কিন্তু মিশরের ফাতিমিয় এবং পরে আলামুত ও সিরিয়ার নব্য-ইসমাঈলি বা অ্যাসাসিনরা[] এই ইসমাঈলি আদর্শ বহন করে চলল। ফাতিমিয়দের একটি শাখা থেকেই দ্রুজইজমের উদ্ভব হয়। অ্যাসাসিন আন্দোলনের সদস্যরা একে 'নতুন প্রচার'[] নামেও অভিহিত করে থাকে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন আল-হাসান ইবন-আল-সাব্বাহ (মৃ ১১২৪ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন তূস থেকে আগত এক পারসীয় ও নিজেকে তিনি দক্ষিণ আরবের হিময়ারীয় রাজাদের বংশধর বলে দাবি করতেন। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশোধের স্পৃহাই ছিল তাঁর সমস্ত কার্যাবলির প্রেরণা। আল-রায়ির[] এক যুবক হিসাবে হাসান, বাতিনি আদর্শ থেকে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি গ্রহণ করেছিলেন এবং মিশরে দেড় বছর কাটানোর পরে একজন ফাতিমিয় ধর্মপ্রচারক[] হিসাবে তিনি তার জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে কাজবিনের উত্তর পশ্চিমে আলামুতে অবস্থিত শক্তিশালী পার্বত্য দুর্গটি তিনি অধিকার করেন। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,২০০ ফুট ওপরে আলবুর্জ

পর্বতশ্রেণীর বিস্তৃত সোপানে এবং কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী উচ্চভূমির মধ্যবর্তী তীরের মাঝে দুর্গম কিন্তু সবচেয়ে ছোট রাস্তাটির ওপর সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি হয়। আলামুত নামের থেকেই সম্ভবত, 'ঈগলের বাসা' কথাটি এসেছে। নতুন ব্যবস্থা চালু হবার ক্ষেত্রে এই দুর্গের দখলই প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা।

আলামুত দুর্গ থেকে সেই মহান, ধর্মগুরু (দাই আল-দুয়া) তার অনুগামীদের নিয়ে অন্যান্য দুর্গের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। তাদের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তারা অবাধে ও গুপ্তভাবে ছুরির ব্যবহার করে গুপ্তহত্যাকে এক শিল্পের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। ইসমাঈলীয়দের পূর্ব-ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা এই গুপ্ত সংগঠনটি এক ধরনের অজ্ঞতাবাদের জন্ম দিয়েছিল। এই অজ্ঞতাবাদের উদ্দেশ্য ছিল আদর্শের বেড়ী থেকে শিক্ষানবিশকে মুক্ত করা। দৈববার্তা-ঘোষণাকারী ধর্মগুরুদের অনাবশ্যকতা সম্পর্কে তাকে সচেতন করা এবং কোন কিছুকে বিশ্বাস না করা ও সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাকে উৎসাহী করে তোলা। প্রধান অধ্যক্ষের নিচেই ছিল প্রত্যেকজেলা বিশেষের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির (একবচনে, আল-দায়ী আল-কবীর) স্থান। তারপর ছিল সাধারণ প্রচারকদের স্থান। এই সংগঠনের সবচেয়ে নিচে ছিল ফিদাই।[১২] মহান ধর্মগুরুর যে কোন আদেশ কার্যকর করতে এরা সব সময় প্রস্তুত থাকত। আলামুতের ধর্মগুরু হাশিশকে কাজে লাগিয়ে যে পদ্ধতিতে 'আত্মোৎসর্গকারী অনুগামীদের' সম্মোহিত করতেন, মার্কো পোলোর কাছ থেকে তারই একটি বিলম্বিত ও ব্যবহৃত চিত্রসহ বর্ণনা আমাদের হাতে এসেছে। ১২৭১ বা ১২৭২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রতিবেশী দেশগুলিতে তিনি ভ্রমণ করছিলেন। আলামুতে ওই মহান ধর্মগুরু নির্মিত রুচিশীল প্যাভেলিয়ন ও বাড়িগুলির চারধারে সুন্দর সুন্দর বাগান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর পোলো লিখেছেন :

"তিনি যাকে তার অ্যাশিশিন করতে চাইবেন তাকে ছাড়া আর কাউকেই এখন ওই বাগানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। বাগানের প্রবেশপথে একটি দুর্গ ছিল। গোটা পৃথিবীর আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি তার ছিল। এছাড়া বাগানে ঢোকার আর কোন রাস্তাও ছিল না। তার দরবারে ১২ থেকে ২০ বছর বয়সের বেশ কিছু যুবককে তিনি রেখেছিলেন। এদের সৈন্য হবার ইচ্ছা ছিল......... তারপর এক-একবারে তিনি চার, ছয় বা দশজনকে বাগানে নিয়ে যেতেন। প্রথমে তাদের এমন একটা পানীয় খাওয়াতেন যাতে তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর তাদের বহন করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হত। সুতরাং তারা যখন জেগে উঠত, তারা দেখত যে তারা বাগানে ঢুকে পড়েছে।

জেগে উঠে এমন একটা মনোরম স্থানে নিজেদের দেখে তারা মনে করত যে, এটা প্রকৃতই স্বর্গ। যুবতী ও তরুণীরা সেখানে তাদের আলিঙ্গন করত যতক্ষণ না তারা পরিতৃপ্ত হয়.......।

সুতরাং যখন সেই প্রবীণ মানুষটি যখন কোন রাজপুত্রকে হত্যা করাতে চাইতেন, তখন এমন একজন যুবককে ডেকে বলতেন, 'তুমি যাও এবং অমুক অমুককে হত্যা করে এস; যখন তুমি

ফিরে আসবে আমার দেবদূতেরা তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। আর যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে তা সত্ত্বেও আমি, তোমার দেহ বহন করে স্বর্গে নিয়ে আসার জন্য আমি দেবদূতদের পাঠাব।"[২০]

১০৯২ খ্রিস্টাব্দে সালজাক সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উজির নিজাম-আল-মুলককে এক সুফির[২১] ছদ্মবেশে এক ফিদাই হত্যা করেন। এটি ছিল এই ধরনের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডগুলির মধ্যে প্রথম ঘটনা এবং তা মুসলিম দুনিয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ওই একই বছরে সালজাক সুলতান মালিকশাহ তৎপর হয়ে উঠলেন এবং দুর্গের উদ্দেশে একটি শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী পাঠালেন। দুর্গের সেনারা রাতে প্রবল বেগে পাল্টা আক্রমণ করল এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে হারিয়ে দিল। খলিফা ও সুলতানদের অন্যান্য প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত খলিফা সাম্রাজ্য ধ্বংসের নায়ক মোঙ্গল যোদ্ধা হুলাগু ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই দুর্গ ও পারসিয়াতে[২২] অবস্থিত এর সহায়ক দুর্গগুলিও দখল করেন।

একাদশ শতাব্দীর শেষের বছরগুলিতে অ্যাসাসিনরা সিরিয়াতে শক্ত ভিতের ওপর তাদের সংগঠনকে দাঁড় কবান এবং আলেপ্পোর ক্ষমতাসীন সালজাক বংশের রাজপুত্র রিযওয়ান ইবন-তুতুশকে (মৃ. ১১১৩ খ্রিঃ) ধর্মান্তরিত করে নিজেদের দিকে নিয়ে আসেন। ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে তারা মেসিয়াদ[২৩]-এর পার্বত্য দুর্গ এবং আল-কাহ আল-কাফদমাস ও আল-উলায়কাহ্[২৪]-সহ উত্তর সিরিয়ার অনেকগুলি দুর্গ দখল করেন। অ্যাসাসিনরা এমন কী অরেন্টজ-এর ওপরে অবস্থিত শেজার (আধুনিক সেজার) সাময়িকভাবে দখল করেন। এই অ্যাসাসিনদেরই ইসমাইলাইট বলতেন উসামা[২৫]। সিরিয়ায় তাদের অন্যতম বিখ্যাত ধর্মশিক্ষক ছিলেন রশীদ-আল-দিন সিনান (মৃ ১১৯২ খ্রিঃ)। তিনি মেসিয়াদে বাস করতেন এবং শায়খ আল-জাবাল উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মযুদ্ধের কাহিনীকারেরা ওই উপাধির অনুবাদ করে নাম দিয়েছিলেন "লা ভক্স ডেলা মন্টেগ"[২৬] (পর্বতের প্রবীণ মানুষ)। রশীদের বিশ্বস্ত লোকেরাই ধর্মযোদ্ধাদের মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলরা মেসিয়াদ দখল করার পর মামলুক সুলতান বেবারস ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার অ্যাসাসিনদের ওপর শেষ আঘাত হানেন। তারপরই অ্যাসাসিনরা উত্তর সিরিয়া, পারস্য, ওমান, জাঞ্জিবার ও বিশেষত ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতে এদের সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ এবং এরা এখানে খোজা বা মাওলা[২৭] নামে পরিচিত ছিল। তারা সকলেই বোম্বের আগা খাঁকে তাদের খেতাবধারী নেতা বলে মানতেন। আগা খাঁ নিজেকে সপ্তম ইমাম ইসমাঈল থেকে শুরু করে আলামুতের মহান ধর্মগুরুর বংশধর বলে দাবি করতেন। শুধু ভারতেই নয়, এমন কী সিরিয়াতেও আদায়কৃত রাজস্বের এক-দশমাংশ তিনি গ্রহণ করতেন এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে তার অধিকাংশ সময় তিনি প্যারিস ও লণ্ডনে ব্যয় করতেন।

● নুসাইরিয়

লেবাননের দ্রুজেসদের পূর্ববর্তী উত্তর সিরিয়ার নুসাইরিয়গণ ইসমাঈল সম্প্রদায়ের আর একটি শাখা। এগারোতম আলীপন্থি ইমাম আল-হাসান আল আসকারির (মৃ ৮৭৪ খ্রিঃ)

দলভুক্ত ও নবম শতাব্দীর শেষদিককার মুহাম্মাদ ইবন-নুসাইর-এর নাম অনুসরণে এদের এরকম নাম হয়েছিল। দুসাউদের[৯৯] মতে, ইবন-নুসাইরের অনুগামীরা দলগতভাবে অ-দার্শনিক প্রকৃতি উপাসনা থেকে ইসমাইলিজমে দীক্ষিত হবার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল। এটাই ইসমাঈলিয়দের মূল সদস্য ও তাদের মধ্যেকার উল্লেখনীয় পার্থক্যের প্রতীক।

অন্যান্য চরমপন্থি শী'আহ্ সম্প্রদায়ের মতো নুসাইরিয়গণও মনে করত যে, আলীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্[১০০] মানুষের দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। যেহেতু তাদের এলাকায় ফরাসি অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল আলাওয়াইট। দ্রুজ ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের পথ অনুসরণ না করে তাদের প্রার্থনার নিজস্ব বিধি ছিল এবং খ্রিস্টমাস ও ইস্টারসহ অন্যান্য খ্রিস্টান উৎসবও তারা পালন করত। তাদের অনেকেই মাত্রা (ম্যাথিউ), যুহান্না (জন) ও হিলানা (হেলেন) ইত্যাদি খ্রিস্টান নাম গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টধর্ম থেকে এই সমস্ত জিনিস গ্রহণ করার পাশাপাশি তাদের ধর্মে অ-দার্শনিক প্রকৃতি উপাসনার নানা বিষয়ের অবশিষ্টাংশ মিশে ছিল। দ্রুজদের থেকে আরও গোপনে তারা এই ধর্মাচরণ পালন করত। এই আদর্শে দীক্ষিত ৩,০০,০০০ মানুষ এখন উত্তর ও মধ্য সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এবং দূরবর্তী তুর্কির সিলিসিয়াতে বাস করে। এদের অধিকাংশ হল কৃষক।

● প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী অন্যান্য শী'আহ্ সম্প্রদায়

শী'আহ্‌গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশই অর্থাৎ টুয়েলভার বলে পরিচিতরা, নুসাইরি, অ্যাসাসিন, দ্রুজ, কারমাতিয়া ও অন্যান্য ইসমাঈলিদের চরমপন্থি (গুলাহ্) বলে গণ্য করত। তার কারণ হল এই সমস্ত চরমপন্থিরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতায় সন্দেহ করত এবং মুহাম্মাদের শেষ নবী হওয়াকে[১০১] মানতে চাইত না। গুলাহ্-র মধ্যে একটি গোষ্ঠী ছিল যারা ঘোষণা করেছিল যে গ্যাব্রিয়েল ভুলক্রমে মুহাম্মাদকে আলী বলে মনে করেছিলেন যখন তিনি পয়গম্বরি ঘোষণা করার[১০২] জন্য ডেকে পাঠান। পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত চরমপন্থি শী'আহ্ গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল, তাদের মধ্যে পশ্চিম আনাতোলিয়ার তাখতাজিস (কাঠুরে), পারস্য ও তুর্কীস্তানের আলী-ইলাহি (যারা আলীকে স্বীকার করে না), তাদের মতো একই আদর্শে দীক্ষিত আনাতোলিয়ার পূর্বদিকের কিজিল-বাশ (লাল-মাথাওয়ালা) এবং তুর্কি ও আলবানিয়ার বক্‌তাশি উল্লেখযোগ্য।

আল-হুসায়নের পৌত্র জাইদের[১০৩] দলভুক্ত আল-ইয়ামানের জাইদিরা এদের ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। আল-হুসায়নকেই তারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করত। সমস্ত শী'আহ্ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এরাই ছিল সুন্নিদের সবচেয়ে কাছের লোক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা ছিল সবচেয়ে উদার। একদিকে গুলাহ্ আর অন্যদিকে জাইদির মাঝামাঝি জায়গায় ছিল টুয়েলভাররা। অন্যান্য শী'আহ্ গোষ্ঠীদের বিপরীতে জাইদিরা কোন গুপ্ত ইমামে বিশ্বাস করত না, কোন অস্থায়ী বিবাহ (মুত্‌আহ্) প্রথার অনুশীলন করত না এবং

প্রকৃত মনোভাব গোপন করে লোককে (তাকিয়া) প্রশ্রয় দিত না। কিন্তু অন্যান্য শী'আহ্ গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা সুফিবাদের বিরোধিতা করত। শী'আহ্ সম্প্রদায় ও তাদের উপসম্প্রদায়ভুক্ত সব মানুষের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি বা সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের[১৩৪] ১৪ শতাংশ।

● টীকা ●

১. ইবন-খাল্লিকান. ১ম খণ্ড ৩৮-৪৫ পাতা দেখুন; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১১৩৯ ও পরের পাতা দেখুন।

২ উপরে দেখুন. ১২৩-২৪ পাতা।

৩. তার আদেশাবলির একটি অনুলিপি তাবারী, ৩য় খণ্ড. ১১১২-১৬ পাতায় আছে।

৪. ইবন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ১৯৬-৯৭ পাতা।

৫. একই বই ১৯৭ পাতা; তাবারি, ২য় খণ্ড, ১৭৩৩ পাতা।

৬. উপরে দেখুন, ৩৫৯ পাতা।

৭. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১১৩১ ও পরের পাতা।

৮. প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি তার বিরোধিতার জন্য শাহরাস্তানি ৩৭-৪২ পাতা দেখুন; বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ১০২-০৯ পাতা।

৯. ইবন-হাজম, ৪র্থ খণ্ড. ১৪৮ পাতা; আল-খাইয়াত, কিতাব-আল ইন্তিসার. সম্পাদনা : এইচ. এস. নাইবার্গ (কায়রো. ১৯২৫). নির্ঘন্ট।

১০. শাহরাস্তানি, ৪৬-৪৮ পাতা; বাগদাদি, ১০৯-১০ পাতা দেখুন।

১১. তার মাকালাত আল-ইসলামিয়িন. সম্পাদনা : এইচ রিটার (কনস্টান্টিনোপল, ১৯২৯). ১৫৫-২৭৮ পাতা; শাহরাস্তানি, ৬৫-৭৫ পাতা দেখুন।

১২. শাহরাস্তানি, ৫৪ ও পরের পাতা দেখুন; বাগদাদি, ১২১ পাতা দেখুন।

১৩. ফিহ্‌রিস্ত, ১৮১ পাতা।

১৪. গাজ্জাল (স্পিনার) থেকে কিছু ভুলভাবে আল-গাজ্জালী : মাজাল্লাত আল-মাজমা ২য় খণ্ড (১৯২৭) ২২৪-২৬ পাতায় মুহাম্মাদ ইবন-আবি-শানাব। তুলনীয় : ডানকান বি ম্যাকডোনাল্ড-এর জার্নাল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবন্ধ (১৯০২). পাতা ১৮-২২।

১৫ নিও-প্লেটোনিস্ট।

১৬. আল-মুনকিয মিন আল-দালাল: সম্পাদনা : এ স্মেল্ডারস (প্যারিস. ১৮৪২), ৪-৫ পাতা; তুলনীয় সি. ফিল্ড. দি কনফেসনস অফ আল-গাজ্জালী (লণ্ডন. ১৯০৯) ১২

১৩ পাতা। এই বইটির আত্মজীবনীমূলক অংশটি সেন্ট অগাস্টিন-এর অভিজ্ঞতার-সত্যতা প্রমাণ করে।

১৭. ৪র্থ খণ্ড (কায়রো, ১৩৩৪)। এর আরও কয়েকটি সংস্করণ আছে।

১৮. (কায়রো, ১৩২২)।

১৯. সম্পাদনা : এম বোজেস (বেইরুট, ১৯২৭)।

২০. ২য় সংস্করণ (কায়রো, ১৩২৭)।

২১. আরবী শব্দ সুফ, পশম থেকে। জানা যায় যে, রহস্যময় জীবনে প্রবেশের সময়ে পশমের পোশাক পরাটাই ছিল রীতি। থিওডোর নলডিকি-র জাইসক্রিফ্‌ট দার দাশেন মরগেন লানডিশেন সেলসফ্‌ট, ৪৮ খণ্ড (১৮৯৪), ৪৫-৪৮ পাতা।

২২. সূরা ৪৬ : ২৯ ও পরের সূরা।

২৩. আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ ও স্মরণ; সূরা ৩৩ : ৪১।

২৪. রেনল্ড এ নিকলসন, দি মিস্টিকস অফ ইসলাম (লণ্ডন, ১৯১৪), ১০ পাতা।

২৫. আল-মাসিহ্ আল-দাজ্জাল, আরমাইক মেসিহা দাগ্‌গালা থেকে; সি. এফ. ম্যাথিউ ২৪: ২৪; রেভ ১৩ : ১-১৮; ড্যানিয়েল ১১ : ৩৬।

২৬. জাহিয, বায়ান, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পাতা।

২৭. জার্নাল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯০৪), ১৩২ ও পরের পাতায় টি, ডুকা কর্তৃক উদ্ধৃত।

২৮. ইবন-আসাকির, ২য় খণ্ড, ১৬৭-৯৬ পাতা দেখুন; কুতুবি, ১ম খণ্ড, ৩-৫ পাতা দেখুন; আল-কুশাইরি, আল-রিসালা (কায়রো, ১২৮৪), ৯-১০ পাতা।

২৯. বুলদান, ২য় খণ্ড ৫৩৬ পাতা।

৩০. তুলনীয় : আল-হুজবিরি, কাশফ আল-মাহজুব, অনুবাদ : আর এ নিকলসন (লিডেন, ১৯১১), ১১৪ পাতা।

৩১. রিসালা, ১২ পাতা।

৩২. মাছওয়ালা, জোনা (য়ুনুস) সম্পর্কে কোরানের ২১ : ৮৭- তে উল্লিখিত। যু-আল-নূনের প্রকৃত নাম হল সাওবান আবু-আল-ফইয ইবন-ইবরাহীম।

৩৩. কুশাইরি, ১০ পাতা; হুজবিরি, ১০০ পাতা।

৩৪. ২য় খণ্ড, ৪০১-০২ পাতা।

৩৫. ৩য় খণ্ড, ২৪ পাতা, ১১.২৭-২৮।

৩৬. হায়াওয়ান, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৬-৪৭ পাতা।

৩৭. ইগনাজ গোল্ডজিহার, ভরলেসানজেন উবের ডেন ইসলাম, সম্পাদনা : এফ. বাবিনজার (হাইডেলবার্গ, ১৯২৫), ১৬০ পাতা।

৩৮. আরবী শব্দ আবু-ইয়াযীদ-এর তুর্কি উচ্চারণ; কুশাইরি, ১৭-১৮ পাতা দেখুন; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড ৪২৯ পাতা।

৩৯. ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৬১ পাতা। তুলনীয় : নিকলসন, স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম (কেমব্রিজ, ১৯২১), ৮০ পাতা; লুইস ম্যাসিগনন, লা প্যাসন দ্য আল-হাল্লাজ : মার্টার মিস্টিক ডেল ইসলাম (প্যারিস, ১৯২২), ২য় খণ্ড, ৫১৮ পাতা।

৪০. কুশাইরি, ২৪-২৫ পাতা; হুজবিরি, ১২৮-৩০ পাতা।

৪১. দিওয়ান, সম্পাদনা : আমিন খুরি, ৩য় সংস্করণ, (বেইরুট, ১৮৯৪), ৬৫-১৩২ পাতা; অনুবাদ : প্রায় সম্পূর্ণটাই নিকলসন কর্তৃক, স্টাডিজ, ১৯৯-২৬৬ পাতা।

৪২. এখনও বিদ্যমান সেরা জীবনীটি রয়েছে আল-যাহাবিতে, জার্নাল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯০৭ খ্রি), ২৬৭-৩১০ পাতায় ডি এস মারগোলিউথ-এর 'তারিখ আল-ইসলাম'। তার বিস্ময়কর কাজ সম্পর্কে শাত্তানাওফি, বাহজাত আল-আসরার (কায়রো, ১৩০৪), ফুতূহ আল-গায়ব নামক পুস্তকে জিলানির ৭৮টি বক্তৃতা উদ্ধৃত করা আছে।

৪৩. এ ব্যাপারে আবু-আল-মাওয়াহিব আল-শাজিলি দেখুন, কাওয়ানিন হিকাম আল-ইশরাক (দামাস্কাস. ১৩০৯). অনুবাদ : জে জুরজি, ইল্যুমিনেশান ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম (প্রিন্সটন, ১৯৩৮)।

৪৪. আরবী শব্দ দারবিশ, পারসীয় ভাষা থেকে আগত, সাধারণভাবে গরিব, অভাবী এবং ভিক্ষুকদেরকে বোঝায়।

৪৫. এক গোঁড়া মুসলিমের সমালোচনার জন্য ইবন-আল-জাওযী দেখুন, নাকদ. ২৬২ ও পরের পাতা।

৪৬. রিভিউ দ্য এল হিস্টোরি দাস রিলিজিয়নস, ২১ খণ্ড (১৮৯০), ২৯৫-৩০০ পাতায় ইগনাজ গোল্ড-জিহার-এর লেখা দেখুন; ভরলেসানজেন, ১৬৪ পাতা।

৪৭. দিওয়ান. ১০৮ পাতা. ১. ১৮. সি. এফ. ইবন-কুতাইবা. আল-শি'র. ৫০৮ পাতা. ১.২।

৪৮. কুশাইরি, ২৫ পাতা।

৪৯. আবু নুয়াইম (মৃ. ১০৩৮ খ্রি) তার বিশালাকার হিলিয়াত আল-আওলিয়া ওয়া-তাবাকাত আল-আসফিয়া, ২য় খণ্ড (কায়রো, ১৯৩৩) ৩৯-৭৯ পাতায় মহিলা সুফি ও সন্তদের নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৫০. ফরিদ-আল-দীন আত্তার, তাযকিরাত আল-আওলিয়া, সম্পাদনা : আর এ নিকলসন, ১ম খণ্ড, (লিডেন, ১৯০৫), ৬৭ পাতা।

৫১. আবু-তালিব (আল-মাক্কি)। কুওত আল-কুলুব (কায়রো. ১৯৩২) ৩য় খণ্ড. ৮৩ পাতা। রাবিয়া সম্পর্কে আরও বেশি জানতে হলে মার্গারেট স্মিথ-এর রাবিয়া দি মিস্টিক অ্যান্ড হার ফেলো-সেন্টস ইন ইসলাম (কেমব্রিজ, ১৯২৮) দেখুন।

৫২. লুই ম্যাসিগনন. রিকুয়েল টেক্সটেস ইনেডিটস কনসারনান্ট এল হিস্টোরি ডে লা

মিস্টিক এন পেস ডি' ইসলাম (প্যারিস, ১৯২৯), ১১১-১২ পাতা। হিট্টির মূল গ্রন্থের ৫৮৬ পাতার নিচে দেখুন।

৫৩. ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৫৪৪-৪৫ পাতা।

৫৪. ফাখরি, ৩২৫ পাতা; মাসউদী, ৭ম খণ্ড ৩০২-০৩ পাতা।

৫৫. ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ২৭৮ পাতা।

৫৬. আক্ষরিক অর্থে 'সতর্কতা', 'ভয়'। কোরান, ৩ : ২৭।

৫৭. শাহ্‌রাস্তানি, ৯২ পাতা, ১.১৫, ৯৩ পাতা, ১.৬।

৫৮. গোল্ডজিহার, ভরলেসানজেন, ২০৩ পাতা।

৫৯. উপরে দেখুন, ২৪৮ পাতা, বাগদাদি, উসুল, ১ম খণ্ড, ২৭৭-৭৯ পাতা।

৬০. শাহ্‌রাস্তানি, ১০৮-০৯ পাতা; ইবন-খালদূন, মুকাদ্দামা, ১৬৪-৬৫ পাতা।

৬১. আল-হাসান ও আল-হুসায়নের অগণিত বংশধর যথাক্রমে শরিফ (মহান) ও সায়্যিদ (প্রভু) পদবি ও সবুজ পাগড়ি পরার অধিকারের মধ্য দিয়ে অন্যান্য মুসলিমদের থেকে আলাদা বলে গণ্য হয়েছেন। মক্কার শরিফরা, যাদের বংশধর ছিলেন আল-ইরাক-এর সুন্নিপন্থি রাজা ফয়সাল, ও মরক্কোর শরিফেরা ফাতিমার বড় ছেলের আদর্শ অনুসরণ করে।

৬২. তুলনীয় : ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড ৪৯৯ পাতা।

৬৩. ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৫৫১ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৫৭৭ পাতা।

৬৪. শাহ্‌রাস্তানি, ১২৮ পাতা; বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ৬০-৬১ পাতা; ইবন-হাজম, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮ পাতা; আল-নওবখতি, ফিরাক আল-শী'আহ্, সম্পাদনা : হেলমুট রিটার (কনস্ট্যান্টিনোপল, ১৯৩১), ৮৪-৮৫, পাতা। সি এফ. ইবন-খালদূন। মুকাদ্দামা, ১৬৬ পাতা। সামাররার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গুহাটি (সিরদাব) এখনও দেখা যায়।

৬৫. এই বিষয়ে বংশ-পরিচয় সংক্রান্ত সারণিটি দেখুন। ফিরে আসার ব্যাপারে যে বিশ্বাস ছিল তা প্রায় প্রতারণার পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং মুসলিম ইতিহাসের সর্বযুগে এরকম অনেক মিথ্যা দাবিদারের আবির্ভাব ঘটেছে।

৬৬. ইবন-আল-জাওযী, নাকদ, ১৯-২০ পাতা; সি এফ. বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ১৫ পাতা।

৬৭. নওবখতি, ৫৭-৫৮ পাতা; বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ৫৮ পাতা; ইবন-খালদূন, মুকাদ্দামা, ১৬৭-৬৮ পাতা।

৬৮. শাহ্‌রাস্তানি, ১৪৫-৪৭ পাতা; আল-ইজি, আল-মাওয়াকিফ, ৮ম খণ্ড (কায়রো, ১৩২৭ খ্রি) ৩৮৮-৮৯ পাতা; ডব্লিউ আইভানো-র এ গাইড টু ইসমাইলি লিটারেচার (লণ্ডন, ১৯৩৩) দেখুন।

৬৯. বাগদাদি, উসুল, ৩২৯-৩০ পাতা; শাহ্‌রাস্তানি, ১৪৭ ও পরের পাতা দেখুন; ইবন-আল-জাওযী, ১০৮ পাতা।

৭০. এই সময়ের আগে ম্যানিকিয়ান ও কোন কোন গ্রিক আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে সুদক্ষ ব্যক্তিদের ডিগ্রি দ্বারা তাদের শিক্ষার স্বীকৃতি দেবার রীতি চালু ছিল।

৭১. ইস্তাখরি, ৬১ পাতা; ইবন-আল-ফকীহ, ১১০ পাতা; ইয়াকুত, ৩য় খণ্ড, ১২৩ পাতা। অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক রূপ হল সালামিয়া; মাকদিসি, ১৯০ পাতা; ইবন-খুরদাযবিহ্, ৭৬- ৯৮ পাতা।

৭২. আল-জুওয়ায়নির একটি টীকা অনুযায়ী এক শতাব্দী আগে, তারিখ-ই-জাহাঁ-গুশা, সম্পাদনা : মির্জা এম আল-কাজবিনি, ২নং পার্ট (লিডেন, ১৯৩৭), ৩১৫ পাতা।

৭৩. এই শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে; সম্ভবত আরবীয় নয় (বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ১৭১ পাতা; ফিহ্‌রিস্ত, ১৮৭ পাতা, ১.৯; সামআনি আনসাব, ৪৪[৮ বি] দেখুন), কিন্তু "গোপন শিক্ষক"-এর আরামিক শব্দ; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ২১২৫, ২১২৭ পাতা; ইবন-আল-জাওযী, ১১০ পাতা।

৭৪. ফিহ্‌রিস্ত, ১৮৮ পাতা।

৭৫. সি এফ. ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড ১৩৬ পাতা।

৭৬. একই দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য ইবন-হাজম, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পাতা, ১১.১৩-১৪ দেখুন।

৭৭. এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম-এ 'কার্মাতিয়ান' প্রবন্ধটি দেখুন।

৭৮. পারস্য উপসাগরে পতিত একটি নদীর মোহনায় ফারিসের একটি শহর হল জান্নাব; ইস্তাখরি ৩৪ পাতা।

৭৯. ইবন-হাওকাল, ২১০ পাতা।

৮০. আধুনিক আল-হুফুফ; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড ৬৩ পাতা।

৮১. একই বই, ৮ম খণ্ড ১২৪-২৫, ১৩২-৩৩, ১৫৮-৫৯, ২৩২ পাতা।

৮২. মিসকাওয়াইহ্, তাজারিব আল-উমাম, সম্পাদনা : এইচ এফ আমেড্রজ, ১ম খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯২০ খ্রিঃ), ২০১ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড ১৫৩-৫৪ পাতা।

৮৩. সি. এফ. বাগদাদি, সম্পাদনা : হিট্টি, ১৭৬-৭৭ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড ১৫৩-৫৪ পাতা।

৮৪. তাবারী, ৩য় খণ্ড ২২১৭ ও পরের পাতা দেখুন; মাসউদী, তানবিহ্, ৩৭১-৭৬ পাতা দেখুন; মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড, ১০৮-০৯।

৮৫. 'হাশশাশুন' প্রবন্ধ থেকে, হাশিশের মতো চেতনানাশক মাদকে আসক্ত।

৮৬. আল-দাওয়াহ্ আল-জাদিদা; শাহ্‌রাস্তানি, ১৫০ পাতা।

৮৭. এ জন্যই তার পদবি আল-রাজি; ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৩৬৯ পাতা।

৮৮. ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৩০৪ পাতা, ১০ম খণ্ড ১৬১ পাতা।

৮৯. ফিদাই-এর ভিন্নরূপ, আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত। সি. এফ. ইবন-বতুতা, ১ম খণ্ড, ১০০-০৭ পাতা।

৯০. দি বুক অফ সার মার্কো পোলো, দি ভেনেসিযান, অনুবাদ : হেনরি ইয়ুল, ২য় সংস্করণ (লণ্ডন, ১৮৭৫) ১ম খণ্ড ১৪৬-৪৯ পাতা। ইবন-খাল্লিকানের প্রতি উৎসর্গীকৃত মেসাদে অনুষ্ঠিত একটি অনুরূপ অনুষ্ঠানের একই ধরনের বর্ণনা দেওয়া আছে ফান্ডগ্রুবেন দাস ওরিয়েন্টস, ৩য় খণ্ড (ভিয়েনা, ১৮১৩), সম্পাদনা ও অনুবাদ : হ্যামার, ২০১-০৬ পাতা।

৯১. ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড ২৫৬ পাতা; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন ৪৭৮ পাতা।

৯২. সেহেতু অ্যাসাসিনদের সম্পর্কে বই ও তথ্যাবলি ধ্বংস হয়ে যায়, সেইজন্য এই অদ্ভুত ও বিস্ময় উদ্রেককারী সংগঠনটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রতিপক্ষের বইপত্র থেকে সংগৃহীত।

৯৩. মেসিয়াফ-এর পরিবর্তিত রূপ মেসিয়াথ। এটি এখনও নুসাইরিয়া পর্বতের পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে আছে। ইবন-আল-আসীর, ১১শ খণ্ড ৫২ পাতা; আবু-আল-ফিদা, ৩য় খণ্ড ১৬ পাতা।

৯৪. ইবন-বতুতা; ১ম খণ্ড, ১৬৬ পাতা।

৯৫. কিতাব আল-ইতিবার, সম্পাদনা : হিট্টি, ১৫৯-৬০ পাতা। আরাব-সিরিয়ান জেন্টলম্যান, ১৯০ পাতা।

৯৬. সি এফ. উইলিয়ম অফ টায়ার, রিক্যুয়েল দাস হিস্টোরিয়েনস দাস ক্রুয়সেডস : হিস্টোরিয়েনস অক্সিডেন্টাস-এ "হিস্টোরিয়া রেনাম", ১ম খণ্ড (প্যারিস, ১৮৪৪), ৯৯৬ পাতা।

৯৭. ভারতের গুজরাটের অধিবাসী এই দাউদিরা অনেকটা ইসমাইলীয়দের মতো। এদের সংখ্যা ১,০০,০০০। কিন্তু তারা আগা খাঁর অনুগামী নয়। দাউদিদের সম্পর্কে রিভিউ দ্য মনডে মুসুলমান, ১ম খণ্ড (১৯১০), ৪৭২ ও পরের পাতায় ডি. মেনান্ট-এর লেখা দেখুন।

৯৮. হামজা ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিককার দ্রুজ তর্কশাস্ত্রবিদদের পাণ্ডুলিপিতে ইবন-নুসাইর ও তার অনুগামীদের সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯৯. রেনে দুসাউদ, হিস্টোরি এট রিলিজিয়ন দাস নোসাইরিস (প্যারিস, ১৯০০) ৫১ পাতা।

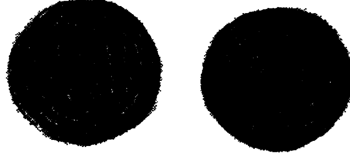
১০০. শাহরাস্তানি, ১৪৩-৪৫ পাতা।

১০১. অন্যান্য চরমপন্থিদের জন্য হিট্টি সম্পাদিত বাগদাদি, ১৪৫ ও পরের পাতা দেখুন; শাহরাস্তানি, ১৩২ ও পরের পাতা দেখুন; ইবন-হাজম, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০ ও পরের পাতা দেখুন; আশআরি, মাকালুত, ১ম খণ্ড ৫-১৬ পাতা।

১০২. বাগদাদি। ১৫৭ পাতা।

১০৩. বংশপরিচয় সম্পর্কিত তালিকাটি দেখুন, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৪৪২ পাতা।

১০৪. সি. এফ. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ২৪৯ পাতা, টীকা ২।



আহমদ্-ইবন-তুলুন-এর দিনার—৮৮১ খ্রি:

॥ অধ্যায় ৩১ ॥

খলিফা সাম্রাজ্যের পতন : পশ্চিমে ছোট ছোট রাজবংশের উদ্ভব

● ১. স্পেন

আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট বংশধর যুবক আবদ-আল-রাহমান নতুন রাজ্য আগ্রাসনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যে ব্যাপক গণহত্যা ঘটেছিল তার দায় এড়ানোর জন্য দূরবর্তী স্পেনের কর্ডোভায় পালিয়ে গেলেন। এক বছর পরে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে এক শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আর এইভাবেই আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শৈশবাবস্থাতেই প্রথম প্রদেশটি চিরকালের জন্য তাদের হাতছাড়া হয়। শীঘ্রই অন্য প্রদেশগুলিও একই পথ অনুসরণ করে।

● ২. ইদ্রিসি রাজবংশ

আল-হাসানের মহান পৌত্র ইদ্রিস ইবন-আবদুল্লা ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে আল-মদীনায় বার বার ঘটে যাওয়া আলী অনুগামীদের অনেকগুলি বিদ্রোহের একটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বিদ্রোহ কঠোর ভাবে দমন করা হয়েছিল এবং তিনি মরক্কোতে (আল-মাগরিব)[১] পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি তাঁর নামাঙ্কিত একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজত্ব প্রায় দু'শো বছর টিকেছিল (৭৮৮-৯৭৪ খ্রিঃ)। এর প্রধান রাজধানী ছিল ফাস (ফেজ)[২]। আর এই ইদ্রিসিয়রাই[৩] ছিল মুসলিমদের ইতিহাসে প্রথম শী'আহ্‌পন্থি রাজবংশ। বার্বারদের কাছ

থেকে তারা তাদের শক্তি সংগ্রহ করেছিল। এই বার্বাররা ছিল সুন্নি, তবুও তারা সর্বদা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর ব্যাপারে প্রস্তুত থাকত। মিশরের ফাতিমিয় ও স্পেনের উমাইয়াদের সাঁড়াশি আক্রমণে তাদের রাজবংশ শেষ পর্যন্ত কর্ডোভার[৪] খলিফা দ্বিতীয় আল-হাকাম (৯৬১-৭৬ খ্রিঃ)-এর এক জেনারেলের প্রবল আঘাতে ভেঙে পড়ল।

● ৩. আগলাবিয় রাজবংশ

শী'আহ্ গোষ্ঠীভুক্ত ইদ্রিসিয়রা যেমন উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমাংশে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল, তেমনি সুন্নি গোষ্ঠীভুক্ত আগলাবিয়রাও পূর্বদিকে একই উদ্দেশ্যে অনুরূপ চেষ্টা চালাচ্ছিল। ইফরিকিয়া (আফ্রিকা মাইনর, অর্থাৎ মূলত তিউনিসিয়া), ল্যাটিন ভাষায় বিকৃতি ঘটে আফ্রিকা নামে পরিচিত অঞ্চলটির জন্য ৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম ইবন-আল-আগলাবকে গভর্নর[৫] রূপে নিযুক্ত করেছিলেন হারুন আল-রশীদ। একজন স্বাধীন সার্বভৌম শাসক হিসেবে ইবন-আল-আগলাব (৮০০-৮১১ খ্রিঃ) তাঁর রাজত্ব চালিয়েছিলেন। তাঁর নিয়োগের পর আর কোন আব্বাসীয় খলিফা মিশরের পশ্চিম সীমানার বাইরে কর্তৃত্ব প্রয়োগের কোন চেষ্টা করেনি। আমির উপাধি পেয়েই আগলাবিয়রা নিজেদের সন্তুষ্ট রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রায় কখনই তাঁদের মুদ্রার ওপর সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের প্রতীক রূপে খলিফার নাম মুদ্রিত করতেন না বললেই চলে। তাঁদের রাজধানী আল-কায়রাওয়ান, কার্থেজের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী তাঁরা তাদের শতাব্দীব্যাপী শাসনকালে (৮০০-৯০৯ খ্রিঃ) ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

ইব্রাহিমের উত্তরসূরিদের অনেকেই তাঁর মতো উদ্যোগী ও কর্মতৎপর ছিলেন। তাই এই রাজবংশটি এশিয়া ও ইউরোপের দীর্ঘ সংঘর্ষের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সুসজ্জিত নৌবহর নিয়ে তারা ইতালি, ফ্রান্স, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়ার উপকূলে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাদেরই একজন প্রথম জিয়াদাত-আল্লাহ্ (৮১৭-৩৮ খ্রিঃ) ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন সিসিলিতে সেনা-অভিযান চালান। তার আগে সেখানে অনেকবার জলদস্যুর আক্রমণ চলেছিল। এই অভিযান ও পরবর্তী আরও কয়েকটি অভিযানের ফলে ৯০২ খ্রিস্টাব্দে[৬] এই দ্বীপটি সম্পূর্ণ পরাভূত হয় ও আক্রমণকারীদের দখলে আসে। মূল ভূখণ্ড, বিশেষত ইতালি অভিযানের ক্ষেত্রে সিসিলি একটি সুবিধাজনক ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। সিসিলি ছাড়াও মাল্টা ও সার্ডিনিয়া দখল করা হল। এই দখলের নায়ক ছিল জলদস্যুরা এবং এরা সুদূর রোম পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তাদের অভিযান চালাত। ক্রীটের মুসলিম জলদস্যুরা বার বার এজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে আক্রমণ চালাত এবং দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি তারা গ্রিসের উপকূলে তাদের অভিযান সংগঠিত করল। পরবর্তীকালে এথেন্সে আবিষ্কৃত তিনটি কুফিক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, দশম শতাব্দীর গোড়ার দিক[৭] পর্যন্ত সেখানে আরবদের উপনিবেশ ছিল।

প্রাচ্যের বিখ্যাত মসজিদগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এখনও দণ্ডায়মান আল-কায়রাওয়ানের বিরাট মসজিদটি তৈরির কাজ জিয়াদাত-আল্লার আমলেই শুরু হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ইব্রাহিম (৮৭৪-৯০২ খ্রিঃ)-এর শাসনকালে সেই কাজ শেষ হয়। আল-কায়রাওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা উকবা-র পুরানো প্রাসাদটি যেখানে অবস্থিত সেখানেই এই মসজিদটি তৈরি হয়েছিল। তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে একজন কার্থেজের ধ্বংসস্তূপের মার্বেল পাথর নির্মিত স্তম্ভ দিয়ে উকবার মসজিদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন। পুনরায় আগলাবিয় কাঠামোয় তা ব্যবহৃত হয়েছিল। এই মসজিদের বর্গাকার মিনারগুলি উমাইয়া আমলের প্রথম দিককার স্থাপত্য শিল্পের একটি নিদর্শন এবং আফ্রিকার বুকে এটিকে সবচেয়ে পুরানো বলে আখ্যা দেওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতে পরবর্তীকালে সিরিয়ার স্থাপত্যরীতিই চালু হয়। পারস্যের ও মিশরের পলকা ও রুচিশীল স্থাপত্যরীতি কখনই তাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। উল্লিখিত অন্যান্য স্থাপত্যরীতিতে ইট ব্যবহৃত হলেও সিরিয়ার স্থাপত্যবিদরা পাথর ব্যবহার করতেন। সম্ভবত এই মসজিদের জন্যই পশ্চিমি মুসলিমদের কাছে মক্কা, আল-মদীনা ও জেরুসালেমের পর আল-কায়রাওয়ান চতুর্থ পবিত্র শহর এবং স্বর্গে যাবার চারটি প্রবেশদ্বারের একটি বলে গণ্য হয়।

আগলাবিয়দের শাসনকালেই বাহ্যিক দিক থেকে ল্যাটিনভাষী ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইফ্রিকিয়া, আরবী-ভাষী ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশে পরিণত হয়। ল্যাটিন উত্তর আফ্রিকা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। আর কখনও তার উত্থান ঘটেনি। অথচ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল-সহ সেন্ট অগস্টাইন তারই ফসল। কিন্তু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তার আর পুনরুজ্জীবন ঘটেনি। অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনেকটাই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। মুসলিমদের অস্ত্র ব্যবহারই সম্ভবত তার কারণ। তবে বশ্যতা স্বীকার না করা বার্বার উপজাতি পরবর্তীকালে মুসলিমদের বিরোধিতা করেছিল এবং এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত বিভেদকামী ও প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মুসলিম সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল।

আগলাবিয় বংশের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন তৃতীয় জিয়াদাত-আল্লাহ্ (৯০৩-০৯ খ্রিঃ)[৮]। তার রাজ্যের দিকে ফাতিমিরা এগিয়ে আসার আগেই কোন প্রতিরোধ[৯] গড়ে না তুলেই ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পালিয়ে যান। ফাতিমিরা ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আগলাবিয়দের হটিয়ে উত্তর আফ্রিকায় এবং ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিশর ও দক্ষিণ সিরিয়ায় ইখশিদিদদের পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করেছিল। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী কোন অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু ইখশিদিদদের সম্পর্কে কিছু বলার আগে তুলুনিয় রাজবংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

● তুলুনিয় রাজবংশ

মিশর ও সিরিয়ায় স্বল্পায়ু তুলুনিয় রাজবংশের (দাওলা, ৮৬৮-৯০৫ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ ইবন-তুলুন। তার বাবা ছিলেন ফরগনার একজন তুর্কি। বুখারার সামানিয় শাসক ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন আল-মামূনের[১০] কাছে। ৮৬৮

খ্রিস্টাব্দে আহমদ মিশরের গভর্নরের লেফটেন্যান্ট রূপে সেখানে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজেকে স্বাধীন[১১] বলে ঘোষণা করেন। জাঞ্জ বিদ্রোহীরা যখন টাকার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, তখন খলিফা আল-মুতামিদ (৮৭০-৯২ খ্রিঃ) টাকা চেয়েও মিশরের লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাননি। এই ঘটনাটি মিশরের ইতিহাসে দিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এর মধ্য দিয়ে নীল নদের উপত্যকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং গোটা মধ্যযুগ জুড়ে এই সার্বভৌম রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। তখন থেকেই মিশরের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আংশিকভাবে বাগদাদ ও এখানকার ক্ষমতাসীন গভর্নরের মধ্যে ভাগ হত। এই গভর্নররা ছিল মূলত কর-প্রদানকারী কৃষক। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকত এবং শাসকদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তা ব্যয় করা হত। ইবন-তুলুনের সময় পর্যন্ত অন্তত একশো জন গভর্নরের প্রত্যেকে গড়ে ২১/৪[১২] বছর করে রাজত্ব চালিয়েছে এবং প্রত্যেকেই তার আগের জনের পথ অনুসরণ করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়েছে। তুলুনিয় বংশের শাসনে মিশর লাভবান হয়েছে এবং সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করেছে।

ইবন-তুলুন (৮৬৮-৮৪ খ্রিঃ) তাঁর নতুন রাষ্ট্রের জন্য একটি সুদৃঢ় সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তিনি ১ কোটি সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনীর ওপর নির্ভর করতেন। এই সামরিক বাহিনীর মূল অংশটি তুর্কি ও নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে গড়া। তাঁর সৈন্যবাহিনী, ক্রীতদাস ও প্রজাদের কাছ থেকে তিনি ব্যক্তিগত আনুগত্যের[১৩] শপথ আদায় করতেন। ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে যখন সিরিয়ার গভর্নর মারা গেলেন তখন আহমদ বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন না হয়েই[১৪] প্রতিবেশী দেশটি দখল করলেন। টলেমির যুগ থেকে এই প্রথম মিশর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হল এবং ফারাও শাসনের দিনগুলি থেকে এই প্রথম মিশর শাসন করতে শুরু করল সিরিয়াকে। সিরিয়ার ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য আককা (একরে)[১৫]-তে একটি নৌ-ঘাঁটি গড়ে তুললেন আহমদ। পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে নীলনদের উপত্যকার ক্ষমতাসীন শাসকেরা সিরিয়াকে শাসন করেছিল।

● জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম

দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কৃষিতে, সেচব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে তুলুনিয় শাসকেরা যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। কায়রোর কাছে আল-রাওযা দ্বীপে আহমদ নাইলোমিটারের উন্নতি সাধন করেছিলেন। মেমফিস-এর[১৬] পুরানো পরিমাপক যন্ত্রটির উন্নতি ঘটিয়ে এক উমাইয়া গভর্নর নাইলোমিটার যন্ত্রটি প্রথম তৈরি করেন। আরবরা মিশর জয় করার পর তুলুনিয় রাজবংশের আমলেই মুসলিম ধর্মাবলম্বী মিশর সর্বপ্রথম শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র ও জমকালো রাজদরবারের প্রতীক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। রাজধানী আল-ফুস্তাতের নতুন অঞ্চল আল-কাতায়ী[১৭] (প্রশাসনিক বিভাগ) সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ তৈরি

করে সাজিয়ে তোলা হয়। ৬০০০০ দিনার ব্যয়ে নির্মিত হাসপাতালটি (বিমারিস্তান) ছিল এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির অন্যতম। আহমদ[১] এটি তৈরি করিয়েছিলেন। এখানকার যে মসজিদটিতে এখনও আহমদ ইবন-তুলুনের নামটি লেখা আছে সেটি ইসলামি দুনিয়ার প্রধান প্রধান ধর্মীয় স্মৃতিসৌধগুলির অন্যতম। মিশরের সবচেয়ে পুরানো এই মসজিদটির মিনারে সামাররার স্থাপত্যরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সামাররাতেই আহমদ তার যৌবনের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। ১,২০,০০০ দিনার ব্যয়ে নির্মিত[১] এই মসজিদটি ইটের খিলান ও সূচালো ধনুকাকৃতি খিলান (উপরে, ৪১৭ পাতা) ব্যবহারের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কাঠের তৈরি চওড়া ছাদের[১] ঠিক নিচেই গোটা বাড়িটির ভিতরে চারদিকে কাঠের তৈরি স্তম্ভের মাথাল ও কার্নিসের মধ্যবর্তী অংশে সুন্দর সুন্দর কুফিক চিত্রসহযোগে কোরানের $^{১}/_{১৭}$ ভাগ খোদাই করা আছে।

আহমদের বিলাসী পুত্র[১] ও উত্তরসূরি খুমারাওয়াইহ্-এর (৮৮৪-৯৫ খ্রিঃ) প্রাসাদে একটি 'সোনার হলঘর' ছিল। এই হলঘরের সোনায় মোড়া দেওয়ালগুলি বিশেষ বিশেষ পটভূমির মধ্যে প্রায় প্রোথিত তাঁর নিজের এবং তাঁর স্ত্রী ও গায়িকাদের[১] মূর্তি দিয়ে সাজানো ছিল। সবচেয়ে সেরা ইসলামিক প্রাসাদগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। সোনার মুকুট-পরা খুমারাওয়াইহ্ ও তার স্ত্রীদের মূর্তিগুলি স্বর্ণমুকুট পরিহিত, পূর্ণাবয়ব ও কাঠের ওপর খোদাই করা। ইসলামি দুনিয়ার শিল্প সংস্কৃতিতে এরূপ জীবিত মানুষদের প্রতিমূর্তি তৈরি প্রায় বিরল ঘটনা বললেই চলে। তাঁর প্রাসাদটি ছিল একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে। সেখানে ফুলের গাছের বেডগুলি করা হয়েছিল আরবী শব্দের আকারে। এছাড়া সোনার গিল্টি করা জলাশয়ের[১] চারপাশেও লাগানো হয়েছিল অপূর্ব সব গাছ। একটি পক্ষীশালা[১] ও একটি চিড়িয়াখানা[১] ছিল প্রাসাদটির উল্লেখযোগ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রাসাদটির মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল একটি পারদের পুকুর আর এর হাওয়া দিয়ে ফোলানো চামড়ার তাকিয়া রেশমি দড়ি দিয়ে রুপোর স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা থাকত। এর উপর শুয়ে রাজা দুলতে দুলতে নিদ্রাহীনতা থেকে মুক্ত হতেন এবং গভীর ঘুমে ডুবে যেতেন। পরবর্তীকালে ওই স্থানে[১] পারদের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আগে খুমারাওয়াইহ্ তার মেয়ে কাতার-আল-নাদার (শিশিরবিন্দু)-র সঙ্গে খলিফা আল-মুতাজিদের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়েতে তিনি যৌতুক বাবদ ১০ লক্ষ দিরহাম, এক হাজার সোনার পিণ্ড, ও অন্যান্য এমন সব মূল্যবান বস্তু দিয়েছিলেন যা এর আগে কখনও দেওয়া হয়নি।[১] তাঁর এই অমিতব্যয়িতা ও বিলাসিতার জন্য রক্ষণশীলেরা তাঁকে অধার্মিক আখ্যা দিয়েছিল। দাবি করা হয় যে, তিনি নাকি একভাবে[১] ৪ রতল মিশরিয় মদ পান করতে পারতেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যখন কবর দেওয়া হচ্ছিল, তখন তার লাগোয়া তাঁর বাবার সমাধিস্থলের কাছে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরান পাঠের জন্য নিযুক্ত সাত ব্যক্তি পাঠ করছিলেন, "আপনারা তাকে ধরুন এবং নরকের আগুনের মাঝখানে তাকে টেনে নিয়ে যান।"[১]

খলিফা সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র অনিয়ন্ত্রিত ও অসংলগ্ন তুর্কি উপাদানের মধ্যে তুলুনিয় রাজবংশ ছিল রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার একটি প্রারম্ভিক প্রকাশমাত্র। তারপরেই অন্যান্য ও আরও গুরুত্বপূর্ণ তুর্কি রাজবংশের আবির্ভাব ঘটল। খলিফা সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপরে অনেকগুলি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

রূপে আহমদ ইবন-তুলুনের ভূমিকা ছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গেল বা বাগদাদের খলিফার ওপর নামেমাত্র নির্ভরশীল হয়ে রইল। অনুগত সেনা ও ক্রীতদাসদের সাহায্যে কীভাবে একটি মাথাভারী ও বিশালাকার খলিফা সাম্রাজ্যের বিনিময়ে সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করা যায়, আহমদ ছিলেন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত দেশে তারা শাসন চালিয়েছিল, সেই সমস্ত দেশে তুলুনিয়, ইখশিদিদ ও অন্যান্য রাজবংশের কোন জাতিগত ভিত্তি না থাকায় তাদের শাসন স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। তাদের জাতিভুক্ত মানুষের শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সমর্থকদলের অভাবই ছিল তাদের দুর্বলতার মূল কারণ। শাসকেরা ছিল প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসনকারী, বিভিন্ন বিদেশি জাতিভুক্ত মানুষদের নিয়ে তারা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল এবং তাদের মধ্য থেকেই দেহরক্ষীদের নিযুক্ত করেছিল। তুলনাহীন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ও তার প্রভাবেই কেবলমাত্র এই ধরনের শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা যায়। আর যে মুহূর্তে শাসকের দৃঢ়মুষ্টি আলগা হয়ে পড়ে বা অন্যের হাতে হস্তান্তরিত হয়, তখনই সেই শাসনব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। সুতরাং ইবন-তুলুন প্রতিষ্ঠিত রাজ্য যে তার পুত্র ও চতুর্থ উত্তরসূরি শাইবান (৯০৪-৯০৫)-এর আমলে আব্বাসীয়দের দখলে চলে গেল, তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই।

● ইখশিদিয়

মিশর ও সিরিয়ায় স্বল্পমেয়াদী আব্বাসীয় শাসনের পর ফরগনা থেকে উদ্ভূত ইখশিদিয় (৯৩৫-৬৯ খ্রিঃ) নামে আর একটি তুর্কি রাজবংশ আল-ফুস্তাত-এ স্থাপিত হয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবন-তুগ্‌জ (৯৩৫-৪৬ খ্রিঃ) মিশরের বিশৃঙ্খল অবস্থার সামাল দেন এবং খলিফা আল-রাজির কাছ থেকে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিনি ইরানের পুরানো রাজ-উপাধি 'ইখশিদ' গ্রহণ করেন। পরবর্তী দু'বছরে তুলুনিয়দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আল-ইখশিদ তাঁর আধা-স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনকে যুক্ত করেন। পরবর্তী কালে মক্কা ও আল-মদীনাও তার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে আল-হিজাজ নামে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী একটি বিতর্কিত অঞ্চলের ভাগ্য কয়েক শতাব্দীর জন্য মিশরের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

● এক নিগ্রো হারেম-প্রহরী

মুহাম্মাদ আল-ইখশিদের পর উত্তরসূরি হয়েছিল তাঁর দুই পুত্র, কিন্তু তাঁরা কেবল নামেই শাসন করতেন। বাস্তবে সমস্ত সরকারি ক্ষমতা ভোগ করত আবু-আল-মিশ্‌ক কাফুর (কস্তুরীবৎ সুগন্ধযুক্ত কর্পূর) নামে এক যোগ্য আবিসিনীয় হারেম-প্রহরী। প্রায় ৮ পাউণ্ড দাম দিয়ে এক তেল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আল-ইখশিদ তাকে কিনেছিলেন। কিন্তু ৯৬৬ খ্রিঃ থেকে ৯৬৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কাফুর-ই একমাত্র শাসক ছিলেন। হামদানিয় নামে উত্তর প্রান্তে উদ্ভূত এক নতুন রাজবংশের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি মিশর ও সিরিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করেন। কাফুরের প্রতিপক্ষ সইফ-আল-দাওলা

আল-হামদানির প্রশস্তিকারী ও তার সময়কার শ্রেষ্ঠতম কবি আল-মুতানাব্বি[৬৬] রচিত কবিতার মাধ্যমে কাফুরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রথমদিকে কবিতায় তার প্রশংসা করা হলেও পরে এর মধ্য দিয়ে তাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করা হয়েছিল। অতি নগণ্য জীবন থেকে এই নিগ্রো ক্রীতদাস যেভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার শিখরে উঠেছিলেন, ইসলামি ইতিহাসে তা প্রথম হলেও শেষ ঘটনা নয়। অন্যান্য রাজবংশের মতো ইখশিদিয় রাজবংশও বিশেষ করে তাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রজাদের আনুগত্য লাভের জন্য রাজকোষের অর্থের ব্যাপক অপচয় করতেন। মুহাম্মাদের রান্নাঘরে প্রতিদিন একশো ছাগল, একশোটি ভেড়া, আড়াইশো হাঁস, পাঁচশো মুরগি, এক হাজার পায়রা, একশো জার মিষ্টি লাগত। যখন কাব্যের ভাষায় কাফুরকে জানানো হয়েছিল যে, তাঁর সাফল্যে উল্লসিত হওয়ার মিশরে ভূমিকম্প ঘটে তখন সেই গর্বিত আবিসিনীয় সেই ভাবী ভূকম্পবিদকে ১০০০ দিনার পুরস্কার দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁদের আমলে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইখশিদিয়দের কোন অবদান ছিল না, কিন্তু জনকল্যাণের কোন কাজ তাঁরা অবহেলা করেননি। এই বংশের শেষ প্রতিনিধি ১১ বছরের বালক আবু-আল-ফাওয়ারিস আহমদ ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট ফাতিমিয় জেনারেল জওহারের[৬৭] কাছে পরাজিত হলে ইখশিদিয় রাজত্বের অবসান ঘটে।

● ৬. হামদানিয় রাজবংশ

উত্তর দিকে শী'আহ্‌পন্থী হামদানিয় বংশ ছিল মিশরের ইখশিদিয় রাজবংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হামদানিরা প্রথমে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের রাজধানী ছিল আল-মাওসিল (৯২৯-৯১ খ্রিঃ)। তাগলিব উপজাতির হামদান ইবন-হামদুনের[৬৮] বংশধর ছিল হামদানিরা। ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তারা উত্তর সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং সঈফ-আল-দাওলার (রাজবংশের তরবারি) নেতৃত্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইখশিদিয় লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে আলেপ্পো (হালাব) ও হিমস্ ছিনিয়ে নেয়। উমাইয়া শাসনে তাদের অতীত গৌরবের কথা সিরিয়ার মানুষ কখনও ভুলতে পারেনি। আর আব্বাসীয় রাজত্বে সিরিয়া অসন্তোষ ও বিদ্রোহের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আলেপ্পোর সঈফ-আল-দাওলা (৯৪৪-৬৭ খ্রিঃ) উত্তর-সিরিয়ায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি ১০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকেছিল। তাঁদের দ্বিতীয় উত্তরসূরি সাঈদ-আল-দাওলা (৯৯১-১০০১ খ্রিঃ) মিশরের ফাতিমিয়দের এক সামন্ত প্রজায় পরিণত হয়েছিলেন। বাইজানটাইন ও ফাতিমিয়দের প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে হামদানিদরা[৬৯] সেই বছরে শেষোক্তদের আনুগত্য স্বীকার করে।

● সাহিত্য বিকাশের যুগ

শিক্ষার প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই আরবদের ইতিহাসে সঈফ-আল-দাওলার নাম

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। শুধু তাই নয়, ইসলামের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী শত্রুদের বিরুদ্ধে অন্যান্য মুসলিমরা যে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণের জন্যও তাঁর নাম লেখা থাকবে। এই হামদানিয় নিজে ছিলেন একজন কবি;[৩৮] তাঁর সময়ের সাহিত্যগোষ্ঠী আল-রশিদ ও আল-মামুনের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ আল-ফারাবি। তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাজকোষ থেকে তাঁকে ৪ দিরহাম পেনসন দেওয়া হত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল-ইসবাহানি, ইবন নুবাতা (৯৮৪ খ্রিঃ) ও আল-মুতানাব্বি (৯১৫-৬৫ খ্রিঃ)। আল-ইসবাহানি ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। তিনি তার বিশালাকার 'আগানি'-র নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি তাঁর পৃষ্ঠপোষককে উপহার দিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিশিষ্ট বাগ্মী ও রাজদরবারের ধর্মপ্রচারক ইবন-নুবাতা-র ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রুচিপূর্ণ উপদেশাবলি[৩৯] শুনে শ্রোতাদের মনে বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ শুরু করার প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠত। আর রাজকবি আল-মুতানাব্বির কঠিন কঠিন শব্দালঙ্কার, কাব্যময় অলঙ্কার ও অকল্পনীয় রূপকের উপমাগুলি বর্তমানেও তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।[৪০] প্রথম দিককার একজন সমালোচক তাঁর কবিতাকে 'উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মান'[৪১] বলে উল্লেখ করেছেন। আল-মুতানাব্বি[৪২] (দৈববার্তা ঘোষণাকারী ধর্ম প্রচারকের দাবিদার) ছিলেন আল-কুফার এক জলবাহকের সন্তান। যৌবনকালে তিনি সিরিয়াবাসী বেদুইনদের মধ্যে দৈববার্তা প্রচার করতেন বলে তাঁর ওই রকম নাম হয়েছিল। আলেপ্পোতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ছিলেন সঈফ-আল-দাওলার চাচাতো ভাই আবু-ফিরাস-আল-হামদানি[৪৩]। হামদানিয় পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আল-মুতানাব্বি পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থী হয়েছিলেন ইখশিদিয় বংশের রাজা কাফুর-এর কাছে। তাঁর কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও পরে তাঁর সম্পর্কে কবির মোহভঙ্গ হয়েছিল।

উত্তর সিরিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী নবজাগরণের বিলম্বিত ফল হিসাবে 'কবিদের দার্শনিক ও দার্শনিকদের কবি' রূপে আবু-আল-আলা আল-মাআররি (৯৭৩-১০৫৭ খ্রিঃ)-র আবির্ভাব ঘটে। ইসলামি দুনিয়ার রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও সামাজিক অবক্ষয়ের যুগের সন্দেহপ্রবণ এবং নৈরাশ্যবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল তার রচনায়। তানুখ-এর বংশধর আবু-আল-আলার জন্ম ও মৃত্যু হয় মাআররাত আল-নুমান নামে একটি স্থানে এবং সেই জায়গাটির নাম অনুযায়ীই তাঁর ওই পদবি হয়েছিল। তাঁর সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সমাধিস্থলটির পুনর্গঠন করা হয়। চার বছর বয়সে তিনি গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পরে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। আবার এরই পরিণতিতে তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে আবু-আল-আলা বাগদাদে যান, যেখানে ১ বছর ৭ মাস কাটান এবং সেখানেই তিনি ইখওয়ান আল-সাফা এবং অন্যান্য ভারতীয়

বংশজাত দার্শনিকদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বাড়ি ফিরে আসার পথে তিনি নিরামিষাশী হয়ে যান এবং নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেন। তার পরের দিককার রচনা বিশেষত লুজুমিয়াত[৪৪] ও রিসালাত আল-গুফরান[৪৫] (ক্ষমা সম্পর্কিত প্রবন্ধ) থেকে জানা যায় যে, যুক্তির ভিত্তিতে তিনি তাঁর জীবন পরিচালনা করতেন এবং নৈরাশ্যবাদী সন্দেহপ্রবণতাকে তিনি তাঁর দর্শন বলে গ্রহণ করেছিলেন। দাবি করা হয় যে, তাঁর রচিত রিসালা-র দ্বারাই দান্তে তাঁর ডিভাইন কমেডি[৪৬] রচনার ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চতুষ্পদি শ্লোকগুলি[৪৭] আংশিকভাবে ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। সিরিয়ার এই কবি ও পারস্যের কবি উমার আল-খইয়ামের মধ্যে বার বার তুলনা টানা হয়। উমার খইয়াম তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পরে মারা যান এবং তিনিও তাঁর এই পূর্বসূরির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আল-মুতানাব্বি ও আল-মাআররি-র পরই আরবের কবিতার মহান যুগ শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোন আরব কবিই স্থানীয়ভাবে খ্যাতিলাভ করা ছাড়া তেমন কোন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি।

● রোমানদের দেশ আক্রমণ

উত্তর সিরিয়ায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার পর 'হামদানিয় বাজবংশের তরবারিটি' অর্থাৎ এই বংশের প্রতিনিধি ৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে শুরু করে প্রতি বছর এশিয়া মাইনরে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। এর ২০ বছর পর তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এমন কোন বছর যায়নি যে বছরে তিনি গ্রিকদের[৪৮] সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। শেষ পর্যন্ত সঈফের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। তিনি মারআশ ও কয়েকটি সীমান্তবর্তী শহর দখল করেন। কিন্তু ভবিষ্যতের দুই সম্রাট নাইসফোরাস ফোকাস ও জন টিমিসেসের[৪৯] অসাধারণ নেতৃত্বে বাইজান্টিয়ামের সৌভাগ্য ফিরে আসে। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নাইসফোরাস শুধুমাত্র দুর্গটি বাদ দিয়ে রাজধানী আলেপ্পো দখল করেন। ১০০০০ যুবক ও সমস্ত বন্দিদের হত্যা করেন এবং সঈফ-আল-দাওলার প্রাসাদটি ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এর আট বা ন'দিন পরেই তিনি অবসর নেন।[৫০] তিনি সম্রাট হবার পর (৯৬৩-৬৯ খ্রিঃ) তাঁর সৈন্যরা আরবদের কাছ থেকে সাইপ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং সিলিসিয়া[৫১] দখল করে ছিল। আর এইভাবেই সিরিয়া যাবার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে যায়। তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে তার সৈন্যদল, দীর্ঘদিন ধরে উর্ধ্বতন যাজক, সাধু ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শহর এবং বাইজান্টিয়ামের ধর্মসভা বলে পরিচিত অ্যান্টিয়োক শহরটি দখল করে নেয়। ৯৬৯ খ্রিঃ থেকে ১০৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত শহরটি বাইজান্টাইনদের দখলেই ছিল। অ্যান্টিয়োক দখলের পরই নাইসফোরাসের জেনারেল আলেপ্পোতে প্রবেশ করে এবং সঈফের পুত্র ও উত্তরসূরি সাআদ-আল-দাওলার (৯৬৭-৯১ খ্রিঃ) কাছ থেকে একটি অবমাননাকর চুক্তি[৫২] জোর করে আদায় করে নেয়। সম্রাট জন টিমিসেস (৯৬৯-৭৬ খ্রিঃ) সিলিসিয়া ও উত্তর সিরিয়ায় তাঁর বিজয়কে দীর্ঘস্থায়ী ও সুদৃঢ় করার নীতি গ্রহণ করেন এবং জেরুসালেমকে মুক্ত করার জন্য তাঁর চূড়ান্ত অভিযান শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অ্যান্টিয়োক থেকে

যথার্থই একটি ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন। দামাস্কাসে পৌঁছান, কিন্তু প্যালেস্টাইনের খুব ভিতরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে হামদানিদের চাচাতো ভাই ও নাসিবিনের অধিবাসী অবাধ্য বানু-হাবিব ১২০০০ মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে চড়া করের প্রতিবাদে দেশ ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং বাইজান্টাইনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলিম দেশ[২৫] আক্রমণে অংশ নেন। টিমিসেসের উত্তরসূরী ছিলেন দ্বিতীয় বেসিল। উত্তর আফ্রিকার আরবরা তাঁকে কিছু অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিল। এই আরবরা তখন সিসিলি ও কিছু এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ শাসন করতো। শেষ পর্যন্ত মিশরের ফাতিমিয়দের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সিরিয়াকে রক্ষা করার জন্য বেসিল যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি ফাতিমিয় রাজবংশের আল-হাকিমের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং তারপর আর কোন গুরুতর সংঘর্ষ ঘটেনি। নাইসফোরাস ও টিমিসেসের মতো দ্বিতীয় বেসিলের প্রচেষ্টায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানা ইউফ্রেটিস ও উত্তর সিরিয়ার প্রাণকেন্দ্র[২৬] পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু তার জন্য মূল্যস্বরূপ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে হয়েছিল। তবুও একথা সত্য সে তাঁদের আমলেই প্রাচ্যের মুসলিমদের[২৭] সঙ্গে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের সবচেয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

● টীকা ●

১. ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড ৪৮৮ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খন্ড, ১২-১৪ পাতা; ইবন-ইয্হারি, বায়ান, ১ম খন্ড ৭২ ও পরের পাতা; ২১৭ ও পরের পাতা; অনুবাদ, ই. ফাগনান, ১ম খণ্ড, (অ্যালজিয়ার, ১৯০১), ৯৬ ও পরের পাতা, ৩০৩ ও পরের পাতা।

২. স্ট্যানলি ল্যান-পুল-এর দি মোহামেডান ডাইন্যাস্টিজ (লন্ডন, ১৮৯৩, ১৯২৫-এ পুনর্মুদ্রিত), ৩৫ পাতা; ই দা জামবাউর, ম্যানুয়েল দা জিনিয়োলজি এট দা ক্রোনোলজি পোর এল' হিস্টোরি দা এল' ইসলাম (হ্যানোভার, ১৯২৭), ৬৫ পাতা দেখুন।

৩. শহরটি তৈরি করেছিলেন ইদ্রিস। ইবন-আবি-জার (আল-ফ্যাসি), রাওয আল-কিরতাস ফি আখবার মুলুক আল-মাগরিব, সম্পাদনা : জে এইচ টর্নবার্গ (উপসালা, ১৮৪৩), ১৫ পাতা; অনু' টর্নবার্গ, অ্যানালস রিগাম মরিটানিয়া (উপসালা, ১৮৪৫), ২১ ও পরের পাতা।

৪. ইবন-আবি-জার, ৫৬-৫৭ পাতা।

৫. ইবন-আল-আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, ১০৬ ও পরের পাতা; ইবন-ইয্হারি, ১ম খণ্ড, ৮৩ পাতা।

৬. ইবন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৫ ও পরের পাতা দেখুন; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮-২০৪ পাতা।

৭. ডি জি ক্যাম্পোরোগলাস, "দি সারাসেনস ইন এথেন্স", সোস্যাল সায়েন্স অ্যাবস্ট্রাক্টস, ২য় খণ্ড, (১৯৩০), ২৭৩ নং; জি সার্টেরিউ, "অ্যারাবিক রিমেনস ইন এথেন্স ইন বাইজানটাইন টাইমস", ঐ, ২৩৬০ নং।

৮. অন্যান্য আগলাবিয়দের জন্য ল্যান-পুল, ৩৭ পাতা; জামবাউর, ৬৭-৬৮ পাতা দেখুন।

৯. ইবন-ইয্হারি, ১ম খণ্ড, ১৪২-৪৬ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ২০৫-২০৭ পাতা; ইবন-আবি-জার, ৬১ পাতা।

১০. ইবন-খালদুন, ৩য় খণ্ড, ২৯৫ পাতা; ৪র্থ খণ্ড, ২৯৭ পাতা।

১১. ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৬১৫ ও পরের পাতা; তাবারী, ৩য় খণ্ড ১৬৯৭ পাতা।

১২. সিএফ কিনদি-তে তালিকাটি দেখুন, সম্পাদনা : গেস্ট, ৬-২১২ পাতা; সুয়ুতি, হুসন, ২য় খণ্ড, ২-১০ পাতা; দ্য জামবাউর, ২৫-২৭ পাতা।

১৩. ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড ৬২৪ পাতা।

১৪. ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ৩০০-৩০১ পাতা; কিনদি, ২১৯ ও পরের পাতা।

১৫. ইয়াকুত, ৩য় খণ্ড, ৭০৭-০৮ পাতা।

১৬. মাকরিজি, সম্পাদনা : উইয়েট, ১ম খণ্ড, ২৪৭-৫০ পাতা।

১৭. মাকরিজি (বুলাক), ১ম খণ্ড, ৩১৩ ও পরের পাতা।

১৮. ইবন-তাগরি-বিরদি, আল-নুজুম আল-জাহিরা ফী মুলুক মিস্র অ-আল-কাহিরা, সম্পাদনা : টি জি জে জুনবোল, ২য় খণ্ড, (লিডেন, ১৮৫৫), ১১ পাতা; কিনদি, ২১৬ পাতা।

১৯. ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড ৯৭ পাতা; ইবন-তাগরি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ৮ পাতা।

২০. এই মসজিদ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল বর্ণনা দেওয়া আছে ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে লেখা মাকরিজিতে (বুলাক), ২য় খণ্ড, ২৬৫ ও পরের পাতা; সুয়ুতি ব্যবহার করেছেন, হুসন, ২য় খণ্ড ১৫২-৫৪ পাতা।

২১. ১৭ টি পুত্র ও ৩৩টি শিশুর একজন; ইবন-তাগরি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ২১ পাতা; সুয়ুতি, হুসন, ২য় খণ্ড, ১১ পাতা।

২২. ইবন-তাগ্রি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ৫৭-৫৮ পাতা; মাকরিজি, ১ম খণ্ড, ৩১৬-১৭ পাতা।

২৩. ইবন-তাগ্রি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ৫৬ পাতা।

২৪. ঐ, ৫৬-৫৭ পাতা।

২৫. ঐ, ৬০-৬১ পাতা।

২৬. ঐ, ৫৮-৫৯ পাতা; মাকরিজি, ১ম খণ্ড, ৩১৭ পাতা। ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড

২৭. ৩১০ পাতা; তুলনীয় : ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ৩০৭-০৮ পাতা; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ২১৪৫-৪৬ পাতা; ইবন-তাগরি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ৫৫ পাতা।

২৮. তানুখি, জামি আল-তাওয়ারিখ, সম্পাদনা : ডি. এস মার্গোলিউথ, ১ম খণ্ড (লণ্ডন, ১৯২১), ২৬১ পাতা।

২৯. সূরাহ : ৯৪ . ৪৭।

৩০. কিনদি, ২৪৭-৪৮ পাতা, তুলুনিয় বংশের পরিচয় সংক্রান্ত একটি তালিকা সঙ্গে দেওয়া হল :

(১) আহমদ ইবন-তুলুন (৮৬৮-৮৪ খ্রিঃ)

(২) খুমারাওয়াইহ্ (৮৮৪-৯৫ খ্রিঃ) (৫) শাইবান (৯০৪-০৫ খ্রিঃ)

(৩) জয়েস (৮৯৫-৯৬ খ্রিঃ) (৪) হারুন (৮৯৬-৯০৪ খ্রিঃ) কাতার-আল-নাদা

৩১. ইবন-সাঈদ, আল-মুগরিব ফী হুলা আল-মাগরিব, সম্পাদনা : কে এল তলকভিস্ট (লিডেন, ১৮৯৯), ৫ পাতা।

৩২. কিনদি, ২০৮ পাতা; মিসকাওয়াইহ্, ১ম খণ্ড, ৩৩২ পাতা, নোট; ইবন-তাগরি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ২৭০ পাতা।

৩৩. ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড ১৮৫-৮৯ পাতা, ইবন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৪-১৫ পাতা; ইবন-তাগরি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ২৭০ পাতা।

৩৪. দিওয়ান, সম্পাদনা : ফ্রে দিয়েতেরিসি (বার্লিন, ১৮৬১) ৬২৩-৭৩২ পাতা; ইবন-সাঈদ, ৪৫-৪৬ পাতা।

৩৫.

তুগ্‌জ

(১) মুহাম্মাদ আল-ইখশিদ (৯৩৫-৪৬)

(২) আবু-আল-কাসিম উনুযূর (৯৪৬-৬০) (৩) আলী (৯৬০-৬৬) (৪) আবু-আল-মিসক কাফুর* (৯৬৬-৬৮)

(৫) আহমদ (৯৬৮-৬৯)

নক্ষত্রটি মালিক-ক্রীতদাস সম্পর্কের ঈঙ্গিত দেয়।

'উনুজুর' বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। তুলনীয় ইবন-তাগরি-বিরদি, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পাতা; কিনদি, ২৯৪ পাতা; ইবন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৩৪৩ পাতা; মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড, ১০৪ পাতা। এবং ওস্টেনফেল্ড-এর দাই স্টাটথ্যাল্টার ভন এজিপটেন জুর জাইট দার কালিফেন, পার্ট ৪ (গটিনজেন, ১৮৭৬), ৩৭ পাতা।

৩৬. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ২১৪১ পাতা।

৩৭. ১. সঈফ-আল-দাওলা আবু-আল-হাসান আলি (৯৪৪-৬৭)

২. সা'দ-আল-দাওলা আবু-আল-মাআলি শরিফ (৯৬৭-৯১)

৩. সাঈদ-আল-দাওলা আবু-আল-ফাযাইল সাঈদ (৯৯১-১০০১)

৪.ক আবু-আল-হাসান আলি (১০০১-০৩) ৪.খ আবু-আল-মাআলি শরিফ (১০০১-০৩)

৩৮. ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৬৬-৬৮ পাতা; তানুখি ১৩৪ পাতা।

৩৯. খুতাব, বিভিন্ন বেইরুট ও কায়রো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৪০. তার লেখা দিওয়ান প্রথমে সম্পাদনা করেন দিয়েতেরেসি ও পরে নাসিফ আল-ইয়াজিজি (বেইরুট, ১৮৮২)। তাঁর মৃত্যুর শততম বর্ষ (৩৫৪ হিজরী সন) সিরিয়া লেবানন ও অন্যত্র ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে পালিত হয়।

৪১. ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৬৩ পাতা। এ ব্যাপারে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার জন্য সাআলিবি, ইয়াতিমা, ১ম খণ্ড, ৭৮-১৬৪ পাতা দেখুন।

৪২. সঠিক উচ্চারণ আবু-আল-তায়্যিব আহমদ ইবন-হুসাইন।

৪৩. দিওয়ান, সম্পাদনা : নাখলা কালফত (বেইরুট, ১৯০০); আংশিক অনুবাদ, রুডলফ দোফাক, আবু ফিরাস : আইন আরবিশের দিচতার অ্যান্ড হেল্ড (লিডেন, ১৮৯৫)। সাআলিবি, ১ম খণ্ড, ২২-৬২ পাতা দেখুন।

৪৪. আল-লুজুমিয়াত আও লুজুম মা লা ইয়ালজাম, সম্পাদনা : আজিজ জান্দ, ২খণ্ডে (কায়রো, ১৮৯১, ১৮৯৫); অনুবাদ (আংশিক) আমিন রিহানি (নিউইয়র্ক, ১৯১৮)।

৪৫. সম্পাদনা : কামিল কিলানি, ২ ভাগ (কায়রো ১৯২৩); জার্নাল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির (১৯০০), ৬৩৭-৭২০; (১৯০২) ৭৫-১০১, ৩৩৭-৬২, ৮১৩-৪৭ পাতায় আর এ নিকলসনের আংশিক অনুবাদ দেখুন।

৪৬. এসিন, ইসলাম অ্যান্ড দি ডিভাইন কমেডি, অনুবাদ : স্যান্ডারল্যান্ড।

৪৭. রুবাইয়াত, চার লাইনের পঙ্‌ক্তি যাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছন্দ পারসীয় রচনারীতি অবলম্বনে গঠিত।

৪৮. ইয়াহিয়া ইবন-সাঈদ আল-আনতাকি, "তারিখ", সম্পাদনা ও অনুবাদ (ফরাসি) আই ক্রাচকোভস্কি ও এ ভ্যাসিলিয়েভ, প্যাট্রোলজিয়া ওরিয়েন্ট্যালিস, ১৮ খণ্ড, ৭৬৮ ও পরের পাতা।

৪৯. আরব কাহিনীর "ইবন-সামশাকিক"; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৪০৭ পাতা; আবু-আল-ফিদা, ২য় খণ্ড, ১১০ পাতা, ১.২০।

৫০. মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড, ১০২-০৪ পাতা; ইয়াহিয়া, ৭৮৬-৮৭ পাতা।

৫১. ইয়াকুত, ৩য় খণ্ড, ৫২৭ পাতা।

৫২. ইয়াহিয়া, ৮২৩-২৪ পাতা।

৫৩. ইবন-হাওকাল; ১৪০-৪১ পাতা।

৫৪. ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৪৪০-৪১ পাতা।

৫৫. ভ্যাসিলিয়েভ, বাইজান্টাইন এম্পায়ার, ১ম খণ্ড, ৩৮১ পাতা।

॥ অধ্যায় ৩২ ॥

প্রাচ্যের কয়েকটি রাজবংশ

আরব দেশে উদ্ভূত ছোট ছোট রাজবংশ পশ্চিমের খলিফা সাম্রাজ্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করেছিল। প্রাচ্যেও অন্যান্যরা, বিশেষত তুর্কি ও পারসীয়রা সেই একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিল।

● ১. তাহিরিদ রাজবংশ

বাগদাদের পূর্বদিকে আপাত অর্থে প্রায়-স্বাধীন রাজ্য প্রথম তৈরি করেছিলেন আল-মামূনের একদা বিশ্বস্ত জেনারেল তাহির ইবন-আল-হুসাইন[১] তিনি ছিলেন খুরাসানের অধিবাসী। আল-আমীনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রভুর সেনাদলকে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বিজয় অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধে একচক্ষু বিশিষ্ট তাহির এত নিপুণভাবে দু'হাতে তরবারি চালনা করেছিলেন যে, আল-মামূন[২] তাঁর নাম দিয়েছিলেন যু-আল-ইয়ামিনাইন (সব্যসাচী)। আর এক কবি তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন 'একচক্ষুহীন ও অতিরিক্ত একটি ডানহাতবিশিষ্ট'[৩] যোদ্ধা। এক পারসীয় ক্রীতদাসের বংশধর তাহিরকে ৮২০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের পূর্বদিকের সমস্ত জমির মালিকানা দান করে আল-মামূন পুরস্কৃত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি তাঁকে খুরাসানে তাঁর ক্ষমতার মধ্যমণি করেছিলেন। এই ঘটনার দু'বছর পরে ঠিক তাঁর মৃত্যুর আগে রাজধানী মারওয়াতে শুক্রবারের প্রার্থনায়[৪] তাহির খলিফার নাম উল্লেখ করেননি। বাস্তবে খলিফার সামন্তপ্রজা হলেও তাহিরের উত্তরসূরিরা তাঁদের রাজত্বের সীমানা প্রায় ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। পরে তাঁদের শাসনকেন্দ্রটি তাঁরা নাইসাবুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে তাঁরা ৮৭২ খ্রিস্টাব্দ[৫] পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন, তারপর তাঁদের পরাজিত করে সাফারিয়রা ক্ষমতায় বসেন।

● ২. সাফ্ফারিয় রাজবংশ

সিজিস্থানে উদ্ভূত সাফারিয় রাজবংশ পারস্যে ৪১বছর (৮৬৭-৯০৮ খ্রিঃ) রাজত্ব করেছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক ইয়াকুব ইবন-আল-লাইস আল-সাফ্ফার (৮৬৭-৭৮ খ্রিঃ)। পেশায় আল-সাফ্ফার (তাম্রকার) ছিলেন এক তাম্রকার, কিন্তু বৃত্তিতে ছিলেন এক দস্যু। আইনের চোখে নিষিদ্ধ একটি গোষ্ঠীর দলপতি রূপে তাঁর বীরত্বপূর্ণ ও কুশলী আচরণ

সিজিস্তানে যিনি খলিফার গর্ভণর ছিলেন তাঁর সস্নেহ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। হয়েছিল। ফলে গভর্নর তাকে তার সেনাদলের নেতৃত্বে[৭] বসিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে আল-সাফ্‌ফার তাঁর উপকারীর উত্তরসূরি হয়েছিলেন এবং গোটা পারস্য ও ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলিকে তাঁর রাজত্বের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এমন কী বাগদাদে আল-মুতামিদের[৮] খলিফা সাম্রাজ্যও তাঁর রাজ্যজয়ের অভিযানে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। পরে সামানিয় রাজবংশ ক্ষমতাসীন হয় এবং সাফ্‌ফারিয় রাজত্বের[৭] এক বিরাট অংশ তাদের দখলে আসে।

● ৩. সামানিয় রাজবংশ

ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও পারস্যের (৮৭৪-৯৯৯ খ্রিঃ) সামানিয় বংশের মানুষেরা ছিলেন বলখ-এর এক মহান জরথুস্টবাদী সামান-এর বংশধর। সামানিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামান-এর এক পৌত্র নসর ইবন-আহমদ (৮৭৪-৯২ খ্রিঃ)। কিন্তু নসরের ভাই ইসমাইল (৮৯২-৯০৭ খ্রিঃ) এই রাজবংশের অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনিই সাফ্‌ফারিয় রাজবংশের[৮] কাছ থেকে খুরাসান ছিনিয়ে নেন। সামানিয়রা ছিল মূলত তাহিরিদ রাজবংশের অধীন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত উপ-গভর্নর। কিন্তু এদের চতুর্থ বংশধর দ্বিতীয় নসর ইবন-আহমদেব[৯] (৯১৩-৪৩ খ্রিঃ) নেতৃত্বে সামানিয়রা তাদের রাজত্বের সীমানা ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও খুরাসান থেকে বাড়িয়ে সিজিস্তান, কারমান, জুরজান, আল-রায়ি ও তাবারিস্তান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিল। বাইরের দিক থেকে তাদের আব্বাসীয় রাজবংশের অনুগত বলে মনে হলেও বাস্তবে তারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাগদাদের খলিফার চোখে এরা ছিল আমির (গভর্নর) বা এমন কী আমিল (কর আদায়কারী), কিন্তু নিজেদের শাসনাধীন এলাকার মধ্যে এদের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ।

সামানিয় রাজবংশের আমলেই টান্সঅক্সিয়ানা পুরোপুরি মুসলিম শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে তাদের রাজধানী বুখারা ও প্রধান শহর সমরকন্দ গৌরবের দিক থেকে বাগদাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সামানিয় রাজবংশের আমলে আরবী ও পারসী মনীষাকে সযত্নে রক্ষা করা ও বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। এই রাজবংশের দ্বিতীয় শাসকের এক ভাইপো এবং সিজিস্তানের অধিবাসী ও সামানিয় রাজপুত্র আবু-সালিহ্ মানসুর ইবন-ইসহাকের নামেই আল-মানসুরি নামক চিকিৎসাবিদ্যার ওপর লেখা তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আল-রাজি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকের সম্মানেই তিনি একাজটি করেছিলেন। আবার সামানিয় শাসক দ্বিতীয় নুহ (৯৭৬-৯৭ খ্রিঃ)-র[১০] নির্দেশেই বুখারায় বসবাসকারী ও ২০ বছরেরও কম বয়সের কিশোর ইবন-সিনাকে সমৃদ্ধ রাজকীয় গ্রন্থাগারে[১১] প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করেই তিনি অপরিমেয় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। আর এই যুগেই আধুনিক পারসীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ফিরদৌসী (৯১৪-১০২০ খ্রিঃ) এই সময়েই তাঁর প্রথম কবিতাটি

লিখেছিলেন। আবার এই সময়েই প্রথম মনসুরের[১১] (৯৬১-৭৬ খ্রিঃ) উজির বালআমি, আল-তাবারী-র লেখা ইতিহাসের[১৩] এক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন। এভাবে উদ্ভূত পারসী ভাষার সর্বাধিক প্রাচীন গদ্য এখনও বিদ্যমান। মুসলিম বিজয়ের পর থেকেই পারসীয়রা তাদের সাহিত্য রচনায় আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন, কিন্তু এই লেখকদের মাধ্যমেই পারস্যের গৌরবময় মুসলিম সাহিত্যের অগ্রগতির সূচনা হয়।

ইরানের সুশিক্ষিত রাজবংশগুলির মধ্যে সামানিয়রা ছিল অন্যতম। কিন্তু ওই যুগে যে সমস্ত উপাদানগুলি অন্য রাজবংশগুলির ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছিল, তারাও সেগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। অশান্ত সামরিক অভিজাততন্ত্র ও পরনির্ভরশীল রাজতন্ত্রের স্বাভাবিক সমস্যাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি নতুন বিপদ, উত্তর দিকে তুর্কি যাযাবরদের থেকে উদ্ভূত সমস্যা। এমন কী যে সমস্ত তুর্কি ক্রীতদাসদের দিয়ে সামানিয়রা তাদের রাজদরবার পূর্ণ করেছিল, রাজ্যের শাসনক্ষমতা ক্রমশ তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। অক্সাসের দক্ষিণ দিকে সামানিয় রাজবংশের শাসনাধীন অঞ্চল ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে গজনবীদের হাতে চলে গিয়েছিল। একজন তুর্কি ক্রীতদাসের নেতৃত্বেই গজনবীরা শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল। অক্সাস নদীর উত্তরাঞ্চল দখল করেছিলেন তুর্কিস্তানের তথাকথিত ইলেক (ইলাক) খান। তিনি ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বুখারা দখল করেন ও তার সাত বছর পরে পতনোন্মুখ সামানিয় রাজবংশের ওপর শেষ আঘাত হেনে তাদের শাসনের ইতি টানেন। শেষবারের মতো না হলেও এই প্রথম মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা ইসলামি দুনিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অগ্রভাগে নিজেদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। চতুর্থ মুসলিম শতাব্দীতে ইসলামি দুনিয়ার সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইরান ও তুরস্কের শাসকদের লড়াই আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতির পটভূমি হিসাবে কাজ করেছিল। এরপর থেকে বাগদাদের খলিফার অধিকাংশ ক্ষমতা করায়ত্ত করা, বা বাস্তবে বসপোরাসের ওপরে বাগদাদে তাদের নিজস্ব অটোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করার আগে পর্যন্ত তারা বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমাগত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল।

● ৪. গজনবী রাজবংশ

তুর্কি ক্রীতদাসদের মধ্যে জনৈক আলপতিগিনকে সামানিয়রা তাদের রাজ-প্রশাসনের উঁচু পদে বসিয়েছিলেন। একজন সাধারণ দেহরক্ষী হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর নেতা[১৪] হন। তারপর ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খুরাসানের গভর্নর পদে উন্নীত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ক্ষমতাসীন নতুন সামানিয় রাজার আনুগত্য হারান এবং তাকে রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের দেশীয় শাসকদের পরাস্ত করে তিনি গজনী দখল করেন এবং সেখানে একটি স্বাধীন অঞ্চল[১৫] গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এটাই আফগানিস্তান (৯৬২-১১৮৬ খ্রিঃ) ও পাঞ্জাবের গজনবী

সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। অবশ্য আলপতিগিনের জামাই ও এক ক্রীতদাস সুবুক্তিগিনকেই (৯৭৬-৯৭ খ্রিঃ) গজনবী রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পরবর্তীকালে যে ১৬ জন গজনবী তার উত্তরসূরি হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর পর্যায়ক্রমিক বংশধর। ভারতের পেশোয়ার ও পারস্যের খুরাসানকে অন্তর্ভুক্ত করে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, সামানিয় রাজবংশের অধীনে থেকেই তিনি প্রথম খুরাসান জয় করেছিলেন।

● গজনীর মাহমুদ

সুবুক্তিগিনের ছেলে মাহমুদ (৯৯৯-১০৩০ খ্রিঃ) ছিলেন এই রাজবংশের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তার রাজধানী গজনী একটি উঁচু মালভূমির ওপরে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল দেখা যেত, কাবুলেব উপত্যকার মধ্য দিয়ে সহজেই সেখানে প্রবেশ করা যেত। তার রাজধানীর এই সুবিধাজনক অবস্থান বেশ কয়েকটি পূর্বমুখী অভিযান চালাতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। ১০০১ ও ১০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাহ্‌মুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং এর মধ্যে দিয়ে রাজধানী লাহোর-সহ পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশের অংশবিশেষ[১৬] দখল করেছিলেন। এর ফলে পাঞ্জাবে স্থায়ীভাবে মুসলিম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত অভিযানের মধ্য দিয়ে হিন্দু মন্দির থেকে মাহ্‌মুদ প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ লুঠ করেছিলেন এবং তার সমসাময়িক মুসলিম রাজাদের মধ্যে মূর্তিভঙ্গকারী ও প্রতিমা পূজাবিরোধী রক্ষণশীল ইসলাম ধর্মের চ্যাম্পিয়ন রূপে এক ঈর্ষণীয় মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মুসলিম ধর্মে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এই কারণে ১০০১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাকে আল-গাজি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। মুসলিম ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করেছিলেন।

মাহ্‌মুদ তাঁর রাজত্বের পশ্চিম সীমানাও সম্প্রসারিত করেছিলেন। সেই সময়ে খলিফা পদটি ছিল শী'আহ্‌পন্থি বুয়াইহিদদের নিয়ন্ত্রণে। মাহ্‌মুদ তাঁদের কাছ থেকে ইসবাহান ও আল-রায়ি সহ পারসীয় ইরাক কেড়ে নেন। সুন্নিপন্থি মাহ্‌মুদ তাঁর আগ্রাসনের সময় থেকেই খলিফা আল-কাদিরের (৯১১-১০৩১ খ্রিঃ)[১৭] সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই মাহ্‌মুদ ইয়ামিন-আল-দাওলা (রাজ্যের ডান হাত)[১৮] উপাধি পেয়েছিলেন। নিজেদের দিক থেকে তিনি এবং তাঁর পরবর্তী কয়েকজন উত্তরসূরি তাঁদের মুদ্রায় আমির (গভর্নর) বা সায়্যিদ (প্রধান) উপাধি গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। যদিও মুসলিমদের মধ্যে মাহ্‌মুদই প্রথম সুলতান[১৯] উপাধি নিয়েছিলেন। সেই সময়কার মুদ্রালিপি থেকে জানা যায় যে, সালজুক শাসকেরাই[২০] আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম এই উপাধিটি ব্যবহার করতেন। পূর্বে উত্তর ভারত এবং পশ্চিমে পারসীয় ইরাক ছাড়াও গোটা খুরাসান, রাজধানী বলখ-সহ তুখারিস্তান, উত্তরে ট্রান্সঅক্সিয়ানার কিছু অংশ ও দক্ষিণে সিজিস্তান[২১] তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুন্দর সুন্দর

বাড়ি[১১] দিয়ে তিনি তাঁর রাজধানীটিকে সাজিয়েছিলেন। একটি বিরাট শিক্ষায়তন তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর অতি দানশীল রাজদরবারটিকে কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রধান আশ্রয়ে পরিণত করেছিলেন। আরব ঐতিহাসিক আল-উতবি[১১] (১০৩৬ খ্রিঃ), বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিশিষ্ট লেখক আল-বিরুনী, বিখ্যাত পারসীয় কবি ফিরদৌসী ছিলেন তাঁর সাহিত্যসভার উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপে এই কবির সহস্রতম জন্মবর্ষ পালিত হয়েছিল। ফিরদৌসী তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা' উৎসর্গ করেছিলেন মাহমুদকে। কিন্তু এই মহাকাব্যের ৬০০০০ কবিতার চরণ রচনা করে তিনি ৬০০০০ দিনারের পরিবর্তে পেয়েছিলেন মাত্র ৬০০০০ দিরহাম। এর জন্য কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষককে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন এবং প্রাণ রক্ষা করতে শেষপর্যন্ত তাঁকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

ইসলামি দুনিয়ায় চূড়ান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইরানের শাসকদের সঙ্গে তুর্কি শাসকদের যে লড়াই চলছিল, গজনবী রাজবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে সেই লড়াইয়ে তুর্কিদের প্রথম বিজয় সূচিত হয়েছিল। তবুও সামানিয় বা সাফ্‌ফারিয় রাজত্বের তুলনায় গজনবীদের শাসনে মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। অস্ত্রের জোরেই এই রাজত্ব টিকে ছিল এবং যে মুহূর্তে শাসকের দৃঢ়মুষ্টি আলগা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাজত্বের পতন ঘটেছিল। মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর সেই একই ঘটনা ঘটেছিল। এইভাবেই পূর্বের রাজ্যগুলি পার্বত্য উচ্চভূমিতে অবস্থিত রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তারই পরিণতিতে ভারতবর্ষে অগণিত স্বাধীন মুসলিম রাজবংশের আবির্ভাব ঘটেছিল। উত্তরে তুর্কিস্তানের খানেরা এবং পশ্চিমে পারস্যের সালজুকরা টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল গজনবী রাজত্ব। আর মধ্যভাগে আফগানিস্তানের ঘুরিরা শেষ আঘাত হেনেছিল এবং ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে শেষ গজনবী রাজ্য তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

● রাজরক্ষী বাহিনী

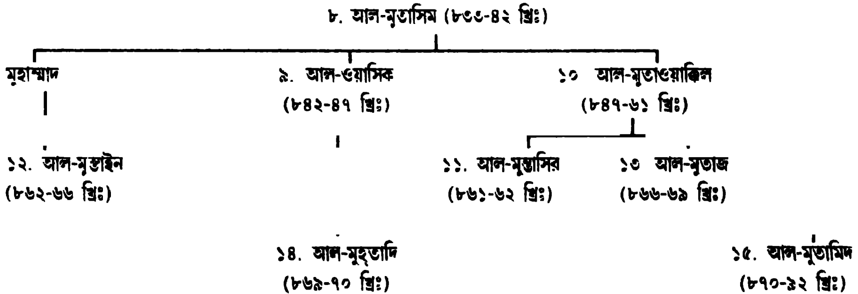
যখন আব্বাসীয় ঈগলের ডানা দুটি উভয় প্রান্তে বাঁধা ছিল, ঠিক সেই সময় পারস্যের তুর্কিদের হাতে ধরা একটি ছুরি তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল। শী'আহ্‌পন্থি পারসীয় বুয়াইহিদ এবং তারপরে সুন্নিপন্থি তুর্কি সালজুকদের আমলে খলিফার হাতে রাজধানী ছাড়া আর কোন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। রাজধানীতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছিল। একটি বিশৃঙ্খল রাজ রক্ষীবাহিনীর উদ্ভব ও তারপরে নিগ্রো ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল এবং পরিণতিতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পথ প্রশস্ত হয়।

হারূনের এক তুর্কি ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান এবং অষ্টম আব্বাসি খলিফা আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রিঃ) প্রথম তার নিজের জন্য ট্রান্সঅক্সিয়ানার তুর্কিদের নিয়ে একটি দেহরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীতে দেহরক্ষীর সংখ্যা ছিল চার হাজার।

খুরাসানের যে সৈন্যদের সাহায্যে আব্বাসীয়রা তাদের খলিফা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, তাদের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তারা তুর্কিদের নিয়ে দেহরক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছিল। কিন্তু প্রতি বছরে তুর্কি সৈন্য নিয়োগ করার ফলে তা খলিফা সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার পক্ষে আরও বড় বিপদ হয়ে উঠেছিল। আর এভাবেই আল-মানসুরের 'শান্তির নগরী' পরিণত হয়েছিল বিক্ষোভ-কবলিত অশান্ত নগরীতে। খলিফার সেনাবাহিনীর উদ্ধত ও অত্যাচারী আচরণের বিরুদ্ধে বাগদাদে স্থানীয় মানুষের বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে খলিফা ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শাসনকেন্দ্রটিকে টাইগ্রিস নদীর ৬০ মাইল উজানে অবস্থিত সামাররা-তে[১৪] সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আদতে অ্যাসিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও খলিফা জায়গাটির নাম দেন সুররা মান রাআ (যে দেখে সেই খুশি হয়)। পরিবর্তিত এই নামের মধ্য দিয়ে এই জায়গাটি আব্বাসীয় মুদ্রার টাঁকশালের নগর বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। অবশ্য সেই সময়ে কৌতুক করে বলা হত যে, নতুন নামের অর্থ হল 'যে এটিকে দেখে (সেখানে তুর্কিরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে বলে) সে-ই সন্তুষ্ট হয় (কারণ তাদের হাত থেকে বাগদাদ মুক্ত হয়েছে)।'

মূলত আল-মুতাসিম ও তাঁর ছেলে আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রিঃ) সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করে সামারারা-কে সাজিয়েছিলেন। ৫৬ বছর ধরে এটি তাঁদের রাজধানী ছিল (৮৩৬-৯২ খ্রিঃ) এবং এই দীর্ঘ সময়ে আটজন খলিফা তাঁদের রাজত্ব চালিয়েছিলেন। এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ আব্বাসীয় আমলের বিদ্যমান স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে সবচেয়ে মনোরম।[১৫]

সামাররা-র আব্বাসি খলিফাদের বংশবৃত্তান্ত সম্পর্কিত সারণি



রোমের প্রিটোরিয়ান সেনাবাহিনী ও তুর্কির জানিসারিদের মতো এই তুর্কি সেনাবাহিনীও খলিফা সাম্রাজ্যে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তবে তুর্কি সেনায় পূর্ণ এই সেনাবাহিনীর উদয় খলিফা সাম্রাজ্যের পতনেরও সূচনা করেছিল। খলিফা তাঁর নতুন রাজধানীতে তার সেনাদলের হাতে প্রায় বন্দিদশায় দিন কাটাতেন। তাঁর পুত্রের[১৬] প্ররোচনায় সেনারা ৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আল-মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করে। আর এটাই ছিল

এই ধরনের প্রথম হত্যাকাণ্ড। এরপর বেশ কয়েকটি এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং এই হত্যাকাণ্ডগুলির পরিণতিতেই ইতিমধ্যে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া আব্বাসীয় রাজত্ব অতি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়। অবক্ষয়ের যুগে আল-মুতাওয়াক্কিল ছিলেন প্রথম খলিফা। তারপর থেকেই প্রধানত তুর্কি সেনাদের ইচ্ছানুযায়ী খলিফা নির্বাচিত হত এবং ক্ষমতাচ্যুত হত। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রীতদাস জেনারেলদের নেতৃত্বে তুর্কি সেনারা ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য চেষ্টা চালাত। এই ক্রীতদাসদের ওপর প্রভাব ছিল বলে রাজদরবারের মহিলারা তাদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন এবং তার ফলে বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পেত। দুর্বল ও দোদুল্যমান আল-মুস্তাইন (৮৬২-৬৬ খ্রিঃ)-কে তার সৈন্যরা ঘেরাও করেছিল ও সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তারপর তাদেরই পরামর্শে তিনি বাগদাদে পালিয়ে যান এবং তাঁর ক্রীতদাসী মা দু'জন তুর্কি জেনারেলের সঙ্গে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি আল-মুতাজ (৮৬৬-৬৯ খ্রিঃ)-এর মা তাঁর খলিফা ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ৫০,০০০ দিনার দিতে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও মাটির নিচে একটি ঘরে তিনি প্রচুর পরিমাণ মণি-মাণিক্যের সঙ্গে ১,০০০,০০০ দিনার লুকিয়ে রেখেছিলেন। দুশো বছর ধরে টুকরো টুকরো প্রদেশে বিভক্ত হয়ে যাওয়া খলিফা সাম্রাজ্য ক্ষমতাহীন শাসকদের সিংহাসনে আরোহণ ও মৃত্যুর হিমশীতল কবরে অবতরণের এক বিভ্রান্তিকর ছবি তুলে ধরে। যে সমস্ত রাজ্যে একজন স্বাধীন গভর্নর দৃঢ় মূর্তিতে ক্ষমতার দণ্ড ধরেছিলেন, একমাত্র সেই সমস্ত রাজ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল।

● ক্রীতদাস বিদ্রোহ

এই সময়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও রক্তাক্ত ঘটনাগুলির অন্যতম হল জাঞ্জ ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ। এরা ছিল পূর্ব আফ্রিকা থেকে আগত নিগ্রো। ইউফ্রেটিসের নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত সোরার খনিতে কাজ করত। এদের নেতা (সাহিব আল-জাঞ্জ) ছিলেন আলি ইবন-মুহাম্মাদ এবং তিনি নিজে আরব বংশজাত বলে ভান করতেন। রাজধানীর বিক্ষুব্ধ অবস্থা এবং বিক্ষুব্ধ ও দুর্দশাগ্রস্ত খনিশ্রমিকদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে একজন 'আলীপন্থি' বলে দাবি করে ঘোষণা করলেন যে দিব্যদৃষ্টি ও জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে তাদের দুরবস্থা মোচনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। এই নতুন মুক্তিদূতের পতাকার নিচে একের পর এক ক্রীতদাসের দল সমবেত হতে থাকলে আরবদের মূল সংবাদদাতা আল-তাবারী তাকে 'দুবৃর্ত্ত' ও 'আল্লাহ্র শত্রু' বলে অ্যাখ্যা দিলেন। এই বিস্ময়কর বিদ্রোহ দমনের জন্য একের পর এক সেনাদল পাঠানো হতে লাগল। কিন্তু একাধিক খালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং পরিচিত ও অনুকূল জলাভূমিতে থাকার দরুন নিগ্রোরা তাদের পরাজিত করল এবং তাদের নেতার নতুন আদর্শ খারিজী তত্ত্ব অনুযায়ী নির্মমভাবে সমস্ত বন্দি ও যুদ্ধ করেনি এমন মানুষদেরও তরবারির আঘাতে হত্যা করল। আল-মুতামিদ (৮৭০-৯২ খ্রিঃ)-এর

রাজত্বের ১৪ বছর (৮৭০-৮৩ খ্রিঃ) ধরে ক্রীতদাসের এই বিদ্রোহ চলেছিল। কত মানুষ মারা গিয়েছিল তা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও সংখ্যাটা ৫ লক্ষেরও বেশিই হবে। এক-একটি যুদ্ধের পর নিহত মুসলিমদের সংখ্যা এত বেশি হত যে নিগ্রোরা তাদের ছিন্ন মাথাগুলি জড়ো করে খালের সাহায্যে আল-বসরায় পাঠিয়ে দিত যাতে সেখানে তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা তাদের শনাক্ত করতে পারে।[১১] অবস্থা এমন হয়েছিল যে আল-বসরা, ওয়াসিত, আল-আহওয়াজ এবং আল-উবুল্লা মানুষহীন জনপদে পরিণত হয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত খলিফার ভাই আল-মুয়াফ্‌ফাক ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, ততক্ষণ এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। তাদের নেতার নির্মিত আল-মুখতারা দুর্গটি ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি আত্মহত্যা করেন। "এইভাবেই পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসে লিখিত[১২] সবচেয়ে রক্তাক্ত ও ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহের একটির সমাপ্তি ঘটে।" আর এই যুদ্ধের সময়েই ইবন-তুলুনের শাসনাধীন খলিফা সাম্রাজ্য থেকে প্রথম দিককার অন্যতম সুন্দর শহর মিশর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

● আমির আল-উমারার ক্ষমতায় আরোহণ

প্রায় ৫০ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে সামাররা তাদের রাজধানী হিসেবে থাকার পর আল-মুতাযিদের (৮৯২-৯০২) আমলে বাগদাদ-ই আবার রাজধানীতে পরিণত হয়। এর ফলে গোটা দৃশ্যপটটি পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ঘটনাবলি একই ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। প্রকৃত শাসনক্ষমতা খলিফাদের হাত থেকে সেনাবাহিনীর হাতে চলে যেতে থাকে। এই সময়েই আবদুল্লা ইবন-আল-মু'তাজের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর দ্বিতীয় চাচাতো ভাই আল-মুকতাদিরের সঙ্গে খলিফার পদ দখলের লড়াইয়ে জয়লাভ করে তিনি আল-মুর্তাজা নামে মাত্র একদিনের জন্য (১৭ ডিসেম্বর, ৯০৮ খ্রিঃ) খলিফার আসনে বসেছিলেন। তারপরই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করা হয়। একদিনের এই খলিফা রাজনীতিকের থেকেও বেশি মাত্রায় একজন কবি ও রসসাহিত্যিক ছিলেন। আল-ফিহ্‌রিস্ত[১৩] ও ইবন-খাল্লিকানে[১৪] উল্লিখিত তাঁর রচনাগুলির অধিকাংশেরই আর কোন অস্তিত্ব নেই।

আল-মুকতাদিরের ২৪ বছরের রাজত্বে (৯০৮-৩২ খ্রিঃ) ১৩ জন উজিরের উত্থান-পতন ঘটেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল।[১৫] বিভ্রান্তি বাড়ানোর জন্যই খলিফার তুর্কি মা নিয়মিত রাজ্য প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতেন। ইবন-মুকলা ছিলেন এই সমস্ত উজিরদের একজন। তিনি ছিলেন আরবী হস্তাক্ষর বিদ্যার[১৬] একজন প্রতিষ্ঠাতা। আর একজন উজির ছিলেন আলী ইবন-ঈসা। দুর্নীতি ও অত্যাচারে পূর্ণ নির্মম ও নিষ্ঠুর এক রাজত্বে তিনি তাঁর চরিত্রের সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। আলীর দুটি উজিরতন্ত্র পাঁচবছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রাজকোষকে স্ফীত করে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজ্য পরিচালনায় তিনি দক্ষতার যে নজির সৃষ্টি

করেছিলেন তার কোন সমকক্ষও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। আল-মুকতাদির যখন খলিফা ছিলেন, সেই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমিয় বংশের উবাইদুল্লাহ্ (৯০৯ খ্রিঃ) এবং স্পেনে উমাইয়া বংশের তৃতীয় আবদ-আল-রাহমান (৯২৯) খলিফার পদ ও প্রতীক ধারণ করেছিলেন। এর ফলে একই সময়ে তিনজন স্বীকৃত ও প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফার অবস্থান মুসলিম দুনিয়ায় এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। দুর্বল ও অক্ষম আল-মুকতাদির (আক্ষরিক অর্থে শক্তিশালী ঈশ্বরের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে) রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার দেহরক্ষী দলের প্রধান মুনিস আল-মুজাফ্ফর -এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মুনিস আল-মুজাফ্ফর ছিলেন হারেমের প্রহরী এবং খলিফা তাকে আমির আল-উমারা (সর্বাধিনায়ক) বলে একটি নতুন উপাধি দান করেছিলেন। মুনিস শীঘ্রই আসল শাসকে পরিণত হলেন। তিনি আল-মুকতাদিরকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং তার জায়গায় সৎভাই আল-কাহিরকে নিয়োগ করলেন। অল্প কিছুদিনের জন্য নিজের পদে পুনরায় ক্ষমতাসীন হবার পর আল-মুকতাদিরের দেহ থেকে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে বার্বার সেনারা তাঁদের নেতা মুনিসের কাছে পৌঁছলেন। আল কাহিরও (৯৩২-৩৪ খ্রিঃ) তাঁর পূর্বসূরির তুলনায় এমন কিছু বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেননি। দ্বিতীয়বার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং যখন তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল তখন তিনি বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা করছিলেন। আমির আল-উমারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর দুই উত্তরসূরি আল-মুত্তাকি (৯৪০-৪৪ খ্রিঃ) ও আল-মুস্তাকফি (৯৪৪-৪৬ খ্রিঃ) একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্ধকারের জগতে প্রবেশ করেন। এক সময়ে বাগদাদে এমন তিনজন মানুষকে দেখা যেত যারা ইসলামি দুনিয়ার সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিল, পরে তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, তাঁদেরকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের দানের ওপর নির্ভর করেই তাঁদের দিন কাটত। আল-রাজির (৯৩৪-৪০ খ্রিঃ) আমলে আমির আল-উমারা শুক্রবারের ভাষণে খলিফার সঙ্গে নিজের নামও যুক্ত করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে একে নতুন পদ্ধতি বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ওই যুগে অল্প যে ক'জন খলিফা ক্ষমতাচ্যুত হননি, আল-রাজি ছিলেন তাদের অন্যতম। কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত সেনাদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। আরবের ইতিহাস-রচয়িতারা তাঁকে 'শেষ প্রকৃত খলিফা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আসলে এর দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনিই ছিলেন শেষ ব্যক্তি যিনি শুক্রবারের প্রার্থনা এবং রাজ্য প্রশাসনের বেশ কিছু বিষয় পরিচালনা করতেন। তিনিই শেষ ব্যক্তি যার কবিতা সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে খলিফা পদের সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা অন্তর্হিত হয়েছিল। আর ততদিনে একটি বড় সৈন্যদলের প্রধান অধ্যক্ষ আমির আল-উমারা মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

● বুয়াইহিদ রাজবংশ

৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খলিফা আল-মুস্তাকফি (৯৪৪ ৪৬ খ্রিঃ) বাগদাদে বিজয়ী আহমদ ইবন বুওয়াইহ্‌কে সংবর্ধনা জানালেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক মুইজ্জ আল-দাওলা

(যে রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করে) উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর আমির আল-উমারা হিসাবে নিযুক্ত করলেন। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে খলিফা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আরও বেশি এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা হল। আহমদের বাবা আবু-সুজা বুওয়াইহ্ অন্যান্য অধিকাংশ রাজপদাধিকারীদের মতো রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রাচীন সাসানিয় রাজাদের বংশধর বলে দাবি করেছিলেন। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের ডেলামাইট উচ্চভূমির অধিবাসীদের নিয়ে গর্বিত এক যোদ্ধা গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন প্রধান। এরা বেশ কিছুদিন সামানিয় রাজবংশের কাজে সাহায্য করেছিল। তিনজন পুত্র-সহ আহমদ প্রথমে ইসবাহান তারপর শীরাজ (৯৩৪ খ্রিঃ) এবং তার পরবর্তী দু'বছরে আল-আহওয়াজ (বর্তমানে খুজিস্তান) ও কারমান প্রদেশ দখল করেন। শীরাজ নতুন রাজবংশের রাজধানীতে পরিণত হয়। বাগদাদে (৯৪৫ খ্রিঃ) আহমদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তুর্কি সেনারা পালিয়ে যায় কিন্তু তার নতুন মনিব শী'আহ্‌পন্থি পারসীয়দের অভিভাবকত্বেও খলিফার অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি ঘটেনি। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ছিলেন একজন আমির আল-উমারা, তবুও খুতবা-তে খলিফার সঙ্গে তাঁরও নামের উল্লেখ রাখার জন্য মুয়িজ-আল-দাওলা জোরের সঙ্গে দাবি করেছিলেন। তিনি এমন কী মুদ্রার ওপরেও তার নাম খোদাই করিয়েছিলেন।

৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হতভাগ্য আল-মুস্তাকফিকে অন্ধ করে দেওয়া হল এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুতও করা হল। এই ঘটনার নায়ক মুয়িজ-আল-দাওলা নতুন খলিফা হিসাবে আল-মু'তিকে (৯৪৬-৭৪ খ্রিঃ) নিয়োগ করলেন। এতদিনে শী'আহ্‌দের অনুষ্ঠানগুলি তাদের যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। বিশেষ করে আল-হুসায়নের মৃত্যুবর্ষে (মহরমের দশম দিন) জনসাধারণের শোকপ্রকাশ ও গাদির আল-খুমে তাঁর উত্তরসূরিরূপে আলীর নিয়োগ সংক্রান্ত মুহাম্মাদের ঘোষণার দিনে আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রকাশও স্বীকৃতি পেল। আর অন্যদিকে খলিফা সাম্রাজ্যও তার চরম অবমাননার যুগে প্রবেশ করল। সেইসঙ্গে বিশ্বাসীদের নেতা বা আমির উল মুমিনীন সর্বাধিনায়ক বা আমির আল-উমারাহ্-র হাতে নিছক পুতুলে পরিণত হয়েছিল। কখনও কখনও দাবি করা হলেও ইসলামি দুনিয়ার ইতিহাসে বুওয়াইহিদরাই প্রথম সুলতান উপাধি গ্রহণ করেনি। সে যুগের মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, মুইজ- আল-দাওলা, ইমাদ-আল-দাওলা (রাজ্যের প্রতিপালক) ও রুকন-আল-দাওলা (রাজ্যের স্তম্ভ) ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধির সঙ্গে আমির বা মালিক শব্দটি যুক্ত করেই তারা নিজেদের সন্তুষ্ট রাখত। উপরোক্ত তিনটি সম্মানসূচক খেতাব দিয়ে যথাক্রমে বুওয়াইহ্-এর তিন ছেলেকে সম্মানিত করেছিলেন খলিফা। এরপর একই ধরনের জমকালো খেতাব বা উপাধি গ্রহণ করাটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুইজের বুওয়াইহি বংশের বেশ কয়েকজন উত্তরসূরি আমির আল-উমারা খেতাবও গ্রহণ করেছিল, যদিও এটা একটা সম্মানসূচক উপাধি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময় ধরে (৯৪৫-১০৫৫) বুওয়াইহিদ রাজবংশের আধিপত্যের যুগে তারা তাদের ইচ্ছামতো খলিফা নিয়োগ করত ও তাদের পদচ্যুত করত।

ফারিসে অবস্থিত বুওয়াইহিদ রাজ্যের রাজধানী শীরাজে বসে শাসকেরা আল-ইরাককে একটি প্রদেশ হিসেবে শাসন করত। বাগদাদে তারা বহু সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ চালু রেখেছিল। এদের যৌথ নাম ছিল দার আল-মামলাকা (রাজ্যের আবাস)। বাগদাদ তখন আর মুসলিম দুনিয়ার প্রাণকেন্দ্র ছিল না, কারণ শীরাজ, গজনী, কায়রো ও কর্ডোভা তার আন্তর্জাতিক খ্যাতিকে ভাগ করে নিয়েছিল।

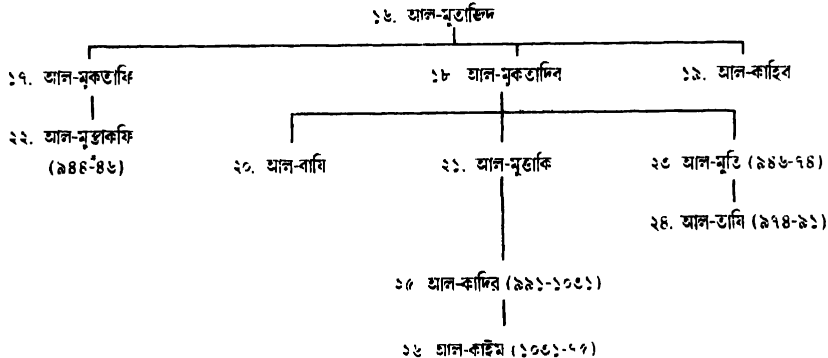
● আযুদ-আল-দাওলা

রুকনের ছেলে আযুদ-আল-দাওলার (রাষ্ট্রের সহায়ক হাত, ৯৪৯-৮৩ খ্রিঃ) শাসনকালেই বুওয়াইহি রাজবংশ তাদের সাফল্যের চূড়ায় উঠেছিল। আযুদ শুধু মহত্তম বুওয়াইহিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত শাসক। আল-ইরাকে ও পারস্যে বুয়াইহিদ শাসকদের অধীনে গড়ে ওঠা বহু ছোট ছোট রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি যে বড় রাজ্য গড়েছিলেন তা আয়তনে প্রায় একটি সাম্রাজ্যের সমান ছিল। আযুদ-আল-দাওলা বিয়ে করেছিলেন খলিফা আল-তাইয়ের মেয়েকে। খলিফা অবশ্য তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন এই আশায় যে, তাহলে খিলাফতের একজন উত্তরসূরি পাওয়া যাবে। ইসলামি দুনিয়ায় আজুদই প্রথম শাসক যিনি শাহানশাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শীরাজে তাঁর রাজদরবার থাকলেও তিনি বাগদাদ শহরটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন, মজে-যাওয়া খালগুলিকে সংস্কার করেছিলেন এবং অন্যান্য বহু শহরে মসজিদ, হাসপাতাল এবং রাজভবন গড়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও আযুদের কোষাধ্যক্ষ মিসকাওয়াইহ্-এর লেখা থেকে ওই সমস্ত তথ্য জানতে পারা যায়। তার পরহিতকর উদ্যোগের জন্য আযুদ তাঁর রাজকোষ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। আলীর অনুমান করা সমাধির ওপর নির্মিত পবিত্র স্থানটি (মাসহাদ) ছিল তার উদ্যোগে তৈরি হওয়া একটি আকর্ষণীয় বাড়ি। কিন্তু আল-বিমারিস্তান আল-আযুদি নামে পরিচিত বাগদাদের বিখ্যাত হাসপাতালটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১০০,০০০ দিনার ব্যয় করে তিনি ৯৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। হাসপাতালে ২৪ জন চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁরা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের শিক্ষকমণ্ডলী হিসাবেও কাজ করতেন। আল-মুতানাব্বির মতো কবিরাও আযুদের গৌরব নিয়ে গান রচনা করেছিলেন। বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ আবু-আলি আল-ফারিসি তাঁর জন্য কিতাব আল ইয়্আহ (ব্যাখ্যামূলক বই) লিখেছিলেন। তিনি ও অন্যান্য লেখকেরা তাঁদের রচনাবলি তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। শান্তি লাভের কলাকৌশলের চর্চা করতে গিয়ে আযুদ তাঁর খ্রিস্টান উজির নসর ইবন-হারুনের মতো একজন দক্ষ সহযোগীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। খলিফার সম্মতি নিয়ে ইবন-হারুন গির্জা ও মঠ তৈরি ও তাঁদের সংস্কার সাধন করেছিলেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দানের যে পূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন আযুদ-আল-দাওলা, তার পুত্র শরাফ-আল দাওলা (৯৮৩-৮৯) তা অনুসরণ করে চলেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে আল-মামূনের অনুকরণে শারাফ একটি বিখ্যাত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করিয়েছিলেন। আযুদের আর এক ছেলে ও দ্বিতীয় উত্তরসূরি বাহা-আল-দাওলা[৬০] (৯৮৯-১০১২ খ্রিঃ) ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-তাইকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এবং তাঁর প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেছিলেন। তাঁর রাজদরবারে সাবুর ইবন-আরদাশির নামে একজন সুশিক্ষিত পারসীয় উজির ছিলেন। ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সাবুর একটি শিক্ষায়তন গড়ে তুলেছিলেন বাগদাদে এবং এই শিক্ষায়তনে ১০০০০ বইয়ের[৬১] একটি গ্রন্থাগার ছিল। ওই শহরে ছাত্রাবস্থায় যখন পড়াশোনা করতেন তখন সিরিয়ার কবি আল-মাআররি গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতেন। মনে রাখা দরকার যে, বুয়াইহিদ রাজত্বে ইখওয়ান আল-সাফার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু রাজ্য নিজেই তখন অবক্ষয়ের সম্মুখীন, বাহা, শারাফ ও তাঁদের তৃতীয় ভাই সামসাম-আল-দাওলা[৬২]-র মধ্যেকার বংশাতীত ও পারিবারিক ঝগড়া তাঁদের উত্তরসূরিদের মধ্যেও সংক্রামিত হল। সর্বোপরি শী'আহ্ ভাবাদর্শের প্রতি বওয়াইহিদদের আনুগত্য সুন্নি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বাগদাদে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং তারই পরিণতিতে রাজবংশের পতন হল। সালজুক বংশের তুগরিল বেগ ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে প্রবেশ করলেন এবং বুওয়াইহিদ শাসনের অবসান ঘটালেন। আল-ইরাকে বুওয়াইহিদ বংশের শেষ প্রতিনিধি আল-মালিক আল-রহিম (দয়ালু রাজা, ১০৪৮-৫৫ খ্রিঃ) বন্দিদশায় তার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সারণিটি বুওয়াইহিদ একাধিপত্যের আমলে (৯৪৫-১০৫৫ খ্রিঃ) আব্বাসীয় খলিফাদের বংশগত সম্পর্কের স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছে :



● সালজুক রাজবংশ

সালজুক তুর্কিদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও খলিফা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য যুগের সূচনা ঘটল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব দিক থেকে তাদের

আবির্ভাবের পর খলিফার হাতে ক্ষমতা বলতে আর কিছুই ছিল না এবং তাঁর সাম্রাজ্য প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। স্পেনে উমাইয়ারা এবং মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় শী'আহপন্থি ফাতিমিয়রা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করল। বাগদাদ থেকে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার কোন আশাই আর রইল না। উত্তর সিরিয়া ও উচ্চ মেসোপটেমিয়া চলে গেল অশান্ত আরব যোদ্ধাদের হাতে, তাদের কেউ কেউ আবার রাজবংশ স্থাপন করতে সফল হয়েছিল। পারস্য, ট্রান্সঅক্সিয়ানা এবং পূর্ব ও দক্ষিণের দেশগুলি বুওয়াইহিদ ও গজনবীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল অথবা কোথাও কোথাও ছোট ছোট রাজবংশ ক্ষমতা দখল করল এবং সুযোগ পেলেই অন্যকে গলা টিপে মারার সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সুন্নি ও শী'আহ্‌দের সংঘর্ষই হয়ে উঠল দৈনন্দিন ঘটনা। ইসলামধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হল।

এইরকম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে সালজাক নামে এক সেনাপতি ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিজাতির গাজ (অথবা ওগাজ) সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তুর্কিস্তানের কিরগিজ সমভূমির এই যাযাবর শ্রেণীভুক্ত লোকেরা বুখারাতে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে এবং আন্তরিকভাবেই সুন্নি ভাবাদর্শকে গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে সালজুক এবং পরে তার ছেলেরা ইলেক খান ও সামানিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে অগ্রসর হতে থাকে। সালজুকের পৌত্র তুগরিল তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুরাসান অভিযান করেন। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই গজনবীদের কাছ থেকে মার্ভ ও নাইসাবুর ছিনিয়ে নেয়। এর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বলখ, জুরজান, তাবারিস্তান, খওযারিজম, হামাদান, আল-রায়ি ও ইসবাহান তাঁদের দখলে আসে। তাঁদের সামনে বুওয়াইহিদদের প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। তার দুর্ধর্ষ তুর্কি উপজাতীয় সেনাদের সঙ্গে নিয়ে তুগরিল বেগ ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর বাগদাদ অবরোধ করেন। বুওয়াইহিদ রাজবংশের শেষ প্রতিনিধির শাসনাধীন বাগদাদের সামরিক গভর্নর ও তুর্কি জেনারেল আল-বাসাসিরি রাজধানী ত্যাগ করেন এবং খলিফা আল-কায়িম (১০৩১-১০৭৫ খ্রিঃ) আক্রমণকারী সালজুকদেরকে মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করেন।

● তুগরিলের ক্ষমতায় আরোহণ

এক বছর পরে তুগরিল বাগদাদে ফিরে এলেন এবং বিরাট অনুষ্ঠান করে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল। ঢিলে লম্বা কোট পরে এবং হাতে পয়গম্বরের দণ্ড ধরে খলিফা পর্দার পিছনে একটি প্ল্যাটফর্মের ওপরে বসেছিলেন; বিজয়ী রাজা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটি তুলে ধরা হল। সংযুক্ত আর একটি প্ল্যাটফর্মে তুগরিল বসলেন এবং এক দোভাষীর মাধ্যমে খলিফার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বিজয়ী রাজাকে সাম্রাজ্যের শাসক করা হল এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রাজা হিসাবে তাকে স্বাগত জানানো হল। আল-সুলতান (শাসনক্ষমতার অধিকারী, সুলতান) হল তার আনুষ্ঠানিক উপাধি। এক নতুন ও আরও সদাশয় অভিভাবকের অধীনে চলে গেল খলিফা সাম্রাজ্য।

তুগরিল তখন উত্তর দিকে এক অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে স্বেচ্ছায় ফাতিমিয় স্বার্থের পক্ষে প্রচারকারী আল-বাসাসিরি ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে তার দাইলমীয় ও অন্যান্য সেনাদের নেতৃত্বে ফিরে এলেন ও রাজধানী পুনরায় দখল করলেন। এই সময় কায়রোর প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতিমিয় আল-মুস্তানসির (১০৩৫-৯৪)-এর পক্ষে তাঁর ও অন্যান্য আব্বাসীয়দের সমস্ত অধিকার খারিজ করে একটি দলিলে খলিফা স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। আল-কায়িমের পাগড়ি খেলাফতির স্মারক, মহানবীর জুব্বা এবং অন্যান্য পবিত্র স্মারক-সহ তার রাজপ্রাসাদের একটি জানালা জয়ের স্মৃতিচিহ্ন রূপে কায়রোতে[৬৩] পাঠানো হল। ফিরে আসার পর তুগরিল পুনরায় তার নিজের পদে আল-কায়িমকে বসালেন এবং বিদ্রোহ করার জন্য আল-বাসাসিরিকে তার জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হল। (১০৬০ খ্রিঃ)। দাইলমীয় সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হল এবং বুওয়াইহিদ বংশ চিরকালের মতো ক্ষমতা হারাল।

তুগরিল (১০৩৭-৬৩ খ্রিঃ) তাঁর ভাইপো ও উত্তরসূরি আলপ আরসলান (১০৬৩-৭২ খ্রিঃ) ও ভাইপোর ছেলে মালিকশাহের (১০৭২-৯২ খ্রিঃ) রাজত্বকালকেই মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রাচ্যে সালজুক কর্তৃত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলা যেতে পারে। সালজুক শাসকেরা সমস্ত দিকে তাদের বিজয় অভিযানকে সম্প্রসারিত করে চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিম এশিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাজ্যে পরিণত হল এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর হৃত গৌরব পুনরুজ্জীবিত হল। মধ্য এশিয়ার এই নতুন জাতি বিশ্বে ইসলাম ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম ধর্মের সংগ্রামে তাদের সর্বস্ব দিতে উদ্যত হল। এই সমস্ত বর্বর নাস্তিকেবা ইসলাম ধর্মের অনুগামীদের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়েছিল আবার একই সময়ে বিজিতদের ধর্ম গ্রহণও করেছিল এবং সেই ধর্মীয় আদর্শের একনিষ্ঠ সমর্থকেও পরিণত হয়েছিল। তবে ওই ধর্মের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে এইট তেমন কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এদের জ্ঞাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোঙ্গলেরা ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিককার অটোমান তুর্কিরাও একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল। ইসলামি রাজনৈতিক আদর্শের অন্ধকারতম অধ্যায়েই ইসলাম ধর্মীয় আদর্শ তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয়গুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি অর্জন করেছিল।

● আলপ আরসলান

তার রাজত্বের দ্বিতীয় বছরেই আলপ আরসলান (বীরসিংহ) খ্রিস্টান আর্মেনিয়ার রাজধানী ও পরবর্তীকালের একটি বাইজান্টাইন প্রদেশ আনি দখল করেছিলেন। শীঘ্রই বাইজান্টাইনের চিরশত্রুদের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয়ে গেল। ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়ার লেকভ্যানের উত্তরে ম্যানজিকার্ট (মালাজকির্ড, মালাসজির্ড)-এর চূড়ান্ত যুদ্ধে আলপ জয়লাভ করলেন এবং সম্রাট রোমানাস ডায়োজিনিসকে বন্দি করলেন। সালজুক [illegible]

উপজাতিরাই প্রথম মুসলিম হিসেবে রোমানদের দেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তারা এখন এশিয়া মাইনরের মালভূমি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করল। আর তখন থেকেই ওই অঞ্চলটি দার আল-ইসলামের (ইসলামের পবিত্র আবাস) অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠল। এই সালজুক যাযাবররাই এশিয়া মাইনরকে তুর্কি প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আলপের জ্ঞাতিভাই সুলাইমান ইবন-কুতলুমিশ পরে এই অঞ্চলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি রূম-এ সালজুকদের সুলতানি স্থাপন করেন (১০৭৭ খ্রিঃ)। দূরবর্তী নিসিয়া (নিকিয়া, তুর্কিভাষায় ইজনিক)-কে প্রথমে রাজধানী করা হয় এবং প্রথম ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধারা এই শহর থেকেই সুলাইমানের পুত্র ও উত্তরসূরি কিলিজ আরসলানকে বিতাড়িত করেন। ১০৮৪ খ্রিস্টাব্দের পর এশিয়া মাইনরে সবচেয়ে ধনী সমৃদ্ধ ও সুন্দর বাইজান্টাইন শহর ইকোনিয়াম (কুনিয়া, কোনিয়ে) ওই দেশে সালজুক রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে আলপের পুত্র তুতুশ কর্তৃক ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সিরিয়ার সালজুক রাজবংশ (১০৯৪-১১১৭ খ্রিঃ) প্রথম ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য নিজেদের ভূমিকা পালন করছিল। ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আলপের দখলে ছিল আলেপ্পো। সেখানেই তিনি ফাতিমিয়দের অগ্রগতি রোধ করেন এবং তাদের হাত থেকে মক্কা ও আল-মদীনা পুনরুদ্ধার করেন।

● সাফল্যের শীর্ষে সালজুক রাজবংশ

সালজুক রাজবংশের প্রথম দু'জন সুলতান বাগদাদে বাস করতেন না, কিন্তু সেখানকার একজন স্থানীয় সামরিক প্রশাসকের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের শাসনক্ষমতা চালাতেন। আলপ কখনও খলিফার রাজধানী দেখতে যাননি বা দেখেননি। ইসবাহান ছিল তাঁর শাসনক্ষমতার কেন্দ্র; তাঁর পূর্বসূরির শাসনক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মার্ভ ও আল-রায়্যি। ১০৯১ খ্রিস্টাব্দের শীতকাল পর্যন্ত অর্থাৎ মালিকশার রাজত্বের ধ্বংসের কিছুকাল আগে পর্যন্ত সালজুক রাজবংশের শাসনকেন্দ্র খলিফার সাম্রাজ্যের রাজধানীতে স্থানান্তরিত হয়নি। খলিফা একজন পুতুল শাসকে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি সুলতানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হতেন। শুধু তাই নয়, বিদেশি শক্তিই তাকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছিল এবং তাঁর উচ্চপদের সমস্ত রাজকীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই পুতুল শাসককে রাজকীয় সজ্জায় সাজিয়ে রেখেছিল। শুক্রবারের প্রার্থনায় খলিফার নামের সঙ্গে সুলতানের নামও উচ্চারিত হত। ১০৮৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মুকতাদি (১০৭৫-৯৪ খ্রিঃ) সুলতান মালিকশার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং যখন তার একটি ছেলের জন্ম হল তখন মালিকশাহ্ তার নাতির হাতে খলিফা সাম্রাজ্য ও সুলতানি সিংহাসন তুলে দেবার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মালিকশার (১০৭২-৯২ খ্রিঃ) আমলেই সালজুক রাজবংশ তাদের সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছায়। দেশে তাঁর রাজত্ব তুর্কিস্তানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত শহর কাশগড় থেকে

জেরুসালেম ও প্রস্থে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে কাস্পিয়ান সাগর[৭৫] পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।" যে মাঝিরা তাঁকে অক্সাস নদী পার করে দিয়েছিল, ভাড়া দেবার জন্য তিনি অ্যান্টিয়োকে[৭৬] তাদের প্রতিনিধির নামে ড্রাফ্‌ট পাঠিয়েছিলেন। একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাসকের চেয়েও মালিকশাহ্ ছিলেন আরও কিছু বেশি। তিনি রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, প্রাচীরের সংস্কার করেছিলেন, খাল খনন করেছিলেন এবং মক্কা পর্যন্ত তীর্থযাত্রার রাস্তায় অসংখ্য পান্থশালা তৈরি করেছিলেন। তাঁর জীবনীকারের লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁর আমলে ওই বিরাট সাম্রাজ্যের সমস্ত রাস্তাই ছিল নিরাপদ— এমন কী ট্রান্সঅক্সিয়ানা থেকে সিরিয়া[৭৭] পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাই মরুযাত্রী, এমন কী একজন বা দু'জনের পক্ষেও কোনরকম বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়াই চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। এই সময়ে বাগদাদে ময়লা জল-নিষ্কাশন ও আবর্জনা দূর করার জন্য প্রয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ইবন-আল-আসীর[৭৮] এর জন্য খলিফা আল-মুকতাদিকে কৃতিত্ব দান করলেও এই সমস্ত কাজ শুরু করেছিলেন সালজুক সুলতান। টাইগ্রিসের তীরে অবস্থিত সাধারণ স্নানাগারের নোংরা জল অপসারণের জন্য ভূগর্ভস্থ খানা-নির্মাণ এবং মাছ পরিষ্কার ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ জায়গায় ব্যবস্থা করা এইসব পদক্ষেপের মধ্যেই পড়ে। ইবন খাল্লিকানের[৭৯] লেখায় উল্লিখিত ছোট একটি সত্য কাহিনী মালিকশার চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জানতে সাহায্য করে। তুস-এর একটি মসজিদ দেখে সুলতার তার সঙ্গী উজির নিজাম-আল-মুল্‌ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মসজিদে ঢুকে কিসের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন। তখন সেই উজির উত্তর দিলেন, যে-ভাইয়ের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ চলছিল তাতে সুলতানের জয় কামনা করে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছিলেন। মালিকশাহ্ বললেন, "আমার দিক থেকে বলতে পারি যে, এরজন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিনি। মুসলিমদের শাসন করার পক্ষে যে উপযুক্ত এবং প্রজার স্বার্থের দিক থেকে যে আরও বেশি উপকারী, তাকে জেতানোর জন্যই আমি আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করছিলাম।'

● নিজাম-আল-মুলক : এক বিখ্যাত উজির

আলপ আরসলান ও মালিকশার প্রশাসনে যে-ব্যক্তি প্রধান পরিচালকের কাজ করতেন তিনি হলেন তাদের পারসীয় উজির নিজাম-আল-মুলক (রাজ্যের সংগঠন)। তাকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অলঙ্কার বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ইবন-খাল্লিকানের লেখা যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয় তা হলে আমরা দেখব যে "মালিকশার রাজত্বকাল-সহ মোট কুড়ি বছর ধরে নিজাম-আল-মুলক তার নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। আর সুলতান কেবলমাত্র সিংহাসনে বসে থাকতেন বা শিকারের পিছনে ধাওয়া করাটা উপভোগ করতেন।"[৮০]

তাঁর পিতা ও পিতামহের মতো শিক্ষাদীক্ষাহীন ও সম্ভবত নিরক্ষর হলেও নিজাম-আল-মুলকের পরামর্শ অনুযায়ী মালিকশাহ্ তাঁর নবনির্মিত মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ১০৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিদদের একটি সম্মেলন ডেকেছিলেন এবং পারসীয় ক্যালেন্ডারের[১১] সংস্কার করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে তৈরি হয়েছিল জালালি ক্যালেন্ডার (তারিখ)। মালিকশার ইচ্ছানুযায়ী (এই ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েছিল বলে তার পুরো নাম জালাল-আল-দিন (ধর্মের মহত্ত্ব) আবু-আল-ফাত্হ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এক আধুনিক গবেষকের মতে, এই ক্যালেন্ডারটি "আমাদের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভুল।"

নিজাম-আল-মুলক নিজে ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান ও শিক্ষিত মানুষ[১২]। তাঁর কলম থেকে আমরা সিয়াসাত-নামাহ্[১৩] নামে রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যতম উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক পুস্তিকা পেয়েছি। মালিকশার পরামর্শ অনুযায়ী একটি প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে তিনি এই গবেষণা সন্ধর্বটি রচনা করেছিলেন। ভাল রাষ্ট্র প্রশাসনের চরিত্র কেমন হবে— সে ব্যাপারে কূটনীতিবিদদের মতামত লিখিত আকারে পেশ করার জন্য সুলতান তাদেব অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই সময়ে পারসী ভাষায় রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে বিখ্যাত পর্যটক ও ইসমাঈলি মতের প্রচারক নাসির-ই-খুসরু (১০৭৪ খ্রিঃ) এবং বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ ও কবি উমার আল-খইয়াম (১১২৩-২৪ খ্রিঃ)-এর রচনাগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। উমার ক্যালেন্ডারের সংস্কারের কাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং তিনি নিজামের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। ইসলামি দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার[১৪] জন্য প্রথম সুসংগঠিত শিক্ষায়তন স্থাপনই পারসীয় উজিরের গৌরবের মূল কারণ বলে গণ্য হয়। বাগদাদে ১০৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত তার নিজামীয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। একসময় আল-গাজ্জালী এই শিক্ষায়তনের একজন শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

● সালজুক রাজ্যের বিভাজন

আমরা আগেই জানতে পেরেছি, এক ইসমাঈলি গুপ্তঘাতকরা প্রথমদিকে যে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যা করেছিল, প্রবীণ নিজাম ছিলেন তাদের অন্যতম। ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সালজুক বংশের প্রথম তিনজন রাজার শাসনকালে যে গৌরবময অধ্যায় শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটে। সংক্ষিপ্ত অথচ গৌরবময় এই অধ্যায়ে তিনজন সুলতান সেই সমস্ত দূরবর্তী রাজ্যগুলির অধিকাংশকেই ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন যেগুলি একদা ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করেছিল। কিন্তু বাগদাদ ও ইসলামের এই গৌরবময় অধ্যায়ের মেয়াদ ভারতের গ্রীষ্মকালের মতোই সংক্ষিপ্ত। মালিকশার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও পরবর্তী অন্যান্য দ্বন্দ্ব-বিসম্বাদের পরিণতিতে কেন্দ্রীভূত সালজুক রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সালজুক রাজবংশের পতন ঘটে। সংগঠনের রূপ ও অভ্যাসের দিক থেকে যাযাবর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষের দ্বারা গড়ে ওঠা সালজুক সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে রক্ষার

জন্য এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। নিজাম-আল-মুলক ১০৮৭ খ্রিস্টাব্দে সামরিক জায়গিরদার প্রথা নিয়মিত করেছিলেন এবং তার ফলে অনুদানের ব্যাপারটি বংশগত বিষয় হয়েই রইল। এর পরিণতিতে অনেকগুলি আধা-স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব ঘটল। এই বিশাল রাজত্বের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট অঞ্চলগুলি বাস্তবে স্বাধীনতা অর্জন করল। অন্যদিকে, পারস্যের মহান সালজুকরা ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখল। পরিবারের প্রধান উপবিভাগগুলির অন্যতম ছিল পারসীয় ইরাক (১১১৭-৯৪ খ্রিঃ)। অটোমান তুর্কিরা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের পর আল-রুমের ইকোনিয়ামে সালজুকদের পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করল। এই অটোমান তুর্কিরাই ছিল জঙ্গী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শেষ বড় প্রতিনিধি। গাজ উপজাতি থেকেই এদের উদ্ভব, সালজুকরাও এদেরই বংশধর। দূরবর্তী ভিয়েনা সহ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে অনুপ্রবেশ এবং আরবদের খলিফা সাম্রাজ্যের মতো একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর অটোমান তুর্কিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া পর্যন্তই তাদের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

ইসলাম ধর্মে সালজুক ও অটোমান তুর্কিদের একটি স্থায়ী অবদান ছিল এর মধ্যে রহস্যময়তার সঞ্চার করা। তুর্কিদের দেশে বিভিন্ন মুসলিম ফকির গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা এশিয়া মাইনরের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও ধর্মগত বিষয়ে বিচ্ছিন্ন খ্রিস্টানদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রথম দিককার উত্তর এশিয়ার জাদুভিত্তিক চিকিৎসক-পুরোহিতদের আদর্শের সমন্বয়ে গঠিত ভাবনা-ধারণা লালন-পালন করত। মুসলিম আরবেরা ফুতুওয়া[৮৫] নামের একটি সংগঠনের মাধ্যমে তাদের বীরত্বের প্রকাশ ঘটাত। এই সংগঠনটি তুর্কিদের মধ্যে একটি নতুনরূপ বা আখি-এর আকার ধারণ করেছিল। মূলগতভাবে এই আখি সংগঠনগুলি অর্থনৈতিক গিল্ড হতে পারত। কিন্তু এগুলি হয়ে উঠেছিল ধর্মশালা এবং এশিয়া মাইনরে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে এই আখি ধর্মশালাগুলিতেই ইবন-বতুতার[৮৬] থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় দুটি মাথাওলা ঈগলের ছবিযুক্ত প্রতীকের চিন্তা সর্বপ্রথম কোনোও এক প্রাচীন সুমেরীয় পুরোহিতের মস্তিষ্ক থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। তারপরই ব্যাবিলনের অধিবাসী ও হিট্টাইটল্যান্ডে (এশিয়া মাইনর) স্থায়ী বসবাসকারী সালজুক তুর্কিরা তিন হাজার বছর পরে আবার এই প্রতীক ধারণ করে। সালজুকদের কাছ থেকে এটি প্রথমে বাইজান্টিয়াম এবং পরে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার অধিবাসীরা ব্যবহার করতে শুরু করে।

● ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে অমনোযোগী বাগদাদ

১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে আল-কায়িমের রাজত্বকাল থেকে খলিফা সাম্রাজ্যের ওপর সালজুকদের প্রাধান্যের সূচনা হয়। তাদের এই প্রাধান্য ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে আল-নাসির-এর শাসনকাল[৮৭] পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই অধ্যায়ের বিরাট অংশ জুড়ে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে ধর্মযোদ্ধারা

ক্লান্তিকর প্রবল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সালজুক বা আব্বাসীয়রা কেউই এই দূরবর্তী দেশগুলির ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেনি। মুসলিম দুনিয়ার মূল কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে মুসলিম সম্প্রদায় এই ধর্মযুদ্ধগুলিকে তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন ব্যাপার বলে মনে করেছিল। জেরুসালেমের পতনের পর (১০৯৯ খ্রিঃ) আগ্রাসনকারী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে সাহায্যের আবেদন নিয়ে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল যখন বাগদাদে গিয়েছিল, তখন তারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেও কোন সাহায্য করেনি। খলিফা আল-মুস্তাজহির (১০৯৪-১১১৮ খ্রিঃ) ওই প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দেন সুলতান বারকি-ইয়ারুকের (১০৯৪-১১০৪ খ্রিঃ) কাছে। এই বারকি-ইয়ারুক ছিলেন মালিকশার দ্বিতীয় উত্তরসূরি ও মাতাল ছেলে।[12] এর আমলেই সুলতানি সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রতিনিধি দলের কোন লাভ হয়নি। ধর্মযোদ্ধাদের দ্বারা অবরুদ্ধ ত্রিপোলি থেকে ১১০৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আবেদন আসে। এই অবরুদ্ধ শহরটির প্রধানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাহায্যের আবেদন নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আগের বারের মতো এবারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তিন বছর পরে ফ্রান্স যখন আলেপ্পোর ব্যবসায়ীদের কাছে মাল পৌঁছে দেবার কাজে নিযুক্ত মিশরের কয়েকটি জলযান আটক করে, তখন আলেপ্পোর এক প্রতিনিধি দলের জরুরি অনুরোধে সাড়া দিয়ে আল মুস্তাজহির কিছুটা তৎপর হয়ে ওঠেন এবং হাতে গোনা একদল সেনা পাঠান যারা অবশ্যই কিছুই করতে পারেনি।[13] আলেপ্পোর এই প্রতিনিধি দলই মসজিদের প্রচারবেদী ধ্বংস করেছিল এবং সুলতান যে মসজিদের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতেন সেখানকার প্রার্থনারীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিল। খ্রিস্টান-ইসলাম সম্পর্কের ইতিহাসে যখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাটক চলেছিল, তখন সালজুক সুলতান ও ধর্মবিশ্বাসীদের নেতা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল।

পরবর্তীকালে খলিফা আল-মুকতাফির (১১৩৬-৬০ খ্রিঃ) শাসনকালে ধর্মযোদ্ধারা যখন মারাত্মক আক্রমণ চালাল, পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে মুসলিম নেতা জাঙ্গি[14] সাহায্যের জন্য বাগদাদের কাছে জরুরি আবেদন জানালেন। জনতার দাবিতে সাড়া দিয়ে সেখানে কয়েক হাজার সেনা পাঠানো হল। ইতিমধ্যে জাঙ্গির যোদ্ধা পুত্র নূর-আল-দীন এবং বিখ্যাত সালাহ্-আল-দীন (সালাদিন) শুধু খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেই নয়, এমনকি মিশরের অনৈক্যপ্রিয় ফাতিমিয়দের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে তাদের অস্ত্র ধরল। ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে সালাহ্-আল-দীনের হাতে ফাতিমিয় রাজবংশের পতন ঘটল এবং একজন একনিষ্ঠ সুন্নি হিসেবে তিনি মিশর ও সিরিয়ার খুতবা-তে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুস্তাদির নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর দ্বারা এই সমস্ত দেশগুলিতে আরও একবার আব্বাসীয় খলিফার প্রাধান্য স্বীকৃতি পেল।

সালাহ-আল-দিন হিট্টিন-এর চূড়ান্ত যুদ্ধের পর (১১৮৭ খ্রিঃ) আল-মুস্তাদির উত্তরসূরি আল-নাসিরের কাছে বেশ কিছু ফ্রাঙ্কিশ (জার্মান জাতির শাখাবিশেষ যারা পঞ্চম শতাব্দীতে গল বা আধুনিক ফ্রান্স জয় করেছিল) বন্দি ও লুট করা মালের একটি অংশ পাঠিয়েছিলেন।

তার মধ্যে সোনায় আচ্ছাদিত একটি ব্রোঞ্জের ক্রস ছিল এবং কথিত আছে যে, এর মধ্যে নাকি আসল ক্রসের কিছুটা কাঠ মেশানো ছিল। খলিফা এই ক্রসটিকে বাগদাদে[১১] মাটির তলায় পুঁতে দিয়েছিলেন।

● খওয়ারিজমের শাহরা

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে[১৩] ১১৮০ থেকে ১২২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত পর্যন্ত আল-নাসিরের রাজত্বকালকেই দীর্ঘতম আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর পূর্বসূরির মতো তিনিও খলিফা সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত করার একটা শেষ ও মৃদু চেষ্টা চালিয়েদিলেন। সালজুক রাজপুত্রদের মধ্যে সীমাহীন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বীর সালাহ্-আল-দীন কর্তৃক আব্বাসীয় খলিফা সাম্রাজ্যের নতুন স্বীকৃতি আল-নাসিরকে একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি করে তিনি রাজধানীর ওপর তাঁর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এক ধরনের শপথাবদ্ধ ভ্রাতৃত্ববোধের সংগঠন ফুতুওয়াহ্, এক ধরনের বীরত্বপূর্ণ নাইটহুড বিকশিত হয়েছিল এবং তিনি এই সংগঠনের সংস্কার করেছিলেন। আলী ও নামজাদা লোকেরা, বিশেষত পয়গম্বরের জামাতার বংশধরদের মধ্যে এই সংগঠনের উৎস নিহিত। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সদস্যদের (ফিতিয়ান) অন্তর্ভুক্ত করা হত এবং তারা এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ধরনের পোশাক[১৬] পরে হাজির থাকত। ইয়াজিদ ইবন-মু'আবিয়া ইসলামি দুনিয়ায় প্রথম ফাতা আল-আরব অর্থাৎ আরবদের নাইট উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ওই সময়ে তার কোন প্রয়োগগত গুরুত্ব ছিল না।

আল-নাসিরের এই প্রচেষ্টাকে নিভন্ত দীপের কম্পমান শিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভুল হয়েছিল যখন তিনি খওয়ারিজমের শাসক তাকাশ (১১৭২-১২০০ খ্রিঃ) এবং খওয়ারিজম শাহদের[১৭] তুর্কি রাজবংশের সদস্যদের পারসীয় ইরাকের[১৮] সালজুকদের আক্রমণে প্ররোচিত করেছিলেন। এই সালজুকরাই পারস্যের সালজুকদের পরে বাগদাদ শাসন করেছিল। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাকাশ ও সালজুক সুলতান তুগ্রিলের (১১৭৭-৯৪ খ্রিঃ) যুদ্ধ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তুগ্রিল পরাজিত হন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আল-ইরাক ও কুর্দিস্তানে সালজুক শাসনের অবসান ঘটে। আল-নাসির আশা করেছিলেন যে, বিজয়ী শাহ্ জয় করা অঞ্চলগুলো তাঁর হাতে তুলে দেবেন, কিন্তু তাকাশের পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সালজুক প্রথার অনুকরণে সুলতান হিসাবে তাঁর নাম খোদাই করা মুদ্রা তিনি চালু করলেন এবং বাগদাদের প্রাচীন ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে খলিফাকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সার্বভৌম ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করলেন। তাঁর উদ্যমী পুত্র আলা-আল-দিন মুহাম্মাদের আমলেও (১২০০-১২২০ খ্রিঃ) এই বিতর্ক চলতে থাকল। পারস্যের অধিকাংশ এলাকা (১২১০) এবং বুখারা ও সমরকন্দকে নিজের অধীনে এনে ও গজনী (১২১৪ খ্রিঃ) দখল করে এই খওয়ারিজম শাহ আব্বাসীয় খলিফা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোর দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার পরিবর্তে তিনি

সেখানে জনৈক আলীপন্থিকে বসানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। আতঙ্কিত আল-নাসির (রক্ষক ধর্মবিশ্বাসের) ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে বিধর্মী মোঙ্গল তাতারদের[৯৭] সাহসী দলনেতা ও দূরবর্তী পূর্বদিকের উদীয়মান সূর্যের প্রতীক চিঙ্গিজ খানের (১১৫৫-১২২৭ খ্রিঃ) সাহায্য চেয়েছিলেন। এই দুঃসাহসী ষাট হাজার[৯৮] বর্বর তাতার ও তাদের এগিয়ে চলার সমস্ত পথ জুড়ে বশ্যতাধীন মানুষদের নিয়ে বর্ধিত সেনাদের আক্রমণের সামনে পড়ে আলা-আল-দীনের পালানো ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। কাস্পিয়ান সাগরের এক দ্বীপে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ১২২০ খ্রিস্টাব্দে[৯৯] হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান।

● চিঙ্গিজ খানের আবির্ভাব

দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ও বিস্ময়কর ধনুকে সজ্জিত হয়ে মোঙ্গলরা ইতিমধ্যে যেখানেই গিয়েছিল[১০০] সেখানেই ব্যাপক অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। তাদের আক্রমণের মুখে পড়ে প্রাচ্যের ইসলামি দুনিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত জায়গায় আগে রাজকীয় প্রাসাদ ও গ্রন্থাগার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখন জনশূন্য মরুভূমি বা বিকৃত ধ্বংসস্তূপ পড়ে রইল। আর এই বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে বয়ে চলল রক্তস্রোত। হারাত (হিরাত)-এর ১,০০,০০০ জনগণের মধ্যে বেঁচে রইলেন মাত্র ৪০,০০০।[১০১] ধর্মানুরাগ ও বিদ্যার্জনের জন্য সুবিখ্যাত মসজিদগুলি মোঙ্গলদের ঘোড়ার আস্তাবল রূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। সমরকন্দ ও বলখের অধিকাংশ অধিবাসীদের হয় হত্যা করা হল বা বন্দি করা হল। খওয়ারিজম পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে। পরবর্তীকালে প্রচলিত একটি কাহিনীতে বলা হয়েছিল যে, বুখারা দখলের পর (১২২০ খ্রিঃ) চিঙ্গিজ (গেঙ্গিস) ঘোষণা করেছিলেন যে, "মানুষের পাপের[১০২] জন্য শাস্তি দিতে ঈশ্বর তাকে (চিঙ্গিজকে) পাঠিয়েছেন।" সেই সময়ের একজন বিশেষজ্ঞ ইবন-আল-আসীর[১০৩] এই ধ্বংসলীলার বর্ণনায় কেঁপে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তাঁর জন্ম না হলেই বোধহয় ভাল হত। এমন কী এক শতাব্দী পরে ইবন-বতুতা[১০৪] যখন বুখারা, সমরকন্দ, বলখ ও অন্যান্য ট্রান্সঅক্সিয়ানান শহরে গিয়েছিলেন, তখনও তার বেশিরভাগ অংশই ছিল ধ্বংসস্তূপে ভরা। তার পরেই এসেছিল বাগদাদের পালা।

এইভাবেই ইসলামি দুনিয়াকে বিধ্বস্ত করে বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন এই দুঃসাহসী মোঙ্গল যোদ্ধা। তাঁর নেতৃত্বাধীন সেনাদল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীন থেকে এড্রিয়াটিক পর্যন্ত প্রতিটি রাজ্যের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল। রাশিয়া আংশিক ভাবে দখল করেছিল মোঙ্গলরা, আর মধ্য ইউরোপের দূরবর্তী পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত তারা দখল করে নিয়েছিল। ১২৪১ খ্রিস্টাব্দে চিঙ্গিজের পুত্র ও তার উত্তরসূরির মৃত্যু ঘটায় এই মোঙ্গল যোদ্ধাদের[১০৫] আক্রমণের হাত থেকে পশ্চিম ইউরোপ রক্ষা পেয়েছিল।

খলিফা আল-নাসিরকে তাঁর শাসনকালের বাকী বছরগুলি সতর্কতার সঙ্গে কাটাতে হয়েছিল। তাঁর পুত্র আল-জাহির (১২২৫-২৬ খ্রিঃ) ও পৌত্র আল-মুস্তানসিরেরও (১২২৬-

৪২ খ্রিঃ) একই অবস্থা হয়েছিল। একবার এই মোঙ্গলরা প্রায় সামাররা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। সমকালীন ইতিহাসে এদের তাতারও বলা হয়। এর ফলে আত্মরক্ষার জন্য বাগদাদের আতঙ্কিত অধিবাসীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার মতো বিপদ কেটে গেল। এটা ছিল চরম আঘাতের পূর্বে ক্ষণিকের শান্তি।

● টীকা ●

১ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৮২৯ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৪২৪ পাতা; সি. এফ. মাসউদী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪২৩ পাতা।

২ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড ৪২২ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৭০ পাতা।

৩ ইবন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৫ ও ২৭০ পাতা।

৪ মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ৪২ পাতা; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৮৮০ পাতা।

৫ ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড ১২৪-২৫ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ৩৫০-৫১ পাতা; ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৬০৫ পাতা; মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, তারিখ-ই-গুজিদা, সম্পাদনা: ই জি ব্রাউনি, ১ম খণ্ড (লিডেন, ১৯১০) ৩৭৩ পাতা; অনুবাদ: (সংক্ষিপ্ত), ব্রাউনি, ২য় খণ্ড (লিডেন, ১৯১৩), ৭২ পাতা।

৬ ইস্তাখরি, ২৪৫-৪৭ পাতা।

৭ মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ৪১-৪৫ পাতা; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৬৯৮-১৭০৬, ১৮৮০-৮৭ পাতা।

৮ ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ১৯২-৯৫, ৩৪৬-৪৭ পাতা: ৮ম খণ্ড ৪-৬ পাতা; ইসফাহানি, সম্পাদনা: গটওয়াল্টি, ২৩৬-৩৭ পাতা; তাবারী, ৩য় খণ্ড ২১৯৪ পাতা; তারিখ-ই-সিসতান, সম্পাদনা: বাহার (তেহরান, ১৯৩৫), ২৫৬ পাতা।

৯ মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ১ম খণ্ড ৩৮১-৮৩ পাতা = ২য় খণ্ড ৭৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৫৮-৬০, ১৫৪-৫৬ পাতা।

১০ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৬৯ ও পরের পাতা।

১১ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ৪ পাতা।

১২ তার শাসনে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রশস্তিমূলক বর্ণনা দিয়েছেন, ইবন-হাওকাল, ৩৪১-৪২, ৩৪৪-৪৫ পাতা।

১৩ মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ১ম খণ্ড, ৩৮৫ পাতা = ২য় খণ্ড ৭৫ পাতা।

১৪ ইবন-হাওকাল, ১৩ ও ১৪ পাতা, তার কাছে আলবতাকিন বলে উল্লিখিত, হাজিব সাহিব খুরাসান।

১৫ মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ১ম খণ্ড ৩৯৩ পাতা - ২য় খণ্ড, ৭৮ পাতা।

১৬ ঐ, ১ম খণ্ড ৩৯৫ ও পরের পাতা; বিরুনী, তাহকিক, ১১ পাতা; এম নাজিম, দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অফ সুলতান মাহমুদ অফ গজনা (কেমব্রিজ, ১৯৩১), ৮৬ ও পরের পাতা।

১৭ হিলাল আল-সাবি, তারিখ আল-উজারা (মিসকাওয়াইহ্-এর সম্পূরক অংশ, তাজারিব, ৩য় খণ্ড), সম্পাদনা: অ্যামেড্রজ, ৩৪১-৪০ পাতা।

১৮ মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ১ম খণ্ড, ৩৯৫ পাতা।

১৯ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৯২ পাতা।

২০ নিচে দেখুন, ৪৭৪ পাতা।

২১ হিলাল আল-সাবি, ৩৪০ ও ৩৮৬ পাতা।

২২ সিরিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯২৫), ৬১-৯০ পাতায় এস ফ্লুরির প্রবন্ধ দেখুন।

২৩ তার কিতাব-ই-ইয়ামীনি, অনুবাদ: জেমস রেনল্ডস (লণ্ডন, ১৮৫৮)। প্রথমে আরবী ভাষায়, মাহ্মুদ-এর গৌরবময় রাজত্বের উচ্চ প্রশংসা করেছিল।

২৪ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১১৭৯-৮১ পাতা; মাসউদী, ৭ম খণ্ড, ১১৮ ও পরের পাতা দেখুন; ইয়াকুত, বুলদান, ৩য় খণ্ড ১৬-১৭ পাতা।

২৫ মার্কদিসি, ১২২-২৩ পাতা; আর্নেস্ট হার্জফেল্ড, দার ওয়ানডচমাক দার বাউটেন ভন সামাররা (বার্লিন, ১৯২৩)।

২৬ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৪৫২-৬৫ পাতা; (সংক্ষেপিত) ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ৬০-৬৪ পাতা।

২৭ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৫১২-১৩ পাতা, ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ৮০-৮১ পাতায় কপি করা আছে।

২৮ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৭১৮-১৯ পাতা।

২৯ পারসীয় ভাষায় জাঙ্গ (ইথিওপিয়া), যখন জাঙ্গবার, তখন আরবীতে জাঞ্জাবার, পরে জাঞ্জিবার।

৩০ ৩য় খণ্ড, ১৭৮৫ ও ১৭৮৬ পাতা।

৩১ মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ৩১ ও ৫৮-৬১ পাতা।

৩২ তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৭৮৫-৮৬ পাতা।

৩৩ নলডিকি, স্কেচেস ফ্রম ইস্টার্ণ হিস্টোরি, অনুবাদ: জে এস ব্ল্যাক (লণ্ডন, ১৮৯২), ১৭৪ পাতা।

৩৪ ১১৬ পাতা।

৩৫ ১ম খণ্ড, ৪৬২ পাতা।

৩৬ ফাখরি, ৩৬০ ও পরের পাতা।

৩৭ মিসকাওয়াইহ্, ১ম খণ্ড, ১৮৫ ও পরের পাতা; সাবি, উজারা, সম্পাদনা: অ্যামেড্রজ ১০৯, ৩২৬, ৩৫৯-৬০ পাতা।

৩৮ হ্যারল্ড বাওয়েন, দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অফ আলি ইবন ঈসা "দি গুড ভিজিয়ার" (কেমব্রিজ, ১৯২৮)।

৩৯ "দি ভিক্টোরিয়াস", মিসকাওয়াইহ্, ১ম খণ্ড, ৭৬ পাতা; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ২১৯৯ পাতা।

৪০ মিসকাওয়াইহ্, ১ম খণ্ড ১৯৩ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ১৪৭-৪৮ পাতা।

৪১ ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ১৭৯ পাতা।

৪২ মিসকাওয়াইহ্, ১ম খণ্ড, ২৯১-৯২ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ২০৯, ২১১, ৩২২-৩৩ পাতা; ফাখরি, ৩৭৫ পাতা; মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ২৮৭ ও পরের পাতা।

৪৩ মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড, ৭২ পাতা; মাসউদী, ৮ম খণ্ড, ৪০৯ পাতা।

৪৪ ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ২৪১ পাতা।

৪৫ ফাখরি, ৩৮০ পাতা; তানুখি, ১৪৬ পাতা।

৪৬ সামরিক শাসনের অধীন বাগদাদের খলিফাদের বংশগত সারণি :

১৬. আল-মুতাযিদ (৮৯২-৯০২ খ্রিঃ)

১৭. আল-মুকতাফি (৯০২-০৮ খ্রিঃ)

১৮. আল-মুকতাদির (৯০৮-৩২ খ্রিঃ)

১৯. আল-কাহির (৯৩২-৩৪ খ্রিঃ)

২০. আল-রাযি (৯৩৪-৪০ খ্রিঃ)

২১. আল-মুত্তাকি (৯৪০-৪৪ খ্রিঃ)

২২. আল মুস্তাকফি (৯৪৪-৪৬ খ্রি)

৪৭ সি. এফ. ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড ৯৮ পাতা; ফাখরি, ৩৭৬ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড ১৯৭ পাতা; মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ১ম খণ্ড ৪১৩-১৪ পাতা; ফ্রিডবিখ উইলকেন, মিরকন্ড'স জেস্টিতে দার সুলতান আস দেম জেসক্রেতে বুজে (বার্লিন, ১৮৩৫), ১৩ পাতা (পারসীয় মূল পাঠ্যাংশ), ৫৮ পাতা (অনুবাদ) (মিরখাওয়ান্দ থেকে সংগৃহীত, রাওযাত আল-সাফা)।

৪৮ মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড, ১৫৮ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড ৩৩৭ পাতা; উইলকেন, ২১ পাতা (মূল পাঠ), ৬৬ পাতা (অনুবাদ) : মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড ৩৯৬ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পাতা।

৪৯ মক্কা ও আল-মদীনার মাঝখানে একটি ঝরনা, শী'আহ্ ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রচলিত আছে যে, ওইখানে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদ ঘোষণা করেছিলেন : "আমি যার প্রভু, আলীও তার প্রভু"। ইবন-সা'দ, ৫ম খণ্ড ২৩৫ পাতা। মাসউদী, তানবি, ২৫৫-৫৬ পাতা। এই ঘোষণার দিনটি স্মরণে রেখে শী'আহ্ গোষ্ঠী যূ-আল-হিজজার ১৮তম দিনে এক আনন্দোৎসবের আয়োজন করে।

৫০ সি. এফ. উপরে, ৪৬৪ পাতা; নিচে ৪৭৪ পাতা।

৫১ খাতীব, ১ম খণ্ড, ১০৫-০৭ পাতা।

৫২ মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড ৪১৪ পাতা; ইয়াকূত, উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬৬ পাতা।

৫৩ শাহানশাহ-র সংক্ষিপ্তকরণ, পারসীতে রাজাদের রাজার জন্য, প্রাচীন ইরানি রাজাদের উপাধি অনুকরণে। আযুদ-এর ছেলে বাহা-আল-দাওলা প্রথমে অনুরূপ আরবী নাম মালিক আল-মুলুক ব্যবহার করেছিলেন এবং তুর্কি আমলের শেষ রাজবংশের কাছে এই উপাধি বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেছিল।

৫৪ ২য় খণ্ড ৪০৪--৮ পাতা। ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড ১৬ পাতা।

৫৫ কিফতি, ৩৩১ পাতা।

৫৬ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ১ম খণ্ড, ৩১০, ২৩৮, ২৪৪ পাতা; কিফতি, ২৩৫-৩৬, ৩৩৭-৩৮ ও ৪৩৮ পাতা।

৫৭ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পাতা।

৫৮ মিসকাওয়াইহ্, ২য় খণ্ড, ৪০৮ পাতা।

৫৯ "রাজ্যের মর্যাদা"। ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১৬-১৭ পাতা; রুধরাওয়ারি, যাইল (মিসকাওয়াইহ্-এর ক্রোড়পত্র তাজারিব; ৩য় খণ্ড) সম্পাদনা: অ্যামেড্রজ ১৩৬ ও পরের পাতা দেখুন।

৬০ "রাজ্যের উৎকর্ষ" ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৪২ ও পরের পাতা; রুযরাওয়ারি, ১৫৩ ও পরের পাতা।

৬১ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৭১ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পাতা।

৬২ 'রাজ্যের তরবারি' ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১৬-১৯ ও ৩২-৩৫ পাতা; রুযরাওয়ারি, ১৮৪ ও ২৬০ পাতা।

৬৩ মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ৪৩৪-৩৬ পাতা, অনুবাদ: ৯৩-৯৪ পাতা, জোয়ানেস এ ভালারস্, মিরকন্ডি হিস্টোরিয়া সেলজেচকিদারুম (গিসেন, ১৮৩৭), ১ ও পরের পাতা (রাওযাত আল-সাফা থেকে সংগৃহীত)।

৬৪ তার বাবার নাম মিকাঈল, ভাইয়ের নাম দাউদ (ডেভিড) ও তার চাচার নাম মূসা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৩২২ পাতা। প্রথম দিকের সালজুকদের মধ্যে এই ধরনের নাম খ্রিস্টান, সম্ভবত নেস্টোরিয়ন প্রভাবের কথাই তুলে ধরে। কাজবিনি, আসার, ৩৯৪ পাতা।

৬৫ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ১০৭-০৮ পাতা; ইবন-তাগরি-বিরদি, সম্পাদনা: পপার, ২য় খণ্ড, পার্ট ২, ২২৫ পাতা।

৬৬ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৮৩৬ পাতা; ইবন-তাগরি-বিরদি, ২৩৩ পাতা; ইমাদ-আল-দীন (আল-ইসফাহানি), সংক্ষেপিত, আল-বানদারি, তাওয়ারিখ আল-সালজুক, সম্পাদনা: এম. থিয়োডর হাউৎসমা (লিডেন, ১৮৯৯), ১৪ পাতা।

৬৭ আল-রাওয়ানদি, রাহাত আল-সুদূর, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইকবাল (লণ্ডন, ১৯২১) ১০৫ পাতা। তাগরিল ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক যার মুদ্রার এই উপাধি ছাপা থাকত। স্ট্যানলে ল্যান-পুল, ক্যাটালগ অফ ওরিয়েন্টাল কয়েনস ইন দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, সম্পাদনা: আর এস পুল, ৩য় খণ্ড (লণ্ডন, ১৮৭৭), ২৮-২৯ পাতা। সালজুকদের আমলে 'সুলতান' একটি প্রচলিত সার্বভৌম খেতাব হয়ে উঠল।

৬৮ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৬২২ পাতা।

৬৯ ইবন আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ২৫ ও পরের পাতা।

৭০ ঐ, ৪৪ ও পরের পাতা। ইমাদ-আল-দীন, ৩৮ পরের পাতা; ভ্যাসিলিয়েভ, বাইজেন্টাইন

৭১ আরবী ভাষায় 'রুম' বলতে 'রোমানদের' বোঝায়। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ১৯৯ পাতা দেখুন।

৭২ ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৪৩-৪৪ পাতা।

৭৩ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪৪৩ পাতা।

৭৪ ঐ, ৫৮৯-৯০ পাতা।

৭৫ ঐ, ৫৮৭ পাতা।

৭৬ ঐ, ৫৮৯ পাতা।

৭৭ ঐ, ৫৮৭ পাতা।

৭৮ ১০ম খণ্ড, ১৫৬ পাতা।

৭৯ ২য় খণ্ড, ৫৮৮ পাতা।

৮০ ১ম খণ্ড, ২৫৫ পাতা।

৮১ ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৬৭-৬৮ পাতা। মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটির অবস্থান অনিশ্চিত, সম্ভবত ইসবাহানে, আল-রায়ি বা নাইসাবুরে। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে দেখুন, ৩৭৭ পাতা।

৮২ ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড ১০৪ পাতা; ইমাদ-আল-দীন, ৩০ পাতা।

৮৩ সম্পাদনা : চার্লস সেফার (প্যারিস, ১৮৯১), অনুবাদ : সেফার (প্যারিস, ১৮৯৩)।

৮৪ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৪১০ পাতা, দেখুন।

৮৫ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন, ৪৮১ পাতা।

৮৬ ২য় খণ্ড, ২৬০ ও ৩১৮ পাতা। ইবন-বতুতা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেইমত 'ব্রাদার-এর আরবী শব্দ 'আখি' নয়, কিন্তু এটি 'নাইটলি' বা 'নোবল'-এর তুর্কি প্রতিশব্দ। ইসলামিকা, ৪র্থ খণ্ড (১৯২৯), ১-৪৭ পাতা, ৫ম খণ্ড, ২৮৫-৩৩৩ পাতায় ফ্রাঞ্জ টেসনার-এর প্রবন্ধ দেখুন। জার্নাল এশিয়াটিক-এ জে ডেনি-র সিরিজ ২, ১৬ খণ্ড (১৯২০), ১৮২-৮৩ পাতা দেখুন।

৮৭ সালজুক আমলে খলিফাদের তালিকা :

২৬. আল-কাইম (১০৩১-৭৫ খ্রিঃ)

|

মুহাম্মাদ

|

২৭. আল-মুকতাদি (১০৭৫-৯৪ খ্রিঃ)

|

২৮. আল-মুস্তাজহির (১০৯৪-১১১৮ খ্রিঃ)

২৯. আল-মুস্তারশিদ (১১১৮-৩৫ খ্রিঃ)

|

৩০. আল-রশীদ (১১৩৫-৩৬ খ্রিঃ)

৩১. আল-মুকতাফি (১১৩৬-৬০)

৩২. আল-মুসতানজিদ (১১৬০-৭০

৩৩. আল-মুসতাদি (১১৭০-৮০)

৩৪. আল-নাসির (১১৮০-১২২৫)

৮৮ ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ১৯২ পাতা।

৮৯ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ১৫৪ পাতা।

৯০ ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৩৩৮-৩৯ পাতা; ইবন-আল-কালানিসি, যাইল, ১৭৩ পাতা।

৯১ সিরিয়া ও আল-মাওসিলে আতাবেগ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আতাবেগরা (তুর্কিতে আতা, "বাবা" + বেগ, রাজপুত্র ছিলেন আসলে সালজুক যুবরাজদের গৃহশিক্ষক অথবা অভিভাবক। আর শেষমেশ তাদের চরম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। আবূ-শামাহ, আল-রাওযাতাইন ফী আখবার আল-দাওলাতাইন, ১ম খণ্ড (কায়রো, ১২৮৭), ২৪ পাতা।

৯২ ইবন-আল-আসীর, ১১ খণ্ড, ৩৫৩ পাতা; আবু-শামা, ২য় খণ্ড ৭৬ ও ১৩৯ পাতা।

৯৩ সি. এফ মুস্তাওফি-ই কাজবিনি, ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পাতা। আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে আল-কায়িম (১০৩১-৭৫)-এর খিলাফতকাল ছিল দ্বিতীয় দীর্ঘতম আমল। অবশ্য ফাতিমিয় খলিফা আল-মুস্তানসির (১০৩৫-৯৪) নামে মাত্র প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেছেন। তবে ইবন-আসীর (দ্বাদশ খণ্ড, ২৮৬ পাতা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, অভিষেকের সময় এই খলিফার বয়স ছিল মাত্র সাত। আর কর্ডোভার তৃতীয় আবদ-আল-রাহমান (৯১২-৬১) ছিলেন এই তালিকার এক উজ্জ্বল নাম। কিন্তু তিনি ৯২৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করতে পারেননি।

৯৪ ফাখরি, ৪৩৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ১২ খণ্ড, ২৬৮ পাতা; ইবন-যুবাইর, ২৮০ পাতা; আরও দেখুন, হারম্যান থর্নিং, BEITRAGE ZUR KENNTNISS DES ISLAMISCHEN VEREINSWESENS AUF GRUND VON BAST MADAD ET- TAUFIQ (বার্লিন, ১৯১৩); এইচ রিটার, দার ইসলাম, ১০ম খণ্ড, (১৯২০), ২৪৪-৫০ পাতা।

৯৫ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে যিনি ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন, ছিলেন গজনা-র ক্রীতদাস এবং সালজুক বংশের মালিকশার আমলে কাপ বহনকারীর কাজ করতেন। মালিকশা তাকে খওয়ারিজমের গভর্নর রূপে নিয়োগ করেছিলেন। জুওয়াইনি, পার্ট ২ (লিডেন, ১৯১৬) ৩ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ১৮২-৮৩ পাতা।

৯৬ আল-ইরাক আল-আজামি (মিডিয়া), সালজুকদের আমলে আল-ইরাক আল-আরাবি থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য ওই নামে ডাকা হতো। দেখুন, ৩৩০ পাতা, টীকা ২।

৯৭ ডবলিউ বার্টহোল্ড-এর তুর্কেস্তান, ২য় সংস্করণ, অনুবাদ: এইচ এ আর গিব (অক্সফোর্ড, ১৯২৮), ৩৯৯-৪০০ পাতা। তিনি যখন পশ্চিমদিকে এগোচ্ছিলেন তখন চিঙ্গিজ খান-এর দুজন কর্মচারী ছিলেন মুসলিম। তার বহু আগেই মুসলিম ব্যবসায়ীরা পূর্ব মঙ্গোলিয়র যাযাবর উপজাতিদের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৩৪৩-৪৪ পাতা দেখুন।

৯৮ হিসাব-নিকাশ সম্ভবত অতিরঞ্জিত, ৬০০০০ থেকে ৭০০০০-এর মধ্যে।

৯৯ মুস্তাওফি-ই-কাজবিনি, ১ম খণ্ড, ৪৯৮ পাতা।

১০০ জুওয়াইনি, পার্ট ১, ১৭ ও পরের পাতা; ইবন-আল-আসীর, ১২ শ খণ্ড,২৩৪ ও পরের পাতা দেখুন।

১০১ সি. এফ. ইয়াকুত, বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, ৯৫৮ পাতা। ১২২০ খ্রিস্টাব্দে, সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার এক বছর আগে, ইয়াকুত হারাত-এ গিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন এটি তার দেখা সবচেয়ে বড় ও ধনী শহর।

১০২ জুওয়াইনি, পার্ট ১, ৮১ পাতা।

১০৩ ১২ শ খণ্ড, ২৩৩ পাতা।

১০৪ ৩য় খণ্ড, ২৫-২৭, ৫২-৫৮-৫৯ পাতা।

১০৫ এদের ভুল করে গুলিয়ে ফেলা হয় কলমাকদের সঙ্গে, যাদের পরবর্তী প্রজন্মের ১,৭৫,০০০ মানুষকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্বাসিত করেছিল সাইবেরিয়াতে এবং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ৬০০ জনের দেখা মিলেছিল পশ্চিম জার্মানির উদ্বাস্তু শিবিরে। এদের মধ্যে ২৫০ জনের দু'বছর পরে নিউ জার্সির একটি কৃষিজমিতে স্থায়ীভাবে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে তারা একটি গ্যারেজকে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত করে। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের, ৬৭৬ পাতা, টীকা ১।

॥ অধ্যায় ৩৩ ॥

আব্বাসীয় খিলাফতের পতন

প্রথম ইসলামিক শতাব্দীতে যে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে আরব মরুভূমির এই সন্তানেরা সভ্য দুনিয়ার বেশির ভাগ অংশ জয় করে নিয়েছিল, তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে তাদের বংশধরদের একচেটিয়া প্রাধান্যের দ্রুত অবক্ষয়কেই একমাত্র তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ৮২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অন্য যে কোন জীবিত মানুষের তুলনায় বাগদাদের খলিফার হাতে পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল।। আবার ৯২০ খ্রিস্টাব্দে তার উত্তরসূরির ক্ষমতা এতই কমে গেল যে, রাজধানীতেও তার বিন্দুমাত্র প্রভাব অনুভব করা যেত না। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী শহরটিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। আর এরই সঙ্গে আরবদের প্রাধান্য চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে গেল এবং প্রকৃত খিলাফতেরও অবসান ঘটল।

যে সমস্ত বাহ্যিক কারণগুলি এই ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল, তার মধ্যে বার্বারদের অত্যাচারই (এক্ষেত্রে মোঙ্গল বা তাতার) বাস্তবে খিলাফতের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অসংখ্য ছোট-খাটো রাজবংশ কিন্তু পতনের মূল কারণ ছিল না, ছিল রোগের লক্ষণমাত্র। পাশ্চাত্যের রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে এর খানিকটা তুলনা চলে। খিলাফৎ যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায় তখনই অন্যরা তাকে রক্ষা করার চেষ্টা না করে, সাম্রাজ্যের অংশবিশেষকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু খিলাফতের অবলুপ্তির ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ কারণগুলি ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে পাঠক মনোযোগের সঙ্গে আগের অধ্যায়টি লক্ষ করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই এই কারণগুলি ও কয়েক শতাব্দী ধরে সেগুলির কার্যকারিতা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছেন। বেশির ভাগ জয়গুলিই ছিল নামে মাত্র। ওই সমস্ত দ্রুত ও অসম্পূর্ণ বিজয়গুলির মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাজনের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। প্রশাসনও স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার পরিপূরক ছিল না। শোষণ ও অতিমাত্রায় কর আদায় করাই ছিল স্বীকৃত নীতি; ব্যতিক্রম নয়, বরং এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। আরবীয় ও অ-আরবীয়, আরবীয় মুসলিম ও নয়া মুসলিম, মুসলিম ও যিম্মীদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাটা ছিল স্পষ্ট। আরবীয় মানষদের মধ্যেও উত্তর ও দক্ষিণকে কেন্দ্র করে পুরানো বিভেদকামী মানসিকতা তখনও বজায় ছিল। ইরানীয় পারসিক, তুরানীয়, তুর্কি বা হেমিটিক বার্বারেরা কেউই সেমিটিক আরবদের সঙ্গে মিলেমিশে

কখনও একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হতে পারেনি। এই ধরনের পৃথক সত্তাগুলিকে কোন সচেতনতাই ঐক্যের সূত্রে বাঁধতে পারেনি। ইরানের অধিবাসীরা সর্বদাই তাদের প্রাচীন জাতীয় গৌরবের ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং কখনই তারা নিজেদেরকে নতুন রাজত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। যে কোন সাম্প্রদায়িকতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে বার্বাররা অস্পষ্টভাবে তাদের উপজাতীয় মানসিকতা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটাত। সিরিয়ার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই একজন সুফিয়ানির অভ্যুত্থানের অপেক্ষায় ছিল, যে তাদের আব্বাসীয় শাসনের জোয়াল[১] থেকে মুক্ত করবে। বহির্মুখী ধর্মীয় শক্তিগুলি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিগুলির থেকে কোন অংশেই কম কার্যকর ছিল না, বরং তারা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল এবং শী'আহ্, কারামাতিয়া, ইসমাঈলিয়া, অ্যাসাসিন ও অনুরূপ সম্প্রদায় সৃষ্টি করার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছিল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে আরও কিছু বেশি। কারামাতিয়া ওই নতুন সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে হঠাৎ প্রবল আক্রমণ করল এবং খুব শীঘ্রই ফাতিমিয়রা পশ্চিম প্রান্তটি দখল করে নিল। খলিফা সাম্রাজ্য যেভাবে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলকে যুক্ত করে একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, ইসলামধর্ম সেভাবে তার অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত করতে সক্ষম হয়নি।

তা ছাড়া আব্বাসীয় সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও নৈতিক শক্তিও উপস্থিত ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী তাদের শাসনকালে বিজয়ী জাতির রক্তের সঙ্গে বিজিত জাতির রক্তের মিশ্রণের ফলে তাদের গুণাবলি ও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আরবের জাতীয় জীবনের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আরবের মানুষদের অদম্য মানসিক শক্তি ও নৈতিক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যটি ধীরে ধীরে বিজিতদের সাম্রাজ্যে পরিণত হল। অগণিত খোজা পুরুষদের সাহায্যে গড়ে ওঠা বড় বড় হারেম, নারীত্ব ও পুরুষত্বের অধঃপতনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি সেই ছেলে ও মেয়ে ক্রীতদাস (গিলমান), অসংখ্য উপপত্নী এবং অসংখ্য সৎ-ভাই ও সৎ-বোনের উপস্থিতি এবং তাদের পারস্পরিক হিংসা ও ষড়যন্ত্র, বিলাসবহুল জীবন এবং মদ ও গানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব— এই সমস্তও একই ধরনের অন্যান্য উপাদান পারিবারিক জীবনের প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং তার ফলে ধারাবাহিকভাবে দুর্বল উত্তরসূরি সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তরাধিকারের অধিকার নিয়ে অন্তহীন দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হয়নি। বরং এই দ্বন্দ্বই দুর্বল উত্তরসূরিদের আরও দুর্বল করে দিয়েছিল।

এ ব্যাপারে অর্থনৈতিক কারণগুলিকেও অবহেলা করা চলে না। নতুন কর আদায় এবং শাসকশ্রেণীর সুবিধার্থে প্রাদেশিক সরকারগুলি কৃষি ও শিল্পকে নিরুৎসাহিত করল। একদিকে যেমন শাসকেরা ধনী হতে লাগল, তারই সঙ্গে সমানুপাতিক হারে সাধারণ মানুষ গরিব হতে লাগল। রাজ্যের মধ্যেও খণ্ড খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠেছিল, এবং তার শাসকেরা প্রজাদের সর্বস্ব

হরণ করে নিয়েছিল। বারবার রক্তাক্ত সংঘর্ষে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটায় জনসংখ্যা কমতে লাগল এবং তার ফলে কৃষিযোগ্য বহু জমি পতিত অবস্থায় পড়ে রইল। নির্দিষ্ট সময়ের পর নিম্ন মেসোপটেমিয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হল এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিল। প্লেগ, গুটিবসন্ত, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর মহামারী আকারে দেখা দিল এবং মধ্যযুগের মানুষ এর সামনে শক্তিহীন অক্ষম অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। মহামারীর আক্রমণে বিরাট এলাকা জুড়ে বহু সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটল। জয়ের পর প্রথম চার শতাব্দীতে প্রায় ৪০ টি বড় ধরনের মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ঘটনা আরবীয় বর্ষপঞ্জিতে লেখা আছে। জাতীয় অর্থনীতির অবক্ষয় খুব স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করল।

● বাগদাদে হুলাগু'র শাসন

১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে চিঙ্গিজ খানের পৌত্র হুলাগু এক বিরাট সেনাদল সঙ্গে নিয়ে মঙ্গোলিয়া ত্যাগ করেন এবং অ্যাসাসিন ও খলিফা সাম্রাজ্য ধ্বংসের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেন। শুরু হয় মোঙ্গল উপজাতিদের দ্বিতীয় আক্রমণ। খওয়ারিজম শাহদের বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর যে সমস্ত ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছিল, মোঙ্গলদের আক্রমণের সামনে সেগুলি খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। ইসমাঈলি অ্যাসাসিনদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানে যোগ দেবার জন্য হুলাগু আমন্ত্রণ জানান খলিফা আল-মুসতাসিমকে[১] (১২৪২-৫৮ খ্রিঃ)। কিন্তু এই আবেদনে খলিফা কোন সাড়া দেননি। ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুলাগুর সেনারা কোনরকম অসুবিধা ছাড়াই আলামুতের মূল ঘাঁটিসহ অ্যাসাসিনদের বেশির ভাগ শক্ত ঘাঁটিই দখল করে নিল। ফলে তাঁদের সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা ধুলোয় মিশে গেল।[২] এমন কী শিশুদেরও হত্যা করা হয়েছিল। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে খলিফা যখন খুরাসানের রাজপথ দিয়ে কৌশলে সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন সেই মুহূর্তে বিজয়ী আগ্রাসনকারীরা আত্মসমর্পণের দাবি জানিয়ে খলিফাকে একটি চরমপত্র পাঠান এবং শহরের বাইরের প্রাচীর ভেঙে দিতে বলেন। খলিফা যে উত্তরটি পাঠান তা ছিল এড়িয়ে যাবার একটি ছলমাত্র। ফলে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে হুলাগুর সেনারা রাজধানীর বাইরের প্রাচীরটি ভেঙে ফেলার জন্য কার্যকর আক্রমণ চালায়। খুব শীঘ্রই একটি স্তম্ভের গায়ে ফাটল ধরে।[৩] উজির ইব্‌ন-আল-আলকামি নেস্টোরিয়াম ক্যাথলিকদের মাধ্যমে সন্ধির চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য হুলাগুর কাছে আসেন। হুলাগুর একজন খ্রিস্টান স্ত্রী ছিলেন। তিনি সন্ধির শর্তাবলি জানতে এলেন। কিন্তু হুলাগু তাদের অভ্যর্থনা করতে অস্বীকার করেন। যারা 'শান্তির নগরী'-তে প্রবেশ করেছিল বা আব্বাসীয় খলিফা সাম্রাজ্য আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দেবার চেষ্টাও কার্যকর হয়নি। হুলাগুকে বলা হয়েছিল যে, "খলিফাকে যদি হত্যা করা হয় তা হলে গোটা বিশ্বজগতে নৈরাজ্য দেখা দেবে, সূর্য মুখ লুকোবে, বৃষ্টি হওয়া থেমে যাবে এবং গাছপালা আর জন্মাবে না।"[৪] জ্যোতিষীদের পরামর্শ

নেওয়ার ফলে হুলাগু এ সম্পর্কে অনেক বেশি কিছু জানতেন। তাই তিনি তাঁর সেনাদের নিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি শহরে প্রবেশ করলেন এবং হতভাগ্য খলিফা তাঁর তিনশো[৬] কর্মচারী ও কাযী-সহ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালেন। দশ দিন পরে তাদের সকলকেই হত্যা করা হল। সারা শহর জুড়ে চলল লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ; খলিফার পরিবার-সহ শহরের অধিকাংশ মানুষের আর কোন অস্তিত্বই রইল না। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির মারাত্মক দুর্গন্ধ হুলাগুকে কয়েকদিনের জন্য শহর থেকে সরে যেতে বাধ্য করল। সম্ভবত বাগদাদে তিনি বাস করার কথা ভেবেছিলেন, তাই অন্যান্য শহরের মতো বাগদাদে অত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলেনি। এখানকার নেস্টোরিয়ান যাজকবর্গ বিশেষ আনুকূল্য লাভ করল। কয়েকটি স্কুল ও মসজিদ এই ধ্বংসলীলার হাত থেকে ছাড় পেয়েছিল অথবা সেগুলিকে পুনরায় তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাসে এই প্রথম, মুসলিম দুনিয়ায় কোন খলিফা রইলেন না শুক্রবারের প্রার্থনার সময় যার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

১২৬০ খ্রিস্টাব্দে হুলাগু উত্তর সিরিয়ার দিকে তাঁর অভিযান সংগঠিত করলেন। এখানে আলেপ্পো ছাড়াও হামাহ্ ও হারিম দখল করলেন এবং সেখানকার প্রায় ৫০০০০ মানুষকে হত্যা করলেন। দামাস্কাস দখলের উদ্দেশ্যে একজন জেনারেলকে পাঠানোর পর পরিস্থিতির চাপে তাঁর ভাই গ্রেট খানের মৃত্যুর পর তিনি পারস্যে[৭] ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। সিরিয়া দখলের পর যে সেনাবাহিনী পিছনে পড়ে রইল, মিশরিয় মামলুক কুতুজ[৮]-এর বিখ্যাত জেনারেল বেবারের সঙ্গে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে নাজারেথের কাছে (গোলিয়াথ-এর ঝরনা) আইন জালুত-এ যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। মামলুকরা আবার সিরিয়া দখল করে নিল, এবং এর ফলে নিশ্চিতভাবেই পশ্চিম দিকে মোঙ্গলদের অগ্রগতি রুদ্ধ হল।

পরে হুলাগু ফিরে এসেছিলেন এবং সিরিয়া জয় করার উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে মৈত্রী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

আমু দরিয়া থেকে সিরিয়ার সীমান্ত এবং ককেশাস পর্বতমালা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত—পারস্যের মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হুলাগু-ই প্রথম ইল-খান[৯] উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সপ্তম উত্তরসূরি গজন মাহ্‌মুদ (১২৯৫-১৩০৪ খ্রিঃ) পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই উপাধি নেন। গজন মাহ্‌মুদের শাসনকালেই ইসলামধর্ম তার শী'আহ্‌বাদী ঝোঁক সহ রাজধর্মের স্বীকৃতি লাভ করে। ইল-খানদের বা হুলাগুদের আমলে বাগদাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং এটি আল-ইরাক আল-আরাবি নামের একটি প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়। মহান ইল-খান নামে পরিচিত হুলাগু তার প্রজাদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবকেই পছন্দ করতেন। শান্তির সময়ে তিনি লবণ হ্রদ আর্মিয়া-র পূর্বদিকে অবস্থিত মারাগা-তে থাকতে পছন্দ করতেন। এখানেই তিনি বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসহ অনেক অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে প্রাণত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। মোঙ্গলদের প্রথা অনুযায়ী তার সঙ্গে সুন্দরী যুবতীদের কবর দেওয়া হয়। পূর্বতন শাসক

সালজুকদের মতো তিনি ও তাঁর উত্তরসূরিরা পারস্যের অধিবাসীদের প্রশাসনিক দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনমতো ব্যবহারও করেছিলেন। ওই সময়ের দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-জুওয়াইনি (১২৮৩ খ্রিঃ) ও রশীদ-আল-দীন (১৩১৮ খ্রিঃ) তাঁদের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। পারস্যে ইল-খানদের ৭৫ বছরের রাজত্বকালে সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটেছিল।

পূর্বদিকে বন্য মোঙ্গল ও পশ্চিমে ধর্মযুদ্ধের বর্মসজ্জিত নাইটদের প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মনে হয়েছিল যে, ইসলামধর্ম বুঝি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হবে। কিন্তু ওই একই শতাব্দীর শেষভাগে পরিস্থিতির কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল! ইতিমধ্যেই শেষ ধর্মযোদ্ধাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ইল-খানদের অনেকেই খ্রিস্টধর্ম নিয়ে অনুরাগীর ভান করেছে। কিন্তু তাদেরই সপ্তম বংশধর শেষ পর্যন্ত ইসলামকে রাজধর্ম বলে স্বীকৃতি দিল। মুহাম্মাদের মতে বিশ্বাসীদের পক্ষে এটি একটি উজ্জ্বল বিজয়। সালজুকদের ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ ঘটেছিল। যেখানে মুসলিমদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সেখানে তাদের ধর্মাদর্শ জয়লাভ করেছিল। ইসলামি সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য হুলাগুর নির্মম আক্রমণের পর মাত্র অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে তারই প্রপৌত্র গজন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসাবে ওই একই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য অনেক সময় ও উদ্যম ব্যয় করেছিলেন।

● ইসলাম ধর্মের শেষ বীরপুরুষ

ইসলাম ধর্মের সামরিক খ্যাতির সংরক্ষণ এবং নতুন ও বিরাট এলাকা জুড়ে তার বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দেবার কাজ মোঙ্গলরা করেনি। তাদের জ্ঞাতিভাই ও আরবের এই ধর্মের শেষ চ্যাম্পিয়ন অটোমান তুর্কিরা[১০] এই কাজ করেছিল। সুলাইমানের শাসনকালে (১৫২০-৬৬ খ্রিঃ) তাদের রাজত্ব টাইগ্রিসের তীরে অবস্থিত বাগদাদ থেকে দানিয়ুবের তীরে অবস্থিত বুদাপেস্ট পর্যন্ত এবং নীল নদীর প্রথম জলপ্রপাতের কাছে অবস্থিত আস্ওয়ান থেকে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সুলাইমানের বাবা সেলিম যখন উত্তর সিরিয়ায়[১১] মামলুক সেনাদলকে ধ্বংস করেন, সেখান থেকে তাঁরই সঙ্গে-আসা বন্দিদের মধ্যে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিজেকে আল-মুতাওয়াক্কিল বলে পরিচয় দিয়ে আব্বাসীয় খলিফাদের আদর্শ প্রচার করে চলেছিল। এই আব্বাসীয় খলিফারা সেখানে প্রায় ২৫০ বছর ধরে মামলুক সুলতানদের পুতুল হিসাবে রাজত্ব চালাচ্ছিল। বাগদাদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সময় পালিয়ে-আসা আল-মুস্তাসিমের এক পিতৃব্য ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে এই আদর্শ প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন এবং চতুর্থ মামলুক শাসক বেবারস্ (১২৬০-১২৭৭) তাঁকে আল-মুস্তানসির[১২] নাম দিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে কায়রোর খলিফা পদে বসিয়েছিলেন। আল-মুস্তানসির যখন বেবারসের পক্ষে বাগদাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখন শত্রুপক্ষের হঠাৎ আক্রমণে তিনি মারা যান। তারপরই আব্বাসীয় বংশের আর একজন বংশধরও মারা যান। ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে একই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একেও খলিফা পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। সুলতান সেলিম খলিফা

আল-মুতাওয়াক্কিলকে সঙ্গে করে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কায়রো যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিশরের আব্বাসী খিলাফতের পতন ঘটে। যদিও অনেক লেখকই বলেছেন যে, শেষ আব্বাসীয় শাসক যাবতীয় সুবিধা ও অধিকারসহ তার 'খলিফা' খেতাবটি বিজয়ী উসমানীয় তুর্কি বা তার উত্তরাধিকারীদের নিকট কনস্ট্যান্টিনোপলে[১১] সমর্পণ করেছিলেন, তথাপি সমসাময়িক কোন সূত্রে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। ❑

● টীকা ●

১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে, ২৮৬ পাতা।

২ ঈশ্বরের আরাধনায় 'যিনি উপবাস করেন'। শেষ খলিফারা :
৩৪. আল-নাসির (১১৮০-১২২৫)
৩৫. আল-জাহির (১২২৫-২৬)
৩৬. আল-মুস্তানসির (১২২৬-৪২)
৩৭. আল-মুস্তাসিম (১২৪২-৫৮)

৩ রশীদ-আল-দীন, জামি, সম্পাদনা ও অনুবাদ : কোয়াট্রেমেয়ার, ১ম খন্ড, ১৬৬ ও পরের পাতা।

৪ ফাখরি, ৪৫৪ পাতা; রশীদ-আল-দীন, ১ম খন্ড, ২৮৪-৮৫ পাতা।

৫ ফাখরি, ১৯০ পাতা; রশীদ-আল-দীন, ১ম খন্ড, ২৬০ পাতা। ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ও মোঙ্গল শাসনে আল-মাওসিলের গভর্নর ফখর-আল-দীন ইসার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত 'ফাখরি'র বইটি বাগদাদের পতনের এক প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বিবরণ।

৬ রশীদ-আল-দীনের লেখায় ৩০০০, ১ম খন্ড, ২৯৮ পাতা।

৭ মার্কো পোলোর মহান খান ছিলেন অপর ভাই, কুবলাই (১২৯৪ খ্রিঃ) কোলরিজের লেখা কবিতার কুবলা খান। কুবলাই মঙ্গোলিয়ার কারাকোরাম থেকে রাজধানী পিকিং-এ স্থানান্তরিত করেছিলেন। রশীদ-আল-দীন, ১ম খন্ড, ১২৮ পাতা ও ২য় খন্ড দেখুন। সম্পাদনা : ই. ব্লচেট (লিডেন, ১৯১১), ৩৫০ ও পরের পাতা।

৮ আবু-আল-ফিদা, ৩য় খন্ড, ২০৯-১৪ পাতা; রশীদ-আল-দীন, ১ম খন্ড, ৩২৬-৪৯ পাতা; মাকরিজি, সুলুক, অনুবাদ: কোয়াট্রেমেয়ার অ্যাজ সুলতানস মামলুকস, ১ম খন্ড (পার্ট ২), ৯৬৩ এবং পরের পাতা।

৯ তুর্কি ইল অর্থাৎ 'উপজাতি' তুর্কি খান অর্থাৎ 'মালিক' উপজাতির প্রভু, অধস্তন প্রধান, দূরবর্তী মঙ্গোলিয়া, গোবি মরুভূমির উত্তরে, পরে পিকিং-এ খাকান (মহান খান)-দের প্রতি সামন্ত আমলের শ্রদ্ধাকেই নির্দেশ করে।

১০ তাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা উসমান (জন্ম ১২৫৮ খ্রিঃ)-এর অনুকরণেই ওইভাবে ডাকা হত।

১১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৬৭৭ ও ৭০৫ পাতা।

১২ আবু-আল-ফিদা, ৩য় খন্ড, ২২২ পাতা। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৬৭৬ পাতা।

১৩ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ১১৬ পাতা; নিচে, ৭০৫ পাতা।

চতুর্থ ভাগ

ইউরোপে আরব অভিযান : স্পেন ও সিসিলি

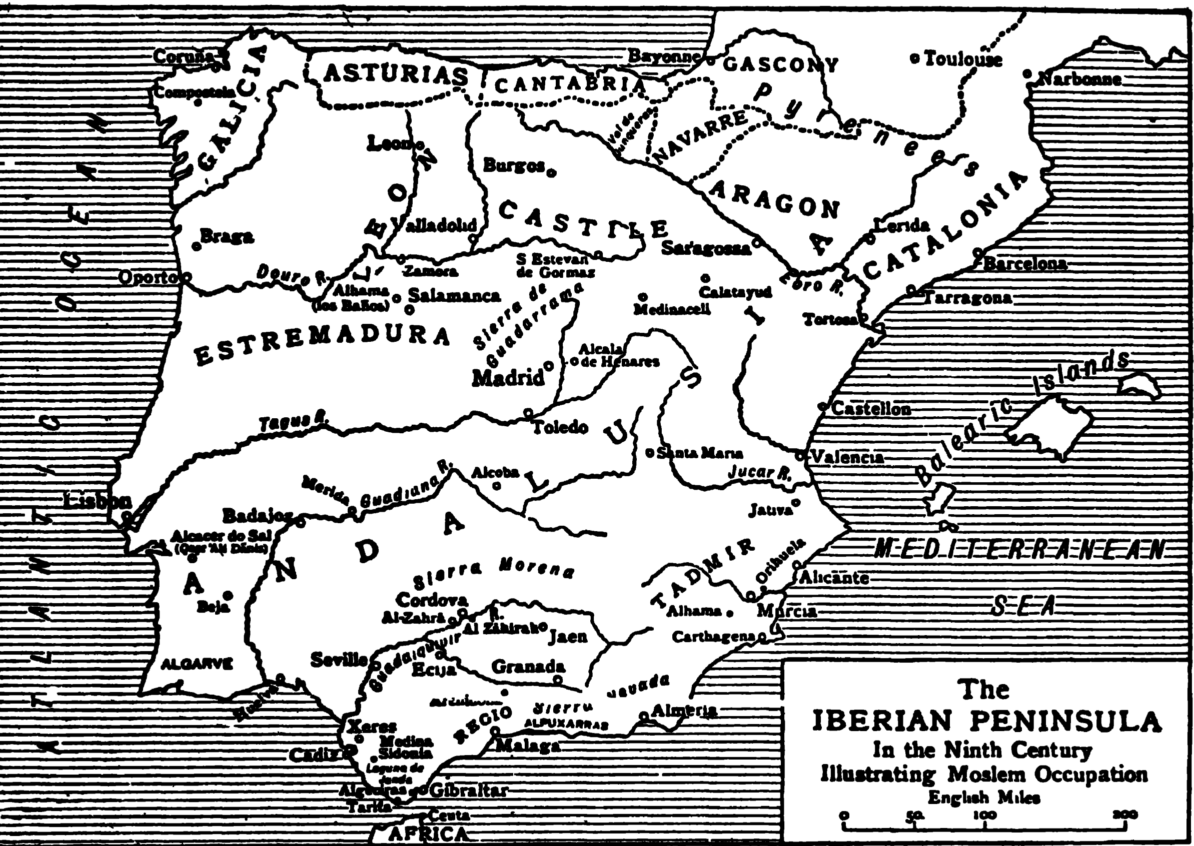
॥ অধ্যায় ৩৪ ॥

স্পেন বিজয়

● গথ রাজত্বের পতন

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশদ্বার আইবেরিয়ার উপদ্বীপে মুসলিমদের অভিযানকে আরবদের শেষ ও সবচেয়ে নাটকীয় বড় ধরনের সামরিক অভিযান বলে আখ্যা দেওয়া যায়। তুর্কিস্তান জয়কে যেমন এশিয়া ও মিশরে আরবদের সুদূরতম রাজ্য বিস্তার বলে উল্লেখ করা যেতে পারে, তেমনি আইবেরিয়ার উপদ্বীপে আরবদের অভিযানটি আফ্রিকা ও ইউরোপের দূরতম অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিমদের সম্প্রসারণ রূপে গণ্য হতে পারে।

সামরিক অভিযানের দ্রুততা ও সাফল্যের পরিপূর্ণতার দিক থেকে স্পেনে এই অভিযানটি মধ্যযুগের সামরিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ৭১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম সামরিক অভিযান শুরু হয়। উমাইয়া আমলে উত্তর আফ্রিকার বিশিষ্ট গভর্নর মূসা ইবন-নুসাইরের একজন সহচর তারীফ[১] ৪০০ জন পদাতিক ও একশো অশ্বারোহী নিয়ে ইউরোপ মহাদেশের সুদূরতম দক্ষিণ প্রান্তের এই ছোট উপদ্বীপে এসে নামেন। এই উপদ্বীপটির বর্তমান নাম তারীফা, কারণ সেই অভিযানের পর থেকেই এটি জাজিরাত (দ্বীপ) তারীফ[২] নাম বহন করে চলেছে। প্রায় ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে মূসা গভর্নর পদে আসীন ছিলেন। কার্থেজের পশ্চিমাঞ্চল থেকে তিনি বাইজান্টাইনদের চিরতরে তাড়িয়ে ছিলেন এবং ধীরে ধীরে আটলান্টিক পর্যন্ত তাঁর বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিলেন। এইভাবেই তিনি ইউরোপ আক্রমণের জন্য মুসলিমদের হাতে মোক্ষম অস্ত্র (Point d' appui) তুলে দিলেন। তারীফের সাফল্য ও স্পেনের ভিসিগথিক রাজবংশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এবং রাজ্য জয়ের থেকে লুঠের মালের ভাগ পাবার লোভে তাড়িত হয়ে মূসা ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তার মুক্তিপ্রাপ্ত বার্বার ক্রীতদাস তারিক ইব্‌ন-জিয়াদকে ৭০০০ লোক সহ স্পেনে পাঠালেন। এদের অধিকাংশই ছিল বার্বার। স্পেনের বিশাল পর্বতের কাছে তারিক তাঁর লোকজন-সহ নামলেন এবং সেই থেকে পর্বতটি পরিচিত হল জাবাল তারিক (জিব্রাল্টার-এর শৃঙ্গ)[৩] নামে। আর এর মধ্য দিয়েই তারিকের নাম অমর হয়ে রয়েছে। কথিত আছে যে জিব্রাল্টার প্রণালী যেখানে মাত্র ১৩ মাইল চওড়া সেখানে অবস্থিত সেউতা[৪]-র কাউন্ট ও এক আধা-পৌরাণিক জুলিয়ান[৫] এই অভিযানের জাহাজগুলি সরবরাহ করেছিলেন।



The
IBERIAN PENINSULA
In the Ninth Century
Illustrating Moslem Occupation
English Miles
0
50
100
200
ATLANTIC OCEAN
MEDITERRANEAN
SEA
Balearic Islands
AFRICA
GALICIA
ASTURIAS
CANTABRIA
GASCONY
NAVARRE
ARAGON
CATALONIA
CASTILE
LEON
ESTREMADURA
ANDALUS
TADMIR
ALGARVE
Pyrenees
Sierra de Guadarrama
Sierra Morena
Coruña
Compostela
Bayonne
Toulouse
Narbonne
Leon
Burgos
Braga
Valladolid
Saragossa
Lerida
Barcelona
Tarragona
Oporto
Zamora
S Estevan de Gormaz
Calatayud
Medinaceli
Tortosa
Alhama (los Baños)
Salamanca
Alcala de Henares
Madrid
Castellon
Toledo
Santa Maria
Valencia
Lisbon
Alcoba
Jativa
Badajoz
Alcacer do Sal
Orihuela
Alicante
Beja
Cordova
Al-Zahra
Al Zahirah
Jaen
Alhama
Murcia
Carthagena
Seville
Ecija
Granada
Almeria
Xeres
Medina Sidonia
Malaga
Cadiz
Gibraltar
Algeciras
Tarifa
Ceuta
Douro R.
Tagus R.
Ebro R.
Jucar R.
Guadiana R.
Merida
ALPUXARRAS
REGIO

১২,০০০ সেনাকে সঙ্গে নিয়ে তারিক ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই জনডা[৬] উপহ্রদের তীরে বারবেট নদীর[৭] মোহনায় রাজা রডরিকের সেনাদের মুখোমুখি হলেন। রডরিক তাঁর পূর্বসূরি উইতিজার-এর ছেলেকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন[৮] দখল করেছিলেন। উইতিজার-এর ভাই বিশপ ওপাস ছিলেন রাজার রাজনৈতিক শত্রুদের নেতা। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই ২৫০০০ সেনার ভিসিগথিক সেনাবাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হল। কিন্তু রডরিকের কী হয়েছিল তা এখনও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। স্পেনীয় ও আরবীয় ধারাবিবরণীতে বলা হয়েছে যে, তিনি ঘটনাস্থল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

এই চূড়ান্ত বিজয়ের পরে স্পেনের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের অগ্রগতি একটা শোভাযাত্রায় পরিণত হল। যে সমস্ত শহরগুলিতে ভিসিগথিক নাইটদের প্রাধান্য ছিল, তারাই একমাত্র কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারিক তাঁর বেশির ভাগ সেনাদের নিয়ে ইসিজার মধ্য দিয়ে রাজধানী টলেডোর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বেশ কিছু সেনাদের প্রতিবেশী শহরগুলিতে পাঠালেন। দক্ষিণের শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত সেভিল এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। একটি সেনাদল কোনরকম প্রত্যাঘাতের মুখোমুখি না হয়েই আর্কিডোনা দখল করল, আর একটি সেনাদল দখল করল এলভিরা। বর্তমানে যেখানে গ্রানাডা অবস্থিত তারই কাছাকাছি এলভিরার স্থান। এটি খুব সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে নিল। মুগীস আল-রুমি (রোমান, গ্রিক)-র নেতৃত্বাধীন অশ্বারোহী সেনাসহ তৃতীয় সেনাদলটি কর্ডোভা আক্রমণ করল। দু'মাস বাঁচিয়ে রাখার পর এক মেষপালকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলিমদের এই ভবিষ্যৎ রাজধানীটি আক্রমণকারীদের হাতে তুলে দিতে হল। বলা হয় যে, ওই বিশ্বাসঘাতকটি প্রাচীরের গায়ে একটি ফাটলের[৯] কথা আক্রমণকারীদের জানিয়ে দিয়েছিল। মালাগা কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এই অভিযানের সবচেয়ে তীব্র লড়াই হয়েছিল ইসিজাতে এবং শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীরাই বিজয়ী হয়। কিছু ইহুদি অধিবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভিসিগথদের রাজধানী টলেডো আক্রমণকারীদের হস্তগত হল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে তারিকের নেতৃত্বে এক সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল, আর গ্রীষ্মের শেষে তিনিই অর্ধেক স্পেনের শাসকে পরিণত হলেন। এই অভিযান সফল করার পথে তিনি একটি গোটা রাজত্ব ধ্বংস করে ছিলেন।

● মূসার জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম

তাঁর লেফটেন্যান্টের অপ্রত্যাশিত ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে মূসা ১০,০০০ সেনা নিয়ে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে স্পেনে ছুটে গেলেন। এই সেনাদের সকলেই ছিল আরব ও সিরিয়ার আরব। তারিক যে সমস্ত শহর এবং শক্ত ঘাঁটিগুলি এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই মেডিনা সিডোনিয়া ও কারমোনার মতো শহর ও শক্তঘাঁটিগুলিকেই মূসা বেছে নিয়েছিলেন আক্রমণের জন্য। স্পেনের শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র ও সবচেয়ে বড় শহর

এবং এক সময়ের রোমান রাজধানী সেভিল ৭১৩ খ্রিস্টাব্দের জুনের শেষ পর্যন্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মেরিডাতে তারা সবচেয়ে দুর্দমনীয় প্রতিরোধের সামনে পড়েছিল। এক বছর ধরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর ঝোড়ো আক্রমণে ৭১৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন[১১] এই শহরটির পতন ঘটে।

টলেডো শহরের মধ্যে বা কাছাকছি কোন স্থানে মূসার সঙ্গে তারিকের দেখা হয়। শোনা যায়, সামরিক অভিযানের প্রথম দিকে[১২] আক্রমণ শানানোর যে আদেশ মূসা দিয়েছিলেন, তা অমান্য করার জন্য তিনি তারিককে চাবুক মারেন এবং শিকলে বেঁধে রাখেন। কিন্তু বিজয় অভিযান চলতেই থাকে। শীঘ্রই আক্রমণকারীরা উত্তর দিকে সারাগোসাতে (সিজারিয়া অগাস্টা, সিজারাগাস্টা) পৌঁছায় এবং মুসলিম সেনাবাহিনী অ্যারাগন, লিঁয়, অস্টারিয়াস ও গ্যালিসিয়ার উচ্চভূমির মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। সেই একই বছরের বসন্তকালে খলিফা আল-ওয়ালীদ দূরবর্তী দামাস্কাসে ডেকে পাঠান মূসাকে। যে অভিযোগে মূসা তার অধস্তন কর্মচারীকে অভিযুক্ত করেছিলেন, খলিফা সেই একই অভিযোগে অর্থাৎ ওপরওলার আদেশ অমান্য করে স্বাধীনভাবে কাজ করার অপরাধে মূসাকে অভিযুক্ত করলেন। কারণ খলিফাই ছিলেন ইফরিকিয়ার গভর্নর মূসার একমাত্র ওপরওলা।

● বিজয়বাহিনীর জয়যাত্রা

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদ-আল-আযীযের হাতে দখল-করা নতুন অঞ্চলটির কর্তৃত্বভার তুলে দিয়ে মূসা ধীর গতিতে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে চললেন। যাত্রাপথে অফিসার, মুকুট ও সোনার বেল্টে সজ্জিত ৪০০ ভিসিগথিক রাজপুত্র তাঁর সঙ্গী ছিলেন অফিসাররা এবং আর তাদের পিছনে চলল লুঠ করা প্রচুর সম্পদ[১৩] নিয়ে ক্রীতদাস ও যুদ্ধবন্দিদের এক বিশাল বাহিনী। উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এই রাজকীয় বাহিনীর জয়যাত্রা-র বর্ণনা আরবের ঐতিহাসিকদের এক অতি প্রিয় বিষয়। এর বর্ণনা আমাদের অতীতের রোমান জেনারেলদের জয়যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী এই জয়যাত্রার খবর বিজয়মিছিলের চেয়েও দ্রুতগতিতে দামাস্কাসে ছড়িয়ে পড়ে। টাইবেরিয়াসে পৌঁছে মূসা দেখেন যে, রাজধানী অভিমুখে তাঁর অভিযান বিলম্বিত করার জন্য, অসুস্থ আল-ওয়ালীদের ভাই ও উত্তরসূরি সুলাইমানের আদেশ ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে। এই আদেশের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ভবিষ্যত খলিফার সিংহাসনে[১৪] আরোহণ করার মুহূর্তটি যাতে মূসার বাহিনীর রাজধানীতে প্রবেশের দ্বারা আরও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৭১৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মূসা রাজকীয় অলংকারে সজ্জিত ভিসিগথিক রাজপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে দামাস্কাসে প্রবেশ করলেন এবং আল-ওয়ালীদ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সুন্দর উমাইয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে মর্যাদা ও আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত রাজ-পরিবারের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি মুসলিমদের বিজয়ের ইতিহাসে অন্যতম উচ্চ আসনে

বসতে পারে। এই প্রথম কয়েকশো পশ্চিমি রাজা ও কয়েক হাজার ইউরোপীয় ইসলাম-বিশ্বাসীদের সেনাপতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গিয়েছিল। অন্যান্য ট্রফি ছাড়াও মূসা একটি উৎকৃষ্ট টেবিল (মায়িদা) খলিফাকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজা সলোমনের সেবায় নিযুক্ত অশরীরী শক্তিগুলিই নাকি এই উৎকৃষ্ট টেবিলটির রূপকার ছিল। লোককথা থেকে জানা যায় যে, এই সুন্দর শিল্পকর্মটি জেরুসালেম থেকে রোমানরা তাদের রাজধানীতে বয়ে এনেছিল এবং সেখান থেকেই পরে গথরা এটি দখল করে। এই সুন্দর টেবিলটিকে মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজানোর ব্যাপারে প্রতিটি গথিক রাজাই তার পূর্বসূরিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। টলেডোর গির্জাতে এই সম্পদ রাখা ছিল এবং সম্ভবত যে-বিশপ এই সম্পদ নিয়ে রাজধানী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর কাছ থেকেই তারিক সেটি দখল করে নেন। কথিত আছে যে, মূসা যখন টলেডোতে তাঁর কাছ থেকে টেবিলটি দখল করেন তখন তারিক তার একটি পায়া লুকিয়ে রেখেছিলেন! সংবর্ধনার সময় খলিফার উপস্থিতিতেই তারিক তার কর্মকৃতিত্বের[১৫] প্রমাণ হিসেবে নাটকীয়ভাবে সেই হারানো অংশটি হাজির করেন।

● মর্যাদার আসন থেকে মূসার অবনমন

অন্যান্য বহু সফল আরব জেনারেলদের মতো মূসার জন্যও একই পরিণতি অপেক্ষা করেছিল। আল-ওয়ালীদের উত্তরসূরির হাতে তাঁকে চরমভাবে অপমানিত হতে হল। বিধ্বস্ত না-হওয়া পর্যন্ত প্রখর সূর্যালোকে দাঁড় করিয়ে রেখে তাকে হেনস্থা করার পাশাপাশি তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা ও স্পেনের এই বয়স্ক বিজয়ীকে আল-হিজাজের দূরবর্তী গ্রাম ওয়াদি আল-কুরা[১৬]-তে ভিখারির জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

● বিজয়ের কারণ

স্পেন এখন খলিফা সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। তার আরবী নাম হল আল-আন্দালুস[১৭]। দ্বীপের পূর্ব ও উত্তর দিকের অল্প কিছু অঞ্চলমাত্র মূসার ঠিক পরবর্তী উত্তরসূরির দখল করতে বাকী ছিল। আর খুব অল্প কয়েকটি বিদ্রোহ তাকে দমন করতে হয়েছিল। মাত্র সাত বছরের মধ্যে মধ্যযুগের ইউরোপের সুন্দরতম ও বৃহত্তম প্রদেশগুলির অন্যতম এই দ্বীপটি তারা জয় করে নিয়েছিল। অন্তত কয়েক শতাব্দী ধরে এই দ্বীপটি বিজয়ীদের দখলেই ছিল।

উপরের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থেকে এই অভূতপূর্ব জয়ের কারণগুলি খুঁজে বের করা আদৌ শক্ত নয়। প্রথমত পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে যে ভিসিগথরা (পশ্চিম গথ) স্পেনে প্রবেশ করার পর তাদের ও স্পেনীয়-রোমান জনসাধারণের মধ্যে যে জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাদের পূর্বসূরি সুয়েভি ও ভান্ডালদের স্থানচ্যুত

করার জন্য গথদের দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করতে হয়েছিল। এই পূর্বসূরিরা ছিল অনেকটা আগ্রাসনকারী জার্মান যোদ্ধাজাতির অনুরূপ। ভিসিগথরা প্রায় নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী রাজাদের মতোই তাদের শাসন চালাত। ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে রিকেয়ার্ড নামে তাদেরই একজন দেশীয় মানুষের ক্যাথলিক ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত ভিসিগথরা খ্রিস্টান ধর্মের আরিয়ানিজম মতবাদ অনুসরণ করত। ক্যাথলিক হিসাবে সাধারণ মানুষ প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী গথদের ঘৃণা করত। এরকম দেশীয় মানুষদের সঙ্গে বেশ ভাল সংখ্যক ক্রীতদাসের মতো দায়ে আবদ্ধ কৃষক ও ক্রীতদাসরাও তাদের দুর্দশায় অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং, এই ক্রীতদাসরা যে আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিল এবং তাদের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহুদিরাও ছিল। গথিক রাজারা ধর্মগত কারণে এদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতন চালিয়ে জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা ৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত রাজার নির্দেশে পরিপূর্ণতা লাভ করল। এই নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, সমস্ত ইহুদিকে ধর্মান্তরিত হতে হবে, অন্যথায় তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এর থেকেই বোঝা যায়, মুসলিম আক্রমণকারীরা যখন স্পেনের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিল, তখন কেন বিজিত শহরগুলির দায়িত্বভার ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, গথ রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মতানৈক্য ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রাজবংশের পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে গথিক অভিজাত সম্প্রদায়, আঞ্চলিক-প্রভুতে পরিণত হল। অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজনের সিংহাসন দখলের সময়েই মুসলিম আক্রমণ ঘটেছিল। ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতাচ্যুত পূর্বসূরি-র আত্মীয়েরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। উইতিজার-এর ক্ষমতাচ্যুত পুত্র অ্যাকিলার একটা সরল ধারণা ছিল যে আরবরা তাঁর হয়েই যুদ্ধ করছে। তাই আরবদের টলেডো জয়ের পর সেখানে তাঁর জমিদারি পুনরুদ্ধার হওয়ায় অ্যাকিলা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেখানে তিনি খুব আড়ম্বরে জীবনযাপন করতে থাকেন। তাঁর পিতৃব্য বিশপ ওপাসকে রাজধানীর প্রধান গির্জার বিশপ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তবে এই যুদ্ধজয়ে জুলিয়ানের ভূমিকা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বড় বেশি অতিরঞ্জিত।

● পিরেনিজ-এর ওপারে

সারাগোসার পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার শেষ বাধাগুলির একটি ভেঙে পড়ল। কিন্তু রয়ে গেল পিরেনিজ। মূসা কখনই তাদের অতিক্রম করতে পারেননি, যদিও কয়েকজন আরব ইতিহাস রচয়িতা তাঁকে সেই কৃতিত্ব দিয়েছেন এবং আশা করেছিলেন যে, ফ্রাঙ্কদের দেশ অতিক্রম করে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলের মধ্য দিয়ে দামাস্কাসে গিয়ে

খলিফার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আসলে এটাকে খুব অদ্ভুত বলে মনে হলেও, আরব আক্রমণকারীরা কিন্তু ইউরোপে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের ভৌগোলিক মানচিত্র সম্পর্কে তাদেব জ্ঞান ছিল খুবই কম। বাস্তবে মূসার তৃতীয় উত্তরসূরি আল-হুর ইবন-আবদ-আল-রহমান আল-সাকাফি[১১] ৭১৭ বা ৭১৮ খ্রিস্টাব্দে ওই সীমা অতিক্রম করেছিলেন।

ফ্রান্সের সন্ন্যাসীদের মঠ ও গির্জার প্রভূত সম্পত্তিতে লুব্ধ হয়ে এবং মেরোভিঞ্জিয়ান রাজদরবারের প্রধান অফিসারগণ ও অ্যাকুইটেন (ল্যাটিন ভাষায়, অ্যাকুইটেনিয়া)-এর ডিউকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে উৎসাহিত হয়ে আল-হুর সামরিক অভিযান শুরু করেন এবং তাঁর উত্তরসূরি আল-সামহ্ ইবন-মালিক আল-খাওলানি তা অব্যাহত রাখেন। ৭২০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা দ্বিতীয় উমারের রাজত্বকালে আল-সামহ্, সেপ্টিমানিয়া ও নারবন (আরবীতে, আরবুনাহ্) দখল করেন। সেপ্টিমানিয়া ছিল ভেঙে যাওয়া ভিসিগথিক রাজত্বের ওপর নির্ভরশীল একটি প্রদেশ। পরে একটি অস্ত্রাগার এবং সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার-সহ নারবনকে একটি বিরাট দুর্গে পরিণত করা হয়। কিন্তু পরের বছরেই অ্যাকুইটেন-এর ডিউক ইউদিসের শাসনকেন্দ্র তুলুজে তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হয়। অ-মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আল-সামহ্ "শহীদের মৃত্যু"[২০] বরণ করেন। এই প্রথম মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে একজন জার্মান রাজপুত্র জয়লাভ করেন। পিরেনিজের সীমানাব ওপারে আরবদের সামরিক অভিযানগুলি সাফল্যের মুখ দেখেনি।

● তুর-এর যুদ্ধ

আমির আল-সামহ্-এর উত্তবসূরি আবদ-আল-রহমান ইব্‌ন-আবদুল্লা আল-গাফিকির উত্তরদিকে শেষ ও সবচেয়ে বড় অভিযান ছিল স্পেনে। তিনি পশ্চিম পিরেনিজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ৭৩২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালের প্রথম দিকে এটিকে অতিক্রম করে গেলেন। গারোন নদীর তীরে ডিউক ইউদিসকে পরাজিত করে তিনি বোর্দো-র ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন এবং এর গির্জাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। পয়টিয়ারস্-এর প্রাচীরের বাইরে একটি রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উত্তর দিক দিয়ে তিনি তুর-এর প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেলেন। গলসের ধর্মপ্রচারক সাঁ মার্তার দেহ কবরস্থ ছিল বলে তুর ছিল গলসের কাছে এক ধর্মীয় তীর্থস্থান। এখানকার ব্রত উদযাপন কল্পে কৃতকর্মাদি নিঃসন্দেহে আগ্রাসনকারীদের কাছে ছিল প্রধান আকর্ষণ।[২১]

তুর ও পয়টিয়ারস এর মধ্যে ক্লেন ও ভিয়েনে-এর সংযোগস্থলে মেরোভিঞ্জিয়ান রাজদরবারের মেয়র চার্লস মার্টেল এর সঙ্গে আবদ-আল-রহমানের দেখা হল। ডিউক ইউদিস এই চার্লসেরই কাছে সাহায্য চেয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। পরে 'মার্টেল' (হাতুড়ি) পদবিটি তিনি লাভ করেছিলেন. এর থেকেই বোঝা যায় যে চার্লস ছিলেন বীর ও

সাহসী। তিনি বহু শত্রুকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন এবং যে ইউদিস অ্যাকুইটেন-এ স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন, তাকে তিনি উত্তরের ফ্রাঙ্কদের আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছিলেন। নামে রাজা না হলেও হেরিসটালের অধিবাসী পিপিন-এর অবৈধ সন্তান চার্লস-ই ছিলেন আসল রাজা।

সাতদিন ধরে আবদ-আল-রহমানের নেতৃত্বাধীন আরব সেনাবাহিনী এবং চার্লসের নেতৃত্বাধীন নেকড়ের চামড়া পরিহিত ও কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়া দীর্ঘ জটাধারী ফ্রাঙ্ক পদাতিক সেনারা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে যুদ্ধ শুরুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝে মাঝে ছোটখাট হাতাহাতিও চলল। শেষ পর্যন্ত ৭৩২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক শনিবার আরব সেনাপতিই আক্রমণ শুরু করলেন। যুদ্ধের মধ্যে ফ্রাঙ্ক সেনারা একটা ফাঁপা চতুর্ভুজ তৈরি করল শক্ত প্রাচীরের মতো, এক খণ্ড বরফের মতো অনমনীয় ভাবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করল। তাদের প্রতিরোধকে এক পশ্চিমি ঐতিহাসিক[১২] এভাবেই বর্ণনা করেছেন। শত্রুপক্ষের ছোট অশ্বারোহী বাহিনীও ব্যর্থ হল। কোন ফাঁকফোকর না রেখেই তরবারি দিয়ে ফ্রাঙ্ক সেনারা তাদের সমস্ত শত্রু সৈন্যদের হত্যা করল। আবদ-আল-রহমান নিজেও নিহত হলেন। অবশেষে রাতের অন্ধকার উভয় পক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। পরের দিন ভোরবেলা শত্রুশিবিরের নিস্তব্ধতা দেখে চার্লস এটিকে একটি ছল বলে সন্দেহ করলেন। আসল ঘটনা জানার জন্য গুপ্তচর পাঠানো হল। জানা গেল যে, রাতের অন্ধকারে আরবেরা তাদের শিবির ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইভাবে চার্লস বিজয়ী হলেন।

বা তুর-এর এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বড় বেশি অতিরঞ্জিত করে
হিনীগুলি এটিকে নানাভাবে অলংকৃত করে তুলেছিল। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ভূমিকা প্রায় নীরব। মুসলিমদের কাছে এটি বালাত আল-শুহাদা[১৩], শহীদদের স্মৃতিক্ষেত্র রূপে পরিগণিত। খ্রিস্টানদের মতে, এই দিনটি তাদের চিরকালীন শত্রুদের সামরিক অভিযানের ইতিহাসে একটি দিক-পরিবর্তনের প্রতীক। সেদিন যদি আরবরা জয়লাভ করত তা হলে গিবন[১৪] ও তার পরে অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা প্যারিসে ও লণ্ডনের যেখানে যেখানে এখন গির্জা রয়েছে তার পরিবর্তে সেখানে মসজিদ দেখতে পেতেন এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বাইবেলের পরিবর্তে কোরান পাঠ শুনতে পেতেন। আধুনিক যুগের বহু ঐতিহাসিকের কাছে, তুর-এর যুদ্ধটি ইতিহাসের[১৫] চূড়ান্ত যুদ্ধগুলির অন্যতম। বাস্তবে অবশ্য এই যুদ্ধের দ্বারা কোন কিছুরই নিষ্পত্তি হয়নি। জিব্রাল্টারের শুরুর জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই হাজার মাইল দূরে এসে আরব-বার্বারদের এগিয়ে চলার গতি একটা স্বাভাবিক স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছিল। তাদের অভিযান গতি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। দুটি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা আবদ-আল-রহমানের সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে শুরু করেছিল। আরবদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও অনুভূতির ঐক্য ছিল না। এটা সত্য যে, এই স্থানেই মুসলিমদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই তাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত

ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে তারা অ্যাভিগনন দখল করেছিল; ন'বছর পরে তারা লাইয়োঁ লুঠ করল এবং ৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের আগে তারা তাদের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে রণনীতিগত দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি নারবোন-এর দখল ছেড়ে দেয়নি। যদিও তুর-এর এই পরাজয় আরবদের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার প্রধান কারণ ছিল না, তবুও এর দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সুদূরতম সীমা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদের মৃত্যুর একশো বছর পরে দামাস্কাসে তাঁর উত্তরসূরির সাম্রাজ্য চীন থেকে গল[১৬] পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে এক বিশ্ব-সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

● গৃহযুদ্ধ

৭৩২ খ্রিস্টাব্দে তুর-এর যুদ্ধ ও ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া বংশের প্রথম আবদ-আল-রহমানের বীরত্বপূর্ণ আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়কার ইতিহাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্পেনের মুসলিমদের দু'টি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব ছিল আসলে উত্তর আরবীয় বা মুযারীয়দের[১৭] সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় বা ইয়ামানীয়দের সেই পুরানো রেষারেষি। সর্বত্রই ইয়ামানীয়রা শী'আহ্ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল, পক্ষান্তরে মুযারীয়রা ছিল সুন্নি রক্ষণশীল ভাবাদর্শের অনুগামী। আব্বাসীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সময়ে ইয়ামানীয় বা আলীপন্থিরা স্বাভাবিকভাবেই নতুন রাজত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আর অন্যরা ছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়া বানু-উমাইয়া রাজবংশের অনুগামী। স্পেন বিজয়ের পরে আফ্রিকা থেকে বার্বাররা দলে দলে এসে এই দ্বীপটিতে ভিড় জমিয়েছিল। এখানেই তাদের অনেকে খারিজি আদর্শে দীক্ষিত হয় এবং উমাইয়া ও আলীপন্থিদের বিরুদ্ধে নিজেদের মত প্রচার করতে থাকে। এরাই তখন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা সৃষ্টিকারী কারণে পরিণত হয়েছিল। তারা অভিযোগ করেছিল যে, তাদের জাতি যুদ্ধের মূল চাপটা বহন করলেও তাদের দেওয়া হয়েছিল মধ্যভাগের অনুর্বর মালভূমি, অথচ আরবরা তাদের জন্য আন্দালুসিয়ার সবচেয়ে শস্যশ্যামলা প্রদেশগুলি আদায় করে নিয়েছিল।

অসন্তোষ শীঘ্রই প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপ নিল। কয়েক বছর (৭৩৪-৪২ খ্রিঃ) ধরে মরক্কো থেকে আল-কায়রাওয়ান পর্যন্ত জ্বলতে থাকা বার্বার বিদ্রোহের আগুন স্পেনেও ছড়িয়ে পড়ল এবং গুটিকয়েক আরব ঔপনিবেশিক শাসকদের উৎখাত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। ৭৪১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হিশাম আফ্রিকার মানুষদের ওই বিদ্রোহ[১৮] দমনের জন্য ২৭,০০০ সিরীয় সেনাকে পাঠালেন। সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ বলজ ইবন-বিশর আল-কুশাইরির নেতৃত্বে জিব্রালটার প্রণালী পার হল। সিরিয়ার সেনারা ঔপনিবেশিক শাসকে পরিণত হল এবং উচ্চকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উমাইয়া রাজবংশের প্রতি তাদের অবিচল আনুগত্য ইতিমধ্যেই সৃষ্ট এক জটিল পরিস্থিতিতে এক নতুন সমস্যার জন্ম দিল। বলজ সরকার দখল করলেন এবং পরবর্তী কর্ডোভায় তাঁর লোকদের প্রশাসনের উচ্চ পদে

বসালেন। তারপরে অশান্ত সিরিয়ানরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। হিমস-এর সেনাদল সেভিলে, প্যালেস্টাইনে থাকা সেনারা মেদিনা সিদোনিয়া ও অ্যালজেসিরাস-এ, দামাস্কাসের সেনারা এলভিরা জেলায় এবং কিন্নাসরিন-এর সেনারা জেন জেলায় স্থায়ী ঘাঁটি গড়ল। এই সময়কার নৈরাজ্যের প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ৭৩২ থেকে ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার স্বল্প সময়ে স্পেনে ২৩ জন গভর্নর একের পর এক ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। এই সময়ে যদিও বেশ কিছু সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল এবং এতে কয়েকজন গভর্নর 'শহীদের মৃত্যু' বরণ করেছিলেন তবুও এই অবস্থায় উত্তর দিকে শত্রুর দেশে বিশেষ কিছু অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়নি।

● আমির সাম্রাজ্য

দ্বীপের শাসন চালানোর ভার ছিল একজন আমিরের হাতে। আনুষ্ঠানিক ভাবে আল-কায়রাওয়ানে বসবাসকারী গভর্নর-জেনারেল আল-মাগরিব (উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন)-এর অধীনে থাকলেও বাস্তবে তিনি স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমির, দামাস্কাসের খলিফা ও মূসা ইব্‌ন-নুসাইরের ছেলে আবদ-আল-আযীযের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পেতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অধীনেই কাজ করতেন। প্রথম আমির তাঁর রাজধানী হিসেবে সেভিল (ইশবিলিয়া)-কে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি রাজা রডরিকের বিধবা স্ত্রী ইজিলোনাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম বদলে হয়েছিল উম (আসিমেব মা) আসিম। আল-ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁর এই নতুন খ্রিস্টান স্ত্রী ভিসিগথিক রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী তার স্বামীকে একটি মুকুট পরতে এবং রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্য মাথা নিচু না করে যাতে কেউ রাজদরবারে ঢুকতে না পারে তার জন্য সেখানকার প্রবেশদ্বার অত্যন্ত ছোট করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার নিজের প্রাসাদের ভজনালয়ে প্রবেশের দরজা তিনি এত ছোট করার ওপর জোর দিয়েছিলেন যাতে আবদ-আল-আযীয যখন সেখানে ঢুকবেন তখন তাকেও যেন আরাধনার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করতে হয়। এই সমস্ত নতুন নতুন উদ্ভাবনাকে কেন্দ্র করে গুজবগুলি শেষ পর্যন্ত অতিরঞ্জিত হয়ে মুসলিম আমিরকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কৌশল সংক্রান্ত কাহিনীতে পরিণত হয়ে খলিফা সুলাইমানের কানে পৌঁছায় এবং তার ফলে মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেনের প্রথম গভর্নরকে হত্যা করা হয়। সেই সময়ে সেভিলির কাছে অবস্থিত সান্তা রুফিনায় সন্ন্যাসিনীদের মঠে-র কাছে ৭১৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিয়োগান্তক ঘটনাটি ঘটেছিল। সম্ভবত মঠটি তারপর মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাব কাটা মুণ্ডুটি দামাস্কাসে পাঠানো হয় এবং সেখানে তার বয়স্ক ও হতভাগ্য বাবা আবদ-আল-আযীযকে সেটি দেখানো হয়।

তিন বছর পরে ক্ষণজীবী আমিরদের চতুর্থ জন আল-সামহ্ ইবন-মালিক আল-খাওলানি তাঁর রাজধানী কর্ডোভা (করতবা)-তে স্থানান্তরিত করেন। বেশ কয়েক শতাব্দী পরে এটিই

ছিল পশ্চিমের উমাইয়া রাজবংশের উৎকৃষ্ট বাসস্থান। আল-সামহ্ জমির নতুন সমীক্ষা করেন, কর আরোপের নতুন পদ্ধতি চালু করেন এবং কর্ডোভাতে পুরানো রোমান কাঠামোর ওপরে গুয়াদালকুইভির[৩১] ওপর দিয়ে সেতুটি পুনর্নির্মিত করেন। আল-সামহ্-র মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই গভর্নরের পদটি মুযারীয় ও ইয়ামানীয়দের মধ্যে একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর উভয় পক্ষই একটি সুন্দর পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তা হল, এক বছর অন্তর এক এক পক্ষের মনোনীত সদস্য ওই পদে আসীন হয়ে রাজ্য শাসন করবে।

ইউসুফ ইবন-আবদ-আল-রহমান আল-ফিহ্রি[৩২] ছিলেন মুযারীয়দের মনোনীত প্রথম গভর্নর। তিনি ছিলেন আল-কায়রাওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা উকবা-র একজন বংশধর। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৬ খ্রিঃ) তাঁর মনোনয়নে[৩৩] সম্মতি দেন। কিন্তু বছর শেষ হবার পর ইউসুফ উভয় পক্ষের মেনে নেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী ইয়ামানীয় প্রার্থীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন এবং প্রায় দশ বছর[৩৪] ধরে তাঁর শাসন চালিয়ে যান। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে তিনি যখন একটি বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন খবর এসে পৌঁছায় যে আবদ-আল-রহমান ইব্‌ন-মু'আবিয়া নামে এক উমাইয়া যুবক গ্রানাডার দক্ষিণ উপকূলে এসে নেমেছেন এবং আমির সাম্রাজ্য দখল করতে এগিয়ে চলেছেন। এর পর স্পেনের ইতিহাসে এক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। ❑

● টীকা ●

১ তিনি আরব না বার্বার ছিলেন, তা নিশ্চিত নয়। সি. এফ. মাক্কারি (লিডেন), ১ম খণ্ড, ১৫৯ পাতা; ইব্‌ন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পাতা; ইব্‌ন-ইয্হারি, সম্পাদনা : ডোজি, ২য় খণ্ড, ৬ পাতা ; অনুবাদ : ফাগনান, ২য় খণ্ড, ৭ পাতা; আখবার মাজমুয়া ফী ফত্‌হ আল-আন্দালুস, সম্পাদনা : লাফঁত ই আলকানতারা (মাদ্রিদ, ১৮৬৭), ৬ পাতা (মূল পাঠ) =২০ পাতা (অনুবাদ)।

২ আল-ইদ্রিসি কর্তৃক উল্লিখিত, যিক্‌র আল-আন্দালুস (নুজহাত আল-মুশতাক থেকে সংকলিত), অনুবাদ ও সম্পাদনা : ডন জোসেফ এ কণ্ডে (মাদ্রিদ, ১৭৯৯), ১১, ৩৫ ও ৪৪ পাতা।

৩ ইদ্রিসি, ৩৬ পাতা।

৪ আরবী উলিয়ান, বালাযুরি, ২৩০ পাতা = হিট্টি, ৩৬৫ পাতা; আখবার গ্রন্থে যুলয়ান, ১ম খণ্ড, ৪ পাতা; ইব্‌ন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ৬ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পাতা; ইব্‌ন-আবদ-আল-হাকাম, সম্পাদনা : টোরি, ২০৬ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর গ্রন্থে যুলয়ান, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৪ পাতা। ফ্রান্সিসকো কডেরার পুনর্নির্মান অনুযায়ী, এস্টুডিওস ক্রিটিকোস দা হিস্টোরিয়া আরব

এসপাণোলা, ২য় সিরিজ (সারাগোসা, ১৯০৩) ৪৭ পাতা, তার আসল নাম ছিল আরবান অথবা ওলবান। আরবদের সঙ্গে জুলিয়ানের সহযোগিতার ব্যাখ্যা হিসাবে রডরিক কর্তৃক তার সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডার ওপর অত্যাচারের যে কাহিনী উল্লেখ করা হয় তা আসলে লোকমুখে প্রচলিত। স্পেনীয় ও আরব ঐতিহাসিকেরা এই জয়ের কাহিনীকে বেশ ভালরকম অলংকৃত করেছিলেন।

৫ আরবী সাবতাহ্ থেকে স্পেনীয়, ল্যাটিন ভাষায় সেপটেম (সাত) থেকে, এর পুরো নাম অ্যাড সেপটেম ফ্রাত্রেস। এই শহরেই 'সেপটেম ফ্রাত্রেস (সাত ভাই) পর্বতমালার একটি প্রাচীন অ্যাবিলা অবস্থিত। ইদ্রিসি, ১২ পাতা।

৬ এই ছোট্ট নদীটিকে এখন সালাডো বলা হয়। আরবরা এটিকে ওয়াদি বাক্কা (লাক্কা) বলে। এটি বিকৃতভাবে গুয়াদিবেকা নামে উচ্চারিত হয় এবং সেজন্য গুয়াডিলিত-এর সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলা হয়। আর্থার গিলম্যানের সহায়তায় স্ট্যানলি ল্যান-পুল-এর লেখা 'দি মুরস ইন দি স্পেন' (নিউ ইয়র্ক, ১৯১১), ১৪ ও ২৩ পাতা তুলনীয়।

৭ আরবী ইতিহাসে আল-বুহাইরা (হ্রদ) বলে উল্লিখিত।

৮ রডরিক = আরবীতে লুযরিক, লাযরিক, রুযরিক; উইতিজা = গাইতাসা, গিতিশা ইত্যাদি। মাককারি, ১ম খণ্ড, ১৬০ ও ১৬১ পাতা; ইব্‌ন-আবদ-আল-হাকাম, ২০৬ পাতা; ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ৮ পাতা; ইব্‌ন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পাতা; আখবার, ৮ পাতা; মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৩৫৯ পাতা।

৯ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ১০-১১ পাতা; আখবার, ১০ পাতা; সি. এফ. মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ১৬৪-৬৫ পাতা।

১০ তাবারী, ২য় খণ্ড, ১২৫৩ পাতা। অন্যান্য সূত্রে সংখ্যাটি আছে ১৮,০০০।

১১ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ১৫-১৬ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৭ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড,, ১৭০-৭১ পাতা। সি. এফ. ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্, তারিখ ইফতিতাহ্ আল-আন্দালুস (মাদ্রিদ, ১৮৬৮), ৯-১০ পাতা; অনুবাদ : জুলিয়ান রিবেরা কর্তৃক হিস্টোরিয়া ডে লা কনকুইস্টা দ্য এস্পানা (মাদ্রিদ, ১৯২৬), ৬-৭ পাতা ও. হাউদাস কর্তৃক হিস্টোরিয়া ডে লা কনকুইট ডে এল' আন্দালুসি', রিকুয়েল ডে টেক্সটেস এট ডে ট্রাডাকশানস-এ, ইত্যাদি (প্যারিস, ১৮৮৯), ১ম খণ্ড,, ২২৬ পাতা।

১২ ইব্‌ন-আবদ-আল-হাকাম, ২১০ পাতা; ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ১৭-১৮ পাতা।

১৩ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২১-২২ পাতা; ইব্‌ন-আবদ-আল-হাকাম, ২১০-১১ পাতা; ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্, ১০ পাতা; পেসুডো-ইব্‌ন-কুতাইবা, কিসসাত ফত্‌হ আল-আন্দালুস (আল-ইমামাহ্ ওয়া-আল-সিয়াসা থেকে নেওয়া এবং ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্‌র ক্রোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত), ১৩৮, ১৪০ ও পরের পাতা। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ২৩৫ পাতা।

১৪ সি. এফ. আবদ-আল-ওয়াহিদ আল-মাররাকুশি, আল-মু'জিব ফী তালখিস আখবার আল-মাগরিব, ২য় সংস্করণ, আর ডোজি সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৮১), ৮ পাতা; অনুবাদ : ই ফাগনান কর্তৃক হিস্টোরি দাস আলমোহাদেস (আলজিয়ার্স, ১৮৯৩), ১০ পাতা।

১৫ ইব্‌ন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ২৬-২৭ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৮-৪৯ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ১৬৭ ও ১৭২ পাতা; ইব্‌ন-আবদ-আল-হাকাম, ২১১ পাতা; নাবযাহ্ মিন আখবার ফাত্‌হ আল-আন্দালুস, (আল-রিসালা আল-শরিফিয়া ইলা আল-আকতার আল-আন্দালুসিয়া থেকে সংকলিত এবং ইব্‌ন-আল-কুতাইয়ার ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত, মাদ্রিদ, ১৮৬৮), ১৯৩, ২১৩ পাতা। অ্যারাবিয়ান নাইটস ২৭২ নং দেখুন।

১৬ মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ১৮০ পাতা। সি. এফ. ইব্‌ন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ২৭ পাতা।

১৭ প্রকরণগত দিক থেকে এই শব্দটি ভ্যাণ্ডাল নামের সঙ্গে যুক্ত, যারা আরবদের আগে ওই দেশ দখল করেছিল।

১৮ মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ১৭৫ পাতা; ইব্‌ন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭-১৮ পাতা।

১৯ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২৪-২৫ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ৩৭৩ পাতা।

২০ আল-যাববি, বুগিয়াত আল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজাল আল-আন্দালুস, সম্পাদনা : ফ্রান্সিসকো কডেরা ও জুলিয়ান রিবেরা (মাদ্রিদ, ১৮৮৪-৮৫) ৩০৩ পাতা।

২১ যাব্‌বি-র বুগিয়া ৩৫৩ পাতা দেখুন।

২২ আন্দ্রে ডুসনে, হিস্টোরিয়া ফ্রাঙ্কোরাম স্ক্রপ্টোরেস, ১ম খণ্ড, (প্যারিস, ১৬৩৬), ৭৮৬ পাতা।

২৩ আখবার, ২৫ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ১৪৬ পাতা, ১.৩. বালাত হল একটি বিদেশি শব্দ যা ল্যাটিন বা গ্রিক 'প্লেটিয়া বা প্যালাটিয়াম থেকে সিরীয় ভাষায় যুক্ত হয়েছে। জায়গায় নাম হিসেবে এই শব্দটি খুব প্রচলিত, বিশেষত স্পেনীয় ভাষায় (ইদ্রিসি, ৩২ ও ৫৯ পাতায়)। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রটিকে 'বাঁধানো পথ' রূপে উল্লিখিত হয়েছে, কারণ লড়াইটা হয়েছিল রোমের একটি বাঁধানো রাস্তায়, সি. এফ. জন, ১৯:১৩।

২৪ ডেক্লাইন অ্যাণ্ড ফল, সম্পাদনা : বিউরি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫ ও পরের পাতা। ল্যান-পুলের ২৯-৩০ পাতা দেখুন।

২৫ এডওয়ার্ড ক্রিজি, দি ফিফটিন ডিসিসিভ ব্যাটলস অফ দি ওয়ার্ল্ড, নতুন সংস্করণ (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৮), ১৫৯ ও পরের পাতা দেখুন; এস পি স্কট, হিস্টোরি অফ দি মুরিশ এম্পায়ার ইন ইউরোপ (ফিলাডেলফিয়া, ১৯০৪), ১ম খণ্ড, ৩০৬ পাতা। সি. এফ. হেনরী কপি, হিস্টোরি অফ দি কুনকোয়েস্ট অফ স্পেন বাই দি আরব-মুরস (বোস্টন, ১৮৮১), ২য় খণ্ড, ১৯ ও পরের পাতা।

২৬ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের দেখুন, ২১৫ পাতা।

২৭ মুযার ও রাবীয়াহ্ উভয় সম্প্রদায়ই আরবের গোষ্ঠী, এদের প্রায়ই যৌথ শব্দ মা'আদ'-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের, ২৮০ পাতা।

২৮ আখবার, ৩১ পাতা। সি. এফ. ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্, ১৪-১৫ পাতা; ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ১ম খণ্ড, ৪১-৪২ পাতা; ২য় খণ্ড, ৩০ পাতা; মাররাকুশি, ৯ পাতা।

২৯ ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্, ২০ পাতা; ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ৩৩ পাতা; ইব্‌ন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৯ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ২০৪-০৫ পাতা; ইব্‌ন-আল-খাতীব। আর ডোজির রিচার্চেস সুর এল' হিস্টয়ার এট লা লিটারেচোর দে এল' এসপানে, ৩য় সংস্করণ (প্যারিস, ১৮৮১), ১ম খণ্ড, অ্যাপেনডিক্স ii. vii—viii পাতা।

৩০ ইব্‌ন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৮-১৯ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ১৪৫-৪৬ পাতা।

৩১ আখবার, ২০ পাতা; ইব্‌ন-আবদ-আল-হাকাম, ২১২ পাতা; ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্‌, ১১ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ১৪ পাতা; ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২২-২৩ পাতা; মাক্‌কারি ১ম খণ্ড, ১৭৮ পাতা। সি. এফ. পেস্যুডো-ইব্‌ন-কুতাইবাহ্‌, ১৬৯ ও পরের পাতা।

৩২ নাবযাহ্‌, ২০৬-০৭ পাতা; ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্‌, ১২-১৩ পাতা; সি. এফ. ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২৫ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ১৯০ পাতা।

৩৩ আরবীভাষা থেকে আল-ওয়াদি আল-কবীর, বড় উপত্যকা।

৩৪ আখবার, ৫৭ ও পরের পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ২৮৬-৮৭ পাতা।

৩৫ পেস্যুডো ইব্‌ন-কুতাইবাহ্‌, ১৮৮ পাতা।

৩৬ ইব্‌ন-আল-আব্বার, আল-হুল্লাহ্‌ আল-সিয়ারা (নোটিসেস সার কুয়েলকুস ম্যানাসক্রিটস আরাবেস), সম্পাদনা : ডোজি (লিডেন, ১৮৪৭-৫১), ৫৪ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ৩৭৬ পাতা।

॥ অধ্যায় ৩৫ ॥

স্পেনে উমাইয়া আমিরী সাম্রাজ্য

● একটি নাটকীয় পলায়ন

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া রাজবংশের[১] সদস্যদের হত্যা করে আব্বাসীরা তাদের সিংহাসন দখলের ইঙ্গিত দিল, তখন যে ক'জন পালাতে পেরেছিলেন হিশামের পৌত্র ও দামাস্কাসের দশম খলিফা আবদ-আল-রহমান ইব্‌ন-মু'আবিয়া[১] ছিলেন তাদের অন্যতম। ২৪ বছরের এই যুবকের অন্নের জন্য রক্ষা পাওয়া এবং একাধিকবার আব্বাসী গুপ্তচরদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচ বছর ধরে ছদ্মবেশে প্যালেস্টাইন, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ঘুরে বেড়ানোর কাহিনী আরব ইতিহাসের অন্যতম সেরা নাটকীয় ঘটনা। ইউফ্রেটিস নদীর বাম তীরে বেদুইনদের একটি শিবিরে আবদ-আল-রহমান আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি পালিয়ে যান। একদিন সেই শিবিরের কাছেই হঠাৎ আব্বাসীদের কালো পতাকার আবির্ভাব ঘটে। তার তেরো বছরের ভাইকে নিয়ে আবদ-আল-রহমান নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছোট ভাইটি খুব ভাল সাঁতার জানত না এবং আব্বাসীদের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে মাঝ নদী থেকে ফিরে আসে। আব্বাসীরা তাকে হত্যা করে। বড় ভাই সাঁতরে নদীর অপর তীরে[২] ওঠেন।

দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবদ-আল-রহমান তাঁর বিশ্বস্ত ও শক্তসমর্থ মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস বদরের সাহায্যে প্যালেস্টাইনে পৌঁছে যান। উত্তর আফ্রিকায় তিনি অন্নের জন্য ইউসুফ আল-ফিহ্‌রির এক আত্মীয় ও সেখানকার গভর্নরের হাতে নিহত হতে হতে বেঁচে যান। বন্ধুহীন ও কপর্দকহীন অবস্থায় এই নির্বাসিত পলাতক ব্যক্তিটি এক উপজাতির কাছ থেকে অন্য উপজাতি, এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সেউতা-য় পৌঁছান (৭৫৫ খ্রিঃ)। তাঁর মামারা ছিলেন ওই এলাকার বার্বার এবং তাঁরা তাঁকে আশ্রয় দিলেন। তারপর দামাস্কাস ও কিন্‌নাসরিন থেকে আগত এবং এলভিরা ও জেন-এ স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসা সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি বদরকে পাঠান। নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিল উমাইয়া রাজবংশের পূর্বতন আশ্রিত ব্যক্তি। যাঁর মাধ্যে [illegible] সিরিয়াবাসী অভিভূত হবে এমন একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে সমবেত হওয়ার সুযোগ [illegible] তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। সিরিয়াবাসীরা সহজেই ইয়ামানীয়দের [illegible]

আসতে সক্ষম হল। ইয়ামানীয়রা যে আবদ-আল-রহমানকে ভালবাসত তা নয়, বরং তারা তাদের নামেমাত্র গভর্নর ইউসুফকে ঘৃণা করত বলেই সিরিয়াবাসীরা একাজে সফল হয়েছিল। নতুন নেতাকে বহন করে আনার জন্য একটি জাহাজ পাঠানো হল। লম্বা ও দোহারা চেহারা, তীক্ষ্ণ ও ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা মুখাবয়ব এবং পাতলা লাল চুলের[৪] অধিকারী বানু-উমাইয়া-রাজবংশের এই যুবরাজ ছিলেন দুঃসাহসিক অভিযানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ওই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ ঘরানায় তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ফলে শীঘ্রই তিনি ওই জটিল পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। রাজসিংহাসনের এই নতুন দাবিদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য দুর্বল ইউসুফ মূল্যবান সম্পদ ও নানা প্রতিশ্রুতি, এমন কী তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ব্যর্থ হলেন। বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ ছাড়াই দক্ষিণ দিকের একের পর এক শহর তাদের দখলে চলে গেল। আর্কিডোনায়[৫] স্থিত জর্ডান বাহিনী, সিদোনায় প্যালেস্টাইন বাহিনী এবং সেভিলে বসবাসকারী হিমস্-এর আরবেরা রাজপুত্রকে সাদরে অভ্যর্থনা[৬] জানাল।

● কর্ডোভা দখল

আবদ-আল-রহমান যখন তার অনুগামীদের নিয়ে কর্ডোভার দিকে এগোচ্ছিলেন, সেই সময়ে ইউসুফ এগিয়ে চললেন সেভিলের দিকে। আসন্ন যুদ্ধের আগে দেখা যায় যে, রাজপুত্রের কোন সামরিক পতাকা ছিল না, তখন সেভিলে-র ইয়ামানীয় সেনাপতি আবু-আল-সাব্বাহ্ আল-ইয়াহ্সুবি একটি বর্শার[৭] মাথায় একটি সবুজ পাগড়ি বেঁধে একটি পতাকা তৈরি করলেন। এইভাবেই স্পেনে উমাইয়া রাজবংশের পতাকা উড়ল।

৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে-র সকালে গুয়াদালকুইভির তীরে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদলের যুদ্ধ শুরু হল। উভয় পক্ষের বেশির ভাগ সেনাই ছিল অশ্বারোহী। আন্দালুসিয়ায় এই ধরনের ঘটনা ছিল বিরল। আবদ-আল-রহমান বুঝতে পারলেন, তার কিছু অনুগামীর মনে আশঙ্কা জেগেছে যে তিনি হয়ত শিবির পরিত্যাগ করতে পারেন। তাই তিনি জোর করে নিজের ঘোড়ার বদলে আবু-আল-সাব্বাহ-এর[৮] বুড়ো খচ্চরটিতে আরোহণ করলেন। যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলেছিল এরূপ সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। তার প্রধান সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে ইউসুফ নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ডোভা দখল হল এবং সেখানকার সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করা হল। তবে রাজধানীতে লুঠতরাজ বন্ধ করা এবং পরাজিত গভর্নরের হারেমকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দেবার ক্ষেত্রে আবদ-আল-রহমানকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

● মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেনে ঐক্য ও শান্তি স্থাপন

কর্ডোভার ওপর প্রভুত্ব মানেই নিশ্চিতভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেনের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার বোঝায় না। পলাতক গভর্নর উত্তর দিকে একের পর এক গোলমাল পাকিয়ে তুলতে

লাগলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না টলেডোর[৯] কাছে তাঁকে হত্যা করা হল। ৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত এই শহরটি দুর্বল হয়নি। আব্বাসী প্রতিনিধিদের সহায়তায় একের পর এক ইয়ামানীয় ও শী'আহ্দের বিদ্রোহ ঘটে চলেছিল। বার্বারদের অভ্যুত্থানকে দমন করতে প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছিল। বিজিত দেশের সিংহভাগ লুণ্ঠন করার জন্য বার্বাররা কখনই তাদের উর্ধ্বতন আরবদের ক্ষমা করতে পারেনি। নতুন আমিরের পূর্বতন দৃঢ় সমর্থকেরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের যথাযথভাবেই মোকাবিলা করা হয়েছিল। সেভিলির যে শায়খের পতাকা ও খচ্চরের সাহায্যে আবদ-আল-রহমান জয়লাভ করেছিলেন এক বিদ্রোহে তার মৃত্যু ঘটল। আবদ-আল-রহমানের ডান হাত বদরের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সীমান্তবর্তী এক শহরে নির্বাসিত করা হল।

মনের দিকে থেকে যারা পরস্পরের শত্রু তারাই আবার বাইরে মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল। ৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসূর স্পেনের গভর্নর হিসাবে জনৈক আল-আলা ইব্ন-মুগীসকে নিয়োগ করার ঔদ্ধত্য দেখালেন। দু'বছর পরে আল-আলার শিরশ্ছেদ করা হল এবং তার কাটা মুন্ডুটি নুন ও কর্পূর মাখিয়ে একটি কালো পতাকা ও গভর্নর রূপে তার নিয়োগপত্র দিয়ে মুড়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কায়[১০] গমনরত আল-মানসূরের কাছে পাঠানো হয়। আল-মানসূর অন্য কোনও এক মুহূর্তে আবদ-আল-রহমানকে 'কুরাইশ[১১]-এর বাজপাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর এখন তিনি নিজের মনোভাব প্রকাশ করে বললেন— "আমাদের ও এমন এক শত্রুর মধ্যে একটি সমুদ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ!"[১২] শোনা যায় যে, আব্বাসীয়দের কাছ থেকে সিরিয়া ছিনিয়ে নেবার জন্য আবদ-আল-রহমান একটি নৌবহর সজ্জিত করেছিলেন, কিন্তু অভ্যান্তরীণ সমস্যার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের রাজ্যে থেকে যেতে বাধ্য হন।

● শার্লমানের সম-প্রতিদ্বন্দ্বী

৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পূর্ব অংশের আরব বার্সেলোনার গভর্নর ও ইউসুফ আল-ফিহ্‌রির প্রিয় জামাইয়ের নেতৃত্বে এক প্রবল শক্তিশালী মিত্রগোষ্ঠী গড়ে উটল। এবং স্পেনের নতুন আমীরের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আব্বাসীয় খলিফার[১৩] মিত্র ও সেই কারণে আবদ-আল-রহমানের শত্রু শার্লমানকে আহ্বান জানালেন। উত্তর-পূর্বের স্পেনীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে শার্লমান সারাগোসা[১৪] অবধি অগ্রসর হলেন (৭৭৮ খ্রি:), কিন্তু যখন তাঁর মুখের ওপর সেই শহরের প্রবেশদরজা বন্ধ করে দেওয়া হল এবং তাঁর রাজ্যের শত্রুরাই তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, তখন তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। পিরেনিজ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে সার বেঁধে পশ্চাদপসরণের সময় বাসকিউ ও পার্বত্য এলাকার অন্যান্য উপজাতিরা সামনের দিক থেকে ফ্রাঙ্কিস সেনাদলকে আক্রমণ করল। এই আক্রমণের ফলে ফ্রাঙ্কিস সেনাদলের বহু সেনা প্রাণ হারাল এবং তাদের তল্পিতল্পা[১৫] নষ্ট হয়ে গেল। যে সমস্ত সেনাপতি মারা গেলেন,

রোলান্ড ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কাহিনী চানসন ডে রোলান্ড-এ অমর হয়ে রয়েছে। এটি শুধু প্রথম দিককার ফরাসি সাহিত্যের একটি রত্নই নয়, মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মহাকাব্যগুলির অন্যতমও বটে। বাস্তবে আবদ-আল-রহমান যেমন নিজেকে পূর্বাঞ্চলের[১৬] শ্রেষ্ঠ শাসক বলে প্রমাণ করেছিলেন, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলেরও সবচেয়ে শক্তিশালী সার্বভৌম শাসক বলে নিজেকে প্রমাণ করলেন।

● একটি স্বাধীন আমিরী সাম্রাজ্য

তাঁর বহু সংখ্যক শত্রুকে বশ মানানোর প্রক্রিয়ায় আবদ-আল-রহমান ৪০,০০০ বা তারও বেশি সংখ্যক বার্বারদের এক অতি সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত ভাড়াটে সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এরা সকলেই এসেছিল আফ্রিকা থেকে এবং নিজের সিংহাসন রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এদের বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করতে পারতেন। বেশি মাইনে দিয়ে এইরকম একটি বাহিনীর আনুকূল্য কীভাবে লাভ করতে হয় তা তিনি জানতেন। আব্বাসীয় খলিফার নামে দেওয়া যে খুতবা তিনি এতদিন বজায় রেখেছিলেন, ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে তা বাতিল করলেও তিনি নিজে খলিফা উপাধি ধারণ করলেন না। স্বাধীনভাবে শাসন চালালেও তিনি ও তৃতীয় আবদ-আল-রহমান-রহমান পর্যন্ত তাঁর উত্তরসূরিরা আমীর উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথম আবদ-আল-রহমানের অধীনে স্পেন এইভাবেই প্রথম রাজ্য হিসেবে ইসলামি দুনিয়ার স্বীকৃত খলিফার কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছিল।

তাঁর রাজ্যকে সংহত করে এবং সেখানে সামগ্রিকভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনার পর আবদ-আল-রহমান স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিলেন। যুদ্ধের কৌশলের মতো শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি সমান কৃতিত্ব দেখালেন। তার রাজ্যের শহরগুলিকে তিনি সুন্দরভাবে সাজালেন, রাজধানীতে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য তিনি একটি কৃত্রিম জলপ্রণালী তৈরি করলেন। তার চারধারে একটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন এবং তার পূর্বসূরি হিশাম কর্তৃক উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় নির্মিত প্রাসাদের অনুকরণে তিনি নিজের জন্য কর্ডোভার বাইরে মুনিয়াত[১৭] আল-রুসাফা তৈরি করলেন। তাঁর প্রাসাদে তিনি জলের ব্যবস্থা করলেন এবং জাম ও বেদানার মতো বিদেশি ফলের গাছ লাগালেন। তাঁর বাগানে সিরিয়া থেকে প্রথম আমদানি করা একটি নিঃসঙ্গ খেজুর গাছকে নিয়ে তিনি কয়েকটি আবেগময় কবিতা রচনা করেছিলেন।[১৮]

তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে আবদ-আল-রহমান, ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে জেরুসালেম ও মক্কার দু'টি মসজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কর্ডোভার বিরাট মসজিদটির[১৯] পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরসূরিদের দ্বারা সম্পূর্ণ এবং বর্ধিত হবার পর কর্ডোভার এই মসজিদটি শীঘ্রই পশ্চিমি দুনিয়ার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কা'বায় পরিণত হয়। অসংখ্য জমকালো স্তম্ভ ও বাইরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সহ এই বিরাট মসজিদটি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ফার্দিনান্দের পুনর্বিজয়ের পর খ্রিস্টানদের একটি গির্জায় পরিণত হয়। জনপ্রিয় 'লা মেজকুইটা' (মসজিদ) নামে এটি আজও

টিকে রয়েছে। এই বিরাট মসজিদটি ছাড়াও রাজধানীতে গুয়াদালকুইভির ওপর একটি সেতু ছিল, পরবর্তী কালে এর খিলানের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৭ করা হয়। প্রজাদের বস্তুগত কল্যাণের দিকেই শুধু উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য ছিল না। বরং বিভিন্ন উপায়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে আরবীয়, সিরীয়, বার্বার, নুমিডিয়ান, হিস্পানো-আরব ও গথদের সম্মিলিত করে একটি জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই কাজটি ছিল সত্য সত্যই হতাশাব্যঞ্জক। একাধিক অর্থে তিনি সেই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যার মধ্য দিয়ে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্পেন বিশ্ব-সংস্কৃতির দু'টি কেন্দ্রের একটিতে পরিণত হয়েছিল।

প্রথম আবদ-আল-রহমান প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ দু'শো পঁচাত্তর বছর (৭৫৬-১০৩১) ধরে টিকে ছিল। আরব ইতিহাস-রচয়িতারা একে আল-দাখিল (নতুন আগন্তুক) বলে আখ্যা দিয়েছেন। অষ্টম আমীর তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের রাজত্বে (৯১২-৬১) এই রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই রাজবংশের অনেক আমীরের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম এবং তিনিই প্রথম খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (৯২৯ খ্রি:)। বস্তুত খলিফা আবদ-আল-রহমানের রাজত্বেই এই দ্বীপটিতে আরব শাসন তার সর্বোচ্চ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। গোটা উমাইয়া শাসনেই কর্ডোভা ছিল তাদের রাজধানী এবং তার পশ্চিমি প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদের মতোই কর্ডোভা এক অতুলনীয় আড়ম্বরের অধিকারী হয়েছিল।

'দশম শতাব্দীর বিসমার্ক' এবং সম্ভবত আরব আমলের সবচেয়ে সেরা রাজা ও জেনারেল বলে পরিচিত, প্রতিভাধর শাসক আল-হাজিব আল-মানসূর (১০০২ খ্রি:)-এর মৃত্যুর পর উমাইয়া খলিফা সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমতে থাকে এবং ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে এই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উমাইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর অনেকগুলি ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। অবশেষে উত্তরাঞ্চলে খ্রিস্টান শক্তির আবির্ভাবের ফলে ছোট ছোট রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শাসনের শেষ চিহ্নটিও এই দ্বীপ থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

● খ্রিস্টানদের আচরণ

আবদ-আল-রহমান আল-দাখিলের উত্তরসূরিদের প্রধান কাজ ছিল রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং খ্রিস্টান ও মুসলিম জনসাধারণের দ্বৈত চরিত্র থেকে উদ্ভূত এবং পুরানো আরব মুসলিম ও ধর্মান্তরিত নতুন স্পেনীয় মুসলিমদের পারস্পরিক হিংসার ফলে গড়ে ওঠা কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান। শুরু থেকেই বিজয়ী আরবেরা স্পেনে তাদের প্রজাদের সঙ্গে সে ধরনের আচরণ করছিল, অন্যান্য বিজিত দেশে তাদের অনুসৃত আচরণের থেকে তা মূলগতভাবে আলাদা ছিল না। কেবলমাত্র খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ওপর ধার্য মাথাপিছু বার্ষিক

কর (জিয্য়া) করদাতার আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ১২, ২৪ ও ৪৮ দিরহামের মধ্যে ওঠা-নামা করত। শিশু ও মহিলারা, বয়স্ক ও অনাথেরা, সন্ন্যাসী ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের শিকার হওয়া মানুষেরা অবশ্যই এই করের আওতার বাইরে ছিল। এই সমস্ত যিম্মীদের কাছ থেকে গড়ে ফসলের প্রায় ২০ শতাংশ জমির খাজনা (খারাজ) হিসেবে আদায় করা হত। কিন্তু মাথাপিছু করের মতো জমির খাজনা করদাতার আর্থিক অবস্থাভেদে ওঠা-নামা করত না। তরবারির জোরে অধিকৃত অঞ্চল, স্পেন বিজয়ের মুহূর্তে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া সামন্ত প্রভু ও চার্চের মালিকানাধীন জমি দখল করে বিজয়ীদের মধ্যে ব্যক্তি সম্পত্তি রূপে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই সমস্ত জমিতে ভূমিদাসদের চাষ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের নতুন মুসলিম সামন্ত প্রভুদের উৎপাদনের ৪/৫ ভাগ দিতে হত। দখল করা এই সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশের মালিক ছিল রাজ্য, রাজস্ব হিসেবে ক্রীতদাসেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ জমা দিত। রাজ্যের মালিকানাধীন বেশ কিছু জমি বিদ্রোহ দমন করার জন্য আমদানি করে আনা সিরীয় ও আরব সেনাদের মধ্যে জায়গির হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

মুসলিম হবার পরে কোন ক্রীতদাসের ওপরেই ইসলাম ধর্মানুযায়ী আর কোন দাসত্বের বন্ধন চাপানো হত না। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস মেনে চলার ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ওপরে কোন অত্যাচার করা হয়নি। তারা যাজকদের ও দেশীয় বিচারকদের বিধান ও আইন মেনে চলতে পারত। কিন্তু ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ ও মুসলিমদের ধর্ম-সংক্রান্ত কোন মামলার ব্যাপারে খ্রিস্টান বিচারকদের কোন এক্তিয়ার ছিল না। সুতরাং একথা সাধারণভাবে বলা যায় যে, মুসলিমরা স্পেন দখল করার পরে সেখানকার মানুষের জীবনে নতুন করে আর কোনও অসহনীয় অত্যাচার নেমে আসেনি। ডোজি-র[১১] মতে, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরবদের স্পেন বিজয় এমন কী একটি আশীর্বাদ হয়েই এসেছিল।" মুসলিম শাসনের মধ্য দিয়ে স্পেনের অভিজাত শ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায় সহ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর একাধিপত্য খর্ব হয়েছিল, ক্রীতদাস শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল এবং ভিসিগথ শাসনে যে অধিকার থেকে খ্রিস্টানরা বঞ্চিত ছিল, যেমন জমির মালিক এমন খ্রিস্টানদের তাদের সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার তা-ও দেওয়া হয়েছিল।

● একযোগে স্বধর্মত্যাগ

যাই হোক খ্রিস্টানরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। পার্বত্য ও গ্রামীণ এলাকায় তারা পুরানো জাতীয় চরিত্র ও প্রচলিত সংস্কৃতি বজায় রাখলেও শহর এলাকায় তারা তা করতে পারল না। নয়া মুসলিম রূপে তারা একটি সামাজিক শ্রেণীর জন্ম দিল। আরবরা তাদের মুয়াল্লাদূন (একবচনে, মুয়াল্লাদ, গৃহীত, অনুমোদিত) বলে ডাকত। স্পেনীয়রা তাদের বলত মুলাদিস। কালক্রমে এই সমস্ত নবদীক্ষিত ব্যক্তিরাই জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে

বিক্ষুব্ধ অংশে পরিণত হল। মূলত ক্রীতদাস, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ও দিনমজুর হিসেবে তাদের যে সমস্ত বংশধরেরা চাষবাস করত তাদের মধ্য থেকেই সেনা নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশ কিছু ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও আদতে তারা ছিল "ছদ্মবেশী খ্রিস্টান"[১২]। কিন্তু তারা সকলেই জানত যে, ইসলামধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুস্পষ্ট ও অপ্রতিরোধ্য শাস্তি হল মৃত্যু। আরবের মুসলিমরা সমস্ত মুয়াল্লাদদের তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে মনে করত, যদিও তাদের বেশ কয়েকজন ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর। স্পেন বিজয়ের পর প্রথম শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই মুয়াল্লাদরা অনেক শহরে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হল এবং প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারাই প্রথম অস্ত্র তুলে নিল। ❑

● টীকা ●

১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ২৮৫-৮৬ ও ৪৫০ পাতা।

২ পুরানো খ্রিস্টান ইতিহাস-রচয়িতাদের দ্বারা 'বেনিমাউজিয়াস' রূপে বিকৃত।

৩ আখবার, ৫২-৫৪ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭৭ পাতা।

৪ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ৫০ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৬ পাতা।

৫ রেজিও (আরবীতে রাইয়া) পার্বত্য প্রদেশের রাজধানী; ইয়াকূত, ১ম খণ্ড, ১৯৫ ও ২০৭ পাতা।

৬ ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ৩৭৮ পাতা; ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ৪৮ পাতা: মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ২১২ পাতা।

৭ আখবার, ৮৪ পাতা; সিএফ্‌ ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্‌. ২৬ পাতা।

৮ আখবার, ৮৮-৮৯ পাতা: ইব্‌ন-আল-আসীর, ৫ম খণ্ড, ৩৭৮ পাতা।

৯ ইব্‌ন-আল-আব্বার, হুল্লাহ্‌, ৫৫ পাতা।

১০ ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্‌, ৩৩ পাতা।

১১ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ৬১ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ২১৩ পাতা।

১২ ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ্‌, ৩৩-৩৪ পাতা; মাককারি, ১ম খণ্ড, ২১৫ পাতা।

১৩ ই লেভি-প্রভেনকাল, হিস্টয়ার ডে এল এসপাগনে মুসুলমান, ১ম খণ্ড (প্যারিস, ১৯৫০), ১২১ পাতা।

১৪ আখবার. ১১৩ পাতা।

১৫ এজিনহার্ড, শার্লমান, সম্পাদনা ও অনুবাদ : হ্যালফেন. ২৯-৩১ পাতা; ইব্‌ন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১২৩-২৪ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর. ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭-৮ পাতা।

১৬ দোজি. ২য় খণ্ড. ১৬৭-৬৮ পাতা দেখুন।

১৭ গ্রিক (কপটিক ভাষাতেও প্রচলিত) থেকে গৃহীত শব্দটির অর্থ 'বাগান'।

১৮ ইব্‌ন-আল-আব্বার, হুল্লাহ্, ৩৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, ৭৭ পাতা; প্রথম খেজুর গাছ লাগিয়েছিল ফিনিশিয়রা। গাছের কলম থেকে আরবীয়রা নতুন ধরনের খেজুর গাছ তৈরি করেছিল, কিন্তু বীজ থেকে গাছ তৈরি করাটাই ছিল প্রথম দিককার রীতি।

১৯ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ৬০ পাতা, তুলনীয় ২৪৫ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ২১২ পাতা।

২০ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ১৭০-৭১ পাতা।

২১ হিস্টয়ার দাস মুসুলমানস ডি'এসপ্যানে, সম্পাদক ই. লেভি-প্রভেনকাল (লেডেন, ১৯৩২), ১ম খণ্ড ২৭৮ পাতা; অনুবাদ: ফ্রান্সিস জি স্টোকস, স্প্যানিশ ইসলাম (লন্ডন, ১৯১৩), ২৩৬ পাতা।

২২ ইউলোজিয়াস, "মেমোরিয়েল সাঙ্কটোরাম', বুক টু, এ স্কোটাস-এর হিসপানিয়া ইলাসট্রেট, ৪র্থ খণ্ড, (ফ্রাঙ্কফোর্ট, ১৬০৮), ২৯৩ পাতা।

॥ অধ্যায় ৩৬ ॥

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা

খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্মান্তরিত এমন নয়া মুসলিমেরা প্রচুর সংখ্যায় আল-রাবাদ[১] নামে পরিচিত কর্ডোভার দক্ষিণ শহরতলিতে বাস করত। এদের একটা বড় অংশ ধর্মতত্ত্ব ও আইনের (ফকীহ্) শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের প্রায় ৪০০০ জনের কর্মজীবন রাজধানীতে বিকশিত হয়েছিল। যতদিন আবদ-আল-রহমানের উত্তরসূরি এবং তার ধার্মিক ও পণ্ডিত পুত্র[২] প্রথম হিশাম (৭৮৮-৯৬ খ্রিঃ) শাসনক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন রাজ্যের অভ্যন্তরে অসন্তোষ সৃষ্টির কোন আশু কারণ ঘটেনি। কিন্তু হিশামের উত্তরসূরি প্রথম আল-হাকাম (৭৯৬-৮২২ খ্রিঃ) ছিলেন অসচ্চরিত্র, মদ ও মৃগয়ায় আসক্ত। তার রাজত্বে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। আল-হাকামের লঘু স্বভাবের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, এমন কী প্রধানত আরবী ভাষা না-জানা[৩] নিগ্রো ও বিদেশি ভাড়াটে সেনা সমন্বিত তার দেহরক্ষীদলের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। ৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অসন্তোষের সৃষ্টি হল যখন একদিন উত্তেজিত জনতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া আমীরকে পাথর দিয়ে আক্রমণ করল এবং ধর্মতাত্ত্বিকেরা সোচ্চারে তাকে সমর্থন জানাল। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, আল-হাকামকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে এই চক্রীদলের ৭২ জন নেতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তার করে ক্রুশবিদ্ধ করা হল। বিক্ষুব্ধরা একের পর এক অভ্যুত্থান ঘটাতে লাগল এবং ৮১৪ খ্রিস্টাব্দে[৪] এক বার্বার ফকীহের নেতৃত্বে এক গুরুতর বিদ্রোহের সৃষ্টি হল। বিক্ষুব্ধ জনতা আল-হাকামকে তার রাজপ্রসাদে বন্দি করে রাখল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে সফল হল। শহরতলির জনসাধারণের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হল। মাটির দিকে মাথা ঝুলিয়ে এদের তিনশো নেতাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল। সমস্ত জনসাধারণকে তিনদিনের মধ্যে স্পেন ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দেওয়া হল এবং তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। সেখানে পুনরায় কাউকে বাড়ি তৈরি করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।[৫] আট হাজার পরিবার মরক্কোতে, বিশেষত ফাস (ফেজ)-এ আশ্রয় নিল। আলীর এক বংশধর দ্বিতীয় ইদ্রিস তখন সেখানে তার নতুন রাজধানী[৬] তৈরি করছিলেন। ১৫.০০০ মানুষ[৭] আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই উদ্বাস্তুরাই ৮২৭ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ওই শহরটির পরিচালক হয়ে উঠেছিল। তারপর খলিফা আল-মামুনের এক জেনারেলের নেতৃত্বে তাদের ওই শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হল। নির্বাসিত মানুষেরা ক্রিট-এ তাদের নতুন আশ্রয় গড়ে তুলল। এই শহরটির একটি অংশ তখনও পর্যন্ত

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। তারা গোটা দ্বীপটিকে নতুন আকার দিল এবং তাদের নেতা সেখানে একটি রাজবংশ গড়ে তুলল। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে[৮] গ্রিকরা ক্রিট পুনরুদ্ধার করার আগে পর্যন্ত এই রাজবংশ টিকে ছিল।

● পরিখার হত্যাকাণ্ড

মনে রাখা দরকার যে, বেশ কিছু স্পেনীয় মুসলিম ছিল আরবদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং তাদের পূর্বতন সম-ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তারা আরবদের হয়েই লড়াই করেছিল। আমরুস ইবন-ইউসুফের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। আল-হাকাম ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে গর্বিত 'রাজকীয় নগরী'[৯] টলেডোর গভর্নর রূপে নিয়োগ করেছিলেন। বিজিত দেশীয় মানুষদের চোখে এটি ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। মুসলিমদের এই যুগ সন্ধিক্ষণে টলেডো অশান্ত হয়ে উঠেছিল; এর বিশ্বাসঘাতক ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা সর্বদাই একটা ধারাবাহিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছিল। আল-হাকামের পুত্র ও ১৪ বছর বয়স্ক রাজপুত্র আবদ-আল-রহমানের শহর পরিদর্শনের সম্মানে আল-হাকামের পরামর্শক্রমে আমরুস একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই ভোজসভাতে টলেডোর শতাধিক বিশিষ্ট নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দুর্গবেষ্টিত তার নব-নির্মিত প্রাসাদের প্রাঙ্গনে একটি দীর্ঘ পরিখা ছিল এবং সেই পরিখার মাটি দিয়েই ওই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। পরিখার পাশে আমরুস একজন ঘাতককে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একজন করে অতিথি প্রাঙ্গনের মধ্যে ঢোকার মুহূর্তে ঘাতকের তরবারি তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। মৃতদেহগুলি সেই পরিখার মধ্যেই জড় করে রাখা হল। 'পরিখার এই হত্যাকাণ্ডের'[১০] পর বহু বছর ধরে অশান্ত টলেডোতে শান্তি বিরাজ করছিল।[১১] কিন্তু উমাইয়া স্পেনীয় আমলের এক উদ্যমী কারিগর এবং সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যার এক উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় আবদ-আল-রহমান[১২]-এর রাজত্বের আগে পর্যন্ত মেরিদা সহ অন্যান্য শহরগুলি প্রায়ই বিদ্রোহ করছিল।

একজন আমীর হিসেবে দ্বিতীয় আবদ-আল-রহমান (৮২২-৫২ খ্রিঃ) এক মহিলা, এক খোজা, একজন ধর্মতাত্ত্বিক ও একজন সঙ্গীতশিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আবদ-আল-রহমানের পদবি হয়েছিল আল-আওসাত।[১৩] সেই মহিলাটি ছিলেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী সুলতানাহ (রানি) তারুব ; তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ঔৎসুক্য জাগ্রতকারিণী। খোজাটি ছিল উপহার পাওয়া এক ক্রীতদাস, তার নাম ছিল নসর। সে ছিল রাজসংসারের সরকার, এক স্পেনীয় পুরুষ ও রানির[১৪] প্রিয়ভাজন। আর ধর্মতাত্ত্বিকটি ছিলেন কর্ডোভার ফকীহ বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহের বার্বার নেতা ইয়াহিয়া ইবন-ইয়াহিয়া (মৃ. ৮৪৯ খ্রিঃ)। মাসমুদাহ্ উপজাতিভুক্ত এই বিদ্রোহী নেতা ছিলেন বাগদাদের ইমাম মালিক ইবন-আনাস-এর ছাত্র এবং এর উদ্যোগেই আল আন্দালুসে[১৫] মালিকী মতবাদ চালু হয়েছিল। এই

মতবাদ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সেখানকার মানুষেরা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল "আল্লাহ্‌র বই ও মালিকের মুঅত্তা[১৬] ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না।" আর সেই সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন বাগদাদ থেকে আসা জিরয়াব নামের এক পারসীয় চড়া সুরের গায়ক।

যে সমস্ত সঙ্গীতশিল্পী হারূন আল-রশীদ ও তার পুত্রদের রাজদরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন, জিরয়াব[১৭] ছিলেন তাদের অন্যতম। সেই রাজদরবারে শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার ফলে তার সমকক্ষ বিখ্যাত শিক্ষক ইসহাক আল-মাওসিলি তাকে হিংসা করতে শুরু করেন এবং জিরয়াব প্রথমে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় পালিয়ে যান। কর্ডোভাকে দ্বিতীয় বাগদাদে পরিণত করতে উদগ্রীব আবদ-আল-রহমান একটি অতি আড়ম্বরপূর্ণ রাজদরবার গড়ে তুলেছিলেন এবং হারূনের অনুকরণে চরম অপব্যয় করতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীর বাইরে এসে এই যুবক কার্য নির্বাহক কর্মচারীটিকে[১৮] অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তার নতুন পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে জিরয়াব বার্ষিক বেতন হিসেবে ৩০০০ দিনার ও কর্ডোভায় ৪০,০০০ দিনার মূল্যের জমিদারি পেয়েছিলেন। জিরয়াব ও তার পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শীঘ্রই তার প্রতিভার আলোকে ওখানকার অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পীদের খ্যাতি ম্লান হয়ে গেল। ১০,০০০ গানের কথা ও সুর জানার জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন কবি এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের[১৯] ছাত্র হিসেবেও খ্যাতিলাভ করলেন। অন্যান্য সঙ্গীত শিল্পীদের মতো জিরয়াবও বিশ্বাস করতেন যে, জিন্নেরা তাকে রাত্রিবেলায় গান শিখিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তিনি নিজেকে এতখানি মার্জিত, রসিক ও আমুদে হিসেবে তুলে ধরলেন যে, শীঘ্রই তিনি সমকালের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে পরিণত হলেন। ফ্যাশনের প্রতীক হয়ে উঠলেন। এতদিন চুল লম্বা করে রাখা হত ও তা কপালের ওপর থেকে ভাগ হয়ে যেত। কিন্তু এখন তা ভুরু পর্যন্ত সুন্দর করে বিছানো হতে লাগল। ধাতব পাত্রের বদলে কাচের গ্লাসে জল খাওয়া শুরু হল। শতমূলীসহ যে সমস্ত খাবার মানুষের কাছে অপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল, তা আবার প্রিয় হয়ে উঠল। আর জিরয়াবের অভ্যাসকে[২০] অনুকরণ করেই এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটল।

● শহীদের মৃত্যু বরণের প্রতিযোগিতা

আবদ-আল-রহমানের রাজত্বের শেষদিকে বিজয়ী শাসকদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম এবং হারেম-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রলোভন এত লোভনীয় হয়ে উঠেছিল যে, শহরে খ্রিস্টানদের একটি বিরাট অংশ অনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হলেও আরবীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। নিজেদের বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য ও শিল্পের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং আরব সভ্যতার উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে দেশীয় খ্রিস্টানেরা শীঘ্রই আরবদের জীবনযাপন প্রণালীকে অনুকরণ করতে শুরু করল। এরূপ অনুকরণকারীর সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে, তারা নিজেরাই একটি সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হল এবং মোস্তারাব[২১] বিশেষণে ভূষিত

হতে লাগল। মনে রাখা দরকার, ইউরোপের যে দেশগুলি সবচেয়ে শেষে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল স্পেন ছিল তার অন্যতম। মুসলিম বিজয়ের সময়ে স্পেনের বেশ কিছু মফস্বল জেলার মানুষেরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করত না এবং এর ভিসিগথিক আর্যসুলভ শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ খ্রিস্টদর্শন ও মুসলিম ধর্মকে মেনে নিয়েছিল। কর্ডোভার এক সমসাময়িক খ্রিস্টান লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন এইজন্য যে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষেরা ল্যাটিন ফাদারদের রচনাবলি এড়িয়ে চলতেন এবং "আরব পণ্ডিতদের বাকপটুতায়[১১] উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন।" ৭২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বা কাছাকাছি সময়ে সেভিল-র বিশপ জন আরবী জীবন-ধারণে অভ্যস্ত খ্রিস্টান ও মুরদের[১৩] জন্য আরবী ভাষায় বাইবেলের একটি সমালোচনামূলক বই লিখেছিলেন।

আরবীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবার এই প্রবণতার বিরোধী এক প্রতিক্রিয়া হিসেবে কর্ডোভার খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ধর্মান্ধ ইহুদিদের মধ্যে এক কৌতূহলোদ্দীপক আন্দোলন শুরু হল। এর পরিণতিতে বহু নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় শহীদের মৃত্যু বরণ করল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ইউলোজিয়াস নামে এক কঠোর তপস্বী যাজক এবং তাকে সমর্থন করেছিলেন তার ধনবান বন্ধু ও পরবর্তীকালে তার জীবনীকার অ্যালভারো।[১৪] মুহাম্মাদকে তীব্রভাবে গালিগালাজ করা ও ইসলাম ধর্মকে অভিশাপ দেবার অপরাধে[১৫] পারফেকটাস নামে কর্ডোভার আর এক যাজককে রমাযানের ভোজ-উৎসবে (৮৫০ খ্রিঃ) হত্যা করার ঘটনাটি এই আন্দোলনের মানসিকতাকে আরও শক্তি যোগাল। কর্ডোভার বিশপের নেতৃত্বে সেখানকার জনসাধারণ তাকে একজন সাধুব্যক্তি এবং তার মৃত্যুকে অলৌকিক ঘটনা বলে ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র দেরি করল না। কারণ তার মাথাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগে এই হত্যাকাণ্ডের ঘাতক রাজসংসারের সরকার খোজা নসরের শীঘ্রই মৃত্যু হবে বলে তিনি কি সার্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করে যাননি? তারুবের রাজবংশীয় স্বামীকে হত্যা করার জন্য নসর সম্ভবত তারুবের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। অন্য এক স্ত্রীর গর্ভজাত মুহাম্মাদের (আবদ-আল-রহমানের ৪৫টি ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলে) পরিবর্তে তার নিজের সন্তান আবদুল্লাকে সিংহাসনে বসানোই ছিল তারুবের উদ্দেশ্য। আবদ-আল-রহমান এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছিলেন এবং নসর যখন একটা শিশি এনে বলল যে, এর মধ্যে রোগ সারানোর একটা আশ্চর্য রকমের ওষুধ আছে তখন রাজা সেই ওষুধটি প্রথমে তাকেই[১৬] খাবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

পারফেকটাস হত্যার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আইজ্যাক নামের এক সাধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার ভান করে কাযীর সামনে উপস্থিত হলেন এবং মুহাম্মাদকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। পারফেকটাসের মতো তাকেও হত্যা করা হল এবং তিনিও একজন শহীদ সাধু ব্যক্তিতে[১৭] পরিণত হলেন। এরপরই শুরু হল মৃত্যু বরণের প্রতিযোগিতা। যাজক ও অযাজকীয় জনসাধারণ মাত্রাতিরিক্তভাবে ইসলামের নিন্দা করে শান্তি পেতে চেয়েছিল। এইভাবে মাত্র দু'মাসেরও কম সময়ে এগারজন শহীদের মৃত্যু বরণ করল।

● ফ্লোরা ও ইউলোজিয়াস

আবদ-আল-রহমানের কার্যকলাপে প্ররোচিত হয়ে বিশপেরা দ্বিধাগ্রস্ত মনে একটি সভা করলেন এবং ইউলোজিয়াসের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই সভা খ্রিস্টানদের এইভাবে পবিত্র মৃত্যু বরণ করার প্রবণতাকে অবিলম্বে বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু এতেও কোন ফল হল না। অবশেষে এক খ্রিস্টান মা ও মুসলিম বাবার সুন্দরী কন্যা এবং ইউলোজিয়াসের অনুগামী এক সুন্দরী যুবতী ফ্লোরার পালা এল। পূর্বে নিহত সন্ন্যাসীদের একজনের বোন যুবতী সন্ন্যাসিনী মেরীকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরাও মুহাম্মাদকে গালিগালাজ করতে লাগল। এক সহানুভূতিশীল কাযী তাদের দুজনকে জেলে পাঠাল। ইউলোজিয়াসেরও ইতিমধ্যে কারাদণ্ড হয়েছিল। ফ্লোরার প্রতি ইউলোজিয়াসের ছিল পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ভালবাসা। ফ্লোরা ও তার সঙ্গিনী যেহেতু আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা নিয়েও ফাঁসির মঞ্চে জীবনদানের ব্যাপারে কিছুটা দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল, তাই তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ইউলোজিয়াস তার বাগ্মিতার সমস্ত ক্ষমতাটুকুই ব্যবহার করেছিলেন। সম্ভাব্য শহীদ সেই দুই যুবতী তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করল না; ফলে ৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর[২৮] তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে অসংখ্য নিপীড়ন মূলক নীতির প্রবর্তক প্রথম মুহাম্মাদের (৮৫২-৮৬ খ্রি) আদেশে কর্ডোভার সেই সময়কার বিশপ ইউলোজিয়াসের মৃত্যু হবার আগে পর্যন্ত হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এই আত্মাহুতির আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটল না। সব মিলিয়ে চুয়াল্লিশ জনের মত শহীদ হলেন।

● বিদ্রোহের পথে বিভিন্ন প্রদেশ

বিস্ময়কর না হলেও আরও কিছু গুরুতর গোলযোগ অপেক্ষা করে ছিল। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, মুহাম্মাদ বা তার দুই পুত্র ও উত্তরসূরি আল-মুনযির (৮৮৬-৮৮ খ্রিঃ) ও আবদুল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রিঃ)-র কেউই উমাইয়া রাজবংশের চরম সহিষ্ণুতা ও উদ্যমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি ছিলেন না। এছাড়া রাজবংশের বড় ছেলে বা যোগ্য ছেলের রাজসিংহাসন লাভ করার যে চিরাচরিত প্রথা মুসলিম রাজবংশে চলে আসছিল, তার ফলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। দু'বছরেরও কম সময় রাজত্ব করার পর তার উত্তরসূরির প্ররোচনায় আল-মুনযিরের শরীর থেকে রক্তমোক্ষণের সময়[২৯] শল্য-চিকিৎসকের ছুরির সাহায্যে তার দেহে বিষ প্রয়োগ করা হল। ইতিমধ্যেই তার রাজ্যে মুয়াল্লাদ ও মোজারাব বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বেশ কিছু অঞ্চল তার অধীনতা অস্বীকার করে বার্বার অথবা স্পেনীয় মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিল। কাগজে-কলমে যে সমস্ত অঞ্চল কর্ডোভাব অধীন ছিল, সেখানকার জাতীয় চেতনার সমর্থক বলে ভান করা নয়া-মুসলিমরাই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিল। আর এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দশম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত উমাইয়া আমীরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছিল।

দক্ষিণে রেজিও[৬০] পার্বত্য প্রদেশ ও তার রাজধানী আর্কিডোনা ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি করল। বার্ষিক করের বিনিময়ে মুহাম্মাদ ওই অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। দেশীয় মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিল ইসলামে দীক্ষিত স্পেনীয় মানুষ। উত্তরাঞ্চলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এক পুরানো ভিসিগথিক পরিবার বানু-কাসির[৬১] নেতৃত্বে স্বাধীন আরাগণ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে সারাগোসা, টুডেলা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী শহরকে[৬২] তার অন্তর্ভুক্ত করে নিল। তাদের পশ্চিমের প্রতিবেশী লিঁয়-র রাজাদের সঙ্গে বানু-কাসি পরিবার সন্ধি স্থাপন করল। টলেডো'র চারপাশ ঘিরে যে শহরটি ছিল সেখানে অধিকাংশ সময়ে শান্তির তুলনায় অশান্তি বিরাজ করত। বারবার বানু-যূ-আল নূনের নেতৃত্বে একদল দস্যু আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবারি বহন করে নিয়ে আসত। ভিসিগথদের নেতৃত্বাধীন রোমান সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র সেভিলে রোমান ও গথদের বংশধর ছিল। এখানে বানু-হাজ্জাজ সর্বেসর্বা[৬৩] হয়ে উঠেছিলেন। সেভিল ও এর জেলার এই সমস্ত শাসকেরা একজন আরবের স্ত্রী ও উইতিজার নাতনি সারা-র মাতৃকুলের বংশধর। ঐতিহাসিক ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ ও(গথমহিলার সন্তান) ছিলেন সারা-র[৬৪] বংশধর। গ্যালিসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে আবদ-আল-রহমান ইবন-মারওয়ান আল-জিল্লিকি[৬৫] নামে মেরিডা ও বাদাজজের এক দুঃসাহসী বিশ্বাসঘাতক এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং লিয়-র রাজা ও আরব শাসকের বিরোধী সমস্ত বিদ্রোহীদের বন্ধুত্বে তৃতীয় অ্যালফোনসোর সাহায্যে তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন। বর্তমানে পর্তুগালের আলগার্ভ[৬৬] অঞ্চল বলে পরিচিত সেই সময়কার দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আর এক ধর্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক মুহাম্মাদের রাজত্বের শেষ দিকে নিজেকে ওই অঞ্চলের শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আর এক বিশ্বাসঘাতক রাজপুত্রের নেতৃত্বে মারসিয়া (আরবী ভাষায় মারসিয়াহ্) আরব সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহীদের মধ্যে উমার ইবন-হাফসুন ছিলেন সবচেয়ে বিপজ্জনক ও অশান্ত।

● ইবন-হাফসুন

উমার ছিলেন এক ভিসিগথিক কাউন্টের মুসলিম বংশধর। ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বোবাসট্রো[৬৭] শৃঙ্গের ওপর অবস্থিত এক পুরানো দুর্গকে মূল কেন্দ্র করে একটি দস্যুবৃত্তির সংগঠক রূপে ইবন-হাফসুন তার বর্ণময় জীবন শুরু করেছিলেন। কর্ডোভার রাজার সেনাবাহিনীতে সাময়িকভাবে কাজ করার পরে এলভিরা (ইলবিরাহ্)-র পার্বত্য উপজাতিদের সহায়তায় মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উমার স্পেনীয় দক্ষিণাঞ্চলে নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হন। তার বিদ্রোহ দমন করার কাজে মুহাম্মাদ, আল-মুনযির ও আবদুল্লা-এই তিন আমীর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দক্ষিণের খ্রিস্টান ও অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে উমার দীর্ঘদিনের অবদমিত জাতীয় চেতনায় বীরপুরুষ হয়ে উঠলেন। কিন্তু আরবদের কাছে তিনি 'হতভাগা', 'দুর্বৃত্ত'-ই[৬৮] ছিলেন। বহু ভাগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত

কর্ডোভাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সফল হলেন এবং তাকে স্পেনের গভর্নর রূপে নিয়োগ করা হবে, এই আশায় তিনি আব্বাসীয়[৩৩] ও আফ্রিকার আগলাবি শাসকদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করলেন। তার এই উচ্চাকাঙক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর তিনি ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তার পূর্বপুরুষদের যে ধর্মীয় আদর্শ তিনি দীর্ঘদিন গোপনে মনের মধ্যে লালন-পালন করে এসেছেন[৩৪] সেই ধর্ম গ্রহণ এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে স্যামুয়েল নাম গ্রহণ করলেন। স্যামুয়েল বার বার উমাইয়া রাজবংশের ভিত্তি ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। এর ফলে প্রথম আবদ-আল-রহমানের উত্তরসূরিদের কর্তৃত্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই কর্তৃত্বকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একজন সংস্কারকের প্রয়োজন দেখা দিল। ❑

● টীকা ●

১ ইব্‌ন ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড ৭৩ ও ৭৭ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৯ ও পরের পাতা; ইক্‌দ, ২য় খণ্ড, ৩৬৫; ইবন-খালদুন, ৫র্থ খণ্ড ১২৬ পাতা।

২ ইবন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১-০২ পাতা; ইবন-আল-কুতাইয়াহ্‌, ৪২ পাতা।

৩ তার ডাকনাম ছিল আল-খুরস ও তিনি ছিলেন বোবা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১২৭ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ২২০ পাতা।

৪ ২০২ হিজরী সন (৮১৭-১৮ খ্রিঃ), ইবন-ইযহারির গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ৭৭ পাতা; তুলনীয় : ইবন-আল-কুতাইয়াহ, ৫১-৫২ পাতা।

৫ এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার পরিণতিতে আল-হাকামের উপনাম হয় আল-রাবাদ (শহুরে)। ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ, ৩৮ পাতা।

৬ যে জায়গায় তারা স্থায়ীভাবে আশ্রয় নিল সেটি এখনও অভিহিত হয় ইদওয়াত্‌-আল-আন্দালুস, আন্দালুসিয়দের তীর নামে।

৭ ইবন-আল-কুতাইয়াহ্‌, ৫১ পাতা।

৮ ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ, ৩৯-৪০ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ২১৯ পাতা; মাররাকুশি, ১৩-১৪ পাতা; কিনদি, উলাহ, ১৬১-৬৫ পাতা ও ১৮৪ পাতা; ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ৫৬১ পাতা; ইয়াকুত, ১ম খণ্ড, ৩৩৭ পাতা; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ২০২ পাতা।

৯ ইসিদোরাস প্যাসেনসিস-এ উরবস রেজিয়া, এসপার্মা সাগরাডা-তে 'দেল ক্রোনিকন', থিয়াট্রো জিওগ্রাফিকো-হিস্টোরিকো ডে লা ইগলেসিয়া ডে এসপানা, সম্পাদনা : ফ্রে-হেনরিক ফ্লোরেজ, ৮ম খণ্ড, (মাদ্রিদ, ১৭৫৩) ২৯৭ পাতা; মদীনাত আল-মুলূক (রাজাদের শহর), কাজবিনি উল্লিখিত, আসার, ৩৬৬ পাতা।

১০ ওয়াকআত আল-হুফরা, ইবন-আল-আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৫ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১২৬ পাতা।

১১ ইবন-আল-কুতাইয়াহ, ৪৫-৪৯ পাতা; ইবন-ইযহারি, ২য় খণ্ড, ৭১-৭২ পাতা।

১২। কর্ডোভার উমাইয়া আমীর :

১। প্রথম আবদ-আল-রহমান (৭৫৬-৮৮)।
|
২। প্রথম হিশাম (৭৮৮-৯৬)।
|
৩। প্রথম আল-হাকাম (৭৯৬-৮২২)
|
৪। দ্বিতীয় আবদ-আল-রহমান (৮২২-৫২)
|
৫। প্রথম মুহাম্মাদ (৮৫২-৮৬)

৬। আল-মুনযির (৮৮৬-৮৮) ৭। আবদুল্লা (৮৮৮-৯১২)
|
মুহাম্মাদ
|
৮। তৃতীয় আবদ-আল-রহমান (৯১২-২৯, খলিফা ৯২৯-৬১)।

১৩ প্রথম আবদ-আল-রহমান ও তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের মধ্যবর্তী সেতু, ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ, ৬১ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১২৭ পাতা।

১৪ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২২৪-২৫ পাতা; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে, ৫১৬ পাতা।

১৫ ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ১৭৩ পাতা। তুলনীয় : ইবন-আল-কুতাইয়াহ্, ৩৪ পাতা। ইবন-খাল্লিকানের মতে, মালিক, ইয়াহিয়াকে 'আল-আন্দালুসের জ্ঞানী মানুষ (আকিল) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ সমস্ত ছাত্ররা যখন রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি হাতিকে দেখবার জন্য ছুটে যাচ্ছিল তখনও তিনি তার আসনে বসে ইমামের বক্তব্য শুনছিলেন।

১৬ মাকদিসি, ২৩৬ পাতা।

১৭ পারসীয় ভাষায় জার মানে 'সোনা' + আব মানে 'জল'; আবু-আল-হাসান আলি ইবন-নাফি ইকদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১, জিরয়াবকে কালো দাস নামে ডাকত।

১৮ তুলনীয় : ইবন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ৩৫৭ পাতা, মাক্কারি কর্তৃক উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, ২২২ পাতা।

১৯ মাক্কারি, ২য় খণ্ড ৮৭ পাতা। ইবনে আল কুতাইয়াহ্ — পৃ ৬৮

২০ মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৮৭-৮৮ পাতা।

২১ আরবী থেকে গৃহীত মুস্তাআরিব, যে আরবী ভাষা ও ঐতিহ্য গ্রহণ করছে।

২২ অ্যালভারো, 'ইনডিকুলাস লুমিনোসাস' এসপানা সাগরাডা, ১১শ খণ্ড, ২৭৪ পাতায়।

২৩ প্রাইমেরা ক্রোনিকা জেনারেল এস্টোরিয়া ডে এসপানা কিউ ম্যানডো কমপোনির অ্যালফনসো এল সাবিও, সম্পাদনা : রামন মেনেনডেজ পিডাল (মাদ্রিদ, ১৯০৬), ১ম খণ্ড, ৩২৬ পাতা।

২৪ ভিটা ভেল প্যাসিও বিটিসিমি মার্টারিস ইউলোজিজ', এসপানা সাগরাডা, ১০ম খণ্ড ৫৪৩-৬৩ পাতা; "ভিডা ই মার্টারিও ডে এস ইউলোজিও", এসপানা সাগরাডা, ১০ম খণ্ড, ৪১১ ও পরের পাতায়।

২৫ অ্যালভারো, এসপানা সাগারাডা, ১১শ খণ্ড, ২২৫-২৬ পাতায় "ইনডিকুলাস"।

২৬ ইবন-আল-কুতাইয়াহ্, ৭৬-৭৭ পাতা; ইবন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১৩০ পাতা।

২৭ অ্যালভারো, এসপানা সাগরাডা, ১১ খণ্ড, ২৩৭-৩৮ পাতায় 'ইনডিকুলাস'।

২৮ এসপানা সাগরাডা, ১০ম খণ্ড, ৪১৭-১৮ পাতা; অ্যালভারো, "ভিটা ইউলোজিজ", একই বইয়ের ৫৪৭ ও পরের পাতায়।

২৯ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১৬০-৬১ ও ১২২ পাতা, ১ম খণ্ড, ১৩২ পাতা; ইবন-খালদূন ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৩২ ; আখবার, ১৫০ পাতা।

৩০ আরবীতে রায়া, অন্যদের মতো ইবন-খালদূন (৪র্থ খণ্ড, ১৩২ পাতা, তুলনায় ১৩৪ পাতা) যেটিকে একটি শহর বলে মনে করেছেন ও মালাগা বলে ভুল করেছেন। ভিসিগথদের নেতৃত্বাধীন রিজিও-র রাজধানী মালাগা এবং তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের রাজত্বের পর। ইদ্রিসি, ২৮ পাতা দেখুন।

৩১ সেবাস্তিয়ানে বেনিকাজ্জি, এসপানা সাগরাডা, ১৩ খণ্ড, ৪৮৭ পাতায় 'ক্রোনিকন'।

৩২ ইবন-আল-কুতাইয়াহ্, ৮৫, ১১৩-১৪ পাতা। ইবন-খালদূনের ৪র্থ খণ্ড, ১৩৪ পাতায় কাসি ভুল করে মুসার বদলে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে তার বংশধরদের 'লাব', 'লোপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তুলনীয় : ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১৭৫-৭৬ পাতা।

৩৩ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১২৮ ও পরের পাতা; ইবন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬ পাতা।

৩৪ ইবন-আল-কুতাইয়াহ্, ৪-৬ পাতা।

৩৫ গ্যালিসিয়ান, ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১০২ ও ১০৪ পাতা; ইবন-আল-কুতাইয়াহ্, ৮৯-৯০ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ১২৭-১২৮ পাতা; দাব্‌বি, ৩৫৯ পাতা; ইবন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১৩১ পাতা; ইয়াকূত, বুলদান, ২য় খণ্ড, ১১০ পাতা।

৩৬ আরবীতে, আল-গার্‌ব, পশ্চিম।

৩৭ আরবীতে বুবাশতার; ইবন-আল-কুতাইয়াহ্, ৯০ পাতা। আখবার, ১৫০ পাতা। তুলনীয় : ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১০৮, ১২০, ২০৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ২৯৫ পাতা।

৩৮ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১১৭ পাতা; ১২০, ১২৩ পাতা। তুলনীয় : ইকদ, ২য় খণ্ড, ৩৬৭ পাতা।

৩৯ ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৫ পাতা।

৪০ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ১৪৩ পাতা।

॥ অধ্যায় ৩৭ ॥

কর্ডোভায় উমাইয়া খিলাফত

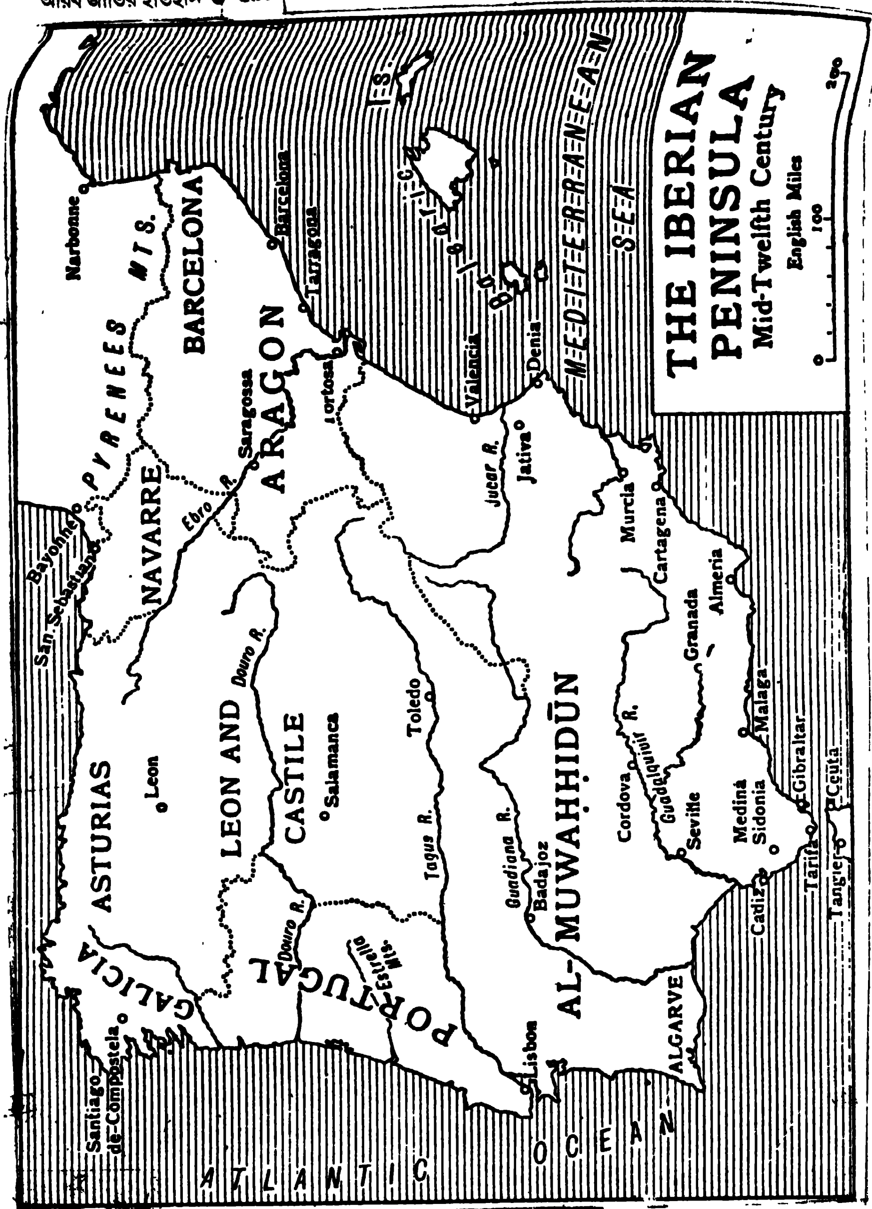
● খলিফা আবদ-আল-রহমান আল-নাসির

৯১২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় আবদ-আল-রহমান যখন তার দাদু আবদুল্লাহ-র উত্তরসূরি রূপে সিংহাসনে বসলেন, তখন তার বয়স মাত্র ২৩ বছর। শুধুমাত্র তার অনুগত নয়,[১] নিছক এই সন্দেহের বশে আবদুল্লা তার এক ছেলে অর্থাৎ আবদ-আল-রহমানের বাবা মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য অপর এক পুত্রকে প্ররোচিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃঘাতী ওই পুত্রের হত্যাকাণ্ডেও তার পরোক্ষ প্রশ্রয় ছিল এবং এর ফলে তিনি পুত্রহীন হয়ে পড়েন। আবদ-আল-রহমানের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে প্রথম আবদ-আল-রহমান দ্বারা সংগঠিত বিরাট মুসলিম রাজ্যটির আয়তন সংকুচিত হয়ে কর্ডোভা ও তার আশপাশের এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

যুবক আমীর নিজেকে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি করেছিলেন। সকল যুগের নেতাদের মধ্যে যে গুণাবলি থাকে, তার মধ্যেও সেই দৃঢ় সঙ্কল্প, সাহস ও সরলতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে আবদ-আল-রহমান তার হারানো অঞ্চলগুলি একের পর এক পুনরুদ্ধার করেন। দীর্ঘ ৫০ বছর (৯১২-৬১ খ্রিঃ)[২] ধরে তার শাসনকালের মধ্যে যে সহজাত প্রাণশক্তি লক্ষ করা গেছে, তার সাহায্যে সমস্ত দিকেই তিনি তার বিজয় অভিযানকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। ৯১২ খ্রিস্টাব্দের[৩] শেষ দিনটিতে এসিজা সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করেছিল। এলভিরা একই পথ অনুসরণ করল। কোন প্রতিরোধ ছাড়াই জেন আত্মসমর্পণ করেছিল। আর্কিডোনা কর দিতে রাজী হল। ৯১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে সেভিল তার প্রবেশদ্বার খুলে দিল। রেজিও প্রদেশের পার্বত্য দুর্গ ইবন-হাফসুনের সাহসী অনুগামীদের প্রতিহত করেছিল, সেটিও ধীরে ধীরে আবদ-আল-রহমানের হস্তগত হতে লাগল। সেই দুর্ধর্ষ নেতা নিজে তার অভেদ্য দুর্গ বোবাসট্রোতে কোন প্রতিআক্রমণকে হেলায় মোকাবিলা করার মানসিকতা নিয়ে বসে রইলেন। ৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু এসে সেই দুর্ধর্ষ শত্রুর দীর্ঘ ৩৭ বছরের শত্রুতার অবসান ঘটাল। শুধুমাত্র টলেডোই তখনও বশ্যতা স্বীকার করেনি। কিন্তু ৯৩২ খ্রিস্টাব্দে গর্বোদ্ধত এই পূর্বতন রাজধানীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং সেটিও দখল হয়ে গেল। গোটা রাজ্যে এইভাবে শান্তি স্থাপিত হল এবং প্রজাবৎসল নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন শাসকের নেতৃত্বে রাজ্যটি সংহত রূপ পেল।

ইতিমধ্যে বহিঃশত্রুদের কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। দক্ষিণে মুসলিম ফাতিমিয় ও উত্তরে লিঁয়-র খ্রিস্টান রাজারাই ছিল বহিঃশত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়ায় ফাতিমিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উবাইদুল্লাহ্ আল-মাহদী। তিনি ইবন-হাফসুনের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করলেন এবং জিব্রাল্টার প্রণালীর অপর পারে দূত ও গুপ্তচর পাঠালেন। ফাতিমিয়রা নিজেদের মুহাম্মাদের মেয়ে ও আলীর স্ত্রী ফাতিমার বংশধর বলে দাবি করতেন। তাই তারা নিজেদের ছাড়া ইসলাম ধর্মের অপর কোন কর্তৃত্বকে স্বীকার করতেন না। কর্ডোভার অধিবাসী ও মেকী এমপেডোক্লীয় দার্শনিক ইবন-মাসাররা (৮৮০-৯৩১ খ্রিঃ) পশ্চিমি দুনিয়ায় এক ধরনের রহস্যময় লেখন পদ্ধতি চালু করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র ব্যবহৃত শব্দগুলির অন্তর্নিহিত রহস্যময় অর্থ বুঝতে পারত। এই ইবন-মাসাররাকে তার চালু করা বিশেষ লেখন পদ্ধতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে স্পেনে একটি ফাতিমিয় পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৯১৭ বা ৯১৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আবদ-আল-রহমানের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছিল মরক্কো। কিন্তু আফ্রিকায় যখন শত্রুর আবির্ভাব ঘটছে তখন স্পেনে তার সিংহাসন নিরাপদ থাকতে পারে না—এই সত্য উপলব্ধি করে তিনি ৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সেউতা দখল করেন এবং শেষ পর্যন্ত বারবারি উপকূলের[৪] একটি বিরাট অংশ তার কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তার পুনর্নির্মিত ও বর্ধিত আকারের নৌবহরটির[৫] সমকক্ষ সেই সময়ে বিশ্বে আর ছিল না। আলমেরিয়াকে[৬] প্রধান বন্দর করে তিনি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার কর্তৃত্ব নিয়ে ফাতিমিয় নৌবাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৭০টি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্পেনীয় নৌবহর স্পেনের উপকূলে ফাতিমিয় খলিফার[৭] নেতৃত্বাধীন সিসিলিয় নৌবহরের আক্রমণের জবাবে আফ্রিকার উপকূলের কিছু কিছু অংশ বিধ্বস্ত করে দিল।

অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে যখন এই সামরিক অভিযান চলছিল, তখন এক খ্রিস্টান ক্রীতদাসীর সন্তান আবদ-আল-রহমান প্রায়ই উত্তর প্রান্তের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ছিলেন। এই খ্রিস্টানেরা এর আগে কখনও বশ্যতা স্বীকার করেনি। এখানে বাসকুইস রাজ্য[৮] পিরেনিজের সঙ্গে যুক্ত মধ্যাঞ্চলকে দখল করে নিয়েছিল। পূর্বপ্রান্তে তখন নাভারে ও আরাগণ রাজ্য সবেমাত্র জন্ম নিয়েছে। পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে সেই অঞ্চলগুলি যেগুলি ক্যাসিল ও লিঁয় রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম রাজ্যগুলির এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে লিঁয়-র দুর্দমনীয় রাজা দ্বিতীয় অরডোনো[৯] ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলটি বিধ্বস্ত করে দিয়ে মুসলিম রাজাদের বিরুদ্ধে তার অভিযান শুরু করেন। তিন বছর পরে তিনি আবদ-আল-রহমানের এক সেনাপতিকে বন্দি করেন এবং ওই মুসলিম সেনাপতি সান এস্তেবান ডে গোরমেজ[১০] নামে যে সীমান্তবর্তী দুর্গটি দখল করেছিলেন, তারই একটি দেয়ালে একটি বুনো শুয়োরের মাথার পাশে ওই সেনাপতির মাথাটিকে পেরেকবিদ্ধ করেন। পর পর হঠাৎ আক্রমণ করে উত্তরাঞ্চলের এই শত্রুরা সফলভাবে লুঠতরাজ চালাচ্ছিল। ৯২০ খ্রিস্টাব্দে আবদ-আল-



ইবেরিয়ান উপদ্বীপ, দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি

রহমান নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, সান এস্তবানকে (এস. এস্তেভান) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন এবং খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাজ্যের মধ্যবর্তী বিতর্কিত এলাকার অন্যান্য কয়েকটি দুর্গও[১১] ধ্বংস করলেন এবং ভাল দে জানকোয়ারাস-এ (নলখাগড়ার উপত্যকা) দ্বিতীয় অরডোনো ও নাভারের স্যাঞ্চো[১২] দি গ্রেট-এর সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হলেন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। নাভারের বিভিন্ন অঞ্চল ও সংলগ্ন খ্রিস্টান এলাকাগুলি দখল করে আবদ-আল-রহমান বিজয়ীর বেশে তার রাজধানীতে ফিরে এলেন। চার বছর পরে তিনি সুদূর উত্তরে নাভারের রাজধানী প্যাম্পেলুনা-তে[১৩] প্রবেশ করে সেটিকে ধ্বংস করলেন। সেখানকার গর্বোদ্ধত রাজা ও পূর্বপ্রান্তে খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান পুরুষটি এরপর দীর্ঘদিন ধরে শক্তিহীন হয়ে ছিলেন। ইবন-ইয্হারি[১৪] তাকে 'কুকুর' বলে উল্লেখ করেছেন। ওই একই সময়ে খ্রিস্টান ধর্মের আর এক বীরপুরুষ অরডোনো মারা যান এবং তারপরে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে সামরিক অভিযানে ভাটা পড়ে।

আবদ-আল-রহমানের দীর্ঘ রাজত্বের বাকী বছরগুলি তার প্রজ্ঞাদীপ্ত ও সুদক্ষ শাসনের সাক্ষ্য বহন করে। তার মধ্যে প্রথমটি হল সেই ঘোষণা, অর্থাৎ ৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি শুক্রবার থেকে সাধারণ প্রার্থনা ও রাজকীয় দলিলে ক্ষমতাসীন শাসককে 'খলিফা' বলে উল্লেখ করা হবে। তিনি নিজে তার জন্য আল-খলিফা আল-নাসির লি-দিন আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র ধর্মের রক্ষক খলিফা[১৫] উপাধি গ্রহণ করলেন। তার পক্ষে এই খেতাবটি ছিল যথোপযুক্ত কারণ পূর্বপ্রান্তের খলিফা সাম্রাজ্যের যে দুর্দশা হয়েছিল তা থেকে উদ্ধার করে তিনি মুসলিম স্পেনকে এমন একটা মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসিয়েছিলেন যে, এই প্রথম তিনি আমীর আল-মুমিনিনের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্মের রক্ষক হিসেবে খলিফা আল-নাসির খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে তার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। কারণ এই খ্রিস্টানরা বরাবরই তাদের পূর্বপুরুষদের অধিকৃত দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল। ৯২৯ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তার এই অভিযান চলেছিল। ওই বছরেই লিঁয়-র রাজা দ্বিতীয় রামিরো ও স্যাঞ্চো দি গ্রেট-এর বিধবা পত্নী নাভারের রানি রিজেন্ট টোটা[১৬] সম্মিলিত ভাবে সালামানকার দক্ষিণে আলহানডেগা[১৭]-তে তার সামরিক অভিযানকে দারুণভাবে প্রতিহত করলেন। বিগত ২৭বছর ধরে তার অবিরাম সামরিক অভিযান এই প্রথম ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। খলিফার বিশাল সেনাদল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, খলিফা নিজে কোনক্রমে বেঁচে গেলেন। এই টোটাই পরে তার সে পুত্রের নামে নাভারে শাসন চালাচ্ছিলেন। তাকে এবং লিঁয়-র পূর্বতন রাজা ও তার নাতি স্যাঞ্চো দি ফ্যাটকে সঙ্গে নিয়ে স্যাঞ্চোর চিকিৎসার জন্য এবং তাকে সিংহাসনে[১৮] পুনরায় বসানোর জন্য সামরিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হন। রাজকীয় অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হল, এরই পাশাপাশি মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীর মানুষেরা দেখল, যে খলিফার কথাই এবরো মোহনা থেকে আটলান্টিক এবং

পিরেনিজ পর্বতমালার পাদদেশ থেকে জিব্রালটার পর্যন্ত আইন হিসেবে প্রচলিত ছিল তারই দরবারে খ্রিস্টান রাজা কীভাবে সাহায্যের জন্য কাতর মিনতি জানাচ্ছে। ইহুদি রাজদরবারের চিকিৎসক ও কূটনীতিক হাসডে বেন-শাপরুতের দক্ষ চিকিৎসায় স্যাঞ্চো, যে অতিরিক্ত স্থূলতার জন্য তিনি সিংহাসন হারিয়েছিলেন, তার হাত থেকে মুক্তি পেলেন এবং খলিফার সাহায্যে তিনি ৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তার হারানো সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেন।

● আল-জাহ্‌রা

ওই সময়ে খলিফার রাজদরবারটি ছিল ইউরোপের জাঁকজমকপূর্ণ রাজদরবারগুলির অন্যতম। বাইজান্টাইন সম্রাটের এবং জার্মানি, ইতালি ও ফ্রান্সের[১১] রাজাদের দূতরাও ছিল এই রাজ দরবারের আস্থাভাজন। ৫ লক্ষ মানুষ, সাতশো মসজিদ[১২] ও তিনশো সাধারণ স্নানাগার সহ রাজধানী কর্ডোভার স্থান ছিল জাঁকজমকের দিক থেকে বাগদাদ ও কনস্ট্যান্টিনোপলের ঠিক পরেই। গুয়াদালকুইভিরে দেখা যায় সিয়েরা মোরেনার একটি তীক্ষ্ণ অভিক্ষিপ্তাংশের ওপর অবস্থিত শহরটির দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে হাজার হাজার ক্রীতদাস ও প্রহরীদের থাকার জন্য চারশো ঘর ও কয়েকতলা বিশিষ্ট রাজবাড়িটি অবস্থিত। লোককথা থেকে জানা যায় যে, আবদ-আল-রহমান তার এক উপপত্নীর ফেলে-যাওয়া টাকার সাহায্যে ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই রাজবাড়ির নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন। তার প্রথম চিন্তা ছিল, খ্রিস্টানদের হাতে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণরূপে এই টাকাটা ব্যবহার করবেন। কিন্তু কোন যুদ্ধবন্দির খোঁজ না মেলায় অপর এক উপপত্নী আল-জাহ্‌রা (উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট)-র পরামর্শে তিনি এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন এবং ওই উপপত্নীর নামে প্রাসাদটির নামকরণ করেন। নুমিদিয়া ও কার্থেজ থেকে মার্বেল পাথর আনা হয়েছিল, সোনার মূর্তিযুক্ত স্তম্ভ ও বেসিনগুলি কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে আমদানি করা হয়েছিল বা উপহার হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। ১০০০০ মজুর ও বোঝা বহনের জন্য ১৫০০ পশু ২০ বছর[১৩] ধরে কাজ করেছিল। আল-নাসিরের দুই উত্তরসূরির দ্বারা বর্ধিত ও অলঙ্কৃত আল-জাহ্‌রা রাজকীয় মফস্বল শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ও তার পরে আংশিকভাবে খননের কাজ শুরু করা হয় এবং ওই প্রাসাদটির অবশিষ্টাংশ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

আল-জাহরাতে ৩৭৫০ জনের[১৪] স্লাভ দেহরক্ষী খলিফাকে ঘিরে রেখেছিল। তার নিয়মিত সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০০,০০০।[১৫] জার্মান ও অন্যান্যদের দ্বারা স্ল্যাভেনিক উপজাতিদের মধ্য থেকে ক্রীত এবং আরবদের কাছে বিক্রীত ক্রীতদাস ও যুদ্ধবন্দিদেরই স্লাভ নামে ডাকা হত। পরবর্তী সময়ে ক্রীত সমস্ত বিদেশি অর্থাৎ ফ্রাঙ্ক, গ্যালিসিয়ান, লম্বার্ড ও অন্যান্য যাদের যৌবনকালেই কিনে নিয়ে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আরবীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলা হত তাদের সকলকেই স্লাভ[১৬] বলা শুরু হয়। স্পেনের এই জানিসারি বা মামলুকদের সাহায্যে খলিফা শুধু বিশ্বাসঘাতকতা ও দস্যুবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাই নয়,

পুরানো আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাবকে খর্ব করেছেন। কৃষি ও বাণিজ্য বিকশিত হয়েছিল এবং রাজ্যের আয়ের উৎসও কয়েক দফা বেড়ে গিয়েছিল। রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৬,২৪৫,০০০ দিনার। এই রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ ও এক-তৃতীয়াংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হত। আর বাকী অর্থ রাজভাণ্ডারে[১৫] সংরক্ষিত করা হত। এর আগে কখনও কর্ডোভা এত সমৃদ্ধ হয়নি, আল-আন্দালুস এত ধনশালী হয়নি এবং রাজ্য এত বেশি বিজয় অর্জন করেনি। আর এর সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল একটিমাত্র মানুষের প্রতিভার মাধ্যমে, যিনি ৭৩ বছরে মারা যাবার সময় লিখে গিয়েছিলেন যে, তিনি মাত্র ১৪দিন সুখ[১৬] ভোগ করেছেন। ❑

● টীকা ●

১ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ১ম খণ্ড, ডোজি লিখিত ভূমিকা, ৪৭-৫০ পাতা; ইব্‌ন-আল-আব্বার, হুল্লাহ্, ৯১ পাতা।

২ ইব্‌ন-আল-আব্বার, হুল্লাহ্, ৯৯ পাতা, সঠিকভাবেই বলেছেন তার সময়কাল পর্যন্ত তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের রাজত্বকালই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৪৮১ পাতা, টীকা ২।

৩ ইব্‌ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পাতা।

৪ ইব্‌ন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭-৩৮ পাতা, মাক্কারির রচনাতে উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, ২২৭ পাতা।

৫ ইংল্যান্ডে নর্থমেন (নর্সমেন) বলে পরিচিত স্ক্যান্ডিনোভিয়ার জলদস্যু, ফ্রান্সের নর্মান ও ডেনস্‌দের সঙ্গে বহুবার স্পেনীয় মুসলিম নৌবহরের সংঘর্ষ ঘটেছিল। এদের সকলেই আরবেরা সাধারণ-নাম মাজুস (আগুনের পূজারি) বলেই ডাকত। ৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আবদ-আল-রহমানের রাজত্বে মাজুসরা প্রথম তীরভূমিতে নামার চেষ্টা করেছিল, ৮০টি জাহাজ নিয়ে তারা লিসবনের উপকূলে নোঙর করে, ও পরে সেভিল দখল করে। ৮৫৮-৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুহাম্মাদের রাজত্বে দ্বীপের উপকূলে বহুবার নামার চেষ্টা করে। ইব্‌ন-আল-কুতাইয়াহ, ৬৩ পাতা; ইব্‌ন-ইযহারি, ২য় খণ্ড, ৮৯-৯০ ও ৯৯ পাতা; মাসউদী, ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পাতা; ইব্‌ন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ১১-১২ ও ৫৮ পাতা; ডোজি; রিসার্চেস, ২য় খণ্ড ২৫০-৩৭১ পাতা।

৬ আরবী আল-মারিয়া থেকে, (প্রহরা স্তম্ভ)।

৭ ইব্‌ন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬ পাতা; অনুবাদ : ডি স্লেন, হিস্টয়ার দাস বার্বারেস এট দাস ডাইন্যাস্টিস মুসুলমানস ডে এল' আফ্রিকি সেপটেনট্রিওনেল, সম্পাদনা : পল ক্যাসানোভা, ২য় খণ্ড, (প্যারিস, ১৯২৭), ৫৪২ পাতা।

৮ বাস্‌কান্‌স-এর নকল ইব্‌ন-কুতাইবাহ্-এর গ্রন্থে, ১২১, ১৩২ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৭ম খণ্ড, ৪৮ পাতা; ইব্‌ন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০ পাতা।

৯ মাসউদী-র "আরদুন", ৩য় খণ্ড, ৭৫ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পাতা; ইব্ন-ইয্‌হারির "আরযুন", ২য় খণ্ড, ১৭৯ ও ১৮৭ পাতা।

১০ অথবা কাসট্রো মরোস; আরবী, শান্ত ইশতিবান, আশতিন বা কাশটার মুরুশ।

১১ ইব্ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ১৮৩ ও পরবর্তী পাতা; আবদ-আল-রহমানের সভাকবি ইব্ন আব্দ-রাব্বিহি বলেন ৭০টি দুর্গ ধ্বংস হয়, ইক্‌দ, ২য় খণ্ড, ৩৬৮ পাতা।

১২ ইবন-আল-কুতাইয়ার 'শানজা', ১১৪ পাতা; মাক্কারির 'শানজা', ১ম খণ্ড, ২৩৩ পাতা; ইবন-খালদুনের 'সানজা', ৪র্থ খণ্ড, ১৪১ পাতা।

১৩ মাক্কারির বইতে 'বানবালূনাহ্, ১ম খণ্ড, ২৩৪ পাতা; ইবন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ১৯৬ ও ১৯৯ পাতা।

১৪ ২য় খণ্ড ২০০।

১৫ ইকদ, ২য় খণ্ড ৩৬৮ ও ৩৬৯ পাতা; ইবন-ইযহারি, ২য় খণ্ড, ১৬২, ২১১-১২ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭ পাতা; মাক্কারির পুনরুল্লিখিত, ১ম খণ্ড, ২২৭ পাতা।

১৬ ইবন-খালদুনের বইতে 'তুতাহ্', ৪র্থ খণ্ড ১৪২-৪৩ পাতা।

১৭ আরবী আল-খান্দাক থেকে, পরিখা, মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পাতা।

১৮ ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পাতা, মাক্কারিতে উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পাতা।

১৯ ইবন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড ২২৯ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড ১৪২-৪৩ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২২৭ পাতা।

২০ ইব্ন ইয্‌হারি-এর গ্রন্থে তিন হাজার বর্ণিত হয়েছে। ২য় খণ্ড, ২৪৭ পাতা; তুলনীয় : মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ৩৫৫ পাতা।

২১ ইব্ন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২২৫, ২৪০, ২৪৬-৪৮ পাতা; ইবন-হাওকাল, ৭৭ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ৩৪৪-৪৭ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪১৩ পাতা।

২২ ইবন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পাতা।

২৩ মাসউদী, ৩য় খণ্ড, ৭৪ ও ৭৮ পাতা। পরের হলেও মাসউদী একজন সমসাময়িক গ্রন্থকার।

২৪ আরবীতে, সাকালিবা; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ২৩৫ পাতা।

২৫ ইবন-ইয্‌হারি, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪১৩ পাতা। তুলনীয় : ইবন-হাওকাল, ৭৭ পাতা।

২৬ ইবন-ইয্‌হারি ২য় খণ্ড, ২৪৮ পাতা।

।। অধ্যায় ৩৮ ।।

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংগঠন

তৃতীয় আবদ-আল-রহমান ও তার উত্তরসূরি দ্বিতীয় আল-হাকাম (৯৬১-৭৬ খ্রিঃ)-এর রাজত্ব আল-হাজিব আল-মানসুর (৯৭৭-১০০ খ্রিঃ)-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পশ্চিমি দুনিয়ায় মুসলিম সাম্রাজ্যের সুদূরতম প্রান্ত রূপে বিরাজ করছিল। এর আগে কিংবা পরে আর কখনও মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেন, ইউরোপ ও আফ্রিকার রাজনৈতিক জীবনে এমন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

● কর্ডোভা

এই সময়ের উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী ইউরোপের সবচেয়ে সংস্কৃতিমনস্ক শহরে এবং কনস্ট্যান্টিনোপল ও বাগদাদের সঙ্গে বিশ্বের তিনটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটিতে পরিণত হয়। ১,০০,১৩,০০০ বাড়ি[১] ২১টি মফস্বল[২], ৭০টি গ্রন্থাগার এবং অসংখ্য বইয়ের দোকান, মসজিদ ও অট্টালিকা বিশিষ্ট এই শহরটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং পর্যটকদের মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। শহরটির বুকে মাইলের পর মাইল বাঁধানো রাস্তা ছিল এবং পথের ধারের বাড়িগুলি[৩] থেকে রাস্তায় তীব্র আলো ফেলার ব্যবস্থা ছিল। অথচ "তার প্রায় ৭০০ বছর পরে লণ্ডনে একটিও আলোর ব্যবস্থা ছিল না। এবং "কয়েক শতাব্দী পরে প্যারিসে বর্ষণস্নাত কোন দিনে যে বাড়ির বাইরে পা বাড়াবে তার পা-ই গোড়ালি পর্যন্ত কাদায়[৪] ডুবে যাবে।" এখনও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে স্নান করাকে ধর্মহীন বা অসভ্য ব্যক্তিদের আচরণ বলে মনে করে, কর্ডোভার বিজ্ঞানীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানকার বিলাসবহুল স্নানাগারে স্নান করবার অধিকার ভোগ করে এসেছে। টলেডোর সুশিক্ষিত বিচারক সঈদের[৫] (মৃ. ১০৭০) লেখায় নার্ডিক বর্বরদের প্রতি আরবদের মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে,—"সূর্য যেহেতু তাদের মাথার ওপর সরাসরি তার কিরণ ছাড়ায় না, তাই তাদের আবহাওয়া থাকে ঠাণ্ডা ও আকাশ থাকে মেঘলা। তাই তাদের মেজাজটাও ঠাণ্ডা ও কৌতুকগুলো অমার্জিত। কিন্তু দেহের আকার বিরাট, গায়ের রং হালকা ও চুলগুলো লম্বা। সরস কৌতুক ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তাদের ছিল না, বরং মূর্খামি ও বোকামিই ছিল তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য"। তাই যখনই লিঁয়, নাভারে বা বার্সিলোনার শাসকেরা কোন শল্যবিদ, স্থপতি, সুদক্ষ সঙ্গীতশিল্পী বা পোশাক প্রস্তুতকারকের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তা হলে তার জন্য তারা কর্ডোভার কাছে আবেদন

জানাতেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীটির খ্যাতি সুদূর জার্মানিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন স্যাক্সন সন্ন্যাসিনী এই রাজধানীটিকে 'বিশ্বের রত্ন'[১৬] বলে বর্ণনা করেছেন। এমনই সুন্দর একটি শহর ছিল উমাইয়া শাসকের আবাস ও তার প্রশাসনের মূল কেন্দ্র।

● সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ

পশ্চিমের খলিফা সাম্রাজ্যে সরকারি প্রশাসন পূর্বের খলিফা সাম্রাজ্যের সরকারি প্রশাসন থেকে মূলগতভাবে আলাদা ছিল না। খলিফার পদটি ছিল বংশানুক্রমিক, যদিও প্রায়ই সামরিক বাহিনীর অফিসার ও অভিজাতরা তাদের পছন্দের লোককে ওই পদে নির্বাচিত করত। হাজিব (রাজ-সরকার) ছিল উজিরের ওপরে এবং তার মাধ্যমেই খলিফার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। উজিরের নিচে ছিল কুত্তাব (সচিব) এবং এরা উজিরের সঙ্গে মিলিতভাবে দিওয়ান তৈরি করত। কর্ডোভা বাদে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ছয়, প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনের দায়িত্বে ছিলেন ওয়ালি নামে একজন অসামরিক ও সামরিক গভর্নর। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরও ছিল এই ওয়ালিদের অধীনে। বিচারের ভার ছিল খলিফার হাতে, তিনি প্রথানুযায়ী বিচারের দায়িত্ব তুলে দিতেন কাযীদের হাতে। কর্ডোভার কাযী আল-কুযাহ ছিলেন এই কাযীদের নেতৃত্বে। সাহিব আল-শুরতাহ নামে এক বিশেষ বিচারক অপরাধমূলক ও ফৌজদারি মামলাগুলি শুনতেন। সাহিব আল-মাজালিম নামে কর্ডোভার একজন বিশেষ বিচারক জনগণের অভাব অভিযোগ শুনতেন। জরিমানা, চাবুক মারা, কারাদণ্ড ও অঙ্গহানি ছিল সাধারণ অপরাধের শাস্তি, আর আল্লাহ্‌র নিন্দা, প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা ও ধর্মত্যাগের শাস্তি ছিল মৃত্যু। এক বিশেষ দায়িত্বশীল অফিসার ছিলেন মুহতাসিব (স্পেনীয় ভাষায় আলমোতাসিন)। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও তিনি ব্যবসা ও বাজারের তত্ত্বাবধান এবং ওজন ও পরিমাণের সঠিকতা দেখাশোনা করতেন। এছাড়াও জুয়াখেলা, যৌন অশ্লীলতা ও অশোভন পোশাক[১] পরার ব্যাপারে তিনিই হস্তক্ষেপ করতেন।

● শিল্প

রাজস্বের ব্যাপারে রাজ্য ছিল রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ওপর আরোপিত শুল্কের ওপর নির্ভরশীল। খলিফার শাসনাধীন স্পেন ছিল ইউরোপে সবচেয়ে বেশি ধনী ও ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশগুলির অন্যতম। রাজধানীতে প্রায় ১৩,০০০ তাঁতী ছিল, এছাড়াও ছিল বিকাশশীল চর্মশিল্প। স্পেন থেকেই চামড়াতে তামাটে রঙে রঞ্জিত করা ও চামড়ার ওপর কিছু খোদাই করার কৌশল মরক্কোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই দুটি দেশে থেকে তা ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে যায়। কর্ডোভান, কর্ডভান, কর্ডওয়েনার ও মরক্কো—এই শব্দগুলি থেকে সেটাই মনে হয়। শুধু কর্ডোভাতেই নয়, এমনকি মালাগব, আল্‌মেরিয়া ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে পশম ও রেশমের পোশাক তৈরি হত। রেশমগুটির চাষটা প্রথমে চীনাদেরই একচেটিয়া ছিল, পরে

মুসলিমরা স্পেনে রেশমগুটির চাষ শুরু করে এবং সেখানে এই চাষ সাফল্য লাভ করে। আলমেরিয়াতে কাচ ও তামার বাসনপত্র তৈরি হত। ভ্যালেন্সিয়ার পেটারনা ছিল মৃৎশিল্পের মূল কেন্দ্র। জেন ও আলগার্ভে তাদের সোনা ও রূপার খনি, কর্ডোভা লোহা ও সীসা[৯] এবং মালাগা চুনির খনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দামাস্কাসের মতো টলেডোও তার তরবারির[১০] জন্য সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছিল। ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুকে সোনা ও রূপার দ্বারা খচিত করে তার ওপর ফুলের নকশা করার কৌশল জন্মলাভ করেছিল দামাস্কাসে। পরে তা বহু স্পেনীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয় কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং দামাসিন, দামাস্কিন, ফরাসি দামাসকুইনার ও ইতালীয় দামাসকিনো প্রভৃতি শব্দে তা একটি ভাষাগত ঐতিহ্যের ছাপ রেখে যায়।

● কৃষি

পশ্চিম এশিয়ায় চালু কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি স্পেনীয় আরবরাও গ্রহণ করেছিল। তারা খাল[১১] খনন করেছিল. আঙুর চাষ করত এবং ধান[১২], খুবানি[১৩]. পীচ্‌ফল[১৪], ডালিম[১৫], কমলালেবু[১৬], আখ[১৭], কার্পাস[১৮] ও জাফরানের[১৯] চাষ শুরু করেছিল। বিশেষভাবে অনুকূল ভূমি ও জলবায়ু দ্বারা সমৃদ্ধ দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব সমভূমিতে গ্রামীণ ও নগরজীবনের কাজ-কারবারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। জমির মালিকের সঙ্গে ভাগপ্রথায় সে সমস্ত কৃষকরা এই অঞ্চলে গম ও অন্যান্য শস্য এবং জলপাই ও অন্যান্য ফল[২০] উৎপাদন করত।

মুসলিম শাসনাধীন স্পেনের অন্যতম গৌরব ছিল কৃষির উন্নতি এবং আরবদের কাছ থেকে স্পেন দেশটি যে সমস্ত স্থায়ী উপকার পেয়েছিল এটি ছিল তার অন্যতম। কারণ স্পেনের বাগানগুলিতে এই সেদিন পর্যন্ত মুরীয় ছাপ বজায় ছিল। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাগানগুলির অন্যতম হল জেনারেলাইফ (আরবী শব্দ জান্নাত আল-আরিফ থেকে পরিদর্শকের স্বর্গ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিককার একটি নাসরিদ[২১] স্তম্ভ এবং এর ভবনটি ছিল আলহাম্‌রার বহিঃস্থ বাড়িগুলির অন্যতম। এই বাগানটি তার সুবিস্তৃত ছায়া, ফোয়ারা ও মৃদুমন্দ বাতাসের[২২] জন্য প্রবাদতুল্য ছিল এবং এটি একটি গোলাকার বা ডিম্বাকার অট্টালিকার আকারে গড়ে উঠেছিল। জলস্রোতের দ্বারা বাগানটি ছিল বিধৌত, আর এই জলস্রোতগুলি অসংখ্য জলপ্রপাত তৈরি করার পরে ফুল, গুল্ম ও গাছের আড়ালে ছড়িয়ে যেত। এখন সেখানে অল্প কয়েকটি বিরাট মোচাকার গাছ ও সুন্দর সুগন্ধ পাতা যুক্ত চিরহরিৎ গুল্ম ছড়িয়ে আছে।

● বাণিজ্য

মুসলিম শাসনাধীন স্পেনের শিল্পজ ও কৃষিজ উৎপাদন তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও উদ্বৃত্ত থাকত। এর বৃহত্তম নদী বন্দরগুলির অন্যতম সেভিলির মারফত সুতো, জলপাই ও

তেল রপ্তানি করা হত এবং মিশর থেকে জামাকাপড় ও ক্রীতদাস এবং ইউরোপ ও এশিয়া থেকে সংগীতজ্ঞা মেয়ে আমদানি করা হত। মালাগা ও জেন-এর জাফরান, ডুমুর, মার্বেল পাথর এবং চিনি রপ্তানি হত। স্পেনীয় দ্রব্যাদি আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্ট্যানটিনোপলের মধ্য দিয়ে ভারত ও মধ্য এশিয়ায় তার বাজার খুঁজে পেয়েছিল। বিশেষত দামাস্কাস, বাগদাদ ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্য ছিল উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বিশ্বের আন্তর্জাতিক নৌ-সেনাপতি, পোতাদি নির্মাণের স্থান, গড়[২৩], সমুদ্রগর্ভের টেলিগ্রামের তার, বিশেষ ধরনের রণতরী[২৪] হালকা ডিঙি (স্লুপ)[২৫], শুল্ক ইত্যাদি অল্প কয়েকটি শব্দ ছিল না; অবশ্য এই নৌ-শব্দগুলি সমুদ্রপথে আরবদের পূর্বতন প্রাধ্যান্যের সাক্ষ্য বহন করে। আল-ইদ্রিসি[২৬]-তে সংরক্ষিত এক অখ্যাত গল্পে আটলান্টিক (বাহর আল-জুলুমত, প্রাচীন মেয়ার টেনেব্রেরাম, অন্ধকারময় সমুদ্র) সাগরে ছোটখাটো সামুদ্রিক অভিযানের কথা বলা হয়েছে। এই গল্পে বলা আছে আটজন প্রতারিত জ্ঞাতিভাই লিসবন থেকে সমুদ্র-অভিযান শুরু করার পর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ৩৫ দিন ভেসে বেড়ানোর পরে আশ্চর্য দ্বীপপুঞ্জে[২৭] গিয়ে উঠেছিল।

রাজ-প্রশাসন একটা নিয়মিত ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। পূর্বপ্রান্তের দেশগুলির অনুকরণে তারা তাদের মুদ্রা তৈরি করেছিল। দিনার ছিল স্বর্ণ-একক ও দিরহাম ছিল রূপা একক।[২৮] প্রথম দিককার ইসলামি যুগের তামার মুদ্রা[২৯] (fals) চালু ছিল। উত্তরের খ্রিস্টান রাজ্যগুলিতে আরবী টাকা চালু ছিল, কারণ ওইসব রাজ্যগুলিতে প্রায় চারশো বছর ধরে আরবী বা ফরাসি মুদ্রা ছাড়া আর কোন মুদ্রা চালু ছিল না।

● খলিফার গৌরব

তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের রাজদরবার যে সমস্ত প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তার পুত্র ও উত্তরসূরি দ্বিতীয় আল-হাকাম আল-মুস্তানসির (৯৬১-৭৬ খ্রিঃ)-এর দরবারও তাদের দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। আল-মাসউদী[৩০] তাকে সমস্ত শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। আল-হাকামের রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে কুখ্যাত অরদোনো আবির্ভূত হন। আবদ-আল-রহমানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। তাই এখন তিনি আবার লিঁয়-র রাজসিংহাসনে আসীন হবার জন্য সাহায্যের আবেদন জানান। কর্ডোভার খ্রিস্টান বিচারক ওয়ালি ইবন-খায়জুরান ও টলেডোর আর্চবিশপ আবদুল্লা ইবন-কাসিম[৩১] সেই পূর্বতন রাজাকে সঙ্গে করে আল-জাহ্‌রায় নিয়ে যান এবং রাজদরবারে কী ধরনের আচার-আচরণ করতে হয় সে ব্যাপারে বিশদে শিক্ষা দেন। দু'ধারের রাস্তায় বিন্দুমাত্র ফাঁক না রেখে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাদের মধ্য দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়ে শাদা পোশাকে সজ্জিত ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত উষ্ণীষ মাথায় দিয়ে অরদোনো রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে খ্রিস্টানরা একে অপরের মুখোমুখি হলেন। রাজদরবারে খলিফা তার সিংহাসনে বসলেন এবং তার পরিবারের সদস্য ও প্রধান অফিসারেরা দু'দিকে ও পিছনে

বসলেন। পুরোপুরি নতজানু হয়ে খ্রিস্টান রাজপুত্র এগিয়ে এলেন, মাথার উষ্ণীষ খুলে রাখলেন, ইসলাম-বিশ্বাসীদের নেতার হাতে চুম্বন করলেন, নিজেকে তার ক্রীতদাস বলে আখ্যা দিলেন, তার সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন এবং স্থান ত্যাগ করে পিছন দিকের দরজার পানে এগিয়ে গেলেন। তার অভিজাত সঙ্গীসাথীরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। ওয়ালিদ দোভাষীর কাজ করলেন। কিছু কিছু শর্তে খলিফা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এই সাক্ষাত শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।[৩২]

● শিক্ষামূলক কার্যকলাপ

অবশ্য এই সময়কার প্রকৃত গৌরব নিহিত রয়েছে রাজনীতি অপেক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতির মধ্যে। আল-হাকাম নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজে[৩৩] তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। পণ্ডিতদের তিনি উদার হস্তে দান করতেন এবং রাজধানীতে তিনি ২৭টি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[৩৪] তৃতীয় আবদ আল-রহমান প্রধান মসজিদে যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন, কর্ডোভার সেই বিশ্ববিদ্যালয়টি আল-হাকামের শাসনকালে বিশ্বের শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এই শিক্ষায়তনটি কায়রোর আল-আজহার ও বাগদাদের নিজামীয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং শুধুমাত্র স্পেন থেকেই নয়, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য প্রান্ত থেকে খ্রিস্টান ও মুসলিম ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিল। যে মসজিদে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল, আল-হাকাম তাকে বিস্তৃত করেছিলেন, সীসার পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও বাইজানটাইনের শিল্পীদের আনা মোজাইক পাথর দিয়ে এটিকে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য ২৬১, ৫৩৭ দিনার ও ১১/২ দিরহাম[৩৫] ব্যয় করেছিলেন। প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে তিনি অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের বেতনের জন্য আলাদা তহবিল তৈরি করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক ইবন-আল-কুতাইয়াহ্ এবং বাগদাদের বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আবু-আলি আল-কালি[৩৬]। তাঁর 'আমালী'[৩৭] (Dictations) এখনও আরব ভূখণ্ডে পঠিত হয়। ইবন-আল-কুতাইয়াহ্ ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাতেন। আর-আবু-আলির লেখা নাটকীয় ঘটনাগুলির অন্যতম হল খলিফা আল-নাসিরের উদ্যোগে বাইজান্টাইন দূতদের যখন সাড়ম্বর অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছিল তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তব্য রাখার সময় আবু-আলি হঠাৎ মঞ্চে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একেবারে শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মুহাম্মাদের প্রতি আশীর্বাদসূচক বাণী উচ্চারণ করার পর তিনি আর কিছু বলতে পারেননি। সেই অবস্থায় তাকে সরিয়ে মুর্নাযর ইবন-সাঈদকে আনা হয় এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক অসাধারণ বক্তব্য রাখেন। তার এই বক্তব্যটি আল-মাক্কারির[৩৮] বইতে ছন্দোবদ্ধ গদ্যে আড়াই পাতা জুড়ে লিপিবদ্ধ করা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাড়াও রাজধানীতে একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার ছিল। আল-হাকাম ছিলেন বইয়ের এক অনুরাগী পাঠক। পাণ্ডুলিপি কেনা বা নকল করার উদ্দেশ্যে তার প্রতিনিধিরা আলেকজান্দ্রিয়া দামাস্কাস ও বাগদাদের বইয়ের দোকানগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াত। এইভাবে ৪,০০,০০০ বই সংগৃহীত হয়েছিল, আর ৪৪ খন্ডের একটি ক্যাটালগে বইগুলির নাম নথিবদ্ধ করা ছিল। প্রতিটি খন্ডে কেবলমাত্র কাব্য সংক্রান্ত গ্রন্থের[৩৯] নাম লিখতেই ২০ টি পাতা ব্যবহার করা হয়েছিল। মুসলিম খলিফাদের মধ্যে আল-হাকামই ছিলেন সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পন্ডিত। তিনি এই সমস্ত বইয়ের অনেকগুলিই ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এবং কিছু পান্ডুলিপির ওপর লিপিবদ্ধ তার মন্তব্য পরবর্তী যুগের পন্ডিতদের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। উমাইয়া বংশের এক বংশধর আল-ইসবাহানি তখন আল-ইরাকে বসে আগানি নামের বইটি লিখছিলেন। বইটির প্রথম কপি সংগ্রহ করার জন্য আল-হাকাম গ্রন্থকারকে এক হাজার দিনার পাঠিয়েছিলেন।[৪০] এই সময়েই আন্দালুসিয়ায় সংস্কৃতির মান এত উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল যে, বিশিষ্ট ডাচ পন্ডিত ডোজি[৪১] ও অন্যান্য পন্ডিতেরা উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, "প্রত্যেকেই পড়তে ও লিখতে পারে"। যখন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপে শিক্ষার প্রাথমিক বিষয়গুলি জানা গেছে এবং তাও অল্প কয়েকজন যাজকরাই সেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, তখন আন্দালুসিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ছিল লক্ষণীয়।

● আমিরী স্বৈরতন্ত্র

আল-হাকামের পর তার পুত্র দ্বিতীয় হিশাম আল-মুয়াইয়াদ (৯৭৬-১০০৯ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন। তখন তার বয়স মাত্র ১২ বছর। হিশামের মা, এক সুন্দরী ও শক্তসমর্থ বাস্তববোধ সম্পন্ন মহিলা ছিলেন রাজ্য শাসনের ব্যাপারে প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। তার নাম ছিল সুব্‌হ্[৪২] (ঊষা, ঊষাদেবী)। মুহাম্মাদ ইবন-আবি-আমির নামে সুলতানার এক আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে এক নগণ্য পেশাদার পত্রলেখক রূপে জীবন শুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই ওই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেছিলেন। একটি মুসলিম রাজ্যে মনের জোর, প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কী অসাধ্য সাধন করতে পারে, মুহাম্মাদের জীবন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মুহাম্মাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন মাআফির উপজাতিভুক্ত এক ইয়ামানীয়। তারিকের বিজয়ী সেনাদলে যে ক'জন আরব ছিল, তিনি ছিলেন তাদের একজন। লোকসমাজে তার প্রণয়িনীরূপে পরিগণিত রানির পৃষ্ঠপাষকতায় যুবক মুহাম্মাদ শক্তির জোরে বা চতুরতার সাহায্যে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের পিছনে ফেলে রাজদরবারে তিনি ক্রমাগত এক পদ থেকে আরও উচ্চ পদে আরোহণ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি রাজসরকার (হাজিব) ও উজির[৪৩] হয়েছেন। তারপর তিনি স্লাভনিক দেহরক্ষীদের সরিয়ে দিয়ে মরক্কোর একদল স্থানীয় ভাড়াটে সেনা মোতায়েন করেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরিণত খলিফাকে তার প্রাসাদে বন্দি করে রাখেন। আল-জাহরাকে বাতিল করার জন্য হাজিব ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে

কর্ডোভার পূর্বদিকে তার নিজের জন্য একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করেন এবং তার নাম দেন আল-মদীনা আল-জাহিরা (অতি উৎকৃষ্ট শহর)।[১৪] অবশ্য সেই জায়গাটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। নিজেকে উলামার অনুগ্রহভাজন করানোর জন্য ওই সব ধর্মতাত্ত্বিকদের দ্বারা খারাপ বলে চিহ্নিত আল-হাকামের গ্রন্থাগারের দর্শন-সংক্রান্ত ও অন্যান্য বইপত্র তিনি পুড়িয়ে দেন। উদার হাতে অনুদান দিয়ে তিনি কবিদেরও নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে আসেন। তারপর শুক্রবারের প্রার্থনায় ও মুদ্রার ওপরে তার নাম যুক্ত করেন এবং রাজার মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নিজের নামযুক্ত সোনার তন্তু দিয়ে বোনা পোশাক পরতে থাকেন। ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মন্ত্রি-দফতর[১৫] থেকে জারি হওয়া সমস্ত দলিলে খলিফার বদলে নিজের সিল মারতে শুরু করেন। নামমাত্র উমাইয়া খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আমিরি সাম্রাজ্য স্থাপন করার কাজটিই তিনি শুধু করেননি, আমিরি খিলাফতও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শান্তিপূর্ণ উদ্যোগের মতো সামরিক উদ্যোগেও তিনি সমান সাফল্য লাভ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কার করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রাচীন উপজাতীয় সংগঠনের পরিবর্তে স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। নবনির্মিত কায়রোর (৯৬৯ খ্রিঃ) দূরবর্তী পূর্বপ্রান্তে ফাতেমিয় শাসনের বিলুপ্তি এবং উত্তর দিকের ছোট ছোট খ্রিস্টান রাজ্যগুলির মধ্যেকার মারাত্মক সংঘর্ষ তার সেনাবাহিনীকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ও আইবেরিয়ান দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে বিজয়-অভিযান সংগঠিত করার সুযোগ করে দেয়। তার বিজয় অভিযানগুলি তাকে ৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সাম্মানিক আল-মানসূর বি-আল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সহায়তায় বিজয়ী হওয়া) উপাধি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতি বছর বসন্ত ও শরৎকালে আল-হাজিব আল-মানসূর তাব সেনাদের নিয়ে লিঁয়, ক্যাস্টিল ও ক্যাটালোনিয়ার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সামবিক অভিযান চালাতেন। এখানে অন্যান্য সাফল্য লাভ করার পাশাপাশি ৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জামোরা দখল করেন, তার ত্রয়োদশ অভিযানে[১৬] বার্সেলোনা নগর লুঠ করেন (৯৮৫ খ্রিঃ) এবং ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিরাট প্রাচীর ও নজরদারির উঁচু স্তম্ভ-সহ লিঁয় শহরকে ধ্বংস করে গোটা রাজ্যটিকে একটি শাখাপ্রদেশে পরিণত করেন। তিনি এমন কী গ্যালিসিয়ার পার্বত্য গিরিখাতে তার অভিযান চালান এবং ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জ্যাগো (সান্টিয়াগো) কমপোস্টেলার[১৭] সুন্দর গির্জাটি ধ্বংস করেন। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকেই তীর্থযাত্রীরা এই পবিত্র ধর্মস্থানটি দেখতে আসত। তার ওই শেষ সাফল্যের পরই তিনি বিজয়গর্বে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন। অসংখ্য খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দি কর্তৃক কাঁধে করে ওই গির্জার দরজা বয়ে আনার ঘটনাটি তারই ইঙ্গিত দিয়েছিল। পরে রাজধানীর বিরাট মসজিদটিতে এই দরজা ও গির্জার ঘন্টা লাগানো হয়। ঘন্টাগুলি মুসলিম অট্টালিকায় আলো হিসেবে ব্যবহৃত হত। গোড়ালিতে শেকল-বাঁধা খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দিদের আল-মানসূর মসজিদ সারানোর কাজে লাগিয়েছিলেন। তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের শাসন ছাড়া আর কোন সময়েই স্পেনীয় ইসলামের নক্ষত্র এত তুমুল দীপ্তি ছড়ায়নি।

তার পঞ্চদশ সামরিক অভিযানটি[৪৮] ছিল ক্যাস্টিলের বিরুদ্ধে। ১০০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন তখনই যুদ্ধক্ষেত্রে আল-মানসূরের মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছাটি বোঝা যায়। তার অসংখ্য সামরিক অভিযানের সময় আল-মানসূরের বর্মে যে ধুলো জমেছিল এবং যা তিনি এই উদ্দেশ্যে[৪৯] সঞ্চয় করে রেখেছিলেন যে, তার দেহের সঙ্গে সেই ধুলোয় ভরা বর্মটিও কবরস্থ করা হবে। মেদিনাসেলিতে (মাদীনাত সালিম) তার সমাধিস্থলে এই লিপিটি খোদাই করা আছে :

তার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তার কাহিনী খুঁজে দেখতে পারো,
যেন সে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।
সময় আর কখনও তার মতো বীরের জন্ম দিতে পারবে না,
তার মতো কেউই আর স্পেনের সীমান্তগুলিকে প্রহরা দিতে পারবে না।[৫০]

কিন্তু মঠবাসী বর্ষ-বিবরণীকারের তীক্ষ্ণ মন্তব্য খ্রিস্টানদের মানসিকতা অনেক ভালভাবে প্রকাশ করেছে : "১০০২ খ্রিস্টাব্দে আলমানজর মারা গেলেন এবং নরকে কবরস্থ হলেন।"[৫১]

● উমাইয়া বংশের অবলুপ্তি

আমিরীয় স্বৈরতন্ত্রী শাসকের মৃত্যুর ৮০ বছর পরে বার্বার, আরব, স্লাভ (সাকালিবা) ও স্প্যানিশরা আন্দালুসকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। প্রাচীন রোম ও ধ্বংসোন্মুখ বাগদাদে তারা যে ভূমিকা পালন করেছিল, এখানেও প্রিটোরিয় প্রহরীরা সেই একই ভূমিকা নিয়েছিল। আল-মানসূর তার পুত্র আবদ-আল-মালিক আল-মুজাফ্‌ফরকে তার উত্তরসূরি করেছিল। আবদ-আল-মালিক ছ'বছর[৫২] ধরে রাজ্যের ঐক্য ও সম্মান রক্ষা করতে সফল হয়েছিলেন। ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে আল-মুজাফ্‌ফরকে তার ভাই ও উত্তরসূরি আবদ-আল-রহমান বিষ প্রয়োগ করেন। আবদ-আল-রহমানের পদবি ছিল শানজুল (সাঞ্চুয়েলো, অর্থাৎ ছোট সাঞ্চো, কারণ তার মা ছিলেন নাভারের রাজা সাঞ্চোর কন্যা)। উমাইয়া খলিফার সম্মতি না নিয়েই তিনি অবিলম্বে নিজেকে উত্তরসূরি বলে ঘোষণা করেন, এর ফলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হয়।[৫৩] এই ঘটনার একুশ বছর পরে একের পর এক খলিফা তৈরি হতে থাকে — এদের কেউ-বা কর্ডোবান, কেউ-বা স্লাভ, আবার কেউ-বা ছিল বার্বারদের হাতের পুতুল। একজন খলিফাকে পদচ্যুত করে আর একজনকে ক্ষমতায় বসানোর[৫৪] ক্ষেত্রে ক্যাস্টিলীয়দেরও একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু আসল ক্ষমতা ছিল সেনাবাহিনীর হাতে। ৩০ বছরের নিঃসঙ্গ জীবন থেকে হতভাগা দ্বিতীয় হিশামকে টেনে বের করে আনা হয়, কিন্তু সে শুধু শিশুসুলভ অদক্ষতাই প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে তার দ্বিতীয় জ্ঞাতিভাই দ্বিতীয় মুহাম্মাদ আল-মাহ্‌দীর[৫৫] অনুকূলে দ্বিতীয় হিশাম সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রাজসিংহাসনের প্রতি মুহাম্মাদের একমাত্র দাবি ছিল এটাই যে, তিনি অল্প কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যেই তিনি

আমিরিদদের[৫৭] মদীনা আল-জাহিরা বিধ্বস্ত করেন। এছাড়া উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকজন নেতা তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি তাদের মাথা কেটে নিয়ে এসে সেগুলিকে ফুলের টবে পরিণত করেন এবং তার প্রাসাদের উল্টোদিকে নদীর তীরে সেই টবগুলিকে সাজিয়ে রাখেন। তিনি রাজপ্রাসাদে মদ তৈরি করার মধ্য দিয়ে নাববায, মদ-প্রস্তুতকারী[৫৮] উপনাম অর্জন করেন। এই নৈরাজ্যের সময়ে ন'জন উমাইয়া খলিফার মধ্যে তিনজন একবারের বেশি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; তাদের একজন দ্বিতীয় হিশাম দু'বার সিংহাসনে বসেছিলেন ও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, তারপর এক রহস্যজনক উপায়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান এবং সেই রহস্যের আর সমাধান হয়নি। প্রায় তারই মতো দেখতে এক ভণ্ড সেভিলিতে[৫৯] ক্ষমতাসীন হন। এই সমস্ত খলিফাদের মধ্যে সেরা ছিলেন দরিদ্র ও হতভাগ্য পঞ্চম আবদ-আল-রহমান আল-মুস্তাজহির (১০২৩ খ্রিঃ) ও তার উজির ছিলেন শিক্ষিত ইবন-হাজম। আল-মুস্তাজহির স্নানঘরের হিটারের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে তাকে টেনে আনা হয় এবং তার উত্তরসূরি তৃতীয় মুহাম্মাদ আল-মুস্তাকফির চোখের সামনে তাকে হত্যা করা হয়। দু'বছর পরে তারও ওই নির্মম পরিণতি হয়। আল-মুস্তাকফির আগ্রহ ছিল যৌনতা ও ভোজনেচ্ছায়।[৬০] বোরখা পরা একটি গায়িকার ছদ্মবেশে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সীমান্তের এক অখ্যাত গ্রামে তারই অফিসারদের[৬১] একজনের বিষ-প্রয়োগে তিনি নিহত হন। এই খলিফারই এক মেয়ে ছিলেন মহিলা কবি ওয়াল্লাদা। তার সৌন্দর্য ও কবি-প্রতিভার জোরে তিনি রাজদরবারের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন এবং অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অনুজ্জ্বল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে আসার আগে উমাইয়া খলিফা সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা হাম্মুদিদ রাজত্বের দ্বারা ভঙ্গ হয়েছিল। হাম্মুদিরা খলিফা সাম্রাজ্যের সব ধরনের সুবিধা দাবি করেছিল। জনৈক আলী ইবন-হাম্মুদ (১০১৬-১৮ খ্রিঃ) ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তারই নামধারী পয়গম্বর মুহাম্মাদের এক জামাইয়ের বংশধর বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন আধা-বার্বার। কর্ডোভায় নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করার আগে আলী সেউতা ও তাঞ্জিয়ারের গভর্নর পদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি মালাগা দখল করেছিলেন এবং সেখানেই তার আট বংশধর ১০২৫ থেকে ১০৫৭ খ্রিঃ[৬২] পর্যন্ত নিজেদের লালন-পালন করেছিলেন। তার পরে হাম্মুদিদ বলে ভানকারী অন্য দুজন খলিফা পদে আসীন হয়েছিলেন এবং ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের[৬৩] আগে পর্যন্ত তারা কর্ডোভায় অন্যের ইচ্ছানুযায়ী শাসন চালিয়েছিলেন।

এই বছরেই তৃতীয় হিশাম আল-মুতায পুনরায় উমাইয়াদের জন্য সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু সেই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পক্ষে ৫৪ বছর বয়স্ক রাজা মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। রাজ-প্রশাসনের ক্রমাগত পরিবর্তনে বিরক্ত হয়ে কর্ডোভার অধিবাসীরা এক বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে খলিফা সম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটালেন। বিরাট মসজিদ সংলগ্ন

ভূ-গর্ভস্থ এক অন্ধকারময় ঘরে তারা রাজ-পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সহ হিশামকে বন্দি করে রাখলেন। এখানকার চূড়ান্ত অন্ধকারে ও অতি অল্প পোশাকে অর্ধেক জমে-যাওয়া সেই হতভাগ্য শাসক বিষাক্ত বাতাসে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা তার কোলের ওপর শিশুকন্যাটিকে রেখে তার শরীর গরম করার চেষ্টা চালালেন। এই মেয়েটিকেই তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইতিমধ্যে উজিররা একটি জনসভা করছিলেন এবং সেই জনসভায় চিরতরে খলিফা সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করে জনৈক আবু-আল-হাজম ইবন-জওহারের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভার হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেওয়া হল। তার অনাহারী শিশুটির[৬৪] জন্য এক টুকরো রুটি ও একটু আলোর জন্য কাতর আবেদন জানাতে জানাতে হিশাম সেই নবযুগ সৃষ্টিকারী ঘোষণাটি শুনলেন। ❑

● টীকা ●

১ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ। তুলনীয়; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ।

২ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৯৯ ও ৩০৪ পাতা। তুলনীয়: ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড ২৪৭-৪৮ পাতা।

৩ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৯৮ পাতা, ২. ২.৩ বাড়ির সামনের দরজায় অথবা কোণে এই আলোগুলি আটকানো থাকত।

৪ জন ডবলিউ ড্রেপার, এ হিস্ট্রি অফ দি ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ ইউরোপ, সংশোধিত সংস্করণ (লন্ডন, ১৯১০), ২য় খন্ড, ৩১ পাতা।

৫ তাবাকাত, ৮-৯ পাতা।

৬ স্ক্রিপচোরেস রেরাম জার্মানিকারাম-এ হটসভিথা; হটসভিথা অপেরা, সম্পাদনা : পলআস দ্য উইন্টারফেল্ড (বার্লিন, ১৯০২), ৫২ পাতা, ১.১২।

৭ আল-সাকাতি, ফী আদাব আল-হিসবা, সম্পাদনা : কলিন ও লেভি-প্রভেনসাল, (প্যারিস, ১৯৩১), ৩ ও পরের পাতা; লেভি-প্রভেনসাল, এল' এসপ্যানে মুসুলমান আউ জাইম সাইকল (প্যারিস; ১৯৩২), ৭৯-৯৬ পাতা।

৮ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ১০২, ১২৩-১২৪ পাতা।

৯ লিসান-আল-দীন ইবন-আল-খাতীব, আল-ইহাতা ফী আবর গারনাতাহ্ (কায়রো, ১৩১৯) ১ম খণ্ড, ১৫ পাতা; আল-লামহা আল-বদরিয়া ফী আল-দাওলা আল-নাসরিয়া, সম্পাদনা: আল-খাতীব (কায়রো, ১৩৪৭). ১৩ পাতা।

১০ শিল্প ও ধাতু সম্পর্কে আরও জানতে হলে ইবন-হাওকাল, ৭৮-৭৯ পাতা; ইস্তাখরি, ৪২ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড ৯০-৯২ ও ১২৩ পাতা দেখুন।

১১ ক্যানাল-এর স্পেনীয় শব্দ অ্যাসিকুইয়া, আরবী শব্দ আল-সাকিয়া থেকে গৃহীত।

১২ স্পেনীয় শব্দ অ্যারোজ আরবী শব্দ আল-আরুজ থেকে গৃহীত; মূলত সংস্কৃত শব্দ; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৬৬৫ পাতার নিম্নাংশ তুলনীয়।

১৩ স্পেনীয় শব্দ অ্যালবারিকোকিউ (ইংরাজিতে অ্যাপ্রিকট) আরবী শব্দ আল-বারকুক থেকে গৃহীত। এটি আবার ল্যাটিন থেকে গ্রিক ভাষার মাধ্যমে সংগৃহীত।

১৪ স্পেনীয় শব্দ অ্যালবারচিগো আরবী শব্দ ফিরসিক থেকে, ফিরসিক আবার ল্যাটিন থেকে সংগৃহীত। এটি এক ধরনের জাম জাতীয় ফলবিশেষ।

১৫ আরবী শব্দ রুমমান, স্পেনীয় ভাষায় রোমানিয়া, ডালিমের রস থেকে প্রস্তুত এক ধরনের পানীয়।

১৬ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের উপরে দেখুন, ৩৫১ পাতা। আরবেরা প্রথমে ইউরোপে তেতো বা সেভিলি কমলালেবু চালু করেছিল। পরে পর্তুগিজরা ভারত থেকে মিষ্টি বা সাধারণ কমলালেবু উদ্ভাবন করে।

১৭ তুলনীয় : হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে ৬৬৭ পাতা।

১৮ স্পেনীয় শব্দ আলগোডন মূলত স্পেনীয় শব্দ কটন (COTON) (ইংরাজিতে কটন), আরবী শব্দ আল-কুত্ন থেকে গৃহীত।

১৯ স্পেনীয় শব্দ আজাফ্রান, পর্তুগিজ শব্দ (আকাজরাও (ACAJRAO) আরবী শব্দ আল-জা'ফারান থেকে গৃহীত।

২০ ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ১ম খণ্ড, ১৪-১৫, ২৭, ৩৭ পাতা; লামহা, ১৩ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ৯৪- ৯৬ পাতা; ইবন-বতুতা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৬-৬৯ পাতা।

২১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন, ৫৪৯ পাতা।

২২ ইবন-আল-খাতীব, লামহা, ১০৯ পাতা।

২৩ দ্রব্যের ওপর শুল্ক বোঝাতে। আরবী শব্দ আওয়ারিয়া থেকে।

২৪ স্পেনীয় শব্দ করবেতো-এর মাধ্যমে আরবী শব্দ গুরাব, যুদ্ধজাহাজ,।

২৫ স্পেনীয় চালুপা (CHALUPA) শব্দ থেকে আরবী শব্দ জালবা, অর্থাৎ নৌকা।

২৬ ৫১-৫২ পাতা।

২৭ সম্ভবত ক্যানারি ও কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ।

২৮ ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ১ম খণ্ড, ৩৭ পাতা।

২৯ গ্রিক শব্দ ফোলিস (PHOLLIS) ও ল্যাটিন শব্দ ফোলিস (FOLLIS) থেকে।

৩০ ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পাতা।

৩১ এই দুই সম্মানিত খ্রিস্টান অতিথির নামের মুসলিম রূপটি লক্ষ করুন।

৩২ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ২৫১ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৫ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৪৮, ২৫২-৫৬ পাতা।

৩৩ ইবন--আল-আসীব, ৮ম খণ্ড, ৪৯৮ পাতা; ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ১ম খণ্ড, ৩০৫ পাতা।

৩৪ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ২৫৬ পাতা।

৩৫ একই বই, ২৫৩, ২৫৬-৫৭ পাতা।

৩৬ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৩০৫ পাতা; ইয়াকূত, উদাবা, ২য় খণ্ড, ৩৫১-৫৪ পাতা; সামআনি, ৪৩৯ বি দেখুন।

৩৭ ২টি খণ্ড, (বুলাক, ১৩২৪)।

৩৮ ১ম খণ্ড, ২৩৭-৪০ পাতা।

৩৯ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৪৯-৫০, ২৫৬ পাতা; ইবন-খালদুন: ৪র্থ খণ্ড ১৪৬ পাতা।

৪০ ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড ১৪৬ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৫০ পাতা।

৪১ হিস্টোয়ার দাস মুসলমানস, সম্পাদনা : লেভি-প্রভেনসাল, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পাতা; নিকলসন, লিটারারি হিস্ট্রি, ৪১৯ পাতা; দি কেমব্রিজ মিডাইভাল হিস্ট্রি-তে র‍্যাফায়েল আলটামিরা, (নিউ ইয়র্ক, ১৯২২) ৩য় খণ্ড, ৪৩৪ পাতা।

৪২ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ২৬৮ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৫৯ পাতা; মাররাকুশি, ১৭ ও ১৯ পাতা।

৪৩ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ২৬৭-৬৯ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৭-৪৮ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১২৪-২৫ পাতা; ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৬৭-৬৯ পাতা।

৪৪ ইবন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড, ২৯৪-৯৭ পাতা।

৪৫ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৫৮ পাতা।

৪৬ ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড ৭১ পাতা; অন্যদের মতে ২৩ তম অভিযান।

৪৭ আরব গ্রন্থকারদের 'শান্ত ইয়াকব', ইব্ন-ইয্হারি, ২য় খণ্ড ৩১৬-১৯ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৭০-৭২ পাতা; ইদ্রিসি, ১০৪ পাতা; খ্রিস্টানরা এটিকে জেবিদির পুত্র ধর্মপ্রচারক জেমস-এর সমাধিস্থান বলে গণ্য করে। জেবিদি স্পেনে খ্রিস্টধর্ম চালু করেছিলেন। এই সমাধিটি আল-মানসূর ধ্বংস করেননি।

৪৮ ইবন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পাতা, অনুযায়ী ৫২টি অভিযান হয়েছিল; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৫৮ পাতা, তুলনীয়, ২৬১ পাতা, ১.১৭ উদ্ধৃতি অনুযায়ী অভিযানের সংখ্যা ৫৬; ইবন, আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৬৯ পাতা, ১.১৪; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৪৯৮ পাতা ১, ১৫; ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ, ১৪৯ পাতা।

৪৯ ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৭২ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১২৫ পাতা; মাররাকুশি, ২৬ পাতা।

৫০ নিকলসন, লিটারারি হিস্ট্রি, ৪১৩ পাতা; ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৩ পাতা; ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ, ১৫১ পাতা। আরবী শব্দ তুঘ্র, অর্থাৎ 'স্পেনের সীমান্ত', বলতে সীমান্ত অঞ্চল বা সীমান্তের দুর্গ বোঝানো হয়েছে।

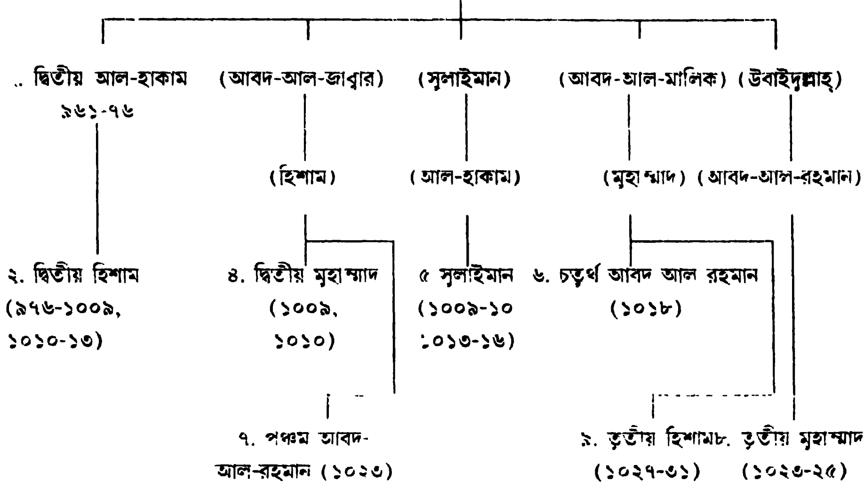
৫১ এসপানা সাগরাদা, ২৩ খণ্ড, ৩০৮ পাতায় 'ক্রোনিকন বারগেনসি'।

৫২ ইবন-ইয্হারি, সম্পাদনা: লেভি-প্রভেনসাল, ৩য় খণ্ড, (প্যারিস, ১৯৩০) ৩-৪ এবং ৩৬-৩৭ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৭৬-৭৭ পাতা।

৫৩ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ৪৩-৪৮ পাতা, ৬৬-৭৪ পাতা; ইবন-খালদূন ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮-৫০ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৪৯৯ পাতা।

৫৪ ইব্ন-খালদূন, ৪র্থ খণ্ড, ১৫০-৫১ পাতা; ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ্, ১৫৯-৬০ পাতা।

৫৫ নিচের সারণিতে কর্ডোভার উমাইয়া খলিফার বংশ পরিচয়



৫৬ নুওয়াইরি, সম্পাদনা: গ্যাসপার রেমিরো, ১ম খণ্ড, ৭৪ পাতা।

৫৭ ইবন-আল-আসীর, ৮ম খণ্ড, ৫০০ পাতা।

৫৮ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন, ৫৩৮ পাতা।

৫৯ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ১৩৮-৩৯ পাতা; নুওয়াইরি, ১ম খণ্ড, ৭৮ পাতা; ইবন-আল-আব্বার, হুল্লাহ, ১৬৪ পাতা; ইবন-বাসাম, আল-যাখীরা ফী মাহাসিন আহল আল-জাযীরা, পার্ট ১, ১ম খণ্ড, (কায়রো, ১৯৩৯), ৩৯ পাতা।

৬০ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১৯৪ পাতা।

৬১ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ১৪২ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১৯৪ পাতা; মাররাকুশি, ৪০ পাতা; নুওয়াইরি, ১ম খণ্ড, ৮৪ পাতা।

৬২ মাররাকুশি, ৩০-৩৭ পাতা; ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ১১৩-১৭, ১১৯-২৫ পাতা; মাক্কারি ১ম খণ্ড, ২৮১-৮২ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৫২-৫৫ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১৮৮ ও পরের পাতা। হাম্মুদিদরা মরক্কোর ইদ্রিসিদদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৬৩ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ১২৪-৩৫ পাতা।

(হাম্মুদ)

১. আলী (১০১৬-১৮)   ২. আল-কাসিম (১০১৮-২১, ১০২২-২৫)

৩. ইয়াহিয়া (১০২১, ১০২৫-২৭)

৬৪ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ১৫০-৫২ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৮৬ পাতা, ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৫২-৫৩ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ১৯৮-৯৯ পাতা, মাররাকুশি, ৪১ পাতা।

।। অধ্যায় ৩৯ ।।

ছোট ছোট রাজ্য : গ্রানাডার পতন

উমাইয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ছোট ছোট রাজ্যের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিকভাবে সঙ্ঘটিত এক সমাবেশ গড়ে উঠল। এই রাজ্যগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং দু'টি মরক্কোজাত বার্বার রাজবংশ তাদের অংশত দখল করে নেবার পর ছোট ছোট রাজ্যগুলি উত্তরের খ্রিস্টান রাজশক্তির কাছে একের পর এক বশ্যতা স্বীকার করল। একবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে বহু শহরে বা প্রদেশে সেনাপতি ও ছোট রাজার নেতৃত্বে এই ধরনের প্রায় ২০টি স্বল্পায়ু রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আরবেরা এই সমস্ত ছোট রাজাদের 'মুলুক আল-তাওয়াইফ' (স্পেনীয় ভাষায়, রেয়েস ডে তাইফাস, ছোট রাজা) বলত।

কর্ডোভায় এক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বে ছিল জাহ্ওয়ারিদরা। সেভিলের[১] শাসক বানু-আব্বা'দ ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে এটি দখল করে নেন। সেই থেকে মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান ছিল সেভিলের। আর সেভিলের সৌভাগ্য সর্বদাই কর্ডোভার সৌভাগ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। গ্রানাডা ছিল জিরিদ রাজ্যের রাজধানী, রাজবংশের বার্বার প্রতিষ্ঠাতা ইবন-জিরি (১০১২-১৯ খ্রিঃ)-র নাম অনুযায়ী রাজ্যটির এই রকম নাম হয়েছিল। মরক্কোজাত মুরাবিয়রা ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডা ধ্বংস করে দেয়। গ্রানাডা ছিল একমাত্র স্পেনীয় মুসলিম শহর যেখানে ইহুদি উজির ইসমাইল ইবন-নাগজালাহ[২] (মৃ. ১০৫৫) চরম কর্তৃত্ব ভোগ করেছিলেন। আর মালাগা ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রতিবেশী জেলাগুলিতে হাম্মুদি রাজবংশ[৩] ১০৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়েছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও তার প্রথম দুই উত্তরসূরি খলিফা হিসেবে কর্ডোভাতেও তাদের শাসন চালাতেন। জিরিদ রাজবংশের হাত থেকে মালাগা শেষ পর্যন্ত মুরাবিয় শাসনের[৪] আওতার মধ্যে চলে এল। টলেডোর ছোট রাজ্যের সিংহাসনটি দখল করল বানু-যু-আল-নুন (১০৩২-৮৫ খ্রিঃ)[৫]। এটি একটি প্রাচীন বার্বার পরিবার। লিয়ঁ ও ক্যাস্টিলের[৬] রাজা ষষ্ঠ অ্যালফোনসোর দ্বারা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এই পরিবারটি প্রায়ই বিদ্রোহ করে বসত। সারাগোসাতেও ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৪১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত বানু-হুদ পরিবার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। এই সমস্ত ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে সেভিলের সংস্কৃতিমনস্ক আব্বাদিদ রাজবংশ ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান।

● সেভিলের আব্বাদিদ রাজবংশ

বানু-আব্বাদ (১০২৩-৯১ খ্রিঃ) পরিবার নিজেদের আল-হিরার প্রাচীন লাখমিদ রাজাদের বংশধর বলে দাবি করত। রাজ্য বিজয়ের[৯] অল্প কিছুদিন পরেই সিরীয় সেনাবাহিনীর হিমস্ রেজিমেন্টের একজন অফিসার হিসেবে তাদের স্পেনীয় পূর্বপুরুষ এখানে এসেছিল। সেভিলের এক ধূর্ত কাযী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি তার দাবার ঘুঁটি হিসেবে এমন একজনকে ব্যবহার করেছিলেন যার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় হিশামের[১০] খুবই সাদৃশ্য ছিল। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে কাযীর পুত্র আব্বাদ তার পিতার উত্তরসূরি রূপে খলিফা হিসেবে ভানকারী মেকী হিশামের রাজসরকারের পদে আসীন হন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই তার আসল রূপ প্রকাশ করেন এবং সাম্মানিক আল-মুতাযিদ[১১] (যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শক্তি চান) উপাধি গ্রহণ করে প্রকাশ্যেই রাজ্য শাসন করতে থাকেন। আর এইভাবেই তিনি তার পিতার তৈরি প্রহসনের অবসান ঘটান।

● আল-মুতামিদ

আল-মুতাযিদ নিজে একজন কবি ছিলেন। আর যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর ছোট গান রচনা করতেন তিনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রায় ৮০০ মহিলা বিশিষ্ট একটি হারেমও তার ছিল। কিন্তু তার পুত্র ও উত্তরসূরি আল-মুতামিদ (যিনি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীল, ১০৬৮-৯১)-এর রণ উদ্যোগের কাছে তার রাজদরবারের দীপ্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কারণ তার পুত্র ছিলেন সমস্ত ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।[১২] সিংহাসনে আরোহণের অল্প কিছুদিন পরেই আল-মুতামিদ বানু-জাহওয়ার রাজত্ব ধ্বংস করে কর্ডোভাকে তার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হলেন। তার সমসাময়িক অনেক রাজার মতো তিনিও ছিলেন প্রথমে গ্যালিসিয়ার রাজা গার্সিয়া ও পরে তার উত্তরসূরি ষষ্ঠ অ্যালফোনসোর[১৩] করদ রাজা। আল-মুতামিদ একটি অনুভূতিপ্রবণ ও কাব্যচেতনায় সম্পৃক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। তার বিলাসবহুল জীবন, রাজকীয় আনন্দানুষ্ঠান ও ছদ্মবেশে তার দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে অনেক ছোট ছোট সত্য কাহিনী প্রচলিত আছে। যে রাজার দরবারটি ছিল ক্ষণিকের অতিথিদের সাময়িক আশ্রয়স্থল, কবিদের সাক্ষাতের জায়গা, প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সমাবেশের স্থান ও সমস্ত আশাভরসার কেন্দ্র[১৪]। তিনি কবি ইবন-আম্মারকে[১৫] তার উজির হিসেবে এবং প্রতিভা ও সৌন্দর্যের অধিকারিনী ইতিমাদ নামের এক ক্রীতদাসীকে তার প্রিয়তমা স্ত্রী রূপে বেছে নিয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় কবি ইবন-আম্মারের সঙ্গে ওয়াদালকুইভির নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে রাজা লক্ষ করলেন যে, মৃদুমন্দ বাতাস নদীর জলকে অশান্ত করে তুলছে। রাজা সঙ্গে সঙ্গে একটি কবিতার শ্লোক রচনা করলেন ·

তাকিয়ে দেখ হে বাতাস কেমনে গড়িছে ঢেউয়ের বর্ম;

এবং তার উজিরকে শ্লোকটি সম্পূর্ণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানালেন।

ইবন-আম্মার ইতস্তত করছিলেন। খুব কাছেই নদীর তীরে একটি যুবতী কাপড় কাচছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ পূর্ণ করে বলে উঠল :

না যদি জমিতে খুলে ফেলা কোন নাইটের নহে কর্ম![১০]

সেই যুবতীটিই ছিল ইতিমাদ আল-রুমাইকিয়া, ভবিষ্যতের রানি। শোনা যায় এই রানির নামের প্রথম অংশটিই তার রাজবংশীয় স্বামী নিজের নামের[১১] সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং রানির প্রতিটি ইচ্ছা ও শখই তিনি পরবর্তী কালে পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। একবার কর্ডোভায় তুষারকণা দিয়ে তৈরি পাখির পালকের মতো কোমল ফলক পড়ার বিরল দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে ইতিমাদ এর একটি বিকল্প তৈরি করে দেবার জন্য আল-মুতামিদকে অনুরোধ করতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে গোটা সিয়েরাকে বাদাম গাছে ছেয়ে দেবার আদেশ দিলেন। শীতকালের শেষের দিকে এই গাছগুলি শাদা ফুলে ভরে ওঠে। আর একদিন কিছু বেদুইন গয়লানী দুধের জার বহন করে তাদের ঘাগরা কিছুটা তুলে কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তাই দেখে রানি নিজে ওই বেদুইন মেয়েদের অনুকরণ করতে চাইলেন। কালবিলম্ব না করে রাজপ্রাসাদের উঠানটি গোলাপ-জলে ভেজা তীব্র সুগন্ধ ও আতরে পূর্ণ একটি হ্রদে পরিণত হল এবং শীঘ্রই সেটি রানি ইতিমাদ ও তার সুন্দরী সহগামীদের[১২] কোমল পায়ের স্পর্শ পাবার উপযুক্ত সুন্দর গন্ধে ভরা জলা জায়গা হয়ে উঠল।

আল-মুতামিদের শাসনকালের প্রথম দিকের দিনগুলো ছিল যেমন বিলাসবহুল, তার শেষের দিনগুলো ছিল তেমনি দুঃখময়। বেশ কয়েক বছর ধরেই উত্তরের খ্রিস্টান রাজারা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেই ব্যস্ত ছিলেন। এই কয় বছরের স্থিতাবস্থার পর তারা আবার তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রথম ফার্দিনান্দ ও তার পুত্র ষষ্ঠ অ্যালফোনসোর নেতৃত্বে লিঁয় ও ক্যাস্টিল রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠল। অ্যালফোনসো তার রাজ্যের সঙ্গে গ্যালিসিয়া ও নাভারে-কে যুক্ত করলেন। মুসলিম ও খ্রিস্টান রাজপুত্ররা যেহেতু তার আনুকূল্য পাবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল, তাই তিনি তার উত্তরসূরির মতো নিজেকে 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করলেন। তার উত্তরসূরি সপ্তম অ্যালফোনসো নিজেকে 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করা ছাড়াও 'দু'টি ধর্মের মানুষজনের রাজা' বলে দাবি করলেন। এখন উত্তর দিক থেকে নিয়মিত আক্রমণ শুরু হল এবং সেই অভিযান সুদূর দক্ষিণে ক্যাডিজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ইতিমধ্যেই 'মাই সিড দি চ্যালেঞ্জার' বলে খ্যাত রডরিগো ডায়াজ ডি বিভার তার ক্যাস্টিলীয় অনুগামীদের সাহায্যে ভ্যালেন্সিয়া দখল করে ফেলেছেন এবং আব্বাদিয় রাজত্বকে নাকাল করতে শুরু করেছেন। তার সামন্ত প্রজা ষষ্ঠ অ্যালফোনসো ও সিদদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে আল-মুতামিদ এই সময়ে বন্ধু হিসেবে মরক্কো থেকে শক্তিশালী মুরাবিত নেতা ইউসুফ ইবন-তাশফিনকে ডেকে এনে এক মারাত্মক

ভুল করে বসলেন। যে সমস্ত সমালোচকেরা পূর্বেই এই বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন এবং 'একই খাপে দুটি তরবারিকে পোরার' অসম্ভব চেষ্টার ব্যাপারে তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, আল-মুতামিদ তাদের বলেছিলেন যে ক্যাস্টিলে[১০] একজন শুয়োর পালক হবার বদলে তিনি আফ্রিকায় একজন উট-চালক হবেন। এই বার্বার মুরাবিয়দের শরীরে কিছু পরিমাণে নিগ্রো রক্তও প্রবাহিত হত এবং তারাই এখন আলজিয়ার্স থেকে সেনেগাল পর্যন্ত ক্ষমতার আসনে বসে আছেন।

ইউসুফ আমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছিলেন। বিনা বাধায় তিনি দক্ষিণ স্পেনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন, বাদাজোজের কাছে আল-জাল্লাকাতে[১১] ষষ্ঠ অ্যালফোনসোর মুখোমুখি হলেন এবং ২০,০০০ সেনার সাহায্যে ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর তাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করলেন। খ্রিস্টান রাজা ও তার মাত্র ৩০০ ঘোড়ার প্রাণ কোনরকমে রক্ষা পেল। পিছনে পড়ে রইল অসংখ্য মৃতদেহ যাদের মাথা দিয়ে একটি দুর্গ গড়ে তোলা যেত। এবং যুদ্ধজয়ের আনন্দে উল্লসিত মুসলিমরা[১২] সেটিকে মিনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। বার্বার সেনাপতি তার যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে ৪০,০০০ মাথা বহন করে নিয়ে গেলেন। মুসলিম স্পেনে উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল এবং গর্বিত ইবন-তাশফিন-সেভিলি কবিদের অলঙ্কারপূর্ণ প্রশস্তি বুঝতে না পেরে তার পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আফ্রিকায় ফিরে গেলেন। যে মুরাবিয় প্রধান তার সাহারান যোদ্ধাদের নিয়ে সভ্য স্পেনের অনেক রুচিকর সামগ্রী ভোগ করে তাদের চাহিদা আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন এবং সেখানকার মরুভূমির রুক্ষতা আরও অসহনীয় করে তুলেছিলেন, অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ফিরে এলেন। তবে এবারে বন্ধুরূপে নয়, বিজয়ী রূপে। ১০৯০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর তিনি গ্রানাডায় প্রবেশ করলেন। পরের বছরেই তিনি সেভিলে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করলেন। মুসলিম স্পেনের গোটাটাই তার দখলে চলে এল। কেবলমাত্র টলেডো রইল খ্রিস্টানদের হাতে এবং সারাগোসাতে বানু-হুদ পরিবারকে টিকে থাকতে দেওয়া হল। আল-মুতামিদকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মরক্কোতে। সেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে তিনি নির্বাসিত জীবন কাটাতে লাগলেন; স্ত্রী ইতিমাদ ও তার কন্যারা নির্বাসনে তাঁত চালিয়ে খাবার জোগাড় করতে লাগলেন।[১৩] একদিন সেই পরাভূত রাজা লক্ষ করলেন যে, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতে মানুষের মিছিল চলেছে মসজিদের দিকে। তার ভিতরে জীবিত কবিসত্তা সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত মর্মন্তুদ পঙক্তি রচনা করেছিল :

বৃষ্টির লাগি মিনতি জানাতে চলিয়াছে তারা আল্লার কাছে
আমি বলি, মোর চোখের জলেতে বন্যার স্রোতধারা যে আছে
ফুকারিল তারা, সত্য, তবুও তোমার চোখের জলের ও ধারা
অফুরান; হায় জল নয়, ও সে তোমার দেহের রক্ত।[১৪]

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে আব্বাদিদ বংশের এই শেষ প্রতিনিধি আগমাত-এ মারা যান। আর এই সময় থেকেই স্পেনে বার্বার একাধিপত্যের অধ্যায় শুরু হয়।

● মুরাবিয় বংশ

মুরাবিয়রা (আলমোরাভাইদ) আসলে একটি ধর্মীয় সামরিক মৈত্রীসংঘ। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক ধার্মিক মুসলিম নিম্ন সেনেগালের একটি দ্বীপে অবস্থিত রিবাত (যেখান থেকে মুরাবিত-এর উৎপত্তি)[১১] অর্থাৎ দুর্গ-ঘেরার মধ্যে এই মৈত্রীসংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। সাহারার বিরাট অনুর্বর ভূখণ্ডে যাযাবর রূপে জীবনযাপনে অভ্যস্ত সানহাজা উপজাতির একটি শাখা লামতুনা-ভুক্ত মানুষদের মধ্য থেকেই মৈত্রীসংঘের প্রথম দিককার সদস্যদের নিয়োগ করা হয়। তাদের বংশধর দক্ষিণ আলজেরিয়ার তাওয়ারিক (তুয়ারেগ)-রা এখনও যাযাবরের মতো জীবন যাপন করে এবং চোখের নিচ থেকে মুখের বাকি অংশ বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখে। তাদের লোকদের মধ্যে প্রচলিত এই অদ্ভুত প্রথার[১২] জন্য তাদের আরেক নাম হয় মুলাস্‌সামুন (বোরখাধারী)। মাঝে মাঝে মুরাবিয়দেরও এই নামে ডাকা হয়। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা-সন্ন্যাসী নিয়ে শুরু করে মুরাবিয়রা কয়েকটি নিগ্রো উপজাতি-সহ বেশ কিছু উপজাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেদের গোটা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও শেষ পর্যন্ত স্পেনের[১৩] শাসক রূপে প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মের সঙ্গে তরবারির মেল বন্ধনে[১৪] কী অসাধ্য সাধন করা যায় তাদের কাহিনী ইসলামের ইতিহাসে তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

মুরাবিয় সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ইবন-তাশফিন (১০৬১-১১০৬ খ্রিঃ) ১০৬২ খ্রিস্টাব্দে মাররাকুশ (মরক্কো, মারাকেশ) নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই তার ও তার উত্তরসূরিদের রাজধানীতে[১৫] পরিণত হয়েছিল। স্পেনে কর্ডোভার পরিবর্তে সেভিল-ই সহায়ক রাজধানীর ভূমিকা পালন করেছিল। মুরাবিয় শাসকেরা নিজেদের হাতেই সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল এবং আমীর আল-মুসলিমিন[১৬] উপাধি ধারণ করেছিল। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা বাগদাদে[১৭] ক্ষমতাসীন আব্বাসীয় খলিফার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে মেনে চলত। উমাইয়া রাজত্ব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেই কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায়। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ স্পেনে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে মুরাবিয় শাসকেরা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইতিহাসেও এই প্রথম বার্বার শাসকেরা বিশ্ব আঙিনায় একটি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করছিল।

● মুদ্রা

পরবর্তী সময়ে মুরাবিয় আমলের দিনারের বিপরীত দিকে আমীর আল-মু উপাধিটি খোদাই করা ছিল. এর আগে ক্ষমতাসীন আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনের প্রতীকরূপে তার অপর দিকে ইমাম উপাধিটি মুদ্রিত ছিল। লিঁয় ও ক্যাস্টিলের রাজা অষ্টম অ্যালফোনসো (১১৫৮-১২১৪ খ্রিঃ) এই দিনারের নকল করেছিলেন। অবশ্য তিনি আরবী অক্ষরগুলিকে বজায় রেখে উৎকীর্ণ বাণীগুলিকে খ্রিস্টান রূপকথা অনুযায়ী বদল করে নিয়েছিলেন। এই

মুদ্রার তিনি নিজে আমির আল-কাতুলাকিন (ক্যাথলিকদের অধিনায়ক) ও রোমের পোপ ইমাম আল-বিয়া আল-মাসিহিয়া (খ্রিস্টান গির্জার নেতা) রূপে অঙ্কিত ছিলেন। প্রচলিত মুসলিম সূত্রের বদলে মুদ্রাটি "মহান পিতা, তার পুত্র, পবিত্র আত্মা, একমাত্র ঈশ্বরের" নামে চালু করা হল। এবং যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তাদের প্রকাশ্যে নিন্দা করার পরিবর্তে "যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে" তাদের রক্ষা করা হবে"— এই নীতি চালু হল।

● ধর্মগত কারণে নির্যাতন

মুরাবিয় শাসনে ইসলাম ধর্মে নতুন রূপান্তরকরণ ও বর্বর ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হবার প্রক্রিয়া পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মান্ধ ইহুদিদের ধর্মীয় আবেগের উন্মাদনার পরিণতিতে বহু খ্রিস্টান, ইহুদি ও এমন কী উদার মুসলিমদেরও যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ আলীর রাজত্বে (১১০৮-৪৫ খ্রিঃ) ইউসুফের পুত্র ও উত্তরসূরি আল-গাজ্জালীর রচনাগুলি কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল অথবা স্পেন ও আল-মাগরিবে[১৮] আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ মুরাবিয়দের আনুকূল্যপ্রাপ্ত মালিকী বিচারশাস্ত্রের বক্তব্য-সহ গাজ্জালীর মন্তব্যগুলিও ধর্ম-তাত্ত্বিকদের (ফকীহ্‌দের) কাছে মর্যাদাহানিকর বলে গণ্য হয়েছিল। পূর্বের যে সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি কোনরকম রাখঢাক না করেই আন্দালুসিয় ফকীহ্‌দের এই আইনী পরামর্শে সম্মতি দিয়েছিল যে, মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেনের ছোট ছোট রাজাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে ইউসুফ ইবন-তাশফিন বিচ্যুত হয়েছিল। এবং তাদের সিংহাসনচ্যুত[১৯] করা শুধু তার অধিকারই ছিল না, বরং কর্তব্য ছিল, আল-গাজ্জালীর নাম ছিল সেই তালিকার একদম ওপরে। আল-ইদ্রিসির[২০] দ্বারা লুসেনা নামে আখ্যাত একটি ইহুদি শহরের অধিবাসীরা ছিল মুসলিম দুনিয়ার সমধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। স্পেনের মুরাবিয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা রাজস্বের ঘাটতি মেটানোর জন্য তাদেরকে উদার হাতে দান করার আহ্বান জানিয়েছিল। ভিসিগথিক শাসনের তুলনায় উমাইয়া শাসনে স্পেনীয় ইহুদিদের আইনগত মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান ও তার পুত্র আল-হাকামের আমলে কোষাধ্যক্ষ হাসদে বেন-শাপরুতের প্রভাবে পূর্বপ্রান্ত থেকে অনেক ইহুদি এসেছিল এবং কর্ডোভা হয়ে উঠেছিল ইহুদিদের ধর্মীয় আইন ও উপদেশাবলি শিক্ষার একটি কেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমেই সেখানে আন্দালুসিয় ইহুদি সংস্কৃতির[২১] বিকাশের সূচনা হয়েছিল। স্পেনীয় ইহুদিরা বাস্তবে আরবদের ভাষা ও পোশাক ব্যবহার করত এবং তাদের মতো একই আচার-আচরণ অনুসরণ করে চলত।

● ভাবী আরব সম্প্রদায়

স্পেনীয় জনসাধারণের যে অংশটি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেও বিত্তরা মুসলিমদের ভাষা ও জীবন ধারণ পদ্ধতি আয়ত্ব করেছিল, তাদের মোজারাব বলা হত।

এই সময়ে তাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণে তাদের ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। বড় বড় শহরে আরবী জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই সমস্ত খ্রিস্টানেরা নিজেদের অঞ্চলে বাস করত, উমাইয়া আমলে তারা নিজেদের বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট[২২] নিয়োগ করত এবং কোন বিশেষ ধরনের পোশাক পরত না। সাধারণত তারা দুটো নাম ব্যবহার করত। একটি আরবী ও পরিচিত, অন্যটি যথারীতি স্পেনীয় বা ল্যাটিন। তারা এমন কী সুন্নৎ করার রীতি মেনে চলত ও হারেমও রাখত। মোজারাবদের অধিকাংশই ছিল দ্বিভাষী; তাদের মাতৃভাষা ছিল নিচু স্তরের ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত ও স্পেনীয় হবার লক্ষ্যে অগ্রসরমান রোমান্স পেটয়েস। টলেডোর মতো শহরগুলিতে ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ অ্যালফোনসোর দ্বারা খ্রিস্টানদের বিজয়[২৩] সংঘটিত হবার পরে দু'শতাব্দী ধরে তারা আইন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে লেখার কাজে আরবী ভাষা ব্যবহার করত। তার অনেক উত্তরসূরির মতো এই অ্যালফোনসোও তার মুদ্রাগুলিতে আরবীয় অক্ষর খোদাই করেছিলেন। আরাগনের প্রথম দিককার রাজাদের মধ্যে অন্যতম প্রথম পিটার (মৃ. ১১০৪) কেবলমাত্র আরবী অক্ষরেই লিখতে পারতেন। এমন কী যখন ল্যাটিন ভাষাতেও মোজারাবরা কিছু লিখত তখন তারা আরবী অক্ষরই ব্যবহার করত। মুসলিম বিজয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাইবেলের অংশবিশেষ আরবী ভাষায়[২৪] অনূদিত হয়েছিল। ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভার আইজ্যাক ভেলাসকুয়েজ ল্যাটিন ভাষা[২৫] থেকে লুক ও অন্যান্য তিনটি গসপেল অনুবাদ করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তার ধর্মতাত্ত্বিকদের ফতোয়ার (ধর্মীয় আদেশ) ভিত্তিতে ভিসিগথ আমলে তৈরি ও তখন গ্রানাডার মোজারাবদের দখলে থাকা একটি সুন্দর গির্জাকে মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্য ইউসুফ ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে একটি আদেশ দেন। উত্তরের এক খ্রিস্টান শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অপরাধে ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার এই সমস্ত অধিবাসীদের কোতল করা হয়েছিল অথবা মরক্কোতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ১১ বছর পরে মোজারাবদের দ্বিতীয়বার নির্বাসনে পাঠানোর পরে স্পেনে তাদের অতি অল্প কয়েকজন পড়ে রইল।

এই সময়ে নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মোজারাব ও মুসলিমদের মধ্যকার পার্থক্যের সীমারেখা টানা খুবই শক্ত হয়ে পড়েছিল। শুরু থেকেই আমরা লক্ষ করেছি যে, বিজয়ী সেনাবাহিনী ও উপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে প্রকৃত আরবদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। শুধুমাত্র সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেই তারা ছিল সীমিত। সেনাবাহিনী ও প্রথম অভিবাসী দলের সঙ্গে আগত মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। রোগ ও যুদ্ধ প্রথম দিককার বিজয়ী শাসক ও অভিবাসীদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছিল। চতুর্থ প্রজন্মের পর দেশীয় মেয়েদের বিয়ে করার ফলে আরবীয় রক্তের তেজ কমে গিয়েছিল। উপপত্নী, ক্রীতদাস ও যুদ্ধবন্দিরা অন্যান্য বিজিত দেশের মতো এখানেও সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছিল। রিবেরা-র[২৬] গবেষণা থেকে জানা যায় যে, স্পেনের মুসলিমরা বা তথাকথিত মুরেরা অধিকাংশই ছিল

স্পেনীয় রক্তের অধিকারী। এই আধুনিক স্পেনীয় গবেষকের মতে, উমাইয়া বংশের তৃতীয় খলিফা দ্বিতীয় হিশামের দেহে এক-দশমাংশের বেশি আরবীয় রক্ত প্রবাহিত হত না।

● মাই সিড দি চ্যালেঞ্জার

মুরাবিয় শাসনের প্রথম দিকে স্পেনীয় রাজবংশের বীরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ও মোজারাবদের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় মানুষ রডরিগো দিয়েজ দ্য বিভার তার সামরিক অভিযানগুলি চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সিড[৬১] নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। একটি অভিজাত ক্যাস্টিলিয় পরিবারের বংশধর রডরিগো প্রথমে ষষ্ঠ অ্যালফোনসোর কাছে চাকরি করতেন। পরে ষষ্ঠ অ্যালফোনসো তাকে ক্যাস্টিলিয় রাজত্বের বাইরে নির্বাসিত করেন (১০৮১ খ্রিঃ)। তারপর তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কখনও এক গোষ্ঠীর, কখনও-বা-আর এক গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সুযোগ আসামাত্রই মুসলিম বা সমধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তার আচরণে তিনি যতটা মুসলিম ততটাই খ্রিস্টান ছিলেন। সারাগোসাতে তিনি যখন হুদিদ রাজবংশের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি প্রভূত গৌরব অর্জন করেন এবং তার মুসলিম সেনাদের কাছ থেকে এল সিড ক্যাম্পিয়াডর[৬২] উপাধি পান। ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্সিয়াতে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি রাজমুকুটের সমান গৌরবময় মাই সিড দি চ্যালেঞ্জার উপাধি লাভ করেন, কারণ ওই সময়ে ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি মুরাবিয় আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভ্যালেন্সিয়াকে আগলে রেখেছিলেন। অত্যাশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ গল্প কাহিনীতে তিনি স্পেনের জাতীয় নায়ক, এর বীরত্বের প্রতীক ও খ্রিস্টধর্মে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের প্রতিভূ ছিলেন। স্পেনীয় গাথাগুলিতে তার নামের সঙ্গে ধার্মিক ও ঋষিতুল্য ব্যক্তির জ্যোতির্মণ্ডল যুক্ত হয়ে আছে। দ্বিতীয় ফিলিপ (মৃ. ১৫৯৮ খ্রিঃ) এই দাবিটিকে পোপের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন যাতে তাকে সিদ্ধ পুরুষ বলে ঘোষণা করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সিডের নামের মহিমা কীর্তন করে রচিত 'ক্যানটার দ্য মিও সিড' নামের মহাকাব্যটি প্রাচীনতম ও বৃহত্তম স্পেনীয় কবিতাগুলির অন্যতম। এই মহাকাব্যটি পরবর্তী কয়েক যুগ ধরে স্পেনীয় মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং দেশীয় ভাষা গড়ে তোলা ও জাতীয় চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গেছে।

● মুরাবিয় রাজত্বের অবলুপ্তি

প্রত্যাশা মতোই স্পেনে মুরাবিয় রাজবংশের মেয়াদ (১০৯০-১১৪৭ খ্রিঃ)[৬৩] ছিল স্বল্পস্থায়ী। এই রাজবংশের মধ্যে দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার রাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট কালচক্র দ্রুততার সঙ্গে পূর্ণ হয়েছিল। সুদক্ষ সামরিক শাসনের পর দেখা দিয়েছিল অলসতা ও দুর্নীতি এবং তার পরিণতিতে এসেছিল বিভাজন ও পতন। মরুভূমির দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, এবং মরক্কো ও

আন্দালুসিয়ার বিলাসবহুল অঞ্চলে অকস্মাৎ জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে এর রুক্ষ বার্বাররা শীঘ্রই সভ্যতার নেতিবাচক অভ্যাসগুলির শিকার হয়ে দুর্বল, এমন কী পৌরুষত্বহীন হয়ে পড়ল। তারা এমন একটা সময়ে স্পেনে অনুপ্রবেশ করেছিল যখন বৌদ্ধিক আনন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আরবরা তার বহু দিন আগেই যুদ্ধের অনুরাগ ও রাজ্যজয়ের লালসা থেকে মুক্ত হয়েছিল। এর ফলে আফ্রিকা থেকে আগত বিজয়ী শাসকেরা ওই দেশেই স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ পেল এবং একই সঙ্গে নিজেদের সর্বনাশ এল যেটা আত্মস্থ করার জন্য তারা কোনভাবেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা অপেক্ষাকৃত সবল জ্ঞাতিভাই মুয়াহ্হিদদের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। গোটা দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে স্পেন পালাক্রমে এই দুই বার্বার রাজবংশের অধীনেই ছিল। তবে মরক্কোই ছিল এদের রাজধানী।

● মুয়াহ্হিদ রাজবংশ

মুরাবিয় রাজবংশের মতোই জনৈক বার্বারের দ্বারা সংগঠিত একটি রাজনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মুয়াহ্হিদ রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। সেই বার্বারটি ছিলেন মাসমুদাহ উপজাতির[১৪] মুহাম্মাদ ইবন-তুমারত (১০৭৮-১১৩০ খ্রিঃ)। মুহাম্মাদ প্রতীকী উপাধি আল-মাহ্দী[১৫] গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত ধর্মপ্রচারক বলে আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলাম ধর্মের পবিত্র ও মৌলিক রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারের জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। তখন ইসলাম ধর্মে অতিমাত্রায় আল্লাহ্র ওপর নরত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তারই প্রতিবাদ হিসেবে তিনি তার নিজের এবং মরক্কোর অ্যাটলাস পর্বতের অন্যান্য বন্য উপজাতির মধ্যে তাওহিদ তত্ত্ব, আল্লাহ্ ও তার দর্শনগত ধারণার ঐক্য সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। সেই কারণেই তার অনুগামীদের আল-মুয়াহ্হিদূন[১৬] বলে ডাকা হত। বেঁটে, কুৎসিত ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় জাত, মসজিদের বাতি জ্বালানোর জন্য নিযুক্ত এক ব্যক্তির এই সন্তানটি কঠোর তপস্যা এবং ঠিক তার বিপরীতধর্মী সঙ্গীত, মদপান ও অন্যান্য অনৈতিক কার্যকলাপ সংমিশ্রিত জীবন যাপন করতেন। যখন তিনি যুবক ছিলেন, অতি উৎসাহে তিনি একদিন মুরাবিয় রাজা আলি ইবন-ইউসুফের বোনকে ফাস (ফেজ)-এর রাস্তায় অপমান করেছিলেন কারণ মেয়েটি বোরখা না পরে[১৭] রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।

● মুয়াহ্হিদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

১১৩০ খ্রিস্টাব্দে ইবন-তুমারতের বন্ধু ও তার সেনাবাহিনীর জেনারেল আবদ-আল-মুমিন ইবন-আলী সিংহাসনে বসলেন। তিনি ছিলেন জানাতাহ উপজাতিভুক্ত এক কুমোরের ছেলে। পরে তিনি বৃহত্তম মরক্কোতে মুয়াহ্হিদ রাজবংশের খলিফা-প্রতিষ্ঠাতায় পরিণত হলেন। আফ্রিকার ইতিহাসে এটিই ছিল বৃহত্তম সাম্রাজ্য। তারাই ইসলাম ধর্মের একমাত্র ও যথার্থ প্রবক্তা—এই তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সমস্ত একেশ্বরবাদী মুসলিমেরা মরক্কো ও সংলগ্ন

— মুওয়াহ্হিদ শাসনাধীন মরক্কো —

দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাতে লাগল। আবদ-আল-মুমিন ১১৪৪-১১৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিলিমসান (টিলেমসেন)-এর কাছে মুরাবিয় সেনাদলকে ধ্বংস করেন এবং তিলিমসান-সহ ফাস, সেউতা, আগমাত ও তাঞ্জিয়ার দখল করেন। এরপর ১১ মাস ধরে মাররাকুশ অবরোধ করে রাখার পর ১১৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুরাবিয় রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটান। মুরাবিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাতি ও এই বংশের শেষ প্রতিনিধি ইসহাক ইবন-আলী নামে এক বালককে তার শিশুসুলভ কান্না সত্ত্বেও মুয়াহ্হিদ খলিফা (আমীর আল-মুমিনিন) হত্যা করেন। মাররাকেশ এরপর মুয়াহ্হিদদের রাজধানীতে পরিণত হয়। স্পেনে তখন রাজনৈতিক দুর্নীতি, দস্যুবৃত্তি ও জন-অসন্তোষ চরমে। ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে আবদ আল-মুমিন স্পেনে তার সেনাবাহিনীকে পাঠান এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তারা দ্বীপটির গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। ৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে উমাইয়া আমিরী সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ আরও কয়েক বছর ধরে মুরাবিয় বংশের শেষ প্রতিনিধিদের দখলে ছিল।

মরক্কো ও স্পেনের শাসনকর্তা আবদ-আল-মুমিন ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে আলজিরিয়া, ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়া ও ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপোলি জয় করলেন। মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম আটলান্টিক থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ আন্দালুসিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত হল। অন্যদিকে, স্পেন ছাড়াও মরক্কো ও আলজিরিয়ার অংশবিশেষ মুরাবিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। এই বিশাল নতুন সাম্রাজ্যে ধর্মপ্রচারের প্রতিটি মঞ্চ থেকে মাহদী অথবা তার খলিফার নামে শুক্রবারের প্রার্থনা বা ভাষণ পাঠ করা হত। এর আগে অবশ্য আব্বাসীয় খলিফার নামেই শুক্রবারের প্রার্থনা পাঠ করা হত।

● আল-মানসূর

গৌরবের সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবদ-আল-মুমিন মারা গেলেন। তার উত্তরসূরিদের মধ্যে সবার সেরা ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন তার নাতি আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মানসূর (১১৮৪-৯৯ খ্রিঃ)। অন্যান্য অনেক বার্বার শাসকের মতো তিনিও এক খ্রিস্টান ক্রীতদাসের সন্তান ছিলেন। সালাহ্-আল-দীন (সালাদিন) মূল্যবান উপহার-সহ একটি প্রতিনিধি দলকে আল-মানসূরের রাজদরবারে পাঠিয়েছিলেন। উসামা ইবন-মুনকিযের এক ভাইপো ছিলেন এই প্রতিনিধি দলের নেতা। সালাহ্-আল-দীন মেনে চলতেন আব্বাসী খলিফাকে। তাই, তিনি ওই প্রতিনিধি দলকে আমীর আল-মুমিনিনের পরিবর্তে আমীর আল-মুসলিমিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে প্রথমদিকে আল-মানসূর কোন ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা বোধ করছিলেন। পরে তিনি ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ১৮০টি বড় নৌকা দিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন।

আল-মানসূরের আমলে নির্মিত ও বর্তমানে বিদ্যমান স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনের প্রতীক স্মৃতিস্তম্ভগুলি মরক্কো অথবা স্পেনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্মগুলির অন্যতম।

১১৭০ খ্রিস্টাব্দে মুয়াহ্হিদ শাসকেরা তাদের রাজধানী সেভিলে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সিংহাসনে তার আরোহণ-পর্বটি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দ্বারা সূচিত হয়েছিল। বিরাট মসজিদটির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এটির এখন নাম হয়েছে গিরালডা। এই মসজিদটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ১১৭২ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয়েছিল ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে। এখন ওই মসজিদের স্থান নিয়েছে একটি গির্জা। আলেকজান্দ্রিয়ার অনুকরণে মরক্কোতে তিনি রিবাত আল-ফাত্হ তৈরি করেছিলেন এবং মাররাকেশে তিনি একটি হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন। তার সমসাময়িক আল-মাররাকুশি মনে করতেন যে, গোটা বিশ্বে এই হাসপাতালটির কোন জুড়ি ছিল না।

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই ছিল স্পেনের মুয়াহ্হিদ খলিফাদের প্রধান দুশ্চিন্তা। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ১২১২ খ্রিস্টাব্দে লাস নাভাস দা টলোসাতে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে তাদের দ্বীপ থেকে নির্বাসিত হতে হয়। কর্ডোভার ৭০ মাইল পূর্বে এই লড়াইটি হয়েছিল। আরবেরা এটিকে আল-ওকাব (পর্বত)-এর যুদ্ধ বলে। আরাগনের রাজার নেতৃত্বাধীন খ্রিস্টান সেনাবাহিনী, রাজার নেতৃত্বে নাভারে-র বাহিনী, টেম্পলার ও অন্যান্য নাইটদের নেতৃত্বাধীন পর্তুগালের বাহিনী ক্যাস্টিলের রাজা অষ্টম অ্যালফোনসোর নেতৃত্বে এগিয়ে চলল। ফরাসি ধর্মযোদ্ধারাও অ্যালফোনসোর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল-মানসূরের ছেলে খলিফা মুহাম্মাদ আল-নাসির (১১৯৯-১২১৪ খ্রিঃ) আরব সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সেনাদলের ৬,০০,০০০ সেনার মধ্যে মাত্র ১০০০ কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছিল। আল-নাসির নিজে মাররাকুশে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং দু'বছর পরে তিনি সেখানেই মারা যান। এর মধ্য দিয়ে স্পেনে মুয়াহ্হিদ রাজত্বের অবসান ঘটে। মুসলিম ধর্মের অনুসারী গোটা স্পেন বিজয়ীদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ধীরে ধীরে এটি সদা-আগ্রাসনকারী খ্রিস্টান শাসক ও স্থানীয় মুসলিম রাজবংশের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। স্থানীয় মুসলিম রাজবংশগুলির মধ্যে গ্রানাডার নাসরিদরা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য এবং ওই দ্বীপে ওরাই ছিলেন মুসলিম শাসনের শেষ প্রতিনিধি।

মরক্কোতে আল-নাসিরের ন'জন উত্তরসূরির সকলেই ছিলেন আবদ-আল-মুমিনের বংশধর। ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে জানাতা-র একটি শাখা বানু-মারিনের অর্ধ-যাযাবর বার্বার উপজাতি তাদের রাজধানী দখল করে নেবার আগে পর্যন্ত তাদের রাজত্ব টিকে ছিল।

● বানু-নসর

নসরিয় রাজবংশের (১২৩২-১৪৯২ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন-ইউসুফ ইবন নসর। তিনি অবশ্য ইবন-আল-আহ্মার নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। আল-মদীনার সুপ্রসিদ্ধ খাজরাজ উপজাতিকে এদের বংশধর বলে মনে করা হয়। ওই পরিবারটির অন্য নাম ছিল বানু আল আহ্মার। এক সময়ে গ্রানাডায় বসবাসকারী ও ইবন আল আহ্মারের এক উত্তরসূরির

রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত ইবন-খালদূন[৬০] তার লেখার মধ্যে মুহাম্মাদের জীবনের এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। মুয়াহ্হিদ রাজত্বের বিলুপ্তির পর ক্যাস্টিলিয়রা একজন মুসলিম শাসককে অপর মুসলিম শাসকের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে দিচ্ছিল এবং এইভাবে পালাক্রমে প্রত্যেককেই ধ্বংস করছিল। তাই মুহাম্মাদ খ্রিস্টানদের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করলেন এবং গ্রানাডার কাছাকাছি তার নিজের জন্য একটি রাজ্য লাভ করলেন। এই রাজ্যটি সীমিত অর্থেও সেভিলের গৌরবকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিল এবং বজায় রেখেছিল। পরবর্তী ২৫০ বছর ধরে উদীয়মান খ্রিস্টান শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যটি ইসলাম ধর্মের সমর্থক রূপে এক উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল।

মুহাম্মাদ (১২৩২-৭৩ খ্রিঃ) আল-গালিব (অতিক্রমকারী) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রানাডাকে তার রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ও তার উত্তরসূরিরা ক্যাস্টিলিয় রাজার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানিয়েছিলেন। অবস্থান ও আবহাওয়ার[৬১] দিক থেকে গ্রানাডার (গারনাতা) মতো আন্দালুসিয়ার আর কোন শহর আরবরা পছন্দ করত না। দামাস্কাসের মানুষেরাও এই শহরটিকে পছন্দ করত এবং বহু সিরীয় ও ইহুদি এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছিল।[৬২] এর সমভূমি অঞ্চল (মারজ) ভেগা-তে জলধারার প্রাচুর্য ছিল এবং তাই এখানে চিরসবুজ গাছপালা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক বিরল দৃশ্য দেখা যেত। এই শহরটির সঙ্গে দামাস্কাসের[৬৩] গুতাহ্-র অনেক মিল ছিল। নাসরিদ শাসনের শেষের দিকে শহরটিতে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ বাস করত। আল-মাক্কারির নায়ক নাসরিদ রাজদরবারের উজির ও রাজপরিবারের সাহিত্যগুণ সম্পন্ন ঐতিহাসিক লিসান-আল-দিন ইবন-আল-খাতীব (মৃ. ১৩৭৪) গ্রানাডার শাসক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখে গেছেন তার থেকে আমরা রাজধানী সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় তথ্য জানতে পারি।

● আলহামরা

এই সুন্দর শহরটির দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে একটি পার্বত্য চত্বরে এক পুরানো উমাইয়া দুর্গের ধ্বংসস্তূপের ওপর আল-গালিব তার বিশ্ববিখ্যাত আল-হামরা (স্পেনীয় ভাষায়, আল-হামব্রা) দুর্গটি তৈরি করেছিলেন। দুর্গটি ছিল লাল, কারণ এটি লালরঙের এক বিশেষ ধরনের প্ল্যাস্টার দিয়ে তৈরি হয়েছিল। আগে ভাবা হত যে, আল-গালিবের ছদ্মনাম থেকে আল-হামরা অর্থাৎ লাল নামটি এসেছিল, কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। লাল প্ল্যাস্টার দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলেই এর ওই রকম নাম হয়েছিল। তার তিন উত্তরসূরির দ্বার বর্ধিত আকার ও সৌন্দর্যপূর্ণ চেহারা পেয়ে এটি স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যমূলক স্মৃতিস্তম্ভে পরিণত হয়েছিল। এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিসের মতো পারিপার্শ্বিক সমভূমির পাহারাদার অসাধারণ কারুকার্য ও আরবীয় নকশার প্রতিমূর্তি এই দুর্গ-প্রাসাদে নাসরিয়রা এক রাজদরবার তৈরি করেছিল যেটি সাময়িকভাবে উমাইয়া ও আব্বাদিদ শাসিত মুসলিম স্পেনের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিল। শিল্প ও শিক্ষার প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষত উত্তর আফ্রিকা থেকে বহু পণ্ডিতকে আকর্ষণ করে

এনেছিল। বাণিজ্যে, বিশেষত ইতালির সঙ্গে রেশমের বাণিজ্যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে গ্রানাডা পরিণত হয়েছিল স্পেনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরীতে। তাদের শাসনে রাজধানীটি খ্রিস্টান আক্রমণে পালিয়ে আসা মুসলিমদের আশ্রয়স্থল এবং শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ছিল স্পেনীয় ইসলামের অস্তগামী সূর্যের অন্তিম রশ্মি।

● গ্রানাডার শেষের দিনগুলি

একাদশ শতাব্দীতে উমাইয়া খলিফা সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান পুনর্বিজয়ের (রিকনকুইস্তা) অধ্যায় শুরু হয়। স্পেনীয় ঐতিহাসিকেরা ৭১৮ খ্রিস্টাব্দে কোভাডোঙ্গার যুদ্ধকে এই পুনর্বিজয়ের প্রকৃত সূচনা বলে মনে করেন। এই যুদ্ধে অস্টারিয়ান সেনাপতি পেলেয়ো মুসলিমদের অগ্রগতি রোধ করেন। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিমরা যদি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের খ্রিস্টান শক্তির শেষ আশ্রয়স্থলটি ধ্বংস করে দিত তবে পরবর্তী কালে স্পেনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হত। প্রথমদিকে উত্তরের খ্রিস্টান শাসকদের অবিরাম পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বাধাপ্রাপ্ত হবার পর ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও লিঁয়র ঐক্যের মধ্য দিয়ে প্রচার কৌশল যথেষ্ট ত্বরান্বিত হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গ্রানাডা ব্যতিরেকে অন্যান্য জায়গায় পুনর্বিজয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে টলেডোর পতন ঘটল; ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভা ও ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে সেভিলের পতন হল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে মূলত দুটি প্রধান প্রক্রিয়া চালু ছিল। একটি হল খ্রিস্টধর্মে স্পেনের দীক্ষা ও অপরটি হল এর ঐক্যসাধন। স্পেনকে দীক্ষা দেবার কাজটি পুনর্বিজয় ও ঐক্যসাধন থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। দ্বীপটির যে অংশে এক সময় সেমিটিক, কার্থেজিনিয়ান সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, একমাত্র সেই অংশেই ইসলামধর্ম সমাজের গভীরে তার প্রভাব ছড়িয়েছিল। সিসিলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য, এবং এর তাৎপর্যও ছিল বিরাট। প্রাচীন কার্থেজ ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, সাধারণ অর্থে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সেই একই পার্থক্য লক্ষ করা গিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গোটা রাজ্যে অগণিত ছোট ছোট মুসলিম শাসক হয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অথবা চুক্তির মাধ্যমে খ্রিস্টানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের আইন ও ধর্মকে বজায় রাখল। এই সমস্ত মুসলিমদের 'মুদেজার'[৬৪] আখ্যা দেওয়া হল। এদের অনেকেই আরবী ভাষা ভুলে গিয়ে রোমান ভাষা আয়ত্ত করল এবং কম বা বেশি পরিমাণে খ্রিস্টান আচার-আচরণ আত্মস্থ করে নিল।

স্পেনের চূড়ান্ত ঐক্যের দিকে এগিয়ে যাবার গতি ছিল ধীর, কিন্তু নিশ্চিত। এই সময়ে ক্যাস্টিল ও আরাগন রাজত্ব দু'টি নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবাধীন অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরাগনের ফার্দিনান্দ ও ক্যাস্টিলের রাজকুমারী ইসাবেলার বিয়ে এই দুটি রাজ্যকে চিরকালীন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করল। এই ঐক্যের মধ্য দিয়েই স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন ত্বরান্বিত হল। নাসরিয় সুলতানেরা, এই নামেই তাদের ডাকা হত[৬৫] কোন দিক থেকেই ক্রমবর্ধমান বিপদের মোকাবিলা করার উপযুক্ত ছিল না। তাদের শেষ প্রতিনিধিরা রাজবংশের

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে তাদের অবস্থা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। ১২৩২ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে ২১জন সুলতান[৬৫] রাজত্ব করেছিল, তাদের মধ্যে ছ'জন দু'বার করে শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল এবং অষ্টম মুহাম্মাদ আল-মুতামাসসিক নামে এক সুলতান তিনবার রাজ্য শাসনের (১৪১৭-২৭, ১৪২৯-৩২. ১৪৩২-৪৪) সুযোগ পেয়েছিলেন। অর্থাৎ ২৮টি রাজত্বের প্রতিটির গড় মেয়াদ ছিল ন'বছর। উনিশতম সুলতান আলী আবু-আল-হাসান (স্পেনীয় ভাষায় আলবোসেন, ১৪৬১-৮২, ১৮০৩-৮৫)-এর বেপরোয়া স্বভাবের জন্যই মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত হয়। কারণ তিনি শুধু প্রচলিত প্রথানুযায়ী কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন তাই নয়, বরং ক্যাস্টিলিয় অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফার্দিনান্দ ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ আল-হাম্মা[৬৬] দখল করে নিলেন। সিয়েরা দা আলহামার পাদদেশে অবস্থিত এই উষ্ণ প্রস্রবণটি গ্রানাডা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশপথে প্রহরীর ভূমিকা পালন করত। আবু-আল-হাসানের স্ত্রী ফাতিমা[৬৭] তার স্বামীর খ্রিস্টধর্মাবলম্বী এক স্পেনীয়[৬৮] উপপত্নীকে হিংসা করতেন, কারণ তার রাজবংশীয় স্বামী সেই উপপত্নীর সন্তানদেরই অনুগত ছিল। তাই সেই মুহূর্তে মা ফাতিমার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আবু-আল-হাসানের এক ছেলে মুহাম্মাদ আবু-আবদুল্লা তার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়ালেন। দুর্গের সেনাদের সমর্থন পেয়ে সেই বিদ্রোহী ছেলে ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে আলহামরা দখল করলেন এবং নিজেকে গ্রানাডার শাসক বলে ঘোষণা করলেন। রাজবংশের এই এগারোতম মুহাম্মাদের পদবি ছিল আবু-আবদুল্লা। পরের বছরে স্পেনীয় মিথ্যা দম্ভে আক্রান্ত হয়ে তিনি ক্যাস্টিলিয় শহর লুসেনা আক্রমণের দুঃসাহস দেখালেন। সেখানে তাকে প্রচণ্ড প্রহার করা হল ও তিনি যুদ্ধবন্দি হিসেবে গ্রেপ্তার হলেন।

তারপর আবু-আল-হাসান নিজেকে আবার গ্রানাডার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব চালান। তারপর তিনি তার অপেক্ষাকৃত সবল ভাই ও মালাগার গভর্নর[৬৯] আল-জাগাল (সাহসী) ডাকনামধারী দ্বাদশ মুহাম্মাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাদের বন্দি আবু-আবদুল্লা, ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা দুর্ভাগা মুসলিম রাজত্বের চূড়ান্ত ধ্বংস সাধনের উপযোগী এক নিখুঁত উপায় বের করলেন। ক্যাস্টিলিয় রাজ্যের লোকজন ও টাকার সাহায্যে আবু-আবদুল্লা ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে তার জ্ঞাতিভাইয়ের রাজধানীর অংশবিশেষ দখল করে নেন এবং আর একবার হতভাগ্য গ্রানাডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার ফলে একই সময়ে ওই একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে দুটি সুলতানের মধ্যে এক ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধের ছবি লক্ষ করা যায়। আলহামরা নামক স্থানে আবু-আবদুল্লার হাতে বানু-সাররাজ (আবেনসেরেজ)-এর দেশভক্ত অভিজাত পরিবারের ধ্বংস-সংক্রান্ত লোককাহিনী আসলে গ্রানাডার শেষের দিনগুলির পৌরাণিক ইতিহাসের অন্তর্গত ও এই সময়কার সৃষ্টি।

ইতিমধ্যেই ক্যাস্টিলিয় সেনাবাহিনী এগিয়ে চলেছিল। একের পর এক শহর তাদের কাছে নতি স্বীকার করছিল। পরের বছরে মালাগার পতন ঘটল এবং তাদের বহু মানুষকেই ক্রীতদাস

হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হল। দণ্ডপ্রাপ্ত রাজধানীটির চারদিকের অবরোধ আরও ছোট হতে লাগল। ফার্দিনান্দের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আল-জাগাল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফার্দিনান্দের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন আবু-আবদুল্লা। হতাশাগ্রস্ত আল-জাগাল সেই সময়ে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত আফ্রিকার মুসলিম শাসকদের কাছে শেষবারের মতো আবেদন জানালেন, কিন্তু সে আবেদন ব্যর্থ হল। অবশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এবং অবসর জীবন কাটাতে টিলিমসানে চলে গেলেন। সেখানে তার বাকী জীবনটা দুর্দশা ও দারিদ্রে কাটল। শোনা যায় ভিক্ষারত আল-জাগালের কম্বলের ওপর একটি ব্যাজে লেখা ছিল, "ইনি হলেন আন্দালুসিয়ার দুর্ভাগা রাজা।" কেবলমাত্র গ্রানাডা শহরটি মুসলিমদের দখলে রইল।

আল-জাগাল ক্ষমতাচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবু-আবদুল্লার পৃষ্ঠপোষকেরা শহরটি তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য তার কাছে অনুরোধ জানাল (১৮৯০)। একজন সাহসী সেনাপতির অনুপ্রেরণায় দুর্বলচিত্ত আবু-আবদুল্লা সেই অনুরোধ মেনে নিতে রাজি হলেন না। পরের বছরের বসন্তকালে ফার্দিনান্দ ১০,০০০ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে আবার গ্রানাডার সমভূমিতে প্রবেশ করলেন। আগের বছরেই তিনি শস্য ও ফলের বাগান ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং স্পেনে ইসলামের শেষ দুর্গটির চারধারে তার অবরোধকে আরও শক্ত করে তুলেছিলেন। গোটা নগরটিকে এমনভাবে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল যাতে অনাহারে থাকতে থাকতে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

যখন প্রবল ঠাণ্ডা ও তুষারপাত সহযোগে শীত এগিয়ে এল, বাইরের দিক থেকে সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গেল, খাদ্যদ্রব্যের প্রবল অভাব দেখা ছিল, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে লাগল ও দারিদ্র্য দেখা দিল। ইতিমধ্যেই শত্রুসেনারা শহরের প্রাচীরের বাইরে সমস্ত জমি দখল করে নিয়েছিল এবং অবরুদ্ধ নগরীর মানুষজনের পক্ষে শস্য বোনা বা সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে লাগল ..... সফর মাস নাগাদ (ডিসেম্বর ১৪৯১), মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছল।

যদি দু'মাসের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে, সেক্ষেত্রে দুর্গের সেনারা নিম্নলিখিত শর্তের ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হল : (ক) সমস্ত অফিসার ও জনসাধারণ-সহ সুলতান ক্যাস্টিলিয় শাসকের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে, (খ) আবু-আবদুল্লাকে একটি তালুক দেওয়া হবে আল-বাশারাতে (গ) তাদের আইনেও মুসলিমদের দৈহিক নিরাপত্তা ও তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের স্বাধীনতা থাকবে। নির্দিষ্ট মেয়াদ পেরিয়ে যাবার পরেও তুর্কি বা আফ্রিকার মানুষজনের কাছ থেকে অবস্থা বদলানোর কোন ইঙ্গিত না পেয়ে ক্যাস্টিলিয়রা ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি গ্রানাডাতে প্রবেশ করল এবং গ্রানাডার দুর্গের ওপরে তুরস্কের প্রতীকের পরিবর্তে ক্রুশচিহ্ন ঝুলতে লাগল। জমকালো পোশাকে সজ্জিত রানিকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান তার হামরা পরিত্যাগ করলেন এবং তার অনুচরদের সঙ্গে যেতে যেতে পুনরায় ফিরে

আসার কোন সম্ভাবনা না থাকায় তারা রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তার রাজধানীটি শেষবারের মতো দেখতে দেখতে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এতদিন যে মা দুষ্ট গ্রহের মতো তার ওপর কু-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনিই তার বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করলেন—"মানুষের মতো লড়াই করে যে নগরী তুমি রক্ষা করতে পারলে না, তার জন্য মেয়েছেলের মতো চোখের জল ফেলে তুমি ভালই করেছ।" যে পার্বত্য উচ্চভূমি থেকে তিনি তার বিষাদময় বিদায় অভ্যর্থনা নিয়েছিলেন, সেটি এখনও 'এল আলটিমো সাসপিরো ডেল মোরো' বা মুরের শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস নামে পরিচিত।

তাকে দেওয়া তালকের ওপর আবু-আবদুল্লা প্রথমে তার বাড়ি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ফাস-এ চলে যান এবং ১৫৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সেখানেই তিনি মারা যান। আর যে বছরে আল-মাককারি[illegible] তার ইতিহাস রচনা করছিলেন (১৬২৭-২৮) সেই সময়ে তার বংশধরেরা দয়ার পাত্র হিসেবে ভিখারির জীবন কাটাচ্ছিল।

● অত্যাচারিত হওয়ার মানসিকতা

তাদের ক্যাথলিক রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণি ইসাবেলা আত্মসমর্পণের শর্তগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলেন। রানির অপরাধ-শ্রবণকারী খ্রিস্টান পুরোহিত কার্ডিনাল জিমেনেজ দা সিসনেরস[illegible]—এর নেতৃত্বে ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে জোর করে ধর্মান্তরকরণ করানো হয়েছে বলে প্রচার শুরু হল। কার্ডিনাল প্রথমে ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত আরবী বইগুলিকে পুড়িয়ে দিয়ে যেগুলির প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। গ্রানাডা পরিণত হল আরবী পাণ্ডুলিপিগুলির বহ্ন্যুৎসবের কেন্দ্র। গুপ্ত বিভাগ খোলা হল এবং এই ধরনের পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করার কাজে তাদের ব্যস্ত রাখা হল। গ্রানাডা দখলের পরেও যে সমস্ত মুসলিমরা সেখানে রইল তাদের মরিসকো[illegible] বলা হতে লাগল। ইসলামে ধর্মান্তরিত স্পেনীয়দের প্রতি সাধারণভাবে এই পরিভাষা ব্যবহৃত হত। স্পেনীয় মুসলিমরা রোমান ভাষায় কথা বলত, কিন্তু তারা সাধারণত আরবী অক্ষরেই[illegible] লেখালিখি করত। বেশির ভাগ না হলেও অনেক মরিসকো-ই ছিল স্পেনীয় বংশধর, কিন্তু এখন তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হতে লাগল যে তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল খ্রিস্টান। সুতরাং হয় তাদের খ্রিস্টান হতে হবে, নাহলে তার ফলভোগ করতে হবে। মুদেজাররা দলবদ্ধ হল মরিসকোদের সঙ্গে এবং অনেকেই গুপ্ত-মুসলিম সেজে বাইরে খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী বলে ভান করলেও গোপনে ইসলামধর্ম পালন করতে লাগল। অনেকেই খ্রিস্টান প্রথায় বিবাহ করার পরিবর্তে গোপনে মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান মেনে বিয়ে করতে লাগল। অনেকে আবার প্রকাশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি খ্রিস্টান নাম ও ব্যক্তিগতভাবে গোপনে ব্যবহারের জন্য একটি নাম গ্রহণ করল। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে এই মর্মে রাজকীয় আদেশ জারী করা হল যে ক্যাস্টিল ও লিঁয়র সমস্ত মুসলিমরা হয় ধর্মান্তরিত হবে অথবা স্পেন থেকে চলে যাবে। কিন্তু এই আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে আরাগনের মুসলিমরা একই

আদেশের সম্মুখীন হল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ একটি আইন চালু করে মুসলিমদের অবিলম্বে তাদের ভাষা, ধর্ম, প্রতিষ্ঠান ও জীবন-যাপনের পদ্ধতি বাতিল করার আদেশ দিলেন। এমন কী বিধর্মীদের স্মৃতিচিহ্ন স্পেনীয় স্নানাগারগুলিও ধ্বংস করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন। গ্রানাডার বুকে দ্বিতীয় বিদ্রোহ দেখা দিল ও প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে দমন করা হল। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ফিলিপ মুসলিমদের বহিষ্কারের আদেশে স্বাক্ষর করলেন এবং এর ফলে স্পেনের মাটি থেকে সমস্ত মুসলিমদেরই জোর করে নির্বাসিত করা হল। প্রায় ৫ লক্ষ মুসলিম এই দুরবস্থার শিকার হল এবং আফ্রিকার কূলে অথবা আরও দূরবর্তী মুসলিম দেশগুলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। শত্রুপক্ষের জাহাজ ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত মরক্কোর অসামরিক জাহাজের অধ্যক্ষদের মূলত এই মরিসকোস-দের মধ্য থেকেই নিয়োগ করা হতো। গ্রানাডার পতন ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলিমকে নির্বাসিত বা হত্যা করা হয়েছিল। সাধারণভাবে আরব সভ্যতা যেখানেই গড়ে ওঠে সেখানেই তাদের স্থায়ী অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে স্পেনের মাটিতে মুর সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়েছিল। "মুরেরা নির্বাসিত হল; কিছু সময়ের জন্য ধার করা আলোর বাহার নিয়ে স্পেনের বুকে খ্রিস্টধর্মের চাঁদের উদয় হয়েছিল; তারপর হল চন্দ্রগ্রহণ এবং তখন থেকেই স্পেন সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল।"[১০] ❑

● টীকা ●

১ মাররাকুশি, ৫০-৫১ পাতা।

২ নাগরালাহ্, হিব্রুতে স্যামুয়েল বেন-নাগদেলা। ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ২৬১ ও ২৬৪ পাতা।

৩ এই বংশের শেষের আগের জন দ্বিতীয় ইদ্রিসের (১০৪২-৪৬, ১০৫৩-৫৪) পৌত্র ছিলেন বিখ্যাত ভূগোলবিদ আল-শারিফ আল-ইদ্রিসি।

৪ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ২৬২-৬৬ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৬০-৬১ পাতা।

৫ ই. লেভি-প্রভেনকাল, ইনস্ক্রিপশনস আরাবেশ দা এসপানে (লিডেন, ১৯৩১), ৬৫-৬৬ পাতা।

৬ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৮৮ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড ১৬১ পাতা; ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ২৭৬-৮৫ পাতা; ইবন-আল-আসির, ৯ম খণ্ড, ২০৩ পাতা।

৭ ইবন-ইয্হারি, ৩য় খণ্ড, ২২১-২৯ পাতা; ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৩-৬৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ২০৪ পাতা।

৮ এই সমস্ত ছোট ছোট রাজবংশের শাসকদের নাম ও শাসনকালের জন্য লেন-পুল-এর ডাইনাস্টিজ, ২৩-২৬ পাতা; দা জামবাউর, ৫৩-৫৭ পাতা; ডোজি-র মুসলমানস, সম্পাদনা : লেভি-প্রভেনকাল, ৩য় খণ্ড, ২৩৬-৪১ পাতা দ্রষ্টব্য।

৯ উপরে দেখুন, ৫০২ পাতা। সেভিল-কে প্রায়ই 'হিমস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন-জুবাইর, ২৫৮-৫৯ পাতা।

১০ ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৬ পাতা; ইবন আল আসীর, ৯ম খণ্ড, ২০১-০২ পাতা; ইবন আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৩ পাতা।

১১ একই নামের আব্বাসি খলিফার নাম অনুযায়ী; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৩২ পাতা।

১২ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪১২ পাতা; সি এফ ইবন-আল-খাতীব, ইহ্তাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৭ পাতা।

১৩ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪১৪ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৯২ পাতা।

১৪ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড ৪১২ পাতা; আল-ফাতহ ইবন-খাকান-এর প্রশস্তি, কালাইদ আল-ইকয়ান (বুলাক, ১২৮৩), ৪-৫ পাতা।

১৫ মাররাকুশি, ৭৭, ৮৫-৯০ পাতা।

১৬ ডোজি, স্ক্রিপটোরাম অ্যারাবাম অফ দা আব্বাদিদিস, ২য় খণ্ড, (লিডেন, ১৮৫২), ১৫১-৫২ পাতা, ৩য় খণ্ড, (লিডেন, ১৮৬৩) ২২৫ পাতা।

১৭ ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৪ পাতা। তার প্রথম মালিক রুমাইক-এর থেকেই সে তার পদবিটি পেয়েছিল।

১৮ ডোজি, স্ক্রিপটোরাম, ২য় খণ্ড, ১৫২-৫৩ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ২৮৭ পাতা।

১৯ আমন্ত্রণপত্রের জন্য মাক্কারি, ২য় খণ্ড ৬৭৪ পাতা দেখুন।

২০ মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৬৭৮ পাতা; ডোজি, স্ক্রিপটোরাম, ২য় খণ্ড, ৮ পাতা; কোরান ২ : ১৬৮।

২১ স্যাক্রালিয়াস, আধুনিক স্যাগরাজাস, মারাকুশি, ৯৩-৯৪ পাতা দেখুন। ইবন-খালদুন, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৮৬-৮৭ পাতা দেখুন। অনুবাদ : দা স্লেন, বারবারেস, ২য় খণ্ড, ৭৮-৭৯ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪১৫ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ১০১-০২ পাতা; ইবন-আবি-জার, রাওয-আল-কিরতাস, ১ম খণ্ড, ৯৩ ও পরের পাতা।

২২ ইবন-আল-খাতীব, আল-হুলাল আল-মসিহা ফী যিকর আল-আখবার আল-মাররাকুশিয়া (তিউনিস, ১৩২৯), ৪৩ পাতা, তার হিসাব অনুযায়ী নির্যাতিত খ্রিস্টানের সংখ্যা ৩০০,০০০।

২৩ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪১৯ পাতা; ইবন-খাকান, ২৫ পাতা; ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ২য় খণ্ড, ৮৩ পাতা; ডোজি, স্ক্রিপটোরাম, ১ম খণ্ড, ৬৩-৬৪ পাতা, ২য় খণ্ড, ১৫১ পাতা।

২৪ ডোজি, স্ক্রিপটোরাম, ১ম খণ্ড, ৩৮৩ পাতা।

২৫ ফরাসি ভাষায়, মারাবাউট ভক্ত 'ভক্ত' শব্দটির বিকৃত রূপ।

২৬ ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৪২৮-২৯ পাতা; ইবন-আল খাতিব, হুলাল, ১০ পাতা।

২৭ মরক্কোর ডালিম অঞ্চলের বার্বার উপজাতি নিজেদের আল-মুরাবিতের বংশধর বলে দাবি করে।

২৮ ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ৭৫-৮৭ পাতা; ইবন-খালদুন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮১-৮২ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ৯ম খণ্ড, ৪২৫-২৭ পাতা।

২৯ ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ৮৮-৮৯ পাতা; ইবন খালদুন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৪ পাতা, ডি স্লেন, ২য় খণ্ড, ৭৩ পাতা।

৩০ ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ৮৮ ও ৯৬ পাতা; ইবন খালদুন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৮ পাতা।

৩১ মাররাকুশি, ৬৪ পাতা।

৩২ একই বই, ১২৩ পাতা; ইহ্‌য়া, ১ম খণ্ড ২৮-৩৮ পাতা দেখুন।

৩৩ ইবন-খালদুন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৭ পাতা।

৩৪ সিফাত আল-মাগরিব, সম্পাদনা : ডোজি. ও ডি গোজে (লিডেন, ১৮৬৬), ২০৫ পাতা।

৩৫ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ৫০ পাতা।

৩৬ আরবী ভাষায় দুই প্রধান কর্তাব্যক্তিকে কুমিস (ল্যাটিনে, কোমেস; স্পেনীয়-তে, কোন্‌ডে) ও কাযী-আল-নাসারা (খ্রিস্টানদের বিচারক) বলা হত।

৩৭ তাদের কয়েকটি লেখার জন্য অ্যাঞ্জোল গনজালেজ প্যালেনসিয়া-র লস মোজারেবস দা টলেডো এন লস সিগলোস ১২ ওয়াই ১৩, ৪ খণ্ড (মাদ্রিদ, ১৯২৬-৩০)।

৩৮ ওপরে দেখুন, ৫১৬ পাতা।

৩৯ জর্জ গ্রাফ, ডাই খ্রিস্টালিক-অ্যারাবিসে লিটারেটার বিস জুর ফ্রাঙ্কিসেন জিট (ব্রিসগাউ-এর ফ্রাইবুর্গ, ১৯০৫), ২৭ পাতা।

৪০ জুলিএন রিবেরা ওয়াই টেরাগো, ডিসারটাসনেস ওয়াই ওপাসকুলোপ (মাদ্রিদ, ১৯২৮), ১ম খণ্ড, ১২৩-৩৫, ১০৯-১২ পাতা।

৪১ আরবী ভাষায় সায়্যিদ থেকে কথ্যভাষায় সিদ, অর্থাৎ প্রভু।

৪২ আরবীশব্দ মুবারিজ-এর স্পেনীয় প্রতিশব্দ। অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৮৮ ও ১৭৩ পাতা।

আল-কানবিতুর শব্দের আরবী শব্দ ক্যামপেডর; ইবন-বাসাম, ডোজি-র রিচার্চেস-এ "আল-যাখিরা", ২য় খণ্ড ৬ ও ১০ পাতা; ইবন-ইয্‌হারির বইতে আল-কানবিতুর, ৩য় খণ্ড, ৩০৫-০৬ পাতা (ক্রোড়পত্র)। সিএফ মাক্‌কারি, ২য় খণ্ড, ৭৫৪ পাতা।

৪৩

তাশফিন
|
১. ইউসুফ (১০৯০-১১০৬)
|
২. আলী (১১০৬-৪৩)
|
৩. তাশফিন (১১৪৩-৪৬) — ৫. ইসহাক (১১৪৬-৪৭)
|
৪. ইবরাহিম (১১৪৬)

৪৪ ইবন-খালদূন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পাতা; ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৪০০ পাতা। সিএফ মাররাকুশি, ১২৮ পাতা; ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ১১০ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪২৬ পাতা।

৪৫ ইবন-আল-খাতীব, হুলাল, ৭৮ পাতা; কিতাব মুহাম্মাদ ইবন-তুমারত, সম্পাদনা : আই. গোল্ডজিহার (আলজিয়ার্স, ১৯০৩), ২-৩ পাতা।

৪৬ একেশ্বরবাদী শব্দটির স্পেনীয় বিকৃত রূপ আলমোহাদেস

৪৭ ইবন-খালদূন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পাতা। সিএফ. ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৪৩১ পাতা।

৪৮ মাররাকুশি, ১৪৫-৪৬ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৫৫৭ পাতা; ইবন-আবি-দিনার, আল-মুনিস ফী আখবর ইফরিকিয়া ওয়া তিউনিস (তিউনিস, ১২৮৬), ১২০ পাতা।

৪৯ ইবন-আল-আসীর, ১০ম খণ্ড, ৪১২-১৩ পাতা।

৫০ এক মুয়াহ্হিদ খুতবা-র জন্য মাররাকুশি, ২৫০-৫১ পাতা দেখুন।

৫১ মাররাকুশি, ১৮৯ পাতা; ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ১৪২ পাতা; ইবন-আবি-দিনার, ১১৬-১৭ পাতা।

৫২ ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ৩৮১ পাতা; ইবন-খালদূন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৬ পাতা।

৫৩ মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৬৯৩ পাতা।

৫৪ ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ৩৭৯ পাতা।

৫৫ ২০৯ পাতা।

৫৬ তার অন্যান্য প্রাসাদগুলির জন্য ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ১৪৩ ও ১৫১-৫২ পাতা দেখুন।

৫৭ মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৬৯৬ পাতা। সিএফ মাররাকুশি, ২৩৬ পাতা; ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পাতা। একজন সমসাময়িক ইংরেজ উপাখ্যান-রচয়িতা দাবি করেন যে আল-নাসির ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাগনাকার্টার খ্যাতিসম্পন্ন ও কিউর দা লায়ন-এর ভাই রাজা জনের কাছ থেকে আগত এক প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধিটি তাকে করদ রাজ্য হিসেবে ইংল্যাণ্ডকে ভেট দিতে চেয়েছিলেন এবং বিনিময়ে ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে তাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বলেছিলেন।

৫৮ তালিকার জন্য আল-জারকাশির তারিখ আল-দাওলাতায়েন আল-মুওয়াহ্হিদিয়া ওয়াল-হাফসিয়া (তিউনিস, ১২৮৯) দেখুন; লেন-পুল, ডাইন্যাস্টিজ, ৪৭-৪৮ পাতা; দা জামবাউর, ৭৩, ৭৪ পাতা।

৫৯ ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ১৭৪-৭৫, ১৮৪ পাতা।

৬০ ৪র্থ খণ্ড, ১৭০-৭২ পাতা। ইবন-আল-খাতীবের লামহা, ৩০ ও পরের পাতা দেখুন।

৬১ সিএফ ইবন-আল-খাতীব, ইহাতাহ্, ১ম খণ্ড, ১৩ পাতা।

৬২ মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ১০৯ ও ৭২১ পাতা। সিএফ. ইবন-জুবাইর, ১৬-১৭ পাতা। ওপরে দেখুন, ৫০২ পাতা।

৬৩ ইবন-আল-খাতীব, লামহা, ১৩ পাতা; ওপরে দেখুন, ২৩১ পাতা।

৬৪ আরবী মুদাজ্জন শব্দের অর্থ (খ্রিস্টান বিজয়ী শাসকের দ্বারা) কর দেবার শর্তে একজনকে স্থিতাবস্থায় থাকতে দেওয়া।

৬৫ ইবন-খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, ১৭২ পাতা।

৬৬ তালিকার জন্য লেন-পুলের ডাইনাস্টিজ, ২৮-২৯ পাতা; জামবাউর, ৫৮-৫৯ পাতা দেখুন।

৬৭ স্পেনীয় শব্দ আলহামা, আরবী শব্দ 'উষ্ণ প্রস্রবণ' অর্থে ব্যবহৃত। মাক্কারি-র ২য় খণ্ড, ৮০১ পাতায় আলহাম্মা।

৬৮ 'আইশা' নয়; এল এস ডি লুসেনা, আল-আন্দালুস, ১২শ খণ্ড, (১৯৪৭), ৩৫৯ ও পরের পাতা।

৬৯ রুমিয়া, মাক্কারির ২য় খণ্ড, ৮০৩ পাতায়।

৭০ শেষ নাসরিদদের বংশতালিকা :

১৮. সাআদ আল-মুসতাইন (১৪৪৫-৪৬, ১৪৫৩-৬১)

১৯. আলী আবু-আল-হাসান (১৪৬১-৮২, ১৪৮৩-৮৫)

২০. দ্বাদশ মুহাম্মাদ আল-জাগাল (১৪৮৫-৮৬)

২১. একাদশ মুহাম্মাদ আবু-আবদুল্লা (১৪৮২-৮৩, ১৪৮৬-৯২)

৭১ মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৮১০ পাতা।

৭২ একই বই, ৮১১ পাতা।

৭৩ স্পেনীয় শব্দ আলপুজাররাস। শব্দটির অর্থ 'তৃণক্ষেত্র', সিয়েরা নেভাদার দক্ষিণ থেকে দূরবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য সমভূমি যার অন্তর্ভুক্ত।

৭৪ সি এফ, আখবার আল-আসার ফী ইনকিদা দাওলাত বানি নসর, সম্পাদনা : এম জে মূলার (মিউনিখ, ১৮৬৩), ৪৯ পাতা।

৭৫ লোককাহিনী অনুযায়ী, ওই বছরেই নাকি আলহামব্রা-তে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক অভিযানের জন্য ক্রিস্টোফার কলম্বাস রানি ইসাবেলার কাছে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানান। এই অভিযানের ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়।

৭৬ ২য় খণ্ড, ৮১৪-১৫ পাতা।

৭৭ তার মহান অবদান হল বহুভাষিক ছাপানোর কাজ (১৫০২-১৭)। তিনিই প্রথম বাইবেলের মূল পাঠের সঙ্গে অনুবাদ মুদ্রিত করেছিলেন।

৭৮ 'ছোট মুর'দের বোঝাতে স্পেনীয় প্রতিশব্দ। পশ্চিম আফ্রিকার মরিটানিয়া ও তার অধিবাসীদের রোমানরা বলত মাউরি (সম্ভবত ফিনিশিয় শব্দ যার অর্থ 'পশ্চিমি'), এর থেকেই স্পেনীয় মোরো, ইংরেজি মুর শব্দের উৎপত্তি। সেই অর্থে বার্বারদের-ই মুর বলা উচিত। কিন্তু স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সমস্ত মুসলিম সম্পর্কেই ওই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফিলিপাইনের ৫ লক্ষ মুসলিমকে এখনও মোরো বলা হয়। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ম্যাজেলান এই দ্বীপটি আবিষ্কারের পর থেকে স্পেনীয়রা তাদের এই নামে ডাকতে শুরু করেছিল।

৭৯ মরিসকোদের সাহিত্য বৈচিত্র্যময় ও ভাষার দিক থেকে আকর্ষণীয়। আরবী শব্দ আল-জামিয়া থেকে এর নাম দেওয়া হয়েছিল আলজামিয়াডো। আরাগনের একটি পুরানো বাড়ির মেঝের তলায় এই ধরনের কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। গুপ্তচরদের চোখের আড়ালে রাখার জন্য এভাবে রাখা হয়েছিল। এগুলি হল ম্যানাসক্রিটোস ড্রেবস ওয়াই অ্যালজামিয়াডোস ডেলা বিবলিওটেকা ডেল্য জুন্টা, সম্পাদনা : জে রিবেরা, ও এম অসিন (মাদ্রিদ, ১৯১২)। এ আর নাইকলের এ কমপেনডিয়াম অফ আলজামিয়াডো লিটারেচার (প্যারিস, ১৯২৮)।

৮০ লেন-পুল, মুরস ইন স্পেন, ২৮০ পাতা।

॥ অধ্যায় ৪০ ॥

বৌদ্ধিক অবদান

মধ্যযুগে ইউরোপের বৌদ্ধিক ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়গুলির স্রষ্টা ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাকালের মধ্যবর্তী সময়ে আরবী ভাষী মানুষজনেরাই ছিল সারা বিশ্বে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার প্রধান মশালবাহক। তাদের মাধ্যমেই প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শনের পুনরুদ্ধার, নয়া সংযোজন ও সম্প্রচার ঘটেছিল এবং তার ফলেই পশ্চিম ইউরোপে নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল। আর এই সমস্ত ব্যাপারেই আরবীভাষী স্পেনের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।

● ভাষা ও সাহিত্য

ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অভিধান রচনা-সহ বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-আন্দালুসের আরবেরা আল-ইরাকের আরবদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম খ্যাতনামা অধ্যাপক আল-কালি (৯০১-৬৭ খ্রিঃ) উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি আর্মেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাগদাদে তার শিক্ষাজীবন কেটেছিল। তার প্রধান শিষ্য মুহাম্মাদ ইবন-আল-হাসান আল-জুবাইদি[১] (৯২৮-৮৯ খ্রিঃ) ছিলেন হিমস্-এর এক পরিবারের সন্তান, কিন্তু তিনি নিজে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল-হাকাম তার কিশোর পুত্র হিশামের শিক্ষক হিসেবে আল-জুবাইদিকে নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হিশাম তাকে কাযি এবং সেভিলের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করেছিলেন। তার সময়কাল পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাকরণবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের তালিকা রচনা করাটাই ছিল আল-জুবাইদির প্রধান কাজ। আল-সুয়ুতি তার মুজহির রচনার ক্ষেত্রে আল-জুবাইদির বইটির অনেক তথ্য ব্যবহার করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আরবী ব্যাকরণকে ভিত্তি রূপে ব্যবহার করেই হিব্রু ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে (ইংরেজি সংস্করণের ওপরে, ৪৩ পাতা, টীকা ১) এবং এখনও পর্যন্ত হিব্রু ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দগুলি আরবী ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ রূপেই ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানসম্মত হিব্রু ব্যাকরণের জনক হায়্যুজ জুদা বেন-ডেভিড (আরবীতে, আবু-জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবন-দাউদ)-এর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল কর্ডোভা-তে এবং এখানেই একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি মারা যান।

সাহিত্যের জগতে সবচেয়ে খ্যাতনামা লেখক ছিলেন কর্ডোভার অধিবাসী ইবন-আবদ-রাব্বিহ্ (৮৬০-৯৪০ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের[২] রাজকবি। প্রথম হিশামের মুক্তিপ্রাপ্ত এক ক্রীতদাসের বংশধর ছিলেন ইবন-আবদ-রাব্বিহ্। আল-ইকদ আল-ফরীদ (সুন্দর নেকলেস)[৩] নামে যে সংকলনটি তিনি করেছিলেন, তার থেকেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আরবদের সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনার ক্ষেত্রে আল-আগানির পর এটিই শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। কিন্তু স্পেনীয় ইসলামের সবার সেরা পণ্ডিত ও মৌলিক চিন্তানায়ক ছিলেন আলী ইবন-হাজম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রিঃ)। ইসলামের দু-তিনজন চিন্তাশীল মনীষী ও সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ইবন-হাজম নিজেকে একজন সম্ভ্রান্ত পারসি ব্যক্তির বংশধর বলে দাবি করলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান থেকে মুসলিম ধর্মান্তরিত এক স্পেনীয়ের নাতি। যৌবনে তিনি আবদ-আল-রহমান আল-মুস্তাজহির ও হিশাম আল-মুতায[৪]-এর পতনোন্মুখ রাজদরবারে উজিরের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। কিন্তু উমাইয়া খলিফা সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের সম্ভাবনা লক্ষ করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং নির্জনে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, হাদীস, তর্কবিদ্যা, কাব্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে তার চারশোটি লেখা আছে বলে ইবন-খাল্লিকান[৫] ও আল-কিফতি[৬] দাবি করেন। দীর্ঘদিন আগে বিলুপ্ত জাহিরীয় (আক্ষরিকতাবাদী) বিচারশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তা রূপে এবং সাহিত্য কর্মে তিনি ছিলেন সদাতৎপর ও উদ্যমী ব্যক্তি। তার রচিত তাওক আল-হামামা[৭] (কবুতরের নেকলেস) নামে প্রেমের কাব্য-সংকলনে তিনি কাল্পনিক ভালবাসার জয়গান গেয়েছেন। অবশ্য তার বিদ্যমান বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল-ফাস্ল ফী আল-মিলাল অ-আল-আহ্ওয়া অ-আল-নিহাল[৮] (সম্প্রদায়, উদার ধর্মমত ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে অমোঘ বক্তব্য)। এই বইটিই তাকে তুলনামূলক ধর্মের ক্ষেত্রে প্রথম পণ্ডিতের সম্মান এনে দেয়। এই রচনায় তিনি বাইবেল-সংক্রান্ত বর্ণনার অসুবিধাগুলি উল্লেখ করেন। ষোড়শ শতকে আরও উন্নত সমালোচনার আগে তার বক্তব্য নিয়ে কারো মনে কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি।

সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছোট ছোট রাজাদের বিশেষত আব্বাসীয় মুরাবিয় ও মুয়াহ্হিদদের শাসনকাল ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উমাইয়া আমলে সংস্কৃতির যে বীজ বোনা হয়েছিল, তার আগে পর্যন্ত তা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। গৃহযুদ্ধের ফলে উমাইয়া শাসনের অবলুপ্তি ঘটল এবং পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন রাজবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে সেভিল, টলেডো ও গ্রানাডার মতো কেন্দ্রগুলি কর্ডোভার খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছিল। কর্ডোভার যে সমস্ত খ্রিস্টানরা আরবীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ মোজারাবরা আরবী সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, তারাই উত্তর ও দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে আরবী সংস্কৃতির বহু জিনিসের প্রচার করেছিল। ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের গদ্য সাহিত্যে পৌরাণিক কাহিনী, গল্প ও নীতিকাহিনীর বিকাশ ঘটেছিল। যেগুলির মাথে প্রথম দিককার ইন্দো-পারসীয় উৎস থেকে উদ্ভূত আরবীয় সাহিত্যগুলির সাথে অভূতপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ করা গিয়েছিল। ক্যাস্টিল ও লিঁয়-র রাজা অ্যালফোনসো দি ওয়াইজ (১২৫২-৮৪ খ্রিঃ)-এর জন্য স্পেনীয় ভাষায় কালিলা

ওয়া-দিমনার আনন্দদায়ক গল্পগুলি অনূদিত হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই এক ধর্মান্তরিত ইহুদি সেই কাহিনীগুলিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কাহিনীগুলি পারসীয় অনুবাদ থেকে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হবার ফলে সেগুলি লা ফনটেনের কাহিনীগুলির অন্যতম উৎসে পরিণত হয়েছিল বলে তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। সমস্ত রকমের ভাষাতাত্ত্বিক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ ও গদ্যকাব্যের ছন্দে রচিত এবং এক অশ্বারোহী বীরের দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মাকামা-র সঙ্গে স্পেনের জুয়াচোর, ভবঘুরেদের জীবনীমূলক উপন্যাসের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের গঠন প্রকৃতির ক্ষেত্রেই আরবেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। আর এর ফলে প্রচলিত প্রথার নিগড়ে সংকীর্ণ ও অনড় নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা আবদ্ধ পশ্চিমি মননশক্তি মুক্তিলাভ করেছিল। কিন্তু আরবদের আদর্শ অনুসরণ না করেই স্পেনীয় সাহিত্য বরং উদ্ভট কল্পনাশক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। সারভান্টাসের ডন কুইকজোটের কৌতুক একই ভূমিকা পালন করেছিল। বইটির রচয়িতা এক সময় আলজিয়ার্সের জেলে বন্দি ছিলেন এবং কৌতুকের সঙ্গে দাবি করেছিলেন যে, বইটি আসলে আরবী উৎস থেকেই সংকলিত করা হয়েছে।

● কাব্য

যেখানে যখনই আরবী ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা গেছে সেখানেই কাব্য রচনার একটা গভীর আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। মুখে মুখে প্রচলিত অসংখ্য কবিতা তাদের বিষয়বস্তুর জন্য না হলেও সুর ও সুন্দর শব্দ নির্বাচনের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই সমাদর পেয়েছিল। শব্দের সৌন্দর্য ও মধুর উচ্চারণ ধ্বনিতে আনন্দ অনুভব করা ছিল আরবীভাষী মানুষদের একটি বৈশিষ্ট্য এবং স্পেনের মাটিতেও তার প্রকাশ ঘটেছিল। প্রথম উমাইয়া শাসক ও তার বেশ কয়েকজন উত্তরসূরি ছিলেন কবি। ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে আল-মুতামিদ ইবন-আব্বাদ কাব্য বা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেশির ভাগ সম্রাটের রাজদরবারেই রাজকবিরা যুক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধ ও ভ্রমণের সময়ে সম্রাটেরা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সর্বাধিক সংখ্যক সুন্দর ও অনুপ্রাণিত কবি তাদের রাজদরবারে আছে বলে সেভিল গর্ববোধ করত। কিন্তু তার বহু আগেই কর্ডোভাতে কাব্য প্রতিভার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল এবং যতদিন গ্রানাডা ছিল ইসলামের একটি শক্তিশালী দুর্গ, ততদিন সেই অগ্নিশিখা সেখানে দীপ্যমান ছিল।

ইবন-আবদ-রাব্বিহ্, ইবন-হাজম্ ও ইবন-আল-খাতীব ছাড়াও স্পেনের মাটিতে আরও কয়েকজন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল যাদের রচনাগুলিকে এখনও উন্নত মানের বলে গণ্য করা হয়। এমনই একজন কবি হলেন আবু আল ওয়ালীদ আহমদ ইবন জায়দুন (১০০৩-৭১ খ্রিঃ)। কেউ কেউ তাকে আল-আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য করে থাকেন। 'কুরায়শ'-এর একটি শাখা মাখজুম-এর অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন ইবন-জায়দুন। তিনি প্রথম জীবনে কর্ডোভার রাজতন্ত্রের প্রধান ইবন জাহওয়ার-এর একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফা

আল-মুস্তাকফির মেয়ে ও মহিলা কবি ওয়াল্লাদার প্রতি তার গভীর ভালবাসার জন্য সম্ভবত তিনি সেই মর্যাদার আসন থেকে পদচ্যুত হন। জেল ও নির্বাসনে বহু বছর কাটানোর পরে আল-মুতাযিদ আল-আব্বাদি তাকে একই সঙ্গে প্রধান উজির ও সেনাবাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। এবং তাকে যু-আল-বিজারাতাইন[১০] অর্থাৎ অসি ও মসী বিভাগের প্রধান উপাধি দান করেন। তার পরামর্শে-ই আল-মুতামিদ ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান করেন এবং জাহ্ওয়ারিদদের হাত থেকে রাজ্যটি ছিনিয়ে নেন। আল-মুতামিদের রাজদরবার সাময়িকভাবে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেখানে ইবন-জায়দুনের প্রতিভা ইবন-আম্মার নামে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ও মন্ত্রীর মনে হিংসা জাগিয়ে তুলেছিল। ইবন-আম্মারের বংশপরিচয় সঠিকভাবে জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে, প্রথমদিকে তিনি যাযাবরের জীবন যাপন করতেন এবং যে কেউ তাকে পুরস্কার দিত তার প্রশস্তিতেই তিনি গান রচনা করতেন। সেভিলে ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে[১১] তার পৃষ্ঠপোষক আল-মুতামিদের হাতেই ইবন-আম্মারের মৃত্যু ঘটে। মার্জিত রুচির কবি ইবন-জায়দুন ছিলেন একজন বিখ্যাত পত্র-লেখক। ব্যাপকভাবে পঠিত তার চিঠিগুলির অন্যতম হল সেই চিঠিটি, যাতে তিনি ইবন-জাহ্ওয়ারের মন্ত্রী ও ওয়াল্লাদার অভিলাষী, তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক ইবন-আবদুসকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছিলেন। ওয়াল্লাদার উদ্দেশে রচিত ইবন-জায়দুনের[১২] বহু কবিতাতেই আল-জাহরা ও তার বাগানগুলির সৌন্দর্যের উজ্জ্বল চিত্র এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। স্পেনীয় আরবী কবিতার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী ওয়াল্লাদা (মৃ. ১০৮৭) তার মনোরম ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য ক্ষমতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। স্পেনের মাটিতে আরব মহিলাদের মধ্যে কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও সহজাত প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। আর ওয়াল্লাদাকে বলা হত স্পেনের স্যাফো। আল-মাক্কারি[১৩] তার বইয়ের একটি গোটা অধ্যায় জুড়ে আল-আন্দালুসের মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে, "বাগ্মিতা ছিল এদের দ্বিতীয় সহজাত প্রতিভা।" কর্ডোভায় ওয়াল্লাদার বাড়িটি ছিল কবি, পণ্ডিত ও রসিক ব্যক্তিদের মিলনস্থল।[১৪]

তুলনামূলকভাবে কম খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাধরদের মধ্যে আবু-ইসহাক ইবন-খাফাজার[১৫] (মৃ. ১১৩৯) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণে একটি ছোট গ্রামে তিনি বাস করতেন। কিন্তু তার সময়কার ছোট ছোট রাজাদের প্রতি এবং সেভিলের যুবক ও লম্পট কবি মুহাম্মাদ ইবন-হানির (৯৩৭-৭৩) প্রতি তিনি সম্মান দেখানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। ফাতিমিয় খলিফা আল-মুইজের[১৬] প্রশস্তিপূর্ণ অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। ইবন-হানি গ্রিক দার্শনিকদের মতবাদের[১৭] দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে মনে করা হত।

● মুওয়াশশাহ্

প্রচলিত নিয়মের বন্ধন থেকে কিছুটা পরিমাণে মুক্ত হয়ে স্পেনীয় আরবী কবিতা নতুন ছন্দোবদ্ধ আকার গড়ে তুলল এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি প্রায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল।

পল্লীগীতি ও ভালবাসার গানের মধ্য দিয়ে এক কোমল রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল যা ছিল মধ্যযুগীয় বীরত্বের পূর্বগামী। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে মুওয়াশশাহ[১৮] ও জাজল নামে এক ধরনের গীতি কবিতার জন্ম হয়েছিল আন্দালুসে। উভয় গীতিকবিতাই সমবেত গানের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গীত ধারার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল এবং সেগুলি সমবেত ভাবেই গাওয়া হত। সুর ও সঙ্গীতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং সর্বক্ষেত্রে তারা কাব্যের সঙ্গে একটা ঐক্য বজায় রেখে চলত।

কর্ডোভার যাযাবর চারণকবি আবু-বকর ইবন-কুজমান (মৃ. ১১৬০ খ্রিঃ) শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়ে মহান ব্যক্তিদের প্রশস্তিপূর্ণ গান গেয়ে বেড়াতেন। তখনও পর্যন্ত তাৎক্ষণিক সঙ্গীত-রচয়িতাদের হাতে পড়ে থাকা, জাজল-কে তিনি সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন আঙ্গিকের মর্যাদায়[১৯] উন্নীত করেছিলেন। মুওয়াশশাহ্ নামে লোকসঙ্গীতের অন্য ধারাটির শুধু উন্নতিই ঘটেনি, এমন কী তা জন্মলাভও করেছিল স্পেনে এবং সেখান থেকে তা উত্তর আফ্রিকা ও প্রাচ্যের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট মুওয়াশশাহ্ রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টুডেলা-র অন্ধ কবি আবু-আল-আব্বাস[২০] আল-তিউতিলি। ইউসুফ ইবন-তাশফিনের পুত্র ও উত্তরসূরি আলীর গৌরবগাথা গাইবার পর তিনি ১১২৯ খ্রিস্টাব্দে তার যৌবনকালেই মারা যান। ইহুদিধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সেভিলের এক অধিবাসী ইব্রাহিম ইবন-সাহল[২১] (মৃ. ১২৫১ বা ১২৬০) ছিলেন এই ধারার আর এক বিশিষ্ট কবি। কিন্তু মদের প্রতি তার চিরাচরিত আসক্তির ফলে তার ইসলামধর্মে বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। এছাড়া মুওয়াশশাহ্ রচয়িতাদের অপর বিশিষ্ট কবি মুহাম্মাদ ইবন-ইউসুফ আবু-হায়্যানি (১২৫৬-১৩৪৪) ছিলেন বার্বার সম্প্রদায়ের এক বহুভাষিক ব্যক্তি ও গ্রানাডার অধিবাসী। তিনি পারসি, তুর্কি[২২] মিশরিয় খ্রিস্টানদের ভাষা ও ইথিওপিয়া ভাষায় ব্যাকরণ[২৩] রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র তুর্কি ভাষার ব্যাকরণটি অক্ষত রয়েছে।

সাধারণভাবে আরবী কবিতা ও বিশেষভাবে এই গীতিকবিতা দেশীয় খ্রিস্টানদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল এবং আত্মস্থ হবার কার্যকর উপাদানে পরিণত হয়েছিল। জাজল ও মুওয়াশশাহ্ নামে এই দু'ধরনের গীতিকবিতা ভিল্যানসিকোর ক্যাস্টিলিয় জনপ্রিয় কবিতার রূপ গ্রহণ করেছিল। এই ভিল্যানসিকো বড়দিনের ভজনগীত-সহ খ্রিস্টানদের প্রার্থনায় ব্যবহৃত হত। এই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার শেষের ছয় চরণ সাধারণত সিডিই, সিডিই ইত্যাদি ছন্দে উচ্চারিত হত এবং আন্দালুসিয় কবিদের রচনাবলিতে বিশেষত আরবী জাজলে-ই তা লক্ষ করা যায়। আল-কাজবিনি[২৪] (মৃ. ১২৮৩) জোর দিয়েই বলেছেন যে দক্ষিণ পর্তুগালের শিলব (সিলভেস)-এ এমন কী কৃষকেরাও পরিস্থিতি অনুযায়ী কবিতা রচনা করতে পারত। এর থেকে আধুনিক লেবাননের কাওয়ালান-দের কথা মনে পড়ে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধরনের লোকসঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারত এবং যে লোকসঙ্গীতের অনেকগুলিকেই তারা এখনও জাজল ও মুওয়াশশাহ বলে থাকে।

অষ্টম শতাব্দীতে স্পেনীয় ভাষায় দেহাতীত ভালবাসাকে কেন্দ্র করে যে সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তাকে আরবীয় কাব্যেরই একটি বিশেষ অবদান বলা যেতে পারে। দক্ষিণ ফ্রান্সে একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম প্রভাঁস-প্রদেশের কবিদের আবির্ভাব ঘটে। তারা সুন্দর কল্পনাশক্তির সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের কম্পিত ভালবাসার অনুভূতিকে প্রকাশ করতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের প্রভাঁস প্রদেশে প্রেমমূলক গীতিকবিদের[৭৭] আবির্ভাব ঘটে। তারা তাদের সমসাময়িক দক্ষিণ প্রদেশের জাজল-গায়কদের অনুকরণ করেছিলেন। আরবের নজির অনুকরণ করে হঠাৎই দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে দেবী-মহিমা চর্চার উদ্ভব ঘটল। প্রথম দিককার ইউরোপীয় সাহিত্যের মহত্তম স্তম্ভ সেন দা রোলা-র সৃষ্টি হয়েছিল ১০৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে এবং এর মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপে একটি নতুন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। ঠিক যেমন ভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্পেনের সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ ও হোমারের কবিতার মধ্য দিয়ে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, পশ্চিম ইউরোপে অনেকটা সেই একই প্রক্রিয়ায় নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

● শিক্ষা

অন্যান্য সমস্ত মুসলিম দেশের মতো এখানেও আরবী ব্যাকরণ ও কবিতা এবং কোরান পড়া ও লেখার ওপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে উঠেছিল। যদিও শিক্ষার বিষয়টি ছিল মূলত একটি বেসরকারি উদ্যোগ, তবুও শিক্ষা এতটা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে স্পেনীয় মুসলিমদের একটি বড় অংশ পড়তে ও লিখতে পারত[৭৮]—সে যুগে ইউরোপে এই অবস্থা ছিল প্রায় অজানা। ইসলামি দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের কার্যাবলিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষার জগতে মেয়েদের অবস্থাও ছিল অন্যরকম। আন্দালুসিয়াতে মেয়েদের লিখতে শেখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা খুব কমই মানা হত। শুধু আল-মাক্কারির[৭৯] লেখাতেই যে এ অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে তা নয়, বরং সাহিত্যিক ইতিহাসের তথ্যাবলি দ্বারা সেই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিতও হয়েছে।

কোরানের ব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, আরবী ব্যাকরণ, কাব্য ও অভিধান, ইতিহাস ও ভূগোলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা গড়ে উঠেছিল। প্রধান প্রধান শহরগুলির অনেকগুলিতেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। সেগুলির মধ্যে কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও আইন ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক ও চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় হাজারের বেশি ছাত্র পড়াশোনা করত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট শিক্ষার জগতে সবচেয়ে লোভনীয় পদের সুযোগ করে দিত। সপ্তম নাসরিয় ইউসুফ আবু-আল-হাজ্জাজ (১৩৩৩-৫৪) গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। তার প্রশাসনকে মর্যাদাময় করে তুলেছিলেন কবি ও ঐতিহাসিক লিসান-আল-দীন ইবন-আল-খাতীব[৮০]। বিশ্ববিদ্যালয়টির দরজায় প্রহরীর ভূমিকায় ছিল দুটি পাথরের সিংহ। এখানে

ধর্মতত্ত্ব, বিচারশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। ক্যাস্টিল ও অন্যান্য দেশের ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। এখানে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথাগতভাবে মাঝে মাঝে জনসভা ও স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সেখানে তারা স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন ও বক্তব্য রাখতেন। কলেজের দরজায় একটি জনপ্রিয় বাণী খোদাই করা ছিল। সেটি হল : "বিশ্বজগৎ কেবলমাত্র চারটি জিনিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে : জ্ঞানীদের শিক্ষা, মহান মানুষদের ন্যায়বিচার, ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রার্থনা ও সাহসীদের বীরত্ব।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অনেক গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল। কর্ডোভার রাজকীয় গ্রন্থাগারের কাজ শুরু করেছিলেন প্রথম মুহাম্মাদ (৮৫২-৫৬) এবং তৃতীয় আবদ আল-রহমান তাকে বর্ধিত আকার দান করেছিলেন। দ্বিতীয় আল-হাকাম যখন তার নিজের সংগৃহীত বইপত্র এই গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন, তখন এটি বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল। কয়েকজন মহিলা-সহ বেশ কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হয়েছিল।

● বইপত্র

গ্রিস ও রোমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক সংগঠন ও নাটকের সমারোহ। কিন্তু মুসলিম দুনিয়ায় এর অভাব ও অন্যান্য অস্বাভাবিকতার জন্য সেখানে বই-ই হয়ে উঠেছিল জ্ঞান সংগ্রহের একমাত্র হাতিয়ার। বইয়ের বাজার হিসেবে স্পেনের মাটিতে কর্ডোভার স্থান ছিল প্রথম। একটি ছোট্ট সত্য ঘটনা থেকে ওই সময়ের মানসিকতা বুঝতে পারা যাবে :[২১]

"আমি যখন কর্ডোভায় বাস করতাম, যে সমস্ত বইয়ের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ সেগুলি কেনার জন্য আমি প্রায়ই বইয়ের বাজারে যেতাম। অবশেষে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা ও রুচিশীলভাবে বাঁধাই করা একটি বই আমার হাতে পড়ল। আনন্দে উল্লসিত হয়ে আমি বইটির জন্য দর দিলাম। কিন্তু বার বারই আমি আরেকজনের দেওয়া দরের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে লাগলাম যতক্ষণ না এর দর বইটির উপযুক্ত দামের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে গেল। আমি তখন নিলামদারকে বললাম, 'সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতাকে আমায় দেখিয়ে দিন যে বইটির উপযুক্ত দামের তুলনায় অনেক বেশি করে দিয়েছে।' তখন সেই নিলামদার আমাকে অভিজাত পোশাকে সজ্জিত এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে আমি তাকে বললাম, "আল্লাহ্ আমাদের মহান ফকীহ্-কে দীর্ঘজীবী করুন। এই বইটার ব্যাপারে আপনার যদি বিশেষ আগ্রহ থাকে তা হলে আমি এই বইটির ব্যাপারে দরাদরি করব না, কারণ দরাদরির ফলে এর দাম মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি একজন ফকীহ্ নই, আর আমি এই বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কেও কিছুই জানি না। কিন্তু আমি একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছি, এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করার জন্য গ্রন্থাগারের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছি। কিন্তু এখনও সেখানে একটি ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে এই বইটি রাখা যাবে। বইটির হাতের লেখা খুব ভাল এবং বাঁধাইটা উন্নতমানের বলে আমি এটাকে পছন্দ করেছি এবং এটা

কেনার জন্য যে টাকাই লাগুক না কেন তা দিতে আমি রাজি আছি। কারণ আল্লাহ্‌র দোয়ায় আমার যথেষ্ট টাকা আছে।"

● লেখার কাগজ

কিন্তু স্থানীয়ভাবে যদি লেখার কাগজের উৎপাদন না হত তা হলে আন্দালুসিয়াতে বইয়ের এমন বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলা সম্ভব হত না। এই কাগজের উৎপাদন ছিল ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির অন্যতম। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানিতে স্থান পরিবর্তনে সক্ষম ছাপার অক্ষর আবিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু কাগজ ছাড়া এই ছাপার অক্ষরের সাহায্যে কোন কিছু ছাপাই সম্ভব হত না। আর এই কাগজ ও ছাপার সাহায্য ছাড়া ইউরোপে জনপ্রিয় শিক্ষা যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের দেশ থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি প্রথমে মরক্কোতে চালু হয়েছিল এবং সেখান থেকে তা দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে[৩০] স্পেনে পৌঁছেছিল। স্পেনে কাগজ তৈরির শিল্পকেন্দ্র হিসেবে শাতিবাহ্ (জাতিভা)-র নাম উল্লেখ করেছেন ইয়াকৃত।[৩১] এই ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ভাষাতাত্ত্বিক দিক আছে যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ইংরেজি 'রিম' শব্দটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ 'রেমি' শব্দ থেকে এসেছে; 'রেমি' শব্দটি এসেছে, স্পেনীয় 'রেসমা' শব্দ থেকে—এটি একটি বিদেশি শব্দ, আরবী শব্দ 'রিজমা' থেকে গৃহীত। এর অর্থ হল একগুচ্ছ। স্পেনের পরে ইতালিতে কাগজ তৈরির প্রক্রিয়া চালু হয় (১২৬৮-৭৬)। অবশ্য এরও মূলে ছিল মুসলিম প্রভাব, যা এসেছিল সিসিলি থেকে। কেউ কেউ যদিও দাবি করে থাকেন যে প্রত্যাগত ধর্মযোদ্ধারা ফ্রান্সে কাগজকল চালু করতে সাহায্য করেছিল, তা সত্য নয়। প্রথম কাগজ কলগুলির জন্য ফ্রান্স বাস্তবে স্পেনের কাছে ঋণী। এই দেশগুলি থেকেই কাগজ শিল্প পরবর্তী সময়ে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আবদ-আল-রহমানের একজন সচিব তার বাড়িতে বসে রাজার আদেশপত্র লিখতেন এবং তারপর সেগুলির একাধিক কপি তৈরির জন্য বিশেষ ধরনের অফিসে পাঠাতেন। সেখানে রাজার আদেশগুলি বিশেষ এক পদ্ধতিতে (ট্যাব, সম্ভবত ব্লক তৈরি করে ছাপা) ছাপা হত এবং তারপর সেগুলি রাজপ্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের[৩২] মধ্যে বিলি করা হত।

স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসানের পর দ্বিতীয় ফিলিপ (১৫৫৬-৯৮) ও তার উত্তরসূরিরা আরবের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে দু'হাজারের কিছু কম বই সংগ্রহ করেন। এই বইগুলির সাহায্যেই এসকুরিয়াল গ্রন্থাগারের মূল ভিত্তিটি গড়ে উঠেছিল। মাদ্রিদের খুব কাছেই গ্রন্থাগারটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মরক্কোর সুলতান শরিফ জাইদান তার রাজধানী থেকে পালানোর সময় তার গ্রন্থাগারের সমস্ত বই একটি জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই জাহাজটির ক্যাপ্টেন যেহেতু তার সমস্ত বেতন আগাম পাননি, তাই তিনি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে বইগুলি নামিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। মার্সেইলে যাবার পথে জাহাজটি স্পেনীয় জলদস্যুদের হাতে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ফিলিপের আদেশে জাহাজের তিন বা চার হাজার বই এসকুরিয়াল

গ্রন্থাগারে জমা পড়ে। এর ফলে ওই গ্রন্থাগারটি আরবী ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপিতে[৩৩] সমৃদ্ধ অন্যতম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়।

● ইতিহাস-রচনা

স্পেনের মাটিতে আরবী ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস-রচনা, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানগুলির উন্নতি ঘটেছিল কিছুটা দেরি করে। কারণ সিরিয়া ও আল-ইরাকের মুসলিমদের মতো স্পেনের মুসলিমদেরও সেদেশের মানুষদের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই শেখার ছিল না। এমন কী তাদের ক্ষমতায় আরোহণের পরেও স্পেনীয় বিজ্ঞান প্রাচ্যের খিলাফত আমলের বিজ্ঞানের অগ্রগতির তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। কেবলমাত্র উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত অঙ্কশাস্ত্রেই পশ্চিমি মুসলিমরা চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জন করেছিল।

আন্দালুসিয়ার প্রথম দিককার সবচেয়ে পরিচিত ঐতিহাসিকদের অন্যতম ছিলেন আবু-বকর ইবন-উমর। তিনি সাধারণত ইবন-আল-কুতাইয়াহ্[৩৪] নামেই বেশি পরিচিত। কর্ডোভাতে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানেই তার কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল এবং ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তার রচিত তারিখ ইফতিতাহ্ ('ফাত্‌হ' শব্দের ভিন্ন রূপ) আল-আন্দালুস[৩৫] বইটিতে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে তৃতীয় আবদ-আল-রহমানের শাসনকালের প্রথম দিক পর্যন্ত আলোচনা করা আছে। ইবন-আল-কুতাইয়াহ্ একজন ব্যাকরণবিদও ছিলেন এবং ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ[৩৬] সংক্রান্ত তার গবেষণামূলক প্রবন্ধটি ছিল ওই বিষয়ের ওপর প্রথম রচনা। প্রথম দিককার আর একজন ঐতিহাসিক ছিলেন বহু ইতিহাস-মূলক রচনার অধিকারী আবু-মারওয়ান হায়্যান ইবন-খালাফ। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন এবং তার পদবি ছিল ইবন-হায়্যান (৯৮৭ বা ৯৮৮-১০৭৬)। ইবন-হায়্যানের রচনার সংখ্যা ৫০-এর কম হবে না। তার একটি হলো ৬০-টি খণ্ডে রচিত আল-মতিন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, কেবলমাত্র আল-মুকতাবিস ফী তারিখ রিজাল-আল-আন্দালুস[৩৭] বইটিই অক্ষত আছে। মুয়াহ্হিদ রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটি ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। মরক্কোর ঐতিহাসিক আবদ-আল-ওয়াহিদ আল-মাররাকুশি[৩৮] বইটি রচনা করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু কাল স্পেনে বাস করেছিলেন।

আন্দালুসিয়া বেশ কয়েকজন জীবনীকারের জন্ম দিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর জীবনীকারদের অন্যতম ছিলেন আবু-আল-ওয়ালীদ আবদুল্লা ইবন-মুহাম্মাদ ইবন-আল-ফারাজী। তিনি ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভাতে জন্মেছিলেন, সেখানেই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন এবং পরে সেখানেই তিনি শিক্ষকতা করতেন। যখন তার তিরিশ বছর বয়স তখন তিনি তীর্থযাত্রায় বের হন এবং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি আল-কায়রাওয়ান, কায়রো, মক্কা ও আল-মদীনায় তিনি যাত্রা থামিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তাকে ভ্যালেন্সিয়ার কাযী পদে নিয়োগ করা হয়। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে বার্বাররা যখন কর্ডোভা নগরীতে লুঠপাট চালাচ্ছিল, তখন ইবন-আল-ফারাজীকে তার বাড়িতেই হত্যা করা হয়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পর চতুর্থ দিনের আগে তার মৃতদেহ পাওয়া

যায়নি এবং দেহটা এমন ভাবে গলে গিয়েছিল যে স্বাভাবিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী স্নান করানো ও নতুন কাপড়ে দেহ ঢেকে দেবার[৩৯] পর্বটি বাতিল করেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ইবন-আল-ফারাজীর রচনাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র তারীখ উলামা আল-আন্দালুস[৪০] বইটি দেখা যায়। স্পেনের আরবীয় পণ্ডিতদের এই জীবনী-বিষয়ক সংকলনটি ইবন্ বাশকুওয়াল, আবু-আল-কাসিম খালাফ ইবন-আবদ-আল-মালিক ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে "আল-সিলাহ্ ফী তারিখ আয়িম্মাত আল-আন্দালুস"[৪১] নামে সম্পূরণ করেছিলেন। ইবন-বাশকুওয়ালের অক্ষত দুটি বইয়ের এটি হল অন্যতম। তিনি ৫০টি বই[৪২] লিখেছিলেন। ইবন-বাশকুওয়াল ১১০১ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভাতে জন্মেছিলেন ও সেখানেই ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। তার মিলাহ নামের বইটি পরবর্তী কালে আবু-আবদুল্লা মুহাম্মাদ ইবন-আল-আব্বার (১১৯৯-১২৬০) সম্পূর্ণ করেন। তিনি ছিলেন ভ্যালেন্সিয়ার নাগরিক। তিনি বইটির নাম দেন আল-তাকমিলাহ্ লি-কিতাব আল-সিলাহ[৪৩]। এছাড়াও তিনি আল-হুল্লাহ্ আল-সিয়ারা[৪৪] নামে একটি জীবনী-সংকলন রচনা করেছিলেন। শিক্ষিত স্পেনীয় আরবেরা যে মূল্যবান অভিধানটি ব্যবহাব করতেন, তার নাম ছিল বুগিয়াত আল-মুলতামিস ফী তারিখ রিজাল আল-আন্দালুস। এই অভিধানটির প্রণেতা ছিলেন আল-যাব্বি,[৪৫] আবু-জাফর আহমদ ইবন-ইয়াহিয়া (মৃ. ১২০৩)। তিনি মার্সিয়াতে বিকাশ লাভ করেছিলেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা আবু-আল-কাসিম সাঈদ ইবন-আহমদ আল-আন্দালুসির (১০২৯-৭০)[৪৬] কলম থেকে তাবাকাত আল-উমাম[৪৭] (জাতিগুলিব শ্রেণীবিভাগ) বইটি পেয়েছি। আল-কিফতি, ইবন-আবি-উসাইবিয়া ও ইবন-আল-ইবরি এই বইটিকে তাদের রচনার প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বানু-যূ-আল-নূনের শাসনকালে সাঈদ ছিলেন টলেডোর কাযী এবং নিজেকে তিনি ঐতিহাসিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ পর্যবেক্ষক রূপে খ্যাতনামা করে তুলেছিলেন।

পশ্চিমের ইসলামি দেশগুলি যে সর্বোত্তম সাহিত্যিক দক্ষতা ও ঐতিহাসিক উপলব্ধির জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল, তার জন্য যে দুই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি প্রশস্তি লাভ করতে পারেন তারা হলেন নাসরিদ রাজদরবারের দুই কর্তাব্যক্তি ও বিশিষ্ট বন্ধু ইবন-আল-খাতীব ও ইবন-খালদুন।

সিরিয়া থেকে স্পেনে চলে যাওয়া একটি আরব পরিবারের বংশধর ছিলেন লিসান আল-দীন ইবন-আল-খাতীব[৪৮] (১৩১৩-৭৪)। সপ্তম নাসরিদ সুলতান ইউসুফ আবু-আল-হজ্জাজ (১৩৩৩-৫৪) ও তার পুত্র পঞ্চম মুহাম্মাদ (১৩৫৪-৫৯, ১৩৬২-৯১)-এর শাসনকালে তিনি যূ-আল-বিজারাতাইন[৪৯] উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রাজদরবারের ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার তিন বছর পরে ফাস এ কোন এক ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুতে গোটা আরব স্পেন না হলেও গ্রানাডা তার শেষ মহান গ্রন্থকার, কবি ও রাজনীতিককে হারায়। [illegible] কাব্যিক, রসসাহিত্যমূলক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, দর্শনগত ও ঔষধ-সংক্রান্ত ৬০টি

বইয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অক্ষত রয়েছে। সেগুলির মধ্যে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গ্রানাডার সুবিস্তৃত ইতিহাস।[৫০]

তিউনিসের একটি স্পেনীয় আরব পরিবারে আবদ-আল-রহমান ইবন-খালদূন (১৩৩৩-১৪০৬) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হাযরামাওত উপজাতি ছিল এদের পূর্বপুরুষ। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা অষ্টম শতাব্দীতে ইয়ামানীদের সঙ্গে স্পেনে চলে এসেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত তার উত্তরসূরিরা সেভিলে বিকশিত হয়েছিলেন। নিজের সম্মান খুইয়ে গ্রানাডার সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদের (১৩৬২) কাছে চাকরিতে ঢোকার আগে ফাস-এ বেশ কয়েকটি উঁচু পদে আসীন ছিলেন আবদ-আল-রহমান। সুলতান তাকে শান্তির দূত হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে ক্যাস্টিলিয় রাজদরবারে পাঠিয়েছিলেন। দু'বছর পরে তার প্রভাবশালী বন্ধু ইবন-আল-খাতীবের মনে হিংসা জাগিয়ে তোলার পরে ইবন-খালদূন ফিরে আসেন আল-মাগরিবে। এখানে তিনি বেশ কিছু পদে আসীন ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কালআত ইবন-সালামা-তে[৫১] ফিরে আসেন। সেখানে তিনি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে বাস করেছিলেন। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু আল-আজহার মসজিদে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি কায়রোতে তার যাত্রা ভঙ্গ করেন। দু'বছর পরে মামলুক সুলতান আল-জাহির বারকুক তাকে কায়রোর প্রধান মালিকী কাযী-র পদে নিয়োগ করেন। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে দুর্ধর্ষ টেমারলেনের (তাইমুর) বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে দামাস্কাসে পাড়ি দেবার সময় তিনি বারকুকের উত্তরসূরি আল-নাসির ফারাজের সঙ্গে গিয়েছিলেন। টেমারলেন একজন সম্মানিত অতিথি রূপে ইবন-খালদূনকে সাদরে বরণ করে নেন। এইভাবেই উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের রাজনীতিতে এই ঐতিহাসিক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এই ঘটনাগুলিই তাকে ওই বিস্তৃত ইতিহাস লিখতে সাহায্য করেছিল। কিতাব আল-ইবার অ-দিওয়ান আল-মুবতাদা অ-আল-খবর ফী আয়্যাম আল-আরব অ-আল-আজম অ-আল-বার্বার[৫২] (নির্দেশমূলক উদাহরণের বই এবং আরব, পারসীয় ও বার্বার ইতিহাসের মুখ্য ও গৌণ ঘটনার সমাহার) নামে তার বইটি তিনটি অংশে বিভক্ত : প্রথম খণ্ডটি মুকাদ্দামা[৫৩] (প্রবন্ধাবলির ভূমিকাসমূহ), দ্বিতীয় খণ্ড বা মূল অংশটিতে আরব ও প্রতিবেশী মানুষদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় বা সর্বশেষ খণ্ডটিতে[৫৪] উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজবংশ ও বার্বারদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, মুকাদ্দামাতে দক্ষতার সঙ্গে যে সমস্ত জটিল তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে বইটির মুল অংশে তা প্রয়োগ করা হয়নি। যাই হোক, যে অংশে মাগরিবের বার্বার উপজাতি ও আরবদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা চিরদিনের জন্য এক মূল্যবান পথপ্রদর্শকের কাজ করবে।

মুকাদ্দামা[৫৫] বইটির জন্যই ইবন-খালদূন খ্যাতিলাভ করেছেন। এই বইটিতে তিনি সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বিকাশের একটি তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। এই তত্ত্বে তিনি আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রাকৃতিক ঘটনাবলি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির ভূমিকাকে

যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন মানুষ যদি জাতীয় অগ্রগতি ও অবক্ষয়ের নিয়ম রচনা করার চেষ্টা করেন, তাকে অবশ্যই ইবন-খালদূনকে ইতিহাসের প্রকৃত সীমা ও চরিত্রের আবিষ্কারক বা অন্তত সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রকৃত জনক বলে গণ্য করতে হবে। তিনি নিজেও নিজের সম্বন্ধে এমন দাবিই করেছেন।[৬৬] কোন ইউরোপীয় তো নয়ই, এমন কী কোন আরব লেখকও ইতিহাসের এমন দর্শনগত ও সর্বব্যাপক চিত্র তুলে ধরতে পারেননি। সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে ইবন-খালদূনকে ইসলামি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

● ভূগোল

একাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে পরিচিত ভূগোলবিদ ছিলেন আল-বাকরি। তিনি ছিলেন একজন হিস্পানো-আরব। দ্বাদশ শতাব্দীর, বা বলা চলে গোটা মধ্যযুগের, সবচেয়ে প্রতিভাবান ভূগোল-গ্রন্থকার ও মানচিত্রবিদ ছিলেন আল-ইদ্রিসি। তিনি ছিলেন এক স্পেনীয় আরব রাজ-পরিবারের বংশধর এবং তিনি স্পেনে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

পশ্চিমের মুসলিম ভূগোলবিদদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন আবু-উবায়দ আবদুল্লা ইবন-আবদ-আল-আযীয আল-বাকরি[৬৭]। তার কর্মজীবন বিকাশ লাভ করেছিল কর্ডোভাতে ও সেখানেই ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে পরিণত বয়সে তিনি মারা যান। তার বইগুলি এখনও অক্ষত আছে। একজন রসসাহিত্যিক, কবি ও ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি তার আল-মাসালিক অ-আল-মামালিক (রাস্তা ও রাজধানী সংক্রান্ত বই)[৬৮] নামের বিশাল ভূগোল বইটির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ ভূগোল বইয়ের মতো এই বইটিও পথ-বিবরণী রূপেই লেখা হয়েছিল। বইটি আংশিকভাবে অক্ষত রয়েছে।.

আল-ইদ্রিসি ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে সেউতা-য় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সিসিলির নর্মান বংশীয় রাজা দ্বিতীয় রজারের রাজত্বকালকে দীপ্যমান করে তুলেছিলেন। সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই তার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

● পর্যটন

আল-ইদ্রিসির পরে আরবের ভূগোল-সাহিত্যে আর কোন বড় মৌলিক গ্রন্থকারের দেখা পাওয়া যায় না। পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনীই তখন ভূগোল-বইয়ের ভূমিকা পালন করছিল। অবশ্য সেগুলির সংখ্যাও ছিল অনেক। এই সমস্ত পর্যটকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন ইবন-জুবাইর[৬৯], আবু-আল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইবন-আহমদ। আবু-আল-হুসাইন ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্সিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতিভা-তে শিক্ষালাভ করেন। ১১৮৩ ও ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইবন-জুবাইর গ্রানাডা থেকে মক্কায় যান এবং মিশর, আল-ইরাক, সিরিয়া ও সিসিলি ঘুরে ফিরে আসেন। ওই সময়ে সিরিয়ার কিয়দংশ ধর্মযোদ্ধাদের দখলে ছিল। ১১৮৯-১১৯১ ও ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে

তিনি প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভ্রমণ করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত আসতে পেরেছিলেন এবং সেখানেই তিনি মারা যান। প্রথম ভ্রমণের কাহিনী তিনি তার রিহ্‌লাহ্[৬০] নামের বইটিতে লিপিবদ্ধ করেন। আরবীয় সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। গ্রানাডার অধিবাসী আবু-হামিদ মুহাম্মাদ আল-মাজিনি (১০৮০/৮১-১১৬৯-৭০) ছিলেন ওই সময়ের অন্যতম হিস্পানো-আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটক। তিনি ১১৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। ভলগা অঞ্চলের বুলগারদের মধ্যে থাকাকালীন তিনি এক বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ লক্ষ করেছিলেন। অধুনালুপ্ত অতিকায় হাতির প্রস্তরীভূত দাঁত দূরবর্তী খওয়ারিজমে রপ্তানি করা হত এবং তার থেকে সেখানে চিরুনি এবং জহরত বা প্রসাধন-দ্রব্য রাখার ছোট ছোট কৌটো[৬১] তৈরি হত। আর অন্য কোন বইতে এ ঘটনার বর্ণনা মেলে না।

মরক্কোর আরব অধিবাসী ও মধ্যযুগের মুসলিম ভূ-পর্যটক মুহাম্মাদ ইবন-আবদুল্লা ইবন-বতুতার ভ্রমণের দ্বারা ইবন-জুবাইর ও আল-মাজিনির ভ্রমণ ম্লান হয়ে গেছে। ইবন-বতুতা ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে তানজা-তে (তাঞ্জিয়ার) জন্মগ্রহণ করেন ও ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে মাররাকুশে মারা যান। ওই শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে তিনি চারবার মক্কায় গিয়েছিলেন ও সেই সূত্রে তিনি গোটা মুসলিম দুনিয়াতেও ভ্রমণ করে আসেন। পূর্বদিকের সিংহল, বঙ্গদেশ, মালদ্বীপ ও চীন দেশে তিনি ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলেও গিয়েছিলেন। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষবারের ভ্রমণে আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রান্তে গিয়েছিলেন। কাজানের কাছে বুলগার শহর ও ভলগা ভ্রমণের দাবিটি তার সমগ্র ভ্রমণ-কাহিনীর[৬২] মধ্যে সম্ভবত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অতিরঞ্জন।

● পশ্চিমি দুনিয়ার ওপর প্রভাব

পশ্চিমি দুনিয়ার ওপর আরবের ভূগোল চর্চার প্রভাব ছিল খুবই কম। পৃথিবী যে গোলকাকার এই প্রাচীন তত্ত্বে তারা তখনও বিশ্বাস করত এবং মনে করত যে, তা না হলে নতুন বিশ্বের আবিষ্কার সম্ভব হত না। এই তত্ত্বের অন্যতম উদগাতা ছিলেন আবু-উবাইদা মুসলিম আল-বালানসি (ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসী)। দশম শতাব্দীর[৬৩] প্রথমার্ধে তার কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল। পরিচিত ভূ-গোলার্ধের একটি কেন্দ্র বা গম্বুজ বা চূড়া আছে যেটি চারটি প্রধান কোণ থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত, এই হিন্দু ধারণাটি তারা পোষণ করত। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় এই অ্যারিন তত্ত্বটি ছাপা হয়েছিল। এর থেকেই কলম্বাস এই তত্ত্বটি পেয়েছিলেন যার ফলে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, পৃথিবীর আকৃতি একটি নাশপাতির মতো এবং অ্যারিনের বিপরীত দিকে পশ্চিম গোলার্ধে উচ্চভূমিতে অবস্থিত আর একটি কেন্দ্র আছে। এভাবেই জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত ভূগোল ও অঙ্কশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নতুন ধারণা পশ্চিমি ঐতিহ্যে সংযোজিত হয়েছিল।

● জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে স্পেনে প্রচণ্ড পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা চলেছিল এবং কর্ডোভা, সেভিল ও টলেডোর শাসকেরা তার প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখিয়ে

ছিলেন। বাগদাদের জ্যোতির্বিদ আবু-মা'শার-এর মতো আন্দালুসিয়ার বেশির ভাগ জ্যোতির্বিদই বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনার পিছনে নক্ষত্রের প্রভাব আছে। এই নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে পড়াশোনা অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় এবং তাদের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার পরিমাপকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আর জ্যোতিষবিদ্যা এভাবেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাকে সাহায্য করেছিল। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রাচ্যের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা স্পেনের মাধ্যমেই ল্যাটিনভাষী পশ্চিমি দুনিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। মুসলিম জ্যোতির্বিদদের দ্বারা রচিত জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান প্রধান বইগুলি স্পেনের মাটিতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দশম অ্যালফোনসোর উদ্যোগে সংকলিত অ্যালফোনসাইন সারণিকে আরব জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে গণ্য করা যায়।

প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাদের সমধর্মাবলম্বীদের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত রচনাবলির ওপর ভিত্তি করেই স্পেনীয় আরব জ্যোতির্বিদেরা তাদের বইগুলি লিখেছিলেন। টলেমি-র ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অ্যারিস্টটল তত্ত্বের তারা পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন এবং অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের ভিত্তিতে তারা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সংক্রান্ত টলেমির তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। প্রথম দিককার অগ্রগণ্য হিস্পানো-আরব জ্যোতির্বিদদের মধ্যে কর্ডোভার অধিবাসী আল-মাজরিতি[৬৪] (মৃ. ১০০৭ খ্রিঃ), টলেডোর অধিবাসী আল-জারকালি (১০২৯-১০৮৭) এবং সেভিলের অধিবাসী ইবন-আফলাহ্ (মৃ. ১১৪০ ও ১১৫০-এর মধ্যবর্তী)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিককার স্পেনীয় মুসলিম বিজ্ঞানী আবু-আল-কাসিম মাসলামাহ আল-মাজরিতি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম সারণি অর্থাৎ আল-খওয়ারিজমির[৬৫] গ্রহের সারণি (জিজ) সম্পাদনা ও সংশোধন করেন। এই সমস্ত সারণিগুলির ভিত্তি হিসাবে এতদিন যে ইয়াজদাগার্দ যুগ ব্যবহৃত হচ্ছিল, তাকে পরিবর্তন করে তিনি ইসলামি যুগে রূপান্তরিত করেন এবং কিছু পরিমাণে আরিন এর মধ্যরেখাকে কর্ডোভার মধ্যরেখার দ্বারা পরিবর্তিত করেন। বাথ-এর অধিবাসী অ্যাডেলার্ড ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে আল-খওয়ারিজমির সারণির একটি ল্যাটিন অনুবাদ রচনা করেন। প্রায় ১৫ বছর পরে সম্ভবত ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আল-বাত্তানি প্রণীত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ ল্যাটিনভাষায় অনুবাদ করেন তিভোলির অধিবাসী প্লেটো এবং তার বহু বছর পরে দশম অ্যালফোনসোর (মৃ. ১২৮৪) উদ্যোগে এটি আরবী ভাষা থেকে সরাসরি স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়। দশম অ্যালফোনসোর পদবি ছিল দি ওয়াইজ ও দি অ্যাস্ট্রোনমার। আল-মাজরিতি যে সমস্ত মর্যাদাসূচক খেতাব পেয়েছিলেন, তার অন্যতম ছিল আল-হাসিব বা অঙ্কশাস্ত্রবিদ। কারণ পরিমিতি-সহ অঙ্কশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাকে একজন পথপ্রদর্শক (ইমাম) বলে গণ্য করা হত। তিনি এবং তার কর্ডোভাবাসী শিষ্য আবু-আল হাকাম আমর আল-কারমানি[৬৬] (মৃ. ১০৬৬) স্পেনের মাটিতে ইখওয়ান আল সাফার রচনাবলি চালু করেছিলেন।

বেশ কয়েকজন স্পেনীয় মুসলিম ও ইহুদি জ্যোতির্বিদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই টলেডীয় সারণি তৈরি হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল-জারকালি, আবু-ইসহাক ইবরাহীম ইবন-ইয়াহিয়া (মৃ. ১০৮৭)। টলেমি ও আল-খওয়ারিজমির রচনাবলি থেকে সংগৃহীত ভৌগোলিক তথ্যের ভিত্তিতেই এই সারণিগুলি তৈরি হয়েছিল। ক্রেমোনা-এর অধিবাসী জেরার্ড দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় এই সারণির অনুবাদ করেছিলেন। মার্সেইলের অধিবাসী রেমণ্ডের রচনাবলির বেশির ভাগ অংশই (১১৪০) আল-জারকালির জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতেই লেখা হয়েছিল। টলেমি অতিরঞ্জিত করে ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ দাঁড় করিয়েছিলেন ৬২°; আল-খওয়ারিজমির হিসাব অনুযায়ী তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৫২°-তে এবং আল-জারকালি সেই পরিমাপকে আরও কমিয়ে তাকে প্রায় সঠিকমান ৪২°-তে দাঁড় করিয়েছিলেন। আল-জারকালিকে নিশ্চিত ভাবেই তার যুগের অগ্রণী জ্যোতির্বিদ পর্যবেক্ষক[৬৮] রূপে গণ্য করা যায়। তিনি এক উন্নত ধরনের অ্যাস্ট্রোলেব তৈরি করেছিলেন এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল সাফিহা[৬৯]। এছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম নক্ষত্রদের নিরিখে সৌরজগতের দূরতম স্থান নির্ণয় করেছিলেন। তার পরিমাপ অনুযায়ী এর মান ছিল ১২.০৪", কিন্তু এর প্রকৃত মান ছিল ১১.৮", কোপারনিকাস তার দ্য রেভুল্যুশেনিবাস অরবিয়াম কায়লেস্টিয়াম নামের বইটিতে আল-বাত্তানির পাশাপাশি আল-জারকালির (আরজাচেল)লেখা থেকেও উদ্ধৃত করেছিলেন।

ক্রেমোনার জেরার্ড কর্তৃক অনূদিত কিতাব আল-হাইয়াহ্[৭০] (জ্যোতির্বিদ্যার বই) নামের বইটিতে জাবির ইবন-আফলাহ্ (জেবের ফিলিয়াস আফলে) কঠোর ভাষায় টলেমির সমালোচনা করেছিলেন এবং সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন যে, বুধ ও শুক্রের মতো নীচু শ্রেণীর গ্রহের কোন দৃশ্যমান লম্বন নেই। অন্যদিক থেকেও ইবন-আফলার বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এতে গোলকাকার ও সামতলিক ত্রিকোনমিতির ওপর একটি অধ্যায় রয়েছে। আজকের দিনে আমরা ত্রিকোনমিতির অনুপাত বলতে যা পড়ি, ইবন-আফলার প্রায় ২৫০ বছর পরে আল-বাত্তানি সেই ধারণাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। বীজগণিত ও বৈশ্লেষিক জ্যামিতির মতো ত্রিকোণমিতিও মূলত আরবদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল।

শেষের দিককার স্পেনীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে নুর-আল-দীন আবু-ইসহাক আল-বিতরুজি[৭১] (আলপেট্রেজিয়াস, মৃ. ১২০৪) ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি ছিলেন ইবন-তুফাইল-এর একজন ছাত্র। সৌরজগতে বস্তুপিণ্ডগুলির বাহ্যিক নকশা সংক্রান্ত তার কিতাব আল-হাইয়াহ[৭২] নামের বইটি সমকেন্দ্রিক গোলকের ভুল তত্ত্বটিকে সংশোধিত আকারে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালানোর জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক নতুন জ্যোতির্বিদ্যার জনক বলে গণ্য হলেও আল-বিতরুজি প্রকৃত পক্ষে অ্যারিস্টটলের তত্ত্বেরই পুনর্গঠন করেছিলেন। মুসলিম জ্যোতির্বিদরা টলেমির তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে তাত্ত্বিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার পরিণতি হিসেবে আল-বিতরুজির রচনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি নাগাদ জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও আবহবিদ্যা সংক্রান্ত

অ্যারিস্টটলের অনেক বই-ই আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আর এই বইগুলির অধিকাংশতেই ভূগোল সংক্রান্ত অ্যারিস্টটলের চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল।

আরব জ্যোতির্বিদেরা আকাশের বুকে তাদের পরিশ্রমের যে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল, সাধারণ একটি সৌরক্ষেত্রে যারাই নক্ষত্রদের নাম পড়বে তারাই তা সরাসরি উপলব্ধি করতে পারবে। আরবীয় উৎস থেকে উদ্ভূত ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে বর্ণিত আক্রাব (আকরাব, বৃশ্চিক), আলজেদি (আল-জাদি, ছাগলছানা), আলটেয়ার (আল-তাঈর, উড্ডয়নশীল), দেনেব (যানব, লেজ), ফেরকাড (ফারকাদ, বাছুর)[৭৩] প্রভৃতি বেশির ভাগ নক্ষত্রের নামই নয়, 'অ্যাজিমুথ' (আল-সুমুত), 'নাদির' (নাজির), 'জেনিথ' (আল-সামত) সহ বেশ কিছু পরিভাষা আরবীয় শব্দপ্রকরণের অন্তর্গত এবং খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপ যে সমৃদ্ধ ইসলামি ঐতিহ্য আত্মস্থ করেছিল তার সাক্ষ্য দেয়। ইউরোপের অঙ্কশাস্ত্রের শব্দভাণ্ডারেও আমরা আরব বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। 'অ্যালজেবরা', 'অ্যালগোরিজম'-এর মতো ধার করা শব্দ বাদেও আরও কিছু আরবী শব্দ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ল্যাটিন থেকে আগত বিদেশি বীজগণিতিক শব্দ 'সার্ড'-এর অর্থ হল 'বধির', এটি আরবী শব্দ যাধর আসম (বধির মূল)-এর ভাষান্তর। ত্রিকোনমিতিতে 'সাইন' (ল্যাটিন, সাইনাস) শব্দটির মতো আরবী শব্দ জৈব (পকেট)-এর ভাষান্তর, যেটি সংস্কৃত 'জীবা' শব্দ থেকে সংগৃহীত। চেস্টারের নাগরিক ও ইংরেজ অঙ্কশাস্ত্রবিদ রবার্ট-এর কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিকোনমিতিতে আরবী শব্দ জৈব-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সাইনাস' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

আরবীভাষা থেকে ধার করা অঙ্কশাস্ত্রের সবচেয়ে আকর্ষক শব্দের অন্যতম হল 'সাইফার'[৭৪] অথবা 'জিরো'। যদিও আরবেরা সাইফার শব্দটি আবিষ্কার করেনি, তা সত্ত্বেও ইউরোপে আরবীয় সংখ্যার মধ্যে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং পশ্চিমি দুনিয়াকে এই সুবিধাজনক শব্দটির ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল ও তার দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে পাটিগণিতের ব্যবহারকে সহজ করে তুলেছিল। অঙ্কশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সাইফার-এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শ্রেণীতে একটি একক, একটি ১০ বা ১০-এর সমতাসূচক সংখ্যা উপস্থাপিত না করেও 'শ্রেণী বজায় রাখতে' ব্যবহৃত হয় 'এই ছোট্ট বৃত্ত'।[৭৫] শূন্য ছাড়া আমাদের সংখ্যাগুলিকে একটি সারণি বা তালিকাতে এক, দশ, একশো-র স্তম্ভে অ্যাবাকাস বা গণনাযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

নবম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে আল-খওয়ারিজমি তার বইগুলি লিখেছিলেন। অক্ষরের পরিবর্তে শূন্য ও অন্যান্য শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকেই জনক বলা হয়। এই সংখ্যাগুলিকে তিনি 'হিন্দী' বলতেন অর্থাৎ এর দ্বারা সংখ্যাগুলির ভারতীয় চরিত্রকেই তিনি বোঝাতে চাইতেন। হিন্দু গণনা পদ্ধতির ওপর তার রচনাবলি বাথ-এর অধিবাসী অ্যাডেলার্ড দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই ল্যাটিন অনুবাদ দ্য ন্যুমেরো ইন্ডিকো অক্ষত থাকলেও মূল আরবী গ্রন্থটি হারিয়ে গেছে। স্পেনের মুসলিমরা নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আকৃতিতে কিছুটা আলাদা এক ধরনের সংখ্যা উদ্ভাবন করেছিলেন। এগুলি হুরূফ আল-গুবার (ধুলোর অক্ষর) নামে পরিচিত ছিল ও

এক ধরনের বালির গণনাযন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি ব্যবহৃত হত। অধিকাংশ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে 'হিন্দু' সংখ্যার মতো গুবার সংখ্যাও ভারতীয় উৎস থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু অন্যরা দাবি করেন যে, গুবার সংখ্যাগুলি আসলে রোমান উৎস থেকেই উদ্ভূত এবং আরবদের আগমনের[৭৬] আগেই তা স্পেনে চালু ছিল। দ্বিতীয় পোপ সিলভেস্টার নামে (৯৯৯-১০০৩) পরিচিত হবার আগে জেরবার্ট বহু বছর স্পেনে কাটিয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুবার সংখ্যাগুলির বর্ণনা দেন। আর এই ধরনের সংখ্যা সংবলিত আরবী পাণ্ডুলিপি (৮৭৪) লেখা হবার প্রায় ১০০ বছর পরে তার রচনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল। হিন্দু সংখ্যাগুলির তুলনায় গুবার সংখ্যার সঙ্গেই আধুনিক ইউরোপীয় সংখ্যাগুলির অনেক বেশি সাদৃশ্য রয়েছে।

অ-মুসলিম ইউরোপে আরবীয় সংখ্যাগুলি ছড়িয়ে পড়ার গতি ছিল খুবই ধীর। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু সময় ধরে খ্রিস্টান পাটিগণিতবিদেরা পুরানো রোমান সংখ্যাগুলিকেই বা গণনাযন্ত্রকেই ব্যবহার করতেন অথবা আপস ঘটিয়ে তাদের পুরানো পদ্ধতির সঙ্গে নতুন অ্যালগোরিজমের ব্যবহার করতেন। ইতালিতেই প্রথম ব্যবহারিক কাজে নতুন চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে পিসার অধিবাসী লিওনার্ডো ফাইবোনাক্কি তার একটি বইতে প্রথম আরবীয় সংখ্যার ব্যবহার শুরু করেন। একজন মুসলিম শিক্ষকের কাছে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। সত্যি বলতে কী তার বইয়ের মধ্য দিয়েই ইউরোপে অঙ্কশাস্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। পুরানো ধরনের সংখ্যার সাহায্যে পাটিগণিতের অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ত। আজ যে ধরনের গণনা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার মূলে রয়েছে শূন্য এবং আরবীয় সংখ্যাগুলির উপস্থিতি।

● উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা

প্রাকৃতিক ইতিহাসের[৭৭] ক্ষেত্রে, বিশেষত বিশুদ্ধ ও ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের ক্ষেত্রে পশ্চিমি দুনিয়ার মুসলিমেরা তাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করল। তাল ও শণ জাতীয় গাছের মধ্যকার যৌন পার্থক্য সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তারা কলম থেকে, বীজ থেকে ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেড়ে ওঠা—ওই তিন শ্রেণীতে গাছগুলিকে ভাগ করেছিলেন। সম্রাট ফ্রেডারিকের প্রশ্নাবলির[৭৮] একটির উত্তরে ইবন-সাবঈন যা বলেছিলেন তার থেকেই এটা জানা যায়। কর্ডোভার চিকিৎসক আল-গাফিকি,[৭৯] আবু-জাফর আহমাদ ইবন-মুহাম্মাদ (মৃ. ১১৬৫ খ্রিঃ) স্পেন ও আফ্রিকা থেকে অনেক গাছ সংগ্রহ করেছিলেন, আরবী, ল্যাটিন ও বার্বার ভাষায় প্রতিটি গাছের নাম দিয়েছিলেন এবং আরবী ভাষায় সবচেয়ে ছোট আকারে ও নিখুঁতভাবে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী ও আরও ভালভাবে পরিচিত একই দেশের মানুষ ও সমজ্ঞানানুশীলনকারী ইবন-আল-বাইতার শুধু তার প্রধান রচনা আল-আদবিয়া আল-মুফরাদা (সাধারণ-গাছ-সম্পর্কে)[৮০] থেকে প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতই করেননি, তার যথাযথ স্বীকৃতিও দিয়েছিন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবু-যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবন-

মুহাম্মাদ ইবন-আল-আওয়ামের কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল সেভিলে। কৃষি সম্পর্কে তার প্রধান রচনা আল-ফিলাহা শুধু ইসলামি নয়, এমন কী বিষয়টি সম্পর্কে মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও বটে। অংশত প্রথম দিককার গ্রিক ও আরবীয় উৎস থেকে এবং অংশত স্পেনের মুসলিম কৃষকদের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে লিখিত এই বইটিতে ৫৮৫টি গাছ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ৫০টিরও বেশি ফলের গাছের চাষ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গাছের কলম জোড়া দেবার প্রণালী এবং মাটি ও সারের গুণাবলি সম্পর্কে এতে যেমন নতুন ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন গাছ ও আঙুর গাছের বিভিন্ন রকম রোগের লক্ষণ ও রোগ সারানোর উপায় সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এইটির সমস্ত গুরুত্ব সত্ত্বেও এটি আরব লেখকদের কাছে কম পরিচিত। ইবন-খাল্লিকান বা ইয়াকুত অথবা হাজ্জি খালফা কেউই এই বইটি সম্পর্কে জানতেন না এবং ইবন-খালদূন[৮১] ভুল করে বইটিকে ইবন-ওয়াহশিয়ার বইটির সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ[৮২] বলে গণ্য করেছিলেন।

● ইবন-আল-বাইতার

স্পেনের, বা বলা ভাল, গোটা মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ ও ওষুধ-বিদ্যা বিশারদ ছিলেন আবদুল্লা ইবন-আহমদ ইবন-আল-বাইতার। তিনি ছিলেন ডায়োস্কোরাইডসের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি মালাগায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একজন বিশারদ হিসেবে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কায়রো নগরে আয়্যুবিদ আল-মালিক আল-কামিলের কাছে প্রধান ভেষজবিদ[৮৩] হিসেবে তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। মিশর থেকে তিনি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে ব্যাপক ভ্রমণ চালান। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দামাস্কাসে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি দুটি বিখ্যাত বই রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি তিনি তার পৃষ্ঠপোষক আল-সালিহ্ আয়ুবের নামে উৎসর্গ করে যান। পূর্বসূরি আল-কামিলের মতো তিনি দামাস্কাস শহরকে তার সিরীয় রাজধানী রূপে ব্যবহার করেছিলেন। বিখ্যাত বই দু'টির অন্যতম 'আল-মুগনি ফী আল-আদবিয়া আল-মুফ্রাদা' ভেষজবিদ্যার ওপরে লেখা; আর একটির নাম 'আল-জামি ফী আল-আদবিয়া আল-মুফ্রাদা'[৮৪] এবং এটিতে প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ ও ধাতব উপাদানের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের সহজ সরল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা আছে। বইয়ের তথ্যগুলি গ্রিক ও আরবীয় উৎস থেকে সংকলিত এবং লেখকের নিজের পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে সংযোজিত। এই বইটিকে ওই বিষয়ের ওপর মধ্যযুগের-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই বইটিতে ১৪০০ উপাদান নিয়ে আলোচনা আছে এবং তার মধ্যে প্রায় ২০০টি গাছ-সহ ৩টি উপাদান সম্পূর্ণ নতুন বা অভিনব বস্তু। প্রায় ১৫০ জন গ্রন্থকারের বই থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এর মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ২০ জন ছিলেন গ্রিক। ইবন-আল-বাইতার রচিত 'সিম্পলিসিয়া' বইটির ল্যাটিন অনুবাদ ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রেমোনাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

● চিকিৎসাবিদ্যা

স্পেনীয় আরব চিকিৎসকদের অধিকাংশই ছিলেন নেশায় চিকিৎসক ও পেশায় অন্য বৃত্তিধারী ব্যক্তি। ইবন-রুশদ, ইবন-মাইমুন, ইবন-বাজ্জা ও ইবন-তুফাইল দার্শনিক হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী পাতায় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইবন-আল-খাতীবকে আমরা একজন বিশিষ্ট ও সুন্দর রচনাশৈলী সম্পন্ন লেখক ও ঐতিহাসিক বলে গণ্য করে থাকি। তিনিও অন্যান্য অনেক চিকিৎসকের মতো একটি উজির অফিস চালু করেছিলেন। চতুর্দশ শতকে কালান্তক মহামারীর কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল ইউরোপ। তখন ঈশ্বরের কাজ ভেবে খ্রিস্টানরা হয়েছিল অসহায়। তখন গ্রানাডার এই মুসলিম চিকিৎসক রোগ-সংক্রমণের তত্ত্বের পক্ষে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। নীচের অনুচ্ছেদটি[৮৫] থেকে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় :

> "যারা বলেন, 'ধর্মীয় আইন যখন একে অস্বীকার করে তখন আমরা কীভাবে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে পারি', তাদের প্রতি আমাদের উত্তর হল এই যে অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাক্ষ্য ও বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্টের দ্বারাই রোগ সংক্রমণের তত্ত্বটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তথ্যগুলি জোরালো যুক্তি উপস্থাপনা করে। রোগ সংক্রমণের বিষয়টি অনুসন্ধানীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যিনি লক্ষ করেন যে, রোগীর সংস্পর্শে আসা একজন ব্যক্তি কীভাবে ওই রোগের শিকার হয়ে পড়েন এবং যিনি এই রোগের সংস্পর্শে আসেননি তিনি কীভাবে নিরাপদ থাকেন। তিনি এটাও লক্ষ করেছেন যে, কীভাবে পোশাক, পানপাত্র ও কানের দুলের মাধ্যমে এই রোগ সংক্রমণ ঘটে থাকে।"

● আল-যাহরাবী

আরব দেশে খুব বেশি শল্যবিদের সৃষ্টি হয়নি। তবুও তাদের শ্রেষ্ঠ শল্যবিদ ছিলেন দ্বিতীয় আল-হাকামের রাজদরবারের চিকিৎসক আবু-আল-কাসিম (আবুলকাসিস) খালাফ ইবন-আব্বাস আল-জাহরাবী[৮৬] (মৃ. ১০১৩ খ্রিঃ)। তার রচিত আল-তসরীফ লি-মান আজাজ আন আল-তাআলিফ[৮৭] (বড় গবেষণামূলক প্রবন্ধের দ্বারা উপযুক্ত নয় তাদের জন্য একটি সহায়ক গ্রন্থ) বইটির জন্যই তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বইটির শেষ অধ্যায়টিতে তার সময়কার শল্যবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানের সংযোজন ঘটানো হয়েছে। এই বইটিতে ক্ষতস্থানকে পোড়ানো, মূত্রাশয়ের পাথরকে নষ্ট করে দেওয়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য শবব্যবচ্ছেদ ও জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি নতুন ধারণাগুলির প্রথম উল্লেখ করা হয় বা গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শল্য-চিকিৎসা সংক্রান্ত এই অংশটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন ক্রেমোনার নাগরিক জেরার্ড এবং ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে, ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে বাসেল-এ ও ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে

তার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৮৮] বহু শতাব্দী ধরে এই বইটি সালের্নো, মন্টপেলিয়ার ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে শল্যবিদ্যার আকর-গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হত। বইটির মধ্যে শল্যচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রের ছবিও রয়েছে এবং সেগুলি অন্যান্য আরব গ্রন্থকারদের যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি ইউরোপে শল্যচিকিৎসার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে। ইহুদি মন্ত্রী ও চিকিৎসক হাসদে বেন-শাপরূত ছিলেন তার সহকর্মী। বাইজান্টাইনের এক সন্ন্যাসী নিকোলাসের সঙ্গে হাসদে যৌথভাবে ডায়োস্কোরাইড-এর মেটিরিয়া মেডিকার আরবী অনুবাদ করেছিলেন। এই অনূদিত বইটি বাইজান্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্টানটাইন[৮৯]-এর পক্ষ থেকে তৃতীয় আবদ-আল-রহমানকে কূটনৈতিক উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

● ইবন যুহ্‌র

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবন-যুহরের যে দক্ষতা ছিল, শল্যবিদ্যায় তার সমকক্ষ ছিলেন আল যাহরাবী। আবু মারওয়ান আবদ আল-মালিক ইবন-আবি-আল-আলার পদবি ছিল ইবন যুহর[৯০] (হিব্রুর মাধ্যমে ল্যাটিনে, অ্যাভেনজোর) এবং তিনি ছিলেন স্পেনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত সদস্য। সেভিলে ১০৯১ ও ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইবন-যুহর জন্মেছিলেন এবং মুয়াহ্‌হিদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবদ-আল-মুমিন-এর উজির ও রাজ-চিকিৎসক হিসেবে বহু বছর কাজ করার পর তিনি সেখানেই ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর অনেক বই লিখে তিনি তার মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর সহকর্মীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর ছটি রচনার মধ্যে তিনটির এখনও অস্তিত্ব আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল-তাইসির ফী-আল মুদাওয়াহ অ-আল-তাদবীর[৯১] (ওষুধ ও পথ্যের সরলীকরণ)। তাঁর বন্ধু ও অনুরাগী ইবন-রুশদের অনুরোধে রুশদের লেখা আল-কুল্যিয়াত[৯২] এর অনুরূপ হিসেবে তিনি এই বইটি লিখেছিলেন। তাইসির নামের বইটিতে কুল্যিয়াত-এর তুলনায় অনেক বেশি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার আল-কুল্যিয়াত বইটিতে ইবন-রুশদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্যালেনের পরবর্তী সময়ে ইবন-যুহরকেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কমপক্ষে তাকে আল-রাযীর পরে ইসলামি দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে অ্যাখ্যা দেওয়া যায়। একথা প্রায়ই বলা হয় যে ইবন-যুহর সর্বপ্রথম হাড়ের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং খোস পাঁচড়ার (সুয়াবাত আল-জারাব) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অতি সম্প্রতি জানা গেছে যে, তার আবিষ্কারের আগে আহমদ আল-তাবারী (দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) তার আল মুয়ালাজাহ আল-বুকরাতিয়া[৯৩] বইতে খোস-পাঁচড়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইবন যুহর পরিবারের পরপর ছ'টি প্রজন্মে চিকিৎসক সৃষ্টি হয়েছে। উপরে উল্লিখিত আবু-মারওয়ানের পর তার পুত্র আবু-বকর মুহাম্মাদ (১১৯৮-৯৯) ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সদস্য। অবশ্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত কার্যকলাপের তুলনায় আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার দক্ষতার

জন্যই তিনি বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতির পরিচায়ক মুওয়াশশাহ্-সহ অনেক কবিতাই তার নামে উৎসর্গীকৃত।[২৪] মুয়াহ্হিদ বংশের খলিফা আবু-ইউসুফ ইয়াকুব আল-মানসূর তাঁকে মাররাকুশে তার চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন এবং সেখানেই এক ঈর্ষাপরায়ণ উজির বিষপ্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় খলিফা নিজেই ধর্মীয় বাণী পাঠ করেছিলেন। ইবন-যুহ্‌র পরিবারের আর একজন অর্থাৎ তার দাদু স্পেন, বাগদাদ, আল-কায়রাওয়ান ও কায়রোতে[২৫] চিকিৎসক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তারও নাম ছিল আবু-মারওয়ান আবদ আল-মালিক। প্রাচ্যে আরও একজন হিস্পানো-আরব চিকিৎসক চিকিৎসার পেশায় যুক্ত ছিলেন। তিনি হলেন আলমেরিয়া (আল-মারিয়া) -র নাগরিক উবাইদুল্লা ইবন-আল-মুজাফ্ফর আল-বাহিলি। একাধারে কবি ও চিকিৎসক আল-বাহিলি ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সালজুক খলিফা মাহমুদ ইবন-মালিকশাহ-র চাকরিতে যোগ দেন এবং ৪০টি উটের পিঠে এক চলমান হাসপাতাল[২৬] তাকে সরবরাহ করা হয়। দামাস্কাসে ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

● ইউরোপে স্থানান্তর

স্পেনে মুসলিম আধিপত্যের প্রথম শতাব্দীতে প্রাচ্যের সংস্কৃতি উচ্চতর স্থান থেকে আন্দালুসিয়ায় প্রবাহিত হয়েছিল। জ্ঞান অন্বেষণের তাগিদে মিশর, সিরিয়া, আল-ইরাক, পারস্য এবং এমন কী ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও চীনদেশ পরিভ্রমণরত সে সমস্ত স্পেনীয় পণ্ডিতের তালিকা আল-মাক্কারির[২৭] বইতে পাওয়া যায়, তার থেকেই একথা জানা যায়। কিন্তু ইবন যুহ্‌র ও আল-বাহিলির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একাদশ ও পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই প্রবাহের গতিপথ বিপরীতমুখী হয়ে যায়। অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধারাটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তা ইউরোপের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও অনেক দেশে প্রবাহিত হয়। আরবীয় চিকিৎসাবিদ্যাকে ইউরোপে প্রেরণের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, স্পেন এবং বিশেষত টলেডো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। টলেডোতে ক্রেমোনাবাসী জেরার্ড ও মাইকেল স্কট নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পশ্চিমি দুনিয়ার পরিচিতি ঘটানোর যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল, তার পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন কনস্টানটাইন দি আফ্রিকান (১০৮৭ খ্রিঃ)। তিনি 'আলী ইবন-আল-আব্বাস' প্রণীত আল-কিতাব আল-মালিকি-র[২৮] তত্ত্বগত অংশটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কার্থেজের একটি অখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করে কনস্টানটাইন বেশ কিছুদিন সালেরনো-র মেডিক্যাল স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। এটি ছিল ইউরোপের প্রথম মেডিক্যাল স্কুল। প্রচলিত লোককাহিনী থেকে জানা যায় যে, একজন ল্যাটিন, একজন গ্রিক, একজন ইহুদি ও একজন স্যারাসেন এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল-জাহরাবীর লেখা তাসরীফ, আল-রাযীর আল-মানসূরি ও ইবন-সিনার আল-কানুনের অনুবাদক কনস্টানটাইন ও ক্রেমোনার অধিবাসী জেরার্ড (১১৮৭ খ্রিঃ), ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে

আল-রাযী-এর 'আল-হাবী' এবং ইব্ন জায্লাহ্-এর তাকবীম আল-আবদানের অনুবাদক ফারাজ বেন-সেলিম (ফারারিয়াস, ফারাগাত) নামে এক সিসিলীয় ইহুদির কাছে মূলত আরবীয় ওষুধপত্র-সংক্রান্ত-জ্ঞানের জন্যই মধ্যযুগের ইউরোপ ঋণী ছিল। অবশেষে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান এই তিন প্রধান চিকিৎসাবিদ্যার ধারা এমন এক অবস্থায় এসেছিল যেখানে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই সমস্ত ও একই ধরনের অন্যান্য অনুবাদের মাধ্যমে অসংখ্য আরবী পরিভাষা ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। একটি সুগন্ধি ভোজ পানীয় বোঝাতে 'জুলেপ' (আরবীতে জুলাব, পার্সিতে গুলাব, গোলাপ জল), মধুমিশ্রিত ঘন ফলের রসের অবিকৃত নির্যাস বোঝাতে 'রব' (আরবীতে রাব) এবং ওষুধের ফরমূলা অনুযায়ী প্রস্তুত জল ও চিনির মিশ্রণ এবং বিশেষ ধরনের ওষুধ মিশ্রিত দ্রবণ বোঝাতে 'সিরাপ'[৯৯] (আরবীতে শারাব) এই সমস্ত পরিভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষায় 'সোডা' শব্দটি মাথাব্যথা এবং সোডানাম শব্দটি মাথাব্যথা সারানোর ওষুধ বোঝাতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু এগুলি এসেছিল আরবী শব্দ 'সুদা' থেকে, তার অর্থ—মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। অস্ত্রশস্ত্রের কিছু পরিভাষার মতো চিকিৎসাবিদ্যার বেশ কিছু শব্দও অনূদিত হয়েছিল। আরবী শব্দ আল-উম্ম-আল জাফিয়া স্থূলাঙ্গী জননী এবং আল-উম্ম আল-রাকিকা ক্ষীণাঙ্গী জননী এর ল্যাটিন প্রতিশব্দ হল 'ডুরা মেটার' ও 'পিয়া মেটার'। রসায়নবিদ্যার যে সমস্ত শব্দ আরবী ভাষায় রচিত বইগুলি থেকে ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার জন্য জাবির ইবন-হায়্যান ও অন্যান্য মুসলিম রসায়নবিদদের কৃতিত্ব দেওয়া যায়। এর মধ্যে 'অ্যালকোহল'[১০০], 'অ্যালমবিক'[১০১], 'অ্যালকালি (আল-কালি), 'অ্যান্টিমনি'[১০২], 'অ্যালুডেল'[১০৩] রিয়েলগার[১০৪] ও টুট্টি[১০৫] উল্লেখযোগ্য।

● দর্শনশাস্ত্র

স্পেনের আরবীয় বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল দর্শনগত চিন্তার ক্ষেত্রে। যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের এবং প্রাচ্যে তাদের সম-ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা গ্রিক দর্শন অন্য রূপে ল্যাটিনভাষী পশ্চিমি দুনিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল, এখানে তারা তার শেষ ও শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষত বিশ্বাস ও যুক্তি, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মৈত্রী সাধনের মধ্য দিয়ে এটা তাদের অবদানকে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছিল। মুসলিম চিন্তানায়কদের কাছে অ্যারিস্টটল, প্লেটো ও কোরান প্রত্যেকেই ছিল সত্য। কিন্তু সত্য একটাই হওয়া উচিত, আর সেই কারণেই তিনটির মধ্যে ঐক্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেই কাজে তারা নিজেরাই নিজেদের নিয়োজিত করে। খ্রিস্টান পণ্ডিতরাও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ামি ও রহস্যময়তার জন্য তাদের কাজ অনেক বেশি শক্ত হয়ে উঠেছিল। গ্রিকদের সৃষ্ট দর্শনশাস্ত্র ও হিব্রু ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা উদ্ভাসিত একেশ্বরবাদী ধর্ম ছিল প্রাচীন পশ্চিমি ও পূর্ব দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহ্য। মধ্যযুগে বাগদাদ ও আন্দালুসিয়ার মুসলিম চিন্তানায়কদের চিরন্তন গৌরব ছিল এই যে, দুটি ধারার চিন্তার মধ্যে তারা ঐক্য সাধন

করেছিল এবং তা ইউরোপে প্রেরণ করেছিল। পরবর্তী যুগের ধর্মতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার ওপর এর প্রভাবের কথা বিচার করলে তাদের অবদানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে হয়।

পশ্চিম ইউরোপে এই নতুন দার্শনিক চিন্তার অনুপ্রবেশের ফলে সেখানে 'অন্ধকার যুগ'-এর অবসান এবং জ্ঞানচর্চার উষাকালের সূচনা হয়। আরবীয় দর্শনচিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়ে জ্ঞানচর্চা ও দর্শন চর্চায় ইউরোপীয়দেয় আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ফলেই তাদের মধ্যে একটি স্বাধীন ও দ্রুতগতিতে বিকাশমান বৌদ্ধিক জীবন গড়ে ওঠে এবং আমরা আজও তার ফল ভোগ করছি।

● বেন গ্যাবিরল

আরব-অধ্যুষিত স্পেনের প্রথম দিককার দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিল সলোমন বেন-গ্যাবিরল[১০৬] (অ্যাভিসব্রন, অ্যাভেন্সব্রল)। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি। সলোমন ১০২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মালাগায় জন্মেছিলেন এবং ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেনসিয়াতে মারা যান। পশ্চিমি দুনিয়ায় নয়া-প্লেটোনিক মতবাদের প্রথম মহান শিক্ষক বেন-গ্যাবিরলকে প্রায়ই ইহুদি প্লেটো হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তার পূর্ববর্তী ইবন-মাসাররার[১০৭] মতো তিনিও ছিলেন এমপেডোক্লিস সৃষ্ট দর্শনচিন্তার অন্যতম প্রবক্তা। তার সময় থেকে এক হাজার বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়ার হেলেনিস্টিক ইহুদি দার্শনিক ফিলো প্লেটোর দর্শনতত্ত্বের প্রাচ্যের উপযোগী রূপদান করেছিলেন। পরবর্তী কালে সেই দর্শনতত্ত্বের খ্রিস্টিয় ও ইসলামিয় ধর্মবিশ্বাসের উপযোগী রূপ ও গ্রেকো-মুসলিম দর্শনের মাধ্যমে বেন-গ্যাবিরলের দ্বারা তা পুনরায় পাশ্চাত্যের উপযোগী রূপ গ্রহণ করে এবং ইউরোপে পুনরায় তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ইয়ানবু আল-হায়্যাহ্ (জীবনের ঝরনা)[১০৮] ছিল বেন-গ্যাবিরলের প্রধান রচনা। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে ফনস ভিটো নামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এই বইটি মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চায় একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে ফ্র্যান্সিস্ক্যানদের (সেন্ট ফ্র্যান্সিস কর্তৃক স্থাপিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়) তারা উদ্বুদ্ধ করেছিল।

● ইবন-বাজ্জাহ্

মুসলিম স্পেনে দর্শনচিন্তার ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দীটি ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই আবু-বকর মুহাম্মাদ ইবন-ইয়াহিয়া ইবন-বাজ্জার (অ্যাভেনপেস, অ্যাভেমপেস) আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অ্যারিস্টটলের দর্শনের ভাষ্যকার। গ্রানাডা ও সারাগোসায় তার কর্মজীবন অতিবাহিত হয় এবং ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাস-এ তার মৃত্যু ঘটে। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর ইবন-বাজ্জাহ্ অনেক মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তার মধ্যে তিনি টলেমির ধারণাগুলির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এভাবেই তিনি একদিকে যেমন ইবন-তুফাইল ও আল-বিতরূজির পথ প্রশস্ত করেছিলেন, তেমনি

অন্যদিকে মেটিরিয়া মেডিকা ও ওষুধপত্র অন্যান্য মৌলিক প্রবন্ধ রচনার পটভূমি তৈরি করেছিলেন। মেটেরিয়া মেডিকা সংক্রান্ত তার প্রবন্ধের কথা ইবন-আল-বাইতারের লেখা থেকে জানতে পারা যায়। আর ওষুধপত্র সম্পর্কে লেখা তার প্রবন্ধগুলি ইবন-রুশদের [১০৯] ওপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এক বন্ধুকে লেখা বিদায় সম্ভাষণ মূলক একটি চিঠি ছাড়া তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বইটি এখনও অক্ষত রয়েছে সেটি একটি দর্শন-সংক্রান্ত প্রবন্ধ। সেটির নাম হল তদ্‌বীর আল-মুতাওয়াহ্‌হিদ (ডি রেজিমাইন সলিটারি, দ্য রেজিম অফ দি সলিটারি), কেবলমাত্র হিব্রু ভাষায় লেখা বইটির অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। কোন সাহায্য না পেয়েও মানুষ সেই পরম ভাবের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তার বর্ণনা করাই বইটির উদ্দেশ্য। এছাড়া, সেই পরম শক্তি বা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের মধ্যে দিয়ে মানুষের আত্মা কীভাবে ধীরে ধীরে নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জন করে, তা শিক্ষা দেওয়াই দর্শনের উদ্দেশ্য। মুসলিম জীবনীকারেরা অবশ্য ইবন-বাজ্জাকে একজন নাস্তিক [১১০] বলেই গণ্য করেছেন।

ইবন-বাজ্জার দার্শনিক ধ্যানধারণাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যান আবু-বকর[১১১] মুহাম্মাদ ইবন-আবদ আল-মালিক ইবন-তুফাইল[১১২]। তিনি ছিলেন একজন নয়া-প্লেটোনিয় দার্শনিক এবং গ্রানাডায় তিনি চিকিৎসার কাজে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুয়াহ্‌হিদ খলিফা আবু-ইয়াকুব ইউসুফ (১১৬৩-৮৪)-এর উপদেষ্টা ও মুখ্য রাজচিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে একটি মুসলিম রাজ্যে একাধিক কাজে নিযুক্ত হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজচিকিৎসকের পদ ত্যাগ করেন এবং তার বন্ধু ও দার্শনিক ইবন-রুশদ সেই পদে নিযুক্ত হন। অবশ্য তিনিই খলিফাকে ওই পদে ইবন রুশদকে নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে রক্ষণশীল ও দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতায় উদার মুয়াহ্‌হিদ রাজবংশের দরবারকে চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তিতে ভাস্বর করে তুলেছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ইবন-তুফাইল জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে মুয়াহ্‌হিদ রাজবংশের রাজধানী মাররাকুশে মারা যান। তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক খলিফা আবু-ইউসুফ আল-মানসুর (১১৮৪-৯৯) সেখানে ইবন-তুফাইলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। তার অতি সুন্দর সৃষ্টি হল দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ একটি বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। বইটির নাম হাই ইবন-ইয়াকজান (জীবন্ত ব্যক্তি, এক প্রহরীর পুত্র)।[১১৩] কোন বাইরের শক্তির সাহায্য ছাড়াই মানুষ নিজের ক্ষমতা বলেই পরম বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং পরম শক্তির ওপর তার নির্ভরশীলতাও সে উপলব্ধি করতে পারে—এটাই ছিল ওই বইটিতে বর্ণিত কাহিনীটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য। মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক ও শ্রেষ্ঠ আনন্দদায়ক এই কাহিনীটি এডওয়ার্ড পোকক (১৬৭১)[১১৪] সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তারপর এটি ডাচ (১৬৭২), রাশিয়ান (১৯২০) ও স্প্যানিশ (১৯৩৪)-সহ অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। কিছু কিছু মানুষ এর মধ্যে 'রবিনসন ক্রুসো'-বইটির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেন। এর মধ্যে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে। ইবন-সিনা রচিত একই নামের ছোট অথচ প্রাণহীন গল্প থেকে ইবন-তুফাইল

তার কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের নাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কাহিনীর মূল প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন আল-ফারাবি থেকে শুরু করে প্রথম দিককার অন্যান্য লেখকের কাহিনী থেকে।

● ইবন-রুশদ

পশ্চিমি দুনিয়ার ওপর প্রভাবের নিরিখে বিচার করে হিস্পানো-আরব জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের ভাষ্যকার আবু-আল-ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবন-আহমদ ইবন-রুশদকে (অ্যাভেরোজ) শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ইবন-রুশদ ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভার এমন এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে পরিবার থেকে বহু ধর্মতাত্ত্বিক ও কাযীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি নিজেই ১১৬৯-৭১ পর্যন্ত সেভিলের কাযী ছিলেন এবং দু'বছর পরে কর্ডোভাতেও ওই একই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। খলিফা আবু-ইয়াকুব ইউসুফ ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে ইবন-তুফাইলের পরিবর্তে তাকে রাজ-চিকিৎসক পদে নিযুক্ত করার জন্য তাকে মাররাকেশ-এ ডেকে পাঠান। দর্শনচর্চা করার জন্য প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী বলে সন্দেহ করে ইবন-রুশদকে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসিত করেন ইউসুফের পুত্র ও তার উত্তরসূরি আল-মানসূর; কিন্তু পরে আবার তাকে মাররাকুশে ওই পদে নিয়োগ করা হয়। সেখানে অল্প কিছুদিন পরেই ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর[১১৫] তিনি মারা যান। তার দেহাবশেষ পরে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করা হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবন-রুশদের মূল অবদান হল বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ একটি জ্ঞানকোষ। এই জ্ঞানকোষটির নাম আল-কুল্লিয়াত[১১৬] ফী আল-তিব্ব (চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে সর্বজনীন সত্য)। এই বইটির মধ্যেই এই সত্যের স্বীকৃতি আছে যে, কোন ব্যক্তিই দু'বার গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয় না এবং রেটিনা বা অক্ষিপটের কার্যকলাপও এতে ভালভাবে বোঝানো রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা ইবন-রুশদ চিকিৎসক রুশদকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছিল। অন্যান্য তত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ছাড়াও তার মূল দার্শনিক গ্রন্থ ছিল তাহাফুত আল-তাহাফুত[১১৭] (অসম্বদ্ধতার অসম্বদ্ধতা)। আল-গাজ্জালী যুক্তিবাদকে আক্রমণ করে তাহাফুত আল-ফালাসিফাহ (দার্শনিকদের অসম্বদ্ধতা[১১৮]) নামে যে বইটি লিখেছিলেন, তার প্রত্যুত্তরেই রুশদের বইটি লেখা হয়েছিল। তার এই বইটির জন্যই তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, এই পরিচিতিটা কেবলমাত্র মুসলিম দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান দুনিয়ায় তিনি প্রধানত অ্যারিস্টটল তত্ত্বের ভাষ্যকার রূপেই পরিচিত ছিলেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মধ্যযুগের একজন তত্ত্বব্যাখ্যাতা হলেন সেই লেখক যিনি পূর্বের লেখাকে পটভূমি ও কাঠামো রূপে ব্যবহার করে একটি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক রচনা সৃষ্টি করতে পারেন। ইবন-রুশদের তত্ত্বব্যাখ্যাও ছিল বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের সমষ্টি এবং এগুলি রচনার ক্ষেত্রে তিনি আংশিকভাবে অ্যারিস্টটলের রচনার শিরোনাম ব্যবহার করেছেন ও সেগুলির বিষয়বস্তুকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ইবন-রুশদ গ্রিক ভাষা জানতেন না, তাই বাগদাদে তার পূর্বসূরিরা অ্যারিস্টটলের রচনার

যে অনুবাদ করেছিলেন তার ওপর নির্ভর করেই তিনি অ্যারিস্টটল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। অ্যারিস্টটল তত্ত্বের ওপর তার ভাষ্য তিনটি ভাগে বিভক্ত—একটি সংক্ষিপ্ত, জামি (সারাংশ), একটি অন্তবর্তী, তালখিস (পুনরায় চালু করা), তৃতীয়টি দীর্ঘ, তফসির বা শারহ্ (ভাষ্য)[১১৯]। ইবন-রুশদের অধিকাংশ ভাষ্যই হিব্রু ভাষায় বা হিব্রু থেকে ভাষান্তরিত করে ল্যাটিন ভাষায় সংরক্ষিত আছে। অল্প কয়েকটি আরবী ভাষায় সংরক্ষিত আছে, তাও সেগুলি হিব্রু অক্ষরে[১২০] লেখা।

আরবী ভাষায় যে সমস্ত মহান মুসলিম দার্শনিকরা লিখতেন, ইবন-রুশদ ছিলেন তাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি। কিন্তু ইসলামি দুনিয়ায় তিনি কোন উত্তরসূরি সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। মুসলিম ধর্মাবলম্বী এশিয়া বা আফ্রিকার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে তিনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। পাশ্চাত্যে তিনি পরিণত হয়েছিলেন 'ভাষ্যকার'[১২১] এবং অ্যারিস্টটল হয়েছিলেন 'শিক্ষক'। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গ্রিক গ্রন্থের সিরীয় ভাষান্তর থেকে করা আরবী অনুবাদের ওপর আরবী ভাষায় রচিত ভাষ্যের হিব্রু ভাষান্তরের ল্যাটিন অনুবাদকে তিনি ব্যবহার করেছেন, তবুও ইবন-রুশদের মতো আর কোন লেখকই খ্রিস্টান পণ্ডিত ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মনকে এত প্রবলভাবে আলোড়িত করতে পারেনি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অ্যাভেরোইজম-ই ছিল চিন্তার প্রধান ধারা। কিন্তু রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও প্রথমে স্পেনের মুসলিমদের মধ্যে এবং পরে তালমুডিস্ট ও শেষে খ্রিস্টান যাজকদের মধ্যে এই চিন্তাই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইবন-রুশদ ছিলেন একজন যুক্তিবাদী। এবং ধর্মবিশ্বাসের গোঁড়ামি ছাড়া আর সব কিছুকেই তিনি যুক্তিভিত্তিক বিচারের সামনে দাঁড় করানোর অধিকার দাবি করেছিলেন। কিন্তু তিনি মুক্ত চিন্তার অধিকারী বা অবিশ্বাসী ছিলেন না। ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিবর্তনমূলক; দিনের বিচারে নয়, কিন্তু চিরন্তনতার নিরিখে। প্রথম দিককার অ্যারিস্টটলপন্থি মুসলিম দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলের বেশ কয়েকটি অপ্রামাণিক রচনাবলিকে তার প্রকৃত রচনাবলি বলে গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি নয়া-প্লেটোনিক রচনাবলিও ছিল। কিন্তু ইবন-রুশদের দর্শন ছিল আরও বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যারিস্টটলীয় দর্শন। গির্জার যাজক কর্তৃপক্ষ তার লেখার আপত্তিকর অংশ বাদ দেবার পর ইবন-রুশদের রচনাবলি প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠ্যবই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। তার সমস্ত উৎকর্ষ ও ভ্রান্ত ধারণাকে মেনে নিয়েও বলা যায়, আধুনিক গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানের জন্মের আগে পর্যন্ত ইবন-রুশদের দ্বারা সূচিত বৌদ্ধিক আন্দোলন ইউরোপীয় চিন্তার ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল।

● ইবন-মাইমুন

ইবন রুশদের পর ওই যুগের দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম স্থানের একমাত্র দাবিদার ছিলেন তার সমসাময়িক ইহুদি দার্শনিক ও কর্ডোভার সহ-নাগরিক আবু-ইমরান মুসা ইবন-মাইমুন (হিব্রুতে,

মোশেহ বেন-মাইমন[১২২], ল্যাটিনে, মাইমোনাইডস)। গোটা আরবীয় যুগে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত হিব্রু চিকিৎসক ও দার্শনিক। তিনি ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে[১২৩] কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মুয়াহ্হিদ খলিফার নির্যাতনের ফলে তার পরিবার দেশ ত্যাগ করেন এবং ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কায়রোতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। স্পেনে থাকার সময়ে ইবন-মাইমুন প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মাচরণ পালন করলেও গোপনে তিনি ইহুদি ধর্মাচরণ পালন করতেন-এ সংক্রান্ত আল-কিফ্তি[১২৪] ও ইবন-আবি-উসাইবিয়ার[১২৫] দাবি সম্প্রতি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কায়রোতে ইবন-মাইমুন বিশিষ্ট খলিফা সালাহ্-আল-দীন ও তার পুত্র আল-মালিক আল-আযীযের রাজদরবারে চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১১৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি কায়রোতে ইহুদি সম্প্রদায়ের[১২৬] প্রধান ধর্মীয় পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেখানেই ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। ইচ্ছানুযায়ী তার মরদেহ মোজেসের একসময়ের চলার পথ ধরে মানুষের দ্বারা বাহিত হয়ে টিবেরিয়াসে আসে এবং সেখানেই সমাধিস্থ হয়। টিবেরিয়াসে নির্মিত তার নিরহঙ্কার সমাধিটি এখনও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী দেখতে যান। আধুনিক মিশরের অসুস্থ গরিব ইহুদিরা এখনও তাদের রোগ সারানোর জন্য কায়রোতে অবস্থিত রাব্বি মোশেহ্ বেন-মাইমুনের উপাসনাস্থলের ভূগর্ভস্থ ঘরে রাত কাটান।

ইবন-মাইমুন একজন জ্যোতির্বিদ, ধর্মতাত্ত্বিক, চিকিৎসক ও সর্বোপরি একজন দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার চিকিৎসাবিজ্ঞান ছিল আল-রাযী, ইবন-সিনা ও ইবন-যুহর থেকে সংগৃহীত ওই সময়ের উন্নত মানের গ্যালেনিজম। তা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যুক্তিবাদী সমালোচনার আঘাতে আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ইবন-মাইমুন খাৎনা পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়েছিলেন, কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্য হেমোরয়েডকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাদের জন্য হালকা নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে বলেছিলেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কেও উন্নত চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। চিকিৎসা-সংক্রান্ত তার সবচেয়ে জনপ্রিয় বইটির নাম আল-ফুসুল ফী আল-তিব্ব (ওষুধপত্রের সংক্ষিপ্ত সূত্র)। তার অগ্রণী দার্শনিক রচনাটির নাম দালালাত আল-হাইরিন[১২৭] (হতভম্বদের জন্য পথপ্রদর্শক)। এই বইটিতে তিনি ইহুদি ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম অ্যারিস্টটলিয়ানিজম, বা আরও বিস্তৃত অর্থে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ধর্মতাত্ত্বিকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা দূরদর্শিতাকে তিনি দৈহিক অভিজ্ঞতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বাইবেলের মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমর্থকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং তার ফলে রক্ষণশীল ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছে। এই রক্ষণশীল ধর্মতাত্ত্বিকেরাই তার বইটিকে যালালাহ (ভুল পরামর্শ, ভুল) বলে আখ্যা দিয়েছে। স্বাধীনভাবে গড়ে উঠলেও তার দর্শনচিন্তার সঙ্গে ইবন-রুশদের দর্শনচিন্তার মিল পাওয়া যায়। ইবন-রুশদের মতো তিনিও গ্রিক ভাষা জানতেন না এবং আরবী অনুবাদের ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করেছেন। তিনি যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তা ছিল পরমাণু তত্ত্ব। অবশ্য তিনি এর বিভাজন করেননি। আরবী-ভাষায় যে সমস্ত দার্শনিকেরা লেখালেখি করতেন তাদের দ্বারা প্রচারিত অন্য দুটি তত্ত্ব

ছিল মৌলবাদী তত্ত্ব এবং নিও-প্লেটোনিক ও অ্যারিস্টটলীয় দার্শনিক তত্ত্ব। মৌলবাদী তত্ত্বের মূলকথা হল, আল্লাহ্ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই দুটি তত্ত্ব থেকেই তার দার্শনিক তত্ত্ব ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার রচনাবলির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেগুলি হিব্রু অক্ষরে এবং আরবী ভাষায় লেখা হয়েছিল। সুতরাং সেগুলি খুব শীঘ্রই হিব্রু ভাষায় ও পরে আংশিকভাবে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। সময় ও কালের নিরিখে সেগুলির দূর-প্রসারী প্রভাব পড়েছিল মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেগুলিই ছিল প্রধান মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে ইহুদিদের চিন্তাভাবনা কৌলিন্যে পৌঁছেছিল। আধুনিক সমালোচকদের মতে, ডমিনিক্যান সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টান সাধুদের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল। আলবার্টাস ম্যাগনাস, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডানস স্কটাস, স্পিনোজা ও এমন কী কান্টের রচনাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

● রহস্যবাদী ইবন-আরাবি

ওই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রহস্যবাদী ছিলেন আর এক হিস্পানো-আরব। তার নাম আবু-বকর মুহাম্মাদ ইবন-আলী মুহ্ঈ-আল-দিন ইবন-আরাবি[...]। তিনি ছিলেন ইসলামি সুফিবাদের সবচেয়ে বড় দূরকল্পী প্রতিভা। ইবন-আরাবি ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে মার্সিয়া (মারসিয়াহ্)-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১২০১-০২ সালের আগে পর্যন্ত তার কর্মজীবন বিকশিত হয়েছিল। তারপর তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা করেন এবং ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে[...] দামাস্কাসে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি প্রাচ্যেই জীবন অতিবাহিত করেন। সেখানে একটি মসজিদের মধ্যে তার সমাধি এখনও দণ্ডায়মান। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান জগতের ব্যবস্থার মতো দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্যেও মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তিতে এক বিরাট সংগঠনের সূচনা হয়। ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ (ইশরাকি) বা মেকী-এমপেডোক্লিনের নিও-প্লেটোনিক ও সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার প্রতিনিধি ইবন-আরাবি সুফি আন্দোলনকে দূরকল্পী দর্শনের কাঠামোগত আকৃতি দিয়েছিলেন। নিও-প্লেটোনিক ও সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার জনক ছিলেন যথাক্রমে ইবন-মাসাররা ও বেন-গ্যাবিরল। প্রাচ্যে এই চিন্তার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন আল-সুহরাওয়ার্দি (মৃ. ১১৯১)। তিনি ছিলেন পারস্য বংশজাত। এই বংশ পরিচয় ও আলোর দর্শনের ওপর বেশি গুরুত্ব তার ওপরকার ম্যানিকিয়ান ও জোরাস্ট্রিয়ান প্রভাবের পরিচয় দেয়। তার মুখ্য রচনা হল হিকমত আল-ইশরাক (ঔজ্জ্বল্যের জ্ঞান)। ওই চিন্তার অনুসারীদের ওই নামে ডাকা হত। কারণ তাদের রহস্যতত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ্ ও শক্তির জগৎ হল আসলে আলোকরশ্মির সমষ্টি এবং তাকে মেনে নেবার যে প্রক্রিয়া তা আসলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের[...] শক্তির অন্তর্বর্তী মাধ্যমের দ্বারা ওপর থেকে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির প্রণালী। তার অনুগামীদের কাছে ইবন-আরাবি ছিলেন আল-শায়খ আল-আকবর বা মহান শিক্ষক। বিশালাকার রচনাবলির[...] মাধ্যমে তার দর্শনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী বই দুটির নাম হল আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়া[...] (মক্কার রহস্যোদঘাটন) এবং ফুসুস আল-হিকাম[...] (জ্ঞানগর্ভ কর্মবিধির সমুজ্জ্বল

বৈশিষ্ট্য)। ফুতুহাত[১৬৪]-এর ১৬৭তম অধ্যায়টির নাম কিমিয়া আল-সাআদাহ্ (সৌভাগ্যের পরশমণি)। এতে মানুষের স্বর্গে আরোহণ সম্বন্ধে একটি রহস্যময় রূপক কাহিনী আছে। এখনও অপ্রকাশিত আল-ইসরা ইলা মাকাম আল-আসরা (সবচেয়ে মহানুভবের উদ্দেশ্যে নৈশযাত্রা) নামে আর একটি বইতে তিনি সপ্তম স্বর্গে মুহাম্মাদের আরোহণ বর্ণনা করেছেন। আর এই সপ্তম স্বর্গে পয়গম্বরের ভ্রমণবৃত্তান্তের বর্ণনা ইবন-আরাবি করেছিলেন দান্তের[১৬৫] আগে।

বিচারশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইবন-আরাবি তার সমসাময়িক ইবন-হাজমের মতো জাহিরি (আক্ষরিকতাবাদী) চিন্তাধারার প্রতিনিধি ছিলেন। দূরকল্পী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি বাতিনি (রহস্যবাদী)[১৬৬] বলে গণ্য হতেন এবং দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী ব্যক্তি। তার ওয়াহদাত আল-উজুদ (অস্তিত্বের ঐক্য) তত্ত্ব তার সেই পরিচয়েরই সাক্ষ্য বহন করে। তার তত্ত্বের মূল বক্তব্য ছিল আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যেই ভাব (আয়ান যাবিতা) হিসেবে সেই বস্তু বিরাজ করত, সেখান থেকেই সেই ভাবের জন্ম ও সেখানেই তার বিলুপ্তি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ্ হল অন্তর্নিহিত বস্তু এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল তার বাহ্যিক প্রকাশ। নির্যাস ও তার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও বিশ্বজগতের মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য নেই। এখানেই মুসলিম রহস্যবাদ শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরবাদে পরিণত হয়। আল্লাহ্‌র প্রকাশ ঘটে মানুষের মধ্য দিয়েই এবং মুহাম্মাদই হলেন পরিপূর্ণ মানুষ (আল-ইনসান আল-কামিল)। যীশুর মতো মুহাম্মাদও ছিলেন কালিমাহ্, বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী সক্রিয় শক্তি। ইবন-আরাবির বিচারে, প্রকৃত রহস্যবাদীর অবশ্যই একজন পথপ্রদর্শক থাকে—সেটি হল তার অন্তর্নিহিত চেতনার আলো এবং তিনি সমস্ত ধর্মেই[১৬৭] আল্লাহ্‌কে দেখতে পান।

আলোক-ভিত্তিক চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় স্পেনীয় প্রতিনিধি ছিলেন ইবন-আরাবি। এই চিন্তার প্রভাব কেবলমাত্র পারসি ও তুর্কি সুফি সম্প্রদায়ের[১৬৮] মধ্যেই পড়েনি, তা এমন কী দানস স্কটাস, রজার বেকন ও রেমণ্ড লুলের[১৬৯] মতো তথাকথিত অগস্টিনিয়ান পণ্ডিতদের মধ্যেও পড়েছিল। আবু-মুহাম্মাদ আবদ-আল-হাক ইবন-সাবঈন (১২১৭-৬৯) নামে আর এক মার্সিয়ান ইবন-আরাবির মতো একই চিন্তা ও লেখনীর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সুফি সম্প্রদায়ে তার খ্যাতি তাকে ঈর্ষনীয় খেতাব কুত্‌ব-আল-দীন (ধর্মের সেতু জয় করে এনে দিয়েছিল)। বস্তুর চিরন্তনতা, আত্মার প্রকৃতি ও অবিনশ্বরতা, ধর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য এবং হোহেনস্টফেনের দ্বিতীয় ফ্রেডারিক দ্বারা জিজ্ঞাসিত ও মুয়াহ্‌হিদ খলিফা আবদ-আল-ওয়াহিদ আল-রশীদ (১২৩২-৪২) দ্বারা প্রেরিত একই ধরনের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি আল-আজভিবা আন আল-আসইলাহ্ আল-সিকিল্লিয়া[১৭০] (সিসিলিয় প্রশ্নাবলির উত্তর) নামে যে বইটি লিখেছিলেন, তার জন্যই ইবন-সাবঈন বেশি পরিচিত। ইবন-সাবঈন তখন সেউতায় বাস করছিলেন এবং ইসলামি নৈষ্ঠিকতার আলোকে কিছুটা বিস্তৃতভাবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সিসিলির খ্রিস্টান সম্রাটের একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রশ্নাবলির সঙ্গে যুক্ত টাকা প্রত্যাখ্যান

করেছিলেন। ইবন-সাবঈনের অন্যতম অগ্রণী বই হল আসরার আল-হিকমা আল-মাশরিকিয়াহ্ (আলোক ভিত্তিক দর্শনের রহস্য)। এই বইটি এখনও অপ্রকাশিত। ইতিহাসে বিরল মুসলিমদের মধ্যে তিনি একজন যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। মক্কায়[১৪১] সাময়িকভাবে যখন তিনি ছিলেন তখন কবজির একটি শিরা কেটে দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

● অনুবাদের কেন্দ্র টলেডো

আরবীয় পাণ্ডিত্যের সম্পদকে পশ্চিমি দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে টলেডো মূল ভূমিকা পালন করেছিল। ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান বিজয়ের পর থেকেই এটি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছিল। আর্চবিশপ প্রথম রেমণ্ড (১১২৬-৫২)-এর উদ্যোগে এখানে অনুবাদের একটি নিয়মিত শিক্ষালয় চালু হয়েছিল। ১১৩৫ থেকে ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখানে একদল অনুবাদকের আবির্ভাব ঘটেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অংশ, এমন কী ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকেও পণ্ডিতেরা এখানে আসত। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকেই মাইকেল স্কট ও চেস্টার[১৪২] থেকে রবার্ট এখানে এসেছিল। ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট সর্বপ্রথম আল-খওয়ারিজমির বীজগণিতের অনুবাদ করেছিল; ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে পিটার দ্য ভেনারেবলের জন্য তিনি হারম্যান দ্য ডালমেশিয়ানের সঙ্গে কোরানের ল্যাটিন অনুবাদ সমাপ্ত করেন। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রচারকদের আদেশেই মুসলিম ও ইহুদিদের কাছে মিশনারীদের পাঠানোর উদ্দেশ্যেই ইউরোপের মধ্যে টলেডোতেই সর্বপ্রথম প্রাচ্য-সংক্রান্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

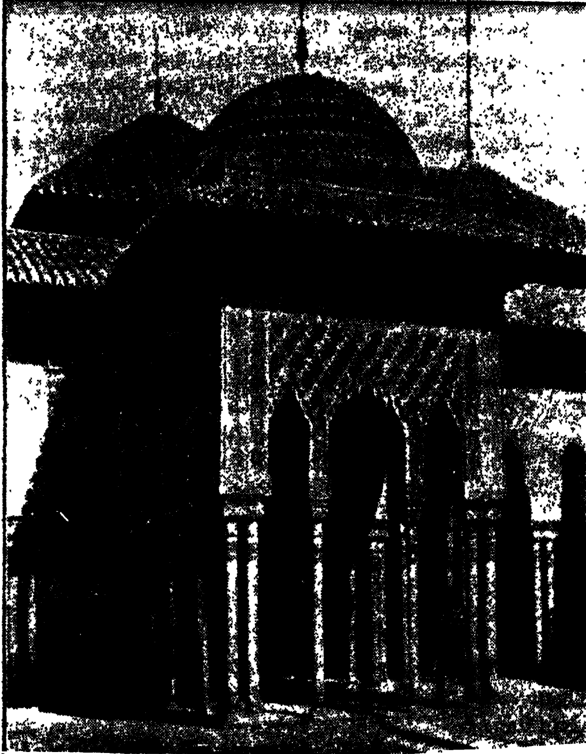
বাথ-এর অ্যাডেলার্ড এই সময়ে স্পেনে গিয়েছিলেন। রজার বেকনের পূর্বে ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানের জগতে তিনিই ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সিসিলি ও সিরিয়াতে কিছুদিন থাকার পর অ্যাডেলার্ড ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে আল-মাজরিতির জ্যোতির্বিদ্যার সারণিটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই সারণিটি আল-খওয়ারিজমির সারণির ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল এবং এর মধ্যে সাইন-এর তালিকাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার আরও কয়েকটি গবেষণামূলক রচনার অনুবাদ করেছিলেন এবং আরবী ভাষা বা সাহিত্যে পণ্ডিত ইংরেজদের দীর্ঘ সারিতে তার স্থান ছিল প্রথম। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী মাইকেল স্কট (মৃ. ১২৩৬) ছিলেন ল্যাটিন অ্যাভেরোইজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজ-জ্যোতিষী হবার আগে তিনি স্পেনে পড়াশোনা ও কাজকর্ম করেছিলেন। টলেডোতে তিনি অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে আল-বিতরুজির জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বই আল-হায়্যাহ্ এবং অ্যারিস্টটল রচিত ডি কোয়েলা এট মানডো, ইবন-রুশদ-এর ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করেছিলেন। সিসিলিতে থাকাকালীন সময়ে তিনি অন্যান্য আরবীয় বইপত্র অনুবাদ করেছিলেন এবং সেগুলিকে তিনি রাজা ফ্রেডারিকের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অ্যারিস্টটলের প্রাণীবিদ্যা-সংক্রান্ত বই অ্যাব্রিভিয়েশিও অ্যাভিসেনি ডি অ্যানিমালিবাস নামক ইবন-সিনার অনুবাদ। টলেডোর

অনুবাদকদের মধ্যে সবচেয়ে ফলপ্রসূ ছিলেন ক্রেমোনার অধিবাসী জেরার্ড। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর আগে তিনি মোট ৭১টি আরবী বইকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এর মধ্যে আল-ফারগাণী অনূদিত টলেমি-র অ্যালমাজেস্ট, অ্যারিস্টটল সম্পর্কে আল-ফারাবির ভাষ্য, ইউক্লিডের এলিমেন্টস এবং অ্যারিস্টটল, গ্যালেন ও হিপোক্রেটিসের বিভিন্ন গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

রক্ষণশীল ও ধর্মান্তরিত—উভয় শ্রেণীর ইহুদিরাই এই অনুবাদের কাজে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথম দিককার এই অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টলেডোর আব্রাহাম বেন-এজরা (মৃত, ১১৬৯) বাইবেলের একজন বিখ্যাত ভাষ্যকার এবং তার পূর্বসূরি প্রাচ্যের এক সম-ধর্মাবলম্বী মাশাআল্লাহ্[১৩৩] (মৃ. ৮১৫) রচিত জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের তিনি অনুবাদ করেছিলেন। আল-খওয়ারিজমির তালিকার ওপর আল-বিরুনীর ভাষ্যেরও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বেন-এজরার সমসাময়িক এবং ধর্মান্তরিত ইহুদি সেভিলের অধিবাসী জন (জোয়ানেস হিস্পালেনসিস. প্রায়ই একজন মোজারাব খ্রিস্টানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হত)-এর কর্মজীবন ১১৩৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দে টলেডোতে বিকশিত হয়েছিল। তিনি আর্চবিশপ রেমণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং আল-ফরগানি; আবু-মা'শার, আল-কিন্দি, বেন-গ্যাবিরল ও আল-গাজ্জালীর পাটিগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনের বই তিনি অনুবাদ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আল-ফরগানির জ্যোতির্বিদ্যা। জন আরবী ভাষায় রচিত বইগুলিকে তার মাতৃভাষা ক্যাস্টিলিয়তে এবং তার এক সহকারী ক্যাস্টিলিয় থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে আরবীয় বিজ্ঞান ও দর্শন ইউরোপে প্রচারিত হয় এবং অন্তর্বর্তী মাধ্যম রূপে স্পেনের কাজগুলিও সম্পন্ন হয়। টলেডো থেকে পিরেনিজের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধিক আন্দোলনের গতিধারা প্রভাঁস অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল এবং আলপাইন[১৩৪] থেকে তা লোরেন, জার্মানি, মধ্য ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ড[১৩৫] পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের যে সমস্ত শহরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলি হল—মার্সেইল, যেখানে বসেই রেমণ্ড ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে টলেডোর সারণির ওপর ভিত্তি করেই গ্রহ-নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করেছিলেন, তুলুজে ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে হারম্যান দ্য ডালমেশিয়ান টলেমি-র রচনা প্ল্যানিসফোরিয়াম-এর আল-মাজরিতি কৃত অনুবাদের ভাষান্তর করেছিলেন; নারবোনে বসে আব্রাহাম বেন-এজরা ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে আল-খওয়ারিজমিকৃত সারণি-সংক্রান্ত আল-বিরুনীর ভাষ্যের অনুবাদ করেছিলেন এবং মন্টপেলিয়ার, যে শহরটি ত্রয়োদশ শতাব্দিতে ফ্রান্সের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পূর্ব ফ্রান্সের ক্লুনি শহরের বিখ্যাত মঠগুলি বেশ কিছু স্পেনীয় সন্ন্যাসীর আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল এবং দ্বাদশ শতকে আরবীয় শিক্ষার ব্যাপ্তিতে তাৎপর্যপূর্ণ আলোকপাত করেছিল। মঠাধ্যক্ষ পিটার দ্য ভেনারেবল ইসলাম-বিরোধী বহু প্রচার পুস্তিকার পাশাপাশি কোরানের প্রথম ল্যাটিন অনুবাদে সাহায্য করে ছিলেন (১১৪১-৪৩)। দশম শতাব্দীতে লোরেন (লোথারিঙ্গিয়া)

শহরে আরবীয় বিজ্ঞানের প্রচলন হয়েছিল এবং তার ফলে এটি পরবর্তী দু'শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানকার অন্যান্য শহরের মধ্যে লিজ, জর্জ ও কোলন হয়ে উঠেছিল আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সবচেয়ে উর্বর ভূমি। লোরেন থেকেই তা জার্মানির অন্যান্য অঞ্চলে বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং লোরেনে জন্ম বা শিক্ষিত এমন মানুষের দ্বারা তা নর্মান ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হয়েছিল। উত্তরের জার্মান রাজা ও স্পেনের মুসলিম শাসকদের মধ্যে প্রায়ই দূত বিনিময়



আলহামব্রার রাজদরবার, গ্রানাডা

হত এবং তা বৌদ্ধিক আদান-প্রদানের দিক থেকে ফলপ্রসূও হয়েছিল। ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জার্মানদের রাজা অটো দি গ্রেট দূত হিসেবে জন নামে এক লোথারিঙ্গিয়ান সন্ন্যাসীকে পাঠিয়েছিলেন। সেই সন্ন্যাসীটি প্রায় বছর তিনেক কর্ডোভায় বাস করেছিলেন, সম্ভবত আরবী শিখেছিলেন এবং সেখান থেকে বিজ্ঞানচর্চার অনেক পাণ্ডুলিপি[১২৬] সঙ্গে করে এনেছিলেন। এইভাবেই স্পেনীয়-আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ❑

● টীকা ●

১ সাআলিবি-র ইয়াতিমা, ১ম খণ্ড ৪০৯ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৩৮-৪০ পাতা দেখুন।

২ ইয়াকৃত-এর উদাবা, ২য় খণ্ড, ৬৭-৭২ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৫৬-৫৮ পাতা দেখুন।

৩ বিভিন্ন সংস্করণ, কোনটাই সমালোচনামূলক নয়। এখানে ব্যবহৃত একটির তিনটি খণ্ড আছে (কায়রো, ১৩০২)।

৪ ইয়াকৃত, উদাবা, ৫ম খণ্ড, ৮৭ পাতা।

৫ ২য় খণ্ড, ২২ পাতা।

৬ ২৩৩ পাতা।

৭ সম্পাদনা: ডি কে পেটরফ (লিডেন, ১৯১৪); অনুবাদ: এ আর নাইকল, দি ডাভস নেক-রিং অ্যাবাউট লাভ অ্যাণ্ড লাভারস (প্যারিস, ১৯৩১)।

৮ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন সংস্করণ নেই। এখানে ব্যবহৃত একটির ৫টি খণ্ড আছে (কায়রো, ১৩৪৭-৪৮)। দেখুন, আসিন, অ্যাবেনহাজাম দ্য কর্ডোবা ওয়াই সু হিস্টোরিয়া ক্রিটিকা লাস আইডিয়াস রিলিজিওসাস, ৫ খণ্ড (মাদ্রিদ, ১৯২৭-৩২)।

৯ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৭৫-৭৭ পাতা।

১০ তুলনায়, মাররাকুশি, ৭৪ পাতা, ১.৫।

১১ মাররাকুশি, ৮৯ পাতা; ইবন-খাকান, ৯৮-৯৯ পাতা। তুলনায়, ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৭০ পাতা।

১২ দিওয়ান, সম্পাদনা : কামিল কিলানি ও আবদ-আল-রহমান খলিফা (কায়রো, ১৯৩২) ২৫৭-৫৮ পাতা; নিকলসনের অনুবাদ, লিটারারি হিস্টোরি, ৪২৫ পাতা।

১৩ ২য় খণ্ড, ৫৩৬-৬৩৯ পাতা।

১৪ ইবন-বাসাম, ৩৭৬ পাতা।

১৫ তার রচিত দিওয়ান ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। তার জীবন নিয়ে লেখা ইবন-খাকান, ২৩১-৪২ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ২৩-২৪ পাতা দেখুন।

১৬ জাহিদ আলি, তাবঈন আল-মাআনি ফী শারহ্ দিওয়ান ইবন-হানি (কায়রো, ১৩৫২), পাতা, ১ ও পরবর্তী।

১৭ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৬৭ পাতা; মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৪৪৪ পাতা।

১৮ কাঁধ থেকে নিতম্ব পর্যন্ত তির্যক ভাবে মেয়েদের শরীরে আঁটা বহুরঙা মুক্তাখচিত বেল্ট, উইশা-র সঙ্গে তুলনা করতে ওই নামে ডাকা হয়েছে।

১৯ ইবন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ৫২৪ পাতা। এ আর নাইকলের এল ক্যানসিওনারো (মাদ্রিদ, ১৯৩৩)-তে ইবন-কুজমানের কবিতাগুলি ছাপা হয়েছে।

২০ ইবন-খাকান, ২৭৩ পাতায় ভুলক্রমে নামটি দেওয়া হয়েছে; ইবন-খালদুন, মুকাদ্দামা, ৫১৯ পাতা।

২১ তার দিওয়ান ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বেইরুটে ছাপা হয়। তার সম্পর্কে জানতে কুতুবি, ফাওয়াত, ১ম খণ্ড, ২৯-৩৫ পাতা; মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৩৫১-৫৪ পাতা; সুআলা মুহাম্মাদ, ইব্রাহিম ইবন সাহল (আলজিয়ার্স, ১৯১৪)।

২২ আল-ইদরাক লি-লিসান আল-আতরাক, সম্পাদনা : আহ্‌মেদ কেফারোগলু (ইস্তামবুল, ১৯৩০-৩১); প্রথম বা দ্বিতীয় তুর্কি ব্যাকরণ।

২৩ কুতুবি, ২য় খণ্ড, ৩৫৬ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ৮২৩ ও পরের পাতা। অন্যান্য কবিদের সম্পর্কে জানতে ইবন-খালদূন, মুকাদ্দমা, ৫১৮-৩৪ পাতা দেখুন।

২৪ আসার, ৩৬৪ পাতা। বুলেটিন হিস্পানিক, ৪০তম খণ্ড (১৯৩৮) ৩৩৭ ও পরবর্তী পাতায় আর মেনেনডেজ পিডাল দেখুন। ওই বুলেটিন, ৪১ খণ্ড (১৯৩৯) ৩০৫-১৫ পাতায় এ আর নাইকল দেখুন।

২৫ আরবী শব্দ 'তারাব' থেকে এই শব্দটি এসে থাকতে পারে; এর অর্থ বাজনা, গান; রিবেরা, ডিসারটাসিয়োনেস, ২য় খণ্ড, ১৪১ পাতা।

২৬ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৫৩১ পাতা।

২৭ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন, ৫৬০ পাতা।

২৮ লামহা, ৯১-৯৬ পাতা। পরবর্তী বছরগুলিতে গ্রানাডা আবার স্পেনে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

২৯ মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ৩০২ পাতা।

৩০ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৩৪৭ পাতা।

৩১ ৩য় খণ্ড, ২৩৫ পাতা।

৩২ ইব্‌ন-আল-আব্বার, হুল্লাহ্‌, ১৩৭ পাতা।

৩৩ হার্টউইগ ডেরেনবার্গ-এর ২খণ্ড বিশিষ্ট (প্যারিস, ১৮৮৪-১৯০৩) লেস ম্যানাসক্রিপ্টস আ্যারাবেস ডে এল এসকুরিয়াল-এর সূচিপত্র দেখুন; লেভি-প্রোভেনকল সংশোধিত ৩য় খণ্ড, (প্যারিস, ১৯২৮)।

৩৪ সাআলিবি, ১ম খণ্ড, ৪১১-১২ পাতা দেখুন; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৩৬-৩৮ পাতা।

৩৫ (মাদ্রিদ, ১৮৬৮), অনুবাদ : ডন জুলিয়ান রিবেরা, হিস্টোরিয়া ডে লা কনকুইস্টা ডে এসপানা (মাদ্রিদ, ১৯২৬)।

৩৬ কিতাব আল-আফআল, সম্পাদনা : ইগনাজ গুইডি (লিডেন, ১৮৮১)।

৩৭ সম্পাদনা : মেলকর এম আনতুনা, পার্ট ৩ (প্যারিস, ১৯৩৭)।

৩৮ আল-মু'জিব ফী তালখীস আখবার আল-মাগরিব, সম্পাদনা : আর ডোজি, দ্বিতীয় সংস্করণ (লিডেন, ১৮৮১), অনুবাদ : ই ফাগনান, হিস্টয়ার দাস আলমোহাদাস (আলজিয়ার্স, ১৮৯৩)।

৩৯ ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৪৮০ পাতা; মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ৫৪৬ পাতা।

৪০ সম্পাদনা : ফ্রান্সিসকো কোডেরা, ২ খণ্ড, (মাদ্রিদ, ১৮৯০-৯২)।

৪১ সম্পাদনা : কোডেরা, ২ খণ্ড (মাদ্রিদ, ১৮৮২-৮৩)।

৪২ আল-যাহাবি, তাযকিরাত আল-হুফ্‌ফায, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, (হায়দরাবাদ, ১৩৩৪), ১২৯ পাতা। তুলনায়, ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৩০৫-০৬ পাতা।

৪৩ একটি অংশ কোডেরা-র দ্বারা সম্পাদিত, ২খণ্ড (মাদ্রিদ, ১৮৮৬-৮৯), অপর অংশটি মিসসেলেনিয়া ডে এস্টুডিওস ইয়া টেক্সটোস অ্যারাবেস (মাদ্রিদ, ১৯১৫)-তে এম অ্যালারকন ও সি এ গণজালেজ প্যালেনসিয়া দ্বারা সম্পাদিত, ১৪৬-৬৯০ পাতা, আলফ্রেড বেল ও এম বেন চেনেব দ্বারা সমাপ্ত (আলজিয়ার্স, ১৯১৯-২০)। ইবন-আল-আব্বার সম্পর্কে জানতে কুতুবি, ২য় খণ্ড, ২৮২-৮৪ পাতা দেখুন; ইবন-খালদূন, অনুবাদ : ডি স্লেন, ২য় খণ্ড, ৩৪৭-৫০ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, ৭৭ পাতা।

৪৪ ডোজির দ্বারা আংশিক সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৪৭-৫১)।

৪৫ সম্পাদনা : কোডেরা ও জুলিয়ান রিবেরা (মাদ্রিদ, ১৮৮৪-৮৫)।

৪৬ যাববি, বুগ্‌য়া, ৩১১ পাতা।

৪৭ সম্পাদনা : এল শিখো (বেইরুট, ১৯১২)।

৪৮ আল-মাক্‌কারি তার নাফহ্‌ আল-তিব্‌ বইটির দ্বিতীয়াংশে ইবন-আল-খাতীব-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক তিলিমসান-এর অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু মুসলিম স্পেনের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস সংক্রান্ত এই মূল বইটি তিনি দামাস্কাসে বসে ১৬২৮ থেকে ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচনা করেছেন।

৪৯ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৫৬০ পাতা।

৫০ আল-ইহাতাহ ফী আখবার গারনাতাহ, ২ খণ্ড (কায়রো, ১৩১৯)। একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫১ উত্তর আলজেরিয়া-র তিলিমসানের পূর্বে অবস্থিত এই অঞ্চলকে এখন তাগজুট বলা হয়।

৫২ ৭ খণ্ড (কায়রো, ১২৮৪)। ৭ম খণ্ডের শেষে ৩৭৯ পাতায় তার আত্মজীবনী আছে, যা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজে লাগবে। এটি এম জি ডি স্লেনের দ্বারা অনূদিত হয়েছে। জার্নাল এশিয়াটিক, সিরিজ ৪, ৩য় খণ্ড (১৮৪৪), ৫-৬০, ১৮৭-২১০, ২৯১-৩০৮, ৩২৫-৫৩ পাতা। মাক্‌কারি (কায়রো, ১৩০২), ৪র্থ খণ্ড, ৬-১৭ পাতা দেখুন।

৫৩ কায়রো সংস্করণের আগে এম. কোয়াট্রেমেয়ার-এর সংস্করণ, ৩ খণ্ড (প্যারিস, ১৮৫৮) : অনুবাদ : ডি স্লেন, ৩ খণ্ড (প্যারিস, ১৮৬২-৬৮, সম্পাদনা : বাউটবাউল, প্যারিস, ১৯২৫-২৭)।

৫৪ অনুবাদ : ডি স্লেন, হিস্টায়ার দাস বারবেরেস এট দাস ডাইনাস্টিজ মুসুলমানস ডে এল আফ্রিক সেপ্টেনট্রিওনেল, সম্পাদনা : পল ক্যাসানোভা, ২খণ্ড (প্যারিস, ১৯২৫-২৭)।

৫৫ অনুবাদ : ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, ইবন-খালদূন রচিত মুকাদ্দামা, ৩খণ্ড (নিউইয়র্ক, ১৯৫৮)।

৫৬ মুকাদ্দামা, ৪-৫ পাতা।

৫৭ ইবন-বাশকুওয়াল, ১ম খণ্ড ২৮২ পাতা; সুয়ূতি, বুগি্য়া, ২৮৫ পাতা।

৫৮ ডি স্লেন দ্বারা আংশিকভাবে সম্পাদিত (আলজিয়ার্স, ১৮৫৭)।

৫৯ তার সম্পর্কে জানতে মাক্‌কারি (লিডেন), ১ম খণ্ড, ৭১৪ ও পরের পাতা দেখুন।

৬০ উইলিয়াম রাইট সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, এম জে. ডি. গোজি (লিডেন, ১৯০৭)।

৬১ তুহফাত আল-আলবাব, সম্পা: গ্যাব্রিয়েল ফেরান্ড, জার্নাল এশিয়াটিক, ২০৭ খণ্ড (১৯২৫), ২৩৮ পাতা।

৬২ তুহফাত আল-নাজ্জার ফী গারাইব আল-আমসার ওয়া-আজাইব আল-আসফার সম্পাদনা ও অনুবাদ : সি ডেফ্রেমেরি ও বি আর সাঙ্গুইনেট্টি, ৩য় প্রকাশ (প্যারিস, ১৮৭৯-৯৩), ২য় খণ্ড, ৩৯৮-৯৯ পাতা।

৬৩ সাঈদ, তাবাকাত, ৬৪ পাতা। ইবন-হাজম, ২য় খণ্ড ৭৮-৭৯ পাতা; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে ৩৭৫ পাতা।

৬৪ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৩৮৪ পাতা।

৬৫ মাজরিত (মাদ্রিদ)-এ জন্ম।

৬৬ সাঈদ, ৬৯ পাতা, ইবন-আবি-উসাইবিয়া কর্তৃক উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, ৩৯ পাতা। তুলনীয় কিফতি, ৩২৬ পাতা। সঈদ নিজে একজন জ্যোতির্বিদ, তিনি আল-মাজরিতির সমালোচনা করেছেন।

৬৭ সাঈদ, ৭১ পাতা।

৬৮ সাঈদ, ৭৫ পাতা।

৬৯ কিফতি, ৫৭ পাতা। তুলনীয়, খওয়ারিজমি, মাফাতিহ্, ২৩৩-৩৪ পাতা।

৭০ তুলনীয়, কিফতি, ৩১৯ পাতা, ১.১২.৩৯৩ পাতা, ১.১; হাজ্জি খালফা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০৬ পাতা। অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত রচনার মতো ওই বইটিরও শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপিটি অক্ষত আছে।

৭১ কর্ডোভার উত্তরে অবস্থিত পেড্রোক-এর।

৭২ মাইকেল স্কট কর্তৃক ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় ও ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে হিব্রুভাষায় অনূদিত।

৭৩ আরও নামের জন্য রিচার্ড এইচ অ্যালেন রচিত স্টার নেমস অ্যাণ্ড দেয়ার মিনিংস (নিউইয়র্ক, ১৮৯৯); আমিন এফ. আল-মা'লুফ, আল-মু'জাম আল-ফালাকি (কায়রো, ১৯৩৫)।

৭৪ 'সাইফার'-এর সগোত্র নয়, 'সাইফার'-এর অর্থ সংকেত, মোনোগ্রাম, এবং এটি আরবী শব্দ 'সিফ্‌র' থেকে নেওয়া, এর অর্থ বই। আসলে শব্দটি অ্যারামিক।

৭৫ খওয়ারিজমি, মাফাতিহ, ১৯৪ পাতা।

৭৬ ডেভিড ই স্মিথ ও লুইস সি কার্পিনস্কি, দি হিন্দু-আরাবিক নিউমেরালস (বোস্টন ও লণ্ডন, ১৯১১), ৬৫ ও পরের পাতা; সলোমন গ্যান্ডজ, আইসিস, ১৬শ খণ্ড (১৯৩১), ৩৯৩-৪২৪ পাতা। ইবন-খালদুন রচিত মুকাদ্দমা-র ৪ পাতা, ১.২২ দ্রষ্টব্য।

৭৭ ঘোড়া ও সহিসদের সম্পর্কে জানতে ইবন-হুযাইল, হিলিয়াত আল-ফুরসান ওয়া-শিয়ার আল-শুজআন, সম্পাদনা : লুইস মার্সিয়ার (প্যারিস, ১৯২২); অনুবাদ : মার্সিয়ার, লা পারুর দাস ক্যাভালিয়ারস এট লিনসিনে দাস প্রিয়াক্স (প্যারিস, ১৯২৪)।

৭৮ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের নিচে দেখুন, ৫৮৭ পাতা।

৭৯ গাফিক একটি শহর, কর্ডোভার কাছে অবস্থিত।

৮০ ইবন-আবি-উসাইবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, ৫২ পাতা। বিখ্যাত খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ইবন-আল-ইবরি রচিত এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সম্প্রতি মুন্তাখাব কিতাব জামি আল-মুফরাদাত নামে প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি ইংরেজি অনুবাদও বের হয়েছে। সম্পাদনা : ম্যাক্স মেয়েরহফ ও জুরজি সুবহি (কায়রো, ১৯৩২?)। সিরীয় ভাষায় রচিত ইবন-আল-ইবরির সংক্ষিপ্ত অনুবাদটি হারিয়ে গেছে।

৮১ মুকাদ্দামা, ৪১২ পাতা।

৮২ তার বিবলিওথেকা অ্যারাবিকো-হিস্পানা এসকুরিয়ালেনসিস-এর ১ম খণ্ড (মাদ্রিদ, ১৭৬০) ৩২৩ ও পরের পাতায়, লেবাননীয় পণ্ডিত মাইকেল কাসিরি (গাজিরি) প্রথম এসকুরিয়ালে ইবন-আল-আওয়ামের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাসিরি-র ছাত্র জোসেফ অ্যান্টনিও বাঙ্কোয়েরি ২খণ্ডে স্পেনীয় অনুবাদ (মাদ্রিদ, ১৮০২)-সহ এটির সম্পাদনা করেন। অনুবাদ : ক্লিমেন্ট মুলেট, লা লিভর ডি' এগ্রিকালচার, ৩ পার্ট ২টি খণ্ড (প্যারিস, ১৮৬৪-৬৭)। সম্পাদিত বা অনূদিত কোন অংশটিই সন্তোষজনক নয়।

৮৩ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড ৯৩৪ পাতা; কুতুবি, ১ম খণ্ড, ২৬১ পাতা। ইবন-আবি-উসাইবিয়া ছিলেন ইবন-আল-বাইতারের ছাত্র এবং তিনি তার শিক্ষকের সঙ্গে দামাস্কাসের প্রতিবেশী এক অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৮৪ আল-জামি লি-মুফরাদাত আল-আদবিয়া অ-আল-আগযিয়া। ৪খণ্ড (বুলাক, ১২৯১); জোসেফ ভি সোনথিমার কৃত জার্মান অনুবাদ, ২খণ্ড (স্টুটগার্ট, ১৮৪০-৪২) সন্তোষজনক নয়; লুসিয়েন লিক্লার্ক-কৃত ফরাসি নোটিসেস এট এক্সট্রেটস দাস ম্যানাস্ক্রিটস ডে লা বিবলিওথেক ন্যাশনেল, ২৩ তম খণ্ড (প্যারিস, ১৮৭৭), পয়েন্ট ১, ২৫তম খণ্ড (১৮৮১), পয়েন্ট ১, ২৬তম খণ্ড (১৮৮৩), পয়েন্ট ১।

৮৫ মুক্নিয়াত আল-সাইল আন-আল-মারাদ আল-হাইল, সম্পাদনা ও অনুবাদ . এম জে মুলার, সিটজাঙবেরিচটে দার কোনিগল, বেয়ার, অ্যাকাডেমিক দার উইসেনস্ক্যাফটেন জু মুনচেন, ২য় খণ্ড (মিউনিখ, ১৮৬৩), ৬-৭, ১৮-১৯ পাতা।

৮৬ তার জন্মস্থান আল-জাহরা ছিল কর্ডোভার বিখ্যাত মফস্বল, আবু-আল-কাসিম, যার অপভ্রংশ আবুলকাসিস বা আলবুকাসিস, নামে তিনি ল্যাটিনভাষী লেখকদের কাছে পরিচিত ছিলেন।

৮৭ ইবন-আবি-উসাইবিয়া-তে তালিফ, ২য় খণ্ড, ৫২ পাতা।

৮৮ আলবুকাসিস-এর অক্সফোর্ড সংস্করণ, ডিচিরারজিয়া-তে মূল গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ করেছেন জন চ্যানিং। সমগ্র অংশ এখনও অপ্রকাশিত।

৮৯ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ৪৭ পাতা, যেখানে রোমানাস-এর সঙ্গে অনুদানের কৃতিত্বটি যুক্ত হয়ে আছে।

৯০ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৬-৬৭ পাতা।

৯১ হিব্রু অনুবাদটি করা হয়েছিল কুৎসিত ভাষায়, সম্ভবত ভেনেশিয় কথ্য ভাষায়। ভেনিসের এক ইহুদির সাহায্যে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সেটি আবার ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ভেনিসে সেটি বার বার ছাপা হয়েছিল।

৯২ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড ৭৫-৭৬ পাতা।

৯৩ আর্কিভ ফার জেসচিতে দার মেডিজিন, ২৯শ খণ্ড (১৯২৭) ১২৩-৬৮ পাতায় মুহাম্মাদ রিহাব।

৯৪ নমুনার জন্য মাক্কারি, ১ম খণ্ড ৬২৫-২৮; ইবন-খাল্লিকান ২য় খণ্ড, ৩৭৫-৭৬ পাতা দেখুন।

৯৫ সাঈদ, ৮৪ পাতা, ইবন-আবি-উসাইবিয়া কৃত অনুলিপি, ২য় খণ্ড, ৬৪ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৭৬-৭৭ পাতা।

৯৬ মাক্‌কারি, ১ম খণ্ড, ৮৯৯ পাতা।

৯৭ ১ম খণ্ড, ৪৬৩-৯৪৩ পাতা।

৯৮ একজন সালেরনিটান চিকিৎসক কনস্টানটাইন, জন দ্য সারাসেন (১০৪০-১১০৩)-এর এক শিষ্য শল্যচিকিৎসার অংশটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিল। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৩৬৭ পাতা; নিচে ৬৬৩ পাতা।

৯৯ 'শরবত'-এর জন্য হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ওপরে দেখুন, ৩৩৫ পাতা।

১০০ আরবী শব্দ আল-কুহল থেকে সম্ভবত ইংরেজি 'কোল' শব্দটি এসেছে।

১০১ আরবী শব্দ আল-ইনবিক, মূল শব্দ গ্রিক।

১০২ আরবী শব্দ ইসমিদ গ্রিক ভাষাজাত।

১০৩ আরবী শব্দ আল-উসাল, জলযান।

১০৪ আরবী শব্দ রাহজ আল-গার, "গুহার গুঁড়ো"।

১০৫ আরবী শব্দ "তুতিয়া" সংস্কৃত শব্দজাত।

১০৬ সুলাইমান ইবন-ইয়াহিয়া ইবন-জাবিরুল, তুলনীয়, সাঈদ, ৮৯ পাতা।

১০৭ মিগুয়েল এসিন-এর আবেনমাসাররা ইয়া সু এসকুয়েলা। অরিজেনিস ডেলা ফিলোসফিয়া হিস্পানো মুসুলমানা (মাদ্রিদ, ১৯১৪)।

১০৮ তার ইসলাহ আল-আখলাক সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন স্টিফেন এস ওয়াইজ (নিউ ইয়র্ক, ১৯০১)।

১০৯ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৩ পাতা, অনুযায়ী ইবন রুশদ (১১২৬-এর আগে) ইবন-বাজ্জাহ্-র ছাত্র।

১১০ ইবন-খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ৩৭২ পাতা।

১১১ সেখান থেকে তার ল্যাটিন নাম হল আবুবাসের।

১১২ ইবন-আবি উসাইবিয়ার ২য় খণ্ড ৭৮ পাতায় ইবন-আল-তুফাইল। তুলনীয় : ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড। ১৩৫ পাতা; ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড ৪৬৭ পাতা।

১১৩ মানুষের বুদ্ধিমত্তা আল্লাহ্‌র পরম ভাবেরই অংশ।

১১৪ এডওয়ার্ড পোকক, দি এল্ডার দ্বারা সম্পাদিত আরবী ভাষ্য-সহ এর অনুবাদ একত্রে অক্সফোর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। মূল আরবী গ্রন্থের বহু সংস্করণ ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে কায়রো ও কনস্ট্যানটিনোপলে প্রকাশিত হয়েছিল। লিওন গথিয়ারের সংস্করণ ও তার ফরাসি অনুবাদ (আলজিয়ার্স, ১৯০০; বেইরুট, ১৯৩৬) একমাত্র বিশ্লেষণাত্মক সংস্করণ।

১১৫ ইবন-আবি-উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, ৭৬-৭৭ পাতা; ইবন-আবি-জার, ১ম খণ্ড, ১৩৫-৩৬; ইবন-খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, ৪৬৭ পাতা।

১১৬ অপভ্রংশ হয়ে ল্যাটিন ভাষায় কলিগেট হয়েছিল, কলিগো বা সংগ্রহ করার সঙ্গে এটি শব্দ প্রকরণগত ভাবে আদৌ যুক্ত নয়।

১১৭ সম্পাদনা মরিস বয়েজেস (বেইরুট, ১৯৩০); অনুবাদ : এস ভ্যান ডেন বার্গ, ২খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৫৪)।

১১৮ অ্যারিস্টটলীয় ও নয়া-প্লেটোনিয়; তার মাকাসিদ আল-ফালাসিফা (কায়রো, ১৩৩১)-তে প্রকাশিত তার দৃষ্টিভঙ্গি।

১১৯ পুরো তালিকার জন্য আর্নেস্ট রেনান-এর অ্যাভেরোজ এট এল' অ্যাভেরোইজম, দ্বিতীয় সংস্করণ (প্যারিস, ১৮৬১), ৫৮-৭৯ পাতা দ্রষ্টব্য; সার্টন, ইনট্রোডাকশান, ২য় খণ্ড ৩৫৬-৬১ পাতা।

১২০ তার তালখিস কিতাব আল-মাকুলাত, অ্যারিস্টটলের ক্যাটাগরি-র একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল মরিস বয়েজেস-এর দ্বারা' (বেইরুট, ১৯৩২)।

১২১ অথবা দান্তে-কে উদ্ধৃত করা যায় 'অ্যাভেরোইস চে ইল গ্রান কমেন্টো ফিও", ইনফারনো, কান্টো-৪, ১.১৪৪।

১২২ মোশেহ হাজ-জেমান, "তার সময়ের মোজেস" বলে উল্লিখিত। প্রচলিত ইহুদি প্রবাদে বলা হয়, "মোজেস থেকে মোজেস-এর মধ্যে মোজেস-এর মতো কেউ নেই (ম্যায়মোনাইডস)", এর দ্বারা ইহুদিদের মূল্যায়নে মোজেসের গুরুত্বে স্বীকৃতি মেলে।

১২৩ গোটা সভ্য দুনিয়ায় তার আটশোতম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

১২৪ ৩১৮-১৯ পাতা।

১২৫ ২য় খণ্ড, ১১৭ পাতা।

১২৬ আরবী রা'স আল-মিল্লা, হিব্রুতে নাজিদ।

১২৭ হিব্রু অক্ষরে সম্পাদিত ও ফরাসিতে অনূদিত সলোমন মাঙ্কের দ্বারা, ৩খণ্ড (প্যারিস, ১৮৫৬-৬৬)।

১২৮ প্রাচ্যে তিনি ইবন-আরাবি নামে পরিচিত, তার দেশবাসী ও হাদীসবিদ আবু-বকর ইবন-আল-আরাবির সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝাতে তাকে ওই নামে ডাকা হয়। তার নিসবাহতে অর্থাৎ উপনামে তিনি আল-হাতিমি আল-তায়ী ব্যবহার করতেন। এব অর্থ তিনি ছিলেন হাতিম আল-তাইয়ের বংশধর।

১২৯ ইবন-আল-যাওজী মিরআত আল-জামান, সম্পাদনা : জেমস আর জিউয়েট (শিকাগো ১৯০৭), ৪৮৭ পাতা; মাক্কারি, ১ম খণ্ড, ৫৬৭ পাতা; কুতুবি, ২য় খণ্ড, ৩০১ পাতা; আল-শা'রানি, আল-ইওয়াকিত অ-আল-জাওয়াহির (কায়রো, ১৯০৫), ৮ পাতা।

১৩০ হাজ্জি খালফা, ৩য় খণ্ড, ৮৭ ও পরের পাতা; জার্নাল এশিয়াটিক-এ কাররা ডি ভক্স, সিরিজ ৯, ১৯ তম খণ্ড (১৯০২), ৬৩-৯৪ পাতা।

১৩১ তার ২৮৯ রচনার মধ্যে ব্রোকেলমান, ১ম খণ্ড, ৪৪২-৪৮ পাতা-র তালিকা থেকে জানা যায় বর্তমানে ১৫০টি অক্ষত আছে।

১৩২ ২য় সংস্করণ, ৪খণ্ড (বুলাক, ১২৯৩)।

১৩৩ (বুলাক, ১২৫২)।

১৩৪ ২য় খণ্ড, ৩৫৬-৭৫ পাতা।

১৩৫ ওপরে দেখুন, ১১৪ পাতা।

১৩৬ মাককারি, ১ম খণ্ড, ৫৬৯ ও পরের পাতা।

১৩৭ ইবন-আরাবি, তারজুমান আল-আশওয়াক, সম্পাদনা ও অনুবাদ : নিকলসন (লণ্ডন, ১৯১১), ১৯ ও ৬৭ পাতা।

১৩৮ সুফি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন জালাল-আল-দীন আল-রুমি। ইবন-আরাবির মৃত্যুর ৩০ বছর পরে তিনি মারা যান। ইবন-আরাবির এক ছাত্রের মাধ্যমে আল-রুমির সঙ্গে ইবন-আরাবির যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

১৩৯ তার এল ইসলাম ক্রিস্টিয়ানিজাডো (মাদ্রিদ, ১৯৩১)-তে এসিন এই তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন যে, ইবন-আরাবির মধ্য দিয়ে মুসলিম সুফিবাদের যে প্রতিফলন হয়েছিল তা সচেতন বা অসচেতনভাবে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের রহস্যবাদের অনুকরণ মাত্র।

১৪০ এখনও অপ্রকাশিত এম আমারি, বিবলিওটেকা আরাবো-সিকুলা (লিপজিগ, ১৮৫৫-৫৭), ৫৭৩-৭৭ পাতা; জার্নাল এশিয়াটিক, সিরিজ ৫, ১ম খণ্ড (১৮৫৩), ২৪০-৭৪ পাতা। এ এফ মেহরেন, লক. সিট. ১৪ তম খণ্ড (১৮৭৯), ৩৪১-৪৫৪ পাতা দ্রষ্টব্য।

১৪১ কুত্‌বি, ১ম খণ্ড, ৩১৬পাতা।

১৪২ চার্লস এইচ হাসকিনস প্রণীত স্টাডিজ ইন দি হিস্টোরি অফ মিডাইভাল সায়েন্স, ২য় সংস্করণ (কেমব্রিজ, ১৯২৭), ১ম অধ্যায়।

১৪৩ ফিহ্‌রিস্ত ২৭৩ পাতায় উল্লেখ্য।

১৪৪ নিচে দেখুন, ৬০৫ পাতা।

১৪৫ ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত প্রথম বই, দি ডিকটেস অ্যাণ্ড সেয়েনগিস অফ দি ফিলোসফিরেস, ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্টমিনস্টারে উইলিয়াম ক্যাক্সটন কৃত। এক সিরীয়-মিশরিয় রাজপুত্র আবু-আল-ওয়াফা মুবাশশির ইবন-ফাতিক-এর লেখা মুখতার আল-হিকাম ওয়া-মাহাসিন আল-কালিম-এর ভিত্তিতে ক্যাক্সটনের বইটি লেখা হয়েছে, কর্মকাল ১০৫৩ খ্রিঃ (সম্পাদনা : আবদ-আল-রহমান বাদাবি, মাদ্রিদ, ১৯৫৮)।

১৪৬ "ভিটা জোহানিস অব্বাটিস গর্জিয়েনসিস," জি এইচ পার্টজ, মনুমেন্টা জার্মানিয়া হিস্টোরিকা, স্ক্রিপটোরেস রেরাম জার্মানিকেরাম, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩৭-৭৭ পাতা।

।। অধ্যায় ৪১ ।।

শিল্প ও স্থাপত্য

● ক্ষুদ্র শিল্প

অন্যান্য দেশের মুসলিমদের যেসব শিল্পকর্ম আদৃত হয়েছিল, স্পেনের আরবরা প্রায় তার সবকটিতেই দক্ষ ছিল। ধাতুর উপর খোদাই[১] নকশা, কিংবা সোনারুপোর[২] কাজে স্পেনীয়-মুর কারিগরদের দক্ষতা সেসময় অবিসংবাদিত ছিল। এইসব কাজের সবচেয়ে পুরনো যে নমুনা এখনও পাওয়া যায় তা হল দ্বিতীয় হিশাম (খ্রিস্টাব্দ ৯৭৬-১০০৯)-এর একটি সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন। এটি সযত্নে রাখা আছে গিরোনার গির্জায়। পুরো শিল্পকর্মটির চেহারা হল— রুপোর পাত দিয়ে মোড়া কাঠের একটি বাক্স। রুপোর পাতটি দেখতে অনেকটা গোটানো কাগজ সোজা করলে যেমন হয় সেরকম। এর উপরেই খোদাইয়ের কাজ। বৈশিষ্ট্য হল, খোদাইটি পাতের উপরের দিক থেকে না করে উল্টো দিক থেকে করা। এতে আরবী ভাষায় লেখা রয়েছে, হিশামকে এই বাক্সটি উপহার দিচ্ছেন দ্বিতীয় আল-হাকাম (খ্রিস্টাব্দ ৯৬১-৭৬)-এর এক সভাসদ। নির্মাতা বদর এবং তারীফ নামে দুই কারিগর। ছুরি, কাঁটা, চামচ অথবা তলোয়ারের মত পেটা লোহার কাজ বা বিশেষ এক ধরনের জ্যোতির্যন্ত্র নির্মাণে টলেডো এবং সেভিলের[৩] কারিগরদের বিশেষ সুনাম ছিল। গুণমানের বিচারে টলেডোয় তৈরি তলোয়ারের স্থান ছিল দামাস্কাসের তলোয়ারের ঠিক পরেই। তারকা পর্যবেক্ষণের জ্যোতির্যন্ত্রের জন্ম প্রাচীন গ্রিসে। এটিকে উন্নত ও আধুনিক করে ১০ম শতাব্দীর ইউরোপে চালু করার কৃতিত্ব কিন্তু মুসলিমদেরই। নামাযের সময় এবং মক্কার অবস্থান জানতে এই যন্ত্রের ব্যবহার হত। শুধু তাই নয়, নাবিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজেও অপরিহার্য ছিল এই জ্যোতির্যন্ত্র। এটি নিয়ে মজার একটি গল্প আছে আরব্য রজনীতে (২৯ নং গল্প)। চতুর এক ক্ষৌরকার এই জ্যোতির্যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষৌরকর্মের সঠিক সময় খুঁজে বার করতে চাইত। আর এই ছলে সে তার খদ্দেরদের বোকা বানাত। নিখুঁতভাবে তৈরি এই জ্যোতির্যন্ত্র শুধু যন্ত্রই নয়, এক অনন্য শিল্পকর্মও।

● মৃৎশিল্প

ধাতুর উপরে রঙের ব্যবহারে দক্ষতা দেখাতে না পারলেও রঙিন মৃৎপাত্র তৈরিতে মুসলিম শিল্পীদের শৈলী প্রাচীনকাল থেকেই সুবিদিত। ইউরোপে মুসলিমদের এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভ্যালেন্সিয়া। এরূপ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ফল এই যে, তা পয়টিয়ার্স-এ

মৃৎশিল্পের কারখানা গড়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ১৫ শতকের হল্যাণ্ডেও মুসলিম এই মৃৎশিল্পের অনুকরণ দেখা যায়। স্পেন থেকে এই শিল্পের প্রসার ঘটেছিল ইতালিতে। পরবর্তী কালেও স্পেনে তৈরি মৃৎপাত্রে, নকল আরবীয় অন্তর্লেখ এবং গির্জায় ব্যবহৃত বহু জিনিসের কারুকার্যে এই মুসলিম শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। মৃৎশিল্প এবং চীনামাটির তৈরি জিনিসপত্রের ক্ষেত্রেও স্পেনের মুসলিমদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। এর মধ্যে রয়েছে মোজাইক, বিশেষত টালি ও নীলাভ চকচকে মাটির বা চীনামাটির পাত্র ইত্যাদি। স্পেন ও পর্তুগালে আজও এর সমাদর অটুট। রংবেরঙের টালি প্রথম তৈরি হয়েছিল আরব শিল্পীদেরই হাতে। তার প্রমাণ, এই টালির মূল আরবী নাম 'আজুলেজো'[৪] আজও চালু। আজকের সংগ্রাহকরাও মনে করেন, মুদেজারের মৃৎশিল্পের তুলনা একমাত্র চীনা মৃৎশিল্পের সঙ্গে। ১১ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে টলেডো এবং করডোভায় অসাধারণ সব মৃৎপাত্র তৈরি হত। এরপর এই শিল্পের প্রসার ঘটে কালাতায়ুদ (কাল'আত আইউব)[৫], মালাগা এবং ভ্যালেন্সিয়ার ম্যানিসেসে। তবে, কাচের জিনিসপত্র তৈরি এবং তাকে বহুবর্ণে রঞ্জিত করার ক্ষেত্রে স্পেন অবশ্য সিরিয়ার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারত না।

● বস্ত্রশিল্প

মধ্যযুগে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে স্পেনের আরবদের[৬] যথেষ্ট অবদান ছিল। রেশমি ও অন্যান্য কাপড় তৈরি এবং বাণিজ্যে তারা ছিল সবার আগে। কিন্তু গালিচা তৈরিতে পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে পারস্যের ধারেকাছেও তারা আসতে পারত না। করডোভা ছিল বস্ত্রশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। শোনা যায়, আলমেরিয়াতেই চার হাজার আটশো তাঁত ছিল[৭]। আল-মাওসিল থেকে মহামূল্যবান মসলিন রপ্তানি করা হত ইতালিতে। সেদেশে অবশ্য মসলিনের নাম ছিল 'মুসোলিনা'। বাগদাদ থেকে রপ্তানি করা মূল্যবান রেশমি কাপড়ের ইতালিয় নাম ছিল 'বালডাক্কো'। আর রেশমের তৈরি এক বিশেষ ধরনের চাঁদোয়াকে বলা হত 'বালডাচিন'[৮]; ইউরোপের বহু গির্জার পবিত্র বেদীর উপর এই চাঁদোয়া টাঙানো হত। পরবর্তীকালে গ্রানাডা থেকেও রেশমি কাপড় রপ্তানি করা হত ইউরোপে। ফুল-লতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশা কাটা এবং উজ্জ্বল রঙে রাঙানো প্রাচ্যের এই রেশমি কাপড়ের চাহিদা ছিল মূলত ইউরোপের অভিজাত মহলে। তবে ধর্মানুষ্ঠানের বিশেষ পোশাক, ধর্মযাজকদের স্মৃতিচিহ্ন[৯] মুড়ে রাখা বা অভিজাতদের মহার্ঘ পোশাক তৈরির জন্য এই রেশমি কাপড় ব্যবহার করা হত। মুসলিম দেশ থেকে রেশমি কাপড়ের রপ্তানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসায়ীরা এই শিল্পের লাভের অঙ্ক কষে ফেলল। এর ফলে ফ্রান্সে ও ইতালির বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠল কাপড়ের কল। এই সব কারখানার গোড়াপত্তনের সময় অবশ্য মুসলিম কারিগরদের নিযুক্ত করা হয়েছিল

১৪ থেকে ১৬ শতাব্দীতে ইউরোপের বস্ত্রশিল্পে ইসলামি প্রভাবের অজস্র চিহ্ন রয়েছে। ঠিক যেমনটি রয়েছে স্থাপত্য, ধাতু, কাচ, মৃৎশিল্প অথবা ললিতকলার অন্যান্য ক্ষেত্রে। ১২ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের তাঁতশিল্পীরা ইসলামি নকশার অনুকরণ করতে শুরু করে। নিছক সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অর্থহীন আরবী অক্ষর চিত্রণের অজস্র নজির রয়েছে এই সময়কার শিল্পীদের কাজে। একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার, স্পেন এবং বিশেষভাবে সিসিলিতে ইসলামের প্রভাব কমে যাওয়ার অনেকদিন পরেও প্রাচ্যের শিল্পীদের প্রভাবও দেখা যেত। তার প্রমাণ, 'মুদেজার' শিল্প ও স্থাপত্যে। এখানে একই সঙ্গে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব রয়েছে। একই কারণে নর্ম্যান যুগে সিসিলির শিল্প ও স্থাপত্যে ইসলামের প্রভাব স্পষ্ট। মুদেজার শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পে। এখনও পর্যন্ত স্পেনের ছুতোররা তাদের কাজকর্মের সময় যেসব ভাষা ব্যবহার করে তার অধিকাংশই আরবী।



গজদন্ত পাত্র ৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় তৈরি। এখন মাদ্রিদের মিদ্রিদের মিউজিয়ো আর্কায়োলজিকোতে সংরক্ষিত।

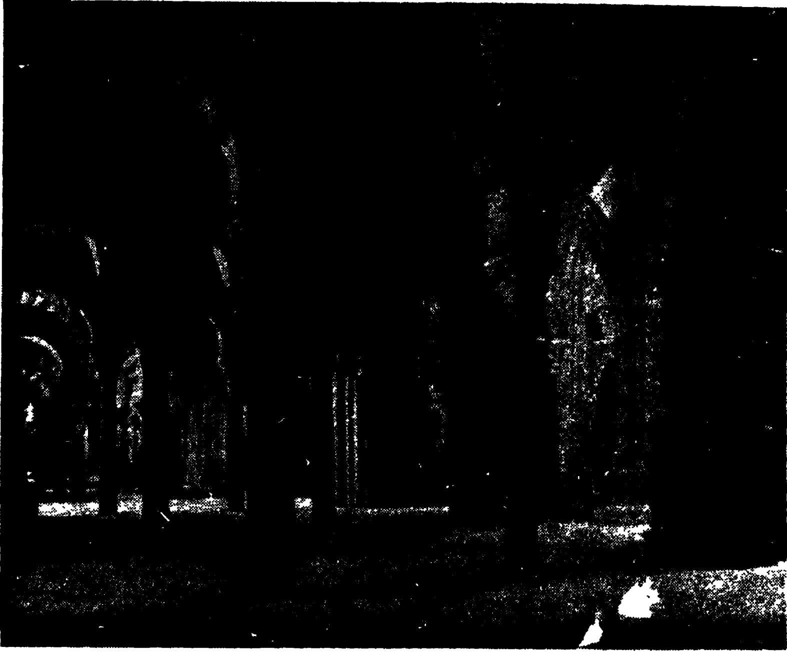
● গজদন্ত

গহনা তৈরির ক্ষেত্রেও স্পেনের আরবদের কৃৎকৌশল অন্যান্য শিল্পের মতই ছিল। ১০ম শতাব্দীর করডোভায় একদল শিল্পী আংশিক বা সম্পূর্ণ হাতির দাঁতের অপূর্ব সুন্দর কয়েকটি বাক্স তৈরি করেছিল। এর উপর হাতে আঁকা অথবা খোদাই করা থাকত অসামান্য সব কারুকাজ। এগুলি গহনা, সুগন্ধি বা মিষ্টি রাখার জন্য ব্যবহার করা হত। নকশার মধ্যে ছিল নাচ, গান বা শিকারের দৃশ্য। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, নকশার ছাঁচে বৈচিত্র্য আনতে ব্যবহার করা হত পশুপাখিদের ছবি। এইসব বাক্সের গায়ের লেখা থেকে জানা যায়, অধিকাংশ সময়েই এগুলি উপহার হিসাবে দেওয়া হত। এই কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল ৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বেলুনাকার এক বাক্স। ঢাকনায় খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায় খলিফা দ্বিতীয় আল-হাকাম এটি তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন। বাক্সর ধারে ময়ূর ও অন্যান্য পাখি ছাড়াও ছোট ছোট খেজুর গাছ খোদাই করা ছিল।

● স্থাপত্য

স্পেনের মুসলিমদের ধর্মস্থানের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেগুলি এখনও আছে তার অন্যতম হল করডোভার মসজিদ। প্রাচীন এই মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের সৌন্দর্যের বিচারে

সত্যিই নজরকাড়া। ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে এক গির্জার জায়গায় এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজা প্রথম আবদ-আল-রহমান। এটি ছিল মূলত প্রাচীন রোমান মন্দির।[১০] ৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র প্রথম হিশাম মসজিদের চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মিনারগুলি সংযোজনসহ মূল



কর্ডোভার জামে মসজিদের অভ্যন্তরভাগ

অংশটি তৈরি করেন। এই ধর্মস্থানের মিনারগুলি আফ্রিকার শিল্পের আদলে তৈরি। আফ্রিকার শিল্প বলে চালু হলেও এই শিল্পশৈলীর জন্ম সিরিয়ায়। হিশামের বংশধরেরা করডোভার এই মসজিদে আরো নতুন সংযোজন করেন। ১২৯৩ টি স্তম্ভ এবং একটি বিশাল উদ্যানের উপর মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল।[১১] গির্জার ঘণ্টা[১২] থেকে তৈরি পিতলের ঝাড়লণ্ঠন এই ধর্মস্থানকে আলোকোজ্জ্বল রাখত। সবথেকে বড় ঝাড়লণ্ঠনটি ছিল হাজার বাতির আর সবথেকে ছোট ঝাড়লণ্ঠনে ছিল ১২ টি।[১৩] অট্টালিকার বিভিন্ন কারুকাজের জন্য বাইজানটাইনের কারিগরদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। শোনা যায়, সিরিয়ার উমাইয়া মসজিদ

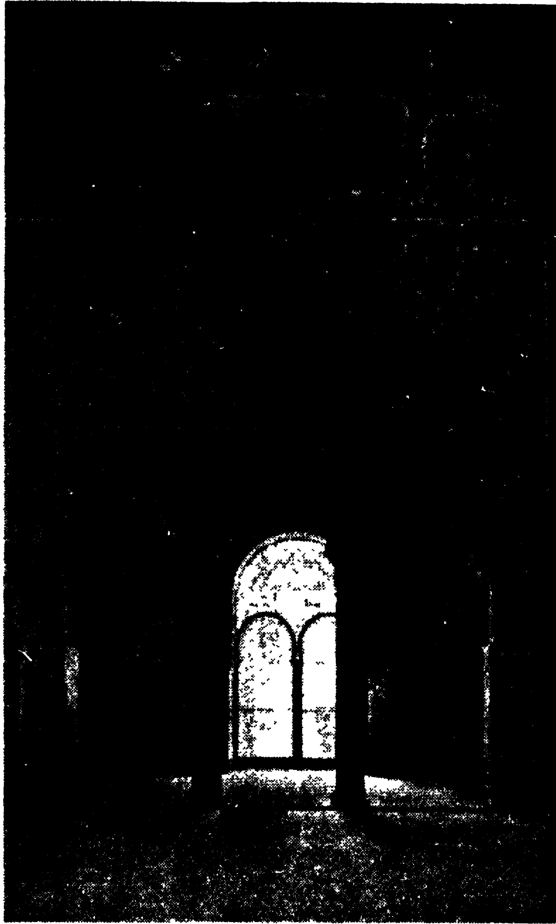
তৈরি করতেও নিযুক্ত হয়েছিল এরাই।[১৬] মসজিদের কাঠামো তৈরি করতেই খরচ হয়েছিল ৮০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। এই টাকার সবটাই গথ বা জার্মানদের কাছ থেকে লুঠ করা। মসজিদটি আরো বড় এবং কিছু মেরামতির কৃতিত্ব অবশ্য আল-হাজিব-আল-মানসূরের (৯৭৭-১০০০)। বর্তমানে এটি কুমারী মেরির নামে উৎসর্গীকৃত একটি গির্জা।

অন্যান্য যেসব ধর্মনিরপেক্ষ স্মৃতিসৌধের ধ্বংসাবশেষ আছে তার মধ্যে সেভিলের আলকাজার[১৭] এবং গ্রানাডার আলহামরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশাল এই সৌধগুলির কারুকাজ এককথায় অসামান্য। তৃতীয় আবদ-আল-রহমান এবং তাঁর উত্তরসূরিরা তৈরি করেছিলেন মদীনাত-আল-জাহরা নামের একটি প্রাসাদ। এখন এটি করডোভা লা ভিয়েজা নামে পরিচিত। এই প্রাসাদের স্তম্ভগুলি আনা হয়েছিল রোম, কনস্ট্যানটিনোপল এবং কারথেজ থেকে। এখনকার ধ্বংসাবশেষে অবশ্য অতীত গৌরবের খুব সামান্য প্রমাণই পাওয়া যায়। খলিফার প্রিয় উপপত্নীর নামেই এই প্রাসাদ। তাই এর প্রধান ফটকের উপর প্রেমিকার একটি মূর্তি বসিয়েছিলেন খলিফা। প্রাসাদের জন্য মানুষের মূর্তি দিয়ে সাজানো অসামান্য এক ফোয়ারা তৈরি করিয়ে আনানো হয়েছিল কনস্ট্যানটিনোপল থেকে। ১০১০ খ্রিস্টাব্দের বার্বার বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই প্রাসাদ দখল করে পুড়িয়ে দেয়। এই সময়েই বিদ্রোহীরা আল-মানসূরের সুরম্য প্রাসাদ আল-মদীনা-আল-জাহিরা ধ্বংস করে দেয়। করডোভার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই প্রাসাদের কোন চিহ্নই আজ আর নেই।

সেভিলে আলকাজারের প্রাচীনতম অংশটি তৈরি করেছিলেন টলেডোর এক স্থপতি। ১১৯৯ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুয়াহ্হিদ শাসকের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৩৫৩ সালে নিষ্ঠুর রাজা পিটারের জন্য এটির পুনর্বিন্যাস করেন মুদেজার কারিগররা। তবে এর মুসলিম শিল্পকলার দিকটি অবিকৃত রাখা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এটি রাজকীয় আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহার করা হত। করডোভা, টলেডো সহ স্পেনের অন্যান্য শহরে ও আরো অনেক আলকাজার ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সেভিলের এই আলকাজারটির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। আরো একটি সৌধের জন্য সেভিল গর্ব করতে পারে। তা হল, গিরালডা মিনার। এটি একটি বিশাল মসজিদের মিনার। ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে তা নির্মিত হয়েছিল। সেটি ছিল ছুঁচালো তোরণ-শ্রেণী দ্বারা অলংকৃত এবং পরবর্তী গথিক প্রবাহের পুরোধা।

● আলহামরা

স্পেনীয়-মুসলিম শিল্পশৈলীর উজ্জ্বলতম নিদর্শন আলহামরার নাসরিদ প্রাসাদ।[১৮] গ্রানাডার এই রাজপ্রাসাদের অসামান্য ও রাজকীয় শিল্পশোভা তাকে স্থাপত্যশিল্পের উচ্চতম শিখরে বসিয়েছে। রঙবাহারি মোজাইকের কাজই হোক বা খোদাইয়ের কাজ সবক্ষেত্রেই এই প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রাজা প্রথম মুহাম্মদ আল-গালিব প্রাসাদের কাজ আরম্ভ করেন. আবু আল হাজ্জাজ ইউসুফ (১৩৩৩-৫৪) এবং তাঁর বংশধর



মুদেজার শিল্পীদের রঙিন টালি ব্যবহারের নমুনা।
আলকাজার-এর দূতদেব ঘর, সেভিল।

পঞ্চম মুহাম্মাদ আল-গনি (১৩৫৪-৯) এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। প্রাসাদের অধিকাংশ দেওয়ালেই খোদাই করা রয়েছে আবু-আল-হাজ্জাজের স্তুতি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল সিংহমূর্তি দিয়ে সজ্জিত রাজদরবার। দরবারের কেন্দ্রস্থলে শ্বেতপাথরের ১২ টি সিংহমূর্তি

বৃত্তাকারে রাখা আছে। এদের প্রত্যেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জলের ধারা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ফোয়ারা। প্রাসাদের তথাকথিত বিচারকক্ষের ছাদের কারুকার্যও ছিল অসামান্য। চামড়ার উপর আঁকা বীরগাথা, শিকারের গল্প ছাড়াও ছিল ডিম্বাকৃতি এক আসনে বসে থাকা ১০ জন শাসকের ছবি। 'আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত বিজয়ী কেউই নয়', আল-গালিবের এই জীবনদর্শনও অনেক জায়গায় খোদাই করা ছিল। অন্যান্য লেখা ছিল নিছকই শোভাবর্ধনের জন্য। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণের প্রতিলিপিও ছিল।

● বক্র খিলান

ইউরোপের মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যই ছিল ঘোড়ার খুরের আকারে খিলান। কিন্তু মুসলিম স্থাপত্য প্রসারের আগে থেকেই উত্তর সিরিয়া, টেসিফন সহ অন্যান্য অনেক জায়গার স্থাপত্যে এই খিলানের ব্যবহার দেখা গেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য কৌনিক খিলানই ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইসলামে এর প্রথম ব্যবহারও দেখা গেছে দামাস্কাসের উমাইয়া মসজিদ এবং কাস্‌র আমরাহ-তে। উমাইয়া মসজিদে অবশ্য অশ্বখুরাকৃতি খিলানের ব্যবহারও ছিল। মুসলিম বিজয়ের আগেও স্পেনের স্থপতিরা এই খিলান ব্যবহার করত। কিন্তু করডোভার মুসলিমরাই প্রথম এর শৈল্পিক ও স্থাপত্যগত উপযোগিতা উপলব্ধি করে এবং সেই অনুযায়ী তাকে উন্নতও করে। পাশ্চাত্যে এই স্থাপত্যই মুর স্থাপত্য বলে খ্যাত। তবে, করডোভার আরবদের একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি হল আড়াআড়ি ধনুকাকৃতি ছাদ এবং দর্শনসাধ্য আড়াআড়ি শিরা।

করডোভার এই স্থাপত্যশৈলী টলেডো এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব মোজারাবদের। এখানে ইসলামি স্থাপত্যের সঙ্গে খ্রিস্টান স্থাপত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক অনন্য ধারার জন্ম হয় মুদেজার শিল্পীদের হাতে। ধনুকাকৃতি খিলান ও ছাদের ব্যবহারই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। দুই ধর্মের এই মিলিত শিল্পশৈলীই স্পেনের জাতীয় স্থাপত্যে পরিণত হয়। গোটা দেশেই এর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। স্পেনীয় ভাষায় স্থাপত্য সংক্রান্ত অনেক কথারই মূল রয়েছে আরবী ভাষায়।

● সঙ্গীত

বাগদাদের মাওসিলি সঙ্গীত শিক্ষায়তনের এক ছাত্র জিরয়াবের মাধ্যমেই স্পেনে মুসলিমদের সঙ্গীতকলার প্রচার শুরু হয়। জিরয়াব করডোভায় আসেন ৮২২ খ্রিস্টাব্দে। সঙ্গীতে অপার জ্ঞান, বিজ্ঞানে প্রশ্নাতীত দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আকর্ষক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত স্বভাব তাঁকে অচিরেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। দ্বিতীয় আবদ-আল-রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় জিরয়াব করডোভায় একটি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। এই শিক্ষাকেন্দ্র আন্দালুসিয়ার সঙ্গীতের প্রসারকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং সেভিল, টলেডো, ভ্যালেন্সিয়া এবং

গ্রানাডায় এইরকম আরো শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই জিরয়াবই স্পেনের ঈগলের বাঁকা নখরের মতো বীণা প্রভৃতির তার তোলার জন্য গজদন্ত নির্মিত যন্ত্রবিশেষের পরিবর্তে কাঠের যন্ত্র নির্মাণ করেন। তিনি বীণায় পঞ্চম একটি তার সংযোজন করেন।

জিরয়াবের পরে তাঁর পরম্পরাকে অব্যাহত রাখেন আবু-আল-কাসিম এবং আব্বাস-ইবন-ফিরনাস (মৃ. ৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে)। প্রাচ্যের সঙ্গীত স্পেনে পরিচিত এবং জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব বহুলাংশে এঁদেরই। বিজ্ঞানচর্চার প্রতি জিরয়াবের অনুরাগই তাঁকে পাথর থেকে কাচ তৈরির পন্থা আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের বাড়িতে তিনি একধরনের তারামণ্ডল তৈরি করেছিলেন যেখানে বসে তারা, মেঘ এমন কী বিদ্যুৎও দেখা যেত। আরব ইতিহাসে ইবন-ফিরনাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছিলেন। পালকের তৈরি একটি ডানা দিয়ে তিনি উড়ানযন্ত্র তৈরি করেছিলেন। শোনা যায়, এর সাহায্যে বেশ কিছুদূর উড়তেও পেরেছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত এই ওড়ার চেষ্টার মাসুল হিসাবে তাঁকে বেশ চোট পেতে হয়। কারণ, এই ডানা ওড়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।[১১] জিরয়াব এবং ইবন-ফিরনাসের সঙ্গীতে স্বাভাবিকভাবেই ছিল পারস্য ও আরবের প্রভাব। তবে গ্রিক সঙ্গীত আরবীতে অনূদিত হওয়ার ফলে গ্রিক ও পিথাগোরিয় প্রভাব আসতে শুরু করে।

পূর্বাঞ্চলের মুসলিমদের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিমদের সঙ্গীতানুরাগ ছিল অনেক বেশি। ১১ শতাব্দী নাগাদ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাগদাদের খ্যাতিকে প্রায় ম্লান করে দিয়েছিল আন্দালুসিয়া। সেইসময় কিছুদিন করডোভার শাসনভার ছিল 'আব্বাসি'দের দখলে। এদের আমলে সঙ্গীত ও অন্যান্য নান্দনিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে সেভিল। এই সবই ছিল আন্দালুসিয়া ঘরানার সঙ্গীত। আল-মুতামিদ (১০৬৮-৯১) নামে এক 'আব্বাসি' খলিফা শুধু একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও বীণাবাদকই ছিলেন না, তাঁর কাব্যপ্রতিভাও ছিল অসামান্য। 'আব্বাসি'-দের রাজধানী বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে বাদ্যযন্ত্র রপ্তানি করাও শুরু হয়। মুরাবিয় যুগে সেভিল এবং ফাসের বিশিষ্ট দার্শনিক ইবন-বাজ্জা (মৃ. ১১৩৮) সঙ্গীতের উপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে বইটির আর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। তবে, সেইসময় ইউরোপে এটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। প্রাচ্যে ঠিক এমনই কদর ছিল আল-ফারাবির গবেষণার। মুয়াহ্হিদ যুগের এক বিশিষ্ট দার্শনিক ইবন-সাবঈন (মৃ. ১২৬৯) সঙ্গীত সংক্রান্ত আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন, নাম 'কিতাব আল-আদোয়ার আল-মানসুব'। বইটির একটিমাত্র সংস্করণ অক্ষত আছে যা কায়রোতে সযত্নে রক্ষিত।[২০] সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কে শ্রেষ্ঠ—সেভিল না করডোভা তাই নিয়ে একবার এক বির্তক হয়েছিল ইবন-রুশদ এবং আবু-বকর মুহাম্মাদ ইবন-যুহ্র-এর মধ্যে। বিতর্কে উপস্থিত ছিলেন মুয়াহ্হিদ যুগের তৃতীয় শাসক আল-মানসূর (১১৮৪-৯৯)। করডোভার সমর্থনে ইবন-রুশদ তাঁর প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন 'আপনি কী বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটা জিনিস আমি জানি, সেভিলে কোন পণ্ডিতের মৃত্যু হলে তাঁর বই-পত্র করডোভায় এনে বিক্রি করতে হয়, কারণ সেখানে

বইয়ের চাহিদা আছে। কিন্তু করডোভায় কোন সঙ্গীতজ্ঞের মৃত্যু হলে তাঁর বাদ্যযন্ত্রগুলি সেভিলে এনে বিক্রি করা হয়"।[২১]

● ইউরোপের প্রভাব

খ্রিস্টানরা মুসলিমদের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবদেশে গানের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ক্যাস্টিল এবং আরাগনের রাজদরবারে মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ; গ্রানাডার পতনের পরেও মুরদের নৃত্যগীত স্পেন ও পর্তুগালের[২২] মানুষের মনোরঞ্জন করেছে। রিবেরার[২৩] সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়, ১৩ শতাব্দী ও তারপরে স্পেনের জনপ্রিয় সঙ্গীত (মিউজিকা ফিকটা) এবং গোটা দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গীতের কথা, সুর ইত্যাদির মূল সূত্র রয়েছে আন্দালুসিয়ায়। তারপর আরবী, পারসি, বাইজানটাইন এবং গ্রিক ভাষার মাধ্যমে এই সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়েছে। দর্শন, গণিত এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসার ঘটে গ্রিস এবং রোম থেকে। বাইজানটাইন পারস্য, বাগদাদ হয়ে স্পেন এবং তারপর গোটা ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গীতচর্চার বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীন স্পেনের যেসব বাদ্যযন্ত্রের ছবি পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে মুসলিমদেরই তৈরি। এমনকী সেই সময়ের অনেক সঙ্গীতশিল্পীই ছিলেন মুসলিম।

প্রাচীন স্পেনের অনেক চিত্রেই দেখা যায়, আরব সঙ্গীতশিল্পীরা দাবা খেলছেন।[২৪] ১২৫২-৮২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাস্টিল এবং লিঁয়-র রাজা দশম অ্যালফনসোর[২৫] লেখা ইউরোপীয় একটি ভাষার একটি রচনাই স্পেনে পাওয়া দাবা সংক্রান্ত প্রথম রচনা। খ্রিস্ট ধর্মপ্রধান স্পেনে মুসলিম শিক্ষাপ্রসারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই রাজা অ্যালফনসো। তাঁর আমলেই বিখ্যাত কবিতা সংকলন ক্যান্টিগাস ডি সান্টা মারিয়া প্রকাশিত হয়। রিবেরার মতে, এই সব কবিতায় যে সুর দেওয়া হয়েছিল, তার কৃতিত্ব মুসলিম ও আন্দালুসিয়ানদের। এই কবিতা সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজা আলফনসো গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সংক্রান্ত একটি বিশেষ অঙ্কও তৈরি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর তৈরি করা আইনে ইসলামের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বর্তমান স্পেনের আইনও তৈরি হয়েছে রাজা আলফনসোর তৈরি এই আইনের ভিত্তিতে।

মধ্যযুগে ফ্রান্সের প্রভাঁস প্রদেশে প্রেমের গানে আরব সঙ্গীতজ্ঞদের প্রভাবের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। শুধু গানের ভাব বা মেজাজেই নয়, যন্ত্রানুষঙ্গের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব ছিল স্পষ্ট। প্রভাঁসের গায়কেরা তাঁদের গানের যে নাম দিতেন তাও আরবী ভাষা থেকে অনূদিত। প্যারিসের সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ অ্যাডেলার্ডই সম্ভবত আল-খওয়ারিজমির গণিত সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদক। লিবার ইয়াসাগোগোগারাম আলকোরিসমি নামে এই গ্রন্থে সঙ্গীত সংক্রান্ত একটি অধ্যায় ছিল। লাতিন বিশ্বের সঙ্গে আরবীয় সঙ্গীতকে পরিচিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যমই ছিল এই গ্রন্থ। অ্যাডেলার্ডের সঙ্গীতচর্চার সময় ছিল ১২ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। সেই সময়ের মধ্যেই সঙ্গীত সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থ এবং আল-কিনদি, আল-ফারাবি, ইবন-সিনা এবং

ইবন- বাজ্জার মত পণ্ডিতদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আরবদের হাতে এসে গিয়েছিল। এইসব মৌলিক গবেষণা লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হত টলেডোয়। ১২ শতাব্দীর শেষভাগেই তা ইউরোপে প্রচারিত হয়ে যায়। এই সময়েই খ্রিস্টান ইউরোপীয় সঙ্গীতে ব্যাকরণ চালু হয়। সঙ্গীতে তাল ও লয়ের এই প্রভাবকে প্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন কোলনের ফ্র্যাঙ্কো (১১৯০)। তাঁর তৈরি ফ্র্যাঙ্কোনিয়ান স্বরলিপির সঙ্গে এখনকার স্বরলিপির বিশেষ ফারাক নেই। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কোর যুগের অন্তত চার দশক আগে থেকেই আরবীয় সঙ্গীতে এই তাল বা 'ইকা'র বহুল ব্যবহার ছিল। আল-কিনদির লেখায় এর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আছে। ফ্র্যাঙ্কোর পর গারল্যাণ্ডের জনের নামে একটি পুস্তিকা রচিত হয়। গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ছিল লয় বা 'ওকেটাস'। 'ওকেটাস শব্দটি সম্ভবত আরবী শব্দ ইকাআত (ইকার বহুবচন) থেকে নেওয়া হয়েছে।

তাল ও লয়ের ব্যবহার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আরবদের একমাত্র অবদান নয়। দুটি বাদ্যযন্ত্র বীনা (আরবী আল-উদ, স্প্যানিশ লাউদ্) এবং রবাবকে (আরবী রবাব[২৬], স্প্যানিশ রাবেল)' পশ্চিম ইউরোপে জনপ্রিয় করার কৃতিত্বও আরবদের। কবি চসারের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র রবাব বা রিবিবে থেকেই আজকের বেহালার জন্ম। পর্তুগালে এখনও বেহালাকে রাবেকা বলা হয়। এই উপদ্বীপের অন্যান্য অনেক বাদ্যযন্ত্রের নামের উৎস আরবী ভাষায়। যেমন প্রাচীন ভেরী বা আনাফিল (ফ্রেঞ্চ আনাফিন, মূল আরবী আল-নাফির[২৭]), খঞ্জনী বা প্যানডেরো (প্রচলিত আরবী বান্দায়ার), করতাল বা সোনাজাস (আরবী বহুবচন সুনুজ, একবচন সিনজ, ফ্রেঞ্চ সান্জ)। ইউরোপে গীটার (ফ্রেঞ্চ, আরবী কিতারা[২৮], স্প্যানিশ গীটারা, মূল শব্দ জার্মান), শিঙা (স্প্যানিশ অ্যালবোক, ফ্রেঞ্চ, আরবী আল-বাক), টিমবাল (স্প্যানিশ আটামবাল, ফ্রেঞ্চ, আরবী আল-তবল) এবং কানুনের (ফ্রেঞ্চ, আরবী কানুন) মত বাদ্যযন্ত্রের প্রচলনও হয় আরবদের মাধ্যমে। ❑

● টীকা ●

১ স্প্যানিশ আলহাজা, গহনা, আরবীতে বলে আল-হাজাহ।

২ ইউরোপীয় সংগঠনের সাথে দামাস্কাস কাজ করত, কিন্তু সাধারণভাবে দামাস্কাসিয় সংগঠন বলেই পরিচিত ছিল।

৩ মাক্কারি খণ্ড, ১ পাতা-১২৪

৪ আরবীতে আল-জুলাইজি। দেখতে হবে মাক্কারি, খণ্ড ১ পাতা ১২৪

৫ ইদ্রিসি, সিফাত-আল-মাগরিব (লিডেন), পাতা-১৮৯

৬ ইবন হাওকাল, পাতা ৭৯ ; ইসতাখরি, পাতা-৪৪, ১.৮ , ইবন আল-খাতীব, লামহা, পাতা-১৩ ; মাক্কারি খণ্ড ১, পাতা-১২৩-৪।

৭ মাককারি, খণ্ড ১, পাতা-১০২।

৮ ঐ। মূলগ্রন্থের পাতা-৬৬৮।

৯ ঐ। মূলগ্রন্থের পাতা ৪২২-৩ এবং পাতা ৬৬৮

১০ ঐ। পাতা ৫০৮-৯

১১ ঐ। পাতা ৫৩৩

১২ উমারি, মাসালিক আল-আবসার ফি মামালিক আল-আমসার, আহমাদ-যাকী, ১ম খণ্ড, (কাইরো, ১৯২৭) পাতা, ২১২।

১৩ ঐ। পৃঃ ২৬৪, ২৬৫

১৪ অর্থতত্ত্বের জন্য হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার ২ নম্বর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৫ এটার জন্য সবচেয়ে ভালো ছবি পাওয়া যাবে অ্যালবার্ট এফ. কালর্ভাট, আলহামরা, দ্বিতীয় সংস্করণ (লন্ডন, ১৯০৭)।

১৬ ঐ। মূলগ্রন্থের ৪১৭ পৃঃ c.f. বেল, ওখাইডির পাতা ৫, ৯, ১২, pl. ৭, সংখ্যা ১ সি লিওনার্ড ওলে, দি সামেরিয়ানস (অক্সফোর্ড, ১৯২৮) পাতা, ৩৬-৭।

১৭ দৃষ্টান্তস্বরূপ : আরবী ভাষায় শান-বাঁধানোর জন্য প্রস্তরফলককে বলা হয় 'কাদ্দান'। তা স্পেনীয় ভাষায় হয়েছে 'আদুকুইন' (ADOQUIN)। খাদ্য, পাত্র প্রভৃতি রাখার আলমারিকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'আল-খাজানাহ্'; তা স্পেনীয় ভাষায় হয়েছে 'আলাসেনা' (ALACENA)। আরবী ভাষায় নির্মাতাকে বলা হয় 'আল-বান্না'। স্পেনীয় ভাষায় তা হয়েছে আলবানিল, (ব্যবহারিক, আলভাণেল)। আরবীতে শয়নাগারকে বলা হয় 'আল-কুতবাহ্'। তা স্পেনীয় ভাষায় হয়েছে 'আলকোতা' (ALCOTA) ব্যবহারিক 'আলকোবা'। যা হতে ইংরেজিতে হয়েছে 'আলকোভ'। আরবীতে মঞ্চ বা ভারাকে বলা হয় 'আল-দিইআম্আহ্'। স্পেনীয় ভাষায় তা হয়েছে 'আন্দামিও' (ANDAMIO), ব্যবহারিক : আন্দেইম, সমতল ছাদ বোঝাতে আরবীতে বলা হয় 'আল-সুতাইহাহ্'। স্পেনীয় ভাষায় তা হয়েছে 'আজোতিয়া' (AZOTEA), ব্যবহারিক : 'আকোতেইয়া'। জল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখার আধারকে আরবীতে বলে 'আল-জাব'। তা থেকে স্পেনীয় আলগিব (ALGIBE) ওগিভ হয়েছে। 'কাদ্দান' সম্পর্কে দেখুন, ডি. লিওপোল্ড দ্য ইগুইলাজ ওয়াই আঙ্গুয়াস রচিত GLOSARIO ETIMOLOGICO DE LAS PALABRAS ESPANOLAS DE ORIGEN ORIENTAL (গ্রানাডা, ১৮৮৬)

তুলনীয় : আর. ডোজি এবং ডবলিউ. এইচ. এঙ্গেলম্যান, GLOSSAIRE DES MOTS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS DERIVES DE L'ARABE, দ্বিতীয় সংস্করণ (লিডেন, ১৮৬৯)। ইবন-যুবাইর-এর লেখায় 'আল-কায্যান' কথাটি আছে, ৩৩১ পৃষ্ঠা ; ১, ১৮.

১৮ দেখতে হবে, মূলগ্রন্থের পাতা ৫১৪

১৯ মাক্কারি খণ্ড, ১ খণ্ড, ২৫৪।

২০ আহমাদ তায়মুর-এর আল-হিলাল, খণ্ড ২৮(১৯১৯), পাতা ২১৪

২১ মাক্কারি, খণ্ড ১, পাতা ৯৮, ৩০২

২২ ইংল্যান্ডের মরিস নৃত্যশিল্পী, এই নাম চিহ্নিত করে এটা মুরীয়দের (স্পেন) শিল্প।

২৩ Histories de la musica drabe medievaly influencsu en la espanola (মাদ্রিদ, ১৯২৭) ; মিউজিক ইন এনসিয়েন্ট এ্যারাবিয়া এ্যাণ্ড স্পেন ; Being La musicas de las cantigas, ভাষান্তর ও সংক্ষিপ্তকরণ : ইলিনর হগ ও মারিওন লেফিংওয়েল (স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৯), বিশেষত দ্বাদশ অধ্যায় ; Disertaciones, খণ্ড-২ ; পাতা ৩-১৭৪

২৪ স্পেনীয় 'এ্যাজেড্রেজ' (মূলত 'এক্সিদ্রেজ') ব্যবহারিক 'জেদ্রেজ' (XADREZ) — এই সবই আরবী 'আল-শতরঞ্জ' হতে এসেছে, যা পার্সির মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত (দেখুন, ৩৩৯ পৃঃ)। তাস খেলার উৎস হয় আরব হবে নয়তো আরবীয়দের মাধ্যমে তা ইউরোপে পৌছেছে। স্পেনীয় ভাষায় খেলার তাসকে বলা হয় 'নইপ' (NAIPE), ইতালিতে বলা হয় 'নাইব' (NAIB)। এগুলি আরবী শব্দ 'নায়িব' (শাসক) হতে এসেছে। যা ১৫ শতক পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এল. এ. মেয়ার, Bulletin del' institut Francais d' Archeologie orientale, খণ্ড ৩৮ (১৯৩৯), ১১৩ ও পরবর্তী পাতা।

২৫ চিত্রণের জন্য দেখুন জন জি. হোয়াইট, EL tratado de ajedrez del Rey d. Alonso el Sabio. del ano ১২৮৩ (লিপজিগ, ১৯১৩), পিএল. ৪৩

২৬ উপরোক্ত গ্রন্থ, ৪২৬ পাতা।

২৭ বহুবচনে 'আনফার' (সম্ভবত তা হতে ইংরেজিতে 'ফানফেয়ার' হয়েছে)। ক্রুশেডের সময় সিরিয়া থেকে ইউরোপে এই যন্ত্রটির আবির্ভাব ঘটেছে। তার নাম থেকে অন্তত তাই অনুমিত হয়। যেরূপভাবে করতাল (সুনুয্) হয়েছে। হেনরি জি. ফারমার, 'ওরিয়েন্টাল ইনফ্লুয়েনসেস অন অক্সিডেন্টাল মিলিটারি মিউজিক', ইসলামিক কালচার, ১৫ খণ্ড (১৯৪১), ২৩৫-৪২ পাতা ; দেখুন, নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থ, ৬৬৩-৫৪ পাতা।

২৮ শব্দটির পুংলিঙ্গ হল, 'কিতার', প্রাগুক্ত, ৪২৭ পৃষ্ঠা।

।। অধ্যায় ৪২ ।।

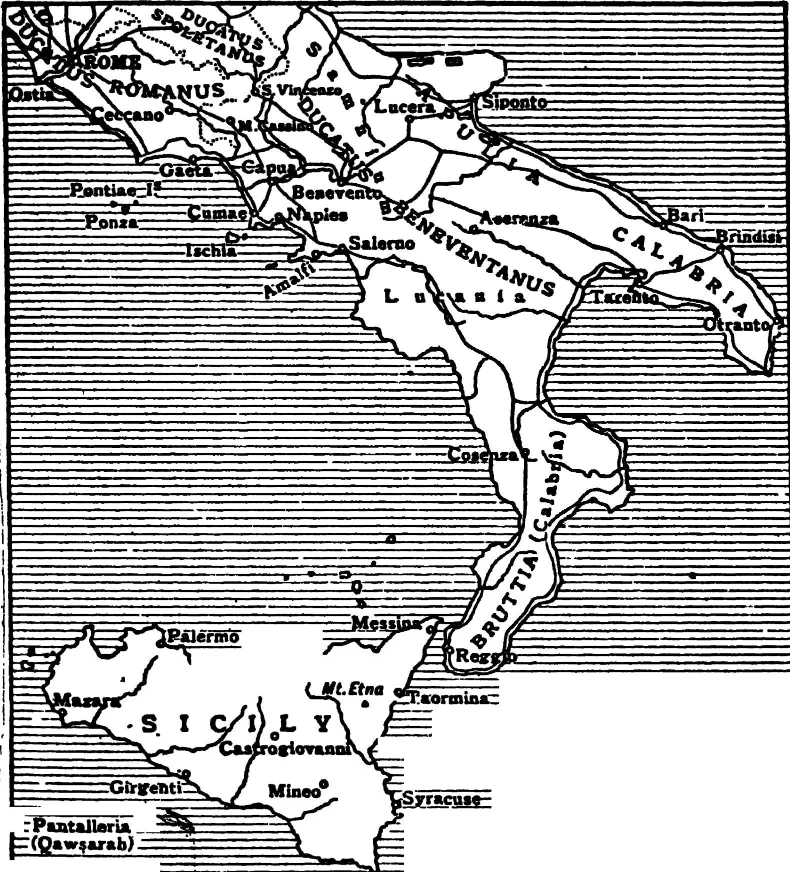
সিসিলিতে

● বিজয়

উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে আরব আধিপত্যের চূড়ান্ত পর্ব হল মুসলিমদের সিসিলি (আরবী সিকিল্লিয়াহ) বিজয়। নবম শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপ এবং সিসিলিতে মুসলিম বিজয়ের নেতৃত্বে ছিলেন আল-কায়রাওয়ানের আগলাবিয়রা। তবে এর আগেও এই অঞ্চলে ভাগ্যান্বেষী মুসলিম সেনা, দস্যু বা অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষের বিক্ষিপ্ত আক্রমণ হয়েছে। ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইন-শাসিত আলেকজান্দ্রিয়ার নৌবাহিনীকে আক্রমণ করে জলপথের দখল নিয়ে নেয় আরবরা। একই বছরে মু'আবিয়ার[১] সেনাপ্রধান প্রথমবার সিসিলি আক্রমণ করে। সাইরাকিউজ (সারাকুসা, সারাকুস্‌সা) থেকে আরবরা গির্জায় রক্ষিত সম্পদ ও অন্যান্য মূলবোন সামগ্রী লুঠ করা ছাড়াও বহু নারীকে অপহরণ করে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সিসিলির উপর বারবার আঘাত হেনেছে মুসলিম লুঠেরারা। অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের বার্বার ও আরব জলদস্যুরা উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের দ্বীপগুলিকে ক্রমাগত আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে ফেলে। ফলে সিসিলি, করসিকা এবং সার্ডিনিয়ার বাসিন্দারা সর্বদাই আতঙ্কে দিন কাটাত। জলপথে আক্রমণ এবং লুঠতরাজ তখনকার দিনে জীবিকা হিসেবেই যথেষ্ট স্বীকৃত ছিল — তা সে মুসলিমদের মধ্যেই হোক, বা খ্রিস্টানদের মধ্যে. তবে এইসব লুঠতরাজই ছিল বিক্ষিপ্ত।

পরিস্থিতি পাল্টে যায় নবম শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। আল-কায়রাওয়ানের ক্ষমতাশালী আগলাবিয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সাইরাকিউজের এক বিদ্রোহী বাইজানটাইন শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করে আগলাবিয় রাজদরবারে। আগলাবিয়দের তৃতীয় শাসক প্রথম জিয়াদাত-আল্লাহ্‌ (৮১৭-৩৮)-এর কাছে আক্রমণের সুবর্ণসুযোগ এসে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ৭০ বছর বয়স্ক কাযী-উজির আসাদ ইবন-আল-ফুরাতের[২] নেতৃত্বে ১০ হাজার সেনা সংবলিত ৭০টি যুদ্ধজাহাজ এবং ৭০০ ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। সেইসঙ্গেই শুরু হয় প্রকৃত বিজয়পর্ব। আফ্রিকান সেনারা মাজারায়[৩] নোঙর ফেলে এবং সাইরাকিউজের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেনাদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ায় আসাদ এবং

তাঁর বহু সেনাকে[৭] ফিরে যেতে হয়। স্পেন থেকে নতুন সেনাবাহিনী আসার পর তারা ৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পালেরমো (আরবী বালারম, মূলত ফিনিশিয়ার উপনিবেশ) দখল করে। নয়া সেনাবাহিনীর দৌলতে বাড়তে থাকে লুঠতরাজ এবং দখল। প্রশস্ত হতে থাকে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ। ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মেসিনা[৮] তাদের দখলে আসে। ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবল পরাক্রমী



সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি

আগলাবিয় শাসক দ্বিতীয় ইব্রাহিম (৮৭৪-৯০২)-এর শাসনকালে ন'মাসের আক্রমণের পর সাইরাকিউজ আরবদের দখলে আসে। শাসনকালের শেষপর্বে দ্বিতীয় ইব্রাহিম সিসিলিতে চলে আসেন এবং সিসিলির সীমা কমিয়ে এনে মাউন্ট এটনা[৯] পর্যন্ত সীমিত করে দেন। ৯০২ খ্রিস্টাব্দে

তিনি তাওরমিনা দখল করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম-এর মৃত্যু হয় সিসিলিতে। তাঁকে কবরও দেওয়া হয় সেখানে। ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে যে বিজয়পর্ব শুরু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ হয় তাঁর শাসনকালেই। পরবর্তী ১৮৯ বছর ধরে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে সিসিলি আরব সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ হয়েছিল।

● ইতালিতে

স্পেনকে কেন্দ্র করে যেমন উত্তরাঞ্চলে লুঠতরাজ এবং আক্রমণ করা হত, ঠিক তেমনই ইতালির ক্ষেত্রেও সিসিলির ভূমিকা ছিল একইরকম। ৯০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগেই দ্বিতীয় ইব্রাহিম ইতালির পাদদেশ ক্যালাব্রিয়া[৭] পর্যন্ত তাঁর বিজয়রথ নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও ইতালি আক্রমণকারী প্রথম আরব কিন্তু তিনি নন। পালেরমো দখলের কিছুদিন পরেই আগলাবিয় সেনাপ্রধানরা দক্ষিণ ইতালির লমবার্ডদের অভ্যন্তরীণ কলহে হস্তক্ষেপ করে। লমবার্ডরা তখনও পর্যন্ত বাইজানটাইন শাসকদের অধীনে। এরপর ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে নেপলসের[৮] পক্ষ থেকে আরবদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। সেই সঙ্গেই ভিসুভিয়াসের পর্বতশ্রেণীতে মুসলিমদের রণদামামা বেজে ওঠে। চারবছর পরে বারি দখল করে আরবরা। পরবর্তী ৩০ বছর ধরে এই বারিই ছিল মুসলিমদের সামরিক ঘাঁটি। সেই সময়ে তারা ভেনিসও আক্রমণ করে। ৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে তারা অস্ট্রিয়া পৌঁছয় এবং রোম আক্রমণেরও চেষ্টা করে। রোমের ভিতরে ঢুকতে না পেরে তারা ভ্যাটিকানের কাছে সেন্ট পল এবং সেন্ট পিটার গির্জা অবরোধ করে এবং যাজকদের সমাধি নষ্ট করে। তিনবছর বাদে আরেকটি মুসলিম বাহিনী অস্ট্রিয়া বন্দর আক্রমণ করে। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের প্রাচীর ও ইতালিয় নৌসেনার প্রতিরোধের মুখে তারা দাঁড়াতে পারেনি। র‍্যাফেলের ছবিতে নৌবাহিনীর এই লড়াই এবং রোমের রক্ষা পাওয়ার দৃশ্য দেখা যায়। তবে রোম রক্ষা পেলেও ইতালির উপর মুসলিমদের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। মুসলিম কর্তৃত্বের এতটাই জোর ছিল যে, অষ্টম পোপ জন (৮৭২-৮২) দুবছর ধরে[৯] মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

● আল্‌পস অতিক্রম

আগলাবিয়রা তাদের আক্রমণ ইতালির উপকূলের মধ্যেই সীমিত রাখেনি। ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তারা মাল্টা[১০] দখল করে। দশম শতাব্দীতে এই লুঠতরাজ ইতালি এবং স্পেন থেকে মধ্য ইউরোপের আল্‌পস পর্বতমালাতেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্‌পসের অনেক প্রাসাদ এবং প্রাচীরকেই সারাসেন আক্রমণের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা হয়। বায়দেকারের সুইজারল্যাণ্ড গ্রন্থে গ্যাবি এবং অ্যালগ্যাবির (আল-জাবি?, কর সংগ্রাহক) মত অনেক জায়গার নাম আছে যার মূল রয়েছে সম্ভবত আরবীতে।[১১]

● সিসিলি হতে প্রত্যাহার

৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বারিকে মুসলিম দখলমুক্ত করে খ্রিস্টানরা। সেই সঙ্গেই সূচনা হয় ইতালি এবং মধ্য ইউরোপে দুঃস্বপ্নময় মুসলিম যুগের অবসানের। বারির সেনাপ্রধানরা নিজেদের এতটাই ক্ষমতাশালী মনে করতে শুরু করেছিল যে তারা পালেরমোঁর আমিরের বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হয়। নিজেদের স্বাধীন 'সুলতান' বলে ঘোষণা করে তারা। ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইন সম্রাট প্রথম বাসিল টরান্টো (টারান্ট)-এর মত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ মুসলিমদের দখলমুক্ত করেন। কয়েকবছর বাদে তিনি ক্যালাব্রিয়া থেকেও অবশিষ্ট মুসলিমদের হটিয়ে দেন। এইভাবে, ২৫০ বছর আগে সুদূর আরব থেকে আরম্ভ হওয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। নেপলসের দক্ষিণের উপকূলের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আজও অন্য মাত্রা দেয় অসংখ্য 'সারাসেন মিনার'। এই মিনারগুলি থেকেই সিসিলি বা আফ্রিকা থেকে আবব বাহিনীর আগমনবার্তা ঘোষণা করা হত। .

● সিসিলিয় আমিরগণ

সিসিলিতে প্রথম কার্যভার গ্রহণ করেন আমীর আল-কায়রাওয়ানের[১১] আগলাবিয়দের অধীনে। ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আরো ক্ষমতাশালী ফাতিমিয়দের কাছে পরাস্ত হয় আগলাবিয়রা এবং সিসিলি হয়ে যায় ফাতিমিয় খলিফাদের সাম্রাজ্যের একটি অংশ। উত্তর আফ্রিকায় এই ফাতিমিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন উবায়দুল্লাহ-আল-মাহদী। চারবছর পরে আহমাদ ইবন-কুরহাব (৯১২-১৬)-এর নেতৃত্বে সিসিলির মুসলিমরা ফাতিমিয়দের হটিয়ে দেয়। ফাতিমিয়দের শত্রু আব্বাসীয় খলিফা-আল-মুকতাদিরের নামে শুক্রবারের প্রার্থনা[১২] করে তারা। ৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আমীর আহমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর বার্বারি সেনারা। আল-মাহদীর আদেশে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। আর সিসিলি আবার চলে আসে ফাতিমিয়দের দখলে। সিসিলিকে কেন্দ্র করে তারা জেনোয়া পর্যন্ত তাদের লুঠতরাজ চালিয়ে যায়। ৯৩৪ অথবা ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তারা জেনোয়া দখল করে।

সিসিলির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। স্পেন এবং আফ্রিকার মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ ছিল সর্বদাই। কালবীয়সহ দক্ষিণ আরবের ইয়ামানীয় এবং উত্তরের আরবদের মধ্যে পার্থক্য এবং দীর্ঘদিনের শত্রুতা এই বিরোধকে আরো জটিল করে তুলেছিল। ৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ফাতিমিয় খলিফা আল মানসুর সিসিলির রাজ্যপাল হিসাবে আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন-আবি-আল-হুসাইন আল-কালবি' (৯৬৫)-কে নিযুক্ত করেন। তিনি মোটামুটিভাবে একটি স্বাধীন ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র[১৩] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ও তাঁর কালবীয় রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা তাঁদের শাসনকালে বহুভাষার এই দ্বীপে আরব সংস্কৃতিকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবু আল-ফুতুহ্ ইউসুফ ইবন-আব্দুল্লার (৯৮৯-৯৮) স্বল্পস্থায়ী আমলেই মুসলিম সিসিলি সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল।

কালবীয় আমীররা তাঁদের সমৃদ্ধ নগরগুলিতে বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদে থাকতেন। তাঁদের রাজদরবারও ছিল যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত। পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও পর্যটক ইবন-হাওকাল-এর[১৫] (৯৪৩-৭৭ খ্রিঃ) রচনায় রাজধানী পালেরমোর বর্ণনা আছে। প্রাচীনতম এই বর্ণনা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁর রচনা থেকেই জানা যায়, সেইসময় পালেরমোতে দেড়শোরও বেশি মাংসের দোকান এবং ৩০০ মসজিদ ছিল। মসজিদের প্রার্থনায় জমায়েত হওয়া ভক্তদের ৩৬টি সারি, প্রত্যেক সারিতে ২০০ জন করে; সর্বমোট সংখ্যা সাত হাজারেরও বেশি তিনি গণনা করেছিলেন। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল তিনশোরও বেশি। এদের অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হত, যদিও 'শিক্ষকরা তাঁদের অযোগ্যতার জন্য নিন্দিত ছিলেন'।

● নরম্যান বিজয়

গৃহযুদ্ধ ও বাইজানটাইন শাসকদের মদতের ফলে কালবীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর ফলে এই দ্বীপের শাসনভার নরম্যানদের হাতে চলে আসে। নরম্যান বিজয়ের সূচনা ঘটে ১০৬০ খ্রিস্টাব্দে ট্যানক্রেড ডি হটেভিলের পুত্র কাউন্ট রজারের মেসিনা বিজয়ের মাধ্যমে। ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পালেরমো দখল করেন এবং ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাইরাকিউজ। ১০৯০-তে মাল্টা বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। নরম্যানরা এর আগেই প্রধান ভূখণ্ডে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। ১০৯১ খ্রিস্টাব্দের পর নবলব্ধ সাম্রাজ্যেও তারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

● আরব-নরম্যান সংস্কৃতি

নরম্যানদের আমলে সিসিলিতে খ্রিস্টান ও আরব সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও বিকাশ ঘটে। প্রাচীন সভ্যতার সুস্পষ্ট স্মৃতি সিসিলিতে ছিল। আরব শাসনকালে তাতে পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। আর নরম্যানদের শাসনকালে গ্রিস ও রোমের মূল্যবান ঐতিহ্যের প্রভাবে সিসিলিতে নরম্যান সংস্কৃতি এক স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। সেইসময় পর্যন্ত আরবরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ ও সংঘর্ষে এতই ব্যস্ত ছিল যে, ললিতকলার বিস্তারে তারা মনোযোগই দিতে পারেনি। কিন্তু আরব-নরম্যান শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিভা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়।

প্রথম রজার (১১০১) ছিলেন স্থূলরুচির মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরব সংস্কৃতির সূক্ষ্মতা তাঁকে ছুঁয়েছিল। প্রাচ্যের দার্শনিক, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ এবং চিকিৎসকদের তিনি যথেষ্ট সম্মান করতেন। সব ধর্মের প্রতিই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি এবং কারো ধর্মাচরণেই বাধা দিতেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর পদাতিক সেনার অধিকাংশই ছিল মুসলিম। তবে এক্ষেত্রে কবি 'আবদ-আল-জাব্বার ইবন হামদিসের (১০৫৫-১১৩২) কথা আলাদা। তাঁর জন্ম সাইরাকিউজে হলেও নরম্যান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি স্পেনের আল-মুতামিদের দরবারে আশ্রয় নেন। মোটের

উপর, রজার তাঁর পূর্বসূরিদের শাসনব্যবস্থাই কায়েম রাখেন। এমন কী উচ্চপদস্থ মুসলিম প্রশাসকরাও তাঁদের আগের পদেই বহাল ছিলেন। পালেরমোতে তাঁর রাজদরবারে প্রতীচ্যের থেকে প্রাচ্যের প্রভাবই ছিল বেশি। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সিসিলিতে এই ধারাই বজায় ছিল যেখানে খ্রিস্টান রাজশক্তি থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদে বেশ কিছু মুসলিম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই শতাব্দীতে সিসিলির বাণিজ্যের পুরোভাগে ছিল মুসলিমরা। কৃষিক্ষেত্রেও ছিল আরবদের আধিপত্য। কারণ স্পেনে থাকার সময় থেকেই তারা জানত জমিতে কীভাবে সোনা ফলাতে হয়। আখ, খেজুর, কার্পাস, জলপাই, কমলালেবু, তুঁতগাছ ইত্যাদি নানারকম চাষের প্রচলন করে আরবরাই। ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর নরম্যানরা রেশমগুটির চাষ আরম্ভ করে। প্রচুর পরিমাণে প্যাপিরাস গাছ লাগানো হত। ইবন-হাওকালের[১৭] মতে, এত ভাল প্যাপিরাস একমাত্র মিশরেই দেখা যেত। এর আঁশ থেকে তৈরি হত জাহাজের দড়ি। ইবন-জুবাইর[১৮] সিসিলিতে আসেন ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এখানকার উর্বরা জমি, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং জীবিকা নির্বাহের নানান উপায় দেখে তিনি মুগ্ধ হন। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাগানো আঙুর ও অন্যান্য গাছও তাঁর নজর কাড়ে।

ইউরোপ থেকে পাওয়া কাগজে লেখার প্রাচীনতম তথ্য হল প্রথম রজার-এর স্ত্রীর জারি করা একটি ফরমান। সম্ভবত ১১০৯ খ্রিস্টাব্দের এই নির্দেশ ছিল গ্রিক ও আরবী ভাষায় লেখা। তবে এই নির্দেশের কাগজ সিসিলির আরবরাই আমদানি করেছিল বলা অধিকতর যুক্তিসংগত। রাজা প্রথম রজার-এর আমলের মুদ্রা হল প্রাচীনতম। এতে আরবী ভাষায় লেখা ছাড়াও মুদ্রা তৈরির সময়কালও (১১৩৮) আরবীতে খোদাই করা ছিল।

সিসিলির খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে আরব সংস্কৃতি চর্চার যে ধারা প্রথম রজার আরম্ভ করেছিলেন, তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর পুত্র ও পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় রজার (১১৩০-৫৪) এবং দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর শাসনকালে। দ্বিতীয় রজার-এর পোশাক-আশাক ছিল মুসলিমদের মত। তাঁর আলখাল্লায় আরবী নকশা কাটা থাকত। মুসলিম সংস্কৃতির এই প্রভাবের ফলে তাঁর সমালোচকদের কাছে দ্বিতীয় রজার একরকম বিধর্মীই ছিলেন। ইবন-জুবাইরের[১৯] বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় উইলিয়াম (১১৬৬-৮৯)-এর আমলে পালেরমোর খ্রিস্টান মহিলারাও মুসলিম পোশাক পরতেন। দ্বিতীয় রজার তাঁর রাজধানীতে যে গির্জা তৈরি করেছিলেন তাতে আরব শিল্পকলার ছাপ ছিল স্পষ্ট। গির্জার ছাদে যে সব ছবি রয়েছে, তাতেও ছিল ফাতিমিয় শিল্পীদের প্রভাব। গির্জার দেওয়ালের লিখনে ব্যবহৃত হয়েছে কুফি ভাষা। তাই নিঃসন্দেহেই বলা যায়, এই গির্জা ছাড়াও সিসিলির অন্যান্য অনেক স্মারক তৈরির কাজে আরব কারিগরদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। ভ্যাটিকানের মিউজিও ক্রিস্টিয়ানো এবং অন্যান্য সংগ্রহশালায় হাতির দাঁতের তৈরি বহু জিনিস আছে যা সেইসময়ের সিসিলির আরব শিল্পকলার নিদর্শন।[২০] হাতির দাঁতের অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে আছে বাক্স ও ধর্মযাজকদের দণ্ড। রজারের সেনাবাহিনী এতই শক্তিশালী ছিল যে, তা ভূমধ্যসাগরে সিসিলিকে অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সেনাবাহিনী গঠন

● আল-ইদ্রিসি

দ্বিতীয় রজার-এর দরবারের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন ছিলেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট ভৌগোলিক ও মানচিত্রকর আল-ইদ্রিসি। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে আবু-আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন-মুহাম্মাদ আল-ইদ্রিসির (১১৬৬) জন্ম সিউতায়। তাঁর পিতামাতা ছিলেন স্পেনীয়-আরব। তবে তাঁর গবেষণামূলক কাজকর্মের সবই হয়েছে পালেরমোতে, দ্বিতীয় রজার-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। রজার সম্পর্কে তাঁর লেখা গ্রন্থের (কিতাব রুজার) নাম নুজহাত আল-মুস্তাক ফি ইখতিরাক আল-আফাক[২১] (যিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করতে উদ্গ্রীব, তাঁর জন্য শ্রান্তি-বিনোদন)। এই গ্রন্থে ছিল আল-মাসউদী এবং টলেমির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গবেষণার মূল কথা। কিন্তু এগুলি লেখা হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো পর্যটকদের সংগ্রহ করা তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এইসব তথ্য সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে আল-ইদ্রিসি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর গোল আকারের মত বিষয় নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। এই বিশাল গ্রন্থ ছাড়াও আল-ইদ্রিসি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের জন্য মহাকাশ সংক্রান্ত একটি গোলক এবং পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। দুটিই রুপোর তৈরি।[২২]

● দ্বিতীয় ফ্রেডারিক

দ্বিতীয় রজার এবং তাঁর দ্বিতীয় পৌত্র হোহেনস্টফেনের ফ্রেডারিক-কে বলা হত 'সিসিলির খ্রিস্টান সুলতান'।[২৩] দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (১২১৫-৫০) সিসিলি এবং জার্মানির সম্রাট ছিলেন। ১২২০ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের পদ পান এবং ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিঁয়া র উত্তরাধিকারী ইসাবেলের সঙ্গে বিবাহের ফলে জেরুসালেমের রাজা হন। এর ফলে তিনি খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বোচ্চ অসামরিক পদাধিকারীর মর্যাদা পান। বিবাহের তিন বছর পর তিনি এক ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এর ফলে তাঁর উপর মুসলিম ধ্যানধারণার আরো বেশি প্রভাব পড়ে।

ফ্রেডারিকের ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে প্রাচ্যের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁর নিজের একটি হারেম ছিল। তাঁর দরবারে ছিলেন সিরিয়া এবং বাগদাদের দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং লম্বা ঢিলাঢালা পোশাক পরিহিত দার্শনিকরা। ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের ইহুদিরা। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য প্রাচ্যের নর্তকীদের আনা হত। রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করতেন। মিশরের আয়্যুবিয় সুলতানের[২৪] সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সালাহ-আল-দীন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান আল-কামিল মুহাম্মাদের (১২১৮-৩৮) কাছ থেকে তিনি উপহার হিসাবে বেশ কিছু পশু পান। এর মধ্যে ছিল উট এবং জিরাফ।[২৫] ইউরোপের যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই এই উট তাঁর সঙ্গী ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে জিরাফ সেই প্রথম দেখা যায়। মিশর থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে তিনি সূর্যের আলোয় উটপাখির ডিম ফোটানো যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেন। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে দামাস্কাসের আয়্যুবিয় সুলতান আল আশরাফের কাছ

থেকে একটি তারামণ্ডল পান। এতে সূর্য ও চাঁদের চিত্র ছাড়াও তাদের আবর্তনের মাধ্যমে সময় পরিবর্তনের নির্দেশও দেওয়া রয়েছে। এর বদলে ফ্রেডারিক একটি শাদা ভালুক এবং শাদা ময়ূর দামাস্কাসের সুলতানকে উপহার দেন। এইসব উপহারে সিসিলি এবং দামাস্কাসের নাগরিকরা খুব খুশি হন। অন্যান্য মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান আল-কামিলের কাছেই তিনি অঙ্ক ও দর্শনের বিভিন্ন প্রশ্ন পেশ করতেন। কিছুটা তথ্য সংগ্রহ এবং কিছুটা সমস্যা সমাধানের জন্য। এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তৈরি করে দিতেন মিশরের এক পণ্ডিত।[১৮] জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা প্রশ্নের সমাধান হত আল-মাওসিলে। একই প্রশ্নমালা দেওয়া হত ইবন-সাবইন-এর কাছে।

ফ্রেডারিক সিরিয়া থেকে বাজপাখিকে তালিম দেওয়ার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়ে আসেন। তাঁর প্রশিক্ষণ স্বচক্ষে দেখে তিনি তা পরীক্ষা করে দেখতে বাজপাখির চোখ বেঁধে দেন, সে গন্ধ শুঁকে খাবার খুঁজতে পারে কিনা দেখতে। তিনি তাঁর দোভাষী এবং জ্যোতিষী থিওডোরকে (সাযূরি) দিয়ে আরবী ভাষায় লেখা বাজপাখির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি বই অনুবাদ করান। এই থিওডোর অ্যান্টিয়োকের[১৯] একজন জ্যাকোবিয় খ্রিস্টান। এই বইটি এবং পারস্যের আরেকটি বইয়ের অনুবাদের ভিত্তিতেই ফ্রেডারিক এ সম্পর্কে গবেষণা চালান, যা প্রকৃতি সংক্রান্ত বইয়ের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক ধারার প্রবর্তন করে। অ্যারিস্টটলের নাম ভাঁড়িয়ে লেখা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সির আল-আসরার গ্রন্থটির নির্বাচিত অংশও অনুবাদ করেন থিওডোর। থিওডোরের আগে রাজসভার রাজজ্যোতিষী ছিলেন মাইকেল স্কট। এই মাইকেল স্কট ১২২০ থেকে ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সিসিলি এবং ইতালিতে মুসলিম স্পেনের শিক্ষার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি তাঁর সম্রাটের জন্য অ্যারিস্টটলের জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা, বিশেষ করে ডি অ্যানিম্যালিবাসের সারাংশ আরবী থেকে লাতিনে অনুবাদ করেন। এর সঙ্গে ছিল ইবন-সিনার ভাষ্য। তাঁর পৃষ্ঠপোষককে উৎসর্গ করা স্কটের এই বইটির নাম অ্যাবরেভিয়াশিও অ্যাভিসেনে।

ফ্রেডারিকের রাজদরবারে প্রায় আধুনিককালের একাগ্রতা নিয়ে তথ্য-অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার পথেই ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা হয়। ফ্রান্সের প্রভাঁস প্রদেশ এবং আরবের প্রভাবে[২০] ইতালির সঙ্গীত ও কবিতা বিকশিত হতে লাগল। আরবীয় কবি ও গায়কদের প্রভাবে উগ্রভাষায় কবিতা লেখা হত। প্রথমদিকে ইতালির জনপ্রিয় সঙ্গীত অর্থাৎ উৎসবের গান এবং ব্যালাটা আন্দালুসিয়ার লোককাব্যেরই[২১] মত ছিল। ইংরেজিতে ছত্র বা Stanza কথাগুলি আরবী শব্দ বায়ত, 'গৃহ', 'কবিতার অংশবিশেষ (STROPHE)-এর অনুবাদ। তবে ফ্রেডারিকের সবচেয়ে বড় অবদান হল নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১২২৪)। ইউরোপে সেই প্রথমবার একটি নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু আরবী পাণ্ডুলিপি জমা করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যারিস্টটল এবং ইবন-রুশদের রচনার অনুবাদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ছিল। এইসব অনুবাদের প্রতিলিপি প্যারিস ও বোলোনার

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন টমাস অ্যাকুইনাস। ১৪ শতাব্দী এবং তার পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী



আল-ইদ্রিসির ভিত্তিতে পৃথিবীর একটি আরবী মানচিত্র

শিক্ষা চালু হয়। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছিল অক্সফোর্ড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এই চর্চার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের পাঠানোর প্রস্তুতি হিসাবেই আরবী শিক্ষাকে আরো প্রসারিত করা হয়।

● ভাবের আদানপ্রদানে সিসিলির ভূমিকা

সিসিলি ছিল দুটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার মিলনক্ষেত্র। তাই সিসিলির মাধ্যমে একই সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। সিসিলিতে একই সঙ্গে থাকতেন গ্রিকভাষী,

আরবীভাষী মুসলিম এবং বেশ কয়েকজন পণ্ডিত যাঁরা লাতিন জানতেন। সরকারি নথিপত্র এবং আইনে এই তিনটি ভাষাই ব্যবহৃত হত। পালেরমোর জনগণও এই তিন ভাষাতেই কথা বলতেন। ১১৬০ খিস্টাব্দ নাগাদ প্রথমবার আলমাজেস্ট সরাসরিভাবে গ্রিক থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদের কাজে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ইউজেন নামে গ্রিকভাষী এক সিসিলিয়ানের। পালেরমোর এই পণ্ডিতকে আমির উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর বিদ্যাচর্চার সময় ছিল দ্বিতীয় রজার এবং তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম উইলিয়াম-এর শাসনকালে। তিনি আরবী এবং লাতিন ভাষাও জানতেন। টলেমিকে নিয়ে লেখা গ্রন্থ অপটিকা আরবী থেকে লাতিনে অনুবাদ করেন। অপটিকার গ্রিক সংস্করণটি হারিয়ে গেছে। আরবী 'কালিলাহ' গ্রিকভাষায় অনুবাদের কাজেও সাহায্য করেন ইউজেন। উইলিয়ামের শাসনকালে কেবল আরবীভাষা থেকেই নয়, গ্রিক থেকে অনুবাদের কাজও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

স্পেনের ইহুদিদের মত সিসিলির ইহুদিরাও অনুবাদের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল-রাযীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশাল গ্রন্থ লাতিনে অনুবাদ করেন সিসিলির ইহুদি চিকিৎসক ফারাজ বেন সালিম। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে আনজউ-এর প্রথম চার্লস-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই অনুবাদের কাজ হয় এবং পরবর্তী সময়ে একাধিক পাণ্ডুলিপিতে এই গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থটিই চিকিৎসা সংক্রান্ত একমাত্র প্রধান গ্রন্থ, যা সিসিলিতে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদের মূল বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত। পরে টলেডোতে কয়েকটি গ্রিক ও আরবী গ্রন্থের পরিমার্জিত অনুবাদ হলেও এক্ষেত্রে সিসিলির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● ইতালির পথে

সিসিলির শাসক নরম্যান রাজারা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা কেবল এই দ্বীপেরই নয়, দক্ষিণ ইতালির-ও শাসক ছিলেন। তাই তাঁরা এই উপদ্বীপ এবং মধ্য ইউরোপে মুসলিম সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে প্রসারিত করেছেন। দশম খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ আল্পসের উত্তরাঞ্চলে আরব শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। নরক বা 'দোজখ' সম্পর্কে দান্তের ধারণা ইউরোপের পরিচিত সংস্কৃতি থেকে নেওয়া হলেও তার মূল সুর প্রাচ্যের সংস্কৃতি থেকেই গৃহীত বলে মনে করা হয়। যদিও দান্তের ধারণা কোন বিশেষ আরবী গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে প্রাচ্যের সংস্কৃতির এই প্রসারের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নবজাগরণের সময়কার 'ক্যাম্পানিলি'র আকার উত্তর আফ্রিকা বিশেষত মিশরের মিনারের আদলে বলে মনে করা হয়। সিসিলি এবং এই উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরেও মুসলিম শিল্পী ও কারিগরদের যথেষ্ট কদর ছিল। প্যালাটিন গির্জার মোজাইক এবং নকশাই তার প্রমাণ। পালেরমোর রাজপ্রাসাদে মুসলিম শাসকরা যে তাঁতঘর তৈরি করেছিলেন ইউরোপীয় রাজপুরুষদের পোশাকও তৈরি হত সেখানেই। তাঁরা যে পোশাক পরতেন তাতে

আরবী নকশা ছিল। ইতালিয় বস্ত্রশিল্পীরা তাদের প্রাথমিক শিল্পজ্ঞান এবং নকশা সিসিলির কারিগরদের থেকেই শিখেছিলেন। ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ইতালির বেশ কয়েকটি শহরে রেশম বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠে। সিসিলির নকশার অনুকরণে তৈরি এইসব রেশম বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি করা হত। পালেরমো এবং ক্যাডিজের মত ভেনিস, ফেরারা এবং পিসায় প্রাচ্যের শিল্পীরা ইতালিয়দের কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাজেও সাহায্য করত। ইউরোপে প্রাচ্যের পোশাকের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে, একসময়ে ইউরোপীয়দের কাছে নিখুঁত সাজের সংজ্ঞাই ছিল প্রাচ্যের পোশাক।

পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসের মত সমৃদ্ধ নগরে মুসলিম শিল্পকলার চর্চা এতই বেশি হয় যে, ইতাল্তিতে প্রকাশিত বইয়ে প্রাচ্যের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। খ্রিস্টানদের বইতেও ছিল আরবের বাঁধাইয়ের কাজের নিদর্শন। বিশেষ করে প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপের ক্ষেত্রে। একইসঙ্গে, ইতালির বিভিন্ন শহরেব কারিগররা প্রাচ্যের কারিগরদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি এবং চিত্রিত চর্ম-আবরণী বা কভারের কাজ শিখেছিল। ভেনিস হয়ে উঠেছিল পিতলের ভিতরে সোনা[৩৩], রুপো বা তামা দ্বারা অলংকৃত কাজের প্রধান কেন্দ্র। দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে আল-মাওসিলে এই শিল্পকলার চর্চা হত।

মোটের উপর বলা যায়, ক্রুশেডের সময় সিসিলির মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। এক্ষেত্রে সিসিলির স্থান স্পেনের পরে হলেও সিরিয়ার অনেক আগে। ❑

● টীকা ●

১. পৃঃ ১৬৭; থিওফ্যানিস পৃঃ ৩৪৮,
২. ইবন-ইয্হারি; খণ্ড-১ পৃঃ ৯৫; নুওয়াইরি, সম্পাদনা গাসপার, খণ্ড-২, পৃঃ ২৪১; আমারি 'বিবলিওটেকা', পৃঃ ৫২৭।
৩. আরবী, মাজার; ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-৬, পৃঃ ২৩৬; ইদ্রিসি, 'মিন কিতাব নুজহাত আল-মুস্তাক-ফী-ইখতিরাক-আল-আফাক, সম্পাদনা, এম আমারি এবং সি স্যাকিয়া-পারেল্লি (রোম ১৮৭৮), পৃঃ ৩২; আমারি, 'স্টোরিয়া', সম্পাদনা নাল্লিনো, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৯৪।
৪. ইবন-ইয্হারি, খণ্ড-১, পৃঃ ৯৬; ইবন-খালদুন, খণ্ড-৪, পৃঃ ১৯৯.
৫. মাসিনি, মাসিনাহ; ইয়াকুত, খণ্ড-৪, পৃঃ ৫৩৫; ইবন জুবাইর, পৃঃ ৩২০।
৬ আরবী, 'যাবাল-আল-নার', আগুনের পাহাড়। ইবন্-আল-আসীর, খণ্ড-৬, পৃঃ ২৩৯; ইয়াকুত খণ্ড-৩, পৃঃ ৪০৮; আমারি, বিবলিওটেকা, (লিপজিগ-১৮৮৭), অ্যাপেন্ডিক্স-২, পার্ট-২।
৭. ইয়াকুতের কিল্লারিয়াহ্, খণ্ড-৪, পৃঃ ১৬৭; ইবন-হাওকাল-এর কাল্লারিয়াহ্, ৮,১২৮। দেখুন ইবন্- খালদুন, খণ্ড-৪, পৃঃ ২০০, ২০২।
৮. নাবুল,-ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-৭, পৃঃ ৩; আমারি, 'বিবলিওটেকা', নির্ঘণ্ট; ইদ্রিসি, পৃঃ ১৭।

৯. আমারি, 'স্টোরিয়া', সম্পাদনা নাল্লিনো, খণ্ড-১, পৃঃ ৫৮৮-৯৩।

১০. ইবন-খালদুন, খণ্ড-৪, পৃঃ ২০১।

১১. সম্ভবত এই অঞ্চলে 'মৌর'-এই বিশেষণটি 'বাদামী'-র সঙ্গে সমর্থিত ছিল। অ্যালপাইন অঞ্চলের মানুষরা ধর্মযুদ্ধের ফলে এই ধরনের শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

১২. তালিকার জন্য দেখুন 'জামবাউর', পৃঃ ৬৭, এডওয়ার্ড সাচাউ, এইন ভারজিচনিস, মুহাম্মেদানিশ্চার ডাইনাস্টিন (বার্লিন ১৯২৩) পৃঃ ২৬।

১৩. ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-৮, পৃঃ ৫৩-৪।

১৪. ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-৮, পৃঃ ৩৫৪।

১৫. পৃঃ ৮২-৭।

১৬. ইবন্-হামিদ তাঁর সেভিল্লীয় প্রভুর সঙ্গে একই সঙ্গে বন্দী অবস্থায় আফ্রিকা যাত্রা করেন। তাঁর 'দিওয়ান'-এর সম্পাদনা করেছে সি স্যাকিয়াপারেল্লি (রোম, ১৮৯৭); সারসংক্ষেপ আমারি, 'বিবলিওটেকা'। পৃঃ ৫৪৭-৭৩।

১৭. পৃঃ ৮৬।

১৮. পৃঃ ৩২৮।

১৯. পৃঃ ৩৩৩।

২০. দেখুন পেরি বি কট্, 'সিকুলো অ্যারাবিক আইভরিজ (প্রিন্সটন, ১৯৩৯)।

২১ ৭১টি মানচিত্র সহ বইটির সংক্ষিপ্তসার। ১৫৯২ সালে রোমে মুদ্রিত হয়। দুই ম্যাবোনাইট পণ্ডিত, জিব্রাইল-আল-সাহ্উনি (গ্যাব্রিয়েল সিওনিটা) এবং ইয়ুহান্না আল-হাসরুনি (জোয়ানেস হাসরোনিটা) এটিকে ভুলভাবে ল্যাটিনে অনুবাদ করে নাম দেন। জিওগ্রাফিয়া নুবিয়েনসিস (প্যারিস ১৬১৯)। বইটির এই সংস্করণের কিছুটা তৈরি হয়েছে লিডেন, মাদ্রিদ, রোম, বন ইত্যাদি জায়গায়। দেখুন কোনার্ড মিলার-এর 'ম্যাপে অ্যারাবিকা; খণ্ড-৬, (স্টুটগার্ট, ১৯২৭)।

২২ আমারি, 'বিবলিওটেকা, পৃঃ ৬৫৮।

২৩. আমারি,.'স্টোরিয়া', সম্পাদনা নাল্লিনো খণ্ড-৩, পৃঃ ৩৭২।

২৪. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৪৮।

২৫. এটির উৎস মূলত আরবী শব্দ 'জারাফাহ'।

২৬. আমারি, 'বিবলিওটেকা', পৃঃ ৫২২, পৃঃ ৫১৪, ১.৪।

২৭. ইবন্-আল-ইব্রি, পৃঃ ৪৭৭-৮।

২৮. আমারি, 'স্টোরিয়া' সম্পাদনা নাল্লিনো। খণ্ড-৩, পৃঃ ৭৬০, জি এ সিজারিও, "লে অরিজিনি দেল্লা পোয়সিয়া লিরিকা এ-লা-পয়েসিয়া সিসিলিয়ানা সোট্টো গ্নি সুয়েভি. দ্বিতীয় সংস্করণ (মিলান ১৯২৪) পৃঃ ১০১, ১০৭।

২৯. জোসে এম মিল্লাস-'রেভিসতা ডি আর্কাইভস্', খণ্ড-৪১, (১৯২০), পৃঃ ৫৫০-৬৪, ৪২ (১৯২১), পৃঃ ৩৭-৫৯।

৩০. ইতালিয়ান ভাষায় 'অ্যাজিমিনা', এসেছে আরবী 'আযামি' থেকে। পার্সী, বিদেশী।

চতুর্থ ভাগ

ইউরোপে আরব অভিযান : স্পেন ও সিসিলি

।। অধ্যায় ৪৩ ।।

মিশরের শী'আহ্ খিলাফত : ফাতিমিয়

● ইসমাঈলীয় প্রচারকার্য

৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ফাতিমিয় সাম্রাজ্যই প্রধান শী'আহ্ সাম্রাজ্য[১]। বাগদাদে আব্বাসীয়দের ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ফাতিমীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ ইবন-হুসাইন। ইনি সম্ভবত ইসমাঈমি[২] সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা পারস্যের অধিবাসী আবদুল্লা ইবন-মায়মুনের বংশধর। সাঈদের সাফল্যের মূলে রয়েছে ইসমাঈলি গোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত প্রচার। এর আগে এইরকম প্রচার আর একবারই হয়েছিল এবং তার ফলেই উমাইয়া সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। সাঈদের এই প্রচারাভিযানের প্রধান 'দায়ী' (প্রচারক) ছিলেন আল-ইয়ামানে অবস্থিত সানার বাসিন্দা আবু-আবদুল্লা আল-হুসাইন আল-শী'ই। নবম শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি নিজেকে মাহদীর অগ্রদূত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বার, বিশেষ করে কিতামাহ্ (কুতামাহ্) উপজাতির মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেন। মক্কায়[৩] তীর্থযাত্রার সময়ে তিনি এই উপজাতির মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান। তখন ইফরিকিয়া শাসন করতেন আগলাবিয়রা।

● দুর্বোধ্য সাঈদ

সুদূর আফ্রিকায় আল-শী'ই-এর এই প্রশ্নাতীত সাফল্য সাঈদকে অনুপ্রাণিত করে। সালামিয়ায় তাঁর ইসমাঈলীয় প্রধান কার্যালয় ছেড়ে তিনি বণিকের ছদ্মবেশে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা যাত্রা করেন। কিন্তু আগলাবিয় শাসক জিয়াদাত-আল্লার (৯০৩-৯) হুকুমে তিনি সিজিলমাসায় কারারুদ্ধ হন। সাঈদকে মুক্ত করেন আল-শী'ই[৪]। এরপর, ক্রমাগতই সাফল্যের মুখ দেখতে থাকেন তিনি। শতাব্দী প্রাচীন আগলাবিয় সাম্রাজ্যের পতন হয় ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই হাতে। তিনি শেষ আগলাবিয় শাসক জিয়াদাত-আল্লাকে দেশছাড়া করেন। সেইসঙ্গে আফ্রিকার সেই অঞ্চলে সুন্নি সম্প্রদায়ের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। ইমাম' উবাইদল্লাহ্ আল-মাহদী উপাধি লাভ করে সাঈদের অভিষেক হয়। ফাতিমাহ্-এর উত্তরপুরুষ হিসাবে 'আল-হুসাইন' এবং 'ইসমাঈলি' নাম গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা তাঁর এই বংশপরিচয় অবিশ্বাস

করত, বিশেষ করে তাঁরাই সাঈদের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে আল-উবাইদিয়াহ্ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

সাঈদের পরিচয়ের ব্যাপারে মুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বিমত রয়েছে, কেউ তাঁকে ফাতিমিয় বংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করেন, কেউ তা করেন না। তাই তাঁর অন্তত আটরকম বংশ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা আছে। কেউ কেউ আবার তাঁকে ইহুদির পুত্রও বলেছেন। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে যাঁরা নিঃসন্দেহ, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইব্‌ন-আল-আসীর[৬], ইব্‌ন-খালদূন[৭] এবং আল-মাকরিজি[৮]। যাঁরা তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান তাঁরা সাঈদকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইব্‌ন-খাল্লিকান[৯], ইব্‌ন-ইয়্‌হারি[১০], আল-সুয়ূতি[১১] এবং ইবন-তাগ্‌রি-বিরদি[১২]। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, ১১০১ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ফাতিমিয় বংশ পরিচয় নিয়ে কোন মতবিরোধ ছিল না। হঠাৎ বাগদাদে আব্বাসি খলিফা আল-কাদিরের আদেশে বিচিত্র এক ইস্তাহার জারি করা হল। শী'আহ্ এবং সুন্নি সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর করা এই ইস্তাহারে খলিফা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর মিশরিয় শত্রু আল-হাকিম ফাতিমা বংশের উত্তরাধিকারী নন। তিনি বিধর্মী[১৩] দায়াসানের বংশধর।

● প্রথম ফাতিমিয়

উবাইদুল্লাহ্ (৯০৯-৩৪) প্রথমে আল-কায়রাওয়ানের শহরতলি রাক্কাদায় আগলাবিয়দের অবস্থান স্থল থেকেই রাজত্ব আরম্ভ করেন। শাসক হিসাবে তাঁর দক্ষতা ও সুনাম ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্ষমতা দখলের দুবছর পরে তিনি তাঁর প্রচার-নেতা আল-শী'ইকে হত্যা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মূল আফ্রিকার ভূখণ্ডে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইদ্রিসিয় শাসিত মরক্কো থেকে মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন এবং দুবছর বাদে তা দখল করেন। সিসিলিতে তিনি কিতামা উপজাতিভুক্ত একজন প্রশাসক পাঠান। স্পেনের বিদ্রোহী নেতা ইবন-হাফসুনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। মাল্টা, সার্ডিনিয়া[১৪], কবসিকা, বালিয়ারিক সহ অন্যান্য দ্বীপগুলি তাঁর নৌশক্তিকে যথেষ্ট সমীহ করে চলত। এই নৌ-সেনারা আগলাবিয় নৌবাহিনীরই অন্তর্গত। ৯২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি আল-কায়রাওয়ানের দক্ষিণ-পূর্বে ১৬ মাইল দূরে তিউনিসিয়ার উপকূলে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। নিজের নামে সেই রাজধানীর নামকরণ করেন আল-মাহদীয়াহ[১৫]।

● নৌবহর

উবাইদুল্লাহ্‌র বংশধরেরা তাঁর আগ্রাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি মেনে চলেন। তাঁর পুত্র[১৬] আবু আল-কাসিম মুহাম্মাদ আল-কায়িম (৯৩৪-৯৪৬) ৯৩৪ অথবা ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে

ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চল আক্রমণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনী জেনোয়া এবং ক্যালাব্রিয়া দখল করে সেখান থেকে ক্রীতদাস ও অনেক মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে আসে। তবে এতে কেবল লুঠতরাজই হয়েছে ; স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ হয়নি। আল-কায়িমের পৌত্র আবু-তামিম মাআদ আল-মুইজের (৯৫২-৭৫) নৌবাহিনী স্পেনের উপকূলে লুঠতরাজ চালায়। সেইসময় স্পেনের খলিফা ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী আল-নাসির। এর তিনবছর বাদে (৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে) ফাতিমিয় সেনারা পশ্চিমে আটলান্টিক পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখান থেকে ফাতিমিয় সেনাপ্রধান তাঁর খলিফাকে উপহার হিসাবে পাত্রের মধ্যে জীবন্ত মাছ পাঠান। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইকসিদি শাসকদের পরাস্ত করে মিশর দখল করেন ফাতিমীয়রা। কায়রোর বন্দর মকস-এ ফাতিমিয় নৌসেনারা তাদের সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে। এরপরে কায়রোর বন্দর তৈরি হয় বুলাকে।

● সেনাপতি জওহর

মিশর অভিযানের নায়ক ছিলেন জওহর আল-সিকিল্লি (সিসিলিয়)। এঁর অপর নাম আল-রুমি (গ্রিক)। খ্রিস্টানজাত জওহরের জন্ম বাইজানটাইন প্রদেশ, সম্ভবত সিসিলিতে। সেখান থেকে ক্রীতদাস হিসাবে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আল-কায়রাওয়ানে।[১০] ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী আল-ফুসতাত বিজয়ের পরে জওহব তাঁর নতুন সামরিক ঘাঁটির গোড়াপত্তন করেন আল-কাহিরায়।[১১] সেদিনের সামরিক ঘাঁটিই আজকের আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে জনবহুল শহর কায়রো। ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কাহিরা ফাতিমিয়দের নতুন রাজধানীর মর্যাদা পায়। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আল-আজহার[১২] নামে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন জওহর। কিছুদিন পরেই খলিফা আল-আযীয এখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

আল-শী'ই-এর পরে জওহরই ছিলেন ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা। নবগঠিত এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল গোটা উত্তর আফ্রিকা। ফাতিমিয় শাসকরা পশ্চিম আরব অধিকার করেন ইকশিদিদের কাছ থেকে; পবিত্র মক্কার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইকশিদিদরা পেয়েছিলেন আব্বাসিদদের কাছ থেকে। মিশরে এসেই প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ায় তিনি এক সেনাপ্রধানকে পাঠান। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই সেনাপ্রধান দামাস্কাস[১৩] আক্রমণ এবং কিছুদিনের জন্য তা অধিকারও করেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কারামাতিয়া গোষ্ঠী। সিরিয়াতে এইসময় তাদেরই প্রবল প্রতাপ ছিল।

● ফাতিমিয় শক্তির সমৃদ্ধি

পঞ্চম ফাতিমিয় শাসক আবু-মানসুর নিযার আল-আযিযের ৯৭৫-৯৬ শান্তিপূর্ণ শাসনকালেই ফাতিমিয় সাম্রাজ্য সাফল্যের শিখরে ওঠে। আল-আযীযই প্রথম ফাতিমিয় খলিফা, যিনি মিশর শাসনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। আটলান্টিক থেকে লোহিত সাগর, আ

ইয়ামান, মক্কা, দামাস্কাসে শুক্রবারের নামাযে উল্লেখ করা হত তাঁর নাম। এমন কী একবার আল-মাওসিলের নামাযেও তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। আল-আযীযের শাসনকালে বাগদাদের গৌরবকে ম্লান করে দেয় মিশর। শুধু তাই নয়, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে একমাত্র ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হিসাবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তারা। আল-আযীযের বাসনা ছিল, তিনি বাগদাদ দখল করবেন। বন্দি করবেন আব্বাসীয়দের। আর এই বন্দিশালার জন্য ২০ লাখ দিনার খরচ করে কায়রোতে এক প্রাসাদ গড়তেও কসুর করেননি তিনি। পূর্বসূরিদের মত তাঁরও স্পেন বিজয়ের আকাঙক্ষা ছিল প্রবল। স্পেনের করডোভার খলিফাকে তিনি বার্তা পাঠালেন : আমি অবিলম্বে স্পেন দখল অভিযান শুরু করব। করডোভার খলিফা জবাবে লিখলেন : আমাদের পক্ষে পূর্বে জানানো সম্ভব হয়নি বলে প্রস্তাবটি উপহাসের যোগ্য। কেননা, তা আমাদেরকেই শুনতে হল। যদি আর কখনও শুনতে হয় তবে আমরা অবশ্যই প্রত্যুত্তর দেব।[১১]

ফাতিমিয় খলিফাদের মধ্যে সম্ভবত আল-আযীযই ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী এবং প্রজানুরঞ্জক। তিনি নিজে যেমন জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন, তেমনই প্রজাদের জন্য কায়রো ও তার আশেপাশে বহু নতুন মসজিদ, সেতু, খাল এবং প্রাসাদ তৈরি করে ছিলেন। খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তাঁর যে সহিষ্ণুতা ছিল, তা আগের কোন খলিফারই ছিল না। তাঁর এই সহিষ্ণুতার পিছনে তাঁর খ্রিস্টান উজির ইসা ইবন-নাসতুর, তাঁর রুশ স্ত্রী ও তাঁর উত্তরাধিকারী আল-হাকিমের জননী এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও জেরুসালেমের দুই বিশপ শ্যালকের অবদান ছিল যথেষ্ট।

আল-আযীযের রাজত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। সেই প্রথম আব্বাসীদের অনুকরণে তুর্কি ও নিগ্রো ভাড়াটে সেনা আনা হল। কিছুদিনের মধ্যেই এই ভাড়াটে সেনারা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অমান্য করতে থাকে। শুরু হয় নিজেদের মধ্যে এবং বার্বার দেহরক্ষীদের সঙ্গে তাদের অবিরাম বিরোধ। এই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিরোধই ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ। সারকাশিয় এবং তুর্কি সেনারা পরে তাদের শাসকদের উচ্ছেদ করে পৃথক শাসকগোষ্ঠী তৈরি করে।

● অত্যাচারী খলিফা

আল-আযীযের উত্তরাধিকারী আবু-'আলী মানসুর আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১) মাত্র ১১ বছর বয়সে বাদশাহী তখতে বসেন। প্রবল অত্যাচারী ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাসনকাল ছিল নৈরাজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরা। বেশ কয়েকজন উজিরকে তিনি হত্যা করেন, ধ্বংস করেন পবিত্র সেপালকার (১০০৯) সহ বহু গির্জা। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের হেয় প্রতিপন্ন করার তাঁর কৌশল ছিল অদ্ভুত। তাদের কালো পোশাক পরতে তিনি বাধ্য করতেন; তারা কেবল গাধায় চড়ার অনুমতি পেত। শুধু তাই নয়, সর্বসাধারণের স্নানাগার ব্যবহার করার সময় খ্রিস্টানদের গলায় ক্রুশ ঝোলাতে হত এবং

ইহুদিদের গলায় ঝোলাতে হতো ঘন্টা লাগানো ছোট জোয়াল।[২২] আল-মুতাওয়াক্কিল এবং দ্বিতীয় উমারের পর আল-হাকিমই তৃতীয় মুসলিম খলিফা যিনি অ-মুসলিমদের[২৩] প্রতি এত কঠোর ছিলেন। তা ছাড়া ফাতিমিয় আমল বিম্মীদের পক্ষে ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে সন্তোষজনক। পবিত্র সেপালকার ধ্বংস করার নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁর খ্রিস্টান সচিব ইবন-আবদুন। এই নির্দেশই পরবর্তী ধর্মযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। শেষপর্যন্ত এই দুর্বোধ্য, প্রিয়ভাজন খলিফা চরম গোঁড়া ইসমাঈলি গোষ্ঠীর মতবাদ অনুসরণ করে নিজেকে আবির্ভূত ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেন। দ্রুজ নামে একটি গোষ্ঠী তাঁর এই দাবি মেনেও নেয়। এর আগে পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সম্মান পেতেন আল-দারাজি (মৃ. ১০১৯)[২৪] নামে এক তুর্কি ধর্মপ্রচারক। ১০২১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি আল-হাকিমকে হত্যা করা হয় মুকাত্তামে। শোনা যায়, তাঁর বোন সিত্ আল-মুলুক তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রের নায়িকা ছিলেন। খলিফা যাকে অসচ্চরিত্রা বলে অভিযোগ করেছিলেন।

● অধঃপতন

আল-হাকিমের মৃত্যুর পরে অপরিণত মন ও বয়সের কিশোর ও যুবাদের খলিফার পদে বসানো হত। প্রকৃত ক্ষমতা উজিরদের কুক্ষিগত ছিল। উজিররা পরে 'মালিক' রাজ উপাধি লাভ করেন। আল-যাহির (১০২১-১০৩৫) মাত্র ১৬ বছর বয়সে খলিফা হন। অষ্টম কনস্ট্যানটাইনের সঙ্গে এক সমঝোতা হয় আল-জাহিরের—কনস্ট্যানটাইনের রাজত্বে যত মসজিদ আছে তাতে আল-যাহিরের নাম উল্লেখ এবং কনস্ট্যানটিনোপলের মসজিদটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। তার পরিবর্তে খলিফার নির্দেশে পুনর্নির্মাণ করা হবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পবিত্র সেপালকার।[২৫] আল-যাহিরের পর খলিফা হন তাঁর ১১ বছরের পুত্র মাআদ আল-মুসতানসির (১০৩৫-৯৪)। তাঁর প্রায় ৬০ বছরের শাসনকাল মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে[২৬] দীর্ঘতম। তাঁর শাসনের প্রথম পর্বে তাঁর মা এবং এক ইহুদি আমলার হাতেই সর্বাধিক ক্ষমতা ছিল। এই ইহুদির কাছ থেকে সুদানি ক্রীতদাসী হিসাবে তাঁর মাতাকে কেনা হয়েছিল। এই সময়েই ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের সীমানা সঙ্কুচিত হতে হতে মিশর ও তার নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ফাতিমিয়দের আমলে সিরিয়া ছিল মিশরেরই সঙ্গে যুক্ত; যদিও এই বন্ধন তেমন দৃঢ় ছিল না। কিন্তু ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর এই বন্ধন দ্রুত শিথিল হতে আরম্ভ করে। প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্যালেস্টাইন। পূর্ব দিক থেকে আসা প্রবল পরাক্রমশালী সালজুক তুর্কোমানদের রণহুঙ্কারে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ বাতাস ছেয়ে যায়। ইতিমধ্যে ফাতিমিয় শাসিত আফ্রিকার প্রদেশগুলি তাদের খলিফার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করে। হয় তারা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে অথবা তাদের পূর্বতন মিত্র আব্বাসীয়দের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। উত্তর মিশরের জঙ্গি উপজাতি বানু-হিলাল এবং মূলত নজ্‌দ-এর এবং এখন মিশরের সুলায়মরা এরপর পশ্চিমের পথে সহজেই এগিয়ে যেতে থাকে। ১০৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বেশ কয়েকবছর তারা ত্রিপোলি ও তিউনিসিয়ার

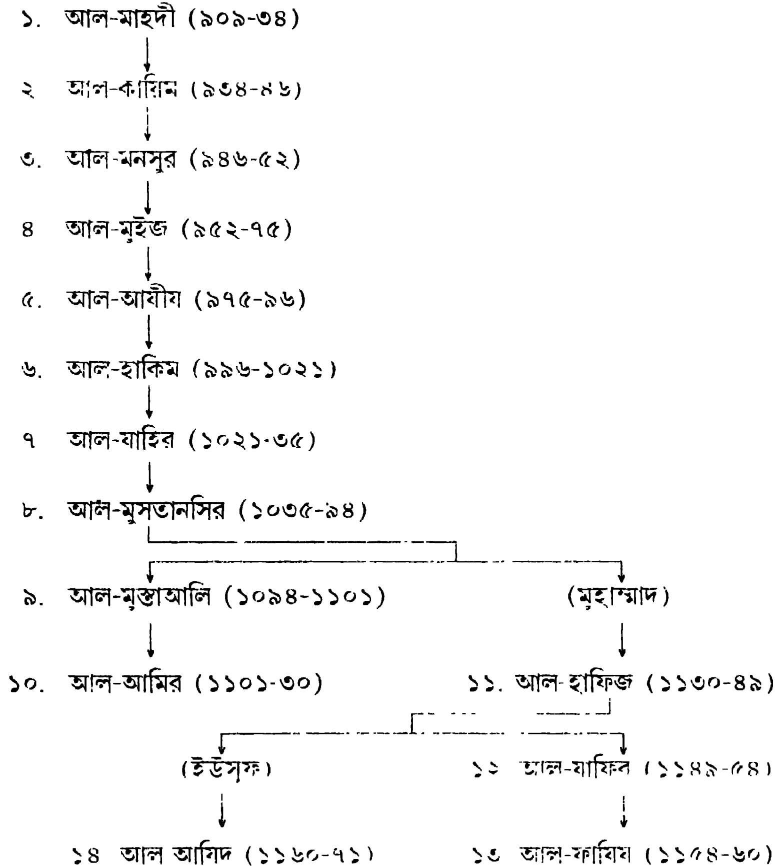
লুঠতরাজ চালায়। আগলাবিয়দের পর সার্বভৌম শাসক হিসাবে সিসিলি স্বীকৃতি দিয়েছিল ফাতিমিয়দের। কিন্তু ১০৭১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সিসিলির প্রায় সবটাই দখল করে নেয় নরম্যানরা। এমন কী আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের কিছু অংশও নরম্যানদের দখলে চলে আসে। একমাত্র আরবই শী'আহ্ সম্প্রদায়ের আদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিল। সবদিকে পরাজয়েব কালিমার মধ্যে একমাত্র আশার আলো ছিল বাগদাদে তুর্কি সেনাপ্রধান বলপূর্বক দখলকারী আল-বাসাসিরির[10] (মৃ ১০৬০) সাফল্য; যদিও এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁর জোরেই বাগদাদের মসজিদগুলিতে পরপর ৪০টি শুক্রবারের নামাযে মিশরের খলিফার নাম উল্লেখ করা হত। বাগদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওয়াসিত এবং আল-বাসরা। আল-বাসাসিরির সাফল্যের স্মারক হিসাবে আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়িমের শিরস্ত্রাণ, হযরতের আলখাল্লা এবং তাঁর প্রাসাদের একটি অসাধারণ জানালা কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয়। খলিফা আল-কায়িম ফাতিমিয়দের হাতে পরাজয় স্বীকার করে তাঁর রাজত্বের সমস্ত দাবি ছেড়ে দেন। দাবি পরিত্যাগেব তাঁর লিখিত প্রতিশ্রুতির প্রতিলিপি, শিবস্ত্রাণ এবং হযবতেব আলখাল্লা প্রায় এক শতাব্দী পর বাগদাদকে ফিরিয়ে দেন সালাহ্-আল দীন। কিন্তু কারুকার্যময় জানালাটি একের পর এক মিশরিয় প্রাসাদে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে তা মামলুক সুলতান বেবার্স আল-জাশনাকিরের কবরের স্মৃতিস্তম্ভে বসানো হয়।

● পতন

এদিকে মিশরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমাগতই খারাপ হতে থাকে। বিরোধ বাড়তে থাকে তুর্কি, বারবারি এবং সুদানি সৈন্যদের মধ্যে। তা ছাড়া সাত বছরের দীর্ঘ খরা দেশের আর্থিক সম্পদকে প্রায় শূন্যের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। দেশের এই অস্থির অবস্থায় বিভ্রান্ত খলিফা আক্কার সামরিক প্রধান বদর আল-জামালি নামে এক আরমেনিয়াকে উজির এবং সেনাপ্রধানের[11] পদে বসান। এই আরমেনিয় আগে ক্রীতদাস ছিলেন। নতুন আমির আল-জুয়ুশের উৎসাহের অভাব ছিল না। অরাজকতা ও নৈরাজ্যের মধ্যেও তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালান এবং ফাতিমিয় সাম্রাজ্যকে নবজীবনেব আশ্বাস দেন। কিন্তু এই সাফল্য ছিল নেহাতই ক্ষণস্থায়ী। ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে বদবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মালিক আল-আফযাল[12] এই পদে আসীন হন। কিন্তু পিতাপুত্র দুজনের একান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফাতিমীয় সাম্রাজ্যের পতনকে আটকানো যায়নি। ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের শেষপর্বে[13] কেবলই উজিরদের মধ্যে সংঘর্ষ চলত। সেনাবাহিনীর মধ্যেও শুরু হয়ে যায় গোষ্ঠী রাজনীতি এবং একেকটি গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে একেকজন উজিরকে মদত দিতে থাকে। আল-মুসতানসিরের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আল-মুস্তাআলিকে রাজসিংহাসনে বসান আল-মালিক আল-আফযাল। খলিফাকে নিজের আয়ত্তে রাখাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। আল-মুস্তাআলিব পর তাঁর পাঁচ বছরের পুত্রকে আল-আমির (১১০১-৩০) উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান আল-আফযাল। পরবর্তী খলিফা আল-হাফিজের (১১৩০ ১১৪৯) মৃত্যুর সময় ফাতিমিয়

সাম্রাজ্যের অবস্থা এতই করুণ হয়েছিল যে তা কেবল রাজপ্রাসাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বললেই চলে। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-যাফিরের (১১৪৯-৫৪) তখন কম বয়স। তাঁর তারুণ্য ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রকৃত ক্ষমতা দখল করে নেন কুর্দিশ উজির ইবন-আল-সাল্লার। এই উজির আল-মালিক আল-আদিল নামে পরিচিত। ১১৪৪ থেকে ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাতিমিয় রাজদরবারে ছিলেন উসামাহ্। নিজের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, সেইসময়ে ফাতিমিয় রাজদরবারে ষড়যন্ত্র, বিরোধ এবং ঈর্ষার এতটাই আধিপত্য ছিল যা এককথায় নজিরবিহীন।

ফাতিমিয় খলিফাদের বংশলতিকা



১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইবন-আল-সাল্লারকে হত্যা করে তাঁরই সম্পর্কিত পৌত্র নাসর ইবন-আব্বাস। এই হত্যাকারীর পিতাই ছিলেন ইবন-আল-সাল্লারের উত্তরাধিকারী। নাসরকে খলিফা আল-যাফির তার পিতাকে হত্যা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত খলিফাকেই গোপনে হত্যা করা হয়। মিশরের ইতিহাসে এটি একটি জঘন্যতম অধ্যায়। খলিফার মৃত্যুর পরদিনই আব্বাস চার বছরের খলিফাপুত্র আল-ফায়িয-কে (১১৫৪-৬০) সিংহাসনে বসান। শিশু আল-ফায়িয-এর মৃত্যু হয় মাত্র ১১ বছর বয়সে। তারপর তার ন'বছর বয়স্ক জ্ঞাতিভাই আল-আযিদ খলিফা হন। আড়াইশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করা ফাতিমীয় সাম্রাজ্যের চর্তুদশ এবং শেষ খলিফা এই আল-আযিদ। জনগণের অস্তিত্ব ছিল নিরাপত্তাহীন। খাদ্যের জন্য নীলনদের জলপ্রবাহের ওপর তারা নির্ভর করত। ইতিমধ্যে জলের অপ্রতুলতা বারংবার দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের বিস্তার ঘটল। তার ওপর, খলিফা এবং তাঁদের সেনাবাহিনীর অফুরান চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষের উপর করের দুর্বহ বোঝা চাপানো হয়। শুধু তাই নয়, কর আদায় করতে যথেষ্ট বলপ্রয়োগও করা হত। ধর্মযুদ্ধ এবং জেরুসালেমের রাজা আমালরিকের ক্রমাগত আক্রমণ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা আমালরিক কায়রোর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছান।

শেষপর্যন্ত ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে সালাহ-আল-দীন শেষ ফাতিমিয় খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন। ❑

● টীকা ●

১ একদম প্রথম দিকে আলিদের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ইদ্রিসিদ এবং হাম্মুদিদস মতবাদের দিকে পুনরায় ঝুঁকে পড়েছিল। মরক্কোর শরিফ, যাঁর কর্তৃত্বের শুরু হয়েছিল ১৫৪৪ সালে, তাঁর বংশ তালিকার শিকড় আল-হাসান ছাড়িয়ে আলী এবং ফাতিমাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে তাঁরা সবাই ছিলেন নিষ্ঠাবান।

২. আসল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম ইসমাইল (মৃ. ৭৬০), হিট্টির মূল ইংরেজি সংস্করণের পৃঃ ৪৪২।

৩ ইবন্-ইয্হারি, খণ্ড ১, পৃঃ-১১৮।

৪. অনেকের ভুল ধারণা হল, সিজিলমাশাহ্-এর আল-শিয়ীর কাছে আত্মসমর্পণের আগেই আসল বন্দীকে কেটে ফেলা হয়েছিল।

৫ শী'আদের মতো ফাতিমিয়রাও খলিফার তুলনায় ইমাম উপাধি পছন্দ করতেন।

৬. খণ্ড ৮, পৃঃ ১৭-২০, সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন আবু-আল-ফিদা, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৭-৮।

৭. খণ্ড-৪, পৃঃ-৩১।

৯. খণ্ড-১, পৃঃ ৪৮৭।

১০. খণ্ড-১, পৃঃ ১৫০, ১৫৭-৮।

১১. তারিখ-আল-খুলাফা (কায়রো ১৩০৫), পৃঃ ২১৪।

১২. সম্পাদনা, পপার, খণ্ড-২, পার্ট, ২; পৃঃ ১১২।

১৩. মূল কর্মসূচী আবু-আল-ফিদার, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৫০-এ পাওয়া যাবে।

১৪. শেষপর্যন্ত ১০০৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়।

১৫. ইয়াকুত, বুলদান, খণ্ড-৪, পৃঃ ৬৯৪-৯৬, মাসউদী, তানবিহ্, পৃঃ ৩৩৪, ইবন্-হাম্মাদ, আখবার, মুলুক বানি উবাভদ্, সম্পাদনা, এস ভনদেরহায়দেন (আলজিয়ারস্, ১৯২৭), পৃঃ ৯-১০।

১৬. ইসমাঈলী সূত্র অনুসারে তাঁর শাসনাধীনে ছিল একটি 'আলিদ'; তথ্যসূত্র বানার্ড লুইস, 'দ্য অরিজিন অফ ইসমাইলিজম্' (কেম্ব্রিজ, ১৯৪০), পৃঃ ৫১-২।

১৭. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-১, পৃঃ ২০৯-১৩, মাকরিজি, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৫২, ৩৭৭।

১৮. কাহির আল ফালাক্ (স্বর্গের বিজয়োৎসব)-এর পর একেই বিশেষ বিজয়োৎসব বলে উল্লেখ করা হতো, এটি তার উদীয়মান অবস্থা, একে কলুষিত করেছিল কায়রোর ভেনিশীয়রা।

১৯. "উজ্জ্বল ব্যক্তি"—আল-জাহরার পরে, এটিই ছিল ফাতিমাহ্-এর অন্যতম উপাধি।

২০. ইবন খালদুন, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৮; মাকরিজি, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৭৮।

২১. ইবন্-তাগ্রি-বিরদি, সম্পাদনা ঃ পপার, খণ্ড-২, পর্ব-২, পৃঃ ২।

২২. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-৩, পৃঃ ৫; ইবন্-হাম্মাদ, পৃঃ ৫৪; তুলনীয়, ইয়াহিয়া ইবন্ সাঈদ, সম্পাদনা শিখো এট আল, পৃঃ ১৮৭।

২৩. সুফিদের নানারকম গোঁড়া নিয়মকানুন সম্বন্ধে জানতে হলে দেখুন ইবশিহি, মুস্তাতরাফ, খণ্ড-১, পৃঃ ১০৩।

২৪. এই দল সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে পড়ুন হিট্টির 'অরিজিন অফ দ্রুজ পিপল্।'

২৫. মাকরিজি, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৫৫, তুলনীয় ইয়াহিয়া, ইবন্-সাঈদ, পৃঃ ২৭০-৭১; হিট্টির ইংরেজি সংস্করণ পৃঃ ২০৪।

২৬. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-২, পৃঃ ৫৫০, হিট্টির ইংরেজি সংস্করণ পৃঃ ৪৮১, টীকা-২।

২৭. বানু-হিলাল-এর এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিযান এবং সামরিক অভিযানই বিখ্যাত মহাকাব্য সিরাত-বানি-হিলাল'-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

২৮. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-১, পৃঃ ১০৭-৮।

২৯. প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃঃ ৬৪, ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-১০, পৃঃ ৬০, ১৬০।

৩০. আবু-আল-কাসিম শাহিনশাহ্, ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯৬-৭।

৩১. ফাতিমিদ খলিফাদের তালিকা জানতে হলে বংশলতিকা দেখুন।

৩২. সম্পাদনা হিট্টি, পৃঃ ৬-৩৩, আরব সিরিয়ান জেন্টলম্যান, পৃঃ ৩০ ৫৯।

॥ অধ্যায় ৪৪ ॥

ফাতিমিয় মিশরের জীবন

মিশরই হল বিশাল ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের একমাত্র অংশ যেখানে উবাইদুল্লাহ আল-মাহদীর বংশধরেরা ফাতিমিয় সংস্কৃতির ছাপ রেখে যেতে পেরেছিলেন। মিশরের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের অনিশ্চিত সম্পর্ক সেই সমস্ত প্রদেশগুলিতে ফাতিমিয়দের স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্নগুলিকে বজায় রাখার অনুকূল শক্তি সক্রিয় ছিল। মিশরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ফাতিমিয় এবং তাদের পূর্ববর্তী ইকশিদিয় ও তুলুনিয় যুগকে বলা যেতে পারে আরব-পারস্য যুগ। পারসি-তুর্কি যুগ থেকে তা ছিল পৃথক। আর তা আয়্যুবিয় ও মামলুক শাসনকালকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। প্রাক-তুলুনিয় আমল খাঁটি আরবীয় হিসেবে চিহ্নিত। ফাতিমিয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসেন আয়্যুবিয়রা। আয়্যুবিয় শাসকরা সালজুক সাম্রাজ্যের ভাবধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আফ্রিকাব পরিচয় ঘটান। শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ও রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন ছিল সালজুক সাম্রাজ্যেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, ফাতিমিয়দের শাসনকালে পারস্যের সংস্কৃতির প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ জুড়েই মিশরের জনসংখ্যার গরিষ্ঠাংশই ছিল আরব প্রভাবিত খ্রিস্টান। এরা কঠোর শী'আহ্ সাম্রাজ্যে থাকলেও মনে প্রাণে ছিলেন সুন্নি। এই কারণেই, সালাহ-আল-দীনের পক্ষে রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া সহজ হয়েছিল।

মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল ফাতিমিয় যুগ। ফ্যারাওদের পর ফাতিমিয়রাই প্রথম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে অমিত বিক্রমে। শুধু তাই নয়, তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মের উপব ভিত্তি করে। এর আগের দুটি রাজবংশেরই মিশরের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনে কোনরকম আধিপত্য ছিল না। সামরিক ক্ষমতা এবং আব্বাসীয় শাসনের ভগ্নদশাই ছিল তাদের উত্থান এবং অস্তিত্বের ভিত্তি।

● উচ্চশ্রেণীর জীবনযাত্রা

ফাতিমিয় মিশরের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় আল-মুইজ্জের শাসনকালে এবং তা সাফল্যের শিখরে পৌঁছয় আল আযীযের আমলে। কিন্তু আল-মুসতানসিরের আমলেও মুসলিম

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শীর্ষে ছিল মিশর। ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্যের ইসমাঈলি ধর্মপ্রচারক নাসির-ই-খুসরো[১] মিশরে ছিলেন। সেই সময়টা ছিল ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ঠিক আগের সময়। সেই সময়েও ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের প্রাচুর্যের এক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাসিরের রচনায়। তা থেকে জানা যায়, খলিফার প্রাসাদে বাস করতেন ৩০ হাজার মানুষ। এদের মধ্যে ছিল ১২ হাজার পরিচারক এবং এক হাজার ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক। এক উৎসবের দিনে খচ্চরের পিঠে চড়ে খলিফাকে যেতে দেখেন নাসির। সুদর্শন এই খলিফার পরনে ছিল সাদামাটা শাদা কাফতান ও পাগড়ি। এক পরিচারক তাঁর মাথায় মূল্যবান রত্নখচিত এক ছাতা ধরে যাচ্ছিল, বিবরণীতে জানানো হয়েছে। নীলনদের কূলে রাখা ছিল সাতটি যুদ্ধজাহাজ। প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৫০ হাত এবং প্রস্থ ৬০ হাত। রাজধানীতে খলিফার ২০ হাজার বাড়ি ছিল; এর অধিকাংশই ইঁটের তৈরি এবং পাঁচ থেকে ছ'তলা পর্যন্ত উঁচু। খলিফার মালিকানাধীন দোকানের সংখ্যাও ছিল ২০ হাজার। এগুলি মাসিক দুই থেকে ১০ দিনার ভাড়ায় দেওয়া হত। প্রধান সড়কগুলি ছিল আলোকোজ্জ্বল। জিনিস বিক্রি হত নির্ধারিত মূল্যে। এ ব্যাপারে কেউ কারচুপি করলে তাঁর শাস্তি ছিল অভিনব। উটের পিঠে চড়িয়ে ঘন্টা বাজিয়ে তাকে শহর পরিক্রমা করানো হত। স্বর্ণকার বা মহাজনের দোকানেও তালা দেওয়া হত না। আল-ফুসতাতে সাতটি বিশাল মসজিদ ছিল। কায়রোতে ছিল আটটি।[২] গোটা দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিমণ্ডল দেখে নাসির মন্তব্য করেছিলেন : "এখানকার অফুরান সম্পদের পরিমাণ জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মিশরের মত সমৃদ্ধ দেশও আমি আর কোথাও দেখিনি।"[৩]

মিশরের খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী ছিলেন আল-মুসতানসির। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে তিনি সুখ ও আড়ম্বরের জীবন কাটাতেন। শোনা যায়, নিজের রাজপ্রাসাদে কা'বার অনুকরণে তিনি একটি বিশেষ অংশ তৈরি করেছিলেন। তিনি সুন্দরী গায়িকাদের সঙ্গীতসুধা এবং মদ্যপান করতেন সেখানে বসে। তিনি বলেছিলেন 'কালো পাথরের দিকে তাকিয়ে মোয়াজ্জিনের গুনগুন শব্দ শোনা বা অশুদ্ধ জল পান করার থেকে এ অনেক সুখের।" আল-মাকরিজি[৪] এই খলিফার সম্পদের যে তালিকা পেশ করেছিলেন তাতে বহু মূল্যবান জিনিসের কথা বলা হয়েছিল। যেমন দুর্লভ রত্ন, স্ফটিকের পাত্র, সোনা চড়ানো পাত্র, হাতির দাঁত ও আবলুস কাঠের দোয়াত, হলুদরঙা স্ফটিকের পেয়ালা, শিশিতে রাখা কস্তুরী, ইস্পাত দিয়ে বাঁধানো আয়না, সোনা ও রুপোর বাট দেওয়া যষ্ঠি, সোনা-রুপোর ঘুঁটি সহ দাবার ছক, রত্নখচিত ছুরি ও তলোয়ার এবং দাবিক ও দামাস্কাসে তৈরি অপূর্ব কারুকার্য করা বস্ত্র। বহু অমূল্য শিল্পসামগ্রী তুর্কি সেনাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই অপচয় এবং লাগামছাড়া বিলাসের মূল্য খলিফাকে দিতে হয়েছিল পরবর্তী জীবনে। একদিন যিনি আমোদ প্রমোদের জন্য দুহাতে খরচ করেছেন, ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকেই স্ত্রী ও কন্যাদের অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে বাগদাদে পাঠিয়ে দিতে হয়

● প্রশাসনিক ব্যবস্থা

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ফাতিমিয়রা অথবা আরো আগের পারস্যের শাসনব্যবস্থাকেই অনুসরণ করত। সরকারি চাকুরি প্রার্থীদের জন্য একটি নির্দেশাবলি তৈরি করেছিলেন আল-কালকাশান্দি (১৪১৮) নামে এক মিশরিয়। এতে ফাতিমিয়দের সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার এক চিত্র পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীতে তিনটি প্রধান পদ ছিল : (১) আমির। এঁরা সর্বোচ্চ সামরিক আধিকারিকের সঙ্গে সঙ্গে খলিফার দেহরক্ষীও ছিলেন। (২) রক্ষীবাহিনীর আধিকারিক। এঁদের এক্তিয়ারে থাকতেন শিক্ষক (একবচনে, উসতায) এবং খোজা এবং (৩) বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানরা। এই বাহিনীগুলির নামকরণ হত বিশেষ বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ কোন খলিফা বা উজিরের নামে। যেন হাফিজিয়াহ, জুয়ুশিয়াহ, সুদানিয়াহ ইত্যাদি। উজিরদের মধ্যেও ছিল বিভিন্ন পদ। সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা সেনাবাহিনী ও যুদ্ধদপ্তরের তত্ত্বাবধান করতেন। তারপরে ছিলেন বিদেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উজির। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের রাজসভায় পেশ করা এবং তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোই ছিল এই শ্রেণীর উজিরদের কাজ। তৃতীয় শ্রেণীর উজিররা ছিলেন প্রশাসনিক ভারপ্রাপ্ত। এদের মধ্যে ছিলেন টাঁকশালের প্রধান কাযী, বাজার নিয়ন্ত্রক বা মুহতাসিব। বিভিন্ন জিনিসের ওজন, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি ছিল তাঁদের কাজ। এছাড়া ছিলেন বায়ত আল-মালের ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ। উজিরদের সবচেয়ে নিম্নস্তরে ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের করণিক ও সচিবরা। শোনা যায়, ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন খলিফা আল-মুইজ ও আল-আযীযের উজির ইয়াকুব ইবন-কিল্লিস (মৃ. ৯৯১)। বাগদাদের এই ইহুদি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে কাফুরের রাজদরবারে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। প্রশাসনে তাঁর প্রশ্নাতীত দক্ষতাই ছিল মিশরের আর্থিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। প্রথমদিকের ফাতিমিয় খলিফারা[৮] তাঁরই সাহায্যে আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন।

● বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতি

ফাতিমিয় মিশরকে জ্ঞানের আলো দেখাবার কৃতিত্ব বহুলাংশেই ইবন-কিল্লিসের। তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। শুধু তাই নয়, প্রতিমাসে এক হাজার দিনার খরচ করতেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য। তাঁর সময়েই মুহাম্মাদ আল-তামিমির মত চিকিৎসক খ্যাতি অর্জন করেন। এই চিকিৎসকের জন্ম জেরুসালেমে এবং ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ তিনি মিশরে আসেন। এর আগে, ইকশিদিয়দের আমলে ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন-ইউসুফ আল-কিন্দি খ্যাতি অর্জন করেন। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আল-ফুসতাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ১০৬২ খ্রিস্টাব্দে আল-ফুসতাতেই মৃত্যু হয় আরেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবন-সালামাহ আল-কুযাই-এর।

প্রথমদিকের ফাতিমিয় খলিফারা সংস্কৃতিমনস্ক হলেও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে

তাঁদের শাসনকাল ছিল নিষ্ফলা। বাগদাদ এবং করডোভার অন্যান্য খলিফাদের মতো আল-আযীযও ছিলেন কবি ও বিদ্যোৎসাহী। আজহার মসজিদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তিনিই। কিন্তু তখনকার অধিকাংশ আইনজীবী, ঐতিহাসিক বা কবি, এমন কী বিচারপতিরাও ফকীহ্ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাই ছিল ফাতিমিয়দের বৈশিষ্ট্য। তাই রক্ষণশীল বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকদের ফাতিমিয় রাজদরবার সম্পর্কে প্রবল অনীহা জন্মায়। সেইসঙ্গে ফাতিমিয় শাসনের শেষপর্বের অরাজকতা মানুষের মনে প্রবল অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। তাই শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফাতিমিয় যুগকে নিষ্ফলা বললেই চলে।

● বিজ্ঞান ভবন

চরমপন্থি শী'আহ্ মতবাদ শিক্ষা ও প্রচারের জন্য ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে দার আল-হিকমাহ বা দার আল-ইলম (জ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের গৃহ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল-হাকিম। শিক্ষাক্ষেত্রে ফাতিমিয়দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই প্রতিষ্ঠান। এর জন্য আল-হাকিম একটি তহবিল তৈরি করেন। তহবিলের ২৫৭ দিনার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি, বইপত্র বাঁধাই ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ করা হত।[১০] এই প্রতিষ্ঠান ফাতিমিয় রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এখানে পাঠাগার ও মন্ত্রণাসভা ছিল। ইসলাম সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও এখানে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো হত। ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে আল-মালিক আল-আফযাল ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে এটিকে বন্ধ করে দিলেও আয়্যুবিয়দের উত্থান পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।

● জ্যোতির্বিদ্যা ও আলোকবিদ্যা

ব্যক্তিগতভাবে আল-হাকিম জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আল-মুকাত্তামে তিনি একটি মানমন্দির তৈরি করেছিলেন। মাঝেমাঝেই খলিফা তাঁর ধূসররঙা গাধায় এই মানমন্দিরে পৌঁছে যেতেন প্রত্যূষের আগে। সমকালীন ঐতিহাসিক ইবন-হাম্মাদ[১১] এই মানমন্দিরের দুটি মিনারে আল-হাকিম প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্যন্ত্রের মত তামার যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। এই যন্ত্রে আঁকা রাশিচক্রের একেকটি রাশির দৈর্ঘ্যই ছিল তিন বিঘত করে।

আল-হাকিমের রাজসভায় রত্নদের মধ্যে ছিলেন মিশরের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আলী ইবন-ইউনুস[১২] (মৃ. ১০০৯) এবং বিশিষ্ট মুসলিম পদার্থবিদ ও চক্ষুচিকিৎসার ছাত্র আবু আলী আল-হাসান (লাতিন আলহাজেন) ইবন-আল হাইসাম। ইবন-ইউনুস তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নামাঙ্কিত গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান জানার একটি ছক তৈরি করেছিলেন। সমকালীন যেসব ছক ছিল, তার ত্রুটিগুলি তিনি সংশোধন করেছিলেন বিভিন্ন পরীক্ষা -নিরীক্ষার মাধ্যমে। ইবন-আল-হাইসামের (মৃ. ১০৩৯) জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে, আল বাসরায়,

খলিফার সুবিধার্থে তিনি প্রতিবছর নীলনদের বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেন। একাজে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি খলিফার রোষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে মানসিক ভারসাম্যহীনতার ভান করেন। শুধু তাই নয়, খলিফার মৃত্যু পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর তাঁর শতাধিক রচনা আছে।[১২] চক্ষুচিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ কিতাব আল-মানাযির ছিল তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেলেও ক্রেমোনার জেরার্ডের সময় অথবা তার আগে এটি অনুবাদ করা হয়। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে এর লাতিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগে চক্ষু চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের যথেষ্ট অবদান আছে। মধ্যযুগে চক্ষুচিকিৎসা-সংক্রান্ত অধিকাংশ রচনাই আলহাজেনের 'অপটিকে থেসারাস'-কে ভিত্তি করে রচিত। রজার বেকন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং জোহান কেপলারের উপরেও তাঁর প্রভাব স্পষ্ট। ইবন-আল-হাইসাম তাঁর রচনায় ইউক্লিড ও টলেমির প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। এই তত্ত্বে বলা হত, চোখ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি দৃশ্যবস্তুর উপর পড়ে। আপতন এবং প্রতিফলনের কৌনিক পরিমাপ জানতে তিনি পরীক্ষা চালান। কয়েকটি পরীক্ষায় তিনি আতশকাচ তৈরির তত্ত্বের কথাও জানিয়েছিলেন। অথচ এই আতশকাচ তৈরি হয়েছিল তিন শতাব্দী পরে, ইতালিতে।

আল-হাকিমের আমলে মিশরে চক্ষুচিকিৎসা-সংক্রান্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়। 'আম্মার ইবন-'আলী আল-মাওসিলির লেখা এই গ্রন্থের নাম আল-মুন্তাখাব ফী ইলাজ আল-আয়ন[১৩] (চক্ষুচিকিৎসার নির্বাচিত বিষয়)। গুণের বিচারে গ্রন্থটি সমসাময়িক চক্ষুচিকিৎসাবিদ ইবন-ঈসা রচিত 'তাযকিরাহ'-র থেকে এগিয়ে থাকলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'তাযকিরাহ' অনেক বেশি সম্পূর্ণ হওয়ায় তা ছিল অনেক বেশি জনপ্রিয়। একটি ফাঁপা শোষণ নলের সাহায্যে ছানির সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন আম্মার। এই নল আবিষ্কার করেছিলেন স্বয়ং আম্মার।

● রাজকীয় গ্রন্থাগার

আল-মুসতানসিরের আমলে সম্পদের অপচয় যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, তার কবল থেকে রক্ষা পায়নি রাজপ্রাসাদের পাঠাগারও। আল-আযীয প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারে সেইসময় বইয়ের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। পাঠাগারের দুষ্প্রাপ্য সম্ভারের মধ্যে ছিল ব্যাখ্যাসহ কোরানের ২৪০টি সংস্করণ। ইবন-মুকলার মত দক্ষ হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিও ছিল। আল-তাবারী স্বাক্ষরিত তাঁর ইতিহাস বইয়ের একটি সংস্করণ পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করেন আল-আযীয। ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দের লুঠতরাজের সময় এই পাঠাগারের সম্পদকে নয়ছয় করা হয়েছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, ২৫টি উটের পিঠে চাপিয়ে পাঠাগারের বই নিয়ে যাওয়া হয়। তুর্কি সেনাপ্রধানদের বাড়িতে আগুন জ্বালানো হত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি দিয়ে। শিক্ষার অবমাননার আরেকটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হল, বইয়ের বাঁধাই করা মলাট

দিয়ে তুর্কি সেনাপ্রধানদের ক্রীতদাসদের জুতো মেরামত করা হত। তবে আল-মুসতানসিরের বংশধরেরা পাঠাগারের জন্য নতুন বই সংগ্রহ করেছিলেন। এক শতাব্দী পরে, ফাতিমিয়দের পরাস্ত করে সালাহ্-আল-দীন যখন রাজপ্রাসাদের দখল নেন, তখনও পাঠাগারে লক্ষাধিক বই ছিল। অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে এই পাঠাগারের কিছু বই তিনিও তাঁর অনুগতদের বিলিয়ে দেন।[১৪]

● শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা

শিক্ষাক্ষেত্রে বিফল হলে ও মিশরের শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ফাতিমিয় যুগের যথেষ্ট অবদান ছিল। কায়রোর প্রথম দুই ফাতিমিয় খলিফা এবং পরবর্তী পর্যায়ে দুই আর্মেনিয় উজিরের আমলে শিল্পক্ষেত্রে মিশরের সমৃদ্ধি একমাত্র ফ্যারাও বা আলেকজান্দ্রিয়ার যুগের সমৃদ্ধির সঙ্গেই তুলনীয়।

ফাতিমিয় যুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন আজও রয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হল আজহার মসজিদ। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ তৈরি করেন জওহর। পরে মসজিদটি মেরামত করা হলেও মূল মসজিদটিকে অবিকৃত রাখা হয়। যেটি একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মূল মসজিদটি ইবন-তুলুন মসজিদের আদলে ইঁটের তৈরি। খিলানগুলি ছিল কৌনিক। সমসাময়িক প্রথা অনুযায়ী ইরানের প্রভাব এই স্থাপত্যলিপিতে ছিল না। মিনারগুলি ছিল ভারি এবং চৌকো। ফাতিমিয় আমলের আরেকটি প্রাচীন মসজিদ তৈরি করেছিলেন আল-হাকিম। যদিও ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ তৈরির কাজ আরম্ভ করেন তাঁর পিতা, কিন্তু এই কাজ শেষ হয় ১০১২ খ্রিস্টাব্দে। এটির নির্মাণরীতিও ছিল আল-আজহারের মতো। প্রার্থনাকক্ষের উপরে আটকোনা ঢাকের মতো একটি বস্তু ছিল। এর উপরে তৈরি হয়েছিল ইঁটের এক গম্বুজ। আল-হাকিমের মসজিদ এখন শুধুই ধ্বংসাবশেষ। এখানে পাথরের ব্যবহার হয়েছিল। তবে মিনারগুলি চৌকো না হওয়ায় অনুমান করা যায় এর কারিগররা সিরিয়ার নয়, উত্তরাঞ্চলের আল-ইরাকের বাসিন্দা। ফাতিমিয় যুগে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ইঁটের পরিবর্তে পাথরের ব্যবহার হয়েছে অনেক পরে। ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি আল-আকমার মসজিদের বাইরের অংশই তার প্রমাণ। এটি কোন আর্মেনিয় খ্রিস্টান স্থপতি তৈরি করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। আল-আকমার মসজিদেই ইসলামি স্থাপত্যেব একটি বিশেষ নিদর্শন লক্ষ করা গিয়েছিল, পরবর্তীতে যা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তা হল দেওয়ালের গায়ে ভার রক্ষার জন্য প্রলম্বিত পাথর বা তক্তা এবং কুলঙ্গি (মুকারনাস) ব্যবহার। এই মসজিদে স্তম্ভ ছিল। এটি এবং আল-সালিহিবন রাজ্জিকের (১১৬০) মসজিদের গায়ে খোদাই করা ঋজু শিল্পশৈলী এবং কুফিক ভাষার নির্মেদ কিছু সংকলন ফাতিমিয় শিল্পকলার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিল। ধীরে ধীরে ফাতিমিয় শিল্পীদের হাতে অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। যেমন ঝুলন্ত কৌনিক খিলান বা নির্মিত ভবনের বহির্ভাগে গভীর কুলুঙ্গি। পরে, আয়্যুবিয় এবং মামলুক যুগে এই শিল্পশৈলী আরো

উন্নত হয়ে ওঠে। তেমনই কাঠ অথবা পাথরের উপর খোদাই করা লিপিই পরবর্তী যুগের গৌরবোজ্জ্বল শিল্পের পূর্বাভাস দিয়েছিল। মসজিদের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠাতার কবর তৈরির রেওয়াজ শুরু হয় ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে। মুকাত্তামে বদব আল-জামালি প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সমাধি স্মৃতিফলকই এই ধারার প্রথম মসজিদ।

ফাতিমিয় যুগের অট্টালিকার বিপুল শিল্পশোভার স্বাক্ষর বহনকারী তিনটি তোরণ আজও বর্তমান। এগুলি হল : বাব জাওয়িলাহ, বাব আল-নাসর এবং বাব আল-ফুতুহ[17]। কায়রোর এই বিশাল তোরণগুলির ধ্বংসাবশেষ ফাতিমিয় মিশরের গৌরবের অন্যতম সাক্ষী। বাইজানটাইন পরিকল্পনামাফিক এইগুলি তৈরি করেছিলেন এডিসিন স্থপতিরা।

● সজ্জা ও শিল্প-সংক্রান্ত

কায়রোর আরব সংগ্রহশালায় ফাতিমিয় যুগে তৈরি কাঠের উপর খোদাইয়ের একাধিক কাজ রয়েছে। এতে নানাধরনের পশুপাখির নমুনা পাওয়া যায়। যেমন—দানবের হাতে আক্রান্ত হরিণ, ঈগলের কবলে পড়া খরগোশ বা পাখির লড়াই। এতে সাসানিয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। একই প্রভাব রয়েছে ফাতিমিয় যুগে ব্রোঞ্জের তৈরি আয়না, ধুনুচি বা হাতল-ওয়ালা বড় জগের ক্ষেত্রে ঈগল ও সিংহের সংমিশ্রণে এব বিচিত্র জীবের ব্রোঞ্জমূর্তিই হল ফাতিমিয় যুগের ব্রোঞ্জশিল্পের সেরা নমুনা। চল্লিশ ইঞ্চি উচ্চ এই জগটি বর্তমানে পিসায় রয়েছে। বস্ত্রশিল্পেও ইরান এবং সাসানিয়দেব বিশেষ প্রভাব ছিল, যদিও বয়নশিল্প ছিল খ্রিস্টান প্রধান মিশরের জাতীয় শিল্প। ধর্মযুদ্ধের[18] সময় বস্ত্রশিল্পের বেশ কিছু নমুনা পশ্চিমে চলে যায়। ফাতিমীয় মিশরের বস্ত্রে জন্তুদের নকশা কবা থাকত। এই জন্তুদের ভঙ্গি কখনও ছিল প্রচলিত বা পরিচিত কখনও বা সেই যুগের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেলানো। মধ্যযুগের মিশরের বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শহর ছিল দাবিক, দিময়াত এবং তিন্নিস। কাপড়ের নামও ছিল শহরের নামের সঙ্গে মেলানো। যেমন—দাবিকি, দিময়াতি এবং তিন্নিসি। চসারের সময়ে প্রসিদ্ধ ফুসতিয়ান কাপড়ও তৈরি হত আল-ফুসতাতে, নামের থেকেই যা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সিরামিকের কাজের ক্ষেত্রেও ফাতিমিয় শিল্পীরা ইরানি শিল্পশৈলীকে অনুসরণ করত। বস্ত্রশিল্পের মত এখানেও জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হত। ফাতিমিয় শিল্পসম্পদের তালিকায় আল-মাকরিজি[19] মৃৎশিল্প-সংক্রান্ত ও ধাতুনির্মিত বহু সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে চীনের উজ্জ্বল মৃৎপাত্রের কথাও আছে। পূর্ব আরবে[20] চীনা সামগ্রীর অস্তিত্বের এটিই প্রথম নথি। নাসির-ই-খুসরো[21] দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, মিশরিয়দের তৈরি মাটির জিনিস এতই সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ ছিল যে, তার ভিতর দিয়ে হাত দেখা যেত।

ইসলামের ইতিহাসে বই বাঁধাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে মিশরে। সম্ভবত এগুলি অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর কাজ। বাঁধাই-সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আরো আগের খ্রিস্টানদের বাঁধাইয়ের প্রভাব রয়েছে। মিশরে এই শিল্পের বিকাশের পরে মুসলিম চর্মশিল্পীরা যন্ত্র এবং মুদ্রণ ও অলঙ্করণের প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠে। ❑

● টীকা ●

১. সেফের নামেহ্, সম্পাদনা স্কেফার, পৃঃ ৩৬-৫৬, অনুবাদ পৃঃ ১১০-৬২।
২. তুলনীয় মাকরিজি, খণ্ড-২, পৃঃ ২৬৪, ইয়াকুত, খণ্ড-৩, পৃঃ ৯০১।
৩. পৃঃ ৫৩ (মূল), পৃঃ ১৫৫ অনুবাদ।
৪. খণ্ড-১, পৃঃ-৪১৪। তুলনীয়, ইবন্-তাগ্‌রি-বিরদি, খণ্ড-২, পর্ব-২, পৃঃ ১৮১-২।
৫. সুবহ্, খণ্ড-৩, পৃঃ ৪৮০।
৬. ইবন্-আল-সইরাফি, আল-ইশারাহ ইলা মান নালা আল বিজরাহ্, সম্পাদনা আবদুল্লাহ মুখলিস (কায়রো, ১৯২৪), পৃঃ ৯৪।
৭. 'কিতাব-আল-উলাহ্-ওয়া-কিতাব-আল-কুযাহ্'-এর লেখক, সম্পাদনা আর গেস্ট (লিডেন-১৯০৮-১২)।
৮. 'উয়ূন-আল-মা'রিফ-ওয়া-ফুনুন আখবর আল খালাইফ'-এর লেখক (অপ্রকাশিত)।
৯. মাকরিজি, খণ্ড-১, পৃঃ ৪৫৯।
১০. পৃঃ ৫০।
১১. কিফতি পৃঃ ২৩০-৩১, ইবন্-খাল্লিকান খণ্ড-৩, পৃঃ ৬।
১২. ইবন্-আবি-উইবিয়াহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ৯১-এর পর থেকে, আল কিফতি, পৃঃ ১৬৭-৮; মুস্তাফা নাজিফ, ইবন্-আল-হায়সামঃ বুহুসুহু ওয়া কুশুফুহু-আল-বাসারিয়াহ (কায়রো), পৃঃ ৯-১৪।
১৩. পাণ্ডুলিপি আকারে আংশিকভাবে সংরক্ষিত আছে এসকুরিয়াল-এ কাসিরি, খণ্ড-১, পৃঃ ৩১৭, অনুবাদ জে হিরশ্চবার্গ এট আল, 'ডাই আরাবিশেন আউজেনা রাজতে নাখ্ দেন কিউলেন বেরবিতেত' খণ্ড-২ (লিপজিগ্, ১৯০৫)।
১৪. মাকরিজি, খণ্ড-১, পৃঃ ৪০৮-৯; আবু-শামাহ্ খণ্ড-১, পৃঃ ২৬৮।
১৫. দেখুন মাকরিজি, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৮০-র পর থেকে।
১৬. দেখুন পৃঃ ৬৬৮।
১৭. দেখুন পৃঃ ৬২৬।
১৮. মাজাল্লাত-আল-মাজমা-এ ক্রেকনো খণ্ড-১৩ (১৯৩৫), পৃঃ ৩৮৬-৮ যেখানে আল বিরুনি চীনে বাসনের উল্লেখ করেছেন। সিলসিলাত-আল-তাওয়ারিখ পৃঃ ৩৫-৩৬; আলদিমাস্কি, নুখবাত-আল-দাহর ফি 'আজাইব-আল-বার-ওয়াল-বাহর, সংস্করণ এ এফ মেহরেন (সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৬) পৃঃ - ৪৩, সেখানে সম্ভবত পোর্সিলিন-এর উল্লেখ আছে। ডাই সেরামিক ভন সামারা (বার্লিন, ১৯২৫), পৃঃ ৬১-র এফ সারে নবম শতাব্দীতে সামাররাতে পোর্সিলিন আবিষ্কারের কথা নথিভুক্ত করেন।
১৯. স্কেফার সম্পাদিত, পৃঃ ৫২, অনুবাদ ঃ ১৫১।

॥ অধ্যায় ৪৫ ॥

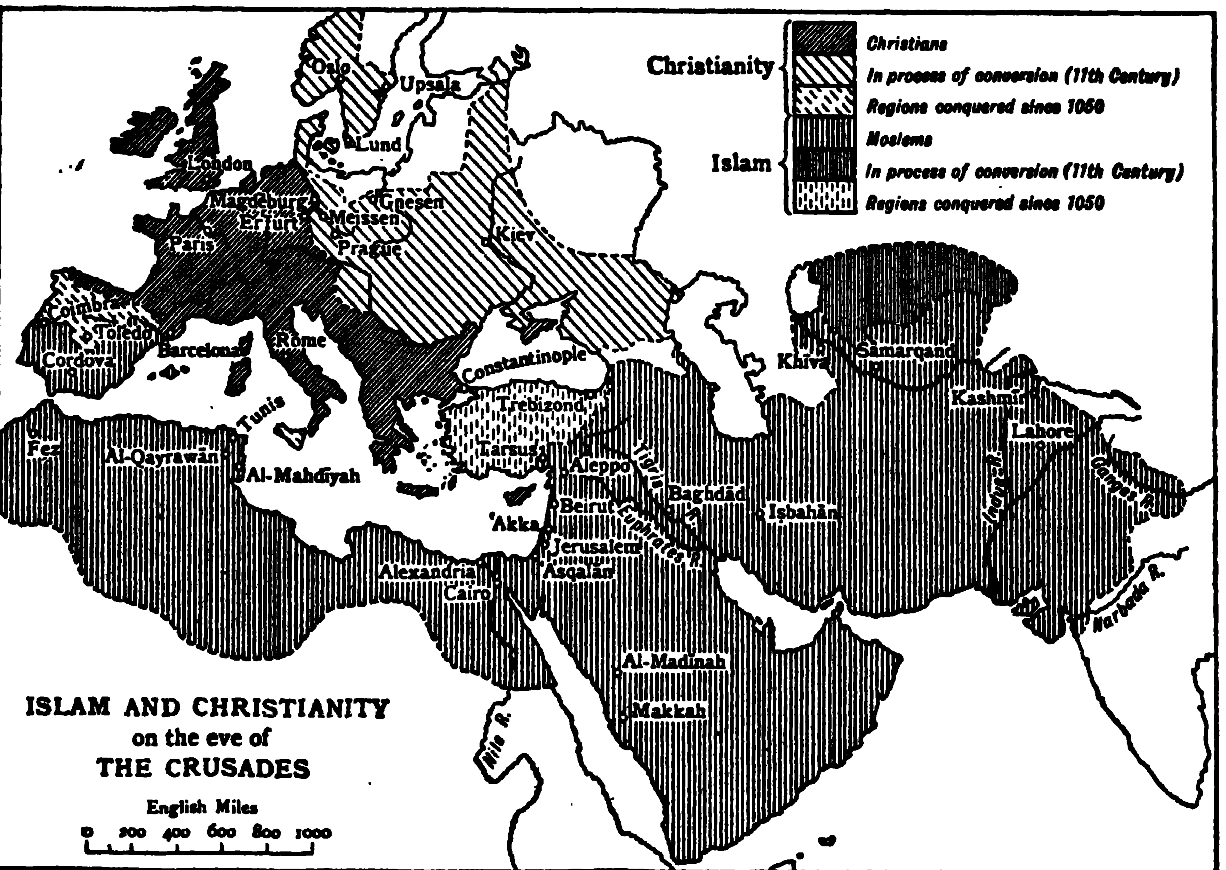
রণাঙ্গনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : ধর্মযুদ্ধ

১১ শতাব্দীর শেষভাগে সিরিয়াকে মুসলিম দখলমুক্ত করতে এগিয়ে আসে যাযাবর খ্রিস্টানরা। সেই সময়ের সিরিয়া ছিল ছোট-বড় নানা অংশে বিভক্ত। বিচ্ছিন্ন এই সব অংশের ভোগ-দখল এবং শাসন চালাত স্থানীয় আরব গোষ্ঠীপতিরা। রেয়াত করত না কেউ কাউকে। যেমন, উত্তরাংশে সালজুক তুর্কিরা ছিল সর্বশক্তিমান। কিন্তু, দক্ষিণে ক্ষমতায় ছিল মিশরের বিচ্ছিন্ন ফাতিমিয়রা। ভৌগোলিক গঠন বা শাসনের মত সিরিয়ার ভাষাও ছিল বহু বিভক্ত। এক-এক গোষ্ঠীর লোকেরা বলত এক-এক রকমের ভাষা। দক্ষিণ লেবাননের দ্রুজ, উত্তরের পর্বতাঞ্চলের নুসাইরিয়া ও তাদের প্রতিবেশী ইসমাঈলি এবং পরে অ্যাসাসিনরা তিনটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। ইসলাম ধর্মের মূলপ্রবাহ থেকে এগুলি ছিল স্বতন্ত্র। আবার, সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী ছিল উত্তর লেবাননের ম্যারোনাইট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সিরিয়ার প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করত।

● সিরিয়ার সালজুকরা

মধ্য এশিযার যাযাবর উপজাতি সালজুকরা ১১ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আব্বাসিদ শাসিত পশ্চিমি রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করে এবং খুরাসান, পারস্য, আল-ইরাক, আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনরে তাদের শাসন কায়েম করে। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলেন স্বয়ং খলিফাও। এবিষয়ে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে (অধ্যায় ৩২)। আল-রূম (এশিয়া মাইনর)-এর মত মূল সালজুক পরিবারের অন্যতম প্রধান শাখা ছিল সিরিয়ার সালজুকরাও। কিন্তু তারা একজনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসন করেনি। সিরিয়ার প্রায় প্রতিটি শহরই সেইসময় এক-একজন সালজুক বা আরব শাসকের অধীনে ছিল। ১০৮৯ খ্রিস্টাব্দের পরে শী'আহ্ সম্প্রদায়ভুক্ত বানু-আম্মার' এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে ত্রিপোলি। ১০৮১ খ্রিস্টাব্দের পর শেজার অধিকার করেন বানু-মুনকিয। উপকূল এবং উত্তর সীমান্তে বাইজানটিনিয়দের আক্রমণ চলত অনবরত। জিতলে দখল হত কোন শহর বা জনপদ, আর হারলে হাতছাড়া হতেও দেরি হত না সেইসব এলাকা।

সিরিয়ায় সালজুকদের প্রথম দলটি আসে ১০৭০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে। সুলতান আলপ আরস্লান্ সেই বছর আলেপ্পোর আরব যুবরাজকে তাঁর অধীনে আনেন। তাঁর সেনাপ্রধান আতসিজ জেরুসালেমে প্রবেশ করে ফাতিমিয় শাসকদের হাত থেকে প্যালেস্টাইন দখল



ক্রুশেডের আমলে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম

করেন। ফাতিমিয়রা চলত প্রচলিত ধর্মমতের তোয়াক্কা না করে। গোঁড়া সুন্নি মুসলিম হিসাবে সালজুকরা তা আদৌ সুনজরে দেখত না। তাই ফাতিমিয়দের ধ্বংস করাকে তারা তাদের কর্তব্য মনে করত। পাঁচ বছর বাদে ফাতিমিয়দের পরাস্ত করে দামাস্কাস অধিকার করেন আতসিজ। ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবশ্য জেরুসালেম আবার ফাতিমিয়দের দখলে চলে আসে। এই বছরেই ফাতিমিয় সেনারা হস্তচ্যুত উপকূলবর্তী শহরগুলি ফের দখল করে। এই শহরের মধ্যে ছিল আসকালান (আসকালোন), আক্কা (একর), টায়ার (সুর) এবং উত্তরের জুবায়েল (বাইব্লস)। আলপের পুত্র তুতুশই প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার সালজুক রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে তিনি খুরাসান ছাড়াও আলেপ্পো (হালাব), আল-রুহা (এডেসা) এবং আল-মাওসিলের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার পরের বছরই যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরই তাঁর দুই পুত্র রিযওয়ান এবং দুকাকের মধ্যে রাজ্যপাটের দখল নিয়ে বিরোধ বাধে। এই বিরোধের ফলে তুতুশের কষ্টার্জিত সিরিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রিযওয়ানের রাজধানী হয় আলেপ্পো। তাঁর শাসনকাল বিস্তৃত ছিল ১০৯৫ থেকে ১১১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দুকাকের রাজধানী ছিল দামাস্কাস[১]। তাঁর শাসনকাল ১০৯৫ থেকে ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁদের শাসনকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ছিল পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, যার সূত্রপাত ঘটেছিল ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে।

● অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রেরণা

সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে, মধ্যযুগে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষকেই ধর্মযুদ্ধ বলা যেতে পারে। ধর্মযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল প্রাচীনকালে ট্রয় এবং পারস্যের যুদ্ধগুলির মাধ্যমে; আর আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম ইউরোপের সম্প্রসারণই ছিল এই যুদ্ধের অন্তিম পর্ব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভৌগোলিক পার্থক্যের ফলে দুটি অঞ্চলের মধ্যে ধর্ম, জাতি এবং ভাষাগত পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ইউরোপের প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ কেবল সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, স্পেন এবং সিসিলিতেও তার বিস্তার ঘটেছিল। আরেকটি কারণ ছিল, টিউটোনিক উপজাতিদের পরিযায়ী এবং যুদ্ধপ্রবণ মানসিকতা। ইতিহাসে তাদের অভ্যুত্থানের পরে টিউটোনিক উপজাতিরা ইউরোপের মানচিত্রই বদলে দেয়। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে আল-হাকিমের হাতে পবিত্র সেপালকার গির্জা ধ্বংস হওয়া এবং এশিয়া মাইনরে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচারও ধর্মযুদ্ধের অন্যতম কারণ। আর পবিত্র সেপালকার গির্জার চাবি আশীর্বাদ স্বরূপ জেরুসালেমের[২] প্যাট্রিয়ার্ক পাঠিয়েছিলেন (৮০০) শার্লমানকে।

তবে, ধর্মযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল অন্য। এশিয়ায় সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনাসের যে সাম্রাজ্য ছিল, সালজুকদের হাতে তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মারমোরার উপকূল পর্যন্ত

সালজুকরা হামলা চালায়। এমন কী কনস্ট্যানটিনোপলকেও হুমকি দেয়। এই অবস্থায় ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনিনাস দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। এই আবেদনই শেষপর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পোপ সম্ভবত ভেবেছিলেন, এই আবেদনের মাধ্যমে গ্রিক ও রোমান গির্জাকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ চাওয়া হচ্ছে। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই দুই গির্জার মধ্যে মতানৈক্য ঘটে গেছে বিস্তর।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের ক্লেরমঁতে পোপ দ্বিতীয় আরবান যে ভাষণ দেন তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এত ফলপ্রসূ আবেদনের কথা ইতিহাসে কমই দেখা গেছে। ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "পবিত্র সমাধিস্তম্ভের দিকে অগ্রসর হও; পাপীদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে তা অধিকার কর। ঈশ্বর তাই চান।" পোপের এই আবেদন সর্বত্রই খ্রিস্টানদের আবেগকে নাড়া দেয়। ১০৯৭ সালের বসন্তকালের মধ্যে পোপের ডাকে সাড়া দিয়ে দেড় লক্ষ মানুষ কনস্ট্যানটিনোপলে সমবেত হন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ফ্র্যাঙ্ক এবং নরম্যান; সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষও কিছু ছিলেন। এইভাবেই সূচনা হয় প্রথম ধর্মযুদ্ধের। ক্রুশই ছিল এই ধর্মযুদ্ধের অভিজ্ঞান।

তবে সকলেই যে ধর্মীয় আবেগ থেকে বা ধর্মরক্ষার তাগিদে এগিয়ে এসেছিল তা নয়। বোহেমন্ড-সহ বহু নেতা তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে যোগ দেন। পিসা, ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকদের ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থ। ধর্মপ্রাণ মানুষ ছাড়াও আবেগপ্রবণ, দুঃসাহসিক এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতার জন্য এই যুদ্ধ ছিল একটি নতুন সমাবেশস্থল। অনেক অপরাধী আবার এই যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল। আর্থ-সামাজিক দুর্দশায় বিপর্যস্ত ফ্রান্স, লোরেন, ইতালি এবং সিসিলির জনসাধারণ এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দেন আত্মরক্ষার তাগিদেই, আত্মাহুতির মহান ব্রতে নয়।

● বিজয় পর্ব

সাধারণভাবে ধর্মযুদ্ধের সংখ্যার যে হিসাব দেওয়া হয় তা খুব গ্রহণযোগ্য নয়। এই হিসাব অনুযায়ী সাত থেকে নটি ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ চলেছিল প্রায় একটানা এবং এক-একটি যুদ্ধের কালরেখাও স্পষ্টভাবে টানা হয়নি। ধর্মযুদ্ধকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। প্রথম পর্বের সময়কাল ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আল-মাওসিলের নায়ক আতাবেগ জাঙ্গি এই বিজয় পর্বে আল-রুহা পুনরুদ্ধার করেন। জাঙ্গির সূচনা করা মুসলিম সংঘর্ষ আরো সংগঠিত রূপ নেয় দ্বিতীয় পর্বে এবং সালাহ-আল-দীনের (সালাদিন) বিজয়ে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তৃতীয় পর্ব ছিল গৃহযুদ্ধ এবং ছোটখাট সংঘর্ষে ভরা। সিরিয়া ও মিশরের আয়্যুবিয় এবং মিশরিয় মামলুকরা এইসব যুদ্ধের পুরোভাগে ছিলেন। এই যুদ্ধের তৃতীয় বা অন্তিমপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে। সিরিয়ার মূল ভূখণ্ডের ওপর ধর্মযোদ্ধারা যে দখল কায়েম করেছিল তা নিশ্চিহ্ন হয় এই সময়েই। সম্পূর্ণ বিজয়পর্বের সময়কালই চিহ্নিত

করা হয় তথাকথিত দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের (১১৪৭-৯) আগে। তৃতীয় পর্ব মোটামুটিভাবে ১৩ শতক জুড়ে বিস্তৃত। শেষপর্বের একটি যুদ্ধ ছিল কনস্ট্যানটিনোপলের বিরুদ্ধে (১২০২-৪) এবং মিশরের বিরুদ্ধে দুটি (১২১৮-২১)। এমন কী একটি যুদ্ধ তিউনিসিয়াতেও হয় (১২৭০)। তবে এই যুদ্ধ থেকে কোন পক্ষেরই কোন লাভ হয়নি।

● বাইজানটাইনের এশিয়া মাইনর পুনরুদ্ধার

ধর্মযুদ্ধের যাত্রা শুরু হয় কনস্ট্যানটিনোপল থেকে। প্রথম লক্ষ্য এশিয়া মাইনর। কুনিয়াহ্-এর তরুণ সালজুক সুলতান কিলিজ আরস্লান (১০৯২-১১০৭) তখন এশিয়া মাইনরের শাসনকর্তা। ফলে, তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই ধর্মযোদ্ধাদের অস্ত্র প্রথম উদ্যত হয়ে ওঠে। একমাস অবরুদ্ধ রাখার পর তারা ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নিসিয়া দখল করে। এই নিসিয়া ছিল কিলিজের পিতা সুলাইমান ইবন-কুতলুমিশের রাজধানী। ইনি আল-রূমের সালজুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুদ্ধ ছাড়া আর একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধ হয়েছিল ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে মুসলিমদের, সেটি হল ডোরিলেয়াম-এর (এসকি-শহর) যুদ্ধ। এখানে ১ জুলাই[৫] তারা কিলিজের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। এই বিজয় অভিযানের সর্বাধিনায়ক হিসাবে চিহ্নিত হন আলেক্সিয়াস। তুলুজের রেমণ্ড এবং ধর্মযুদ্ধের অন্যান্য নেতাদের কাছ থেকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক মিত্রতার শপথ আদায় করে নেন। এই এলাকায় গড়ে ওঠে ঘনবদ্ধ সামরিক ক্ষমতা এবং শাসন। তাই, তুর্কিদের ইউরোপ আক্রমণ তখনকার মত প্রতিহত হয়। ২৫০ বছর পরে তুর্কিরা অবশ্য ফের ইউরোপ আক্রমণ করে।

● প্রথম লাতিন উপনিবেশ

তুর (Tourus) পর্বত পার হয়ে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রার সময়ে বল্ডউইনের নেতৃত্বে ধর্মযোদ্ধাদের একটি অংশ পূর্ব দিকে ঘুরে যায়। খ্রিস্টান আর্মেনিয় অধিকৃত এই অঞ্চলে ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দে আল-রুহার দখল নেয় ধর্মযোদ্ধারা।[৬] খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে এখানেই প্রথম লাতিন উপনিবেশ ও প্রথম লাতিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বল্ডউইন যুবরাজ হন এই রাষ্ট্রের। তাঁর পিতা ছিলেন বুলোনের কাউন্ট। দক্ষিণ ইতালির নরমান ট্যানক্রেডের নেতৃত্বে আরেকটি বিচ্ছিন্ন সেনাদল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, অর্থাৎ সিলিসিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়। এখানকার জনগণ ছিল আর্মেনিয় ও গ্রিক। এখানে সেন্ট পলের জন্মস্থান টারসাস দখল করেন নরমান ট্যানক্রেড।

● অ্যান্টিয়োক দখল

ইতিমধ্যে মূল সৈন্যদল অ্যান্টিয়োক পৌঁছয়। অ্যান্টিয়োকের শাসনভার সেইসময় ছিল

যাগি-সিয়ান[৮] নামে এক সালজুক আমীরের হাতে। তৃতীয় মহান সালজুক সম্রাট মালিকশাহ তাঁকে এই দায়িত্ব দেন। দীর্ঘদিন ধরে অতি কষ্টে অ্যান্টিয়োক অবরুদ্ধ করে রাখে ধর্মযোদ্ধারা (২১ অক্টোবর ১০৯৭ থেকে ৩ জুন ১০৯৮)। শেষপর্যন্ত একটি দুর্গের দায়িত্বে থাকা এক আর্মেনিয় সেনাপ্রধানের বিশ্বাসঘাতকতায় বোহেমন্ডের করায়ত্ত হয় অ্যান্টিয়োক। এই বোহেমন্ড ছিলেন ট্যানক্রেডের আত্মীয় এবং নেতা হিসাবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। অ্যান্টিয়োক তাঁর হাতে চলে যাওয়ার আগে শহরটিকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করেন আলেপ্পোর রিযওয়ান।

অবরোধকারীরা অ্যান্টিয়োক শহরে প্রবেশ করা মাত্রই আল-মাওসিলের আমীর কারবুকা[৯] তাদের আটক করেন। অ্যান্টিয়োক দখলের খবর পেয়েই তিনি তাঁর রাজধানী থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন। কিন্তু ধর্মযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে কারবুকার সেনাবাহিনী অসহায় হয়ে ওঠে। কারণ, এই লড়াইয়ে ধর্মযোদ্ধাদের প্রধান অস্ত্র ছিল তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা। অন্যান্য সাধারণ সেনার মত রাজ্যজয় বা লুঠতরাজ নয়। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর গায়ে যে বল্লম বিদ্ধ করা হয়েছিল, অ্যান্টিয়োকের এক গির্জায় তা মাটির নিচে রক্ষিত ছিল। সেই পবিত্র বল্লম আবিষ্কার করে খ্রিস্টান সেনারা আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে এবং বীরবিক্রমে তাদের বন্দিদশার অবসান ঘটিয়ে (২৮ জুন) কারবুকার সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। বোহেমন্ডের অধীনে চলে আসে অ্যান্টিয়োক এবং খ্রিস্টান অধিকৃত দ্বিতীয় রাজ্যের রাজধানী হিসাবে তা চিহ্নিত হয়। প্রায় ১৭৫ বছর ধরে অ্যান্টিয়োক খ্রিস্টানদের দখলে ছিল।

বোহেমন্ডের এই কর্তৃত্বে অসন্তুষ্ট হন তুলুজের রেমন্ড ; কারণ অ্যান্টিয়োকে পবিত্র বল্লম আবিষ্কার করে তারই অনুগত সেনারা। ক্ষুব্ধ রেমন্ড দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। আবু-আল-আলার জন্মস্থান হিসাবে বিখ্যাত মাআবরাত আল-নুমান দখল করে তার সেনাদল। তারপর এখানকার লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করে এবং শহরে আগুন লাগিয়ে[১০] সেনারা এই শহর ছেড়ে চলে যায় (১৩ জানুয়ারি, ১০৯৯)। কাউন্ট রেমন্ড তারপর হিন আল-আকরাদ[১১] দখল করেন। এর ফলে অরন্তেস (আল-আসি)-এর সমতল এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ তাঁর অধীনে চলে আসে। এরপর উত্তর লেবাননের পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চলে আরকাহ্[১২] অবরোধ করেন এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে অ্যানটারটাস[১৩] বিনা বাধায় করায়ত্ত করেন রেমন্ড। লেবাননের ম্যারোনাইট খ্রিস্টানরা তাঁকে পথপ্রদর্শক এবং অল্পসংখ্যক সেনা দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু এইসব ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন রেমন্ড; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জেরুসালেম বিজয়। লোরেনের কাউন্ট এবং বল্ডউইনের ভ্রাতা বুইলনের গডফ্রের জরুরি আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর সেনাদলের সঙ্গে রেমন্ড জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করেন।

● জেরুসালেম দখল

দক্ষিণ দিকের এই যাত্রাপথে ধর্মযোদ্ধারা আল রামলাহ দখল করে। প্যালেস্টাইনে[১৪]

এটিই ছিল লাতিনদের প্রথম কর্তৃত্ব। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন প্রায় ৪০ হাজার ধর্মযোদ্ধা জেরুসালেমের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছয়। এদের প্রায় অর্ধেক ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য[১৫]। তুলনায় মিশরিয় বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল হাজারখানেক। জেরিকোর মত এখানেও প্রাচীর ভেঙে পড়বে এই আশা নিয়ে ধর্মযোদ্ধারা খালি পায়ে শিঙা বাজিয়ে শহরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে। একমাস ধরে তারা জেরুসালেম অবরোধ করে রাখে। এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত কার্যকর হয়। শেষ পর্যন্ত ১৫ জুলাই অবরোধকারীরা ঝড়ের মত শহরে প্রবেশ করে এবং নৃশংস হত্যালীলা চালায়। নারী, শিশু বা বৃদ্ধ কেউই তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। "শহরের পথে ঘাটে সর্বত্র মানুষের কাটা হাত-পা, মাথা স্তূপাকারে পড়ে ছিল।"[১৬] প্রায় মাসখানেক বাদে আসকালানের কাছে মিশরিয় বাহিনীকে আরেকবার পরাস্ত করে লাতিনরা জেরুসালেমে তাদের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু আসকালানে মিশরিয় সেনাদের ঘাঁটি ও সৈন্যদলের একটি সদরদপ্তর রয়েই গেল। মিশরের উজির আল-মালিক আল-আফযলের নেতৃত্বে এই সৈন্যদল শত্রুদের অনবরত হেনস্থা করতে লাগল[১৭]। এইভাবে জেরুসালেমের মাধ্যমে তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাতিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, রেমন্ডকে কোন প্রশাসনিক পদে আসীন না করে রাজা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু রেমণ্ড এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বয়ং যীশুকে যেখানে কাঁটার মুকুট পরতে হয়েছিল, সেখানে সোনার মুকুট পরতে নারাজ ছিলেন তিনি[১৮]। অতএব সৎ নেতা ও নির্ভীক যোদ্ধা গডফ্রেকে[১৯] এই পদের জন্য মনোনীত করা হয়। তাঁর উপাধি ছিল "ব্যারন এবং পবিত্র সমাধিস্তম্ভের রক্ষক"। ধর্মযোদ্ধা এবং তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই মনে করলেন তাঁদের শপথ রক্ষা হয়েছে। তাঁরা স্বদেশে ফিরে গেলেন।

● ইতালিয়দের হাতে বন্দরের সীমানা সঙ্কোচন

নেতৃত্বে এসেই গডফ্রের প্রথম কাজ হয় উপকূলবর্তী শহরগুলির আয়তন কমিয়ে আনা। কারণ এছাড়া প্রশাসন চালানো হয়ে উঠত বিপজ্জনক। তা ছাড়া স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখারও সমস্যা ছিল। কিন্তু, এই সমস্যা মিটতে দেরি হয়নি। স্বদেশে ফেরা তীর্থযাত্রীরা অধিকাংশ সময়েই সওয়ার হতেন ইতালিগামী জাহাজে। ফলে, এইসব জাহাজ মারফত গডফ্রে তাঁর প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখতে পারতেন বুইলনের সঙ্গে। আর এই সব ইতালিয় জাহাজ যাতায়াতের ফলে জেরুসালেম এক বাণিজ্যিক বৃত্তে পরিণত হয়। ভাগ্যান্বেষী ইতালিয়দের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল জেরুসালেমের উপকূলবর্তী শহরের সদ্য গড়ে ওঠা বাজার এবং মুক্ত বন্দরের অবাধ সুযোগ। দেখা গেল, পরের বছরই (১১০০) জাফ্‌ফায় (ইয়াফা) বাণিজ্য করার বিশেষ অধিকার পেয়ে গেল পিসার বণিকরা। সোজা কথায়, গডফ্রের শাসনে এবং ইতালিয় বণিকদের দৌলতে জেরুসালেমের অবস্থা আপাতভাবে শান্ত হয়ে

আসতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই আরসাফ, সিজারিয়া (কায়সারিয়াহ) এবং আক্কা গডফ্রের কাছে প্রার্থনা জানাল যুদ্ধবিরতির[২০]। বিনিময়ে স্বীকার করে নিল বশ্যতা এবং বার্ষিক করপ্রদানের চুক্তি। কিন্তু গডফ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা উল্টে গেল। শুরু হল লুঠতরাজের রাজত্ব। যুদ্ধবিরতির চুক্তি সত্ত্বেও ভেনিসের নৌবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করল আক্কা এবং মাসখানেকের মধ্যেই অধিকার করে নিল হেফা (হাইফা)[২১]। এইবার ঘটল এই অধ্যায়ের অন্যতম নৃশংস ঘটনা। হেফার সেনাবাহিনী এবং সাধারণ মানুষকে ডেকে পাঠানো হল এক গির্জায়। সবাইকেই অভয় দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিরাপত্তার কোন অভাব ঘটবে না। কিন্তু ঘটল ঠিক তার উল্টোটাই। অপ্রস্তুত সেনা এবং আশ্বস্ত জনসাধারণকে হত্যা করা হল নির্বিচারে। ভেনিসিয় লুঠেরাদের হাত থেকে এই বন্দরগুলিকে বাঁচাতে পারত মিশরিয় নৌসেনারা। হয়ত তারা চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কোন ফলই ফলেনি।

ইতিমধ্যে, ট্যানক্রেড[২২] তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের উদ্যোগ নেন। জর্ডনের সীমান্তবর্তী প্রদেশ আক্রমণ করেন। ভূমধ্যসাগরের উপকূল ও দামাস্কাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বেসান দখল করেন। ট্যানক্রেডের প্রবল বিক্রমের কাছে বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে নাবুলাস। কিন্তু সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া তার লক্ষ্য ছিল না। তাই তিনি টিবেরিয়াসে গডফ্রের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। তাঁর আনুগত্যের এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে ১১০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অর্জিত সমস্ত ভূখণ্ড অ্যান্টিয়োকের কাছে সমর্পণ করেন। অ্যান্টিয়োকের শাসক বোহেমন্ড ছিলেন সম্পর্কে তাঁর কাকা। মারাশের কাছে এক সংঘর্ষের সময় তাঁকে বন্দি করেন গুমিশটিগিন[২৩]। ১১০৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপণ দিয়ে বোহেমন্ডকে মুক্ত করা হয়।

● জেরুসালেমের রাজা প্রথম বল্ডউইন

গডফ্রের[২৪] মৃত্যুর পর তাঁর অনুচরেরা তাঁর ভাই বল্ডউইনকে[২৫] উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বল্ডউইন আল-রুহা থেকে চলে আসেন এবং ১১০০ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনে বেথলেহেমে তাঁর অভিষেক হয়। ক্লারিকাল পার্টি জেরুসালেমকে গির্জার অধীনস্থ অঞ্চল বলে মনে করায় এই অভিষেক বেথলেহেমে হয়।

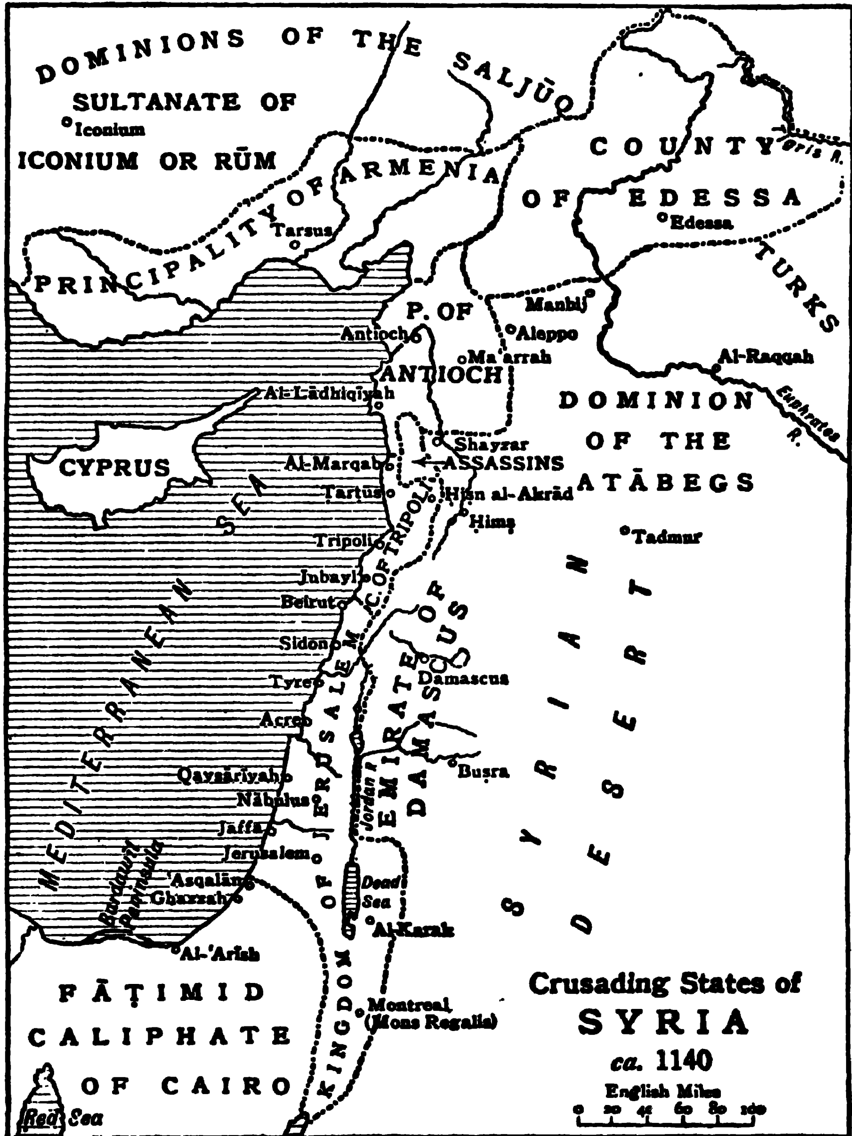
বল্ডউইন ছিলেন যোগ্য, কর্মচঞ্চল এবং আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। তাঁর শাসনকালে (১১০০-১৮) লাতিন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল লোহিত সাগরের উত্তরের আল-আকাবাহ থেকে বেইরুট পর্যন্ত। তাঁর সম্পর্কিত ভাই এবং উত্ত[illegible] দ্বিতীয় বল্ডউইন[২৬] (১১১৮-৩১) এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরো কয়েকটি শহর যো[illegible]। এই শহরগুলির অধিকাংশই ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। তবে জর্ডনের ওপারে তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হতে পারেনি। ১১১০ খ্রিস্টাব্দে বেইরুট এবং সিডন দখল করা হয়। লাতিন আক্রমণে বিধ্বস্ত উত্তরাঞ্চলের এই শহরগুলি সাহায্যের জন্য একমাত্র দামাস্কাসের দরজায় যেতে পারত। সেইসময়

দামাস্কাসের শাসক ছিলেন আতাবেগ তুগতিগিন। সালজুক সুলতানের প্রাক্তন ক্রীতদাস তুগতিগিন সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র দুকাকের[২৭] অনুপস্থিতিতে দামাস্কাসের অন্তবর্তী শাসক ছিলেন। কিন্তু সাহায্যের ব্যাপারে তুগতিগিন ছিলেন নিরুপায়। কারণ বল্ডউইনের সঙ্গে বহুবছর ধরে তাঁর সমঝোতার চুক্তি ছিল। কিছুদিনের যুদ্ধবিরতির পরে ১১০১ খ্রিস্টাব্দে আরসাফ এবং সিজারিয়া আক্রমণ করে জেনোয়ার এক সেনাবাহিনী। সংঘর্ষ এবং লুঠতরাজের পর আরসাফ এবং সিজারিয়া শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে। শর্ত হয়, লুঠ করা সম্পদের এক তৃতীয়াংশ নেবে জেনোয়ার সেনাবাহিনী এবং এই দুই শহরে তাদের বিশেষ সামরিক ঘাঁটিও থাকবে। তবে টায়ার এবং আসকালানের পরিস্থিতি অনেক স্থিতিশীল এবং নিরাপদ ছিল। টায়ার ১১২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং আসকালান ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিমদের দখলে ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে ১১১৫ খ্রিস্টাব্দে বল্ডউইন আল-শবাকে[২৮] একটি সুরক্ষিত নগরদুর্গ তৈরি করেন। এর ফলে দামাস্কাস থেকে আল-হিজাজ এবং মিশর পর্যন্ত মরুপ্রান্তর তাঁর দখলে এসে গেল।

● তৃতীয় ফ্র্যাঙ্ক উপনিবেশ স্থাপন

সেইসময় সিরিয়ার ত্রিপোলি (গ্রিক ত্রিপোলিস থেকে তারাবুলাস) শহর ছিল ব্যস্ততম বন্দর। অ্যান্টিয়োক থেকে জেরুসালেম অভিমুখে বিজয় অভিযানের সময় থেকেই কাউন্ট রেমন্ডের[২৯] নজর ছিল ত্রিপোলির দিকে। জেরুসালেমে লাতিন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ফিরে এসে তিনি ত্রিপোলি অবরোধ শুরু করেন ১১০১ খ্রিস্টাব্দে। শহরটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য তিনি এর দু-বছর পরে নিকটবর্তী আবু আলী (কাদিশা) নদীর গিরিখাতে একটি পাহাড়ের উপব এক দুর্গ[৩০] তৈরি করেন। পাহাড়ের নাম দেওয়া হয় মনস্ পেলেগ্রিনাস (তীর্থযাত্রীদের পাহাড়)। ক্রমেই এটি লাতিনদের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবেশী খ্রিস্টান ও পাহাড়ের অধিবাসীদের[৩১] পাঠানো সেনার সাহায্য সত্ত্বেও ত্রিপোলি দখল করা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে ত্রিপোলির সীমান্তবর্তী বিভিন্ন শহর দখল করে যাচ্ছিলেন রেমন্ড। ১১০৪ খ্রিস্টাব্দে ৪০ টি রণতরী এবং জেনোয়ার নৌসেনার সাহায্যে তিনি জুবাইল দখল করেন। ফলে, ত্রিপোলির দক্ষিণ সীমানাও নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু এত প্রচেষ্টার পরও ত্রিপোলি দখল করতে পারেননি রেমন্ড। ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে নিজের দুর্গে তাঁর মৃত্যু হয়। ১১০৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই পর্যন্ত অবশ্য ত্রিপোলি অবরুদ্ধই ছিল।

এইভাবে আল-রুহা এবং অ্যান্টিয়োকের পর ত্রিপোলিকেও জেরুসালেম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত[৩২] রাজ্য হিসাবে ধরা হল। আল-রুহা এবং জেরুসালেম ছিল বারগাণ্ডিয়দের শাসনাধীন, অ্যান্টিয়োক নরম্যানদের এবং ত্রিপোলি ছিল প্রভাঁস প্রদেশীয়দের দখলে। মুসলিম সাম্রাজ্যে লাতিন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেবল এই চারটি অঞ্চলেই। খ্রিস্টান আধিপত্য সীমাবদ্ধ ছিল সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলেই। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপকূলবর্তী সামান্য এলাকার উপরই দখল কায়েম করতে পেরেছিল.



সিরিয়ার ক্রুশেড-লিপ্ত রাজ্য

লাতিনরা। তাদের অধিকৃত প্রতিটি অঞ্চলের আশেপাশেই ছিল মুসলিম রাজত্ব। এমন কী নিজেদের রাজত্বেও লাতিনদের জনসংখ্যা ছিল খুবই কম এবং ছড়ানো ছিটানো। আলেপ্পো, হামাহ, হিমস, বা'লাবাক এবং দামাস্কাসের মত অভ্যন্তরীণ শহরগুলি কখনও লাতিন শাসনের আওতায় আসেনি। তবে, কিছু সময় ধরে তারা লাতিনদের কর দিয়েছে। ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নূর-আল দীন এর শাসনাধীন দামাস্কাস ৮০০০ দিনার কর দিত।[৫৫]

● সামাজিক আদানপ্রদান

এই লাতিন রাজ্যগুলিতে বংশপরম্পরায় যেসব খ্রিস্টান শাসক এসেছেন এবং তাদের মধ্যে যে বিরোধ হয়েছে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ এগুলি আরব ইতিহাস নয়। ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানুষের মধ্যে যে মৈত্রী গড়ে ওঠে তা অবশ্যই গুরুত্বের দাবি রাখে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, খ্রিস্টানরা প্রাচ্যে এসেছিল নিজেদের সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণা নিয়ে। মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী এবং মুহাম্মাদকে দেবজ্ঞানে উপাসনাকারী মনে করে মুসলিমদের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। কিন্তু মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেই তাদের ভ্রান্তিমোচন হয়। অপরদিকে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে মুসলিম মনোভাবও ছিল ততোধিক বিরূপ। উসামাহ[৫৪] বলেছিলেন, "খ্রিস্টানরা হল পশু। তবে তাদের সাহস এবং লড়াই করবার গুণ আছে। এছাড়া আর কিছুই নেই।" এক দেশের মানুষ আরেক দেশ জয় করতে গেলে পারস্পরিক যোগাযোগ অনিবার্য। কিন্তু ধর্মযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই যোগাযোগের বিষয়টি ছিল অভিনব। মুসলিমদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের যোগাযোগ ছিল আরোপিত। কিন্তু যুদ্ধের থেকে শান্তিপর্বেই এই যোগাযোগের সময়কাল ছিল দীর্ঘ। আর এই দীর্ঘ যোগাযোগের সময়েই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয়। খ্রিস্টান-মুসলিম সম্পর্ক হয় শান্তিপূর্ণ ও প্রকৃত অর্থেই প্রতিবেশীসুলভ। ফ্র্যাঙ্করা তাদের কর্মচারী ও কৃষক হিসাবে নির্ভরযোগ্য স্থানীয় মুসলিমদেরই নিয়োগ করত। আবার তাদের প্রবর্তন করা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই স্থানীয় কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত হয়। তারা তাদের সঙ্গে ঘোড়া, কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শিকারিদের নিরাপত্তা, পর্যটক ও বণিকদের নিরাপদে ভ্রমণ, বাণিজ্যের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি হয়। দুপক্ষই এই চুক্তি মেনে চলত। প্রাচ্যের আবহাওয়ার উপযুক্ত ও আরামদায়ক পোশাক পরার জন্য ফ্র্যাঙ্করা তাদের ইউরোপীয় পোশাক ছেড়ে স্থানীয় পোশাক পরা আরম্ভ করে। রসনারও পরিবর্তন হয় তাদের। বিশেষ করে মিষ্টি ও মশলাদার খাবারের দিকেই তারা বেশি করে ঝোঁকে। প্রাচ্যের ধাঁচের ঘরবাড়িই তাদের বেশি পছন্দ হয়, কারণ এই সব বাড়িতে ছিল খোলামেলা উঠোন ও প্রচুর জলের ব্যবস্থা। অনেকেই স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ করেন। এইসব অসবর্ণ বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের বলা হত পউলেন[৫৫]। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সন্তানরা মুসলিম ও ইহুদি উভয়ের

কাছেই সমান গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। পারস্পরিক কলহ-বিবাদের মীমাংসায় লাতিনরা খ্রিস্টধর্মের বাইরের মানুষের সাহায্য চাইত। মুসলিমরা তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের মোকাবিলা করতে লাতিনদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধত।

● মুসলিম প্রতিক্রিয়া : জাঙ্গি ও নূরী

ধর্মযুদ্ধ পর্বে মুসলিম প্রতিরোধের সূচনা হয় ইমাদ-আল-দীন (বিশ্বাসের ভিত) জাঙ্গির উত্থানের মাধ্যমে। আল-মাওসিলের এই নীলচক্ষু আতাবেগই (১১২৭-৪৬) ছিলেন ধর্মযুদ্ধ বিরোধী প্রথম বীর। বীরত্বের এই ধারা চূড়ান্ত সাফল্য পায় সালাহ্-আল-দীনের আমলে। পরবর্তী শতাব্দীর মামলুকদের মধ্যেও তা বর্তমান ছিল। মালিকশাহের এক ক্রীতদাসের সন্তান জাঙ্গি নিজ বাহুবলে আলেপ্পো, হাররান এবং আল-মাওসিলকে নিয়ে গঠিত একটি রাজত্বের শাসনভার গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি জাঙ্গি রাজপরিবার (১১২৭-১২৬২) প্রতিষ্ঠা করেন। আতাবেগদের প্রতিষ্ঠিত রাজপরিবারগুলির মধ্যে এই জাঙ্গিরাই সর্বোত্তম। জাঙ্গিই প্রথম লাতিন রাজ্যগুলির উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম আঘাত ছিল আল-রুহার উপর। বাগদাদের নিকটবর্তী এবং মেসোপটেমিয়া ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যকার যোগাযোগ পথের প্রধান কেন্দ্র হওয়ার ফলে আল-রুহা ছিল সিরিয়ার সবকটি লাতিন রাষ্ট্রেরই দ্বাররক্ষী। চার সপ্তাহের অবরোধের পর জাঙ্গি ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় জোসেলিনের[৩৬] কাছ থেকে আল-রুহার শাসনভার কেড়ে নেন। ধর্মযোদ্ধাদের এই শহর দুর্গ দিয়ে ঘেরা থাকলেও প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে যথেষ্ট দুর্বল প্রমাণিত হয়। আল-রুহা দখলের মাধ্যমে মুসলিম সিরিয়া ও আল-ইরাকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপের কাছে এই ঘটনাই ছিল তথাকথিত দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের (১১৪৭-৯) সঙ্কেতবার্তা। জার্মানির তৃতীয় কনরাড এবং ফ্রান্সের সপ্তম লুই এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ফ্রান্স ও জার্মানির নাইট, টেম্পলার[৩৭] এবং হসপিটালার[৩৮] নামের নাইটদের দুটি সঙ্ঘের সদস্য এবং জেরুসালেম দামাস্কাসের সেনা নিয়ে দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের সেনাবাহিনী তৈরি হয়। কিন্তু চারদিন ধরে[৩৯] আটক রাখা ছাড়া এই সেনাবাহিনী কিছুই করতে পারেনি। দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের প্রাপ্তির ঘর তাই শূন্যই বলা যায়।

সিরিয়ায় জাঙ্গির সাম্রাজ্যে তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁরই পুত্র নূর-আল-দীন (বিশ্বাসের আলো) মাহ্মুদ। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও ছিলেন ইসলামধর্ম প্রচারের অন্যতম প্রবক্তা। যদিও যোগ্যতার নিরিখে তিনি পিতার থেকে উপরেই ছিলেন। নূরের রাজধানী ছিল আলেপ্পোয়। পিতার মত তিনিও ফ্র্যাঙ্কদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং নিজেকে তাদের থেকে শক্তিশালীও মনে করতেন। ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দামাস্কাসের উপর কোনরকম আঘাত না হেনেই তার শাসনভার দখল করে নন। সেইসময় দামাস্কাসের শাসক ছিলেন তুগতিগিনের এক বংশধর। জাঙ্গিয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে জেরুসালেমের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে শেষ বাধা ছিল দামাস্কাস। নূরের দামাস্কাস বিজয়ের মাধ্যমে সেই বাধা দূর হয়ে যায়। নূর তাঁর কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্বটি সম্পন্ন করেন। ১১৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল-রুহার পূর্বতন শাসক দ্বিতীয় জোসেলিনকে বন্দি করেন[৪০]। অ্যান্টিয়োকের কিছু অংশের সীমানা রদবদল করে তার আয়তন কমিয়ে আনেন। ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিয়োকের শাসক তৃতীয় বোহেমন্ড এবং তাঁর সহযোগী ত্রিপোলির শাসক তৃতীয় রেমন্ডকে বন্দি করেন। মুক্তিপণের বিনিময়ে যথাক্রমে এক ও নয় বছরের কারাবাসের পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্যালেস্টাইনে অবশ্য ইসলাম ধর্মের জয়জয়কার তেমন শোনা যায়নি। এখনকার প্রধান সামরিক শক্তিকেন্দ্র আসকালান প্রায় অর্ধশতাব্দী ফ্র্যাঙ্কদের প্রতিরোধ করেও শেষরক্ষা করতে পারেনি। ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে জেরুসালেমের শাসক তৃতীয় বল্ডউইন এটি দখল করেন। এর ফলে খ্রিস্টানদের মিশর যাওয়ার পথ আরো সুগম হয়ে যায়।

● সালাদিনের উত্থান

নূর-আল-দীনের সুযোগ্য সেনাপ্রধান ছিলেন শিরকুহ। নূরের নির্দেশে এবং নিজের যোগ্যতা ও বুদ্ধিকে সম্বল করে তিনি ফাতিমিয় শাসিত মিশরের দিকে অগ্রসর হন। সেইসময়ে ফাতিমিয়দের জরাজীর্ণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি কেবল রণনীতিই নয়, কূটনীতির যুদ্ধেও জয়লাভ করেন। ফলস্বরূপ ফাতিমিয় খলিফা আল-আযিদের[৪১] (১১৬০-৭১) উজিবের পদটি তাঁর করায়ত্ত হয়। শিরকুহের এই অভাবনীয় সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন পূর্বতন উজির শাওয়ার। সেই কারণে তৃতীয় বল্ডউইনের ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী প্রথম আমালরিকের কাছে তিনি সাহায্যের আবেদন করেন এবং তা মঞ্জুরও হয়। খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শিরকুহের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ্-আল-দীন (সততার প্রতি বিশ্বস্ত, সালাদিন) ইবন-আয়্যুব।

আল-মালিক আল-নাসির আল-সুলতান সালাহ্-আল-দীন ইউসুফের জন্ম ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে, টাইগ্রিস নদীর তীরে তাকরিতে। তাঁর পিতামাতা ছিলেন কুর্দিশ। সালাহ-আল-দীনের জন্মের পরের বছরই তাঁর পিতা আয়্যুবকে বা'লাবাক্কের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন আতাবেগ জাঙ্গি। সালাহ-আল-দীনের বাল্য, কৈশোর ও প্রাথমিক শিক্ষার দিনগুলি কেটেছে সিরিয়ায়, কিন্তু সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। প্রথমদিকে ঈশ্বরতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি। এই সময় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও[৪২] তিনি তাঁর কাকা শিরকুহের সঙ্গে মিশর যেতে বাধ্য হন। আর এই মিশরেই তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা হয়। মিশরে এসে তাঁর জীবনের প্রধান দুই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় মিশরে শী'আহ্ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে সুন্নিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মযুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কদের প্রতিহত করা। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিশরের উজির হওয়ার পর ১১৭১ খ্রিস্টাব্দেই তিনি শুক্রবারের নামায থেকে ফাতিমিয় খলিফার নাম বাদ দিয়ে দেন। তাঁর পরিবর্তে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুস্তাযির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়

একেবারেই বিনা প্রতিবাদে। আলোড়ন এতই কম হয়েছিল যে বলা হয়, এই নিয়ে "দুটি ছাগলেও গুঁতোগুঁতি হয়নি।"[৪৩]

সালাহ-আল-দীনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আরো অনেক বড়মাপের। আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে মুসলিম সিরিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এখানকার সম্রাট ছিলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নূর-আল-দীন। ক্রমেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে ওঠে তিক্ত। ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি চুক্তির পর কুরুন (শৃঙ্গ) হামার যুদ্ধে জয়লাভ করে সিরিয়ার অধীশ্বরও হয়ে যান তিনি। সেইসময় সিরিয়ার শাসনভার ছিল নূরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ১১ বর্ষীয় ইসমাঈলের হাতে। ইতিমধ্যে সালাহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুরান শাহ আল-ইয়ামান দখল করেন। আল-হিজাজ সহ অন্যান্য ধর্মীয় শহরগুলি বিনা প্রতিবাদেই মিশরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সালাহ-আল-দীনেরই অনুরোধে আব্বাসীয় খলিফা তাঁকে মিশর, আল-মাগরিব, নুবিয়া, পশ্চিম আরব, প্যালেস্টাইন এবং মধ্য সিরিয়ার শাসকের সম্মান দেন। এইসব ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন না স্বয়ং খলিফাও। কিন্তু সালাহকে তোষামোদের খাতিরে এই উপঢৌকন দিতেও তিনি পিছপা হননি। এদিকে খলিফার এক্তিয়ার-বহির্ভূত এইসব ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব পেয়ে সালাহ-আল-দীনও নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করতে শুরু করেন। তাঁরই আত্মীয়, ঐতিহাসিক আবু-আল-ফিদার[৪৪] কথায়, তিনি নিজেকেই মনে করতেন একমাত্র সুলতান। দশ বছর পরে, পার্বত্য মেসোপটেমিয়ার সীমানাকে কমিয়ে আনেন সালাহ-আল-দীন। সেখানকার বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদের আনুগত্যও আদায় করে নেন। নূর-আল-দীনের স্বপ্ন ছিল ফ্র্যাঙ্কদের ঘিরে ধরে মুসলিম সিরিয়া-মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের যাঁতাকলে পিশে ফেলা। নিজের জীবদ্দশায় যে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়নি। কিন্তু তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি সালাহ-আল-দীনের শাসনকালে তা পূর্ণ হয়।

উত্তর সিরিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যখন ব্যস্ত ছিলেন সালাহ-আল-দীন, তখন তাঁরই মুসলিম শত্রুদের প্ররোচনায় দুবার তাঁর জীবননাশের চেষ্টা হয়। তবে দুবারই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর আগে হত্যার চক্রান্ত হয়েছিল নূর-আল-দীন এবং ফাতিমিয় খলিফা আল-আমিরের বিরুদ্ধে (১১৩০)। ফাতিমিয় খলিফার ক্ষেত্রে চক্রান্তকারীরা সফল হয়েছিল। সেইসময় সিরিয়ায় এই চক্রান্তকারীরা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। তাদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের হাত থেকে রেহাই পাননি খ্রিস্টান শাসকরাও। এদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপোলির দ্বিতীয় রেমন্ড (১১৫২) এবং জেরুজালেমের নবনির্বাচিত রাজা মন্টফেরাটের কনরাড[৪৫] (১১৯২)। ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রশীদ-আল-দিন সিনানের সদরদপ্তর মাসিয়াদ অবরোধ করেন। সিনান পরিচিত ছিলেন 'পর্বতের প্রবীণ ব্যক্তি' হিসাবে। এহেন প্রবীণ ব্যক্তিকেও মাথা নোয়াতে হয় সালাহ-আল-দীনের সামনে, ভবিষ্যতে তাঁর কোন আক্রমণের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করবেন না—এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মাসিয়াদের উপর থেকে অবরোধ তুলে নেন সালাহ।

সিনান তাঁর অধীনস্থ অঞ্চলকে পারস্যের দখলমুক্ত করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব দক্ষ গুপ্তচরবাহিনী এবং চিঠি আদান-প্রদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রা ছিল। এদেরই সাহায্যে তিনি অনেক গোপন খবর পেয়ে যেতেন। যদিও সর্বসাধারণের চোখে তাঁর এই দক্ষতাকে অলৌকিক ক্ষমতা বলেই মনে হত। সিনানের আত্মঘাতী বাহিনী ফিদাই-এর সদস্যরা বিষাক্ত ছুরি তৈরি ও তার ব্যবহারে দক্ষ ছিল।[৪৬] সিনানের ক্ষমতার উৎসই ছিল তাঁর সমর্থকদের নিঃশর্ত আনুগত্য। এই আনুগত্যের প্রদর্শনে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করতেন। শোনা যায়, ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে জেরুসালেমের খেতাবি রাজা শ্যাম্পেনের হেনরির সামনে তিনি এইরকমই এক অন্ধ আনুগত্যের প্রমাণ দেন। হেনরি এসেছিলেন তাঁর অতিথি হয়ে। তাঁকে খুশি করতে সিনান তাঁর প্রাসাদের মিনারে বসে থাকা দুজন অনুচরকে ইঙ্গিত করেন। সিনানের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তাঁর অনুগত দুই অনুচর মিনারের উপর থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেন।[৪৭]

● হিট্টিন

গুপ্তহত্যার চক্রান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার পর সালাহ আরো নিশ্চিন্তমনে ফ্র্যাঙ্কদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে শুরু করেন। একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকেন তিনি। ছদিনের অবরোধের পরে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তিনি টিবেরিয়াস দখল করেন। এরপরেই শুরু হয় হিট্টিনের (হাট্টিন) যুদ্ধ (জুলাই ৩-৪)। শুক্রবার দিনেই তিনি হিট্টিনের যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তবে তাঁর পৌষমাস ফ্র্যাঙ্ক সেনাবাহিনীর পক্ষে সর্বনাশ প্রমাণিত হয়। আনুমানিক ২০ হাজার ফ্র্যাঙ্ক সেনার অধিকাংশই বিপক্ষের হাতে বন্দি হয়। তাপ ও তৃষ্ণার জ্বালায় মৃত সেনারা অবশ্য এমনিই রক্ষা পায়। জেরুসালেমের রাজা গাই দ্য লুসিগনান সহ বহু বিশিষ্ট নেতাই সালাহের হাতে বন্দি হন। সালাহ-আল-দীন যেমন প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন, তেমনই ছিলেন বিনয়ী। তাই ভগ্নহৃদয় জেরুসালেমরাজকে তিনি প্রাপ্য সম্মান দেন। কিন্তু উদ্ধত ও দুঃসাহসী শ্যাটিলনের রেজিন্যাল্ডের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। লাতিন নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া রেজিন্যাল্ড আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরব মুলুকের শান্তিও নষ্ট করেছিলেন। আল-কারাকের শাসনভারপ্রাপ্ত এই শাসক বহুবার মরুযাত্রীদলের উপর আক্রমণ করে লুঠপাট চালিয়েছেন। মুসলিমদের সঙ্গে তাদের চুক্তিবিরোধী ছিল এই কাজ। আল-হিজাজের তীর্থযাত্রীরাও তাঁর কোপের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আয়লাহে সেনা পাঠিয়ে তিনি তীর্থযাত্রীদের শান্তিভঙ্গ করতেন। রেজিন্যাল্ডের মত শান্তিভঙ্গকারী এবং বিধর্মীকে স্বহস্তে হত্যা করার শপথ নেন সালাহ। হিট্টিনের যুদ্ধের শেষে সেই সুযোগ তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসে। আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী, আতিথ্যের প্রথম শর্তই হল অতিথিকে জলপান করানো। বন্দি রেজিন্যাল্ড সেই ঐতিহ্যের সুযোগ নিয়ে সালাহের বন্ধুত্ব পাওয়ার আশায় তাঁর কাছে জল চান। কিন্তু শত্রুকে অতিথির মর্যাদা দিতে নারাজ সালাহ জল দেননি।[৪৮] তিনি চুক্তিভঙ্গের দায়ে হত্যা করেন রেজিন্যাল্ডকে। টেম্পলার ও হসপিটালার

সেনাদেরও প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়।[৪৯]

হিট্টিনের পরাজয় ফ্র্যাঙ্কদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বড়রকম আঘাত করে। এক সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর জেরুসালেম আত্মসমর্পণ করে (২ অক্টোবর ১১৮৭)। আকসা মসজিদে বন্ধ হয়ে যায় খ্রিস্টানদের ঘন্টাধ্বনি। জেরুসালেমের আকাশ বাতাস মুখরিত হয় নামাযের আযানে। খ্রিস্টান আধিপত্যের প্রতীক প্রাসাদচূড়ার (ডোম অব দি রক) সোনার ক্রুশ ভেঙে ফেলে সালাহের সেনারা।

লাতিন সাম্রাজ্যের রাজধানী দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক শাসিত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ শহরই সালাহ্-আল-দীনের করায়ত্ত হয়। বাকি শহরগুলি দখলের পিছনে ছিল সুপরিকল্পিত প্রচারব্যবস্থা। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না কারুর কাছেই, কারণ হিট্টিনের যুদ্ধে তাদের শক্তিশালী যোদ্ধাদের অধিকাংশই হয় বন্দি হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে। বিজয়গৌরবে উদ্দীপ্ত সালাহ-আল-দীন এরপর উত্তর এবং দক্ষিণে অগ্রসর হন। উত্তরে আল-লাযিকিয়াহ (লাওডিসিয়া, লাটাকিয়া), জাবালাহ্ এবং শিহয়াণ দখল করেন। দক্ষিণের আল-কারাক এবং আল-শবাক তাঁর করায়ত্ত হয়। মনে রাখতে হবে, শাকিফ আরনান[৫০], কাওকাব[৫১] এবং সাফাদ তখনও সালাহের অধিকারে আসেনি। ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই তিন শহর ছাড়াও আরও কয়েকটি অনধিকৃত অঞ্চল আয়ত্ত করেন তিনি। অ্যান্টিয়োক, ত্রিপোলি এবং টায়ার ও কয়েকটি ছোট দুর্গ ও শহরের শাসনভার ছাড়া মুসলিম ভূখণ্ডে ফ্র্যাঙ্কদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

● আক্কা অবরোধ

পবিত্র শহর জেরুসালেমের পতন ইউরোপকে আবার সংঘর্ষের পথে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ ভুলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী তিন শাসক—জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস। এইভাবেই শুরু হয় তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ (১১৮৯-৯২)। সংখ্যার দিক থেকে এই যুদ্ধই ছিল বৃহত্তম। যুদ্ধের দুই নায়ক সালাহ্-আল-দীন এবং প্রথম রিচার্ডকে নিয়ে বীরগাথা এবং বীরপূজা ছিল অপরিসীম। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ তাই আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে, তা সে প্রাচ্যেই হোক বা প্রতীচ্যে।

আরব ভূখণ্ডের দিকে স্থলপথে যাত্রা শুরু করেন ফ্রেডারিক। কিন্তু সিসিলির একটি নদী পার হতে গিয়ে তিনি ডুবে যান। তাঁর সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ফিরে আসে দেশে। এদিকে রিচার্ড তাঁর যাত্রাপথে প্রথমেই সাইপ্রাস দখল করেন। মূল ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত আরবদের শেষ আশ্রয় হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সাইপ্রাসকে।

ইতিমধ্যে, আরবের লাতিনরা আক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়াস শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়। আক্কা দখল করতে তারা প্রায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে, নিজেদের সেনা ছাড়াও তাদের বাহিনীতে ছিল ফ্রেডারিকের কিছু সেনা এবং ফ্রান্সের রাজার বাহিনী। লাতিনরা যে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ এই যুদ্ধের নেতা রাজা গাই। সালাহ্-আল-দীনের হাতে বন্দি হওয়ার পর তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন একটাই শর্তে—সালাহ্র বিরুদ্ধে জীবনে অস্ত্র হাতে নেবেন না তিনি। কিন্তু সেই শর্ত লঙ্ঘন করেই তিনি আক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যান। লাতিনদের আক্কা আক্রমণের পরদিনই সালাহ্ সেখানে গিয়ে ছাউনি ফেলেন শত্রুশিবিরের সামনেই, যুদ্ধ হয় জল এবং স্থলে। এরই মধ্যে রিচার্ডের আগমনে উল্লসিত হয়ে ওঠে লাতিন বাহিনী। আক্কা অবরোধের সময় অনেক অবিশ্বাস্য ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে যার বর্ণনা সমকালীন আরব ও লাতিন লেখকদের রচনায় আছে। শোনা যায় দামাস্কাসের এক ব্যক্তি বিস্ফোরক তৈরি করে লাতিনদের তিনটি দুর্গ উড়িয়ে দেন। সালাহ্-আল-দীন তাঁকে এজন্য পুরস্কার দিতে চাইলে তিনি তার বদলে আল্লাহ্‌র কৃপা প্রার্থনা করেন।[২১] গল্প আছে রিচার্ড সম্পর্কেও। আক্কায় আসার পথে সিসিলি থেকে তিনি জাহাজ পাথরকুচি এনেছিলেন তিনি। এক বিশেষ অস্ত্রের সাহায্যে পাথর ছোঁড়া হত শত্রুদের দিকে। এমনই একটা পাথরের আঘাতে ১৩ জন আক্কাবাসী প্রাণ হারিয়েছিলেন। লাতিনদের বীরত্বের নিদর্শন হিসাবে এই অস্ত্র সালাহকে দেখানোও হয়েছিল। দুই শিবিরের দুই নেতা সালাহ্ এবং রিচার্ড পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করলেও পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়নি কারুরই। আক্কার অবরুদ্ধ সেনাদের সঙ্গে সালাহ্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল পায়রার মুখে পাঠানো চিঠি এবং জলপথে সাঁতরে যাওয়া গুপ্তচরেরা। একবার এমনই এক সাঁতারুর সলিল সমাধি হয়। তার মৃতদেহ ভেসে উঠলে আক্কাবাসীরা তার কাছ থেকে টাকা এবং সালাহ্র চিঠি পায়। সালাহ্র জীবনীকারের[২২] কথায় "এমন কোন মানুষের কথা আগে শুনিনি যে তার জীবদ্দশায় পাওয়া দায়িত্ব মৃত্যুর পর পালন করেছে।" আক্কার উপর প্রতিটি সফল আক্রমণের জন্যই দরাজ হাতে পুরস্কার দিয়েছিলেন রিচার্ড। কিন্তু বিনাযুদ্ধে হাল ছেড়ে দেয়নি আক্কার মানুষও : সেনা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মহিলারাও এগিয়ে আসেন নগর বাঁচাতে। তাই অবরোধও চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। মধ্যযুগের যুদ্ধের ইতিহাসে আক্কার অবরোধকাল ছিল দীর্ঘতম (২৭ আগস্ট ১১৮৯—১২ জুলাই ১১৯১)। ফ্র্যাঙ্কদের ছিল নৌবাহিনী এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সুবিধা। মুসলিমদের ছিল একজন ব্যক্তির নেতৃত্বেই যুদ্ধ করার সুবিধা। সালাহ্ চাইলেও খলিফা তাঁকে কোনভাবেই সাহায্য করেননি। শেষপর্যন্ত আক্কার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আত্মসমর্পণের শর্তের মধ্যে ছিল—মুক্তিপণের বিনিময়ে আক্কার বন্দি সেনাদের মুক্তি দেওয়া এবং পবিত্র ক্রুসের[২৩] পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। একমাস পরেও মুক্তিপণ না পাওয়ায় রিচার্ড দুহাজার সাতশো বন্দিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[২৪] বন্দিদের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা কিন্তু সালাহের স্বভাবের একেবারেই বিপরীত। জেরুসালেম

দখলের সময় তিনিও বন্দিদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ নির্দিষ্ট করেন। বহু দরিদ্র মানুষ এই মুক্তিপণের টাকা দিতে পারেনি। সালাহ তাঁর ভাই এবং গির্জার বিশপের অনুরোধে সহস্রাধিক বন্দিকে মুক্তি দেন। তারপর স্বেচ্ছায়, নারী ও শিশুসহ বাকি বন্দিদের মুক্তি দেন বিনা পণে।

নেতৃত্বের দিক থেকে আক্কা এবার জেরুসালেমের স্থলাভিষিক্ত হল।[৫৬] অতএব আরব-মুলুকে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য এবার আলোচনা শুরু হল। কল্পনাবিলাসী ও আবেগপ্রবণ রিচার্ড তাঁর বোনের সঙ্গে সালাহর ভাই আল-মালিক আল-আদিলের বিবাহের প্রস্তাব দেন। সেইসঙ্গে উপঢৌকন হিসাবে বরকনেকে জেরুসালেমের শাসনভার দেওয়ার আর্জিও পেশ করেন। মুসলিমদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের বিবাদ মেটানোই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।[৫৭] ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৯মে, ইস্টারের পূর্ববর্তী রবিবারে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আল-আদিলের পুত্র আল-মালিক আল-কামিলকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দেরই ২ নভেম্বর দুপক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উপকূলবর্তী অঞ্চল লাতিনদের এবং অভ্যন্তরীণ অঞ্চল মুসলিমদের অধীনস্থ হয়। দুপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়, জেরুসালেমের তীর্থযাত্রীদের কোনভাবেই হেনস্থা করা হবে না। সালাহ কিন্তু বেশিদিন এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখতে পাননি। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি দামাস্কাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১২ দিন পরে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। উমাইয়া মসজিদের কাছে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আজও সিরিয়ার রাজধানীর এক দর্শনীয় স্থান।

সালাহ-আল-দীনকে নিছক একজন যোদ্ধা অথবা সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রচারক বললে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হবে না। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার এবং জনকল্যাণেও তিনি সমান উদ্যোগী ছিলেন। জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা, আল্লাহ্-সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রসারে উৎসাহদান ছাড়াও তিনি বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদ তৈরি করেন। তৈরি করেন বাঁধ এবং জলনিকাশি খাল। তাঁর আমলের স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল কায়রোর একটি নগরদুর্গ।[৫৮] ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে শহরের প্রাচীরের সঙ্গেই তিনি এই দুর্গের কাজ শুরু করেন। দুর্গ তৈরি হয় ছোট আকারের পিরামিডের পাথর দিয়ে। গুণীজনকে সম্মান করা এবং তাঁদের উপযুক্ত পদমর্যাদা দিতে জানতেন সালাহ। তাঁর মন্ত্রিসভার দুই উচ্চশিক্ষিত উজির আল-কাযী আল-ফযিল[৫৯] এবং ইমাদ-আল-দীন আল-কাতিব আল-ইসফাহানি[৬০] তাঁদের অসাধারণ বাগ্মিতাও লেখনশৈলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সালাহর জীবনীকার বাহা-আল-দিন ইবন- শাদ্দাদ[৬১] ছিলেন তাঁর শেষ জীবনের ব্যক্তিগত সচিব। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বহু দেশ আক্রমণ করেছেন, সিংহাসনচ্যুত করেছেন বহু শাসককে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের উপর কোন আকর্ষণ ছিল না সালাহর। ফাতিমিয় খলিফাদের ক্ষমতাচ্যুত করে তাদের সমস্ত সম্পদ নিজের সেনাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন তিনি। এর মধ্যে ছিল ১৭ দিরহাম ওজনের এক মহামূল্য নীলকান্তমণি। ইবন-আল-আসীর[৬২] নিজে এটি ওজন করেন। নূর-আল-দীনের সম্পদও তিনি নিজে ভোগ করেননি। নূরের বংশধরকেই তা দিয়ে দেন। মৃত্যুর সময় সালাহর কাছে ছিল মাত্র ৪৭ দিরহাম এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা।[৬৩] জনপ্রিয়তার বিচারে আরবে এখনও সালাহ-আল-

দীনের নাম হারুন-আল-রশীদ এবং বেবার্সের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপেও। ইংরেজ কবির কল্পনায় এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের[৬৪] লেখনীতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে সালাহ্-আল-দীনের অসামান্য বীরত্ব ও বিনয়ের দৃষ্টান্ত।

● গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের যুগ : আয়্যুবিয়

টাইগ্রিস থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত সালাহ-আল-দীনের বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা ভাগ করে নেন। কিন্তু বংশপরিচয়ে উত্তরাধিকারী হলেও এরা কেউই সালাহ্র গুণ অথবা দক্ষতার অধিকারী ছিলেন না। প্রথমে দামাস্কাসে সালাহর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আল-মালিক আল-আফযল (শ্রেষ্ঠ সুলতান)। অপর দুই পুত্র আল-আযীয (শক্তিশালী) কায়রোর এবং আল-যাহির (বিজয়ী) আলেপ্পোর শাসনভার গ্রহণ করেন। সালাহর ভাই এবং সহযোগী আল-আদিল পান আল-কারাক এবং আল-শবাকের শাসনভার। কিন্তু সালাহর পুত্রদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না আর তারই সুযোগ নিয়ে আল-আদিল ১১৯৬ থেকে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিশর এবং সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল নিজের করায়ত্ত করেন। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে আল-আদিল তাঁর এক পুত্রকে মেসোপটেমিয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের শান্তি আলোচনার প্রধান মাধ্যমই ছিলেন আল-আদিল। লাতিন ঐতিহাসিকরা তাঁকে 'সাফাদিন'[৬৫] বলে উল্লেখ করেছেন। আজীবন তিনি লাতিনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ছোটখাট সংঘর্ষ হলেও সাধারণভাবে তাঁর নীতি ছিল ফ্রাঙ্কদের উপনিবেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা। তাঁরই অনুমতিতে ভেনিশিয়রা আলেকজান্দ্রিয়ায় সরাইখানা-সহ[৬৬] বিশেষ বাজার তৈরি করে। আলেকজান্দ্রিয়াতেই বাণিজ্যিক দূতাবাস স্থাপন করে পিসা। দামাস্কাসের আল-আদিলিয়াহ বিদ্যালয় আজও তার নামের স্বাক্ষর বহন করছে। এই বিদ্যালয় আংশিকভাবে তাঁরই তৈরি।[৬৭]

১২১৮ খ্রিস্টাব্দে আল-আদিলের মৃত্যুর পর তাঁরই বংশোদ্ভূত আয়্যুবিয় শাসকরা মিশর, দামাস্কাস এবং মেসোপটেমিয়া শাসন করে। আয়্যুবিয় পরিবারের অন্যান্য শাখার শাসকরা হিমস, হামাহ এবং আল-ইয়ামান শাসন করে। মিশরের আয়্যুবিয়রাই ছিল এই পরিবারের প্রধান। সিরিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে তাদেরই আত্মীয় দামাস্কাসের শাসক আয়্যুবিয়দের সঙ্গে তাঁদের নিত্য সংঘর্ষ চলত। উত্তর সিরিয়ার আয়্যুবিয়রা ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে হুলাগুর হাতে পরাস্ত হয়। কেবল হামাহতেই আয়্যুবিয়রা শাসন করতে থাকে যদিও তাদের গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। মামলুকরা এখানে রাজত্ব করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঐতিহাসিক সুলতান, সালাহ-আল-দীনের ভাইয়ের বংশধর আবু-আল-ফিদা (১৩৩২)।

● ফ্র্যাঙ্ক শিবির

সালাহ-আল-দীনের পরবর্তী অধ্যায়ে ক্রমবর্ধমান পারিবারিক কলহের ফলে ইসলাম তার

আগ্রাসী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, বেইরুট, সাফাদ, টিবেরিয়াস, আসকালান এমন কী জেরুসালেমের মত সালাহ-র কষ্টার্জিত ভূখন্ডগুলি একে একে ফ্র্যাঙ্কদের দখলে চলে যায়। কিন্তু মুসলিমদের এই অন্তঃকলহের সুবিধা নিতে পারেনি ফ্র্যাঙ্করা। তাদের অবস্থাও ছিল ততোধিক শোচনীয়। তাদের উপনিবেশগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউরোপ থেকে আরো সেনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ঠিক সময়ে তাদের মদত পাওয়া যাচ্ছিল না। লাতিন সেনাদের মধ্যেও শুরু হয়ে গিয়েছিল কলহ। জেনোয়া ও ভেনিশিয় সেনাদের মধ্যে কলহ, টেম্পলার ও হসপিটালার গোষ্ঠীর নাইটদের মধ্যে ঈর্ষা, নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং সর্বোপরি জেরুসালেমের রাজার নিছক খেতাবি পদ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা—এই সবই ছিল তখন ফ্র্যাঙ্ক শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইসব কলহের সময় প্রায়ই একপক্ষ আরেক পক্ষকে বাগে আনতে মুসলিমদের সাহায্য নিত।

● ক্ষমতার কেন্দ্রে মিশর

সালাহ আল-দীনের মৃত্যুর পর ফ্রাঙ্ক এবং মুসলিমদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয় মিশরে, আল-কামিলের শাসনকালে (১২১৮-৩৮)। আল-আদিলের পুত্র এবং মিশরে তার উত্তরাধিকারী ছিলেন সেই সময়কার বিশিষ্ট আয়্যুবিয় নেতা। তিনি জানতেন, সিরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হলে তাঁকে প্রথমেই ধর্মযোদ্ধাদের হটাতে হবে। তাঁর পিতার মৃত্যুর কিছুদিন আগে ধর্মযোদ্ধারা দিময়াতের (দামিয়েত্তা) কাছে তাঁবু ফেলে। তার পরের বছরই তিনি দিময়াত শহর দখল করেন। মিশরের এই আক্রমণের ফলে ইতালির উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে, ইসলামি ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল সিরিয়া থেকে মিশরে স্থানান্তরিত হয়েছে। অতএব মিশর জয় করতে পারলেই একমাত্র তারা লোহিত সাগরে পৌঁছে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের লাভজনক বাজার দখল করতে পারবে। প্রায় দু'বছরের সংঘর্ষের শেষে (নভেম্বর ১২১৯—আগস্ট ১২২১) আল-কামিল দিময়াতের দখল ছেড়ে দিতে ফ্র্যাঙ্কদের বাধ্য করেন। বিনিময়ে তিনি তাদের অবাধ যাতায়াতের সুবিধা দেন।[৬৮]

পিতার মত আল-কামিলও সেচ ও কৃষিব্যবস্থার উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেন। খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি তিনি এতটাই সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, খ্রিস্টানরা আজও তাঁকে সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী সম্রাট বলে গণ্য করে। খ্রিস্টান রাজারা তাঁকে এতই সম্মান করত যে আল-কামিল ক্ষমতায় আসার এক বছর পর আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস তাঁর দরবারে এসে তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। সুফি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কবি উমার-ইবন-আল-ফরীদের (১১৮১-১২৩৫) সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবি কিন্তু সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেননি। আল-কামিলের সঙ্গে রিচার্ডের বন্ধুত্ব ছিল। এবার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

স্থাপন করেন তিনি। এই ফ্রেডারিক ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এবং আল-কামিলের মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি আরব ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জেরুসালেম এবং আক্কা-জেরুসালেম সংযোগরক্ষাকারী ভূখন্ড ফ্রেডারিকের হাতে চলে আসে। পরিবর্তে, আয়্যুবিয়[৬৯] সহ অন্যান্য শত্রুদের মোকাবিলায় আল-কামিলকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন ফ্রেডারিক। অটোমান যুগের আগে খ্রিস্টান এবং মুসলিম শাসকের মধ্যে এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চুক্তি। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেরুসালেম ছিল ফ্র্যাঙ্কদের শাসনাধীন। সেই বছরই আল-কামিলের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী আল-মালিক আল-সালিহ নাজম-আল-দীন আয়্যুব (১২৪০-৪৯) খওয়ারিজম তুর্কিদের এক জঙ্গিবাহিনীর সাহায্যে জেরুসালেমকে মুসলিমদের শাসনে ফিরিয়ে আনেন।[৭০] এই জঙ্গিদের মধ্য-এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন চিঙ্গিজ খান।

● সেন্ট লুই

আল-সালিহ যখন মৃত্যুশয্যায় তখনই ফ্রান্সের রাজা নবম লুই তাঁর অশ্বারোহীবাহিনী নিয়ে দিময়াত আক্রমণ করেন। সম্রাট মৃত্যুসজ্জায়, অতএব দিময়াত একরকম বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে (৬ জুন, ১২৪৯)। কিন্তু কায়রো অভিমুখে যাত্রা করতেই চিত্রটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। কায়রোর চতুর্দিক ছিল খালে ভরা। নীলনদে তখন ভরা জোয়ার ফলে খালগুলিতে প্রায় বানভাসির অবস্থা। নৌকা চালানোও দুঃসাধ্য। এদিকে ফরাসি সেনাবাহিনীতে তখন হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে মহামারী। সবমিলিয়ে নবম লুইয়ের বাহিনী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় (এপ্রিল ১২৫০)। সপার্ষদ বন্দি হন রাজা লুই।[৭১]

● মামলুকদের উত্থান

ইতিমধ্যে, ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আল-সালিহের মৃত্যু হয়। দেশের এই চরম বিপদের সময় অসীম সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তাঁর স্ত্রী শাজার-আল-দুর (মুক্তাবৃক্ষ)। আল-সালিহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তুরান শাহ মেসোপটেমিয়া[৭২] থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনমাস ধরে তিনি এই মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। কিন্তু আল-সালিহের ক্রীতদাসরা (মামলুক) তাঁর পুত্রকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তাঁরই বিমাতার চক্রান্তে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয় তুরান শাহকে। স্বঘোষিত[৭৩] মুসলিম সম্রাজ্ঞী হন শাজার। দামাস্কাসের আয়্যুবিয় পরিবারের ছ'বছরের বালক আল-আশরফ মুসাকে শুধু নামকাওয়াস্তে যৌথভাবে সুলতান করা হয়। এরসঙ্গে আবার লোকদেখানো রাজা করা হয় মামলুক আইবককে। এই মামলুক আইবকই ছিলেন মামলুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজনীতির এই পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে একমাসের বন্দিদশার পর রাজা লুই এবং তাঁর সঙ্গীদের মুক্তি দেওয়া হয়। অবশ্যই বিনাশর্তে নয়। মোটা টাকা মুক্তিপণ এবং দিময়াতের

দখল আদায় করে নেওয়া হয়।[৭৪] ১২৫০ থেকে ১২৫৪ রাজা লুই সিরিয়ায় ছিলেন। এইসময় তিনি আক্কা, হেফা, সিজারিয়া, সিডন প্রভৃতি বন্দরের চারপাশে দুর্গ তৈরি করে তাকে আরো শক্তিশালী করেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়াতে তিনি আরেকটি ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তবে এখানেও তিনি সাফল্য পাননি। সেখানেই তিনি মত্যুবরণ করেন। ধর্মযুদ্ধের নেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে খাঁটি ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। বলা হয়, তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল এক প্রার্থনা। ঈশ্বরের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

● শেষ আঘাত : বেবার্স

মামলুক রাজবংশের চতুর্থ সম্রাট আল-মালিক আল-যাহির বেবার্স (১২৬০-৭৭) এবং তাঁর পরবর্তী শাসকরা ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানে। বেবার্স ক্ষমতায় আসার আগে তাঁরই পূর্বসূরি কুতুজের সেনাপ্রধান ছিলেন। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর আয়ন জালুতে তিনি তাতারদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। তখনই তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে তাঁর শত্রুপক্ষের নেতা ছিলেন মঙ্গোলিয় কিতবুঘা। তাঁর সেনাবাহিনী গাজা[৭৫] হয়ে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বেবার্সের হাতে তারা পরাজিত হয়। আরব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গোলিয়রা কায়রো দখল করতে পারলে মিশরের অমূল্য সম্পদ ও বইপত্র তাদের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারত। সেইসঙ্গে মিশর ও সিরিয়াকে মঙ্গোলিয় আক্রমণের কবল থেকে বাঁচিয়ে দুটি দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেন বেবার্স। প্রতিবেশী দুই দেশের এই ঐক্য মামলুক শাসনের দীর্ঘ ২৫০ বছর ধরে অটুট ছিল। কিন্তু অটোমানদের আগমনে তা ভেঙে যায়।

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে সালাহ-আল-দীনের মত স্মরণীয় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বেবার্স। তাই খ্রিস্টানশাসিত শহরগুলির সঙ্গে পারস্যের হুলাগিয়-ইল-খানদের ঘনিষ্ঠতায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ফলস্বরূপ এইসব শহরের উপর তাঁর আক্রমণ আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ১২৬৩ থেকে ১২৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রায় প্রতিবছরই এদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। তাসের ঘরের মত লাতিন অধিকৃত শহরগুলি ভেঙে পড়ে। ফ্র্যাঙ্কদের দখলে থাকা সিরিয়ার উপরই সবচেয়ে জোরালো আঘাত হানেন বেবার্স। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই লাতিনদের প্রতিরোধ ছিল দুর্বল। এতটাই দুর্বল যে, এই পর্বে উল্লেখ করার মত কোন যুদ্ধই হয়নি।

১২৬৩ খ্রিস্টাব্দে আয়্যুবিয়দের হাত থেকে আল-কারাক দখল করেন বেবার্স। ধ্বংস করে দেন নাজারেথের (আল-নাসিরাহ) পবিত্র গির্জা। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে অবরোধ করেন সিজারিয়া। ৪০ দিনের অবরোধের পর সিজারিয়ার শাসক হসপিটালার গোষ্ঠীর আরসাফ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই সাফাদের টেম্পলার সেনারা আত্মসমর্পণ করেন। তাদের শর্ত ছিল, টেম্পলার গোষ্ঠীর দু'হাজার নাইটকে প্রাণে মারা হবে না। বেবার্স আনুষ্ঠানিকভাবে এই আর্জি মঞ্জুর করলেও কার্যত ঠিক এর উল্টো নির্দেশ দেন। সুলতানের

সেই নির্দেশ মোতাবেক সব নাইটকেই নিকটবর্তী এক পাহাড় চূড়ায় নিয়ে গিয়ে কোতল করা হয়।[১৬] বেবার্সের সাফল্য তাঁকে "তাঁর যুগের আলেকজান্দার এবং বিশ্বাসের ভিত"-এর মত উপাধি এনে দিয়েছিল। এই বীর যোদ্ধার সাফল্যের কথা আজও সাফাদের বিভিন্ন প্রাচীরে লেখা আছে। জর্ডনের উপর যে সেতু তিনি তৈরি করেছিলেন, তাতে তাঁর নাম খোদাই করা আছে। সেইসঙ্গে আছে সেতুর দুধারে দুটি সিংহমূর্তি। ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাফ্‌ফার শাকিফ আরনুন বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। এমন কী যে অ্যান্টিয়োক তাতারদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে আসছিল, তারাও বেবার্সের কাছে আত্মসমর্পণ করে (২১ মে)। অ্যান্টিয়োক-সহ এই অঞ্চলের ১৬ হাজার সেনাকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় এক লক্ষ সেনাকে বন্দি করা হয় বলে কথিত আছে। এদের মধ্যে অনেককে আবার মিশরের বাজারে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হয়। শহরগুলি থেকে লুঠপাট করে টাকাপয়সা বিলিয়ে দেওয়া হয় অবাধে। শোনা যায়, একটি শিশু ১২ দিরহাম কুড়িয়ে পায়; একটি ছোট্ট মেয়ের হাতে আসে পাঁচ দিরহাম। অ্যান্টিয়োকের দুর্গ, বিশ্ববিখ্যাত গির্জাগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় নির্মমভাবে। এই ক্ষতি আজও অপূরণীয়ই থেকে গেছে।[১৭] অ্যান্টিয়োকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের ছোটখাটো লাতিন রাজ্যগুলিও ভেঙে পড়ে। ১২৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত বেবার্সের অবরোধ থাকার পর আত্মসমর্পণ করে হিসন-আল-আকরাদ। হসপিটালারদের এই দুর্গ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুর্গ। হসপিটালারদের সহযোগী আসাসিনদের দখলে থাকা মাসিয়াদ, আল-কাদমাস, আল-কাহাফ এবং আল-খাওয়াবির দুর্গও বেদখল হয়ে যায়। এইভাবে যবনিকা পড়ে ত্রাস ও ষড়যন্ত্রে ভরা দীর্ঘ এক শাসনকালের। এরপর অ্যান্টারটাসের টেম্পলার এবং আল-মারকাবের হসপিটালারদের কাছে শান্তিচুক্তি করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

● কালাউন

প্রায় বেবার্সের মতই কর্মঠ এবং ধর্মযোদ্ধাদের কট্টর বিরোধী ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী কালাউন (১২৭৯-৯০)। অ্যান্টারটাসের টেম্পলারদের সঙ্গে যে শান্তিচুক্তি বেবার্স করেছিলেন, ১২৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তার মেয়াদ আরো ১০ বছর ১০ মাস বাড়ানো হয়। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই বেইরুটের[১৮] শাসক টায়ারের রাজকুমারীর সঙ্গেও শান্তিচুক্তি হয়। রণাঙ্গনে তাঁর অসামান্য সাফল্যই কালাউনকে আল-মালিক আল-মানসুর (বিজয়ী সুলতান)-এর খেতাব এনে দেয়। ৩৮ দিনের অবরোধ শেষে ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে আত্মসমর্পণ করে আল-মারকাব।[১৯] টারটাসের কাছে এক পাহাড়-চূড়ায় এই শহরকে দেখে মনে হত যেন সমুদ্রকে উপেক্ষা করে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে থাকা এক অকুতোভয় ব্যক্তি। শহরের সীমানার প্রাচীরে কালাউনের সেনাবাহিনীর তীরের ফলা আজও বিদ্ধ হয়ে আছে। দ্বাদশবর্ষীয় আবু-আল-ফিদার সেটাই ছিল প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা; সেন্ট জনের যোদ্ধাদের কড়া নিরাপত্তার

মধ্যে নগরদুর্গ থেকে ত্রিপোলিতে নিয়ে আসা হয়। তখনও পর্যন্ত ত্রিপোলিই ছিল লাতিনদের বৃহত্তম কেন্দ্র। ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। ত্রিপোলির উপর কালাউন এমন ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালান যে, স্বয়ং আবু-আল-ফিদাও[৮১] বন্দরের বাইরে পড়ে থাকা স্তূপীকৃত মৃতদেহের দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে ওঠেন। ত্রিপোলির পর দক্ষিণের শক্ত ঘাঁটি আল-বাতরুন দখল করা হয়। কালাউন তাঁর পূর্বসূরি বেবার্সের মতই বিভিন্ন দুর্গের দেওয়ালে তাঁর বিজয়গাথা খোদাই করে রাখেন। আজও এই দেওয়াল লিখন অম্লান হয়ে আছে।

● আক্কা

লাতিনদের আধিপত্যের অবসান ঘটানোর পথে শেষ বাধা ছিল আক্কা। কিন্তু আক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়েই মৃত্যু হয় কালাউনের। পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন পুত্র আল-আশরাফ (১২৯০-৯৩)। একমাসের অবরোধ এবং প্রস্তর নিক্ষেপক ৯২টি যন্ত্রের ব্যবহারে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আক্কা দখল হয়। সাইপ্রাসের নৌপথে সাহায্য সত্ত্বেও লাতিনরা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। আল-আশরাফের পক্ষ থেকে টেম্পলার যোদ্ধাদের আশ্বাস দেওয়া হয়, পরাজয় স্বীকার করলে তাঁদের প্রাণে মারা হবে না। কিন্তু কার্যত ঠিক উল্টোটাই ঘটেছিল। শহরের সম্পদ লুঠ করে, দুর্গ ভেঙে এবং ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় আক্কাকে।[৮২]

আক্কার পতনের সঙ্গে সঙ্গে উপকূলের অবশিষ্ট শহরগুলিও বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে। ১৮ মে টায়ার, ১৪ জুলাই সিডন, ২১ জুলাই বেইরুট দখল হয়। ৩ আগস্ট অ্যান্টারটাস দখল করা হয় এবং টেম্পলার অধিকৃত জনশূন্য আথলিথ (ক্যাসট্রাম পেরেগ্রিনোরাম শ্যাটো পেলেরিন) দুর্গকে ধ্বংস করা হয় সেই মাসেরই মাঝামাঝি নাগাদ।[৮৩] এইভাবেই সমাপ্তি ঘটে সিরিয়ার ইতিহাসের এক নাটকীয় অধ্যায়ের।[৮৪] ❑





১২৫১ খ্রিস্টাব্দে আক্কার আরবী লিপিযুক্ত ফ্র্যাঙ্কিশ স্বর্ণমুদ্রা।

● টীকা ●

১. দেখুন 'মেমোরিয়াল হেনরি ব্যাসেট' (প্যারিস, ১৯২৮), খণ্ড-২; পৃঃ ২৭৯-৮৪, জি ওয়েট।

২. সিরিয়ার সালজুক বংশ (১০৯৪-১১১৭)।

১. তুতুশ-ইবন্-আলপ্ আরসলান (১০৯৪-৫)।

২. রিযওয়ান (১০৯৫-১১১৩) দুকাক (দামাস্কাসে ১০৯৫-১১০৪)

৩. আলপ্ আরসলান-আল-আখরাস (১১১৩-১৪) ৪. সুলতান শাহ্ (১১১৪-১৭)

৩. 'আমেরিকান হিসটরিক্যাল রিভিউ-তে আইনার জোরানসন দেখুন, খণ্ড-৩২ (১৯২৭), পৃঃ ২৪১-৬১. 'সিরিয়া এ ক্রাইনক্রায়ুসগ্ দেখুন. খণ্ড-৭ (১৯২৬). পৃঃ ২১১-৩৩. হিট্টির ইংরেজি সংস্করণ দেখুন পৃঃ ২৯৮।

৪. দেখুন ডব্লু বি স্টিভেনসন-এর 'দ্য ক্রুসেডারস্ ইন দ্য ইস্ট (কেম্ব্রিজ ১৯০৭), পৃঃ ১৭।

৫. 'গেস্টা ফ্রানকোরাম এট্ এলিওরাম হায়ারোসলিমিটানোরাম', সংস্করণ হাইনরিখ হেজেনমার (হাইডেলবার্গ, ১৮৯০), পৃঃ ১৯৭, টীকা-২, পৃঃ ২০৮, টীকা-৬২; ফ্যুলার 'হিস্টোরিয়া হায়ারোসলি খিতানা, সম্পাদনা হেজেনমার (হাইডেলবার্গ ১৯১৩), পৃঃ ১৯২, টীকা-১০। তুলনীয়, ইবন্-আল-কালানিসি, সম্পাদনা অ্যামেদ্রজ, পৃঃ ১৩৪; অনুবাদ এইচ এ আর গিব-এর 'দ্য দামাস্কাস ক্রনিকল অফ্ দ্য ক্রুসেড্স (লণ্ডন-১৯৩২), পৃঃ ৪২।

৬. ম্যাথু অফ্ এডেসা, 'ক্রনিক' সম্পাদনা ই ডুলাউরিয়ার (প্যারিস ১৮৫৮), পৃঃ ২১৮।

৭. গ্রিক অ্যান্টিওকিয়া থেকে আরবী ভাষায় হয়েছে আন্তাকিয়াহ্, আর তার থেকে শেষপর্যন্ত অ্যান্টিওকাস। এর প্রতিষ্ঠাতার পিতার নাম সেলুকাস ১ (৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), এখানেই প্রথম যীশুর শিষ্যদের খ্রিস্টান বলে অভিহিত করা হয় (অ্যাক্টস - ২ — ২৬), তাই এই শহরের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

৮. 'ইবন্-আল-আসীর'-এ 'বাগি সিয়ান' খণ্ড-১০, পৃঃ ১৮৭; আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-২ পৃঃ ২২০; ইবন খালদুন, খণ্ড ৫, পৃঃ ২০।

৯. তুলনীয় ইবন্-আল-আসীর-এর খণ্ড ১০, পৃঃ ১৮৮; আবু আল ফিদা খণ্ড-২, পৃঃ ২২১। এক তুর্কী দুঃসাহসী অভিযাত্রী যিনি ১০৯৬ সালে আল মাওসিলকে আরব বানু উকায়েল থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে সালজুক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১০. ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-১০, পৃঃ ১৯০, নকল করেছেন আবু-আল-ফিদা। তুলনীয় 'গেস্টা ফ্র্যাঙ্কোরাম' পৃঃ ৩৮৭; কামাল আল দিন, 'মুনতাখাবাত্ মিন তারিখ হালাব', রেকুইল ঃ 'ওরিয়েনটাক্স' খণ্ড-৩, পৃঃ ৫৮৬-৭।

১১. আক্ষরিকভাবে, 'কুর্দদের দুর্গ'। এখন বলা হয় কালআত-আল-হিস্ন; 'ক্রাক দেগ ক্যাভেলিয়ার্স অফ দ্য ফ্রাঙ্কস্'। এই ক্রাক হলো আদতে 'ক্রাত', 'আকরাদ'-এর অপভ্রংশ।

১২. অ্যালেক্সান্দার সেভেরাম (২২৫-৩৫)-এর জন্মস্থান যিনি ছিলেন সিরিয়ান বংশোদ্ভূত রোমের সম্রাট।

১৩. ল্যাটিন ইতিহাসের টরটোসা। এখন বলা হয় টারটুস।

১৪. ইবন্-আল-কালানিসি পৃঃ ১৩৬।

১৫. তুলনীয় 'অ্যানালেস দে তেরে সেইন্টে', 'আর্কাইভ্স ডি এল ওরিয়েন্ট ল্যাটিন, খণ্ড-২, (প্যারিস ১৮৮৪), পর্ব-২, পৃঃ ৪২৯, রেমন্ডাস দে অ্যাগিলেস, "হিস্টোরিয়া ফ্রাঙ্কোরাম কুই সেপেরান্ট জেরুসালেম, মিগান-তে, 'প্যাট্রোলজিয়া ল্যাটিনা' খণ্ড ১৫০ পৃঃ ৬৫৭।

১৬. অ্যাগিলেস, পৃঃ ৬৫৯। আকসা মসজিদে প্রায় ৭০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তথ্যসূত্র ইবন্-আল-আসীর খণ্ড-১০, পৃঃ ১৯৪। এই তথ্যটি এডেসার ম্যাথিউ (পৃঃ ২২৬) অনুযায়ী ৬৫,০০০।

১৭. ইবন্-মুয়াস্সার 'আখবার মিসর", সম্পাদনা ঃ হেনরি মাসে (কায়রো ১৯১৯), পৃঃ ৩৯-এর পর থেকে।

১৮. অ্যাগিলেস পৃঃ ৬৫৪।

১৯. 'কুন্দুফ্রি', ইবন্-আল কালানিসিতে, পৃঃ ১৩৮; ইবন্-তাগরি-বিরদির 'কুন্দুহ্রি' সম্পাদনা ঃ পপার, খণ্ড-২, পর্ব-২, পৃঃ ৩০৪।

২০. এক্স-এর অ্যালবার্ট "হিস্টোরিয়া হায়ারোসোলিমিটানে এক্সপিডিশনস্", মিগনা, খণ্ড ১৬৬, পৃঃ ৫৭৫।

২১. দেখুন ইবন্ খাল্লিকান, খণ্ড-১, পৃঃ ১০১।

২২. ইবন্-আল-কালানিসি-র 'তানকরি', পৃঃ ১৩৮। উসামাহ্-এর 'ডাঙ্কারি', সম্পাদিত, হিট্টি পৃঃ ৬৫।

২৩. দানিশমান্দস্-এর তুর্কমান বংশকে যিনি সিওয়াস-এ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি বৃহত্তর প্রতিবেশী সালজুক-এর সঙ্গে মিশে যায়।

২৪. ইবন্-আল-কালানিসি, পৃঃ ১৩৮ = গিব্ব পৃঃ ৫১।

২৫. ইবন্-আল-কালানিসি-এর 'বাগদাবিন' পৃঃ ১৩৮। ইবন্-তাগরি-বিরদি, খণ্ড-২, পর্ব-২, পৃঃ ৩৪৩; পৃঃ ৩২৭ (বারদাবিল)।

২৬. জেরুসালেম-এর রাজপরিবারের বংশতালিকা জানতে হলে দেখুন রেনে গ্রুসেত, 'হিস্টোরিয়া দেস ক্রুয়সাদেশ, খণ্ড-১ (প্যারিস, ১৯৩৪) পৃঃ ৬৮৬।

২৭. আরো অনেক আতাবেগ-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি ১১০৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন এবং বুরিদ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ টিকে ছিল ১১৫৪ সাল পর্যন্ত।

২৮. তাদের বলা হত ল্যাটিনস্ মনস্ রেগালিস (মন্ট রয়্যাল, মন্ট্রিল)। প্রথম দিকের প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে ক্র্যাক ডি মন্ট্রিল তার উত্তর-পূর্ব দিকের এলাকাকে উল্লেখ করেছেন ক্র্যাক দেস মোয়াবাইটস বলে। (আল-কারাক: আরাম ভাষা 'কারখা' থেকে হয়েছে আরবী কারাক। কারখা-শহরের নাম। বাগদাদের একটি এলাকাকে বলা হয় কারখ।

২৯ যেহেতু তাঁকে বলা হত সেন্ট গিলেস এব রেমন্ড, তাই আরবরা তাঁকে উল্লেখ করত সানজিল

বা ইবন্-সনজিল বলে।

৩০. পরে তুর্কীরা এটি মেরামত করে। এই তারাবুলাস-এর এই দুর্গটি এখনও কারাগার হিসাবে ব্যবহার হয়।

৩১. ইবন্-খালদুন, খণ্ড ৫ পৃঃ ১৮৬।

৩২. এই সব সংযুক্ত রাজ্যই জেরুসালেম-এর গুরুত্ব বোঝায়; জন লা মন্টের 'ফিউডাল মনার্কি ইন দ্য ল্যাটিন কিংডম অফ্ জেরুসালেম (কেম্ব্রিজ ১৯৩২), পৃঃ ১৮৭।

৩৩. ইবন্-আল-কালানিসি, পৃঃ ৩৩৬।

৩৪. সম্পাদনা হিট্টি, পৃঃ ১৩২= 'আরব সিরিয়ান জেন্টলম্যান'-পৃঃ ১৬১।

৩৫. 'বাচ্চা কিংবা ছোট ছেলেকে ল্যাটিনে বলা হয় পুল্লানি। তুলনীয় আরবী 'ফুলান'।

৩৬. ইবন্-আল-আসীর, 'তারিখ-আল-দাওলাহ্-আল-আতাবাকিয়াহ্'। রিকুইলঃ অরিয়েনটাক্স খণ্ড-২, পর্ব-২, পৃঃ ১১৮-এর পর থেকে।

৩৭ আরবী দাবিয়াহ্ শব্দটি সিরীয় ভাষায় গরিব শব্দের অপভ্রংশ। আদি ল্যাটিনে সেখানে এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হল "পাউপারস্ কমিলিটোনস্ ক্রিস্টি (খ্রিস্টের দরিদ্র সেবক অর্থাৎ নাইট)।

৩৮. আদতে ছিল নাইটস্ অফ সেন্ট জন। আরবীতে বলা হয় ইসবাতারিয়াহ্ (আসবিতারিয়াহ্)।

৩৯. ঠিকঠাক মানা যায় ইবন্-আল-কালানিসি-এর বর্ণনা। পৃঃ ২৯৮-৯। তিনি নিজেই তখন দামাস্কাস শহরের একজন অন্যতম সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।

৪০. ইবন্-আল-ইবরি, পৃঃ ৩৬১; ইবন-আল-আসীর, খণ্ড-১১, পৃঃ ১০১, তুলনীয় কামাল-আল-দিনের 'জুবদাত-আল-লাহাব-মিন তারিখ হালাব, অনুবাদ ই, ব্লচেট (প্যারিস ১৯০০) পৃঃ ২৫।

৪১. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-১, পৃঃ ৪০৫-৭, তুলনীয় ইয়াকূত, খণ্ড ২, পৃঃ ২৪৬-৭।

৪২. আবু-শামাহ্, খণ্ড ১, পৃঃ ১৫৫; আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ৪৭।

৪৩. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ৫৩।

৪৪. খণ্ড-৩, পৃঃ ৬০।

৪৫. ইবন্-আল-আসীর, খণ্ড-১২, পৃঃ ৫১।

৪৬. ইবন্-বতুতা, খণ্ড-১, পৃঃ ১৬৬-৭।

৪৭. মারিনাস সানুতো, বঙ্গারস-এ 'লিবার সেকরেটোরাম, 'গেস্তা দেই পার ফ্রাঙ্কোস (হ্যানয় ১৬১১), খণ্ড-২, পৃঃ ২০১।

৪৮. পৃঃ ২৫ দেখুন।

৪৯ আবু-শামাহ্, খণ্ড ২, পৃঃ ৭৫ থেকে। তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ইবন্-আল-আসীর, খণ্ড-১১ পৃঃ ৩৫২-৫; এরনাউল এবং বার্নার্ড লে ট্রেসরিয়র এর 'ক্রনিক', সম্পাদনা এম এল ডি মাস ল্যাট্রি (প্যারিস, ১৮৭১) পৃঃ ১৭২ ৪।

৫০. লিও টেস্ (আল লিতানি), ল্যাটিন সূত্র অনুসারে বেলফোর্ট। এর মালিককে বলা হত রেজিনাল্ড অফ্ সিডন। শব্দের মূল উৎপত্তি জানতে হলে পড়ুন, 'হিস্ট্রি অফ সিরিয়া', এবং লেবানন অ্যান্ড প্যালেস্টাইন' (লন্ডন, ১৯৫০) ৬০২, টীকা-৫।

৫১. বায়সান-এর উত্তরে জর্ডনদের তৈরি করা একটি নতুন দুর্গ। এর পুরো নামটি হল 'কাওকাব আল হাওয়া (আকাশের তারা), ল্যাটিন সূত্র অনুসারে একে বলা হতো বেলভয়ের।

৫২. ইবন্-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩২১।

৫৩. বাহা-আল-দিন-ইবন্-শাদ্দাদ, 'সিরাত সালাহ্-আল-দিনঃ আল নাওয়াদির আল সুলতানিয়াহ্, অ-আল মাহাসিন আল ইউসুফিয়াহ, (কায়রো ১৩১৭), পৃঃ ১২০, নেওয়া হয়েছে অনুবাদ 'সালাদিন' অথবা 'হোয়াট বিফেল সুলতান ইউসুফ (লন্ডন, ১৮৯৭) পৃঃ ২০৬ থেকে।

৫৪. আবু-শামাহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ১৮৮; ইমাদ-আল-দিন (আল ইসফাহানি), আল ফাতহ্ আল-কুসসি্ ফি আল-ফাতহ্ আল কুদসি, সম্পাদনা সি ডে ল্যান্ডবার্গ (লিডেন ১৮৮৮), পৃঃ ৩৫৭; ইবন্-আল-ইবরি পৃঃ ৩৮৬-৭; আবু আল ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ৮৩-৪।

৫৫. পিটারবোরাফ-এর বেনেডিক্ট, সম্পাদনা ডব্লু স্টাবস্ (লন্ডন ১৮৬৭), খণ্ড-২, পৃঃ ১৮৯; ইবন্ শাদ্দাদ, পৃঃ ১৬৪-৫।

৫৬. ইবন্-আল-ইবরি পৃঃ ৪১৩, বলেছেন আক্কার রাজা সম্বন্ধে।

৫৭. তুলনীয় আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ৮৪।

৫৮. কালআত আল-জাবাল। তাঁর খোদিত লিপি এখনও প্রাচীন ফটকের গায়ে পড়া যায়।

৫৯. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-১, পৃঃ ৫০৯-এর পর থেকে; সুবকি, তাবাকাত, খণ্ড-৪, পৃঃ ২৫৩-৪।

৬০. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-২, পৃঃ ৪৯৫-এর পর থেকে। সুয়ূতি, হুসন, খণ্ড-১, পৃঃ ২৭০। তাঁর আল ফাতহ্ এই পরিচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।

৬১. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-৩, পৃঃ ৪২৮-এর পর থেকে। এই পরিচ্ছেদে তিনি বহুবার 'সিরাহ' ব্যবহার করেছেন।

৬২. খণ্ড-১১, পৃঃ ২৪২।

৬৩. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ৯১।

৬৪. ই জি ওয়ালটার স্কট-এর 'টালিসম্যান'-এ, নাগানা ডার ওয়াইসে-তে কম-বেশি পাওয়া যাবে। সালাহ্-আল-দিন-এর খ্যাতির ফলে তাকে ঘিরে একটি কিংবদন্তির বলয় তৈরি হয়েছে। এই গল্প আবার থমাস বেকের মহত্ত্ব প্রমাণ করে, যদিও তিনি ছিলেন স্যারাসেন মা-এর সন্তান।

৬৫. তাঁর সম্মানসূচক উপাধি সঈফ-আল-দিন (ধর্মের তলোয়ার) থেকে। ইবন্ খাল্লিকান, খণ্ড-২, পৃঃ ৪৪৬।

৬৬. আরবী 'ফান্দুক', গ্রিক 'পানদোকিয়োন' থেকে সৃষ্ট। আরবী 'বান্দুক' (বাদাম) গ্রিক 'পন্টিকস' থেকে (বিশেষণ পনটস্)। বুন্দুকিয়াহ্, আরবী ভাষায় ভেনিসের নাম (আবু-আল-ফিদা। 'তাকবীম আল-বুলদান' সংস্করণ রেনাউদ এবং দি স্লান, প্যারিস ১৮৪০, পৃঃ ২১০), এসেছে ভেনেটিকাম থেকে।

৬৭. এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইবন্-খাল্লিকান, আল-সুবকি এবং অন্যান্যদের নাম যুক্ত। এখানেই বর্তমানে আরব একাডেমি অফ্ দামাস্কাস তৈরি হয়েছে।

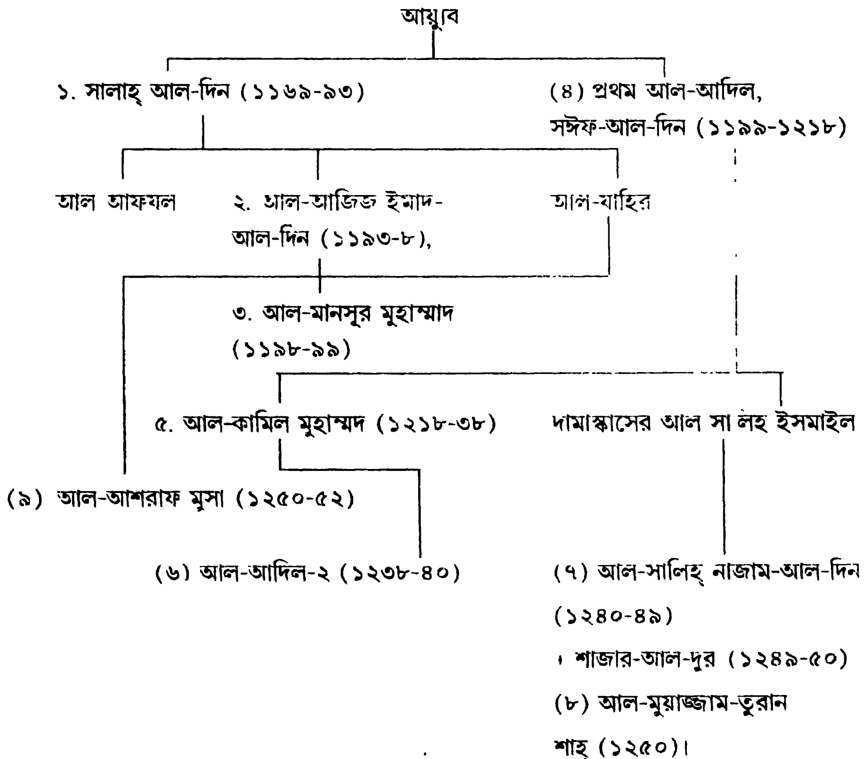
৬৮. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৩৫-৭, ইবন্-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৪৯-৫০; ইবন-খাল্লিকান, খণ্ড-২ পৃঃ ৪৫১, ইবন-আইয়াস, বাদায়ী আল-জুহুর-কি-ওয়াকাল-আল-দুহুর (বুলাক, ১৩১১), খণ্ড-১ পৃঃ ৭৯-৮০।

৬৯. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৪৮; ইবন্-আল-আসীর, খণ্ড-১২, পৃঃ ৩১৫।

৭০. দেখুন পৃঃ ৪৮২।

৭১. মাকরিজি, খণ্ড-২, পৃঃ ২৩৬-৭, সম্পাদনা জয়েনভিল্ল, হিস্টরি ডি সেন্ট লুইস, এন ডি. ওয়েল্লি, (প্যারিস. ১৮৭৪). পৃঃ ১৬৯।

৭২. ইজিপ্সিয়ান আয়্যুবিদদের বংশলতিকা। এঁদের মধ্যে আল-আজিজ, আল মানসুর এবং আল আশরাফ বাদে সকলেই কোনো না কোনো সময় দামাস্কাসের স্বীকৃতি পেয়েছেন।



৭৩. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৯০; সুয়ুতি, হুসন্, খণ্ড-২. পৃঃ ৩৯।

৭৪. জয়েনভিল, পৃঃ ২০১।

৭৫. মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-১. পর্ব ১. পৃঃ ৯৮,১০৪।

৭৬. প্রাগুক্ত, পর্ব-২, পৃঃ ২৯-৩০; আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৪, পৃঃ ৩।

৭৭. ইবন্-আল-ইবরি, পৃঃ ৫০০; মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-১, পর্ব-২, পৃঃ ৫২-৪; আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৪, পৃঃ ৪-৫।

৭৮. মাকরিজি উভয় সন্দর্ভের মূল বয়ান সংরক্ষণ করেছেন। কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-২, পর্ব-৩, পৃঃ ১৭২-৬, ১৭৭-৮, অনুবাদ পৃঃ ২২-৩১, ২১২-২১।

৭৯. "দ্য ওয়াচ টাওয়ার" ক্যাস্ট্রাস মার্গাথাম, মার্গাট।

৮০. খণ্ড-৪, পৃঃ ২২।

৮১. খণ্ড-৪, পৃঃ ২৪।

৮২. আবু-আল-ফিদা (যিনি অবরোধে অংশ নিয়েছিলেন) খণ্ড-৪, পৃঃ ২৫-৬; মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-২, (পর্ব-৩), পৃঃ ১২৫-৯; আর্কাইভস্, খণ্ড-২, পর্ব-২, পৃঃ ৪৬০; লেস্ গেসটেস দেস্ চিপরইস সংস্করণ জি রেনাউড (জেনিভা,১৮৮৭) পৃঃ ২৫৬।

৮৩. দেখুন বঙ্গারস-এর সানুতো, খণ্ড-২, পৃঃ ২৩১ থেকে।

৮৪. পরে ইউরোপে রোডস্, স্মিরনা, আলেকজান্দ্রিয়া এবং তুর্কীর বিরুদ্ধেও ধর্মযুদ্ধ হয়। ১৩৯৬ সালে নিকোপলিস-এর যুদ্ধে এর সমাপ্তি ঘটে। দেখুন, এ এস আতিয়া-র 'দ্য ক্রুসেড ইন দা লেটার মিডল্ এজেস্ (লন্ডন, ১৯৩৮)।

অধ্যায় ৪৬
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

ঘটনার ঘনঘটা, বীরগাথা, কিংবদন্তি আর জনশ্রুতি ধর্মযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কিছুটা অতিরঞ্জিত করেছে। প্রাচ্যের থেকে অবশ্য প্রতীচ্যের কাছেই এই যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি। ধর্মযুদ্ধের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল ললিতকলা, শিল্প এবং বাণিজ্যে। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের উপর তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু গোটা সিরিয়া জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি এবং ধ্বংসের যে-মর্মান্তিক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও এই ধর্মযুদ্ধেরই ফল। এর মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক অধিকৃত উপকূলবর্তী শহরগুলির উপর মামলুকদের তান্ডবলীলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ জুড়ে মুসলিম ও খ্রিস্টান বিদ্বেষের যে-বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, এই ধর্মযুদ্ধেই তা ফলবতী হয়।

● নূরীগণের অবদান

গৃহযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধ সত্ত্বেও নূরী এবং আয়্যুবিয়দের আমলে সিরিয়া কিন্তু সুদিনের মুখ দেখেছিল। উমাইয়া যুগকে বাদ দিলে এটিই ছিল মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ। এ সময়ের ভূপতিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নূর-আল-দীন এবং সালাহ-আল-দীন-এর নাম। এদের আমলের স্থাপত্য এবং শিক্ষাবিস্তারের নিদর্শন রাজধানী দামাস্কাসে আজও বর্তমান। নূর-আল-দীন দামাস্কাসে তাঁর শাসনকালে সীমানার প্রাচীব, তার মিনার ও প্রবেশদ্বারগুলি মেরামত করেন। তাঁর তৈরি করা প্রশাসনিক ভবনগুলি কিছুদিন আগেও ব্যবহার করা হত। শুধু তাই নয়, দামাস্কাসের প্রাচীনতম ইল্‌ম-হাদীস[১] শিক্ষাকেন্দ্র তারই তৈরি। নূরের পরবর্তী যুগে সিরিয়ায় এই মাদ্রাসাগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নিজের নামে[২] একটি হাসপাতাল তৈরি করেন নূর-আল-দীন। আল-ওয়ালীদের হাসপাতালের পর এই নূরি হাসপাতালই দামাস্কাসের দ্বিতীয় হাসপাতাল। পরে এটি চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র[৩] হয়। নূরের তৈরি করা মাদ্রাসাগুলি ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তবে এই বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়গুলি ছিল আবাসিক এবং এখানে নিজামীয়াহ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী ছাত্রদের তালিম দেওয়া হত। শাফিঈ ধারার এই মাদ্রাসা আলেপ্পো, হিমস, হামাহ এবং বা'লাবাকে তৈরি করেন নূর। তাঁর আমলের এইসব শিক্ষাকেন্দ্র এবং অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভে যেসব লেখা খোদাই করা আছে তার হরফ প্রাচীন আরবী হস্তলিপিবিদদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয়। কারণ, এর আগে পর্যন্ত স্থাপত্য-লিপির আদল ছিল কৌণিক কুফিক। তখনই প্রথম

গোলাকার 'নসখি' শৈলীর হরফে লেখা ও নকশা খোদাই করা হয়। আলেপ্পোর নগরদুর্গের পশ্চিম মিনারে এই শৈলীতে খোদাই করা হরফে লেখা আজও পড়া যায়। এই দুর্গের যে রূপ আজ আমরা দেখতে পাই, তা সংরক্ষণের কৃতিত্ব কিন্তু নূর-আল-দীনেরই। প্রাচীন সামরিক স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন হিসাবে পরিচিত এই দুর্গের কথা অ্যাসিরিয় এবং হিট্টিয় নথিপত্রে পাওয়া যায়। নূর-আল-দীন মারা যাওয়ার পর তাঁকে কবর দেওয়া হয় দামাস্কাসে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আল-নূরীয়াতে। সিরিয়াতে সেই মাদ্রাসা নূরের সমাধি ও মসজিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে। নূরের স্মৃতিস্তম্ভ আজও যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আয়্যুবিয় ধারাকেই অনুসরণ করেছেন মামলুকরা। তাদের আমলে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের গোল গম্বুজের (কুব্বাহ্) নীচে কবর দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়ে যায়।



আলেপ্পোর প্রাচীন নগরদুর্গ নূর-আল-দীন (খৃ: ১১৭৪) সংরক্ষিত

স্থাপত্যশিল্প এবং শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন সালাহ-আল-দীন। শিক্ষার সাহায্যে শী'আহ্ বিরোধী এবং ফাতিমিয়পন্থি হাওয়াকে রোখাই ছিল তাঁর নীতি। মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে নিযাম-আল-মুলকের পরেই তাঁর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর শাসনকালে বিদ্যালয়-নগরী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে দামাস্কাস। ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে দামাস্কাসে এসেছিলেন ইবন-জুবাইর। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, শহরে ২০টি মাদ্রাসা, দুটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মুসলিম ফকির ও দরবেশদের জন্য অসংখ্য খানকাহ্ ছিল। দরবেশদের জন্য এই ধরনের খানকাহ্ মিশরে প্রথম তৈরি করেন সালাহই।

● আয়্যুবিয়দের অবদান

১৩ শতাব্দী থেকে আয়্যুবিয় এবং তাদের উত্তরাধিকারী মামলুকদের শাসনের গোড়ার

দিকে তৈরি দামাস্কাস এবং আলেপ্পোর স্থাপত্যই প্রাচ্যের ধ্রুপদী আরব শিল্পের নিদর্শন। মামলুকদের শাসনকালে যে-স্থাপত্যশৈলী মিশরে অনুসরণ করা হয়েছিল, তার জন্ম কিন্তু সিরিয়ায় ; আয়্যুবিয় স্থপতিদের হাতে। এই সময়কার মিশরিয় স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন সারা আরব মুলুকেরই গর্বের বস্তু। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল মজবুত এবং শক্তপোক্ত গঠন। উচ্চমানের পাথরের উপর সাধারণ শিল্পকর্মই হয়ে উঠত অসাধারণ। কিন্তু আন্দালুসিয় স্থাপত্যশৈলীর মতো এখানেও শোভাবর্ধনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত অলংকরণের উপর জোর দেওয়া হত।

সালাহ-আল-দীনই জেরুসালেম ও মিশরে মাদ্রাসার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রথম চালু করেন। তাঁর শাসনকালে আল-হিজাজেও এই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রথম চালু হয়। মিশরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁরই নামাঙ্কিত কায়রোর আল-সালাহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠানটি। ইবন-জুবাইর আলেকজান্দ্রিয়াতেও একাধিক মাদ্রাসার কথা বলেছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মিশরিয় মাদ্রাসাগুলি বেশি দিন টেকেনি। কিন্তু পরবর্তীকালের মিশরের স্থাপত্যশৈলীতে এদের প্রভাব স্পষ্ট। মিশরে আরবীয় শিল্পকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবেই উত্তরকালে তা চিহ্নিত হয়। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কায়রোতে সুলতান হাসানের গড়া মসজিদ সংলগ্ন মহাবিদ্যালয়। চতুষ্কোণ এক চত্বরের (সাহ্ন) চারপাশে ছিল চারটি দেওয়াল দিয়ে চারটি বিশাল কক্ষ। চত্বরের মাথা ছিল খোলা। চতুষ্কোণ এই চত্বরটি চিহ্নিত করা হয়েছিল চারটি দরদালান (একবচনে, লিওয়ান) দিয়ে। এক-একটি কক্ষে এক-একটি মাযহাবের রীতি শিক্ষা দেওয়া হত। পুরো স্থাপত্যটি এক নজর দেখলে মনে হবে একটি ক্রুশ চিহ্ন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও সালাহ-আল-দীন কায়রোতে দুটি হাসপাতাল চালাতেন। হাসপাতালগুলি সম্ভবত নির্মাণ করা হয়েছিল দামাস্কাসের নূরী হাসপাতালের আদলে। তাঁর আগে ইবন-তুলুন এবং কাফুর আল-ইকশিদিও এই ধরনের দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র মিশরে তৈরি করেছিলেন। হাসপাতালের ক্ষেত্রেও মসজিদের স্থাপত্যশৈলীই অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেইসব স্থাপত্যের কোন নিদর্শনই আজ আর নেই। জনকল্যাণমূলক স্থাপত্য নিদর্শনের অস্তিত্ব না থাকলেও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নির্মিত দুর্গের নিদর্শন কিন্তু আজও আছে। কায়রোর নগরদুর্গই তার উদাহরণ। এই দুর্গের স্থাপত্যশৈলী থেকে বোঝা যায়, সালাহ তাঁর দুর্গনির্মাণের বিদ্যা অনেকটাই রপ্ত করেছিলেন নরম্যানদের স্থাপত্য থেকে। সেই সময় প্যালেস্টাইনে এই ধরনের প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেছে। তিনি সম্ভবত কায়রোর নগরদুর্গ তৈরি করতে খ্রিস্টান বন্দিদের কাজে লাগিয়েছিলেন। কায়রোতে থাকার সময় সালাহর বাসভবনও এই দুর্গেই ছিল, তবে দুর্গে থাকলেও কেবল যুদ্ধেই মনোনিবেশ করেননি তিনি। তাঁর দরবারে ছিল উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সমাবেশ। ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন উজিররা ছাড়াও সেখানে ছিলেন বিশিষ্ট ইহুদি চিকিৎসক ইবন মায়মুন এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ইরাকি শিক্ষাবিদ আবদ আল-লতীফ

আল-বাগদাদী (১১৬২— ১২৩১)। মিশর[১] সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্যযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বিবরণ।

● বিজ্ঞান ও দর্শনে অবদান

বৌদ্ধিক এবং শিক্ষাজগতের এই ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও ধর্মযুদ্ধপর্বে প্রাচ্যে ইসলামি সংস্কৃতির মহিমা ক্রমশই অস্তমিত হয়ে আসছিল। এই পর্বের কিছু আগে থেকেই ইসলামি সংস্কৃতির বন্ধ্যা অধ্যায় শুরু হয়। দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীত সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব বিরল প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল, তাদের যোগ্য উত্তরসূরির দেখা মেলেনি।

এই কারণেই ১২ এবং ১৩ শতাব্দী জুড়ে ইসলাম ও পশ্চিমি খ্রিস্টানদের পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সিরিয়া। কিন্তু আরব সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে স্পেন, সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা এমন কী বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের তুলনায় সিরিয়ার ভূমিকা ছিল নেহাতই নগণ্য। ইউরোপের খ্রিস্টানদের উপর ইসলামি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সিরিয়ার একটা বড় ভূমিকা ছিল। ধর্মযোদ্ধাদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল সিরিয়া। এই প্রভাবই পরোক্ষে ছাপ ফেলেছিল পশ্চিমি দুনিয়ার উপর। তা ছাড়াও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এই প্রভাব আরও গভীর হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক জগতে সিরিয়ার প্রভাব কোনভাবেই উল্লেখযোগ্য নয়। এরই সঙ্গে আরেকটা কথাও মনে রাখা দরকার। সিরিয়া দখলকারী ফ্র্যাঙ্করা রুচির দিক থেকে মুসলিমদের চেয়ে নিম্নমানের ছিল। কিন্তু প্রাসাদ, দুর্গ আর ছাউনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে কৃষক, কুম্ভকারের মত তৃণমূল স্তরে মুসলিমদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল বেশি। বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগই তাদের হয়নি। তার ওপর দেশ ও ধর্মের সঙ্গে জড়ানো কুসংস্কার বা ভয় দু'তরফের মাঝে গড়ে তুলেছিল দূরত্বের প্রাচীর। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে মুসলিমদের শেখাবার মত কোন বিদ্যাই প্রায় ফ্র্যাঙ্কদের ঝুলিতে ছিল না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে দুপক্ষের পাণ্ডিত্যের যে কোন তুলনাই চলত না তার প্রমাণ পাওয়া যায় উসামাহের[২] টিপ্পনীতে। ফ্র্যাঙ্কদের বিচারব্যবস্থাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের সুদৃঢ় প্রমাণ একেবারে অলভ্য নয়। বাথের অ্যাডেলার্ড ১২ শতকের গোড়ার দিকে অ্যান্টিয়োক এবং টারসাসে আসেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি সংক্রান্ত আরবী রচনা লাতিনে অনুবাদ করার কৃতিত্ব তাঁরই। এর প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রথম ইউরোপীয় বীজগণিত বিশেষজ্ঞ লিওনার্দো ফাইবোনাক্কি মিশর ও সিরিয়াতে আসেন। বর্গ সংক্রান্ত একটি তত্ত্ব তিনি দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নামে উৎসর্গ করেন। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে মৈত্রীর ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন ফ্রেডারিক। আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদকারীরা তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেত। স্টিফেন নামে এক পিসাবাসী ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিয়োকে আল-মাজুসির চিকিৎসা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থটি

অনুবাদ করেন। ফ্র্যাঙ্করা এই একটিমাত্র আরবী গ্রন্থই নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ১২ শতাব্দী থেকেই গোটা ইউরোপ জুড়ে বহু অতিথিশালা, হাসপাতাল এবং কুষ্ঠরোগ চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনুমান করা হয়, হাসপাতালের মাধ্যমে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাটি মুসলিম প্রাচ্যের কাছ থেকেই নেওয়া। প্রাচ্যের প্রভাবেই ইউরোপে আবার জনসাধারণের জন্য স্নানাগার চালু হয়। রোমানরা এই ব্যবস্থার সপক্ষে থাকলেও খ্রিস্টানরা এর বিরোধী ছিল। ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিয়োকে ত্রিপোলির ফিলিপ সির আল-আসরার-এর আরবী পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। অ্যারিস্টটলের নাম ভাঁড়িয়ে লেখা এই রচনার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর যোগ্য শিষ্য আলেকজান্দারকে সাহায্য করা। ফিলিপই এটিকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। নাম দেন সেক্রেটাম সেক্রেটোরাম। ব্যবহারিক জ্ঞান এবং আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত এই বইটি ছিল মধ্যযুগের পরবর্তী পর্বের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ।

● সাহিত্য ক্ষেত্রে

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব ছিল আরো পরিব্যাপ্ত। যীশুখ্রিস্টের শেষ ভোজকালীন থালা সংক্রান্ত যেসব কাহিনী আছে তার বেশিরভাগেরই জন্ম সিরিয়ায়। অনুমান করা হয়, ধর্মযোদ্ধারা আরব মুলুক থেকে কালিলাহ্ এবং আরব্যরজনীর কাহিনী শুনেছিলেন এবং স্বদেশে ফেরার পরও তার স্মৃতি ছিল অম্লান। চসারের স্কোয়্যারিজ টেল আসলে আরব্যরজনীরই গল্প। লোকমুখে শোনা প্রাচ্যের বিভিন্ন গল্প দিয়েই বোকাচ্চিও তাঁর ডেকামেরন গ্রন্থটি সাজিয়েছিলেন। আরবী এবং অন্যান্য ইসলামি ভাষার প্রতি খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের আগ্রহও কিন্তু ধর্মযুদ্ধেরই অবদান। রেমন্ড লুলের (মৃ. ১৩১৫) মতো অনেকেই মনে করতেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেই ধর্মযোদ্ধারা তাঁদের পতন ডেকে আনেন। ক্যাটালান রেমন্ড লুলই প্রথম ইউরোপীয় যিনি প্রাচ্যের শিক্ষার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ ধর্মযুদ্ধের উপর জোর দেন। তাঁর মত ছিল হিংসা নয়, মুসলিমদের আস্থা অর্জন করেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিরামারে খ্রিস্টানদের আরবী শিক্ষার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত তাঁর এই প্রয়াসের প্রভাবেই কাউন্সিল অব ভিয়েনা ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস, লুভেন এবং সালামাঙ্কায় আরবী এবং তাতার শিক্ষণের দুটি পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

● সামরিক ক্ষেত্রে অবদান

এসব সত্ত্বেও খুব স্বাভাবিকভাবেই রণকৌশলের ক্ষেত্রেই ধর্মযুদ্ধের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আড়ধনুকের ব্যবহার, যোদ্ধা এবং ঘোড়ার বর্ম পরা এবং বর্মের নিচে তুলোর আস্তরণ দেওয়া সবই ধর্মযুদ্ধের দান। সিরিয়ার ফ্র্যাঙ্করা শিঙা ও ভেরীর বদলে সামরিক বাদ্য হিসেবে

ব্যবহার করতে শুরু করে টেবার[১১] এবং নেকার[১২]। মুসলিমদের কাছ থেকেই তারা যুদ্ধের চিঠি চালাচালির কাজে কবুতরদের[১৩] তালিম দিতে শিখেছিল। আলোর রোশনাইয়ে বিজয়োৎসব পালন করা বা যোদ্ধাদের মধ্যে খেলাধূলা (জারিদ) সিরিয়ার কাছ থেকেই ধার করা। ফ্র্যাঙ্কযোদ্ধাদের শরীর ও অস্ত্রের নানা কসরতের জন্মও সিরিয়ার মাটিতেই। মুসলিম যোদ্ধাদের কাছ থেকে তারা শিখেছিল কুলচিহ্ন সংক্রান্ত প্রতীক এবং যুদ্ধের প্রচারের জন্য সরকারি ঘোষক-সংক্রান্ত বিভাজন ইত্যাদির ব্যবহার।

দুমুখো ঈগল[১৪] বা ফ্রান্সের পূর্বতন রাজবংশের প্রতীক আইরিস ফুল[১৫] ইত্যাদি এই যুগের মুসলিম প্রভাবেরই ফল। সালাহ্-আল-দীনের কুলচিহ্ন ছিল সম্ভবত ঈগল। মামলুক শাসকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন পশুর নাম ও প্রতিকৃতি তাঁদের বর্মের উপর খোদাই করতেন। তাঁদের নিজস্ব বিভিন্ন সেনাদল ছিল। তাই প্রত্যেকটি দলই তাদের বর্ম, পতাকা, তকমা ইত্যাদিতে আলাদা আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। বেবার্স তাঁর পূর্বসূরি ইবন-তুলুনের মতই কুলচিহ্ন হিসাবে সিংহের প্রতীক ব্যবহার করতেন। সুলতান বারকুকের (মৃ. ১৩৯৮) কুলচিহ্ন ছিল বাজপাখি। ইউরোপে কুলচিহ্ন ব্যবহার প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয় ১১ শতকের শেষভাগে। ইংরেজদের মধ্যে তা আরম্ভ হয় ১২ শতকের গোড়ার দিকে। আধুনিক যুগের মুসলিমদের কুলচিহ্ন হিসাবে নক্ষত্র, অর্ধচন্দ্র, সিংহ এবং সূর্যই এখনও টিকে আছে। "অ্যাজিওর" (আরবী লাজাওয়ার্ড) সহ অন্যান্য শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই কুলচিহ্ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সঙ্গে মুসলিমদের ভাষা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের কথা প্রমাণিত হয়।

● বারুদ

নগর অবরোধের কৌশলকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল ধর্মযুদ্ধ। পরিখা বা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দুর্গ দখল ও ধ্বংস করা, পাথর ইত্যাদি ছোঁড়ার যন্ত্র ব্যবহার, কাঠের গুঁড়ির মুখে লোহার পাত বসিয়ে তা দিয়ে দুর্গের দেওয়াল বা প্রাচীর ভাঙা এবং সর্বোপরি দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল ধর্মযুদ্ধ। বারুদের আবিষ্কারক চীন। কিন্তু সেখানে বারুদকে কেবল আগুন লাগাবার কাজেই ব্যবহার করা হত। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বারুদের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় ঘটে মঙ্গোলদের মাধ্যমে। এখানেই প্রথম ক্ষেপণাস্ত্রে বারুদের বিস্ফোরক-ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দী পরে আগ্নেয়াস্ত্রে বারুদকে ব্যবহার করা হয়। তবে ধর্মযুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিকই পরোক্ষভাবেও একথা উল্লেখ করেননি। বারুদ তৈরির প্রথম ইউরোপীয় প্রণালী ছাপার অক্ষরে দেখা যায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মার্ক নামে এক গ্রিক ব্যক্তির লেখায়। তবে বেকনের প্রণালী তাঁর নিজের লেখা কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে সম্ভবত সিরিয়াবাসী হাসান আল-রামমাহ (বল্লমধারী অশ্বারোহী) নাজম-আল-দীন আল আহ্দাব একটি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থের নাম আল-ফুরুসিয়াহ

অ-আল-মানাসিব আল-হারবিয়াহ[১০] (ঘোড়সওয়ারী ও সামরিক কসরত)। এতে বারুদ তৈরিতে পটাশিয়াম নাইট্রেটের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখ আছে আতসবাজি তৈরির প্রণালীর কথা। এই প্রণালীর সঙ্গে মার্কের লেখার যথেষ্ট মিল আছে। বারুদ ব্যবহার সংক্রান্ত অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থটি হল আল-উমারি (মৃ. ১৩৪৮) প্রণীত[১১]।

● স্থাপত্য শিল্পে অবদান

ইতালি ও নরম্যান্ডির ধর্মযোদ্ধারা দুর্গ তৈরিতে দক্ষ ছিল। তাদের কাছ থেকে এই বিদ্যা যে কিছুটা রপ্ত করেছিল আরবরা তার প্রমাণ কায়রোর নগরদুর্গ। ফ্র্যাঙ্কদের স্থাপত্যবিদ্যা দেখা যায় মূলত প্রাসাদ ও গির্জায়। এর মধ্যে হিস্‌ন আল-আকরাদ, আল-মারকাব এবং আল-শাকিফ (বেলফোর্ট) সহ অধিকাংশ প্রাসাদই আজও বর্তমান। জেরুসালেমে পবিত্র সেপালকার গির্জার কিছু অংশ, আকসা মসজিদের কাছে 'সলোমনস্ স্টেবলস' এবং বেশ কয়েকটি ধনুকাকৃতি ছাদ বা খিলানবিশিষ্ট বাজার তাদেরই তৈরি। সেপালকার গির্জা এবং ডোম অব দা রকের অনুকরণে গোল 'মন্দির' ধাঁচের অনেক গির্জাই তৈরি হয়েছিল। এরমধ্যে চারটি ইংল্যান্ডে এবং বাকিগুলি ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানিতে তৈরি হয়। বেইরুটের তথাকথিত 'উমারি মসজিদ'টি ১১১০ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জন গির্জা হিসাবে তৈরি করেন প্রথম বল্ডউইন। ধর্মযুদ্ধ পর্বের স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল কৌনিক মিনার এবং সাদামাটা কৌনিক ছাদ। কায়রোতে ফ্র্যাঙ্ক স্থাপত্য শিল্পের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন হল আল-নাসিরের[১২] মসজিদের তোরণদ্বার। ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে আক্কার গির্জা থেকে এই তোরণদ্বার নিয়ে মসজিদে বসানো হয়।

● কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অবদান

বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের থেকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব ছিল অনেক বেশি ফলপ্রসূ। পশ্চিম ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তিল, কাঁটার মত শুঁটিযুক্ত গাছ, জনার এবং চাল[১৩], লেবু, তরমুজ, খরমুজ, খোবানি এবং পেঁয়াজ-জাতীয় গাছের চাষের যে প্রচলন হয় তা ধর্মযুদ্ধেরই দান। লেবুর আরবি নাম লাইমুন, ভারত অথবা মালয় অঞ্চলেই এর জন্ম। কাঁটার মত শুঁটিযুক্ত গাছকে আরবীতে বলা হত খাররুব (মূল অ্যাসিরিয়) । পেঁয়াজ জাতীয় গাছের ফলকে আসকালনের পেঁয়াজ বলা হত। যেমন বহুবছর ধরে খোবানিকে দামাস্কাসের কিসমিস বলা হত। মুসলিম স্পেন এবং সিসিলির মাধ্যমে আরো বহু ধরনের শস্য চাষের প্রসার ঘটে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এই মাধ্যম সিরিয়া না স্পেন বা সিসিলি তা বলা মুশকিল।

প্রাচ্যে থাকার সময় ফ্র্যাঙ্কদের রুচিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। গ্রীষ্মপ্রধান আরবদেশ ও ভারতের সুগন্ধি, মশলা, মিষ্টান্ন সহ আরো বহু জিনিসের স্বাদ নিতে শুরু করে তারা। সিরিয়ার বাজার বোঝাই করা থাকত এইসব জিনিস। এই রুচিই পরে ইতালি এবং ভূমধ্যসাগরের শহরগুলির বাণিজ্যক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। দামাস্কাসের বৈশিষ্ট্য তার ধূপ, সুগন্ধি

গাছগাছড়া, গোলাপ (রোজা দামাস্কিনা) ও অন্যান্য সুগন্ধি এবং পারস্যের অসংখ্য সুগন্ধি তেল ও আতর[২৪] প্রতীচ্যে জনপ্রিয় হয়। ওষুধ হিসাবে ফটকিরি এবং ঘৃতকুমারীর গুণাগুণ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হয় তারা। ধর্মযোদ্ধাদের লুঠ করা সামগ্রীর তালিকায় মশলাপাতিও আসতে শুরু করে। শোনা যায়, ১১০১ খ্রিস্টাব্দে সিজারিয়া দখল করে জেনোয়ার সেনাবাহিনীর ভাগে অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গে ১৬ হাজার পাউন্ড গোলমরিচও আসে। লবঙ্গ, মরিচ সহ অন্যান্য সুস্বাদু ও সুগন্ধি মশলা প্রতীচ্যের পাকশালে আসে ১২ শতাব্দীতে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন ভোজই মশলাদার খাবার ছাড়া সম্পূর্ণ হত না। মিশরে এসে ধর্মযোদ্ধারা খাবারে আদার (আরবী ও পারসি জানজাবিল এর উৎস সংস্কৃতে নিহিত (আর্দ্রক)) স্বাদ পেতে শেখে। তবে প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় অবদান হল চিনি (আরবী শুক্কারা আসলে সংস্কৃত ভাষাজাত (শর্করা)। ইউরোপীয়রা এর আগে পর্যন্ত চিনির স্বাদ জানত না। মিষ্টি খাবার তৈরিতে এর আগে পর্যন্ত চিনির স্বাদ জানত না। মিষ্টি খাবার তৈরিতে মধু ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। সিরিয়ার উপকূলে বাচ্চাদের আখ চুষে খেতে দেখে ফ্র্যাঙ্করা। আর তখন থেকেই আখের গুণের সমঝদার হয়ে ওঠে ফ্র্যাঙ্করা। সেইসময় থেকেই ইউরোপের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে যায় আখ। সেইসঙ্গে ওষুধ তৈরিরও অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। টায়ারের উইলিয়াম[২৫] (মৃ ১১৯০) তাঁর নিজের শহরে আখচাষ সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখে গেছেন। আরবী জানা এই ঐতিহাসিকই মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধের (১০৯৫ থেকে ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দ) সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণের রচয়িতা। চিনিই হল প্রতীচ্যকে দেওয়া প্রাচ্যের প্রথম বিলাসসামগ্রী। পশ্চিমি রসনাকে তৃপ্ত করতে চিনির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি কেউই। চিনির হাত ধরেই পশ্চিমে পাড়ি জমায় নানা স্বাদের শরবত, গোলাপজল, হরেকরকমের ফল এবং সুস্বাদু মিষ্টি।

● জলচক্র

১১৮০ খ্রিস্টাব্দে নরম্যান্ডিতে প্রথম বায়ুচালিত কল ব্যবহৃত হলেও ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই[২৬]। এই সময়ের আগে থেকেই ইউরোপে জলচালিত চাকা (নোরিয়া, আরবী না'উরাহ্ থেকে) দেখা যেত। তবে আরবমুলুক থেকে শেখা বিদ্যা দিয়ে ধর্মযোদ্ধারা একে আরো কার্যকর উন্নত করে ফেলে। সিরিয়ার ধাঁচের চাকা আজও জার্মানিতে, বা বেরিউথের নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়[২৭]। সিরিয়ায় সেই রোমান যুগ থেকেই জলচালিত চাকা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু স্থানীয় যন্ত্রবিদদের দক্ষতায় তা আরো উন্নত হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মিশরিয় যন্ত্রবিদ কায়সার ইবন-মুসাফির তাআসিফ[২৮] (মৃ. ১২৫১)। হামার রাজকর্মচারী এই বৈজ্ঞানিকই আরবে মহাকাশ সংক্রান্ত প্রথম গোলক তৈরি করেন। এই গোলকটি এখনও পর্যন্ত অক্ষত আছে[২৯]। ইয়াকুত[৩০] (মৃ. ১২২৯) এবং আবু-আল-ফিদার[৩১] (মৃ. ১৩৩১) সময় থেকেই হামার অন্যতম গর্বের বস্তু এই চাকা। কেবল রসনাতেই নয়,

প্রাচ্যের প্রভাব পড়েছিল প্রতীচ্যের পোশাক পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা এমন কী প্রসাধনেও। রুচি এবং সেইসঙ্গে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। তখন থেকে দাড়ি রাখার চল শুরু হয় ইউরোপে। আরব ফেরত ধর্মযোদ্ধারা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার নিজস্ব কম্বল, গালিচা এবং পর্দা দিয়ে গৃহসজ্জার নতুন রূপকে জনপ্রিয় করে তোলে। মসলিন, বালদাচিন, দামাস্ক[৩১] ভেলভেট, সাটিন[৩২], রেশমি কাপড়ের কদর বুঝতে শেখে ইউরোপীয়রা। দামাস্কাস্ ও কায়রোর ইহুদিদের তৈরি অলংকার ও প্রসাধন সামগ্রী প্রতীচ্যের মহিলাদের মন কেড়ে নেয় সহজেই, আয়নায় ইস্পাতের পরিবর্তে অন্য ধাতুর পাতলা আস্তরণ দেওয়া শুরু হয়। নিছক আরামের জন্যই নয়, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যও প্রাচ্যের তৈরি রেশম ও পশমের কাপড় (কামলাহ) উটের লোম এবং নরম পশুচর্মের পোশাক প্রতীচ্যে দেখা যেতে লাগল প্রায়শই। মুসলিমদের তসবিদানার অনুকরণে পুঁতি দিয়ে গাঁথা মালার[৩৪] আবির্ভাব ঘটল ইউরোপে। ধর্মীয় স্মারক ইত্যাদি রাখার জন্য বিশেষ পাত্র তৈরি হত আরবে। ইউরোপীয় তীর্থযাত্রীরা সেইসব পাত্র[৩৫] দেশে নিয়ে যেতেন। মনোলোভা কাপড় এবং ধাতুর তৈরি নানা জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে রং ও পালিশ করার নানা সামগ্রীর সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় হয় আরব দুনিয়ার মাধ্যমেই। শুধু তাই নয়, এপর্যন্ত অব্যবহৃত যে সব রং, তাতে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে শুরু করে প্রতীচ্যের মানুষ। যেমন গোলাপী ও বেগুনির সংমিশ্রণে তৈরি লাইলাক ফুলের রং (ফ্রেঞ্চ, আরবী লাইল্যাক মূলত পারসি), উজ্জ্বল লাল রং (ফ্রেঞ্চ, আরবী কিরমিজি মূলত শব্দটি সংস্কৃত)। ধীরে ধীরে প্রাচ্যের অনুকরণে, কাপড়, পোশাক, কম্বল ইত্যাদি তৈরি শুরু হয় খোদ ইউরোপেই। অ্যারাস ছিল এই রকমই একটি উৎপাদন কেন্দ্র; এখানকার কাপড় বিক্রি হত চড়া দামে। গির্জার[৩৬] জানালায় বহুল প্রচলিত রং করা কাচের ব্যবহারও প্রাচ্যের দান। ফ্র্যাঙ্কশাসিত অ্যান্টিয়োকে গিয়েছিলেন টুডেলার[৩৭] বেঞ্জামিন। তাঁর লেখায় সেখানকার রঙিন কাচ তৈরির কথা জানা যায়। কাচ, মাটি, সোনা, রুপো এবং মিনার কাজে আরব শিল্পীদের দক্ষতাই প্রেরণা যুগিয়েছে ইউরোপীয়দের।

● বাণিজ্যক্ষেত্রে অবদান

প্রাচ্যের কৃষিজ পণ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ইউরোপের বাজারে ক্রমশই বাড়ছিল। আর সেই সঙ্গেই বাড়ছিল তীর্থযাত্রী ও ধর্মযোদ্ধাদের পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা। তাই জল পরিবহন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধি পেতেও সময় লাগেনি। রোমান যুগের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত সুদিনের মুখ আর দেখেনি। বন্দর হিসাবে এবং বাণিজ্যিক মুনাফার অঙ্কে ইতালির অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলিকে পিছনে ফেলে দেয় মার্সেইল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রাচ্য থেকে আরো বেশি পণ্য সরবরাহ এবং দ্রুত আরো বেশি টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফেরত মালের জন্য বিক্রেতারা ঋণ দিতে সম্মত হল। জেনোয়া এবং পিসায় ...র সংস্থা গড়ে উঠল। লেভান্টেও এর শাখা ছিল। টেম্পলাররা হুন্ডি ব্যবহার করতে

আরম্ভ করল। টাকা জমা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তারা সুদে টাকা ধারও দিতে লাগল। লাতিনদের আবিষ্কৃত প্রাচীনতম আরবী স্বর্ণমুদ্রাটি ছিল বাইজানটিনিয়াস সারাসিনেটাস। প্যালেস্টাইনের মাটিতে ভেনিসিয়দের হাতে তৈরি এই স্বর্ণমুদ্রার উপর আরবী লেখা খোদাই করা থাকত। বাণিজ্যিক দূতাবাসগুলি এরপরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে নিছক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেই তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। কূটনীতির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। আরবের ইতিহাসে প্রথম বাণিজ্যিক দূতাবাসটি ছিল জেনোয়ার। ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে আক্কায় এই দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মিশরেও[১৯] বাণিজ্যিক দূতাবাস গড়ে ওঠে।

● কম্পাস আবিষ্কার

ধর্মযুদ্ধ-পর্বে জলপথ পরিবহনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল দিকনির্ণয় যন্ত্র। চুম্বককে দিকনির্ণয়ের কাজে লাগানোর উপযোগিতা সম্ভবত চীনাদেরই প্রথম চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে পারস্য উপসাগর ও সুদূর প্রাচ্যের[২০] জলপথে বাণিজ্য করে মুসলিমরা এই বিদ্যা রপ্ত করে এবং তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। জলপথে দিকনির্ণয়ের জন্য চুম্বক ব্যবহার করতে শুরু করে তারা। সম্ভবত ১১ শতাব্দী নাগাদই এই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় মুসলিমদের মধ্যে। কিন্তু বাণিজ্যিক কারণে তা গোপন রাখা হয়। ইউরোপে ইতালিয় নাবিকরাই প্রথম দিকনির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার করে। আর এই যন্ত্র ব্যবহারের পরে সাহিত্যেও তার উল্লেখ হতে থাকে। মুসলিম সাহিত্যে এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ আছে পারস্যের একটি গল্প সংকলনে। জাওয়ামি আল-হিকায়াত ওয়া-লাওয়ামি আল-রিওয়াইয়াত[২১] নামে এই সংকলন রচিত হয় ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মুহাম্মাদ আল-আওফি এটি রচনা করেন। একটি গল্পে লেখক নিজেকে নাবিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন একটি মাছ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। লাতিন সাহিত্যে অবশ্য ১২ শতাব্দীতেই দিকনির্ণয় যন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ব্যবহারের দিক থেকে না হলেও সাহিত্যে উল্লেখের ক্ষেত্রে মুসলিমদের থেকে লাতিনরা এগিয়ে ছিল।

● জাতিগত সংমিশ্রণ

সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের সঙ্গে ফ্র্যাঙ্করা কতটা মিশে গিয়েছিল তা হিসেব করে বলা মুশকিল[২২]। উত্তর লেবাননের ইহ্‌দিন শহর, বেথলেহেম বা আল-আরিশের আজকের প্রজন্মের মানুষের মধ্যে নীলচক্ষু বা শ্বেতকুন্তলের দেখা হামেশাই মেলে। খ্রিস্টান লেবানিজদের বেশ কিছু পরিবার আজও তাদের ফ্র্যাঙ্ক ঐতিহ্যকে সযত্নে পালন করে চলেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কারাম বা ফারানজিয়াহ (ফ্র্যাঙ্ক) এবং সালিবী (ক্রুশওয়ালা)। অন্যান্য পরিবারের মধ্যে সাওয়াইয়ার নাম স্যাভয় থেকে, দুয়ায়হির নাম ডি দুয়াই থেকে এবং বারডাউইলের নাম নিঃসন্দেহে বল্ডউইন[২৩] থেকে নেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত পরিবারের

উত্তরাধিকারীরা প্যালেস্টাইন এবং উত্তর সিনাইতেও আছেন। প্যালেস্টাইনের একটি গ্রামের নাম সিনজিল। সেন্ট জিলেসের নামের স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে এই গ্রামটি। ঠিক তেমনই আরেকটি গ্রাম আল-রায়নার মধ্যে রয়েছে রেনডের স্মৃতি। অপরদিকে দ্রুজরা দাবি করে জনৈক কাউন্ট ড্রিউক্স-এর সঙ্গে তাদের যোগাযোগের নামের মিল থাকলেও বাস্তবে এই দাবির সপক্ষে কোন প্রমাণ অবশ্য মেলে না``। ❑



British Museum

মামলুক বেবার্সের স্বর্ণমুদ্রা ৬৬৭ (১২৬৮-৬৯) খ্রিস্টাব্দের এই মুদ্রায় তার নামের নীচে সিংহ দেখা যাচ্ছে

● টীকা ●

১. এই দার-আল-হাদিস-আল-নুরিয়াহ্-তে সমসাময়িক ইবন্-আসাকির (খণ্ড-১, পৃঃ ২২২)-এ বক্তৃতা সংগৃহীত আছে।

২. আল-মারিস্তান আল-নুরি। ইবন্ জুবাইর, পৃঃ ২৮৩, ইবন্ খাল্লিকান, খণ্ড-২, পৃঃ ৫২১।

৩. তুলনীয়, ইবন্-আবি-উসাইবিয়াহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ১৯২। সেই ইমারতটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

৪. দেখুন, পৃঃ ৬৩০।

৫. পৃঃ ২৮৩-৪, পৃঃ ৪০৮, ৪১২।

৬. আরব খানাকাহ এসেছে পারসী খানাগাহ্ থেকে। সুয়ূতী, হুসন্, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫৮।

৭. রেনে গ্রুসেত, "দ্য সিভিলাইজেশন অফ দ্য ইস্ট", খণ্ড-১, 'দ্য নিয়র অ্যান্ড মিডল ইস্ট' অনুবাদ ক্যাথরিন এ. ফিলিপস্ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩১), পৃঃ ২৩৫। এম. ভন বারকেম, ম্যাটেরিয়ক্স পুয়োর আন করপাস ইন্সক্রিপ্সোনাম অ্যারাবিক্যারাম, পর্ব-২, খণ্ড-১ (কায়রো, ১৯২২), পৃষ্ঠা ৮৭ ও পরবর্তী।

৮. ইবন্-খাল্লিকান, খণ্ড-৩, পৃঃ ৫২১।

৯. সুয়ূতী, হুস্ন, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫৭-৮।

১০. পৃঃ ৪১-২।

১১. ইবন্ জুবাইর পৃঃ ৫১-২।

১২. দেখুন পৃঃ ৬৫২।

১৩. আল-ইফাদাহ্ অ-আল-ইতিবার ফি আল উমুর আল-মুশাহাদাহ অ-আল-হাওয়াদিস আল-মুয়াযানাহ্ বি-আরদ মিসর, সম্পাদনা ডি জে হোয়াইট (তুবিনগেন, ১৭৮৯), অনুবাদ হয়েছে ল্যাটিন, জার্মান এবং ফরাসী ভাষায়। ইবন্ আবি-উসাইবিয়াহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ২০৭: কুতুবি, খণ্ড-২, পৃঃ ১০।

১৪. পৃঃ ১৩৮= 'আরব সিরিয়ান জেন্টলম্যান' পৃঃ ১৬২।

১৫. ফরাসী 'তামবাউর' থেকে আরবী তুনবুর' তার থেকে পারসী তুমবুর'। এক ধরনের বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

১৬. ফরাসী "নাকাইরে" থেকে আরবী 'নাক্কারাহ্'-এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

১৭. দেখুন, সালিহ্ ইবন্-ইয়াহিয়ার তারিখ বেরুট, সম্পাদনা ঃ এল শিখো (বেইরুট, ১৮৯৮), পৃঃ ৬০-৬১; আল জাহিরির 'জুবদাত কাশ্‌ফ আল মামালিক, সম্পাদনা পি. রাভাইসে (প্যারিস ১৮৯৪) পৃঃ ১১৬-১৭। তুলনীয় ঃ সুয়ুতি, হুস্‌ন, খণ্ড-২, পৃঃ ১৮৬।

১৮. জাঙ্গির সিঞ্জার মুদ্রায় প্রাচীন সুমেরীয় প্রতীক খোদাই করা আছে।

১৯. এল এ মেয়ার-এর 'সারাসেনিক হেরালড্রাইঃ 'এ সার্ভে' (অক্সফোর্ড, ১৯৩৩) পৃঃ ২৩-৪। আসিরীয়াতে এই ধরনের নকশার বহুল প্রচলন ছিল। এখনও ফ্রান্সের ক্যানাডিয়ান যুদ্ধবস্ত্রে এই চিহ্ন ব্যবহার হয়।

২০. আরবী এবং ফরাসী ভাষায় যে সংক্ষিপ্তকরণ হয়েছে, তার অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে রেনাউদ এবং ফাভে। জার্নাল এশিয়াটিক, ক্রম-৪, খণ্ড-১৪ (১৮৪৯) পৃঃ ২৫৭-৩২৭। এছাড়াও দেখুন খণ্ড-১২, পৃঃ ১৯৩ থেকে।

২১. তারিফ (কায়রো ১৩১২) পৃঃ ২০৮।

২২. দেখুন পৃঃ ৬৮১।

২৩. তুলনীয় পৃঃ ৫২৮ 'সিসেম', আরবী 'সিমসিম শব্দটি এসেছে প্রথমে আসীরিয়ান পরে গ্রিক ভাষায় অপভ্রংশ হিসাবে।

২৪. দেখুন পৃঃ ৩৫১।

২৫. 'হিস্টোরিয়া রেরাম', রিকুইল অক্সিডেন্টাক্স। খণ্ড-১, পৃঃ ৫৫৯; জ্যাকুইস দে ভিতরি, 'হিস্টোরিয়া হায়ারোসোলিমিতানা"। বঙ্গারস, খণ্ড-১, পৃঃ ১০৭৫।

২৬. তুলনীয়, পৃঃ ৩৮৫।

২৭. এম সোবারনহিম, 'হামা', (প্রবন্ধ), 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম।

২৮. দেখুন ইবন্-খাল্লিকান, অনুবাদ দি স্লান, খণ্ড-৩, পৃঃ ৪৭১-৩। ইবন-বতুতা, খণ্ড-৪, পৃঃ-২৫৫। উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ চীনের, ক্যানটন-এর জলশক্তিচালিত যন্ত্র।

২৯. এখন আছে নেপলস্-এর মিউজিয়ো নাজিওনালেতে।

৩০. খণ্ড-২, পৃঃ ৩৩১।

৩১. তাকবীম, পৃঃ ২৬৩।

৩২. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ৩৪৬, ৫৯২।

৩৩. শব্দটি এসেছে আরবী 'জায়তুনি' থেকে চীনা শব্দ 'সিয়েন-তাং' (আধুনিক হ্যাংচাও)-এর এটি অপভ্রংশ। এটি দক্ষিণ পূর্ব চীনের একটি শহরের নাম যেখানে প্রথম এই সিল্কের উৎপাদন শুরু হয়।

৩৪. দেখুন পৃঃ ৪৩৮।

৩৫. পৃঃ ৬৩১।

৩৬. দেখুন পৃঃ ৩৪৬।

৩৭. অনুবাদ আশের পৃঃ ৫৮।

৩৮. ইংরাজি 'চেক' শব্দটি এসেছে আরবী 'সাক' থেকে ১৮ শতকে ভারতে।

৩৯. দেখুন পৃঃ ৬৫২-৩।

৪০. দেখুন পৃঃ ৩৪৩।

৪১. দেখুন মুহাম্মাদ নিজামউদ্দিন-এর 'ইনট্রোডাকশন টু দ্য জাওয়ামি আল হিকায়াত' (লন্ডন ১৯২৯), পৃঃ ২৫১। তুলনীয়, এফ হার্থ এবং ডব্লু ডব্লু রকহিল-এর চাউ-জু-কুয়া (সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১৯১১) পৃঃ ২৮-৯। তুলনীয় এস এস নাদভির 'ইসলামিক কালচার' খণ্ড - ১৬ (১৯৪২), পৃঃ ৪০৪।

৪২. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের দেখুন পৃঃ ৬৪৩-৪।

৪৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪০, টীকা-৬।

৪৪. হিট্টি, 'দ্রুজ পিপল্। পৃঃ ১৫।

অধ্যায় ৪৭

মামলুক, মধ্যযুগে আরব দুনিয়ার শেষ রাজবংশ

নামই বলে দেয়[১] মামলুক ছিল মূলত ক্রীতদাসদের রাজবংশ। নানা দেশ, নানা জাতির এই ক্রীতদাসরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক শাসন কায়েম করে পরবাসভূমে। তাই শুধু মুসলিম ইতিহাসেই নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসেই এই মামলুকদের উত্থান ও সমৃদ্ধি প্রায় নজিরবিহীন। ক্রীতদাস থেকে সুলতানের সর্বোচ্চ শিরোপা পাওয়া মামলুকরা সিরিয়া এবং মিশরের মাটি থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ধর্মযোদ্ধাদের শেষ চিহ্নও মুছে ফেলেন। হুলাগুর মঙ্গোল যাযাবর এবং তাইমুরের আরবমুখী গতিকে চিরতরে প্রতিহত করার কৃতিত্বও মামলুকদের। তা না হলে পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবরণ হত অন্য ভাষায়, অন্য আঙ্গিকে। মঙ্গোল ও তাইমুরকে আটকানোর ফলে সিরিয়া বা আল-ইরাকের মত ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হতে হয়নি মিশরকে। সেদেশের সংস্কৃতির ধারা ছিল প্রবহমান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতাও বজায় ছিল। আরবের বাইরে কোন মুসলিম রাষ্ট্রই এই সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে (১২৫০—১৫১৭) মামলুকদের দখলে ছিল বিশ্বের অন্যতম উপদ্রুত অঞ্চল। নিজেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। মূলত অশিক্ষিত এবং যুদ্ধবাজ এই মামলুকরা ছিল শিল্পকলা ও স্থাপত্যের সমঝদার। এক্ষেত্রে তাদের অবদান যেকোন শিক্ষিত রুচিশীল রাজবংশের সঙ্গেই তুলনীয়। তাদের এই শিল্পপ্রীতিই কায়রোকে আজ পর্যন্ত মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য করে রেখেছে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে মামলুকদের ক্ষমতাচ্যুত করে অটোমান সেলিম। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আরব খলিফাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এসেছিল এই রাজপরিবার। এদের শাসনকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন এবং আরবজাতি বহির্ভূত অটোমান তুর্কদের সাম্রাজ্য কায়েম হয়।

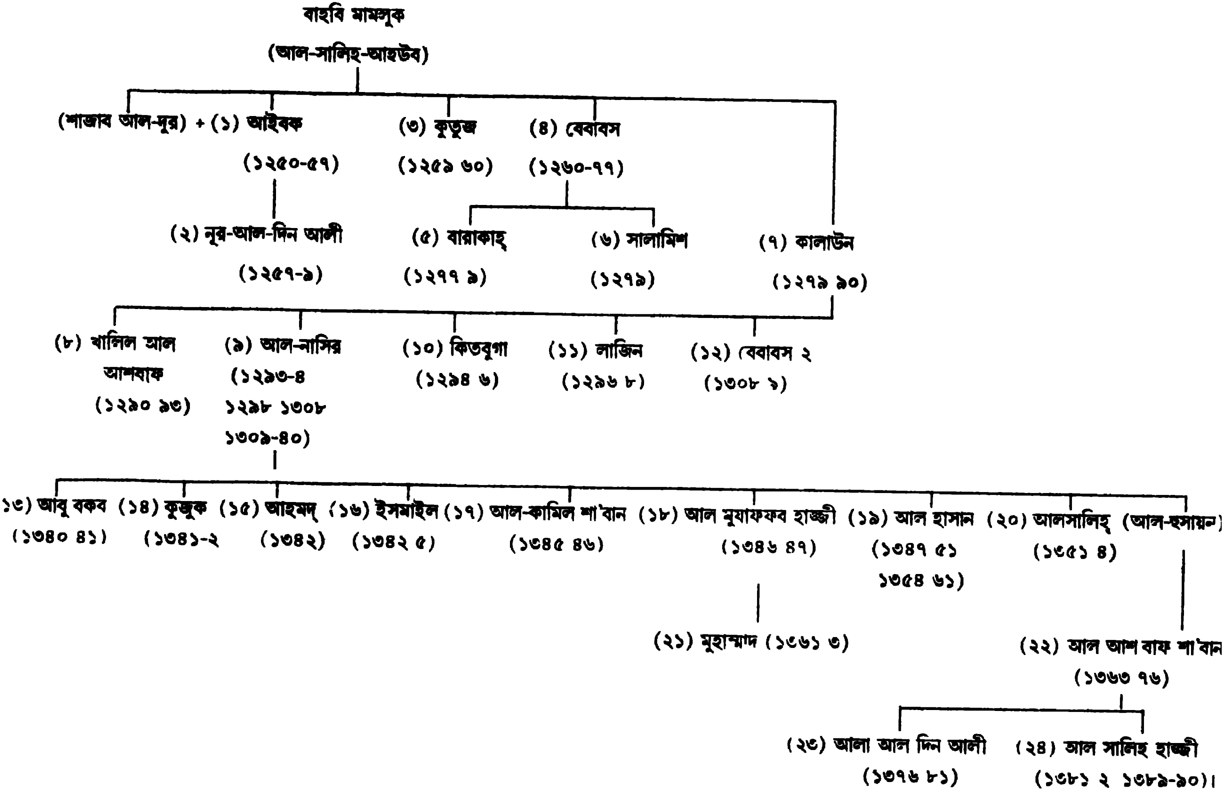
● রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

আয়্যুবিয় সুলতান আল-সালিহের মৃত্যুর পর (১২৪৯) তাঁর বেগম শাজার-আল-দুরের মাধ্যমেই মামলুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তুর্কি অথবা আর্মেনিয় ক্রীতদাসী এই শাজার ছিলেন খলিফা আল-মুস্তাসিমের হারেমে। আল-সালিহের ক্রীতদাসী হিসাবে কাজ করার সময়ে তাঁর গর্ভে আল-সালিহের একটি পুত্র জন্মায়। পুত্রের জন্মের পরই দাসত্বের শৃঙ্খল

মোচন হয় শাজারের। আল-সালিহের মৃত্যুর পর এই শাজার যখন ক্ষমতার শীর্ষে ওঠেন, তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনেক তীরই বিদ্ধ করেছে তাঁকে। এই 'শাসিকাকে' ব্যঙ্গ করে মিশরের আমীরদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেছিলেন শাজারেরই প্রাক্তন প্রভু খলিফা আল-মুস্তাসিম। তাঁর চিঠিতে লেখা ছিল 'তোমাদের শাসন করার জন্য যদি পুরুষের অভাব হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের বলো, আমরা বরং একজন পুরুষ পাঠিয়ে দেব।'[১] সুলতানা শাজার-আল-দুরই ছিলেন উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার কোন দেশের একমাত্র মহিলা শাসক। ক্লিওপেট্রা ও জেনোবিয়ার দেশকে ৮০ দিন ধরে একা শাসন করেন শাজার, নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা তৈরি[২] ছাড়াও শুক্রবারের নামাযে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন সুলতানা। শেষপর্যন্ত যখনই আমীরগণ তাঁর সহযোগী ও সেনাপ্রধান (আতাবেগ আল-আসকার) ইজ্জ-আল-দিন-আইবাক[৩]কে সুলতান মনোনীত করেন, তখন সুলতানা তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শাসনের প্রাথমিক পর্বে আইবাককে অনেকগুলি কাজ করতে হয়। তাঁর সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী সিরিয়ার আয়্যুবিয়দের দমন, তাঁরই সঙ্গে যৌথভাবে সিংহাসনে বসা শিশুশাসক আল-আশরাফকে হটাবার চেষ্টা এবং নবম লুইয়ের বিরুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী নিজের সেনাপ্রধানকে হত্যা। এইসময় সুলতানা তাঁর স্বামীর ক্ষমতা ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সম্পূর্ণ নিজের অধীনে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঈর্ষাই এই প্রথম মুসলিম সুলতানার পতনের কারণ হয়। সুলতান আরেকটি বিবাহ করতে চলেছেন শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করেন শাজার। কায়রোর রাজপ্রাসাদে খেলাধূলা সেরে স্নান করার সময় খুন হন সুলতান। কিন্তু নিষ্কন্টক রাজ্যভোগ শাজারের ভাগ্যে ছিল না। সুলতানের প্রথমা স্ত্রীর প্রতিহিংসার শিকার হন তিনি। এই প্রথমা স্ত্রীর ক্রীতদাসীরা সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের জুতোর আঘাতে শাজারকে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করে। প্রাসাদের মিনার থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তাঁর মৃতদেহ[৪]। এইভাবেই শেষ হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী এক নারী আধিপত্যের কাহিনী।

● বাহরি এবং বুরজি মামলুক

আইবাকই (১২৫০—৫৭) ছিলেন প্রথম মামলুক সুলতান। মামলুক শাসনকালকে দুটি রাজবংশের মধ্যে ভাগ করা হয় : বাহরি (১২৫০—১৩৯০) এবং বুরজি (১৩৮২—১৫১৭)। বাহরি মামলুকদের পূর্বপুরুষরা ছিল আয়্যুবিয় আল-সালিহের[৫] দেহরক্ষী। আল-সালিহের এই ক্রীতদাসরা নীলনদের[১] আল-রাওযাহ দ্বীপে বসবাস করত। বাহরিরা ছিল মূলত তুর্কি ও মঙ্গোল[১]। বিদেশি ক্রীতদাসদের দেহরক্ষী নিযুক্ত করার প্রথা চালু করেন বাগদাদের খলিফারা। আয়্যুবিয়রাও সেই প্রথাই বহাল রাখে। আর একই রকম ভাবে এর চরম মূল্য দিতে হয় ভবিষ্যতে[১]। অতীতের দেহরক্ষী ক্রীতদাসেরা বর্তমানের সেনাপ্রধান ও ভবিষ্যতে সুলতানের পদে উন্নীত হয়।


বাহ্রি মামলুক
(আল-সালিহ্-আইউব)
(শাজার আল-দুর) + (১) আইবক
(১২৫০-৫৭)
(২) নূর-আল-দিন আলী
(১২৫৭-৯)
(৩) কুতুজ
(১২৫৯ ৬০)
(৪) বেবারস
(১২৬০-৭৭)
(৫) বারাকাহ্
(১২৭৭ ৯)
(৬) সালামিশ
(১২৭৯)
(৭) কালাউন
(১২৭৯ ৯০)
(৮) খালিল আল আশরাফ
(১২৯০ ৯৩)
(৯) আল-নাসির
(১২৯৩-৪
১২৯৮ ১৩০৮
১৩০৯-৪০)
(১০) কিতবুগা
(১২৯৪ ৬)
(১১) লাজিন
(১২৯৬ ৮)
(১২) বেবারস ২
(১৩০৮ ৯)
(১৩) আবু বকর
(১৩৪০ ৪১)
(১৪) কুজুক
(১৩৪১-২
(১৫) আহমদ্
(১৩৪২)
(১৬) ইসমাইল
(১৩৪২ ৫)
(১৭) আল-কামিল শা'বান
(১৩৪৫ ৪৬)
(১৮) আল মুযাফফর হাজ্জী
(১৩৪৬ ৪৭)
(১৯) আল হাসান
(১৩৪৭ ৫১
১৩৫৪ ৬১)
(২০) আলসালিহ্
(১৩৫১ ৪)
(আল-হুসায়ন)
(২১) মুহাম্মাদ (১৩৬১ ৩)
(২২) আল আশরাফ শা'বান
(১৩৬৩ ৭৬)
(২৩) আলা আল দিন আলী
(১৩৭৬ ৮১)
(২৪) আল সালিহ হাজ্জী
(১৩৮১ ২ ১৩৮৯-৯০)।

বুরজিদের উত্থান হয় মামলুক শাসনের পরবর্তী পর্বে। তাদের পূর্বপুরুষরাও ছিল দেহরক্ষী, তবে বাহরি মামলুক কালাউনের (১২৭৯—৯০) দেহরক্ষী। মূলত সারকাসিয় এই ক্রীতদাসেরা থাকত নগরদুর্গের মিনারে (আরবী, একবচন, বুরজ)। সব মিলিয়ে শাজার বাদে বাহরি মামলুক শাসকের সংখ্যা ২৪[১০] আর বুরজিদের সংখ্যা ২৩। সিংহাসনের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার বা স্বজনপোষণকে কোনরকম আমল দিত না বুরজিরা। কব্জির জোরে অথবা আমীরদের সমর্থন আদায় করে যে সিংহাসন দখল করতে পারত, সেই হত সুলতান। শুধু বুরজিই নয়, একাধিক বাহরি সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তাঁরই ক্রীতদাস, পুত্র নয়। অল্পবয়সে হিংসার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে বহু সুলতানের। মামলুক সুলতানদের গড় শাসনকাল ছিল ছয় বছরেরও কম।

● আয়্যুবিয় ও তাতারদের প্রতিহত করা

নতুন এই রাজবংশের প্রথম কাজই ছিল নিজেদের রাজত্বের ভিত মজবুত করা এবং তার সীমানা সুরক্ষিত করা। আইবাক তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরের রণাঙ্গনে। তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর পুত্র আল-মানসূর আলী ছিল নাবালক তাই অস্থায়ীভাবে শাসনভার ছিল (নাইব-আল-সালতানাহ) সইফ-আল-দীন কুতুজের (১২৫৯—৬০) উপর। আল-কারাকের আয়্যুবিয় সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করার পর সইফ নাবালক আল-মানসূর আলীকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন অন্যায়ভাবে। আয়্যুবিয়রা নিজেদের মিশরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মনে করত। আর সেই কারণেই কুতুজের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ। কিন্তু আয়্যুবিয়দের আটকাবার সঙ্গে সঙ্গেই হুলাগুর তাতার সেনাদের আক্রমণের মুখোমুখি হন কুতুজ। তাতার সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন কিতবুগা। কুতুজের কাছে পাঠানো হুলাগুর দূতদের[১১] হত্যা করেন কুতুজ। আয়ন জালুতে (১২৬০) যুদ্ধের মাধ্যমে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। এই যুদ্ধে সেনাপ্রধান হিসাবে উত্থান হয় বেবার্সের। তবে শেষপর্বে কুতুজ স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। তাতার সেনারা পর্যুদস্ত হয়। রণাঙ্গণেই মৃত্যু হয় কিতবুগা সহ অন্যান্য নেতার। যুদ্ধ মিশরে না হওয়ায় তার আঁচও লাগেনি মিশরে। উপরন্তু নিকটবর্তী এই অঞ্চল মামলুকদের দখলে চলে আসে। বেবার্সের আশা ছিল বীরত্বের পুরস্কার হিসাবে সুলতান তাঁকে আলেপ্পোর শাসনভার দেবেন। কিন্তু সুলতান তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেননি। বেবার্স তাই তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সিরিয়া হয়ে দেশে ফেরার পথে শিকার করার জন্য থামেন কুতুজ। বেবার্সের এক সহযোগী তাঁকে সম্মান জানাতে তাঁর হাতে চুম্বন করার সময় বেবার্স তলোয়ারের ঘায়ে গলা কেটে ফেলেন সুলতানের (২৪ অক্টোবর, ১২৬০)[১১]। মৃত সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরই হত্যাকারী। শোনা যায়, কুতুজ ছিলেন জনৈক খওয়ারিজম শাহের[১১] সম্পর্কিত নাতি। তাতারীরা তাঁকে ক্রীতদাস করে দামাস্কাসে বিক্রি করে দেয়, সেখান থেকে তাঁকে কেনেন আইবাক।

● বেবার্স

আল-মালিক আল-যাহির (বিজয়ী) রুকন-আল-দীন (বিশ্বাসের ভিত) বেবার্স আল-বান্দুকদারী[১৪] (১২৬০—৭৭) ছিলেন মামলুক সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও স্মরণীয়। এই তুর্কোমান ক্রীতদাসকে খুব অল্পবয়সে ৮০০ দিরহামের বিনিময়ে দামাস্কাসে বিক্রি করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর নীল চোখদুটির একটিতে খুঁত থাকার জন্য তাঁকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আয়্যুবিয় আল-সালিহ[১৫] তাঁকে কিনে নেওয়ার আগে হামাহ্তে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। এই প্রভুর কাছ থেকে তিনি তাঁর নামের শেষ অংশটি পেয়েছিলেন। এর অর্থ ধনুকধারীর (আড়ধনুক) মালিকানাধীন (বন্দুকদার)। আল-সালিহের অধীনে আসার পর প্রথমে তাঁর স্থান হয় সুলতানের দেহরক্ষীদের একটি বাহিনীর নেতৃত্বে। সেখান থেকেই নিজের বাহুবল ও যোগ্যতায় ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে ওঠেন তিনি। দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ, এই নেতা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও কর্মচঞ্চল। গমগমে কণ্ঠস্বরে ছিল কর্তৃত্বের সুর। এককথায় জননেতার সব গুণই ছিল তাঁর মধ্যে।

বেবার্সই ছিলেন মামলুক রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম উল্লেখযোগ্য মামলুক সুলতান। যোদ্ধা হিসাবে তিনি প্রথম জয়ের স্বাদ পান আয়ন জালুতের রণক্ষেত্রে। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ধর্মযোদ্ধাদের[১৬] বিরুদ্ধে অসংখ্য আক্রমণই মূলত তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। তাঁর এই আক্রমণই ফ্র্যাঙ্কদের দুর্গ ক্রমশই দুর্বল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত বেবার্সেরই বংশধর কালাউন এবং আল-আশরাফের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় ফ্র্যাঙ্করা। বংশধরদের এই বিজয়ের ভিত কিন্তু বেবার্সেরই হাতে তৈরি। উত্তর সিরিয়ার উপর তাঁর অন্তিম পর্বের আক্রমণগুলির একটি ছিল অ্যাসাসিনদের বিরুদ্ধে। এই আক্রমণে অ্যাসাসিনদের ক্ষমতা চিরতরে খর্ব করেন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর সেনাবাহিনী বার্বারদের পরাজিত করে পশ্চিমদিকে এবং নুবিয়া[১৭] দখল করে দক্ষিণদিকে তাঁর সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করে।

বেবার্সকে নিছক সামরিক শাসক বললে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। সামরিক ক্ষেত্র ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনহিতকর নানা প্রকল্পে তাঁর অবদান ছিল অসীম। সেনাবাহিনীকে সুসংহত করার সঙ্গে সঙ্গে নৌবাহিনীর পুনর্গঠন ও সিরিয়ার দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করেছিলেন তিনি। খাল কাটা, বন্দরের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যেমন তাঁর অবদান তেমনই ডাক যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করার কৃতিত্বও তাঁরই। এই দ্রুত ডাকযোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কায়রোর সঙ্গে দামাস্কাসের যোগাযোগে মাত্র চারদিন লাগত। প্রতিটি ডাকঘরেই ঘোড়া সার দিয়ে দাঁড় করানো থাকত। তাই দুই রাজধানীতেই সুলতানের যাতায়াত ছিল অবাধ। প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই রাজধানীতে পোলো খেলতে পারতেন তিনি। সাধারণ ডাক ব্যবস্থা ছাড়াও পায়রার মুখে চিঠি পাঠানোর কাজকেও আরো নিখুঁত ও দ্রুত করার ব্যবস্থা করেন মামলুকরা। ফাতিমিয়দের আমলেও এই তালিম পাওয়া কবুতরদের বিশেষ সম্মান ছিল। জনহিতকর নানা কাজ করেছিলেন বেবার্স। মসজিদের কলি ফেরানোর সঙ্গে

সঙ্গে ধর্মীয় ও জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেছিলেন। তাঁর আমলের স্থাপত্যের[১৯] মধ্যে তাঁর নামাঙ্কিত মসজিদ (১২৬৯) এবং বিদ্যালয় আজও বর্তমান। মসজিদটিকে দুর্গে পরিণত করেন নেপোলিয়ন। পরে ব্রিটিশ সেনারা এতে রেশন দপ্তর খোলে। দামাস্কাসে তাঁর সমাধিক্ষেত্রেই আজকের জাহিরিয়াহ পাঠাগার তৈরি হয়েছে। মিশরের সুলতান হিসাবে তিনিই প্রথম চারটি রক্ষণশীল ধর্মীয় রীতির প্রতিনিধি হিসাবে চারজন কাযীকে নিযুক্ত করেন। সুসংহত ও স্থায়ীভাবে মিশরিয় মাহ্‌মিলের আয়োজন করার কৃতিত্বও বেবার্সেরই প্রাপ্য। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি যেমন রক্ষণশীল ছিলেন, তেমনই অভাব ছিল না তাঁর উদ্দীপনারও। ধর্মযুদ্ধে ইসলামকে গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই জনপ্রিয় বাদশা হারুন-আল-রশীদের একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করা হয় তাঁকে। কিংবদন্তিতে সালাহ-আল-দীনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পগাথা আরব মুলুকে আরব্য রজনীর থেকেও জনপ্রিয়।

বেবার্সের শাসনকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মঙ্গোল এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় শাসকের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী। সুলতান হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যাযাবরদের একটি গোষ্ঠীর[২০] প্রধান অথবা ভলগা উপত্যকায় কিপচাকের (বেবার্সের জন্মস্থান) মঙ্গোলদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেন। পারস্যের ইল খানদের সঙ্গে দুপক্ষের শত্রুতাই ছিল এই বন্ধুত্বের ভিত্তি। কনস্ট্যানটিনোপলের শাসক মাইকেল প্যালিওনোগাসের সঙ্গেও সমঝোতা হয় তাঁর। লাতিন খ্রিস্টানদের কট্টর বিরোধী প্যালিওলোগাস তাঁর শহরে ধর্মযোদ্ধাদের হাতে বিধ্বস্ত প্রাচীন মসজিদের[২১] পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। তাঁরই অনুরোধে এই কাজ তদারকের জন্য বেবার্স একজন মালিকী মতবাদের নেতাকে কনস্টানটিনোপল পাঠান। নবম লুইয়ের ভ্রাতা ও সিসিলির রাজা আনজউ-এর চার্লসের সঙ্গে বেবার্সের বাণিজ্যিক চুক্তি হয় (১২৬৪)। বাণিজ্যিক চুক্তি হয় আরাগনের জেমস এবং সেভিলের অ্যালফনসোর সঙ্গেও।

● খলিফা-সংক্রান্ত কাহিনী

বেবার্সের শাসনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হল, আব্বাসীয় খলিফাদের নতুন করে ক্ষমতায় আনা। তবে এই ক্ষমতা সম্পূর্ণ ছিল না, আব্বাসীয় খলিফারা তাঁরই অধীনে কাজ করতেন। এর পিছনে বেবার্সের গভীর উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত নিজের রাজতন্ত্রকে আইনের স্বীকৃতি দান। সেইসঙ্গে তার রাজদরবারকে গুরুত্বের আসনে বসানো। আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হল, আলীপন্থিদের ষড়যন্ত্রকে দমন করা। ফাতিমিয় যুগ থেকেই এই ষড়যন্ত্র মিশরের রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১২৬১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-যাহিরের পুত্রকে দামাস্কাস থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন। ইনি শেষ আব্বাসীয় খলিফার সম্পর্কিত কাকাও ছিলেন। বাগদাদ বিপর্যয়ের সময় তিনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। বেবার্স তাঁকে মহাসমারোহে খলিফা আল-মুসতানসির হিসাবে অভিষিক্ত করেন। আসন্ন

বন্দিদশার পরিবর্তে খলিফার সম্মান পান তিনি। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের আপন আপন ধর্মগ্রন্থ তুলে বেষ্টনী রচনার মধ্যে কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে তাঁকে সিরিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়। তাঁর বংশপরিচয়ের যথার্থতার সপক্ষে রায় দেন এক বিচারকমন্ডলী। ক্ষমতায় বসিয়ে এই ক্রীড়নকের কাছ থেকে অনেক বেশি আদায় করে নেন বেবার্স। আল-মুসতানসির তাঁকে মিশর, সিরিয়া, দিয়ার বকর, আল-হিজাজ, আল-ইয়ামান এবং ইউফ্রেটিসের উপত্যকার আইনসিদ্ধ শাসকে শীলমোহর দেন। এর তিনমাস বাদে আব্বাসীয় খলিফাকে বাগদাদের শাসক হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রবল বিক্রমে বাগদাদের পথে রওনা হন বেবার্স। কিন্তু দামাস্কাসে পৌঁছেই আল-মুসতানসিরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেন তিনি। মরুপ্রান্তরে আব্বাসীয় খলিফাকে আক্রমণ করেন বাগদাদের মঙ্গোল শাসক। আর তারপর থেকেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান তিনি।

একবছর বাদে আব্বাসীয় বংশের আরেক নবীন সদস্যকে কায়রোতে এনে খলিফার তখতে বসান বেবার্স। এই আব্বাসীয় খলিফা হলেন আল-হাকিম। তিনি ও তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘ ২৫০ বছর ধরে স্রেফ নামেই খলিফা থাকার আত্মতুষ্টি নিয়ে বেঁচে ছিলেন। মুদ্রায় খলিফা হিসাবে তাঁদের নাম খোদাই করা অথবা সিরিয়া এবং মিশরের শুক্রবারের নামাযে তাঁদের নাম উচ্চারিত হওয়ার মত সামান্য সুযোগ সুবিধাই তাঁদের ধন্য করত। এদের মধ্যে একজন ছাড়া কারো নামই মক্কার নামাযে উচ্চারিত হত না। তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল নতুন সুলতানের অভিষেক অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান এবং ধর্মীয় বৃত্তি প্রদান (ওয়াকফ) অনুষ্ঠানের তদারকি। ভারতের কয়েকজন শাসক সহ বেশ কয়েকজন মুসলিম শাসক এবং অটোমান প্রথম বায়াজিদ (১৩৯৪) আব্বাসীয় খলিফাদের কাছ থেকে কর্তৃত্বের 'সনদ' নেন। কিন্তু বাস্তবে আব্বাসীয়দের দেওয়া এই ক্ষমতার কোন তাৎপর্য ছিল না। ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে বুরজি মামলুক আল-নাসিরের মৃত্যুর পর, খলিফা আল-আদিল আল-মুসতাইন নিজেকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। কয়েকদিন রাজত্বও করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত ক্ষমতাভোগের আয়ু ওই কয়েকদিনই। আল-মুয়াইয়াদ শেইখের পক্ষে (১৪১২-২১)[১৫] তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বেশিদিন সময় লাগেনি। বাহরি মামলুক সুলতান আলী (১৩৭৬-৮১) এবং বুরজি সুলতান বারকুক (১৩৮২-৯৮) ও আইনালের (১৪৫৩-৬০) প্রতি আনুগত্যের অভাবের অভিযোগে বেশ কয়েকজন খলিফাকে পদচ্যুত করা হয়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে অটোমান সুলতান সেলিম মিশরকে মামলুকদের দখলমুক্ত করেন। তখন খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে তিনি নিজের সঙ্গে কনস্ট্যানটিনোপল নিয়ে যান। এই খলিফাই আব্বাসীয় রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি।[১৬]

● কালাউন এবং মঙ্গোলরা

মামলুক সুলতানদের মধ্যে বেবার্সের পরেই যাঁর নাম উল্লেখ করা যায়, তিনি হলেন আল-মালিক আল-মানসূর সইফ-আল-দীন কালাউন (১২৭৯-৯০)। বেবার্সের মত তিনিও ছিলেন

কিপচাক জাত তুর্কোমান ক্রীতদাস। যুবাবস্থায় তাঁকে মিশরে আনা হয় এবং আল-সালিহের কাছে বিক্রি করা হয়। তাঁর পদবি আল-সালিহি এর প্রমাণ। ক্রীতদাস হিসাবে তাঁর দর ছিল যথেষ্ট চড়া। হাজার দিনার[২৫] দিয়েঁ তাঁকে কেনা হয়েছিল। তাই তাঁর আরেকটি পদবি আল-আলফি (যার দাম হাজার)। সদর্পে এই পদবি ব্যবহারই প্রমাণ করে, মামলুক সুলতানরা তাঁদের অতীত পরিচয় সম্পর্কে কোনরকম হীনমন্যতায় ভুগতেন না। বেবার্সের সাত-বছরের ছেলে সালামিশকে সরিয়ে (১২৭৯) ক্ষমতায় আসেন কালাউন। সালামিশ তাঁর বড় ভাই ১৯ বছরের প্রাণোচ্ছ্বল বারাকাহের (১২৭৭-৯) স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। কালাউনই একমাত্র মামলুক সুলতান যাঁরা চারপুরুষ ধরে সুলতানের গদিতে বসেছেন। শেষ বাহরি সুলতান আল-সালিহ হাজ্জি ছিলেন তাঁর প্রপৌত্র।

কালাউন তখতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সিরিয়ার তাঁর রাজত্বের উপর আঘাত হানতে শুরু করে পারস্যের মঙ্গোল শাসক ইল খানের বংশধরেরা। এদের মধ্যে হলাগুর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবাকা (১২৬৫-৮১) এবং তাঁর পুত্র আরগুনের (১২৮৪-৯১) কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল খ্রিস্টানদের প্রতি। অন্যদিকে, সিরিয়া থেকে মিশরিয়দের হটাতে নতুন করে ধর্মযুদ্ধের ছক কষছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা। দুপক্ষের সমঝোতা হতে তাই দেরি হয়নি। কালাউনের তুলনায় আবাকার সেনাবাহিনী যেমন ছিল সংখ্যায় বেশি, তেমনই তাতে আর্মেনিয়, ফ্র্যাঙ্ক ও জর্জিয় সেনা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিয়া দখলের আশা তাদের পূর্ণ হয়নি। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে হিমস[২৬] কালাউনের বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়। শেষপর্যন্ত মঙ্গোলরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়। বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতান কালাউন। যেমন, কিপচাকের মঙ্গোল শাসক, বাইজানটাইন সম্রাট, জেনোয়ার শাসক, ফ্রান্স, ক্যাস্টিল এবং সিসিলির রাজা। এমন কী সুদূর শ্রীলঙ্কার শাসকও তাঁর দরবারে একজন দূতের হাতে একটি বার্তা পাঠান। কিন্তু কায়রোর কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। মঙ্গোলদের সাহায্য করার অপরাধে আর্মেনিয়ার উপর তান্ডব চালায় কালাউনের সেনারা। ভেঙে ফেলা হয় ধর্মযোদ্ধাদের দুর্গ।[২৭] ধ্বংসলীলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ত্রিপোলির পুনর্গঠন হয় কয়েকবছর পরে। কিন্তু মূল স্থানে নয়। সমুদ্রতট থেকে বেশ কয়েকমাইল দূরে আবু আলির (কাদিশা) তটে। আজকের ত্রিপোলি এখানেই অবস্থিত। শাসনকালের শেষপর্বে সব সরকারি দপ্তর থেকে খ্রিস্টান প্রজাদের বরখাস্ত করার নির্দেশ জারি করেন কালাউন।

● কালাউনের হাসপাতাল

অন্যান্য ক্ষেত্রেও কালাউনের যথেষ্ট অবদান ছিল। আলেপ্পো, বা'লাবাক এবং দামাস্কাসের নগরদুর্গগুলির খোলনলচে পাল্টে ফেলেন তিনি। কায়রোতে তিনি একটি হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন। তা ছাড়াও তৈরি করেছিলেন একটি জাঁকাল সমাধিক্ষেত্র।[২৮] সমাধিটি আজও পাথরের উপর আরবী অলংকরণ খোদাইয়ের কাজের এক অসাধারণ নিদর্শন হয়ে বেঁচে

আছে। তবে তাঁর তৈরি হাসপাতাল আল-মারিস্তান আল-মানসুরি ছিল তাঁর আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত। মুসলিম হাসপাতালের প্রাচীনতম নিদর্শনটি আজ অবশ্য ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। এই হাসপাতাল তৈরির ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। একবার শূল বেদনায় অসুস্থ সুলতান দামাস্কাসের নূরী হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে বসেই তিনি মনস্থ করেন, সুস্থ হয়ে কায়রোতে এইরকমই একটি হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতেও তাঁর দেরি হয়নি। ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দেই এই হাসপাতাল তৈরির কাজ শেষ হয়। ১৩ শতাব্দীর এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ছিল আশ্চর্যরকমের আধুনিক। মূল হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিল বিদ্যালয় ও মসজিদ। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য ছিল আলাদা বিভাগ। যেমন জ্বর, চক্ষুচিকিৎসা বা পেটের রোগ। প্রতিটি বিভাগই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদের নিজস্ব পরীক্ষাগার, ভেষজশালা, পাকশালা, শৌচাগার এবং গুদাম ছিল। প্রধান চিকিৎসক নানা বিষয়ে তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের পরামর্শ দিতেন। সবরকম সুযোগ সুবিধা সহ একটি বিশেষ কক্ষ ছিল এই আলোচনাসভার জন্য। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়েই আসতেন। তেমনই এখানে শুধু পুরুষ কর্মীই ছিলেন না, কাজ করতেন মহিলারাও। হাসপাতাল তহবিলে প্রতিবছর দশ লক্ষ দিরহাম জমা পড়ত। আর্তের চিকিৎসায় সুলতান কালাউনের এই আগ্রহকে সাধারণ মানুষ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। শত সহস্র বধির শিশু, সন্তানহীনা রমণী এবং অসুস্থ মানুষ তাঁর সমাধিক্ষেত্রে সংরক্ষিত তাঁর পোশাককে একটিবার ছুঁয়ে দেখতে এসেছেন। রোগ নিরাময়ে তাঁর ক্ষমতার প্রতি মানুষের আস্থা ছিল অগাধ। সেদিনের সেই বিশ্বাস আজও বেঁচে আছে।

● আল-আশরাফ

কালাউনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-মালিক আল-আশরাফ (অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত) খলিলের (১২৯০-৯৩) একমাত্র সাফল্য ছিল ১২৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আক্কা দখল।[৬০] এতে ফ্র্যাঙ্কদের অধীনে থাকা গুটিকতক বন্দরের পতন আরো ত্বরান্বিত হয়। "যে উপকূল এতদিন ধর্মযুদ্ধের দামামায় মুখর ছিল, তাতে নেমে আসে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।"[৬১] টেম্পলারদের শেষ কর্তৃত্বস্থল ছিল উত্তর সিরিয়ার উপকূলে আরওয়াদ (আরাদুস) দ্বীপ। আল-আশরাফের উত্তরাধিকারী তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আল-মালিক আল-নাসির মুহাম্মাদের আক্রমণে তা-ও হাতছাড়া হয়ে যায় ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে।

● মঙ্গোলদের বিতাড়ন

আল-নাসির সুলতানের তখতে বসেছিলেন তিনবার ১২৯৩-৪ খ্রিস্টাব্দে, ১২৯৮-১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৩০৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে।[৬২] তিনি ছাড়া একমাত্র আল-মুস্তানসির এই নজির স্থাপন করেছিলেন। আল নাসির প্রথম সুলতান হন ন'বছর বয়সে মামলুক সুলতানদের মধ্যে

তাঁর রাজত্বকালই ছিল দীর্ঘতম। মুসলিম ইতিহাসেও এই শাসনকালের মেয়াদ অন্যতম দীর্ঘ।[illegible] তাঁর আমলেই মঙ্গোলদের থেকে শেষ বড় আঘাতটি আসে। আক্রমণে নেতৃত্ব দেন সপ্তম ইল-খান গজন মাহমুদ। এই মাহমুদের আমলেই তাঁর রাষ্ট্রের স্বীকৃত ধর্ম হয় ইসলাম।[illegible] আর্মেনিয় ও জর্জিয় সেনাদের নিয়ে গঠিত মঙ্গোল বাহিনীতে এক লক্ষ সেনা ছিল বলে শোনা যায়।[illegible] মিশরিয় সেনাদের তুলনায় এই সংখ্যা ছিল তিনগুণ বেশি। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর মাসে মঙ্গোলদের আক্রমণে হিমসের পূর্বদিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় মিশরিয়রা। মঙ্গোলদের বিজয়রথও চলতে থাকে দুর্বার গতিতে। ১৩০০ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দামাস্কাস দখল করে তারা। দামাস্কাসের উপর লুঠতরাজ না চালালেও উত্তর সিরিয়ার বাকি অংশে অবাধে লুঠতরাজ চালায় মঙ্গোলরা। কিন্তু ১৩০০ খ্রিস্টাব্দেরই মার্চ মাসে মঙ্গোলরা দামাস্কাস ত্যাগ করে। শুধু তাই নয়, শহরের দুর্গগুলিও অক্ষত রেখে দেয়। এরপর মিশরিয়রা আবার এই অঞ্চলের দখল নিয়ে নেয়। তিনবছর পরে আবার আঘাত হানেন গজন। কিন্তু এবার দামাস্কাসের দক্ষিণে মারজ আল-সাফারেই তাদের গতিরোধ করা হয়।[illegible] মিশরে মুসলিমদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মঙ্গোলরাই ছিল তাদের সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ। মারজ আল-সাফারের বিজয় মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে মামলুকদের চতুর্থবারের জন্য জয়ী করে। এরপর গজনের কোন বংশধরই আর আক্রমণের ঝুঁকি নেননি।

দামাস্কাসকে মঙ্গোলদের দখলমুক্ত করার পর শুরু হয় আল-নাসিরের প্রতিশোধের পালা। কয়েক মাস আগে তাঁর সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের হেনস্থা করেছিল লেবাননের দ্রুজরা। আল-নাসির ১২ হাজার দ্রুজ ধনুর্ধরকে এনে উচিত শিক্ষা দেন। কিসরাওয়ানের আলীপন্থি[illegible] সহ অন্যান্য বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী এবং উত্তর লেবাননের মারোনাইটদের উপরেও অত্যাচার চালান তিনি। ১৩০২ খ্রিস্টাব্দ ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি আর্মেনিয়দের ভূখণ্ডের[illegible] উপর বারবার আঘাত হানেন। দ্বিতীয় উমার এবং আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের উপর যেসব বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল, সেগুলি আবার বলবৎ করেন আল-নাসির।

দীর্ঘ রাজত্বকালে যুদ্ধের থেকে শান্তির ক্ষেত্রেই তাঁর কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন আল-নাসির। খর্বাকৃতি এই সুলতানের একটি পায়ে খুঁত ছিল। নিজের জীবনযাত্রা ও নিজের চারপাশকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্যে ভরিয়ে রাখতে ভালবাসতেন তিনি। সুলতান বিদেশযাত্রা থেকে ফিরলে তাঁর সম্মানে প্রায় চার হাজার হাত গালিচা বা অন্যান্য মূল্যবান বস্ত্র বিছিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাত তাঁর অনুচরবর্গ। তীর্থযাত্রাতেও বিলাসের কমতি থাকত না সুলতানের। ধূ ধূ মরুভূমিতে যাত্রা করার সময় প্রতিদিন তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকত টাটকা তাজা সবজি। তীর্থযাত্রায় সুলতানের সঙ্গে যাওয়া ভ্রাম্যমাণ বাগান থেকে আসত এই সবজি। বাগানকে ভ্রাম্যমাণ রাখা হয়েছিল ৪০টি উটের পিঠে চাপিয়ে।[illegible] তাঁর পুত্রের বিবাহে রাজপ্রাসাদে আলোর রোশনাই আনতে জ্বালা হয়েছিল তিন হাজার মোমবাতি। এই বিয়ের

ভোজে ১৮ হাজার মিষ্টি রুটি পরিবেশন করা হয়েছিল। জবাই হয়েছিল ২০ হাজার পশু। তাঁর বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ আল-কাস্‌র আল-আবলাক[৪০] (হরেক রঙের প্রাসাদ) তৈরি হয়েছিল দামাস্কাসের এক প্রাসাদের আদলে। সুলতান ছিলেন, দক্ষ শিকারি, ক্রীড়ানুরাগী এবং ঘোড়ার সমঝদার। তিনি ঘোড়াগুলির বংশপরিচয় সংবলিত পুস্তক রাখতেন। পছন্দের ঘোড়া কিনতে ৩০ হাজার দিনার খরচেও তাঁর কার্পণ্য ছিল না।[৪১]

● মিশরের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

তবে আল-নাসিরের প্রাচুর্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনকল্যাণ এবং শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মামলুক যুগকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যায়। কিছু জনকল্যাণমূলক কাজে বাধ্যতামূলক শ্রম বিনিয়োগ করা হয়। নীলনদের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার সংযোগ সৃষ্টিকারী একটি খাল কাটার কাজ করেছিল প্রায় এক লাখ লোক। কায়রোর নগরদুর্গে একটি নালা তৈরি করে তা জুড়ে দিয়েছিলেন নীলনদ পর্যন্ত (১৩১১)। গোটা রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩০টি মসজিদ এবং দরবেশদের জন্য বেশ কয়েকটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও তৈরি করেছিলেন জনসাধারণের জন্য পানীয়জলের ফোয়ারা (আরবী, একবচনে, সাবিল), স্নানাগার এবং বিদ্যালয়। মক্কার উন্নতিকল্পে দরাজ হাতে দান করেছিলেন আল-নাসির। কায়রোর নগরদুর্গে তাঁর নিজস্ব মসজিদের অলঙ্করণ হয়েছিল আক্কার ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে (১৩১৮)। তাঁরই নামাঙ্কিত আল-নাসিরিয়াহ বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয় ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে। কায়রোতে আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এই বিদ্যালয়। আল-নাসিরের আমলের বিদ্যালয় ও মসজিদগুলি মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন। ছোট ছোট শিল্পও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। পিতল ও ব্রোঞ্জের উপর নকশা, উজ্জ্বল কাচের বাতি বা সুদৃশ্য হস্তলিখিত কোরানের অলংকরণ তারই উদাহরণ। এইসব কাজের নমুনা দেখা যায় কায়রোর ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং আরব মিউজিয়ামে।

● দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ

আল-নাসিরের দীর্ঘ জামানায় প্রাচুর্যের ভার বহন করতে সাধারণ প্রজাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয় এবং এই বোঝাই শেষ পর্যন্ত মামলুক সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। দেশজুড়ে দুর্দশা দূর করতে সুলতান বেশ কিছু আর্থিক ব্যবস্থা নেন। ইউরোপ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ান, জমি জরিপের নির্দেশ দেন। কর মকুব করেন নুন, মুরগীর মাংস, আখ, নৌকা, ক্রীতদাস এবং ঘোড়ার। মদ্যপান দমন করেন এবং যেসব রুটি বিক্রেতা অতিরিক্ত দাম নিত তাদের উত্তমমধ্যম প্রহার করতেন। এইসব ব্যবস্থার ফল ছিল নেহাতই ক্ষণস্থায়ী। তাঁর পরবর্তী কালে গৃহযুদ্ধ, খরা এবং মহামারী মানুষের দুর্দশাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে যে প্লেগ-মহামারী ইউরোপকে আক্রমণ

করে মিশরে তার প্রকোপ ছিল দীর্ঘ সাতবছর ধরে। এই দীর্ঘ সময়ে বহু প্রাণ অকালে ঝরে যায়। এর আগে কোন মহামারীই মিশরে এত বিধ্বংসী ছিল না। ইবন-আয়াসের[৪২] মতে, রাজধানী কায়রোতেই মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় নয় লক্ষ। যদিও এই সংখ্যাতত্ত্ব কিছুটা অতিরঞ্জিত। সুলতান এবং তাঁর সঙ্গে যারা পেরেছিলেন, তারাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। শোনা যায়, এই মহামারীতে গাজ্জায় এক মাসে ২২ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। আলেপ্পোতে গড়ে প্রতিদিন পাঁচশো জন মারা যেতেন।

● বাহরিদের পতন

আল-নাসিরের পরবর্তী পর্যায়ে ৪২ বছরে (১৩৪০-৮২ খ্রিস্টাব্দ) ১২ জন বাহরি মামলুক সুলতান রাজত্ব করেছেন একের পর এক। কিন্তু তাঁরা নামেই সুলতান ছিলেন। সিংহাসনে তাঁরা বসলেও প্রকৃত ক্ষমতার সিংহভাগই ছিল আমীরদের হাতে। দেশ চালাতেন আমীররাই। মর্জিমাফিক সুলতানদের সিংহাসনচ্যুত করতে, এমন কী হত্যা করতেও এরা দ্বিধাবোধ করতেন না। আল-নাসিরের এইসব উত্তরসূরিরা কোনক্ষেত্রেই কোন অবদান রেখে যেতে পারেননি। একমাত্র আল-নাসিরের পুত্র সুলতান আল-হাসানের আমলে একটি মসজিদ তৈরি হয় ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে। ক্রুশাকার এই মসজিদকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মসজিদের শিরোপা দেওয়া হয়।

বাহরিদের শেষ সুলতান ছিলেন আল-নাসিরের প্রপৌত্র আল-সালিহ হাজ্জি ইবন-শাবান (১৩৮১-২, ১৩৮৯-৯০)। শৈশবেই তখতে বসা এই সুলতানের দুবছরের শাসনকালে প্রথম বাধা সৃষ্টি করেন সারকাসিয় বারকুক। বুরজি রাজবংশের[৪৩] প্রতিষ্ঠাতা এই বারকুকের হাতেই এই শিশু সুলতানের কর্তৃত্বের ইন্তেকাল হয়। আল-আশরাফ শাবানের[৪৪] পুত্রদের ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করেন বারকুক। বারকুকেরও আগে আরেকজন সারকাসিয় আল-নাসিরের রাজত্বকালে বাধা সৃষ্টি করেন। কালাউনের ক্রীতদাস এই সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় বেবার্স (১৩০৮-৯)। আল-নাসিরের আমলে বিঘ্ন ঘটানো তিনজন সুলতানের মধ্যে একজন এই দ্বিতীয় বেবার্স। বুরজি রাজবংশের উত্থানের প্রথম বার্তা এসেছিল তাঁরই মাধ্যমে। □

• টীকা •

১. দেখুন পৃঃ ২৩৫, টীকা-১।
২. সুয়ুতি হুসন, খণ্ড-২, পৃঃ ৩৯। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ৬৫৫ পৃঃ।
৩. ভারত এবং ফারিসের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তিনিই একমাত্র মুসলিম মহিলা যিনি মুদ্রায় নিজের নাম খোদাই করেছিলেন।
৪. তাঁর নাম থেকে মনে হয় যে, তিনি ছিলেন তুর্কী (আই, চাঁদ + বেগ-যুবরাজ)। মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-১, পর্ব-১, পৃঃ ১।

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২, খিতাত, খণ্ড-২, পৃঃ ২৩৭, আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ২০১।

৬. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৮৮; ইবন্-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৭৩।

৭. কথ্য ভাষায় বলা হয়, 'বাহ্‌র' অর্থাৎ সমুদ্র।

৮. ইবন্-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৬৯, এবং সুয়ূতি, হুসন্ খণ্ড-২, পৃঃ ৮০, তাঁদেরকেও তুর্কী বংশোদ্ভূত বলে মনে করা হয়েছে।

৯. দেখুন পৃঃ ৪৬৬।

১০. বাহরি মামলুক-এর বংশলতিকার জন্য সারণী দেখুন।

১১. যে চিঠি তাঁরা নিয়ে গেছিলেন সেটি সংরক্ষিত আছে মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার খণ্ড-১, পর্ব-১, পৃঃ ১০১-২।

১২. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ২১৬; ইবন্-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৮০; তুলনীয়ঃ মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-১, পর্ব-১, পৃঃ ১১৩।

১৩. সুয়ূতি, হুসন্, খণ্ড-২, পৃঃ ৪০; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন পৃঃ ৪৮২।

১৪. মার্কো পোলোর 'বেন্দোকোয়েদার' অনুবাদ ইউল, দ্বিতীয় সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃঃ ২২।

১৫. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৪, পৃঃ ১১, কুতুবি খণ্ড-১, পৃঃ ১০৯।

১৬. দেখুন পৃঃ ৬৫৫।

১৭. ইবন্-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৪০০।

১৮. দেখুন পৃঃ ৩২৩, ৬৬৪।

১৯. দেখুন কুতুবি, খণ্ড-২, পৃঃ ১১৩-১৫।

২০. পূর্বদেশীয় মোঙ্গলরা ভুলভাবে কালমাক্ বলে চিহ্নিত হয় পশ্চিমদেশীয় মোঙ্গলদের সঙ্গে, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ দেখুন পৃঃ ৪৮৩, ৪ নং টীকা।

২১. দেখুন পৃঃ ৬২১।

২২. মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-১, পৃঃ ১৪৬-৬৮; ইবন-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৮২-৩; আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৩, পৃঃ ২২২; ইবন-আইয়াস, খণ্ড-১, পৃঃ ১০০-১০১।

২৩. ইবন্-তাগরি-বিরদি, খণ্ড-৬, পৃঃ ২৬৭-৮, ৩০৩-২১; সুয়ূতি, হুসন্ খণ্ড-২, পৃঃ ৬৮-৭১, ইবন্-আইয়াস, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৫৭-৯।

২৪. দেখুন পৃঃ ৪৮৯, এবং পৃঃ ৭০৫।

২৫. সুয়ূতি, হুসন্, খণ্ড-২, পৃঃ ৮০, মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড ২, পৃঃ ১।

২৬. আবু-আল-ফিদা খণ্ড-৪, পৃঃ ১৫-১৬; মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-২, পৃঃ ৩৬-৪০।

২৭ দেখুন পৃঃ ৬৫৭।

২৮. আরবী-'কুব্বাহ', ইবন-খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৪০৩।

২৯. মাকরিজি 'খিত্তাত', খণ্ড-২, পৃঃ ৪০৬--৭।

৩০ দেখুন পৃঃ ৬৫৮।

৩১. গিবন, 'ডিক্লাইন', বিউরি সম্পাদিত খণ্ড-৬, পৃঃ ৩৬৫।

৩২. দেখুন পৃঃ ৫৫৩।

৩৩. তুলনীয়, পৃঃ ৪৮১-এর ২ নং টীকা এবং-৫২০-এর ২ নং টীকা।

৩৪. দেখুন পৃঃ ৪৮৮।

৩৫. মাকরিজি, অনুবাদ কোয়াট্রেমেয়ার, খণ্ড-২, পৃঃ ১৪৬।

৩৬. আবু-আল-ফিদা (খণ্ড-৪, পৃঃ ৫০) ছিলেন আল-নাসির-এর ব্যক্তিগত বন্ধু। তার সাহায্যেই আল-নাসির তাঁর পিতৃপুরুষের রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আবু-আল-ফিদা নিজে শত্রু সৈন্যকে তাঁর নিজের শহর 'হামাহ'-এর ওপর দিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

৩৭. ইবন্-ইয়াহিয়া পৃঃ ১৩৬-৭।

৩৮. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৪, পৃঃ ৪৮,৫৩-৪, ৯০-৯১: ইবন্ খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৪১৯-২০, ৪২৯-৩০।

৩৯. আবু-আল-ফিদা, খণ্ড-৪, পৃঃ ৮৯।

৪০. মাকরিজি, 'খিতাত, খণ্ড-২, পৃঃ ২০৯-১০। তুলনীয় ঃ মাসউদী, তানবীহ, পৃঃ ২৫৮।

৪১. সোনালি অক্ষরে লেখা এক অপূর্ব পাণ্ডুলিপি। লিখেছিলেন সেক্রেটারি আল-হুসাইনি এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল নাসিরকে। এই বর্ণনা আছে হিট্টি, ফারসি এবং আবদ্-আল-মালিক-এর 'ক্যাটালগ অফ্ অ্যারাবিক ম্যানুস্ক্রিপটস্, নং ১০৬৬।

৪২. খণ্ড-১, পৃঃ ১৯১।

৪৩. ইবন খালদুন, খণ্ড-৫, পৃঃ ৪৭২; ইবন-তাগরি-বিরদি, খণ্ড-৬, পর্ব-২, পৃঃ ১।

৪৪. বংশলতিকা সারণীটি দেখুন।

॥ অধ্যায় ৪৮ ॥

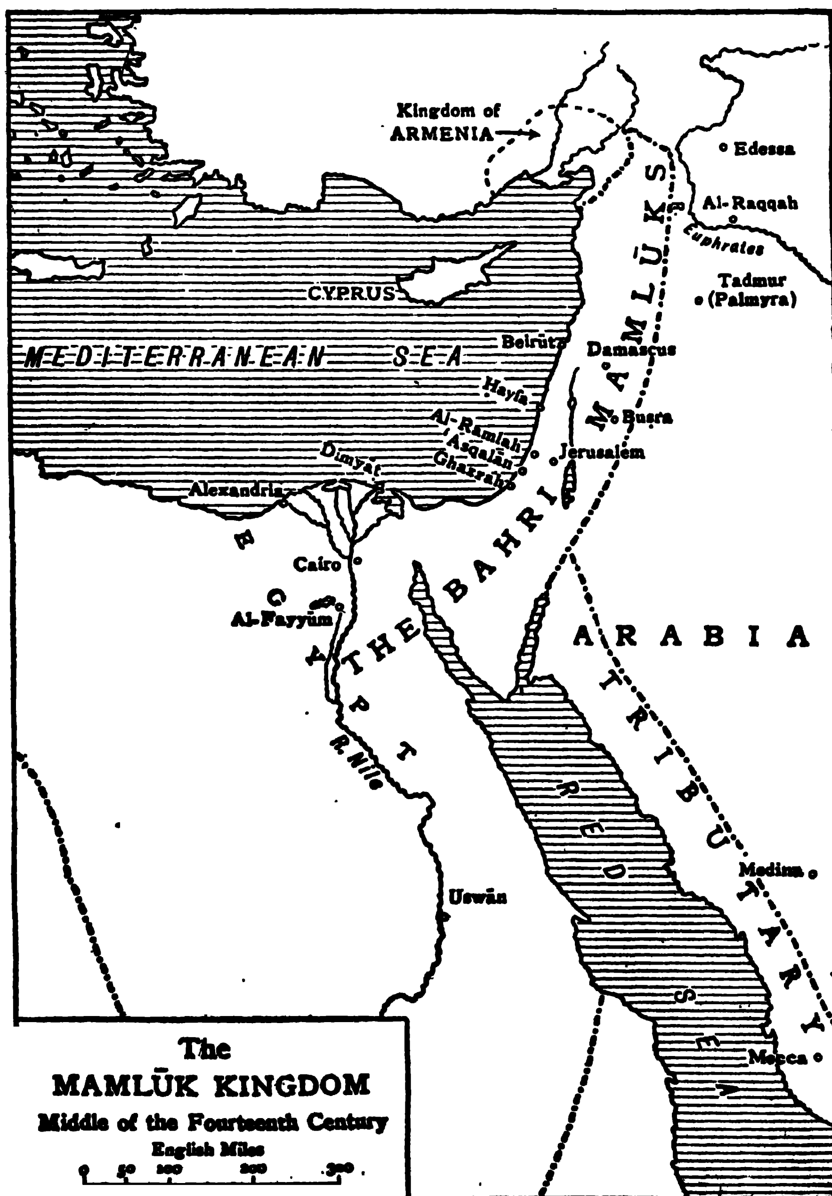
বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক প্রয়াস

মামলুক মিশরের যাত্রা শুরু হয় বিজয়গৌরবে গরীয়ান সুলতানদের হাত ধরে। মামলুকরা একদিকে যেমন সিরিয়ার বুক থেকে ফ্র্যাঙ্ক আধিপত্যের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলেছিল, তেমনই থামিয়ে দিতে পেরেছিল মঙ্গোলদের বিজয়রথও।

সামরিক ও প্রশাসনিক সাফল্য দিয়ে সূচনা হলেও মামলুক পর্বের শেষদিকে নানা অরাজকতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় মিশর এবং সিরিয়াকে। মামলুকদের সামরিক শক্তি যেমন হ্রাস পেয়েছিল, তেমনই মাথা-চাড়া দিয়েছিল জাতিদ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ। মুদ্রার অবমূল্যায়ন, চড়া করের বোঝা এবং ঘনঘন খরা ও মহামারী সাধারণ মানুষের জীবনে ঘোর অনিশ্চয়তা ডেকে এনেছিল। প্রাচীন কুসংস্কার এবং তুকতাক ও জাদুবিদ্যার চল অন্যত্র তেমন না থাকলেও নীলনদের উপত্যকায় তা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। সেইসঙ্গে সংস্কারবিরোধী রক্ষণশীলতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় উচ্চমানের বৌদ্ধিক অবদানের প্রত্যাশাও করা যায় না। অষ্টম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আরব দুনিয়ার যে আধিপত্য চলে আসছিল ১৩ শতাব্দীর গোড়া থেকেই তার ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে।[১] শুধুই সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অবিরাম প্রয়াস একের পর এক প্রজন্মের মানসিক ও নৈতিক অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবসাদের চিহ্ন ছিল সর্বত্র।

● বৈজ্ঞানিক অবদান

১৩ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ বিজ্ঞানের মাত্র দুটি শাখায় তাদের অধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল আরবরা। এই দুটি শাখা হল—ত্রিকোণমিতি-সহ জ্যোতির্বিজ্ঞান গণিত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, বিশেষ করে চক্ষুচিকিৎসা। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা গণিতে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল পারস্যের পণ্ডিতদের। এঁদের রচনা অবশ্য সবই আরবী ভাষায়। এই পণ্ডিতদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল ইল-খানিদ মানমন্দির এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত নাসির-আল-দীন আল-তুসির (১২০১-৭৪) নেতৃত্বাধীন মারাগার গ্রন্থাগার। সিরিয়ার ঐতিহাসিক আবু-আল-ফারাজ ইবন-আল-ইবরিকে[২] সিরীয় সাহিত্যের শেষ ধ্রুপদী লেখক হিসাবে গণ্য করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, সিরিয়ার জ্যাকোবাইট ক্যাথলিক (বারহেব্রিয়াস ১২২৬-৮৬) এই ঐতিহাসিক মারাগাহ গ্রন্থাগারে ইউক্লিডের উপর (১২৬৮) এবং টলেমির উপর (১২৭২-৩) ভাষণ দেন।



চোদ্দ শতকের মধ্যভাগে মামলুক সাম্রাজ্য

● চিকিৎসাবিদ্যা

মামলুক শাসনাধীন সিরিয়া ও মিশরের এই সম্মিলিত সাম্রাজ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ব্যাপারে মিশরিয় সুলতানরা অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কালাউনের তৈরি বিশাল ও সুপরিকল্পিত হাসপাতালই তার প্রমাণ। এই হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন আবু-আল-হাসান আলী ইবন-আল-নাফিস। দামাস্কাসে শিক্ষিত এই চিকিৎসক তাঁর শারহ্ তশরীহ আল-কানুন গ্রন্থে ফুসফুসে রক্ত চলাচল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার কথা জানিয়েছেন। অথচ এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় স্পেনের সারভেটাসকে[৩] যাঁর তত্ত্ব রচিত হয় আলী ইবন-আল-নাফিসের ২৫০ বছর পরে।

কালাউনের শাসনকালের এই চিকিৎসকের মৃত্যু হয় দামাস্কাসে (১২৮৮-৯)। পশুচিকিৎসার উপরে এক মূল্যবান আরবী গ্রন্থ রচিত হয় কালাউনের পুত্র আল-নাসিরের আমলে। গ্রন্থটি উৎসর্গও করা হয় আল-নাসিরকে। কামিল আল-সিনাতায়ন : আল-বাইতারাহ অ-আল-জারতাকাহ[৪] নামে এই গ্রন্থটির লেখক সুলতান আল-নাসিরের আস্তাবলের প্রধান প্রশিক্ষক আবু-বকর ইবন-আল-মুনযির আল-বাইতার (মৃ. ১৩৪০)। পশুচিকিৎসককে আরবীতে বলা হত বাইতার। গ্রিক 'হিপ্পিয়াট্রস' থেকে নেওয়া। এর থেকেই বোঝা যায়, যাযাবর থাকার সময় থেকেই আরবরা উট এবং ঘোড়ার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানলেও পশুচিকিৎসায় আরো সুসংহত জ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভবত বাইজানটাইন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেই তারা শেখে। কালাউন এবং বারকুক-সহ বেশ কয়েকজন মামলুক সুলতানের আস্তাবলেই ঘোড়ার সংগ্রহ ছিল দেখার মত। ঘোড়াকে কেন্দ্র করে ইসলামি ঐতিহ্য সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ লেখাও শুরু হয় এই সময় থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালাউনের মানসুরিয়াহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক আবদ-আল-মুমিন আল-দিময়াতির লেখা (মৃ. ১৩০৬) ফয্ল-আল-খাইল (ঘোড়ার শ্রেষ্ঠত্ব) গ্রন্থটি।

● ইহুদি চিকিৎসকগণ

আয়্যুবিয়দের সময় থেকেই মিশরের চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহুদি চিকিৎসকদেরই প্রাধান্য ছিল। বিশিষ্ট চিকিৎসক ইবন-মায়মুনের খ্যাতি ও কৃতিত্বের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এই ইহুদিরা। কিন্তু ইহুদি চিকিৎসকই হোন বা মুসলিম, একটা ক্ষেত্রে এরা পিছিয়ে ছিলেন। আর তা হল, চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন কোন পথ বা পন্থার সন্ধান পাননি তাঁরা। তবে, এ পর্যন্ত যা চর্চিত তা লিপিবদ্ধ হতে থাকে এই সময়েই। ইহুদি ও মিশরিয় ভেষজজ্ঞ আল-কুহিন (প্রধান) আল-আত্তার (ভেষজী) ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরবীতে ভেষজশাস্ত্র সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ লেখেন। নাম মিনহাজ আল-দুক্কান ওয়া-দস্তুর আল-আ'য়ান (ভেষজ ব্যবহার ও প্রয়োগের বিধি ও তালিকা)। মুসলিম প্রাচ্যে আজও এই গ্রন্থটি হারায়নি তার উপযোগিতা।

এই সময়ে এক বিশেষ ধরনের বই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত হলেও এর মধ্যে অনেকটাই ছিল কামোদ্দীপক। আজকের ভাষায় এগুলিকেই আমরা 'আদিরসাত্মক বই' হিসাবে চিহ্নিত করি। আরবী সাহিত্য সব যুগেই মূলত পুরুষপাঠ্য। এর টীকা-টিপ্পনীতে থাকা সরস মন্তব্য আজকের পাঠকের কাছে অশ্লীল মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন মিশরিয় আল-তিফাশি। পেশাগতভাবে অবশ্য তিনি জহুরি ছিলেন। ১৩ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাঁর জনপ্রিয়তার শুরু। এই সময়েই মিশরের চিকিৎসকরা মানসিক চিকিৎসার উপর বিশেষ জোর দেন। আল-রাযী প্রথম এর নাম দেন তিব্ব রুহানি (ইলাজ নাফসানি, ঝাড়ফুঁক)। এই মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন সালাহ-আল-দীনের ইহুদি চিকিৎসক হিবাতুল্লাহ ইবন-জুমাঈ (জামি)। তাঁর প্রধান গ্রন্থটির নাম আল-ইরশাদ লি-মাসালিহ আল-আনফাস অ-আল-আজসাদ (শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার পদ্ধতি)। চিকিৎসক হিসাবে ইবন-জুমাঈ-র দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। একবার, এক শবযাত্রার "শব" কে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, সে জীবিত। কারণ মৃত মানুষের মত তার দুটি পায়ের পাতা নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিল না। সে দুটি ছিল সোজা।[৫]

● চোখের রোগ

চক্ষুচিকিৎসায় আরবদের দক্ষতা সুবিদিত[৬]। মামলুক শাসনের আগে থেকেই আরবরা এই চিকিৎসার চর্চা শুরু করে। কিন্তু ১২ এবং ১৩ শতাব্দীতে সিরিয়া ও মিশরে চক্ষুচিকিৎসা হতে থাকে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। বিশ্বের অন্য কোন প্রান্তেই তখন এই চিকিৎসা এতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। ১২ শতাব্দীতে আরবীতে লেখা হয় চক্ষুচিকিৎসার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি। কায়রোর ইহুদি চক্ষুচিকিৎসক আবু-আল-ফাযাইল ইবন-আল-নাকিদের (মৃ. ১১৮৮-৯)[৭] লেখা এই গ্রন্থটির নাম মুজাররাবাত (পরীক্ষিত চিকিৎসা)। কিন্তু তারপরে চক্ষুচিকিৎসায় অগ্রগণ্য ভূমিকা নেয় সিরিয়া। ১৩ শতাব্দীর দুটি সুচিন্তিত গ্রন্থের রচয়িতাই ছিলেন সিরিয়ার চক্ষুচিকিৎসক। প্রথমটি হল আলেপ্পোর চিকিৎসক খলিফা ইবন-আবি-আল-মাহাসিন রচিত আল্-কাফি ফী আল-কুহ্ল (ভেষজ অঞ্জনের বিশদ বিবরণ)। দ্বিতীয়টির নাম নূর আল-উয়ুন ওয়া-জামি আল-ফুনুন[৮] (চোখের জ্যোতি এবং বিদ্যার বিভাগের সংক্ষিপ্তসার)। রচয়িতা সালাহ-আল-দীন ইবন-ইউসুফ ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হামাহ্‌তে চিকিৎসক ছিলেন। খলিফার উত্থান অবশ্য আরও কিছুটা আগে, ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। শল্যচিকিৎসায় নিজের দক্ষতা সম্পর্কে খলিফা ইবন-আবি-আল-মাহাসিন এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, একচক্ষু ব্যক্তির ছানি কাটতেও তাঁর কোন দ্বিধা হয়নি। মামলুক পর্বে সিরিয়ার পণ্ডিতদের উত্থানের কথা বলতে গেলে একটি বিশেষ তথ্য জানা প্রয়োজন। সিরিয়ার সব পণ্ডিতদের সাফল্যই ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ শহরগুলিতে। কারণ উপকূলবর্তী অঞ্চল ছিল ক্রুশেডারদের দ্বারা যুদ্ধবিধ্বস্ত। পরবর্তীতে কালাউন ও তাঁর বংশধরদের পাল্টা আক্রমণে শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সিরীয় উপকূলের।

● চিকিৎসাবিদ্যা-বিষয়ক ইতিহাস

আরব দুনিয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন মুয়াফ্ফাক-আল-দীন আবু-আল-আব্বাস আহমাদ ইবন-আবি-উসাইবিয়া (১২০৩-৭০)। মামলুক শাসনের প্রথম পর্বে দামাস্কাসে তাঁর উত্থান। দামাস্কাসের এক চক্ষুচিকিৎসকের পুত্র ইবন-আবি-উসাইবিয়া নিজেও ছিলেন একজন চিকিৎসক। দামাস্কাস ছাড়াও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন কায়রোতে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ইবন-আল-বাইতারের সঙ্গে তিনি ভেষজ নিয়ে গবেষণা করেন। নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন বিজ্ঞানী-চিকিৎসক আবদ-আল-লতীফ-আল-বাগদাদীর সঙ্গেও। তাঁর লেখা সেরা গ্রন্থটির নাম উয়ুন আল-আনবা ফি তাবাকাত আল-আতিব্বা[৯] (বিভিন্ন চিকিৎসকের সম্পর্কে তথ্যের ঝরনাধারা)। সুবিশাল তথ্যবহুল এই গ্রন্থে প্রায় চারশো আরব ও গ্রিক চিকিৎসকের জীবনী আছে। চিকিৎসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতেও এরা পন্ডিত ছিলেন। তাই ইবন-আবি-উসাইবিয়ার এই গ্রন্থটি আরবের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক অমূল্য তথ্যভান্ডার। সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকেও গ্রন্থটির মূল্য কম নয়। তা ছাড়া এইরকম গ্রন্থ আরবী সাহিত্যে বিশেষ লেখা হয়নি। আল-কিফতির ইখবার আল-উলামা বি-আখবার আল-হুকামা (দার্শনিক ও চিকিৎসকদের কাহিনীর মাধ্যমে এই পন্ডিতদের জানা) গ্রন্থটির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা গেলেও এটি নিছকই সংক্ষিপ্তসার।[১০] পদবি থেকেই বোঝা যায় আলী-ইবন-ইউসুফ আল-কিফতির জন্ম উচ্চতর মিশরে (১১৭২)। তবে জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটিয়েছিলেন আলেপ্পোতে। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সেখানে আয়্যুবিয় শাসকদের উজির ছিলেন।

● সমাজবিজ্ঞান : জীবনী

সমাজবিজ্ঞানে মামলুক যুগের প্রধান অবদান ছিল জীবনীগ্রন্থ। এইসময়ে ইসলামি সাহিত্যের বিশিষ্ট জীবনীকার শামস-আল-দীন (বিশ্বাসের সূর্য) আহমাদ ইবন-মুহাম্মাদ ইবন-খাল্লিকানের উত্থান হয় দামাস্কাসে। ইয়াহিয়া ইবন-খালিদ আল-বারমাকির বংশধর এই জীবনীকারের জন্ম ১২১১ খ্রিস্টাব্দে, ইরবিলে (আরবেলা)। তাঁর শিক্ষা আলেপ্পো এবং দামাস্কাসে। ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সিরিয়ার প্রধান কাযী নিযুক্ত করা হয়। তাঁর সদরদপ্তর ছিল দামাস্কাসে। মাঝে সাতবছর বাদ দিলে ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে পর্যন্ত তিনি এই পদেই আসীন ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ওয়াফায়াত আল-আয়আন ওয়া-আনবা আবনা আল-যামান[১১] (সম্প্রতি বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তিদের জীবনী এবং সমকালীন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের ইতিহাস)। গ্রন্থটিতে মুসলিম ইতিহাসের ৮৬৫ জন বিশিষ্ট মানুষের জীবনগাথা রয়েছে। যা শুধু নির্ভুলই নয়, রচনাশৈলীতেও অসাধারণ। আরবী ভাষায় জীবনীগ্রন্থের এত তথ্যনির্ভর ও নিখুঁত গ্রন্থ সেই প্রথম লেখা হয়। আরবীর প্রথম জাতীয়

জীবনচরিত অভিধান। নামের নির্ভুল বানান, যথাযথ তারিখ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বংশপরিচয়-সহ অন্যান্য তথ্যকে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন লেখক। সেইসঙ্গে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দিকগুলি তুলে ধরেছেন। আর সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন কবিতা ও টীকার মাধ্যমে। তাই অনেকের মতেই এটি "সর্বকালের সেরা জীবনীগ্রন্থ।"[11]

● ইতিহাস

জীবনীগ্রন্থ ছাড়া, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মামলুক যুগের অবদানকে মোটামুটিভাবে সমৃদ্ধই ভাল যায়। আবু-আল-ফিদা, ইবন-তাগরি-বিরদি, আল-সুয়ূতি এবং আল-মাকরিজির মত ঐতিহাসিকরা মামলুক যুগেরই ফসল। সুলতান বারকুকের আমলের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবন-খালদূন (মৃ. ১৪০৬) তাঁর পূর্ব পরিচয় এবং সাহিত্যকর্মের সূত্রে স্পেন এবং আল-মাগরিবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুলতান বারকুকের অধীনে অধ্যাপক ও বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন তিনি। সেইসঙ্গে দামাস্কাসে তাইমুরের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় সুলতান ফারাজের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বও দেন।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আবু-আল-ফিদা (১২৭৩-১৩৩২) ছিলেন সালাহ্-আল-দীনের এক ভ্রাতার বংশধর এবং সুলতান আল-নাসিরের অধীনে হামাহ্-এর রাজ্যপাল। তাঁর রচিত গ্রন্থ মুখতাসার তারিখ আল-বাশার[12] (মানব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)-এ তিনি ইবন-আল-আসীরের বিশাল ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, এই ঐতিহাসিক বিবরণকে নিজের সময়কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করেছেন। আবু-আল-মাহাসিন ইবন-তাগরি-বিরদির (১৪১১-৬৯) পিতা ছিলেন মামলুক রাজদরবারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং মাতা সুলতান বারকুকের এক তুর্কি ক্রীতদাসী। তবে শুধু পিতৃপরিচয়েই নয়, নিজগুণে একাধিক সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ইবন-তাগরি-বিরদির[13]। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আল-নুজুম আল-জাহিরাহ ফি মুলুক মিস্‌র অ-আল-কাহিরা[14] (মিশর ও কায়রোর রাজাদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র)। এতে আরবদের বিজয় থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরের ইতিহাসের বিবরণ আছে।

ইবন-আল-যাওজী, ইবন-হাজম এবং আল-তাবারীর মত জালাল-আল-দীন আল-সুয়ূতি[15] (১৪৪৫-১৫০৫) ছিলেন ইসলামি সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখক। তবে তাঁর রচনায় অভাব ছিল মৌলিকতার। ১৫ শতাব্দীর সাহিত্যের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের রচনা আরবের শিক্ষাজগতের সমস্ত বিষয়েই সমৃদ্ধ ছিল। যেমন : কোরান, আইন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কারবিদ্যা ইত্যাদি।[16] তাঁর লেখা প্রায় ৫৬০ টি গ্রন্থের নাম পাওয়া গেছে। তাঁর একটি রচনায় আলোচ্য বিষয় ছিল বিচিত্র : হযরত মুহাম্মাদ পাতলুন পরতেন কিনা, তাঁর পাগড়ি

কেমন দেখতে ছিল অথবা তাঁর পিতামাতা স্বর্গে যাবেন না নরকে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হস্তলেখাবিদ।

সেই কারণেই তাঁর নামে প্রচারিত বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি, আসলে সেগুলি তাঁর নিজের রচনা নয়, নিছকই নকল করা। তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কোরানের আলোচনা ও টীকা সংবলিত আল-ইতকান ফি উলুম আল-কুরআন[১১], ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত আল-মুজহির ফি উলুম আল-লুগাহ[১২] এবং মিশরের ইতিহাস সংক্রান্ত হুসন আল-মুহাযারাহ ফি আখবার মিস্‌র অ-আল-কাহিরাহ।[২০]

মামলুক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন তাকি-আল-দীন আহমাদ আল-মাকরিজি (১৩৬৪-১৪৪২)। আল-মাকরিজির জন্ম কায়রোতে, বা'লাবাক্কান বংশে। কায়রো এবং দামাস্কাসে সহকারী কাযী এবং শিক্ষক হিসাবে বহু উচ্চপদে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর খ্যাতির প্রধান উৎস আল-মাওয়াইজ অ-আল-ইতিবার ফি যিকর আল-খিতাত ওয়া-আল-আসার[২১] (দৃষ্টান্ত সহযোগে ধর্মোপদেশ ও শিক্ষামূলক নতুন ব্যবস্থা ও ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা) গ্রন্থটি। বিষয়বস্তু মিশরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল-সাখাবী[২২] অভিযোগ করেছিলেন, এই গ্রন্থটি রচনায় আল-মাকরিজি অন্যান্য ঐতিহাসিকের ভাব ও রচনা চুরি করেছেন। এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন ছিল তা নয়। কিন্তু সেই সময়কার অধিকাংশ রচনাই ছিল এই দোষে দুষ্ট।

● ইসলাম ও ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত

মিশরে জ্ঞানকোষ হিসাবে আহমাদ আল-নুওয়াইরির (মৃ. ১৩৩২) নিহায়ত আল-আরব ফি ফুনুন আল-আদব[২৩] এবং আহমাদ আল-কালকাশান্দির (মৃ. ১৪১৮) সুবহ আল-আ'শা-র[২৪] নাম বহুল প্রচারিত। সরকারি শাসন বিভাগের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য লেখা হলেও এই গ্রন্থগুলি মূলত মিশর ও সিরিয়া সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ। মামলুক যুগের অবশিষ্ট লেখকরা ইসলামি শিক্ষা এবং ভাষাবিদ্যার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। মামলুক যুগের এক উল্লেখযোগ্য ও অসাধারণ গ্রন্থ হল, নৌচালনার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে এক সংক্ষিপ্তসার। রচয়িতা নাজদি বংশের আহমাদ ইবন-মাজীদ।[২৫] শোনা যায়, ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকা থেকে ভারতগামী ভাস্কো ডা গামার জাহাজের নাবিক ছিলেন এই ইবন-মাজীদ।

মামলুক যুগে ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান তাকি-আল-দীন আহমাদ ইবন-তায়মিয়াহ[২৬]-এর (১২৬৩-১৩২৮)। অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও রক্ষণশীল এই পণ্ডিতের জন্ম হাররানে। তবে তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় দামাস্কাস শহর। তিনি কোরান, হাদীস এবং ইজমা ব্যতীত অপর কোন কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করেননি। এমন কী ইসলাম ধর্মে প্রচলিত নতুন

প্রথা বা বিদ'আতেরও কট্টর বিরোধী ছিলেন তিনি। যেমন বিদ'আত, ফকির-দরবেশদের আরাধনা, দরগায় তীর্থযাত্রা বা মানত। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন ইবন-হাম্বালের অনুগামী। নাজদের ওয়াহাবিরা পরে তাঁর মত অনুসরণ করে। হাদীস শাস্ত্রের আরেকজন উল্লেখযোগ্য পন্ডিত ছিলেন কায়রোর প্রধান কাযী ইবন-হাজার আল-আসকালানি (১৩৭২-১৪৪৯)। মাত্র ন'বছর বয়সেই কোরান কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি। মামলুক যুগের কবিদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র উল্লেখযোগ্য নাম্নি হল শরাফ-আল-দীন মুহাম্মাদ আল-বুসিরি (১২১৩-১২৯৬)। বার্বার বংশোদ্ভুত এই কবিই রচনা করেছিলেন বিখ্যাত গীতিকাব্য আল-বুরদাহ (পয়গম্বরের আবরণ)। হযরত মুহাম্মাদের স্মরণে রচিত এই কাব্যের অনুপ্রেরণা ছিল তাঁরই জীবনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। একবার পক্ষাঘাতে পঙ্গু কবি পয়গম্বরকে স্বপ্নে দর্শনলাভ করেছিলেন। সেই শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে আল-বুরদাহ গীতিকাব্যে। আরবীতে এর থেকে জনপ্রিয় গীতিকাব্য আর নেই। আরবী, তুর্কি, পারসি এবং বার্বারদের ভাষায় এই গীতিকাব্যের নব্বইয়ের বেশি ভাষ্য লেখা হয়েছে। আল-বুরদাহ অনূদিত হয়েছে পারসি, তুর্কি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি এবং ইতালিয় ভাষায়। আজও এই গীতিকাব্যের বিভিন্ন পঙ্ক্তি আবৃত্তি করা হয়। দ্রুজরা তাদের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে মৃত মানুষের আত্মার শান্তিকামনায় আল-বুরদাহ থেকে পাঠ করেন।

● গল্পকথন

আরব মুলুকের গল্পগাথা আজ গোটা বিশ্বের কাছে সুখপাঠ্য। কিন্তু এগুলির জনপ্রিয়তার সূচনা কিন্তু মামলুক যুগ থেকে। আন্তারা এবং বেবার্সের যে দুটি প্রেমকাহিনী আজও মুসলিম প্রাচ্যের মনে গাঁথা রয়েছে, তা পরিমার্জিত হয়েছে মামলুক যুগেই। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের যে 'আলফ লায়লা' আজ এত জনপ্রিয় তা কিন্তু মামলুক যুগের আগে ততটা জনপ্রিয় না। বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত করে তাকে ঘষামাজা করাও মামলুক যুগেরই অবদান। মামলুক সুলতানরা ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী। বিশেষ করে ধর্মযুদ্ধ পর্বের সুলতানরা। ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, তীরন্দাজি, মল্লক্রীড়া, শিকার এবং ঘোড়সওয়ারি ইত্যাদিতে উৎসাহ ও দক্ষতা তাঁদের কিংবদন্তি করে তুলেছে। আব্বাসীয় পর্বের তুলনায় মামলুক যুগের বীরদেরই বন্দনা করেছেন সমকালীন রচনাকারেরা। আরব্যরজনীর গল্পেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এমন কী মামলুক শাসিত কায়রোর রীতি রেওয়াজই তাঁদের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

● ছায়ানাট্য

১৩ শতাব্দির শেষভাগে আরবী সাহিত্যে ছায়ানাট্যের আবির্ভাব ঘটে। মুহাম্মাদ ইবন-দানিয়াল আল-খুজাই আল-মাওসিলি (মৃ. ১৩১০) রচিত তাইফ আল-খয়াল ফি-মারিফাতে খয়াল আল-জিল (ছায়ানাট্যের আলোকে কল্পনার ভূত) এইরকমই একটি সাহিত্যসৃষ্টি, যার

রচনাশৈলীও যথেষ্ট উঁচুদরের। রচনাকার ছিলেন একজন মুসলিম চিকিৎসক। তবে ইহুদি না খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত তা নিয়ে দ্বিমত আছে। বেবার্সের শাসনকালে তাঁর উত্থান। তাঁর এই রচনাই মধ্যযুগের ইসলামে ছায়ানাট্যের একমাত্র নিদর্শন যা আজও পাওয়া যায়। ছায়ানাট্যের জন্ম সম্ভবত দূর প্রাচ্যে। মুসলিমরা ভারত অথবা পারস্য দেশ থেকে এর সন্ধান পায়। নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আরবী গল্পকারেরা তাঁদের কাহিনীতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আনতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে প্রাধান্য দিতে থাকেন হাস্যরসকেও। ১২ শতাব্দী নাগাদ পুতুলনাচেরও প্রচলন শুরু হয়ে যায়। ১১ শতাব্দীতে স্পেনে বাক্যালঙ্কারের ক্ষেত্রে খায়াল আল-জিলের কথা উল্লেখ করেন ইবন-হাজম।[৩] পশ্চিম এশিয়া এবং মিশর[৩] থেকে এই নাট্যধারা প্রবাহিত হয় কনস্ট্যানটিনোপলে। এখানে প্রধান চরিত্রকে কারাগজ (কালো চক্ষু) সাজানো হত। এখান থেকে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও এই নাট্যধারা জনপ্রিয় হয়। তুর্কি পুতুলনাচের অনেক উপকরণই আরব্যরজনীর থেকে ধার নেওয়া। অনুমান করা হয়, চার্লি চ্যাপলিনের মত আধুনিককালের অভিনেতাদের উপর তুর্কি কারাগজদের প্রভাব রয়েছে।

● স্থাপত্য-শিল্প

মামলুক শাসনকাল যুদ্ধবিগ্রহে পূর্ণ হলেও অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হল, গুণমানে অসাধারণ স্থাপত্যশিল্প ও চারুকলার উন্মেষ ঘটেছিল এই যুগেই। মিশরের ইতিহাসে টলেমীয় এবং ফেরাউনি যুগের পরে এত উঁচুদরের শিল্পসৃষ্টি আর হয়নি। কালাউন, আল-নাসির এবং আল-হাসানের তৈরি মসজিদ, বিদ্যালয় ও সমাধিস্থলগুলিতে মুসলিম স্থাপত্য প্রাণময় হয়ে উঠেছিল। বুরজিদের শাসনকালে বারকুক, কায়েত-বে এবং আল-গোরির স্মৃতিসৌধগুলি স্থাপত্যশিল্পের অনুপম নিদর্শন। তারপর থেকে আরবমুলুকে আর কোন উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা বা প্রাসাদ তৈরি হয়নি।

মামলুক স্থাপত্যশৈলী গড়ে ওঠে নূরিদ এবং আয়্যুবিয় স্থাপত্যের আদলে[৩]। ১৩ শতাব্দীতে তা সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবে নতুন মাত্রা পায়। কারণ এই ১৩ শতাব্দীতে মঙ্গোল আক্রমণের ভয়ে হাজার হাজার মুসলিম শিল্পী ও কারিগর আল-মাওসিল, বাগদাদ এবং দামাস্কাস থেকে পালিয়ে এসে মিশরে আশ্রয় নেয়। ধর্মযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মিশরের উত্তরাঞ্চলে প্রস্তর-নির্মিত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আর কোন বাধাও ছিল না। তা ছাড়া, এই সময় থেকে অট্টালিকা বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইঁটের স্থান নেয় পাথর। মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয় তৈরির ক্রুশাকার কাঠামোকে গড়ে তোলা হয় আরো নিখুঁতভাবে। মামলুক আমলে একাধিক গম্বুজ তৈরি হয়েছিল। প্রত্যেকটিই ছিল আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত। রোমান বা বাইজানটাইন শিল্পধারার আদলে বিভিন্ন বর্ণ ও আকারের পাথর পরপর সাজিয়ে অসাধারণ নকশা (আবলাক)[৩] তৈরি করা হত। মামলুক পর্বে ঝুলন্ত খিলান ছাড়াও মুসলিম স্থাপত্যের

দুটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য আরো উন্নত হয়ে ওঠে। এই দুই বৈশিষ্ট্য হল, জ্যামিতিক নকশা ও কুফিক লিপি খোদাই। তবে মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে থেকেও মিশরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলিম শাসনের সব পর্বেই স্পেন ও পারস্যের তুলনায় মিশর ও সিরিয়ার স্থাপত্যে পশুপাখির নকশার ব্যবহার ছিল অনেক কম। সবচেয়ে সুখের কথা, মামলুক স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শনগুলি আজও অক্ষত আছে। এত শতাব্দী পরেও আজকের পর্যটক ও গবেষকদের কাছে তা বিশেষ আগ্রহের বস্তু।

● শিল্পকলা

ফলিত শিল্পের প্রায় সব শাখাই ছিল নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে ধর্মসংক্রান্ত নির্মাণ। এইসব শিল্পের নিদর্শন আজও রয়েছে। যেমন ব্রোঞ্জের অসাধারণ নকশা করা মসজিদ দুয়ার, সুন্দর আরবীয় নকশা করা ব্রোঞ্জের ঝাড়লণ্ঠন, কোরান রাখার জন্য সোনার উপর রত্নখচিত বাক্স। এছাড়াও মসজিদের কুলুঙ্গিতে নানাবর্ণের কাচের নকশা, মসজিদের প্রচারমঞ্চ ও প্রচারবেদীতে কাঠের সূক্ষ্ম নকশা মামলুক যুগের শিল্পসমৃদ্ধিরই প্রকাশ।[১১] মসজিদের বিশাল দরজাগুলির অধিকাংশতেই ছিল দামাস্কাসের ধাতুর কাজ। মসজিদের বাতিদান এবং জানালা তৈরি হত রঙবাহারি কাচ দিয়ে। কাচের উপর ফুল লতাপাতার নকশা এবং আরবী লিপি খোদাই করা থাকত। মসজিদের ভিতরের দেওয়াল অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত হত নকশাদার উজ্জ্বল টালি। আল-নাসিরের নগরদুর্গের (১৩১৮) মসজিদের তোরণে কাচ ও চিনেমাটির উপর নকশা দেখা যায়। স্থাপত্যশৈলীতে কাচ ও চিনেমাটির উজ্জ্বল নকশা ছিল মামুলক যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্যের এক বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী বুরজি পর্বে রত্নখচিত নকশার প্রচলন হয়। কায়েত-বের মসজিদের দরজা বা প্রচারমঞ্চে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহুবর্ণের কাচ জোড়া লাগিয়ে নকশা, হাতির দাঁতের কাজ বা কলাই করা পাত্রের ব্যাপারে অবশ্য ইসলামি পর্বের আগে থেকেই মিশরের খ্রিস্টানদের আধিপত্য রয়েছে।

● রঙিন অক্ষর বা চিত্র দিয়ে গ্রন্থসজ্জা

তেমন বড়মাপের না হলেও মামলুক শিল্পের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল পাণ্ডুলিপির অলঙ্করণ। তবে এই অলঙ্করণ প্রায় সবক্ষেত্রেই কোরানের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সঠিক রং ও তুলির টানে এক-একটি পৃষ্ঠা রাঙিয়ে তোলা এতটাই পরিশ্রমসাধ্য ছিল যে কোরানের দুটি বা তিনটির বেশি পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ অলঙ্করণ হত না। কোরানের অলঙ্কৃত সংস্করণের বাছাই করা সংগ্রহ ছিল মামলুক সুলতানদের কাছে। কায়রোর ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ সেগুলি শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

• অভিজাত জীবনযাত্রা

শিল্পের বিকাশ বা শিল্পসৃষ্টি নিছক মসজিদ বা ধর্মের আঙিনাতেই থেমে থাকেনি। মানুষের নিত্যকার জীবনেও এসেছিল শিল্পের ছোঁয়া। সমকালীন সাহিত্যিকদের রচনায় মামলুক যুগের বিলাসবহুল জীবনের কথা বলা আছে। এই জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায় এই যুগের অপূর্ব কারুকার্যময় বিলাসসামগ্রীর নিদর্শন থেকে। একদিকে রয়েছে পেয়ালা, পাত্র, বারকোশ, ধূপদান ইত্যাদির মত নিত্যব্যবহার্য জিনিস। অন্যদিকে দেখা যায় মামলুক রাজকুমারীদের ব্যবহৃত কানের দুল, বাজুবন্ধ, গলার হার, চুড়ি ও অন্যান্য গহনা যা আজও মিশরিয় রমণীদের মনোহরণ করে।

মামলুকদের জীবনে উৎসব ও বিনোদনের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। প্রতিটি ভোজসভার পরেই থাকত, নাচ, ভোজবাজি বা ছায়ানাটিকার আসর। রাজসভার পদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে ছিলেন গৃহস্থালির প্রধান (উস্তাদার), বর্মবহনকারী (আমিব সিলাহ), ঘোড়ার প্রশিক্ষক (আমির আখুর) ভোজসভায় পেয়ালায় পানীয় ঢালার পরিচারক (সাকি খাস)।

মামলুক সুলতানদের বিলাসিতা ও ব্যয়বহুলতার দুটি নিদর্শন পেশ করা যায়। উটের পিঠে মিশরে বরফ নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য দামাস্কাস ও কায়রোর মধ্যে একাধিক কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন বারকুক। বুরজি মামলুক সুলতান জকমক (১৪৩৮-১৪৫৩) তিনবছরে ক্রীতদাস কেনা ও দানধ্যানের জন্য ৩০ লক্ষ দিনার খরচ করেছিলেন।

সিরিয়া এবং মিশর অটোমানদের দখলে আসার পর মামলুক শিল্পকলার অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়। সুলতান সেলিম বহু স্থপতি, শিল্পী ও সূত্রধরদের কনস্ট্যানটিনোপল পাঠিয়ে দেন। কেবল একটি শিল্পই সময়ের ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে টিকে যায়। তুর্কি বিজয়ের পরেও বর্ণময় ও কারুকার্যময় টালির এই শিল্প অক্ষত ছিল। সাউথ কেনসিংটন সংগ্রহশালায় বাখা দামাস্কাসের টালিই ছিল এর প্রমাণ। আজকের দামাস্কাসে তৈরি পিতলের উপর খোদাই করা বা রত্নখচিত বারকোশ, পাত্র, বাতিদান বা ফুলদানিতে এখনও মামলুক যুগের আদলই পাওয়া যায়। ❑

• টীকা •

১. দেখুন সারটন্, ইন্ট্রোডাকশন্, খণ্ড-২, মূলত পরিচিত অংশ। ইসলামি সংস্কৃতির এই ক্রম অবনতিই মধ্যযুগের অন্তিম পর্বের সূচনা করে। হিট্টির মূল ইংরেজি সংস্করণ দেখুন পৃঃ ১৪২।

২. তাঁর তারিখ-মুখতাসার-আল-দুয়াল-এর সম্পাদনা করেছিলেন আন্তুন সালিহানি (বেইরুট ১৮৯০)।

৩. আবদুল-করিম চেহাদে, 'ইব্ন আন-নাফিস-এট্ লা ডেকোভারতে ডি লা সার্কুলেশন পালমোনারি (দামাস্কাস, ১৯৫৫)।

৪. মূল আল-নাসিরি, অনুবাদ এম পেরন, লে নাসেরিঃ লা পারফেকশন দাস দিউক্স আর্টস ওয়ু ট্রাইটে কমপ্লেট ডি' হিপলজি এট্ ডি হিপিয়াট্রি আরাবেস, ৩ খণ্ড (প্যারিস ১৮৫২-৬০)।

৫. ইবন্-আবি-উসাইবিয়াহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ১১৩।

৬. দেখুন পৃঃ ৩৬৩-৪।

৭. ইবন্-আবি-উসাইবিয়াহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ১১৫-১৬।

৮. হাজ্জি-খালফাহ্, খণ্ড-৬, পৃঃ ৩৯৩।

৯. প্রথমে সম্পাদনা করেছিলেন ইমরু-আল-কায়িস ইবন্-আল-তাহহান্ (অগাস্ট ম্যুলার), ২ খণ্ড (কায়রো ১৮৮২)। পুনরায় বর্ধিত, সংশোধিত ও নির্ঘণ্ট-সহ ২ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন অগাস্ট ম্যুলার (কনিগ্সবার্গ, ১৮৮৪)।

১০. সম্পাদনা ঃ জুলিয়াস লিপার্ট (লিপজিগ, ১৯০৩)।

১১. বহু সংস্করণ। যেটি এখানে ব্যবহার হয়েছে সেটি মুদ্রিত ৩ খণ্ডে (কায়রো, ১২৯৯); অনুবাদ ডি স্লেন ৪ খণ্ড (প্যারিস, ১৮৪৩-৭১)।

১২. নিকলসন, 'লিটারারি হিসট্রি, পৃঃ ৪৫২।

১৩. যে সংস্করণটি এখানে ব্যবহার হয়েছে সেটি ৪ খণ্ডের (কনস্তানতিনোপল, ১২৮৬) তাঁর ভূগোল সংক্রান্ত পুস্তক 'তাকবীম আল-বুলদান', সম্পাদনা জে টি রিনাউদ এবং ডি স্লেন (প্যারিস, ১৮৪০); অনুবাদঃ রিনাউদ, ২ খণ্ড (প্যারিস, ১৮৪৮)।

১৪. খণ্ড-৬, পৃঃ ৪৩০, ১.৬; পৃঃ ৫৫২, ১.৫২; পৃঃ ৭৪৩, ১.১৯।

১৫. সম্পাদনা এফ জি জুইনবোল এবং ম্যাথেস, ২ খণ্ড (লিডেন, ১৮৫৫-৬১), সম্পাদনা ঃ উইলিয়াম পপার, ৩ খণ্ড (বার্কলে, ১৯০৯-২১)।

১৬. জন্মেছিলেন ঈজিপ্টের আসয়ূত (অ্যাসিউত)-এ।

১৭. তালিকা তুলনীয় তাঁর নাজম্ আল-ইকইয়ান-ফি-আ'য়ান-আল-আ'য়ান। সম্পাদনা হিট্টি (নিউইয়র্ক, ১৯২৭)।

১৮. অসংখ্য কায়রো সংস্করণ, কোনটাই সমালোচনামূলক নয়।

১৯. যে সংস্করণ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি ২ খণ্ডের (কায়রো ১৩২৫)।

২০. যে সংস্করণ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি ২ খণ্ডের (কায়রো ১৩২১)।

২১. যে সংস্করণ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি ২ খণ্ডের (বুলাক্, ১২৭০)।

২২. আল-তিব্ব-আল-মাসবুক-ফি-যাইল আল-সুলুক (বুলাক, ১৮৯৬), পৃঃ ২২।

২৩. ৯ খণ্ড (কায়রো ১৯২৩-৩৩), অসম্পূর্ণ।

২৪. ১৪ খণ্ড (কায়রো ১৯১৩-২২)।

২৫. 'কিতাব-আল-ফাওয়াইদ-ফি-উসূল আল-বাহর অ-আল-কাওয়াইদ, সম্পাদনা ঃ জি ফারান্দ (প্যারিস, ১৯২১-৩)।

২৬. তাঁর নামে যে ৫০০টি বই উল্লিখিত তার মধ্যে ৬৪টি অবশিষ্ট আছে। দেখুন কুতুবি, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৮-৯

২৭. তাঁর 'আল-ইসবাহ্-ফি-তামইজ-আল-সাহাবাহ্', ৮ খণ্ডের (কায়রো, ১৩২৩-৭)-এর কথাই উপরে বলা হয়েছে।

২৮. জন্মেছিলেন আবুসির-এ।

২৯. জে ডব্লু রেডহাউস, 'দ্য বুরদাহ্'। ডব্লু এ ক্লাউসটন-এর 'অ্যারাবীয়ান পোয়েট্রি ফর ইংলিশ রীডারস্ (গ্লাসগো, ১৮৮১), পৃঃ ৩১৯-৪১)।

৩০ আংশিক সম্পাদনা করেছেন জর্জ জ্যাকব, ৩ খণ্ড (এরল্যানগেন, ১৯১০-১২)। দেখুন কুতুবি, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩৭।

৩১. আল-আখলাক অ-আল-সিয়ার, সম্পাদনা মাহমাসানি (কায়রো), পৃঃ ২৮।

৩২. দেখুন ইবন্-আইয়াস, খণ্ড-২, পৃঃ ৩৩।

৩৩. দেখুন পৃঃ ৬৬০।

৩৪. তুলনীয় হিট্টির ইংরেজি সংস্করণের পৃঃ ৬৮০।

৩৫ ইলাসট্রেশনের জন্য দেখুন গ্যাসটন উইয়েট 'ক্যাটালগ জেনারেল দ্ মিউসি আবারে দ্ কায়রে, ল্যাম্পেস এট্ বুটেলেস্ এন ভের এমালিয়ে (কায়রো, ১৯২৯)।

৩৬. সুবহ্, খণ্ড-৪, পৃঃ ১৮; মাকরিজি, খিতাত, খণ্ড-২, পৃঃ ২২২; জাহিরি, পৃঃ ১১৪, গুডেফ্রয়-ডেমোমবাইনস্, "লা সিরিয়ে আল-এপোক-দাস-মামলুক (প্যারিস, ১৯২৩), পৃঃ এল।

৩৭. জাহিরি, পৃঃ ১১৭-১৮। উমারি পৃঃ ১৮৪।

৩৮. ইবন্ তাগরি-বিরদি, খণ্ড-৭, পৃঃ ২৪৬।

॥ অধ্যায় ৪৯ ॥

মামলুক শাসনের অবসান

মামলুক শাসকরা ছিলেন দুটি রাজবংশে বিভক্ত। বাহরি এবং বুরজি। দুটি বংশই মামলুক ধারার অন্তর্গত হলেও দু'পক্ষের মধ্যে ফারাক ছিল স্পষ্ট। বাহরিরা ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। বুরজিদের মধ্যে দু'জন সুলতান বাদে সকলেই ছিলেন সারকাসিয়। খুশকদম (১৪৬১-৭) এবং তাইমুরবুগা (১৪৬৭) নামে এই দুই সুলতান ছিলেন গ্রিক।[১] সুলতানের পদের ক্ষেত্রে বংশপরম্পরাকে গুরুত্ব দিতে একেবারেই নারাজ ছিল বুরজিরা। এব্যাপারে বাহরিদের থেকে তারা ছিল অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে পদমর্যাদায় সুলতান শীর্ষে থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু থাকত সেনাবাহিনীরই দখলে। মোট ২৩ জন বুরজি সুলতান ১৩৪ বছর (১৩৮২-১৫১৭) ধরে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, এদের মধ্যে ন'জন রাজত্ব করেছেন ১২৪ বছর ধরে। বাকি ১৪ জনের শাসনকাল ছিল নেহাতই স্বল্পায়ু। একটি হিসাব থেকেই এই স্বল্প মেয়াদের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৪২১ খ্রিস্টাব্দেই তিনজন সুলতান তখতে বসেছেন। ১২৪ বছরে যে ন'জন সুলতান রাজত্ব করেছেন তাঁরা হলেন—বারকুক, ফারাজ, আল-মুয়াইয়াদ শেইখ, বার্সবে, জাকমাক, আইনাল, খুশকদম, কায়েত-বে এবং কানশ আল-গরি।[২] এদের মধ্যে কায়েত-বে শাসন করেছেন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে (১৪৬৮-৯৫)। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর শাসনকালকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩]

● বুরজি সুলতানদের আদর্শ

ষড়যন্ত্র, লুঠতরাজ এবং হত্যার ক্ষেত্রে বাহরিদের প্রবণতাই অব্যাহত রেখেছিল বুরজিরা। সেই কারণেই, বুরজি যুগকে সিরিয়া ও মিশরের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বের একাধিক সুলতান ছিলেন বিশ্বাসঘাতক ও রক্তপিপাসু। কয়েকজন সবদিক থেকেই সুলতান হওয়ার অযোগ্য ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত এবং হীনরুচির। সুলতান আল-মুয়াইয়াদ শেইখের (১৪১২-২১) কুকীর্তি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৪] মদ্যপ এই সুলতানকে এক সারকাসিয় ক্রীতদাস-বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছিলেন বারকুক। এই বারকুক পিতৃপরিচয়ের দিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন। বুরজি সুলতানদের মধ্যে একমাত্র তাঁর পিতাই ছিলেন মুসলিম।

সুলতান বার্সবে (১৪২২-৩৮) ছিলেন বারকুকের আরেক ক্রীতদাস। তিনি একবর্ণও আরবী জানতেন না। এক গুরুতর অসুখ থেকে তাঁকে সুস্থ করতে না পারার অপরাধে দুই চিকিৎসকের মাথা কেটে ফেলেন তিনি। সুলতান আইনাল (১৪৫৩-৬০) বারকুকের ক্রীতদাস ছিলেন। সম্পূর্ণ নিরক্ষর এই সুলতান সরকারি নথিপত্রে নিজের নাম সই করতেন তাঁর সচিবের হস্তাক্ষর নকল করে। সুলতানের সমসাময়িক ইবন-তাগরি-বিরদির[৬] মতে, আইনাল কোরানের প্রথম সূরাও নির্ভুলভাবে পাঠ করতে পারতেন না। বেবার্স সহ অন্য কয়েকজন মামলুক সুলতানের মত তাঁর বিরুদ্ধেও সমকামিতার অভিযোগ ছিল। 'আব্বাসীয় আমলের কুখ্যাত'[৭] গিলমান সংস্থা মামলুক যুগেও বেড়ে উঠতে থাকে। সুলতান ইয়ালবে (১৪৬৭) শুধু অশিক্ষিতই ছিলেন না, মানসিক বিকারগ্রস্তও ছিলেন।[৮] মামলুক সুলতানদের অশিক্ষিত মনোভাব ও নিষ্ঠুরতার আরো নিদর্শন আছে। সুলতান কায়েত-বে (১৪৬৮-৯৫) এক রসায়নবিদের জিভ কেটে ফেলেন ও তাঁর চোখ অন্ধ করে দেন। এই রসায়নবিদের অপরাধ ছিল— তিনি আবর্জনাকে সোনায় পরিণত করতে পারেননি। এই কায়েত-বেকে ৫০ দিনার দিয়ে কেনেন সুলতান বার্সবে। আর তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন সুলতান জাকমাক। শস্য বিক্রির উপর তাঁর চাপানো অত্যধিক করের বোঝা জনগণকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে।

মামলুক যুগে দুর্নীতি কেবল সুলতানের তখতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রশাসনের সর্বস্তরই ছিল এই দোষে দুষ্ট। বারকুক, ফারাজ, শেইখ এবং বার্সবের দেহরক্ষী থেকে শুরু করে অসংখ্য আমীর এবং ক্রীতদাসেরা নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি করে। একইভাবে তৈরি হয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা এবং সম্পদ কুক্ষিগত করা।

● বিপজ্জনক অর্থনৈতিক অবস্থা

মামলুক সুলতানদের একচোখা নীতিই তাদের সাম্রাজ্যের আর্থিক দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়। বার্সবে তাঁর আমলে গোলমরিচের মত জনপ্রিয় মশলা-সহ অন্যান্য সব মশলা ভারত থেকে আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অন্যদিকে দাম বাড়ার আগেই বাজারের সব মশলা নিজে কিনে প্রজাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করেন। চিনি তৈরির উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন বার্সবে। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের জন্য আখচাষও বন্ধ করে দেন, যাতে তাঁর নিজের মুনাফা বাড়ে। তাঁর আমলে মিশর ও তাঁর প্রতিবেশী দেশগুলি একবার প্লেগের কবলে পড়ে। আর এই রোগের প্রতিকার হিসেবে চিনির বিশেষ চাহিদা ছিল। ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে সংঘটিত প্লেগ-মহামারীর মত ভয়ানক আকার না নিলেও, শোনা যায়, এই প্লেগে কেবল কায়রো শহরেই তিনমাসে তিনলক্ষ মানুষ প্রাণ হারান। নিষ্ঠুর সুলতানের কাছে এই মহামারী ছিল প্রজাদের পাপের ফল। তাই শাস্তিস্বরূপ মহিলাদের পর্দানশিন করার ফতোয়া জারি করেন তিনি।[৯] আর করের বোঝা চাপান ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের উপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এখানেই শেষ নয়। অ-মুসলিমদের সরকারি পদ থেকে বরখাস্ত করেন বার্সবে। তাদের পোশাকের উপরেও জারি হয় নানা বিধিনিষেধ। তবে এব্যাপারে তিনিই প্রথম নন। খ্রিস্টান

এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে একই নীতি অবলম্বন করেন তাঁর বেশ কয়েকজন পূর্বসূরি এবং পরবর্তীকালে সুলতান জাকমাক ও খুশকদম।[১০] সুলতান আইনালের একাধিক পূর্বসূরি রুপোর মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেন এবং মর্জিমাফিক মূল্যবান ধাতুর মূল্য পরিবর্তন করেন।

অত্যধিক করের বোঝা কেবল অ-মুসলিমদেরই বহন করতে হত না। মামলুক যুগে কোন সুনিয়ন্ত্রিত করব্যবস্থা ছিল না। তাই সুলতানদের প্রচার, দরবারের জাঁকজমক ও সুবিশাল প্রাসাদের খরচ বহন করতে হত প্রজাদেরই। সাধারণ মানুষ এবং জনগণের পয়সায় ফুলে ফেঁপে ওঠা সরকারি আধিকারিক এবং প্রজাদের করের বোঝা বহন করতে হত। লুটেরা যাযাবররা পূর্বাঞ্চলের ব-দ্বীপ ও মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত। কৃষিপ্রধান উপত্যকার ফাল্লাহীনদের (কৃষক) উপর আঘাত হেনে এই অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে তোলে তারা। বিধ্বংসী মহামারীর পাশাপাশি নিত্য আসা-যাওয়া ছিল পঙ্গপালের। তার সঙ্গে ছিল দুর্ভিক্ষ। নীলনদের জল কমে গেলে খরা আর প্লেগের আক্রমণ এই দুর্ভিক্ষকে আরো বাড়িয়ে দিত। সুলতান ফারাজ এবং শেইখের শাসনকালে এই দুর্ভিক্ষ আরো বেড়ে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে, মামলুক যুগে সিরিয়া এবং মিশরের জনসংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়।[১১]

● ভারতীয় বাণিজ্য হাতছাড়া

মামলুক শাসনের শেষপর্বে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা দেশের দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপের সন্ধান পান। সিরিয়া ও মিশরের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে মুসলিম নৌবাহিনীর উপর পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বাহিনীর আক্রমণ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভারত ও আরবের মশলা ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান বাণিজ্যদ্রব্যের বিপণন কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব কমে যায় সিরিয়া ও মিশরের বন্দরগুলির। ইউরোপীয়রা এই কেন্দ্রকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। অতএব মিশর ও সিরিয়ার জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বিনষ্ট হয় চিরতরে। আরব উপকূলে আল-গরি-এর নৌবাহিনী বহুবার যুদ্ধ করেছে পর্তুগিজদের সঙ্গে। নিরুপায় আল-গরি পোপকে হুমকি দেন, পর্তুগিজদের না রোখা হলে খ্রিস্টানদের ধর্মস্থানগুলি ধ্বংস করে ফেলা হবে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় না। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকটে প্রথম পা রাখেন পর্তুগিজরা। গড়ে ওঠে উপনিবেশ। ১৩ বছর বাদে পর্তুগিজ সেনাপ্রধান অ্যালফনসো ডি আলবুকার্ক (আরবী, আবু-আল-কুরক(?) জুতা প্রস্তুতকারক) আক্রমণ করেন আদান (আদেন)।

● ঐতিহাসিক কার্যাবলি

মামলুক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে। যেন অযোগ্য মামলুক সুলতানদের দুর্বলতা ঢাকতেই মুসলিম সেইসব অসাধারণ নিদর্শন আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বারকুকের মসজিদ এবং সমাধি, কায়েত-বের মসজিদ এবং আল-গরি-র মসজিদ তাদের সুলতানদের নাম অন্তত একটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল করে রেখেছে। কায়েত-বের

স্মৃতিতে নির্মিত মসজিদটিতে মূল মসজিদ ছাড়াও রয়েছে সুলতানের সমাধি, একটি বিদ্যালয় ও সুদৃশ্য ফোয়ারা। শাদা ও লাল রঙের সঠিক সমন্বয়ে রাঙানো মসজিদের গম্বুজে গোলাপফুল ও লতাপাতার নিখুঁত খোদাই করা আছে। এই মসজিদগুলি ছাড়াও মামলুক যুগের স্থাপত্যে সিরিয়ার আয়ুবিয়দের প্রাণময় ও কর্মচঞ্চল ধারাই অব্যাহত ছিল।

বাহরিদের মত বুরজিদের আমলেও ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বিবিধ আরবীয় কারুকার্যের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। স্থাপত্যের মত শিল্পের ক্ষেত্রেও আল-নাসির ইবন-কালাউনের যুগের পর কায়েত-বের শাসনকালই সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

● বৈদেশিক সম্পর্ক

স্বদেশে সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ছিলেন বুরজি সুলতানেরা। কিন্তু তার থেকেও বেশি ব্যর্থ ছিলেন বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। বুরজিদের প্রথম সুলতানের শাসনকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই উত্তরাঞ্চলে তাইমুরের আক্রমণের আভাস পাওয়া যায়। প্রবল পরাক্রমশালী এই তাইমুর ছিলেন হুলাগু ও চিঙ্গিজ খানের যোগ্য উত্তরাধিকারী। বুরজি আমলে সিরিয়ার স্থানীয় প্রশাসকদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়েছে বারবার। এই বিদ্রোহ সিরিয়ার স্থিতিশীলতা ক্রমশ নষ্ট করে দেয়। তাইমুর ছাড়াও আরও এক শক্তিধর শত্রু বুরজিদের সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিতে শুরু করে। এরা হল আনাতোলিয়ার অটোমান তুর্কিরা।

● সাইপ্রাস বিজয়

এই নিষ্ফলা যুগে সাফল্যের একমাত্র আলো ছিল ১৪২৪-২৬ খ্রিস্টাব্দে বার্সবের সাইপ্রাস বিজয়। সাইপ্রাস আক্রমণের পিছনে মামলুক সুলতানদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে জলদস্যুদের ঘাঁটি ধ্বংস করা। এই জলদস্যুরা সিরিয়ার বন্দরগুলিতে বারবার আঘাত হানত। সাইপ্রাস ছিল ফ্র্যাঙ্কদের দখলে। টেম্পলার ও লুসিগনানের পর ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রিচার্ড সাইপ্রাসের শাসনভার গ্রহণ করেন। ধর্মযোদ্ধাদের সক্রিয় সমর্থক সাইপ্রাস ছিল মামলুক সাম্রাজ্যের আতঙ্ক। সাইপ্রাসের ঘন ঘন আক্রমণে বিপর্যস্ত মামলুক সুলতান বেবার্স ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ক্যাপ্রিয়ত আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীকে লিমাসল থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু বার্সবের সেনাবাহিনী ছিল আরো শক্তিশালী। লিমাসল দখল করে তারা লারনাকার দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে লুসিগনান বাহিনীকে পরাস্ত এবং বন্দি করা হয় রাজা জেনাসকে। রাজা সহ আরো সহস্রাধিক বন্দিকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে কায়রোর পথে পথে ঘুরিয়ে সুলতানের সামনে পেশ করা হয়। সুলতানের পায়ের তলার মাটি চুম্বন করতে বাধ্য করা হয় রাজা জেনাসকে।[১২] মাটি চুম্বন করেই তিনি জ্ঞান হারান। পরে নগর দুর্গের কারাগারে তাঁকে বন্দি করা হয়। ইবন-তাগরি-বিরদি[১৩] পরে এই বন্দি রাজার সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। তাঁর রচনায় এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। পরে ভেনেশিয়ান দূতের হস্তক্ষেপে

রাজাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশ্য বিনাশর্তে নয়। দু'লক্ষ দিনার মুক্তিপণ এবং বাৎসরিক দু'লক্ষ দিনার করের বিনিময়ে রাজসিংহাসন ফেরত পান রাজা জেনাস। রোডসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন বার্সবে। রোডসের সেন্ট জনের নাইটরা ক্যাপ্রিয়তের সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রায়ই মিশর আক্রমণ করত। বুরজি আমল জুড়েই সাইপ্রাস ছিল মামলুকদের দখলে। কিন্তু বুরজিদের অসংখ্য পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সাইপ্রাস যথেষ্ট ছিল না।

● তাইমুর

তাইমুর ল্যাং-এর জন্ম ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্সঅক্সিয়ানায়। উচ্চারণের ভুলে প্রায়ই তাঁকে তেমারলেন বলা হয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন চিঙ্গিজ খানের পুত্রের উজির। কিন্তু এই পরিবারটি নিজেদেরকে চিঙ্গিজের বংশধর বলে দাবি করত। ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে তাঁর জীবনী রচনা করেছিলেন ইবন-আরব-শাহ।[১৪] তাঁর দাবি, তাইমুর ছিলেন এক মুচির সন্তান। প্রথম জীবনে রাহাজানি ছিল তাঁর পেশা। ল্যাং (খঞ্জ) 'বিশেষণের' উৎস— ভেড়া চুরি করতে ধরা পড়ে গিয়ে পাওয়া পায়ের চোট। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে তাইমুর তাতার গোষ্ঠীর প্রধান হন। তারপর একের পর এক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আফগানিস্তান, পারস্য, ফারিস এবং কুর্দিস্তান তাঁর দখলে আসে। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদ অধিকার করেন এবং তার পরের বছর মেসোপটেমিয়া। সালাহ-আল-দীনের জন্মস্থান তাকরিতে তাইমুর তাঁর হাতে মৃত ব্যক্তিদের খুলি দিয়ে তৈরি করেন এক পিরামিড। ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিপচাক অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মস্কো নিজের দখলে রাখেন। তিনবছর বাদে তাইমুর উত্তর ভারতে হানা দেন এবং ৮০ হাজার দিল্লিবাসীর প্রাণ নেন। বারকুক তাঁর শাসনকালের শেষভাগে তাইমুরের দূতদের হত্যার চক্রান্ত করেন। পরে অবশ্য দু'পক্ষের মধ্যে মৈত্রী হয়।

১৪০০ খ্রিস্টাব্দে ঝড়ের মত উত্তর সিরিয়ার উপর আছড়ে পড়েন তাইমুর। তিনদিন ধরে ধ্বংসলীলা চলে আলেপ্পো শহরের উপর। ২০ হাজারেরও বেশি আলেপ্পোবাসী মুসলিমদের মাথা জড় করে এক স্তূপ তৈরি হয়। এর উচ্চতা দশ হাত, প্রস্থ ২০ হাত। সবকটি মুখই রাখা হয়েছিল বাইরের দিকে।[১৫] নূরিদ এবং আয়্যুবিয় যুগে তৈরি আলেপ্পোর মসজিদ ও বিদ্যালয়ের মত অমূল্য সম্পদগুলি চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পরপর হামাহ্, হিমস এবং বা'লাবাক তাইমুরের দখলে চলে আসে। বিপদের সঙ্কেত পেয়ে প্রতিরোধ করতে আসা সুলতান ফারাজের মিশরিয় বাহিনীকে হটিয়ে দামাস্কাস অধিকার করেন তাইমুর (ফেব্রুয়ারি, ১৪০১)। দামাস্কাস অবরোধ করে রাখার সময় সেখানে এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাইমুর নামেমাত্র মুসলমান হলেও শী'আহ্দের মতের প্রতি তাঁর কিছুটা বিশ্বাস ছিল। নিজের অপকর্মের সপক্ষে তিনি শী'আহ্ সম্প্রদায়ের এক উলামার কাছ থেকে অনুমোদন আদায় করেন জোর করে। উমাইয়াদ মসজিদের দেওয়াল ছাড়া কিছুই অক্ষত রাখেননি তিনি।[১৬] দামাস্কাসের বাছাই করা পণ্ডিত,

শিল্পী ও শ্রমিকদের তাঁর রাজধানী সমরকন্দে নিয়ে আসেন তাইমুর। ইসলামি বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে সমরকন্দের কাজে লাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার এই লুণ্ঠন দামাস্কাসকে দীন করে দেয় সেই সময় থেকেই। ইবন-তাগরি-বিরদি[১৭]র পিতা ছিলেন সুলতান ফারাজের প্রধান বর্মধারী। তাই তাঁর কলমে তাইমুরের অভিযানের এক জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। ইবন-খালদুন কায়রো থেকে সুলতান ফারাজের সহযোগী ছিলেন। দামাস্কাসের যে প্রতিনিধিদল তাইমুরের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে তিনি তাঁর নেতৃত্ব দেন। দামাস্কাস থেকে দ্রুত বাগদাদ ফিরে আসেন তাইমুর। সেখানে তাঁর কয়েকজন আধিকারিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ব্যাপক হত্যালীলা চালান তিনি। মৃতদের মাথা দিয়ে শহরের চারপাশে ১২০ টি মিনার খাড়া করেন।

পরবর্তী দু'বছরে তাইমুর এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন এবং ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই আঙ্কারায় অটোমান সেনাদের পরাস্ত করেন। সুলতান প্রথম বায়াজিদ তাঁর হাতে বন্দি হন। পূর্বতন রাজধানী ব্রুসা এবং স্মিরনাও দখল করেন তাইমুর। বন্দি সুলতানকে রাতে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। আর চারদিকে গরাদ (কাফাস) দেওয়া দুই ঘোড়ায় টানা ডুলিতে করে তাঁকে ঘোরানো হত। কাফাস কথাটি ইবন-আরব-শাহের[১৮] এক রচনায় ভুল প্রয়োগ করা হয়। তার থেকেই চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে, বায়াজিদকে লোহার খাঁচায় রাখা হয়েছিল। ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে এক অভিযানের সময় মৃত্যু হয় তাইমুরের। আর তাঁর মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মিশরের মামলুক সুলতানরা। সমরকন্দে তাঁর কবর আজও অক্ষত আছে।

● তাইমুরের উত্তরসূরি

তাইমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহ-রুখ (১৪০৭-৪৭) মামলুক সুলতান বার্সবের সঙ্গে এক বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। নিজের শপথ রক্ষা করার জন্য কা'বায় চাদর চড়ানোর অধিকার চেয়ে মামলুক সুলতানের কাছে দূত পাঠান তিনি। ক্ষমতাশালী মুসলিম শাসক হিসাবে এই অধিকার ভোগ করতেন মামলুকরা। নিজের কাযীদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্সবে কৌশলে এই অধিকার থেকে শাহ-রুখকে বঞ্চিত করার জন্য বলেন, মক্কার দরিদ্রদের জন্য অর্থব্যয় করলেই তাঁর শপথ রক্ষা হবে।[১৯] এর উত্তরে শাহ-রুখ একটি সুসভ্য পোশাক তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং নির্ভরশীলতার প্রতীক স্বরূপ পাঠান। সুলতান যেন তা গ্রহণ করে নিজেকে শাহ-রুখের অনুগত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রুদ্ধ বার্সবে পোশাকটি ছিঁড়ে ফেলে শাহ-রুখের দূতকে চাবুক পেটা করে একটি জলাধারে তার মাথা ডুবিয়ে রাখেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে এক দূতের উপর এই অকথ্য অত্যাচারের সাক্ষী ছিলেন ইবন-তাগরি-বিরদি।[২০] শাহ-রুখের পর তাইমুরের বংশধরদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ বেড়েই চলে। এর ফলে সাফাবীদের উত্থান এবং অটোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন হয়।

● অটোমান তুর্কি

মঙ্গোলিয়ায় অটোমান তুর্কদের উত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়।[২১] মধ্য এশিয়ায় ইরানিয় উপজাতিদের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটে। এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে তারা তাদের আত্মীয় সালজুকদের স্থানচ্যুত করে ১৪ শতকের গোড়ার দিকে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বাইজানটাইন সম্রাট এবং আরবের খলিফাদের স্থানচ্যুত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। উসমানের (১২৯৯-১৩২৬) প্রপৌত্র প্রথম বায়াজিদ (১৩৮৯-১৪০২) ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আমলে সিরিয়ার উত্তর সীমান্ত থেকে দানিউব পর্যন্ত বিস্তৃত অটোমান তুর্কদের এশিয় সাম্রাজ্যের প্রায় সবটাই বেদখল হয়ে যায়। তাঁর পুত্র প্রথম মুহাম্মাদের (১৪০২-২১) আমলে অবশ্য ইউরোপের হাত থেকে হৃতসাম্রাজ্যের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করা হয়। তবে মিশরের সুলতানদের কাছে অটোমানরা সত্যিই উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে প্রথম মুহাম্মাদের প্রপৌত্র দ্বিতীয় বায়াজিদের (১৪৮১-১৫১২) আমলে। সেইসময়ে মিশরের সুলতান ছিলেন কায়েত-বে। দুপক্ষের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ দেখা দেয় এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সীমান্তে। তাদের অধীনস্থ দেশগুলির মধ্যে বারংবার সংঘর্ষ হতে থাকে। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বায়াজিদের ভাই এবং সিংহাসনের দাবিদার পলাতক জেমকে আশ্রয় দিয়ে নতুন করে বিপদ ডেকে আনেন কায়েত-বে। পরে জেমকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলে সুলতান তাঁকে মিশরে ফিরিয়ে আনতে পোপের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর পর তুর্কিদের কট্টর বিরোধী পারস্যের শাহ ইসমাঈলকে (১৫০২-২৪) গোপনে সমর্থনের আশ্বাস দেন কানশ আল-গরি। আর তাতেই তুর্কিদের সঙ্গে মামলুকদের বিরোধ আরো বেড়ে যায়। এই বিরোধই শেষপর্যন্ত মামলুক সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

● সাফাবীয়

ইসমাঈল ছিলেন সাফাবীয় রাজবংশের (১৫০২-১৭৩৬) প্রতিষ্ঠাতা। মুসলিম পারস্যের রাজবংশের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এই সাফাবীয় রাজবংশের। নামটি পবিত্র শেখ-সফি-আল-দীনের (পবিত্র বিশ্বাসভাজন) নাম থেকে নেওয়া। ইসমাঈল ছিলেন এঁর ষষ্ঠ বংশধর। শী'আহ্ ধর্মমতে বিশ্বাসী এই রাজবংশ সপ্তম ইমাম মুসা আল-কাজিমের বংশোদ্ভূত। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তারা শী'আহ্ ধর্মমতকে বিশেষত 'ইস্না আশারিয়া' মতবাদকে পারস্যের জাতীয় ধর্ম ঘোষণা করেন। সেই থেকেই এই ধর্মবিশ্বাসে অটল থেকেছে পারস্য। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উরমিয়াহ হ্রদের উত্তরে চালদিরানে দ্বিতীয় বায়াজিদের পুত্র সুন্নি অটোমান প্রথম সালীমের (১৫১২-২০) সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ইসমাঈলের। কিন্তু জেনিসারির[২২] উন্নতমানের কামানের মুখে হার মানে ইসমাঈলের অশ্বারোহীরা। তুর্করা এরপর ইসমাঈলের রাজধানী তিবরিজ, মেসোপটেমিয়া এবং আর্মেনিয়ার কিছু অংশ দখল করে (১৫১৫)।

● মারজ দাবিকের চূড়ান্ত যুদ্ধ

পরের বছর বসন্তকালে কানশ আলেপ্পোর দিকে অগ্রসর হন। বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করাবার নামে গেলেও তাঁরই আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বন্ধু পারস্যের ইসমাঈলকে সাহায্য করা। তাঁর উদ্দেশ্যকে শান্তিপূর্ণ রূপ দিতে তিনি তাঁর প্রধান কাযী এবং তাঁর অধীনস্থ খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে সঙ্গে নেন। কিন্তু সালীমকে পরাস্ত করা তত সহজ ছিল না। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি মামলুক সুলতানের আসল উদ্দেশ্যের কথা জানতে চান। কানশ-এর দূত সালীমের শিবিরে গেলে তাকে অপমান করার জন্য তার দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে মামলুক শিবিরে ফেরত পাঠানো হয়। সুলতানের সহযোগীদের হত্যা করে ফেলা হয়। আসন্ন বিপর্যয় ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কায়েত-বের এককালের ক্রীতদাস কানশ-এর তখন ৭৫ বছর বয়স। কিন্তু তখনও তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তাঁর শাসনকাল জুড়ে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে তিনি উত্তর সিরিয়ার প্রশাসকদের আনুগত্যে বা মিশরিয় আমীরদের সহযোগিতার উপর আস্থা রাখতে পারেননি।

দুপক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্মুখসমর শুরু হয় ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট, আলেপ্পোর কাছে মারজ দাবিকে। আলেপ্পোর বিশ্বাসঘাতক প্রশাসক খাইর বের উপর একটি সৈন্যদলের দায়িত্ব দেন কানশ। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক এই সেনাপ্রধান প্রথম সুযোগেই তাঁর সেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান। সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত সুলতান ঘোড়া থেকে পড়ে যান।[২৫] অতঃপর অটোমানদের জয়ের পথও সুগম হয়ে যায়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে তুর্কি সেনারা অনেক এগিয়ে ছিল। তাদের কামান, গাদা বন্দুক এবং অন্যান্য দূরপাল্লার অস্ত্রের কাছে হার মেনেছিল মামলুক অশ্বারোহী এবং তাদের বেদুইন ও নিগ্রো সেনারা। তুর্কিরা এর কিছুদিন আগে থেকেই বারুদের ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সিরিয়া ও মিশরের যোদ্ধারা তখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রাচীন ধারণার প্রতিই বেশি আস্থাশীল ছিল। তারা মনে করত, অস্ত্র নয়, যোদ্ধার শৌর্যই যুদ্ধের প্রকৃত নিয়ন্তা। মামলুকদের পরাজিত করে সালীম আলেপ্পোতে প্রবেশ করেন। মামলুকদের পক্ষে যারা তখনও জীবিত ছিল তাদের কাছে সালীম ছিলেন ত্রাণকর্তা। আলেপ্পোতে তাঁকে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা করেনি তারা। সালীম অবশ্য খলিফার প্রতি কোনরকম নিষ্ঠুরতা দেখাননি। আলেপ্পোর নগরদুর্গে তিনি সুলতানদের জমা করা লক্ষ লক্ষ দিনার মূল্যের সম্পদ পান। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি দামাস্কাসের দিকে পা বাড়ান সালীম। সেখানে অবশ্য তাঁকে বিশেষ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন বিনাযুদ্ধে। বাকিরা মিশরে পালিয়ে যান। অতএব সহজেই সিরিয়া তাঁর দখলে চলে আসে। এরপর চারশো বছর ধরে সিরিয়ায় অটোমানদের রাজত্ব কায়েম ছিল।

● মিশর বিজয়

সিরিয়া দখল করে দক্ষিণে মিশর আক্রমণ করেন সেলিম। মিশরের সুলতানের পদে তখন ছিলেন কানশ-এর ক্রীতদাস তুমান-বে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি কায়রোর সীমানার বাইরে দুপক্ষের লড়াই শুরু হয়। তুমান প্রথমে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধজয়ের জন্য তাঁর বীরত্বই যথেষ্ট ছিল না। মামলুক সেনাদের দুর্নীতি, আমীরদের ঈর্ষাকাতরতা, অর্থ এবং আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল অটোমানদের কামান-বন্দুকের ক্ষমতা। সব মিলিয়ে তুমানের প্রতিরোধ ভেসে যায় খড়কুটোর মত। বেদুইন সেনাদের মদতপুষ্ট সালম শেষপর্যন্ত কায়রোয় প্রবেশ করেন। অবাধে লুঠতরাজ চালানো ছাড়াও ইচ্ছামতো মামলুকদের হত্যা করেন তিনি।

মামলুকদের অবশিষ্ট সেনারা নীলনদের দক্ষিণ তটে সেলিমের বন্দুকের শিকার হয়। তুমান-বে পালিয়ে গিয়ে এক বেদুইন গোষ্ঠীপতির কাছে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় তাঁর সঙ্গে। অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্যি যে, কায়রোর একটি প্রধান প্রবেশদ্বারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।[২৪] চিরতরে মুছে যায় মামলুকদের আধিপত্য। সালাহ-আল-দীনের সময় থেকেই প্রাচ্যের ইসলামি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কায়রো। অটোমানদের হাতে তার সার্বভৌমত্ব হারিয়ে সেই কায়রো এক প্রাদেশিক নগরে পরিণত হয়। মক্কা ও আল-মদীনা স্বাভাবিকভাবেই অটোমানদের দখলে চলে আসে। শুক্রবারের নামাযের পরিচালক মিশরিয় খতিবগণ সেলিমের প্রতি আল্লাহ্র আশিস্বাণী প্রচার করেন এইভাবে :

"হে প্রতিপালক! সুলতানকে আশীর্বাদ করুন। সুলতানের পুত্র, দুটি দেশ ও দুই সাগরের বিজয়ী ও শাসক, দুই ইরাকের সম্রাট এবং দুটি পবিত্র শহরের মন্ত্রী বিজয়ী রাজা সেলিম শাহ। হে প্রতিপালক! তাঁকে অনুগ্রহ করুন; তাঁকে আরো যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ করুন, হে দুনিয়া ও আখিরাত এবং বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ।"[২৫]

● অটোমান খিলাফত

হেমন্তকাল পর্যন্ত মিশরে ছিলেন সালীম। এইসময় তিনি পিরামিড, আলেকজান্দ্রিয়া এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখেন। এরপর তিনি কনস্ট্যানটিনোপলে ফিরে যান। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই কনস্ট্যানটিনোপলই ছিল অটোমানদের রাজধানী। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে সঙ্গে নিয়ে আসেন তিনি। পরে তহবিল তছরুপের দায়ে তাঁকে বন্দি করেন। পরে সালীমের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী সুলাইমান খলিফাকে কায়রোয় ফেরত পাঠান। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই কায়রোতেই খলিফার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয় খলিফাদের নামে দীর্ঘদিনের প্রহসনের সমাপ্তি ঘটে। খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর পদ অটোমান সুলতানের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।[২৬] এই অভিযোগের সপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকলেও একথা সত্যি যে, সালীম খলিফাসুলভ সুবিধা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে 'খলিফা' উপাধিটিও

শেষপর্যন্ত নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেন। সালীমের কয়েকজন উত্তরসূরিও ছিলেন স্বঘোষিত খলিফা। তবে এই উপাধি ছিল নেহাতই সৌজন্যমূলক। আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের সাম্রাজ্যের বাইরে এই উপাধির কোন স্বীকৃতি ছিল না। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে রুশ ও তুর্কিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত কুচুক কেনারজির চুক্তিতে অটোমান সুলতানকে 'খলিফা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সেই প্রথম কোন কূটনৈতিক নথিতে কোন অটোমান সুলতানকে 'খলিফা' উপাধি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই চুক্তিতেই প্রথম তুর্কির বাইরে মুসলিমদের উপর অটোমান সুলতানের ধর্মীয় কর্তৃত্বকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

কনস্ট্যানটিনোপলের এই সুলতান-খলিফারাই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মুসলিম শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁরা শুধু বাগদাদের খলিফাদের উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, বাইজানটিয়ামের সম্রাটদেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন।[২৭] মামলুক শাসনের অবসান এবং বসপোরাসে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিমদিকে সরতে থাকে। সেইসময় গোটা বিশ্বের সভ্যতা ও অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে পশ্চিমে। আমেরিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপথকে নতুন দিশা দেখায়। সেইসঙ্গে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের গোটা অঞ্চল ক্রমশই হারাতে থাকে তাদের গুরুত্ব। আরব সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠা মধ্যযুগের আরব খলিফা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে এখানেই। সূচনা হয় আধুনিক যুগের অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের। □

● টীকা ●

১. ইবন্-তাগরি-বিরদি, খণ্ড-৭, পৃঃ ৬৮৫, ৮৪২, ৮৪৭।

২. তার জন্য লেখা কোরানে তাঁর নামের বানান এভাবেই লেখা হয় (মরিজ, পেলিওগ্রাফি), খণ্ড ১, পৃঃ ৮৩)। সাধারণভাবে নামটি হল কানসুহ আল-ঘুরি।

৩. বুরজি মামলুকদের তালিকা ঃ

১. আল-যাহির-সঈফ-আল-দিন-বারকুক-১৩৮২ (তাঁর রাজত্বকাল বাহরি হাজ্জির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল-১৩৮৯-৯০)

২. আল-নাসির-নাসির-আল-দিন-ফারাজ-১৩৯৮।

৩ আল-মানসুর 'ইজজ্ আল দিন আব্দ আল-আজিজ-১৪০৫। আল নাসির ফারাজ (পুনরায়)-১৪০৬।

৪. দ্য খলিফা আল আদিল আল-মুস্তাইন-১৪১২।

৫. আল্-মুয়াইয়াদ শায়খ-১৪১২।

৬. আল-মুজাফ্ফর আহমদ্-১৪২১।

৭. আল-যাহির-সঈফ-আল-দিন-তাতার-১৪২১।

৮. আল-সালিহ্-নাসির-আল-দিন মুহাম্মাদ-১৪২১।
৯. আল-আশরাফ-সঈফ-আল-দিন বার্সবে-১৪২২।
১০. আল-আজিজ জামাল-আল-দিন ইউসুফ-১৪৩৮।
১১. আল-জাহির-সঈফ-আল-দিন জাকমাক-১৪৩৮।
১২. আল-মানসুর-ফাখর-আল-দিন উসমান-১৪৫৩।
১৩. আল-আশরাক-সঈফ-আল-দিন আইনাল-১৪৫৩।
১৪. আল-মুয়াইয়াদ শিহাব-আল-দিন আহমাদ-১৪৬০।
১৫. আল-জাহির-সঈফ আল দিন খুশকদম-১৪৬১।
১৬. আল-জাহির-সঈফ-আল দিন ইয়ালবে-১৪৬৭।
১৭. আল-যাহির-তাইমুরবুগা-১৪৬৭।
১৮ আল-আশরাফ-সঈফ আল দিন কায়েতবে-১৪৬৮।
১৯. আল-নাসির-মুহাম্মাদ-১৪৯৫।
২০. আল-যাহির কান্শ-১৪৯৮।
২১. আল-আশরাফ-জান-বালাত-১৪৯৯।
২২. আল-আশরাফ কান্শ আল-গরি-১৫০০।
২৩. আল-আশরাফ-তুমান-বে-১৫১৬-১৭।

৪. ইবন্-তাগরি-বিরদি, খণ্ড-৬, পৃঃ ৩২২।
৫ সুয়ুতি, হুস্ন, খণ্ড-২, পৃঃ ৮৮।
৬. খণ্ড-৭, পৃঃ ৫৫৯।
৭. দেখুন পৃঃ ৩৪১, ৪৮৫।
৮. ইবন্-তাগ্রি-বিরদি, খণ্ড-৭, পৃঃ ৮৩১, ৮৪০, ৮৪১।
৯. ইবন্-তাগ্রি-বিরদি, খণ্ড-৬, পৃঃ ৭৬০।
১০. প্রাগুক্ত, খণ্ড-৭, পৃঃ ১৮৬, ৭২১-২।
১১. তুলনীয়, ইবন্-তাগ্রি-বিরদি, খণ্ড-৬, পর্ব-২, পৃঃ ২৭৩।
১২. সুলতানের সামনে ভূমিচুম্বন করার প্রথা চালু করেন ফাতিমিদ-আল-মুইজ্। প্রথম এটি বন্ধ করেন বার্সবে। এর পরিবর্তে তিনি সুলতানের হস্তচুম্বন প্রথা চালু করেন। পরে অবশ্য পুরনো প্রথাই কিছু সংস্কারের পর ফিরে আসে। ইবন-তাগ্রি-বিরদি, খণ্ড-৬, পৃঃ ৫৫৮-৯।
১৩. খণ্ড-৬, পৃঃ ৬১২-১৮, ৬২০।
১৪.. আজাইব-আল-মাকদুর-ফি-আখবার তাইমুর (কায়রো, ১২৮৫) পৃঃ ৬।
১৫. ইবন্-তাগ্রি-বিরদি, খণ্ড-৬, পৃঃ ৫২।
১৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৮।
১৭. খণ্ড-৬, পৃঃ ৫, ১.১৪, পৃঃ ৫০। তুলনীয়, মিরখওয়ান্দ। 'তারিখ রাওযাত আল সাফা (তেহেরান, ১২৭০), যষ্ঠ পুস্তক।

১৮. পৃঃ ১৩৬।

১৯. ইবন্-তাগ্‌রি-বিরদি, খণ্ড-৬, পৃঃ ৭২২, ৭২৫।

২০. খণ্ড-৬, পৃঃ ৭৪৩।

২১. পৃঃ ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮৯।

২২. তুর্কী 'জেনি চেরি'-নতুন সৈন্যদল। সাধারণত এই নাম বন্দি খ্রিস্টানদের দিয়ে যে নিয়মিত পদাতিক সৈন্যবাহিনী তৈরি হত তাদেরই দেওয়া হত। অটোমানদের যুদ্ধে জেতার পিছনে এদের খুব বড় ভূমিকা ছিল।

২৩. ইবন্-আইয়াস্, সম্পাদনা পল কাহ্‌লে, এট্ আল, খণ্ড-৫ (ইস্তাম্বুল, ১৯৩২), পৃঃ ৬৭-৯।

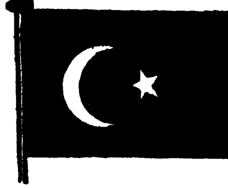
২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৮, ১৪৫।

২৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৫।

২৬. দেখুন পৃঃ ৪৮৯, ৬৭৭।

২৭. অটোমান খলিফাদের রাজত্ব শেষ হওয়া সম্বন্ধে জানতে হলে দেখুন হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ১৩৯, ১৮৪।

ষষ্ঠ ভাগ
অটোমান শাসন এবং স্বাধীনতা



অটোমান সাম্রাজ্যের পতাকা

॥ অধ্যায় ৫০ ॥

তুর্কি প্রদেশ হিসাবে আরব ভূখণ্ড

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকে অবজ্ঞা করে, সালজুক সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে অটোমানরা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে তাদের শাসন কায়েম করে আনাতোলিয়ায়। শাসনভার থাকলেও পরবর্তী প্রায় ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অটোমানদের এই রাষ্ট্র ছিল নিছকই সীমান্তবর্তী আমীরশাহি।[১] যুদ্ধবিগ্রহ এবং অনিশ্চয়তা ছিল এই রাষ্ট্রের নিত্যসঙ্গী। ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে অটোমানদের রাজধানী ছিল ব্রুসা (বারসা)। ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই আমিরশাহি কিছুটা স্থিতিশীল হয়। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তাদের ভিত হয়ে ওঠে মজবুত। অতঃপর অ্যাড্রিয়ানোপলকে (এডিরন) রাজধানী[২] করে গড়ে ওঠে তাদের রাজত্ব। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ী বীর দ্বিতীয় মুহাম্মাদের (১৪৫১-৮১) কনস্ট্যানটিনোপল জয় সূচনা করে এক নতুন যুগের। প্রতিষ্ঠিত হয় অটোমান সাম্রাজ্য। বসপোরাস থেকে সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করতে থাকেন এই নতুন সম্রাট। বিশাল এই সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল এশিয়ার অন্তর্গত, অপরটি ইউরোপের। সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতি একদিকে তাঁকে বাইজানটিয়ামের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অপরদিকে মামলুকদের পতন[৩] তাঁকে আরব খলিফার সাম্রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী করেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভাব ফেলেছিল অটোমানদের সংস্কৃতির উপরেও। দুই সংস্কৃতির মিলনে গঠিত এই ঐতিহ্যই ছিল অটোমান তুর্কিদের ইতিহাসের সবচেয়ে ফলপ্রসূ দিক।

● উত্তর আফ্রিকা

উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলি ১৬ শতাব্দীতে তুর্কিদের অধীনে চলে আসে। এদের মধ্যে প্রথম ছিল আলজেরিয়া (আল-জাযাইর, মোটামুটিভাবে রোমানদের নুমিদিয়া)। মিশর বিজয়ের একবছর পর, ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক বংশোদ্ভূত দুই অটোমান নৌসেনাধ্যক্ষ খয়র-আল-দীন বারবারোসা এবং তাঁর ভাই আলজেরিয়া আক্রমণ করেন। সেখান থেকে স্প্যানিশ

জবরদখলকারীদের সরিয়ে সাবলাইম পোর্টে পাঠিয়ে দেন। পরিবর্তে পোর্টের তরফ থেকে খয়র-আল-দীনকে বেলারবে (তুর্কি সাম্মানিক পদ)[৪] উপাধি দেন। খয়র-আল-দীন তাঁর জানিসারি সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে একটি সামরিক অভিজাতদের গোষ্ঠী তৈরি করেন। সুলতানের জন্য তিনি দক্ষ সেনাদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন। সেনাদের নিয়োগ করা হয়েছিল ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান, ইতালিয় এবং গ্রিকদের মধ্যে থেকে। এই সেনাবাহিনী গোটা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত হয়েছিল। এরা পশ্চিমে স্পেনের উপকূলে অটোমান ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। পূর্বদিকে টাইগ্রিস নদীর কূলে এই ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে জানিসারি সেনারা। অতঃপর তিউনিসিয়ার পশ্চিমে (রোমানদের আফ্রিকা) আবির্ভাব হয় এক বিপজ্জনক প্রতিবেশীর। তিউনিসিয়ার রাজসিংহাসন নিয়ে সেই সময় চলছিল এক অন্তঃকলহ। অভ্যন্তরীণ এই বিবাদের সুযোগ নিয়ে খয়র-আল-দীন ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ীভাবে তিউনিসিয়া দখল করেন। তবে, এই দেশ পাকাপাকিভাবে তুর্কিদের দখলে আসে ৪০ বছর পর। তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন সিনান পাশা। আলবেনিয় বংশোদ্ভূত এই সেনাধ্যক্ষ ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরের প্রশাসক হিসাবে তিনি দক্ষিণ আরবের বিরুদ্ধে এক অভিযানে 'উসমান'[৫] বংশের অধিকারভুক্ত আল-ইয়ামানকে ফাঁদ করে তোলেন। সিনানের আগে তুর্কি সেনাধ্যক্ষ পিরি রেইস আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলে হানা দিয়ে আদান (অ্যাডেন, ১৫৪৭) এবং মাসকট (১৫৫১) দখল করেন। শুধু তাই নয় পারস্য উপসাগরের উপরিভাগেও আক্রমণ করেন। এই পিরি রেইস খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত বলে অনুমান করা হয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত তাঁর একটি মানচিত্র বা তথাকথিত কলম্বাস মানচিত্রে আটলান্টিক মহাসাগর এবং আমেরিকা[৬] চিহ্নিত আছে। তিউনিসিয়ার প্রশাসকদের প্রথমে বলা হত বে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তাঁরা দে[৭] নামে চিহ্নিত হন। তিউনিসিয়ায় স্প্যানিশ শাসন ও স্থানীয় শাসকদের হটানোরও আগে সিনান পাশা ও অন্য দুই তুর্কি সেনাধ্যক্ষ ত্রিপোলি থেকে সেন্ট জনের (মাল্টার) নাইটদের হারিয়ে ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপোলি শহর দখল করেন। ত্রিপোলি (তারাবুলাস আল-গার্ব) নামটি আসলে গ্রিক নাম। নামটি নেওয়া হয়েছে তিনটি ফোনেশিয়-কারথেজিনিয় উপনিবেশ থেকে। এই তিনটি উপনিবেশ ও তার সংলগ্ন অঞ্চল নিয়েই একসময় গঠিত হয়েছিল রোমান শাসনাধীন ত্রিপোলিতানিয়া। এর মধ্যে বার্বারদের প্রভাব ছিল নগণ্য। এইভাবেই একমাত্র মরক্কো (আল-মাগরিব আল-আকসা, মোটামুটিভাবে রোমান মরিটানিয়া) ছাড়া বার্বার[৮] প্রদেশগুলি অটোমানদের দখলে চলে আসে। মরক্কোর অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা ছিল বার্বার বংশোদ্ভূত। সাধারণভাবে দেখা যায়, বার্বারদের জনসংখ্যার অনুপাত কেবল পূর্ব থেকে পশ্চিমেই নয়, উত্তর থেকে দক্ষিণেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ত্রিপোলি, টিউনিস এবং আলজিয়ার্সে এরপর প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়। এই সরকার নামেই ছিল পোর্টের করদ রাজ্য। আসলে এরা সকলেই আধা-স্বাধীন রাজ্য ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রদেশে স্থানীয় বা অনুগত শাসকদের কর্তৃত্ব ছিল। এদের মধ্যে অনেকের বংশধরেরাও প্রাদেশিক

সরকারের প্রধান হয়েছেন। তবে, সামরিক বাহিনীর আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। পোর্টকে বাৎসরিক কর দেওয়া হত। তবে তা করের থেকে বেশি উপহারের রূপ নেয়। অটোমান প্রতিনিধিরা জোর করে কর আদায় করলে তার প্রতিবাদে কখনও কখনও বিদ্রোহ হত এই প্রদেশগুলিতে। ১৭১১ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপোলিতানিয়া শাসন করে কারামানলি বংশ। ১৭ শতাব্দীর পর থেকে নৌশক্তি কমে আসতে থাকে অটোমানদের। এর ফলে আফ্রিকার প্রদেশগুলির উপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণও কমে যায়। তাই এই প্রদেশের শাসকদের কাছে স্থানীয় শাসনকে আরো বড়মাপে কাজে লাগানোর সুযোগ এসে যায়। মিশর ও সিরিয়ার অটোমান-শাসিত প্রদেশগুলির তুলনায় তারা অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

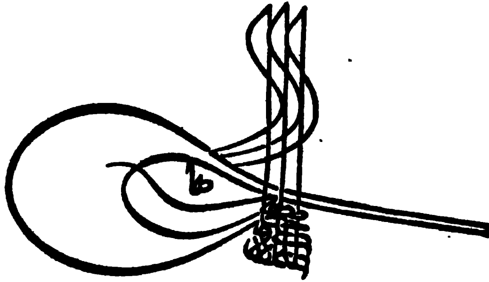
● জলদস্যু রাজ্য

বার্বার প্রদেশগুলি জলদস্যু প্রধান প্রদেশে পরিণত হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করতেই এই জলদস্যুতা। আর তা 'জিহাদের' রূপ নেয়। সেনাদের মত জলদস্যুরাও হয়ে উঠল পেশাদার। এই পেশা সরকার এবং জনগণ দুপক্ষের কাছেই লাভজনক ছিল। বন্দি এবং লুঠ করা সম্পদের উপর চাপানো হত নির্ধারিত অঙ্কের কর। বন্দিদের মুক্তিপণের জন্য আটক করে রাখা হত অথবা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হত। প্রায় তিনশতক ধরে এই আয়ই সে দেশের কোষাগারের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল। জলদস্যুদের জাহাজ প্রায়ই অটোমান নৌসেনাদের হয়ে কাজ করত। মুসলিম স্পেন থেকে নির্বাসিতরা[৯] ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুর সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেয়। তাদের লুঠতরাজ ও আক্রমণ এই অঞ্চলের আতঙ্কে পরিণত হয়।[১০] ১৭ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই দস্যুবৃত্তি চরমে ওঠে এবং ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনের উপকূলে সমূহ বিপদ ডেকে আনে। এই শতাব্দীরই পরের দিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি নৌসেনারা জলদস্যুদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তাদের জনগণ ও বাণিজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে জলদস্যুদের বাৎসরিক কর দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করত। এই নিরাপত্তা যদিও তাদের অনেক সময়েই বিপদে ফেলত। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং সুইডেনের অবস্থা ছিল এই রকমই। এমন কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নজরানা দেওয়াকেই নিরাপদ মনে করত। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি আলজিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাৎসরিক ৮৩ হাজার ডলার কর দিত ত্রিপোলিকে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপোলির কারামানলি দে এই কর বৃদ্ধি করার দাবি জানান। ফলে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। চলে চারবছর ধরে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন নৌসেনারা ত্রিপোলি আক্রমণ করে। বার্বার প্রদেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ মার্কিন নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল।

● জমকালো কনস্ট্যান্টিনোপল

অটোমানরা উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশই জয় করে প্রথম সুলাইমানের (১৫২০-৬৬) আমলে। সুলাইমান ছিলেন বীর প্রথম সালীমের পুত্র। এই সালীম শুধু সিরিয়া এবং মিশর জয় করেননি,

অটোমান সাম্রাজ্যকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য।[১১] সুলাইমানের শাসনকালে হাঙ্গেরির সীমান্তের অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়, ভিয়েনা অবরোধ করা হয় এবং রোডস দখল করা হয়। সেইসময় অটোমান সাম্রাজ্য দানিউবের কূলে বুদাপেস্ট থেকে টাইগ্রিসের কূলে বাগদাদ পর্যন্ত এবং ক্রিমিয়া থেকে নীলনদের প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটিই ছিল আধুনিক যুগের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, সর্বকালের সবচেয়ে স্থায়ী রাষ্ট্রও বটে। উসমানের প্রত্যক্ষ বংশধর হিসেবে অন্তত ৩৬ জন সুলতান ১৩০০ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই রাষ্ট্র শাসন করেছেন।[১২]



মহানুভব সুলতান সুলাইমানের নাম বহন করছে তুগরা হস্তলিপি

ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের জন্য সুবিদিত সুলাইমানকে আল-কানুনি (বিধানদাতা) সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন তাঁর প্রজারা। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মানুষও তাঁর বিচারপদ্ধতি এবং প্রণয়ণ করা আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[১৩] তিনি আলেপ্পোর ইব্রাহিম আল-হালাবিকে (মৃত, ১৫৪৯) মুলতাকা আল-আবহুর (সাগরের সঙ্গমস্থল) নামক একটি গ্রন্থ সংকলনের দায়িত্ব দেন। ১৯ শতাব্দীর সংস্কারের আগে পর্যন্ত এটিই ছিল অটোমান আইনের প্রচলিত গ্রন্থ।[১৪] ইউরোপীয়দের কাছে অবশ্য তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী। প্রকৃত অর্থেই তিনি পরাক্রমশালীই ছিলেন। তাঁর রাজদরবার গোটা ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্যতম উজ্জ্বল দরবার ছিল। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসকে লেখা তাঁর চিঠির বয়ান ছিল সত্যিই লক্ষ করার মত।

"আমি যিনি সুলতানদের সুলতান, রাজার রাজা, বিশ্বের বুকে সমস্ত রাজাদের মুকুটদাতা, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া, শ্বেতসাগর এবং কৃষ্ণসাগর, রুমেলিয়া, আনাতোলিয়া, কারামানিয়া, রূম ভূখণ্ড, জুলকাদ্রিয়া, দিয়ারবেকির, কুর্দিস্তান, আজেরবাইজান, পারস্য, দামাস্কাস, আলেপ্পো, কায়রো, মক্কা, মদীনা, জেরুসালেম, সারা আরব, ইয়ামান এবং অন্যান্য দেশ যা আমার পূর্বপুরুষদের (আল্লাহ্‌ তাঁদের কবরকে আলোকিত করুন) বাহুবলে জয় করা ভূখণ্ড এবং আমার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ মহিমময় আল্লাহ্‌র দান করা ভূখণ্ডের সর্বময় কর্তা, আমি সুলতান সুলাইমান খান, সুলতান সেলিম খানের পুত্র, সুলতান বায়াজিদ খানের পৌত্র : তোমার উদ্দেশে, ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস।"[১৫]

সুলাইমান তাঁর রাজধানী সহ অন্যান্য শহরের সৌন্দর্য ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাজপ্রাসাদ, সমাধিস্থল, সেতু, নালা, পান্থশালা এবং স্নানাগার তৈরি করেছিলেন। ২৫০টি স্নানাগার তৈরি করেছিলেন তাঁর প্রধান স্থপতি সিনান। সিনান ছিলেন আনাতোলিয়ার খ্রিস্টান। তখনকার যুবকদের মতো[১৬] তিনিও সম্ভবত কনস্ট্যানটিনোপল চলে এসেছিলেন। এখানে এসেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তুরস্কের অন্যতম কর্মময় এবং দক্ষ স্থপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন তিনি। তাঁর অনবদ্য শিল্পকর্মের একটি হল সুলতানের নামাঙ্কিত সুলাইমানিয়াহ মসজিদ। সান্টা সোফিয়াকে টেক্কা দেওয়ার জন্যই এই মসজিদটিকে সাজানো হয়েছিল। মসজিদের বিশাল গম্বুজ সান্টা সোফিয়ার থেকেও ১৬ফিট উঁচু। পারস্যের শিল্পশৈলীতে তৈরি অসাধারণ টালি দিয়ে সাজানো হয়েছিল মিহরাব এবং মসজিদের পিছনের দিকের দেওয়াল। এইসময়ে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসে এককালের নামী শহর মদীনা। মধ্যযুগের ক্ষমতাশালী সুলতান ও খলিফাদের রাজধানী এবং একদা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র দামাস্কাস, বাগদাদ বা কায়রোর মতো শহর পরিণত হয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আবাসস্থলে। সেইসঙ্গে, কনস্ট্যানটিনোপলের সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটি হিসাবেও ব্যবহার করা হয় এই শহরগুলিকে। অথচ অতীতে এই কনস্ট্যানটিনোপলের প্রাচীরই চারটি ঐতিহাসিক ঘটনায় দামাস্কাস ও বাগদাদের আরব বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছে।[১৭]

● অটোমান সংস্কৃতি

নানাদেশ এবং নানাজাতির মিলনেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে তুর্কি সংস্কৃতি। এর ব্যাপ্তি যেমন বিশাল ছিল, তেমনই ছিল এর বৈচিত্র্য। পশ্চিম এশিয়ায় আসার আগেই তুর্কিরা পারস্যের মানুষের সংস্পর্শে আসে। তাদের কাছ থেকেই তুর্কিরা শিল্পশৈলী, রম্য রচনার পদ্ধতি শেখে। আবার রাজার পদকে মহিমান্বিত করার রাজনৈতিক পাঠও নেয়। মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের থেকে সম্ভবত তারা প্রয়োজনের আগেই আক্রমণ ও বিজয়ের মনোভাব পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেবা এবং অঙ্গীভূত করার গুণও গ্রহণ করেছিল।[১৮] মূলত রূমের সালজুকদের মাধ্যমে বাইজানটিনিয়দের থেকে বেশ কিছু সামরিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দিকগুলি সম্পর্কে জানার সুযোগ হয় তুর্কিদের। তবে এসব কিছুর উর্ধ্বে ছিল আরবদের অবদান। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আরবদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে তুর্কি সমাজ ও সংস্কৃতি। ঠিক যেমন করে গ্রিকদের কাছে শিক্ষালাভ করেছিল রোমানরা। আরবদের কাছ থেকে তুর্কিরা বিজ্ঞান ও আইনের পাঠ নিয়েছে। ধর্ম এবং তার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক নীতিও রচিত হয়েছে আরবদেরই ছত্রচ্ছায়ায়। শুধু তাই নয়, আরবদের কাছে তুর্কিদের শেখা বর্ণমালা ১৯২৮ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। মধ্য এশিয়ায় থাকার সময় পর্যন্ত তুর্কিদের লেখা সাহিত্য ছিল সংখ্যায় নেহাতই নগণ্য। লেখার জন্য সিরীয় খ্রিস্টানদের চালু করা সিরিয়াক লিপি ব্যবহার করা হত।[১৯] ইসলাম ধর্মে দীক্ষা এবং আরবীভাষা শিক্ষার পর, আরবী এবং পারসি ভাষা থেকে ধর্ম, বিজ্ঞান, আইন এবং সাহিত্যের হাজার হাজার নিদর্শন ও

উপমা গ্রহণ করে তুর্কিরা। তুর্কি ভাষাকে পরিশুদ্ধ করতে সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছেন জাতীয়তাবাদীরা। কিন্তু এই উদ্যোগ সত্ত্বেও তুর্কি ভাষায় আরবী ও পারসির এইসব নিদর্শন বেঁচে আছে। তবে তিনটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে অটোমানদের অবদান ছিল একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। এই তিনটি ক্ষেত্র হল : রাষ্ট্রশাসন, স্থাপত্য এবং কবিতা।

● রাজকীয় প্রতিষ্ঠান

পূর্ববর্তী রোমান এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মত অটোমান সাম্রাজ্যের চরিত্র ছিল মূলত সামরিক। সেইসঙ্গে আরো একটি সাদৃশ্য ছিল। তা হল, বংশপরম্পরায় শাসন। প্রজাকল্যাণ নয়, অটোমান শাসনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রাষ্ট্রের কল্যাণ। রাষ্ট্রের কল্যাণের অর্থই ছিল রাষ্ট্রের মূর্ত প্রতীক সুলতান-খলিফার কল্যাণ। অটোমানদের প্রজারা ছিল নানা জাতির—আরবীয়, সিরীয়, ইরাকি. মিশরিয়, বার্বার, কুর্দ. আর্মেনিয়, স্লাভ. গ্রিক, আলবেনিয় ইত্যাদি। বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও জীবনযাত্রার এই মানুষেরা উসমানের তলোয়ারের ক্ষমতায় এক হয়েছিল। এমন কী কৃষকশ্রেণীর তুর্কিদেরও পৃথক করে রাখা হত শাসক তুর্কিদের থেকে। এই কৃষকরাও ছিল প্রজাদেরই দলে। শাসকরা নিজেদের উসমানলি, ওসমানল বা অটোমান হিসাবে উল্লেখ করতেই পছন্দ করতেন। তুর্কিরা যতদিন শাসন করেছে, ততদিনই তারা তাদের সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কিন্তু সংখ্যালঘু হিসাবে আরব ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিকতার কোন চেষ্টাই তারা করেনি। কিন্তু নিজেদের দল ভারী করতে তারা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। যেমন অ-মুসলিম মহিলাদের বিবাহ করা, প্রজারা ইসলামধর্ম বা তুর্কি ভাষা গ্রহণ করলে এবং রাজদরবারে যোগদান করলে তাদের সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করা ইত্যাদি। অটোমান আমলে অন্য অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে আসা যুবকদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। তাদের সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হত। এইভাবে বাছাই করা অ-মুসলিম যুবকদেরও দেশের কাজে লাগানো হত। অটোমান তুর্কিরা যখনই কোন দেশ জয় করেছে, তখনই সেখানকার সেরা প্রতিভাবানদের বাছাই করে তাদের রাজধানীতে নিয়ে এসেছে। রাজধানীতে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হত, তুর্কি আদবকায়দার সঙ্গে পরিচিত করা হত। এইভাবেই তুর্কি সাম্রাজ্যকে আরো গৌরবান্বিত করে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হত এইসব ভিনদেশী প্রতিভাদের। সারকাশিয়, গ্রিক, আলবানিয়, স্লাভ, ইতালিয় এমন কী আর্মেনিয়রাও উচ্চপদে আসীন ছিলেন। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে কেউ কেউ উজিরও হয়েছিলেন।

● দুর্বলতার সহজাত উপাদান

বলপ্রয়োগ করে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত অটোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বিশাল। এতবড় সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কাজ ছিল না। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ছিল। সেইসঙ্গে ছিল নানাধর্মের মানুষ। এদের মধ্যে বিভেদ রেখাও ছিল স্পষ্ট। মুসলিমদের সঙ্গে

খ্রিস্টানদের বিভেদ ছিল। শুধু তাই নয়, তুর্কি মুসলিমদের সঙ্গে আরব মুসলিমদের, খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও বিরোধ ছিল গভীর। আর এই বিরোধের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পতনের বীজ। বহির্বিশ্বে যখন জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার রমরমা অবস্থা, তার মোকাবিলায় এই ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থা অত্যন্ত দুরবস্থায় উপনীত হয়। মিলেট[২০] ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হত। এই ব্যবস্থার স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। কর্তৃত্বের শিখরে (অন্তত কাগজে কলমে) ছিলেন সুলতান-খলিফা। আর এই পদে উত্তরাধিকারীর দ্বিমত সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোকে আরো দুর্বল করে তোলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এইসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও অটোমান সাম্রাজ্যের পতন যত দ্রুত হওয়া উচিত ছিল তার অনেক পরে এই পতন হয়।

সুলাইমানের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের শুরু হয়। পতনের ইতিহাস একদিকে যেমন দীর্ঘ, তেমনই ছিল ভুলভ্রান্তি এবং তার অবশ্যম্ভাবী মাশুলের ভারে দীর্ণ। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভিয়েনা বিজয়ের ব্যর্থতাই ছিল সম্ভবত পতনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। ইউরোপে অটোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের এইখানেই ইতি ঘটে। সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, অধিকৃত সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখাই এরপরে তুর্কিদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আক্রমণের বদলে আত্মরক্ষার কাজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সেনাবাহিনী। একদিকে অন্তঃকলহ এবং অবক্ষয়, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস। এই প্রয়াসই তাদের ইউরোপের রুগ্নমানুষ অটোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর করেছিল। তবে এইসব দেশের পারস্পরিক ঈর্ষা এবং সহযোগিতার অভাব অটোমান সাম্রাজ্যের আয়ু আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

● উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির হস্তচ্যুতি

আরব ভূখণ্ডের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিই প্রথম অটোমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই দেশগুলি একসঙ্গে একটি পৃথক গোষ্ঠীর মতো ছিল। দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে তাদের ভৌগোলিক নৈকট্য তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল ইসলামি ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে দূরত্ব। ইসলামি ঐতিহ্যের দিক থেকে তারা কিছুটা দুর্বল ছিল। তা ছাড়াও এইসব দেশের জনসংখ্যায় বার্বার এবং ইউরোপীয়দের সংখ্যা বেশি থাকায় প্রথম থেকেই এই দেশগুলি নিজেদের মর্জিমাফিক চলত।

আলজেরিয়াই প্রথম আরব রাষ্ট্র, যারা অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। এইসময় ফ্রেঞ্চ সেনারা আলজেরিয়ার উপকূলে তাঁবু ফেলে। আলজেরিয়ার শাসক দে হুসাইন ফ্রান্সের কনসালকে অপমান করেছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ এবং জলদস্যুদের প্রতিরোধ করার অছিলায় সেনা মোতায়েন করা হলেও শেষপর্যন্ত ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়াকে ফরাসি ভূখণ্ড হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আলজেরিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চল হয় ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯৪২ সালের নভেম্বরে মার্কিন সেনা যখন আলজেরিয়ায় আসে তখন

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের অনুশাসনের দোহাই দিয়ে প্রতিবাদ করেন লাভাল। এই আইনবলে আলজেরিয়া ফ্রান্সেরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ[১১] বলে তিনি যুক্তি দেখান। যেকোন বিভাগের মত আলজেরিয়াও ফরাসি সংসদে তাদের প্রতিনিধি পাঠাত। ১৯৬২ সালে ফরাসি সেনা ও আলজেরিয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দীর্ঘ আট বছরের সংঘর্ষ শেষ হয়। এক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা পায় আলজেরিয়া।

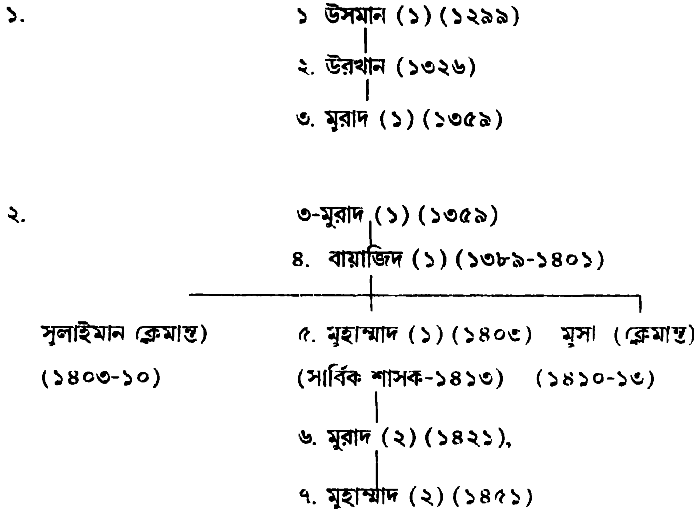
আলজেরিয়ার মত তত প্রবলমাত্রায় না হলেও ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়া দখল করে ফ্রান্স। সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের পূর্বমুখী সম্প্রসারণের পথে এটি একটি পদক্ষেপ। আলজেরিয়ার মতো এখানেও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে আরবীর স্থান নেয় ফরাসি ভাষা। তিউনিসিয়ার অভিভাবকত্ব ছিল নিছকই নামে। শাসনকার্যে ফরাসিদেরই আধিপত্য ছিল। স্থানীয় শাসক বের সঙ্গে একজন ফ্রেঞ্চ আবাসিক সেনাপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। যাঁর হাতে সমস্ত সরকারি কাজকর্মের দায়িত্ব ছিল। তবে মিশরের কাছাকাছি থাকায় সেদেশের মুসলিম ঐতিহ্য তুলনামূলকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিল। আলজেরিয়ার মত তিউনিসিয়াতেও হাজার হাজার ফ্রেঞ্চ ঔপনিবেশিকদের নির্বাসিত করা হয়। তিউনিসিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে বহুসংখ্যক ইতালিয় উপনিবেশ থাকায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে যায়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, আলজেরিয়া এবং তিউনিসিয়া দুদেশেরই নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য ফ্রেঞ্চ শাসকদের অধীনে যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল। ১৯৫৫ সালে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পায় তিউনিসিয়া। ১৯৫৬ সালে পায় পূর্ণ স্বাধীনতা। তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া এখন প্রজাতন্ত্র।

ত্রিপোলিতানিয়া ছিল বার্বার রাজ্যগুলির মধ্যে তুর্কিদের শেষ ঘাঁটি। মূলত উষর মরুভূমির এই দেশে উপকূলবর্তী অঞ্চলে কিছু মরূদ্যান আছে। ১৯১১-১২ সালে তুর্কো-ইতালিয় যুদ্ধের ফলে ত্রিপোলিতানিয়া অটোমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। সিরিনাইকার সঙ্গে এই দেশকেও ইতালি তার উপনিবেশ বানায় এবং ১৯৩৪ সালে লিবিয়া ইতালিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালিয় এবং তাদের সহযোগী জার্মান বাহিনীকে লিবিয়া থেকে হটিয়ে দেয় ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ এবং স্থানীয় বাহিনী। ১৯৫১ সালে এই দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়।

১৯০১ সালে ফরাসি বাহিনীর মরক্কো বিজয় আরম্ভ হয়। একসময় দুটি আরব-বার্বার সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র এই মরক্কো কখনও অটোমানদের অধীনে ছিল না।[১২] ১৯০৭ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ফ্রান্স তাদের দখল সম্পূর্ণ করে। ইতিমধ্যে উপকূলের ওপারে তাদের এলাকা দখলের কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে স্পেন। ১৯৫৬ সালে অবশ্য ফ্রান্স এবং স্পেন তাদের দাবি মরক্কোর সুলতান বা বর্তমানের রাজার কাছে সমর্পণ করে। এইভাবেই গোটা 'শ্বেত আফ্রিকা' (সাধারণভাবে সাহারা মরুভূমি কালো আফ্রিকার থেকে শ্বেত আফ্রিকাকে আলাদা করে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পর এই দেশগুলি দক্ষিণ ইউরোপের তিনটি লাতিন রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। সেইসময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এইসব দেশের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। ❑

● টীকা ●

অটোমান শাসকদের বংশলতিকা ঃ



৩. দেখুন পৃঃ ৭০৪-৫।

৪. তুর্ক 'বে', এসেছে তুর্কী (পূর্বতুর্কী) 'বেগ' থেকে। এটি একটি সম্মানজনক উপাধি, যেটি ইজিপ্সিয়ানরা এখনও ব্যবহার করে।

৫. জোসেফ ভন হ্যামার, 'গেসচিচটে দাস ওসমানিশ্চেন রাইকস, খণ্ড-৩ (পেস্ট, ১৮২৮), পৃঃ ৫৫১; কুতব-আল-দিন-আল-মাক্কি, 'আল বার্ক-আল-ইয়ামানি-ফি-আল-ফাতহ্ আল-উসমানি', অনুবাদ সিলভেস্টার ডি স্যাসি, 'নোটিশেস্ এট্ এক্সট্রেইটস্ দাস ম্যানুসক্রিপ্টস্ ডি লা বিবলিওথেক ন্যাশনালে', খণ্ড-৪ (প্যারিস ১৭৯১-৬), পৃঃ ৪৬৮। আল ইয়ামান-এর সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে হলে দেখুন হুসাইন, এ আল, আরশি, 'বুলুগ-আল-মারাম-ফি-শারহ্-মিস্ক আল-খিতাম' সম্পাদনা এ এম আল-কিরমিলি (কায়রো, ১৯৩৯) পৃঃ ৬০-৮০।

৬. 'দ্য জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ'-তে পল কাহ্‌লে, খণ্ড ২৩ (১৯৩৩), পৃঃ ৬২১-৩৮, হাজ্জি খালফাহ্, খণ্ড-২, পৃঃ ২২-৩; দেখুন পিরি রেইজ, 'বাহরিয়াহ্, সম্পাদনা পল কাহ্‌লে, ২ খণ্ড (বার্লিন ১৯২৬)। ১৫৩৮-এর আগে তুর্করা আরও একবার আদান দখল করেছিল।

৭. তুর্ক দাই, মামা।

৮. বার্বেরিয়ানদের রাজ্য-এই শব্দটি গ্রিকরা ব্যবহার করত, তাদের বোঝাতে যারা গ্রিক সভ্যতার বাইরের বাসিন্দা। রোমানরা "বারবারি" বলতে বোঝাতো ঈজিপ্ট-এর পশ্চিমাঞ্চল।

৯. দেখুন পৃঃ ৫৫৬।

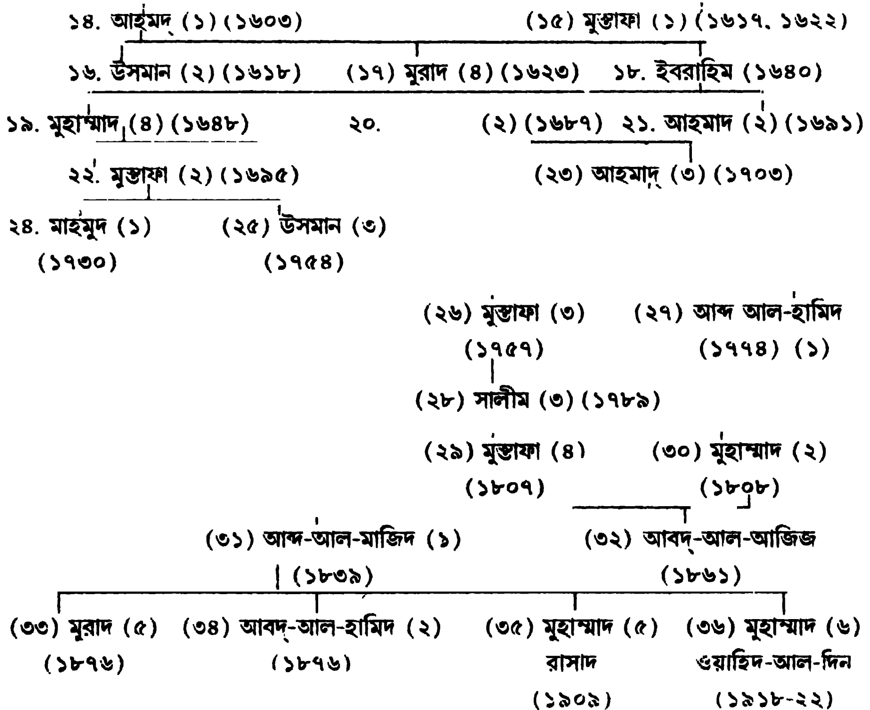
১০. এই প্রসঙ্গে আরও বেশি জানতে হলে দেখুন স্টানলি লেন পুল-এর 'দ্য স্টোরি অফ বারবারি করসেয়ারস' (নিউ ইয়র্ক ১৮৯১)

১১.

৭. মুহাম্মাদ (২) (১৪৫১)
৮. বায়াজিদ (২) (১৪৮১)
৯. সালীম (১) (১৫১২)
১০. সুলাইমান (১) (১৫২০)
১১. সালীম (২) (১৫৬৬)
১২. মুরাদ (৩) (১৫৭৪)

১২.

১২. মুরাদ (৩) (১৫৭৪)
১৩. মুহাম্মাদ (৩) (১৫৯৫)



১৩. এম ক্যাভিড বেসন, "এবুসুয়ুদ এফেন্দি" ইসলাম আনসিকলোপেদিসি।"

১৪. দেখুন হিট্টির 'হিসট্রি অফ সিরিয়া' পৃ ৬৬৪

১৫. রজার বি মেরিম্যান, "সুলেইমান দা ম্যাগনিফিশেন্ট (কেমব্রিজ, ১৯৪৪), পৃঃ ১৩০।)

১৬. পৃঃ- ৭০৩, টীকা-১।

১৭. দেখুন পৃঃ ২৯৯-৩০০।

১৮. অ্যালবার্ট এইচ লাইবার, "দ্য গভর্নমেন্ট অব দ্য অটোমান এম্পায়ার ইন দ্য টাইম অফ্ সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট" (কেম্ব্রিজ, ১৯১৩), পৃঃ ১৮

১৯. দেখুন হিট্টির 'হিস্ট্রি অফ্ সিরিয়া' পৃঃ ৫১৮-১৯।

২০. দেখুন পৃঃ ৭২৭।

২১. দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্, নভেম্বর ২১, ১৯৫২।

২২. মূল ইংরেজি সংস্করণে যেরকম আছে পৃঃ ৭১১তে।

॥ অধ্যায় ৫১ ॥

মিশর এবং বর্ধিষ্ণু আরব

মিশর ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকার অন্তর্গত হলেও যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চিম এশিয়ারই অনেক কাছাকাছি। বৃহত্তর সিরিয়া এবং আল-ইরাককে সঙ্গে নিয়ে মিশর একটি পৃথক আরব গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার বা মূল আরব ভূখন্ডের অধিবাসীদের কোন মিলই ছিল না।

● মামলুকদের কর্তৃত্ব

মিশর দখলের পর সুলতান সালীম অল্প কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। প্রশাসনেও বিশেষ কোন রদবদল ঘটাননি। কায়রোতে কয়েকদিন আমোদপ্রমোদে কাটিয়ে রাজধানীতে ফেরার সময় সুলতান সঙ্গে নিয়ে যান ছায়ানাটিকার[১] একটি দল—তাঁর পুত্র সুলাইমানের[২] মনোরঞ্জনের জন্য। আর মিশরের প্রশাসন দেখার জন্য রেখে যান খাইর বে নামে এক অটোমান পাশাকে এবং পাঁচ হাজার জেনিসারি সেনা। পরে অবশ্য খাইর বে সুলতানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।[৩] মিশর তখন ১২টি সনজাকে[৪] বিভক্ত ছিল। এই সনজাকগুলি পুরনো মামলুক শাসকদের অধীনেই থেকে যায়। প্রত্যেক মামলুক বের নিজস্ব ক্রীতদাস যোদ্ধাবাহিনী ছিল। এই যোদ্ধারা তাঁদের হয়ে লেনদেন করা ছাড়াও মামলুকদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে সাহায্য করত। ককেশাস সহ অন্যান্য অঞ্চল থেকে ক্রীতদাসদের কিনে এনে নিজেদের বাহিনীকে শক্তিশালী করতেন মামলুকরা। আগের মত তখনও মামলুকরা কর আদায় বা সৈন্য সংগ্রহ করত, কিন্তু আগের গৌরব তাদের ছিল না। বাৎসরিক কর দিয়ে তারা অটোমান কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

কনস্ট্যানটিনোপল থেকে পাঠানো অটোমান রাজপ্রতিনিধি মিশরের স্থানীয় বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারতেন না। চলতি রীতিনীতি এবং স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই ছিল তাঁর প্রকৃত ক্ষমতার পথে প্রধান বাধা। তাই কোন রাজপ্রতিনিধিই বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারতেন না। মিশরের উপর তুর্কিদের সরাসরি দখল ছিল ২৮০ বছর ধরে। এর মধ্যে একশোরও বেশি পাশা একের পর এক[৫] নিযুক্ত হয়েছেন। পাশা পদে ঘনঘন পরিবর্তন সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণও শিথিল করে দেয়। এর ফলে মিশরে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৭ শতাব্দী থেকে দেশে ঘনঘন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিতে থাকে। এই পর্বে মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ দিক ছিল পাশা এবং বের মধ্যে বিরোধ। বে'দের মধ্যে পারস্পরিক কলহ এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই তীব্র হলেই পাশারা তার সুযোগ নিতেন। কনস্ট্যানটিনোপলের অটোমানরা যতই

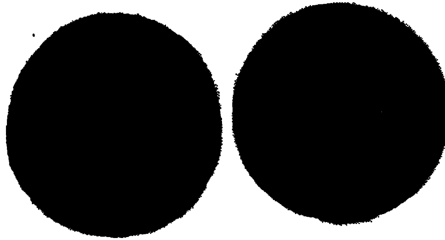
পতনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, গোটা সাম্রাজ্যেই রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি সমীহও তত কমতে থাকে।

পাশা এবং মামলুকদের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ মিশরবাসীদের আরও দুর্দশা এবং দারিদ্র্যের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। দুপক্ষের অবিরাম অত্যাচারে অতিষ্ঠ কৃষকদের দুর্দশা অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছিল। দুর্নীতি, ঘুষ তো ছিলই। সেইসঙ্গে নিয়মমাফিক খরা, মহামারী এবং নিরাপত্তার অভাব দেশের দুরবস্থা আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মহামারীতে তিন লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দের মহামারীতে মিশরের ২৩০টি গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে।[৬] সেই সময়ের কাহিনীকার আল-ইসহাকির[৭] লেখা থেকে জানা যায়, ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মহামারীর সময় কায়রোর প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম শুধু সেইসব দোকান যেখানে শব ঢাকার কাপড় পাওয়া যেত। এই দোকানগুলি রাতদিন খোলা থাকত। রোমানদের অধীনে থাকার সময়ে মিশরের জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষে পৌঁছয়। ১৮ শতাব্দীর শেষের দিকে এই সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছে যায়।

● আলী বে-র নিজেকে সুলতান ঘোষণা

মামলুক শাসকদের ক্ষমতা তুঙ্গে পৌঁছয় ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে যখন আলী বে অটোমান পাশাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি অর্জন করে নিজেকে পোর্টের দখল থেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। শোনা যায়, আলী বে ছিলেন এক খ্রিস্টান ধর্মযাজকের পুত্র। লুঠেরাদের হাতে পড়ে তিনি ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হয়ে যান। পাশার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের সময় সুলতান রাশিয়ার সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকায় আলী বে সহজে সেনা নিয়ে আরব ও সিরিয়া জয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তাঁর সেনাপ্রধান ও জামাতা আবু-আল-যাহাব[৮] মক্কা জয় করেন ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে।[৯] মক্কার শরীফকে সরিয়ে এই পদের আরেক দাবিদারকে বসানো হয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ নতুন শরীফ আলী বে কে "মিশরের সুলতান এবং দুই সাগরের শাসক (ভূমধ্য ও লোহিত)" এর বিশাল উপাধিতে ভূষিত করেন। মক্কার সরকার সবসময়েই গঠন করতেন পয়গম্বরের বংশধরেরা।[১০] আলী শুধু এই উপাধিই গ্রহণ করেননি, উপাধির সঙ্গে যুক্ত সুযোগসুবিধাও ব্যবহার করেছেন। এরমধ্যে ছিল মুদ্রায় নিজের নাম খোদাই করা এবং খুতবায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করা। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানেন আবু-আল-যাহাব। দামাস্কাস[১১] সহ সিরিয়ার একাধিক শহর দখল করেন। বিজয়গর্বে গর্বিত আবু-আল-যাহাব তাঁরই প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তুরস্কের সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর সেনাবাহিনীকে মিশরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। আলী তাঁর প্যালেস্টিনিয় বন্ধু এবং সহযোগী বিদ্রোহী যাহির আল-উমারের[১২] কাছে আক্কায় পালিয়ে যান (এপ্রিল ১৭৭২)। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও তিন হাজার আলবেনিয় সেনাকে নিয়ে গঠিত বাহিনীর কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। বন্দরে নোঙর করা রুশ যুদ্ধজাহাজ থেকেই এই সেনাবাহিনী পান তিনি। অত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের

আশায় আলী নতুন করে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে আহত হয়ে কিছুদিন পরই (১৭৭৩) তাঁর মৃত্যু হয়। তবে মৃত্যুর কারণ আঘাত না বিষক্রিয়া তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁরই প্রাক্তন



আলীবে'র মুদ্রা

ক্রীতদাস আবু-আল-যাহাবকে তুরস্ক সরকারের তরফ যেতে শাইখ আল-বালাদ (সম্প্রদায়ের প্রধান) উপাধি দেওয়া হয়। এই উপাধিই পাশাদের থেকে মামলুকদের পৃথক করে রাখত। মামলুকদের জন্য শাইখ আল-বালাদের ঠিক পরের গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল আমীর আল-হজ। বাৎসরিক তীর্থযাত্রার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরাই এই পদের অধিকারী ছিলেন। আলী বের উত্থান ক্ষণস্থায়ী হলেও তা অটোমানদের দুর্বলতাকে তুলে ধরে। অপরদিকে আবু-আল-যাহাবের অটোমান প্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে মামলুকদের অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়।

● নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

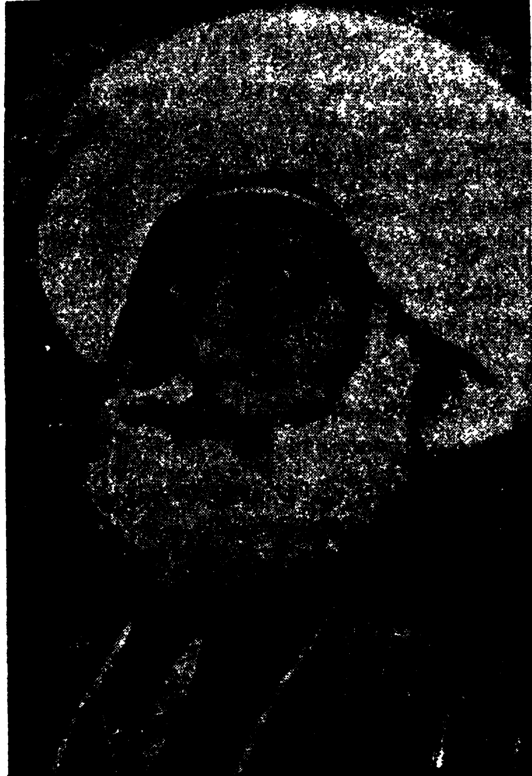
মিশরের সরকারের দখল নিয়ে বিশিষ্ট মামলুকদের মধ্যে লড়াই চলতেই থাকে। সহসা, ধূমকেতুর মত এক আক্রমণকারী পদার্পণ করেন আলেকজান্দ্রিয়ায় (জুলাই ১৭৯৮)। বিচিত্র, শক্তিশালী এই যোদ্ধার নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। মামলুকদের শায়েস্তা করাই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বলে তিনি প্রচার করেন। তাঁর জারি করা আরবী ঘোষণাপত্রে তিনি মামলুকদের সমালোচনা করে বলেছিলেন মামলুকরা তাঁর অথবা তাঁর সহযোগী ফরাসিদের মত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম নয়। সেই সঙ্গে ছিল তুরস্ক সরকারের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার দায়িত্ব।[১১] কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যোগাযোগ ছিন্ন করে ব্রিটিশদের বড়রকম আঘাত দিতে চেয়েছিলেন তিনি। আর এইভাবেই তিনি বিশ্বের উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করার লক্ষ্যে এগোচ্ছিলেন। আবুকির উপসাগরে ফরাসি বাহিনীর পরাজয় (অ্যাবাউকির, ১ আগস্ট, ১৭৯৮) আক্কা অভিযানে ব্যর্থতা (১৭৯৯)[১২] এবং আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে (২১ মার্চ ১৮০১) পরাজয় প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে বড়রকম ধাক্কা দেয়। অতঃপর মিশর

থেকে ফরাসি বাহিনীও সরিয়ে নিতে বাধ্য হন তিনি। এর আগে পর্যন্ত বিশ্ব রাজনীতিতে মিশরের ভূমিকা ছিল নগণ্য। তুরস্কের করের উৎস এবং সিরিয়া ও আরবের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সামরিক ঘাঁটি হিসাবেই ব্যবহার করা হত মিশরকে। কিন্তু এরপরই হঠাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে মিশর। ভারত সহ দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের[১৫] প্রবেশদ্বার হয় এই দেশ। নেপোলিয়নের অভিযান প্রায় বিস্মৃত ভারতের সড়কপথের দিকে নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইউরোপীয়দের। তারা তাই তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ইউরোপীয় ষড়যন্ত্র এবং কূটনীতির কেন্দ্রস্থল হয়ে যায়।

● মুহাম্মাদ আলী : আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা

যে তুর্কি সেনাবাহিনী মিশর থেকে নেপোলিয়নকে হটিয়ে দিয়েছিল, তারই এক নবীন আধিকারিক ছিলেন মুহাম্মাদ আলী। তাঁর জন্ম ম্যাসিডোনিয়ায়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে পাশা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নিজ কৃতিত্বে তিনি নীলনদের উপত্যকার নতুন অধীশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। পোর্টের প্রতি আনুগত্য হয়ে যায় নেহাতই নগণ্য। ১৯ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিশরের ইতিহাসে যা কিছু অবদান তা এই একজনেরই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মিশর শাসন করেছে। তাই তাঁকে মিশরের জনক আখ্যা দেওয়া যথার্থ, অন্তত আধুনিক মিশরের ক্ষেত্রে। তাঁর মত উদ্যোগ, উদ্যম বা দূরদৃষ্টি তাঁর সমকালীন কোন মুসলিম নেতার মধ্যেই ছিল না। যুদ্ধ হোক বা শান্তি, তিনি তাঁর কর্তৃত্বে অবিচল থেকেছেন। জমির উপর প্রজাদের ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করে তিনি নিজেই গোটা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছেন। শুধু তাই নয়, কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে তিনি নিজেই এই পণ্যের একমাত্র উৎপাদক ও বিপণনকারী হয়ে ওঠেন। আরব মুলুকে জাতীয়করণের পথে এটিই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর নিজস্ব আর্থিক নীতি অনুসারে তিনি খাল কাটেন, কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করেন এবং ভারত ও সুদান থেকে শেখা তুলোর চাষ মিশরে প্রবর্তন করেন (১৮২১-২)। নিজে নিরক্ষর হলেও মুহাম্মাদ আলী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। শিক্ষামন্ত্রক বা শিক্ষা পরিষদ গঠন করা ছাড়াও তিনিই প্রথম তাঁর রাজ্যে যন্ত্রবিজ্ঞান (১৮১৬) এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্র[১৬] প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য অধ্যাপক বা চিকিৎসকদের তিনি নিয়ে আসতেন প্রধানত ফ্রান্স থেকে। মিশরের মানুষের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য তিনি সামরিক বা শিক্ষাজগতের প্রতিনিধিদের সবসময়ই স্বাগত জানাতেন তেমনই রণকৌশল বা শিক্ষার জন্য নিজের দেশের প্রতিনিধিদের ইউরোপে পাঠাতেন। নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১৮১৩ থেকে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের (মুহাম্মাদ আলীর মৃত্যুর বছর) মধ্যে ৩১১ জন মিশরিয় ছাত্রকে সরকারি খরচে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ায় পড়তে পাঠানো হয়। এইজন্য সরকারের খরচ হয় ২,৭৩,৩৬০ মিশরিয় পাউন্ড। প্যারিসে এই ছাত্রদের সুবিধার জন্য একটি বিশেষ

ভবন তৈরি করা হয়। যেসব বিষয় নিয়ে ছাত্ররা পড়তে যেতেন তার মধ্যে ছিল স্থল ও জলযুদ্ধ, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ওষুধ প্রস্তুতের বিদ্যা এবং শিল্পকলা। সেইসময় থেকেই মিশরের পাঠ্যসূচিতে ফরাসিভাষার আধিপত্য। মিশরের ফরাসি শিক্ষাকেন্দ্রে এখনও ছাত্রসংখ্যা অন্য যেকোন বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের থেকে বেশি।[১১]



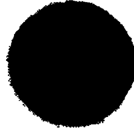
আধুনিক মিশরের রূপকার মুহাম্মাদ আলী

মিশরিয় সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানো এবং আধুনিক ধাঁচে গড়ে [illegible] লার কৃতিত্ব ফরাসি সেনাধ্যক্ষ সেভের। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তাঁর নাম হয় সুলাইমান [illegible] সিরিয়া আক্রমণে

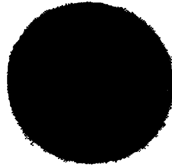
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এই সেনাধ্যক্ষ। কায়রোর একটি প্রধান সড়ক আজও তাঁর নামাঙ্কিত। তাঁর বংশধরেরা মুহাম্মাদ আলীর পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মিশরিয় নৌসেনার পুনর্গঠনের দায়িত্বও পালন করেন আরেক ফরাসি যন্ত্রবিদ। মিশরিয় সেনারা প্রথম আঘাত হানে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবি আরবের বিরুদ্ধে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়নি। প্রথম দফায় সুলাইমানের ১৬ বছরের পুত্র তুসুনের নেতৃত্বে ১০ হাজার সেনা যাত্রা শুরু করে। সেই উপলক্ষে কায়রোর নগরদুর্গে এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করেন সুলাইমান পাশা। স্বাভাবিকভাবেই সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয় মামলুকদের। ভোজ শেষ হতেই দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে এক সরু গলিতে নিয়ে গিয়ে মামলুকদের উপর অবাধ আক্রমণ ও হত্যাকান্ড চালানো হয়। ৪৭২ জন মামলুকদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন প্রাণ বাঁচিয়ে পালান। কিন্তু নগরদুর্গের এই হত্যালীলা ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্রও। সেখানেও মামলুকদের হত্যা করা হয়, বাজেয়াপ্ত করা হয় তাদের সম্পত্তি। এইভাবে প্রায় ৬০০ বছরের পুরানো মামলুকদের মিশরের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। মামলুক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় চিরতরে।

দ্বিতীয় দফার সামরিক অভিযানে মিশরিয় সেনারা ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব সুদান (আল-নূবাহ) দখল করে। মুহাম্মাদ আলীর বংশধরেরা এই কর্তৃত্ব কায়েম রাখেন। এরফলে পরবর্তী প্রজন্মের ব্রিটিশ ও মিশরিয়দের জন্য এমন এক সমস্যা তৈরি হয়, যার আজও সমাধান হয়নি। তৃতীয় দফার অভিযান ছিল গ্রিকদের বিরুদ্ধে। মিশরের স্থল ও জলবাহিনী পোর্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রিকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করতে এগিয়ে যায়। সেইসময় ক্ষমতায় ছিলেন দ্বিতীয় মাহমূদ (১৮০৮-৩৯)। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার এবং জেনিসারি সেনাদের পরাস্ত করার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। নাভারিনোতে (২০ অক্টোবর, ১৮২৭) তুর্কি-মিশরিয় সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ইংরেজ, ফরাসি ও রুশ সেনাদের এক সম্মিলিত বাহিনী। তুর্কিদের ৭৮২টি যুদ্ধজাহাজের মধ্যে মাত্র ২৯টি অক্ষত ছিল। গ্রিকদের বিরুদ্ধে সহায়তার জন্য মিশরিয় শাসককে সিরিয়া ও মোরিয়ার শাসনভার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অটোমান তুর্কিরা। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সেই প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মুহাম্মাদ আলী ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র ইবরাহীমকে সিরীয়া বিজয়ের দায়িত্ব দেন। ইবরাহীমের কর্মজীবনে সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুই ছিল। ১৮১৬ এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি সফল হয়েছিলেন। তেমনই গ্রিকদের কাছে পরাজিত মিশরিয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এই সিরিয়া অভিযান ছিল মুহাম্মাদ আলীর শাসনকালের বৃহত্তম ও শেষ সামরিক সাফল্য। ১০ বছর ধরে সিরিয়া দখলে রাখার পর তিনি গোটা অটোমান সাম্রাজ্যের দিকেই হাত বাড়াবার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির নির্দেশে তিনি তাঁর হাত গুটিয়ে নেন। মিশরের মাটিতেই ফিরিয়ে আনেন তাঁর সেনাদের[২০]। ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেদের স্বার্থেই অটোমান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মিশরের মত শক্তিধর রাষ্ট্রের উত্থান তারা ভাল চোখে দেখেনি।

তাদের প্রভাব বিস্তার এবং প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের পথে এই দেশ বাধা সৃষ্টি করবে বলে তারা মনে করত। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি জারি করা এক ফরমান মোতাবেক মিশরের



দ্বিতীয় মাহমুদের স্বর্ণমুদ্রা তাঁর রাজত্বের পঁচিশতম বর্ষে মিশরে নির্মিত



দ্বিতীয় মাহমুদের দস্তামুদ্রা তাঁর রাজত্বের একত্রিশতম বর্ষে মিশরে নির্মিত

পাশার পদ বংশপরম্পরায় মুহাম্মাদ আলীর বংশধরদের জন্য নির্দিষ্ট হয়।[২১] একই দিনে জারি করা ফরমান অনুসারে মুহাম্মাদ আলীকে সুদানের শাসনভার দেওয়া হয়।[২২] এইভাবেই মিশরিয়-এশিয় সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা তার সব গৌবব হারিয়ে ধূলায় মিশে যায়।

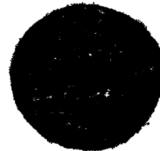
● সিরিয়া

প্রথম সালীমের[২৩] সিরিয়া বিজয়ের (১৫১৬) ফলে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো অথবা জনসংখ্যায় কোন বড়রকমের পরিবর্তন আসেনি। প্রশাসনিক বিভাগগুলির নতুন নামকরণ হয়েছিল ওয়ালাইয়া। জেরুসালেম, সাফাদ এবং গাজ্জা ভূখন্ডকে দামাস্কাসের অন্তর্ভুক্ত করে এই প্রদেশের আয়তনকে বাড়ানো হয়। বিশ্বাসঘাতক জান-বিরদি আল-গাজালিকে দামাস্কাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়। খাইর বের মত তিনিও দাবিকের যুদ্ধে[২৪] তাঁর মামলুক প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এই বিশ্বাসভঙ্গ তাঁকে কার্যত সিরিয়ারই শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।[২৫] কিন্তু এতেও তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই সালীমের মৃত্যুর (১৫২০) পর তিনি আল-মালিক আল-আশরাফ (মহানতম রাজা) উপাধি নিয়ে নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। সেইজন্য মদ্রায়

নিজের নাম খোদাই করেন। তাঁর পথপ্রদর্শক আলেপ্পোরে খাইর বেকেও স্বাধীন হওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু অটোমান সম্রাট সুলাইমানও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে দেরি করেননি। তার জেনিসারি সেনারা সিরিয়ার রাজধানী এবং তার আশপাশের অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। সাধারণ মানুষের উপর তাদের ভয়ংকর অত্যাচার তাইমূরের যুগের[২৬] কথা মনে করিয়ে দেয়। জেনিসারিদের নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায় ত্রাস। আজও সিরিয়ার মানুষের স্মৃতিতে সেই আতঙ্কের ছাপ রয়েছে।

● প্রাদেশিক প্রশাসন

সিরিয়ায় এরপর থেকে তুর্কি পাশারা এক-এক করে এসেছেন আর চলে গেছেন। প্রথম ১৮০ বছরে (১৫১৭-১৬৯৭) দামাস্কাসে[২৭] অন্তত ১৩৩ জন পাশা ক্ষমতায় এসেছেন। শাসক বদলের ক্ষেত্রে মিশরের থেকেও সিরিয়ার অবস্থা খারাপ ছিল।[২৮] আলেপ্পোতে মাত্র তিনবছরে মোট নজন ওয়ালি ক্ষমতায় আসেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই টাকার বিনিময়ে পদ দখল করতেন। উচ্চপদের সাহায্যে নিজেদের তহবিল ভারি করতেন এবং নিজেদের আরও মহিমান্বিত করে তুলতেন। আত্মপ্রচারের এই মাত্রা মাঝে মাঝে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদেরও ছাপিয়ে যেত, কারণ এদের উপর পোর্টের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিলই ছিল। প্রজাদের অবস্থা ছিল রায়াহর[২৯] মত। জন্তু জানোয়ারের পালের মতই তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হত, অত্যাচার করে নিংড়ে নেওয়া হত সবকিছু। রায়াহ হিসাবে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা মিলেটে[৩০] বিভক্ত করা হত। এই নীতি অনুযায়ী সিরীয়রা ছিল ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি। এমন কী এখানকার ইউরোপীয়দেরও মিলেটেরই অন্তর্ভুক্ত করা হত। তাদের নিজেদের ধর্মের প্রধানদের তৈরি করা আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আত্মসমর্পণের বিনিময়ে তারা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। ভেনেশিয়রাই প্রথম শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুযোগ পেয়েছিল। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে সুলাইমান তাদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তির মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ ছিল।[৩১] ফরাসিদের হাতে এই চুক্তি এসে পৌঁছয় ১৪ বছর পরে। ইংরেজদের



৯২৬ (১৫২০) খ্রিস্টাব্দে হলাব (আলেপ্পো)-এ নির্মিত প্রথম সুলাইমানের স্বর্ণমুদ্রা

হাতে আসে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে। অটোমান সাম্রাজ্যে প্রজাদের উন্নতিসাধনের জন্য সামান্য হলেও কিছু চেষ্টা করেছিলেন সংস্কারপন্থী তিন সুলতান—তৃতীয় সালীম (১৭৮৯-১৮০৭), দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-৩৯) এবং আবদ-আল-মাজীদ[৩২] (১৮৩৯-৬১)। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর কোন ফলই পাওয়া যায়নি। রায়াহদের কাজ করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দূর করার জন্য তনযীমাত নামে বিশেষ আইন তৈরি করা হয়েছিল। এই আইনে কৃষিক্ষেত্রে কর ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আইনের চোখে জাতিধর্মনির্বিশেষে সব প্রজারই সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। তাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতিও ছিল এই আইনে। কিন্তু তনযীমাত কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনরকম উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। ১৯০৮ সালের নবীন তুর্কি সংস্কারও একই রকমভাবে নিষ্ফল হয়ে যায়।

● অর্থনৈতিক অবনতি

তবে সিরিয়ার অর্থনীতির ক্রমাবনতির জন্য শুধু অটোমানদের প্রশাসনিক দুর্বলতাকেই দায়ী করা উচিত নয়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ থেকে ভারত যাওয়ার জলপথ আবিষ্কৃত হয়। নতুন এই জলপথ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপথকে বদলে দেয়। আরব হারিয়ে ফেলে তার গুরুত্ব। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আরব ও সিরিয়ার স্থান দখল করে পর্তুগিজরা। বাণিজ্যিক দিক থেকে আরব ভূখন্ডকে সকলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে থাকে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার আবিষ্কার বিশ্বের কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থলকে পশ্চিমে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর আগে পর্যন্ত নামের মাহাত্ম্য বজায় রেখে মধ্যমণি হয়ে ছিল ভূমধ্যসাগর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ভূমধ্যসাগরও একধারে সরে যায়। সাড়ে তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গুরুত্ব হারিয়ে একপাশে সরে ছিল ভূমধ্যসাগর। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ আলীর এক বংশধর ইসমাঈলের[৩৩] শাসনকালে সুয়েজ খাল চালু হয়। আর তখনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথে তার হৃতগৌরব ফিরে পায় ভূমধ্যসাগর। ১৮ শতাব্দীর ক্ষীয়মান প্যালেস্টাইনে তীর্থযাত্রীদের থেকে আদায় করা করই ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। আলেপ্পো এবং ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যাপ্ত জলসিঞ্চনে উর্বর সমতলভূমিকে ১৮ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই গ্রাস করে নেয় ঊষর মরুভূমি।[৩৪] এই শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই সিরিয়ার জনসংখ্যা ১৫ লক্ষে নেমে আসে। যার মধ্যে সম্ভবত দুলক্ষেরও কম মানুষ প্যালেস্টাইনে থাকতেন।[৩৫] ১৯ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেরুসালেমের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার; ১৯ শতাব্দীরই মধ্যভাগে দামাস্কাসের জনসংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ, বেইরুটের ১৫ হাজার এবং আলেপ্পোর ৭৭ হাজার।[৩৬]

অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সিরিয়ার বণিকরা প্রথম স্থলপথে বাণিজ্য আরম্ভ করার সময় আল-ইরাক, পারস্য এবং ভারতের সঙ্গে সংযোগসৃষ্টিকারী বাণিজ্যপথের সূচনাস্থল হয়ে ওঠে আলেপ্পো। তাই আলেপ্পোতে একাধিক ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। প্রথমেই গড়ে ওঠে

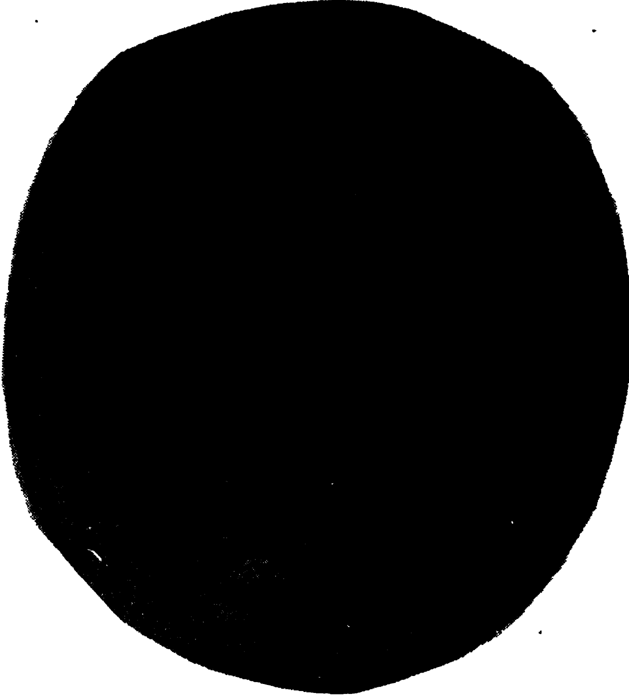
ভেনেশিয় উপনিবেশ। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ফ্রান্সিসকে সুলাইমানের দেওয়া শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের সুযোগকে কাজে লাগায় ফরাসিরা। সেইসঙ্গে ছিল ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মাহমুদ এবং পঞ্চদশ লুইয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অটোমান সাম্রাজ্যে আসা খ্রিস্টানদের নিরাপত্তার দায়িত্বই ছিল ফরাসিদের।[৬৭] সিরিয়ার অন্যান্য শহরে দ্রুত গড়ে উঠতে থাকতে ফরাসিদের শিল্পকেন্দ্র (কারখানা)। ইংরেজ বণিকরাও ফরাসিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। প্রাচ্যের বিলাসসামগ্রীর চাহিদা পশ্চিমি দুনিয়ায় ছিল। ধর্মযুদ্ধের ফলে আরও কিছু নতুন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয় প্রতীচ্যের মানুষ। আর এইসব চাহিদা পূরণ করতেই আরব মুলুকে শিল্পের প্রসার ঘটাতে থাকে বিদেশিরা। আত্মগর্বে গরীয়ান মুসলিমরা সব বিদেশিদেরই হেয় করত। তাই প্রথমদিকে হেনস্থা হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে বিদেশিরা স্থানীয় পোশাকের আশ্রয় নিত। কিন্তু ইউরোপীয় বণিকদের আধিপত্য বাড়তেই খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক, ইউরোপীয় শিক্ষক, পর্যটকদের আসা যাওয়াও হয়ে ওঠে অবাধ। মূলত জেসুইট, কাপুচিন এবং লাজারিস্ট গোষ্ঠীর খ্রিস্টানরাই ছিলেন ধর্মপ্রচারের কাজে সবচেয়ে সক্রিয়। তাঁদের উদ্যোগে ১৭ এবং ১৮ শতকে ইউনিয়াত গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরীয় গির্জায় ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, সিরিয়ার ভাষা ব্যবহৃত হত আর গ্রিক গির্জায় এই ভাষা ছিল গ্রিক। লেবাননের উদার এবং আলোকপ্রাপ্ত যুবরাজ দ্বিতীয় ফখর-আল-দীন আল-মানির (১৫৯০-১৬৩৫) শাসনকালে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব আরও বেড়ে যায়।

● লেবাননের আলোকপ্রাপ্ত আমীর ফখর-আল-দীন

পিতামহ প্রথম ফখর-আল-দীনের (মৃ. ১৫৪৪) নামেই নামকরণ হয়েছিল যুবরাজের। প্রথম ফখর-আল-দীন ছিলেন সুযোগসন্ধানী। সিরিয়ার দখল নিয়ে মামলূক এবং তুর্কিদের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে দাবিকে তখন এক কৌশল অবলম্বন করেন তিনি। যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে যুদ্ধশেষে বিজয়ীর পক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দাবিকের যুদ্ধে বিজয়ী হন সালীম। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অনুগতদের এক গোষ্ঠীকে নিয়ে বিজয়ীকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেন ফখর-আল-দীন। তিনি তাঁর অসাধারণ বাকচাতুর্যে[৬৮] একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এই অভিনন্দন বীরত্বকে নয়, বিজেতাকে। তিনি শুধুমাত্র বিজেতারই ছত্রধারণ করতে চান। তাঁর এই বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে সালীম লেবাননের স্বশাসনের সুযোগ সুবিধা আগের মতই বহাল রাখেন। সেইসঙ্গে করের পরিমাণও কমিয়ে দেন। তুর্কিরা ক্ষমতায় আসামাত্রই বুঝতে পেরেছিল, কষ্টসহিষ্ণু এবং বলশালী পর্বতারোহী দ্রুজ ও মারোনাইটদের নিয়ে গঠিত লেবাননকে সিরিয়ার তরফ থেকে কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। দামাস্কাসের তুর্কি ওয়ালি সাধারণভাবে পোর্ট এবং লেবাননের সামন্তপ্রভুদের মধ্যে সংযোগরক্ষা করতেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে লেবানিজরা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। সামন্তপ্রভুরা তাদের জমি বা সম্মত্তি উত্তরাধিকারীদের সমর্পণ করতেন ইচ্ছামতো। এছাড়া মর্জিমাফিক কর আদায় করলেও সুলতানের সামরিক বাহিনীতে কোনভাবেই তারা যোগদান করতেন না।

দ্বিতীয় ফখর-আল-দীনকে সমগ্র সিরিয়ার না হলেও অটোমান লেবাননের ইতিহাসের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বলা যায়। আরব জাতিভুক্ত 'মান'দের ক্ষমতার শিখরে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁরই। খর্বাকৃতি এই নেতার সম্পর্কে একটি হাস্যকর উক্তি প্রচলিত ছিল—"তাঁর পকেট থেকে একটি ডিম পড়লেও তা ভাঙবে না।" তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তিনটি—এক, বৃহত্তর লেবানন সৃষ্টি। দুই, তুরস্ক সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তিন, লেবাননকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া। স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার অনেকটাই কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন তিনি। পোর্টের কাছ থেকে বেইরুট ও সিডনের দায়িত্ব পাওয়া ছাড়াও উত্তরে ত্রিপোলি, বায়ালাবাক এবং আল-বিকা আর দক্ষিণে সাফাদ টিবেরিয়াস এবং নাজারেথের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করেন দ্বিতীয় ফখর-আল-দীন। এরপরই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টি যায় সমুদ্রের ওপারে। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তাস্কানির ডিউক ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তিতে পোর্টের বিরুদ্ধে গোপন সামরিক ষড়যন্ত্রের কথা ছিল।[৬৯] এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হওয়ার আগেই অবশ্য দামাস্কাস থেকে পাঠানো তুর্কি সেনা তাঁকে লেবানন থেকে হটিয়ে দেয়। পরাস্ত হয়ে পরিবার ও পরিজন সহ তাঁর ইতালিয় মিত্ররাষ্ট্রের রাজধানী ফ্লোরেন্সে আশ্রয় নেন তিনি। পাঁচবছর ইউরোপে (১৬১৩—১৮) থাকার পর মাতৃভূমি লেবাননে ফিরে আসেন দ্বিতীয় ফখর-আল-দীন। মাতৃভূমির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবার তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আর বীরের এই সংকল্পই তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক সরকার তাঁকে আলেপ্পো থেকে মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত 'আরবিস্তানের' অধীশ্বরের স্বীকৃতি দেয়। ক্ষমতায় এসেই লেবাননকে আধুনিক ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন দ্বিতীয় ফখর-আল-দীন। ইতালি থেকে স্থপতি এবং যন্ত্রবিদ ছাড়াও কৃষিবিজ্ঞানীদের নিজের দেশে নিয়ে আসেন, যাতে তাঁর প্রজারা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাস করতে পারে।[৭০] আল-বিকার যেসব জায়গা জলাধারে ভরা ছিল আধুনিক উপায়ে সেখানকার জলনিকাশের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাও ছিল। দেশের উন্নতির জন্য বিদেশি বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের জন্যও নিজের রাজত্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি। ফরাসি ক্যাথলিকরা বেইরুট, সিডন, ত্রিপোলি, আলেপ্পো বা দামাস্কাসের মত শহরে তো বটেই, এমনকী লেবাননের গ্রামেও তাদের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ধর্মের ব্যাপারে দ্বিতীয় ফখর-আল-দীন তেমন গোঁড়া ছিলেন না। অটোমানদের কাছে তিনি ইসলামের জয়গান করতেন। আবার নিজের প্রজাদের সামনে দ্রুজ ধর্মের। কিন্তু খ্রিস্টানধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সহানুভূতি এতটাই বেশি ছিল যে, অনেকসময়েই তাঁর বিরুদ্ধে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিযোগ তোলা হয়।[৭১] তার খ্রিস্টানপ্রীতিই সন্দিগ্ধ করে তোলে অটোমানদেরও। দামাস্কাস থেকে অটোমান সেনাবাহিনী আবার তাঁকে আক্রমণ করে। কিছুটা প্রতিরোধ করে পালিয়ে গেলেও এবার তাঁকে ধরা পড়তে হয়। জাজ্জিনের কাছে একটি গুহায় লুকিয়ে থাকার সময় অটোমান সেনারা তাঁকে বন্দি করে কনস্ট্যানটিনোপলে নিয়ে আসে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।[৭২] তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর

পুত্ররাও। সকলেরই মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় এবং তাঁর শবটি তিনদিন ধরে একটি মসজিদের সামনে রেখে দেওয়া হয়। স্বাধীন ও বৃহত্তর লেবাননের স্বপ্ন দেখা দ্বিতীয় ফখর-আল-দীনের উচ্চাশা ও



দ্বিতীয় ফখর-আল-দীন আল-মানী, লেবাননের আমীর ১৫৯০-১৬৩৫

উদ্যোগের সমাপ্তি হয় এইভাবে। কিন্তু মানুষ চলে গেলেও তার আশা আকাঙ্ক্ষা যায় না। তাই দ্বিতীয় ফখর-আল-দীনের মত লেবাননকে স্বাধীন করে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আমীর বাশীর-আল-শিহাবি (১৭৮৮-১৮৪০)। তবে ১৯৪৩ সালের আগে তাঁদের এই উচ্চাশা সম্পূর্ণ বাস্তব রূপ পায়নি। ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'মান'দের স্থলাভিষিক্ত হয় 'শিহাব'রা। শিহাবরা নিজেদের অন্যতম সম্ভ্রান্ত কুরাশ জাতির অন্তর্গত বলে দাবি করত। লেবাননের এই শাসকবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেষ 'মান' শাসকের জামাতা।

● সিরিয়ায় আযম

১৮ শতকের আগে পর্যন্ত সিরিয়ার স্থানীয় শাসকরা তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেননি। ইসমাঈল পাশা আল-আযমই প্রথম প্রতিবাদ করেন। দামাস্কাসের বাসিন্দা ইসমাঈলকে

১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের শহরেরই ওয়ালি নিযুক্ত করা হয়। ইসমাঈল প্রতিবাদী এবং যোগ্য হলেও তাঁর পুত্র আসআদ ছিলেন যোগ্যতর। হামাহ এবং দামাস্কাসে তাঁর তৈরি প্রাসাদগুলি আজও শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। পোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শাস্তিস্বরূপ ইসমাঈলকে বন্দি করে হত্যা করা হয়। আসাদকে কনস্ট্যানটিনোপলের নির্দেশে ষড়যন্ত্র করে স্নানাগারের ভিতরে হত্যা করা হয় (১৭৫৭)।[৫৩] আযম পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সিডন এবং ত্রিপোলির শাসক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু লেবাননের আমীরদের মতো তাঁরা প্রতিবাদী ছিলেন না। বরং দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁরা অটোমানদের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন।

● প্যালেস্টাইনে একনায়কতন্ত্র

১৮ শতাব্দী জুড়ে অটোমানদের ক্ষমতা এবং গৌরব যত কমতে থাকে, স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ করা বা স্বাধীন হওয়া স্থানীয় শাসকদের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। লেবানন বা মিশরের মত প্যালেস্টাইনেও স্বাধীনতার আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর এই আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রূপকার ছিলেন আল-শাইখ যাহির আল-[আল] উমার। বেদুইন উমারের পিতাকে সাফাদ জেলার শাইখ নিযুক্ত করেন লেবাননের শিহাবি শাসক। যাহিরের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় অল্পবয়সেই। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি টিবেরিয়াস দখল করেন।[৫৪] অন্যান্য শহরগুলি বিনা প্রতিরোধেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই আক্কা তাঁর অধীনে চলে আসে। ধর্মযুদ্ধের সময় থেকেই আক্কার ভগ্নদশা। যাহির ক্ষমতায় এসেই শহরের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। আক্কাকে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কৃতিত্বও তাঁরই। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। আক্কায় খুন জখম রাহাজানি বন্ধ করলেন শক্ত হাতে, ফিরিয়ে আনলেন আইনের অনুশাসন। একইসঙ্গে, গমের চাষ এবং রেশম শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে। খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতিও যাহির ছিলেন যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তাঁর আমলে আক্কা কতটা নিরাপদ ছিল তা জানা যায় তাঁরই জীবনীকারের কথায়। তিনি লিখেছেন[৫৫]—"মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার সহ একজন মহিলাও নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে প্রকাশ্য রাজপথে ঘুরে বেড়াতে পারতেন।"

একনায়ক হিসাবে নিজের কর্তৃত্বের ভিত মজবুত করে মিশরের আলী বের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন যাহির। সেইসময় তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছিল। আর সেই পরিস্থিতির সুবিধা নেন যাহির। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের রুশ নৌসেনাদের সাহায্যে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিডন[৫৬] দখল করেন। তিনবছর পরে যাহিরের কর্তৃত্বকে আঘাত করে লেবানন। সেখানকার শিহাবি আমীর দামাস্কাসের ওয়ালির সঙ্গে সমঝোতা করে কনস্ট্যানটিনোপলের সেনাবাহিনীর সাহায্যে যাহিরকে তাঁরই রাজধানীতে আক্রমণ করেন। অবরুদ্ধ থাকার সময় যাহিরকে হত্যা করেন তাঁরই এক বিশ্বাসঘাতক অনুচর। সিরিয়ার সেনাবাহিনী সিডনকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। আর সেই

সেনাবাহিনীরই এক সাধারণ আধিকারিক নিজেকে যাহিরের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আহমাদ আল-জা'য্যার নামে এই শাসকের উত্থান এবং শাসনকাল ছিল আরও নাটকীয়।

আল-জা'য্যার জন্মসূত্রে ছিলেন বসনিয়ার খ্রিস্টান। অল্পবয়সেই যৌন অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তিনি কনস্ট্যানটিনোপলে পালিয়ে যান। পরে তাঁর নাম হয় আহমাদ। কনস্ট্যানটিনোপলে এক ইহুদি ক্রীতদাস বিক্রেতার হাতে পড়ে শেষপর্যন্ত তিনি কায়রোয় আলী বের অধীনে চলে আসেন। ঘাতক হিসাবে তাঁর দক্ষতা তাঁকে আল-জা'য্যার বা কসাই নামে ভূষিত করে। মিশর থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে যান আল-জা'য্যার। সিডনে যাহিরের বিরুদ্ধে তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সিডনের শাসকের[৪৭] পদ দেওয়া হয়। ধীরে-ধীরে তিনি উত্তরে লেবানন ও দক্ষিণে প্যালেস্টাইনের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। দক্ষিণের এই কর্তৃত্ব তাঁকে আক্কায় যাহিরের উত্তরাধিকারীর পদমর্যাদা এনে দেয়। আক্কায় এসে তিনি বসনিয়া ও আলবেনিয়ার অশ্বারোহী এবং মাগরিবি পদাতিকদের নিয়ে নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেন। শহরের চারপাশে প্রাচীর তৈরি হয় বাধ্যতামূলক শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে। ছোট এক নৌবহরও তৈরি করা হয়। আল-জা'য্যারের এই কর্তৃত্ব অটোমান তুর্কিদেরও বাধ্য করে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তারা সিরিয়া ও লেবাননের শাসক হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। অটোমানদের কর্তৃত্ব ছিল শুধু নামেই। আল-জা'য্যার মুখে অটোমানদের কাছে তথাকথিত বশ্যতার কথা বললেও, কার্যক্ষেত্রে তাঁর সুর ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। অটোমান শাসক তৃতীয় সালীমের দূতকে তিনি হত্যা করেন। আহমাদ পাশা আল-জা'য্যারের কৃতিত্ব ও রণকৌশলের নজির এখানেই শেষ হয় না। স্যার সিডনি স্মিথের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাহায্যে নেপোলিয়নের মতো প্রবল পরাক্রমশালী বীরের আক্রমণের হাত থেকেও আক্কাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন তিনি।[৪৮] মনে প্রাণে স্বৈরাচারী এই শাসকের কাছে বাহুবলই ছিল শেষ কথা। শত্রু ও সন্দেহভাজনদের প্রতি তাঁর ক্ষমাহীন আচরণ আজও মানুষের মনে নিষ্ঠুরতা ও আতঙ্কের এক নজির হয়ে বেঁচে আছে। স্থানীয় এক বিবরণীকারের লেখায়[৪৯] তাঁর সন্দেহপ্রবণতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী অঙ্কিত আছে। তার হারেমের ৩৭ জনের মধ্যে কয়েকজনের প্রতি সন্দেহ হয়েছিল আল-জা'য্যারের। আর সেই সন্দেহের বশে খোজাদের দিয়ে হারেমের সকলকেই পুড়িয়ে মেরেছিলেন তিনি। তবে শুধু নিষ্ঠুরতাই নয়, নিজের নামের মাহাত্ম্য প্রচারেও কোনরকম কসুর ছিল না তাঁর। নিজের জীবনে বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আল-জা'য্যার। কখনও জয়ের শিরোপা এসেছে, কখনও বা এসেছে পরাজয়ের গ্লানি। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, রণাঙ্গণে মৃত্যু হয়নি আল-জা'য্যারের। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মারা যান।

● বাশীর আল-শিহাবি

আল-জা'য্যারের সময় লেবাননের রাজা ছিলেন আমীর দ্বিতীয় বাশীর (১৭৮৮-১৮৪০)। নেপোলিয়ন আক্কা আক্রমণ করার সময় সাহায্য না-করায় তিনি আল-জা'য্যারের কুনজরে পড়ে

যান। আল-জা'যারের পরাক্রম তখন এতই বেশি যে, তাঁর কোপের হাত থেকে বাঁচতে বাশীর একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে সাইপ্রাসে পালিয়ে যান। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে আল-বিকাকে লেবাননের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি মিশরে পালিয়ে যান। দামাস্কাস এবং ত্রিপোলির ওয়ালিদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। মিশরের প্রশাসক মুহাম্মাদ আলীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইবরাহীমের নেতৃত্বে যখন মিশরিয় বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ[১৩] করে, তখন বাশীর ও তাঁর অনুচরেরা তাদের সাহায্য করে। মিশরিয়রা জাফা ও জেরুসালেম বিজয়ের পর আক্কা অবরোধের সময়েও লেবাননের সাহায্য পায়। মিশরিয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করে দামাস্কাসও। হিমস থেকে তুর্কি সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দেওয়ার পর এশিয়া মাইনরের পথ আরও সুগম হয়ে যায়। টরাস পর্বতের গিরিপথকে কিছু জায়গায় আরও প্রশস্ত করতে হয় যাতে মিশরিয়দের অস্ত্রশস্ত্র সহজে নিয়ে যাওয়া যায়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে কনিয়েহ (কুনিয়াহ) বিজয়ের ফলে কনস্ট্যানটিনোপল বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বসফোরাসের প্রায় দোরগোড়ায় কুটাহিয়ায় (কুতাহিয়াহ) তাঁবু ফেলে মিশরিয়রা। এতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে রাশিয়া। আর রাশিয়ার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ইংল্যান্ড এবং তার আগে পর্যন্ত মুহাম্মাদ আলীর বিশেষ সাহায্যকারী ফ্রান্সও মিশরের বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়। আর এইভাবেই কনস্ট্যানটিনোপল বিজয়ের উচ্চাশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায় মিশরিয়দের।

নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সিরিয়ার প্রজাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন ইবরাহীম। বিশেষ করে খ্রিস্টানদের। এর আগে পর্যন্ত দামাস্কাসের মত শহরে কোন খ্রিস্টান ঘোড়ায় চড়ে বা শাদা, লাল ও সবুজ পাগড়ি মাথায় দিয়ে প্রকাশ্যে বেরোতে পারতনা। যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম এসে সেইসব বৈষম্য দূর করে দেন। পরে অবশ্য ইবরাহীমের উদারনীতি অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। পিতার নির্দেশে তিনি করের হার প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে দেন। মিশরিয় প্রথা মেনে[১৪] রেশম ও অন্যান্য দেশিয় পণ্যে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করেন। কিন্তু সিরিয়া এবং লেবাননের মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষোভের কারণ হয় তাঁর দুটি নীতি। তা হল, নিরস্ত্রীকরণ এবং প্রজাদের জোর করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা। এর অবধারিত ফল হয় বিদ্রোহ। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইনে যে-বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়, ক্রমশ তা সিরিয়ার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন প্রকাশিত ইস্তাহারে লেবাননের বিদ্রোহীরা নিরস্ত্রীকরণ এবং জোর করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগকেই তাদের ক্ষোভের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে।[১৫] সেইসময় লেবাননের আমীর ছিলেন মিশরিয়দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এর সুবাদে লেবানন যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। লেবাননের খনিজ পদার্থকে কাজে লাগিয়ে মুহাম্মাদ আলী তাঁর নৌসেনাকে নতুন করে শক্তিশালী করে তুলতে চাইছিলেন। নোভারিনোর[১৬] যুদ্ধে এই নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। আল-মাতন জেলার কারনাইলে কয়লা এবং মারজাবায় লোহার জন্য মিশরিয়দের সন্ধানের চিহ্ন আজও বর্তমান। লেবাননে বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ আবার একটি সেনাবাহিনী পাঠান। কিন্তু নিজ্জীবে (উত্তর সিরীয়ার নেজিব) এই সেনাবাহিনী পরাস্ত হয়। আর একবার অটোমান

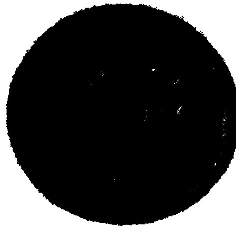
সাম্রাজ্য তার গৌরব হারায়। অভ্যন্তরীণ শক্তির হস্তক্ষেপে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর মুহাম্মাদ আলী সিরিয়া থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে ইবরাহীম দামাস্কাস থেকে গাজ্জা হয়ে ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করেন। বাশীরকে একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে মাল্টায়[১৪] নিয়ে যাওয়া হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সিরিয়া ও মিশরের এই কলহ প্রাচ্যে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করে। অপরদিকে গুরুত্ব কমে আসে ফ্রান্সের।

● লেবাননের স্বায়ত্ত্বশাসনকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

অটোমানরা অতঃপর অনুধাবন করে, লেবাননকে তাদের অধীনে আনতে হলে মারোনাইট এবং দ্রুজদের বিভেদে আরও ইন্ধন যোগাতে হবে। কারণ ফখর-আল-দীনের মত বাশীরের নেতৃত্বেও এরা সম্প্রদায়ের থেকে গোষ্ঠীকেই বেশি গুরুত্ব দিত। তখনও পর্যন্ত লেবাননের অভ্যন্তরীণ কলহ ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক, ধর্মীয় নয়। চিরপরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত বিভাজন নীতিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ অটোমানরা সেই সুযোগই নিল। বিভিন্ন প্রদেশে শাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করল তারা। খ্রিস্টান এবং দ্রুজ দুপক্ষই তাদের সামন্ত প্রভুদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। তবে খ্রিস্টানদের ক্ষোভ ছিল আরো বেশি। তাই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতেও বেশি সময় লাগল না। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ও মারোনাইট ধর্মযাজকদের মদতে উত্তর লেবাননের কৃষকরা তাদের সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সরব হয়। সামন্ত প্রভুদের বিশাল ভূখণ্ড তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাশীর ছিলেন লেবাননের অন্যতম যোগ্য শাসক। জনগণের প্রতি সুবিচার ও তাদের নিরাপত্তা দেওয়া ছাড়াও তিনি পশ্চিমের সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিরা ছিলেন অন্যরকম।[১৫]

অটোমানদের মদতে দ্রুজ ও মারোনাইটদের মধ্যে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে যে-গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় তা চরম রূপ নেয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। ভয়ংকর এই সংঘর্ষ আজও দেশের ইতিহাসে এক ভয়াবহ সময় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রথম আবদ-আল-মাজীদ সেইসময় সুলতান ছিলেন। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রায় ১১ হাজার খ্রিস্টানের মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মারোনাইট। এছাড়াও শ'দেড়েক গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। লেবাননের কৃষকদের কাছে আজও এই বছরটি ঐতিহাসিক সানাত-আল-হারাকাহ (বিবাদের বছর)[১৬] হিসাবে চিহ্নিত আছে। এই ধ্বংসলীলা ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপের পথ আরও সুগম করে দেয়। ফলস্বরূপ লেবানন চলে যায় ফরাসি সেনাবাহিনীর দখলে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের এক আইনবলে লেবাননকে স্বশাসন দেওয়া হয়। তিনবছর পরে সেই আইন সংশোধন হয় এবং স্বশাসিত অঞ্চলের একজন খ্রিস্টান প্রশাসকের (মুতাসররিফ) অধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ করা হত এবং প্রয়োজনে এই মেয়াদ আরও বাড়ানো হত। স্বাক্ষরকারী শক্তিদের অনুমোদন সাপেক্ষে। সব প্রশাসকরাই ছিলেন ক্যাথোলিক খ্রিস্টান। নতুন মুতাসাররিফীয়াত জাবাল লুবনানের কোন তুর্কি বাহিনী ছিল না, তিনি কনস্টানটিনোপলকে কোন কর দিতেন না এবং

তাঁর অধীনস্থ প্রজারা কনস্ট্যানটিনোপলকে সামরিক দিক থেকেও কোনরকম সহযোগিতা করত না। লেবাননের প্রথম মুতাসাররিফ ছিলেন দাউদ পাশা (১৮৬১-৮)। আবেহতে তাঁর নামে একটি দ্রুজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এই মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।



১২৫৫ (১৮৩৯) খ্রিস্টাব্দে মিশরে নির্মিত প্রথম আবদ আল-মাজীদের রৌপ্য মুদ্রা

মুতাসাররিফ এবং তাঁর মনোনীত প্রশাসনিক পরিষদের দক্ষতা লেবাননকে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। "স্বশাসিত তুর্কি পরিষদের এক উজ্জ্বল উদাহরণ" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল লেবানন। সেইসময়কার লেবাননে "জনগণের নিরাপত্তা এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মান এতটাই উন্নত ছিল যে, অটোমান সাম্রাজ্যের কোন অংশের সঙ্গেই তার কোন তুলনা হত না।"[২৮] জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লেবাননের মানুষ মিশর, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এখনও সেখানে লেবাননের মানুষ রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত লেবাননে স্বশাসন বজায় ছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কিদের হাতে স্বশাসনের অবসান ঘটে। স্বশাসিত লেবাননে পশ্চিমি শিক্ষক, ধর্মযাজক, চিকিৎসক এবং বণিকদের আগমন হয়েছিল বহু সংখ্যায়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কোন দেশেই পশ্চিমিদের এত সমাগম হয়নি। বাশীর বা ফাখরের সময়ের থেকেও বেশি করে এইসময় লেবাননের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। আরব ভূখণ্ড বহির্বিশ্বের দিকে চোখ মেলে তাকায় এই লেবাননের মাধ্যমে।

● আল-ইরাক

ইউফ্রেটিসের উপত্যকায় অটোমান আধিপত্যের সূচনা হয় ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আধিপত্য কমে আসে, শুরু হয় সন্ত্রাস আর অরাজকতার যুগ। একই অবস্থা হয়েছিল নীলনদের উপত্যকারও। তুর্কি পাশা, স্থানীয় শাসক ও মামলুকরা ব্যস্ত ছিলেন আল ইরাকের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। অপরদিকে দুর্নীতি, নিরাপত্তা ও সুবিচারের অভাবে বিপর্যস্ত

হয়ে পড়েছিল জনজীবন। অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও ১৬ শতকের শেষভাগে প্রাদেশিক প্রশাসকদের ক্ষমতা কমতে থাকে। ইরাক বিভক্ত ছিল তিনটি ওয়ালায়াহতে— বাগদাদ, আল-বসরা এবং আল-মাওসিল (মসুল)। অটোমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদে ক্ষমতার লড়াই এবং ষড়যন্ত্রই প্রাধান্য পেতে শুরু করে। প্রাচীনকালে হামুরাবি ও নেবুচাদনেজার এবং মধ্যযুগে হারুন ও আল-মামুনের অধীনে যে সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জন করেছিল বাগদাদ, অটোমানদের অধীনে তা নজিরবিহীন অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

ইরাকের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পিছনে ছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণ যেমন, ইরাকি জনসংখ্যায় শী'আহ্ সম্প্রদায়ের আধিক্য, কনস্ট্যানটিনোপলে সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধা, শী'আহ্ প্রধান পারস্যের সঙ্গে নৈকট্য এবং নগর ও জাতির মধ্যে সম্পর্কের ফাটল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের মতো সেইসময়েও ইরাকের দখল নিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল ও পারস্যের মধ্যে বিরোধ ছিল স্পষ্ট। শী'আহ্ সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি পবিত্র সমাধি ছিল আল-ইরাকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কারবালায় আল-হুসায়নের সমাধি, আল-নাজাফে আলীর সমাধি এবং আল-কাজিমায়েনে সপ্তম ও নবম ইমামের সমাধি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আল-ইরাকে শী'আহ্ সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল বেশি। তারা অটোমান সুলতানদের মতো সুন্নি খলিফাদেরও জবরদখলকারী মনে করত। পারস্যের মানুষ তাদের কাছে পরম মিত্র ছিল। এই শী'আহ্রা ছিল আল-ইরাক ও পারস্যের মধ্যে মিত্রতার সেতু। ১৬ শতাব্দী জুড়ে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না থাকলেও পরোক্ষ বিরোধ ছিল। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সালীমের বিজয়[১১] পর্যন্ত বাগদাদ দখল করেছিলেন শাহ ইসমাঈল। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক জেনিসারি বিদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে শাহ আব্বাস আবার বাগদাদ দখল করেন। ১৫ বছরে ধরে আল-ইরাক সাফাবীয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে। নিয়মমাফিক কর আদায় ছাড়া তুর্কিদের একমাত্র আগ্রহ ছিল আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলের বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে আল-ইরাককে ব্যবহার করা। তুর্কিরা কোনসময়েই এই পূর্ব উপকূলকে ঠিকমতো বাগে আনতে পারেনি। তুরস্ক-পারস্যের যুদ্ধ আল-ইরাকের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলেছিল। শী'আহ্ সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্রগুলিতে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা কমে গিয়েছিল, যা প্রভাব ফেলেছিল দেশের জাতীয় আয়ে। ১৭ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানে আল-ইরাকের গুরুত্ব বেড়ে যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগাযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই দেশ। ১৭ শতাব্দীর অন্তিমপর্বে পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগিজ ও ডাচদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশরা। এরপর খনিজ তেলের আবিষ্কার ইরাকের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯২৫ সালে তেল উত্তোলন ও বিপণনের সুবিধা পায় ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি। ৭৫ বছরের জন্য।

মরুপথে অতর্কিত আক্রমণ এবং অরাজকতার জন্য বেদুইনরা ক্রমেই আতঙ্কে পরিণত হয়। বাগদাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুর্গম মরুপথ যেমন সমস্যা

ছিল, তেমনই সমস্যা ছিল এই বেদুইনরা। ১৮ শতকের মধ্যভাগে নিম্ন ইউফ্রেটিসের বেশ কয়েকটি বেদুইন উপজাতি নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে আল-মুনতাফিক নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। কেবল বাগদাদের পাশারাই নন, স্থানীয় মামলুক শাসক এমন কী সাধারণ মানুষও তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

নামে স্বশাসন পেলেও মামলুকদের রাজপ্রতিনিধির সম্মান দেওয়া হত না। তারা ছিলেন নিছকই নির্ভরশীল বা বেতনভুক স্বশাসক। তাদের অধিকাংশই ছিল সারকাশিয় (কার্কস) ক্রীতদাস। এদের মধ্যে সুলাইমান আগা[৬০] (পরবর্তীতে পাশা) আবু-লায়লা বিদ্রোহ করে পাশা হিসাবে ক্ষমতায় আসেন ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে। বাগদাদে ৮০ বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা মামলুকদের সর্বশেষ শাসক ছিলেন দাউদ (মৃ. ১৮৩০)। আলোকপ্রাপ্ত এই শাসক বাগদাদে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-৬) পরে নিজেদের কর্তৃত্ব আরও দৃঢ় করতে বাগদাদে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে অটোমান তুর্কিরা। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের অন্যতম প্রগতিশীল ও উদারপন্থি প্রশাসক মিদহাত পাশাকে ওয়ালি নিযুক্ত করে তারা। বাগদাদের উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেন মিদহাত। যেমন অরাজকতা বন্ধ করা, বেদুইনদের কৃষিকাজে নিযুক্ত করে স্থায়ী বসবাসের চেষ্টা করা, সেচব্যবস্থার উন্নতি বা জমি নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া। এই তুর্কি প্রশাসকের সততা ছিল প্রশ্নাতীত। শোনা যায়, কনস্ট্যানটিনোপলে ফেরার খরচ মেটাতে তাঁকে নিজের ঘড়ি বিক্রি করতে হয়।[৬১] তাঁর এই ক্ষণস্থায়ী শাসনকালই ছিল সেই সময়কার অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগদাদের একমাত্র আশার আলো। সে-দেশের প্রথম সংবিধান[৬২] রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। যদিও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আবদ-আল-হামীদ তা বাতিল করে দেন।

● আরব ভূখণ্ড

উত্তর আফ্রিকা বা মিশর ও সংলগ্ন দেশগুলির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরব উপদ্বীপ নিজেই ছিল একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। ইসলামের জন্মভূমি হিসাবে পবিত্রতা ও ধর্মবিশ্বাসের এক বলয় তাকে ঘিরে আছে বরাবরই। আর দুনিয়া জোড়া বিশ্বাসীদের অন্তরে ও মানসিকতায় তার অবস্থানও সম্ভ্রমপূর্ণ। সেই সঙ্গে রয়েছে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগের অসুবিধা। তাই মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য আজও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে আরবের সর্বত্র। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল আল-হিজাজ ও আল-ইয়ামান। পশ্চিমি ধ্যানধারণার কোন প্রভাবই এখানে ছিল না।

হযরত মুহাম্মাদের কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ কেন্দ্র না হলেও আল-ইয়ামান ছিল আল-হিজাজের মতই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আল-ইয়ামানের মানুষ ছিল জায়েদের অনুগত। জায়েদ ছিলেন আল-হুসায়নের পৌত্র। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় জায়েদের মৃত্যু হয়। শীআহ্ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও জায়দিদের (জুয়ূদ) মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিল না। বরং তাদের উপর সুন্নিদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট বেশি। কাসিম নামে জায়দিদের এক বংশধর ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি ওয়ালিকে

ক্ষমতাচ্যুত করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েও টিকে ছিল এই রাজত্ব। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে অবশ্য দেশে আবার তুর্কি ওয়ালাইয়াদের শাসন কায়েম হয়। ১৯০৪তে ইমাম ইয়াহিয়ার উত্থানের আগে পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। এর পরের বছর ইমাম 'সান্‌আ' দখল করেন। এই সানআই পরবর্তীকালে তাঁর রাজধানী হয়। কিন্তু ১৯১১ সালের আগে পর্যন্ত তুরস্ক সরকার তাঁর স্বশাসনকে স্বীকৃতি দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরের আগে তুর্কিরা এই দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ছাড়েনি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ চক্রান্তে ইয়াহিয়ার পতন হয়। আল-ইয়ামানে বিদেশিদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনোভাবের এক বিচিত্র উদাহরণ আছে। কয়েকবছর আগে, দামাস্কাসের এক মুসলিম স্বয়ং ইমামের বিশেষ দেহরক্ষীবাহিনীর সঙ্গে আল-ইয়ামান গিয়েছিলেন। কিন্তু মাআরিবে স্থানীয় মানুষ তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন কারণ তাঁকে 'গরীব' বা বিদেশিদের মত দেখতে।[৮৫] লেবাননের মার্কিন লেখক আমিন রিহানির অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। ১৯২০র দশকের গোড়ার দিকে তাঁর দেখা আল-ইয়ামানের অনেক ধর্মতাত্ত্বিকই খ্রিস্টানদের দেখে চোখ অপবিত্র করার ভয়ে কালো চশমা পরে ঘুরতেন।

সুয়ূদি আরব এবং আল-ইয়ামানের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া আরব উপদ্বীপের অন্যান্য সব দেশই ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত কমবেশি গ্রেট ব্রিটেনের ছত্রচ্ছায়ায় পালিত ছিল। এই দেশগুলির মধ্যে ছিল মাসকটের সুলতানি, উমানের রাই বা কাতার ও আল-বাহরাইনের স্বশাসিত শাইখশাসিত রাজত্ব। পারস্য উপসাগরে আল-কুওয়াইতের শাইখ শাসকদের ১৯১৪ সালে স্বশাসন দেয় ব্রিটিশরা। ১৯৬১ সালে তা স্বাধীন আমীরশাহির সম্মান পায়। খনিজ তেলে সমৃদ্ধ এই দেশই মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র। উমান এবং আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের দেশগুলি প্রথমে পর্তুগিজ ও পরে ব্রিটিশদের অধীনে আসে। কিন্তু কোন সময়েই তারা তুর্কিদের অধীনে ছিল না।[৮৬] প্রায় ১৫০ বছর ধরে উমান ছিল নামেমাত্র স্বাধীন। ক্ষমতার কেন্দ্র মাসকটে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় ধরে উমানের সুলতানরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। আর এই বন্ধন আরো দৃঢ় হয় ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাদের এক চুক্তির মাধ্যমে। কাতারের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৩৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত উপসাগরের কূলবর্তী অঞ্চল শাইখের অধীনে ছিল। এই উপকূলকে জলদস্যুদের উপকূলও বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কিছুদিনের সংঘর্ষের পর এই শাইখরা ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জলদস্যুতা এবং ক্রীতদাস বেচাকেনা বন্ধ করার কথা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কাতারের সম্পর্কও দক্ষিণের এই শাইখদের মতো ছিল এবং তা নিয়ন্ত্রিত হত ১৯১৬ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে। আল-বাহরাইনের অবস্থাও ছিল একই রকম। এখানকার মুক্তা শিল্প বিশ্ববিখ্যাত হলেও তা থেকে লাভের অঙ্ক ক্রমেই কমে আসছিল। ১৯৩২ সালে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়ায় বাণিজ্যিক মানচিত্রে আল-বাহরাইনের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

১৯৬৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, আগামী তিনবছরের মধ্যে পারস্য উপসাগর

থেকে তারা সমস্ত সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে নেবে। এই ঘোষণার পরেই আল-বাহ্‌রাইন, কাতার এবং অন্য সাতটি দেশের প্রতিনিধিরা আরব আমীরশাহির এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করে।

এডেন উপনিবেশ থেকে পূর্বাঞ্চলে এডেন (আদন) আশ্রিত দেশগুলি বিস্তৃত ছিল। এর অন্তর্গত ছিল লাহআজ, হাযরামাওত, মাহ্‌রাহ্‌ এবং সুকুত্রা (সোকোত্রা) প্রভৃতি দেশ। ১৮ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অঞ্চল সানআর ইমামের অধীনে ছিল। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ও বন্দর-শহর এডেন দখল করা হয়। ১৯৬৭ সালে গোটা অঞ্চলই স্বাধীনতা লাভ করে এবং দক্ষিণ ইয়ামান প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

● ওয়াহ্‌হাবি

১৮ শতকের মাঝামাঝি মুয়াহ্‌হিদূনদের (একেশ্বরবাদী) উত্থানের আগে আরবের আধুনিক যুগের সূচনা হয়নি। এটি ছিল কঠোর নীতিপরায়ণতার পুনরুজ্জীবন। আর এর প্রবর্তক ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন-আবদ-আল-ওয়াহাব (মৃ. ১৭৯২) নামে আল-উয়ায়নাহ্‌র এক নাজদি। আল-হিজাজ, আল-ইরাক এবং সিরিয়া থেকে ঘুরে এসে আবদ-আল-ওয়াহাবের মনে হয় সেখানকার মুসলিমদের ধর্মচর্চা হযরত মুহাম্মাদ বা কোরানের কঠোর অনুশাসনের থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। ইসলামকে এই বিচ্যুতিমুক্ত করে তাকে আগের রক্ষণশীলতা ফিরিয়ে দেওয়ার সংকল্প নেন তিনি। ইব্‌ন-তায়মিয়ার[৬৫] মত অনুযায়ী তিনি এই কাজের অনুপ্রেরণা পান ইব্‌ন-হানবালের কাছ থেকে। মধ্য-আরবের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতি এবং আবদ-আল-ওয়াহাবের জামাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন-সুয়ূদকে নতুন ধর্মপ্রচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ধর্ম প্রচারের স্বার্থে এই বৈবাহিক সম্পর্ককে ধর্মের সঙ্গে তলোয়ারের মেলবন্ধন বলা যেতে পারে। এরফলে মধ্য ও পূর্ব-আরবে ধর্ম ও ইব্‌ন-সুয়ূদের কর্তৃত্ব দ্রুত প্রসার লাভ করে। আবদ-আল-ওয়াহাবের বিরোধীরা তাঁর অনুগামীদের ওয়াহাবি আখ্যা দেয়। ইসলাম ধর্মকে তার বিভিন্ন সুফি মতবাদ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্যনতুন মনগড়া প্রথা আবিষ্কারের (বিদআহ) হাত থেকে রক্ষা করার আদর্শ নিয়ে ওয়াহাবিরা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কারবালা এলাকায় তান্ডব চালায়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কা ও তার পরের বছর আল-মদীনা দখল করে। এইসব নগরের বিভিন্ন সমাধিভবন ধ্বংস করা ছাড়াও পৌত্তলিকতার অন্য বহু চিহ্ন সম্পূর্ণ ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়।[৬৬] এর পরের বছর তারা সিরিয়া ও আল-ইরাক আক্রমণ করে। ক্রমে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের সীমা পালমিরা থেকে উমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হযরত মুহাম্মাদের সময় থেকে আরব উপদ্বীপে এত বিস্তৃত অঞ্চল কারও অধিকারে ছিল না। ওয়াহাবিরা প্রচার করে, তৃতীয় সালীম[৬৭] প্রবর্তিত বিভিন্ন বিদআহ আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছে। আর সেই কারণেই ওয়াহাবিদের এই সাফল্য। তাদের এই প্রচারে সতর্ক হয়ে যায় অটোমান তুর্কিরা। তাদেরই অনুরোধে পাল্টা প্রচারে নামে মুহাম্মাদ আলী। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবিদের ক্ষমতাচ্যুত করে এই প্রচারাভিযান

শেষ হয়। শুধু তাই নয়, তাদের রাজধানী আল-দিরিয়াহ্ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৮] ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও ওয়াহাবিদের মতবাদ প্রসার লাভ করতে থাকে। পূর্বে সুমাত্রা থেকে পশ্চিমে নাইজেরিয়া পর্যন্ত এই মতবাদের প্রভাব দেখা যায়।

● ইব্‌ন সুয়ূদ

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু থেকে ওয়াহাবিদের মধ্যে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের এক প্রয়াস দেখা যায়। তবে তা ছিল খুবই কম সময়ের জন্য। স্বল্পায়ু এই প্রয়াসকে বাদ দিলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ওয়াহাবিদের গৌরব অস্তমিতই ছিল। এইসময়েই উত্থান হয় ওয়াহাবি রাষ্ট্র ও বংশের পুনরুদ্ধারকারী আবদ-আল-আযীয-ইব্‌ন-সুয়ূদ-এর। প্রথম জীবনে আল-কুওয়ায়েতে নির্বাসিত ছিলেন তিনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি হেইলের ইব্‌ন-রশীদ পরিবার এবং মক্কার শরীফ হুসাইন পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ব্রিটিশদের সমর্থন পেয়ে হুসাইন ১৯১৬ সালে নিজেকে "আরবদের রাজা" ঘোষণা করেন। ১৯২৪ সালে তিনি "মুসলিমদের খলিফা"[৯] আখ্যা পান। ১৯২১ সালে আবদ-আল-আযীয রশীদ পরিবারের শাসনের অবসান ঘটান। ১৯২৪ সালে তিনি মক্কা দখল করেন এবং ১৯২৫ সালে আল-মদীনা ও জুড্ডা তাঁর অধীনে আসে। ১৯৩২ সালে তিনি সুয়ূদি আরবীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন। এর অধীশ্বর ছিলেন তিনি নিজে।[১০] নিজের সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেমন, উপজাতিদের হামলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, জনগণের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, কয়েকটি অঞ্চলে রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং মোটরগাড়ি চালু করা। যাযাবর প্রজাদের ইখওয়ান (ভাই) হিসাবে কৃষিকাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।[১১] তবে এই কাজে তিনি তেমন সফল হননি। তীর্থযাত্রীদের থেকে পাওয়া করের থেকেও বড় আয়ের সূত্র ছিল অ্যারাবিয়ান আমেরিকান অয়েল কোম্পানি। ১৯৩৩ সালে খনিজ তেল উত্তোলন ও বিপণনের সুবিধা পাওয়া এই সংস্থা সরকার এবং জনগণ উভয়েরই আয়ের বৃহত্তম সূত্র হয়ে ওঠে। আরবের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এই সংস্থার অবদান আজও উল্লেখযোগ্য।

● বৌদ্ধিক তৎপরতা

অটোমানদের অধীনে আরব মুলুকের রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা বৌদ্ধিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তবে এই বৌদ্ধিক দৈন্যের সূচনা হয়েছে আরও অনেক আগে। তুর্কিদের আগমনের কয়েক শতাব্দী আগেই ইসলামি সৃজনশীলতা তার গৌরব হারায়।[১২] ১৩ শতকের গোড়ার দিকে ধর্মতত্ত্ব চর্চার আধিক্য, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার এবং নানা অলৌকিক উপাদানের প্রাধান্য, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার অভাব এবং

অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি অযৌক্তিক ও মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা ও সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আরবের বৌদ্ধিক বিকাশের পথের এই প্রতিবন্ধকতা দূর হয় ১৯ শতকে পশ্চিমি দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে।[৭৩]

এই পর্বে মৌলিক রচনার যথেষ্ট অভাব ছিল। অধিকাংশ লেখকই ভাষ্য রচনা, সংকলন অথবা বৃহৎ রচনাকে সংক্ষিপ্ত করার কাজ করতেন। কিন্তু রচনার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ ও বৌদ্ধিক গোঁড়ামিই তাদের কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আরবী ভাষায় রচনা করেছেন এমন তুর্কিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল হাজ্জি খালফাহ্ (মৃ. ১৬৫৭)। কনস্ট্যানটিনোপলের অধিবাসী এই রচনাকারকে তুর্কিরা বলতেন কাতিব ছেলেবি (নবীন লেখক)। হাজ্জি খালফা কর্মজীবন শুরু করেন সেনাবাহিনীর একজন করণিক হিসাবে। তুর্কি সেনাবাহিনী সেইসময় বাগদাদ ও দামাস্কাসে অভিযানে গিয়েছিল। তাঁর লেখা কাশফ আল-যুনূন আন আল-আসামি অ-আল-ফুনূন[৭৪] (উপাধি ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত দ্বিধা দূর করা) আরবী ভাষায় লেখা অন্যতম বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক-বিবরণী এবং জ্ঞানকোষ।

মিশরের সাহিত্যচর্চার সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'আবদ-আল-ওয়াহ্হাব আল-শা'রানি (মৃ. ১৫৬৫)। অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী এই রচনাকারের লেখায় সুফিবাদ ছাড়াও কোরান এবং ভাষাতত্ত্বের বিবরণ আছে। তিনি পয়গম্বর এবং দেবদূতদের[৭৫] সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে দাবি করেন। এর ফলে রক্ষণশীল ধর্মতাত্ত্বিকরা তাঁকে অধার্মিকতার দায়ে অভিযুক্ত করেন। আল-শা'রানির রচনার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ।[৭৬] এর মধ্যে কয়েকটি, মৌলিকতার অভাব সত্ত্বেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর লেখা আল-তাবাকাত আল-কুবরা-এ[৭৭] (উচ্চ শ্রেণী) অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনের বর্ণনা আছে।[৭৮] বিশিষ্ট অভিধান রচনাকার আল-সায়্যিদ মুর্তাযা আল-জাবীদির কর্মক্ষেত্রও মিশর। ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর জন্ম। সরকারি কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর কায়রোতে তিনি টীকা ও মন্তব্য সহ আল-ফিরূযাবাদির বিশাল রচনা আল-কামূসের[৭৯] একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। নাম তাজ আল-আরূস (বধূর টায়রা)।[৮০] আল-গাজ্জালীর ইহ্য়ার উপরেও তিনি টীকা ও মন্তব্য সহ একটি বৃহদায়তন ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। মিশরিয় কাহিনীকারদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আবদ-আল-রহমান ইব্ন-হাসান আল-জাবারতি (মৃ. ১৮২২)। তাঁর পূর্বপুরুষরা অ্যাবিসিনিয়ার জাবার্ত থেকে কায়রোয় চলে আসেন। আল-জাবারর্তি ছিলেন আল-আজহারের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত নেপোলিয়নের বিশেষ পরিষদেরও (দিওয়ান) একজন সদস্য ছিলেন তিনি। এই পরিষদের সাহায্যেই নেপোলিয়ন মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। শোনা যায় এই আল-জাবারতিকে খুন করা হয়েছিল মুহাম্মাদ আলীর নির্দেশে। তার এই ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তাঁর লেখা আজাইব আল-আসার ফি আল-তারাজিম অ-আল-আখবার[৮১] (জীবনী ও সংবাদের বিস্ময়কর স্মারক) একই সঙ্গে ধারাবিবরণী ও অলৌকিক কাহিনীর সমাহার।

এই অধ্যায়ে লেবাননের যেসব লেখকদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনজন মারোনাইট। ইস্তিফান আল-দুয়ায়হি[12] (মৃ. ১৭০৪) শিক্ষালাভ করেছিলেন ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে রোমে মারোনাইট ছাত্রদের করণিক পদে প্রশিক্ষিত করতে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করা হয়। আল-দুয়ায়হি তাঁর গির্জার সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। আল-আমীর হায়দার[13] (মৃ. ১৮৩৫) ছিলেন লেবাননের অভিজাত শিহাব পরিবারের সদস্য। লেবাননের বহু সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসকই এই পরিবারের সদস্য ছিলেন। তান্নুস আল-শিদয়াক[14]এর (মৃ. ১৮৩৫) জন্ম বেইরুটের কাছে। শিহাবি আমীরদের অধীনে বিচারকের পদে নিযুক্ত হন তিনি। তবে সবচেয়ে কৃতি মারোনাইট শিক্ষাবিদ হিসাবে নিঃসন্দেহে ইউসুফ সিমআন আল-সিমআনির (আসেমানি ১৬৮৭-১৭৬৮) নাম করতে হয়। ইনিও রোমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। লেবাননের এই পন্ডিতের উদ্যোগেই মূলত প্রাচ্যের শিক্ষা পশ্চিমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে তা যখন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভ্যাটিকানের গ্রন্থাগারে তাঁর যেসব রচনা আছে তা শুধু পান্ডুলিপির সংখ্যার বিচারেই নয়, গুণগত দিক থেকেও প্রাচ্যশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। আল-সামআনির অবিস্মরণীয় গ্রন্থ বিবলিওথিকা ওরিয়েন্টালিস।[17] এই পান্ডুলিপিগুলির উপর গবেষণা সিরীয়াক, আরবী, হিব্রু, পারসি, তুর্কি, ইথিওপিক এবং আর্মেনিয় ভাষায় লেখা আছে। প্রাচ্যের গির্জা সংক্রান্ত তথ্যের এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

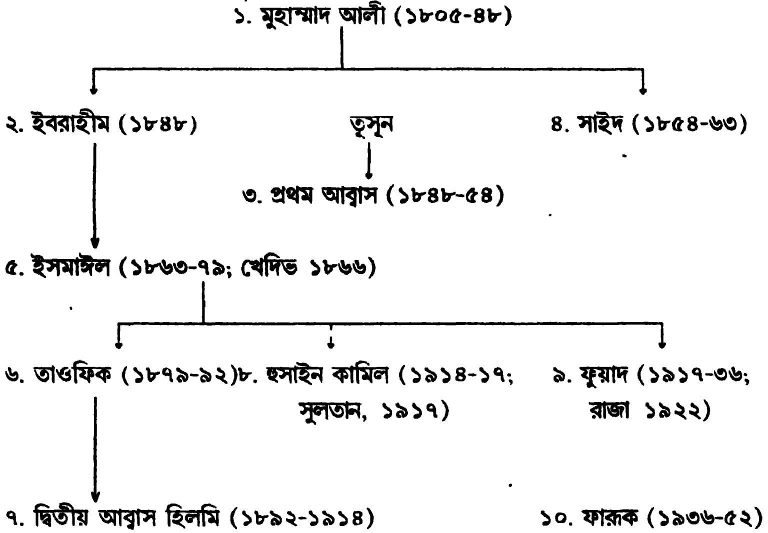
সিরিয়ায় সমকালীন রচনাধারার প্রকাশ ঘটেছিল মূলত দুজন লেখকের কলমে। দামাস্কাসের অধিবাসী এই দুই রচনাকারের নাম আল-মুহিব্বি এবং আল-নাবুলুসি। দুজনের রচনাই সংখ্যায় যথেষ্ট বেশি। মুহাম্মাদ আল-মুহিব্বি (১৬৯৯) শিক্ষালাভ করেন কনস্ট্যানটিনোপলে। মক্কায় কিছুদিন সহকারী বিচারক হিসাবে এবং নিজের শহর দামাস্কাসে অধ্যাপকের কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য[18] ছিল ১২৯০ জন মনীষীর এক জীবনী সংকলন। সেই মনীষীদের সকলেই মুসলিম পঞ্জিকার এগারো শতকের (১৫৯১-১৬৮৮) মধ্যে মারা যান। আবদ-আল-গনী আল-নাবুলিসির (মৃ. ১৭৩১ খ্রিঃ) নাম থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর পরিবারবর্গ মূলত ছিল প্যালেস্টাইনের অধিবাসী। তিনি ছিলেন একজন সুফি ও পর্যটক। তাঁর গ্রন্থাবলির সংখ্যা বিপুল হলেও অধিকাংশই অপ্রকাশিত[19] থেকে গেছে। তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু অলৌকিকতা হলেও ভ্রমণবৃত্তান্তের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। যদিও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে মূলত পবিত্র স্থান এবং লৌকিক উপাখ্যানের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ❑

● টীকা ●

১. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ৭০৩
২. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ৬৯০
৩. ইব্‌ন-আইয়াস, পঞ্চমখন্ড, পৃঃ ১৮৮
৪. তুর্কি সানজাক (আরবী সানজাক), আরবী লিওয়া বা পতাকার অনুবাদ।
৫. জামবাউরে প্রদত্ত তালিকা পৃঃ ১৬৬-৮
৬. জুরজি জায়দান, তারীখ মিসর আল-হাদীস, তৃতীয় সংস্করণ (কায়রো ১৯২৫), দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৯-৪০।
৭. আখবার আল-উয়াল ফি মান তাসাররাফা ফি মিসর মিন-আল-দুওয়াল (কায়রো, ১২৯৬), পৃঃ ২৫৮।
৮. তাঁকে বলা হত "স্বর্ণপিতা"। কারণ তিনি বকশিস হিসাবে সোনা ছাড়া আর কিছু দিতেন না।
৯. আল-জাবারতি, আজাইব আল-আসার ফি আল-তারাজিম অ-আল-আখবার (কায়রো, ১৩২২), প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪২২, ৩৫৩।
১০. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৪৪১ পৃষ্ঠার ৮ নং টীকা।
১১. জাবারতি, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৬৭
১২. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭৩১-৩২ পাতা দেখুন।
১৩. ঘোষণার অনুলিপি জাবারতির তৃতীয় খন্ডে আছে পৃঃ ৪-৫; এর শুরু সনাতন মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে : দয়াময়, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র নামে; সারসংক্ষেপ আল-শারকাবী, তুহফাত আল-নাযিরীন ফি মান ওয়ালিয়া মিস্‌র মিন আল-ওয়ালাত অ-আল-সালাতীন (কায়রো, ১২৮৬) পৃঃ ৫৫; 'কপিজ অব দ্য ওরিজিনাল লেটার্স ফ্রম দ্য আর্মি অব জেনারেল বোনাপার্টে ইন ইজিপ্ট, ইন্টারসেপ্টেড বাই দ্য ফ্লিট আন্ডার দ্য কমান্ড অব অ্যাডমিরাল লর্ড নেলসন' এর ১১ সংস্করণের প্রথম খন্ডে (লন্ডন ১৭৯৮), পৃঃ ২৩৫-৭ এ ইংরেজি অনুবাদ।
১৪. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ৭৩৩
১৫. সাংস্কৃতিক ফলাফল বিষয়ে দেখুন, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের পৃঃ ৭৪৫
১৬. ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রথম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে; রোডেরিক ডি ম্যাথিউজ ও মাট্টা আকরাবী, এডুকেশন ইন আরাব কান্ট্রিজ অব দ্য নিয়ার ইস্ট (ওয়াশিংটন ১৯৪৯), পৃঃ ৮০
১৭. তাঁর মৃত্যুর শতবার্ষিকে আসয়ুতে তাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
১৮. উমার তুসূন আল-বা'সাত আল-ইলমীয়াহ (আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৩৪), পৃঃ ৪১৪
১৯. ম্যাথিউজ ও আকরাবী পৃঃ ১১৬

২০. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭৩৩-৩৭ পাতা দেখুন।

২১. মিশরের রাজপরিবারের বংশলতিকা :



২২. মূল আরবীর জন্য দেখুন জায়দান, তারীখ মিস্‌র, দ্বিতীয় খন্ড,, পৃঃ ১৭২-৫; ফরাসি অনুবাদের জন্য দেখুন এডুয়ার্ড ড্রিয়ল্ট, এল ইজিপ্ট এল ইউরোপ : লা ক্রাইজ ওরিয়েন্টেল ডি ১৮৩৯-১৮৪১, চতুর্থ খন্ড, (রোম, ১৯৩৩), পৃঃ ২৭৫-৮২

২৩. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭০৩ পাতা দেখুন।

২৪. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭০৩ পাতা দেখুন। ইব্‌ন-আইয়াস, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ১৫৬, ১৫৭; সা'দ-আল-দীন, তাজ আল-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয় খন্ড, (কনস্ট্যানটিনোপল, ১২৮০) পৃঃ ৩৬৪-৫

২৫. অটোমান কর্তৃপক্ষ পুরানো নাম সুরাইয়াহ চালু করেন; আরবী নাম আল-শাম আর ব্যবহার হয়নি। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৫৭-৫৮ পাতা দেখুন।

২৬. ইব্‌ন-আইয়াস, পঞ্চম খন্ড,, পৃঃ ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭৬-৮, ৪১৮-১৯ পাতা।

২৭. ল্যামেনস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৬২

২৮. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭১৯ পাতা দেখুন।

২৯. আরবী রায়য়াহ, দল।

৩০. আরবী মিল্লাহ, ধর্ম, জাতি।

৩১. পরে লাতিন, ক্যাপিচুলা, সেখান থেকে ক্যাপিচুলেশন (শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ)।

৩২. খলিফা আবদ-আল-মাজীদের (১৯২২-৪) থেকে তাঁকে আলাদা করার জন্য এই সংখ্যা।

৩৩. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭৫০ পাতা দেখুন।

৩৪. খ্রিস্টিনা পি গ্রান্ট, দ্য সিরীয়ান ডেজার্ট (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮), পৃঃ ১৬১।

৩৫. আলফ্রেড বন, দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অব দ্য নিয়ার ইস্ট (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৫)। পৃঃ ১০।

৩৬. বন, পৃঃ ১১।

৩৭. এফ চার্লস-রোক্স, ফ্রান্স এট ক্রেটিয়েনস ডি ওরিয়েন্ট (প্যারিস, ১৯৩৯) পৃঃ ৬৮-৭৭

৩৮. হায়দার, ৫৬১ তে উদ্ধৃত; ইস্তিফান আল-দুয়ায়হির তায়ীখ আল-তায়ীফাহ আল-মারূনীয়াহ, রশীদ কে আল-শারতূনি (বেইরুট ১৮৯০), পৃঃ ১৫২; তান্নুস আল-শিদয়াক-এর তারীখ আল-আয়্যান ফি জাবাল লুবনান (বেইরুট, ১৮৫৯), পৃঃ ২৫১; হিট্টির হিস্ট্রি অব সিরিয়া, ৬৬৫-৬৬ পাতা দেখুন।

৩৯. এটি এবং অন্যান্য চুক্তির জন্য দেখুন পি পাওলো কারালি (কারা'লি), দ্বিতীয় ফখর আল-দীন ই লা কর্টে ডি টসকানা (রোম ১৯৩৬-৮), প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪৬; দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৫৯; জি মারিটি ইস্টোরিয়া ডি ফাকারদিনো গ্র্যান্ড এমির ডেই ড্রুসি (লিভোরনো, ১৭৮৭) ৭৪ ও পরের পাতা।

৪০. কারালি, দ্বিতীয় খন্ড, ৫২ ও পরের পাতা।

৪১. কারালি, দ্বিতীয় খন্ড, ৬৪০ ও পরের পাতা।

৪২. দুয়ায়হি, পৃঃ ২০৪-৫; শিদয়াক পৃঃ ৩৩০-৩৫; কারালি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৪০-৫৬

৪৩. মুহাম্মাদ কুর্দ-আলি, খিতাত আল-শাম, দ্বিতীয় খন্ড, (দামাস্কাস ১৯২৫), পৃঃ ২৮৯, ২৯০-৯১ ; হায়দার আল-শিহাবি, তারিখ, সম্পাদনা নাউম মুগাবগাব (কায়রো ১৯০০) পৃঃ ৭৬৯

৪৪. ভলনি, ভয়েজ এন সিরীয়া এট এন ইজিপ্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ (প্যারিস, ১৭৮৭), দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৮৫; শিদয়াক, পৃঃ ৩৬০; হায়দার, পৃঃ ৮০১; মিখাইল এন. আল-সাব্বাগ (আল-আক্কাবী), তারীখ আল-শাইখ যাহির আল-উমার আল-জায়দানি, সম্পাদনা কুসতানতীন আল-বাশা (হারীসা) পৃঃ ৩১-৩

৪৫. সাব্বাগ, পৃঃ ৫০

৪৬. সাব্বাগ পৃঃ ১১৫; শিদয়াক পৃঃ ৩৮৯

৪৭. হায়দার, পৃঃ ৮১১, ৮২৭

৪৮ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭২২ পাতা দেখুন।

৪৯. মিখাইল মুশাকাহ্, মাশহাদ আল-আয়ান বি-হাওয়াদিস সূরীয়া ওয়া-লুবনান, সম্পাদনা মুলহিম কে আবদুহ্ এবং আনদারাউস এইচ শাখাশীরি (কায়রো, ১৯০৮), পৃঃ ৫৪।

৫০ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭২৫ পাতা দেখুন।

৫১ হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭২২ পাতা দেখুন। রেশমি বস্ত্রের প্রথম আধুনিক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের বাতাতির গ্রামে। তৈরি করেন এক ফরাসি।

৫২. আসাদ জে রুস্তম, আল-উসূল আল-আরাবীয়া লি-তারীখ সূরীয়া ফি আহদ মুহাম্মাদ আলী, দ্বিতীয় খন্ড, (বেইরুট, ১৯৩৩), পৃঃ ১০১-৩; একই লেখকের রয়্যাল আর্কাইভস অব ইজিপ্ট অ্যান্ড দ্য ডিস্টার্বেন্সেস ইন প্যালেস্টাইন ১৯৩৪ (বেইরুট. ১৯৩৮), পৃঃ ৪৭-৫১; সুলাইমান আবু ইয্য-আল-দীন, ইবরাহীম বাশা ফি সূরীয়া (বেইরুট, ১৯২৯) পৃঃ ৩১৩

৫৩. আসাদ জে রুস্তম, দ্য রয়্যাল আর্কাইভস অব ইজিপ্ট অ্যান্ড দ্য ওরিজিনস অব দ্য ইজিপশিয়ান এক্সপেডিশন টু সিরিয়া (বেইরুট, ১৯৩৬), পৃঃ ৬৩-৬। হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭২৫ পাতা দেখুন।

৫৪. শিদয়াক, পৃঃ ৬২০; মুশাকাহ্ পৃঃ ১৩২-৪; আল-জামিয়াহ আল-মালাকীয়াহ আল-জুগরাফীয়াহ, খিতরা আল-বাতাল আল-ফাতিহ ইবরাহীম বাশা (কায়রো ১৯৪৮) পৃঃ ৩৭২

৫৫. মিশরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম বাশীর ও তাঁর পুত্ররা তাঁদের পাগড়ি বর্জন করে মাগরিবি ফেজ (তারবূশ) পরতে শুরু করেন। এই ফেজ আকারে ছোট ও পুরু। লেবানন ও সিরিয়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে আজও কেউ কেউ এটি পরেন। হায়দার পৃঃ ১০৩৫-৬

৫৬. হিট্টি, হিস্ট্রি অব সিরিয়া পৃঃ ৬৯৪-৫

৫৭. উইলিয়াম মিলার, দ্য অটোমান এম্পায়ার, ১৮০১-১৯২৭ (কেমব্রিজ, ১৯৩৬), পৃঃ ৩০৬

৫৮. সিরিয়া অ্যান্ড প্যালেস্টাইন (বিদেশ দপ্তরের ইতিহাস বিভাগের তত্ত্বাবধানে তৈরি পুস্তিকা) (লন্ডন, ১৯২০), পৃঃ ৩৭

৫৯. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭০৩ পাতা দেখুন।

৬০ এটি মূলত একটি তুর্কি শব্দ, অর্থ বড় ভাই। অটোমান তুর্কিরা প্রথমে 'আগা' শব্দটি প্রভু অর্থে ও পরে সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদের নাম হিসাবে ব্যবহার করেন।

৬১. স্টিফেন এইচ লংগ্রিগ, ফোর সেঞ্চুরিজ অব মডার্ন ইরাক (অক্সফোর্ড, ১৯২৫), পৃঃ ৩০০

৬২. হিট্টি, হিস্ট্রি অব সিরিয়া, পৃঃ ৬৭০

৬৩. নাযীহ্ এম আল-আযম, রিহলাহ ফী বিলাদ আল-আরব আল-সাঈদাহ (কায়রো, ১৯৩৭), পৃঃ ২০

৬৪. রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, দ্য মিডল ইস্ট (লন্ডন. ১৯৫০) পৃঃ ১১০-১৩; হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের গ্রন্থের ৭১০-১১ পাতা দেখুন।

৬৫. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৬৮৯ পাতা দেখুন।

৬৬. উসমান ইব্‌ন-বিশর, উনওয়ান আল-মাজদ ফি তারীখ নাজদ (মক্কা. ১৩৪৯) প্রথম খন্ড,, পৃঃ ১২১-৩; মুসিল নর্দার্ন নেগড, পৃঃ ২৬১-৭

৬৭. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭২৭ পাতা দেখুন।

৬৮. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা; ইব্‌ন-বিশর প্রথম খন্ড,, পৃঃ ১৫৫-২০৭

৬৯. তুর্কিদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের জন্য দেখুন, আমিন সাইদ, আল-সাওরাহ আল-আরাবীয়াহ আল-কুবরা, প্রথম খন্ড, (কায়রো. ১৯৩-?) পৃঃ ১২০

৭০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য এইচ এসটি. জে বি ফিলবি, অ্যারাবীয়া (লন্ডন, ১৯৩০),পৃঃ ১৬০

৭১. কে এস টুইশেল, সৌদি অ্যারাবীয়া (প্রিন্সটন, ১৯৪৭) ১২১ ওপরের পাতা

৭২. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৬৮৩ পাতা দেখুন।

৭৩. হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থের ৭৪৫ ও পরের পাতা দেখুন।

৭৪. সম্পাদনা ও অনুবাদ ওস্তাভ ফ্লুজেল, সাতটি খন্ড, (লিপজিগ ও লন্ডন, ১৮৩৫-৫৮)

৭৫. আল-আনওয়ার আল-কুদসিয়াহ্ ফি বায়ান আদাব আল-উবুদিয়াহ, তাঁর আল-তাবাকাত আল-কুবরা (কায়রো ১৯৩৫) গ্রন্থের প্রথম খন্ড, পৃঃ ২

৭৬. দেখুন ব্রোকেলম্যান গেশিচটে, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৩৬-৮

৭৭. দুটি খন্ড, (কায়রো, ১৯২৫)

৭৮. অটোমান শাসিত মিশরে ইসলাম ধর্মে সুফিবাদের প্রবল প্রভাব সম্পর্কে জানতে দেখুন তাওফিক আল-তাবীল, আল-তাসাউফ ফি মিসর ইব্বান আল-অস্‌র আল-উসমানি (কায়রো, ১৯৪৬), পৃঃ ৬-৫১, ২০০-২৩২

৭৯. মূল অর্থ মহাসাগর, কিন্তু বর্তমানে অভিধান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৮০. দশটি খন্ড,, কায়রো ১৩০৭

৮১. এখানে যে সংস্করণের কথা বলা হয়েছে তার চারটি খন্ড, (কায়রো ১৩২২)

৮২. তারীখ আল-তাইফাহ আল-মারূনিয়াহ, সম্পাদনা রশীদ কে আল-শারতুনি (বেইরুট, ১৮৯০)

৮৩. তারীখ, সম্পাদনা : নাউম মুগাবগাব (কায়রো ১৯০০)

৮৪. আখবার আল-আয়্যান ফি জাবাল লুবনান (বেইরুট ১৮৫৯)

৮৫. চারটি খন্ড, (রোম, ১৭১৯-২৮)

৮৬. খুলাসাত আল-আতকার ফি আয়্যান আল-কার্‌ন আল-হাদি-আশার, চারটি খন্ড, (কায়রো, ১২৮৪)

৮৭. তাঁর শেষের দিকে প্রকাশিত রচনাটি হাদীস-সংক্রান্ত। নাম, যাখাইর আল-মাওয়ারিস ফি আল-দালালাহ আলা মাওয়াযী আল-হাদীস, চারটি খন্ড, (কায়রো, ১৯৩৪)।

॥ অধ্যায় ৫২ ॥

দৃশ্যপট পরিবর্তন : পাশ্চাত্যের প্রভাব

মিশরের মাটিতে নেপোলিয়নের অতর্কিত পদক্ষেপ এক যুগান্তকারী ঘটনা। নেপোলিয়নের হাত ধরেই অতীতের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে বহির্বিশ্বের খোলা হাওয়ায় পাল তুলেছিল আরব দুনিয়া। আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় করানোর কৃতিত্ব বহুলাংশেই নেপেলিয়নের প্রাপ্য। যেমন মুদ্রণযন্ত্র। ভ্যাটিকান থেকে লুঠ করা এক আরবী মুদ্রণযন্ত্র কায়রোতে এনেছিলেন তিনি। মিশরে মুদ্রণযন্ত্রের সেটিই ছিল প্রথম আবির্ভাব।

এই যন্ত্রের সাহায্যে আরবী ভাষায় প্রচারপত্র ছেপে বিলি করতেন নেপোলিয়ন। এর থেকেই মিশরের সরকারি ছাপাখানা মাতবাআত বুলাকের জন্ম। শুধু মুদ্রণযন্ত্রই নয়, নেপোলিয়ন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রযুক্তি ও জ্ঞানের আলো পশ্চিমি ভাবধারার সঙ্গে দ্রুত পরিচয় ঘটিয়ে দেয় আরব দুনিয়ার। এর আগে পর্যন্ত আরবদের রক্ষণশীল ও কূপমণ্ডূক জীবনে প্রগতির কোন ভূমিকা ছিল না। প্রগতি সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন না আরবের মানুষ। পশ্চিমের প্রভাব তাদের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তাদের মধ্যযুগীয় নিষ্ক্রিয়তাকে ভেঙে দেয়। জ্বলে ওঠে এক স্ফুলিঙ্গ যা ক্রমে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়।

● সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রবেশ : মিশর

পশ্চিমের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্ভাব্য সুফলের কথা বুঝতে পেরেছিলেন দূরদর্শী মুহাম্মাদ আলী। তাই তাঁর সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করেন তিনি। শুধু তাই নয়, স্বদেশের ছাত্রদেরও ইউরোপে প্রশিক্ষণ দিতে পাঠাতে লাগলেন।[১] এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি অটোমান তুর্কিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তবে বিদেশি সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ মিশরে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র ছিল শুধুই সামরিক। কিন্তু সামরিক প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল ভাষা শিক্ষা। আর, ভাষা শিখলে স্বাভাবিকভাবেই তা জ্ঞানের পরিধিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে মিশরের মানুষ পশ্চিমি চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। পশ্চিমি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, বিজ্ঞান, ধর্মনিরপেক্ষতা সহ অন্যান্য প্রগতিশীল ভাবধারা তাদের নানাদিক থেকে প্রভাবিত করতে থাকে। আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আলী তাঁর নিজের দেশে সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, চিকিৎসাশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা বা কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষারও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মুহাম্মাদ আলীর মৃত্যুর পর

তাঁর প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পৌত্র আব্বাস (১৮৪৮-৫৪) সব বিদেশি উপদেষ্টাদের বরখাস্ত করেন। বন্ধ করে দেন সব বিদেশি ও ইউরোপীয় ধাঁচের দেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাঁর উত্তরাধিকারী সাঈদ (১৮৫৪-৬৩) ছিলেন পশ্চিমি চিন্তাধারার কট্টর বিরোধী। পরবর্তী শাসক ইসমাঈল (১৮৬৩-৭৯) অবশ্য ছিলেন বিপরীত ভাবধারার মানুষ। মিশরে মেয়েদের জন্য প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মার্কিন আধিকারিকদের নিয়োগ করেন। পশ্চিমের প্রভাব তাঁর উপর এতটাই বেশি ছিল যে, শোনা যায় মিশরকে ইউরোপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হলেও ইসমাঈলের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অনেক ত্রুটি ছিল। যেমন প্রয়োজনীয় নানা জিনিসের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, অর্থের অভাব এবং শিক্ষার মাধ্যম আরবী ভাষায় বইয়ের অভাব। তাই এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায়। তবে রাজপ্রাসাদ ও মসজিদ থেকে সংগ্রহ করা গুটিকতক বই নিয়ে যে গ্রন্থাগার তিনি শুরু করেছিলেন তা আজ মিশরের জাতীয় গ্রন্থাগার। বর্তমানে সেখানে পাঁচ লক্ষের মত বই রয়েছে। দ্য রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি অব ইজিপ্টের প্রতিষ্ঠাতাও ইসমাঈল। ১৯৫০-৫১ সালে তার ৭৫ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হয়।

ইসমাঈলের শাসনকালে আসয়ুতে একটি মার্কিন মহাবিদ্যালয় (১৮৬৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রোতে মেয়েদের জন্য যে মার্কিন মহাবিদ্যালয় আছে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর সাতবছর আগে 'আমেরিকান ইউনাইটেড প্রেসবিটেরিয়ান মিশন' মিশরে তাদের কাজকর্ম শুরু করেন।

● সিরিয়া ও লেবানন

মিশরের সিরিয়া দখল (১৮৩১-৪০)[২] সেদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সিরিয়ার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক রদবদল করেন ইবরাহীম। স্থানীয় শাসকদের (মুকাতিজি) ক্ষমতা কমিয়ে দেন, নিয়মিত করের ব্যবস্থা করেন এবং সরকারি পদের দাবিদার হিসাবে অ-মুসলিমদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেন।[৩] তাঁর ঘোষণা অন্যান্য সুলতানদের মত ছিল না।[৪] ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে আইনের চোখে সর্বধর্মের মানুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করা মাত্রই তিনি তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। দামাস্কাস ও সাফাদের মুসলিমরা এই আইনের বিরোধিতা করলে ইবরাহীম নির্দ্বিধায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। ইবরাহীমের তৈরি করা এই আইন অন্যান্য ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা অনেক বাড়িয়ে দেয়। আইন কার্যকর হওয়ার চারবছর আগে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত দামাস্কাসে আসতেন নিরাপত্তারক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে। কিন্তু আইন কার্যকর হওয়ার পর তিনি নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই যেকোন জায়গায় যেতে পারতেন।[৫]

নতুন উদারনীতি ও উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট করতে লাগল। ১৭৭৩ সালে পোপ যাদের আসা নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেই জেসুইটরা ফিরে আসে।[৬] ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্টান্ট ধর্মপ্রচারকদের প্রভাব বাড়তে থাকে লেবাননে। ১৮৩৮

খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় প্রোটেস্টান্ট গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই বছরই মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড রবিনসন প্যালেস্টাইনে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। এর ফলে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক সম্পদের কথা নতুন করে পরিচিতি লাভ করে। ছাপার অক্ষরে তা প্রকাশ পায়। এর তিনবছর আগে মার্কিন মিশন ছাপাখানা মাল্টা থেকে বেইরুটে সরিয়ে আনা হয়। ক্যাথলিক জেসুইটদের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, বেইরুট শহরের অপর প্রান্তে। আজও এই দুটি ছাপাখানা পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী ছাপাখানা। আধুনিক আরবীতে বাইবেলের অনুবাদ ছেপে প্রচার করত দুপক্ষই। সিরিয়ার প্রথম আরবী ছাপাখানা অবশ্য এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোতে এই ছাপাখানার সঙ্গেও খ্রিস্টানদের পরিচয় হয়। রক্ষণশীল মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস অবশ্য আল্লাহ্‌র বাণীকে মুদ্রণযন্ত্রে দেওয়ার বিরোধী। আজও কোরান হাতে লেখা অথবা খোদাই করা হয়। কিন্তু ছাপা হয় না। আলেপ্পোর ছাপাখানাই ছিল প্রাচ্যে প্রথম। কিন্তু তার জন্ম নিয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। সম্ভবত ইউরোপীয়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এই ছাপাখানা তৈরি হয়। ইউরোপের প্রাচীনতম আরবী ছাপাখানা ছিল ইতালির ফানোতে। পোপদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ছাপাখানা তৈরি হয়েছিল। এখানে ছাপা পুস্তকের মধ্যে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি প্রার্থনাপুস্তক আজও অক্ষত আছে। লেবাননের একটি ধর্মীয় মঠ কাজহাইয়া-তে একটি সিরিয়াক মুদ্রণযন্ত্র ছিল। সম্ভবত সেখানে শিক্ষারত কোন মারোনাইট পন্ডিত রোম থেকে এটি আনেন।[৭] এই ছাপাখানায় সিরিয়াক ভাষায় অনূদিত বাইবেলের প্রার্থনাসঙ্গীতগ্রন্থ ছাপা হয়। শুধু তাই নয়, সিরিয়াক বর্ণমালায় আরবী ভাষাতেও তা অনুবাদ করা হয়।[৮] মনে রাখা দরকার, ১৭ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত উত্তর লেবাননে সিরিয়াক ভাষায় কথা বলা হত।[৯]

মার্কিনীদের শিক্ষাপ্রসার কর্মসূচি একটি বড় সাফল্য পায় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে, সিরিয়ান প্রোটেস্টান্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বর্তমানে এটিই বেইরুটের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়। জেসুইটদের শিক্ষাপ্রসারের কাজ শুরু হয় ১৭ শতকে।[১০] আর তা চূড়ান্ত সাফল্য পায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বেইরুটে ইউনিভারসাইট সেন্ট-জোসেফ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এ অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব আজও বজায় রেখেছে।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়েরও আগে বেইরুটে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল মার্কিনরা (১৮৩০)। আজও তা আছে। ১৭৫৫ সালে দামাস্কাসে প্রতিষ্ঠিত হয় লাজারিস্ট মিশন। প্রায় দুই দশক বাদে এই মিশনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রাচীনতম বিদ্যালয় হিসাবে আজও দামাস্কাসের বালক ও কিশোরদের শিক্ষাদান করে চলেছে। আজকের সরকারি অথবা বেসরকারি যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই পূর্বসূরি এইসব বিদ্যালয়। আজও লেবানন বা সিরিয়ায় বিদেশি ভাষা শিক্ষার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। এমন কী, দেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। উচ্চশিক্ষা বা পেশাদার শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ফরাসি বা ইংরেজিই ব্যবহার করা হয়। এই

কাজে যারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ করলেও আত্মসমর্পণের সুযোগও পেতেন।

পশ্চিমের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব মুলুকের দেশগুলিতে পশ্চিমি ধাঁচের বিদ্যালয়, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, পত্রিকা এবং সাহিত্য সংগঠন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরে প্রথম আরবী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মুহাম্মাদ আলী প্রতিষ্ঠিত আল-ওয়াকাই আল-মিসরিয়্যাহ (মিশরের খবর) নামে এই সংবাদপত্রটি আজও সরকারি মুখপত্র হিসেবে বজায় আছে। সিরিয়ার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, বেইরুটে। হাদিকাত আল-আখবার (সংবাদের বাগিচা) নামে এই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা খলীল আল-খূরি। এর ১২ বছর বাদে স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বুত্রুস আল-বুস্তানি (১৮১৯-৮৩) মার্কিন ধর্মপ্রচারকদের সহযোগিতায় একটি পাক্ষিক প্রকাশ করেন বেইরুট থেকে। রাজনীতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক এই পত্রিকার নাম আল-জিনান (বাগান)। তিনি অবশ্য আরও পত্রিকা প্রকাশ করেন। আল-জিনান প্রকাশের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'দেশাত্মবোধ বিশ্বাসেরই একটি অঙ্গ' এই আদর্শকে প্রচার করা। তাঁর এই আদর্শ আরবী ভাষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই খ্রিস্টান শিক্ষাবিদ আরবীতে জ্ঞানকোষ প্রকাশের কাজ আরম্ভ করেন (দায়িরাত আল-মাআরিফ)। প্রথম ছটি খণ্ডের কাজ তিনি নিজেই শেষ করেন।[১১] আল-বুস্তানির লেখা অভিধান এবং গণিত ও ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক সহ একাধিক গ্রন্থ দেশের সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং আরবের জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ ছাড়াও বিদেশি ও বেসরকারি উদ্যোগও বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লেবাননে সাক্ষরতার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। এরজন্য সরকারি বিদ্যালয়ের থেকে বিদেশি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবদানই ছিল বেশি।[১২] আজও উচ্চশিক্ষার জন্য ফরাসি এবং মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপরই নির্ভর করতে হয়। লেবানন-সহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র পশ্চিমি সংস্কৃতির আগমনকে স্বাগত জানায়। কারণ দুই সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও তারা একই মূলস্রোতের দুটি ধারা। ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের — দুই অঞ্চলের সংস্কৃতিতেই ইহুদি-খ্রিস্টান ও গ্রিকো-রোমান ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন যুগ থেকেই দুপক্ষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। যদিও বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগের মাত্রার তারতম্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মামলুক শাসনের প্রথমপর্ব বা ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিভেদ ছিল মূলত মানুষেরই তৈরি। ১৬ শতকে অটোমান শাসকদের উত্থানের পর থেকেই পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের পথ ও মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পথ ধরে পশ্চিম ইউরোপ এগিয়ে চলতে থাকে অগ্রগতির পথে আর দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কাছে এসবই থাকে অজ্ঞাত, অপরিচিত। ১৮ শতকের শেষভাগে

এই পার্থক্য চরমে ওঠে এবং দুই সাংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান শুরু হয় নতুন করে।[১১]

পারস্পরিক বিনিময় ও নতুন করে গঠনের এই সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় আল-ইরাক বিশেষ উপকৃত হয়নি। ১৭ শতকেই বাগদাদ এবং আল-বসরায় প্রবেশাধিকার পেলেও সেখানকার মুসলিম সমাজে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকরা। কনস্ট্যানটিনোপলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক আধিকারিক ও কর্মীরা ছাড়া আল-ইরাকের সাধারণ মানুষ পশ্চিমি ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেননি। কিন্তু বাণিজ্যিক দিক থেকে বিদেশিদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল আল-ইরাকের। পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব যত মজবুত হতে থাকে, আল-ইরাকে বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও বাড়তে থাকে। এইভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে থাকে আল-ইরাক।

● রাজনৈতিক মুক্তদ্বার

ইবরাহীমের সিরিয়া আক্রমণ এবং নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণ এক অর্থে একইরকম প্রভাব বিস্তার করে। আর তা হল, দুদেশেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রাচীন প্রথা বন্ধ করে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীলতার এক নতুন যুগের সূচনা করা। তার থেকেও বড় কথা দুদেশই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাশার এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে বিবাদের অন্যতম বড় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে সিরিয়া ও মিশর। এই দুই দেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবদমান দুই দেশ ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। দুদেশের লক্ষ্যই ছিল এক—সিরিয়া ও মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ভারত ও দূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। ১৯ শতকের অনেক যুদ্ধেরই মূল কারণ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে জড়িত কোন না কোন স্বার্থ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ক্রিমিয়া যুদ্ধের (১৮৫৪-৬) কথা। প্যালেস্টাইনের ধর্মস্থান রক্ষার দাবি নিয়ে এই যুদ্ধ হয় ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল চালু হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের উত্থানও হতে থাকে দ্রুত। ক্রমেই এই খাল আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। উত্তমাশা অন্তরীপের চারপাশ দিয়ে এই খাল কাটাতে যত খরচ হয়েছিল তা-ও পূরণ হয়ে যায়।[১২] ১০০ মাইল দীর্ঘ এই খাল কাটতে প্রায় দুকোটি ডলার খরচ হয়েছিল। এর অধিকাংশই এসেছিল ইউরোপের জনগণের কাছ থেকে। তবে এর মধ্যে ফ্রান্সের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। মিশরের রাজপ্রতিনিধিদের জন্য ১৭৬, ৬০২ টি শেয়ার ছিল, যার প্রত্যেকটির মূল্য ২০ ডলার। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তা কিনে নেন

● ব্রিটিশের মিশর দখল

মিশরে ইসমাঈলের শাসনকালে সুয়েজ খাল চালু হয়। ইসমাঈলের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে দেশের আর্থিক দুর্দশা চরমে ওঠে। এর ফলে ইউরোপের হস্তক্ষেপও অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। মিশরের কর দ্বিগুণ করে দেওয়ার যে লোভনীয় প্রস্তাব ইসমাঈল দিয়েছিলেন তাতে অটোমান তুর্কিরা তাঁকে (১৮৬৬ এবং ১৮৭৩) তাঁর পরিবারের জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের সম্মান এবং খেদিভ[১৫] উপাধি দেন। এই উপাধির অর্থ একদিক থেকে সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড যৌথভাবে মিশরের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। খেদিভ উপাধিও কেড়ে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সারকাসিয় আধিকারিক অধ্যুষিত সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। ক্ষোভ জমা হচ্ছিল কৃষকদের মধ্যেও। একদিকে করের বোঝা এবং জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করার সমস্যা, অন্যদিকে সরকারের 'করভি' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার জোরে সরকার যেকোন সুস্থ সবল পুরুষকে অল্প অথবা বিনা বেতনে সরকারি প্রকল্পে কাজ করাতে বাধ্য করত। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পের সুফল সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। এই ক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন সেনাবাহিনীর আধিকারিক আহমাদ আরাবী। তিনি নিজেও আগে কৃষক ছিলেন।[১৬] কিন্তু ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর আল-তাল আল-কবীরে (তেল এল-কেবির) এই আন্দোলন বানচাল করে দেন। আরাবীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[১৭] এর ফলে ব্রিটিশদের কাছে মিশর দখলের সুযোগ এসে যায়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর নামেমাত্র হলেও তুর্কিদের অধীনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যান্ড মিশরকে তাদের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করে। খেদিভ আব্বাস হিলমিকে নির্বাসিত করা হয় এবং তাঁর কাকা হুসাইন কামিল সুলতান আখ্যা পেয়ে হিলমির স্থলাভিষিক্ত হন।[১৮] ১৯১৭ সালে হুসাইনের উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভাই ফুয়াদ। ১৯২২ সালে তাঁকে মালিক (রাজা) উপাধি দেওয়া হয়।

এই সময়ই ব্রিটেনের শাসনকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। মিশর স্বাধীনতা লাভ করে এবং সংবিধান রচিত হয়। এই স্বাধীনতার জন্য অবশ্য মিশরের মানুষকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল জাতীয়তাবাদী নেতা সা'দ জাগলুল। কৃষক পরিবারের সন্তান জাগলুল ছিলেন আরাবীর অনুগামী। তবে তাঁর থেকে শিক্ষিত ও যোগ্য। জামাল-আল-দীন আল-আফগানির ছাত্র এবং সফল আইনজীবী জাগলুল ছিলেন মুহাম্মাদ আবদুহ্[১৯]-এর অধীনে আল-ওয়াকাই আল-মিসরিয়্যার প্রাক্তন সম্পাদক। ১৯১৯ সালে তিনি এক প্রতিনিধিদল (ওয়াফদ) নিয়ে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন এবং লন্ডনে যাওয়ার অনুমতি চান ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু তাঁকে ভর্ৎসনা করে মাল্টায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রত্যাখ্যান তাঁকে রাতারাতি জাতীয় নেতায় পরিণত করে। তাঁর দলের মিলিত প্রয়াসের ফলেই ১৯৩৬ সালে ব্রিটেন-মিশর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত

অনুযায়ী সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সেনাদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, বিদেশিদের নিরাপত্তা ও সম্পত্তির দায়িত্ব মিশর সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বন্দর, বিমানবন্দর বা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্রিটেনের সাহায্যও মঞ্জুর হয়।

১৯৫২ সালে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফুয়াদের পুত্র রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। অবসান ঘটে রাজতন্ত্রেরও। ১৯৫৪ সালে কর্ণেল জামাল আবদ-আল-নাসিরের (নাসের) নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ইজরায়েলি, ব্রিটিশ এবং ফরাসি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নাসিরের অনমনীয় মনোভাব ১৯৫৬ সালে তাঁকে সমগ্র আরবের জাতীয় বীরের দুর্লভ সম্মান এনে দেয়। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার চালু করেন।

● ফরাসি এবং ব্রিটিশ 'ম্যানডেট'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আরব মুলুকে বিদেশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অনুশাসনে পরিণত হতে থাকে। তাই আল-ইরাক ও প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ এবং সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসিদের অনুশাসন কায়েম হয়। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ প্রভাবকে টেক্কা দেওয়ার উচ্চাশা। আর ছিল প্রাচ্যের সামগ্রীর চাহিদা পূরণের উদ্যোগ, যা ধর্মযুদ্ধের সময়[২০] থেকেই তৈরি হয়েছে। প্রথম ফ্রান্সিসের[২১] প্রতি সুলাইমানের আত্মসমর্পণ ফরাসি ক্ষমতার ভিতকে আরো মজবুত করে তোলে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বৃহৎ শক্তিগুলির অনুমোদন পেয়েই লেবাননের উপকূলে ফরাসি সেনা মোতায়েন হয়। ভবিষ্যতে আরো বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে লেবাননকে বাঁচাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।[২২]

এইসব দেশের প্রশাসন জাতিসঙ্ঘের চুক্তিপত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। জাতিসঙ্ঘের শর্ত অনুযায়ী অনুশাসিত দেশের জনকল্যাণ এবং তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তাই অনুশাসনকারীর প্রাথমিক কর্তব্য। ফরাসিদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার অভিযোগ ছিল তীব্রতম। তারা অভিযোগ করে, উত্তর আফ্রিকার মতো সিরিয়াতেও সাম্রাজ্যবাদী কৌশল অবলম্বন করেছে ফরাসিরা। যেমন, স্থানীয় সরকারকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা, উদ্ভুত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা, আরবী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা, ফ্রাঁর সঙ্গে যুক্ত করে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের চেষ্টা করা। সেইসঙ্গে ছিল এক দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ও অপরের বিবাদে মদত দেওয়া এবং ষড়যন্ত্র, কারাবাস বা নির্বাসনের মত দমনমূলক পন্থা অবলম্বন করার অভিযোগ।[২৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আলেকজান্দ্রেটার সানজাকের অধিকার তুরস্কের হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সিরিয়াকে একাধিক 'এস্তাত'এ বিভক্ত করাতেও সিরিয়াবাসী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল।

বিদেশি অনুশাসনের ফলে এইসব অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। কৃষিকাজের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক সরকার ও সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের আগুন নেভাবার পক্ষে এইসব সংস্কার যথেষ্ট ছিল না। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে জাবাল-আল-দুরুজে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। দ্রুতই তা দামাস্কাস এবং নিকটবর্তী শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে সিরিয়া থেকে ফরাসি সেনা প্রত্যাহৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই আগুন নেভানো যায়নি। এর দু'বছর পরে লেবানন স্বাধীনতা অর্জন করে সাধারণতন্ত্র গঠন করে। যদিও প্রথমে ফরাসি অনুশাসনের সঙ্গে তাদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

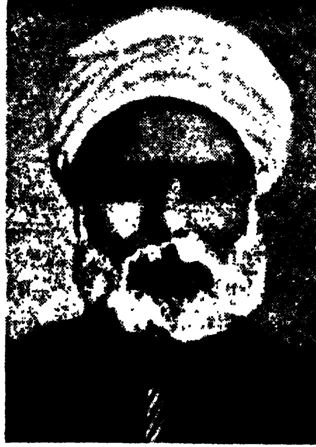
আল-ইরাক এরও আগে ব্রিটিশ অনুশাসনের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করতে শুরু করে। ১৯২০ সালের নিম্ন ইউফ্রেটিস উপত্যকা এবং ধর্মীয় শহর আল-নাজাফে ও কারবালায় যে বিদ্রোহের সূচনা হয়,[১৩] তাতে ব্রিটিশরা নড়েচড়ে বসে। প্রত্যক্ষ শাসনের পরিবর্তে পরোক্ষ শাসন কায়েম করতে বাধ্য হয় তারা। ১৯২০ সালের ৮ মার্চ থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত সিরিয়ার সিংহাসন দখলের পরে ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে রাজা হুসাইনের দ্বিতীয় পুত্র[১৫] ফয়সলকে আল-ইরাকের সংবিধানসম্মত রাজার আসনে বসানো হয়। এরপরে দুপক্ষের মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের চুক্তিটি। এতে ব্রিটেন আল-ইরাককে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের সঙ্গে ২৫ বছরের সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩০ সালের জুন মাসে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ব্রিটেন তার অনুশাসন প্রত্যাহার করে আল-ইরাকের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়।[১৬] এর জন্য রাজা প্রথম ফয়সলের (১৯২১-৩৩) প্রশাসনিক দক্ষতাকেই কৃতিত্ব দিতে হয়। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী তাঁর সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে দ্বিতীয় ফয়সল (১৯৩৯-৫৮) তাঁর কাকা এবং প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়।

● এক মিশরিয় সংস্কারক

রাজনৈতিক ওঠাপড়ার এই যুগে আরব মুলুকের মানুষ এক পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। একদিকে যেমন তারা ইউরোপীয় অনুশাসনের বিরোধিতা করছিল, অপরদিকে তারাই ইউরোপের ধ্যানধারণা ও আধুনিকতাকে আপন করে নিচ্ছিল। ইউরোপ থেকে পাওয়া নবলব্ধ জ্ঞান তারা ইউরোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই কাজে লাগায়। পশ্চিমের থেকে পাওয়া অসংখ্য নতুন ধ্যানধারণার মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাদের আত্মনির্ধারণের পথ দেখায় যা শেষপর্যন্ত বিদেশি শাসনের থেকে স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। পশ্চিমের এই নতুন আদর্শে

ধর্ম নিপেক্ষতা এবং বস্তুগত দিকের উপর জোর দিত। সেইসঙ্গে ভৌগোলিক ও জাতিগত সীমাকেও গুরুত্ব দিত যা সনাতন ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামি ঐতিহ্যে বিশ্বজনীন ধর্ম, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তন্ত্র এবং একচেটিয়া সার্বভৌমত্বকে আদর্শ মনে করা হয়। সমগ্র আরবের পরিবর্তে সমগ্র ইসলামই ছিল বেশি গ্রহণযোগ্য। দুই মতবাদের এই সংঘাত অভ্যন্তর ও বাহির দুদিকেই গড়ে ওঠে। ১৯ শতকের শেষভাগে মিশরের বৌদ্ধিক পরিবেশ ছিল নতুন আদর্শ গ্রহণ এবং বিকাশের পক্ষে আদর্শ। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল উদারনৈতিক সংস্কারক মুহাম্মাদ আবদুহ্‌র (১৮৪৯-১৯০৫) রচনা এবং ভাষণ। তিনি মিশরের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদ 'মুফতি'র সম্মান লাভ করেছিলেন। ইসলামকে আধুনিক ভাবধারায় পরিচয় করানোর অন্যতম প্রথম ব্যক্তি জামাল-আল-দীন আল-আফগানিকে (১৮৩৯-৯৭)[২৭] শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন মুহাম্মাদ আবদুহ্। জামাল-আল-দীনের জন্ম আফগানিস্তানে। মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাসের আগে তিনি ভারত, মক্কা এবং কনস্ট্যানটিনোপলেও থেকেছেন। মিশরে তিনি আহমাদ আরাবীর আন্দোলনের[২৮] সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার দায়ে মুহাম্মাদ আবদুহ্‌কে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। ইসলাম ধর্মের ক্ষীয়মাণ দশা তাকে মর্মাহত করে। ধর্মবিশ্বাসের বিকৃতি এবং কুসংস্কারকে নিন্দার ব্যাপারে তিনি ইব্‌ন-তাইমিয়ার[২৯] পথ অবলম্বন করেন। তাঁর মতে, এই অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক পথে ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং একজন ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অধীনে রাজনৈতিক ঐক্য অত্যন্ত জরুরি। ইসলামের সঙ্গে ধর্মের কোন সংঘাত ছিল বলে তিনি মনে করতেন না। আল-আজহারের ছাত্র ও শিক্ষক মুহাম্মাদ আবদুহ্, জামাল-আল-দীনের সঙ্গে প্যারিস থেকে একটি দৈনিক প্রকাশ করতেন। ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই, এই মত পোষণ করতেন। যুক্তি দিয়ে কোরানের কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশের অর্থভেদ করে তিনি ইসলাম ধর্মে দার্শনিক মতবাদের অভাব দূর করেন[৩০]। জামাল-আল-দীন যেখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের উপর জোর দিতেন, মুহাম্মাদ আবদুহ্ সংস্কারের জন্য সেখানে ধর্মীয় জাগরণের পক্ষপাতী ছিলেন। ইসলাম ধর্মকে তার মধ্যযুগীয় সংস্কারের খোলসমুক্ত হতে সবথেকে বেশি সাহায্য করেছিলেন এই দুই আধুনিক লেখক। দুজনেই তাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাননি, তবে তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁদের ছাপ রেখে যেতে পেরেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাসিম আমিন (মৃ. ১৯০৮) এবং মুহাম্মাদ রশীদ রিযা (মৃ. ১৯৩৫)। কাসিম আমিনই প্রথম বহুবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং বোরখা[৩১] ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মুহাম্মাদ রশীদ রিযার জন্ম উত্তর লেবাননের আল-কালামুনে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরে চলে যান। মুহাম্মাদ আবদুহ্‌র রচনা সম্পাদনা[৩২] করা ছাড়াও তিনি তাঁর জীবনী রচনা করেন এবং তাঁরই আদর্শ অনুসারে আল-মানার পত্রিকার কাজ চালিয়ে যান। তৎকালীন যুবসমাজের কাছে সবচেয়ে বড় কর্তব্য

ছিল গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে আরব সমাজের পুনর্গঠন এবং ইসলাম ও আধুনিক বিশ্বের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপন।



আধুনিক মিশরের সংস্কারক মুহাম্মাদ আবদুহ

● জাতীয়তাবাদ

সকল আরবীভাষী মানুষ একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত — এই বিশ্বাসের বৃহত্তর ভিত্তির উপরেই সূচনা হয়েছিল আরব জাতীয়তাবাদের। আরম্ভে এটি ছিল সম্পূর্ণতই বৌদ্ধিক আন্দোলন যার পুরোভাগে ছিলেন মূলত সিরিয়ার বুদ্ধিজীবীরা। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বেইরুটের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লেবানিজ খ্রিস্টান, যাদের কর্মক্ষেত্র ছিল মিশর।[৫৫] এই আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৭০ সাল নাগাদ, যখন আরবী মহাকাব্যের প্রতি বুদ্ধিজীবীরা নতুন করে মনোযোগী হন এবং ইসলামি ইতিহাস নিয়েও গবেষণা শুরু হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব এবং আরবদের সাংস্কৃতিক সাফল্য সম্পর্কে সচেতনতাই ভবিষ্যত সম্ভাবনার এক ইঙ্গিত এনে দেয়। বৌদ্ধিক জাগরণের হাত ধরেই আসে রাজনৈতিক জাগরণ। আর সেখান থেকেই সূচনা হয় রাজনৈতিক সক্রিয়তার। বহু শতাব্দি পর পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে মানুষের মনে। আর সর্বত্রই এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয় পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায়।

কিছুদিনের মধ্যেই সদ্যগঠিত এই সমগ্র-আরব আন্দোলন বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মিশরে প্রধান সমস্যা ছিল ব্রিটিশদের আধিপত্য। ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার তীব্রতায় মিশরিয় স্বার্থ চাপা পড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই আরব জাতীয়তাবাদের ছত্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গড়ে ওঠে মিশরিয় জাতীয়তাবাদ। সেখানে আঞ্চলিক সমস্যাই বেশি গুরুত্ব পায়। মিশরে নতুন ভাবধারা, নতুন শাসনব্যবস্থা আনার জন্যই স্বাধিকারকামী মিশরিয়রা সরব হয়ে উঠল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব আরবের বিভাজনের ফলে আরব জাতীয়তাবাদের ঐক্য আরো বিনষ্ট হয়। সিরিয়ার জাতীয়তাবাদ ফরাসি অনুশাসন বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। লেবানন প্রথমে ফরাসি অনুশাসনের পক্ষে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অনুশাসনের কট্টর বিরোধী হয়ে পড়ে। একইভাবে, প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ অনুশাসনের বিরোধিতা এবং ইহুদিদের বাসভূমির জন্য আন্দোলনের সমস্যা দেখা দেয়। শেষোক্ত এই সমস্যা প্যালেস্টাইনের জন্ম দেয়। সব মিলিয়ে প্যালেস্টাইনেও জাতীয়তাবাদ হয়ে যায় একান্তভাবেই আঞ্চলিক। এমন কী ট্রান্সজর্ডনের মত ছোট রাষ্ট্রও তার নিজস্ব মর্যাদা অর্জনের পথ নেয়। ১৯২১ সালে ব্রিটিশরা দক্ষিণ সিরিয়া থেকে ট্রান্সজর্ডনকে বিচ্ছিন্ন করে আমির আবদুল্লাহ্‌র অধীনে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। আবদুল্লাহ্‌ তাঁর ভাই ফয়সলকে সিংহাসনচ্যুত করার বিরোধিতা করলে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে এই নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। তা ছাড়া বেদুইনদের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার উদ্দেশ্যও ছিল। ১৯৪৬ সালে আমির ট্রান্সজর্ডনের রাজা এবং ১৯৪৯ সালে জর্ডনের হাশিমিয়া সাম্রাজ্যের (আল-মামলাকাহ আল-উর্দুন্নিয়াহ আল-হাশিমিয়াহ) রাষ্ট্রপ্রধান হন। ইরাকি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় ১৯২০ সাল নাগাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

জাতীয়তাবাদী শক্তি যেমন বিদেশি শক্তির মোকাবিলা করেছে, তেমনই গণতন্ত্রকে সংঘর্ষে নামতে হয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার শত্রু ছিল ঘরে-বাইরে সর্বত্র। পূর্ব আরব জুড়ে সামন্ততন্ত্রের সামাজিক আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক জটিলতাও ছিল। এই ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার এবং ভূসম্পত্তির পরিমাণের ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসতেন। প্রথমে উত্তরাধিকারের থেকে সামন্ত প্রভু নিয়োগের উপরই জোর দেওয়া হত। লেবানন এবং সিরিয়ায় এদের বলা হত মুকাতিজি।[৩৪] কর গ্রহণ এমন কী শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও থাকত এই মুকাতিজিদের। এদের সম্পদের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, পদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের প্রশ্নও তত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ ছিল না। আর, নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধান আজও শেষ হয়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকে আজও গোটা পূর্ব আরব পরিবৃত্তিকালেই আবদ্ধ রয়েছে।

● ঐক্য প্রবণতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে কষ্টদায়ক ছিল। সেইসঙ্গে তাদের রাষ্ট্রের পূর্ণ অথবা আংশিক মর্যাদালাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি সত্যকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তা হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক বাসভূমির জন্য ইহুদিদের আন্দোলন (আরবদের মতে যা অনধিকার প্রবেশমূলক) আরব রাষ্ট্রগুলিকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। অভিন্ন স্বার্থ এবং ঐক্যের মনোভাব প্রকাশ পায় ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কায়রোতে স্বাক্ষরিত আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের চুক্তিতে। এই চুক্তিতে শিক্ষা, বাণিজ্য এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলা হয়। কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতবিনিময় এবং পারস্পরিক মতবিরোধের নিষ্পত্তিতে হিংসার পথে না যাওয়ার কথাও বলা হয়। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যের তালিকায় মিশর, সিরিয়া, লেবানন, আল-ইরাক, ট্রান্সজর্ডন, সুযুদি আরব এবং আল-ইয়ামান ছাড়াও সদ্য স্বাধীন হওয়া মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, সুদান, আল-কুওয়ায়েত এবং আলজেরিয়াও ছিল। ১৯৬১ সালে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে মিশর ও সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গঠিত হয় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। ১৯৬২ সালে সামরিক অভ্যুত্থান হয় আল-ইয়ামানেও। ইমাম শাসিত সাম্রাজ্যের পরিবর্তে সমাজবাদ সম্পর্কিত সাধারণতন্ত্র গঠনের লক্ষ্যে ঘনঘন সামরিক অভ্যুত্থান হতে থাকে পূর্ব আরবে। এইরকম অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে সিরিয়া রয়েছে সকলের আগে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ২০ বছরে অন্তত ১৩ টি অভ্যুত্থান হয়েছে সিরিয়ায়। তার মধ্যে কয়েকটি ব্যর্থ হয়। এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্থিতিশীল হল লেবানন।

বিশ্বের ইতিহাসে আরবদের স্থান স্বতন্ত্র। তৃতীয় একত্ববাদী ধর্মের প্রবর্তক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই ধর্মের সুফল তারা লাভ করেছে। পশ্চিমের সঙ্গে তারাও গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মধ্যযুগ জুড়ে যেমন তারা জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল তেমনই ইউরোপীয় নবজাগরণেও রেখেছে তাদের অমূল্য অবদান। আজ, আধুনিক বিশ্বের সচেতন এবং অগ্রগামী রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের সম্মান অর্জন করতে পেরেছে আরব রাষ্ট্রগুলি। সুমহান ঐতিহ্য এবং খনিজ তেলের বিশাল ভান্ডারে সমৃদ্ধ আরব ভবিষ্যতে মানবজাতির বস্তুগত এবং আত্মিক উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার যোগ্য। ❑

● টীকা ●

১. পৃ: ৭২৩-৪
২. ৭২৫ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
৩. ৭৩৪ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
৪. ৭২৭ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
৫. সিরিয়া অ্যান্ড প্যালেস্টাইন পৃ: ২৭
৬. ৭৩০-৩১ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
৭. ৭৪৩ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
৮. গারশুনি; হিট্টির হিস্ট্রি অব সিরিয়া পৃ: ৫৪৬; লুই শিখো "তারিখ ফন্ন আল-তিবাআ ফি আল-মাশরিক". আল-মাশরিক, তৃতীয় খন্ড (১৯০০), পৃ· ২৫১-৭, ৩৫৫-৬২
৯. ডি আরভিউক্স, মেমোয়ার্স (প্যারিস, ১৭৩৫), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৪০৭, ৩৬১ পৃষ্ঠার উপরে তুলনীয়।
১০. ৭৩০ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
১১. তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত জানতে জুরজি জায়দান এর তারাজিম মাশাহির আল- শার্ক ফি আল-কার্ন আল-তাসি-আশার (কায়রো ১৯০৩), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ২৪-৩১
১২. ম্যাথিউজ অ্যান্ড আকরাবি পৃ: ৪০৭
১৩. সারটন, ইন্ট্রোডাকশন, তৃতীয় খন্ড, পৃ: ২১-২
১৪. ৭২৭-৮ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
১৫. পারসি-খাদিউ, প্রভু, শাসক। এই ফরমানের মূল আরবীর জন্য দেখুন জায়দান, তারিখ মিসর, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ২০৬-৮
১৬. তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন জায়দান। তারাজিম, প্রথম খন্ড, পৃ: ২২৯-৫২
১৭. আরাবীর হয়ে একজন ইংরেজের মামলার জন্য দেখুন উইলফ্রিড এস ব্লান্ট-এর সিক্রেট অব দ্য ইংলিশ অকুপেশন অব ইজিপ্ট (নিউ ইয়র্ক, ১৯২২), পৃ: ৩২৩-৬৩
১৮. ৭২৬ পৃষ্ঠার ১নম্বর পাদটীকার বংশলতিকা দেখুন।
১৯. ৭৫৩-৫ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
২০. ৫৯৪ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।
২১. ৭২৮ পৃষ্ঠার উপরের অংশ তুলনীয়।
২২. ৭৩৫-৬ পৃষ্ঠার উপরে দেখুন।

২৩. জর্জ অ্যান্টনিয়াস, অ্যারাব অ্যাওয়েকেনিং (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৩৯), পৃ: ৩৭২-৬; অ্যালবার্ট এইচ হোউরানি, সিরিয়া অ্যান্ড লেবানন (অক্সফোর্ড, ১৯৪৬), পৃ: ১৭৬-৮

২৪. ফিলিপ ডবলিউ আয়ারল্যান্ড, ইরাক : এ স্টাডি ইন পলিটিকাল ডেভেলপমেন্ট (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮), পৃ: ২৬৬-৭৬

২৫. আল-হিজাজের হুসাইন

ট্রান্সজর্ডনের আবদুল্লাহ

১. আল-ইরাকের ফয়সল (মৃ. ১৯৩৩)

২. গাজি (মৃ. ১৯৩৯)

৩. দ্বিতীয় ফয়সল (১৯৩৫; ১৯৩৯-৫৮)

২৬. আয়ারল্যান্ড, পৃ: ৪০৯-১৮; চুক্তির মূল আরবী সম্পর্কে আবদ-আল-রাজ্জাক আল-হাসানির তারিখ আল-ইরাক আল-সিয়াসি (বাগদাদ, ১৯৪৮), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ১৯৭-২০৪.

২৭. ইসলামে আধুনিকতা সম্পর্কে এইচ এ আর গিব এর মডার্ন ট্রেন্ডস ইন ইসলাম (শিকাগো, ১৯৪৫) ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ৩৯।

২৮. পৃ: ৭৫০, জামাল-আল-দীনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চার্লস সি অ্যাডামস-এর ইসলাম অ্যান্ড মডার্নিজম ইন ইজিপ্ট (লন্ডন ১৯৩৩), ৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা; জায়দান, তারাজিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৫৪, ৬৬.

২৯. পৃ: ৬৮৯

৩০. তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন মুহাম্মাদ রশীদ রিযার তারিখ আল-উস্তায আল-ইমাম আল-শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহ্, তিনটি খন্ড (কায়রো, ১৩২৪); অ্যাডামস পৃ: ১০৬-১০

৩১. তাঁর লেখা তাহরির আল-মারআহ (নারীদের শৃঙ্খল-মোচন) (কায়রো, ১৩১৬), জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন ও রেশার (স্টুটগার্ট, ১৯২৮)।

৩২. এর মধ্যে প্রধান ছিল তাফসীর আল-কুরআন আল-হাকীম-এর আটটি খন্ড (কায়রো, ১৩৪৬)।

৩৩. অ্যান্টনিয়াস, পৃ: ৭৯-৮৬

৩৪. পৃ: ৭৪৬.